অস্পৃশ্য পায়খানা!

ভারতে কথাটা বলতেও ঘেন্না! কিন্তু তা হওয়া উচিত নয়।

অধিকাংশ লোক তাঁদের পায়খানা সত্যিই দারুণ অপরিষ্কার রাখেন। বাড়ীর অন্যান্য ঘরের তুলনায় সবচেয়ে কম নজর শুধু ওই পায়খানার বেলায়। ভাবটা—না দেখলেই মাথা ঘামাতে হবে না। কিন্তু মাথা ঘামবে কারণগুলো দেখলে :

ময়লা পায়খানা শুধু দেখতে বিশ্রী আর দুর্গন্ধময় তাই নয়—তা যেমন অস্বাস্থ্যকর আর স্বাস্থ্যবিধির প্রতিকূল তেমনি দারুণ বিপজ্জনক।

এটি হল সরল সত্য কথা। একটুও কমিয়ে বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না। তাহ'লে আপনার নিজের মনকেই জিগ্গেস করুন তো···

আপনার পায়খানা আপনি যেমন পরিষ্কার চান সেই রকম কি?

উত্তরটি ভাল ক'রে জেনে রাখা দরকার একজনার—আপনার।

রোজ সকালে পরিষ্কার করার জন্য মেথর রাখলেও সে কি ঠিক মত কাজ করছে, না নম নম ক'রে কাজ সেরে পালাচ্ছে? উত্তরটা আপনার যদি খারাপ লাগে একটা জিনিসের খবর জেনে রাখলে আপনি সুখী হবেন···স্যানিফ্রেশ।

স্যানিফ্রেশ জিনিসটা কি?

স্যানিফ্রেশ হল পায়খানা পরিষ্কার করার পদার্থ যা সব ময়লা সাফ ক'রে পায়খানা ঝকঝকে রাখে। প্রথমে পায়খানার জল ঢেলে দিন। তারপর পায়খানার গামলার মধ্যে প্রচুর স্যানিফ্রেশ ছিটিয়ে দিন। ৩-৪ ঘণ্টা তাকে কাজ করতে দিন। আরও ভাল হয় যদি একরাত্ত অবধি রেখে দেন। তারপর আবার জল ঢেলে দিন। তাতে যদি ভাল পরিষ্কার হচ্ছে না দেখেন, তাহলে একবালতি জল জোরে ঢেলে দিন। বস্! আপনার পায়খানা পরিষ্কার রাখার সব ঝামেলা দূর।

স্যানিফ্রেশ ৩ ভাবে কাজ করে

১. স্যানিফ্রেশ পুরোপুরি পরিষ্কার করে।

এতে রয়েছে অত্যন্ত কার্যকর পরিষ্কার করার পদার্থ যা দারুণ শক্ত দাগও উঠিয়ে দেয়। ব্রাশ যেখানে পৌঁছয় না সেখানেও স্যানিফ্রেশ সাফ করে।

২. স্যানিফ্রেশ বিপজ্জনক রোগজীবাণু বিনাশ করে।

পায়খানায় রোগজীবাণু জন্মাতে পারে। তাতে অসুখবিসুখের সম্ভাবনা খুব বেশী। যে কাজ সাধারণ 'ফিনাইল' করতে পারে না সে কাজ স্যানিফ্রেশ করে—আপনার স্বাস্থ্য রক্ষা করে। তাই আপনার পায়খানা যে একেবারে নিরাপদ সেবিষয়ে আপনি একদম নিশ্চিন্ত।

৩. স্যানিফ্রেশ বিরক্তিকর দুর্গন্ধ দূর করে

কখন কখন পায়খানার দুর্গন্ধে প্রাণ অতিষ্ঠ। পায়খানায় হাওয়াবাতাস খেলার পথ না থাকলে দুর্গন্ধ আটক থাকে আর তখন যাকে বলে গোদের ওপর বিষফোড়া! স্যানিফ্রেশে এমন দুর্গন্ধনাশক পদার্থ আছে যা সব বদগন্ধ দূর ক'রে বাতাস নির্মল ক'রে তোলে।

স্যানিফ্রেশ কতবার ব্যবহার করা দরকার? পায়খানা পরিষ্কার রাখার গুরুত্বের কথা চিন্তা করলে এ প্রশ্নের উত্তর একটাই—প্রত্যেক দিন।

নকল হইতে সাবধান!
প্যাকের ওপর
স্যানিফ্রেশ
নাম দেখে নিন।
এ হলো— বালসারার
সেরা কোয়ালিটির গ্যারান্টী

স্যানিফ্রেশ সব ময়লা দূর ক'রে আপনার পায়খানা পরিষ্কার রাখে।

বালসারা
উন্নততর জীবনযাত্রার
আধুনিক সহায়ক

BALSARA

CHAITRA-BLS-

চিঠিপত্র

আগ্নেয়গিরির শিখরে

"আগ্নেয়গিরির শিখরে পিকনিক" (দেশ, ২ জুলাই) প্রবন্ধে বেকার-সমস্যার ভয়াবহতা ফুটিয়ে তুললেও বেকারদের সম্বন্ধে সব কথা বলা হয়নি। রেজিস্ট্রী করা বেকারদের তালিকায় যেমন অবস্থাপন্ন ঘরের মহিলারা (চাকরি যাঁদের কাছে অবসর বিনোদনের উপায়) আছেন, তেমনি আছে বহু চাষী ও অন্যান্য বৃত্তিজীবীদের (ধোপা, নাপিত, তাঁতী প্রভৃতি) ছেলেরা, যারা কিছুটা লেখাপড়া শিখে পৈত্রিক বৃত্তির প্রতি বিমুখ হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার ছেঁদাপাথর অঞ্চলে একটি ধোপার ছেলের সংস্পর্শে এসেছিলাম, যে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে বলে পৈত্রিক বৃত্তি বর্জন করে অফিসে পিওনের চাকরি খুঁজছে। লেখাপড়া জানা ছেলে ধোপার কাজ করুক এটা তার বাবাও চায় না, যদিও সে নিজে রজকবৃত্তি করেই বেকার ছেলের ভরণ-পোষণ করছে। মেদিনীপুর জেলার একজন চাষীর বি-এ পর্যন্ত পড়া ছেলে আমার কাছে চাকরির সন্ধানে আসত, তার কলকাতার মেসের খরচ অশিক্ষিত চাষী বাপের পাঠানো টাকায় চলত। আমি তাকে চাকরি না খুঁজে তার বাপকে চাষের কাজে সাহায্য করার পরামর্শ দিতেই সে আঁতকে উঠে বলেছিল যে কলেজে উচ্চশিক্ষা পাবার পর চাষের কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

এই দুটি ছেলের মত হাজার হাজার তরুণ দেশময় ছড়িয়ে আছে, স্কুল-কলেজের তথাকথিত শিক্ষা (?) যাদের পৈত্রিক বৃত্তি থেকে বিচ্যুত করেছে। বেকার সমস্যা সমাধানের বিষয়ে যাঁরা চিন্তা করছেন, তাঁদের আমি তথাকথিত শিক্ষার অহমিকায় পৈত্রিক বৃত্তি বর্জনকারীদের প্রতি মনোনিবেশ করতে বলি। পৈত্রিক বৃত্তির মধ্যে এদের ফিরিয়ে আনতে পারলে বেকারদের ভিড় অনেকটা কমে যাবে।

ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার সূত্রে গ্রামাঞ্চলে ঘোরাঘুরি করতে করতে আমার মনে হয়েছে যে একটা ঝিমিয়ে পড়া নিষ্ক্রিয়তা গ্রামের মানুষদের আচ্ছন্ন করে আছে। বছরে একটি ফসল ফলানোর পর বছরের বাকি সময় তারা বসেই কাটায়। আবহাওয়ার আনুকূল্য বা জলসেচের ব্যবস্থা থাকলেও তারা দ্বিতীয় ফসল বা শাক-সবজি ফলানোর জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে নারাজ। গ্রামভিত্তিক ছোটখাট শিল্প-প্রয়াসের উদ্যোগে কদাচিৎ তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে আসে, কারণ ব্যাপারটা শ্রমসাধ্য। এই সব শ্রমবিমুখ মানুষ স্থানীয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে বেকারের খাতায় নাম লেখায়, কারণ তাদের ধারণা পরিশ্রম বা কাজ না করেও চাকরি করা যায়।

সঙ্কর্ষণ রায়
কলকাতা-৩৭

॥ ২ ॥

"আগ্নেয়গিরির শিখরে পিকনিক"-এর লেখক ডঃ অশোক রুদ্রকে ধন্যবাদ। আসলে অশোকবাবু একটা পুরোনো সমস্যার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়েছেন যেটার দিক থেকে আমরা চোখ ফিরিয়ে রাখতে চাই। এ সম্বন্ধে কারোরই বোধহয় দ্বিমত নেই যে, বর্তমান সামাজিক কাঠামোতে এই সমস্যার কোন সমাধান নেই। কিন্তু সেই পরিবর্তন কিভাবে আসবে, কে আনবে সে সম্বন্ধে আমাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই। প্রত্যেকেই ভাবি, কিছু একটা করা দরকার; তার পর যথারীতি সব দায়দায়িত্ব তথাকথিত নেতা কিংবা 'গভর্নমেন্ট' বলে একটা নৈর্ব্যক্তিক পদার্থের উপর চাপিয়ে সব ভুলে যাই। এখানেই কি আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল? দৃষ্টান্তস্বরূপ, লেখক চীনের সামাজিক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই পরিবর্তন একদিনে আসেনি। সরকার কিংবা কোন একজন বিশেষ নেতা এই কৃতিত্বের একক দাবিদার হতে পারেন না। এর জন্য জনসাধারণকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। আমাদের নিজেদের দিকে চেয়ে আমার সন্দেহ হয়, কোনো ত্যাগ স্বীকারে আমরা আদৌ রাজী কিনা। অনেকে প্রশ্ন করবেন কী ধরনের ত্যাগ স্বীকারের কথা আমি বলছি। এমনিতেই যাঁদের একটা নির্দিষ্ট আয় আছে তাঁরা যে সবাই খুব সচ্ছলভাবে আছেন এ-কথা কেউ বলবেন না। বরং কোনো রকমে সংসারের চাকা সচল রাখতেই যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। সবই স্বীকার করি।

আমি শুধু বলতে চাই—বিরাট একটা সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের আগে আমাদের একটা মানসিক কাঠামো পরিবর্তনের বোধহয় দরকার আছে। যেমন ধরুন, এই মুহূর্তে যদি প্রত্যেকের আয়ের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ (যা আমরা প্রায় অপচয়ের কোঠায় ফেলে রাখি) বেকার ভাতা হিসাবে কেটে নেবার কথা হয় তবে কজন আন্তরিকভাবে খুশী হবেন? কিন্তু হলে বোধ হয় ভাল হত। তা হলে ডঃ রুদ্রের 'প্রয়োজন ভিত্তিক কর্মে নিয়োগের ব্যাপারটা বোধ হয় সহজে রূপ নিত। তা হলে আমরা বুঝতাম স্বামী স্ত্রী দুজনেই পুরো মাইনে না নিয়ে একজন একটা 'সম্মান-দক্ষিণা' নিয়ে খুশী থাকলে একজনের বেকারের কাজ পাবার সুবিধা হত। কিন্তু তা হবার নয়, কেননা এখানে সেই মানসিক কাঠামো পরিবর্তনের কথা এসে যায়। তা ছাড়া প্রয়োজনকে ত রবারের মত টেনে বড় করা যায়। দ্বিতীয়ত ডঃ রুদ্র 'ওভার টাইম' বন্ধ করে অতিরিক্ত লোক নিতে বলেছেন। ব্যাপারটা খুবই সরল ও তাই হওয়া উচিত। কিন্তু কাজে খুবই কঠিন। আমি এমন একটা অফিসের কথা জানি যেখানে প্রতি দিনের নির্দিষ্ট কাজ জমিয়ে রাখা হয় ওভার টাইমে করবার জন্য। কিভাবে ব্যাপারটা চলে আসছে বলা শক্ত। কিন্তু ডঃ রুদ্রের পরামর্শ কি এই কর্মীরা হাসিমুখে মেনে নেবেন? কাজেই এখানেও সেই মানসিক কাঠামো পরিবর্তনের কথা আসছে। তার পরেও কথা আছে। কাজের সুযোগ সৃষ্টি না করে শুধু বেকার ভাতার ব্যবস্থা করলে

অকর্মণ্য, অপদার্থ তৈরী করা
স্বাস্থ্যের 'ভোল' দেবার কথা
যেতে পারে)। সেটা নিশ্চয়
কাম্য নয়। কাজ কাজের সৃষ্টি
ন্তু অফিস কাছারিতে কাজের
দেখে মনে হয় না সেখানে কাজের
সৃষ্টি হয়। সবটা মিলিয়ে
চরম হতাশাজনক।

বোস

॥ ৩ ॥

পেনরগিরির শিখরে পিকনিক'
পড়লাম। আমার এ সম্বন্ধে
বক্তব্য আছে।

ট্র্যাকটর উৎপাদন সংস্থা
দারি উৎপাদন সংস্থার সঙ্গে
কের চাকরি জড়িত। ওগুলি
র গেলে অথবা উৎসাহজনকভাবে
ল ও'দের কি হবে?

আমি যতদূর জানি বা
আমাদের দেশে এখনো ব্যাপক-
মাটি কাটার কাজে যন্ত্র
র চল হয়নি। বিশেষ ক্ষেত্রে
করা হয়েছে—যেখানে মানুষ
পারেনি। তা ছাড়াও আরেকটি
আমাদের করতে হবে। একটি
একটি খাল কাটলে দশ হাজার
হয়তো পরের বছর থেকে বন্যার
পড়েন না, এবং খাল হয়তো ছয়
মধ্যে যন্ত্রে কাটা সম্ভব। লেখক
দন সেটা দু' বছর ধরে মানুষ
চাটানো হোক, যাতে ঐ দশ হাজার
আরও দু' বছর বন্যার কবলে
?

ল, অধ্যাপক চোদ্দ ঘণ্টা ক্লাস
খোশ গল্প করতে যাতে বসতে
, সেই জন্য তাঁকে মাত্র চোদ্দ ঘণ্টার
দওয়া হয় না। নিয়োগকর্তা আশা
বাকী সময়টা অধ্যাপক পড়াশোনা
। যদি তিনি তা না করেন, সেটা
দায়, নীতির অথবা নিয়োগকর্তার
য়।

য়, লেখক রেস্তরায় যাঁরা খাবার
তাঁদের সঙ্গে এয়ার হোস্টেসের
করেছেন। তা কি ঠিক করা যায়?
তে যোগ্যতায় তাঁরা সমান? এয়ার
সকে দিনের পর দিন যে ঝুঁকি
য় সেটা কি মাইনে দেবার সময়
হবে না? একজন এয়ার
সকে কত রকমের বিধিনিষেধ
চলতে হয় চাকরির খাতিরে
তো ভেবে দেখতে হবে।
চাকরিজীবনও খুব সীমিত।
বছরের বেয়ারা কল্পনা করা শক্ত
কিন্তু চল্লিশ বছরের এয়ার
স?

। দাশগুপ্ত
তা-২৬

॥ ৪ ॥

শ্রীঅশোক রুদ্রের "আপেনরগিরির
। পিকনিক" প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য
জানাই। অত্যন্ত সুন্দর এবং
ম যুক্তি সহকারে লেখক তাঁর
প্রকাশ করেছেন। লিখেছেন—
সকলেরই জানা।' কথাটা সত্যিও
আবার সত্যি নয়ও বটে। জানা ত
কেমন জানা। সেই জানায় বোধ
ও গভীরতা কতটা সেইটেই ভাববার।

কারখানার শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মীরা তাঁদের গোষ্ঠীগত স্বার্থরক্ষার জন্য ইউনিয়ন মারফত লড়াই চালিয়ে নিজেদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরাও ত কই বেকারদের কাজ দেবার দাবিতে স্ট্রাইক, হরতাল বা মিছিল বার করে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেন না। শ্রমিকরা সর্বহারা নয়, লেখক ঠিকই বলেছেন—বেকাররাই সঠিক অর্থে সর্বহারা।' তাদের কোনো নেতা নেই, সংগঠন নেই—তাই তারা আজও লড়াই করতে পারলো না।

বেকারি দূর করতে হলে জনবহুল ভারতে যে 'লেবার ইনটেনসিভ' নীতি একান্ত আবশ্যক এ কথা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, মাও সে-তুং সবাই বলেছেন। কিন্তু এক মাও ছাড়া সেটাকে দেশব্যাপী কাজে কেউই লাগাতে পারেননি। এর কারণ অজ্ঞতা বা অক্ষমতা নয়। লেখকই ত বলেছেন 'সে প্রচেষ্টাই করা হয়নি।' কিন্তু কেন?

লেখক চীন-এর উদাহরণ দিয়েছেন। তা শুনে আমাদের কী লাভ? কংগ্রেস, জনতা, সবাই-ই ত মিশ্র অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু সে পথে কি ভারতের বেকারত্ব কোনো দিনই দূর হওয়া সম্ভব?

আমার বিশ্বাস মানুষের ওপর। কোন প্ল্যান স্কীম বা ইজম-এ আমি বিশ্বাসী নই। মানব সমাজের সত্যকার মঙ্গলকামী 'মহামানব'ই মানুষের মন থেকে হীন স্বার্থ, লোভ, ঈর্ষা দূর করে একটা সত্যিকারের সভ্য মানব সমাজ সৃষ্টি করতে পারেন—যেমন সমাজ, আমরা শুনতে পাই, নতুন চীনে গড়ে উঠছে। চীনেরা যা পারে আমাদের তা না পারার কোনো কারণ নেই।

সুশান্ত হালদার
নয়াদিল্লি ১৯

'চিতা' নয়, 'গুলবাঘ'

২রা জুলাইয়ের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীবাচস্পতি উল্লিখিত দ্বীপী বা চিতাবাঘের ল্যাটিন নামটি শুদ্ধ নয়। মুঘলচিত্রে অংকিত থাকলেও সম্ভবতঃ রাজা-বাদশাদের আমলে শিকার ও শৌখিন কাজে মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে চিতা আজ ভারতবর্ষে দুর্লভ, হয়তো বা অবলুপ্ত। আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে এখনো চিতার হদিশ মেলে। চিতা Panthara গোষ্ঠীভুক্তও নয়, ওর ল্যাটিন নাম Acinonyx Jubatus। এদেশে leoPard (Panthera Pardus) নামধেয় যে প্রাণীটি বনে জঙ্গলে প্রচুর দেখা যায় তাকে বাংলায় 'গুলবাঘ' বলাই সঙ্গত। এই প্রসঙ্গে যে প্রাণীটির ছবি ছাপা হয়েছে সেটিও চিতা নয়, গুলবাঘ। চিতার হলদে গায়ের চিত্রীকরণ সম্পূর্ণ গোলাকৃতি কালো ফোঁটায়। ভাঙা ভাঙা অর্ধচন্দ্রাকৃতি দাগ দেখা যায় কেবলমাত্র গুলবাঘের চামড়াতেই, এছাড়াও গঠন ও গুণগত যথেষ্ট তফাৎ আছে।

জ্যোতির্ময় সমাদ্দার
দার্জিলিং

বিনোদবিহারী

১৬ জুলাই-এর দেশ-এ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ওপর প্রশংসার্হ ছোটো নিবন্ধটির জের টেনে আরো কিছু কথা প্রাসঙ্গিকভাবে বলার তাগিদ অনুভব করছি। বিনোদবিহারী যে তাঁর দুটি চোখ সম্পূর্ণভাবে হারিয়েও আজ শিল্পী হিসেবে ক্রমান্বিত তার কারণ, আমার কাছে অন্তত মনে হয়, এই যে তাঁর সৃষ্টিশীলতা এমনি অবিরল এবং প্রতিভা এতটাই নিরন্তর ব্যাপক যে অন্ধত্বের মধ্যেও তাঁর পক্ষে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে বিশুদ্ধ নান্দনিক অভিজ্ঞতার এমন এক আয়তন যার ফলে তাঁর ড্রয়িং, স্কেচ কোলাজ, পেপারকাটিংস প্রভৃতির মধ্যে দেখা যাচ্ছে এক ক্রমিক সাহসী বিবর্তন।

আমাদের হোমার, মিলটন-এর তুলনা মনে পড়ে নিশ্চয়, কিন্তু তার চেয়েও বেশি করে আমাদের মনে আসে অ্যালডাস হাক্সলির কথা যিনি একদা তাঁর দৃষ্টি ক্রমাগত খোয়াতে খোয়াতে কাগজের সঙ্গে প্রায় চোখ সেঁটে কিছু ড্রইং করেছিলেন। কয়েক বছর পরে হারানো দৃষ্টির কিছুটা তিনি ফিরে পেয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু এতটা কখনই না যাতে দৃশ্যবস্তুর সব অনুপুঙ্খ দুরারোগ্য মায়োপিয়ার কুয়াশা সরিয়ে তাঁর চোখ শুষে নিতে পারতো। আর পারতো না বলেই অতি সাধারণ প্রাত্যহিক দৃশ্যবস্তুও তাঁর দৃষ্টিতে এমন এক নান্দনিক সম্ভাবনায় আবছা হয়ে উঠতো যে একটি সামুদ্রিক সামান্য ঝিনুক প্রসঙ্গেও তিনি প্রায় অফুরন্তভাবে অনর্গল হয়ে উঠতে পারতেন। ভেবে দেখুন 'গেটস টু হেভেন অ্যান্ড হেল' বইটির কথা—যেখানে হাক্সলি বর্ণনা করছেন, তাঁর একান্ত নিজস্ব ধূসর গদ্যে, কেমন করে তাঁর ক্রমশ-দূর-হয়ে-আসা, নেশা রঙিন দৃষ্টির সামনে পালটে যাচ্ছে চার পাশের সব চেনা বস্তু, আসবাবপত্র, ঘরের দেয়ালে সিজান-এর একটি অতি চেনা ছবি, কেমন করে তাঁর সংবেদনা হয়ে উঠছে প্রায় অসহনীয়ভাবে স্পর্শকাতর, তাঁর চেতনা সর্বগ্রাসীভাবে ব্যাপক।

প্রাসঙ্গিকভাবে আমার জার্মানি কবি হোল্ডারলিন-এর কথাও মনে পড়ে যিনি দৃষ্টি না হারালেও এক অনিরুদ্ধ মস্তিষ্ক ব্যাধির ফলে ক্রমেই হারিয়ে ছিলেন তাঁর চেতনা এবং দৈনন্দিন সব সাধারণ অভিজ্ঞতার অবয়বও তাঁর উপলব্ধির কাছে ক্রমাগত এমনি তরল, পারদ-ধর্মী অনিশ্চিত হয়ে উঠছিল যে তাঁর জীবনের শেষের দিকের কিছু বিক্ষিপ্ত লেখার কোনো অর্থ আমরা করতে পারি না। কিন্তু কখনো কখনো একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে এসব লেখার মধ্যেই আমরা পেয়ে যাই এমন কিছু উদ্ভাস বা উন্মোচন যা হোল্ডারলিন-এর কবিতায় আর কোথাও নেই।

হাক্সলির সঙ্গে হোল্ডারলিন-এর, হোল্ডারলিন-এর সঙ্গে বিনোদবিহারীর বর্ণের পার্থক্য। তবু যে-জায়গায় এ'দের মধ্যে একটি গভীর আত্মীয়তা আমি আবিষ্কার করি সেটা হল এই যে, এ'রা ক্রমাগত ঘন-হয়ে-আসা পর্দার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীকে দেখেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের শিল্প দৃশ্যবস্তুর সঙ্গে আর সরাসরি যুক্ত থাকেনি, হয়ে উঠেছে একান্তভাবে স্মৃতি-নির্ভর গভীর সব স্বপ্নের সঙ্গে সংলগ্ন। এবং বিনোদবিহারীর ক্ষেত্রে যেটা ঘটেছে সেটা আরও আশ্চর্যের—তাঁর মধ্যে এসেছে স্পেস এবং ভল্যুম সম্বন্ধে এক নতুন সচেতনতা। স্পেস এখন তাঁর কাছে এক ঘনবস্তু যা তিনি হাতড়ে হাতড়ে চলেন, আঙুল দিয়ে ছুঁতে পারেন।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা

নিগ্রো কবিতা

নিগ্রো কবিতা বিষয়ে শ্রীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা সুখপাঠ্য হলেও নানা কারণে অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। মনে হয় জায়গার অভাবই এ জন্য দায়ী। প্রথমতঃ, জেমস বল্ড-উইন-এর পরই যিনি নিগ্রোসাহিত্যকে বিশ্বের সাহিত্যে হাজির করেছেন সেই ডুবোয়ার নামও রঞ্জনবাবু উল্লেখ করেননি। এক আফ্রিকান ক্রীতদাসের বংশে জন্ম নিয়েছিলেন ডুবোয়া। পাঁচটি বিষয়ে তিনি ডক্টরেট করেন। তিনি যে কেবল কবিতা লিখেছেন তা নয়—তাঁর গল্পও রয়েছে। তাছাড়া নিগ্রো পত্রিকা ক্রাইসিস-এর সম্পাদনাও তিনি করেছেন।

আরও যারা লিখছেন ও লিখেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন রিচার্ড রাইট ও স্টারলিং এ ব্রাউন।

কালো চামড়ার অসহ্য যন্ত্রণা প্রতিটি নিগ্রো ... প্রতি লাইনে ভাষা পেয়েছে। ... কেউ কেউ আশাবাদী। কেউবা হতাশায় ভেঙে পড়েছেন। নিগ্রো স্পিরিচুয়ালগুলির একক্ষা ভাবের অভিব্যক্তি ঘটেছে। এই স্পিরিচুয়ালগুলির সাথে বিখ্যাত ন্যাট টার্নার আর ফ্রেডারিক ডগলাসের নাম জড়িত রয়েছে।

রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা-৩১

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান সমাজচিন্তা

জনাব হোসেনুর রহমান "পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান সমাজচিন্তা" (১১ জুন, ৩৩ সংখ্যা) শীর্ষক আলোচনা প্রসঙ্গে মাদ্রাসার অবৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থার কথা যা বলেছেন তা সমর্থনযোগ্য। ধর্মের অনুশাসন ও অনুষঙ্গ সকলকে অল্পবিস্তর মানতেই হয়। কিন্তু যুগোপযোগী যে আচার-আচরণ ও চিন্তাধারার পরিবর্তন মানুষের প্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে তা হল সুশিক্ষা। দারিদ্র্য ও অন্ধ গোঁড়ামির অশুভ ফলটাই মুসলিম সমাজকে আজ গ্রাস করে

ছে। আর তা হ্রে হতে পারে
ম জীবনভিত্তিক সৃজনধর্মী
প্রসারে। শিক্ষাপ্রসারে মাদ্রাসা ও
র প্রয়োজন এখন আর আছে
নূতন করে ভেবে দেখার দিন
ই এসেছে। শুধু ভেবে দেখলেই
না, কার্যকরী পন্থাও গ্রহণ করতে
এ বিষয়ে আমার বক্তব্য (১)
ান সময়ে মাদ্রাসা ও মক্তবের
র প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি
াচনাচক্রের মাধ্যমে দেশের
ত সম্প্রদায় ও ধর্মীয় নেতাদের
াধারার বিনিময় ও এর সঠিক
ায়ন করা। (২) এরই পরি-
ক্তে মুসলিম মেয়েদের পর্দাপ্রথা
র্কে বিশদ আলোচনা করা।
ড়া মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণের
রায় এমন যে কোন প্রথা সম্পর্কে
ারিতভাবে বিচার-বিবেচনা করা
ঠিক মতামত গ্রহণ করা। (৩)
মুসলিম ছেলেমেয়েদের জীবন-
ক আধুনিক শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহ
। এরাই অধিকসংখ্যায় মক্তব ও
সায় পাঠগ্রহণ করে থাকে।
কেয়া চৌধুরী
ুপুর।

রুলের সঙ্গীতচিন্তা

শ্রীগোপাল মিত্র নজরুলের বাংলা
কে স্বাধীন বিস্তারের পথে
যাবার উপদেশ দিয়েছেন এবং
ুল স্বরলিপি নামক একটি গ্রন্থের
র কিঞ্চিৎ সদুক্তি থেকেই তাঁর
অনুমান। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র
য় তাঁর প্রবন্ধে আজকালকার
সম্প্রদায় যে "ওস্তাদি খাটাতে"
সে সম্বন্ধেই বলেছেন, নজরুলের
আড়ষ্টভাবে গাওয়া হোক
া একবারও বলেননি। গোপাল-
র উদ্ধৃত "কে বিদেশী",
ট ভোলে না" প্রভৃতি আরও বহু
নজরুলের সাক্ষাৎ পরিচালনায়
র্ড করা হয়েছিল। তৎকালে তিনি
াই এসব গান শোনাতেন। কই,
াও তো কবি খুব একটা স্বাধীন
ারের প্রশ্রয় দেননি। আজকাল
্যাকৃত অল্পবয়স্ক অথচ নামকরা
-গায়িকা (যাঁরা আদৌ
ুলের সাক্ষাৎ পরিচয় পাননি)
করছেন সেটা তাঁদের পরি-
াত ওস্তাদি যাতে নজরুলের
তের কিছুমাত্র পরিচয় নেই।
ফার্সী দূরে থাক উর্দু গজলেও
পারদর্শী নন সেটা তাঁদের
ীন বিস্তারের পথ" দেখলেই
যায়। গানকে লীলায়িত করবার
নজরুলের একটা সুনির্দিষ্ট
এবং নীতি ছিল। যেটুকু
সই সেটা তিনি নিজেই প্রকাশিত
র্ড দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। সেটাই
লকার আর্টিস্টদের পক্ষে
হওয়া উচিত ছিল। গোপাল-
পন্থা অনুসরণ করলে
লতা ছাড়া নজরুলের গানে
কিছুই ঘটবে না। আরও একটা
লা আবশ্যক। নজরুলের বহু
আজকাল শোনা যাচ্ছে যা আদৌ
সুর দেওয়া কিনা সন্দেহ। কবি কি কোনও গ্রন্থে তাঁর গানে নতুন সুর প্রয়োগ করবার স্বপক্ষেও মত দিয়ে গেছেন?

প্রণবকুমার ঘটক
কলকাতা-১২

ওস্তাদ আমীর খাঁ ও এ. কানন

আপনাদের সংগীত সমালোচক শ্রীনীলাক্ষ গুপ্ত শ্রী এ কাননের গান সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁকে ওস্তাদ আমীর খাঁ সাহেবের বন্ধু বলায় এবং খাঁ সাহেব সৃষ্ট মালকোষের বন্দিশটি শ্রীকানন গেয়েছেন বলে ৯ই জুলাই-এর দেশে শ্রীঅঞ্জনকুমার বক্সী কিছু বক্রোক্তি করেছেন দেখলাম। শ্রীবক্সীর অবগতির জন্য জানাই যে শ্রী এ কানন যখন মাত্র "কিছুদিনের জন্য" ওস্তাদ আমীর খাঁ সাহেবের ছাত্র ছিলেন তখনই তিনি (শ্রীকানন) দেশের একজন অগ্রগণ্য এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হিসাবে পরিচিত হয়ে গিয়েছেন। সেইজন্য স্বল্পকালের ছাত্র হলেও শ্রীকাননকে খাঁ সাহেব বন্ধুর মত দেখতেন।

দ্বিতীয়ত, আমীর খাঁ সাহেব সৃষ্ট বন্দিশ তাঁর গলাতেই ভালো মানাত একথা যেমন ঠিক তেমনই তাঁর গান আর কারো গাওয়া উচিত নয়— শ্রীবক্সীর এই অভিমত সমর্থনযোগ্য নয়। একজন মহৎ সঙ্গীতশিল্পীর সৃষ্টির উত্তরাধিকার সমগ্র দেশ বা জাতির ওপরই বর্তায়। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথের পরেও রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার হচ্ছে। এবং সেইজন্যই তানসেন, সদারঙ্গ, অদারঙ্গ প্রমুখ স্রষ্টাদের গান যেমন যুগ যুগ ধরে গাওয়া হচ্ছে তেমনই ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি, আমীর খাঁ সাহেব প্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞদের সৃষ্ট বন্দিশগুলি পরবর্তী শিল্পীরা গাইলে তা তামাশা হয় না।

আশিস ভট্টাচার্য কলকাতা-২৬

কলকাতায় স্যার রিচার্ড

৯ জুলাইয়ের দেশ-এ শ্রীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "কলকাতায় স্যার রিচার্ড" প্রবন্ধটিতে কয়েকটি অবাঞ্ছিত তথ্যভ্রান্তি চোখে পড়ল। উনি লিখেছেন "এ ব্রিজ টু ফার" ছবিটির প্রযোজক স্যার রিচার্ড অ্যাটেনবরো। এই ২৫ মিলিয়ান ডলার বাজেটের ছবিটির প্রযোজক হলেন আসলে যোসেফ ই লেভিন। এবং স্যার রিচার্ড অ্যাটেনবরো হলেন ছবিটির পরিচালক।

আরেকটি ব্যাপার হলো, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ছবিটির বিষয়বস্তু হল্যান্ডের একটি ব্রিজের ওপর ঐতিহাসিক জার্মান আক্রমণ। কিন্তু স্যার রিচার্ড অ্যাটেনবরোর সাম্প্রতিকতম ছবিটির বিষয়বস্তু ঠিক উল্টো। কর্নেলিয়াস রায়ানের যুদ্ধোপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে তোলা ছবিটিতে আছে অ্যালায়েড আর্মির (মিত্রপক্ষ) আক্রমণের কাহিনী। হল্যান্ডের ছটি প্রধান ব্রিজ এবং রাইন নদীর ওপর আর্নহেমের শেষ ব্রিজটির ওপর অ্যামেরিকান বিমানবাহিনী এবং বৃটিশ স্থলবাহিনীর সংযুক্ত আক্রমণ এবং তার বিরাট বিফলতাই ছবিতে চিত্রায়িত হয়েছে। এই আক্রমণটি, যার সাংকেতিক নাম ছিল "অপারেশান মার্কেট-গার্ডেন" তার বিফলতাকে যুদ্ধের ইতিহাসে মিত্রপক্ষের বৃহত্তম বিফলতা বলা হয়। এজন্যও ছবিটির বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুগত লাহিড়ী হাওড়া-৪

কানাইশোরের আদিবাসী মেলা

খুব বিনীতভাবে জানাচ্ছি, শ্রীঅরূপ দত্ত-এর লিখিত 'কানাইশোর পাহাড়ের আদিবাসী মেলা' (৯ই জুলাই '৭৭—দেশ) প্রবন্ধটি পড়ে বিস্মিত হয়েছি। এ সমস্ত গ্রামীণ মেলা আমার একাধিকবার দেখা। কানাইশোর পাহাড়ের পাশেই একটি গ্রামে আমার দীর্ঘদিন থাকার অভিজ্ঞতা আছে। আমি একজন আদিবাসী, দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ করছি, একবেলা আধবেলা, দু-একটা ঘণ্টা কোন আদিবাসী গ্রাম, ডাক-বাংলো, মেলা বা উৎসব দেখে সাহিত্য পত্রিকায় এক ধরনের লেখা প্রকাশ করার হুজুগ চলেছে। যা সর্বদাই অসম্পূর্ণ ও খাপছাড়া। তথ্য প্রায়শই ভুল থাকে। এতে করে কেবল পাঠককেই নয় উক্ত বিষয়েরও অমর্যাদা করা হয়।

কানাইশোরে পাহাড় পুজো সম্বন্ধে লিখতে গেলে আবার নতুন প্রবন্ধ ফেঁদে বসতে হয়। তাই সে বিষয়ে না বলাই ভালো।

সমস্ত আদিবাসী সমাজের তরফ থেকে আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই চিঠি ছাপলে আমরা খুশী হব।

কমল চক্রবর্তী জামশেদপুর-১

ভারত মহাসাগরে নৌবহরের টহল

ভারত মহাসাগরে বৃহৎ শক্তির নৌবহরের টহল কেন' প্রবন্ধে 'সোভিয়েট সাবমেরিন—ক্রুইজ মিসাইল' নামাংকিত যে ছবিটি ছাপা হয়েছে সেটি শুধু সোভিয়েট 'সাবমেরিন' হবে। কারণ ক্রুইজ মিসাইল (cruise missile) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মহাশক্তিশালী অস্ত্রের অন্যতম, SALT আলোচনার বিষয়বস্তু। প্রসংগত বিমান ও নৌবাহিনীর জন্যে এই মিসাইলের রকমফের আছে:

বিমান বাহিনীর জন্যে : লম্বায় ১৪ ফুট, ব্যাস = ১৬ ইঞ্চি, নৌবাহিনীর জন্যে : লম্বায় ২১ ফুট, ব্যাস ১৬ ইঞ্চি।

এই ক্রুইজ মিসাইল ২০০ কিলোটন পারমাণবিক বিস্ফোরক বহন করে ঘণ্টায় ৫৫০ মাইল গতিতে উড়ে গিয়ে ১৫০০ মাইল দূরের লক্ষ্যবস্তুকে ১০০ ফুটের মধ্যে আঘাত হানতে পারে। দাম পড়ে এক মিলিয়ন ডলারের কিছু কম।

[উৎস টাইম (TIME) সাপ্তাহিক ২৩শে মে, ১৯৭৭]

অরিন্দম ঘোষ কলকাতা-৩২

প্রকাশিত হল
বিমল করের
এক আশ্চর্য বেদনার,
কিংবা অন্বেষণের
অথবা ভালোবাসার উপন্যাস
প্রচ্ছন্ন
দাম ৮.০০
একটা আশ্চর্য অসুখ নিয়ে বেঁচে ছিল সুবর্ণ। বুকের গভীরে প্রচ্ছন্ন ... এক যন্ত্রণা ... থেকে ... গাঢ় ... উঠে যেন ... চাইত। ঠিক কোন খানে যে এর ... এবং কিসে এর উপশম বুঝতে পারত না সুবর্ণ। তার আজীবন সৌন্দর্য আর ভালোবাসা অন্বেষণের মধ্যে কি? বোঝেনি মীরাও।

... সুবর্ণর জীবনে মীরা থেকে আরম্ভ করে রমা, তনু, শ্যামা, বকুল ইত্যাদি মেয়ের আগমন ঘটলেও কেন মানুষটা কোথাও দাঁড়াল না—এ প্রশ্ন তার মনে জাগত না। শৈলেন্দু, প্রমথ এবং সুবর্ণর ভালোবাসা পাওয়ার পরেও কেন সত্য হয়ে উঠল না তার নিজেরও চাওয়াটুকু। তাও তার অগোচর থাকত না। আসলে আমরা কেউই বুঝি না, বুঝতে পারি না। যদিও ঐ একই অসুখ নিয়ে আমরা অনেকেই বেঁচে আছি, বেঁচে থাকি। সুবর্ণর মতন, মীরার মতন। 'প্রচ্ছন্ন' এক আশ্চর্য বেদনার গল্প, কিংবা অন্বেষণের, অথবা ভালোবাসার। শুধু সুবর্ণর আর মীরার নয়—আমার, আপনার, আমাদের সকলের।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা-৯
ফোন ৩৪ ৪৩৫২

বুদ্ধদেব বসুর
কাব্যনাট্য সংকলন
সংক্রান্তি প্রায়শ্চিত্ত ইক্ষ্বাকু সেন্নিন
দাম ৪.০০
এ বইয়ে তিনটি কাব্যনাট্য সংকলিত হয়েছে। প্রথম নাটক 'সংক্রান্তি'র উপাদান মহাভারতীয়। উপস্থাপনা গ্রীক ধরনের। দ্বিতীয় নাটক 'প্রায়শ্চিত্ত' ইয়েটস-এর একটি কাব্যনাটিকার অনুলিখন, সিপাহিবিদ্রোহের পটভূমিকায় স্থাপিত। শেষ নাটক 'ইক্ষ্বাকু সেন্নিন'-এর নায়ক ঋষ্যশৃঙ্গ।

এই লেখকের অন্যান্য বই:
অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ (নাটক) ৫.০০ পুনর্মিলন (নাটক) ৪.০০ বিপন্ন বিস্ময় (উপন্যাস) ৮.০০ কাল-সন্ধ্যা (নাটক) ৩.০০ কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ (নাটক) ৬.০০ গোলাপ কেন কালো (উপন্যাস) ৫.০০ তুমি কেমন আছো (কাহিনী সংকলন) ৬.০০ তপস্বী ও তরঙ্গিণী (নাটক) ৩.০০

মতি নন্দীর
বিশিষ্ট উপন্যাস
বারান্দা
দাম ৬.০০
আজীবন গৃহবাসের দণ্ডে দণ্ডিত কর্মহীন খঞ্জ গিরিজাপতির মধ্যে ঈর্ষা এবং সন্দেহ কুরে কুরে এক বিরাট গর্ত তৈরি করে তাকে সেই গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। সেখান থেকে উদ্ধার পেতে চাইছিল গিরিজাপতি। কিন্তু ভাগ্য তাকে এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করাল যেখান থেকে আরও গভীরতর এক গর্তে লাফিয়ে পড়া ছাড়া তার আর কোনও উপায় ছিল না।

এই লেখকের অন্যান্য বই:
কোনি ৬.০০ স্টপার ১০.০০ স্ট্রাইকার ৬.০০ দুঃখের বা সুখের জন্য ৩.০০ নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান ৪.০০ ননীদা নট আউট ৪.০০ ক্রিকেটের আইনকানুন ৮.০০

প্রকাশিত হল
শিবকালী ভট্টাচার্যের
ভারতীয় ভেষজ বিষয়ক অদ্বিতীয় গ্রন্থ
চিরঞ্জীব বনৌষধি
দ্বিতীয় খণ্ড
দাম ২৫.০০

আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্যের লেখা কয়েকটি ভারতীয় বনৌষধির সচিত্র পরিচিতি, দ্রব্যগুণ, রোগনিরাময়ক্ষমতা, প্রাণিদেহে সেগুলির প্রভাব, ঔষধার্থে লৌকিক ব্যবহার প্রভৃতি সম্পর্কিত কতকগুলি রচনা গত বছর 'চিরঞ্জীব বনৌষধি' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে কি ভিষগ্, কি ভেষজবিজ্ঞানী, কি সাধারণ মানুষ—সকলের মধ্যেই একটা প্রচণ্ড সাড়া পড়ে যায়। সেইসঙ্গে পাঠকমহলে একটা অতৃপ্তির ছায়াও দেখা দেয়। ভারতীয় বনৌষধিসমূহের অনন্ত ভাণ্ডারের কণামাত্র পেয়ে পাঠকরা তৃপ্ত নন, তাঁরা আরও পেতে চান। যদি জ্ঞাত অজ্ঞাত নির্বিশেষে প্রতিটি ভারতীয় ভেষজের আলোচনা প্রকাশ করা সম্ভব নাও হয়, অতি সাধারণ যেগুলি অন্তত সেগুলির যেন প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়—এই মর্মে প্রত্যহ অজস্র অনুরোধ আসতে থাকে 'চিরঞ্জীব বনৌষধি' প্রকাশের পর থেকেই। পাঠকসাধারণের সেই ঐকান্তিক অনুরোধের মর্যাদা দিয়ে 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা হলো।
মানুষের শারীরিক গঠন দেখে কিভাবে তার প্রকৃতি বিচার এবং কোন্ কোন্ রোগ তার হওয়া সম্ভব নির্ধারণ করা যায়, সে সম্পর্কে এই খণ্ডে একটি মূল্যবান আলোচনা করা হয়েছে।

চিরঞ্জীব বনৌষধি
প্রথম খণ্ড ॥ দাম ২৫.০০

কয়েকটি উপন্যাস
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
কাগজের বউ
দাম ৮.০০
বুদ্ধদেব গুহর
যাওয়া আসা
দাম ৬.০০
সমরেশ বসুর
সংকট
দাম ৬.০০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
রাধাকৃষ্ণ
দাম ১০.০০
রমাপদ চৌধুরীর
লজ্জা
দাম ৭.০০
দিব্যেন্দু পালিতের
বিনিদ্র
দাম ৬.০০
কালকূট-এর
অমাবস্যায় চাঁদের উদয়
দাম ৮.০০
বিমল মিত্রের
পতি পরম গুরু
দাম ৩৫.০০
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
এই তার পুরস্কার
দাম ১৫.০০
আশাপূর্ণা দেবীর
চাঁদের জানালা
দাম ৭.০০
সন্তোষকুমার ঘোষের
সময়, আমার সময়
দাম ৫.০০
গৌরকিশোর ঘোষের
গড়িয়াহাট ব্রিজের উপর থেকে, দুজনে
দাম ৪.০০
প্রতিভা বসুর
উজ্জ্বল উদ্ধার
দাম ১০.০০

পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত হল
সত্যজিৎ রায়ের
ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার
রয়েল বেঙ্গল রহস্য
দাম ৫.০০

ভুটান-সীমান্তে ডুয়ার্সের কালবুনি জঙ্গলে এক সকালে একটি মৃতদেহ পাওয়া গেল। তার কাঁধের খানিকটা মাংস কোনও এক হিংস্র জানোয়ারে খেয়ে গেছে। মৃতদেহটি এক খ্যাতনামা শিকারীর। সবাই বলল—ম্যান-ঈটারের কাজ। কিন্তু ফেলুদা আবিষ্কার করল মৃতদেহের বুকে একটি গভীর ক্ষতচিহ্ন—যা একমাত্র কোনও সুতীক্ষ্ণ ও অতীব ধারালো অস্ত্রের দ্বারাই সম্ভব। তা হলে?

সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য বই:
ফটিকচাঁদ ৮.০০
জয় বাবা ফেলুনাথ ৬.০০
আরো এক ডজন ১০.০০
সাবাস প্রফেসর শঙ্কু ৬.০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫.০০
বাক্সরহস্য ৫.০০
সোনার কেল্লা ৬.০০
গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫.০০
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৫.০০
এক ডজন গপ্পো ১০.০০
বাদশাহী আংটি ৫.০০
বিষয় চলচ্চিত্র ১০.০০

বরুণ সেনগুপ্তের
ইন্দিরা-একাদশী
সুলভ সংস্করণ
প্রকাশিত হল
দাম ৫.০০

৪৪ বর্ষ ৪০ সংখ্যা
১৪ শ্রাবণ ১৩৮৪

ত্র

সংখ্যায়

: সাগরময় ঘোষ
ার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে
রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং
সেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮
রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে

কা
ল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

'অতিশয় প্রজার ভারে'

সম্পাদকীয়

পরিবার পরিকল্পনার নতুন সরকারী নাম হয়েছে—পরিবার কল্যাণ। বিগত সরকারের প্রশাসনিক আচরণের সম্পর্কে যে-সব অভিযোগ প্রবল হয়ে রাজনীতিক প্রতিঘাত সৃষ্টি করেছে ও নির্বাচনে সেই সরকারের পরাজয় ঘটিয়েছে বলে মনে করা হয়, তার মধ্যে একটি প্রধান অভিযোগ এই যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে নির্বীজ করবার প্রক্রিয়া আত্যন্তিক এক অনাচার হয়ে দেশের বহু অঞ্চলের জনজীবনে দুঃসহ উৎপীড়ন সৃষ্টি করেছিল। আসল শিক্ষা এই যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের কার্যকর উৎসাহ এবং নির্বীজ করবার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সুষ্ঠু সতর্কতার শাসন চাই। পদ্ধতি এবং তার প্রয়োজন যেন কোন মতেই জনজীবনের পক্ষে কোন ভয়, ক্লেশ অথবা উৎপীড়নের হেতু না হয়। এবং দেশের সরকার ও জনসমাজ উভয়েরই পক্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আগ্রহের কোন সঙ্কোচ তো নয়ই, বরং আরও উজ্জীবিত প্রসারই চাই। কারণ, ভারতে জনসংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধির হার নিতান্ত প্রকারে খর্ব না করা হলে জাতির ভবিষ্যতের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি ভয়াবহ প্রকারের সঙ্কটে অভিভূত হবে। নির্বীজ করবার প্রক্রিয়ার তুলনায় কোন বেশি সুফলপ্রদ ও সার্থক পদ্ধতি যদি আবিষ্কৃত হয়; তবে তার প্রয়োজন অবশ্যই প্রশস্ত আগ্রহে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে প্রযুক্ত করতে হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিশেষজ্ঞের অভিমত অনুযায়ী যে পদ্ধতি সব চেয়ে সার্থক ও সফলতার অঙ্গীকার বহন করে, সেটা হলো নির্বীজকরণ। বলা চলে জন্মসংখ্যার পরিমাণ নির্দিষ্টকালের সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট একটি সামান্য বৃদ্ধিহার কিংবা সম্পূর্ণ বৃদ্ধিহীন একটি মাত্রার অধীন হয়ে থাকবে; এই উদ্দেশ্য ব্রহ্মচর্য অথবা ইন্দ্রিয় নিগ্রহের দ্বারা সম্ভাবিত হবার নয়, কারণ ওই দুই আদর্শিক পদ্ধতি সামান্য সংখ্যকের জীবনে বিশেষ এক আদর্শিক চরিত্রবৃত্তি হিসাবে সার্থক হতে পারে, অন্যথায় নয়

প্রসঙ্গত স্মরণ করতে হয় যে, বিশ্বব্যাংক সম্প্রতি ভারতের জন্মসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের রীতি-নীতি ও সুফলের যে সমালোচনা করেছেন তার মধ্যে ভারতের পক্ষে অত্যন্ত রকমের কয়েকটি শিক্ষা গ্রহণ করবার বিষয় আছে। বাঙালী কবি দাশরথি রায়ের উক্তি—'অতিশয় প্রজার ভারে ধরণী হরে শস্য।' বিশ্বব্যাংকও ভারতীয় জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রায় এইরকমই অর্থনীতিক তাৎপর্যের উল্লেখ করেছেন। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে ভারতের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের যে তথ্যগত বিশ্লেষণ প্রদত্ত হয়েছে, তার সবার আগের একটি প্রধান বক্তব্য : আগামী একশত বৎসরের মধ্যে ভারতের পক্ষে জন্ম-বৃদ্ধির হার 'শূন্যে' পরিণত করবার কোনই সামর্থ্য ও সম্ভাবনার লক্ষণ নেই, যে-ভাবে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পরিচালিত হচ্ছে যদি সেইভাবেই চলতে থাকে। ১৯৮৬ সালে ভারতের জনসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়াবে বাহাত্তর কোটি, এবং শতাব্দী শেষ হবার আগে জন্মসংখ্যা বিরানব্বই কোটিতে পরিণত হবে। বিশ্বব্যাঙ্ক ধারণা করে যে, ২০৭১ খৃীঃ অব্দে ভারতের জন্মসংখ্যা প্রায় এক'শো এগার কোটি তেত্রিশ লক্ষে পৌঁছবে। ভয়াবহ হিসাব, নিদারুণ পরিণামের একটি আঙ্কিক চিত্র। বিশ্বব্যাঙ্কের ভয় এই যে, যে-দেশ বর্তমানে ওই পরিমাণের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক পরিমাণের জনসংখ্যা নিয়েই জনসাধারণের জীবনযাপনের সাধারণ প্রয়োজনের দাবি মেটাতে পারছে না, সে দেশের পক্ষে এত বিরাট এক জন্মসংখ্যার ভার সেদিন কত ভয়ংকরই না হয়ে উঠবে। ব্যাংকের মন্তব্য, এই বৎসরের জানুয়ারী মাস নিয়ে বিগত দশ মাসে এক কোটি তের লক্ষ নরনারী 'শাসিত' হয়েছে বটে, এবং এর ফলে ১৯৯৭-৯৮ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ছয় কোটি বিরাশি লক্ষ জন্মের সম্ভাবনা পরিহার করা হবে বলে মনে করেও বলতে হয় যে, সমগ্র পরিকল্পনার কাজ অতিরিক্ত ব্যস্ততার চাপ সৃষ্টি করে পরিবার-কল্যাণের অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সমস্যা বাড়িয়েছে।

১৯৭৭ সালের জানুয়ারী সমেত আগের দশমাসের যে 'চমৎকার' সফলতার হিসাব উল্লেখ করা হয়েছে, সেটাও জাতির প্রয়োজনের তুলনায় বস্তুত সামান্য সাফল্য। এবং সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় সত্য এই যে, জন্মসংখ্যার বৃদ্ধিহার দ্রুত এবং যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করবার জাতীয় প্রয়াস বিপুল প্রকারে উদ্বোধিত না করে তুলতে পারলে ২০০১ খৃঃ অব্দের ভারত দুঃখ, দীনতা, অভাব, মন্দা, অশান্তি ও অরাজক আলোড়নের একটি নিদারুণ আয়তনে পরিণত হবেই হবে। তাই দেশপ্রেমের দাবি, জাতির সম্পর্কে ন্যূনতম মাঙ্গলিক বুদ্ধির দাবি, মানবতার মর্যাদা ও বিশ্বশান্তির দাবি আজ এই মুহূর্তে ভারতের জাতীয় জীবনের একটি বিরাট অথচ মহান্ ব্রত পালন করবার শুভ অথচ দুরূহ দায়িত্ব আরোপ করছে—জনসংখ্যার দ্রুত হ্রাস চাই, সমধিক হ্রাস চাই। এক্ষেত্রে চটুল তর্কাতর্কির কোন মুখরতা, কিংবা রাজনীতিক দলীয়তারও কোন স্বার্থ কিংবা সুবিধার প্রাচারিক চঞ্চলতায় জাতীয় অভীষ্টের কোন উপকার হবে না। এক্ষেত্রে সমগ্র জাতির পক্ষে রাজনীতি-নিরপেক্ষ একটি মহৎ একাত্মিকা বুদ্ধির প্রেরণা চাই। জন্মসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ উদ্যম আরও কয়েকগুণ প্রশস্ত করা চাই। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের ঈশ্বরী পাটনী অন্নপূর্ণার কাছে এই বর প্রার্থনা করেছিলেন—আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। ভবিষ্যতের ভারতীয় সংসারের সন্তানেরা যেন সুখ-শান্তির স্নেহাশ্রয় পায়, আজিকার ভারত ঈশ্বরী পাটনীর হৃদয় নিয়ে সেই আকাঙ্ক্ষার অনুগত দায় ও কর্তব্য পালন করবে। এক্ষেত্রে অন্য কোন সহজ পথ নেই।

প্রকাশিত হল

বিমল করের

এক আশ্চর্য বেদনার,
কিংবা অন্বেষণের
অথবা ভালোবাসার উপন্যাস

প্রচ্ছন্ন

দাম ৮·০০

একটা আশ্চর্য অসুখ নিয়ে বেঁচে আছে সুবর্ণপতি। বুকের গভীরে প্রচ্ছন্ন থাকে এক বেদনা। থেকে থেকে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যেন অন্বেষণ করে নিতে চাইছে। ঠিক কোন খানটাতে যে এর উৎস এবং কিসে এর উপশম, বুঝতে পারত না সুবর্ণপতি। তার আলোকিত সৌন্দর্য আর ভালোবাসা অন্বেষণের মধ্যে কি? বোঝেনি মীরাও।

বুঝলে, সুবর্ণপতির জীবনে মীরা থেকে আরম্ভ করে রমা, তনু, শ্যামা, বকুল এতগুলি মেয়ের আগমন ঘটলেও কেন মানুষটা কোথাও দাঁড়াল না—এ প্রশ্ন তার মনে জাগত না। নীরেন্দু, প্রমথ এবং সুবর্ণপতির ভালোবাসা পাওয়ার পরেও কেন সত্য হয়ে উঠল না তার নিজেরও চাওয়াটুকু, তাও তার অগোচর থাকত না। আসলে আমরা কেউই বুঝি না, বুঝতে পারি না। যদিও ঐ একই অসুখ নিয়ে আমরা অনেকেই বেঁচে আছি—বেঁচে থাকি। সুবর্ণপতির মতন, মীরার মতন। 'প্রচ্ছন্ন' এক আশ্চর্য বেদনার গল্প, কিংবা অন্বেষণের, অথবা ভালোবাসার। শুধু সুবর্ণপতি আর মীরার নয়—আমার, আপনার, আমাদের সকলের॥

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা-৯
ফোন [illegible]

বুদ্ধদেব বসুর

কাব্যনাট্য সংকলন

সংক্রান্তি প্রায়শ্চিত্ত ইক্ষাকু সেন্নিন

দাম ৪·০০

এ বইয়ে তিনটি কাব্যনাট্য সংকলিত হয়েছে। প্রথম নাটক 'সংক্রান্তি'র উপাদান মহাভারতীয়, উপস্থাপনা গ্রীক ধরনের। দ্বিতীয় নাটক 'প্রায়শ্চিত্ত' ইবসেন এর একটি কাব্যনাটিকার অনুশিখন, সিপাহিবিদ্রোহের পটভূমিকায় স্থাপিত। শেষ নাটক 'ইক্ষাকু সেন্নিন' এর নায়ক জাপানী॥

এই লেখকের অন্যান্য বই :
অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ (নাটক) ৫·০০ পুনর্মিলন (নাটক) ৪·০০ বিপন্ন বিস্ময় (উপন্যাস) ৮·০০ কাল-সন্ধ্যা (নাটক) ৩·০০ কলকাতার ইলেক্‌ট্রা ও সত্যসন্ধ (নাটক) ৬·০০ গোলাপ কেন কালো (উপন্যাস) ৫·০০ তুমি কেমন আছো (কাহিনী সংকলন) ৬·০০ তপস্বী ও তরঙ্গিণী (নাটক) ৩·০০

মতি নন্দীর

বিশিষ্ট উপন্যাস

বারান্দা

দাম ৬·০০

আজীবন গৃহবাসের দণ্ডে দণ্ডিত কর্মহীন খঞ্জ গিরিজাপতির মধ্যে ঈর্ষা এবং সন্দেহ কুরে কুরে এক বিরাট গর্ত তৈরি করে তাকে সেই গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। সেখান থেকে উদ্ধার পেতে চাইছিল গিরিজাপতি। কিন্তু ভাগ্য তাকে এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করাল যেখান থেকে আরও গভীরতর এক গর্তে লাফিয়ে পড়া ছাড়া তার আর কোনও উপায় ছিল না॥

এই লেখকের অন্যান্য বই :
কোনি ৬·০০ স্টপার ১০·০০ স্ট্রাইকার ৬·০০ দুঃখের বা সুখের জন্য ৫·০০ নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান ৪·০০ ননীদা নট আউট ৪·০০ ক্রিকেটের আইনকানুন ৮·০০

প্রকাশিত হল

শিবকালী ভট্টাচার্যের

ভারতীয় ভেষজ বিষয়ক
অদ্বিতীয় গ্রন্থ

চিরঞ্জীব বনৌষধি

দ্বিতীয় খণ্ড

দাম ২৫.০০

আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্যের লেখা কয়েকটি ভারতীয় বনৌষধির সচিত্র পরিচিতি, দ্রব্যগুণ, রোগ নিরাময়ক্ষমতা, প্রাণিদেহে সেগুলির প্রভাব, ঔষধার্থে লৌকিক ব্যবহার প্রভৃতি সম্পর্কিত কতকগুলি রচনা গত বছর 'চিরঞ্জীব বনৌষধি' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে কি ভিষক্‌, কি ভেষজবিজ্ঞানী, কি সাধারণ মানুষ—সকলের মধ্যেই একটা প্রচণ্ড সাড়া পড়ে যায়। সেইসঙ্গে পাঠকমহলে একটা অতৃপ্তির ছায়াও দেখা দেয়। ভারতীয় বনৌষধিসমূহের অনন্ত ভাণ্ডারের কণামাত্র পেয়ে পাঠকরা তৃপ্ত নন, তাঁরা আরও পেতে চান। যদি জ্ঞাত অজ্ঞাত নির্বিশেষে প্রতিটি ভারতীয় ভেষজের আলোচনা প্রকাশ করা সম্ভব নাও হয়, অতি সাধারণ যেগুলি অন্তত সেগুলির যেন প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়—এই মর্মে প্রত্যহ অজস্র অনুরোধ আসতে থাকে 'চিরঞ্জীব বনৌষধি' প্রকাশের পর থেকেই। পাঠকসাধারণের সেই ঐকান্তিক অনুরোধের মর্যাদা দিয়ে 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা হলো।

মানুষের শারীরিক গঠন দেখে কিভাবে তার প্রকৃতি বিচার এবং কোন্‌ কোন্‌ রোগ তার হওয়া সম্ভব নির্ধারণ করা যায়, সে সম্পর্কে এই খণ্ডে একটি মূল্যবান আলোচনা করা হয়েছে।

চিরঞ্জীব বনৌষধি

প্রথম খণ্ড ॥ দাম ২৫.০০

কয়েকটি উপন্যাস

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
কাগজের বউ
দাম ৮.০০

বুদ্ধদেব গুহর
যাওয়া আসা
দাম ৬.০০

সমরেশ বসুর
সংকট
দাম ৬.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
রাধাকৃষ্ণ
দাম ১০.০০

রমাপদ চৌধুরীর
লজ্জা
দাম ৭.০০

দিব্যেন্দু পালিতের
বিনিদ্র
দাম ৬.০০

কালকূট-এর
অমাবস্যায় চাঁদের উদয়
দাম ৮.০০

বিমল মিত্রের
পতি পরম গুরু
দাম ৩৫.০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
এই তার পুরস্কার
দাম ১৫.০০

আশাপূর্ণা দেবীর
চাঁদের জানালা
দাম ৭.০০

সন্তোষকুমার ঘোষের
সময়, আমার সময়
দাম ৫.০০

গৌরকিশোর ঘোষের
গড়িয়াহাট ব্রিজের উপর থেকে, দুজনে
দাম ৪.০০

প্রতিভা বসুর
উজ্জ্বল উদ্ধার
দাম ১০.০০

পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত হল

সত্যজিৎ রায়ের

ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার

রয়েল বেঙ্গল রহস্য

দাম ৫·০০

ভুটান-সীমান্তে ডুয়ার্সের কালবুনি জঙ্গলে এক সকালে একটি মৃতদেহ পাওয়া গেল। তার কাঁধের খানিকটা মাংস কোনও এক হিংস্র জানোয়ারে খেয়ে গেছে। মৃতদেহটি এক খ্যাতনামা শিকারীর। সবাই বলল—ম্যান-ঈটারের কাজ। কিন্তু ফেলুদা আবিষ্কার করল মৃতদেহের বুকে একটি গভীর ক্ষতচিহ্ন—যা একমাত্র কোনও সুতীক্ষ্ণ ও অতীব ধারালো অস্ত্রের দ্বারাই সম্ভব। তা হলে?

সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য বই :
ফটিকচাঁদ ৮.০০
জয় বাবা ফেলুনাথ ৬.০০
আরো এক [illegible] ১০.০০
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬.০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫.০০
বাক্সরহস্য ৫.০০
সোনার কেল্লা ৬.০০
গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫.০০
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৫.০০
এক ডজন গপ্পো ১০.০০
বাদশাহী আংটি ৫.০০
বিষয় চলচ্চিত্র ১০.০০

বরুণ সেনগুপ্তের

ইন্দিরা-একাদশী

সুলভ সংস্করণ
প্রকাশিত হল
দাম ৫·০০

দেশ ৪৪ বর্ষ ৪০ সংখ্যা
১৪ শ্রাবণ ১৩৮৪

সূচীপত্র

আগামী সংখ্যায়

শান্তিদেব ঘোষের রচনা
বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাপর্বে রবীন্দ্র-বিরোধিতা
পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের রচনা
'ভারতী'র ক্যাশ বই ও গ্রাহক-তালিকা
মানস দাশগুপ্তের প্রবন্ধ
সমস্যা-সংকুল সিকিম
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প
লেডিজ ঘড়ি
সরসীকুমার সরস্বতীর ধারাবাহিক রচনা
পালযুগের চিত্রকলা

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদ্মাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা।

'অতিশয় প্রজার ভারে'

সম্পাদকীয়

পরিবার পরিকল্পনার নতুন সরকারী নাম হয়েছে—পরিবার কল্যাণ। বিগত সরকারের প্রশাসনিক আচরণের সম্পর্কে যে-সব অভিযোগ প্রবল হয়ে রাজনীতিক প্রতিঘাত সৃষ্টি করেছে ও নির্বাচনে সেই সরকারের পরাজয় ঘটিয়েছে বলে মনে করা হয়, তার মধ্যে একটি প্রধান অভিযোগ এই যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে নির্বীজ করবার প্রক্রিয়া আত্যন্তিক এক অনাচার হয়ে দেশের বহু অঞ্চলের জনজীবনে দুঃসহ উৎপীড়ন সৃষ্টি করেছিল। আসল শিক্ষা এই যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের কার্যকর উৎসাহ এবং নির্বীজ করবার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সুষ্ঠু সতর্কতার শাসন চাই। পদ্ধতি এবং তার প্রয়োজন যেন কোন মতেই জনজীবনের পক্ষে কোন ভয়, ক্লেশ অথবা উৎপীড়নের হেতু না হয়। এবং দেশের সরকার ও জনসমাজ উভয়েরই পক্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আগ্রহের কোন সঙ্কোচ তো নয়ই, বরং আরও উজ্জীবিত প্রসারই চাই। কারণ, ভারতে জনসংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধির হার নিতান্ত প্রকারে খর্ব না করা হলে জাতির ভবিষ্যতের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি ভয়াবহ প্রকারের সঙ্কটে অভিভূত হবে। নির্বীজ করবার প্রক্রিয়ার তুলনায় কোন বেশি সুফলপ্রদ ও সার্থক পদ্ধতি যদি আবিস্কৃত হয়; তবে তার প্রয়োজন অবশ্যই প্রশস্ত আগ্রহে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে প্রযুক্ত করতে হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিশেষজ্ঞের অভিমত অনুযায়ী যে পদ্ধতি সব চেয়ে সার্থক ও সফলতার অঙ্গীকার বহন করে, সেটা হলো নির্বীজকরণ। বলা চলে জন্মসংখ্যার পরিমাণ নির্দিষ্টকালের সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট একটি সামান্য বৃদ্ধিহার কিংবা সম্পূর্ণ বৃদ্ধিহীন একটি মাত্রার অধীন হয়ে থাকবে; এই উদ্দেশ্য ব্রহ্মচর্য অথবা ইন্দ্রিয় নিগ্রহের দ্বারা সম্ভাবিত হবার নয়, কারণ ওই দুই আদর্শিক পদ্ধতি সামান্য সংখ্যকের জীবনে বিশেষ এক আদর্শিক চরিত্রবৃত্তি হিসাবে সার্থক হতে পারে, অন্যথায় নয়

প্রসঙ্গত স্মরণ করতে হয় যে, বিশ্বব্যাংক সম্প্রতি ভারতের জন্মসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের রীতি-নীতি ও সুফলের যে সমালোচনা করেছেন তার মধ্যে ভারতের পক্ষে অত্যন্ত রকমের কয়েকটি শিক্ষা গ্রহণ করবার বিষয় আছে। বাঙালী কবি দাশরথি রায়ের উক্তি—'অতিশয় প্রজার ভারে ধরণী হরে শস্য।' বিশ্বব্যাংকও ভারতীয় জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রায় এইরকমই অর্থনীতিক তাৎপর্যের উল্লেখ করেছেন। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে ভারতের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের যে তথ্যগত বিশ্লেষণ প্রদত্ত হয়েছে, তার সবার আগের একটি প্রধান বক্তব্য : আগামী একশত বৎসরের মধ্যে ভারতের পক্ষে জন্ম-বৃদ্ধির হার 'শূন্যে' পরিণত করবার কোনই সামর্থ্য ও সম্ভাবনার লক্ষণ নেই, যে-ভাবে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পরিচালিত হচ্ছে যদি সেইভাবেই চলতে থাকে। ১৯৮৬ সালে ভারতের জনসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়াবে বাহাত্তর কোটি, এবং শতাব্দী শেষ হবার আগে জন্মসংখ্যা বিরানব্বই কোটিতে পরিণত হবে। বিশ্বব্যাঙ্ক ধারণা করে যে, ২০৭১ খ্রীঃ অব্দে ভারতের জন্মসংখ্যা প্রায় এক'শো এগার কোটি তেত্রিশ লক্ষে পৌঁছবে। ভয়াবহ হিসাব, নিদারুণ পরিণামের একটি আঙ্কিক চিত্র। বিশ্বব্যাঙ্কের ভয় এই যে, যে-দেশ বর্তমানে ওই পরিমাণের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক পরিমাণের জনসংখ্যা নিয়েই জনসাধারণের জীবনযাপনের সাধারণ প্রয়োজনের দাবি মেটাতে পারছে না, সে দেশের পক্ষে এত বিরাট এক জন্মসংখ্যার ভার সেদিন কত ভয়ংকরই না হয়ে উঠবে। ব্যাংকের মন্তব্য, এই বৎসরের জানুয়ারী মাস নিয়ে বিগত দশ মাসে এক কোটি তের লক্ষ নরনারী 'শাসিত' হয়েছে বটে, এবং এর ফলে ১৯৯৭-৯৮ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ছয় কোটি বিরাশি লক্ষ জন্মের সম্ভাবনা পরিহার করা হবে বলে মনে করেও বলতে হয় যে, সমগ্র পরিকল্পনার কাজ অতিরিক্ত ব্যস্ততার চাপ সৃষ্টি করে পরিবার-কল্যাণের অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সমস্যা বাড়িয়েছে।

১৯৭৭ সালের জানুয়ারী সমেত আগের দশমাসের যে 'চমৎকার' সফলতার হিসাব উল্লেখ করা হয়েছে, সেটাও জাতির প্রয়োজনের তুলনায় বস্তুত সামান্য সাফল্য। এবং সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় সত্য এই যে, জন্মসংখ্যার বৃদ্ধিহার দ্রুত এবং যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করবার জাতীয় প্রয়াস বিপুল প্রকারে উদ্বোধিত না করে তুলতে পারলে ২০০১ খৃঃ অব্দের ভারত দুঃখ, দীনতা, অভাব, মন্দা, অশান্তি ও অরাজক আলোড়নের একটি নিদারুণ আয়তনে পরিণত হবেই হবে। তাই দেশপ্রেমের দাবি, জাতির সম্পর্কে ন্যূনতম মাঙ্গলিক বৃদ্ধির দাবি, মানবতার মর্যাদা ও বিশ্বশান্তির দাবি আজ এই মুহূর্তে ভারতের জাতীয় জীবনের একটি বিরাট অথচ মহান্ ব্রত পালন করবার শুভ অথচ দুরূহ দায়িত্ব আরোপ করছে—জনসংখ্যার দ্রুত হ্রাস চাই, সমধিক হ্রাস চাই। এক্ষেত্রে চটুল তর্কাতর্কির কোন মুখরতা, কিংবা রাজনীতিক দলীয়তারও কোন স্বার্থ কিংবা সুবিধার প্রাচারিক চঞ্চলতায় জাতীয় অভীষ্টের কোন উপকার হবে না। এক্ষেত্রে সমগ্র জাতির পক্ষে রাজনীতি-নিরপেক্ষ একটি মহৎ একাত্মিকা বৃদ্ধির প্রেরণা চাই। জন্মসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ উদ্যম আরও কয়েকগুণ প্রশস্ত করা চাই। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের ঈশ্বরী পাটনী অন্নপূর্ণার কাছে এই বর প্রার্থনা করেছিলেন—আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। ভবিষ্যতের ভারতীয় সংসারের সন্তানেরা যেন সুখ-শান্তির স্নেহাশ্রয় পায়, আজিকার ভারত ঈশ্বরী পাটনীর হৃদয় নিয়ে সেই আকাঙ্ক্ষার অনুগত দায় ও কর্তব্য পালন করবে। এক্ষেত্রে অন্য কোন সহজ পথ নেই।

জোতির্ম ও

পাকিস্তানে তিন মাসের বন্দোবস্ত

সুধাংশুকুমার বসু

কোন্ লগ্নে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল তা জ্যোতিষীরাই বলতে পারেন কিন্তু সেটা যে শুভ নয় সে কথা বলবার জন্যে দৈবজ্ঞ হবার দরকার নেই। তেইশ বছর ধরে দেশটার যা হাল হয়েছে তাতে বুঝতে কষ্ট নেই কুক্ষণেই সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। আঁতুড় ঘর থেকেই তার ঝামেলা লেগে আছে। পয়লা রাষ্ট্রপতি কায়েদ ই আজম জিন্না দেশটার জন্ম দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু পালন করতে পারেন নি। তার জন্মাবার এক বছর পুরোতেই তিনি ইহলোক থেকে বিদেয় নিয়েছিলেন। তাঁর ডান হাত, দেশের পয়লা প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খাঁও বেশী দিন টেঁকেন নি। পাকিস্তান চার পেরিয়ে পাঁচে পা দিতে না দিতেই তিনিও গেলেন। তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নি, তাঁকে খুন করা হয়েছিল। সেই যে দেশে টালমাটাল আরম্ভ হলো তারপর আজও স্থিতি ফিরে আসেনি। মাঝে মাঝে শান্তি ঝাঁকি-দর্শন দিয়ে গেছে বটে কিন্তু স্থায়ী হতে তো পারেই নি, বেশী দিন টেঁকেও নি। বলতে গেলে পাকিস্তানে মিছিল চলেছে বড়লাট, রাষ্ট্রপতি আর প্রধানমন্ত্রীর তেইশ বছর ধরে। জিন্নার পর নাজিমুদ্দীন, তাঁর পর গুলাম মহম্মদ, তাঁর পর ইস্কান্দার মির্জা, তাঁর পর আয়ুব খাঁ, তাঁর পর ইয়াহিয়া খাঁ, সেযাবৎ জুলফিকার আলি ভুট্টো আর হালফিল চৌধুরী ফজল ইলাহি বড়লাট কিংবা রাষ্ট্রপতির তখতে বসেছেন। প্রধানমন্ত্রীও হয়েছেন লিয়াকত আলি খাঁর পর একে একে নাজিমুদ্দিন, বগুড়ার মহম্মদ আলি, চৌধুরী মহম্মদ আলি, সুহরাবর্দি, চুন্দ্রিগড়, ফিরোজ খাঁ নুন আর ভুট্টো। মাঝখানে বারো বছর—১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ তক চলেছে একটানা নির্ভেজাল জঙ্গী শাসন। ইস্কান্দার মির্জার জমানা ধরলে তার মেয়াদ আরও দু বছর বেশী। জঙ্গী শাসন ঘুচিয়ে দেশের হাল ধরেছিলেন জুলফিকার আলি ভুট্টো ১৯৭১ সনে গোড়ায় মুখ্য সামরিক প্রশাসক আর রাষ্ট্রপতি তারপর প্রধানমন্ত্রী। সেই প্রধানমন্ত্রীর গদি থেকে তাঁকে টেনে নামিয়েছেন প্রধান সেনাপতি জিয়া উল হক ৫ জুলাই।

পাকিস্তানে সাদামাঠা গণতান্ত্রিক কানুন মেনে হয়নি। নির্বাচনী সড়ক ধরে কদাচিৎ রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীরা ঠিকানায় পৌঁছেছেন। নির্বাচন যদিও বা হয়েছে তা খাঁটি গণতন্ত্রী ঢঙে হয়নি—স্বেচ্ছাচারকে গণতন্ত্রী নামাবলী মুড়ে লোককে ঠকাবার ব্যবস্থাই বরাবর হয়ে এসেছে। গোড়ার দিকে অবিশ্যি ঠিক ক্ষমতা জবরদখল কেউ করেন নি। জিন্না লিয়াকত আলি খাঁ মারা যাবার পর একজন আর একজনকে লাথি মেরে গদিতে বসেছেন। গণতন্ত্রের মলাটে আড়াল দিয়ে ক্ষমতার তামাক খাবার যে চেষ্টা চলছিল প্রথম প্রথম সেটুকু গেল মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা রাষ্ট্রপতির গদিতে বসার পর। চেপে বসতে অবিশ্যি তিনি পারেন নি। ১৯৫৮ সনে তাঁকে হটিয়ে রাষ্ট্রপতি বনে গেলেন ফীল্ড মার্শাল (তখন জেনারেল) আয়ুব খাঁ। ছুঁচ হয়ে ঢুকেছিলেন তিনি পাকিস্তানী রাজনীতির দরবারে চার বছর আগে প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভার নিয়ে, বেরুলেন একবারে ফাল হয়ে রাষ্ট্রপতির পোশাক পরে। তিনি নিজেকে জাহির করতে চেয়েছিলেন গণতন্ত্রের পূজারী হিসেবে যদিও তখন দেশে চলছে পুরোপুরি ফৌজী শাসন। গণতন্ত্রকে কবর দেওয়া যে হয়নি—তা দেখাবার মতলব যে তাঁর নেই তাও প্রমাণ করবার জন্যে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্যাপারটা অবিশ্যি নিছক ধাপ্পা। কিন্তু ভোট পেয়ে জিতে গেলেন ফীল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁ। সে সুবাদে তাঁর দখলে রাষ্ট্রপতির গদিটি পাঁচ বছর কায়েম থাকার কথা। গণতন্ত্রের ভিত পাকিস্তানে পাকা হয়ে থাকতো। কিন্তু গণতন্ত্র যেখানে [illegible] কিছু নয় সেখানে কোনও কিছুই নিয়মের বাঁধন মেনে চলে না। আয়ুব খাঁর রাষ্ট্রপতির পদে পাঁচ বছরের মেয়াদ ফুরুবার আগেই আবার পাশা উলটে গেল—আয়ুব খাঁকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে তখতে জাঁকিয়ে বসলেন ইয়াহিয়া খাঁ। নির্বাচনের ঝক্কি তাঁকে পোয়াতে হয় নি। আর হবেই বা কেন—জঙ্গীশাহীতে তো নিয়ম হচ্ছে জোর যার মুলুক তার।

সেই জোরেই রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে বসলেন ইয়াহিয়া খাঁ গণতন্ত্রী নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে ২৫ মার্চ ১৯৬৯ সনে, তখন কিন্তু দেশে হাওয়া খানিকটা পালটেছে। জঙ্গীশাহীর ওপর লোকের মোহ ঘুচে গেছে। আশপাশের দেশে দিব্যি নিয়মমাফিক নির্বাচন হচ্ছে, জনতার রায় নিয়ে সরকার ভাঙা-গড়া চলছে। পাকিস্তানে ওসব কিছুই হচ্ছে না—ফৌজী পান্ডারা যা খুশি তাই করছেন, জনমতের ধার তাঁরা ধারেন না। তবুও যদি স্থিতি থাকতো তা হলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু তাও তো থাকছে না। দেশে শান্তি যদিও বা থাকে স্বস্তি নেই। গুমে গুমে মরেছে লোক কিন্তু কিছু করতে পারেনি ফৌজী তাণ্ডবে ভয়ে। ফৌজী চাঁইরা যখন ক্ষমতা কব্জা করে তখন লোকে তাতে খুশীই হয়েছিল এই ভেবে এবার রাজনীতিকদের
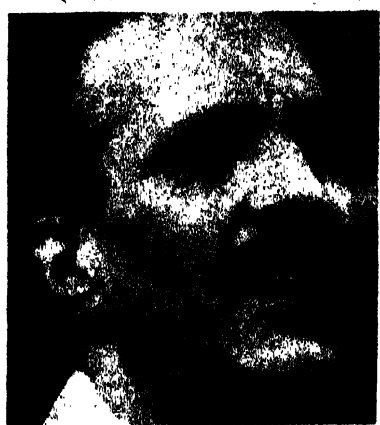
জিয়া-উল হক

কোন্দল থামবে আর শক্ত হাতে হাল ধরে জঙ্গী পান্ডারা দেশের দুর্দশা ঘোচাবার ব্যবস্থা করবে। গণতন্ত্রের জন্যে তখন বড় একটা কেউ কাঁদেনি। কাঁদতে যাবেই বা কোন্ দুঃখে? মাথা নেই তার মাথা ব্যথা। গণতন্ত্র কী বস্তু তা তারা পাকিস্তান পত্তন হবার পর জানতেই পারলো না, কাজেই তার জন্যে তাদের কেন দু চোখ বেয়ে জল ঝরবে? তারা চেয়েছে এমন একজন শক্ত মানুষকে দেশের সব অশান্তি যিনি ঝেঁটিয়ে দূর করবেন। জন দুই শক্ত মানুষ তারা বারো বছরের জঙ্গী শাসনে পেয়েছেও। কিন্তু ভারতবর্ষের সঙ্গে গোটা তিনেক লড়াই বাধিয়ে মান খোয়ানো ছাড়া তাঁরা কিছুই করতে পারেননি। মাথা কাটা গেছে কেবল ফৌজী কর্তাদের নয়, তামাম দেশেরই। লোকের বাড়বাড়ন্ত হওয়া দূরে থাকুক অবস্থা আরও কাহিল হয়েছে ফৌজী আমলে। দেশটাকে লুটেপুটে খাবার ঢালাও পরোয়ানা পেয়েছে গোটা বাইশ পরিবার। শুধু তাই নয়, দেশটাও দু টুকরো হয়ে পড়লো, পূর্ব পাকিস্তানের নাম দুনিয়ার মানচিত্র থেকে মুছে গেল ১৯৭১ সনে আয়ুব-ইয়াহিয়ার দুর্নীতির খেসারত হিসেবে, এ উপমহাদেশে আর এক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হলো। তার নাম বাংলাদেশ। সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্গ হলো ফৌজী পান্ডাদের নবাবিয়ানা পাকিস্তানে। চালু হলো আরও পাঁচটা দেশের মতো অসামরিক শাসন। এ জিনিস যে কী চীজ পাকিস্তানীরা একরকম ভুলেই গিয়েছিল।

মুখে চুনকালি মেখে ফৌজী চাঁইরা প্রশাসন থেকে বিদেয় নিলে আসরে উদয় হলেন জুলফিকার আলি ভুট্টো। তিনি হলেন আয়ুব খাঁর জমানার রাষ্ট্রপতি। নির্বাচনের কোনও বালাই ছিল না, যদিও ঠিক এর আগে ১৯৭০ সনে যে সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল পাকিস্তানে, দেশটা দু টুকরো হবার মুখে তাতে বাজীমাত করেছিলেন ভুট্টোই পশ্চিম এলাকায়। তখনকার পশ্চিম পাকিস্তানে জিতেছিল ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি আর পূবে শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগ। দুটো এলাকা মিলিয়ে গরিষ্ঠতা ভুট্টোর দল পায়নি, পেয়েছিল শেখ সাহেবের আওয়ামী লীগ। কিন্তু পূব এলাকা স্বাধীন হয়ে যাবার পরদেশের গরিষ্ঠ দলের নেতা হয়ে দাঁড়ালেন ভুট্টো। সেই সুবাদে তিনি চেপে বসলেন গদিতে। ব্যাপারটা আর যাই হোক, গণতান্ত্রিক নয়, নেহাতই গাজোয়ারি কান্ড। কিন্তু এ ছাড়া পথই বা কী ছিল? ফৌজী চাঁইরা পলাতক। তাদের রাজত্ব করার শখ মিটে গেছে। ভুট্টোর সঙ্গে টক্কর দিতে পারে এমন দোসরা নেতা কেউ নেই কী ফৌজী, কী রাজনীতিক। রাজা ছাড়া তো আর রাজ্য চলে না। তাই টপ করে বসে পড়লেন তখতে জুলফিকার আলি ভুট্টো। তিনি কিছু ভুঁইফোড় নেতা নন। আয়ুব খাঁর হাতে তাঁর রাজনীতিতে হাতে খড়ি। আয়ুব-শাহীতে তিনি আসরে নামেন বাণিজ্য মন্ত্রীর ভূমিকায়। সেটা ১৯৫৮ সন। দু বছর বাদে তিনি হলেন তথ্য মন্ত্রী, তার দু বছর বাদে শিল্প আর প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রী, পরের বছর দপ্তর পালটে বিদেশ মন্ত্রী। এর পরই তাঁর কপাল খুলে গেল। চীনের ঘাটে তিনি ভিড়িয়ে দিলেন পাকিস্তানকে যদিও অক্সফোর্ড-বারকেলেতে পড়া ভুট্টোর কম্যুনিজম সম্বন্ধে কোনও মোহ থাকার কথা নয়। সবুর থেকেই তাঁর জয়যাত্রার শুরু। তা সমানে এগিয়ে চলেছে এই সাত বছর ৫ জুলাই পা হড়কে নিচে না পড়া পর্যন্ত।

পাকিস্তানকে দেশের সংবিধানে বলা হয়েছে ইসলামী প্রজাতন্ত্র। দেশটা ইসলামী নিশ্চয়ই কিন্তু মোটেই প্রজাতন্ত্র নয়। অবিশ্যি যদি বলা হয় দেশে রাজা যখন নেই তখন প্রজাতন্ত্র ছাড়া আর কী বা বলে আলাদা। কিন্তু তেইশ বছরে প্রজাতন্ত্র কথাটি খোঁড়া হয়েছে পাকিস্তানে, তাকে বাঁচিয়ে রাখার কোনও উদ্যোগই হয়নি। ইংরেজ আমলে এ উপমহাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের যে চারা গাছটি পোঁতা হয়েছিল তা দিব্যি বাড়ন্ত হয়েছে সীমান্তের এপারে। ওপারে সেটি কিন্তু মুড়িয়ে খেয়েছে গোষ্ঠীস্বার্থের ছাগলে। সে গোষ্ঠীস্বার্থ রাজনীতিকদের যেমন, ফৌজী চাঁইদেরও তেমন। দেশটাকে গোল্লায় দেবার চেষ্টা করতে কসুর করেননি খেয়োখেয়িতে মত্ত রাজনীতিকরা আর একগুঁয়ে, দাম্ভিক জঙ্গী পান্ডারা। গণতন্ত্র প্রজাতন্ত্রের জন্যে তাঁদের কারুরই দরদ উথলে পড়েনি কখনও। জিন্না কি লিয়াকত আলি খাঁ বেঁচে থাকলে সংসদীয় গণতন্ত্রের রেওয়াজ গড়ে তোলবার চেষ্টা হয়েছিল, তাঁরা থাকলে হয়তো সে চেষ্টা জোরদারও হতো। তবে লোকে বলে ওই গণতন্ত্রের বাঁধন অসহ্য মনে হওয়াতেই স্বৈরাচারের ভক্ত ফৌজী সর্দাররা চক্রান্ত করে পথের কাঁটা লিয়াকতকে সরিয়ে দিয়েছিল ইহলোক থেকে। তাদের আক্রোশ নাকি ছিল লিয়াকত আলি খাঁর ওপর নয়, গণতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার ওপর, যে শাসনতন্ত্রে ক্ষমতার কলকাঠি থাকে জঙ্গী সর্দারদের হাতে নয় অসামরিক রাজনীতিকদের হাতে। পাকিস্তানের গণতন্ত্রী কাঠামোটা লিয়াকতের হত্যার পরই সিন্ধু নদে ডুবিয়ে দেওয়া হয়নি। সে ঠাট আরও আট বছর বজায় ছিল। কিন্তু কোনও দিন তার ওপর মাটি চাপিয়ে গণতন্ত্রের সুঠাম মূর্তি গড়ে তোলার আন্তরিক আয়োজন হয়নি। শেষ পর্যন্ত জঙ্গী বুটের ঘায়ে তাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে পাট চুকিয়ে দিয়েছিলেন জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা। পুরোপুরি জঙ্গী শাসন কায়েম হলো ১৯৫৮ সনে। জেনারেল আয়ুব খাঁ হলেন পয়লা জঙ্গী প্রশাসক। জঙ্গী আইনের ফাঁদে এলো পাকিস্তান।

গণতন্ত্রে বিশ্বাস থাকলে এমন কান্ড পাকিস্তানে হতে পারতো না। থাকলে একটা সংবিধান অন্তত চটপট খাড়া হতো। ভারত আজাদ হয়েছে ১৯৪৭ সনে। তিন বছরেই নয়া সংবিধান বানিয়ে ফেলেছিল ভারতবর্ষ। সে সংবিধান আজও ভেঙে পড়েনি। বরঞ্চ তার বনিয়াদ আরও মজবুত হয়েছে। কিন্তু ওপারে একটা সংবিধানের খসড়া বানাতেই লেগে গেল নয় বছর। তাও টিঁকলো কুল্লে দু বছর। তাকে খতম করেছিলেন

সঙীনের এক খোঁচায় জঙ্গী রাষ্ট্রপতি ইসকান্দার মির্জা। তাঁর সাকরেদ আয়ুব নকল গণতন্ত্রের ধোঁকা দিয়ে লোককে ভুলোতে চেষ্টা করেছিলেন। খাঁটি গণতন্ত্রী কায়দায় নতুন সংবিধান গড়ার উদ্যোগ আয়োজন কিছুই করেন নি। তবে তাঁর চেলা হয়েও ইয়াহিয়া খাঁ পাকিস্তানকে একটা নতুন সংবিধান ভেট দিয়েছিলেন। সেটাই পাকিস্তানে দু নম্বর সংবিধান। সে সংবিধানের কানুন মেনে নির্বাচনও হয়েছিল ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০। ধরতে গেলে পাকিস্তানে এটাই একমাত্র সত্যিকারের নির্বাচন। প্রাপ্ত বয়স্ক সব লোকেরই এতে ভোট দেবার অধিকার ছিল। জাতীয় পরিষদের অর্ধেকেরও ওপর আসন পেয়েছিল আওয়াম লীগ। জিতেছিল ১৫১টা আসন। ভুট্টোর পিপলস পার্টি পেয়েছিল ৮১টা। সংসদীয় গণতন্ত্রের রেওয়াজ অনুযায়ী গরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবর রহমানেরই গোটা দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা। আওয়ামী লীগ অবিশ্যি আসন পেয়েছিল দেশের পূব অঞ্চলে যার নাম এখন বাংলাদেশ। কিন্তু তাতে কী? একটা দল নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেলেই তো সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজ্যপাটে বসে। মন্ত্রিসভা গড়ার অধিকার তারই। নিজের দলের লোক নিয়েই প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভা গড়েন, অন্য দলের লোকদের ক্ষমতার ভাগীদার হতে দেন না। তবে কেউ আপত্তি করে না। তেমনই দেশের বিশেষ একটা এলাকায় শাসক দলের প্রভাব সীমায়িত থাকলেও তার দেশ শাসন করতে আটকায় না। অবিশ্যি সব এলাকার লোক বিজয়ী দল কিংবা মন্ত্রিসভায় থাকলে ভালো। কিন্তু না থাকলে রাজনীতির মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে এমন কথা কেউ বলে না।

কিন্তু সেই উদ্ভট কথাই বললেন পশ্চিম পাকিস্তানে যাদের ঘাঁটি সেই পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা বিলেত-আমেরিকায় লেখাপড়া শেখা জুলফিকার আলি ভুট্টো। গোটা দেশের ভার আওয়ামী লীগ কিংবা শেখ মুজিবর রহমানের হাতে তুলে দিতে তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না। হলে পাকিস্তানের ইতিহাস অন্য রকম হতো। গণতন্ত্রের ভিত সেখানে পাকা হতো, দেশটা দু ভাগ হয়ে যেত না, আর একদফা লড়াই ভারতবর্ষের সঙ্গে হতো না, বাংলাদেশও জন্ম নিত না। উজীর হবার সাধ অবিশ্যি ভুট্টোর মিটতো না, কিন্তু তিনি হতেন পাকিস্তানের নয়া জমানার মুখ্য বিরোধী নেতা। সংসদীয় গণতন্ত্রে তাঁর ইজ্জতও কম নয়। কিন্তু ভুট্টোর মতলব অন্য। পাকিস্তানে গণতন্ত্র গড়ে উঠুক, লোকে গণতান্ত্রিক অধিকার অবাধে ভোগ করুক, ফৌজী নেতারা যে যার ছাউনিতে থাকুক এ তিনি চান নি। তিনি চেয়েছিলেন দেশের সর্বেসর্বা হতে, তাতে তার অঙ্গহানি হয় তো হোক, গণতন্ত্র যায় তো যাক। পাকিস্তানের চরম সর্বনাশ ডেকে আনলো তাঁরই অন্যায় জেদ। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী তিনি শেখ মুজিবরকে হতে দিলেন না বটে কিন্তু ক্ষয়া পাকিস্তান আরও ক্ষয়ে গেল—তার পাঁজরার হাড় বেশ কিছু খসলো। ভুট্টোর সাধ মেটাবার জন্যে চড়া দর দিতে হলো তাঁর দেশকে। তাতে কিন্তু তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে ভারতবর্ষ সামিল হলে তিনি ক্ষেপে গিয়েছিলেন— তড়পেছিলেন হাজার বছর লড়াই চালাবো বলে, কিন্তু মনে মনে তিনি বোধ হয় খুশীই হয়েছিলেন। জঙ্গীশাহী ওই যুদ্ধেই খতম হয়ে তো তাঁর পথ পরিষ্কার করে দিলে। ইয়াহিয়া খাঁও গেলেন তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে, আর হুমড়ি খেয়ে নিউ ইয়র্ক থেকে দৌড়ে এলেন নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক থেকে দেশের ত্রাণকর্তা জুলফিকার আলি ভুট্টো।

ত্রাণকর্তা তিনি ঠিকই, তবে দেশের নয় দলেরও নয়—নিজের। তাঁর জীবনে লক্ষ্য বুঝি একটিই। তা হচ্ছে সবাইকে ছাড়িয়ে ওপরে ওঠা। তার জন্যে কোনও অকাজ কিংবা কুকাজ করতে তিনি পেছপাও নন এই কথাই তাঁর এতদিনের কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হয়। ধাপে ধাপে তিনি ওপরে উঠেছেন আর সবাইকে পেছনে ফেলে তো বটেই, দরকার হলে ঠেলে ফেলেও। যে আয়ুব খাঁ তাঁকে হাত ধরে নিয়ে এসেছিলেন সেই আয়ুব খাঁকে হটাবার জন্যেই তিনি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ধুয়া তুলেছিলেন। উদ্দেশ্যটা যতটা স্বার্থসিদ্ধি ততটা গণতন্ত্রের ওপর টান ছিল না। তিনি বুঝেছিলেন ফৌজী জমানা শেষ হলে তাঁরই পোয়া বারো—তাঁকে রুখবে পাকিস্তানে এমন হিম্মত কার আছে? অবিশ্যি সত্যিই তাঁর যুগ্যি কেউ পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন না। মার্শাল আসগর খাঁ অবিশ্যি ছিলেন আয়ুব খাঁর ঘোর বিরোধী। কিন্তু ভুট্টোর সঙ্গে এঁটে ওঠার সাধ্যি তাঁর আছে বলে ভুট্টো মনে করেন নি। তাঁর ভুল হয়েছিল শেখ মুজিবর রহমানকে হিসেবের মধ্যে না ধরা। সে ভুলের খেসারত তিনিও দিয়েছেন, দেশও। তাঁর আসল জোর ছিল যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাব নয়—পাকিস্তানে গণতন্ত্রের আলগা শেকড়। গণতন্ত্রের ওপর যদি পাকিস্তানীদের টান থাকতো—অন্তত পশ্চিম এলাকার বাসিন্দাদের—তা হলে ভুট্টোর মতলব হাসিল হতো না—তিনি অমনভাবে গণতন্ত্রের মাথায় লাথি মেরে কখনও রাষ্ট্রপতি, কখনও প্রধানমন্ত্রীর পদ দখল করতে পারতেন না। দেশ জুড়ে তা হলে হইচই পড়ে যেতো। ভুট্টোকে দেশের ত্রাণকর্তা বলে কেউ নাচানাচি করতো না—তাঁকে দুষতো পাকিস্তানে গণতন্ত্র জবাই করেছেন বলে। পাকিস্তানীরা চুপচাপ থেকে কখনও ফৌজী চাঁইদের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে, কখনও জুলফিকার আলি

জুলফিকার আলি ভুট্টো

ভুট্টো। এতেই বোঝা যাচ্ছে, নিজেদের গলায় ছুরি তারা নিজেরাই বসিয়েছে, আয়ুব-ইয়াহিয়া-ভুট্টো তো নিমিত্ত মাত্র।

১৯৭১-এ যখন পাকিস্তানের কাণ্ডারী হলেন ভুট্টো তখন দেশে দারুণ ডামাডোল চলছে। রণে ভঙ্গ দিয়েছেন জঙ্গী চাঁইরা, প্রশাসন ভেঙে পড়ার জো হয়েছে। দেশের মানুষ দিশেহারা, ভুট্টো নিজেও। কী করলে দেশ যে বাঁচবে তার হদিশ তাঁর যে জানা ছিল না তা নয়। কিন্তু ক্ষমতা কব্জা করার এ মওকা তিনি হাতছাড়া করবেন এমন বান্দা ভুট্টো নন। গদিয়ান হয়ে তিনি বসলেন ইসলামাবাদে। ফৌজী চাঁইদের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে—তারা যে বাগড়া দেবে না এ ভরসা তাঁর ছিল। অন্য রাজনীতিকদের তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নি। মোল্লার দৌড় যে মসজিদ পর্যন্ত এটা তিনি ধরে নিয়েছিলেন। হিসেবে তাঁর ভুল হয় নি তেমন। শত্রু তাঁর অবিশ্যি ছিল কিন্তু তাঁর সঙ্গে সমানে পাল্লা দেবার সাধ্য তাদের কারুর ছিল না। ভুট্টো আসরে নেমেছিলেন রাষ্ট্রপতি সেজে, কিন্তু বনে গেলেন প্রধানমন্ত্রী ১৯৭৩-এ। ইতিমধ্যে তিনি সেনেটের নির্বাচন করিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর জাতীয় পরিষদ আর সেনেটের যুক্ত বৈঠকে তিনি হলেন প্রধানমন্ত্রী আর চৌধুরী ফজল ইলাহী রাষ্ট্রপতি। এসবও লোক দেখানো ব্যাপার, খাঁটি গণতন্ত্রী ধরন এ নয়। এর আগে অবিশ্যি সংবিধান পালটে নিয়েছিলেন তিনি জাতীয় পরিষদকে দিয়ে এপ্রিল মাসে। পূব পাকিস্তান ভিন্ন হয়ে যাবার পর সাবেক সংবিধান অচল হয়ে পড়েছিল, যদিও ভুট্টোর রথ ঠিকই চলছিল গড়গড় করে। এই তিন নম্বর সংবিধান এখন পাকিস্তানে চালু। এতে সব কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। রাষ্ট্রপতিকে তাঁর পরামর্শ মেনে চলতে হয়। প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাচন করে জাতীয় পরিষদ আর রাষ্ট্রপতিকে জাতীয় পরিষদ আর সেনেট মিলে। প্রধানমন্ত্রী হবার জন্যে তাই ভুট্টোকে নতুন করে নির্বাচনের ঝামেলা পোয়াতে হয়নি। কেবল সেনেটের নির্বাচন করেই তিনি কর্ম ফতে করে ফেলেছিলেন। বিরোধীদের অত তাড়িঘড়ি সংবিধান পাস করাতে আপত্তি ছিল। তাঁরা একটা যুক্ত গণতন্ত্রী ফ্রন্ট গড়ে তুলেছিলেন খসড়া সংবিধানের বিরোধিতা করতে, ভুট্টোকে কাবু করতে তাঁরা জাতীয় পরিষদে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কাবু তিনি হয়েও ছিলেন খানিকটা। বিরোধীদের দাবি কিছু কিছু মেনে নিয়ে তাঁকে সংবিধানের রদবদল করতে হয়েছিল।

নতুন সংবিধান ভুট্টো বানিয়েছিলেন বটে কিন্তু দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার কোনও চেষ্টা করেননি। প্রদেশে প্রদেশে সরকার গড়েছেন আর ভেঙেছেন নিজের খুশি মতো। যখনই দেখা গেছে কোনও প্রদেশে তাঁর গড়া দল পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি ক্ষমতা পায় নি তখনই হয় ভয় দেখিয়ে না হয় ঘুষ দিয়ে দল ভাঙিয়ে তিনি ভিন্ন দলের সরকার হটিয়ে নিজের দলের সরকার খাড়া করেছেন। নির্লজ্জ ক্ষমতার লড়াইয়ে গণতন্ত্রের কোনও নিয়ম কানুনেরই তিনি তোয়াক্কা করেননি। খেলা করেছেন তিনি প্রদেশের গভর্নর আর মুখ্যমন্ত্রী-মন্ত্রীদের নিয়ে। নিজের দলের লোকদেরও রেহাই দেননি। আদর করে আজ যাকে নিজের মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দিয়েছেন কালই আবার তাঁকে গলা ধাক্কা দিয়েছেন দরকার মনে করলে। তাঁর লক্ষ্য গদি। যখনই তাঁর সন্দেহ হয়েছে দলে কারুর প্রভাব বাড়ছে তখনই তাঁকে রাজনৈতিক কুস্তির প্যাঁচ মেরে কাত করেছেন, পাছে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে কেউ দাঁড়ায়। এর পর দলে যে তিনি শাহানশা- বাদশা হয়ে দাঁড়াবেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই। অন্য দলের তো নয়ই নিজের দলেরও কোনও নেতাকেই তিনি মাথা চাড়া দিতে দেননি। গোটা দেশটাকেই তিনি তাঁর পায়ের তলায় আনতে চেষ্টা করেছেন। তবে পারেন নি। এত করেও বালুচিস্তান আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে শায়েস্তা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, যদিও খয়ের খাঁ সরকার তাদের ওপর তিনি মাঝে মাঝে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। গোলমাল খানিকটা যদিও বা সীমান্ত প্রদেশে থামাতে তিনি পেরেছিলেন, চার ডিভিসন ফৌজ পাঠিয়েও সামলাতে পারেননি বালুচিস্তানকে।

আর বিরোধীদের তো কথাই নেই। তাঁদের তিনি হাতে মাথা কেটেছেন, যখন চেয়েছেন গারদে পুরেছেন, আবার মেজাজ শরিফ হলে ছেড়ে দিয়েছেন। ফৌজকেও তিনি ছেড়ে কথা কননি। সেখানেও যখন খুশী আর যেমন খুশী রদবদল করেছেন। কাউকে অকালে ছুটি দিয়েছেন, কাউকে টেনে ওপরে তুলেছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, আয়ুব খাঁ-ইয়াহিয়া খাঁর সর্বনাশ দেখে শিক্ষা হয়েছে ফৌজী পাণ্ডাদের—তাঁরা আর দেশ শাসনের বায়না করবেন না কখনও। তবুও সাবধানের মার নেই এই ভেবে ফৌজেও কাউকে বড় হতে দেননি, কেউ একটু এগুলেই তার রাশ টেনে ধরেছেন। জঙ্গী প্রশাসক থাকতে থাকতেই তিনি বিদেয় দিয়েছিলেন প্রধান সেনাপতি জেনারেল আবদুল হামিদ খাঁকে। গদিতে বসেই সরালেন তখনকার প্রধান সেনাপতি লেফটেনান্ট জেনারেল গুল হাসান আর বিমানবাহিনীর কর্তা ভাইস মার্শাল এ রহিম খাঁকে। লোকে বলে ইয়াহিয়া খাঁর কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ভুট্টোর হাতে তুলে দিয়েছিলেন ও'রা দুজনই। নইলে পাকিস্তানে জঙ্গীশাহীই বজায় থাকতো—ভুট্টোর আর রাজ্যপাটে বসা হতো না। কিন্তু ভুট্টো চান পাকিস্তানে একেশ্বর হয়ে বসতে। নরম মন নিয়ে তা হওয়া যায় না। তাই মনকে শক্ত করে উপকারের কথা বেমালুম ভুলে গুল হাসানকে হটিয়ে তাঁর জায়গায় বসিয়ে দিলেন তাঁর পেয়ারের টিক্কা খাঁকে যিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন, আর নতুন বিমানবাহিনীর কর্তা করলেন এয়ার মার্শাল জাফর চৌধুরীকে। ভুট্টোর সন্দেহ হয়েছিল তাঁকে হটিয়ে দেবার চক্রান্ত চালানো হচ্ছে ফৌজে আর বিমানবাহিনীতে। সেটা পুরো মিথ্যে হয়তো নয়। পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী কোনও ঝুঁকি না নিয়ে ওলোট পালোট করে দিলেন প্রতিরক্ষা

বাহিনীতে। কর্তৃকে দিলেন তিনি গোটা ফৌজী-বাহিনীর চাঁইদের এক বেতার ভাষণে। হুমকি দিলেন নেপোলিয়নী চাল তিনি বরদাস্ত করবেন না, পাকিস্তানে কমান্ডার ইন চীফ অর্থাৎ প্রধান সেনাপতির পদ তুলে দেওয়া হলো, নতুন ধাঁচে সাজানো হলো প্রতিরক্ষা বাহিনী।

কড়া শাসনে রেখে দিলেন দেশকে বছর কয়েক। ভারতবর্ষের সঙ্গে সিমলা চুক্তি করে তিনি মিটিয়ে নিলেন জঙ্গীশাহীর অপকর্মের জের। হারানো জমি ফিরে পেলেন, ঘরে ফিরে এলো ভারতবর্ষে আটক সেনা-সামন্ত। ওদিকে চীনের সঙ্গেও তাঁর মাখামাখি আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও। বাংলাদেশকে কমনওয়েলথে ঠাঁই দেওয়াতে তিনি রেগে বেরিয়ে এলেন কমনওয়েলথ থেকে, কিন্তু বিলিতী সরকারের সঙ্গে তাঁর কোনও দিনই কাড়াকাড়ি হয়নি, তাঁরা দিব্যি তাঁকে মদত দিয়েছেন। বাংলাদেশের সঙ্গে তিনি আপস করেছিলেন মুজিব বেঁচে থাকতে থাকতেই, ঢাকায় পাড়িও দিয়েছিলেন চুয়াত্তরে জুনে। সোভিয়েট দেশের সঙ্গেও তিনি সম্পর্কটা অনেকটা সহজ ও স্বাভাবিক করে তুলতে পেরেছিলেন। তিনি যে একজন ধুরন্ধর কূটনীতিক তাতে ভুল নেই। তাঁর মতো একই সঙ্গে সাপের আর ব্যাঙের মুখে চুমু দিতে হলে আর কেউ পেরেছেন বলে মনে হয় না। এ ব্যাপারে তিনি যাকে বলে বেনজির। চীনের সঙ্গে তাঁর দহরম মহরম, তবুও কিন্তু আমেরিকার সঙ্গে দোস্তিতে ভাটা পড়েনি। কম্যুনিজম রোখবার মতলবে যে সেন্টো আর সিয়াটো জোট গড়ে তুলেছিল আমেরিকা ভুট্টো দিব্যি তাদের শামিল হয়েছিলেন। সামরিক জোট দুটো তিনি ছাড়েনও নি আবার তাদের ঠুকতেও কসুর করেননি দরকার বুঝলে। ঘরে বাইরে তিনি নিজেকে প্রগতিশীল বলে জাহির করেছেন সব সময়ই। দেশে হরেক রকম সংস্কারের প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন, কিছু কিছু কাজেও করেছিলেন। জমির মালিকানার সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। পালটানো হয়েছিল শিক্ষার কাঠামো, বড় বড় শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করার কাজও খানিকটা এগিয়েছিল। বিদেশ থেকে সাহায্যও পেয়েছিলেন। অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছেন, প্রচুর টাকাকড়িও। গোঁড়ামি রোখবার ইচ্ছেও তাঁর ছিল। এ ব্যাপারে বরঞ্চ বিরোধীদের অনেকের চেয়ে তিনি ছিলেন উদার। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্মের জিগীর না তুললে গদি রাখা দায়। মনে মনে যাই থাক না কেন মুজিবের মতো ধর্মনিরপেক্ষতার জয়গান তিনি গাইতে পারেননি। আদর্শবাদী হলে ক্ষমতা রাখা যায় না একথা ভুট্টো বিলক্ষণ জানেন আর মানেন।

নরমে গরমে দেশকে তিনিই ভালোই চালাচ্ছেন এই বিশ্বাস হয়েছিল বলেই তিনি নির্বাচনের বাদ্যি বাজিয়েছিলেন এ বছরের জানুয়ারির সাত তারিখে। ভুট্টো জাতীয় পরিষদে একদিন ঘোষণা করলেন দেশে নির্বাচন হবে ৭ মার্চ কেন্দ্রে আর তিন দিন বাদে প্রদেশে প্রদেশে। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে নির্বাচনে তিনি হেসেখেলে জিতে যাবেন—বিরোধীরা পাত্তাই পাবে না। সে ধারণা হবার কারণ যে ছিল না তা নয়। [illegible] তো তাঁর সঙ্গে এক আসনে বসার যুগ্যি কোনও [illegible] দেশে নেই তার ওপর দলও তো একটাই—তাঁর [illegible] পিপলস পার্টি। অন্য দলগুলোর নামই [illegible] কিছুই নেই, তাদের নামকরা [illegible] কেবল ভুট্টো কেন অনেকেই [illegible] পাকিস্তানে নির্বাচনী একটা এলেবেলে [illegible] না যেতেই সবাই [illegible] তা বোধ হয় [illegible] দেখবেন • আর [illegible] [illegible] আওয়ামী লড়তো [illegible] কিন্তু নটা দল [illegible] একজোট হয়ে লড়বে বলে কোমর বেঁধে রুখে দাঁড়ালো। তারা ১১ জানুয়ারি পাকিস্তান ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অর্থাৎ পাকিস্তান জাতীয় জোট নাম দিয়ে জোট বদ্ধ হয়ে গেলেন। নটা দল হচ্ছে এরা [illegible] তাহরিক-ই-ইস্তেকলাল, ন্যাশনাল পাকিস্তান মুসলিম লীগ, পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অর্থাৎ পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল, মুসলিম কনফারেন্স, জামাত ই ইসলামী, জমিয়ত-ই-উলেমা-ই-পাকিস্তান। জমিয়ত-ই-উলেমা-ই-ইসলাম এর নেতা মৌলানা মুফতি মামুদই বিরোধী মোর্চার সভাপতি। আর খাকসার। এই পাঁচমিশেলী দলে দক্ষিণপন্থী আছে আবার বামপন্থীরাও আছে, সেকেলে গোঁড়াও আছে আবার একেলে উদারও আছে। তেলে জলে মিলবে না ভেবে যাঁরা গোড়ায় মুখ বেঁকিয়েছিলেন তাঁদের চোখ কপালে উঠলো মোর্চার জমায়েতে লোকের ভিড়ের বহর দেখে। রাজনীতির ঘাঘু ভাষ্যকাররা বললেন—ভুট্টো জিতবেন বটে, তবে বিরোধীরা কিছু কম যাবে না। কিন্তু নির্বাচনের ফল বেরুলে তাঁরা আবার একটু বাঁকা হাসি হাসলেন। দেখা গেল জাতীয় পরিষদের মোট ২০০ আসনের মধ্যে পাকিস্তানী পিপলস পার্টি পেয়েছে ১৫৫টা, আর বিরোধী মোর্চা কুল্লে ৩৬। এ ছাড়া কায়ুম মুসলিম জিতেছে একটা আর নির্দলরা আটটা। ভুট্টো তো খুশিতে ডগমগ।

কিন্তু তাঁর আর তাঁর দোস্তদের হাসি মিলিয়ে গেল বার ঘণ্টা কাটতে না কাটতে। বিরোধীরা তাজ্জব বনে গেলেও ঘরে বসে মাথার চুলও ছিঁড়লে না; রাস্তায় নেমে বুকও চাপড়ালে না। তারা নির্বাচনী রায় মানতে সরাসরি অস্বীকার করলে, বললে—নির্বাচনে দারুণ কারচুপি হয়েছে বলেই এমন কাণ্ড ঘটেছে, নইলে তারা না জিতলেও অনেক বেশী আসন পেতো। ভুট্টো গোড়ায় বিরোধীদের দাবি অসার বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেশে যা ঘটতে লাগলো তা দেখে তাঁর ভির্মি যাবার জো হলো। বিরোধীরা দেশের লোককে অনুরোধ করেছিল ১০ মার্চের প্রাদেশিক নির্বাচনে ভোট না দিতে। তাদের সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করেনি লোকে। খুব কম ভোট পড়েছিল প্রাদেশিক নির্বাচনে। ফাঁকা মাঠে দিব্যি গোল দিলে ভুট্টোর দল কিন্তু তারপর শুরু হলো দারুণ গণ্ডগোল—কেবল মিছিল-জমায়েত নয়, প্রচণ্ড হাঙ্গামা, কোথাও কোথাও রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধ। মিষ্টি কথায় কোনো কাজ হলো না, হুমকিতেও নয়, গোটা পাকিস্তান ফেটে পড়লো বিক্ষোভে। নিরুপায় হয়ে ভুট্টো সামরিক আইন জারি করলেন তিনটে বড় শহরে—লাহোর, করাচি আর হায়দ্রাবাদে। বেপরোয়া গুলি ছুঁড়তে লাগলো পুলিস আর ফৌজ। তাতে অন্তত ৩৫০ জন লোক মারা গেল। ফাটকে পুরলেন বিরোধী নেতাদের সরকার। কিন্তু তাতেও হাঙ্গামা মিটলো না। সারা দেশে চলতে লাগলো ধুন্ধুমার কাণ্ড। তা দেখে পাকিস্তানের বন্ধু আরব দেশগুলোও ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। তারা মিটমাটের জন্যে এগিয়ে এলো মধ্যস্থতা করতে। ভুট্টোকে বাঁচাবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন সাউদী আরব, কুয়ায়েত, ইউনাইটেড আরব এমিরেট আর প্যালেস্টাইন মুক্তি ফৌজের প্রতিনিধিরা। এদিকে ফৌজের মধ্যেও উসখুসুনি শুরু হলো। অনেকেই প্রশ্ন তুললে ভুট্টোকে বাঁচাতে আমরা কেন আমাদের ভাই বেরাদারদের ওপর হামলা করবো? কেন নিরস্ত্র নিরীহ লোককে সঙীন দিয়ে খুঁচিয়ে জখম কিংবা গুলি মেরে খতম করবো? প্রমাদ গণলেন ভুট্টো। ফৌজ বেঁকে বসলে তো তাঁর ভরাডুবি হবে আর দেশে তার নজির তো ঢের আছে। আরও এক বিপত্তি দেখা দিলে আদালতের রায়ে। লাহোর হাইকোর্ট রায় দিলেন মার্শাল ল জারী বেআইনী। কাজেই জঙ্গী আইনে যে হাজার তিনেক লোককে আটক রাখা হয়েছিল তাদের ছেড়ে দিতে হলো। বিপদের উপর বিপদ নির্বাচনী কমিশনের রায়। মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার বিচারপতি সাজ্জাদ জান বিস্তর কেন্দ্রে হেরে যাওয়া বিরোধী প্রার্থীদের আপত্তি মঞ্জুর করে সেগুলোতে নির্বাচন বাতিল করে দিলেন। নির্বাচন রদ করার একটা মামলাও খারিজ হয়ে যায়নি। বোঝা গেল ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়—বিরোধীরা যে নালিশ করেছে গোটা নির্বাচনটাই ঝুটো তা ঠিক।

ভুট্টোকে জান আর গদি বাঁচাতে পথে আসতে হলো। বিরোধী নেতাদের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা শুরু করলেন নেহাত দায়ে পড়ে। তিনি নির্বাচনে ফিরতি নির্বাচন করতে রাজী হলেন ৭ অক্টোবর। ওর মানেই হচ্ছে নির্বাচনে কারচুপি যে হয়েছে তা কবুল করা। তবে তিনি ভাঙেন তো মচকান না। আলাপ আলোচনা চলতে চলতেই তিনি এক খেপ মেরে এলেন পশ্চিম এশিয়ায় যেন কিছুই হয়নি দেশে। তাঁর ধারণা ছিল যত দিন যাবে ততই বিরোধীরা অস্থির হয়ে উঠবে, শেষে তারাই চটেমটে আলাপ আলোচনা ভেঙে দেবে। তিনি নির্বাচন আবার করবেন বটে, কিন্তু ভাঙা হাটে বিরোধীরা সুবিধে করে উঠতে পারবে না। তাঁর এ ফন্দি [illegible] না। বিরোধী নেতাদের মধ্যে কিছু [illegible] মতান্তর যে হয়নি তা নয়, কিন্তু তাঁদের জোটে ফাটল ধরেনি। তাঁরা শর্ত দিয়েছিলেন কেবল নির্বাচন করলেই হবে না, তা তদারকির ভার দিতে হবে ফৌজ আর বিচারকদের হাতে। ভুট্টো সরে দাঁড়াবেন আর সরকার চালাবে একটা কমিটী যাতে থাকবে শাসক দল আর বিরোধী পক্ষ দু তরফেরই লোক। ভুট্টো সরতে রাজী কিন্তু ক্ষমতা খোয়াতে নয়। তিনি যখন বিরোধীদের ল্যাজে খেলাচ্ছিলেন তখনই বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো—সেনাবাহিনীর প্রধান জিয়া উল হক আচম্বিতে ভুট্টো আর বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার করে হয়ে দাঁড়ালেন পাকিস্তানের ভাগ্যবিধাতা। এখন পাকিস্তান শাসন করছেন তিনি আর তিন প্রতিরক্ষা বাহিনীর চাঁই—সেনানী কমিটীর প্রধান জেনারেল মহম্মদ শরিফ, বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল জুলফিকার আলি খাঁ আর নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল শরীফ।

পাকিস্তানী সংবিধান জিয়া উল হক বাতিল করে দেননি। চৌধুরী ফজল ইলাহি এখনও রাষ্ট্রপতি। তবে সব মন্ত্রিসভা, গভর্নর, আইনসভা বাতিল। প্রদেশে হাল ধরেছেন চার হাইকোর্টের চার প্রধান বিচারপতি। জিয়া উল হকের কৈফিয়ত রাজনীতিকদের কাণ্ড দেখে তিনি বিরক্ত হয়েই তিনি ক্ষমতা হাতে নিয়েছেন তবে মোটে ৯০ দিনের জন্যে। অক্টোবরে যেমন ঠিক হয়েছিল নির্বাচন তেমনই হবে। তার আগে নেতারা খালাস পাবেন। আপাতত রাজনীতিকদের মুখে চাবি দিয়ে থাকতে হচ্ছে তবে নির্বাচনের আগে তাঁদের সবাইকেই মুখ খুলতে দেওয়া হবে। সেটা কবে তা অবিশ্যি তিনি বলেন নি। লোকে ভুট্টোর ওপর এতই চটেছে যে, তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়াতে কেউ চোখের জল ফেলেনি কিংবা তাঁর হয়ে দুটো কথাও বলেনি। ভুট্টো তাঁর গোঁয়ার্তুমির জন্যে এখন পস্তাচ্ছেন। যে সাপকে তিনি হাঁড়িতে পুরেছিলেন বলে নিশ্চিন্ত ছিলেন সেই যে তাঁকে ছোবল মারবে এ তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। আটজনকে ডিঙিয়ে টঙে উঠেছিলেন জেনারেল জিয়া উল হক তাঁরই অনুগ্রহে। একেই বলে বরাতের ফের। তবে খাল কেটে কুমির ডেকে এনেছেন ভুট্টো নিজেই। তিনি কিংবা তাঁর সাকরেদরা একটু সমঝে চললে মার্চের নির্বাচনে তিনি তরে যেতেও পারতেন। কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন সব তিনি একাই খাবেন, কাউকে ভাগ দেবেন না আর বিপত্তি ঘটলো তাই। এখন কথা উঠেছে জিয়া উল হক তাঁর সঙ্গে ষড় করেই এ কাজটা করেছেন। সে কথা সাফ অস্বীকার করেছেন জিয়া। সি আই এ তাঁর হাতে তামাক খেয়েছে এ অপবাদের প্রতিবাদও তিনি করেছেন। তাঁর রকম সকম দেখে মনে হয় তাঁর টানটা বুঝি বিরোধীদের দিকেই। তাদের গোঁড়ামিতে তাঁর সায় আছে। তবে তিনি বিরোধীদের হাতে গদি সঁপে দিয়ে ছুটি নেবেন এও মনে হচ্ছে না। গদি দখল করতে গেলে বিরোধীদের লড়াই করে জিততে হবে। তার জন্যে অবিশ্যি তারা তৈরি। ভুট্টো এখন প্যাঁচে পড়েছেন। তাঁর আগের রবরবা নেই, ক্ষমতাও গেছে। চালাকি করে কাজ উদ্ধার করতে তিনি আর পারবেন না। তাঁকে কষি বেঁধে লড়তে হবে। তবে লাখ কথার এক কথা হচ্ছে জিয়া উল হক কী তাঁর কথা রাখবেন? সত্যিই কী তিনি গণতন্ত্রের পূজারী? তা যদি হয় তা হলে পৃথিবীর ইতিহাসে একটা নতুন জিনিস করার গৌরব হবে তাঁর। যে দেশে সাধারণ মানুষের গণতন্ত্রের ওপর ভক্তি নেই সে দেশে গণতন্ত্রকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে ■

দুটি কবিতা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সাদা-কালো ১

"চোদ্দ টাকায় মাছ বেচছ? আর তাই আমাকে
খেতে হবে? অ্যাঁ?
আমি কি একজন ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ার?"
ক্রুদ্ধ ভদ্রলোক পাশের স্টলে গিয়ে দাঁড়ালেন,
যেখানে
সাড়ে বারো টাকা কেজিতে মাছ বিক্রি হচ্ছিল।

রুইমাছের ধড়মুণ্ডু আলাদা করে দিয়ে
ব্যাপারী খুব সুন্দর করে হাসল।
"বুঝলেন, স্যার,
সাদা-বাজার এখন কালো-বাজারের ঠিক
দেড় টাকা পিছনে এসে
দাঁড়িয়েছে।"

সাদা-কালো ২

সাদা ও কালোতে গড়া মূর্তিখানি জাগিয়েছে ধাঁধা।
বাধা
ডিঙিয়ে দুরন্ত দুই জলস্রোত ছোটে
গায়ে গা ঠেকিয়ে, মত্ত। বিস্ফারিত ওষ্ঠে তার ফোটে
বিক্ষোভের, যন্ত্রণার, আনন্দের ভাষা।
ভালবাসা
মানুষেরও সম্ভবত এইরকম।
সর্বাঙ্গে জখম
সংঘাতের। তবু পাশাপাশি
থাকে তারা, আঁকে কালো রক্তের ভিতরে সাদা হাসি।

কৃষ্ণ কুম মনুসী শক্তিশালী শিল্পী তা বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না। ফিগার আঁকায় সিদ্ধহস্ত, কিন্তু সেটা তাঁর ছাত্রাবস্থার কথা। বর্তমানে কৃষ্ণ কুম মনুসীর ছবি থেকে ফিগার সরে গিয়ে আছে শুধু রঙ। অসাধারণ রঙ! কৃষ্ণ কুমের ক্রিয়া-কৌশল বলা যায় ফরাসী তাশিজম-এর অনুরূপ। অজান্তে ঘটে যাওয়া আদৌ নয়, প্রত্যেকটি রচনাই কল্পনাপ্রসূত। এ কল্পনা শিল্পী উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন [illegible]

নদী

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

ব্রীজের ওপর দিয়ে যেতে যেতে দেখেছিলাম সেই নদী।
শান্ত, উদাসীন,
যে জানে তার কাজ শুধু বয়ে যাওয়া সমুদ্রের দিকে।
আমরা কেবলই ঘুরে বেড়াই, দাঁড়িয়ে থাকি চুপচাপ,
আর যখন হাঁটি
যে যাই ভাবুক, আমরা জানি আমরা উদাসীন নই। কিংবা,
আমাদের সেই গদ্যকার বন্ধুটির কথা ভাবুন,
যে চারদিকে থুতু ছেটায়,
যেন তার মন নেই কিছুতেই; তারপর সবার অলক্ষ্যে নিজেই তা
পরিষ্কার করে।
সেও একদিন বসেছিলো নদীর কাছে।
কিন্তু সারাক্ষণ যা ভেবেছে সে
তা ঈর্ষার কথা।
সে নদীর কথা ভাবেনি কখনো।
নদীর কথা ভুলে গিয়েছিলাম আমরাও,
চলছিলো সবকিছু ঠিকঠাক। একদিন দেখলাম তোমার
চোখের গর্ত দিয়ে
বেরিয়ে এসেছে সেই নদী,
মাঝখানে সেই ব্রীজ, আর ফুলে ফেঁপে সেই জল ছুটে এলো
আমার চোখের দিকে।
এবার যে দিন কবিতা লিখতে বসবো,
আর তুমি নক্‌শা তুলতে বসবে
সাদা কাপড়ের ওপর,
আমরা নদী ফুটিয়ে তুলবো তার মধ্যে।

নিষ্কৃতি

ঈশ্বর ত্রিপাঠী

বাতাসের সঙ্গে আমার স্বভাবের ভয়ংকর অমিল
পাখির বা পোকার সঙ্গেও
কারণ ওরা পরাগসংযোগ ঘটিয়েই সন্তুষ্ট
ফুল ফলে পরিণতি পাক বা না পাক।

আমি তোমাকে তেমন খিন্ন অনিশ্চয়তায় ছেড়ে দিতে পারি না
আমার কর্তব্যবোধ আছে
সারা মাঠময় ফুটবল হাঁকড়ে বেড়ালে আমার চলবে না
গোলপোস্টের বেড়া পার করানোর ঝুঁকি
আমাকেই বইতে হবে;

একেবারে সাদামাটা আমি এই সারসত্য বুঝি
তোমাকে পরিণতি দিতে না পারলে আমার নিষ্কৃতি নেই।

কণ্টকল্পিত
অতুল্য ঘোষ

॥ ১ ॥

১৯৪৭এর ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হল। তার কিছু আগেই অবশ্য 'ছায়া' মন্ত্রিসভা হয়েছিল। 'লীগ ও কংগ্রেস'। দুজন মুখ্যমন্ত্রী। সব লেখাপড়া, নিয়মকানুন শেষ হবার পর লীগের মন্ত্রীরা চলে যাবেন ঢাকায় ও কংগ্রেসী মন্ত্রীরা বসবেন কলকাতার মহাকরণে, পশ্চিমবঙ্গে। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী। ১৫ই আগস্টের আগেই ঝড় উঠল। তরুণ তফসিলী-ভুক্ত মন্ত্রী শ্রীরাধানাথ দাসকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিতে হবে। ডঃ ঘোষের নির্দেশে খুব গোলমাল আরম্ভ হয়ে গেল। এবং তারপর যে তিনি মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে সরে যেতে বাধ্য হলেন এবং ডাঃ রায় এলেন, এইখানেই তার সূত্রপাত। প্রতিবাদে অনেকে মুখর হয়ে উঠলেন। শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি, শ্রীমোহিনী বর্মন, শ্রীকমলকৃষ্ণ রায়, শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, শ্রীরাধানাথ দাস এবং আরও কেউ কেউ সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ-পত্র লিখে ফেললেন। ঘন ঘন বৈঠক, কিছুতেই আর সমস্যার সমাধান হয় না। দেশভাগজনিত একটা দুঃখ ও অবসাদ আছে, তার উপর আবার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার স্মৃতিও বেশ প্রকট হয়ে আছে, গান্ধীজী নোয়াখালি ঘুরেছেন, কলকাতায় যেখানে ছিলেন, সে বাড়িও আক্রান্ত হয়েছে—এসব মিলিয়ে রাজনীতি বেশ ভারাক্রান্ত। আর তার উপর যদি এতজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেন, তা হলে ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা-উৎসব পর্যবসিত হবে নৈরাশ্য ও হতাশায়।

নানারকম আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক করেও যখন সমাধানের সূত্র পাওয়া গেল না তখন কংগ্রেস সভাপতিকে আনাই সাব্যস্ত হল। আচার্য কৃপালনী তখন কংগ্রেস সভাপতি। আচার্য কৃপালনী এলেন, অনেকের সঙ্গে কথা-বার্তাও বললেন। কিন্তু জট বিশেষ খুলল না। আচার্য কৃপালনী প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে ডেকে বললেন, 'আপনাকে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে হবে।' প্রফুল্লচন্দ্র পরিষ্কার উত্তর দিলেন, 'না। আমার দ্বারা সম্ভব নয়।' আচার্য কৃপালনী বললেন 'আমি কংগ্রেস-সভাপতি। আমি নির্দেশ দিচ্ছি আপনাকে হতে হবে।' প্রফুল্লচন্দ্র সেন উত্তর দিলেন, 'আমি আপনার সব কথা শুনতে প্রস্তুত। যে কাজ দেবেন, করব। কিন্তু মন্ত্রী হতে পারব না।' ঘুরে-ফিরে সেই অচল অবস্থা। একজন অখ্যাতনামা কর্মী অনেক ঘোরাঘুরি করে সমস্যা সমাধানের একটা সাময়িক সূত্র বার করলেন। ১৫ই আগস্টটা কেটে যাক, তারপর ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে ভেবে-চিন্তে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ প্রতিপালিত হবে। সাময়িক বিরতি। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে কলকাতায় ১৫ই আগস্ট কংগ্রেস সভাপতির জন্য কোনো জনসভার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। অথচ উনি জনসভা করবেনই। অনেক ভেবে-চিন্তে ওঁকে নিয়ে যাওয়া হল শ্রীরামপুরে। শ্রীরামপুর কাছেই, কিন্তু যাত্রাটা খুব উপভোগ্য হয়েছিল। গাড়ির পেছনের আসনে উনি এবং আর দুটি মেয়ে—দুজনেই বি এ পাস। আর সামনের সীটে আমার সঙ্গে বন্ধুবর এ বি চ্যাটার্জি, আই সি এস। মেয়ে দুটি আচার্য কৃপালনীকে রাস্তাঘাট ভাল করে বোঝাল। টালা ব্রীজ দিয়ে যেতে যেতে বোঝাল, ওটি Tolly's নালার উপরের সেতু। বালী ব্রীজকে হাওড়া ব্রীজ বলে চালিয়ে দিল। আর উনি তাদের সঙ্গে গল্পে মশগুল। দেখে একবারও মনে হবে না যে, কিছুক্ষণ আগেও পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা নিয়ে ওঁর উদ্বেগের অন্ত ছিল না।
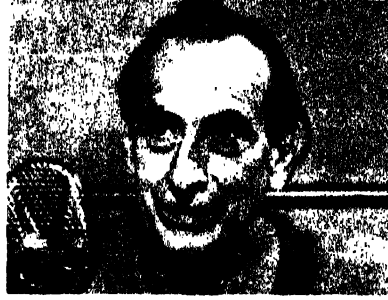
রবীন্দ্রসঙ্গীতের দু-একটি কলিও পেছন থেকে শুনতে পাওয়া গেল। উনি অবশ্য গান গাইছিলেন না, মনে হল যেন একটু গুনগুন করছেন।

শ্রীরামপুর থেকে যখন আমরা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি পৌঁছলুম, তখন রাত সাড়ে আটটা। খাওয়া-দাওয়া, গল্প-গুজব করতে সাড়ে ন'টা বাজল। কৃপালনী তাঁর ঘরে চলে গেলেন। আরও মিনিট দশেক বাদে আমি বাড়ি ফিরে আসব, এমন সময় বসার ঘরে কৃপালনী এসে হাজির হলেন। আমি নমস্কার করে চলে আসার উপক্রম করতেই উনি হাত নেড়ে নিষেধ করলেন। আমার তখন মানসিক অবস্থা বিশেষ ভাল না। সারা দিন উদ্বেগের মধ্যে কেটেছে। মনটা বেশ অবসন্ন। কৃপালনী মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রফুল্ল, তোমার বাড়িতে কি বাড়তি রেডিও আছে?' ডঃ ঘোষ চটপট উত্তর দিলেন, 'না।' সঙ্গে সঙ্গে কৃপালনী আমার দিকে তর্জনী প্রসারিত করে জিজ্ঞেস করলেন 'তোমার সঙ্গে কি গাড়ি আছে?' দুজনের কথাবার্তায় একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলুম, আত্মস্থ হয়ে বললুম 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' এমন সময় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সব কাজের তত্ত্বাবধায়ক নৃপেনদা (ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ বোস) এসে হাজির হলেন। কৃপালনী তখন ঘর থেকে চাদর বার করে এগিয়ে পড়েছেন। নৃপেনদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার কি?' মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিলেন, 'একটা বাড়তি রেডিও নেই বলে দাদা অতুল্যকে নিয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছেন।' কৃপালনী বললেন, 'প্রফুল্ল জানে না, ক্ষমতা হস্তান্তরের ঠিক আগে সুচেতা বন্দেমাতরম গাইবে।' এ কথা বলে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। আমি ভয়ে ভয়ে পিছু নিলুম। নৃপেনদা এসে একটা গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়ালেন। উনি সেদিকে তাকালেনও না। খুব বিরক্ত, খুব ক্ষুব্ধ। কারণ ছিল দুটো। রেডিও থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনা পরিবেশন করা হবে, আর তার সঙ্গে সুচেতার গান। আমি নিউ আলিপুরে ওঁর এক আত্মীয়ের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলুম।

এই প্রসঙ্গে ওঁদের বিয়ের কথা মনে পড়ছে। অসহযোগ আন্দোলনে কৃপালনী অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে জেলে গেলেন। কয়েক বছর বাদে এ আই সি সি-র সম্পাদক। ১৪ বছর সম্পাদক ছিলেন। আর ১৪ বছরই সাদিক আলি (বর্তমানে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল) পার্মানেন্ট সেক্রেটারী। তখন মতিলাল এলাহাবাদে তাঁর বিরাট প্রাসাদ 'স্বরাজ ভবন' কংগ্রেসকে দান করেছেন। সেখানেই অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির কার্যালয়। স্বাধীনতার সময়-সময়েই দিল্লীতে কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়েছিল। কৃপালনী বাস করতেন এলাহাবাদে। সুচেতা পড়াতেন বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে। কোনাকুনি গেলে গঙ্গার এপার-ওপার। সুচেতাও তখন পুরো কংগ্রেসী। বাঙালীর মেয়ে, কিন্তু সবটাই কেটেছে বাংলার বাইরে। পরিবারের অনেকেই কৃতী। উনি সেসব ছেড়ে কংগ্রেসের পথই বেছে নিয়েছেন। দেখাসাক্ষাৎ দুজনের হত বিভিন্ন সভা-সমিতিতে। বয়সের পার্থক্য মোটে বাইশ বছরের। ক্রমশ সুচেতার এ আই সি সি-র অফিসে আসা-যাওয়া বেড়ে গেল। মাঝে মাঝে দাদাকে দু-এক পদ রেঁধেও খাওয়াতেন। সুচেতা কৃপালনীকে 'দাদা' বলতেন, মৃত্যুকাল অবধি 'দাদা'ই বলে গেলেন। এইরকমই চলছিল। কার সাধ্য কিছু বলে। কৃপালনীর জিভের তীক্ষ্ণতা অনেক সময় রাজাজীকেও হার মানাত। এমন সময় জওহরলাল জেল থেকে বেরোলেন। সব দেখে-শুনে কৃপালনীকে একদিন বললেন 'হুঁ' (Yes)। ব্যস, আর কোনও কথা নয়। জওহরলাল আর কৃপালনী, দুজনে তখন খুবই ঘনিষ্ঠ। দু দিন বাদেই জওহরলাল কৃপালনীকে বললেন, 'এবার বিয়ে করে ফেল।' কৃপালনী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেওয়ায় খুব দক্ষ। কিন্তু উনিও কিছুক্ষণের জন্য চুপ। খানিক বাদেই সুচেতারও ডাক পড়ল। সেখানে আর বিয়ে করার অনুরোধ নয়, জওহরলাল বললেন, 'আমি বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলেছি।' অগত্যা। অবশ্য দুজনেই খুব ইচ্ছুক ছিলেন। তবে জওহরলাল মাঝখানে না পড়লে হয়তো হয়েই উঠত না। কৃপালনী ও সুচেতাকে নানা-ভাবে, নানা অবস্থায় দেখেছি। ১৯৭৫এর শেষের দিকে কৃপালনীর হল নিউমোনিয়া। সেবার সবটা দায়িত্বই সুচেতার উপর। অনেক রাগারাগিতে একটা নার্সের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলুম। কিন্তু শরীর তখন আয়ত্তের বাইরে। এর আগে সুচেতার দুবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। আর কৃপালনীর অসুখের সময় উপরি-উপরি রাত জাগার জন্য মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। তারপর হাসপাতাল। দাদা হলেন সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়। সুচেতা ছেড়ে চলে গেলেন।

আরও বেশী
কোকোর পুষ্টি

আরও বেশী
কোকোর স্বাদ

নতুন
বোর্নভিটা অধিক কোকোসহ!

অন্য যে-কোনো মল্ট-যুক্ত খাদ্য-পানীয়ের চেয়ে বোর্নভিটায় সবসময়েই কোকো বেশী ছিল। এখন বোর্নভিটায় আরও বেশী কোকো থাকায় বোর্নভিটা আরও অনেক বেশী পুষ্টিকর ও সুস্বাদু হয়ে উঠেছে।

বোর্নভিটার কোকো রক্ত গড়ে-তোলার উপকরণে সমৃদ্ধ। এছাড়াও এতে আছে ভিটামিন বি এবং ডি আর ক্যালশিয়াম, ফসফোরাস, সোডিয়াম ও পটাশিয়ামের মত খনিজ পদার্থ। শুধু তাই নয় বোর্নভিটা মল্ট, দুধ আর চিনির সমন্বয়ে পুষ্টিগুণে অনন্য।

আপনার ছেলেদের বোর্নভিটা রোজ খাওয়ান, দিনে দু'বার করে। তাদের বাড়ন্ত বয়সে সুস্বাস্থ্যের যে-সব পুষ্টিগুণ দরকার—বোর্নভিটা সে-সব যোগাতে সাহায্য করে। আর বোর্নভিটা আপনারও দরকার। ওদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে।

বোর্নভিটা

আরও বেশী কোকোর পুষ্টি
আরও বেশী কোকোর স্বাদ

OBM-6714 BEN.

রবীন্দ্রনাথের বর্ষাকাব্য ও শান্তিনিকেতনের বর্ষামঙ্গলকাব্য

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শান্তিনিকেতনের বর্ষা এবং রবীন্দ্রকাব্যের বর্ষা—দু-এ মিলে বর্ষামঙ্গল উৎসব, বর্ষামঙ্গল কাব্যও বলতে পারেন। আর এই তিনে মিলে যে জিনিসের সৃষ্টি হয়েছে তাকে বলব এ যুগের যথার্থ 'মঙ্গলকাব্য'। একে একে তিনের কথাই বলব। আগে শান্তিনিকেতন; আপনারা বলবেন তারও আগে বর্ষা। ঠিক কথা, বর্ষা সেই আদিকালের সৃষ্টি। সৃষ্টির আদিতে যেমন আলোকবর্ষণ তেমনি বারিবর্ষণও নিশ্চিত হয়েছিল। তাহলেও মনে রাখতে হবে যে প্রকৃতির দান যতক্ষণ না মানুষের ভোগে আসছে ততক্ষণ তার অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। প্রকৃতিদেবীর দানের হাত দরাজ কিন্তু জানেন যে মানুষ হাত পেতে নিলে তবেই তা সার্থক নইলে সে দান বৃথা। প্রকৃতিদেবী যেমন উদার তেমনি আবার বিনয়ী। মানুষকে বলে রেখেছেন—যা কিছু মোর দান, কেবল গ্রহণ করেই করবে মূল্যবান। অবশ্য মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণী এবং বৃক্ষ লতা উদ্ভিদেরও বারিপাতের প্রয়োজন আছে; কিন্তু সে প্রয়োজন শুধু প্রাণধারণের জন্যে, তার বেশি কিছু তারা জানে না। অর্থাৎ জিনিসটার মূল্য যদি বা বোঝে, জিনিসটা যে অমূল্য সে কথা বোঝে না। এরা প্রকৃতিকে দেখেছে দয়াময়ী মায়াময়ী হিসাবে; মানুষ সেটুকু দেখেই ক্ষান্ত হয়নি, আরেকটু বেশি দেখেছে। তাকে দেখেছে মায়াবিনী মোহিনী মূর্তিতে। আসল কথা প্রকৃতি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; মানুষের হাত লাগলে, মন লাগলে তবে তার যথার্থ রূপটি ফুটে ওঠে। বর্ষা বলুন, শরৎ বলুন, বসন্ত বলুন—প্রকৃতির যা কিছু সৌন্দর্য তা প্রকৃতপক্ষে মানুষের সৃষ্টি। নারীর সৌন্দর্য সম্বন্ধে কবি যে কথা বলেছেন—পুরুষ গড়েছে তোমায় সৌন্দর্য সঞ্চারি—প্রকৃতির সৌন্দর্য সম্বন্ধেও সে কথাই বলা চলে। প্রকৃতি শুধু বিধাতার সৃষ্টি নয়—মানুষ গড়েছে তারে সৌন্দর্য সঞ্চারি।

একদা শান্তিনিকেতন ছিল একান্তে একাকী—জনহীন এক প্রান্তর। আমরা যাকে বলি নিসর্গ তাকে প্রায়ই দেখি নিঃসঙ্গ। সঙ্গী সাথী নেই বলে তার নিজস্ব একটা স্বভাব ঠিক গড়ে ওঠে না। মানুষের সঙ্গ পেলে তার স্বভাবের সঙ্গে মিলিয়ে প্রকৃতিরও একটা স্ব-ভাব গড়ে ওঠে। শান্তিনিকেতনে তাই হয়েছে। বর্ষা তো ছিল সেই কবে থেকেই কিন্তু কাঁকর বালির রাজ্যে সবুজের ছোপ ছিল না এতটুকু। মানুষ এল তবে তো শান্তিনিকেতন সবুজ হল। সেই যে কবি বলেছেন, মানুষের চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে, এও তেমনি। প্রকৃতি দেবীই বরং কার্পণ্য করেছিলেন। মানুষ সেটুকু পূরণ করেছে, সে তাকে দিয়েছে উজাড় করে, মানুষের যত্নেই সে গড়ে উঠেছে।

এ সূত্রে শান্তিনিকেতনের আদি কথাটুকু সংক্ষেপে বলে নিতে হয়। আজ থেকে শতবর্ষেরও আগে শান্তিনিকেতনের যখন জন্ম হয়েছিল তখন ওর মনে কেমন যেন একটু সংসার-বিমুখ ভাব ছিল। শহর বন্দর ছেড়ে, লোকালয় ছেড়ে জনহীন প্রান্তরে এসে আবাস নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা সংসারী মনের লক্ষণ নয়। অথচ যিনি এসে বাসা বেঁধেছিলেন তিনি সংসার-বিরাগী মানুষ ছিলেন না। মহর্ষি সংসারকে কখনো অস্বীকার করেন নি। তাহলেও 'সংসার যবে মন কেড়ে লয়' তখন ক্লান্ত মন হাঁপ ছাড়বার জন্যে একটু অবকাশভূমির সন্ধান করে। শান্তিকামী ক্লান্ত মনের অবকাশ যাপনের স্থান হিসাবে শান্তিনিকেতনের জন্ম। মহর্ষি নিজে এসেছেন, শান্তি পেয়েছেন, আনন্দ পেয়েছেন। বন্ধুজনদের আহ্বান করে বলেছিলেন, এখানকার দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরে মনটাকে একবার ছুটি দিতে পারলে এর উদার আকাশ এবং মুক্ত বায়ু থেকে দেহ মনের অনেকখানি পুষ্টি আহরণ করা যায়। মহর্ষির আহ্বানে বন্ধুজনরা অনেকে এসেছিলেন বয়সে সকলেই প্রবীণ। অর্থাৎ শান্তিনিকেতনের জীবন শুরু হয়েছিল প্রবীণের আবাসস্থল হিসাবে।

শান্তিনিকেতনের জীবনে এই এক মস্ত বড় কৌতুক—জন্মমুহূর্তেই সে অতি গুরুগম্ভীর প্রকৃতির। শৈশবেও মুখে অস্পষ্ট আধবুলি শোনা যায় নি, ধরেই পাকা কথা। বয়স বেড়েছে, তখনও সাধ আহ্লাদের কথা মুখে আনেনি, সাধনার কথা বলেছে। কৌতুকটা এই, মানুষের জীবনে যা ঘটে না ওর জীবনে তাই ঘটেছে। ও শৈশবে ছিল প্রবীণ আর বয়স বেড়ে ক্রমে হয়েছে নবীন।

জীবনের প্রায় চল্লিশ বছর অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধদের নিয়েই ওর দিন কেটেছে। শিশু বা ছেলেছোকরার মুখ বড় একটা দেখেনি। দেখে থাকলেও ওর প্রথম জীবনের ইতিহাসে তার কোন ছাপ নেই। শুধু এইটুকু আমাদের জানা আছে, একবার একটি ছেলে এখানে এসে ক'দিন ছিল তার পিতার সঙ্গে। শান্তিনিকেতন আর সেই ছেলেটি বলতে গেলে এক বয়সী। বয়স্কদের সঙ্গে থেকে থেকে শান্তিনিকেতনের স্বভাবটা হয়েছিল একটু ভারিক্কি গোছের। ওখানে ছেলেমানুষরা যদি থাকত তাহলে সেও ছেলেমানুষী করতে শিখত। ঐ ছেলেটি যে ক'দিন ছিল দুটিতে দিব্যি ভাব জমে গিয়েছিল। পরে দেখা হয়েছে কচিৎকদাচিৎ কিন্তু প্রথম সাক্ষাতের সখ্যে একেবারে ছেদ পড়ে নি। সেই সখ্যই পরে কাব্যে পরিণত হয়েছে।

সেই বালক বড় হয়ে মান্যগণ্য মানুষ হয়েছেন। বয়স যখন চল্লিশ তখন তিনি এসে ঘর বাঁধলেন সেই যেখানে একদিন বালক বয়সে নুড়ি দিয়ে খেলাঘর তৈরি করেছেন। গুটি কয়েক ছেলে নিয়ে এক ইস্কুল খুলে বসলেন। এও এক খেলা—শেখার খেলা, জীবনকে জানার, চেনার খেলা। সে খেলায় ছেলেদের প্রধান সাথী ছিল এখানকার আকাশ, এখানকার মাঠ, গাছপালা, ফুল ফল। আকাশ এবং প্রান্তর যেমন দিগন্ত বিস্তৃত, গাছপালা ফুল ফল তেমন অপর্যাপ্ত ছিল না। মানুষজন যদি থাকে তবে তো মাঠ সবুজ হবে, গাছে ফুল ফুটবে, ফল ফলবে। বৃক্ষহীন রুক্ষ প্রান্তরে মহর্ষি গুটি কতক গাছ লাগিয়েছিলেন, সবুজ ঘাসের আস্তরণ সামান্য একটু জায়গা জুড়ে। শান্তিনিকেতন বাড়িটি ঘিরে স্বল্পপরিসর স্থানটুকু একটি মরুদ্যান হিসাবে বিরাজ করছিল। ছাত্র মাস্টার মিলে লোকসংখ্যা যেমন বাড়ল তেমনি গাছপালার সংখ্যাও। ফুলে ফলে শান্তিনিকেতনের অঙ্গশোভাও বাড়তে লাগল। বলা বাহুল্য, এক দিনে হয়নি, কয়েক বছর লেগেছে। তাহলেও যেদিন—'মোদের তরুমূলের মেলা, মোদের খোলা মাঠের খেলা'—কিশোর কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল সেদিন বেশ বোঝা গেল মেলা বসেছে, খেলা জমেছে।

যে কথাটা একটু আগেই বলেছি, এতদিনে শান্তিনিকেতনের প্রৌঢ়ত্ব কেটে গিয়ে কৈশোর এল। আশ্রম প্রাঙ্গণ কিশোর কণ্ঠের কলধ্বনিতে মুখরিত হল। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় আর অন্য সব বিদ্যালয়ে একটা মূলগত পার্থক্য আছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদ্যালয়টা আগে হয়েছে, বিদ্যার্থীরা পরে এসে জুটেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে জোটালেন গুটি কয়েক ছাত্র; তাদের বললেন, এসো আমরা একটা ইস্কুল তৈরি করি। শুরু হল ইস্কুল গড়ার খেলা। ছাত্র মাস্টার হাত মিলিয়ে ইস্কুল গড়ার কাজে লাগলেন। খেলা আর কাজে ভেদ ছিল না। মাস্টার যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও এলেন খেলার সাথী হয়ে।

আজকালের ইস্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচভূতের কারখানা। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ে পাঁচভূতের দৌরাত্ম্য ছিল না, কিন্তু পঞ্চভূতের—ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোমের প্রচুর সমাদর ছিল। মরুৎ ব্যোম তেজের জন্যে ভাবতে হয় নি, তিনেরই দাক্ষিণ্য অপর্যাপ্ত। ভাবনা ছিল ক্ষিতি আর অপ্-এর জন্যে। মাটি গিয়েছিল ক্ষয়ে, নীচে থেকে কাঁকর পাথরের হাড় বেরিয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ ছেলেদের নিয়ে সেই মরচে-পড়া মাটির পরিচর্যা করেছেন। জলের অভাব, তাতে মাটির দুর্দশা তো বটেই, মানুষের আরো। যেখানে মাথার উপরে প্রখর তপন তাপ, পায়ের নীচে দগ্ধ মৃত্তিকা সেখানে জলের সমাদর যতখানি তেমন আর কিছুর নয়। আশেপাশের গাঁয়ের চাষীরা যেমন উদগ্রীব হয়ে থাকত কবে বর্ষা নামবে, শান্তিনিকেতনের অধিবাসীদেরও সেই দশা। কুয়ো শুকিয়ে গেলে স্নানের জল রেশান করা হত, পানীয় জলের অভাব ঘটত। গাঁয়ের লোকেরা দেবতাকে তুষ্ট করবার জন্যে পুজো মানত করত। ছেলেমানুষরা পুজো-আচ্চা বোঝে না কিন্তু আনন্দ করতে জানে। বর্ষার প্রথম বর্ষণের ধারায় ভিজে ভিজে তপ্ত দেহ শীতল করত। বৃষ্টিতে ছুটোছুটি করত, গান করত। সে গান যে সব সময়ে বর্ষার গান হত এমন নয়। ছেলেদের বৃষ্টিতে ভেজার আনন্দ, ঝমঝম বৃষ্টির সঙ্গে তাদের উদ্দাম সংগীত কবিকে উৎফুল্ল করত। ছেলেদের এই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের মধ্যে তিনি আপন মনের প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছিলেন। শিলাইদহের পদ্মাতীরে বসে বৎসরের পর বৎসর তিনি বর্ষার মেঘাড়ম্বর এবং সেই সঙ্গে পদ্মার উদ্দাম নৃত্য দেখেছেন। সেই নৃত্যের দোল লেগেছে তাঁর কত কবিতার ছন্দে। শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে চলে আসবার ঠিক এক বৎসর আগে এক বর্ষার দিনে শিলাইদহে বসে লিখেছিলেন—'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে, ময়ূরের মতো নাচে রে।' ঐ একই দিনে লেখা অপর এক বিখ্যাত কবিতা—'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে।'

বর্ষার কবি তিনি এরও ঢের আগে থেকে। বর্ষার ঝমঝমানিতে কবিমাত্রেরই মনে সুরের গুনগুনানি শুরু হয়ে যায়। 'নবীন মেঘের সুর লেগেছে আমার মনে' —এ গান লিখেছেন বহুদিন পরে কিন্তু সুরটা লেগেছে বলতে গেলে তাঁর কবি জীবনের শুরু থেকেই—সেই যখন কড়ি ও কোমল এর কবিতায় লিখেছিলেন, 'কোন্ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে কে গাহিল গান—বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।' বোধ করি নিজ শৈশবে শোনা ঘুমপাড়ানি গানের সুরটা মনে তাঁর গেঁথে গিয়েছিল। কড়ি ও কোমল এর আগে নিতান্ত বালক বয়সে বিদ্যাপতির ব্রজবুলি মন ভুলিয়েছিল। তখনই লিখেছিলেন—'শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা/ নিশীথ যামিনীরে।' লিখেছিলেন—'বাদর বরখন, নীরদ গরজন, বিজুলি চমকন ঘোর'। বলা নিষ্প্রয়োজন এ সব বৈষ্ণব পদাবলী নয়, নিতান্ত রবীন্দ্র পদাবলী। ব্রজবুলির অনুকরণ, তাও বুলিটাই প্রধান, ব্রজ (ধাম) যৎসামান্য। মানসীর—'এমন দিনে তারে বলা যায়/এমন ঘনঘোর বরিষায়'—মনের মানুষকে মুখোমুখি পাবার ব্যাকুলতা —বর্ষাকাব্যের খাঁটি সুরটি এখানেই প্রথম প্রকাশ পেয়েছে। সোনার তরীর প্রথম কবিতাতেই বর্ষার প্রবেশ—'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা'। এভাবেই চলেছে। রবীন্দ্রকাব্যে বর্ষা একটি যেন গানের ধুয়া—কেবলি ফিরে ফিরে এসেছে। শুধু কাব্যে নয়, বর্ষা তাঁর সমস্ত সাহিত্য জুড়ে। ছিন্নপত্রে বর্ষার বর্ণনা যেমন প্রচুর, গল্পগুচ্ছের গল্পেও তেমনি। কোন কোন গল্পের পটভূমি বর্ষা, কোথাও বর্ষা নিজেই গল্পের একটি চরিত্র।

একে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ তাতে কৃষি-নির্ভর। এ দেশে বর্ষার বিশেষ একটা আবেদন আছে। বর্ষা আশ্বাসের বার্তা নিয়ে আসে। বরষার সঙ্গে যে ভরসা কথাটার মিল, কৃষিপ্রধান দেশে সেটা একটা মস্ত বড় সাংসারিক সত্য। সাংসারিক দিকটা বাদ দিলেও মানুষের মনের উপরেও এর ক্রিয়া কিছু কম নয়। গ্রীষ্মের দাবদাহে মন মেজাজে যে রুক্ষতা দেখা দিয়েছিল বর্ষার বারিসিঞ্চনে তা কোমল হয়ে এল। ধরণী শীতল হল, মানুষের মন দ্রব হল। সকলের মনকেই অল্পবিস্তর গলিয়ে দেয়, বিশেষ করে কবির মনকে। বর্ষাকে বলা চলে কবিসোহাগিনী। তাঁদের কাছে মেঘ আসে দূত হয়ে কাব্যের বার্তা নিয়ে। আমাদের যাঁরা শ্রেষ্ঠ কবি তাঁরা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে মেঘদূত রচয়িতা। রবীন্দ্রনাথ এটিকে একটি মূল্যবান উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছিলেন। কালিদাসের আষাঢ়স্য প্রথম দিবস আমাদের সাহিত্যে অক্ষয় হয়ে আছে। জয়দেবের কাব্যেও বর্ষার

বিশেষ একটি স্থান, বৈষ্ণব কাব্যে তো বটেই। রবীন্দ্রনাথ এ'দের সকলের কাছেই ঋণী।

'বহু যুগের ওপার হতে আষাঢ় এল আমার মনে'—বলা বাহুল্য, এ আষাঢ় কালিদাসের আষাঢ়। কিন্তু আমি তো বলব কালিদাসের আগেও বর্ষা ছিল এবং বর্ষা ছিল বলেই কবিও ছিল। বর্ষার সঙ্গে কবি এবং কাব্যের অচ্ছেদ্য যোগ। বর্ষার বৃষ্টিধারা যেমন কাব্যধারাও তেমনি কোনদিনই ক্লান্ত হয়নি। পূর্বসূরীদের থেকে কালিদাসে, কালিদাস থেকে জয়দেবে, জয়দেব থেকে বৈষ্ণব কাব্যে, বৈষ্ণব কাব্য থেকে রবীন্দ্রকাব্যে অবিরাম ধারায় চলে এসেছে এবং চলতে থাকবে। কালিদাস যেমন আজ নেই, তেমনি রবীন্দ্রনাথও নেই, কিন্তু আষাঢ় আছে, আষাঢ়ের বর্ষণও আছে এবং বহু যুগ পরেও থাকবে। 'সেদিন এমনি মেঘের ঘটা রেবা নদীর তীরে' —রবীন্দ্রনাথের মন চলে গিয়েছিল কালিদাসের যুগে; আমি কবি নই, আমার মন অত দূরে গিয়ে পৌছয় না। এই শান্তিনিকেতনের বর্ষণসিক্ত আষাঢ় সন্ধ্যায় বসে আমি ভাবছি আজও তেমনি বর্ষার ঘটা লেগেছে শান্তিনিকেতনের শাল-বীথিতে, আম্রকুঞ্জে, মাঠ ছাপিয়ে, খোয়াইয়ের ঢাল বেয়ে যেমনটি দেখে কবি লিখেছিলেন—

> 'শালের বনে থেকে থেকে ঝড় দোলা দেয় হে'কে হে'কে
> জল ছুটে যায় এ'কে বে'কে মাঠের 'পরে।
> আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে নৃত্য কে করে॥'

শুধু স্থান কালের পরিবর্তন নইলে আষাঢ়ের স্বভাবের কোন পরিবর্তন নেই। এমন কি মালবিকারাও আছেন, সকল যুগেই থাকবেন। ঝর ঝর বরিষণে সেই চাহনি ভেসে আসবে কালো মেঘের ছায়ার সনে। ভাবীকালের পাঠকের কাছে কালিদাসের আষাঢ়ের সঙ্গে মিশে যাবে রবীন্দ্রনাথের আষাঢ়। কাব্যের সমৃদ্ধি এবং কাব্যপাঠের আনন্দ এমনিভাবেই বাড়তে থাকে। আকাশে আষাঢ়ের ঘনঘটার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শত যুগের শত কবির কণ্ঠ শুনতে পেয়েছিলেন—

> শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
> ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
> শতেক যুগের গীতিকা।

এ যুগের মানুষ আমরা—বসন্তকে নিয়ে মাতামাতি করি। মাতামাতি করাটা কিছু অস্বাভাবিক নয়; বসন্তের মধ্যে মাদকতা আছে, মনকে মাতিয়ে দেয়। কিন্তু বর্ষার মধ্যে কি নেই? তারও মাদকতা আছে, মাতলামির প্রশ্রয় আছে। 'বৃষ্টি-নেশা-ভরা সন্ধ্যাবেলা/কোন্ বলরামের আমি চেলা'—ঐ বলরাম নামটির মধ্যেই প্রশ্রয়ের ইঙ্গিতটি আছে। তা হোক, তবু বলব মাদকতাটাই বর্ষার সব চাইতে বড় কথা নয়। বর্ষার স্বভাবে সব চাইতে বড় জিনিস হল তার আকুলতা, ব্যাকুলতা —কী যে বেদনা—আবার নিছক বেদনাও নয়, বেদনার সঙ্গে একটু যেন আনন্দের রেশ মিশে আছে। ঘন বর্ষণে দূরের ঐ ঝাপসা গাছপালার ফাঁকে কোন্ দূর অতীতের আভাস আবছাভাবে দেখা দেয়, হয়তো শৈশবের কোন অস্পষ্ট স্মৃতি, কিংবা কে জানে হয়তো এ জন্মেরই নয়, পূর্বজন্মের কোন স্মৃতি মেঘলোক থেকে নেমে এসেছে। 'কোন্ দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে' কোন অভাবিত আশা, কখনো আশংকা মনকে উন্মনা করে দেয়। মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথা-বৃত্তিচেতঃ/কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনী জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে। মেঘাচ্ছন্ন দিনে সুখী ব্যক্তিরও মন উতলা হয়ে ওঠে, প্রিয়া যদি কণ্ঠলগ্না হয়েও থাকেন তাহলেও মনে হয় যথেষ্ট কাছে নয়, দূরে থাকলে তো কথাই নেই। সকল কবির কাব্যে এই বর্ষাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

বসন্তকে আমরা ঋতুরাজ আখ্যা দিয়েছি। এটা এ যুগের দেওয়া নাম না কি প্রাচীনেরাই তাকে এ আখ্যা দিয়েছিলেন, আমি জানি না। ফুলে ফলে রঙে রসে স্বাদে গন্ধে বসন্ত মনকে পুলকিত করে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। কিন্তু কদম্ব কেশরে, মালতী যূথী পরিমলে, ঘন বরিষণে, জলকলকলে বর্ণে গন্ধে রসে বর্ষাও কিছু কম নয়। বরং সমস্তটা মিলিয়ে বলব, বসন্তের চাইতে বর্ষার সমারোহ ঢের বেশি। সে আসে রাজ সমারোহে, সহস্র মেঘের সেনাদল নিয়ে মরুবিজয়ের কেতন উড়িয়ে, আসে ভৈরব হরষে—চোখে তার বিদ্যুৎ চাহনি, গলায় তার বজ্রমানিকের মালা। কাব্যকথা না হয় ছেড়েই দিলাম। শিক্ষা বিষয়ক একটি প্রবন্ধে তিনি বর্ষাগমের যে চিত্র এ'কেছেন তাতেও বর্ষার সেই রাজসিক মূর্তিটি ফুটে উঠেছে। বলেছেন—নববর্ষা প্রথম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্রের মতো তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ নিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দ গর্জনে চির প্রত্যাশী বনভূমির উপরে আসন্ন বর্ষণের ছায়া ঘনাইয়া তুলিয়াছে। (সকল ঋতুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে কথাটি বলেছিলেন। বলেছেন—তরুলতার শাখাপল্লবিত নাট্য-শালায় ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানা রস, বিচিত্র গীতি নাট্যাভিনয় তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও।)

যা হোক, শুধু রাজসিক মূর্তির কথা বললেও সবটুকু বলা হয় না। এমন স্নিগ্ধ শান্ত প্রাণজুড়ানো ভাবও আর কোন ঋতুর মধ্যে নেই। রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় বর্ষার আবাহন করেছেন তাতে তার ঐ করুণাঘন স্নিগ্ধ কান্তিটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন—

> নমো নমো, করুণাঘন নম হে।
> নয়ন স্নিগ্ধ অমৃতাঞ্জন পরশে,
> জীবন পূর্ণ সুধারস বরষে,
> তব দর্শন-ধন-সার্থক মন হে,
> অকৃপণ বর্ষণ করুণাঘন হে॥

তাঁর নিবেদন করতে গিয়ে তিনি প্রায় অনুরূপ ভাষায় অনুরূপ ভঙ্গিতে বলেছেন:

> শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
> করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

অপর এক কবিতায় বলেছেন—

> অমৃতবারি সিঞ্চন কর
> নিখিল ভুবনময়।

থাক্ বর্ষার কথা তো অনেক হল, যে বর্ষা সর্বকালের সর্বজনের। সে বর্ষার গুণকীর্তন করে মন ভরে না। ভালোবাসার জনকে হাটের মাঝখানে দেখে মন ওঠে না, তাকে ঘরে এনে, নিজের গণ্ডীর মধ্যে নিভৃতে এনে দেখতে হয়। সত্যি বলতে কি, বলতে বসেছি শান্তিনিকেতনের বর্ষার কথা। শান্তিনিকেতনের বর্ষা—শুনে কেউ হাসতেও পারেন। শান্তিনিকেতনের বর্ষাটা কি আলাদা, না কি বর্ষাটা শান্তিনিকেতনের একলার সম্পত্তি? অবশ্যই নয়, তবে এটাও সেই বৈষ্ণব কাব্যের পিরিতির লক্ষণ। ইংরেজ কবি যখন বলেন—under an English sky তখন আমারও হাসি পেত। শূন্য ব্যোম অপরিমাণ, তাকেও টুকরো করে কেটে নিয়ে সেখানে ইংলণ্ডের একচেটিয়া অধিকার দাবি করা হচ্ছে। পরে বুঝেছি এ খুব খাঁটি কথা। ভালোবাসার ভাষা তো, একটু একপেশে হবেই।

বর্ষাকে এই শান্তিনিকেতনে এসেই আবিষ্কার করলাম। পূর্ববঙ্গের মানুষ, ছেলেবেলা কেটেছে গ্রামে। সেখানকার বর্ষার ব্যবহারে একটু আতিশয্য আছে, অতিরিক্ত গায়ে পড়া ভাব। ছাড়তে চাইলেও ছাড়ানো যায় না। জোর করে ছাড়াতে

বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান

গেলে আছাড় খেতে হয়। পথ ঘাট জলে কাদায় একাকার। বর্ষা বলতে আমরা যে সদ্যস্নাত একটি পরিচ্ছন্ন মূর্তির কথা ভাবি সে রকমের মোটেই নয়। (আজকের কলকাতার অধিবাসীরা খুব সহজেই তা অনুমান করতে পারবেন, কারণ বর্ষার কলকাতায় সাহেব পাড়াও আজ পাড়াগাঁ।) যা হোক সবটা মিলিয়ে দেশের বর্ষার সঙ্গে খুব একটা ভাব জমাতে পারিনি। অবশ্য স্বীকার করতেই হবে এসবই শিক্ষার ত্রুটি। পুঁথি-পড়া মন, ভাল করে চোখ মেলে দেখতে শিখিনি। গ্রীষ্মের বর্ষার রুদ্র মূর্তিটাই দেখেছি, তার তপঃক্লিষ্ট মূর্তি দেখতে পাইনি। বর্ষার ক্লেদাক্ত মূর্তিই দেখেছি স্নিগ্ধ মূর্তি দেখি নি। হাড়-কাঁপানো শীতকেই জেনেছি, তার পাতা ঝরানো বৈরাগ্য সাধনার কথা কখনো মনেও আসেনি। একমাত্র শরৎকালকেই চাক্ষুষ দেখেছি বলতে পারি। বালক বয়সে পূর্ববঙ্গের গ্রামে শরতের যে সোনার রোদ্দুর দেখেছি পরে তেমনটি আর কোথাও দেখিনি। বর্ষার আতিশয্য কেটে গিয়ে টনটনে টসটসে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যবতী হাস্যময়ী রূপসীর মূর্তিতে এসে দেখা দিত। বোধ করি উৎসবের বেশে আসত বলে ওর জন্যে মনটা আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকত। বসন্তকে অতিমাত্রায় শৌখিন আর পোশাকী মনে হত বলেই বোধ হয় ওকে তেমন আপনার জন বলে ভাবতে পারিনি। পাতলা ফিনফিনে পরিচ্ছদে ফুলবাবুটি সেজে গোঁফে আতর মেখে নাক উঁচিয়ে একটু হাম-বড়া ভাব দেখাত বলে ওর সঙ্গে ভাব করবার তেমন চেষ্টাও করিনি। ভাবতাম, তুমি বড়লোক মানুষ, তোমার মোসাহেবদের নিয়ে তুমি থাক, আমাকে না হলেও তোমার চলে যাবে।

কিন্তু যাই বলি না কেন, কতকটা স্বভাবদোষেই আমি প্রকৃতির প্রতি উদাসীন। গুটি কয়েক ছাড়া ফুল ফল চিনিনে, গাছপালা চিনিনে, পাখি চিনিনে। এ বিষয়ে চার্লস ল্যাম-এর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা। ল্যাম-এর জন্ম লণ্ডনে, সারা জীবন কাটিয়েছেন লণ্ডন শহরে। পল্লী প্রকৃতির সঙ্গে কোনকালেই পরিচয় হয় নি। তাঁর লেখায় কোথাও প্রকৃতির বর্ণনা নেই। বলেছেন, আমার স্বভাবই ঐ। লণ্ডনে না হয়ে আমার জন্ম যদি leafy Devonshire অর্থাৎ পত্রপুষ্পশোভিত ডিভনশায়ারে হত তাহলেও আমি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে অন্ধই থাকতাম। খুব আশ্চর্যের কথা যে, প্রকৃতি-প্রেমী ওয়ার্ডসওয়ার্থের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েও এ বিষয়ে তাঁর মতির কোন পরিবর্তন হয়নি, যেমন আমার হয়নি পল্লীবাসী বালক হয়েও।

শুধু বর্ষা নয়, শান্তিনিকেতনে এসে এই প্রথম সব ঋতুর সঙ্গে নতুন করে আলাপ পরিচয় হল। ছেলেবেলায় শরৎকে যেমন চাক্ষুষ দেখেছিলাম, আর সব ঋতুর ... পরিচয় ঘটিয়ে দিল। চোখে পড়তে বাধা, ছোট

আপনার বাচ্চার কোমল সুখানুভূতি অক্ষুণ্ণ রাখবেন কি ক'রে

আপনার বাচ্চা তো আর যে-কোনো বাচ্চার মত নয়,—তাই ওর এমন এক পাউডারও দরকার যা যে-কোনো পাউডারের মত নয়—জনসন্স বেবী পাউডার। [illegible]

...সে জনসন্স বেবী পাউডার—এটি বিশেষভাবে বিশুদ্ধ, আরামদায়ক আর মোলায়েম ক'রেই তৈরী। আপনি জনসন্স বেবী পাউডারের দৌলতে আরও অনেক আস্থার কবল থেকেও রেহাই পাবেন। এতে বাচ্চাও থাকবে পরম আনন্দে।

বলতে গেলে, আপনার স্পর্শই আপনার বাচ্চার কাছে—সেটা দুনিয়া!

জাগিয়ে দেবার সময়—আপনার বাচ্চাকে কোমল, মোলায়েম আর শুখনো রাখতে, স্নানের পর ওকে বেশ ঝরঝরে ও আরামে রাখতে—জনসন্স বেবী পাউডার ব্যবহার করুন। এর পরশ আপনার স্নেহের মতই। আপনি কাছে না থাকলেও, বাচ্চা মনে করবে আপনি কাছেই আছেন।

বিনাপয়সায় শিশুর যত্ন সম্পর্কিত (বেবী কেয়ার) পুস্তিকা কেবল ইংরেজী ভাষায় পাওয়া যায়।
আমাদের শিশুর যত্ন সম্পর্কিত পুস্তিকা (বেবী কেয়ার) বিনাপয়সায় পেতে হ'লে এই ঠিকানায় চিঠি দিন: কনজিউমার ইনফরমেশন সেন্টার, জনসন এণ্ড জনসন লিঃ, ৩০, ফোরজেট স্ট্রীট, বোম্বাই ৪০০ ০৩৬

জনসন্স* বেবী পাউডার শীতল...শুখনো...আরামদায়ক

*Trade Mark © J&J 77

লিনটাস-J&J.9-2315 BG

জায়গা—গাছপালা, ফুলে ফলে এমনভাবে সাজানো, দেখলে মনে হয় শান্তিনিকেতন একটি যেন ঋতুরঙ্গশালা। 'ঋতুর দল নাচিয়া চলে/ভরিয়া ডালি ফুলে ও ফলে।' ফুলবাবু বলে বসন্তের নিন্দা করেছি, এখন এইটুকু ছোট জায়গায় এত রঙের বাহার দেখে তাক লেগে গেল। পলাশে শিমুলে শিরীষে কি শোভাই ধরেছে! সন্ধ্যাবেলায় পথে চলতে হঠাৎ চমকে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হত—আঃ এ কিসের গন্ধ? নেবু ফুলের, এটা কিসের? এটা চাঁপা, এটা? এটা মুচকুন্দ। খানিকটা এগিয়ে আবার, এটা কিসের? বনপুলকের। নিতান্তই বুনো ফুল, দেখতেও গেঁয়ো কিন্তু গন্ধে গন্ধরাজকেও হার মানায়। কবি নিজে ঐ অচেনা ফুলটির নাম দিয়েছিলেন—বনপুলক। ক্ষণে ক্ষণে নাম-না-জানা ফুলের গন্ধে আমার মনে যে চমক লেগেছে কবি সে কথাই আবার কবিতায় বলেছেন—'হঠাৎ কখন সন্ধ্যা বেলায় নাম-হারা ফুল গন্ধ এলায়।' রবীন্দ্রনাথের কত কবিতায়, কত গানের সঙ্গে যে শান্তিনিকেতনের নাড়ির যোগ সেটা এখানে এসে বুঝেছি।

ছেলেবেলায় জলে কাদায় যে বর্ষা-ভীতি জন্মেছিল এখানকার বর্ষা দেখে সে ভয়ও কেটে গেল। পাথর কাঁকরের জমিতে সহজে কাদা হয় না। জলও দাঁড়ায় না, পিঠটা উঁচু, জলটা গড়িয়ে খোয়াই-এর দিকে চলে যায়—ইংরেজিতে যাকে বলে duck-back, ঘন বৃষ্টির পরেও ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শুকনো তকতকে। ইদানীং অবস্থাটা বদলেছে। যত্রতত্র বাড়ি উঠে জল নেমে যাবার পথ বন্ধ হয়ে জল জমছে, কাদা হচ্ছে। ব্যাপারটা বোধ করি symbolical—শান্তিনিকেতন ক্রমেই ক্লেদাক্ত হয়ে উঠছে।

ইস্কুলের ক্লাস বসে বাইরে—গাছের তলায়, আগে কলেজেরও তাই বসত। অল্প স্বল্প বৃষ্টি হলে ঘরে, বারান্দায় ক্লাস বসাবার ব্যবস্থা হতে পারে। অঝোরে বৃষ্টি হলে সেটা আর সম্ভব হয় না, এখনও হয় না, আগেও হত না। মাঝে মাঝে ছেলেরা ভিজে ভিজেই বেড়াতে চলে যেত। না হয় তো সিংহসদনে জড় হয়ে গানের আসর বসাত। দিনুবাবু (দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) যখন ছিলেন তখন ক্লাসের ভাঙ্গা হাট তাঁকে ঘিরে জমে উঠত। একের পর এক বর্ষার গান চলতে থাকত। বর্ষা যে ওদের ক্লাস মাটি করে দিয়ে পালাবে তার জো ছিল না। উল্টে ওর কাছ থেকে যতখানি আদায় করবার তাই করে ছাড়ত। অর্থাৎ ক্লাসটাই বন্ধ থাকত, শেখাটা বন্ধ থাকত না। অবশ্য শিক্ষা সম্বন্ধে শান্তিনিকেতনের ধারণাটা ছিল যথেষ্ট unorthodox বই-এর জগতের চাইতে বাইরের জগৎটা অনেক অনেক বেশী বেশী শেখা যায়—হাটে মাঠে ঘাটে, রোদে বিষ্টিতে। আমি নিজে সেটা এখানে এসে তবে বুঝেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিদ্যা লাভ করেছিলাম, দেখলাম ক্লাসের বাইরে সে বিদ্যেটা দুনিয়ার অতি সামান্য কাজেই লাগে। এখন বাইরেটা একটু দেখতে শিখেছি বলে সেই পুরোনো বিদ্যেটাও এক আধটু তবু কাজে লাগাতে পারছি।

বাইরের এই জগৎটা যে বহুরূপী, সে যে ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলায়, রূপ বদলায় আমাদের অভ্যাস-জীর্ণ চোখে তা ধরা পড়ে না। বই-এর পাতায় চোখ নিবদ্ধ থাকে বলে শিক্ষিত লোকদের চোখ সেদিকে বড় একটা যায় না। জীবন এবং জগৎ দু-ই অত্যন্ত colourful-এ দুটির সঙ্গে যোগ না থাকার দরুন পুঁথিগত শিক্ষা যেমন colourless তেমনি lifeless। পুরোনো বই-এর পাতা যেমন হলদে হয়ে brittle হয়ে যায় বই পড়া বিদ্যাও তেমনি জীর্ণ এবং brittle। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা রীতিকে যথেষ্ট বর্ণাঢ্য করবার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতিদেবী হাত বাড়িয়েই আছেন কিন্তু তাঁর দাক্ষিণ্যকে আমরা বরাবর প্রত্যাখ্যান করে এসেছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রকৃতিকেই করেছেন তাঁর প্রধান সহযোগী। এখানে এসে দেখলাম প্রকৃতিদেবী তাঁর ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছেন আর ছাত্র শিক্ষক সেই রসের ভোজে পাতা পেড়ে বসে গিয়েছে। একেকটি করে ঋতু আসে, ছেলেমেয়েরা তাকে সানন্দে স্বাগত জানায়। প্রত্যেকটির জন্যে কবি উৎসবের প্রচুর উপকরণ রেখে গিয়েছেন গানে নাটকে কবিতায়। বর্ষায় শরতে বসন্তে মহোৎসব লেগে যায়। এ সব উৎসব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"শান্তিনিকেতনের অবারিত আকাশ এবং দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তর যথার্থই ঋতুরঙ্গভূমি। এখানে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যে আতিথ্য লাভ করেছে তার ভোজের ক্ষেত্রে নব নব রস পরিবেশন করে ঋতুর দল। আনন্দের ঋণ আমরা শোধ করে থাকি রঙে সুরে নাচে। তাকে বলে উৎসব। বৎসরে বৎসরে এই উৎসবে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের মিলন ঘটে।"

শিক্ষা যেখানে সৃজনশীল সেখানে সে নিজেই নিজের আনন্দ সৃষ্টি করে। একটি বিরাট সৃজনী প্রতিভা সৃষ্টি কার্যে নিযুক্ত, কত আনন্দের উপকরণে তিনি ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছেন ছেলেরা তাই কুড়িয়ে নিয়ে তাদের সাজি ভরিয়েছে—কবিতা আবৃত্তি করেছে, গলা ছেড়ে গান করেছে, নাটক লেখা হলে ছাত্র শিক্ষক মিলে তার অভিনয় হয়েছে। ওদিকে গাছপালা, লতাপাতা, ফুলে ফলে শান্তিনিকেতন যে একটি ঋতু-রঙ্গ মঞ্চ হিসাবে গড়ে উঠছিল ছেলেরা আপনা থেকেই সেখানে উৎসবের আয়োজন করেছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শান্তিনিকেতনের প্রথম ঋতু উৎসবটি ছেলেদের উদ্যোগেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রধান উদ্যোক্তা ছিল কবির কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ, উৎসাহদাতা পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী। ছেলেরা ঋতু অনুযায়ী ফুলের মালা, ফুলের মুকুট পরে বর্ষা, শরৎ এবং বসন্তের সাজে গানে কবিতার ঋতু বন্দনা করেছিল। এটা ১৯০৭ সালের কথা। এর কয়েক মাস পরে ঐ বৎসরেই শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

পুত্রের আয়োজিত উৎসবটির কথা বোধ করি শোকার্ত পিতার মনে ছিল। পরের বছর কবি নিজেই বর্ষা উৎসবের প্রস্তাব করেন। ক্ষিতিমোহন সেন মশায় সবে এসে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিয়েছেন। তাঁর উপরেই ভার দিয়েছিলেন উদ্যোগ আয়োজনের। শাস্ত্রী মশায় এবং ক্ষিতিমোহনবাবু মিলে বেদমন্ত্রাদি বেছে

অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়েছিল। আনুষ্ঠানিক ভাবে বর্ষামঙ্গল উৎসব বলতে এই প্রথম। সে বৎসরেই (১৯০৮) শারদোৎসব নাটকটি লেখা হয় এবং অভিনীত হয়। শারদোৎসব দিয়েই ঋতুচক্রের শুরু বলা যেতে পারে। এর পর থেকে শরৎকালে এ নাটকটি অনেক সময়েই অভিনীত হয়েছে। বসন্তকালে কখনো 'রাজা', কখনো 'ফাল্গুনী'; 'অচলায়তনে' বর্ষা নেমেছে, বর্ষায় কখনো কখনো অচলায়তনের অভিনয় হয়েছে। ষড়ঋতুর সমাবেশ হয়েছে 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালায়'।

সকল ঋতুকেই সুরে ছন্দে স্বাগত জানিয়েছেন, কাউকে নিরাশ করেন নি। শীত গ্রীষ্ম কৃচ্ছ্র সাধনে শীর্ণ, তাদেরও সৌন্দর্য তাঁর চোখ এড়িয়ে যায় নি। মানুষের সংসারে এরা সকলেই কিছু না কিছু উপকরণ যোগায়, সেজন্যে এদের সকলের প্রতি তাঁর সমান মমতা, সমান কৃতজ্ঞতা। তবে বর্ষার প্রতি যে বিশেষ একটু পক্ষপাত ছিল রবীন্দ্র কাব্য-পাঠকদের কাছে তা অজানা নয়। শিলাইদহের পদ্মাতীরে বসে বর্ষার যে রূপ তিনি দেখেছিলেন সে নবজলধারার রূপ কোনদিনই আর ভুলতে পারেন নি। বর্ষার অভ্যর্থনায় যতখানি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন এমন আর কারো বেলায় নয়—"আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা/বাজাও শঙ্খ, হুলুরব কর বধূরা/এসেছে বরষা—" সত্যি বলতে কি, মানুষের মনের উপরে বর্ষার যতখানি প্রভাব এমন আর কোন ঋতুর নয়। বৃষ্টির সুরের সঙ্গে মনের একটা সুরের মিল আছে—"জল ছল ছল সুরে হৃদয় আমার কানায় কানায় পুরে"—এতখানি মিল অন্য ঋতুর সঙ্গে হয়ে ওঠে না। আমরা অ-কবি মানুষরাও সেটা অনুভব

হলকর্ষণ উৎসবে

করি, কবি মানুষদের তো কথাই নেই। বর্ষার মন অভিসারী মন। ঘন বর্ষায় দেহটা থাকে ঘরে বন্দী, মনটা চলে যায় ঘর ছেড়ে দূরে, বহু দূরে—কোন্ দূর দেশে, দূর কালে। এই বর্ষার মনই বলেছে—আমি সুদূরের পিয়াসী। বিরহী যক্ষের মতো বলেছে—"গৃহত্যাগী মন মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন, উড়িয়াছে দেশ দেশান্তরে।" অজানা কাল, অদেখা দেশ, অচেনা মানুষ মনকে টানতে থাকে। বর্ষার মন আর প্রেমিকের মন এক। ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে বলেছিলেন, কবিতা আমার অনেক কালের প্রেয়সী। আমি বলি বর্ষাও তেমনি তাঁর অনেক কালের মানসী।

ঠিক বর্ষামঙ্গল নাম দিয়ে প্রথম বর্ষা উৎসব হল ১৯২১এ—শান্তিনিকেতনে নয়, কলকাতায় জোড়াসাঁকো গৃহে। শান্তিনিকেতনের বাইরে সেই প্রথম রবীন্দ্র সংগীতের প্রকাশ্য জলসা। তখন গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন চলছে, সমস্ত দেশ তোলপাড়। রবীন্দ্রনাথ একে অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে মতবাদ প্রচার করেছেন তার উপরে আবার গানের জলসা জুড়ে দিয়েছেন তাই নিয়ে কলকাতা শহর কবি নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ সে নিন্দায় কিছুমাত্র বিচলিত হন নি। কারণ পরের বছরেই ১৯২২এ (তখনও রাজনৈতিক উত্তেজনা যথেষ্টই ছিল) বর্ষামঙ্গলের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান হল এবং সেও কলকাতায়। এবার জোড়াসাঁকো গৃহে নয়, পাবলিক স্টেজ-এ। টিকিট করে দুদিন অনুষ্ঠান হয়েছিল। যদ্দুর মনে পড়ছে প্রথম দিন ম্যাডান থিয়েটার্স-এ কর্পোরেশন স্ট্রীটে, দ্বিতীয় দিন হ্যারিসন রোডে আলফ্রেড থিয়েটারে। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। তখন দেশে রবীন্দ্র সংগীতের খুব একটা প্রচলন ছিল না। সেই প্রথম রবীন্দ্র সংগীত আকণ্ঠ পান করেছিলাম। অনুষ্ঠান সূচীতে ১৮টি গানের সমাবেশ ছিল। গ্রীষ্ম তাপে জলধারার আবাহন দিয়ে শুরু—এসো, এসো হে, তৃষ্ণার জল; বাদলের বিদায় দিয়ে পালা শেষ—বাদল ধারা হল সারা, বাজে বিদায় সুর। গানের ফাঁকে ফাঁকে কবি তিনটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন—বুলন, বর্ষামঙ্গল এবং নিরুপমা।

এর পর থেকে বলতে গেলে প্রতি বৎসরই শান্তিনিকেতনে বর্ষা উৎসব হয়ে এসেছে যদিচ বর্ষামঙ্গল নামটি তখনও শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসব সূচীর অন্তর্গত হয় নি। কোন কোন বছরে হয়তো প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়নি কিন্তু ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকরাই উদ্যোগী হয়ে বর্ষা গানের জলসা বসিয়েছেন। বর্ষামঙ্গল নামই তখনও পাকা হয়নি, একবার শ্রাবণী নাম দিয়ে বর্ষার জলসা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন ঘন ঘন বিদেশে যেতেন সেজন্যে

এখানে বলা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ কবি ছিলেন কিন্তু নিছক কবিত্ব নিয়ে কোথাও মগ্ন থাকেন নি। কবি হয়েও তিনি কর্মী। সেই যৌবনকালে একদিন লিখেছিলেন—এবার ফিরাও মোরে। পাছে কবিতা-কল্পনা-লতা মনকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রাখে সেজন্যে মনটাকে কল্পনার জগৎ থেকে কর্মের জগতে ফিরিয়ে আনবার কথা সর্বক্ষণই মনে রেখেছেন। সুন্দরের আরাধনা করেছেন আজীবন কিন্তু তাঁর "সুন্দর" একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া মাত্র নয়—কেবল মাত্র ধ্যানের বস্তু নয়, ভোগের বস্তুও বটে। তাঁর কাব্য সাহিত্যের কেন্দ্রে আছে দেশ, সমাজ। ধর্মকে যেমন শাস্ত্র গ্রন্থ থেকে আচার অনুষ্ঠান থেকে পূজো মন্দির থেকে মুক্ত করে এনে তিনি মানুষের মধ্যে খুঁজেছেন, তাঁর কবিত্ব এবং সৌন্দর্য প্রেমকেও তেমনি ললিত কলার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে লৌকিক জীবনের সঙ্গে তাকে যুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সৌন্দর্য সাধনার একটা ব্যবহারিক দিক আছে। তারই ফলে বর্ষা-মঙ্গলের সঙ্গে আপনি এসে যুক্ত হয়েছে বৃক্ষ রোপণ উৎসব। বর্ষা এসেছে তো ধরার বুকে প্রাণ নিয়ে এসেছে, সেই "পুরাতন প্রাণের টানে ছুটেছে মন মাটির পানে"। প্রাণের চর্চা শুরু হয়েছে মাঠে মাঠে লাঙলের মুখে, ধুম লেগেছে পাড়ায় পাড়ায় [illegible] ধান রোপণে। কবি তাঁর কাব্যের সুর মিলিয়েছেন তারই সঙ্গে—

যে বাণী ঐ ধানের ক্ষেতে
আকুল হলো অঙ্কুরেতে,
আজ এই মেঘের শ্যামল মায়ায়
সেই বাণী মোর সুরে আনে।

আমাদের দেশে জলকে বলেছে অন্নদাতা। সে হিসাবে বর্ষাও আমাদের অন্নদাত্রী, সেজন্যে বৃক্ষরোপণ একাই আসে নি, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হলকর্ষণ উৎসব। আমরা বরাবর যাকে বর্ষামঙ্গল উৎসব বলে এসেছি তা একক ভাবে সম্পূর্ণ নয়। অন্তত রবীন্দ্রনাথের কাছে সম্পূর্ণ মনে হয় নি। প্রকৃতপক্ষে বর্ষা উৎসব, বৃক্ষরোপণ এবং হলকর্ষণ—এই তিনে মিলে বর্ষামঙ্গল উৎসব। তিনটিতে মিলে উৎসবটি একটি লৌকিক এবং ব্যবহারিক রূপ পেল। তাতে সৌন্দর্যহানি না হয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। সত্যি বলতে কি, বৃক্ষ রোপণ বোধ করি এখানকার সব চাইতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উৎসব। বীরভূমের বৃক্ষ বিরল, রুক্ষ, ক্ষয়ে যাওয়া মাটিতে বৃক্ষ-রোপণ অত্যাবশ্যক ছিল। অত্যাবশ্যককে কতখানি চিত্তাকর্ষক করা যায় এ উৎসবটি দেখলে তবে বোঝা যাবে।

এককালে রাঢ় অঞ্চলে লৌহচূর্ণ আকরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। সেই লোভে অতি নিষ্ঠুর ভাবে বনচ্ছেদন হয়েছিল, ফলে শ্যামল ধরণীর কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে। খোয়াই বা ক্ষয়ে যাওয়া মাটির বিস্তার রোধ করবার জন্যে অনেক আগে থেকেই এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন এবং ফলও পেয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামবাসীদের মধ্যে তার প্রচার হয় নি। এখন বৃক্ষ রোপণের মধ্য দিয়ে গ্রামে গ্রামে যাতে বনভূমি পত্তনের একটা আন্দোলন শুরু হয় সে উদ্দেশ্যে বৃক্ষরোপণকে একটি স্থায়ী উৎসবের আকার দেবার সংকল্প করলেন। বনভূমির শ্রীবৃদ্ধি হলে তবে বারিপাত বৃদ্ধি পাবে, কৃষি সংকটেরও নিরসন হবে। অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা জানে না যে মেঘ আকাশচারী হলে কি হবে সে ধরাতলে বনাঞ্চলের আঁচলে বাঁধা। যেখানে বন সেখানেই মেঘ-বৃষ্টির আড়ম্বর।

আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম বৃক্ষরোপণ উৎসব ১৯২৮-এর ১৪ জুলাই। পুত্র এবং পুত্রবধূ তখন ইয়ুরোপে। সেদিনই প্রতিমা দেবীকে চিঠিতে লিখছেন—"তোমার টবের বকুল গাছটাকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটা হল। পৃথিবীর কোন গাছের এমন সৌভাগ্য কল্পনা করতে পারে না। সুন্দরী বালিকারা সুপরিচ্ছন্ন হয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে যজ্ঞক্ষেত্রে এল। শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন—আমি একে একে ছটা কবিতা পড়লুম।" এর পাঁচটি কবিতায় ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম—এই পঞ্চভূতের কাছে বৃক্ষ শিশুটির জন্যে স্নেহ করুণা এবং শুভাশিস প্রার্থনা করা হয়েছে। অপর কবিতাটিতে বৃক্ষশিশুর মঙ্গল কামনা করে কবি আপন কণ্ঠে মাঙ্গলিক উচ্চারণ করেছিলেন—

আজি এই আনন্দের দিন
তোমার পল্লব পুঞ্জে পুঞ্জে তব হোক্ মৃত্যুহীন।
রবীন্দ্রের কণ্ঠ হতে এ সঙ্গীত তোমার মঙ্গলে
মিলিল মেঘের মন্দ্রে, মিলিল কদম্ব পরিমলে॥

এর পরদিন ১৫ জুলাই শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণের অনুষ্ঠান হল। কবি স্বয়ং হল চালনা করেছিলেন। প্রথম বছরে অনুষ্ঠানটির নাম হয়েছিল গীতাযজ্ঞ। পরে হলকর্ষণ নামেই পরিচিত হয়েছে। শিল্পী নন্দলাল শ্রীনিকেতনের প্রাচীর গাত্রে ফ্রেস্কো রচনা করে সে দিনের উৎসবটিকে স্মরণীয় করে রেখেছেন। সেবারের উৎসব এই কারণে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় যে সেই থেকে বর্ষার গান, বৃক্ষ বন্দনা এবং হলকর্ষণ মিলে বর্ষামঙ্গল শুধু নান্দনিক নয়, একটি সাংসারিক এবং সামাজিক উৎসবে পরিণত হল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শান্তিনিকেতনে বৃক্ষ রোপণ উৎসব শুরু হওয়ার কুড়ি বাইশ বছর পরে ১৯৫০ সালে ভারত সরকার এটিকে একটি সর্বভারতীয় আন্দোলন হিসাবে গ্রহণ করেন। এখন সারা দেশেই বন মহোৎসব উদ্যাপিত হচ্ছে। আশা করা যায় এর ফলে ভূমিক্ষয়ের নিরোধ হবে এবং দেশের বনসম্পদ বৃদ্ধি পাবে।

কবির মৃত্যুর পর থেকে বৃক্ষরোপণ উৎসবটি প্রতি বৎসর ২২শে শ্রাবণ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ সিদ্ধান্তটি সুচিন্তিত। মৃত্যুদিনে নবজাতকের অভিষেক মহাজীবনের যথাযোগ্য স্মারণিক, এ কথা স্বীকার করতে হবে।

বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও এখানে বলে নিচ্ছি। কবি পুত্রবধূকে লেখা চিঠিটিতে বলেছেন, বালিকারা শাঁখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে যজ্ঞক্ষেত্রে এল। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় যখন যবদ্বীপ ভ্রমণে গিয়ে-সম্ভার হাতে নিয়ে শোভাযাত্রা করে উৎসব ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। এখানে দেখা যাচ্ছে বালিকাদের শোভাযাত্রাটি নৃত্যের ভঙ্গিতে আসে নি, হেঁটে এসেছে। তখন শান্তি-নিকেতনে নাচের প্রচলন হয়েছে, মেয়েরা শিখছেন। কিন্তু এখন বসন্তোৎসব এবং বৃক্ষরোপণে যে নৃত্য সম্বলিত শোভাযাত্রা দেখতে পাই তার প্রচলন তখনো হয়নি। এটি হয়েছে আরো কিছুকাল পরে, বোধ করি তিরিশের দশকের মাঝামাঝিতে কিংবা তার দু এক বছর আগে পরে। এ ব্যাপারে শান্তিদেব ঘোষ খানিকটা কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। প্রস্তাবটা তিনিই গুরুদেবের কাছে পেশ করেছিলেন। হেঁটে না এসে নৃত্যের ভঙ্গিতে এলে শোভাযাত্রার শোভা বৃদ্ধি পাবে। কথাটা কবির মনে ধরেছিল। বলেছিলেন, খুব ভালো কথা, এখন থেকে তাই হবে।

বর্ষামঙ্গলের ইতিহাস লিখতে বসিনি, তাহলেও আরো দু একটি অনুষ্ঠানের উল্লেখ করছি। ১৯৩৫ সালের শ্রাবণ মাসে যখন বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের কথা ভাবা হচ্ছে তখন অকস্মাৎ খবর এল কলকাতায় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়েছে। ছেলেদের গানের ভাণ্ডারী, নাটের কাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ কবির একান্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে কবি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। সেবারের বর্ষা-মঙ্গলের জন্যে যে কটি নতুন গান রচনা করেছিলেন তার কোন কোনটির মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন বেদনার সুর লেগেছে। বিশেষ করে "কী বেদনা মোর জানো সে কি তুমি জানো/ওগো মিতা, মোর অনেক দূরের মিতা" অনেকে মনে করেন এ গানটি একেবারেই দিনেন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে রচিত। এর দু বছর পরে ১৯৩৭ সালে আবার কলকাতায় বর্ষামঙ্গলের অনুষ্ঠান হল। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল "ছায়া" প্রেক্ষাগৃহে। কলকাতার অনুষ্ঠানে টিকিট বিক্রি করে কিছু অর্থাগমের আশা থাকে কিন্তু সেটাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য ছিল শহরবাসী মানুষ যাঁরা ঋতু পর্যায়ের প্রতি সাধারণত উদাসীন তাদের এ জাতীয় উৎসবের সঙ্গে খানিকটা পরিচিত করা। বলেছিলেন—"শহরের মধ্যে ঋতু আসে, কিন্তু তার প্রকাশে বাধা থাকে বিস্তর তাই এখানে উৎসবের সৃষ্টি সহজে হয় না।.........মনে করিয়ে দিতে এসেছি বর্ষা এলো, ভারতবর্ষের কবিদের বর্ষা, যে বর্ষার হৃদয় থেকে মেঘ-দূতের বিরহ গান উৎসারিত হয়ে নিত্যকালকে অভিষিক্ত করেছে।"

শান্তিনিকেতনের ঋতু উৎসব শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা মস্ত বড় স্থান গ্রহণ করে আছে, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু ঐটুকু বললেও সবটুকু বলা হয় না। এ সব উৎসবের প্রয়োজনীয়তা কেবল শিক্ষার্থীদের রুচি মার্জনা এবং সৌন্দর্যবোধের উন্মেষণায় শেষ নয়। কবির মনে এর উদ্দেশ্য ছিল অনেক বেশি ব্যাপক। তাঁর কাব্য সৃষ্টিতে এবং সৌন্দর্যচর্চায় তাঁর সমাজবোধ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সব সময়ই তাঁকে প্রভাবিত করেছে। তিনি লক্ষ করছিলেন যে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত দেশের আনন্দ উৎসবগুলি ক্রমে যেন শুকিয়ে আসছে। যা কিছু আনন্দের উৎস তাকেই বলে উৎসব। গ্রামবাসী জনগণের জীবনে তবু কিছু তার অবশিষ্ট আছে। দোল দুর্গোৎসব ছাড়াও রথযাত্রা, ঝুলন যাত্রা, গাজন চড়ক ইত্যাদি নানা উপলক্ষকে কেন্দ্র করে তাদের আনন্দধারা কিছু তারা বজায় রাখতে পেরেছে। কিন্তু আজকের শহরবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায় সাবেককেলে এসব আনন্দোৎসব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাদের শিক্ষা এবং রুচি নিয়ে তারা ওসবের মধ্যে আর রস বা আনন্দ খুঁজে পাবে না। আমাদের সব উৎসবই বলতে গেলে ধর্মভিত্তিক; এ সব ধর্মীয় উৎসব শিক্ষিত সমাজকে খুব বেশি আর টানতে পারবে না। এ যুগের উপযোগী উৎসবের আয়োজন করতে গেলে তাকে ধর্ম-নিরপেক্ষ এবং অসাম্প্রদায়িক হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত ঋতু উৎসব সে উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলতে হবে। আমাদের পূজো প্রাঙ্গণে অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে ষড় ঋতুর অধিষ্ঠাত্রী প্রকৃতিদেবীকেও তিনি আসন বিছিয়ে দিয়েছেন। শারদীয়া পূজো, বাসন্তী পূজো যেমন হচ্ছে তেমনি হবে বর্ষা উৎসব, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব। দু-এ কোন বিরোধ নেই। দু-এরই উদ্দেশ্য আনন্দ। খুব মজার কথা এই যে মূর্তি বিরোধী অরূপের পূজারী হয়েও রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকটি ঋতুকে সুস্পষ্ট মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পূজামণ্ডপে দশপ্রহরণধারিণী দেবীর মূর্তিকে যেমন লোকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে রবীন্দ্র সংগীতের মধ্যে ষড় ঋতুশোভিনী প্রকৃতিদেবীকেও আমরা তেমনি স্পষ্ট করে দেখতে পাই। সব দেশেই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে মিথলজি বা পুরাণ কাহিনী। পুরাণ কাহিনীর সাহিত্যিক সৌন্দর্য উপভোগ করেন সকলেই কিন্তু আজকের শিক্ষিত ব্যক্তিরা সে সব কাহিনী বর্ণিত ক্রিয়াকাণ্ড নিশ্চয় বিশ্বাস করেন না। রবীন্দ্রনাথ ষড় ঋতুকে কেন্দ্র করে আমাদের জন্যে নতুন মিথলজির সৃষ্টি করেছেন। এ মিথলজির সৌন্দর্য যেমন আমরা উপভোগ করি তেমনি আবার তাকে বিশ্বাসও করি কারণ ষড়ঋতুর ক্রিয়াকাণ্ড যা আমরা চোখ মেললেই দেখতে পাচ্ছি তাকে অবাস্তব বলে কোন মতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

চিত্তধারার শুষ্কতা মানুষের জীবনে মস্ত বড় দৈন্যের সূচনা করে। সমাজকে সে দুর্দৈব থেকে রক্ষা করবার জন্যে সারাজীবন সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন; কাব্য রচনাকে উৎসব রচনায় নিয়োজিত করেছেন। ঋতু উৎসবের মধ্যে যেমন তাঁর সমাজ-বোধের পরিচয়, তেমনি সমস্ত ঋতু সংগীতকে মিলিয়ে দেখলে তাঁর গভীর জীবন বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতির মধ্যে যে লীলাখেলা চলছে জীবনেও তাই। প্রকৃতির ঋতুরূপে রুদ্র এবং শান্ত, ভীষণ এবং মধুর পাশাপাশি অবস্থান করছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে কোথাও একটা বিরোধ বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে তা নয়, আপাত বিরোধ প্রত্যেকটিরই মর্যাদা বাড়িয়ে দিচ্ছে। একটি আছে বলেই অপরটির প্রয়োজন, এক অপরের পরিপূরক। গ্রীষ্মের তাপ বর্ষার ধারায় শীতল হয়ে যাচ্ছে, শীতের দৈন্য বসন্ত এসে পূরণ করে দিচ্ছে। প্রচণ্ড ঝড়ের পরে কী গভীর শান্তি। জীবনের খেলাও এই। সুখে দুঃখে, ত্যাগে ভোগে, অভাবে সাচ্ছল্যে, সৌভাগ্যে দুর্ভাগ্যে, রোগে স্বাস্থ্যে [illegible]

প্রেম নেই

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ ২০ ॥

"ইন্নাহ লিল্লাহে ওয়াইন্নাহ ইলায়হে রাজেউন" আত্মা পরমাত্মা হইতে আসে এবং মৃত্যুর পর রমাত্মার নিকট চলিয়া যায়)। ফকিরের মৃত্যুর বোদ ছেলের মুখে পাওয়ামাত্র সাজ্জাদ দেওয়ালে ঠ ঠেকিয়ে বসে চোখ বুঁজল এবং অভ্যাস বশে ড়বিড় করে "ইন্নাহ লিল্লাহে" আউড়ে গেল। ছুক্ষণ আগেই ঘাম দিয়ে তার জ্বর ছেড়েছে। ন্তু দেহে বা মনে কোথাও যেন একফোঁটা উৎসাহও র অবশিষ্ট নেই। ঘামের পানির সঙ্গেই তা ঝি বেরিয়ে গিয়েছে। তাই কোনো রকম শোক দুঃখ সে অনুভব করল না। সে এখন খুবই ন্ত। একেবারে নিস্তেজ। খেতে ভালবাসত জ্জাদ, খেতে পারতও খুব। সারাদিন তো খায়নি ছু, এখন তো বেলা প্রায় ডোবে-ডোবে, তবুও জ্জাদের খাওয়ার কোনও ইচ্ছেই নেই। তামুক তে তো এত ভালোবাসে সাজ্জাদ, খেতে ইচ্ছেও ছ, কিন্তু তামুকটা যে সেজে নেবে, সে উৎসাহ ই, তার বিবিকে বললেও হয়, মুখ দিয়ে ইচ্ছেটা ধু জানিয়ে দেবার ওয়াস্তা, তাহলেই সে ঢেঁকির ড় বন্ধ করে রেখে এসে তামুকটা সেজে দিয়ে , কিন্তু একটুখানি চেঁচিয়ে যে তার বিবিকে কবে, অতটুকু উৎসাহও আর বোধ করল না জ্জাদ।

কেন, তার ছেলে? সে তো বসে আছে নে। তাকে কেন তামুক সাজতে বলছে না জ্জাদ? কাকে বলবে? নিজেকেই সে পাল্টা প্রশ্ন ল। তার ছেলেকে?··· ফটিককে? সফীকুল াকে! এক লহমায় তার মনে একটা ছবি খেলে । বিদ্যুৎগতিতে পাচন-বাড়ি হাতে তার নেংটি- ছেলে, ফটিক বাপ্, দৌড়ে এসে পিরেন- বন্ধ্ পরা সফীকুল মিঞার শরীরে ঢুকে গেল। কে সে অনায়াসে তামাক সাজার কথা বলতে ত। কিন্তু সফীকুল মিঞাকে কি তা বলা যায়? চাটা মাথায় আসা মাত্রই মাথাটা তার কেমন া হয়ে গেল। সে উচিত-অনুচিত বুঝে উঠতে ল না।

ঢেকুস্ কুস্ সপস সপস সপস

ঢেঁকির আর কুলোর একঘেয়ে একটানা শব্দটা াদের ভিতরে একশ গুন জোরদার হয়ে আছড়ে পড়তে লাগল।

সাজ্জাদের মুখের ভিতরে একটা মরো স্বাদ। জিভটা বের করে সে একবার শুকনো ঠোঁটটা চেটে নিল।

"বাজান!"

ছেলের মুখ থেকে ডাকটা শুনে সাজ্জাদ শ্রান্ত চোখ দুটো মেলে তার দিকে চেয়ে রইল। ফটিক দেখল ওর আব্বু বোবা চোখে ওকে দেখছে। এই চাউনির পিছনে নিষ্ফল পরিশ্রম, বঞ্চনা এবং ক্ষুধা ও ব্যাধির কামড়ের যে সুদীর্ঘ ইতিহাসের পটভূমিটা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই মুহূর্তে তার আবরণটা সরে গিয়ে ফটিকের চোখে তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। তার কেমন মনে হতে লাগল, তার আব্বার, তার আম্মার, তার সংসারের এই দুর্দশার জন্য সে দায়ী।

সকাল দশটা নাগাত সে এবাড়িতে ঢুকেছিল। সেই ঢোকার মুখে তার কানে ঢেকুস্ কুস্ ঢেকুস্ কুস্ ঢেঁকি-পাড়ের অবিশ্রান্ত এই শব্দটা ঢুকেছিল। এখন বিকেল। শব্দটা এখনও থামল না। এখনও তার কানের পর্দায় তা ঘা মেরে চলেছে। এখনও তার আম্মা ঢেঁকিতে পাড় দিয়েই চলেছে দিয়েই চলেছে। সারাদিন সে কিছু খায় নি। তার কারণ, ফটিক জানে, আব্বাজানকে না খাইয়ে তার আম্মা কিছুতেই কিছু খাবে না। হয়ত ভালো- বাসার জন্য, হয়ত ঘরে খাদ্যের পরিমাণ এতই কম আছে যে আব্বাজান তা খেয়ে নিলে তার বাপের জন্য আর থাকবে না কিছুই। তাই এরা সোয়ামী যতক্ষণ না খায়, ততক্ষণ কিছুতেই কিছু খায় না। ফটিক দু-একবার ওর আম্মাকে খেতে বলেছিল। চাঁদবিবির ওই এক কথা: খাবানে বাপ্ খাবানে। তোর বাপরে আগে উঠতি দে। মুখি কিছু দিক আগে। তারপরই সে আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে ঢেঁকিতে পাড় শুরু করেছে। অনর্গল কথা বলছে শুধু ঢেঁকি, ঢেকুস্ কুস্ ঢেকুস্ কুস্ আর নাছিমার কুলো সপস সপস সপস। গোটা ব্যাপার- টার মধ্যে সে-ই শুধু বেমানান। সে কোথাও খাপ খাচ্ছে না।

ফটিক দেখল ওর বাপের শূন্য দৃষ্টি তখনও তার দিকে চেয়ে আছে। ক্ষুধার্ত, রিক্ত, ব্যর্থ ব্যাধির তাড়নায় বিপর্যস্ত কৃষকের চোখে মুখেই শুধু এই ধরনের শূন্য দৃষ্টি ভেসে উঠতে পারে। ওঠে। ফটিক জানে, এই শূন্যতা, বোবা অথচ অর্থবহ এই দৃষ্টি এমন কি তার মুখেও ফোটা সম্ভব নয়। কারণ যে অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ যে মাত্রাছাড়া শারীরিক পরিশ্রম এবং যে পরিমাণ মানসিক অনিশ্চয়তা থেকে এই ধরনের অভিজ্ঞতা জন্ম নেয়, এবং এই ধরনের বোবা অথচ অর্থময় দৃষ্টির জন্ম দেয়, ফটিক জানে সে কোনোদিনই আর সেই অভিজ্ঞতার শরিক হতে পারবে না।

ফটিক বলল, "বাজান, পানি দেবো? খাবেন?"

সাজ্জাদ বলল, "পানি। গলাডা শুকোয়ে গেছে।"

ফটিক কুয়োর থেকে টাটকা পানি তুলে নিয়ে এল। বাপকে খেতে দিল। সাজ্জাদ চকচক করে পানি খেয়ে গলা ভেজাল। একবার ওয়াক তুলল। কিন্তু তারপর সামলে গেল। কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে স্থির হয়ে পড়ে থাকল।

ঢেকুস কুস ঢেকুস কুস সপস সপস সপস

"চাচা আছো নাকি? চাচা?"

ডাক শুনে সাজ্জাদের ঝিমোনোর ভাবটা কেটে গেল। মেন্দাদের পাইক গয়া কৈবত্তর মতো গলা মনে হচ্ছে যেন?

"কিডা? গয়া নাকি?"

"হ্যাঁ গো চাচা আমি।"

"তা আসো, ভিতরে আসো।" সাজ্জাদ ডাক দিল।

গয়া ভিতরে ঢুকে সাজ্জাদকে আদাব জানাল। তারপর ফটিকের মুখের দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকার পর গয়া বলল, "ফটিক না? হাঁ আমাগের ফটিকই তো? তাই কও, বলি মুখখানা চিনা চিনা লাগতিছে, অথচ চিনতি পারতিছি নে। মনে মনে কই, এ মিঞা কিডা হতি পারে? ও ফটিক, চিনতি পারিছ না? আমি গয়া। তুমার রাখাল ছোহ্‌রাব গো। সেই যে তুমি রুস্তম সাজে আমারে চিতপাত ক'রে কাদার মদ্দি ফ্যালায়ে দিতে, তারপর ফকিরির নকল ক'রে সেই যে কত রকম সব ছড়া কাটতে, মনে পড়িছে?"

গয়াকে মনে পড়েছে। ওর পেটে পিলে ছিল বলে অন্যান্য রাখালেরা ওকে "পেট ডগ্যরে পুঙা ম'চ্ছে" বলে খেপাতো। ফটিকের মনে পড়ল। আর গয়া তারস্বরে গাল পাড়তো। কেবল ফটিকের সঙ্গেই তার ভাব ছিল। ফটিক রুস্তম সাজত আর গয়ারাম সাজত ছোহ্‌রাব।

ফটিক "চিনতে পারল, তবে তেমন কোনও আবেগ তার এই বাল্যকালের বন্ধু তার মনে সঞ্চারিত করাতে পারল না।

সে একটু ঠান্ডা ভাবেই বলল, "আদাব আরজ"।

ফটিকের ঠান্ডা অভ্যর্থনা গয়াকে অপ্রস্তুত করে দিল। সে বেকুবের মত কিছুক্ষণ ফটিকের দিকে চেয়ে থাকল, তারপর মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে সাজ্জাদকে বলল, "চাচা, তুমি ঠিকই ধরিছিলে। মেন্দা ছাহেব কিছু খাস জমি বন্দোবস্ত দেবেন। মোট কুড়ি পঁচিশ বিঘে হতি পারে। এস্‌টেটের দেওয়ান হালিম সাহেব, লোকটা ত্যামন নিদয় নয় বুঝিছ। তবে হাড়ে হারামজাদা হচ্ছে সদরের নায়েব ঐ শালা জীবনে কায়েত আর আমাগের গিরামের ঐ রামতারণ গোমস্তা। মেন্দাগের এস্‌টেট এই দুই শালা কায়েত চুষে ছুবড়া করে ফ্যালতিছে। বুঝিছ। শালার গোমস্তারে আ্যাত ক'রে কলাম, হুজুর আমি এস্‌টেটের লোক, আপনার গুলাম।

আমার বাড়ির পাশের গুয়ালগের পড়ো ভিটেটা খাস হয়ে গেছে। হুজুর, উডা আমারে দিয়ে দ্যান। আমি গরিব পিয়াদা, পয়সা কড়ি কনে পাব। তবে হুজুরির দয়ার কথা চিরকাল মনে রাখব। তা এটটুও কি ভিজল। গ্যালাম দেওয়ান- বাবুর কাছে। তিনি আরও সরেশ। আমারে সুজা গোমস্তাবাবুরি দ্যাখায়ে দেলেন। খ্যানো আমি এস্‌টেটের পাইক নই। বুঝলে। শেষ পর্যন্ত দুই শালারে পান খাওয়ায়ে তবে সেই প'ড়ো ভিটের দখল পালাম। আমার চৌরি ঘরখানা যে ভিটের উপর তুলিছি, সেইডের কথাই কচ্ছি। এতেই বুঝতি পারবা, ঐ দুই শালা রক্তচুষা কায়েতরে পান না খাওয়ায়ে এ গিরামে একফালি জমিরউ দখল পাওয়ার উপায় কারুর নেই। কথাডা এই জন্যিই তুমারে ক'য়ে রাখলাম চাচা, যে তুমি আমার আপনার লোক। পরে আমারে ভুল না বোঝ। বুঝিছ?"

ফটিক চুপ করে থাকল। সাজ্জাদও। গয়ারাম কিছুক্ষণ উস্‌খুস্ করে বলে উঠল, "কী ব্যাপার গো চাচা। মুখখানা অ্যাতো শুকনো শুকনো দ্যাখাচ্ছে? জ্বরে ধরিছে নাকি?"

সাজ্জাদ বলল, "হয়, ধরিছে। তুমি কি আ'জ শুনলে।"

গয়ারাম বলল, "এই দিগরে, ঘরে ঘরে জ্বর। সদর কাছারিতি যদি থাকতে তা'লি বুঝতি পা'রতে দেশের অবস্থাডা কী? গত বছর গেরথমে খরা। ধান পাটের চারাই করা গ্যালো না। আবার পরের দিকি অ্যামন ভাসাই ভা'সলো যে কিছু হ'ল না।"

সাজ্জাদ বলল, "তুমার ঐ জমিদারী চালির কথা রাখো দিন। এই জ্বরের থে উঠলাম। শরীলডের জুত পাতিছি নে। আগে এটটু বেশ কড়া ক'রে তামুক সাজো দিন দেখি। তারপর দেশের কথা কইও।"

গয়া বলল, "তা যা কইছো।"

গয়া উঠে গিয়ে তামুক সাজতে সাজতে বলল, "ইবার যে কি হবে চাচা, কী যে খাবো?"

এখানে বলা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ কবি ছিলেন কিন্তু নিছক কবিত্ব নিয়ে তোমাদিনষ্ট মুগ্ধ থাকেন নি। কবি হয়েও তিনি কর্মী। সেই যৌবনকালে একদিন লিখেছিলেন—এবার ফিরাও মোরে। পাছে কবিতা-কল্পনা-লতা মনকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রাখে সেজন্যে মনটাকে কাব্যের জগৎ থেকে কর্মের জগতে ফিরিয়ে আনবার কথা সর্বক্ষণই মনে রেখেছেন। সুন্দরের আরাধনা করেছেন আজীবন কিন্তু তাঁর "সুন্দর" একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া মাত্র নয়—কেবল মাত্র ধ্যানের বস্তু নয়, ভোগের বস্তুও বটে। তাঁর কাব্য সাহিত্যের কেন্দ্রে আছে দেশ, সমাজ। ধর্মকে যেমন শাস্ত্র গ্রন্থ থেকে আচার অনুষ্ঠান থেকে পূজা মন্দির থেকে মুক্ত করে এনে তিনি মানুষের মধ্যে খুঁজেছেন, তাঁর কাব্যধর্ম এবং সৌন্দর্য প্রেমকেও তেমনি ললিত কলার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে লৌকিক জীবনের সঙ্গে তাকে যুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সৌন্দর্য সাধনার একটা ব্যবহারিক দিক আছে। তাই কবে বর্ষা-মঙ্গলের সঙ্গে আপনি এসে যুক্ত হয়েছে বৃক্ষ রোপণ উৎসব। বর্ষা এসেছে তো ধরার বুকে প্রাণ দিতে এসেছে, সেই "পুরাতন প্রাণের টানে ছুটেছে মন মাটির পানে", প্রাণের চিহ্ন পুরু হয়েছে মাঠে মাঠে লাঙ্গলের মুখে, শুরু লেগেছে পাড়ায় পাড়ায় বপনে আর রোপণে। কবি তাঁর কাব্যের সুর মিলিয়েছেন তারই সঙ্গে—

যে বাণী ঐ ধানের ক্ষেতে
আকুল হলো অঙ্কুরেতে,
আজ এই মেঘের শ্যামল মায়ায়
সেই বাণী মোর সুরে আনে।

আমাদের শাস্ত্রে জলকে বলেছে অন্নদাতা। সে হিসাবে বর্ষাই আমাদের অন্নদাতা, সেজন্যে বৃক্ষরোপণ করেই ক্ষান্ত হননি, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হলকর্ষণ উৎসব। আমরা বরাবর যাকে বর্ষামঙ্গল উৎসব বলে এসেছি তা একক ভাবে সম্পূর্ণ নয়। অন্তত রবীন্দ্রনাথের কাছে সম্পূর্ণ মনে হয় নি। প্রকৃতপক্ষে বর্ষা উৎসব, বৃক্ষরোপণ এবং হলকর্ষণ—এই তিনে মিলে বর্ষামঙ্গল উৎসব। তিনটিতে মিলে উৎসবটি একটি লৌকিক এবং ব্যবহারিক রূপ পেল। তাতে সৌন্দর্যহানি না হয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। সত্যি বলতে কি, বৃক্ষ রোপণ বোধ করি এখানকার সব চাইতে যৌক্তিকপূর্ণ উৎসব। বীরভূমের বৃক্ষ বিরল, রুক্ষ, ক্ষয়ে যাওয়া মাটিতে বৃক্ষ-রোপণ অত্যাবশ্যক ছিল। অত্যাবশ্যককে কতখানি চিত্তাকর্ষক করা যায় এ উৎসবটি দেখলে তবে বোঝা যাবে।

এককালে রাঢ় অঞ্চলে লৌহচূর আকরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। সেই লোভে অতি নিষ্ঠুর ভাবে বনচ্ছেদন হয়েছিল, ফলে শ্যামল ধরণীর কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে। খোয়াই বা ক্ষয়ে যাওয়া মাটির বিস্তার রোধ করবার জন্যে অনেক আগে থেকেই এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন এবং ফলও পেয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামবাসীদের মধ্যে তার প্রচার হয় নি। এখন বৃক্ষ রোপণের মধ্য দিয়ে গ্রামে গ্রামে যাতে বনভূমি পত্তনের একটা আন্দোলন শুরু হয় সে উদ্দেশ্যে বৃক্ষরোপণকে একটি স্থায়ী উৎসবের আকার দেবার সংকল্প করলেন। বনভূমির শ্রীবৃদ্ধি হলে তবে বারিপাত বৃদ্ধি পাবে, কৃষি সংকটেরও নিরসন হবে। অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা জানে না যে মেঘ আকাশবিহারী হলে কি হবে সে ধরাতলে বনাঞ্চলের আঁচলে বাঁধা। যেখানে বন সেখানেই মেঘ-বৃষ্টির আড়ম্বর।

আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম বৃক্ষরোপণ উৎসব ১৯২৮-এর ১৪ জুলাই। পুত্র এবং পুত্রবধূ তখন ইয়ুরোপে। সেদিনই প্রতিমা দেবীকে চিঠিতে লিখছেন—"তোমার টবের বকুল গাছটাকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটা হল। পৃথিবীর কোন গাছের এমন সৌভাগ্য কল্পনা করতে পার না। সুন্দরী বালিকারা সুপরিচ্ছন্ন হয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে যজ্ঞক্ষেত্রে এল। শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন—আমি একে একে ছটা কবিতা পড়লুম।" এর পাঁচটি কবিতায় ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম—এই পঞ্চভূতের কাছে বৃক্ষ শিশুটির জন্যে স্নেহ করুণা এবং শুভাশিস প্রার্থনা করা হয়েছে। অপর কবিতাটিতে বৃক্ষশিশুর মঙ্গল কামনা করে কবি আপন কণ্ঠে মাঙ্গলিক উচ্চারণ করেছিলেন—

আজি এই আনন্দের দিন
তোমার পল্লব পত্রে পত্রে তব হোক্ মৃত্যুহীন।
রবীন্দ্রের কণ্ঠ হতে এ সঙ্গীত তোমার মঙ্গলে
মিলিল মেঘের মন্দ্রে, মিলিল কদম্ব-পরিমলে॥

এর পরদিন ১৫ জুলাই শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণের অনুষ্ঠান হল। কবি স্বয়ং হল চালনা করেছিলেন। প্রথম বছরে অনুষ্ঠানটির নাম হয়েছিল সীতাযজ্ঞ। পরে হলকর্ষণ নামেই পরিচিত হয়েছে। শিল্পী নন্দলাল শ্রীনিকেতনের প্রাচীর গাত্রে ফ্রেস্কো রচনা করে সে দিনের উৎসবটিকে স্মরণীয় করে রেখেছেন। সেবারের উৎসব এই কারণে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় যে সেই থেকে বর্ষার গান, বৃক্ষ বন্দনা এবং হলকর্ষণ মিলে বর্ষামঙ্গল শুধু মাঙ্গলিক নয়, একটি সাংসারিক এবং সামাজিক উৎসবে পরিণত হল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শান্তিনিকেতনে বৃক্ষ রোপণ উৎসব শুরু হওয়ার কুড়ি বাইশ বছর পরে ১৯৫০ সালে ভারত সরকার এটিকে একটি সর্বভারতীয় আন্দোলন হিসাবে গ্রহণ করেন। এখন সারা দেশেই বন মহোৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আশা করা যায় এর ফলে ভূমিক্ষয়ের নিরোধ হবে এবং দেশের বনসম্পদ বৃদ্ধি পাবে।

কবির মৃত্যুর পর থেকে বৃক্ষরোপণ উৎসবটি প্রতি বৎসর ২২শে শ্রাবণ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ সিদ্ধান্তটি সুচিন্তিত। মৃত্যুদিনে নবজাতকের অভি-ষেক মহাজীবনের বহমানতা স্মারক, এ কথা স্বীকার করতে হবে।

বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও এখানে বলে নিচ্ছি। কবি পুত্রবধূকে লেখা চিঠিটিতে বলেছেন, বালিকারা শাঁখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে যজ্ঞক্ষেত্রে এল। বর্তমান পূর্ব প্রতিমায় যখন বনবীথি প্রাঙ্গণে শিশু-সন্তান হাতে নিয়ে শোভাযাত্রা করে উৎসব ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। এখানে দেখা যাচ্ছে বালিকাদের শোভাযাত্রাটি নৃত্যের ভঙ্গিতে আসে নি, হেঁটে এসেছে। তখন শান্তি-নিকেতনে নাচের প্রচলন হয়েছে, মেয়েরা শিখছেন। কিন্তু এখন বসন্তোৎসব এবং বৃক্ষরোপণে যে নৃত্য সম্বলিত শোভাযাত্রা দেখতে পাই তার প্রচলন তখনো হয়নি। এটি হয়েছে আরো কিছুকাল পরে, বোধ করি তিরিশের দশকের মাঝামাঝিতে কিংবা তার দু এক বছর আগে পরে। এ ব্যাপারে শান্তিদেব ঘোষ খানিকটা কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। প্রস্তাবটা তিনিই গুরুদেবের কাছে পেশ করেছিলেন। হেঁটে না এসে নৃত্যের ভঙ্গিতে এলে শোভাযাত্রার শোভা বৃদ্ধি পাবে। কথাটা কবির মনে ধরেছিল। বলেছিলেন, খুব ভালো কথা, এখন থেকে তাই হবে।

বর্ষামঙ্গলের ইতিহাস লিখতে বসিনি, তাহলেও আরো দু একটি অনুষ্ঠানের উল্লেখ করছি। ১৯৩৫ সালের শ্রাবণ মাসে যখন বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের কথা ভাবা হচ্ছে তখন অকস্মাৎ খবর এল কলকাতায় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়েছে। ছেলেদের গানের ভাণ্ডারী, নাটের কাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ কবির একান্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে কবি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। সেবারের বর্ষা-মঙ্গলের জন্যে যে কটি নতুন গান রচনা করেছিলেন তার কোন কোনটির মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন বেদনার সুর লেগেছে। বিশেষ করে "কী বেদনা মোর জানো সে কি তুমি জানো/ওগো মিতা, মোর অনেক দূরের মিতা" অনেকে মনে করেন এ গানটি একেবারেই দিনেন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে রচিত। এর দু বছর পরে ১৯৩৭ সালে আবার কলকাতায় বর্ষামঙ্গলের অনুষ্ঠান হল। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল "ছায়া" প্রেক্ষাগৃহে। কলকাতার অনুষ্ঠানে টিকিট বিক্রি করে কিছু অর্থাগমের আশা থাকে কিন্তু সেটাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য ছিল শহরবাসী মানুষ যাঁরা ঋতু পর্যায়ের প্রতি সাধারণত উদাসীন তাঁদের এ জাতীয় উৎসবের সঙ্গে খানিকটা পরিচিত করা। বলেছিলেন—"শহরের মধ্যে ঋতু আসে, কিন্তু তার প্রকাশে বাধা থাকে বিস্তর তাই এখানে উৎসবের সৃষ্টি সহজে হয় না।.........মনে করিয়ে দিতে এসেছি বর্ষা এলো, ভারতবর্ষের কবিদের বর্ষা, যে বর্ষার হৃদয় থেকে মেঘ-দূতের বিরহ গান উৎসারিত হয়ে নিত্যকালকে অভিষিক্ত করেছে।"

শান্তিনিকেতনের ঋতু উৎসব শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা মস্ত বড় স্থান গ্রহণ করে আছে, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু ঐটুকু বললেও সবটুকু বলা হয় না। এ সব উৎসবের প্রয়োজনীয়তা কেবল শিক্ষার্থীদের রুচি মার্জনা এবং সৌন্দর্যবোধের উন্মেষণায় শেষ নয়। কবির মনে এর উদ্দেশ্য ছিল অনেক বেশি ব্যাপক। তাঁর কাব্য সৃষ্টিতে এবং সৌন্দর্যচর্চায় তাঁর সমাজবোধ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সব সময়ই তাকে প্রভাবিত করেছে। তিনি লক্ষ করছিলেন যে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত দেশের আনন্দ উৎসগুলি ক্রমে যেন শুকিয়ে আসছে। যা কিছু আনন্দের উৎস তাকেই বলে উৎসব। গ্রামবাসী জনগণের জীবনে তবু কিছু তার অবশিষ্ট আছে। দোল দুর্গোৎসব ছাড়াও রথযাত্রা, ঝুলন যাত্রা, গাজন চড়ক ইত্যাদি নানা উপলক্ষকে কেন্দ্র করে তাদের আনন্দধারা কিছু তারা বজায় রাখতে পেরেছে। কিন্তু আজকের শহরবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায় সাবেককেলে এসব আনন্দোৎ-সব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাদের শিক্ষা এবং রুচি নিয়ে তারা ওসবের মধ্যে আর রস বা আনন্দ খুঁজে পাবে না। আমাদের সব উৎসবই বলতে গেলে ধর্মভিত্তিক; এ সব ধর্মীয় উৎসব শিক্ষিত সমাজকে খুব বেশি আর টানতে পারবে না। এ যুগের উপ-যোগী উৎসবের আয়োজন করতে গেলে তাকে ধর্ম-নিরপেক্ষ এবং অসাম্প্রদায়িক হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত ঋতু উৎসব সে উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলতে হবে। আমাদের পূজা প্রাঙ্গণে অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে ষড় ঋতুর অধিষ্ঠাত্রী প্রকৃতিদেবীকেও তিনি আসন বিছিয়ে দিয়েছেন। শারদীয়া পূজা, বাসন্তী পূজা যেমন হচ্ছে তেমনি হবে বর্ষা উৎসব, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব। দু-এ কোন বিরোধ নেই। দু-এরই উদ্দেশ্য আনন্দ। খুব মজার কথা এই যে মূর্তি বিরোধী অরূপের পূজারী হয়েও রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকটি ঋতুকে সুস্পষ্ট মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পূজামণ্ডপে দশপ্রহরণধারিণী দেবীর মূর্তিকে যেমন লোকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে রবীন্দ্র সংগীতের মধ্যে ষড় ঋতুশোভিনী প্রকৃতিদেবীকেও আমরা তেমনি স্পষ্ট করে দেখতে পাই। সব দেশেই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে মিথলজি বা পুরাণ কাহিনী। পুরাণ কাহিনীর সাহিত্যিক সৌন্দর্য উপভোগ করেন সকলেই কিন্তু আজকের শিক্ষিত ব্যক্তিরা সে সব কাহিনী বর্ণিত ক্রিয়াকাণ্ড নিশ্চয় বিশ্বাস করেন না। রবীন্দ্রনাথ ষড় ঋতুকে কেন্দ্র করে আমাদের জন্যে নতুন মিথলজির সৃষ্টি করেছেন। এ মিথলজির সৌন্দর্য যেমন আমরা উপভোগ করি তেমনি আবার তাকে বিশ্বাসও করি কারণ ষড়ঋতুর ক্রিয়াকাণ্ড যা আমরা চোখ মেললেই দেখতে পাচ্ছি তাকে অবাস্তব বলে কোন মতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

চিত্তধারার শুষ্কতা মানুষের জীবনে মস্ত বড় দৈন্যের সূচনা করে। সমাজকে সে দুর্দৈব থেকে রক্ষা করবার জন্যে সারাজীবন সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন; কাব্য রচনাকে উৎসব রচনায় নিয়োজিত করেছেন। ঋতু উৎসবের মধ্যে যেমন তাঁর সমাজ-বোধের পরিচয়, তেমনি সমস্ত ঋতু সংগীতকে মিলিয়ে দেখলে তাঁর গভীর জীবন বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতির মধ্যে যে লীলাখেলা চলছে জীবনেও তাই। প্রকৃতির ঋতুরঙ্গে রুদ্র এবং শান্ত, ভীষণ এবং মধুর পাশাপাশি অবস্থান করছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে কোথাও একটা বিরোধ বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে তা নয়, আপাত বিরোধ প্রত্যেকটিরই মর্যাদা বাড়িয়ে দিচ্ছে। একটি আছে বলেই অপরটির প্রয়োজন, এক অপরের পরিপূরক। গ্রীষ্মের তাপ বর্ষার ধারায় শীতল হয়ে যাচ্ছে, শীতের দৈন্য বসন্ত এসে পূরণ করে দিচ্ছে। প্রচণ্ড ঝড়ের পরে কী গভীর শান্তি। জীবনের খেলাও এই। সুখে দুঃখে, ত্যাগে ভোগে, অভাবে সাফল্যে, সৌভাগ্যে দুর্ভাগ্যে, রোগে স্বাস্থ্যে [illegible]

প্রেম নেই

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ ২০ ॥

"ইন্নাহ লিল্লাহে ওয়াইন্নাহ ইলায়হে রাজেউন" (আত্মা পরমাত্মা হইতে আসে এবং মৃত্যুর পর পরমাত্মার নিকট চলিয়া যায়)। ফকিরের মৃত্যুর সংবাদ ছেলের মুখে পাওয়ামাত্র সাজ্জাদ দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে চোখ বুজল এবং অভ্যাস বশে বিড়বিড় করে "ইন্নাহ লিল্লাহে" আউড়ে গেল। কিছুক্ষণ আগেই ঘাম দিয়ে তার জ্বর ছেড়েছে। কিন্তু দেহে বা মনে কোথাও যেন একফোঁটা উৎসাহও আর অবশিষ্ট নেই। ঘামের পানির সঙ্গেই তা বুঝি বেরিয়ে গিয়েছে। তাই কোনো রকম শোক বা দুঃখ সে অনুভব করল না। সে এখন খুবই শ্রান্ত। একেবারে নিস্তেজ। খেতে ভালবাসত সাজ্জাদ, খেতে পারতও খুব। সারাদিন তো খায়নি কিছু, এখন তো বেলা প্রায় ডোবে-ডোবে, তবুও সাজ্জাদের খাওয়ার কোনও ইচ্ছেই নেই। তামুক খেতে তো এত ভালোবাসে সাজ্জাদ, খেতে ইচ্ছেও হচ্ছে, কিন্তু তামুকটা যে সেজে নেবে, সে উৎসাহ নেই, তার বিবিকে বললেও হয়, মুখ দিয়ে ইচ্ছেটা শুধু জানিয়ে দেবার ওয়াস্তা, তাহলেই সে ঢেঁকির পাড় বন্ধ করে রেখে এসে তামুকটা সেজে দিয়ে যায়, কিন্তু একটুখানি চেঁচিয়ে যে তার বিবিকে ডাকবে, অতটুকু উৎসাহও আর বোধ করল না সাজ্জাদ।

কেন, তার ছেলে? সে তো বসে আছে সামনে। তাকে কেন তামুক সাজতে বলছে না সাজ্জাদ? কাকে বলবে? নিজেকেই সে পাল্টা প্রশ্ন করল। তার ছেলেকে?... ফটিককে? সফীকুল মিঞাকে! এক লহমায় তার মনে একটা ছবি খেলে গেল। বিদ্যুৎগতিতে পাচন-বাড়ি হাতে তার নেংটি-পরা ছেলে, ফটিক বাপ্, দৌড়ে এসে পিরেন-তহবন্দ্ পরা সফীকুল মিঞার শরীরে ঢুকে গেল। ফটিককে সে অনায়াসে তামাক সাজার কথা বলতে পারত। কিন্তু সফীকুল মিঞাকে কি তা বলা যায়? চিন্তাটা মাথায় আসা মাত্রই মাথাটা তার কেমন হাল্কা হয়ে গেল। সে উচিত-অনুচিত বুঝে উঠতে পারল না।

ঢেকুস্ কুস্ সপস সপস সপস

ঢেঁকির আর কুলোর একঘেয়ে একটানা শব্দটা সাজ্জাদের ভিতরে একক্ষণ গুন জোয়ার হয়ে আছড়ে পড়তে লাগল।

সাজ্জাদের মুখের ভিতরে একটা জ্বরো স্বাদ। জিভটা বের করে সে একবার শুকনো ঠোঁটটা চেটে নিল।

"বাজান!"

ছেলের মুখ থেকে মোলায়েম ডাকটা শুনে সাজ্জাদ শ্রান্ত চোখ দুটো মেলে তার দিকে চেয়ে রইল। ফটিক দেখল ওর আব্বু বোবা চোখে ওকে দেখছে। এই চাউনীর পিছনে নিষ্ফল পরিশ্রম, বঞ্চনা এবং ক্ষুধা ও ব্যাধির কামড়ের যে সুদীর্ঘ ইতিহাসের পটভূমিটা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই মুহূর্তে তার আবরণটা সরে গিয়ে ফটিকের চোখে তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। তার কেমন মনে হতে লাগল, তার আব্বার, তার আম্মার, তার সংসারের এই দুর্দশার জন্য সে দায়ী।

সকাল দশটা নাগাত সে এবাড়িতে ঢুকেছিল। সেই ঢোকার মুখে তার কানে ঢেকুস্ কুস্ ঢেকুস্ কুস্ ঢেঁকি-পাড়ের অবিশ্রান্ত এই শব্দটা ঢুকেছিল। এখন বিকেল। শব্দটা এখনও থামল না। এখনও তার কানের পর্দায় তা ঘা মেরে চলেছে। এখনও তার আম্মা ঢেঁকিতে পাড় দিয়েই চলেছে দিয়েই চলেছে। সারাদিন সে কিছু খায় নি। তার কারণ, ফটিক জানে, আব্বাজানকে না খাইয়ে তার আম্মা কিছুতেই কিছু খাবে না। হয়ত ভালোবাসার জন্য, হয়ত ঘরে খাদ্যের পরিমাণ এতই কম আছে যে আব্বাজান তা খেয়ে নিলে তার বাপের জন্য আর থাকবে না কিছুই। তাই এরা সোয়ামী যতক্ষণ না খায়, ততক্ষণ কিছুতেই কিছু খায় না। ফটিক দু-একবার ওর আম্মাকে খেতে বলেছিল। চাচিবিবির ওই এক কথা: খাবানে বাপ্ খাবানে। তোর বাপরে আগে উঠতি দে। মুখি কিছু দিক আগে। তারপরই সে আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে ঢেঁকিতে পাড় শুরু করেছে। অনর্গল কথা বলছে শুধু ঢেঁকি, ঢেকুস্ কুস্ ঢেকুস্ কুস্ আর নাছিফার কুলো সপস সপস সপস। গোটা ব্যাপারটার মধ্যে সে-ই শুধু বেমানান। সে কোথাও খাপ খাচ্ছে না।

ফটিক দেখল ওর বাপের শূন্য দৃষ্টি তখনও তার দিকে চেয়ে আছে। ক্ষুধার্ত, রিক্ত, ব্যর্থ ব্যাধির তাড়নায় বিপর্যস্ত কৃষকের চোখে মুখেই শুধু এই ধরনের শূন্য দৃষ্টি ভেসে উঠতে পারে। ওঠে। ফটিক জানে, এই শূন্যতা, বোবা অথচ অর্থবহ এই দৃষ্টি এমন কি তার মুখেও ফোটা সম্ভব নয়। কারণ যে অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ যে মাথাভাঙা শারীরিক পরিশ্রম এবং যে পরিমাণ মানসিক অনিশ্চয়তা থেকে এই ধরনের অভিজ্ঞতা জন্ম নেয়, এবং এই ধরনের বোবা অথচ অর্থময় দৃষ্টির জন্ম দেয়, ফটিক জানে সে কোনোদিনই আর সেই অভিজ্ঞতার শরিক হতে পারবে না।

ফটিক বলল, "বাজান, পানি দেবো? খাবেন?"

সাজ্জাদ বলল, "পানি। গলাডা শুকোয়ে গেছে।"

ফটিক কুয়োর থেকে টাটকা পানি তুলে নিয়ে এল। বাপকে খেতে দিল। সাজ্জাদ চকচক করে পানি খেয়ে গলা ভেজাল। একবার ওয়াক তুলল। কিন্তু তারপর সামলে গেল। কিছুক্ষণ চোখ বুজে ঝিম ধরে পড়ে থাকল।

ঢেকুস কুস ঢেকুস কুস সপস সপস সপস

"চাচা আছো নাকি? চাচা?"

ডাক শুনে সাজ্জাদের ঝিমোনোর ভাবটা কেটে গেলে। যেন্দাগের পাইক গয়া কৈবত্তর মতো গলা মনে হচ্ছে যেন?

"কিডা? গয়া নাকি?"

"হ্যাঁ গো চাচা আমি।"

"তা আসো, ভিতরে আসো।" সাজ্জাদ ডাক দিল।

গয়া ভিতরে ঢুকে সাজ্জাদকে আদাব জানাল। তারপর ফটিকের মুখের দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকার পর গয়া বলল, "ফটিক না? হ্যাঁ আমাগের ফটিকই তো? তাই কও, বলি মুখখানা চিনা চিনা লাগতিছে, অথচ চিনতি পারতিছি নে। মনে মনে কই, এ মিঞা কিডা হতি পারে? ও ফটিক, চিনতি পারতিছ না? আমি গয়া। তুমার ভাওয়াল ছোহ্রাব গো। সেই যে তুমি রুস্তম সাজে আমারে চিতপাত ক'রে কাদার মদ্দি ফ্যালায়ে দিতে, তারপর ফকিরির নকল ক'রে সেই যে কত রকম সব ছড়া কাটতে, মনে পড়িছে?"

গয়াকে মনে পড়েছে। ওর পেটে পিলে ছিল বলে অন্যান্য রাখালেরা ওকে "পেট ডগুরে পুড়া ম'ড়ে" বলে খেপাতো। ফটিকের মনে পড়ল। আর গয়া তারস্বরে গাল পাড়তো। কেবল ফটিকের সঙ্গেই তার ভাব ছিল। ফটিক রুস্তম সাজত আর গয়ারাম সাজত ছোহ্রাব।

ফটিক "চিনতে পারল, তবে তেমন কোনও আবেগ তার এই বাল্যকালের বন্ধু তার মনে সঞ্চারিত করতে পারল না।

সে একটু ঠান্ডা ভাবেই বলল, "আদাব আরজ"।

ফটিকের ঠান্ডা অভ্যর্থনা গয়াকে অপ্রস্তুত করে দিল। সে বেকুবের মত কিছুক্ষণ ফটিকের দিকে চেয়ে থাকল, তারপর মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে সাজ্জাদকে বলল, "চাচা, তুমি ঠিকই ধরিছিলে। যেন্দা ছাহেব কিছু খাস জমি বন্দোবস্ত দেবেন। মোট কুড়ি পঁচিশ কিত্তে হতি পারে। এস্টেটের দেওয়ান হালিম সাহেব, লোকটা ত্যামন নিদয় নয় বুঝিছ। তবে হাড়ে হারামজাদা হচ্ছে সদরের নায়েব ঐ শালা জীবনে কায়েত আর আমাগের গিরামের ঐ রামতারণ গোমস্তা। যেন্দাগের এস্টেট এই দুই শালা কায়েত চুষে ছিবড়া করে ফ্যালতিছে। বুঝিছ। শালার গোমস্তারে অ্যাত ক'রে কলাম, হুজুর আমি এস্টেটের লোক, আপনার গুলাম। আমার বাড়ির পাশের গুয়ালগের পড়ো ভিটেটা খাস হয়ে গেছে। হুজুর, উডা আমারে দিয়ে দ্যান। আমি গরিব পিয়াদা, পয়সা কড়ি কমে পাব। তবে হুজুরির দয়ার কথা চিরকাল মনে রাখব। তা এটটুও কি ভিজল। গ্যালাম দেওয়ান-বাবুর কাছে। তিনি আরউ সরেশ। আমারে সুজা গোমস্তাবাবুর ক্যাখারে দেলেন। ম্যানো আমি এস্টেটের পাইক নই। বুঝলে। শেষ পর্যন্ত দুই শালারে পান খাওয়ায়ে তবে সেই পড়ো ভিটের দখল পালাম। আমার চৌরি ঘরখানা যে ভিটেয় উপর তুলিছি, সেইডের কথাই কচ্ছি। এতেই বুঝতি পারবা, ঐ দুই শালা রক্তচুষা কায়েতরে পান না খাওয়ায়ে এ গিরামে একফালি জমিরউ দখল পাওয়ার উপায় কারুর নেই। কথাডা এই জন্যিই তুমারে ক'য়ে রাখলাম চাচা, যে তুমি আমার আপনার লোক। পরে আমারে ভুল না বোঝ। বুঝিছ?"

ফটিক চুপ ক'রে থাকল। সাজ্জাদও। গয়ারাম কিছুক্ষণ উস্খুস্ করে বলে উঠল, "কী ব্যাপার গো চাচা। মুখখানা অ্যাতো শুকনো শুকনো দ্যাখাচ্ছে? জ্বরে ধরিছে নাকি?"

সাজ্জাদ বলল, "হয়, ধরিছে। তুমি কি আ'জ বুঝলে।"

গয়ারাম বলল, "এই দিগারে, ঘরে ঘরে জ্বর। সদর কাছারিতি যদি থাকতে তা'লি বুঝতি পা'রতে দেশের অবস্থাডা কী? গত বছর পেরথমে খরা। ধান পাটের চারাই করা গ্যালো না। আবার পরের দিকি অ্যামন ভাসাই ভা'সলো যে কিছু হ'ল না।"

সাজ্জাদ বলল, "তুমার ঐ জমিদারী চালির কথা রাখো দিন। এই জ্বরের থে উঠলাম। শরীলডের জুত পাতিছি নে। আগে এটটু বেশ কড়া ক'রে তামুক সাজো দিন দেখি। তারপর দেশের কথা কইও।"

গয়া বলল, "তা যা কইছো।"

গয়া উঠে গিয়ে তামুক সাজতে সাজতে বলল, "ইবার যে কি হবে চাচা, কী যে খাবো?"

সাজ্জাদ বলল, "তুমার আবার ভাবনা! তুমি হলে জমিদারের পাইক। পিরজার গলায় গামছার ফাঁস পরালিই টাকা।"

গয়ারাম কলকেয় একটান দিয়ে সাজ্জাদের হুঁকোয় কলকেটা পরিয়ে হুঁকোটা তাকে দিয়ে দিল। সাজ্জাদ কষে বেশ কয়েকটান তামাক খেয়ে শরীরটা চাঙ্গা করে তুলল।

গয়া বলল, "চাচা আমারে ঠাট্টা করিছ। গলায় গামছা! সেদিন আর আছে ভাবিছ? এখন পিরজার গলায় গামছা দিতি গেলি, সে গামছা যে কার কনে ঢোকবে তা জানো? কিন্তু একথা তুমি ঐ গোমস্তা হারামজাদা আর ঐ শালার পো শালা দেওয়ানডারে বুঝোতি পারবা?"

সাজ্জাদের আসল সমস্যা হল, হুঁকোটা তার ছেলেকে দেবে কিনা তাই। সাত পাঁচ ভেবে না দেওয়াই সাব্যস্ত করল। উকিল ছাওয়ালের মন মর্জির হদিশ সাজ্জাদ জানে না। সেই কারণেই সে এত ইতস্তত করছিল। তাই সে একটা সুখটান দিয়ে কলকেটা আবার গয়ার হাতেই তুলে দিল।

কলকে চুষতে চুষতে গয়া বলতে লাগল, "বুঝিছ চাচা, শালার গোমস্তার মুখ দিয়ে কি কোনও কথা বের করা যায়! সবাই এখন কচ্ছে মেন্দা ভাইবগের জমিদারির রস আখন নাকি শুটোয়ে আসতিছে। মাগবো, শৈলকুপা, কুমোরখালির মহলগুলো সব ছাড়ে দেছেন। তাই সদর কাছারিউ গুটোয়ে আনতিছেন। এই নিয়ে ম্যানেজারে আর সদর নায়েবে বাঁধে গেছে চুলোচুলি। ছোট মেন্দা এর মধ্যি নেই। তিনি সেই যে পনের বছর আগে বাড়ির থে বেরোয়ে আসে হাটে পাটের আড়ত খুলে বসিছেন সেই অবধি এস্টেটের সঙ্গে তার সম্পর্ক দিতায় নেই। আমি সদর নায়েবের বুঝোয়ে দিছি যে আমাগের গিরামের গোমস্তা শালা তলে তলে ম্যানেজারের সঙ্গে জোড় বাঁধছে। ম্যানেজার আমারে কয়েছে, গোমস্তার উপর নজর রাখতি। এই করেই তো জানে নিলাম আমাগের গিরামের এক কিতে খাস বিলেন জমি এসটেট ইবার লম্বা-বন্দোবস্ত দেবে। নিতি যদি পার চাচা তো নিয়ে নাও। জয় বিঘের একটা জোত, আমাগের গিরামেই আছে। বিশেষগের আম বাগানের লাগোয়া খাজনা হবে গে ছয়টাকা।"

সাজ্জাদ জিজ্ঞেস করল, "আর সেলামী?"

"তা সেলামী আর কত হবে?" গয়া বলল, "ম্যানেজার তো কলো, বুঝলে চাচা, এস্টেটের ভাগ হবে কুড়ি টাকা। তা তুমি যদি রাজি থাক, তা দেখ, আমি ম্যানেজারকে কয়ে দেখতি পারি। দুটো দশের টাকা পান খাতি দিলিই ও শালারা খুশি হয়ে যাবেনে, বুঝিছ। এই জোতটা তাঁর আর উনি তাকে তোলবে নানে। তুমি ঐ বিশ টাকা সেলামীতেই উড়া পায়ে যাবানে।" তাঁর ধর গে তুমার সেলামী হ'ল গে বিশ, পান খাওয়ার খং হ'ল গে—"

এতক্ষণে ফটিক জিজ্ঞেস করল, "খংটা কী?"

গয়া বলল, "এসব হল সেরেস্তার জমা খরচের অং বং খং। খং মানে খরচ।"

ফটিক বলল, "অ"।

গয়া বলল, "জমিদারীর হিসেব ধরতি পারা চাট্টিখানি কথা নয়। যে সে ধরতি পারেই না"।

ফটিক বলল, "শুধু ম্যানেজারকে দশ টাকার পান খাওয়ার খং দিয়ে দিলেই জমিদারীর পাই মিটে যাবে।"

গয়ারাম বলল, "আর লাগে আমলা ফি। তা সে তো শতকরা মাত্তর দশ টাকা। তা সে আর কতই বা লাগবে। সেলামী বিশ আর খাজনা ছয় একুনে ছাব্বিশ টাকা। তার হল গে শতকরা দশ টাকা। অর্থাৎ দু টাকা নয় আনা সোয়া সাত পাই। তাঁর একুনে হল গে আটাশ টাকা নয় আনা সোয়া সাত পাই, তা আট পাই-ই ধরে নাও, আর পান খাওয়ার খং তুমার ধর গে দশ টাকা, তাঁর একুনে তুমার গে দাঁড়াল ছত্রিশ টাকা নয় আনা আট পাই। এর সিকি টাকা অর্থাৎ কিনা নয় টাকা দুই আনা পাঁচ পাই, চাচা তুমি সঙ্গে সঙ্গে আগাম জমা দিয়ে বায়না করলে আর পনের দিনের মধ্যি বাকী টাকাটা দিয়ে একেবারে তুমার দখলে নিয়ে চ'লে আ'লে।"

সাজ্জাদ বলল, "জমি যে নেব, টাকা কনে? আর জমি নিয়েই বা করব কী? চষবে কিডা? এই বুড়ো হাড়ে যেটুকু জোত চষতাম, তিন বছর ধরে তাই চষতি পারিনে। জ্বরে জ্বরে ভুগে শরীলির আর কী আছে? লাঙলের মুঠো ধরব জোর পাইনে, একটা পাক দিছি কিনা দিছি বুক এমন ধড়ফড় করে যে ব'সে পড়তি হয়। বাকী খাজনার দায়ে এখন আমার জমিই জমিদারের ঘরে জমা করে দিতি হবে। যে জমি চষতি পারবই না, তার খাজনা জমা সুদ আর টানে করব কী? তার চাইতি জমিদারের ঘরে জমা করে দিয়াই ভাল।'

গয়া বলল, "জমিদারের ঘরে জমা করে দিলি হবে লবডঙ্কা। তার চাইতি আর কারুরি বেচে দ্যাও না।"

সাজ্জাদ বলল, "তিন বছর ধরে ধান হচ্ছে না, কিন্তু আমরা চাষারা যার যেটুকু হয়েছে সেটুকু হাটে নিয়ে গিয়ে শুনি ধানের মণ বার আনা চোদ্দ আনা, দিবা তো দ্যাও নাহলি পথ দ্যাখ। ব্যাপারীগের কথাবাত্তার এই হ'ল ধরন।"

গয়া বলল, "কুষ্ঠার অবস্থাও তো তাই।"

সাজ্জাদ বলল, "কুষ্টা! ঐ দ্যাখ গত বছরের কুষ্টা এখনও গলায় ঝোলছে। কুষ্টার কথা আর কোয়ে না। গেল বছর চাষের খরচই পড়িছিল দু টাকা। সেখেনে মোকামের দর ছিল পাঁচ সিকে দেড় টাকা মণ। সব কুষ্টা বাড়ি আ'নে ছাওয়ালের ঘরে ভ'রে রাখিছি। ইবার হয় ঐ কুষ্ঠা খাতি হবে আর না হয় পাকায়ে গলায় দিয়ে ঘরের আড়ায় ঝুলে পড়তি হবে। তুমি গয়ারাম, এই পড়ন্ত কালায় চাষার কাছে জমির খবর নিয়ে আ'লে! হায় আল্লা! তুমার আরও বছর পনেরো আগে আসা উচিত ছিল। তখন এক কিতে কান্ এক কানি জমির খবরও যদি কেউ আ'নে দেছে, তো তারে কাঁধে তুলে নাচিছি। কিন্তু আখন জমির মায়া কাটায়ে উঠিছি বাপ্। হয়ত মালেকের তাই-ই ইচ্ছে। বিছমিল্লা—।"

গয়ারাম চলে যাওয়ার একটু পরেই ঢেঁকির পাড়টা শব্দ হল। চাঁদবিবি আর নছিমা তখন দুটো কুলোয় প্রাণপণে কাঁড়া চালগুলো ঝেড়ে চলেছে। সপাস সপাস সপাস। নছিমা এবং চাঁদবিবি উভয়েই পরিশ্রমে এত কাতর যে কেউ কারো সঙ্গে একটা কথাও বলছে না। আজান শুনে চাঁদবিবি বুঝল মাগরেবের নামাজটাও তার কাজা হয়ে গেল। হায় আল্লা। একবার ভাবল, এই নামাজটা সে পড়ে নেবে। কতদিন পরে তার ছাওয়াল, তার ফটিক বাড়ি আয়েছে, আর কি নামাজটা কাজা করা তার উচিত হবে? কিন্তু উপায় কী? এখনই যদি হাত চালানো বন্ধ করে ওরা তবে কাজ পিছিয়ে যাবে। বরং আজ ছাওয়াল বাড়ি আয়েছে, আজ কিছু চালও পাওয়া যাবে, ও ব্যালা ভাত রাঁধে চাঁদবিবি তার ছাওয়ালরে খাওয়াতি পারবে।

এইটুকু প্রেরণাই চাঁদবিবির শ্রান্ত এবং শিথিল শরীরটাকে চাঙ্গা করে তুলল। দুটো পা বেজায় ভারি হয়ে উঠেছে দুজনের। দুজনের ডানাতেই টান ধরে এসেছে। কিন্তু তবুও সপাস সপাস সপাস কাঁড়ো

খাড়ার বিরাম নেই কারো। এখন আর কোনো কিছুর জন্যই থামা যায় না।

নামাজের বিছানা ফটিকই পেতে দিল এবং বাপ ও ছেলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে মাগরেবের নামাজ শেষ করল। ফটিকের মনে হল, গতকাল ঠিক এই সময় সে পাশের গ্রামে তার শ্বশুরবাড়ির পরিচ্ছন্ন এবং প্রশস্ত মসজিদে এই নামাজটা পড়েছিল। আজ এই একটু আগেই পড়ল তার নিজের বাড়িতে, যেখানে তার জন্ম। অনেকদিন পরে সে নামাজ পড়ল তার বাপের পাশে দাঁড়িয়ে। তবু সে কেন এ বাড়িতে এত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে? কেন সে বোধ করছে, এখানে সে মেহমান? সে পড়াশুনা করেছে বটে, সে তার বাপের পেশায় ফিরে যায়নি, কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্যই তো কূপমণ্ডূকতা থেকে নিজেকে মুক্ত করা। সে তো তার বাপের ঘাড়ে বোঝা হয়ে, বাপের পয়সা নষ্ট করে পড়াশুনা করেনি? তবে? তবে তার এই আত্মগ্লানি কেন? এর জন্যে কি সেই দায়ী? ধরা যাক, সে যদি পড়াশুনা না করত, যদি সে তার বাপের সঙ্গে লাঙলই ঠেলত, এবং অনেক আগেই বিয়ে-শাদি করত, ছেলেপুলে দারিদ্র্যে ও ব্যাধিতে তার দিবসের চিন্তা ও রাত্রির স্বপ্নকে কণ্টকিত করে তুলত, যদি সে বাংলাদেশের অগণিত অশিক্ষিত এবং দারিদ্র্য জর্জরিত কৃষকের সংখ্যায় আরেকটি ব্যর্থ কৃষকের সংখ্যা যোগ করত, তাতেই বা কার কী লাভ হত? তার মায়ের এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর সে লাঘব করতে পারত? বড়জোর সে বিবি এনে তার মাকে একটা সঙ্গী দিতে পারত। কিন্তু তার বেশী সে কী উপকারটা করতে পারত? তার বাপের কোন্ পরিশ্রমটা সে লাঘব করতে পারত? অবিশ্যি সে বাপের সঙ্গে সঙ্গে সে তার প্রাতিদিনের দুঃখ-দারিদ্র্য, দুশ্চিন্তা এবং ম্যালেরিয়াটা ভাগ করে নিতে পারত। কিন্তু কলকাতায় সেও তো খুব সুখে ছিল না। দিনের পর দিন তাকেও কি সেখানে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়নি? থাকতে হয়নি এক-পেটা আধপেটা খেয়ে? কলকাতার মুসলমান, সে বড় অদ্ভুত জাত। একটা জায়গীর পাবার জন্য কোথায় না হন্যে হয়ে ঘুরেছে। পার্ক সার্কাস, তালতলা, ওয়েলেসলি, বেনেপুকুর, বৈঠকখানা, রাজাবাজার, চিৎপুর, কাশীপুর, একবালপুর, মোমেনপুর, খিদিরপুর, মেটেবুরুজ, যেখানে মুসলমান বসতি, কোথাও আর ঢু মারতে বাকি রাখেনি ফটিক। সবাই ছেলে পড়াবার জন্য উর্দু-ভাষী বিহারী বা আপ কান্ট্রির মুসলমান মাস্টার চায়। তাদের জায়গীর পেতে অসুবিধা হয় না। বাঙালীরাও তাদের বাড়িতে এনে রাখে, অবাঙালীরা তো বাঙালীদের পাত্তাই দিতে চায় না, তা সে বাঙালীরা যতই কেন উর্দু বলুক, কি লখনউ-এর আদব তমিজের অনুকরণ করে "পহলে-আপ, পহলে-আপ" করুক। কলকাতার মোছলেম সমাজে কোথাও সে একটা টিউশানী জোগাড় করতে পারেনি। যদিও তার মাইনর এবং মিডিল ইংলিশ ইসকুলে শিক্ষকতা করার ভাল অভিজ্ঞতা আছে। সে গুরু ট্রেনিং পাশ। মিডিল ইংলিশ ইসকুলে সে অ্যাসিসটান্ট হেড মাসটার ছিল।

তার সহপাঠিনী মিস লতিকা পালিত বরং উদারতা দেখিয়েছিল, তার এক দিদির মেয়েকে পড়াবার সুযোগ করে দিয়ে। ফটিকের প্রথম দিনের ঘটনা বেশ মনে আছে। তাকে দেখে তার ছাত্রী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, ও মাসী, তুমি যে বলেছিলে আমার জন্য একজন মাসটার মশাই আনবে। মাসটার কোথায়, এ তো দেখছি মুসলমান। মিস পালিতের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। মিস পালিতের অবস্থা দেখে সেদিন সে নিজের মান-অপমানের কথা ভুলে গিয়েছিল। তাছাড়া সে তখন ভুখছে এবং এইটেই তার শেষ আশ্রয়। সে তার ছাত্রীকে বলেছিল, ঠিক বলেছ খুকি, আমি মুসলমান। তবে আমি যেমন মুসলমান তেমনি আবার ভালো মাসটারও বটি। জানো তো আমার কাছে পড়লে মোটেই বই খুলতে হয় না। মেয়েটা চোখ বড় বড় করে বলেছিল, তাই বুঝি! একদম বই খুলতে হবে না। কী মজা! আমি তবে তোমার কাছে পড়ব।

জায়গীর পায়নি, কিন্তু টিউশানি পেয়েছিল। সে প্রমাণ করতে পেরেছিল যে সে পড়ায় ভালোই। তার প্রথম ছাত্রী রেণু এবার আই এ-তে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু এ সুযোগ তাকে মুসলমান সমাজ দেয়নি, দিয়েছে হিন্দু সমাজ। মিস পালিতের করুণা সে কখনো ভুলবে না, যেমন ভুলবে না কলকাতায় তার অনাহারের জ্বালা।

তবে কি তার ম্যালেরিয়াটা হয়নি, তার বাপের হয়েছে, এইখানেই তফাৎ ঘটে গেল? এত তফাৎ। ফটিক তার বাপের দিকে চাইল। সাজ্জাদ গয়ারামকে যে কথাগুলো বলল, সে কি তাকেই শোনাবার জন্য? তাই কি ফটিক এতক্ষণ ধরে কৈফিয়ৎ দিল মনে মনে।

ফটিক ভেবে দেখল লেখাপড়া শিখে কিছু অন্যায় করেনি। অন্যায় করেছে রোজগার না করে। ওকালতি পড়তে যাবার আগে সে দাঁইরেপুরের মিডিল ইংলিশ ইসকুলে পড়াতো। অ্যাসিসট্যানট হেড মাসটার হয়েছিল। হেড মাসটার হরিপদ বাড়ুজ্জে বুড়ো হয়ে কাজ ছেড়ে দেবার পর বছর দুয়েক অস্থায়ী হেড মাসটার তাকে করা হয়েছিল। ফটিক উৎসাহের সঙ্গে খেটে ইসকুলের চেহারা বদলে দিয়েছিল। প্রেসিডেনট, দশ আনির জমিনদার অ্যানড অনারারি ম্যাজিসট্রেট রায় পি সি ব্যানার্জি বাহাদুর, সেকরেটারি শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বাড়ির, বি এ এল এল বি দশ আনির ম্যানেজারবাবু, এঁরা সবাই তাঁকে প্রশংসা করেছেন। পড়াশুনোয় খেলাধুলোয় বেশ নাম করেছিল তার ইসকুল। বাবুরা এমন কথাও তাকে বলেছিলেন যে তার ধারণা হয়েছিল সেই শেষ পর্যন্ত হেড মাসটার হবে।

এই দু বছরই তার জীবনের সব চাইতে ভালো বছর। কিছু টাকা সে মাস গেলে ঘরে আনছিল। তার বাপের দশাসই চেহারা তখনও টসকায়নি। ফটিকের দেওয়া টাকায় ওর বাপ একটু একটু করে বন্ধকী জমিগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছিল। ওকে মেন্দার মত লোকও বেশ খাতির করতে শুরু করেছিল। মোক্তারকত্তা ওকে দু-পাঁচ টাকা করে পোস্টাপিসের সেভিংস ব্যাংকে জমাতে পরামর্শ দিচ্ছিলেন। কেননা, ফটিক যখন এতটাই এগিয়ে এসেছে, তখন আরেকটু এগিয়ে বি টি পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলুক। তারপর কোনো বড় ইসকুলে চাকরি পেলে প্রাইভেটে এম এ-টা দিতে পারবে। কথাটা ফটিকের মনে ধরেছিল এবং মোক্তারকত্তার কথামত টাকা জমাতে লেগেছিল। ভাগ্যিস তার টাকাগুলো জমেছিল। তাই তার ওকালতি পড়ার ইচ্ছেটা পূরণ হয়ে গেল। তবে দাঁইরেপুরের ইসকুলে তাকে অমনভাবে বেইজ্জৎ না হতে হলে তার উকিল হওয়া হত কিনা সন্দেহ।

ফটিক নাওয়া খাওয়া ছেড়ে ইসকুলটার যাতে উন্নতি হয়, তার চেষ্টা করতে শুরু করল। গরিব মেধাবী হিন্দু মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্র এনে ভর্তি করতে শুরু করল। তার তখন বিয়ের সম্বন্ধ আসতে শুরু করেছে। ফটিকের দুঃখেপ নেই। তার ধ্যানে তখন শুধু ইসকুল। এমন সময় যা অভাবিত তাও ঘটল। স্বয়ং মেন্দা তার এক মেয়ের সঙ্গে ফটিকের বিয়ে দেবার জন্য ওর বাপের কাছে পয়গাম পাঠালেন। আর সে পয়গাম পাঠাবার কায়দাও অদ্ভুত। পিয়াদা পাঠিয়ে তার বাপকে

মিয়ের গাঁয়ে তাকিয়ে থাকলেন। ফিরে ফেলেও গেল। ফটিক ইসকুল দিয়ে তখন যেতে আছে।

বছরের পর ওকে কিছু না জানিয়েই ঐ ইসকুলেরই শিক্ষক, ওর চাইতে বয়সে বড়, প্রেম এই অনুরাগে, মাশিকা সুলতা-এর হেড মাস্টার করা হল। এই আমাতো বড় মেয়েটির ফটিকের। ওর মতো শোনা এবং ভালো একজন শিক্ষক থাকতে, বাবা ... কথা ইসকুল কমিটিই স্বীকার করেছে, একজন কম বয়েসী শিক্ষককে, যে এসটেটের ম্যানেজারের ছেলেকে ফ্রি বাড়িতে পড়ায় এবং ইসকুলে কেবল খোঁট পাকায়, কী করে সেই একই ইসকুল কমিটি যে তাকে হেড মাস্টার নিযুক্ত করতে পারে তা আজও বুঝতে পারেনি ফটিক। তাহলে বিচার বলে কি দুনিয়ায় কিছু নেই? যোগ্যতার দাম আল্লার তৈরি এই জগতে কী ভাবে তাহলে স্থির করা হবে?

ফটিক ইসকুল থেকে পদত্যাগ করল। কানাঘুষো শোনা গেল ফটিক ইসকুলের টাকা খেয়েছে তাই তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কদিন পরে আবার শোনা গেল, না টাকা পয়সায় কোনও গোলমাল নয়, স্বদেশী। ফটিক খদ্দরের সুতো কাটে, খদ্দর পরে। এমনিতে মুসলমান হলে কি হবে, তলে তলে ও স্বদেশী। স্বদেশীদেরই চর। রাজভক্ত প্রজা তৈরি করাই যে ইসকুলের কাজ তার হাল স্বদেশীর চরের হাতে তুলে দেওয়া যায় না। পরের খবর আরও মারাত্মক। সে মোল্লা। মুসলমান ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে বিগড়ে দেবার মতলব নিয়েই ফটিক ঐ ইসকুলে ঢুকেছিল। এমনিতেই প্রজারা বশে থাকছে না। প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে। কৃষক-প্রজা পার্টির নেতারা রোজই এটা সেটা দাবি তুলছে। ময়মনসিং, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহী, পাবনার জমিদাররা কৃষক প্রজা পার্টির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আর কারা এর সঙ্গে জড়িত? ফটিকের মত যারা গরিব চাষার ঘর থেকে লেখাপড়া শিখে উঠে আসছে, তারা। এদিকে এখনও জমিদারীর কোনও বড় রকম হয়নি। প্রজারা ক্ষুব্ধই আছে।

কিন্তু এখন যা হয় নেই, হতে কতক্ষণ। ফজলেই দল জমির খাজনা দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পুষতে আর রাজী হলেন না। সাবধানের বিনাশ নেই। তাই ফটিককে চলে যেতে।

"বাজান, শরীরটা কি খারাপ লাগছে?" ফটিক বাপকে জিজ্ঞেস করল। "শোবেন একটু? আপনার খিদে পায়নি?"

"খিদে আজকাল আর তেমন করে পায় না বাপ। পেটজ্বলা দিলে।"

কিন্তু সাজ্জাদের তার চাইতেও বড় আফসোস আমন সুন্দর জো পেয়েও সে আর কৈবর্ত পাড়ার মাঠের আঠাশের জমিতে চাষ দিতে পারলো না। ক্যাবল জমিতে তাকিয়ে, আর অমনি কাঁপুনী দিয়ে জ্বরে আসে গেল। হাল বলদ আলাদা করি পারে না, আমনই কাঁপুনী। কী করে যে শেষ পর্যন্ত বাড়ি পৌঁছেছে, তা আল্লাই জানে।

"বাজান, অ্যাতো ভোগা ঠিক না। ডাক্তার দেখান। আচ্ছা, আমি কাল এসে আপনাকে যতীন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবোখন।"

"কাল আসবা মানে?" সাজ্জাদ নিস্পৃহভাবে প্রশ্ন করল, "আজ থাকবা কনে?"

সাজ্জাদের মন পড়ে আছে মাঠে। ইশ্, আর দু পহর মুখায় পালিই মাঠটা সে তৈরি করে রেখে আসতে পারত। বদনছিব। বদনছিব। বিটা মালোয়ারি আর ঘাড়ে চড়ার সময় পালো না। ইবার যদি আউশ নষ্ট হয়, পাট সে করবে না, তবে আর বাঁচান নেই। ফৌত হয়ে যাতি হবে। সাজ্জাদ একটা হিসেব কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। দেশী চালির দর যেখেনে দু টাকা মণও ওঠে না, ব্যাপারীরা কেনে না। সেখেনে রেশুনির ঐ মোটা গন্ধআলা চাল আড়াই টাকার নিচেই যা বিকি হয় না ক্যান? গত বছর পাট বুনে সাজ্জাদ গুখুরি করিছে। ইবার সে আউশ বোনবে।

"আজ আমি আপনার বিয়াই বাড়ি ফিরে যাব।"

চাঁদবিবি ভুঁড়োকাঁড় ধামাটা কাঁখে করে গোয়ালের দিকে যাচ্ছিল। ছাওয়ালের কথা শুনে ধামাটা উঠোনে রেখে, সেখানেই বসে পড়ল।

কাতরভাবে বলল, "ও বাপ, আজ থাকি যে। আমি আরও ভাবলাম, ও বাজান শুধু মাউ খায়ে থাকলি, এ ব্যালা চাড্ডে চাল পালাম, তোরে ভাত রাঁধে খাওয়াবে। অ্যাদ্দিন পরে বাড়ি আলি।"

ফটিক বলল, "তা বেশ তো, আজ যদি খাওয়াতে চাও, খাওয়াতে পার। কিম্বা কাল দুপুরেও খাওয়াতে পার। যা তোমার ইচ্ছা। ও বাড়ির থেকে সকালে বেরিয়েছি তো?"

চাঁদবিবি কী বলবে, বুঝতে পারছিল না। তার শ্রান্ত মগজ কিছু গ্রহণ করতে পারছিল না। বলল, "তা আলি কবে?"

ফটিক বলল, "কাল সন্ধ্যাবেলা।"

চাঁদবিবি এবার একটু উৎসাহ বোধ করল। বলল, "হ্যাঁ বাপ, বউ বিটির পছন্দ হইছে তো? আবদার হইছে তো? আর কদ্দিন অ্যামন ফাঁকা বাড়িতি পড়ে থাকব বাপ তাই ক? বউ বিটির ইবার আনে ফ্যাল। তোর বাপ, আমি বুড়ো হয়ে গ্যালাম বাপ। গা গতর আর চলে না। ইবার বউ আসুক। ঘুরুক ফিরুক। বউডারে ঘিরে আমরা আবার বাঁচে উঠি। অ্যাদ্দিন তুই যা কইছিস আমরা কথা রাখিছি। ইবার আমাগের কথাডা রাখ বাপ। শুকনো ছিনায় তিস্টা মিটুক।"

"আরে ঐ," বারান্দা থেকে সাজ্জাদ হাঁক দিল, "ও ফটিকির মা, বাপেরে ইবার ছাড়ে দে। অন্ধকারে অ্যাডটা পথ যাবে। আল্লার মনে যা আছে তাই হবে। তুই কাঁদে কী করবি?"

(ক্রমশ)

টান
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

পাটানওয়ালার সঙ্গে এগ্রিমেন্ট সই হয়েছে বেলা সাড়ে বারোটায়। তারপর তাজমহল হোটেলে লাঞ্চ—সে আর শেষ হতে চায় না। গুজরাটি পার্শী মিলিয়ে ওরা চার-পাঁচজন, জয়ন্তর মতো ওদের কলকাতায় ফেরার তাড়া নেই। ওদের মধ্যে যারা আবার স্বগৃহে নিয়মিতবাসী, শুভকাজের উদ্বোধনে তাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা সবচেয়ে বেশি। পাটানওয়ালা নিজে বয়স্ক, স্থিরবুদ্ধি, কিন্তু এই সেলিব্রেশনে ও প্রশ্রয় দিচ্ছিল। একসময় বললো, আর, কেন তাড়া করছো? ধীরে-সুস্থে কাল যেও, রবিবারে সীট পেয়ে যাবেই। ছ'দিনের পর আর একটা দিন তোমার অনুপস্থিতি সুইটহার্ট সহ্য করতে পারবে।' পেটমোটা সেপাই এক কাঠি সরে না, সে বলে, 'বেশি দিন মেয়েদের নজর ছাড়া করা উচিত নয় কিন্তু।'

জে বি ইলেকট্রনিক্সের তরুণ মালিক জয়ন্ত ব্যানার্জীর ব্রিফকেসে এক লাখ টাকার ব্যাংক ড্রাফট। মহারাষ্ট্র রাজ্যে চারজন নতুন নিযুক্ত ডীলার এই টাকা স্বেচ্ছায় জমা দিল। আমানত হিসেবে থাক। মাসে অন্তত একশোটা টি-ভি সেট যেন ওদের জন্যে বরাদ্দ থাকে, এই শর্ত। জে-বি টি-ভির নাম হয়েছে বাজারে। ক্যাবিনেট সুন্দর এবং স্মার্ট। স্পষ্ট ছবি আসে। অথচ কলকাতায় তেমন বিক্রি নেই। লোকে বলে, এখানকার প্রোগ্রাম তেমন টানে না। আসলে, যাদের হাতে টাকা তাদের ক'জন বাংলা প্রোগ্রাম দেখতে চায়! চায় না। আর মধ্যবিত্ত ক্লাস—শহরে বা ছড়ানো-ছিটোনো শিল্পাঞ্চলে—এখনো টি-ভি জিনিসটাকে স্টেটাস-সিম্বল হিসেবে নিতে শেখেনি। শিখবে। আর আর একটু রবরবা হলে এদিকে ঝুঁকতে বাধ্য হবে। কিন্তু ততদিন তো জয়ন্ত বসে-বসে আঙুল চুষতে পারে না। ব্যাংকের সুদ গুণতে হয়। ঠিক সময়ে কাজের লোকদের মাইনে দিতে হয়। পাঁচ-ছটা বছরের অভিজ্ঞতায় ওর বুঝতে বাকি নেই যে ব্যবসা ব্যাপারটা কখনো স্থির থেমে থাকে না। হয় চড়চড় করে বাড়ে, নয় ধসে যায়। ঠিক সময় ঠিক সুযোগ তাই হারাতে নেই। বিনা সুদে এক লাখ টাকা এখন হাতে এসেছে, এবার ঠিকে জোগানদারদের সংখ্যা কমিয়ে ফেলে সম্পূর্ণ উৎপাদন নিজের আয়ত্তে আনবে জয়ন্ত। উৎপাদন বাড়াবে।

সর্বক্ষণের ভাড়া-গাড়িটা ছুটছিল এয়ারপোর্টের দিকে। দুপাশে কংক্রিটের তৈরী গাছ-ফুল-আঁকা মস্ত রঙিন ললিপপগুলো সটসট করে সরে যাচ্ছিল, জয়ন্তর ভ্রূক্ষেপ নেই। ওর ব্রিফকেসে এক লাখ টাকার জ্যান্ত ব্যাংক ড্রাফট। ওর চোখে একটু নেশা, মনের মধ্যে গুরগুর করছে সফলতার গৌরব। বয়স চল্লিশের নিচে এখনও, তাই ঈষৎ টাকের আভাস যেন ভাগ্যের কপালকে বিস্তৃত করেছে।

চান্স-টিকিটে জায়গা পেয়ে গেল জয়ন্ত। সামনের দিকে, ধূমপান নিষিদ্ধ এলাকায়, জানলার পাশে। কলকাতামুখো যাত্রীর সংখ্যা কম বলে পেয়ে গেল বোধ হয়। আসার সময় দমদমে যে-রকম হুড়োহুড়ি ও দেখেছিল, তাতে পনেরো মিনিট আগে এসে জায়গা পাওয়ার কথাই ওঠে না। দমদমের কথা মনে পড়তেই আচমকা রুবাই আর টৌনটুর মুখ দুটো ভেসে ওঠে। ওরা সী-অফ করতে এসেছিল। স্মিতার টিপ-পরা কপালটা যেন দেখতে পায় জানলার বাইরে, ভরা বিকেলে। ওর তাড়া ছিল, আসতে পারেনি। সত্যি, সাত দিন না যেন একমাস দুমাস বাইরে কাটিয়ে বাড়ি ফিরছে জয়ন্ত।

'ইওর অটোগ্রাফ প্লীজ'—মেয়েলি কণ্ঠ কানে আসতে জয়ন্ত চমকে ওঠে। অন্দরের দিকে মুখ ফিরিয়ে আনে। না, ওর কাছে আসেনি, একটি ছোট কিশোরী মেয়ে ওর সামনের সারিতে, ঠিক সামনে, জানলা ঘেঁষেই বসা ভদ্রলোকটির কাছে বাড়িয়ে দিয়েছে হাত।

ভদ্রলোক হাসলেন। চোখ তুলে মেয়েটিকে দেখলেন। সই দিলেন। বোঝা গেল, সই দেবার অভ্যেস আছে। মেয়েটি চলে গেল। জয়ন্ত লক্ষ করলো, ফিসফাস করছে আশপাশের লোক কিন্তু অতি-পরিচিত চিত্র-তারকার মুখে কোনো বিকার নেই। পার্শ্ববর্তিনী তরুণী—সম্ভবত সঙ্গিনী, বা তৃতীয় চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী—গলা জড়িয়ে বললো কিছু, একটু হাসলো বুঝি, তিনি ডান কানটা একটু এগিয়ে নিয়ে গেলেন, শুনলেন, ফিরে এলেন। ঘাড় অবধি ঝোলানো মেয়েটির বাদামী চুল, তার সঙ্গে ম্যাচ করা ব্রাউন চোখের মণি জয়ন্ত পাশ থেকে দেখলো। অনুমান করলো, বিখ্যাত চিত্র অভিনেতা মেয়েটিকে তেমন পাত্তা দিচ্ছেন না। পেছনের সীট থেকে যতটুকু দেখা যায়—তাঁর সুন্দর অতরুণ মুখাবয়ব, সাজানো কাঁচা-পাকা চুল, একটু কোঁচকানো বিশাল কান—ও দেখলো। বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে ভদ্রলোক মাঝে মাঝে চুল ঠিক করছিলেন, জয়ন্ত দেখলো সুদীর্ঘ ভাগ্যরেখা, প্রত্যেক আঙুলে তাঁর চার-পাঁচটি করে ঘাট।

অসাধারণ মানুষ, জয়ন্ত ভাবলো, চেহারাও তাই সাধারণ মানুষের মতো নয়। নিজের হাতখানা ঊরুর উপর চিৎ করে ফেলে লক্ষ করলো নিজের ভাগ্যরেখাটি, কব্জি থেকে একটু উঠে কেমন যেন ভেঙে গেছে। ও জানে, দেখেছে আগেও, কিন্তু দমেনি। সৌভাগ্য নিয়ে কেউ কেউ জন্মায়, ঠিক আবার কেউ কেউ নিজের সৌভাগ্য রচনাও করে নিতে পারে। করেছে। পুরুষকার না কী যেন বলে তাকে।

দমদমে পৌঁছে দেখলো জামাল দাঁড়িয়ে। খুশী-খুশী মুখ। আলা

[illegible] করতে, যাত তো বেশ হয়রান [illegible], মা দেখে বিমর্ষ হল।
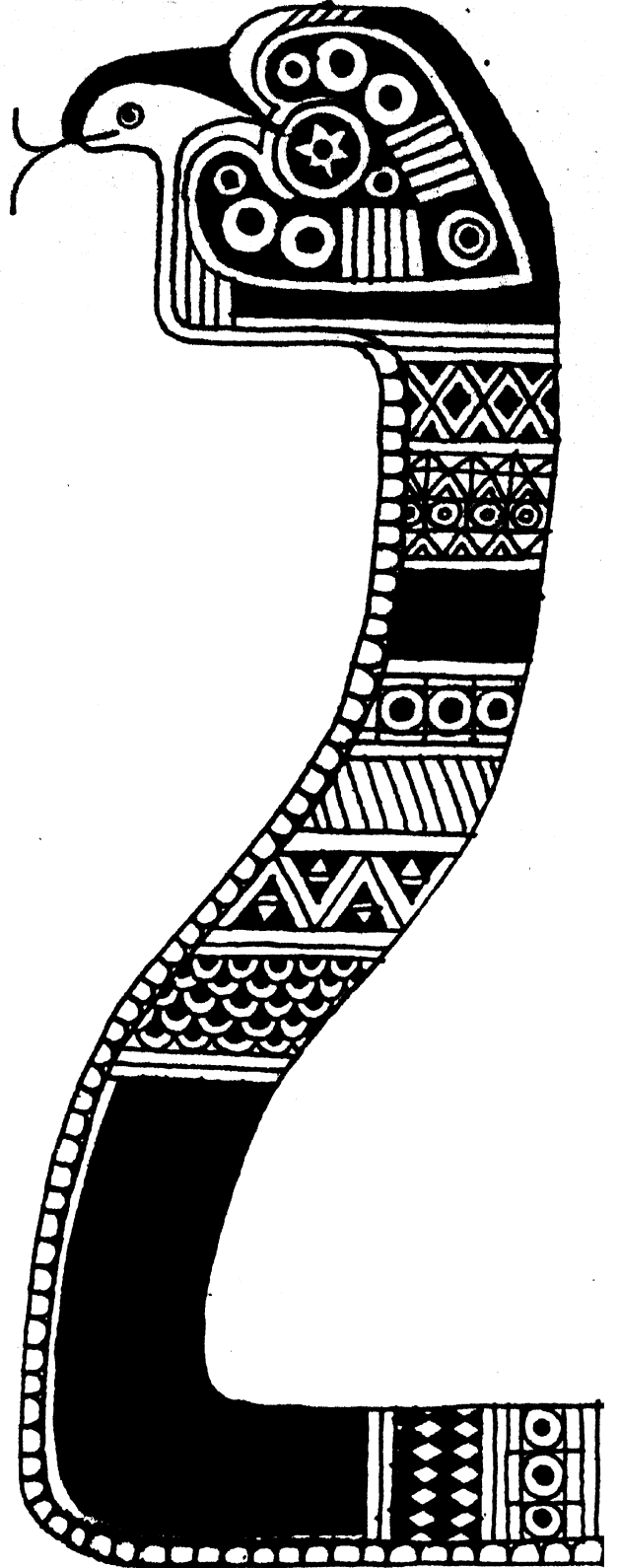
ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলো, "সবাই ভালো আছে?"

পরিষ্কার বাংলা বলতে পারে জামাল। বললো, "ভালো আছে সব। দি-দি ছেড়ে দিতে এল না।"

গাড়িতে উঠে একটা সিগারেট ধরালো জয়ন্ত। মনে পড়লো, শনিবার আজ। শনিবারে বিশেষ প্রোগ্রাম থাকে।

"বৌদি কলকাতায়?" একটু পরে আবার ও জিগ্যেস করে।

—"কাল ফিরবেন। রামজীবনপুরে গেছেন।"

—"ভালোও লাগে! বিড়বিড় করে জয়ন্ত।" আজ দুর্গাপুরে, কাল চিত্তরঞ্জন, পরশু রামজীবনপুর—এই টো-টো করে ঘোরা মিঠুর ভালোও লাগে! ঘরের খেয়ে এই বনের মোষ তাড়ানো—বিরক্তি আসে না ওর। ক্লান্তি?

পরক্ষণেই ওর মনে হল, থামোকা ছুটতে ছুটতে প্রাণ হাতে করে আসার কোনো দরকার ছিল না। একদিন আগে ফিরলাম। অর্থাৎ একটা দিন বাঁচলো। কোথা থেকে বাঁচলো? একটা দিন বেশি কাজ করতে পারবো? না, একদিন বেশি ছুটি পাবো জীবনে? আয়ু কি একদিন বাড়লো? তা যদি বাড়লো না, তাহলে কী হোল লাভ একদিন আগে পৌঁছে। হয়েছে, নিশ্চয় লাভ হয়েছে কোথাও, ভাবতে ভাবতে জয়ন্ত অনুমান করে, যে-বাড়িটা [illegible] জন্যে ও বদ্ধপরিকর [illegible], সে-বাড়িটা ও একদিন আগে ছোঁবে।

জয়ন্তর ঠাকুর্দা ছিলেন উকিল। যথেষ্ট পয়সা রোজগার করেছেন জীবনে। পাঁচ কন্যাকে পাত্রস্থ করেছেন। দশ কাঠা জমির ওপর ভবানীপুরে এই বাড়িখানি তৈরী করেছেন। একমাত্র পুত্রের ওপর বর্তেছে সেটি।

জয়ন্তর বাবা শ্রীনাথ ব্যানার্জী এনট্রান্স অবধি পড়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। উপার্জনের কোনো তাগিদ তাঁর ছিল না, উপার্জনের প্রয়োজনও ছিল না হয়তো, তবু পাছে স্বদেশী হাঙ্গামায় যেতে গোল্লায় যান, সেই ভয়ে এক মার্চেন্ট আপিসে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। তিন বছর দাম্পত্যজীবন যাপন করে এখন তিনি বিপত্নীক হয়েছেন। ত্রিশ বছর একই পদে চাকরি করার পর অবসর নিয়েছেন এখন।

একতলায় চারখানা, দোতলায় চারখানা—আটখানা ঘর। সামনে খানিকটা খোলা জায়গা। একটা টগর গাছ, অযত্নে বেড়ে ওঠা কয়েকটা ফুলের চারা, একটু জঙ্গল—এদের ঘিরে চার ফুট উঁচু পাঁচিল।

শ্রীনাথ ব্যানার্জী এখন একাই থাকেন দোতলায়। দক্ষিণ-পশ্চিমের কোণের ঘরে। পাশের ঘরে ছোট ছেলে শংকর। বয়েস পঁচিশ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। বাপের মতো সে ও উদ্যোগহীন। উপার্জনের একটা ব্যবস্থা কেউ করে দিলে ও [illegible] দিয়ে যেতে পারতো। দেয়নি কেউ। দাদা জয়ন্তও না। একটু ভুল বলা হল। জয়ন্ত তার ছোট কারখানায় দেখাশোনার ভার দিতে চেয়েছিল এক সময়। অন্তত কেনাকাটার দিকটা—যেখানে চুরি চামারি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শংকর নেয় নি, প্রথমত, ইন্টিরিয়র ডেকোরেশন, ফার্নিশিং ইত্যাদি ব্যাপারে, শৌখিন শিল্পে ওর আগ্রহ ছিল না, দ্বিতীয়ত, দাদার কর্মচারী-পদে কাজ করতে ওর আত্মসম্মানে আঘাত লাগতো। সম্প্রতি সে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়েছে, এবং কী প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ কাঠামোটা ভেঙে সাজা যায়, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সেই পরিকল্পনায় ব্যাপৃত। উঠতি শিল্পপতি দাদাকে ও গোপনে ঘৃণা করছে আজকাল। মাঝে মাঝে বুড়ো বাপের খবরাখবর অবশ্য সে নেয়।

দোতলায় বাকি ঘরদুটি জয়ন্ত ও তার পরিবারের জন্যে নির্দিষ্ট। একটিতে দশ বছরের মেয়ে রুবাই, সাত বছরের ছেলে টোনটু ও তাদের দেখাশোনা করার জন্যে ভদ্র ও দুঃস্থ পরিবারের একজন বয়স্কা মহিলা—রমনী।

বহুকাল সংস্কার হয় নি, তার উপায় ছিল না। মাঝে মাঝে চুন ফেরানো হত, খসে যাওয়া প্লাস্টারের ওপর তালি মারা হতো ইতস্তত—তার বেশি কিছু না।

কিছুকাল হল সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছে জয়ন্ত। বাইরে থেকে বাড়িটাকে আর তত পুরনো মনে হয় না। ভাঙা ফাটা অংশগুলি নিশ্চিহ্ন হয়েছে। বাথরুমে আধুনিক টালি ও সরঞ্জাম বসেছে। নিচের তলায় দুটি ঘর—একটি কাজের, অপরটি বিশ্রামের জন্যে—নিজস্ব, ব্যক্তিগত বিশ্রামের জন্যে ঠিকঠাক করে নিয়েছে জয়ন্ত। অবশিষ্ট অংশ প্রায় বিচ্ছিন্ন বলা যেতে পারে। উপকরণগতভাবে তো বটেই। পশ্চিমদিকের দুটি ঘরের মধ্যে একটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে স্মিতাকে, তার রিহার্সাল, মহড়া, আলোচনা তর্কাতর্কির জন্যে নির্দিষ্ট। দলের সাজসরঞ্জাম কিছু কিছু—কস্টিউম, [illegible]—এই ঘরের কোণে গাদা করা থাকে। অন্যের প্রবেশ নিষেধ। শেষ যে ঘরটির কোনো বিবরণ দেওয়া হোল না সেটি তালাবন্ধ। [illegible] অপ্রয়োজনীয় বাতিল, ভাঙা, খুলে-পড়া জিনিসপত্র, তিন পুরুষের স্মৃতিসমৃদ্ধ ধুলোবিমণ্ডিত জঞ্জাল, শোনা যায় যদি কাজে-লাগে ভেবে [illegible] রাখা আছে। জয়ন্ত ফেলে দিতে চেয়েছিল, শ্রীনাথ কিছুতেই নষ্ট হতে দেন নি সেগুলি।

রবিবারে, যারা ভাগ্যবান, তাদের ছুটি। যারা চাকুরেবাবু, তারা এই দিনটা আড্ডা দিয়ে, ঘুমিয়ে, সিনেমা দেখে, ঢেকুর তুলে কাটায়। জয়ন্তর মতো যারা, তাদের [illegible] পোকা সর্বক্ষণ [illegible]।

কারখানাটা একবার না দেখে স্বস্তি পাচ্ছিল না। তাই রবিবার সকালে ছুটলো তারাতলা। একবার গিয়ে পড়লে, বাস্! কিছুই উচিতমতো হয় নি। কেন হয় নি? না, এটা বিগড়েছে, ওটা ফুরিয়েছে, অমুক আসে নি, তমুক দিল না—এই সব সহস্র অজুহাত। অজুহাত ছাড়া কী? প্রতিজ্ঞা থাকলে এমন কিছু কি আছে যা মানুষের অসাধ্য? আসল কথা, মাথা খাটায় না। যাদের ওপর দায়িত্ব, তারা যথেষ্ট সজাগ নয়। দূরদর্শিতা আর সাধারণ জ্ঞানের অভাব অনেক সহজ সমস্যাকে গুরুতর করে দেখায়, জয়ন্তর ধারণা।

ইচ্ছে ছিল বিকেলটা অন্তত বাচ্চাদের সঙ্গে কাটাবে, তা-ও হল না। কারখানা দেখে ফিরলো সন্ধের পর।

স্নান সেরে নিজের ঘরের নিভৃতে এক কাপ কফি নিয়ে বসেছিল জয়ন্ত। একটা দরকারি চিঠি মকশ করছিল, এমন সময় পর্দা ঠেলে ঢুকলো—আর কে—রুবাই। রোগা, ফর্সা। লম্বাটে মুখ। সামনের দাঁত দুটি অপেক্ষাকৃত বড়ো।

জিগ্যেস করলো, "তুমি কি হাওড়ায় যাবে বাবি?"

—"হাওড়ায়?" মেয়ের ঠাণ্ডা কচি হাতটা ধরে টেনে আনলো, কাছে বসালো জয়ন্ত, "কী আছে হাওড়ায়?"

রুবাই-এর বড়ো-করা চোখ দুটো দেখেই ওর মনে পড়ে গেছে। —"ও-হো, তাই তো, মিঠু-মা আসছে, তাই না? কখন ট্রেন তুমি জানো?"

—"টেলিফোন করে জেনে নাও না।"

একটু কী চিন্তা করলো জয়ন্ত। তারপর বললো, "জামাল গাড়ি নিয়ে যাক্ না। সঙ্গে তো আরো লোক থাকবে।"

বসেছিলো, উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু গেল না রুবাই।

বললো, "তুমি চলো না। তাহলে আমরাও যাই। মাকে নিয়ে আসি।"

স্বচ্ছ, ভাবাবেগবর্জিত মন নিয়ে ভাবলো জয়ন্ত। দুটো বাচ্চাকে নিয়ে রাত ন'টার সময় হাওড়া স্টেশনে ছোটা যুক্তিযুক্ত কিনা। ওদের ঘুমোতে দেরি হয়ে যাবে। ট্রেন লেট থাকলে সকলে মিলে অকারণ অপেক্ষা করা। স্টেশনটা অত্যন্ত নোংরা, দুর্গন্ধে ভরতি। তা ছাড়া, স্মিতার সঙ্গে নাটকের গোটা দলটা তো ফিরছে। ওরাই কেউ বাড়ি অবধি ছেড়ে, দু-একটা ট্রাংক, বাক্স নামিয়ে যাবে হয়তো। স্মিতাই বিরক্ত হবে ওদের দেখলে।

সিদ্ধান্ত নেবার আগেই অবশ্য ঘরে ঢুকলেন শ্রীনাথ। টোনটু টানতে টানতে নিয়ে এসেছে বুড়ো মানুষটাকে দোতলা থেকে।

—"দাদু, তুমি বলো, তাহলে বাবি যাবে।"

লম্বাটে মাথার প্রায় সবটাই টাক। তিনদিকে অল্প চুলের ঘের। ছোট করে ছাঁটা সাদা চুল, সাদা ভুরু, সাদা গোঁফ। ধুতির ওপর একটি ফতুয়া পরা। শিশু দুটির সখা তিনি, দু চোখে বিচ্ছুরিত স্নেহ দেখলে ধরা পড়ে।

শ্রীনাথ বললেন, "সবাই মিলে যাও, মিঠু-মাকে নিয়ে এসো। একদিন নিয়মের ব্যতিক্রম হলে কিছু হবে না।"

গলা নামিয়ে বললেন, "এরা হাঁফিয়ে উঠেছে, বেচারি।"

গাড়িবারান্দা করতে গিয়ে দেরি। ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে জয়ন্ত যখন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছয়, তখন ট্রেন এসে গেছে। নেমেছে লোকজন। যাদের মালপত্র বেশি নেই, তারা চলতেও শুরু করেছে।

স্মিতা ওরফে মিঠু-মার এমনই চেহারা এবং চরিত্র যে ওকে লক্ষ না করে উপায় নেই। হাজার মানুষের ভিড়ে মিশে থাকার মতো, হারিয়ে যাবার মতো মানুষ সে নয়। প্রতিমার মতো গোল ফর্সা ওর মুখখানা, সামান্য চাপা থুতনি, ছড়ানো বড়ো ঠোঁট দুটো আর চঞ্চল দুটো চোখের তারা একজোট হয়ে প্রথমেই আপনার নজর কেড়ে নেবে। তারপর আপনার দৃষ্টি আটকে রাখবে কপালের টিপটা। বড়ো টিপ পরা ওর প্রিয় একটি শখ। দু-চোখের চাঞ্চল্যের মাঝখানে একখণ্ড স্থিরতা।

উপরন্তু, ওর কথা। অপরের কথা শোনার চেয়ে নিজের কথা বলতে ওর বেশি ভালো লাগে। হয়তো সব মেয়েদেরই বৈশিষ্ট্য এটা, কিন্তু স্মিতা পারে। গুছিয়ে, মজা করে, উপযুক্ত ভঙ্গি দিয়ে ওর কথা ও বলতে পারে, তাই অন্যেরা শোনে, শুনতে বাধ্য হয়। নাটক ওর রক্তে ঢুকে গেছে।

পাঁচ-ছজন পুরুষ, স্মিতা ছাড়া আর একজন মহিলা—এই ছোট দলটা প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাংক, সুটকেস, হোল্ডল একটার পর একটা নামাচ্ছে কুলিরা। রোগামতন একটি ছেলে কামরা থেকে তদারক করছে।

—"আমাদের এগারোটা জিনিস, সুধীর, তোমাকে বাদ দিয়ে আমাদের এগারোটা জিনিস, মনে রেখো।" দূর থেকে স্মিতার গলা শোনা যাচ্ছে।

রুবাই, টোনটু তো ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো। হাত-ব্যাগ সামলে ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলে নিল, আবার নামিয়ে দিল স্মিতা। পাকা আম যে-ভাবে দু-পাশ থেকে টেপে, সেভাবে রুবাই-এর গাল দুটো টিপে স্মিতা জানতে চায়, ওর মুখ শুকনো কেন, ওর অসুখ-বিসুখ করেছে কিনা।

ওর হয়ে জয়ন্ত উত্তর দেয়, "মন কেমন করেছে মিঠু-মার জন্যে। আমাদের সকলেরই মন কেমন করেছে।"

—"ঈশ্, কত না মন একজনের!" স্মিতা একবার জয়ন্তর দিকে একবার দলপতি অপরেশদার দিকে চেয়ে কথাগুলো বললো।

ঢ্যাঙা, অকৃতদার এই বয়স্ক মানুষটির সঙ্গে জয়ন্তর পরিচয় আছে। সৌম্য, শান্ত অভিনয়শিল্পে সমর্পিতপ্রাণ এই ভদ্রলোক তার যথাসর্বস্ব দিয়ে দলটি গড়ে তুলেছে শুধু নয়, বেঁধে রেখেছে স্নেহ ও যত্ন দিয়ে।

পারিবারিক পুনর্মিলনের দৃশ্যটি উপভোগ করছিল অপরেশ। স্মিতার,

মন্তব্যে সে সাড়া দিল না। বললো, "তোমরা এগোও স্মিতা, এগিয়ে পড়ো। ওই ট্রাঙ্ক দুটো সঙ্গে নিয়ে যেও যেন।" তারপর, হঠাৎ মনে পড়ে গেছে যেন, "ভুলো না, কাল থেকে রিহার্সাল। শনিবার শো।"

—"ওমা, তাই তো। আমি আর পারি না অপরেশদা," স্মিতা প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে।

বলে, "দু-দিন শুধু ঘুমোতে চাই। আমার একটা আলাদা ঘর চাই। ওদের বলেছিলাম, কারো সঙ্গে শুতে পারি না। সে ব্যবস্থা ওরা করেনি।"

অপরেশ এবার একটু হাসলো। দুটো হাত জোড়া করে বললো, —"ওদের হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি।"

—"তুমি কেন ক্ষমা চাইবে? আসলে, তুমি না থাকলে আমি কবেই চলে আসতাম।"

জিনিসপত্র নামানো হয়ে গেছে। গোনা হয়ে গেছে। সুধীর দুজন কুলিকে নিয়ে এগিয়ে গেছে জয়ন্তর গাড়িটার দিকে।

গাড়িতে ওঠার আগে জয়ন্ত পেছন ফিরে তাকায়। দেখতে পায়, অপরেশের দুপাশে ওর দলের লোকেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, হাত নাড়ছে, আর অপরেশ তার পাজামা ও পানজাবির ভেতর থেকে ক্ষমাসুন্দর মুখখানি বার করে চেয়ে আছে ওদের দিকে। একটা কুৎসিত গালাগাল জিভের ডগায় এসে গিয়েছিল। গিলে ফেললো জয়ন্ত।

অথচ, বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যে-উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তার ফলে একা জয়ন্ত নয়, সবাই। স্মিতা, বাচ্চা দুটো, শংকর কাকা, বৃদ্ধ শ্রীনাথ সকলেই কিছুক্ষণের জন্যে তাদের নিজস্ব সূক্ষ্ম বেদনা-অভিমানের বোধ ভুলে যায়।

বাড়িতে ঢোকার দরজার মুখেই ঠিক নয়, একটু দূরে টগর গাছটার কাছে থেমে-থেমে শ্বাস পড়ার শব্দ। জিনিসপত্র নামাতে এসেছিল বংশী, সে-ই টের পায় প্রথম। আলো একটা জ্বলছে নিচু পাওয়ারের, তবু বাড়ির সামনে ছোট খোলা জায়গাটা অন্ধকারই। অন্তত, খানিক দূরের জঙ্গল, ভাঙা ইট-খসা প্লাস্টারের ঢিবি—সবই অস্পষ্ট।

শুয়ে ছিলেন শ্রীনাথ। উঠে জানলার কাছে এলেন। ওপর থেকে জিগ্যেস করলেন, "কী রে, কী হয়েছে?"

সাপ।

ওপরে যারা ছিল, সবাই হুড়মুড় করে নেমে আসে। ছড়ি, ছাতা, টর্চ—হাতের কাছে যে যা পেয়েছে নিয়ে এসেছে। কোথায় সাপ, ঠিক না জানার ফলে গাড়ি থেকে কাউকে নামতে দেওয়া হয় না। জয়ন্ত বংশীর সঙ্গে টর্চ হাতে আস্তে আস্তে এগোয় শব্দটার দিকে। হাতে একটা খোলা ছুরি নিয়ে এসে দাঁড়ায় শংকর। আলোর ঠিক নিচেই দাঁড়ায় বলে ওর ছুরি ও চোখ চকচক করতে থাকে। শংকর চিৎকার করে, "মারো, মারো।"

আরো দু-পা এগিয়ে এসেছেন শ্রীনাথ। হাতে ছড়ি। ভৃত্যকে বলছেন, "এগিয়ে যা, ছুটে গিয়ে মার, নইলে পালাবে।" পুত্রকে বলছেন, "টর্চটা বংশীকে দিয়ে দে, ও দেখতে পাচ্ছে না। তুই চলে আয়, আর বাহাদুরি করতে হবে না।"

সাপই। বেশ বড়ো। প্রায় এক মিটার লম্বা। এইমাত্র গাড়ির চাকায় থেঁতলে গেছে। মাথার দিকে খানিকটা অংশ জ্যান্ত। তাই কোনোক্রমে সাপটা তার যন্ত্রণা ও আক্রোশ প্রকাশ করছে।

ছোট লাঠিটা তুলে তাক করছে বংশী। ক্ষিপ্র হাতে আঘাত করলো। ততোধিক ক্ষিপ্রভাবে সাপটা মাথা সরিয়ে নেয়। কারুকার্য করা মাথা দোলায়। ফোঁস ফোঁস করে রাগ ঝাড়ে। বিস্ফারিত দুটো চোখ দিয়ে, জয়ন্তর মনে হল, ও যেন বলছে—দিস ইজ নট ফেয়ার। চিরিক-চিরিক করে জিভ বার করে সাপটা যেন বলছে—আমি নির্দোষ।

মরা সাপটাকে লাঠির ডগায় ঝুলিয়ে একসময় আলোর নিচে আসে বংশী। হাঁপাচ্ছে। গাড়ির ভেতর থেকে নেমে আসে বন্দীরা। শংকর তার ছুরির ফলা সাপটার মাথায় বসিয়ে দেয়।

শ্রীনাথ হুকুম দেন, "পুড়িয়ে ফেল এখুখুনি। হাওয়া লাগলে বেঁচে উঠতে পারে আবার।"

—"নাঃ, এটা আর বাঁচবে না।" সাপ বিশারদ বংশী বলে। "তবে এর জোড়াটি আছেন এই ভিটের মধ্যে। আমাকে পেলে তিনি ছাড়বেন না, বাবু"।

—"বটে! তাহলে কদিন তুই ওপরে শো।" শ্রীনাথ সান্ত্বনা দিলেন. বললেন, "কলকাতা শহরে সাপ আসে কোত্থেকে? আশ্চর্য।"

ওপরে শোবার ইচ্ছে জয়ন্তরও হয়েছে। সম্পূর্ণ অন্য কারণে অবশ্য। কোথায় যেন একটা প্রকাণ্ড ফাঁক থেকে যাচ্ছে, ও অনুভব করে। কয়েকদিন রাত্রে ওর ভালো ঘুম হয় না। ঝাপসা ক্লান্তি যেন সেঁটে থাকে মাথার মধ্যে। কারখানা থেকে ফিরলেই চেপে ধরে ওটা।

সন্ধেবেলা স্মিতা বাড়িতে থাকে না। হয় রিহার্সাল, না হয় শো। বাংলা কাগজে ওর অভিনয়ের প্রশংসা বেরোয়, ওর ছবি বেরোয়। বাংলা মঞ্চের ইতিহাসে স্মিতা ব্যানার্জির নাম নাকি সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে—ছাপার অক্ষরে এই সব কথা লেখা থাকছে আজকাল। জয়ন্তর ধারণা, ওই অপরেশ লোকটা এ-সবের পেছনে কলকাঠি নাড়ছে। স্মিতার প্রতিভা নেই এমন কথা অবশ্য জয়ন্ত মনে করে না। আমরা কেউ অন্যের প্রিয় কাজে বাধা দেব না, বিয়ের আগে ওদের মধ্যে এই কথা তো হয়ে গেছে। তবু, সন্দেহ হয়, স্মিতাকে ধরে রাখার জন্যে, ওকে হারাবার ভয়ে, অপরেশ অমরত্ব-জাতীয় একটা মোহ ওর সামনে ঝুলিয়ে রাখছে। যার ফলে সংসারে ওর মন নেই।

নাকি মোহটা সফলতার? স্বীকৃতির? সে তো জয়ন্তরও আছে। উত্তরোত্তর বেশি করে দর্শকের হাততালি পাচ্ছে স্মিতা। উত্তরোত্তর বেশি সংখ্যায় বিক্রি হচ্ছে জে-বি টি-ভি। দুই-ই তো সফলতার স্বীকৃতি।

এদিকে অনেক কথা জমে যাচ্ছে। নিভৃতে বলার মতো অনেক কথা বলা হয়ে উঠছে না। মিঠু, তুমি যদি সামান্য, সাধারণ একটি মেয়ে হতে, স্ত্রীলোক ছাড়া অন্য কিছু না, তাহলে কী ভালো হত?

একদিন সকালে চায়ের টেবিলে কথাটা পাড়লো জয়ন্ত।

—"মিঠু, আমাকে একটা ডেইট দাও।"

প্রথমে বুঝতে পারেনি স্মিতা। ভেবেছে, ডিম বা টোস্ট, বা নুন-মরিচ কিছু চাইছে।

জয়ন্ত আবার বললো, "এই শোনো, আমাকে একটা ডেইট দেবে?"

—"তার মানে?" অবাক হয় স্মিতা

—"ডেইট মানে ডেইট। একটা দিন, একটা সম্পূর্ণ রাত আমার সঙ্গে কাটাও, চাইছি। অনেককাল আমাদের দেখা হয় না।"

একটু চুপ করে থেকে স্মিতা বললো, "তোমার সময় হবে? এতটা সময় নষ্ট করলে ক্ষতি হবে না?"

—"না।"

—"কবে বলো।"

—"যেদিন তোমার সুবিধে।"

আচমকা গলা ধরে আসছিল স্মিতার। সামলে নিয়েছে। মুখে কৌতুক ফুটিয়ে, ঠোঁট দুটি ছড়িয়ে পাকা অভিনেত্রীর মতো হাসলো।

বললো, "আজ তো হবে না। কাল নাঃ। তারপর দুটো দিন তো বাইরে শো, কথাই ওঠে না। ফিরে এসে বিশ্রাম চাই একদিন। আচ্ছা, আজ বৃহস্পতিবার, পরের বৃহস্পতিবার তোমার স্যুট করবে? রবিবারটা ইচ্ছে করে অ্যাভয়েড করছি।"

কিছুই না ভেবে জয়ন্ত বললো, "ঠিক আছে।"

ব্যাপারটা নিতান্তই ব্যক্তিগত, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবু বিশেষ এক বৃহস্পতিবারে, ভবানীপুরের বিশেষ একটি পরিবারে, স্বস্তি যেন শিরীষ ফুলের গন্ধের মতো ছড়িয়ে থাকে। ব্যস্ত হয়ে ওঠেন বৃদ্ধ শ্রীনাথ। সকাল থেকে বাগান সাফাই কাজে লেগে যান বংশীকে নিয়ে। যেখানে যত চুন-সুরকির চাঙড়, ঢিল, ইট-পাটকেল জমা ছিল, সব খালাস করেন। মুমূর্ষু দোপাটির চারাগুলো সতেজ করে তোলার জন্যে মাটি ঢিলে করে দেন। বংশী জল ঢালে। পাঁচিলের ফাটলে অ্যাসিড ঢালে। টগরগাছ ছাড়িয়ে ডানদিকে পাঁচিলের গায়ে টিনের শেড। তার নিচে ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা নীল রঙের গাড়িটা শুধু একা ঝিমোয় চুপচাপ। ড্রাইভার আজ আসবে না, ওকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

বাচ্চাদের ঘরে একটা খাটের ওপর বসে জয়ন্ত দোতলা থেকে এইসব দেখছিল। আর সিগারেট টানছিল। ঘরটার মধ্যে কেমন ভ্যাপসা গন্ধ। দেয়ালে ছোপ, পেনসিলের আঁকিবুকি। খাটের নিচে ছড়ানো ছিটোনো ভাঙা খেলনা, ছেঁড়া বই। বাচ্চা দুটো একবার কাকার ঘর একবার নিজেদের ঘর—ছুটোছুটি করছে।

সবুজ একটা শাড়ি পরে দাঁড়িয়েছিল স্মিতা। আলনায় বাচ্চাদের জামা-কাপড় পাট করে টাঙাচ্ছিল।

জয়ন্ত বললো "টোনটুটা একেবারে দিদির ল্যাংবোট হয়েছে দেখেছ?"

—"হুঁ।"

"আচ্ছা, বুবাইকে বড্ড রোগা লাগছে না? পেট ভরে খায় না? রজনী কী করে সারাদিন?"

—"পেটের অসুখটা সারছে না, ও বলছিল। বড়ো ডাক্তার দেখানো দরকার। একদিন খুব বাড়াবাড়ি গেছে নাকি। তুমি তখন ছিলে না।"

জয়ন্তর বলতে ইচ্ছে হল, ওদের দিকে একটু নজর দেওয়া দরকার। বললো না। স্মিতাও কি বোঝে না, দরকার? বোঝে। কিন্তু কে দেবে, কখন দেবে?
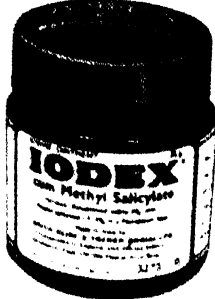
জয়ন্ত বলে, "জানো, এবার বম্বের টিপটা খুব সাকসেসফুল হয়েছে। কী বিরাট মার্কেট ওদিকে, তুমি ধারণা করতে পারবে না। কম্পিটিশন আছে তেমনি। তবে আমার সেট-এর দাম কম রেখেছি, আমার লেবার-চার্জ কম আমার ওভারহেড কম। আমার ল্যামিনেটেড ক্যাবিনেট—তার ডিজাইন ফিনিশ-এর সঙ্গে কেউ পাল্লা দিতে পারবে না। হাজার হোক, একসময় তো আর্টিস্ট ছিলাম। বিউটি কী জিনিস, আমি বুঝি।"

স্মিতা বলতে যাচ্ছিল তাহলে এবার বম্বেতে গিয়ে বসে থাকো, তার আগেই জয়ন্ত বলে, "আরেকবার শিগগির যাওয়া দরকার ঠিকমতো সার্ভিসিং-এর ব্যবস্থা চালু করে আসতে হবে।"

আলনা থেকে সরে এসে বিছানার কাছে দাঁড়ায় স্মিতা।

—"তুমি বিউটির কথা বললে। অপরেশদা কী বলে জানো? সুন্দর যে, তার সামনে দাঁড়ালে পুরুষদের মন দুভাবে রিঅ্যাক্ট করতে পারে। হয় সে সুন্দরকে পুজো করবে, না হয় নষ্ট করবে।"

—"আর মেয়েদের মন?"

স্মিতা এবার জয়ন্তর দুটো কাঁধে হাত দিয়ে বলে "অপরেশদা বলে সুন্দর দেখার চোখ মেয়েদের দেননি ঈশ্বর। যারা দেখতে চায়, তারা আজনা ফেলে দেখে।"

—"তুমি মানো?"

—"নাঃ। আমার মনে হয় সুন্দর বলে অ্যাবসলুট কিছু নেই। যা মন টানে, তাই সুন্দর।"

জয়ন্ত স্ত্রীর গোল ফর্সা মুখটার দিকে তাকায়, তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কপালে সবুজ টিপটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, যেভাবে লোকে চন্দ্রগ্রহণ দেখে সেইভাবে।

ওর বলতে ইচ্ছে করে তোমার অপরেশদা কী টাইপের পুরুষ? পুজো পুজো টাইপ, না নষ্ট টাইপ।

বলে, "আচ্ছা, আমি কীরকম প্রকৃতির লোক বলে তোমার ধারণা? পুজো না নষ্ট?

—"নষ্ট।"

খাটে বসেই দু-হাত বাড়িয়ে স্মিতার খোলা কোমর জড়িয়ে ধরে জয়ন্ত। নাভির ওপর চুমো খায়। নাভির একটু নিচে কাটা-কাটা চামড়ায় ও আলতো করে দাঁত বসিয়ে দেয়। বলে, "এসো, তোমায় ছিঁড়ে-খুঁড়ে নষ্ট করি সুন্দর।"

হাত দিয়ে মুখখানা ঠেলে সরিয়ে দেয় স্মিতা। বলে, "এখন নয়।"

সকালে অনেকক্ষণ ছেলেমেয়ের সঙ্গে ক্যারম খেললো জয়ন্ত। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সকলে একত্র শুয়ে ঘুম দিল। অকারণ সময় নষ্ট করছে, ওর মনে হল না। বিকেলে সাজগোজ করে বেড়াতে গেল ওরা। শংকরকাকা আইসক্রীম খাওয়ালো। বেলুন কিনে দিল। ময়দানে খোলা আকাশের নিচে, জোৎস্না-ভরা ফুরফুরে বাতাসে গুনগুন করে গান গাইল স্মিতা।

বাড়ি ফিরে এসে শোনে, আর একটা সাপ মেরেছে বংশী।

—"সেদিন থেকে তক্কে তক্কে আছি। যাবেন কোথায়। ওটাকে যেখানে পুড়িয়েছিলাম, সেখানটায়, গোড়া ঘাসগুলোর ওপর ঘুরঘুর করছিলেন ইনি। চলে যাচ্ছিলেন, আবার ফিরে ফিরে আসছিলেন।" বংশী ফলাও করে ওর বুদ্ধির গল্প শোনায়।

আগেরটার চেয়ে এটা যেন একটু ছোট। কিন্তু তেমনই [illegible] খর। ভিটের মধ্যে বিষধর সাপ পুষে রাখার সত্যি কোনো মানে হয় না, জয়ন্ত স্বীকার করে মনে-মনে, তবু সাপটার জন্যে ওর কষ্ট হয়। ওর গায়ে হাত বুলোতে ইচ্ছে করে।

বংশীর দিকে চেয়ে বলে, "এটা বোধ হয় মাদী।"

সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। নিচে নেমে গেছে বংশী। দোতলার এ-ঘরেও পুরোদমে পাখা চলছে। তবু ওদের ঘুম আসছিল না। অনেক কথা জমে গেছে দুজনের, যে-কথা আর কাউকে বলা যায় না। যে-কথা রাত্রে শুয়ে দুজন প্রণয়ী নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে। অর্থহীন, এলোমেলো, আবোল তাবোল চিন্তা-ভাবনা অভিমানের কথা সে-সব। ভাজাপেনাপনা। এসব কথা শুনিয়ে হাততালি পাওয়া যাবে না একটাও, বিক্রি হবে না একটিও টি-ভি সেট।

স্মিতা বলছিল, "গ্রুপ নিয়ে আমাদের বিদেশে যাবার কথা হচ্ছে। আমেরিকায়, ক্যানাডায়। প্রায় দুমাস বাইরে থাকতে হবে। সেই সময় বাচ্চা দুটোকে একটু দেখো, বুঝলে।"

জয়ন্ত বলে, "তোমার ওই অপরেশদার সঙ্গে জুটি বেঁধে নাটক করা—ছেড়ে দেওয়া যায় না?"

—"তুমি পারো সব ছেড়ে ছুড়ে বাড়িতে বসে থাকতে?"

—"ওটা আমার জীবিকা।"

—"ওটা তোমার আনন্দও বটে, যেমন অভিনয় করায় আমার আনন্দ। ছেড়ে দিলে আমার কাছে বেঁচে থাকার কোনো মানে নেই।" বলতে গিয়ে স্মিতার গলা ভেঙে যায়।

একটু চুপ করে থেকে জয়ন্ত বলে, "সাপ হয়ে জন্মালে হয়তো পারতে, মিঠু।" ধীরে ধীরে স্ত্রীর খোলা পিঠে, কোমরে হাত বোলায়।

"পারতাম। তুমিও পারতে। কিন্তু আমরা যে সভ্য মানুষ হয়ে পড়েছি। আমরা আর জোড়া সাপ হতে পারবো না কোনোদিন।"

বিজ্ঞান

কলকাতার ভেরিয়েবল সাইক্রোট্রন যখন চালু হল

১৬ জুন ১৯৭৭। মধ্যরাত্রি। কলকাতার সল্ট-লেক উপনগরী তখন সুষুপ্ত। ব্যতিক্রম শুধু একটি বাড়ি। সেই উপনগরীরই এক প্রান্তে। সেখানে তখন মধ্যাহ্নের ব্যস্ততা। যুদ্ধকালীন তৎপরতা নিয়ে গত কয়েক দিন ধরে প্রচণ্ড পরিশ্রম করার পর উদ্বেলিত হৃদয়ে সেখানে মুহূর্ত গুণে চলেছেন কয়েক ডজন পরমাণুবিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ্ এবং কুশলী। সবার মনেই এক প্রশ্ন : সাফল্য, না ব্যর্থতা?

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলল। সেই সঙ্গে একে একে শেষ করা হল শেষ প্রস্তুতির পালা।

অতঃপর কন্ট্রোল রুম থেকে মাইক্রোফোনের ঘোষণা : সাবধান! ভল্টের মধ্যে এবার তৈরি হচ্ছে তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ।

মুহূর্তে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি গিয়ে নিবন্ধ হল কন্ট্রোল প্যানেলের সারিবদ্ধভাবে বসান নির্দেশক কাঁটাগুলির ওপর। ভ্যাকুয়াম চালু হয়েছে। চালু হয়েছে ঠাণ্ডা জলের পাম্প, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অসসিলেটার। হাজার হাজার বিভব মাত্রার তড়িৎ-বর্তনী।

রুদ্ধশ্বাস! সবাই রুদ্ধশ্বাস। দীর্ঘ দশ বছরের পরিকল্পনা এবং পরিশ্রমের পর শেষ মুহূর্তে এসেও সবার মনে একই প্রশ্ন : সাফল্য, না ব্যর্থতা?

পুব আকাশ ফরসা হয়ে উঠল কখন, কেউ জানেন না। ঘড়িতে তখন ছ'টা।

ভল্টের মধ্যে বসান যন্ত্র দানবটির হৃদস্পন্দন ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। কন্ট্রোল রুমে বসান টেলিভিশন পর্দায় ভেসে উঠেছে একফালি আলো। শুরু হল যন্ত্রগণকের মগজের লড়াই।

হ্যাঁ, সাফল্য! পরক্ষণেই যন্ত্রগণক জানিয়ে দিল, তাঁরা সফল হয়েছেন। পরিকল্পনামত সেই যন্ত্রদানব থেকে বেরিয়ে আসছে তেজষ্ক্রিয় রশ্মি। প্রচণ্ড তার শক্তি। প্রায় ৭·৫ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট। তবে সাধারণ আলোক রশ্মি বলতে যা বোঝায় তা অবশ্য নয়। তেজষ্ক্রিয় কণার প্রবাহ। আলফা কণা। যন্ত্র-দানবটি বসান হয়েছে বিরাট এক ভ্যাকুয়াম বা বায়ু-শূন্য চেম্বারের মধ্যে। সেখানে রেখে দেয়া হয়েছিল একফালি তামার পাত। আলফা কণা প্রচণ্ড বেগে এসে আঘাত করল সেই তামার পাতের ওপর। শুরু হল পারমাণবিক বিক্রিয়া। রিমোট কন্ট্রোল থেকে স্বয়ংক্রিয় পর্যবেক্ষক যন্ত্রের সাহায্যে যে সব তথ্য পাওয়া গেল তা থেকে জানা গেল বিক্রিয়াটি ছিল এই রকম :

আলফা কণা+তামা ৬৫=গেলিয়াম ৬৮+১টি নিউট্রন।

গেলিয়াম ৬৮ একটি তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে পজিট্রন বিকিরণের পর এক ঘণ্টার কিছু বেশি সময়ের মধ্যেই এই আইসোটোপটি দস্তা ৬৮তে রূপান্তরিত হল।

সাফল্য! অসামান্য সাফল্য! কলকাতার লবণ-হ্রদে চালু হল পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ সাইক্লোট্রন।

সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রচেষ্টায় এবং প্রায় পুরোপুরি ভারতীয় কাঁচামালে এত বড় সাইক্লোট্রন তৈরির ঘটনা ভারতে এই প্রথম। সারা পৃথিবীতে এ ধরনের যন্ত্র আছে আর মাত্র দুটি। দুটিই মার্কিন দেশে। একটি লরেন্স বার্কলে গবেষণাগারে। অপরটি টেকসাস এ অ্যাণ্ড এম বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাজস্থানে শান্তির উদ্দেশ্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ করার পর ভাবা পরমাণু গবেষণার তত্ত্বাবধানে তৈরি কলকাতার সাইক্লোট্রন ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ এবং পরমাণু বিজ্ঞানীদের আরও একটি ঐতিহাসিক সাফল্যের নজির স্থাপন করল।

*

সাইক্লোট্রন কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর : সাইক্লোট্রন এক ধরনের নিউ-ক্লিয়ার অ্যাকসেলারেটার বা পারমাণবিক ত্বারক যন্ত্র।

অনেকেই হয়ত নানা রকম পারমাণবিক কণার নাম শুনে থাকবেন। যেমন প্রোটন, নিউট্রন, আলফা, প্রভৃতি। প্রোটন পজিটিভ আধান বিশিষ্ট কণা। যে কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যেই এই কণা বাস করে। নিউট্রন আর এক ধরনের পারমাণবিক কণা। এর কোন আধান নেই। তুলনায় আলফা কণার ব্যাপারটা কিন্তু অন্য রকম। এই কণা পেতে গেলে দরকার হিলিয়াম পরমাণু। হিলিয়াম পরমাণুর নিউ-ক্লিয়াসে থাকে দুটি প্রোটন এবং দুটি নিউট্রন। আর সেই নিউক্লিয়াসকে ঘিরে আবর্তন করে দুটি ইলেকট্রন কণা। যাদের মধ্যে থাকে নেগেটিভ চার্জ বা ঋণাত্মক আধান।

ধরুন, বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে হিলিয়াম নিউ-ক্লিয়াসের চার পাশে আবর্তন রত ওই ইলেকট্রন কণা দুটিকে সরিয়ে নেয়া হল। তখন পড়ে থাকবে শুধু হিলিয়ামের নিঃসঙ্গ নিউক্লিয়াস। যার মধ্যে থাকবে দুটি প্রোটন এবং দুটি নিউট্রন। হিলিয়ামের এই নিঃসঙ্গ নিউক্লিয়াসকেই বলা হয় আলফা কণা। বলা বাহুল্য, একটি প্রোটন কণার চেয়ে একটি আলফা কণার ওজন অনেক বেশী। এবং শুধু হিলিয়াম নিউক্লিয়াস বা আলফা কণাই নয়, অন্যান্য মৌলিক পদার্থেরও পরমাণু থেকে ইলেকট্রনদের সরিয়ে নিয়ে পৃথক পৃথক নিউক্লিয়াস পাওয়া যেতে পারে। আলফা কণার তুলনায় এই সব নিউক্লিয়াস ওজনে আরও ভারী।

প্রোটন, আলফা কণা এবং ওই সব নিউক্লিয়াসের বিজ্ঞানীরা নাম দিলেন পারমাণবিক বুলেট। প্রোটন হাল্কা বুলেট, আলফা তুলনায় ভারী, বেশি ওজনের
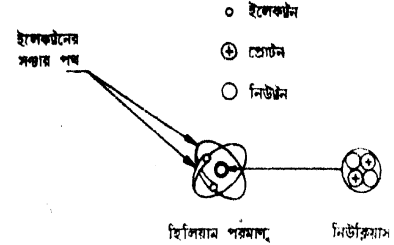
একটি পারমাণবিক বিক্রিয়া

মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসের বুলেট হবে আরও ভারী। ও'রা দেখলেন, ওই সব বুলেটের কোন কোনটি দিয়ে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসে আঘাত করলে ঘটে নানা রকম ঘটনা। বুলেটের আঘাতে কারোর কারোর নিউক্লিয়াস ভেঙে গিয়ে তৈরি করে দুটি ভিন্ন মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াস। কখনও বা এমনও হয়, একটি বুলেট গিয়ে আঘাত করল কোন একটি মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসে। মুহূর্তে ওই নিউ-ক্লিয়াসটি বুলেটটিকে বন্দী করে ফেলল। বরং বলি আত্মসাৎ করল। আর এর ফলে তৈরি হয়ে গেল সম্পূর্ণ নতুন একটি মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াস। উল্লেখ করা যেতে পারে নতুন এই নিউক্লিয়াসটি পরে ভেঙে গিয়ে ভিন্নতর মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসও তৈরি করতে পারে। যেমন ধরুন, প্রোটন + লিথিয়াম ৭ নিউক্লিয়াস—বেরিলিয়াম-৮ নিউক্লিয়াস।

পরে এই বেরিলিয়াম-৮ নিউক্লিয়াসটি স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে ভেঙে গিয়ে তৈরি করে দুটি হিলিয়াম-৪-এর নিউক্লিয়াস বা দুটি আলফা কণা। বুলেটের আঘাতে এই ধরনের ভাঙা গড়ার সময় শক্তি হিসেবে বিভিন্ন ধরনের বিকিরণ বের হয়ে থাকে। পজিট্রন, বিটা, গামা প্রভৃতি বিকিরণ। এই সব ঘটনাকেই বলা হয় নিউ-ক্লিয়ার রিঅ্যাকশন বা পারমাণবিক বিক্রিয়া। পারমাণবিক বিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা পদার্থের মৌল চরিত্র সম্পর্কে নানা রকম মৌলিক তথ্য জানতে পারেন। জানতে পারেন কৃত্রিম উপায়ে বিভিন্ন তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরির কলাকৌশল। অধিক ফলনশীল ফসলের বীজ তৈরির ব্যাপারে যারা সাহায্য করে, সাহায্য করে দুরারোগ্য ক্যানসার নিরাময়ে, ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে, এবং ইত্যাদি।

*

প্রশ্ন : বুলেটের কথা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু সেই বুলেটের সাহায্যে বিভিন্ন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে আঘাত হানতে গেলে প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন। বুলেটকে সেই শক্তি যোগাবে কে?

এ ব্যাপারে নানা রকম পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। তৈরি করেছেন নানা রকম যন্ত্র। সাইক্লো-ট্রন তাদের মধ্যে অন্যতম। এর আবিষ্কর্তা ই. ও লরেন্স।

সাইক্লোট্রনের কার্যপদ্ধতি এই রকম।

ধরুন, ক এবং খ দুটি বায়ুশূন্য ধাতব আধার। ধরুন, বুলেট হিসেবে কাজে লাগান হবে প্রোটন। প্রোটনের উৎস হিসেবে নেয়া হল হাইড্রোজেন গ্যাস। অনেকেই জানেন, হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে একটি প্রোটন।

আকর্ষণ করে একটি ইলেকট্রন। শক্তিশালী বেতার তরঙ্গ, প্রচণ্ড উত্তাপ অথবা বৈদ্যুতিক সম্পর্কের সংস্পর্শে হাইড্রোজেনের ইলেকট্রনকে তার পরমাণু থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। পরিবর্তে তখন পড়ে থাকে পজিটিভ আধানযুক্ত প্রোটন কণা। সাধারণত বৈদ্যুতিক স্পার্কের সাহায্যে হাইড্রোজেন থেকে প্রোটন সংগ্রহ করা হয় ক এবং খ-এর মাঝামাঝি একটি জায়গায় (গ)। ক এবং খ জুড়ে দেয়া হয় বৈদ্যুতিক উৎসের সঙ্গে। ধরা যাক

পারমাণবিক কণা প্রোটন সাইক্লোট্রনে চালিত হচ্ছে

ক-এর সঙ্গে জুড়ে দেয়া হল নেগেটিভ বর্তনী এবং খ-এর সঙ্গে জুড়ে দেয়া হল পজিটিভ বর্তনী। ক এবং খ—এদের প্রত্যেকটিকে বলা হয় D। D দুটির তলের ওপরে এবং নিচে লম্বা অবস্থায় রাখা হয় শক্তিশালী চুম্বকের উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু।

প্রোটন পজিটিভ আধান বিশিষ্ট কণা বলে ধাতব আধার ক তাকে আকর্ষণ করবে। ক নেগেটিভ বর্তনীর সঙ্গে যুক্ত বলে। উক্ত মুহূর্তে তড়িৎ বিভবের দরুন সেই আকর্ষণের ফলে প্রোটন তখন প্রচণ্ড গতিতে ক-এর দিকে ধেয়ে যাবে। শুধু ধেয়ে যাবে নয়, আধারের ভেতর ঢুকে পড়বে। এখন ধাতব আধারের বাইরে থাকে বৈদ্যুতিক আধান। তার ভেতরে কোন আধান থাকে না। ফলে আধারের মধ্যে ঢুকে পড়ার পর ওই প্রোটনের ওপর বৈদ্যুতিক প্রভাব থাকে না। থাকে শুধু ধাতব আধার দুটির ওপরে এবং নিচে রাখা দুটি চুম্বক মেরুর প্রভাব। চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে পড়ে প্রোটন কণা তখন বৃত্তাকার পথে সঞ্চারিত হয়ে এগিয়ে যায় 'খ'-এর দিকে। আর যে মুহূর্তে খ-এর সামনে গিয়ে পড়ে একটি অসসিলেটরের সাহায্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহের দিকটি পালটে দেয়া হয়। তখন 'খ' হয়ে যায় নেগেটিভ, আর ক হয়ে যায় পজিটিভ।

এবার বুঝুন ব্যাপারটা। প্রোটন গিয়ে সবেগে হাজির হল খ-এর সামনে। আর খ নেগেটিভ বলে প্রচণ্ডভাবে তাকে আকর্ষণ করে বসল। এই আকর্ষণে প্রোটনের বেগ গেল খানিকটা বেড়ে। অর্থাৎ তার ত্বরণ ঘটল। বেগ বাড়ার দরুন প্রোটনের কক্ষপথও হল খানিকটা প্রসারিত। তার বৃত্তাকার পথের ব্যাস বেড়ে গেল।

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে বৃত্তাকার পথ ধরে প্রোটন আবার এসে হাজির হল ক-এর সামনে। হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক নেগেটিভে পরিণত হল, খ হল পজিটিভ। ফলে ক আর এক দফা ত্বরিত হল ক-এর কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে। এই ভাবে পর্যায় ক্রমে প্রোটন প্রত্যেকবার একটি D থেকে আর একটি D-এ প্রবেশ করার প্রতিবারেই তার বেগ কিছু না কিছু পরিমাণ বাড়তে লাগল। এবং অবশেষে প্রচণ্ড বেগে তাকে যখন একটি বায় পথের (ঘ) বাইরে নিয়ে আসা হল, দেখা গেল ইতিমধ্যে তার বেগ বহুগুণ বেড়ে গেছে। প্রোটনপথের সামনে কোন পদার্থ রেখে দিলে তখন সে প্রচণ্ড শক্তিতে তাকে গিয়ে আঘাত করবে। আঘাতের ফলে ঘটবে পারমাণবিক বিক্রিয়া। ঠিক এই-ভাবে আলফা কণিকাকেও দ্রুতগতি হিসেবে কাজে লাগান হয়। সংক্ষেপে এই হল সাইক্লোট্রনের কার্যপদ্ধতি।

*

লরেন্স তাঁর নিজের তৈরি সাইক্লোট্রনের সাহায্যে পারমাণবিক গবেষণায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করার পর পৃথিবীর বেশ কয়েকটি গবেষণাগার এই যন্ত্র তৈরির ব্যাপারে এগিয়ে আসেন।

এগিয়ে এসেছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও। তখন ১৯৪০-এর দশক শুরু হয়েছে। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা বললেন, আমরাও তৈরি করব সাইক্লোট্রন।

শুরু করলেনও। বিদেশ থেকে একমাত্র চুম্বকটি নিয়ে আসা ছাড়া সাইক্লোট্রনের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম তৈরি করার ব্যবস্থা হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই বিজ্ঞান কলেজে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থিক সাহায্য করল। গড়ে উঠল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস। এখন যার পরিচয় সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার সহকারী হিসেবে এগিয়ে এলেন ডঃ বাসন্তী দুলাল নাগ চৌধুরী, ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, ডঃ এ পি পাত্র, ডঃ সুধীর মুখোপাধ্যায়, ডঃ বিদ্যুৎমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কৃতী বিজ্ঞানীরা। সাফল্যের সঙ্গে একদিন সত্যি সত্যিই তাঁরা তৈরি করলেন সাইক্লোট্রন। প্রথম ভারতীয় সাইক্লোট্রন। কলকাতার লবণ-হ্রদ উপনগরীতে সদ্য তৈরি যন্ত্রটির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সারা ভারতে এটাই ছিল একমাত্র সাইক্লোট্রন। মৌলিক গবেষণার ব্যাপারে এই যন্ত্রটি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

*

'লবণ হ্রদের সাইক্লোট্রন একটি বড় রকমের চ্যালেঞ্জ।' একবার কথা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের ডাইরেক্টর এবং বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ রাজা রামান্না। 'কলকাতার বিজ্ঞানীরা সাইক্লোট্রন তৈরির ব্যাপারে আগেই ঐতিহ্য রচনা করেছেন। অতএব শক্তিশালী সাইক্লোট্রন যন্ত্র যদি সত্যিই বসাতে হয়, তা হলে সেটা বসবে কলকাতায়।' এটাও ডঃ রামান্নার আর একটি মন্তব্য।

ঠিক হল বিদেশ থেকে ন্যূনতম আমদানি। যাবতীয় সাজসরঞ্জাম দেশেই তৈরি করতে হবে। ঠিক হল, দেশের সরকারী এবং বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলিকে এ কাজে ভূমিকা নিতে হবে। লরেন্স বার্কলে গবেষণাগারের ৮৮ ইঞ্চি সাইক্লোট্রন এবং টেকসাস এ অ্যান্ড এম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইক্লোট্রনকে অবলম্বন করে তৈরি হল ব্লু-প্রিন্ট।

কিন্তু বাধা অনেক। ২৬২ টন ওজনের বৈদ্যুতিক চুম্বক চাই। দেশে এত বড় বৈদ্যুতিক চুম্বক তৈরির মত লোহা আগে কখনও ঢালাই হয়নি। আর সে কি যে সে লোহা! বিশেষ ধরনের লোহা। আমাদের বাস্তু বিজ্ঞানীদের এ ধরনের লোহা ঢালাই করার মত অভিজ্ঞতাও ছিল না। এগিয়ে গেলেন ট্রম্বে এবং কলকাতার বিজ্ঞানীরা। হাত মেলালেন রাঁচি হেভি ইনজিনিয়ারিং করপোরেশনের সঙ্গে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলল আলোচনা। নমুনা পরীক্ষা। অবশেষে এই প্রতিষ্ঠান দৈত্যাকার সেই চুম্বকটি তৈরিও করল। অনেক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, 'আমাদের এই চুম্বকের মান মার্কিন দেশের সাইক্লোট্রনের চুম্বকের চেয়ে অনেক উঁচু।'

এগিয়ে এল ভূপালের ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড। চুম্বকের কয়েলের জন্যে এঁরা তৈরি করলেন বিশেষ ধরনের তামার পরিবাহী। যার ভেতরে আছে ছিদ্র। যন্ত্রটি চালু থাকার সময় ওই ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে ঠাণ্ডা জলের প্রবাহ চলবে। যাতে প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক প্রবাহে কয়েল গরম হয়ে না ওঠে। ট্রম্বের ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের ওয়ার্কশপে তৈরি হল ভ্যাকুয়াম যন্ত্র, ডিফিউশন পাম্প। রিজনেটার ট্যাঙ্ক তৈরি করলেন গার্ডেনরীচ শিপ বিল্ডারস।

সাইক্লোট্রনের মূল বাড়ির পাশে উঠছে সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকসের গবেষণাগার। এই যন্ত্রটিকে কেন্দ্র করে মৌলিক এবং প্রায়োগিক গবেষণার পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে সেখানে।

২২৪ সেণ্টিমিটারের এই সাইক্লোট্রনটি তৈরি করতে মোট খরচ হয়েছে প্রায় ৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে বিদেশ থেকে যৎসামান্য সাজসরঞ্জাম আনতে খরচ পড়েছে ১ কোটি টাকার মত। এই যন্ত্রে ১৩০ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তির আলফা কণা তৈরি করা যাবে। যন্ত্রটির বৈশিষ্ট্য, এর সাহায্যে প্রোটন, ডয়েটরণ এবং আলফা কণার শক্তি প্রয়োজন মত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

*

সাইক্লোট্রন যন্ত্রটি চালু হওয়ার পর এই প্রকল্পের পরিচালক সি অম্বাশংকরণের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি বললেন, আমাদের এই যন্ত্র আগামী তিন মাসের মধ্যে পুরোদস্তুর চালু হয়ে যাবে। তার জন্যে আমাদের বিজ্ঞানী, ইনজিনিয়ার এবং কুশলীরা দিন রাত পরিশ্রম করে চলেছেন। এই যন্ত্রটি তৈরি করতে গিয়ে তাঁরা

প্রচুর অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন। এটাও আমাদের একটা বড় রকমের লাভ।

অম্বাশংকরণ বললেন, কলকাতার ছেলেরা প্রচণ্ড বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমী। এই যন্ত্রটি চালু করার জন্যে গত মার্চ থেকে সপ্তাহে ছয় দিন তাঁরা যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন তার তুলনা হয় না।

তিনি বলেন, পুরোপুরি রুটিন মাফিক কাজ শুরু হওয়ার পর দেশের যে কোন গবেষক প্রয়োজনে এখান থেকে সাহায্য পাবেন। এ ছাড়া নানা রকম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি হবে এখানে। যা কৃষি গবেষণা থেকে শুরু করে সারা পূর্বাঞ্চলের ওষুধ শিল্প, চিকিৎসা এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

তবে ভেরিয়েবল সাইক্লোট্রনের চত্বরে গিয়ে একটা বড় রকমের সমস্যা আমার চোখে পড়ল। সেটা বিদ্যুৎ সমস্যা। দেখলাম এখানেও প্রচণ্ড লোড শেডিং চলে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই যন্ত্র পুরোপুরি কাজে নামবে। তখনও যদি এমনটি চলে, খুবই ক্ষতির সম্ভাবনা। এত টাকা খরচ করার পর যন্ত্রটি যদি ঠিক মত কাজে লাগান না যায় তাতে আর্থিক ক্ষতি যেমন, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড সংবেদনশীল এই যন্ত্রটিরও ক্ষতি হতে পারে। আমার মনে হয়েছে, এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কলকাতা বিদ্যুৎ পর্ষদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

সমরজিৎ কর

ভারতের শিল্পকীর্তি

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯০২—১৯৫৫)

রমেন্দ্রনাথ বিনোদবিহারী রামকিংকরের মতই শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্র ছিলেন। নিঃসন্দেহে তিপ্পান্ন বছর বয়সে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় শিল্পকলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি যখন কলাভবনে যোগদান করেন তখন চিত্র ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে ভেতরে ভেতরে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। ধ্রুপদী চিত্র ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের চেয়ে লোকায়নের দিকে ঝোঁকটা প্রবল হচ্ছে।

শৈশবে আগরতলায় থাকার সময় রমেন্দ্রনাথ শিল্পী হবার স্বপ্ন দেখতেন। প্রবাসীতে অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল, অসিত হালদার, ক্ষিতীন্দ্রনাথের ছাপা কাজ কেটে কেটে খাতাতে সেঁটে রাখতেন। ছবি আঁকতেন। ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি কলকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হতে বাধ্য হন। কিন্তু ক্লাস ফাঁকি দিয়ে তিনি ছবি নিয়ে হাজির হতেন অবনীন্দ্রনাথের কাছে। শেষ পর্যন্ত গুরুজনেরা তাঁকে কলকাতার চারুকলা বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। নন্দলাল তখন সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রমেন্দ্রনাথ ঘন ঘন তাঁর কাছে যেতেন। বিশ্বভারতী চালু হবার কিছু দিনের মধ্যে অসিত হালদারের কথা মতো তিনি এসে কলাভবনে যোগদান করেন।

রমেন্দ্রনাথ একাধারে শিল্পী এবং শিল্পগুরু। কলাভবন থেকে বেরিয়ে তিনি ১৯২৬ সালে অন্ধ্র জাতীয় কলাশালায় শিক্ষকতা করেন। ১৯২৮-এ শান্তিনিকেতনে এসে মাস্টারী করেছিলেন। ১৯২৯এ কলকাতায় সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ে প্রধান সহকারী শিক্ষক হলেন। ১৯৪৬-এ দিল্লিতে নানা রকম চাকরি করে কাটান। দিল্লি পলিটেকনিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের পাবলিকেশন ডিভিসন প্রভৃতি নানা কাজ করেন। ১৯৪৮-এ কলকাতার চারুকলা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন। তাঁরই চেষ্টায় এই বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় হয় এবং এখানে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন প্রদোষ দাশগুপ্ত, গোপাল ঘোষ, রথীন মৈত্রের মতো নব্যধারার বিদ্রোহী সব শিল্পী।

রমেন্দ্রনাথ একাধিকবার বিদেশে গিয়েছিলেন। গ্রাফিকস শিখতে প্রথমবার যান ১৯৩৭-এ। ১৯৪৬-এ প্যারীর বিশ্ব শিল্পকলা প্রদর্শনীতে ভারতের কাজগুলো নিয়ে যান। সেই বছরে লণ্ডনে আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ১৯৫২ সালে অনুরূপ একটি প্রদর্শনী নিয়ে মার্কিন মুলুকে পাড়ি দেন।

রমেন্দ্রনাথ 'ওয়াশ' টেম্পারা এবং তৈলচিত্র এঁকেছেন প্রচুর। উত্তরকাল অবশ্য তাঁকে হয়তো ছাপ ছবি (Graphic)-র প্রধান স্থপতি হিসাবে দেখবে। কারণ তিনি কাঠখোদাই, লিনোখোদাই, পাথর ছাপ, এচিং প্রভৃতি নিয়ে নানা রকম সফল পরীক্ষা করেছিলেন। তাই তাঁর বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের ছাপ ছবির আলোচনা করা যেতে পারে। ১৯১৭ সালে গগনেন্দ্রনাথ পাথরছাপ (Lithograph) নিয়ে মেতে ওঠেন। রমেন্দ্রনাথ অবশ্য ফরাসী মহিলা শিল্পী আন্দ্রে কার্পাসের কাছে পাথরছাপ, কাঠখোদাই এবং এচিং শিখেছিলেন। এ শতাব্দীর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশকে নন্দলাল নিজেও ছাপ ছবি করেন অনেক। তা ছাড়া মুকুল দে ড্রাই পয়েণ্ট, বিনোদবিহারী পাথরছাপ এবং এচিং আর রামকিংকর শুধুই এচিং নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান। এঁরা অবশ্য সবাই চিত্রকর বা ভাস্কর ছিলেন সুতরাং এই পর্বকে ভারতীয় ছাপ ছবির স্বর্ণযুগ বলা যায় বোধহয়।

রমেন্দ্রনাথের তুলি আর পটের রঙীন কাজে গ্রাম এবং শহরের সাধারণ দৃশ্য এবং খোলা আকাশের নীচের নিসর্গ এঁকেছেন। সহজ আটপৌরে দৃশ্য তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করত। পাশ্চাত্ত্য তৈলচিত্রের বিশেষত্ব এমন কী তাঁর ওয়াশ টেম্পারার কাজে বর্তেছে। এক হিসাবে তাঁকে ভারতীয় ইম্প্রেসনিস্ট বলা চলে। কারণ অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালের রীতির সঙ্গে তিনি ইম্প্রেসনিস্টদের খোলামেলা আলো হাওয়াকে পটে প্রবেশ করতে দিয়েছেন। বরং স্টুডিওর বদ্ধঘর তিনি আদপেই পছন্দ করতেন না। তেমনি পুরাণ মহাকাব্যের জগৎ তাঁকে ভীষণভাবে অভিভূত করেছে। হয়তো তাঁর পুরাণ-প্রীতি এবং দৈনন্দিন জীবনের রূপকার হবার প্রচেষ্টা তাঁর কাজকে ঈষৎ দ্বিধাগ্রস্ত করেছে। তিনি বাঙ্গলা কলম এবং পাশ্চাত্ত্য রীতির কাজ শিখেছিলেন, সুতরাং প্রথম জীবনের সরল স্বতঃস্ফূর্ততা যে শেষ জীবনে অলঙ্কারমণ্ডিত হবে এ বিষয় সন্দেহ কি? তবুও তাঁরই কাছে পরবর্তীরা শিখেছেন পাশ্চাত্ত্য রীতিকে গ্রহণ ক'রে কি ভাবে দেশজ আলোছায়ার রঙকে পটে আনতে হয়।

তাঁর ছাপ ছবিতেও দৈনন্দিন জীবন এবং পৌরাণিক জগতের লৌকিক আলৌকিকত্ব এসেছে সহজ প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে। পুকুরঘাট, একপাল হাঁস, বাঁশঝাড়, খিদিরপুর গ্রাম যেখানে ঘোরে সেখানকার বটগাছের সব পায়রা, গান্ধীজী থেকে রাজা বাসুকী সব কিছুর জন্যে তিনি জায়গা ক'রে দিয়েছেন। পাশ্চাত্ত্য নির্মিতির দৃঢ় রচনার সঙ্গে তিনি ভারতীয় নান্দনিক মাধুর্যকে মিলিয়েছেন।

রমেন্দ্রনাথের এই কাঠখোদাই ছবিতে রূপবন্ধের উপস্থাপনের সারল্যের মধ্যে নির্মিতির দৃঢ়তা এবং ভূমিবিভাজনের সহজ চমৎকারিত্ব দ্রষ্টব্য। বিশেষত রৈখিক এবং চাপ চাপ কালো ব্যবহারের মুনশিয়ানা। একটি শহুরে উচ্চ মধ্যবিত্ত বাড়ি। গ্যাস লাইট দেখে মনে হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেকার সময়। সময়টা বোধহয় দুপুরই হবে। উঠানের ওপর চৌবাচ্চা। কল থেকে নলে জল ভর্তি হচ্ছে। একটা মেয়ে বালতি ক'রে জল টেনে তুলছে। প্রাচীরের সামনে সদর দরজা হাট ক'রে খোলা। একপাশে সিঁড়ি দিয়ে ওঠে গিয়ে একটা বাড়ি বাইরে জগৎ বাড়িঘর উঁকি মেরে দেখছে নির্জন অন্দরমহলের দৃশ্য। একপাশে একটা বাছুর ব'সে থেকে সমস্ত দুপুরের আলসাকে মূর্ত ক'রে তুলেছে। জ্যামিতিক আঁটসাট বাঁধনে সমস্ত পটভূমি আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। একটা পাতাহীন বড় গাছ ডালপালা বিস্তার ক'রে আকাশটা ধ'রে আছে। ফলে খাড়া আর অনুভূমি রেখার একঘেয়েমি হ্রাস পেয়েছে। দুপাশে আরও ছোট ছোট গাছ আছে বাইরে। এরা যেন রচনার বাঁধনের মধ্যে এনেছে সুষমা।

দ্বিতীয় ছবি 'ওয়াশে' আঁকা। গ্রামের সাধারণ গেরস্থ বাড়িতে খৈ ঝেড়ে বেছে নেবার দৃশ্য। বাড়ির দুই বৌ, বাচ্চা একটা ছেলে, বড় বড় জালা, ধামা, কুলো এবং সিঁড়ির কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা কুকুর। ধূসর, আবছা, সবুজ, নীল, লাল দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের মাধুর্যকে তুলে ধরেছেন রমেন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের ছবি ও সাহিত্যঃ সম্বন্ধবিচার

সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ৩ ॥

রঙের প্রয়োগে শুধু নয়, আরও নানাভাবে অস্থির তাড়াহুড়ো দেখা যেত, একথা প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে শোনা যায়। যেমন আঁকার উপকরণ ঠিক-মতো ঠিক সময়ে জোগান দেওয়া দরকার হতো, বিলম্বে ক্ষুব্ধ হতেন; আঁকার তাগিদ মনে এলে কাগজপত্রের অভাবে হাতের কাছে যা জুটত, তাতেই আঁকা শুরু করে দিতেন; খাতার মলাট, আলমারির তাক্তা পাল্লা, প্যাক বাক্সের পাটা কিছুই বাদ পড়ত না; তুলি কলমের বিকল্প হতো হাতের আঙুল, বিষম ব্যস্ততায় রঙের বাটির রং ঠাহর করে দেখবার সময় থাকত না, তুলি ডুবত কখনও অবাঞ্ছিত রঙের বাটিতে, নীলের বদলে কালো, হলুদের বদলে লাল, ছবি পড়ত অপঘাতে, আঁকার সময় আঁকিয়ের চেহারাই যেত বদলে, যেন ভূতে-পাওয়া অন্য মানুষ ইত্যাদি ইত্যাদি। অবনীন্দ্রনাথের মুখেও শুনি—

"রবিকাকার ছবি তো নয়, যেন আগ্নেয়গিরির অকস্মাৎ ব্যাপার এক একটা। না বেরিয়ে এসে উপায় নেই।" কৌতূহলোদ্দীপক এই সব তথ্য শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে যেন আমাদের একেবারে সামনে এনে হাজির করে। কিন্তু আমরা অবাক হই ছবি ও সাহিত্য এ দুইয়ের সৃষ্টিব্যাপারে গরমিল দেখে না বরং আশ্চর্য মিল লক্ষ করে। নানা সময়ের প্রবীণ নবীন রবীন্দ্র পরিকরদের কাছে শুনতে পাওয়া যায় কবিতা বা গান রচনার আবেগে কবির অদ্ভুত ভাবান্তরের কথা। ছবি আঁকার প্রসঙ্গে এই যে [illegible] পাওয়ার কথা বলা হয়েছে, [illegible] 'ইনস্পায়ার্ড' অবস্থা। চেনা মানুষের মধ্যে যেন এক অচেনা সত্তা ভর করে, আর তারই [illegible] চেনা মানুষ কলম [illegible] সেই অচেনার নির্দেশে। রবীন্দ্রনাথ কবিতারচনাক্ষেত্রে জীবন-দেবতা প্রসঙ্গে এই কথাই বলেছেন—

"অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।

• • •

[illegible] সংগীত কোথা হতে উঠে,
এ যে লাবণ্য কোথা হতে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন কোথা হতে টুটে
অন্তরবিদারণ।"

—'অন্তর্যামী', চিত্রা।

ছবির মতো কবিতা বা গান রচনায় [illegible] যে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা [illegible] নিজের [illegible] নানা [illegible]—

"[illegible] শুধু এটা কিনা ঠিক বুঝি, [illegible] কাজ নয় নিছক [illegible]। [illegible] গভীর একটা [illegible] জন্মায়।"

—[illegible] ১০ জুলাই, ১৮৯০। ছিন্নপত্রাবলী।

[illegible]

না। এমন নেশায় ধরে যে তখন গুরুতর কাজের গুরুত্বে একেবারে চলে যায়। বড়ো বড়ো দায়িত্বের ভারা-কর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়। কর্তব্যের দাবিগুলোকে মন একধার থেকে না-মঞ্জুর করে দেয়।"

—৭ অক্টোবর, ১৯২৪, পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি।

"আমি এখন গান নিয়ে আছি— কতকটা ক্ষ্যাপার মতো ভাব। আপাতত ছবির নেশাটাকে ঠেকিয়ে রেখেছি।"

—ইন্দিরা দেবীকে, চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড।

সৃষ্টির প্রবল প্রবর্তনায় অতি দ্রুততায় লেখনী চালনায় ফলে কবি নিজের হস্তাক্ষর পরে নিজেই পড়তে পারেননি এবং পাঠোদ্ধারের জন্যে অনুচরদের ডাক পড়েছে এমন কথা কবির একদা একান্তসচিব অমিয় চক্রবর্তী মশাইয়ের কাছে অনেকের শোনা। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাণ্ডু-লিপির বহু পৃষ্ঠা আজও এর সাক্ষ্য দেয়। কবিতা গান রচনার বেলাতেও দেখা যায় হাতের কাছে উপযুক্ত উপ-করণের অভাবে খাতার শেষ রঙিন পৃষ্ঠা অথবা পেস্টবোর্ডের মলাট কাজে লেগেছে, ভোঁতা পেনসিলের প্রায়-ব্যর্থ ব্যবহারও ইতস্তত দুর্লক্ষ্য নয়। সাহিত্যের বেলাতেও ওই একই কথা—'না বেরিয়ে এসে উপায় নেই', না লিখে ফেলে শান্তি নেই।

ছবি আঁকার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের অতিমাত্রায় তাড়াহুড়োর আরও একটা কারণ অনুমান করা যায় তাঁর গানে ও ছবির তুলনামূলক আলোচনাত্মক একটি লেখা পড়ে। অংশটি উদ্ধার করে দিই—

"ছবি যে আঁকে, সে যখন আঁকতে থাকে তখন তার আরম্ভের রেখাতে সমস্ত ছবির আনন্দ দেখা যায় না।—অনেক রেখা অনেক বর্ণ মিললে পর তবেই পরিণামের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু গান যদিচ একটা সম্পূর্ণতার অপেক্ষা রাখে তবু তার প্রত্যেক অসম্পূর্ণ সুরটিও হৃদয়কে যেন প্রকাশ করতে থাকে।"

—'দেখা' শান্তিনিকেতন প্রবন্ধগ্রন্থ।

ছবির আরম্ভ-রেখার এই একান্ত অসম্পূর্ণতা-জনিত পীড়াবোধই, আমাদের বিশ্বাস, তাঁর সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় অস্বাভাবিক দ্রুততার একটা বড় কারণ। ছবির সমগ্র রূপটির আবির্ভাব ত্বরান্বিত করার অভিলাষেই এই বিষম ব্যস্ততা।

প্রসঙ্গটিকে আর টানতে সংকোচ হচ্ছে। কেননা নিছক ছবির কারবার যাঁরা আর্টিস্ট অথবা আর্ট-ক্রিটিক তাঁরা কিন্তু এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁদের ধারণা আঁকার লয়টা শিল্পীবিশেষের স্বভাবানুযায়ী দ্রুত ও বিলম্বিত হয়। এর আর কোনো তাৎপর্য নেই। বিশ্বের স্বনামধন্য [illegible] এ দিক থেকে দু-দলে [illegible] নেই, কেন [illegible]

ঝড়ের বেগে তুলি ছোটান ব্যস্তবাগীশ সেই সব শিল্পীদের শিরোমণি হলেন ফ্লেমিশ শিল্পী ফ্রান্স হল। হলের এই তাড়া কিন্তু পশ্চিমী দর্শকমনে কোনো-দিন কোনো কৌতূহল জাগায়নি, কিংবা কোনো ব্যাখ্যার প্রেরণাও জোগায়নি। শিল্পজগতে এ ঘটনা নিতান্তই স্বাভাবিক ঠেকেছে।

আঁকার লয়টা শুধু শিল্পীর নয়, শিল্প বিশেষের স্বভাবানুযায়ী দ্রুত ও বিলম্বিত হয়। এক জাতের ছবি আছে, যা ধীরে ধীরে গড়ে তোলা হয়, ইংরেজিতে যাকে বলে build up করা। খাঁটি টেম্পারা বা ওয়াসের ছবি এ পর্যায়ে পড়ে। এখানে পর্যায়ক্রমে বর্ণপ্রয়োগ প্রভৃতি ধৈর্য আর কাল-ক্ষেপের অপেক্ষা রাখে ব্যস্ততার কোনো অবকাশই এখানে নেই। অবনীন্দ্রনাথের ওয়াসের ছবিগুলি, প্রাচীন রাজপুত

মোগল ছবি, পশ্চিমের ট্রাডিশানাল তেল রঙের ছবি এ পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু আর এক জাতের ছবি আছে, ইংরেজিতে যাকে বলে direct impresrion sketch—এতে কাগজে কাজ চলে দ্রুততালে, রেখার পর রেখার যোগে ছবি এগিয়ে যায়, সরাসরি মন থেকে কাগজে ফুটে ওঠে রূপ ক্ষিপ্রবেগে। চীনা ও জাপানী ছবিতে এর নমুনা মেলে সব চাইতে ভালো। এ জাতের ছবিতে ঝুঁকি আছে। হয় ছবি উৎরে যায়, নয় তা নষ্ট হয়।

আর একটি কথা বলে প্রসঙ্গ শেষ করি। এই যে দ্রুততার কথা হল, শিল্পের ভাষায় কিন্তু একে দ্রুততা বলে না। কেননা আপাতদ্রুত তুলিচালনার আড়ালে অনেকখানি মনঃসংযোগ এবং দীর্ঘদিনের রূপভাবনা লুকিয়ে থাকে, যাকে বলে conception। শিল্পের পরিভাষায় 'দ্রুত আঁকা' ছবির অর্থ সেই ছবি যা যেমনতেমনভাবে আঁকা অসম্পূর্ণ বা অর্ধসম্পূর্ণ (চিক-খাওয়া ছবি) ছবি। এই অর্থে 'দ্রুততা-দুষ্ট' ছবি রবীন্দ্রচিত্রজগতে একটিও নেই। আমাদের দেখা প্রায় দুহাজার ছবিকে ভিত্তি করে একথা বলতে সাহসী হচ্ছি যে কোথাও অযত্নপ্রসূত অর্ধ-সমাপ্তির লেশমাত্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না। ছবির আঙ্গিক-প্রসঙ্গে [illegible]।

ছবিতে যে সব জীবজন্তুর চেহারা বা নরনারীর মুখ রূপ পেয়েছে, সেগুলিকে অবচেতনার দান বলে ব্যাখ্যা করতে চাওয়া সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন, অত দূরে না গিয়ে এগুলিকে স্মৃতি-লোকের সঞ্চয় বললে ক্ষতি কী? জীবনের নানা পর্বে দেখা প্রাকৃতিক দৃশ্য—স্মরণীয় সূর্যোদয়, করুণ সূর্যাস্ত, জলস্থল আকাশ, মানুষ, মনুষ্যেতর জীব স্মৃতির জগৎ থেকে এ সব তুলির মুখে ফুটে উঠেছে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, অনেক ছবি শিলাইদহের স্মৃতিবাহী। পদ্মা, পদ্মা-তীরের ঘন সবুজের সমারোহ, ফাঁকে ফাঁকে লোকালয়, সেখানকার হিন্দু, মুসলমান প্রজা বিচিত্র নরনারীর মুখাকৃতি কত ছবিতে স্থান পেয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। জলচর জীবের মধ্যে কুমীরের ছবি সংখ্যাবাহুল্যে চোখে পড়ার মতো। ছিন্নপত্রাবলীর পাতায় অথবা সমকালীন কাব্যে যে কুমীরকে আমরা দেখেছি, ছবিতে তার অপর্যাপ্ত পুনরাবির্ভাব। শৈশব ও কৈশোরের চেনা মানুষও ছবির রাজ্যে ভিড় করেছে, এ অনুমান অমূলক নয়। ভৃত্যরাজকতন্ত্রের চারপাশের মানুষগুলি, খেলার সঙ্গী, গৃহশিক্ষক, আরও বহু আপনজন ছবির রাজ্যে এসেছে, যেমন এসেছে জীবন-স্মৃতির পাতায় অথবা শেষ পর্যায়ের কাব্যে করুণ মধুর স্মৃতি রোমন্থনের ভঙ্গিতে। কবি নিজেই বলেছেন, নারী-মুখের চোখ দুটি আঁকতে গেলে তাঁর বৌঠানের চোখ মনে এসে যায়। হয়তো বা তুলির ছোঁয়ায় ফুটেও ওঠে। সাহিত্যে নানা পর্যায়ের নানা রচনায় বৌঠানের বিচিত্র ছবি ফুটে উঠেছে, একথা কারো অবিদিত নয়। শেষ পর্যায়ের সেই কবিতাটি মনে পড়বে বিশেষ করে—

"উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ, [illegible] গলার
হারখানি
চেয়েছি অব[illegible] মানি
তার পানে।
বড়ো বড়ো কাজল নয়ানে
অসংকোচে ছিল চেয়ে
নবকৈশোরের মেয়ে,
ছিল তারি কাছাকাছি বয়স আমার।
স্পষ্ট মনে পড়ে ছবি।"

—'শ্যামা', আকাশপ্রদীপ।

এ কবিতা যদি নিছক কৈশোরিক স্মৃতি বলে স্বীকৃত হয়, তবে ছবির বেলাতেই এ অবচেতনার ক্রিয়া এই কষ্টকল্পনার কারণ কী?

স্মৃতির রাজ্যটা কম রহস্যজনক নয়। আর এ রহস্যের প্রধান উপাদান জোগায় বিস্মরণ। বিস্মৃতি আসলে স্মৃতিরই বিশিষ্ট রূপ। 'ভুলে থাকা নয় তো সে ভোলা'—এই হল তার মর্মকথা। অতীতের মালমসলা নিয়ে তার কারখানা ঘরে গড়ন-পিটনের কাজ চলছে দিনরাত। স্মৃতিলোক মিশরের পিরামিড নয়, আধুনিক যুগের ফ্যাক্টরি। চৈতন্যের তলা থেকে স্মৃতির নেপথ্য-লোকে তো সাজবদল হয়। কিন্তু তারপর সাহিত্যে, শিল্পে যখন সেই স্মৃতি সৃষ্টির রূপ নেয়, তখন তার সাজবদল হয় আর এক দফা। সৃষ্টি-মগ্নতায় কালে কত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে।

নানা স্তরের মনন, নানা পর্যায়ের অনুভূতি, জাগ্রত মনের চেষ্টা, গুপ্ত প্রাণের ধ্যান এই সব জটিল বিমিশ্রতা এক নিবিড় উপলব্ধির অখণ্ডতায় বিধৃত হয়ে অনিবার্য বেগে প্রকাশ পায়। একেই যদি কেউ অবচেতন বলতে চান বলতে পারেন। তাহলে সব সৃষ্টিই অবচেতনার সৃষ্টি।

কিন্তু 'অবচেতনার সৃষ্টি' কথাটিতেই একটু খটকা লাগে। অনুমান করি, সৃষ্টিমাত্রই চেতনার স্তর বেয়ে আসতে বাধ্য। স্রষ্টার সম্পূর্ণ অনবধানতায় অবচেতনার সরাসরি আত্মপ্রকাশ কি কদাপি সম্ভব? অথবা কোনো অভাবিত উপায়ে সম্ভব হলেও তার দ্বারা অন্যের চেতনায় সঞ্চারিত হয়ে সহিতত্ব সৃষ্টি কি আদৌ সম্ভব? এ সব জটিল প্রশ্নের মীমাংসা পণ্ডিতেরা করবেন। আমাদের সে সাধ্য নেই এবং এখানে তা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের মনের সংশয়টুকু, এ উপলক্ষে প্রকাশ করে ফেললাম মাত্র। দুর্মুখেরা বলে, ঘোড়া ডিম পাড়ে না—তবু বাজারে তার ডিম নিয়ে গুজব আছে। অবচেতনার সৃষ্টি ব্যাপারটাও এর কাছাকাছি।' আমাদের সে অতি সাহস নেই। শুধু সসঙ্কোচে সংশয়ের অবতারণা করেই ক্ষান্ত হই।

সৃজন ব্যাপার যে চেতন মনের সাহায্য প্রার্থী, এ কথা রবীন্দ্রনাথের মুখেও শুনি। তিনি বলেন, মনের মুঠোর ফাঁক দিয়ে গলে-পড়া, ছড়িয়ে পড়া জগতে তাঁর কোনো হাত নেই। কিন্তু—

"প্রত্যক্ষটা একবার আমার মনের নেপথ্যে অপ্রত্যক্ষ হয়ে গিয়ে তার পরে যখন প্রকাশের মঞ্চে এসে দাঁড়ায়, তখনই তার সঙ্গে আমার ব্যবহার।"

—জাপানযাত্রী।

তাঁর ছবি নিয়ে অবচেতন মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যায় তিনি কৌতুক বোধ করেছেন দেখতে পাই।—

"কে জানে কার মুখের ছবি কোথায়
থেকে ভেসে
ঠেকল অনাহূত আমার তুলির
ডগায় এসে।
সাইকো এনালিসিস্ যোগে ইহার
পরিচয়
পণ্ডিতেরা জানেন স্পষ্ট, আমার
জানা নয়।"

সে যাই হোক, আমাদের বক্তব্য ছবিরাজ্যের মূর্তিগুলো অবচেতন মনেরই রূপপরিগ্রহণ নয়, চোখে অথবা মনের চোখে দেখা জীবনের রূপায়ণ। এ কথা সহজ কথা। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজে কিছু মন্তব্য করেছেন শিল্পী যামিনী রায়কে লেখা পত্রাংশে।—

"যখন ছবি আঁকতুম না তখন বিশ্বদৃশ্যে গানের সুর লাগত কানে, ভাবের রস আনত মনে। কিন্তু যখন ছবি আঁকায় মন টানল, তখন দৃষ্টির ছায়াবাজার মধ্যে মন স্থান পেল। গাছ-পালা, জীবজন্তু সকলই আপন রূপ নিয়ে চারিদিকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। তখন রেখায় রঙে সৃষ্টি করতে লাগল যা প্রকাশ হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যার দরকার নেই। এই সৃষ্টির জগতে একান্ত দ্রষ্টারূপে আপন চক্ষরের সত্তা আবিষ্কার করল। এই নিছক দেখার জগৎ ও দেখবার আনন্দ এর মর্মকথা বুঝবেন তিনি যিনি যথার্থ শিল্পী।...চিত্রকর গান করে না, ধর্ম কথা বলে না, চিত্রকরের চিত্র বলে—অয়ম অহম ভো—এই যে আমি আছি।"

একটি কথা মনে রাখতে হবে 'শিল্পীর দেখা' আর পাঁচজনের দেখার মতো একেবারেই নয়। সে দেখা শুধু চোখ দিয়ে বা মন দিয়ে দেখা নয়। সে দেখার সঙ্গে 'হওয়া' জড়িয়ে থাকে। যাকে বলে একাত্মতা এবং ইংরেজি ভাষায় Identification এই দেখাই পূর্ণ দেখা, সত্য দেখা। 'সে' নামক বিচিত্র রচনায় রবীন্দ্রনাথ এই দেখার স্বরূপটি বিশ্লেষণ করেছেন এক আশ্চর্য ভঙ্গিতে, লঘু গল্পের ছলে—

"সত্য যুগে মানুষ দেখার জানা জানত না, ছোঁওয়ার জানা জানত না, জানত একেবারে হওয়ার জানা।...সত্য যুগে মানুষ বই পড়ে শিখত না, খবর শুনে জানত না, তাদের জানা ছিল হয়ে-ওঠা জানা। সত্য যুগের রূপে আপনার সীমানা বাড়িয়ে দিত বেড়ালের মধ্যে। সীমানা লোপ করত না। তুমি তুমিও থাকতে, বেড়ালও হতে।

সুকুমার বললে—'আচ্ছা, সে যুগ কি কোনোদিন আসবে।'

যতদিন না আসে ততদিন ছবি আছে, কবিতা আছে। আপনাকে ভুলে গিয়ে আর কিছু হয়ে যাবার ঐ একটা বড়ো রাস্তা।"

—সে

সে গল্পের দাদু নাতি দৌহাকার এই সংলাপে শুধু যে শিল্পী-দৃষ্টির ব্যাখ্যান আছে তাই না, রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলিরও একটি মূল্যবান নেপথ্য-বার্তা পাওয়া যায়। আর কিছু হয়ে যাবার বড়ো রাস্তার কথা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনাতেও রবীন্দ্রনাথ এমনি করেই বলেছেন। সাহিত্যের পথে গ্রন্থের ভূমিকায় দেখি—

"মানুষ শিশুকাল থেকেই নানাভাবে আপন উপলব্ধির ক্ষুধায় ক্ষুধিত; রূপ-কথার উদ্ভব তারই থেকে। কল্পনার জগতে চায় সে হতে নানা খানা; রামও হয়, হনুমানও হয়, ঠিকমতো হতে পারলেই খুশি। তার মন গাছের সঙ্গে গাছ হয়, নদীর সঙ্গে নদী। মন চায় মিলতে, মিলে হয় খুশি। মানুষের আপনাকে নিয়ে এই বৈচিত্র্যের লীলা সাহিত্যের কাজ।"

—ভূমিকা, সাহিত্যের পথে।

এই উপলব্ধির ক্ষুধার ক্ষুধিত রবীন্দ্রনাথের প্রবল আত্মঘোষণা আছে সোনার তরীর 'বসুন্ধরা' কবিতায়। আট পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ কবিতার প্রবহমান-পয়ারবন্ধ পঙ্‌ক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে ক্ষুধার উদ্দাম আর্তি।

"হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে; দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন অনল
বজ্রের মতন, রুদ্র মেঘমন্দ্রস্বরে
পড়ে আসি অতর্কিতে শিকারের 'পরে
বিদ্যুতের বেগে, অনায়াস সে মহিমা
হিংসাতীব্র সে আনন্দ, সে দৃপ্ত গরিমা,
ইচ্ছা করে একবার লভি তার স্বাদ।"

—'বসুন্ধরা', সোনার তরী।

এই প্রবল পংক্তিগুলির সরব পাঠে

লেখকের দুর্দম বাসনার বেগ পাঠক-মনেও সংক্রামী হয়ে ওঠে। পঙ্‌ক্তিগুলি আরো প্রমাণ করে আনন্দবাদী কবির আনন্দবোধ শুধু পোষমানা প্রাণের সহজ খুশি নয়, গভীর অধ্যাত্ম আনন্দও নয়, তার রীতিমতো প্রশস্ত মঞ্চে হিংসাতীব্র আনন্দের তাণ্ডবনৃত্যও অনায়াসে স্থান পায়। কিছু আগে যে প্রসঙ্গটি ছুঁয়ে এসেছি একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, এখানে তার সমাপ্তি ঘটানো যাক এই কথা বলে যে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে যেমন ভয়ংকরের অস্তিত্ব, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যেও তেমনি গদ্যপদ্যনির্বিশেষে অমনি অসংখ্য মূর্তির গতায়াত। তুলনায় ছবিতে তা অপেক্ষাকৃত সহজ-লক্ষ্য কারণ ছবির রাজ্য এবং ছবি রচনার কাল সংক্ষিপ্ততর। কিন্তু সাহিত্যের অতিব্যাপ্ত রচনাকালে ও অতিবিচিত্র সৃষ্টিলোকে যা ছড়িয়ে আছে, তাকে যদি জড়ো করে আনা যায়, তবে দেখা যাবে পাল্লায় সাহিত্যের দিকটাই কিছু বেশি ভারি। কথাসাহিত্যে রূঢ়তার কারবারীকে আমরা পেয়েছি প্রায় গোড়া থেকেই। জীবনজমির যে অংশটায় শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ, যেখানে রিপুর নখদাঁত-বের-করা বিকট বীভৎসতা তার মধ্যে তিনি নেমেছেন দেখতে পাই।

সে যাই হোক, আমাদের বলার কথা হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রসাহিত্যে রূঢ়তার স্পর্শ বিরল নয় আদৌ। এখানে এমন বহু মানুষের আনাগোনা যাদের কস্মিন-কালেও সুকুমারমতি পাঠকবৃন্দের চরিত্র গঠনযোগ্য বলা যাবে না। ছবির কঠিন কঠোর পুরুষ মূর্তিগুলির সঙ্গে তাদের ধাতুগত সাধর্ম্য বেশ সুলক্ষ্য। কথা-সাহিত্যের বাইরেও গদ্যে পদ্যে এমন অজস্র ভাষার ছবি ছড়িয়ে আছে তীব্রতা, বিবরতা, রূঢ়তা, ভয়াবহতার ব্যঞ্জনায় যা রং তুলিতে আঁকা বহু ছবির সমধর্মা। এখান ওখান থেকে যথেচ্ছ সংকলনে তারই অল্প কয়েকটি টুকরো এখানে হাজির করছি। প্রসঙ্গচ্ছিন্নতায় মনে হয় ক্ষতি হবে না, বরং পঙ্‌ক্তি বা বাক্যবদ্ধ ছবির নিজের চেহারাটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতায় ধরা দেবে।—

"হেঁকে উঠল ঝড়
লাগল প্রচণ্ড তাড়া,
সূর্যাস্তসীমার রঙিন পাঁচিল ডিঙিয়ে
ব্যস্ত বেগে বেরিয়ে পড়ল মেঘের
ভিড়
বুঝি ইন্দ্রলোকের আগুন-লাগা
হাতিশালা থেকে
গাঁ গাঁ করে ছুটেছে ঐরাবতের কালো
কালো শাবক
শুঁড় আছড়িয়ে।
মেঘের গায়ে গায়ে দগদগ করছে
লাল আলো
তার ছিন্ন ত্বকের রক্তরেখা।
বিদ্যুৎ লাফ মারছে মেঘের থেকে মেঘে
চালাচ্ছে ঝকমকে খাঁড়া।
বজ্র শব্দে গর্জে উঠল দিগন্ত;
উত্তর পশ্চিমের আমবাগানে শোনা গেল
হাঁফধরা একটা আওয়াজ,
এসে পড়ল পাটকিলে রঙের অন্ধকার,
শুকনো ধুলোর দম-আটকানো তুফান।
আকাশটা ভূতে-পাওয়া।"

—নয় সংখ্যক কবিতা,
পত্রপুট।

"অন্ধকারে ঝোপের থেকে
ঝাঁপিয়ে পড়েছে স্কন্ধকাটা
দুঃস্বপ্ন,
পাগলা জন্তুর মতো
গোঁ গোঁ শব্দে ধরেছে তার টুঁটি
চেপে,
বুকের পাঁজর গুলোর ঠক ঠক
দিয়েছে নাড়া,
গুমরে উঠে জেগেছে সে মৃত্যু
যন্ত্রণায়।"

—'চিরযাত্রী' শ্যামলী।

"রক্তমাখা দন্তপংক্তি হিংস্র সংগ্রামের
শত শত নগরগ্রামের
অন্ত্র আজ ছিন্ন ছিন্ন করে;
ছুটে চলে বিভীষিকা মূর্ছাতুর দিকে
দিগন্তরে।
বন্যা নামে যমলোক হতে,
রাজ্যসাম্রাজ্যের বাঁধ লুপ্ত করে সর্বনাশা
স্রোতে।
যে লোভ-রিপুরে
লয়ে গেছে যুগে যুগে দূরে দূরে

নজা শিকারীর দল গোময়ানা শ্বাপদের
মতো,
দেশবিদেশের মাংস করেছে বিকৃত,
লোলজিহ্বা সেই কুক্কুরের দল
অন্ধ হয়ে বিচ্ছিন্ন শৃঙ্খল,
ভুলে গেল আত্মপর;
আজিম প্রাচ্য তার উন্মাথিয়া উন্মত্ত
নখর
পুঞ্জিত ঐতিহ্যের পাতাগুলো ছিন্ন
করে,
ফেলেছে তার অক্ষরে অক্ষরে
পঙ্ককলিপ্ত চিহ্নের বিকার।"

—২১ সংখ্যক কবিতা, জন্মদিনে।

"ক্ষুধিত মুখিয়াম আর কালবিলম্ব না করিয়া বলিল, ভাত দে।"

বড়ো বউ বাবুদের বন্যায় অকৃস্মিলপাতের মতো এক মুহূর্তেই তাঁর কণ্ঠস্বর আকাশ পরিমাণ করিয়া উঠিল, ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।'

সারাদিন শ্রান্তি ও লাঞ্ছনার পর আলোহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে প্রজ্বলিত ক্ষুধানলে গৃহিণীর রূক্ষ বচন বিশেষত শেষ কথাটার গোপন কুৎসিত শ্লেষ মুখিয়ামের হঠাৎ কেমন একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জনে বলিয়া উঠিল, 'কী বলিলি।' বলিয়া মুহূর্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না-ভাবিয়া একেবারে মাথায় বসাইয়া দিল। বাধা হাতার ছোটো জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত বিলম্ব হইল না।"—

—শাস্তি, গল্পগুচ্ছ।

'সকলা এসে প্রণাম করবার জন্য পায়ে হাত দিতেই যেন বিদ্যুতের আঘাতে ওর সমস্ত শরীর আকম্পিত হয়ে উঠল। পা দুটো আপনি গেল সরে।

ভাঙা গলায় বলে উঠল, পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না।'

অসংযত অসহায় অস্বাভাবিক জোর [illegible] চোখের তারা প্রসারিত হয়ে [illegible] গেল। চেপে ধরলে সকলার হাত, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হল, বললে, 'জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব।'

হঠাৎ ঢিলে শেমিজ-পরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণমূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভুত গলায় বললে, 'পালা পালা পালা এখনই, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।' বলেই পড়ে গেল মেঝের উপর।

গলার শব্দ শুনে আদিত্য ছুটে এল ঘরে, প্রাণের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে ফেলে দিয়ে নীরজার শেষ কথা তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে।"

—মালঞ্চ।

সংখ্যা আর বাড়াব না। ভাষার ছবিতেও কড়া লাইন আর চড়া রঙের যে-চেহারা আছে তার একটু নমুনা দেখে নেওয়া গেল মাত্র।

চলতি ভাষায় যাকে বলে 'সুন্দর' অর্থাৎ নিছক দেখতে শুনতে মিষ্টি শিল্পে শুধু তাকেই আশা করা বেরসিকতা, ছেলেমানুষীও বটে। শিল্পের কারবার সুন্দরকে নিয়ে। কিন্তু সে সুন্দরের অভিধা স্বতন্ত্র। নিজের চারিত্র্যের জোরে যা সুবাক্ত, তার ভড়িমাহীন আত্মঘোষণা রসিকমনের দরজায় ঘা দেয় দরজা খোলার। আর রসিক তাকেই বসায় সুন্দরের আসনে। ছবি মূর্তি সাহিত্য, সৃষ্টির সব মহলেই এই ব্যাপার। কলারাজ্যের 'সুন্দরের' ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথকৃত মন্তব্য মনে পড়বে।

"একরকম গায়ে-পড়া-সৌন্দর্য আছে যা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সঙ্গে যোগ দিয়ে অতি লালিত্যগুণে সহজে আমাদের মন ভোলায়। চোর যেমন দ্বারীকে ঘুষ দিয়ে চুরি করতে ঘরে ঢোকে। সেইজন্যে যে-আর্ট আভিজাত্যের গৌরব করে সে আর্ট এই সৌন্দর্যকে আমল দিতেই চায় না। তাকে দেখাতে গেলে যেমন সাধনা তাকে দেখতে গেলেও তেমনি সাধনা চাই। সুললিত বলে নিজের পরিচয় দিতে সে লজ্জাবোধ করে, সুসঙ্গত বলেই তার গৌরব। লোভীর ভীড় তাড়াবার জন্যে সে অনেক সময় কঠোরকে দ্বারের কাছে বসিয়ে রাখে, এমন কি অনেক সময় কিছু বিশ্রী, কিছু বেসুরো তার রচনার সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। কেন না তার সাহস আছে। সে জানে, যে-বিশিষ্টতা আর্টের প্রাণ, তার সঙ্গে গায়ে পড়ে মিষ্টি মিশোল করবার কোনো দরকার নেই। উমার হৃদয় পাবার জন্যে শিবকে কন্দর্প সাজতে হয় নি।"

—যাত্রী।

চরিত্রবান সাহিত্যে সুর-বেসুরের বাদ প্রতিবাদে পুরুষস্পর্শ কঠিন জমাট রসের উদ্দীপন শিশুদের পছন্দ হবার কথা নয়, কিন্তু তা দুরন্ত সাবালকের সম্ভোগের বস্তু। মিঠেকড়ায় এই মিশোল সুন্দরের জগতে কী অভিনবত্ব এনে দেয়, সাহিত্যের পথে গ্রন্থের এক জায়গায় তার বিশ্লেষণ আছে চমৎকার।

"সুন্দরকে প্রকাশ করাই রস-সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য নয়। সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতার একটা স্তর আছে, যেখানে সৌন্দর্য খুব সহজ। ফুল সুন্দর, প্রজাপতি সুন্দর, ময়ূর সুন্দর। এ সৌন্দর্য একতলা-ওয়ালা, এর মধ্যে সদর অন্দরের রহস্য নেই, এক নিমেষেই ধরা দেয়, সাধনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু, এই প্রাণের কোঠায় যখন মনের দান মেলে, চরিত্রের সংশ্রব ঘটে, তখন এর মহল বেড়ে যায়, তখন সৌন্দর্যের বিচার সহজ হয় না। ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলন, মধুর হতে পারে, কিন্তু 'বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী' মনোহর। একটা কানের আর একটা মনের, একটাতে চরিত্র নেই লালিত্য আছে, আর একটাতে চরিত্র প্রধান। তাকে চিনে নেবার জন্যে অনুশীলনের দরকার করে।"

—সাহিত্যের পথে।

শিল্পাচার্য নন্দলালের আঁকা এক ছাগলের ছবি দেখে উল্লসিত রবীন্দ্রনাথ তার প্রশস্তি লিখে ফেলেছিলেন কবিতায়, এ প্রসঙ্গে তার কয়েক ছত্র শোনাই—

> "ওগো চিত্রী, এবার তোমার কেমন
> খেয়াল এ যে,
> এঁকে বসলে ছাগল একটা উচ্চশ্রবা
> তেজে।
> জন্তুটা তো পায় না খাতির হঠাৎ চোখে
> ঠেকলে,
> সবাই ওঠে হাঁ হাঁ করে সাঁঝ ক্ষেতে
> দেখলে।
> আজ তুমি তার ছাগলামিটা ফোটালে যেই
> দেহে
> এক মুহূর্তে চমক লেগে বলে উঠলেম
> কে হে।"
>
> —ছড়ার ছবি।

লঘুতার আড়ালে প্রশংসার আসল তাৎপর্যটি লক্ষ করা যায়। এ আর কিছু নয়, বিশুদ্ধ চারিত্রের স্ফূর্তি। ঐ চারিত্রকে ফুটিয়ে তোলার সাধনাই রবীন্দ্রনাথের যেমন সাহিত্যে তেমনি ছবিতে। তাই সেখানে খোলা দরজায় সাদাকালো সুশ্রীকুশ্রী ভালো-মন্দ সব কিছুর অবাধ প্রবেশাধিকার। কিছুই অপাংক্তেয় নয়। অপাংক্তেয় তাই যা চারিত্রহীন। সৃষ্টির রাজ্যে সব কিছুকে গ্রহণ করার, স্বীকার করার এই বলিষ্ঠ ঔদার্য থাকে জাত-শিল্পীদের। অক্ষম শুচিবাই তাঁদের নয়। জাতকের গল্পে দেখা যায় বুদ্ধ স্বয় গল্পকার রাজকীয় শিকার-কাহিনীর হিংস্রতা কসাইয়ের মুখে ফুটিয়ে তুলতে কুণ্ঠিত হন নি। মুমুক্ষু বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাসের জন্যে তৈরি অজন্তা গুহার ভিত্তিগাত্রে শিল্পীরা যে ছবি এঁকেছেন, তা বহুধাবিভক্ত জীবন-বৈচিত্র্যের ছবি, বৌদ্ধসাধনার শুধু আদর্শের একমাত্র রূপায়ণ নয়। মাতালের মদের আড্ডাও সেখানে দ্বিধাহীন স্বীকৃতি পেয়েছে। মহাবলীপুরমের গঙ্গাবতরণের কাছে বাঁদরের মূর্তি চারিত্র্যের জোরেই গঙ্গার পাশে সমান আসনে বসতে পায়। বিশ্বনাথ মন্দিরের গায়ে ভাস্করের ছেনির আঘাতে আঘাতে বেজে উঠেছে জীবনের নানা পর্দায় সুর। সেখানে শিল্পী নিরাসক্ত রূপপূজক। আদিম সংগতির সংকোচে রূপকল্পনার ইচ্ছা খর্ব হয়নি কোথাও। এই সকল তুলিচালনা দেখি আমাদের মহাকাব্যগুলিতে। ব্যাসের মহাভারতে জীবন-বিচিত্রার যে অকুণ্ঠিত স্বীকৃতি তার জুড়ি মেলা ভার। স্বর্গীয় শুচিতা থেকে নারকীয় বীভৎসা পর্যন্ত সব প্রকাশের বিষয়ীভূত হয়েছে। এমন কি 'আদর্শ' চরিত্রেও কবি আদর্শের বিশুদ্ধি রক্ষায় ব্যস্ত নন। প্রয়োজনবোধে তার শুভ্র-শুচিতায় কালি লেপে দিতে তাঁর ভয় নেই, কিছুমাত্র কুণ্ঠা নেই। শিল্পীর এই যে সাহস এর আদর্শ আছে অদৃশ্য মহাশিল্পীর বিশ্বশিল্পরচনায়। 'বাঁশরি' নাটকের বাঁশরি চরিত্রের মুখের কথাটি রবীন্দ্রনাথেরই কথা—'বিধাতার তুলিতে অসীম সাহস। যাকে ভালো দেখতে করতে চান, তাকে সুন্দর করা দরকার বোধ করেন না। তাঁর মিষ্টান্ন ছড়ান ইতর লোকদেরই পাতে।'

এই ইতর লোকেরা বিশ্বপ্রকৃতিতে মনোমত সুন্দরকে খোঁজে। 'অসুন্দরকে' তাই তাদের ভয়। কিন্তু সাচ্চা জীবন-রসের রসিক তিনি যিনি দ্বিদেশদর্শী। তিনি জানেন বিশ্বশ্রী ফোটে রূপ-বিরূপের সন্ধিতে। রবীন্দ্র-জীবনে এই দ্বিদেশদর্শিতার সূচনা ঘটে মানসী যুগে। কড়ি ও কোমলে ('পাষাণী মা'—কবিতা দ্রষ্টব্য) একটু [illegible] জেগেছিল মাত্র। প্রথম [illegible]-দর্শনের রূঢ়তা অবশ্যই সহনীয় হয়নি, ব্যথিত বিভ্রান্ত কবির সংশয় প্রশ্ন কবিতার আকার নিয়েছে। মানসীর অন্তর্গত অল্প দিনের ব্যবধানে রচিত পর পর তিনটি কবিতায় সমকালীন ভাবনার গতিপথ সুচিহ্নিত। ১৮৮৭ সালের আষাঢ়ে লেখা হয় 'সিন্ধুতরঙ্গ'। কবিতাটিতে কবির ব্যথিত জিজ্ঞাসা—

> "পাশাপাশি এক ঠাঁই
> দয়া আছে দয়া নাই—
> বিষম সংশয়।
> মহাশঙ্কা মহা-আশা
> একত্র বেঁধেছে বাসা,
> একসাথে রয়।
> এ কি দুই দেবতার
> দ্যুত খেলা অনিবার
> ভাঙা গড়াময়?
> চিরদিন অন্তহীন জয় পরাজয়?"

কবিজীবনে এই প্রথম রূপ-বিরূপের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সচেতনতা। কিন্তু এখানে শুধুই প্রশ্ন আছে, কোনো উত্তর মেলে নি। শেষ দুটি কবিতায় কালগত ঘনিষ্ঠতা লক্ষণীয়। ১৮৮৮ সালে লেখা হয় 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি'। সিন্ধুতরঙ্গের 'দুই দেবতা' এখানে অন্বয়ে মিলিত।

"মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই

নিয়ম নিগড়ে
আনাগোনা মেলামেশা সকই অন্ধ
দৈবের ঘটনা।
এই ভাঙে, এই গড়ে
এই উঠে, এই পড়ে
কেহ নাহি চেয়ে দেখে কার কোথা
বাজিবে বেদনা।

• • •

কোথাও পড়েছে আলো কোথাও বা
অন্ধকার নিশি,
কোথাও সফেন শুভ্র, কোথাও বা
আবর্ত আবিল,
সৃজনে প্রলয়ে মিশি
আক্রমিছে দশদিশি—
অনন্ত প্রশান্ত শূন্য তরঙ্গিয়া
করিছে ফেনিল।

• • •

মোরা শুধু খড়কুটো স্রোতোমুখে
চলিয়াছি ছুটি।

• • •

তুমি কি শুনিছ বসি হে বিধাতা
হে অনাদি কবি,
ক্ষুদ্র এ মানবশিশু রচিতেছে
প্রলাপ জল্পনা?"

দু দিন পর লেখা 'প্রকৃতির প্রতি' কবিতার বক্তব্য—

"আধো-ঢাকা আধো-খোলা ওই তোর মুখ
রহস্য নিলয়
প্রেমের বেদনা আছে হৃদয়ের মাঝে
সঙ্গে আনে ভয়।

• • •

যত অন্ত নাহি পাই তত জাগে মনে
মহারূপ রাশি
তত বেড়ে যায় প্রেম যত পাই ব্যথা,
যত কাঁদি হাসি।
যত তুই দূরে যাস
তত প্রাণে লাগে ফাঁস,
যত তোরে নাহি বুঝি
তত ভালোবাসি।"

লক্ষণীয়, পূর্ববর্তী কবিতা দুটির প্রশ্নাত্মক ভঙ্গি এখানে অনুপস্থিত। সভয় বিস্ময় জিজ্ঞাসার স্থলাভিষিক্ত। 'মহারূপরাশি' সেই বিস্ময়ের উদ্বোধক। পূর্ব কবিতার উচ্চারিত প্রশ্নের উত্তর যদিও এখানেও অনায়ত্ত, তবু দেখা যায় এই চিন্তা ভাবী-চিন্তার খাত ঘেঁষেই রয়েছে।

উত্তর মিলেছে আয়ুর শেষ সীমায়, জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার সেই হল চরম ফসল। বীথিকা কাব্যে বিধাতার উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে কবি বলছেন—

"প্রভু,
সৃষ্টিতে তব আনন্দ আছে
মমত্ব নাই তবু,
ভাঙার গড়ায় সমান তোমার লীলা।
তব নির্ঝর ধারা
বে-বারতা বহি সাগরের পানে
চলেছে আত্মহারা
প্রতিবাদ তারি করিছে তোমার শিলা।
দোঁহার এ দুই বাণী
ওগো উদাসীন, আপনার মনে
সমান নিতেছ মানি;
সকল বিরোধ তাই তো তোমার
চরমে হারায় বাণী।
বর্তমানের ছবি
দেখি যবে, দেখি, নাচে তার বুকে
ভৈরব ভৈরবী।

• • •

মুছিছে মন্দ ভালো।
তোমার অসীম দৃষ্টি ক্ষেত্র
কালো সে রয় না কালো।
অপরার সে তো তোমার চক্ষে
ছদ্মবেশের আলো।"

—'নমস্কার', বীথিকা

অথবা রচনাকাল—৩ আগস্ট, ১৯৩৫

"তোমার সৃষ্টিতে কভু শক্তিরে
কর না অপমান,
হে বিধাতা—হিংস্রেরেও করেছ
প্রবল হস্তে দান
আশ্চর্য মহিমা এ কী।
প্রখরনখর বিভীষিকা,
সৌন্দর্য দিয়েছ তারে,
দেহধারী যেন বজ্রশিখা,
যেন ধূর্জটির ক্রোধ।
তোমার সৃষ্টির ভাঙে বাঁধ
ঝঞ্ঝা উচ্ছৃঙ্খল, করে তোমার
দয়ার প্রতিবাদ।
বনের দস্যু যে সিংহ,
ফেনজিহ্ব ক্ষুব্ধ সমুদ্রে
যে উদ্ধত ঊর্ধ্ব ফণা,
ভূমিগর্ভে দানব যুদ্ধের
ডমরুনিঃস্বনী স্পর্ধা,
গিরিবক্ষভেদী বহ্নিশিখা
যে আঁকে দিগন্তপটে আপন
জ্বলন্ত জয়টিকা,
প্রলয়নর্তিনী বন্যা বিনাশের
মদিরবিহ্বল
নির্লজ্জ নিষ্ঠুর—এই যত
বিশ্ববিপ্লবীর দল
প্রচণ্ড সুন্দর। জীবলোকে
যে দুর্দান্ত আনে ত্রাস
হীনতালাঞ্ছনে সেতো পায় না
তোমার পরিহাস।"

—সে।

একথা স্মর্তব্য বীথিকা, সে প্রভৃতির রচনাকাল কবির অজস্র চিত্র রচনারও কাল। কিন্তু বীথিকার এই কবিতাকেও বহু পিছনে ফেলে আরও পরে এ অনুভব কবিকণ্ঠে স্পষ্টতম ভাষা পেয়েছে নবজাতকের একটি কবিতায়। কবিতার নামই 'রূপ-বিরূপ'। এই হল মানসী যুগের তরুণ রবীন্দ্রনাথ-উচ্চারিত বিভ্রান্ত কাতর প্রশ্নের মৃত্যুপথগামী প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত নিরাবেগ যথার্থ উত্তর।—

"সৃষ্টিরঙ্গভূমিতলে
রূপ-বিরূপের নৃত্য একসঙ্গে
নিত্যকাল চলে,
সে দ্বন্দ্বের করতালঘাতে
উদ্দাম চরণপাতে
সুন্দরের ভঙ্গী যত অকুণ্ঠিত
শক্তিরূপ ধরে,
বাণীর সম্মোহবন্ধ ছিন্ন
করে অবজ্ঞার ভরে।
তাই আজ বেমন্ত্রে হে যন্ত্রী,
তোমার করি স্তব—
তব মন্দ্ররব
করুক ঐশ্বর্যদান
রৌদ্রী রাগিণীর দীক্ষা নিয়ে
যাক মোর শেষ গান
আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
রূঢ় পৌরুষের ছন্দে
জাগুক হুংকার
বাণীবিলাসীর কানে ব্যক্ত হোক
ভর্ৎসনা তোমার।"

—'রূপ-বিরূপ', নবজাতক
উদীচী, শান্তিনিকেতন, ২৮
জানুয়ারী, ১৯৪০

রবীন্দ্রনাথের ছবি আর সাহিত্যের তুলনাত্মক আলোচনার জাল এবার গুটিয়ে আনি। সৃষ্টির দুটি ধারার পারস্পরিক সম্বন্ধ, উভয়ের মিল অমিল নানা দিক থেকে মোটামুটি ঘুরে দেখার চেষ্টা করা গেল। এবার বক্তব্য শেষ করার পালা। কিন্তু তার আগে আর একটি প্রাসঙ্গিক ছোট্ট আলোচনা, যা বাকি আছে, সেরে নিতে চাই।

রবীন্দ্রনাথের ছবি এদেশের চিত্র-জগতে একেবারেই আকস্মিক, কিন্তু সাহিত্যে তিনি এমন সম্বন্ধহীন নূতনত্বের চমক নিয়ে আসেন নি, এখানেই ছবি আর সাহিত্যে মস্ত তফাত—এমনতর মন্তব্য অনেকে করে থাকেন। এ কথার যথার্থতা বিচারের বিষয়। একটু তলিয়ে দেখলে ধরা পড়বে যদিও এর মধ্যে খানিকটা সত্য অবশ্য আছে, তবু মন্তব্যটি ষোলো আনা গ্রহণযোগ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের ছবির আবির্ভাব সাম্প্রতিক ঘটনা। অতি নৈকট্যবশত একালের জনমানসে তার প্রতিক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করেছি ও করছি। কিন্তু রবীন্দ্র কবিতার প্রথম আবির্ভাব এবং সমকালীন সামাজিকের মনে তার আন্দোলন কালের দূরত্বে ঈষৎ অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন বলেই আমরা ধরে নি সে আবির্ভাব বুঝি বেশ সহজে ঘটেছিল। সহজে যে ঘটে নি, তার অগণিত দলিল ছড়িয়ে আছে সমকালীন

সাহিত্যপত্রের ঝড়-ওঠা পাতায়, সমালোচক গ্রন্থকারের গ্রন্থে, আর স্বয়ং কবির হরেক রচনায়। আজ যেমন ছবি তার অপ্রত্যাশিত নূতনত্বের ধাক্কায় দর্শকচিত্তে বিস্মিত আনন্দ অথবা বিভ্রান্ত হতাশার সৃষ্টি করছে, সেদিন সাহিত্যও তেমনি করেছিল। সমকালীন মানসসমুদ্র মন্থন করে প্রচুর প্রশংসা ও প্রচুরতর নিন্দা উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল নবাগতের উদ্দেশে। কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ থেকে শুরু করে বিপিনচন্দ্র পাল, ডি এল রায় নানাকালের রবীন্দ্র-কাব্যাহত নানাজনের নাম মনে পড়বে। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রকাব্যের এমন অনুরাগীও দেখা গেছে যাঁরা কাব্যের 'Shocking' পালাবদলে মর্মাহত হয়েছেন। সোনার তরী, চিত্রা, গীতাঞ্জলি, বলাকার কবিতা পাঠে যিনি ভক্তিতে কৃতাঞ্জলি, পত্রপুটের গদ্য কবিতা পড়ে তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে দণ্ডপাণি মূর্তি ধরেছেন, এও দেখা গেছে। এর কারণ আর কিছুই নয় কাব্যের অপরিচিত রূপ এবং পাঠকের অনভ্যস্ত রুচি। কাব্যসৃষ্টির যে পথে রবীন্দ্র-

নাথের পদক্ষেপ ও বিচরণ তা নব্য মহাকাব্যযুগের মাইকেল হেম নবীনের সঙ্গে তো মেলেই না, 'কাব্যগুরু' বিহারীলালের সঙ্গেও না। দিন কয়েক দু-এক ছত্রে গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণের পরই নবীনশিষ্য ধরেছেন সম্পূর্ণ নিজের এক পথ, সেখানেও বাঁক ফিরেছেন বারংবার। ধরেছেন এমন পথ যে পথ এ পর্যন্ত কেউ কোনোদিন মাড়ায় নি, যাকে নাম দিয়েছেন 'অপথ'। লিখেছেন—

"এইবার এই বর্তমান আনাড়ি লোকটার অপথযাত্রার ভ্রমণ বৃত্তান্ত দুই একটা কথায় বলিয়া লই। সাহিত্যে লক্ষ্মীছাড়ার দলে ভিড়িয়াছিলাম খুব অল্প বয়সেই। এমন ভদ্র গৃহস্থের অনেক তাড়া খাইয়াছি। সঙ্গীতেও আমার ব্যবহারে শিষ্টতা ছিল না। তবু সে মহল হইতে পিঠের উপর বাড়ি যে কম পড়িয়াছে তার কারণ, এখনকার কালে সে দিকটার দেউড়িতে লোকবল বড়ো নাই।"

—'সঙ্গীতের মুক্তি',
সঙ্গীতচিন্তা।

আনাড়ি লোকটার অপথযাত্রা কথাটি লক্ষ করার মতো। এই সঙ্গে আর একটি অবশ্যস্মর্তব্য বচন উদ্ধার করি—

"জাত-খোয়ানো কলঙ্ককে আমি অঙ্গের ভূষণ বলে মেনে নিয়েছি। কলার সকল বিভাগে আমি ব্রাত্য, বিশেষ গানের বিভাগে। গানে আমার পাণ্ডিত্য নেই এ কথা আমার নিতান্ত জানা—তার চেয়ে বেশি জানা গানের ভিতর দিয়ে অব্যবহিত আনন্দের সহজ বোধ। এই সহজ আনন্দের নিশ্চিত উপলব্ধির উপরে বাঁধা আইনের বন্ধনে আমাকে একটুও নড়াতে পারে নি। এখানে আমি উদ্ধত, আমি স্পর্ধিত আমার আন্তরিক অধিকারের জোরে।"

—অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র,
১৪।২।১৯৩৯

ছবির ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের বিধিবদ্ধ একাডেমিক শিক্ষার অভাবজনিত অজ্ঞতা আছে। হয়তো প্রচুর পরিমাণেই আছে। কিন্তু এখানেও ঐ আনন্দের বোধ ক্রিয়াশীল। সৃষ্টির রথযাত্রা তারই সারথ্যে। এমনিভাবে রবীন্দ্র প্রতিভার স্বৈরগতি কখনও অনির্ধারিত পথে চলার সহজ খুশীতে, কখনও বা ভাঙনের পথে বিপ্লবের প্রলয়ানন্দে অভূতপূর্ব নূতনত্বের সৃষ্টি করেছে সাহিত্যে, গানে ছবিতে।

সমাপ্ত

এ লোকটা আংটি চুরি করেছে! আমার বন্ধু নয়; জানিয়ে দাও, সবাইকে জানিয়ে দাও!
এক্ষুনি জানাচ্ছি।

লোকটা অরণ্য-দেবের বন্ধু নয়.. চোর.. আংটি চুরি করেছে

দিকে দিকে সাংকেতিক বার্তা ছড়িয়ে পড়ল ...
লোকটা অরণ্য-দেবের বন্ধু নয় চোর ...আংটি চুরি করেছে...

যা-কিছু সোনাদানা নিয়েছ, ফেরত দিতে হবে...
লম্বা চওড়া
কে এই লোকটা?

যাদের যার যার সোনাদানা, তাকে তাকে ফেরত দেবার ব্যবস্থা করো
এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি, অরণ্যদেব।

যারা-যারা সোনাদানা দিয়েছিলে... লক্ষ্ণৌতে চলে এসো...

আমরা দিয়েছিলাম চার থলে সোনা, দুটো সোনার বাটি আর আংটি নেকলেস।
চিনে-চিনে সব ফেরত নিয়ে নাও।

এ লোকটার শাস্তি কী হবে?
সেই কথাই ভাবছি।
আমার উকিল কোথায়?

বিজ্ঞান বাস্তব ও মানবজীবনের নিয়তি

প্রিয়দারঞ্জন রায়

সম্প্রতি দেশ পত্রিকায় 'মানব সভ্যতা ও বিজ্ঞান' শীর্ষক আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করে অনেক জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থী ঐ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত তথ্য ও তত্ত্বাদির আলোচনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধ তাঁদের এই আগ্রহ পূরণের প্রচেষ্টায় অবতারণা। এই প্রচেষ্টায় কতদূর সফল হব জানি না। কারণ, প্রায় আট-দশ বছর যাবৎ আমি এক প্রকার অন্ধ অবস্থায় বয়সের দুর্বহ বোঝা নিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে চলেছি। ফলে জ্ঞান বিজ্ঞানের আধুনিক প্রগতি সম্বন্ধে নিজেকে অভিজ্ঞ করে রাখবার সুযোগ-সুবিধা হয়ে ওঠে না।

বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছেন—সতত অপস্রিয়মান এক লক্ষ্যের অভিমুখে বিরামহীন অনুসন্ধান। এই লক্ষ্য হচ্ছে বাস্তবের স্বরূপ বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সত্যের স্বরূপ, যাকে ইংরাজীতে বলা হয় রিয়ালিটি। কিন্তু প্রায় ছয় হাজার বছরে বর্তমান মানব সভ্যতার যুগের মধ্যে মাত্র বাট সত্তর বছরে বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি দেবীর গোপন রহস্যের ভাণ্ডার থেকে যেসব জ্ঞানের রত্নরাজি উদ্ধার করেছেন পরিমাণে তা পৃথিবীতে মানুষের বাকি অস্তিত্বকালে অর্জিত জ্ঞানের পরিমাণের চেয়েও অনেক বেশী বললেও অত্যুক্তি হয় না। মানবের সমাজে ও সভ্যতায় এত সব নিত্য নব মূল্যবান জ্ঞান, এত অল্প সময়ের মধ্যে হঠাৎ দেখা দিয়েছে যে মানুষ তাদের ব্যবহার নিজের মনের, সমাজের ও সভ্যতার পরিবেশের উপযোগী করে সমঞ্জস করতে পারেনি। ফলে মানুষের সভ্যতায় যে সব গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে আমার আগের প্রবন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি এবং বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের অদ্ভুত ও বিস্ময়কর অগ্রগতির একটি ধারাবাহিক বিবরণেরও উল্লেখ করেছি।

এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি প্রাকৃতিক বিধান বা নিয়ম সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান যাচ্ছে বদলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি ছিল বিজ্ঞানী নিউটনের প্রবর্তিত গতির নিয়ম ও হেতুবাদের অনুসরণে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যানে বিশ্বাস। এই মতবাদ অনুসারে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ থাকে সমানভাবে একটি কার্যকারণ শৃঙ্খলে বাঁধা। এ থেকেই গড়ে উঠেছিল নৈশ্চিত্যবাদের সূত্র (প্রিন্সিপল অব ডি-টারমিনেশন)।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় তেজস্ক্রিয়তা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ সমূহ, রঞ্জন রশ্মি (এক্সরে), আপেক্ষিক তত্ত্ব (থিওরি অব রিলেটিভিটি), কোয়ানটাম-বিধি, কোয়ানটাম মেকানিক্স, ফোটন, ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন, পরমাণুর গঠনবিধি এবং অণুর প্রকৃতি ও ধর্ম (ফিজিক্স অব মলিকুলস), মহাজাগতিক রশ্মি এবং সম্প্রসারণশীল বিশ্ব ইত্যাদির আবিষ্কারের সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের পরিচয় ঘটেছে।

অবশেষে আণবিক ও পারমাণবিক সত্তাসমূহ এবং প্রাথমিক কণিকা সমূহের (ফান্ডামেন্টাল পার্টিকুলস্) সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের প্রসার উঠেছে বেড়ে। এদের আবিষ্কারের ফলে দেখা গেল যে এরা নৈশ্চিত্যবাদের সূত্র মেনে চলে না এবং বিজ্ঞানের হেতুবাদ যায় এদের ক্ষেত্রে একপ্রকার বাতিল হয়ে। পরমাণুর যখন কোন পরিবর্তন ঘটে তা সকল সময়েই হয় আকস্মিক, অতীতের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ না রেখে এবং ভবিষ্যতের কোন নির্দেশ না দিয়ে। পরমাণুর অভ্যন্তরীণ যাবতীয় পরিবর্তন কোন নিয়ম মেনে চলতে দেখা যায় না। এই সব অণু পরমাণুর অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাই বিজ্ঞানীরা একটি গড়ের নিয়ম (স্ট্যাটিসটিক্যাল ল) অনুসরণ করেন। এ থেকে বলা যেতে পারে যে ইলেকট্রন বা বিদ্যুৎকণিকার গতিবিধি ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন মানুষের গতিবিধির মত একপ্রকার অনিশ্চিত বা কোন নিয়মের অধীন নয়। এরা যেন নিজের খেয়ালমত চলাফেরা করে। কিন্তু দলবদ্ধ অবস্থায় তারা সর্বত্র নিয়মের বাঁধন মেনে চলে। এ যেন একটা মনস্তাত্ত্বিক হেঁয়ালি বা আপাতবিরোধী সত্য। সাধারণত বিজ্ঞানীরা সমষ্টিগত জড়কণিকার ক্ষেত্রে কোন অলৌকিক ব্যাপার কখনো ঘটতে পারে এরকম বিশ্বাস করেন না। কিন্তু পরমাণুজগতে ওরকম ব্যাপারের সম্ভাবনা অনায়াসে মেনে নিতে প্রস্তুত আছেন। বিজ্ঞানীদের দেশ কাল ধারণা সম্বন্ধেও অনুরূপ বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, বিজ্ঞানী আইনস্টাইন-এর আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রবর্তনে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে পদার্থবিজ্ঞানে নিয়মের সত্যতা নির্ভর করে পর্যবেক্ষণের দেশের পরিমাপের মাত্রার (ডাইমেনশন) উপর। গত কয়েক দশকের মধ্যে প্রযুক্তি-বিদ্যার উৎকর্ষের ফলে যানবাহন ও যোগাযোগের বহু অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর উন্নতি ঘটেছে; যথা—অভ্যন্তরীণ প্রজ্বলন ইঞ্জিনের প্রবর্তন (ইনটারন্যাল কমবাসশন এঞ্জিন), থারমাইয়োনিক ভালব-এর উদ্ভাবন, আগে যে-কোন দূর দেশে যেতে কয়েক সপ্তাহের সময়ের দরকার হত এখন বিমানযোগে তা কয়েকদিনেই সম্পন্ন করা যায়, বিদ্যুৎ চুম্বক তরঙ্গে পরিবর্তিত যে কোন বার্তা যাদের পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আসতে বর্তমানে দরকার হয় মাত্র সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময় ইত্যাদি। এর ফলে পৃথিবী হয়ে উঠেছে এখন আমাদের কাছে বড়ই ক্ষুদ্র। জীববিজ্ঞানেও এইপ্রকার সমসাময়িক বিস্ময়কর অগ্রগতির উল্লেখ করা যায়; যেমন বহু খাদ্যপ্রাণের (ভিটামিন) আবিষ্কার, কৃত্রিম উপায়ে প্রজনন (পারথেনোজেনেসিস), ক্যানসার রোগের উৎপাদক পদার্থ, পেপলভ-এর অবস্থার প্রতিফলন (কনডিশনড রিফ্লেক্স) ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং বহু রোগনাশক অ্যান্টিবায়োটিকস-এর আবিষ্কার।

গত দুই-তিন দশকের মধ্যে বিজ্ঞানে যেরকম অপূর্ব দ্রুত ও অদ্ভুত অগ্রগতি ঘটেছে তার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে (১) ১৯৪৫ সালে পারমাণবিক ও পরমাণুকেন্দ্রিক যুগের প্রবর্তন, (২) জীববিজ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রসার, যথা—মস্তিষ্ক ও দেহের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ এবং ১৯৫৪ সালে নিউক্লিক অ্যাসিড আর এন এ ও ডি এন এ-এর সাহায্যে মানুষের বংশানুক্রমিকতার (হেরেডিটি) ব্যাখ্যানের গবেষণার প্রবর্তন; (৩) ১৯৫৭ সালে পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের মহাকাশ ভ্রমণ এবং পরবর্তীকালে পৃথিবী থেকে রকেটযোগে প্রেরিত যানের চন্দ্র-পৃষ্ঠে অবতরণ।

পরিশেষে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক অপূর্ব উন্নতির কথা এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড, কৃত্রিম মূত্রগ্রন্থি মানুষের দেহের মধ্যে স্থাপন করে হৃদরোগ ও মূত্রগ্রন্থিরোগে আক্রান্ত রোগীকে কর্মক্ষম অবস্থায় দীর্ঘকালব্যাপী বাঁচিয়ে রাখার উপায়ের প্রবর্তন হয়েছে। এ বিজ্ঞানের এক অতুলনীয় মহৎ চিরন্তন কীর্তি বললে অত্যুক্তি হয় না। পুরাকালে রসবিজ্ঞানী-দের দীর্ঘায়ু ও পুনর্যৌবন লাভের অভিপ্রায়ে পরশপাথরের অনুসন্ধানের স্বপ্ন এতকাল পরে ফলপ্রসূ হবার আশা দেখা দিয়েছে বলা যায়। পর পর প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বাড়িয়ে তুলছে মানুষের বিলাস এবং আরাম। পৃথিবীর যাবতীয় শারীরিক শ্রমের কাজ ক্রমশ বেশির ভাগ যন্ত্রযোগে গড়ে উঠছে মানুষের হাতের বদলে এমন কি মানুষের মনের সহযোগিতা ব্যতিরেকেও সাইবারনিটিকস এবং অটোমেশন-এর প্রবর্তনের পর। এত সব সুখ-সুবিধার সম্ভাবনা সত্ত্বেও বর্তমানে পৃথিবীতে মানুষ কেউই সুখী নয়। মানুষের জীবন এবং তার প্রবৃত্তির মধ্যে আজ দেখা দিয়েছে বিরোধ এবং দ্বন্দ্ব। এই যান্ত্রিকযুগে মানবজাতির শতকরা পঞ্চাশ ভাগের প্রচেষ্টা হচ্ছে শ্রম পরিহারের উদ্দেশ্যে, তথাপি মানুষের এই শ্রমকেই বিনাবাক্যে সম্মানদান করা হচ্ছে আমাদের প্রবৃত্তি। ইতিহাস হচ্ছে মানুষের চেষ্টা এবং পরিশ্রমের খতিয়ান, যার অভাবে এর কোন মূল্যই থাকে না। পৃথিবীর পরিশ্রমের কাজ ক্রমশ যন্ত্রের সাহায্যে যত বেশি সম্পন্ন হতে থাকবে, মানুষের জীবনের সাম্যাবস্থা যাবে ততই ব্যাহত হয়ে, যার ফলে মানুষ নিজের অস্তিত্বের জন্যে যে সামান্য কিছু তার প্রয়োজন হয় সেসবও তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না, মজুমদের ব্যবহারের দরুন নানা আনুষঙ্গিক প্রতিক্রিয়ার ফলে। অনেকে মনে করেন বিজ্ঞান হচ্ছে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক ঘটনাবলী বা তথ্যের বিবরণী; এ একটি ভুল ধারণা। প্রকৃতপক্ষে এসব প্রাকৃতিক তথ্যকে কোন একটি বিশেষ সন্তোষজনক ও তাৎপর্যপূর্ণ আদর্শে সাজানোই হচ্ছে বিজ্ঞানের একটি প্রধান অঙ্গ, যা একাধারে অর্থপূর্ণ ও বোধগম্য। এর জন্য দরকার হয় বিচারবুদ্ধির। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বাস্তব সত্যতা সম্বন্ধে অনেক সময় প্রশ্ন উঠে। বলাবাহুল্য কোন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সত্যতা নিঃসংশয়ে গৃহীত হয় না। বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুসন্ধানে অর্থাৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কতকটা অনিশ্চয়তা বা ভ্রান্তির সংমিশ্রণ অপরিহার্য। এর উৎস হচ্ছে জ্ঞেয় বস্তুর পরীক্ষার কাজে জ্ঞাতার অংশ গ্রহণের ফলে, মানুষের মন এবং বুদ্ধিকে প্রকৃতি থেকে নিমুক্ত করা যায় না, এবং জ্ঞেয় বস্তুও হচ্ছে প্রকৃতির একটি অংশ। মানুষের বুদ্ধি কেবলমাত্র বহির্জগতের বস্তুকেই তার বোধগম্য করতে পারে। কিন্তু অপরপক্ষে তা তার নিজের উৎসকে অর্থাৎ মনের স্বীয় প্রকৃতিকে বোধগম্য করতে পারে না। কথায় বলে হাতে চিমটে নিয়ে কোন জিনিস ধরা চলে কিন্তু সেই চিমটে উল্টে এসে হাতকে ধরতে পারে না। সুতরাং পরীক্ষা-নিরীক্ষার সিদ্ধান্তের বেলায় মানুষের মনের উপর কোন সম্যক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। সকল ক্ষেত্রেই আংশিক জ্ঞানের অধিকার লাভ করে বিজ্ঞানীরা তাঁদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও বিচারবুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে সম্যক সজাগ আছেন। যার ফলে বাস্তবের প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান তাঁদের মেলে না। এ কারণে অনেক বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা বা ইনটুইশন অধিকতর নির্ভরশীল ও নির্ভুল পরিচালক, এবং মরমীয়াদের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি বিজ্ঞানের গবেষণার চৌহদ্দির মধ্যে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। প্রজ্ঞার উদ্ভব ঘটে বুদ্ধির দীপ্তি ও বিশুদ্ধতা থেকে মানুষের যখন পরোক্ষ (সাবজেকটিভ) ও অপরোক্ষ (অবজেকটিভ) রূপী দ্বৈতজ্ঞান এক সামগ্রিক অদ্বৈত জ্ঞানের উপলব্ধিতে পরিণত হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে যদিও আমাদের জ্ঞানের অপূর্ব অগ্রগতি ঘটেছে তথাপি স্বীকার করতে হবে বাস্তবের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞানতা রয়েছে এখনও অপরিসীম গভীর। এই প্রসঙ্গে আমেরিকান বিজ্ঞানী সোয়ানের উক্তি প্রণিধানযোগ্য মনে করি। তিনি বলেছেন—

"Before long we shall have to face the problem of the nature of life and of all that goes with it, if real progress is to be made. We cannot, for ever, keep the laws of dead matter separated from those of living things. This is so, because everything that happens as the result of human efforts must be initiated by the mind of man. The heavens, for instances, go on in their courses without any attention from mankind. It follows the kind of "deterministic behaviour" which a hundred years ago might have been thought the "way of life" of all nature. But today, a man-made hydrogen bomb can interfere with the smooth running of nature. Thus man's

mind is interlocks with inanimate nature to direct its course. Man has the potentiality to participate and interfere in the work of nature."

এর অর্থ—জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে ও তার আনুষঙ্গিক যাবতীয় প্রশ্নে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। জড় পদার্থের বিধিবিধান ও নিয়ম, সজীব পদার্থের নিয়ম থেকে চিরদিনের জন্যে পৃথক করে রাখতে পারা যাবে না। কারণ মানুষের চেষ্টায় যা কিছু ঘটে সে সমস্তেরই প্রেরণা আসে তার মন থেকে। আকাশের গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি তাদের আপন আপন কক্ষে ঘুরে চলেছে মানুষের কোন সম্পর্ক না রেখে এক পূর্ব নির্দিষ্টভাবে; শতাবধি বছর আগে এটাই যাবতীয় প্রাকৃতিক পদার্থের ধর্ম হিসাবে পরিগণিত হত। কিন্তু বর্তমানে মানুষের গড়া একটি হাইড্রোজেন বোমা এই নির্ধারিত প্রাকৃতিক বিধিবিধানকে পারে ওলটপালট করে ভেঙে দিতে। সুতরাং বলা যায় মানুষের মন জড় প্রকৃতির সঙ্গে বাঁধা আছে তার গতিবিধির নিয়ন্ত্রণে। অতএব বলতে হয় প্রকৃতির কাজের সঙ্গে সহযোগিতা বা বিঘ্ন সৃষ্টি করবার প্রচ্ছন্ন শক্তি মানুষের আছে।

জড় প্রকৃতির বিধিবিধান ও নিয়মের সঙ্গে জীবনের সঙ্গতি সাধন করতে হলে বিজ্ঞানী সোয়ান মনে করেন যে আমাদের প্রয়োজন হবে এমন কতকগুলি বিধিবিধান ও নিয়ম যেগুলি আমাদের বর্তমান জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জুড়ে দিতে পারা যায়। তিনি মনে করেন এমন একটি বিশ্বব্যাপী নতুন সত্তার অস্তিত্ব আমাদের মানতে হবে যা আমাদের পরিচিত জড় জগতের সঙ্গে জীব জগতের যোগাযোগ তুলবে পাকাপাকি করে। এই সত্তাই একটি চেতনবুদ্ধি সত্তা, যা থেকে প্রজ্ঞার কণিকা রশ্মিরূপে সময়ে সময়ে ব্যক্তিজীবনে পরম সত্যের আভাস জাগিয়ে তুলতে পারে। এইরূপ একটি সত্তার ধারণা প্রাচীন ভারতীয় বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্মে, প্রাচীন চীনে 'টাওয়ে'-র এবং ইসলামের সুফী সম্প্রদায়ের ধর্মমতের ধারণার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

অপরপক্ষে প্রযুক্তিবিদ্যার এমন অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে যে, যার ফলে মানুষ আজ দেশকালের ব্যবধানকে করেছে খর্ব, দুরারোগ্য বহু ব্যাধিকে করেছে জয় এবং মানবজীবনের অগণিত সুখসুবিধা তুলেছে বাড়িয়ে। কিন্তু পৃথিবীতে মানুষের চিরবাঞ্ছিত স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠার কোন লক্ষণ এতে দেখা যাচ্ছে না। বিজ্ঞানের জ্ঞানের অর্জনে ও প্রয়োগে মানুষ যে প্রকৃতির উপর প্রভূত নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লাভ করেছে, আজ তা দেখা দিয়েছে মানবজাতির অস্তিত্বের পক্ষে এক ভয়াবহ আতঙ্করূপে। পরিবহন ও যোগাযোগের ব্যবস্থায় বিস্ময়কর অগ্রগতির ফলে মানুষ আজ সক্ষম হয়েছে বায়ুবেগে চলাফেরা করতে এবং পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে তার সঙ্গী মানুষের সঙ্গে চোখের নিমেষে যোগাযোগ সাধনে কিন্তু এর ফলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে, জাতি ও জাতির মধ্যে, দেশ ও দেশের মধ্যে সকল বাধাবিঘ্ন বিদূরিত করে এক সামগ্রিক মানব পরিবারের সৃষ্টি করতে পারেনি। অধিকন্তু এটি গড়ে তুলেছে ছোট ছোট পরস্পর বিবদমান বহু মানবগোষ্ঠী—সম্প্রদায়গত, ধর্মগত, বর্ণগত জাতিগত আদর্শগত, ভাষাগত, রাষ্ট্রগত এবং অর্থনৈতিক ভেদাভেদের ভিত্তিতে।

আত্মিক সম্পদের অবক্ষয়ে কেবলমাত্র বাহ্যজগতের বিষয় সম্পদ ও অর্থ সঞ্চয় মানুষকে দুর্বুদ্ধিতা, দুষ্প্রবৃত্তি ও মূঢ়তার অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করতে পারে না। ফলে, মানুষের ক্ষমতা ও অর্থের লোভ বেড়ে উঠেছে অসংযতভাবে যা হতে সৃষ্টি হচ্ছে পৃথিবীতে অহরহ দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রাম। বিপুল পরিমাণ অর্থ, মালমশলা, শক্তি ও শ্রম ব্যয়িত হচ্ছে দারুণ শক্তিশালী সামরিক মালমশলা ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে ও সঞ্চয়ে এবং মহাকাশ ভ্রমণ ও চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণে তা সবই অপরপক্ষে অনুন্নত দেশের কোটি কোটি লোকের অন্নাভাব, দারিদ্র্য, দুঃখদুর্দশা ও রোগ প্রতিকারের জন্য সদ্ভাবে ব্যয়িত হতে পারত। এ থেকেই মানজীবনের ভবিতব্য বা ভাগ্যলিপি সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এর উত্তরে বলা যায় মানবজীবনের পরিণাম বা ভবিতব্য হচ্ছে তার পারমার্থিক অভিব্যক্তির তুঙ্গতম শৃঙ্গের আরোহণ, যার পরিণামে তার জীবন হয়ে উঠবে আনন্দে পরিপূর্ণতায় সার্থক। একমাত্র বিজ্ঞানের অনুশীলন ও পন্থায় এই আত্মিক অভিব্যক্তির পরিণাম আধুনিক সভ্যতার বর্তমান পরিস্থিতিতে যে সম্ভব হবে না, সংক্ষেপে তা আলোচনা করা হল। এখন এ সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যানের প্রয়োজন আছে মনে করি।

প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির উচ্চতম সোপানেই যে মানুষের অবস্থিতি; এ হয়ত সকলেই স্বীকার করবেন। এটা সম্ভব হয়েছে মানুষের মন ও বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধনে, কারণ বিশ্বভুবনের তুলনায় মানুষ অণু থেকেও অণুর ছোট হয়েও তার চিন্তা ও মননশীলতার প্রভাবে মহান থেকেও মহীয়ানের উপলব্ধির প্রয়াসী, যেহেতু মানুষের মন ও বুদ্ধির শক্তির কোন সীমানা নেই। মানুষ মনের সাহায্যে চিন্তা করে, অনুভব করে, ইচ্ছা করে এবং এরই প্রভাবে সে হয়েছে জীবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব; কিন্তু পশুর সঙ্গে তার দেহের উপাদানে একটি নিকট-সাদৃশ্য দেখা যায়—দেহের গঠন কৌশলে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহারে। ফলে মানুষের মধ্যে দেখা যায় পশুর বহু স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, যা সে তার মনের শক্তির প্রভাবে প্রশমিত, নিয়ন্ত্রিত বা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় সক্রিয় করে তুলতে পারে। বিজ্ঞান মানুষের মনেরই সৃষ্টি এবং তারই কলাকৌশলের একটি অঙ্গ, যার প্রভাবে সে তার প্রাকৃতিক পরিবেশকে উন্নত বা পরিবর্তিত করতে পারে। সুতরাং বিজ্ঞানের উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় আদিম যুগের (প্রস্তর ও কাংস্যযুগের) মানুষের কলাকৌশলে এবং তার ব্যবহারিক যন্ত্রপাতি ও শিল্পদ্রব্যে।

প্রব্যাদি নির্মাণের আঙ্গিনে বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছে। বিজ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়বস্তু এবং ঘটনা পরম্পরায় ইন্দ্রিয়ানুভূতি লব্ধ জ্ঞানের প্রমাণের সাহায্যে তথ্য ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ এবং যুক্তিবিচার প্রয়োগে তাদের শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজিয়ে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও নিয়মের প্রতিষ্ঠা করা। ব্যবহারিক কলাবিদ্যারূপে বিজ্ঞান তার আধুনিক উন্নত অবস্থায় প্রযুক্তিবিদ্যা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এ থেকেই বৈজ্ঞানিক দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তি গড়ে উঠেছে বলা যায়। পরস্পরের পরিপূরকরূপে, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও চাহিদার অনুপাতে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা দ্রুতবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এবং সমাজের উপর তাদের প্রভাব :—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রগতির ফলে মানুষ সক্ষম হয়েছে তার পরিবেশের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠায়। এর ফলে মানুষের সমাজে ও রাষ্ট্রে এমন সব পরিবর্তনের সৃষ্টি হয়েছে যাতে বিজ্ঞানের এই দুই শাখা সম্বন্ধে জ্ঞানের নূতন দিক গিয়েছে খুলে। এর ফলে মানুষ মানুষের উপর আপন ক্ষমতা বিস্তারে প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছে এবং বিশ্বজুড়ে দেখা দিয়েছে মানবজাতির বহু অকল্যাণের বিভীষিকা এবং বিপজ্জনক আশংকা। যদিও বিজ্ঞান তার সত্যসন্ধানের পন্থার মাধ্যমে জড়বিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটনে নিয়োজিত রয়েছে, কিন্তু প্রযুক্তি-বিদ্যারূপে তার প্রয়োগ আজ শুধু খাদ্য, পণ্যদ্রব্য এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ও অন্যান্য সুখসুবিধার উৎপাদনে সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু এখন ক্রমশ পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রে দ্রুতবেগে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে এর অনুশীলন চলেছে যুদ্ধের মালমশলা ও অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদনে। বিজ্ঞান এখন মানুষের প্রভূত কল্যাণে তথা তার গুরুতর অমংগলের কারণ হয়ে উঠেছে বলা চলে—বিপুল উৎপাদিকা শক্তিতে তথা মহতী ধ্বংসশক্তিতে ও ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে।

অধিকন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ফলে মানুষের সমাজে দেখা দিয়েছে দুই পরস্পর দ্বন্দ্বে রত বিরোধীদলের সৃষ্টি—মাথার কাজের কর্মী অর্থাৎ শাসক, প্রশাসক, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের শ্রেণী এবং হাতের কাজের কর্মী অর্থাৎ কৃষক, কারিগর, মিস্ত্রী ইত্যাদি। শ্রমিকশ্রেণী কর্মীদের পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে মস্তিষ্কজীবী কর্মীদের হাতে, যারা শ্রমিকদের শ্রমকে কাজে লাগিয়ে অর্জন করে ক্ষমতা এবং অর্থ। সহানুভূতি, সৎ ইচ্ছা, সহযোগিতা ও পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবে এই দুই শ্রেণীর কর্মীদের মধ্যে অহরহ সৃষ্টি হচ্ছে বিরোধ এবং দ্বন্দ্ব, এমন কি সময়ে সময়ে হিংসাত্মক ও ত্রাসাত্মক উপায় অবলম্বনে। এতে সমাজের শান্তি ও শৃংখলা যায় অবশেষে বিনষ্ট হয়ে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উভয়েরই অগ্রগতি এবং তাদের উৎপাদিকা শক্তি যায় শিথিল হয়ে। অনুরূপ অশান্তি ও দ্বন্দ্বের অবস্থা দেখা দেয় আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে যখন প্রয়োগ করা হয় প্রযুক্তিবিদ্যার সমবায়ে পরাক্রান্ত করে। ক্ষমতা সাধারণত অন্যের উপর আধিপত্য ও প্রতিপত্তি বিস্তারের প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে। এই ক্ষমতা এবং আধিপত্যের লিপ্সা আজ পৃথিবীর সকল জাতিতেই সংক্রমিত হয়ে দেখা দিয়েছে—তাদের ব্যক্তিগত, জাতিগত, রাষ্ট্রগত, ধর্মগত, আদর্শগত স্বার্থের প্ররোচনায় ও বিচারবুদ্ধির মূঢ়তার ফলে। তাই আজ পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ তৎপর হয়ে উঠেছে তাদের সামরিক শক্তি বাড়িয়ে তুলবার প্রতিযোগিতায়, সকল সীমার বাঁধন অতিক্রম করে। এর ফলে গত দুই বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি হয়েছে সম্ভব এবং অধিকতর ভয়াবহ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনাও দিয়েছে দেখা। বিশ্বের শান্তি রক্ষাকল্পে রাষ্ট্রসংঘের যাবতীয় প্রচেষ্টা সাধারণ মানুষের মনে কোন স্থায়ী আশাভরসা জাগাতে পারেনি। কয়েকটি আধুনিক শক্তিশালী রাষ্ট্রে শাসকবর্গের হাতে শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে তাদের মধ্যে অহরহ যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্নীতির প্রভাব ও স্বেচ্ছাচারিতা; এবং শাসিত জনসাধারণের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ, ব্যক্তি স্বাধীনতার অবদমন এবং সংখ্যালঘু শাসকবর্গ ও তাদের শাসনাধীন জনগণের আধ্যাত্মিক অবনয়ন উঠছে প্রকট হয়ে। এমন কি, বহু তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার কৃতিত্বের অপব্যবহারের এইসব বিষময় পরিণাম যায় দেখা। কারণ অজ্ঞ, মূঢ় ও নিরক্ষর জনসাধারণকে সহজেই ভুলানো যেতে পারে মুখর প্রচারকার্যে, বিশেষত প্রযুক্তিবিদ্যার গবেষণায় উদ্ভাবিত রাষ্ট্রশাসিত রেডিও, টেলিভিশন, টেলিপ্রিন্টিং ইত্যাদি যন্ত্রযোগে। এমন কি সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে যেখানে সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে, সেখানে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থাও দুর্নীতিমূলক প্রভাব হতে মুক্ত নয়। অনেকে মনে করেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেখানে অধিক সংখ্যক জনগণের মতানুসারে রাষ্ট্রের শাসনবিধি গঠিত হয়, সেখানে সংখ্যালঘু জনগণের উপর কোন অত্যাচার অবিচারের সম্ভাবনা থাকে না ; এরূপ মনে করবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না। পৃথিবীতে শক্তিহীনের উপর শক্তিমানদের আধিপত্য, অবিচার ও অত্যাচার একটি সাধারণ ঘটনা, এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কারণ শক্তির ধর্মই হচ্ছে শক্তিহীনের উপর আধিপত্য করা ও তাকে অবদমিত করে রাখা। জনসংখ্যার আধিক্যও একটি শক্তিবিশেষ, একথা মানতে হবে। তাই সংখ্যাগুরু জনসাধারণের মতে গঠিত রাষ্ট্রবিধানে শাসকেরা সংখ্যালঘু শাসিতদের উপর কোন অন্যায় অবিচার করতে পারে না এইরূপ ধারণা করা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাবহুলের অত্যাচার অবিচারের দৃষ্টান্তের কোন অভাব নেই। এর দৃষ্টান্ত দেখা যায় মুসলমান বহুল অনেক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর তথা হিন্দুবহুল রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু মুসলমান বা হরিজনদের উপর অত্যাচার অবিচারের ঘটনায়। পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রেও এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় তার উল্লেখ করতে গেলে প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য যায় অনাবশ্যকভাবে বেড়ে। নীতি ও ধর্মবোধের সংযমবিহীন শক্তি মানুষের জগতে সকল ক্ষেত্রেই অকল্যাণের সৃষ্টি করে, এটা একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য। জড়জগতেও অসংযত উদ্দাম শক্তি যে ধ্বংসাত্মক একথা কারো অবিদিত নয় ; কারণ এ একটি বৈজ্ঞানিক সত্য ও প্রযুক্তিবিদ্যার গোড়ার কথা।

এই প্রসঙ্গে মহামতি টলস্টয়ের প্রায় ৮০ বছর আগের উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য মনে করি :—

"If the arrangement of society is bad, and a smaller number of people have power over the Majority and oppress it, every victory over nature will inevitably serve only to increase that power and that oppression. This is what is actually happening."

এর অর্থ—যদি বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে দূষিত বলা যায় এবং মুষ্টিমেয় ব্যক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপর আধিপত্য এবং অত্যাচার করে তাহলে প্রকৃতির উপর প্রত্যেক আধিপত্যের আবিষ্কারে সেই অবিচারকেই শুধু বাড়িয়ে তুলবে। এটাই প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে ঘটছে।

বস্তুত মানব সমাজ ও মানব সভ্যতার পক্ষে এ বড়ই ক্ষোভের ও দুঃখের বিষয় যে, পৃথিবীর শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ বিশেষ ব্যস্ততার সঙ্গে বর্তমানে নিযুক্ত আছেন ব্যাপক ভাবে হত্যাকাণ্ড এবং সমষ্টিগতভাবে আত্মহত্যার প্রচেষ্টায় যুদ্ধ এবং বিপ্লবের মাধ্যমে। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণ এবং ভূমধ্যস্থ খনিজ পদার্থের লুণ্ঠনে রত আছেন এতই অপর্যাপ্ত পরিমাণে যে, তাতে সাধারণ মানুষের মন যায় বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ; দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়লা, তেল, বহু ধাতব ও খনিজ পদার্থের উল্লেখ করা যায়। সম্প্রতি এইসব রাষ্ট্রসমূহ মানুষ মারবার জন্যে মাল-মশলা ও অস্ত্রশস্ত্র মজুত করতে ব্যস্ত আছেন বছরে দুশো বিলিয়ান ডলার ব্যয়ে। এই মানসিক বাতুলতার লক্ষণ প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী বিত্তশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে। এই জাতীয় পারমাণবিক ও পরমাণুকেন্দ্রিক মারণাস্ত্রের ভাণ্ডার গড়ে তুলবার পরিবেশের মধ্যে এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধের আবহাওয়ায় বিশ্ব-শান্তির প্রচার সম্পর্কিত বড় বড় কথা উচু গলায় বলতে শোনা যায়—রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সদস্যদের অধিবেশনে। রাষ্ট্রনীতি এখন পরিণত হয়েছে সামরিক শিল্পনৈতিক ও শ্রমিক সংঘের বিধিবিধানের এক কুখ্যাতি জটিল মিশ্রণে এবং মানবজীবনের প্রধান কর্ম ও উদ্দেশ্যরূপে, যদিও প্রত্যেক রাষ্ট্রের শাসকবর্গের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, আশ্চর্যের বিষয় যে, তাঁদের অনেকেই এখন ব্যস্ত আছেন হত্যাকাণ্ডের নিত্যনতুন উপায় উদ্ভাবনে। মার্কিন রাষ্ট্রের বাৎসরিক সামরিক বাজেটের পরিমাণ হচ্ছে ৮০ বিলিয়ান ডলারের অধিক, এটা রাষ্ট্রের সার্বিক বাজেটের ষাট শতাংশ এবং তার মোট উৎপাদনের মূল্যের ১২ শতাংশ। এ খবর হয়ত অনেকে জানেন যে, মার্কিন রাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাষ্ট্র উভয়ে মিলে যে পরমাণুকেন্দ্রিক মারণাস্ত্র মজুত করেছেন, তাদের বিস্ফোরণের শক্তির পরিমাণ হচ্ছে পনের পাউণ্ড টি এন টি-র সমান পৃথিবীর প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রী এবং শিশু অধিবাসীর হত্যার পক্ষে। গোড়ায় যে প্রথম ক্ষুদ্রাকার ইউরেনিয়াম বোমা জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরের ওপর ফেলা হয়েছিল তাতে প্রায় দুই লক্ষ নর-নারী ও শিশুর মৃত্যু ঘটে এবং প্রায় সমান সংখ্যক লোক অঙ্গহীন, দৃষ্টিহীন, অগ্নিদগ্ধ, বিষদুষ্ট এবং অন্য কোনভাবে পরিক্লিষ্ট হয় অথবা অনেকে দীর্ঘকালব্যাপী রুগ্নাবস্থার পর অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুতরাং এই দুই রাষ্ট্রে যে পরিমাণ শক্তিশালী ভয়াবহ পরমাণুকেন্দ্রিক মারণাস্ত্র সঞ্চিত করা হয়েছে সে সবার প্রয়োগে কোন যুদ্ধের যে কি ভীষণ পরিণাম ঘটতে পারে তা সহজেই কল্পনা করা যায়। শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের নায়ক ও শাসকেরা এর উত্তরে বলতে চান যে তাঁরাই এইভাবে বিশ্বের শান্তিরক্ষা করছেন শক্তির ভারসাম্য (ব্যালান্স অব পাওয়ার) রক্ষার ব্যবস্থা করে। এই ভারসাম্যের সংজ্ঞাটি আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে দীর্ঘকালব্যাপী একটি শ্রুতিমধুর বাঁধা বুলিরূপে চলতি আছে। প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিক অগ্রগতির যুগে এই শক্তির ভারসাম্যের বদলে অধিকতর উপযোগী বাক্য হচ্ছে বিভীষিকার ভারভাগী। রাষ্ট্রের শাসক দলের মুষ্টিমেয় নেতাদের হাতে শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে, তা শুধু যুদ্ধের কারণ হয়ে ওঠেনি, রাষ্ট্রের শাসকবর্গের এক গুরুতর নৈতিক অধঃপতন অবস্থারও সৃষ্টি করেছে বলা যায়। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে লব্ধ শক্তিতে প্রমত্ত হয়ে বহু সমাজবাদী সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনায়ক স্বেচ্ছাচারী হয়ে তাদের অমানুষিক নিষ্ঠুর অত্যাচারের সাফাই গাইতে দ্বিধা বোধ করেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ অগণিত নরনারী ও শিশুদের ক্ষুদ্র শিবিরে বিষাক্ত বায়ুপূর্ণ ঘরে আবদ্ধ করে বা অনশনে রাখা কিংবা দেশ থেকে বাস্তুহারা করে তাদের বিতাড়িত করা ইত্যাদি উপায় অবলম্বনের উল্লেখ করা যায়।

প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরিবেশ বিশেষত জল ও বায়ু যে ক্রমশ দূষিত হয়ে উঠছে একথা অস্বীকার করা চলে না। বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় দেখা গেছে যে বড় বড় শিল্প নগরীতে টনে টনে কার্বন-ডাই-অক্সাইড কার্বন-মনঅক্সাইড, সালফার-ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস, সিলিকা ও অঙ্গার কণিকা এবং অন্যান্য বহু দ্রব্যের ধূলিকণা প্রতি বছর বায়ু মধ্যে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে, কয়লা, তেল, পেট্রোল ইত্যাদি প্রজ্বলনে এবং বহুবিধ কারখানার চিমনির ধোঁয়া থেকে। শহর ও নগরবাসীদের স্বাস্থ্যের উপর এইসব পদার্থ যে বিশেষ ক্ষতিকর একথা বলাবাহুল্য। নিকটবর্তী নদী-সমূহের জলও সব সময়েই দূষিত হচ্ছে কারখানা ও নর্দমা থেকে ময়লা জলের মিশ্রণে। এমন কি বর্তমানে সমুদ্রের জলও দূষিত হচ্ছে পারমাণবিক শক্তি

উৎপাদনের কারখানা পরিহার্য হল থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংমিশ্রণে।

যে পরিমাণে পৃথিবীর প্রাকৃতিক জ্বালানি এবং খনিজ পদার্থসমূহ শোষিত হচ্ছে বিভিন্ন শিল্প উৎপাদনের জন্য এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামরিক প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মেটাতে যুদ্ধকালীন ও শান্তির অবস্থায়, তাতে তাদের পরিসমাপ্তির দিন যে সুদূরবর্তী নয়—তা সহজেই অনুমেয়। পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার চালু হয়েছে পৃথিবীর এই শক্তির ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে কিন্তু পারমাণবিক শক্তির উৎস হিসাবে ইউরেনিয়ামের খনিজ পদার্থের পরিমাণও সীমাবদ্ধ একথা মানতে হয়। সুতরাং পৃথিবীর প্রাকৃতিক জ্বালানি দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণে এবং তার খনিজ দ্রব্যের সংরক্ষণে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। শ্রম লাঘবের কৌশল এবং স্বল্পব্যয়ে বহুল উৎপাদন ও পরিবেশনের শক্তিতে প্রযুক্তিবিদ্যা সৃষ্টি করেছে সাধারণের মধ্যে বহুসংখ্যক বেকারের। এর ফলে অনেক রাষ্ট্রে গড়ে উঠেছে এক জটিল সমস্যা এবং অনেক অশান্তি ও শ্রমিকদলের মধ্যে এক গুরুতর বিক্ষোভ। এমন কি, যাঁরা পাকা কর্মচারী তাঁদেরও সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করতে হয় ধনিকবর্গ ও রাষ্ট্রীয় শাসকদের উপর।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অবিরাম অগ্রগতির ফলে জনসাধারণের মানসিক পরিবেশও গেছে নানাভাবে বদলে। বিশ্বের স্বরূপ এবং প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জড়বাদী বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান যা প্রযুক্তিবিদ্যার বহু বিস্ময়কর কীর্তিতে সমর্থিত হচ্ছে, তার ফলে মানুষের মনে জড়বাদের বিশ্বাস একপ্রকার বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে। জড় ও শক্তিই হচ্ছে বাস্তবের (রিয়্যালিটি) প্রকৃত উপাদান, এই হচ্ছে এখন সাধারণের ধারণা। মানুষের মননশীলতার কোন বিশেষ গুরুত্ব আছে বলে এখন অনেকে মনে করেন না; তাঁদের মতে এ হচ্ছে কেবলমাত্র শারীরিক বৃদ্ধির আনুষঙ্গিক পরিণাম। জীবনের মূল্যবোধ এবং আধ্যাত্মিক মনোভাবকে কেবলমাত্র সংস্কার বা বিভ্রান্তি, এমন কি অনেক সময় বিকৃত যৌন সংস্কার-রূপেও ধার্য করা হয়। এই জাতীয় মনোবৃত্তির রাষ্ট্রনৈতিক পরিণাম হচ্ছে জীবনের নৈতিক মূল্যায়নের প্রতি এক ব্যাপক ঔদাসীন্য। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রে জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় নিরাপত্তার নামে বহু অমানুষিক অত্যাচার ও বর্বরতার কারণ হিসাবেও এই ঔদাসীন্যকে গণ্য করা যায়।

প্রায় বিশ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটে। জীব-জগতের অভিব্যক্তির তুঙ্গতম সোপানে মানুষের স্থান নির্ণয় করা হয়েছে তার ভৌতিক দেহ ও অভ্যন্তরীণ অতি জটিল শারীর যন্ত্রাদির সংগঠনের বিবেচনায়। মানুষের মধ্যে এই অভিব্যক্তির প্রক্রিয়া এক নূতন গতিপথ অবলম্বন করেছে। তার মন ও বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিগ্রহণ করেছে এক শারীরবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিকরূপে, এবং কোন কোন বিরল ব্যক্তির ক্ষেত্রে আপন আত্মার সঙ্গে বিশ্বাত্মার ঐক্য সম্বন্ধে তাঁদের মনকে সচেতন করে তুলেছে। যদিও অভিব্যক্তির প্রক্রিয়া থেকেই মানুষের উদ্ভব, বর্তমানে সে নিজেই এই প্রক্রিয়াকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে যে সক্ষম—একথা স্বীকার করতেই হয়। সুতরাং দেখা যায় যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতা একদিকে সৃষ্টি করেছে তার জাজ্বল্যমান কীর্তি এবং অপরদিকে সঙ্গে সঙ্গে সে নিয়ে এসেছে এক গুরুতর অমঙ্গলের বিভীষিকা বা আশঙ্কা।

মানুষের বুদ্ধির উৎকর্ষ এবং জ্ঞান বা শক্তিরই রূপান্তর তা আধ্যাত্মিক নিয়মের ও মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত না হলে অকল্যাণের কারণ হয়ে ওঠে, একথা আগেই বলা হয়েছে। অপর কথায় বলা যায় মানুষ এখনও বস্তুতান্ত্রিক স্বার্থের মোহ থেকে আধ্যাত্মিক বা পরমার্থিক সোপানে উঠতে পারেনি। মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর কথায় মানুষের জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার বিজ্ঞতার উৎকর্ষও যদি সমভাবে বেড়ে না যায় তাহলে তার জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও যায় বেড়ে :—

In his article on "The Evolution of life; its Origin, History, and future:
Julian Huxley also writes :

"In the light of our present knowledge man's most comprehensive aim is seen not as mere survival, not as numerical increase, not as increased complexity of organization or increased control over his invironment, but as greater fulfilment - the fuller realization of more possibilities by the human species collectively and more of its component members individually".

এর অর্থ—আমাদের জ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় মানবজীবনের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক উদ্দেশ্য হচ্ছে বেঁচে থাকা নয়, সংখ্যাবৃদ্ধি নয়, সংগঠনের জটিলতা নয় বা তার পরিবেশের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ নয়, কিন্তু অধিকতর পরিপূর্ণতা—মানবজাতির অধিকতর সম্ভাবনার অধিকতর উপলব্ধি, সমষ্টিগতভাবে এবং অধিকসংখ্যক ব্যক্তির ব্যক্তিগতভাবে।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর মতে মানুষের অভিব্যক্তির প্রক্রিয়া হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক দেহতাত্ত্বিক নয়। এটা পরিচালিত হয় মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, যা গড়ে উঠে তার মনের সৃষ্টির সঞ্চয় ও বৈচিত্র্য থেকে এবং তাদের ফলাফলে। সুতরাং মানুষের বেলায় অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার প্রধান সোপানগুলি পার হতে হয়, ধারণা, জ্ঞান ও প্রত্যয়ের আদর্শগত বহু প্রবল মানসিক সংগঠনের মাধ্যমে—দেহতাত্ত্বিক ও শারীরবৃত্তিক সংগঠনের পরিবর্তে। সুতরাং রাসেলের মতে মানুষ তার সকল মানসিক সম্পদের (জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি, কল্পনা ও নৈতিক প্রচেষ্টা) ব্যবহারে এই অভিব্যক্তির প্রক্রিয়া নিজের মধ্যে ও তার পরিবেশের মধ্যে পরিচালিত করতে ও তার গতিবেগ বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম। মানবজীবনের অভিব্যক্তি এবং তার ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মতবাদের সঙ্গে যদি এখন আমাদের প্রাচীন বৈদান্তিক মতবাদের তুলনা করা হয় তবে উভয়ের মধ্যে একটি নিকট সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু বেদান্তের মতকেই অধিকতর ব্যাপক বলে মনে হয়।

বেদান্তের মতে অভিব্যক্তি হচ্ছে জড় ও জীবজগতে এক বিশ্বব্যাপী চেতনসত্তার ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়া। আধিভৌতিক ক্ষেত্রে মানুষের দেহে জড়ের জটিলতার উদ্ভব হয়েছে তার উচ্চতম অবস্থায়; এর পরই শুরু হয়েছে অভি-ব্যক্তির প্রক্রিয়ার পরবর্তী অবস্থা মনের স্তরে ও তার ঊর্ধ্ব স্তরে। এ থেকে বোঝা যায় যে, অভিব্যক্তির প্রক্রিয়া মানুষের এখন প্রধানত হয়ে উঠেছে মনস্তাত্ত্বিক।

আত্মচেতনা, যা আদিম জীবকোষের বৈশিষ্ট্য ও প্রধান লক্ষণ, তা মানুষের মধ্যে এক অতি উচ্চ মাত্রায় দেখা দিয়েছে। এর ফলে মানুষ বহির্জগতের জড় পদার্থের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে তাকে নিয়ন্ত্রিত করবার শক্তির অধিকারী হয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর্জগৎ বা আপন সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান বা চেতনার ক্রমবিকাশে সে সমর্থ হয়েছে তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বাড়িয়ে তুলতে। বেদান্তের মতে মানুষের অভিব্যক্তির লক্ষ্য হচ্ছে তার আত্মচেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ, যার ফলে সে তার ব্যষ্টিসত্তা বা আত্মার সঙ্গে সমষ্টি সত্তার বা বিশ্বাত্মার সঙ্গে ঐক্যের উপলব্ধি করতে পারবে। এই বিশ্বাত্মাই হচ্ছে পরম সত্য (আলটিমেট রিয়্যালিটি)। মানবজীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই আত্মন ও ব্রহ্মণের ঐক্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া যা জানলে আর কিছুই জানবার বাকি থাকে না। এই হচ্ছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা অধ্যাত্ম চেতনা, যা উপলব্ধি হয় আত্মচেতনার অভিব্যক্তির তুঙ্গতম সোপানে, বৈজ্ঞানিক বা ব্যবহারিক জ্ঞানের উপলব্ধির সোপানের অনেক ঊর্ধ্বে। জড় পদার্থে, যাকে আমরা অচেতন বলি, তাদের মধ্যে এই আত্মচেতনা রয়েছে সম্পূর্ণ অব্যক্ত অবস্থায়, একথা বলা-বাহুল্য। বর্তমান আলোচনায় দেখা যায় যে অধ্যাত্ম জ্ঞানের ও অধ্যাত্ম মূল্য-বোধের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে মানুষের যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা যায় বিপথগামী হয়ে। এর ফলে তার অভিব্যক্তির পথে সবচেয়ে গুরুতর এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হয়।

পরিশেষে একথা মনে রাখা আবশ্যক যে বিজ্ঞানী এবং প্রয়োগবিজ্ঞানীদের কর্তব্য হচ্ছে জীবনরক্ষার ও সৃষ্টিমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করা, হত্যাকাণ্ডের বা ধ্বংসের কাজে নয়। একথা ভুললে চলবে না যে হিংসা থেকে জন্ম হয় হিংসার এবং ঘৃণা থেকে ঘৃণার। এ হচ্ছে একটি ব্যবহারিক জগতের নীতি, যার ব্যতিক্রম সাধারণত কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু মানুষের মনের এমনই মূঢ়তা যে সে এখনও ইতিহাসের শিক্ষার মর্ম বুঝতে পারেনি; ক্ষমতা এবং আধি-পত্যের মোহে মত্ত হয়ে সে আত্মহত্যার উন্মত্ততায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যু এবং ধ্বংসের কাজে। এই প্রসঙ্গে মহাকবি শেক্সপীয়রের উক্তি উল্লেখযোগ্য মনে করি।

> "But man, proud man,
> Dressed in a little brief
> authority—
> Most ignorant of what he's most assured,
> His glassy essence—like an angry
> ape,
> Plays such fantastic tricks before
> high heaven.
> As make the angels weep."—Measure
> for Measure:

এর অর্থ দাম্ভিক মানুষ ক্ষণিকের জন্য সামান্য ক্ষমতা লাভ করে সবচেয়ে যা তার ধ্রুব প্রাপ্য (নির্মল শুদ্ধ সত্তা) সে সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী অজ্ঞ হয়ে ধৃষ্ট বানরের মত এমন সব উদ্ভট কলাকৌশল দেখায় স্বর্গের দুয়ারে দাঁড়িয়ে, যা দেখে দেবদূতদেরও কান্না পায়।

আজ আমাদের যা দরকার তা শুধু বহির্জগতের তথ্যের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ নয়, যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কাজ; কিন্তু এ ছাড়াও চাই আমাদের অন্তর্জগতের অর্থপূর্ণ ও মূল্যবান তত্ত্বানুসন্ধান ও তার ব্যাখ্যান, যা ধর্মের উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে মার্কিন পদার্থ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর এ মিলিকান-এর উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :—

It seems to me that the two great pillars upon which all human wellbeing and human progress rest are, first the spirit of religion, and second, the spirit of Science or knowledge. Neither can attain the largest effectiveness without suppport from the other to promote the latter, we have universities and research institutions. But the supreme opportunity for everyone with no exception lies in the first.

এর অর্থ—আমি মনে করি যে দুটি অতিকায় স্তম্ভের উপর মানুষের সুখ শান্তি ও মানব সভ্যতার প্রগতি প্রতিষ্ঠিত বলা যায়, তা হচ্ছে (১) মানুষের ধর্মবুদ্ধির প্রেরণা, (২) তার বিজ্ঞানবুদ্ধি বা জ্ঞানের প্রেরণা। এর কোনটাই অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে তার পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে পারে না। জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলনের জন্যে সুযোগসুবিধা আছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণার প্রতিষ্ঠান সমূহে। কিন্তু ব্যক্তিমাত্রেরই ধর্মানুশীলনের সর্বোত্তম সুযোগ রয়েছে তার আপন আয়ত্বে।

ঘরের মধ্যে ঘর

শংকর

॥ ৬০ ॥

মিসেস টমসন গম্ভীর হয়ে গেলেন এবার। বললেন, "আপনি যে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবেন না সে বিশ্বাস আমার আছে। তাই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। একটা কিছু বিহিত করুন, নাহলে অবস্থা কিন্তু খুউ-ব খারাপের দিকে এগোবে। আমি আপনাকে লিখে দিতে পারি ওপরের ঘরের ওই অসভ্য মেয়েটা নিজে মাথা খাটিয়ে এইসব অসভ্যতা করছে। কিন্তু আমিও ইচ্ছে করলে হাটে হাঁড়ি ভাঙতে পারি। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েটার সব খবর জানেন আপনি?"

সামান্য ম্যানেজারি করি। সুতরাং তেইশ নম্বরের মিসেস ঠাকুর, যাঁকে উমারাণী 'অসভ্য অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েটি' বললেন তার 'সব খবর' আমি কীভাবে রাখবো?

মিসেস টমসন এবার রেখে-ঢেকে কথা বলার চেষ্টা করলেন না। বললেন, "এ-পাড়ার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েগুলো সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। কখনও এদের বিশ্বাস করবেন না। বিশ্বাস করেছেন তো ঠকেছেন। এদের মতিগতি বোঝা দায়।"

কয়েকজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। অন্য পাঁচজন ভারতীয় মহিলা থেকে তাঁদের কোনো পার্থক্য আমার নজরে পড়েনি। সুতরাং উমারাণী টমসনের উপদেশ নত-মস্তকে গ্রহণ করতে পারলাম না।

উমারাণী ততক্ষণ নিজের বক্তব্য অঝোরে বর্ষণ করে চলেছেন। "ইংরেজ আমলে এরা খোদ সায়েবের ঘাড়ে চাপবার জন্যে স্পেশাল চেষ্টা করতো। সায়েবের মন জয় করবার জন্যে এমন সব কাণ্ড বাঁধাতো যে মনে হবে এ-কাজের জন্যে এরা স্পেশাল ট্রেনিং নিতো। কিন্তু অতো করেও বিশেষ সুবিধে হতো না! সায়েবরা খাঁটি ইন্ডিয়ান মেয়ে বিয়ে করবে, কিন্তু অ্যানজেলার মতো পাঁচমেশালি মেয়ে মরে গেলেও নয়।"

পাঁচমেশালির ওপর বিরক্তি প্রকাশ করাটা উমারাণীর পক্ষে মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ তাঁর নিজের সন্তান হলেও সেই পর্যায়ে পড়বে। কিন্তু সাময়িক রাগে অন্ধ হয়ে মিসেস টমসন বলে চললেন, "বড় বড় মার্চেন্ট আপিসে তো সায়েবদের কনট্রাক্টে লেখা থাকতো, ওই অ্যানজেলার মতো মেয়ে বিয়েই করতে পারবে না। করলে চাকরি যাবে।"

এ-রকম খবর শাজাহান হোটেলে চাকরি করবার সময় একবার শুনেছিলাম বটে। কিন্তু স্বাধীনতার পরে ওসব আইনকানুন অনেক পাল্টে যাচ্ছে বলে খবর পেয়েছিলাম।

মিসেস টমসন দুঃখ করলেন, "বৃটিশ ফার্মে এখন আর ওসব নিয়মকানুনের বালাই নেই। সেই সুযোগ নিয়ে অনেকগুলো মেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কতকগুলো ভাল-ভাল সায়েব ছোকরার মাথা চিবিয়ে ফেলেছে। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে ফল ভাল হচ্ছে না, এমন খবর আমার কানে আসছে।"

এসব খবরে সত্যিই যে আমার কোনো আগ্রহ নেই তা মিসেস টমসনকে বোঝাই কী করে?

মিসেস টমসন বললেন, "ওই অ্যানজেলা সম্বন্ধে সময় থাকতে খোঁজখবর নিয়ে রাখবেন, না-হলে কোন্ সময়ে আপনিও বিপদে পড়ে যাবেন।"

ব্যাপারটা আমার ঠিক মাথায় ঢুকছে না। পাওনা ভাড়া আদায় করা আমার একমাত্র উদ্দেশ্য—সকলের ঠিকুজি-কুষ্টির খবর নিয়ে রাখতে হবে কেন সামান্য সেই কাজের জন্যে?

চাপা রাগে খইয়ের মতো ফুটতে-ফুটতে মিসেস টমসন তেত্রিশ নম্বরের অ্যানজেলার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, "ওসব মেয়ের কাজকর্মের কায়দাই আলাদা। ওদের জানা-শোনা এক ইংরেজ ছোকরা তো ওইরকম এক মেয়ের পাল্লায় পড়েছে। প্রথমে লোভের বশে একটু প্রশ্রয় দিয়েছিল, তারপর এক-পা বাড়াতেই বঁড়শি গেঁথে গেল। সেই অবস্থায় ধড়ফড় করছে, নিজেকে ছাড়াবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বেচারা আমার কাছেও এসেছিল। কিন্তু আমি খোঁজখবর নিয়ে বললাম, সামান্য টাকার লোভে ওই মেয়ে ছিপ ফেলেনি। খোদ তোমাকে পার্মানেন্টলি পাকড়াও করবার জন্যে ওর স্পেশাল আয়োজন।"

একটু থেমে মিসেস টমসন বললেন, "আমার স্বামীটি সদাশিব মানুষ। উনি প্রথমে আমার কথা বিশ্বাসই করছিলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই উমারাণীর পোড়া কথাই সত্যি হলো। বঁড়শি ছাড়ানো গেলো না। ওই বঁড়শি গিলে বেচারা মিস্টার প্রাইসকে ব্যাংককে ট্রানসফার নিয়ে চলে যেতে হলো।"

এবার মিসেস টমসন কোনোরকম দ্বিধা না-করে মিস্টার ঠাকুরের ইতিহাসে চলে এলেন। "মিস্টার ঠাকুরকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি। কতদিন আমার ঘরে এসে কফি খেয়ে গিয়েছে। কতদিন ঝি-চাকরকে আমি ফ্ল্যাটের চাবি দিয়েছি। আবার চাবি আদায় করে ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছি। কিন্তু ওই বেচারা যে শেষ পর্যন্ত অমন এই মেয়ের খপ্পরে পড়বে তা ভাবিনি।"

কিন্তু যা-হবার তা হয়ে গিয়েছে, এই সাধারণ কথাটি মিসেস টমসন কেন বুঝেও বুঝছেন না?

মিসেস টমসন কিন্তু এরপর ওঁদের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে যা বলে ফেললেন, তাতে আমার কান লাল হয়ে উঠলো।

আমার অবস্থা লক্ষ্য করলেন মিসেস টমসন। তারপর বললেন, "আই অ্যাম স্যরি, এসব কথা এইভাবে আপনাকে বলা আমার হয়তো উচিত হয়নি। কিন্তু কানে যখন আসছে, সন্দেহ যখন হচ্ছে, তখন আমার উচিত আপনাকে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখা।"

এরপর আমি তেইশ নম্বর ঘর থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছিলাম। যাবার সময়েও মিসেস টমসন আবার মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, "জলের অবস্থা আপনি নিজের চোখে দেখে গেলেন। এর একটা বিহিত না হলে গোলমাল আরও বাড়বে, শংকরবাবু।"

মিসেস টমসনের শেষ কথাগুলো আমার কাছে সাবধানবাণীর মতো শোনালো। একটা কিছু ব্যবস্থা না-নেওয়া পর্যন্ত আমার যে মুক্তি নেই তা এবার বেশ সহজেই আন্দাজ করতে পারছি।

এসব সমস্যায় পড়লে কেবলমাত্র নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর নির্ভর না করে দ্বিতীয় কোনো মাথার পরামর্শ নেওয়া উচিত। সেই অনুযায়ী, তেইশ থেকে বেরিয়ে এসেই তেলকালি-বাবুর খোঁজ করেছিলাম। কিন্তু তেলকালিবাবুর পাত্তা পাওয়া গেল না, তিনি তখন কোথাও বেরিয়েছেন।

এই অবস্থায় একটু ধৈর্য ধরে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে পারলেই বোধহয় ভাল হতো। কিন্তু সমস্যাগুলো তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলবার আগ্রহে আর সময় নষ্ট করা গেল না। ভাবলাম এই সময়েই অন্যপক্ষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা যাক।

তখন তিনটে বেজে গিয়েছে। দুপুরের বিশ্রামপর্ব শেষ করে মিসেস অ্যানজেলা ঠাকুর সবেমাত্র সংসারের কাজকর্মে মন দিয়েছেন।

আমি কলিংবেল টেপামাত্র তিনি নিজেই দরজা খুলে দিলেন। এর আগের বারে ওসব ব্যাপারে মাথা ঘামাইনি। কিন্তু মিসেস টমসনের গোপন কথাবার্তার আলোকে লক্ষ্য করলাম মিসেস ঠাকুর আসন্নপ্রসবা।

আমাকে দেখেই মিসেস ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার তেইশ নম্বরের ফ্রেন্ড কেমন আছেন?" কথার মধ্যে বেশ ব্যঙ্গ মিশ্রিত রয়েছে।

আমি বললাম, "এ-বাড়িতে যাঁরা ভাড়া দিয়ে থাকেন তাঁরা সবাই আমার ফ্রেন্ড মিসেস ঠাকুর।"

মিসেস ঠাকুর অত সহজে সন্তুষ্ট হবার পাত্রী নন। বললেন, "এত ঘন ঘন ওই ফ্ল্যাটে আপনার নেমন্তন্ন হচ্ছে, তাই জিজ্ঞেস করলাম।"

"অসুবিধে থাকলেই আমাদের ডাক পড়ে, মিসেস ঠাকুর। ম্যানসন বাড়ির ম্যানেজারকে কেউ তো গল্প করবার জন্যে ডেকে পাঠায় না।"

মিসেস ঠাকুর এবার রাগে ফেটে পড়লেন। বললেন, "আমার পরামর্শ যদি নেন, তাহলে মিস্টার শংকর, ওই বুড়ী ব্রাউনির সঙ্গে বেশী জড়িয়ে পড়বেন না। মেয়েমানুষটি মোটেই সুবিধের নয়। আমার হাজবেন্ডও একসময় বুড়ী ব্রাউনির ভক্ত ছিল; কিন্তু এতোদিনে ব্যাপারটা বুঝেছে।"

এরপর অভিযোগের তালিকা পেশ করতে লাগলেন মিসেস ঠাকুর। বললেন, "আপনি কখনও শুনেছেন, কোনো ফ্রেন্ড কোনো ফ্রেন্ডের ঝি-চাকর ভাঙিয়ে নেয়? ব্রাউনী আমাকে মোটেই পছন্দ করে না। তাছাড়া ব্রাউনী জানে, আমি চিরকাল আপিসে কাজ করে এসেছি, সংসারের কাজকর্ম তেমন শিখিনি। তার ওপর আমার শরীরের এই অবস্থা। পাকে-চক্রে আমাকে বিপদে ফেলবার জন্যে ঠিক সময়ে ব্রাউনী আমার ঝি-কে ভাঙিয়ে নিয়ে চলে গেল। অথচ মিস্টার ঠাকুর যতদিন বিয়ে করেননি, ততদিন এই সব ঝি-চাকরকে ব্রাউনিই ম্যানেজ করে এসেছেন, বলেছেন সায়েবকে ভালভাবে দেখাশোনা করবে।"

ব্রাউনি বলতে মিসেস ঠাকুর যে উমারাণী টমসনের ব্রাউন রঙের কথাই ব্যঙ্গ করছেন তা বুঝতে আমার কষ্ট হচ্ছে না। মিসেস ঠাকুর নিজে অবশ্যই কালো নয়; তাঁর শাদা চামড়ার ওপরে শুধু কিছু বাদামী ছিট ছড়ানো রয়েছে। শ্বেতাঙ্গিনী সৃষ্টি করে খেয়ালী বিধাতা যেন ক্রীড়াচ্ছলে পেনের বাদামী কালী সমস্ত দেহে ছিটিয়ে দিয়েছেন।

মিসেস ঠাকুর এবার সগর্বে ঘোষণা করলেন, "ঝি ভাঙিয়ে নিয়ে ভেবেছিলেন আমার সংসার একেবারে আটকে যাবে। কিন্তু কী হলো? আমি তো ভালই ম্যানেজ করে চলেছি। এবং এও আপনাকে বলে রাখছি, ওই সুকুমারী ঝি একদিন আমার কাছে ফিরে আসবে। এ যদি না হয় তো কী বলেছি।"

এতো জোরের সঙ্গে অ্যানজেলা ঠাকুর ঝি-এর কথা বলছেন কী করে?

মিসেস ঠাকুর কিছুই চেপে রাখলেন না। বললেন, "হাইকোর্ট পাড়ার অ্যাসট্রো-পামিস্ট মিস্টার ভট্টাকারিয়া আমাকে নিজে বলেছেন। মিস্টার ভট্টাকারিয়ার ফোরকাস্ট কখনও মিথ্যে হয় না। তিন বছর আগে—আমি তখন প্লেন অ্যান্ড সিমপল মিস বোল্টন। মাঝে মাঝে অস্ট্রেলিয়ায় যাবার কথা ভাবছি। মিস্টার ভট্টাকারিয়া আমাকে তখনই বলেছিলেন, তোমার বিদেশ যাওয়া হবে না। তোমার বিয়ে হবে একজন ইন্ডিয়ানের সঙ্গে। কিছুদিন আগে মেড সারভেন্টের ব্যাপারে মনের দুঃখে আবার গেলাম ওঁর কাছে। মিস্টার ভট্টাকারিয়া বললেন, তুমি কিছু ভেবো না। স্টারস অ্যান্ড প্লানেটস এই মুহূর্তে তোমার হোম ফ্রন্টে কিছু ট্রাবল দিচ্ছে। কিন্তু ওই সুকুমারী আবার তোমার ঘরে ফিরে এসে কাজ করবে।"

একটু থামলেন অ্যানজেলা ঠাকুর। ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটের মিস্টার ভট্টাকারিয়ার ওপর তাঁর যে অগাধ বিশ্বাস তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

মিসেস ঠাকুর বললেন, "কতদিনের মধ্যে সুকুমারী ফিরবে তাও আমার অ্যাসট্রো-পামিস্ট বলে দিয়েছেন।"

আমি কোনো বিশেষ কৌতূহল দেখাচ্ছি না লক্ষ করে অ্যানজেলা ঠাকুর নিজেই সুকুমারীর প্রত্যাবর্তনের বিবরণ আমাকে শুনিয়ে দিলেন। আমি তখন স্মৃতি থেকে টেম্পল চেম্বারের পুরনো লিফটের সামনে মিস ফোস্টনের ছবিটি খুঁটিয়ে দেখছি। সুন্দরী কুমারীর সেই সদর্প ভঙ্গিমা থেকে কে বিশ্বাস করবে যে বিবাহের কয়েকমাসের মধ্যে তিনি একটি ঠিকে ঝিয়ের ভূত-ভবিষ্যতের ওপর এমন নির্ভরশীলা হয়ে উঠবেন?

অ্যাসট্রো-পামিস্ট মিস্টার ভট্টাচারিয়ার হিসেব অনুযায়ী সুকুমারীর প্রত্যাবর্তন আসন্ন। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে মিসেস ঠাকুর বললেন, মাঝখানে আর বেশি দিন নেই। মিসেস টমসনের ফ্ল্যাটে সুকুমারীকে রীতিমত জাঁকিয়ে বসে থাকতে দেখেছি। দৈবিক বা ভৌতিক কোনো ঘটনা ছাড়া এই সামান্য কয়েকদিনের মধ্যে সুকুমারী আবার স্বস্থানে ফিরে আসবে তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। কিন্তু মিস্টার ভট্টাচারিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর মিসেস ঠাকুরের এমন অগাধ বিশ্বাস যে তিনি ব্যাপারটা নিশ্চিত বলেই ধরে নিয়েছেন।

প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হলেও মিসেস ঠাকুর তাঁর অঘোষিত যুদ্ধ সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে চালিয়ে যাচ্ছেন। উমারাণী টমসন সম্বন্ধে তাঁর মনে একটুও মায়া-দয়া নেই। রক্তের বদলে যেমন রক্ত, দাঁতের বদলে যেমন দাঁত, তেমনি ঝিয়ের বদলে ঝি না-নেওয়া পর্যন্ত কিছুতেই তিনি রণে বিরতি দেবেন না।

উমারাণী টমসনের চতুর্দিকে সন্দেহের ধূম্রজাল বিস্তার করতেও অ্যানজেলা ঠাকুর একটুও দ্বিধা করলেন না।

বললেন, "আমার সম্বন্ধে এ-বাড়িতে নানা গুজব ছড়িয়েছে। এসব গুজব কোথা থেকে তৈরি হয় তা আন্দাজ করবার মতো সামান্য বুদ্ধি আমার অবশ্যই আছে।"

সত্যি কথা বলতে কি, অ্যানজেলা সম্বন্ধে তেমন কিছু গুজব আমার কানে আসেনি। মিসেস ঠাকুর বললেন, "ঝি ভাঙাবার পরে প্রথমে গুজব রটলো, আমার সঙ্গে মিস্টার ঠাকুরের সত্যিই বিয়ে হয়েছে কিনা? আপনার এই বাড়ির কমন দর্জি আরমনুসের এতো বড়ো আস্পর্ধা যে সোজা বলে দিল, মিস্টার ঠাকুর পার্সোনালি না বলা পর্যন্ত সে আমার জামাকাপড় ধারে তৈরি করতে পারবে না।"

ব্যাপারটা যখন তলিয়ে বুঝলাম, তখন জানতে পারলাম গলদ কোথায়। আমার স্বামী সব লোককে ডেকে-ডেকে বলবেন, হ্যাঁ একেই আমি বিয়ে করেছি, এর থেকে অসম্মানজনক আর কী হতে পারে? শেষে বুদ্ধি করে, ওই জয়েন্ট নেম-বোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছি: মিস্টার অঞ্জন ঠাকুর ও মিসেস অঞ্জলি ঠাকুর। এখন লোকের বিশ্বাস হয়েছে, ভরসা বেড়েছে। দর্জিটাও আর কোনো কথা বলে না—যা জামাকাপড় চাই, এক কথায় দিয়ে যায়।"

অ্যানজেলা ঠাকুরের রাগের আরও অনেক কারণ জমে আছে। আজ সুযোগ পেয়ে আমার কাছে তার ফিরিস্তি দিয়ে তিনি নিজেকে হাল্কা করবার সুযোগ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করলেন। আমার কাছে এসব বলে যে কোনো লাভ নেই এই আত্মমগ্না ভদ্রমহিলা তা মোটেই বুঝতে চাইলেন না।

আক্রমণের ভঙ্গিতে মিসেস ঠাকুর বললেন, "আমার সম্বন্ধে রটানো হয়, আমি নাকি সাধারণ গৃহস্থের মতো থাকি না। হ্যাঁ, আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, আমি একটু নাচ, গান, পার্টি, হৈ-হুল্লোড় পছন্দ করি। আমার বাড়িতে এসবের আসর বসে এবং বসবে। এর জন্যে আমার কোনো লজ্জা নেই।"

এ-ব্যাপারে কে ওঁর কাছে আপত্তি জানিয়েছেন তা আমার বোধগম্য হলো না। আমার কানে এসব তোলার কী অর্থ তাও ঠিক বুঝতে পারছি না।

মিসেস ঠাকুর এবার নিবেদন করলেন, "কিন্তু হৈ-চৈ যাই করি, সেখানে আমার স্বামী উপস্থিত থাকেন। তাঁকে বাদ দিয়ে কিছুই হয় না। আমার স্বামীকে আমি সবার সঙ্গে ফ্রিলি মিশতে দিই। আমি অন্য কারুর কারুর মতো স্বামীকে সবসময় গোডরেজের লকারে পুরে রেখে পাহারা দিই না।"

ইঙ্গিতটা যে তেইশ নম্বরের দিকেই তা আন্দাজ করলেও সোজাসুজি কিছু বলা গেল না।

মিসেস ঠাকুর এবার আরও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেন। বললেন, "আমার অতো হায়াই-হায়াই ভয় নেই। কারুর-কারুর সম্বন্ধে চাকর-বাকরদের মুখ দিয়ে যা শুনেছি তা বলতে লজ্জা লাগে।"

লজ্জার কথা মুখেই বললেন মিসেস ঠাকুর, কিন্তু পরবর্তী বক্তব্যে কোনো দ্বিধা লক্ষ করা গেল না। বললেন, "নাম করতে চাই না। কিন্তু শুনে রাখুন। ইংলণ্ডের পাখী হঠাৎ যাতে একদিন আবার ইংলণ্ডে উড়ে না পালায় তার জন্যে পাখীকে নেশা ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হুইস্কি, ব্রান্ডির নেশা নয়—ওসব জিনিস তো ওদেশে আরও ভাল পাওয়া যায়। গাঁজা সিদ্ধির নেশা, যা ইন্ডিয়া ছাড়লে জোগাড় করা খুব শক্ত।"

কথাটা বিশ্বাস না হলেও, মানসচক্ষে একবার বিলুদা ওরফে মিস্টার টমসনের মুখটা স্মরণ করলাম। বড় শান্ত মুখশ্রী—একেবারে গোবেচারা মানুষ। এঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধবার জন্যে উমারাণী নিয়মিত গাঁজা কিংবা আফিমের জাল বুনছেন তা ভাবতে কষ্ট হলো। কিন্তু মিসেস ঠাকুর কোনো নাম না তুলে যা ইঙ্গিত করছেন তা চুপচাপ শুনে যাওয়া ছাড়া আমার কোনো গত্যন্তর নেই।

পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠলো যে মিসেস টমসনের সমস্যার কথা কীভাবে এখানে তুলবো তা ঠিক করে উঠতে পারলাম না। কথা উঠলেও, মিসেস ঠাকুরের মেজাজ যেরকম দেখছি তাতে এখনই কোনো ফল হবে কিনা সন্দেহ।

অগত্যা কাজকর্ম কিছু না-এগিয়ে চুপচাপ ফিরে আসতে হলো। এ-অবস্থায় তেলকালিবাবুর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

তেলকালিবাবু আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "কিছু চিন্তা নেই, সব খবরাখবর আপনাকে জোগাড় করে দিচ্ছি।" তেলকালিবাবু বললেন, "আজকালকার যুগে খবরই শক্তি—এখানকার লোকগুলোর খবরাখবর আমাদের সব সময় রেখে যেতে হবে।"

এবারে কোনোরকম দেরি না করেই তেলকালিবাবু সমস্ত খবর দিলেন। একটু গম্ভীরভাবেই জানালেন, "সামান্য ঝি-এর ব্যাপার থেকে ব্যাপারটা ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছে, স্যার।"

মাথা চুলকে তেলকালিবাবু বললেন, "কদ্দুর আপনার কাছে খবর এসেছে জানি না, ঝি ভাঙাবার কয়েকদিন পরেই গোলমালের সূত্রপাত হলো। চৌত্রিশ নম্বরের বাথরুমটা ঠিক তেইশ নম্বরের বাথরুমের ওপর। হঠাৎ দেখা গেল চৌত্রিশ নম্বরের জল চুঁইয়ে তেইশ নম্বরের বাথরুমে পড়ছে। সেই নোংরা জলে দুদিন মিসেস টমসনের জামাকাপড় নষ্ট হয়ে গেল—ওঁকে ডবল স্নান করতে হলো।"

অন্য বাড়ির নোংরা জল গায়ে পড়লে মানুষের মেজাজ ঠিক থাকে না। খাপ্পা হয়ে কড়া চিঠি লিখে মিসেস টমসন চৌত্রিশ নম্বরে পাঠিয়ে দিলেন। মিসেস ঠাকুর জেগে ছিলেন। তিনি চিঠি নিলেন কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না।

চৌত্রিশ নম্বরের বাথরুমের জল আবার যথাসময়ে তেইশ নম্বরের মেমসাহেবকে নোংরা করে দিল। আরও খাপ্পা হয়ে মিসেস টমসন আরও কড়াভাবে তাঁর দ্বিতীয় চিঠি দূত মারফত পাঠালেন। আরও লিখে দিলেন: পত্রবাহক উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করবে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে পত্রবাহক খালি হাতে ফিরে এল। চিঠিখানা হাতে নিয়ে মিসেস ঠাকুর ভিতরে চলে গিয়েছিলেন। আধঘণ্টার মধ্যেও যখন তিনি ফিরে এলেন না তখন বেচারা পত্রবাহক আবার বেল বাজিয়েছিল। রেগেমেগে এবার মেমসাহেব বেরিয়ে এসে বলেছিলেন, "আমাকে এভাবে জ্বালাতন করতে এসো না। বুঝলে? প্লিজ।" তারপর তিনি শুনিয়ে দিয়েছিলেন, "তোমার মেমসাহেবকে বোলো, আমার স্বামী অথবা আমি থ্যাকারে ম্যানসনের ল্যান্ডলর্ড নই।"

"ফুটো বাথরুমের সমস্যা যখন, তখন দায়িত্বটা বাড়িওয়ালার। আমাদের কাছে খবরটা এল না কেন?"

"আরও বাড়বে, শঙ্করবাবু।"

আমার কথা মন দিয়ে শুনলেন তেলকালিবাবু। তারপর বললেন, "সেইটাই তো সমস্যা। বেড়ালের গলায় কে ঘণ্টা বাঁধবে? মিসেস টমসনের বক্তব্য: যখন তোমার বাথরুমের জল লিক করে আমার ঘরে পড়ছে, তখন বাড়িওয়ালাকে খবর দেবার দায়িত্বটা তোমার। বন্ধুমহলে, মিসেস ঠাকুর ঠিক উল্টো কথা বললেন: তোমার সিলিং লিক হয়েছে তুমি বাড়িওয়ালার সঙ্গে ব্যবস্থা করো। যদি তোমার ওপরে আর কোনো ফ্ল্যাট না থাকতো এবং বৃষ্টির জল লিক করতো, তাহলে তুমি কি ভগবানকে বলতে বাড়িওয়ালার সঙ্গে যোগাযোগ করতে?"

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে তেলকালিবাবু বললেন, "ব্যাপারটা জানেন কি স্যার? কথাগুলো পাঁচকান হয়ে মিসেস টমসনের কানে এমনভাবে ফিরে এল যে তিনি বেশ খাপ্পা হয়ে উঠলেন। তিনিও গোঁ ধরে বললেন, কিছুতেই তিনি বাড়িওয়ালার কাছে যাবেন না। যেতে হলে মিসেস ঠাকুরকেই যেতে হবে।" রাগের আরও একটা কারণ তেলকালিবাবু ব্যাখ্যা করলেন। "মিসেস টমসনের ধারণা, এই জল লিক করবার পিছনে খোদ মিসেস ঠাকুরের নিজস্ব কিছু কারিগরী আছে। নাহলে এতদিন কখনও জল লিক করলো না, আর এই ঝি-বদলের পরেই টপটপ করে জল পড়তে আরম্ভ করলো কেন?"

এরপর যা শুনেছেন তাও তেলকালিবাবু জানালেন, "মিসেস টমসন নাকি লুকিয়ে উকিলের পরামর্শও নিয়েছেন। ওপরের ফ্ল্যাটের জলে নিচের ফ্ল্যাটের জিনিসপত্তর নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণের নোটিশ দেওয়া চলে কিনা। ভগবান জানে, কী অ্যাডভাইস পেয়েছিলেন ভদ্রমহিলা, আমি তো শুনে তাজ্জব। উকিলবাবুদের মাথা কত খাসা হয়। সামান্য কয়েকফোঁটা জলের ব্যাপারকে হয়তো হাইকোর্ট সুপ্রীমকোর্ট পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবেন—টপটপ জল পড়ার জন্যে দায়িত্ব কার? ফ্ল্যাটের বাসিন্দার? না মালিকের?"

"যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আদালতের দিকে গেলেন না মিসেস টমসন। তার বদলে তিনি কারও সঙ্গে গোপন পরামর্শ করলেন। শোনা যায়, কলকালিকে কয়েকবার ওঁর ঘরে দুপুরবেলায় ঢুকতে দেখা গিয়েছে। তারপর মশায় একদিন তাজ্জব ব্যাপার। জল থাকলে তবে তো লিক করে নিচের ফ্ল্যাটে পড়বে? চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট মাঝে মাঝে একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। মোক্ষম সময়ে একেবারে জল থাকে না।"

"কী ব্যাপার? ম্যাজিক নাকি?" জিজ্ঞেস করি তেলকালিবাবুকে।

তিনি বললেন, "নিজের চোখে না-দেখে কোনো মন্তব্য না করাই ভাল। তবে কলের পুরনো পাইপগুলো শিরা-উপশিরার মতো এমন জট পাকিয়ে আছে, এবং কলকালির পাইপজ্ঞান এতোই গভীর যে সে পারে না এমন কাজ নেই।"

এইখানেই ব্যাপারটা শেষ হলো না। তেলকালিবাবু জানালেন, "কলকালির মন-মেজাজ ভাল যাচ্ছিল না। বলরাম ঘোষ স্ট্রীটের মেয়ে-মানুষটি একজোড়া সোনার দুলের জন্যে আব্দার করছিল অথচ কলকালি তেমন সুবিধে করতে পারছিল না। ঠিক এই মাহেন্দ্রক্ষণে আপনার কলকালিকে তেত্রিশ নম্বরে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল।"

"মানে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

তেলকালিবাবু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "কী যে বলি, বুঝে উঠতে পারছি না।

দু-একখানা নতুন মোটা পাইপ নিয়ে কলকালিকে দুপুরবেলায় তেত্রিশ নম্বরে ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম। তারপর কলকালি নিজেই স্বীকার করলো, মীনা-করা সোনার দুল কিনে সে বলরাম ঘোষ স্ট্রীটের মানভঞ্জন করিয়েছে এবং তারপরেই মিসেস টমসন আপনাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর কলঘরে স্নানের সময় জল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। টু গ্লাস টু করে আন্দাজ করুন, আমি সোজাসুজি কী বলবো?"

কলকালিকে সঙ্গে করেই আমি আচমকা তেত্রিশ নম্বর ইনসপেকশনে গেলাম। যা আন্দাজ করেছিলাম তাই—কলঘরের কিছু অংশে চকচকে মোটা নতুন পাইপ এবং বিশেষ স্থানে নতুন কয়েকটি স্টপ কক শোভা পাচ্ছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই নতুন পাইপের রহস্য জিজ্ঞেস করতে কলকালি যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললো, বহুদিনের পুরনো সব পাইপ। মাঝে মাঝে ভাড়াটিয়ারা নিজের খরচে পাইপ পাল্টে নিতে বাধ্য হন, কিন্তু তার সঙ্গে দুই ফ্ল্যাটের ঝগড়ার কোনো সম্পর্ক নেই!

আরও চাপ দিতেও কলকালি কিছু স্বীকার করতে চাইছিল না। কিন্তু তখন বলতে হলো, পুলিস কেসের ভয় রয়েছে। পুলিসের কানে কারা যেন কলকালির নামটা তুলে দিয়েছে। এবার সে নরম হয়ে পড়লো, স্বীকার করলো যে পাইপের সঙ্গে এমন সব কলকব্জা যে-কেউ লাগিয়ে নিতে পারে যে সেই কল খোলা থাকলে নিচের ফ্ল্যাটে একফোঁটা জল পড়বে না!

দারোগা গণেশ সরকারের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের খবরটা এক্ষেত্রে কাজে লাগলো। কলকালি কিছুটা নার্ভাস হয়ে অনুরোধ করলো, আমি যেন তাঁকে বোঝাই, তেইশ নম্বরে সাময়িক জল বন্ধ হওয়ার সঙ্গে কলকালির বিন্দুমাত্র যোগাযোগ নেই।

এই জলযুদ্ধে কোনোরকমভাবে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। জলযুদ্ধ বন্ধ করবার উপায় সম্বন্ধেও খোঁজখবর নিয়েছিলাম। কিন্তু কলকালি যা হিসেব দিল তাতে পাইপের জট ছাড়িয়ে দুই ফ্ল্যাটে একেবারে আলাদা লাইন তৈরি করতে কয়েক হাজার টাকা দরকার হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে দুই পরি-বারের দ্বন্দ্ব মেটাবার জন্যে এতো টাকা খরচের স্বাধীনতা আমার নেই।

দুই পক্ষের দ্বন্দ্বের ঝাঁঝ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। মাঝখানে কয়েকদিন দুই পক্ষের যুদ্ধে সাময়িক বিরতি পড়েছিল। সেই সময় মিসেস ঠাকুর নার্সিং হোমে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে-ছিলেন। দিন দশেক পরেই তিনি সদর্পে থ্যাকারে ম্যানসনের তেত্রিশ নম্বরে ফিরে এলেন।

আমি ভেবেছিলাম নবজাতকের আবির্ভাবে এবার মিসেস ঠাকুর এতোই ব্যস্ত থাকবেন যে পুরনো ঝগড়ার কথা মনে রাখবেন না। কিন্তু আমার প্রত্যাশা ভুল প্রমাণিত হলো।

মিসেস টমসন আমাকে ডেকে বিরক্তির সঙ্গে বললেন, "সন্দেহের অঙ্ক মিলে যাচ্ছে, শংকরবাবু। ওপরের ওই মহিলা এতদিন বাড়িতে ছিলেন না, হয়নি। উনি ফিরেছেন আর আমাদের জল আবার বন্ধ হতে আরম্ভ করেছে।"

মিসেস টমসন বললেন, "আমিও ছেড়ে কথা বলবো না। এই দেখুন বাঁশের মাথায় বাঁধা দুরমুশ আনিয়েছি। জল বন্ধ হলেই ওপরের ছাদে আওয়াজ করবো।"

তেলকালিবাবুও রিপোর্ট দিলেন, দু পক্ষের ঝগড়া বেশ জমে উঠেছে। এক পক্ষ কল বন্ধ করছেন এবং অপর পক্ষ ওপরের ছাদে দুমদুম আওয়াজ করছেন। এর কিছুক্ষণ পরেই প্রত্যুত্তরে ওপরের ঘরে হামানদিস্তায় মশলা পেটার আওয়াজ হচ্ছে বহুক্ষণ ধরে।

মিসেস টমসন আমাকে ডেকে রেগেমেগে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের ফ্ল্যাটে হাতুড়ি দিয়ে কয়লা ভাঙবার পারমিশন আছে?"

খোঁজখবর নিয়ে উত্তর দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। কিন্তু কী উত্তর দেবো ভেবে পাচ্ছি না। অবস্থা যে ক্রমশ আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে তা বুঝতে পারছি। এ-বিষয়ে তেলকালিবাবুর সঙ্গেও আলোচনা করেছি। তেলকালিবাবুও একমত, দুই পক্ষের রেষারেষি ক্রমশ বেড়েই চলেছে। অভিজ্ঞ তেলকালিবাবু আমাকে শুনিয়ে দিয়েছেন, এই ধরনের মন কষাকষি মোটেই ভাল নয়। উত্তাপ বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত মারামারি খুনোখুনি লেগে যায়।

নিয়মকানুনের খোঁজখবর করেও তেমন লাভ হলো না। হুড়োহুড়ি, দাপাদাপি, বাটনা বাটা ইত্যাদি বন্ধ করে কোনো শর্ত লিখিতভাবে করিয়ে নেওয়া হয়নি। একালের ফ্ল্যাটবাড়ির মালিকরা সে বিষয়ে খুব সাবধানী। ফ্ল্যাটবাড়িতে কী করা যাবে এবং কী যাবে না, এমন কী কোন্ কোন্ জিনিস খাওয়া যাবে এবং যাবে না তারও মুচলেকা নিয়ে নেন।

খোঁজখবরের উত্তর দেবার আগেই আর একটি এস-ও-এস হাজির হলো। রাগে গর-গর করতে করতে মিসেস টমসন বললেন, "নিজের চোখে দেখে যান। কীভাবে এখানে অত্যাচার চলেছে।"

দেখলাম ওপরের ফ্ল্যাট থেকে ভিজে কাপড় মেলে দেওয়া হয়েছে। কোনোদিন এই পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে তা অকল্পনীয় থাকায়, এ-বাড়ির স্থপতি নকশা আঁকবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেননি, ফলে উঁচুতলার ভিজে কাপড়ের জল নিচুতলার ব্যালকনির সমস্ত জিনিসপত্র ভিজিয়ে দিচ্ছে। মিসেস টমসন হাউ-মাউ করে উঠলেন, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। আমার দামী দামী জিনিস ওই কাপড়ের জলে নষ্ট হয়ে গেল।

অনেক মাথা ঘামিয়ে সমস্যার কোনো সমাধান দেখছি না। একবার মিসেস টমসনকে বললাম, "উপায় একটাই দেখছি। আপনি এখান থেকে সরে যান। অন্য যে ফ্ল্যাট খালি হয়েছে, অ্যাজ এ স্পেশাল কেস আপনাকে সেখানে সরিয়ে দিচ্ছি।" আমার প্রস্তাব ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন মিসেস টমসন। বললেন, "কোন্ দুঃখে আমি সরবো? সরাতে হলে ওই দুষ্ট মেয়েমানুষকে সরান—একের পর এক অন্যায় করে যাবে, আর আপনারা সবাই তা সহ্য করে যাবেন, তা চলবে না।"

শেষ চেষ্টা হিসেবে তেলকালিবাবুকে শান্তি-দূত হিসেবে তেত্রিশ নম্বরে পাঠালাম। তেলকালি-বাবু সন্ধ্যার সময় মুখ শুকনো করে ফিরে এলেন। বললেন, "বাচ্চা হবার পরে একেবারে বাঘিনীর মতো মেজাজ হয়ে রয়েছে এই ঠাকুর মেমসায়েবের। আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অ্যাটাক করেন আর কী? সোজা বললেন, আপনার ম্যানেজার এবং ওই তেইশ নম্বরকে জানিয়ে দেবেন, ভাড়া যখন পুরো টাকায় দিয়েছি, তখন যেখানে খুশী কারও কথা শুনবো না।"

অপ্রিয় ঘটনার অনাগত পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। তেলকালিবাবু বললেন, "অবস্থা আরো আরও পাকিয়েছে। টমসন মেমসায়েবের একটা বেড়াল ভুল করে তেত্রিশ নম্বরে ঢুকে পড়েছিল। সেই বেড়ালকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"অবস্থা যেভাবে গড়াচ্ছে সেটা মোটেই সুবিধে নয়", তেলকালিবাবু আমাকে সাবধান করে দিলেন। "সব কিছু ঘটনা ডাইরিতে নোট করে রাখবেন, স্যার। কখন থানায় বা আদালতে খুনোখুনির কেসে সাক্ষী দিতে হবে ঠিক নেই। বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে এবং ভাড়াটে-ভাড়াটের মধ্যে ফৌজদারী কেস কলকাতা শহরে লেগেই আছে।"

ইতিমধ্যে মিসেস টমসনের কাছ থেকে লিখিত অভিযোগপত্র এসে গেল। দীর্ঘ চিঠিতে তিনি তেত্রিশ নম্বরের নানা অন্যায়ের ফিরিস্তি দিয়েছেন এবং আমাকে অবিলম্বে তার প্রতিবিধানের উপদেশ দিয়েছেন। সময়মতো প্রতিবিধান না-হলে আমরাও যে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারি সে সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছেন মিসেস টমসন।

মিসেস টমসনের চিঠির সুর বেশ কড়া। কিন্তু তাঁকে তেমন দোষ দিতে পারি না। তেত্রিশ নম্বরের মেমসায়েবই যে ইদানীং আক্রমণ বাড়িয়ে চলেছেন এবং একের পর এক অন্যায় করে চলেছেন সে-সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

সমস্যার সমাধানের কোনো পথই আমি খুঁজে পেলাম না। বেচারা তেলকালিবাবুও ভেবে-চিন্তে কিছু বার করতে পারলেন না। শুধু বললেন, "শেষ পর্যন্ত রক্তারক্তি কাণ্ড একটা হবে মনে হচ্ছে, যদি না ভগবান একটা কিছু করে দেন।"

অগতির গতি গণপতিবাবুর কথা মনে পড়ে গেল। বিপদের সময় ছাড়া অন্য কখনও তাঁর নাম আমার স্মরণে আসে না। টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম।

গণপতিবাবু মোটেই উদ্বিগ্ন হলেন না। সব শুনে বললেন, "তেত্রিশ নম্বরের অন্যায়টাই বেশী মনে হচ্ছে। এ ব্যাপারে চুপচাপ বসে থাকা উচিত হবে না। এখনই তেইশ নম্বরের চিঠির একটা কপি তেত্রিশ নম্বরে পাঠাও, সঙ্গে লিখে দাও তোমার সম্বন্ধে এই ধরনের অভিযোগ প্রায়ই আসছে। আর মিসেস টমসনকে বলো থানায় একটা ডায়রি করে রাখতে। ভিজে কাপড়ের জল অন্যের বাড়িতে পড়া সম্বন্ধে অনেক কেস আছে; আর ওই বেড়াল বন্দী করে রাখার ব্যাপারটা সিরিয়াস।"

থানায় ডায়রির ব্যাপারটা খুব শক্ত হবে না। এস আই গণেশ সরকার যখন রয়েছেন। আগামী-কাল সকালে গণেশবাবু ডিউটিতে থাকবেন। সেই সময় আমিও একবার থানা ঘুরে আসবো; তেত্রিশ নম্বরকে লেখা আমাদের চিঠির একটা নকলও ওখানে জমা রেখে আসবো। বাঘিনীর যা মেজাজ, কখন কী করে ফেলেন তার ঠিক নেই। আর মিসেস টমসনকেও বিশ্বাস নেই। জলের অভাবে আধা স্নান করে এবং ওপরের ফ্ল্যাটের ভিজেকাপড়ের ফোটা হজম করে এই প্রসন্ন মহিলা বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন এবং প্রায়ই বলছেন, "আমাকে ওরা এখনও চেনেনি। আমার নাম উমারাণী সামন্ত!"

মানুষ ভাবে এক, এবং শেষ পর্যন্ত হয় এক। এই জটিল পরিস্থিতির যে শেষ পর্যন্ত নাটকীয় এমন সমাধান হবে তা ভাবতে আজও আমার আশ্চর্য লাগে। যুদ্ধ আগত, আমাদের তখন সাজ-সাজ রব। আমাদের পক্ষে ব্রিগেডিয়ার তেলকালি-বাবু। তাঁর পরামর্শেই, আমি নিজে জেনারেলের ভূমিকা নিয়েছি—অর্থাৎ এই যুদ্ধের দুই পক্ষের সঙ্গে আমি নিজে তেমন দেখাসাক্ষাৎ করছি না; সমস্ত কাজ দূত মারফৎ চলেছে। কারণ, আমাকে শেষপর্যন্ত সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতে পারে।

আগামীকাল সকালে তিনি আমার সঙ্গে থানায় যাবেন। পরেশ সরকার ডিউটিতে আসা মাত্রই আমি খবর পাঠালো। মিসেস টমসন সানন্দে জানিয়েছেন, তিনি আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন।

তেত্রিশ নম্বরকে লেখা আমার চিঠিটাও তেলকালিবাবু মন দিয়ে পড়ে খাবার সময়ে পড়েছেন। বলেছেন, "ঠিক তার কথা লেখে এগোচ্ছি স্যার। খুব ভালবাসা—মন কষাকষি—দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ, আড়ি-বেআড়ি—পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া—বাড়িওয়ালাকে নোটিশ—থানা পুলিস। এর পর বড় জোর গোটা পাঁচেক স্টেপ বাকি রইলো: হাতাহাতি—হাসপাতাল—কোর্টকাছারি—জেল—ফাঁসি।"

"ফিজের খাপ?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"মার্ডার কেস হলে এক পার্টির জেনুইন প্রাণ, না হলে স্রেফ টাকার প্রাণ।" অভিজ্ঞ তেলকালিবাবু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় পরের পার্ট নাটক গড়ালো না। পরের দিন ভোরবেলায় যখন দুই দুষ্টুকে দুই দিকে পাঠাবার উদ্যোগ, সমস্যার নাটকীয় সমাধান হয়ে গিয়েছে।

তেত্রিশ নম্বরে পিওন বইতে চিঠি ধরাতে ছোকরা এক সুইপারকে পাঠিয়েছিলাম। সে কাঁদ কাঁদ হয়ে ফিরে এল। পরিস্থিতি খুবই গুরুতর। অনেকবার বেল বাজাবার পরে একজন মেমসাহেব বেরিয়ে এলেন এবং চিঠিখানা দেখে, পড়ে, সুইপারের সামনে ফড়ফড় করে ছিঁড়ে ফেলেছেন। পিওন বইতে সইও করেন নি শুধু, বলে দিয়েছেন, তোমাদের ম্যানেজার সাহেবকে নিয়ে আসতে বলবে।

এই মহিলাটি যে মিসেস ঠাকুর ছাড়া আর কেউ নয়, সে সম্বন্ধে আমার মনে তখন কোনো সন্দেহ নেই। সুইপার বললো, মেমসাহেবের কোলে যে একটি বেবিও লক্ষ্য করেছে। মিসেস ঠাকুরের ঔদ্ধত্যে আমিও বেশ চটে উঠলাম। চিঠি ছিঁড়ে ফেললেই চিঠির হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যায় না, এই মামলা সর্তাই এ'কে বুঝিয়ে দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এইসব কারণেই আইন পাড়ার চিঠি বাড়ির দেওয়ালে অথবা দরজায় লটকে দেবার ব্যবস্থা আছে।

তেলকালিবাবুও বিফল হয়ে ফিরে এলেন ইতিমধ্যে। অনেকবার তেইশ নম্বরে বেল বাজিয়েছেন তিনি। কিন্তু কেউ বেরিয়ে এল না। মিসেস টমসন কী একলা থানায় চলে গেলেন?

আগের কাজ আগে। চিঠির একটা কপি হাতে আমি তেলকালিবাবুকে তেত্রিশ নম্বরে দিয়ে আসতে বললাম। আমার মেজাজও তখন একটু গরম। চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেবার ব্যাপারটা কিছুতেই হজম করতে পারছি না।

একটু পরেই তেলকালিবাবু একগাল হাসি নিয়ে ফিরে এলেন। মুখে হাসি, কিন্তু বললেন, "সর্বনাশ হয়েছে স্যার। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। অ্যাপেনডিসাইটিস কেস—কোর্ট কেস, পুলিশ কেস আর দরকার হবে না।"

তেলকালিবাবু বললেন, "তেত্রিশ নম্বরের কলিং বেল বাজাতেই যে-ঝি বেরিয়ে এল, তাকে দেখে আমি তাজ্জব: আরে! সুকুমারী না? তুমি এখানে?' সুকুমারী মুখ ঝামটা দিল, 'আমি কোথায় আছি তাতে তোমার কী?' তখনই বুঝলাম, সামথিং সিরিয়াসলি রং। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ঠাকুর মেমসাহেব কোথায়?' 'মরণ আর কি! জানে না কোথায়!' সুকুমারী মুখ ঝামটা দিল। ইতিমধ্যে যিনি বেরিয়ে এলেন, তাঁকে দেখে আমার ফেণ্ট হবার অবস্থা। স্বয়ং মিসেস টমসন। কোলে একুশ দিনের বেবি। বললাম, 'সর্বনাশ হয়েছে, ম্যানেজারবাবুর চিঠি এখানকার মেমসাহেব ছিঁড়ে ফেলেছে, অথচ সই করেন নি।' মিসেস টমসনের তখন অন্য রূপ। আমাকে বকুনি লাগিয়ে বললেন, ছিঃ, অ্যানজেলা কেন ছিঁড়বে? চিঠি আমিই ছিঁড়ে ফেলেছি। ও সবের আর দরকার নেই। আমি এখন খুব ব্যস্ত।"

তেলকালিবাবু এরপর যা বললেন তা মোটামুটি এই রকম। সন্ধ্যেবেলায় অঞ্জলি ঠাকুরের অ্যাপেনডিসাইটিসের যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। ডাক্তার এসে বললেন, এখনই হাসপাতালে অপারেশন দরকার। তিন সপ্তাহের বেবির কথা ভেবেই অজিতাভ ঠাকুর মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এরকম অবস্থায় পড়লে মাথার ঠিক থাকে না। এই অবস্থায় খবরটা কীভাবে গোপন চরের মাধ্যমে তেইশ নম্বরে এসে পৌঁছয়। চর ভেবেছিল, এই খবর পেয়ে তেইশ নম্বর খুশী হবেন।

কিন্তু পরিস্থিতি মুহূর্তে পাল্টে গেল। সব কাজকর্ম ছেড়ে পি-জি হাসপাতালের প্রাক্তন নার্স ঊষারাণী ছুটলেন তেত্রিশ নম্বরে। অঞ্জলি ঠাকুর তখন রোগের যন্ত্রণা এবং বেবির চিন্তায় কান্নাকাটি করছেন। কিন্তু ঊষারাণী তখন প্রহরী অবস্থায় হাল ধরেছেন। বললেন, "বেবি ক্লিনিকে অনেক দিন কাজ করেছি আমি। কোনো চিন্তা নেই তোমাদের।" সুকুমারী একটু গাঁইগুঁই করছিল। কিন্তু ঊষারাণী তাকে প্রচণ্ড বকুনি লাগিয়ে মনে করিয়ে দিলেন, তাঁর ঝগড়া অ্যানজেলার সঙ্গে, বেবির সঙ্গে নয়।

অ্যানজেলাও যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন।

তেলকালিবাবু জানালেন, "সুখে আছে আবার মিলে গিয়েছে! বাচ্চাটা বেশ খুসমেজাজে মিসেস টমসনের কোলে খেলা করছে মনে হলো। মাঝখান থেকে পুলিসের কথা বলতে গিয়ে আমি প্রচণ্ড বকুনি খেলাম। মিসেস টমসন বললেন, ম্যানেজারবাবুর চিঠি আমিই ছিঁড়ে ফেলেছি। বেশ করেছি, ছিঁড়েছি, আমার এখন অনেক কাজ।" এই বলে মিসেস টমসন সুকুমারীকে তেত্রিশ নম্বরের দরজা বন্ধ করে দিতে হুকুম করলেন।

[ক্রমশ]

ক্যাণ্টন্ বা চাংস্ প্রদেশের রান্না উত্তর দিকের চেয়ে অনেক ভালো। আমাদের ঝাল দেওয়া মুর্গির ঝোল খাইয়ে দিল। খাদ্যের প্রাচুর্যে বিস্মিত হতে হয়। নষ্টজনের জন্য গোটা মুর্গি রেঁধে ফেলল। এ ছাড়া আনুষঙ্গিক তো আছেই।

১৮ই সকালে আমরা নানকিং-এর একটি বড় মেডিকেল কলেজ দেখতে গেলাম। যদিও পূর্বে আর একটি হাসপাতালের বর্ণনা লিখেছি, তবুও চাংস্ কলেজ অব নিউ মেডিসিনে যা যা শুনেছি তার উল্লেখ করা ভালো। কারণ, চাষ ও চিকিৎসা—এ দুটি বিষয়ে এবং এরই সঙ্গে শিক্ষা বিষয়েও অনেক নূতন পরীক্ষা করে সুফল পেয়েছে চীন। কালচারাল রেভলিউশনের সময় মাও-সে-তুং-এর নির্দেশে পুরাতন চীনা চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসা-বিদ্যালয় ও দন্ত-চিকিৎসালয় —এই তিনটি মিলে এই শিক্ষায়তন। মাও-সে-তুং চীনা কার্মাকোলজির এক অভিনব সংস্করণ করলেন। এই হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে শিক্ষা লাভ করতে দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্রছাত্রী আসে। সম্প্রতি আলজিরিয়ার তিব্বতী ছাত্র আছে। টানজানিয়া ও অন্যান্য আফ্রিকান দেশ থেকে তো আসেই, তা ছাড়া আমেরিকা থেকে তিন মাসের জন্য এসে আকুপাংচারকোর্স করে গেছে একদল ছাত্রছাত্রী। কাম্বোডিয়া থেকে বেয়ারফুট ডাক্তাররা এসেও শর্ট টার্ম শিখে যাচ্ছে। এই হাসপাতালে তিন হাজার নয় শত বেড—এক হাজার ছয় শত ছাত্রছাত্রী। তার মধ্যে আছে চাষী, শ্রমিক ও সৈন্য। এবং এর ঊনপঞ্চাশ ভাগই মেয়ে। হাসপাতাল-কর্মীর সংখ্যা দু হাজার তিন শত। মোটের উপর, খুব বড় হাসপাতাল ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে ১৯৭০ সালে রেভলিউশনারী কমিটি গঠিত হয়েছে। তখনই আর্মি, চাষী ও শ্রমিকরা শিক্ষা নিতে এসেছে—যাতে প্রত্যেক গ্রামে চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া যায়। এখানে যারা ডাক্তারি পড়তে এসেছে তাদের প্রত্যেকেরই অন্তত দু বছরের কর্মের অভিজ্ঞতা আছে। এভাবে যারা ভর্তি হয়েছে তাদের মধ্যে পাঁচ শত ছেলে এখানে এক বছর শিক্ষা লাভ করে বিভিন্ন স্থানে চলে যায়। দ্বিতীয় দল আসে '৭২ সালে। তারা মিডল স্কুল শেষ করে দু বছর কর্ম শিক্ষা সমাপ্ত করে এসেছিল। দ্বিতীয় দল ১৯৭২—১৯৭৫ তিন বছর ডাক্তারি পড়েছে। এখন এরা তিন বছরে ডাক্তারি 'পাস' করে। ছেলেরা শুধু কলেজে পড়ে না, গ্রামে ও ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে যায়। ছয় মাস কলেজে বিদ্যা শিক্ষায় ডাক্তারির কিছু মূল তত্ত্ব শিখে চীনা চিকিৎসা, আকুপাংচার ইত্যাদির সঙ্গে রোগপ্রতিষেধক ব্যবস্থা শেখে। তারপর ছয় মাসের শেখা ঐ বিদ্যা নিয়ে প্র্যাকটিক্যাল কর্মশিক্ষার জন্য বেরিয়ে পড়ে। এই সময় পাঁচ থেকে ছয় সপ্তাহ বাইরে থাকে। তারপর ফিরে এসে ক্লিনিক্যাল কাজের কতগুলি মূল শিক্ষা পায়। এবং কয়েক মাস পরে আবার বেরিয়ে পড়ে। এমনিভাবে ছয় মাস কলেজে শেখে আর বাইরে প্র্যাকটিস করে। তৃতীয়বার গিয়ে তারা শুধু চিকিৎসাই করে না, বেয়ারফুট ডাক্তারদেরও শিক্ষা দেয়। অর্থাৎ, বেয়ারফুট ডাক্তার তৈরি করে। ১৯৭১ সাল থেকে এইসব ছাত্ররা কলেজের বাইরে লক্ষ লক্ষ লোকের চিকিৎসা করেছে; দশ হাজার 'বেয়ারফুট' ডাক্তার তৈরি করেছে। প্রথম ছয় মাস ওরা অ্যানাটমির কতকগুলি মূল কথা ও প্রাথমিক কিছু ঔষধ ব্যবহার ও আকুপাংচার শেখে ও দফায় দফায় এই শুশ্রূষার শিক্ষা' অর্থাৎ ক্লাসের বাইরের শিক্ষার দ্বারা জনসংযোগ ঘটে—মানুষকে সেবা করতে শেখে। ইতিপূর্বে গ্রামে কোনো ডাক্তারই যেতে চাইত না। এখন সে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

চীন যাবার আগে আমাকে এখানে অনেকে বলেছিলেন, 'বেয়ারফুট' ডাক্তারের বিষয়ে জেনে আসবেন। আমরা এখানে ছয় বছর মেডিকেল কলেজে পড়বার পর শহরের ছেলেদের হঠাৎ গ্রামে যেতে বলি। তাতে সাড়া পাওয়া যায় না। কি করে যাবে? মেডিকেল কলেজে পড়তে যে প্রচুর ব্যয় হয়েছে তার খরচ উঠবে কোথা থেকে? তা ছাড়া শহরের ছেলেরা গ্রামে কোনো সুবিধাই পাবে না। অনেক সময় তাই গ্রামে যাবার জবরদস্তি অত্যাচারের মত বোধ হতে পারে। ওখানে তো তা নয়। ওখানে যারা ভর্তি হয় তাদের সবাই আগে দু বছর কোথাও না কোথাও কাজ করে এসেছে। তাদের সমস্ত খরচ সরকার বহন করে। মিলিটারি থেকে যারা এসেছে তারা মাইনে পায়। তাতেই খরচ চলে। কাজেই সরকারী অর্থে অর্জিত শিক্ষা তারা স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে কিছু দিন দিতে পারে। শিক্ষার সময়টাই মাঝে মাঝে গ্রামে কাটিয়ে গ্রামের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ অবাধ হয়। তা ছাড়া বেয়ারফুট ডাক্তাররা শহরের ছেলে নয়, তারা গ্রামেরই ছেলে। সেই গ্রামে গিয়েই ছাত্ররা তাদের শিখিয়েছে, কখনো বা তারা শহরের কলেজে এসে শিক্ষালাভ করে গ্রামে ফিরে গেছে। এ অবস্থায় 'বেয়ারফুট' ডাক্তারদের সমস্যা থাকবে কেন?

এই মেডিকেল স্কুলে ডাক্তারি ছাড়াও বিদেশী ছাত্রদের ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিচালনার জন্য কালচারাল রেভলিউশনের পরে রেভলিউশনারি কমিটি তৈরী হয়েছে। এই কমিটিতে একুশজন সভ্য। এরা আলোচনা করে নিয়োজিত হয়েছে (by democratic consultation)। মিঃ গুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই কমিটির চেয়ারম্যান কি পলিটিক্সের জন্য এই পদে আছেন, না ডাক্তারি বিদ্যার জন্য? উত্তরে শুনলাম—মাও-সে-তুং বলেছেন, সর্বত্র রেভলিউশনারী কমিটির চেয়ারম্যান রাজনীতিতে দক্ষ, শারীরিকভাবে সুস্থ ও নিজ নিজ বিদ্যায় পারদর্শী হবেন এটাই ঈপ্সিত। এঁরা ঐক্যের জন্য সর্বদা জনসাধারণের মতামত নেবেন; মার্কস, স্টালিন ও মাও-সে-তুং-এর রচনা থেকে শিক্ষা লাভ করবেন। আমরা জিজ্ঞাসা করে জানলাম, সমস্ত ডাক্তারি শিক্ষাটা চীনা ভাষার মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে। আগে ইউরোপীয় বই থেকে চীনাতে অনুবাদ করে নেওয়া হত। এখন নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক লেখা হয়েছে। সমস্তরকম বিজ্ঞানশিক্ষা উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমেই হয়। এই সব কথা বলতে বলতে তিনি আরো রাজনীতি বললেন: মাও-সে-তুং বলেছেন—Do not conspire, be overboard এইজন্যই আমাদের রাজনীতিতে সব খোলাখুলি।

অচেনা চীন

মৈত্রেয়ী দেবী

এই প্রসঙ্গে তাই কমিউনিস্ট দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে আমাদের যে একটি গুজে ধারণা আছে সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা দরকার। কমিউনিস্ট দেশ অর্থ রাশিয়া ও চীন। কিন্তু রাশিয়া ও চীনকে এক ছাঁচে ফেলা যায় না বলেই ধারণা হয়েছিল আমার। আসল কথা, এক মতে নির্বাতিত হলেও প্রত্যেক দেশের নিজস্ব চারিত্রিক বিশেষত্ব আছে। সেগুলিকে উপেক্ষা করে কোনো নেতা সার্থকতার পথে এগিয়ে যেতে পারেন না। নানা প্রসঙ্গে আমি যে বিপুল কর্মোদ্যোগের বর্ণনা দিচ্ছি তাতে একটা প্রশ্ন উঠছে—এই উদ্যোগ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, না জবরদস্তির ফল? এসব বিতর্কের পুরোপুরি উত্তর আমি দিতে পারি না। কারণ, আমার অভিজ্ঞতা স্বল্প। কিন্তু আমাকে ভাবতে হচ্ছে—জবরদস্তি করে মানুষকে কতখানি কাজ করানো যায় এবং কদিন তা চলতে পারে? অত্যাচার কি কখনো প্রেরণা আনে? আর, প্রেরণা না হলে কি এত বড় বিপুল কর্ম সফল হয়? যার ফলে নয় শত মিলিয়ান মানুষের মধ্যে কেউ বেকার নেই, অনাহারে নেই, দ্রব্যমূল্য আজ চৌদ্দ-পনেরো বছর এক আছে, ইনফ্লেশন নেই, কোনো দেশের কাছে ঋণ নেই, কোনো দেশের কাছে প্রার্থী নয়! রাশিয়ার কলভারমুক্ত হয়ে এ দেশের মানুষের বুকের পাটা বিস্তৃত হয়ে গেছে। জবরদস্তি অল্প সময়ের জন্যই বাহ্যিক ফল দেখায় তাতে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটায় না। আমার মনে হয়, স্টালিনের নীতিই কমিউনিস্ট দেশ সম্বন্ধে এক প্রকার ভীতির বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে।

১৯৬১ সালে মস্কোতে একটা পার্কে বসে আমার সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—স্টালিন সম্বন্ধে যা শুনেছি তা সত্য কি? সে চুপ করে রইল। বারবার জিজ্ঞাসা করার পর সে বলল, 'তুমি কি জানো না, এখন সারা বিশ্ব জানে!' 'তোমরা আগে জানতে না কেন?' উত্তর—'আমাদের কাছ থেকে গোপন করা হয়েছিল। হিটলারের চর যখন ইহুদীদের ধরে নিয়ে যেত তখন পাশের বাড়ির লোকে টের পেত না, তারা শুধু দেখত ইহুদীরা নেই। তারা কোথায় গেছে, কি হয়েছে—জানত না। এরকম অবস্থা চীনে হতে পারে বলে মনে হয় না। এরা এত খোলা-মেলা, এত তার্কিক। মাঝে মাঝেই এদের পলিটিক্যাল দ্বন্দ্ব হচ্ছে—যারা হেরে যাচ্ছে, তারাও বেঁচেবর্তে আছে। এখনও এখানে সাত-আটটা পলিটিক্যাল পার্টি আছে। তাদের তেমন জোর নেই, তবে অস্তিত্ব আছে। এমনকি, 'প্রগ্রেসিভ কুমিনটাং' পার্টি নামেও একটি দল আছে।

আমি ওদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, লোকে বলে—তোমরা লিন্ পিআও-কে মেরে ফেলেছ। কথা কি সত্য? তারা বললে, 'আমরা কি করে মারলাম? ক্যাপিটালিস্ট রটনা এমনি বটে। সে তাড়াতাড়ি প্লেনে করে তার পরম বন্ধু সোভিয়েট দেশে পালাচ্ছিল—তেল না নিয়েই। প্লেনে তেল ফুরিয়ে গেলে তো প্লেন পড়ে যাবেই! মাও-সে-তুং-এর সঙ্গে অনেকেরই মতদ্বন্দ্ব হয়েছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি জয়ী হয়েছেন। কারণ, জনসাধারণকে তিনি তাঁর অনুবর্তী করতে পেরেছেন। তবু আমাদের সমালোচনা এই যে, শত পুষ্প বিকশিত হোক বলে তিনি শতপুষ্পবিকাশ নিজেই বন্ধ করলেন। এ কথার উত্তরে কেউ কেউ আমায় বলেছেন, শত পুষ্প বিকাশের জন্য দেয়ালকাটার আধিপত্যও সহ্য করতে হবে এমন নয়। এত করে যে সমাজব্যবস্থা তৈরী হয়ে ফল পাচ্ছে দেশের জনসাধারণ, তাকে আবার পিছন দিকে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা সহ্য করা যায় না।

যা হোক, ডেমোক্রেটিক দেশে, ধরা যাক আমাদের দেশে, মতের স্বাধীনতা খুবই আছে এবং আমরা তা চাই। কিন্তু সব মতের যথেচ্ছ চাষ হলে কি ফুল ফোটে তাও আমরা দেখেছি অনেক। যদি কেউ বলে, দাঙ্গা, গরিবজনদের ঘৃণা করবার আমার অধিকার আছে, কমিউন্যাল হবার আমার অধিকার আছে, কুসংস্কারে বিশ্বাসের আমার অধিকার আছে, মুখ থেকে শিবলিঙ্গ বের করে ভেলকি দেখিয়ে মানুষকে বুদ্ধিভ্রংশ করবার অধিকার আমার আছে—আমরা সয়ে যাই। ফলে, দেশ এক পা এগোয় তো দশ পা পেছোয়। ডেমোক্রেসির চর্চা করার জন্যও মানুষকে শিক্ষিত করা চাই। এলোমেলো চিন্তার বাঁধ ছেড়ে দেওয়া উন্মাদতা কোনো সফলতা আনে না। যে-কোনো একটা মত হলেই হলো, সে আকাশ জুড়ে উড়ুক আর কাঁটাবীজ ছড়িয়ে যাক—এ চীনের নূতন ব্যবস্থায় হতে পারে না। পারলে চীন আজ যা হয়েছে তা হতে পারত না। কাঁটার চাষে শস্যের বিঘ্ন হয়।

স্টালিনের মতের সঙ্গে যে মাও-সে-তুং-এর মতের এ বিষয়ে মিল নেই তা আমাকে ওরা তাঁর লেখা থেকে দেখিয়েছে। উনিশশ ছাপ্পান্ন সালের ২৫শে এপ্রিল তিনি একটি প্রবন্ধে (on the major relationship) যা বলেছিলেন তার সামান্য আলোচনা করব।

তিনি বলছেন, 'কি করে সোশালিস্ট দেশ তৈরি করা যাবে? প্রথমত, ভিতর ও বাহিরের সমস্ত অনুকূল শক্তিকে একত্র করতে হবে। সোভিয়েট ইউনিয়নে অনেক ভুল হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি করো না। দ্বিতীয়ত, যারা অনুকূল নয়, এমন কি বিরুদ্ধে, তাদের অনুকূল করবার চেষ্টা কর।

'আমরা যে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশের থেকে

এগিয়ে যেতে পেরেছি তার কারণ—বৃহৎ শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প ও কৃষিকর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে পেরেছি।......'

সোভিয়েট ইউনিয়ন চাষীদের একেবারে নিংড়ে নিয়েছে—তারা কম দামে অনেক বেশী শস্য নিয়েছে। যান্ত্রিকভাবে সরকারকে বিক্রি করার ব্যবস্থা করে চাষীদের উৎসাহ নিবিয়ে দিয়েছে। তুমি যদি চাও যে, ঘোড়াটা ভাল দিক আর তাকে খেতে না দাও, বা যদি চাও ঘোড়াটা দৌড়াক কিন্তু তাকে চরতে না দাও—এ কেমন বিচার!' (এসব বলা হচ্ছে ১৯৫৬ সালে। কাজেই বোঝা যায়, ক্রুশ্চেভের ক্রুদ্ধ হবার কারণ ঘটেছিল।)

'......আমরা সোভিয়েট নীতি অনুসরণ করে কেন্দ্রের হাতে সমস্ত ক্ষমতা একত্রীভূত হতে দেব না। আমরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মুখ বন্ধ করে তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করবার অধিকার কেড়ে নেব না। আমাদের মত বৃহৎ দেশে কেন্দ্রের সঙ্গে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সম্বন্ধটা মসৃণ হওয়া দরকার।......

'......একটা পার্টি থাকা ভালো, না অনেক পার্টি থাকা দরকার? মনে হয় অনেক পার্টিই থাকা ভালো। তাতে দীর্ঘদিন সহাবস্থানের শিক্ষা ও পরস্পরের উপর দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা থাকে। আমাদের দেশে অনেক ডেমোক্রেটিক পার্টি আছে—যাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া ও ইনটেলেকচুয়ালরা আছেন—যাঁরা জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে ও চ্যাংকাইশেকের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। তাঁদের অস্তিত্ব এখনও আছে। এই দিক থেকে চীন সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে পৃথক। আমরা এঁদের থাকতে দিয়েছি—তাঁদের মত প্রকাশের সুযোগ দিচ্ছি—আমরা তাঁদের সঙ্গে মিলিতও হচ্ছি, সংগ্রামও করছি। আমরা এসব ডেমোক্রেটিক পার্টিদের আমাদের সমালোচনা করবার সুযোগ দিচ্ছি। যাঁরা শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে সমালোচনা করেন সেটা শোনবার যোগ্য। তাঁদের সমালোচনায় উপকার হয়। যাঁরা দেশকে ভালোবাসেন কুমিনটাং সৈন্যদের সেরকম লোকরা, যেমন উইলি হুয়াং ও ওয়েং ওয়েন হাও প্রভৃতি, তাঁদের উৎসাহ বাড়িয়ে তোলবার চেষ্টা করব। এমন কি, যাঁরা আমাদের প্রচণ্ড গাল দেন, যেমন লিয়াংস্যুমিং, লুং ইয়ুন ইত্যাদি, তাঁদের গাল দিতে বাধা দেব না। যদিও তাঁদের বক্তব্য যুক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করে যাব। যেসব নিন্দা অর্থহীন তার প্রত্যুত্তর দেওয়া, যেসব নিন্দায় সত্য আছে তা মাথা নত করে সহ্য করে নেওয়া—এই হচ্ছে নীতি এবং এই নীতি পার্টির পক্ষে ও জনসাধারণের পক্ষে ভালো।

'......কমিউনিস্ট পার্টি ও ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলি সবই ইতিহাসের ফসল। ইতিহাসের ফসল ফলে, আবার মিলিয়ে যায়। তাই কমিউনিস্ট পার্টির আয়ুও একদিন শেষ হবে। তাতে কি খারাপ লাগবে? খারাপ লাগার কারণ নেই। আমার মতে, এ খুবই ভালো কথা। একদিন যে ডিক্টেটরশিপ অব দি প্রলিতেরিয়েৎ আর থাকবে না—আমার কাছে এ শুভ সংবাদ। আমাদের কাজ হচ্ছে সেই শুভ দিনকে ত্বরান্বিত করবার চেষ্টা করা। এ কথা অনেকবার বলেছি। কিন্তু এখন আমাদের আরো শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। আমরা এখন তো সে স্তরে পৌঁছইনি। কাউন্টার রেভলিউশনারী ও ইম্পিরিয়ালিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের পার্টির কাজ একেবারেই শেষ হয়নি। ডিক্টেটরশিপ অব দি প্রলিতেরিয়েতের মধ্যে একটা জবরদস্তি আছে। তাই আমাদের ব্যুরোক্রেসির অত্যাচার ও জবরজঙ্গ শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধতা করা উচিত।......'

এবারে মাও-সে-তুং-এর রেভলিউশন ও কাউন্টার রেভলিউশনের সম্পর্ক সম্বন্ধে মতামত বলছি। অনেকের ধারণা, সমস্ত কমিউনিস্ট দেশেই জল্লাদের অবাধ রাজত্ব। জল্লাদ দিয়ে একটা দেশ গড়া যায় না—সে কথা অনেককে বোঝাতে পারি না। তাই মাও-সে-তুং-এর লিখিত বহুপ্রচারিত মতগুলি স্মরণ করছি। তিনি বলেছেন—'কাউন্টার রেভলিউশনারীরা—নেগেটিভ ও ডেস্ট্রাকটিভ—তারা সৃষ্টি করে না, ধ্বংস করে। তাদের মধ্যেও পরিবর্তন আনা সম্ভব, যদিও একেবারে পুরোপুরি বদলাবে না। ১৯৫১-৫২ সালের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালানো হয়েছিল তার প্রয়োজন ছিল। যাদের যুক্তি দিয়ে সংশোধন হবে না তাদের বিরুদ্ধে কি উপায় আমরা নেব? মৃত্যুদণ্ড, জেল, চোখে চোখে রাখা, বা বন্দি থাকতে দেওয়া? জেলে দেওয়া অর্থ শুধু বন্ধ করা নয়। কর্মের মাধ্যমে তাদের মত পরিবর্তন করানো। চোখে চোখে রাখা মানে সামাজিক শাসন। আর মৃত্যুদণ্ডর অর্থ পরিষ্কার। এটা সত্যি যে, উপর্যুক্ত সময়ে (১৯৫১-৫২) কয়েকজন লোককে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা কিরকম লোক ছিল? তারা বহু লোকের হত্যার দায়ে দায়ী। আমরা যদি জনসাধারণের দ্বারা তীব্রভাবে ঘৃণিত ঐরকম কতকগুলি লোকের প্রাণদণ্ড না দিতাম তা হলে আজ আমরা যে নরম মনোভাব দেখাতে পারছি তা পারতাম না। এখন জানা গেছে, স্টালিন বহু লোককে হত্যা করেছে। তাই লোকে ভাবছে—আমরাও তাই করেছি। কিন্তু আমরা তা করিনি। এখনও শত্রু প্রচুর আছে। তারা শস্য পোড়ায়, গুপ্তচরবৃত্তি করে, গরু বাছুর মেরে ফেলে, নিন্দাজনক পোস্টার লাগায়। তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু এখন থেকে ক্রমে আমাদের প্রাণদণ্ড কমিয়ে ফেলা ও অ্যারেস্ট করাও একেবারে কমিয়ে ফেলতে হবে। আমাদের ইনানে (Yenan) গৃহীত নীতি অনুসরণ করতে হবে—যত কম সম্ভব অ্যারেস্ট কর, কাউকে মেরো না। এমন কি, স্যাউ হুই বা কাংর্সির মত দুষ্ট কুকর্মাদেরও প্রাণদণ্ড দেওয়া চলবে না। তারা প্রাণদণ্ড পাবার মত অপরাধ করলেও না। কারণ, একজনকে মারলে হয়তো আর একজনও তেমনি অপরাধীকে মারতে হবে। ক্রমে অনেক মাথা গড়িয়ে পড়বে। আর এর মধ্যে হয়তো একজন নির্দোষও শাস্তি পেয়ে যাবে। তার চেয়ে অন্যায় আর নেই। কারণ, আমরা জানি—একবার মাথা কাটা পড়লে আর তা গজায় না। লাভই বা কি? শত্রুদের মারলে দেশের উৎপাদন বাড়বে না, বিজ্ঞানের উন্নতি হবে না। দেশের প্রতিরক্ষা জোরদার হবে না। তাইওয়ান ফিরে পাওয়া বা চার শত্রু (ইঁদুর, মশা, মাছি, ছারপোকা) দূর করাও সহজ হবে না। তবে শুধু দুর্নাম হবে যে, এরা বন্দীদের মেরে ফেলে। বন্দী মানুষকে মারায় কোনো গৌরব নেই।

বরং আমরা তাদের ভুল শোধরাতে সাহায্য করব। প্রত্যেকের সাহায্য প্রয়োজন। যারা ঠিক পথে আছে তাদের যদি সাহায্য প্রয়োজন হয় তা হলে যারা ভুল পথে গেছে তাদের আরো সাহায্য প্রয়োজন। জগতে সবাই দোষ করে—কেউ কম, কেউ বেশী। যারা বেশী দোষ করে ফেলেছে তাদের বেশী সাহায্য করতে হবে—যাতে তারা ক্রমে এ দেশের কাজে লাগে। আর সাহায্য না করে তাদের দোষ দেখিয়ে উল্লাস করা একরকম সাম্প্রদায়িকতা।

মাও-সে-তুং-এর লেখা এই সহজ সরল বক্তব্য পড়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এর মধ্যে কোনো তত্ত্বের কচকচি নেই; মতের আস্ফালন নেই। একেবারে সরল সত্যের স্পষ্ট উচ্চারণ। আশা করি, এই নির্দেশ পালিত হচ্ছে।

নানকিং-এ আমরা সানইয়াৎ সেনের সমাধি দেখতে গিয়েছিলাম। সে এক বৃহৎ ব্যাপার! চার শত নব্বইটি সিঁড়ি বেয়ে উঠে তবে সেই সমাধিতে পৌঁছতে হয়। এই সিঁড়ি দিয়ে ওঠাই এক তীর্থযাত্রা। আমার মনে হল—মিশরের সম্রাটের জন্য দাসেরা করেছিল, এই স্মৃতিসৌধ ও সোপানশ্রেণী সাধারণ মানুষের ভালোবাসায় গড়া; কিন্তু দুইয়ের মর্মকথা একই অনিত্যকে নিত্য করার চেষ্টা!

নানকিং-এর আমরা আর একটা দর্শনীয় স্থানে গিয়েছিলাম। পাহাড়ের উপর যন্তরমন্তর'—দুই-আড়াই হাজার বছর আগের তৈরি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের নিদর্শন। এর মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগল একটি মণ্ডল। যেটা দেখলে হঠাৎ মনে হবে গোলাব—পাথরের ভূমণ্ডল। আসলে সেটা আকাশমণ্ডল। মণ্ডলটি ঘোরানো যায়। সমগ্র আকাশটি যেমন আমরা পৃথিবী থেকে দেখি তেমনি দেখানো হয়েছে। সর্বোচ্চ চূড়ায় একটি টেলিস্কোপ বসানো আছে। ওখানে ওঠা বড় পরিশ্রমের ব্যাপার ছিল—দরকারও ছিল না। তবু উঠলাম। এবং সেদিন থেকেই শরীর খারাপ হল।

এসে অবধি আমি ও বংসলা আলোচনা করেছি যে, এখানে পথ-চলতি লোকের মধ্যে ছেঁড়া নোংরা কাপড় পরা একটি লোকও চোখে পড়ছে না। সেই শুনে অবধি পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ পাণ্ডে কেবলই ছেঁড়া কাপড়ের সন্ধান করছিলেন। সানইয়াৎ সেন অ্যাভিনিউ দিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন, 'ঐ দেখ দেখ তালি দেওয়া জামা-পরা একটা লোক—' তাকিয়ে দেখি সত্যিই একটা লোক তার জামায় একটা নয়, অনেকগুলি তালি দেওয়া খুব নিপুণভাবে। বিশ্বম্ভর বললেন, 'খুঁজলে অনেক পাওয়া যাবে। সব দেশেই দুঃখকষ্ট আছে।' আমি অবশ্য খুঁজে খুঁজে ছেঁড়া কাপড় দেখার পক্ষপাতী নই। আমি বরং দেখছিলাম পথের দুপাশের চেনার গাছ। চেনার গাছ কাশ্মীরে বিখ্যাত গাছ। প্রায় বটের মত ডালপালা ছড়িয়ে দেয়। এখানে দেখছি সরু দীর্ঘ কাণ্ড উপরে উঠে গিয়ে মাথার উপরে ছত্রাকারে ডালপালা বিস্তার করেছে—অথচ পাতাগুলি চেনার তাতে সন্দেহ নেই। তালির চেয়েও এ দৃশ্য আশ্চর্য লাগছিল। পরে শুনলাম—বর্ষাকালে যখন ডালপালা ছড়াবার সময় তখন গাছের কাণ্ডগুলি মোটা দড়ি দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে, ডালপালা ছড়াতে পারে না, আর উপরে খোলা জায়গায় পাতার ঝাড় হয়ে যায়। মাইলের পর মাইল এই তরুশ্রেণীকে এভাবে সজ্জিত করা কম শ্রমের ব্যাপার নয়। এটা সৌন্দর্যের জন্যই করা হয়েছে।

নানকিং ছাড়ার আগের দিন রাত্রে আমরা একটি সিনেমা দেখলাম। সেটা তাচিং তৈলখনির প্রায় ডকুমেন্টারী। একটা গল্প তৈরি হয়েছে বটে, তবে সেটা সত্য গল্প। ঐ বিরাট কর্মযজ্ঞের নায়ক একজন সাধারণ মানুষ। আমাদের ওরা বললে যে, এই ছবিটি 'গ্যাং অব ফোর'রা এতদিন দেখাতে দেয়নি। এরকম আরো অনেক ছবি বন্ধ করে রেখেছিল। এখন তারা নিজেরা বন্ধ হওয়ায় এই ছবি প্রথম দেখানো হলো। চীনা বন্ধুরাও আমাদের সঙ্গে প্রথম দেখল। এই ছবিতে এত বিপুল কর্মোদ্যম দেখানো হয়েছে যে, এটা বন্ধ করবার কি উদ্দেশ্য, আমি বুঝতে পারলাম না। আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু অন্য দেশের রাজনীতির ঘোর-প্যাঁচ টেকনিক্যাল পরিভাষা জানা না থাকায় আমি ভালোমত বুঝতে পারিনি। তাই সে সম্বন্ধে লেখবার চেষ্টা করব না। এই তৈলখনির খননকার্য শুরু করে তেল নেই বলে রুশরা চলে গিয়েছিল। বিস্তীর্ণ মরুকের মরুর মধ্যে সেই খননকার্যের দুরূহতা দেখতে দেখতে শুনছিলাম—মাও-সে-তুং-এর জন্যই এ কার্য সফল হয়েছে। কেন? তাঁকে তো তৈলখনিতে দেখা যাচ্ছে না? তিনি দিয়েছেন চিন্তা—তিনি দেখিয়েছেন ঠিক পথ। তিনি বলেছেন, কর্মী কর্ম করবে না। যেমন—কঠিন শ্রমকে বা মৃত্যুকে ভয় করবে না, যশ বা অর্থ চাইবে না, কাজ করবার সুযোগসুবিধা কতটা আছে তার বিচার করবে না, কাজের ঘণ্টা মাপবে না। মাইনা বা পদ উচ্চ কি নীচ তার বিচার করবে না। আর নির্দেশ-মত কাজ করছ বা স্বেচ্ছানির্দিষ্ট কাজ করছ তাও ভাববে না। এও ভাববে না যে, সামনে কাজ বা পিছনে বিশ্রাম। তিনটি সততা প্রয়োজন—চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে। কাজের মান ঠিক রাখা, সংগঠন, মনের ভাব স্থির রাখা ও শৃঙ্খলা—এগুলো কঠিনভাবে পালন করতে হবে। প্রধান চারটি একভাব—অর্থাৎ দিনের শিফ্‌ট ও রাতের শিফ্‌টে কাজ যেন গুণগতভাবে এক থাকে; কাজ খারাপ আবহাওয়া ও ভালো আবহাওয়ায় এক থাকে; পরিদর্শক উপস্থিত থাক বা না থাক, কাজের হিসাব দিতে হোক বা না হোক—কাজ যেন একইভাবে চলে। তাচিং-এর ছবিটা দেখে মনে হল, অতি দ্রুত তেল তোলা সম্ভব হয়েছে মাও-সে-তুং-এর এই নির্দেশ-গুলো পালিত হয়েছে বলেই। নির্দেশগুলি সহজ, সরল ও স্পষ্ট। অর্ধ-নারীশ্বরের মূর্তিও দেখা গেল ঐ ছবিতে। পুরুষেরা যখন দিবা-রাত্র পরিশ্রম করছে মেয়েরা তখন পরিত্যক্ত জমিতে ফসল ফলানোর কাজ করছে। অনাবাদী জমিকে সবুজ করে তুলেছে খালো। সিনেমাটা খুব সুন্দর, কিন্তু একটিও প্রণয়-দৃশ্য নেই। আমার প্রায় ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে এসেছে যে, চীনারা প্রেমে পড়ে না। ভাবলুম কথাটা সু-কে জিজ্ঞাসা করি। তা না করে বললাম, 'সু, তোমাদের দেশে আমি একজন তালি দেওয়া জামা পরা লোক দেখেছি।' সু অবাক হয়ে

তাচিং অয়েল ফিল্ড সম্পর্কে যে চলচ্চিত্রের প্রদর্শন চিয়াং চিং বন্ধ করে দিয়েছিলেন তারই একটি দৃশ্য

সাংহাইতে পৌঁছলাম ২০ তারিখে। আমরা ক্রমেই দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি। সাংহাই ইনডাস্ট্রিয়াল শহর। এই শহরের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ রেভলিউশনারী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান আমাদের কাছে 'গ্যাং অব ফোর'-এর বিষয়ে একটি বিস্তৃত বক্তৃতা দিলেন। তাঁর সামান্য দু-একটি কথা এখানে লিখছি। ফিরে আসার পর আমার কাছে এ-দেশে এ বিষয়ে অনেকে অনেক প্রশ্ন করেছেন। অনেকের ধারণা, ওঁদের মেরে ফেলা হয়েছে। এটা সত্য নয়। তাঁরা বন্দী অবস্থায় যথাস্থানেই আছেন। আগেই লিখেছি, এখানে তার পুনরুল্লেখ করছি, এঁরা সচরাচর মেরে ফেলেন না। লিউ শাও চি-র বিরুদ্ধে এত ঘটনা ঘটল—তাঁকেও বধ করা হয়নি। লিউ জেন চিং (?) প্রথম যুগের মাও-সে-তুং-এর সহকর্মী। তিনি ট্রটস্কি-ভক্ত। তিনিও পিকিং-এ বহাল তবিয়তে আছেন। এসব শুনে আমি ভাবছি—আমাদের দেশের ছেলেরা চীনের নাম করে এত খুনখারাপি করলাই বা কেন, আর ওরাই বা তার তারিফ করছিল কেন? এ প্রশ্ন করেছিলাম—যথাস্থানে তা লিখব। এখন চিয়াং চিং-এর কথা যা শুনলাম তা বলছি। ওরা যখন চার সঙ্গীর নিন্দা করে তখন মাদাম মাও-সে-তুং-এর কথাই বেশী বলে। তার থেকে মনে হয় শুধু মতবাদের পার্থক্য ছাড়াও জনসাধারণের তাঁর সম্বন্ধে কোনো আক্রোশ আছে। ভাইস চেয়ারম্যান বলে চলেছেন—তিনি বললেন, ডাইনেস্টি বদল কর! তিনি নিজে সম্রাজ্ঞী হতে চান—নিষিদ্ধ নগরীর প্যালেসে সাজসজ্জা করে সিংহাসনে বসে দেখেছিলেন দেখায় কেমন। তাঁকে সিডান চেয়ারে (পালকি) করে বয়ে নিতে হত। তিনি সমুদ্রস্নানে যাবেন, সৈন্যরা সমুদ্রের মধ্যে একটা স্থান ঘিরে পাহারা দেবে—যাতে হাঙ্গর না আসে! স্বামী মৃত্যুশয্যায়, তাঁর সাজসজ্জাই শেষ হয় না।' আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই চার সঙ্গীর কোন্ কাজ ক্ষতিকর হয়েছিল?' উত্তরে তিনি বললেন, 'এরা দেশের মধ্যে একটা ভাগ করে দেবার চেষ্টা করছিল। আর্মিতে কেন্দ্রে সর্বত্র বিচ্ছেদ সৃষ্টি করছিল। ওরা বলছিল, অতীতের ভ্রম থেকে ভবিষ্যতে শিক্ষা নিতে হবে। কথাটা শুনতে ভালো, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে বিদ্বেষের বীজ রোপণ করা হয়। ওরা ঝগড়া লাগিয়ে তুলেছিল। মাও-সে-তুং বলেছিলেন, শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে তেমন কোনো contradiction নেই; কাজেই যা কিছু মতবিরোধ আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে মিটিয়ে নিতে হবে। কখনো মারামারি করবে না। কিন্তু ওরা চাতুরী করে বললে, ঠিক আক্রমণ করার সময় মারব না; কিন্তু আত্মরক্ষার সময় সশস্ত্র যুদ্ধ চাই। এইভাবে তারা একটা গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে তুলছিল। ওরা কেবল-মাত্র শ্রেণী-সংগ্রামের কথা বলত, উৎপাদন বাড়ানো বা বিজ্ঞানের উন্নতির কথা একেবারেই বলত না। একটি মিটিং-এ লোকটি বলেছে যে, যদি এক কণাও শস্য না থাকে তাতে ক্ষতি নেই, সংগ্রাম থাকলেই হল। ওরা শাসনের সুব্যবস্থা নষ্ট করতে চাইছিল। তাই কেরানীরা কাজ করত না, কোনো কাজ সময়ে হত না—এমনকি, ট্রেনও সময়ে চলত না। তখন তারা একটা ধুয়ো তুলেছিল—"রিভিসনিজম"-এর ট্রেন সময়ে আসার চেয়ে 'রেভলিউশনারি' ট্রেন দেরিতে আসাও ভালো! ইচ্ছামত বড় চাকরি দিত দল পাকাবার জন্য। ওদের প্রধান নির্ভর ছিল হুজুগে ছেলের দল। ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটর হয়ে ওঠার লক্ষণ দেখা দিচ্ছিল। ওদের পিছনে জনসমর্থন ছিল না। মাও-সে-তুং বলেছিলেন, ওদের দুটো ফ্যাক্টরী আছে —একটা স্টীলের, একটা টুপির।' স্টীল বলতে বোঝায় জবরদস্তি; ক্যাপ বলতে বোঝায় ছাপ, বিশেষ করে কোনো দলের ছাপ। চীনেরা খুব উপমা দিয়ে কথা বলে, তাই সংক্ষেপে ও ব্যঞ্জনায় অনেক কথা বলা হয়।

এসব শুনে আমি লী-কে বললাম, 'যাই হোক, মাদাম মাও-সে-তুং খুব সুন্দরী।'

সে তো আঁতকে উঠল, 'তুমি দেখেছ নাকি?'

'তোমরা আর দেখাচ্ছ কোথায়? ছবি দেখেছি।'

'কোথায় ছবি দেখলে?'

'আমাদের দেশের কাগজে।'

'অ্যাঁ, তোমাদের কাগজে মাদামের ছবিও বেরিয়েছে?'

বাংলা থিয়েটার ও সরকারী দায়িত্ব

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

বাঙালীদের থিয়েটার নিয়ে খুব গর্ব। এই হুঙ্কার অবশ্য সেই ব্যবসায়িক থিয়েটার নিয়ে নয় কে, কেন জানি না, বলা হয়ে থাকে 'পাবলিক' থিয়েটার। বাঙালীরা জাঁক করে সেই থিয়েটার নিয়ে যেটি বেড়ে উঠেছে ব্যবসায়িক পরিধির বাইরে। এই 'অন্য' থিয়েটারে অভিনীত হয়েছে 'রক্তকরবী', 'রাজা', 'চার অধ্যায়', 'ডাকঘর', 'নীলদর্পণ', 'নবান্ন', 'ছেঁড়াতার', 'অঙ্গার', 'কল্লোল' 'নবী গর্জন', 'মানুষের অধিকারে', 'এবং ইন্দ্রজিত', '...ক ভাঙা মধু', 'মুদ্রারাক্ষস', 'মৃচ্ছকটিক' '...রাজা অয়দিপাউস', 'আন্তিগোনে' 'হ্যামলেট', 'ওথেলো', 'ম্যাকবেথ', 'দশচক্র' 'পুতুল খেলা', 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী', নীচের মহল', 'জনৈকের মৃত্যু', 'শেষ সংবাদ', ওয়েটিং ফর গডো', 'তিন পয়সার পালা', 'ভালো মানুষ' ইত্যাদি নাটক; এই 'অন্য' থিয়েটারে নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনেতা-নাট্যকুশলী হিসেবে কাজ করেছেন বা করছেন ...নারঞ্জন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, গঙ্গা-... বসু, তুলসী লাহিড়ী, উৎপল দত্ত, বীরেশ ...খার্জী, জ্ঞানেশ মুখার্জী, অমর গাঙ্গুলী, কুমার ...র, সবিতাব্রত দত্ত, সজল রায়চৌধুরী, ঋত্বিক ঘটক, ...জিতেশ ব্যানার্জী, সত্য ব্যানার্জী, রবি ঘোষ, উমানাথ ভট্টাচার্য, বিভাস চক্রবর্তী, অশোক মুখার্জী, শেখর চ্যাটার্জী, অরুণ মুখার্জী, বাদল সরকার, মোহিত চ্যাটার্জী, মনোজ মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেন, রেবা রায়চৌধুরী, কেয়া চক্রবর্তী, নির্বেদিতা দাস, মায়া ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, তাপস সেন, খালেদ চৌধুরী প্রমুখ শিল্পীরা।

এই জীবননিষ্ঠ শিল্পমনস্ক 'অন্য' থিয়েটারের শুরু চল্লিশের মধ্যভাগে। বছর বিশেকের মধ্যে এই প্রায় ছেলেমানুষ থিয়েটার জনমানসে এমন শেকড় গেড়ে বসেছিল যে প্রায় একশো বছরের বুড়ো ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চ কিছুতেই এর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছিল না। ষাটের দশকে ব্যবসায়ী থিয়েটারের সে এক অতীব হতশ্রী অবস্থা; মাত্র তিনটি মঞ্চে—বিশ্বরূপা, স্টার আর রঙমহলে—নাটক চলছিল টিমটিমিয়ে। আর এরই পাশাপাশি বহুরূপী, এল টি জি, ক্যালকাটা থিয়েটার, শৌভনিক, মাস থিয়েটার, অনুশীলন সম্প্রদায়, চলাচল, নান্দীকার, থিয়েটার ইউনিট, চতুর্মুখ এবং আরও অজস্র দল কি দাপাদাপি কাণ্ডটাই না করছিল! অথচ কোন হিরণ্ময় পৃষ্ঠপোষণ ছিল না এদের জন্যে ও ছিল না চোরাপথে বিদেশী টাকার আমদানি। কুড়ি বছরের কংগ্রেসী শাসনও এদের জন্যে প্রায় কিছুই করেনি। বিধানবাবুর সরকার কর হ্রাসের একটা ব্যবস্থা করেছিলেন; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নাট্যবিভাগ খুলিয়েছিলেন; আর জাতীয় নাট্যশালার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছিলেন অনেক দিন ধরে। এর বেশী কিছু করা হয়তো একটি শিশু রাষ্ট্রের একটি সমস্যাজর্জরিত রাজ্য সরকারের পক্ষে সত্যিই সম্ভব ছিল না। এই সরকারী অসহযোগ বা অমনোযোগ সত্ত্বেও 'অন্য' থিয়েটারের কর্মীরা কাজ করেই যাচ্ছিলেন, শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের উৎসাহ আর নিজেদের পাগলামো সম্বল করে এঁরা আসর কাঁপাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় ১৯৬৭ সালে বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলেন। 'অন্য' থিয়েটারের কর্মীরা এই সরকারকে আপন মনে করেছিলেন; নতুন সরকারের কাছে এঁদের কিছু প্রত্যাশা ছিল। এতদিন এঁরা দেশকে অনেক কিছু দিয়েছেন এবং নিঃস্বার্থভাবেই দিয়েছেন। কাজেই ... ... সরকারের কাছে সহযোগিতা চাওয়ার

যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় প্রথমেই ঘোষণা করেন যে নতুন সরকার থিয়েটারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। একটা ভালো কাজ এই সরকার করেছিলেন। শুরুতেই ১৮৭৬ সালের কুখ্যাত নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল করে দেওয়া হল। কিন্তু হল না অনেক কিছুই। রবীন্দ্রসদন জাতীয় নাট্যশালার রূপ পাক—এই দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। নতুন সরকারের কাছেও এই দাবি জানাবার অধিকার ছিল নাট্যকর্মীদের। কারণ এঁদের অনেকেই যে এই দাবি জানাতে গিয়ে আগের ২৫শে বৈশাখ সকালে রবীন্দ্র সদনের সামনে পুলিশী লাঠির মৃদু আঘাত স্বীকার করেছিলেন। যাই হোক, নতুন সরকার পুরোনো কমিটি বাতিল করলেন: শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্তের মতো নাট্যদিকপালদের বাদ দিয়ে যে নতুন কমিটি তৈরি হল সেটি বিশেষ কিছু করল না বা করতে পারল না। ২৫শে বৈশাখের অনুষ্ঠান নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য এমন কাণ্ড করলেন যে শিল্পীদের মধ্যে অহেতুক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হল। আর এক আলাডঙ্গা হল বাংলা নাটমঞ্চ

প্রতিষ্ঠা সমিতির ব্যাপারে। নিজস্ব উদ্যোগে প্রায় দু' লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে সমিতি কলকাতা পৌরসভার কাছে একখণ্ড জমির জন্য আবেদন করেছিল। সমিতির আবেদনপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন বিষ্ণু দে, উদয়শঙ্কর, আলি আকবর খাঁ, রবিশঙ্কর, সত্যজিৎ রায়, শম্ভু মিত্র, প্রমোদ দাশগুপ্ত, বিজন ভট্টাচার্য, বাদল সরকার, মৃণাল সেন, খালেদ চৌধুরী, সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস এবং আরও অনেক গুণী শিল্পী। কথাবার্তা সব প্রায় পাকাপাকি, চূড়ান্ত আলোচনা সভায় অভাবিত ভাগীদারদের ভীড়ে সমিতির আবেদন চাপা পড়ে গেল। সত্যি কথা বলতে গেলে এমনি নানা ঘটনার ফলে নাট্য-কর্মীদের মনে হয়েছিল এই সরকার থিয়েটার সম্পর্কে উদাসীন এবং নিষ্ক্রিয়। আজ এক দশকের দূরত্ব থেকে দেখলে সেদিনের সরকারের নিষ্ক্রিয়তার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়: ভিতর-বাহিরের নানা চাপে ওঁদের কাজ করতে হয়েছিল এক অস্থির পরিবেশের মধ্যে।

বারবার সরকার বদল, রাষ্ট্রপতির শাসন এবং নানান রাজনৈতিক টাল-মাটালের পর '৭২ সালে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল কংগ্রেস সরকার। নতুন পর্যায়ে কংগ্রেস সরকার থিয়েটারের প্রতি প্রায় কোন দায়িত্ব পালন করেননি, উপরন্তু ক্ষতি করেছেন বিস্তর।

রবীন্দ্রসদন: নতুন সরকার এখানে জাতীয় নাট্যশালা বা স্টেট থিয়েটার গড়ে তোলার কোন উদ্যোগ নিলেন না। বরং ধীরে ধীরে এটি হয়ে উঠল অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটি ভাড়াটে থিয়েটার-বাড়ি (প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্রের সরকারী রবীন্দ্র নাট্যমন্দিরের ভাড়া ৪৫০.০০ টাকা অথচ আমাদের

আরও গোলমাল হল কিছু পরিকল্পনাহীন রবীন্দ্রপুজো বা নাট্যোৎসব জাতীয় বাৎসরিক অনুষ্ঠান শুরু করাতে। জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটল যখন বা অনেক কাজ হচ্ছে রবীন্দ্র সদনকে কেন্দ্র করে।

বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি: সিদ্ধার্থবাবু ক্ষমতাসীন হয়ে প্রায় যেচে নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতিকে জমির আশ্বাস দিলেন। এই প্রতিশ্রুত আশ্বাসের মধ্যে পূর্বসূরীদের নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত আবিষ্কারের চেষ্টা সেদিন করা হয়নি। সে যা হোক ৪ বছর ধরে বারবার আবেদন-নিবেদন-প্রতিবেদন সত্ত্বেও জমি কিন্তু উদ্ধার হল না। উপরন্তু '৭৬-এর জুন মাসে রাজভবনে প্রধানমন্ত্রীর সামনে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে মুখ্যমন্ত্রী বললেন: "দিতে তো চাই...কিন্তু কাকে জমি দেব? এই তো শোভাও জমি চাইছে।" সেই '৬৯ সালের মতই ভাগীদারদের ভীড়কে, সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করা! সেই অসহায়ত্বের অজুহাতে দলগুলিকে পরস্পরের মধ্যে লড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা!
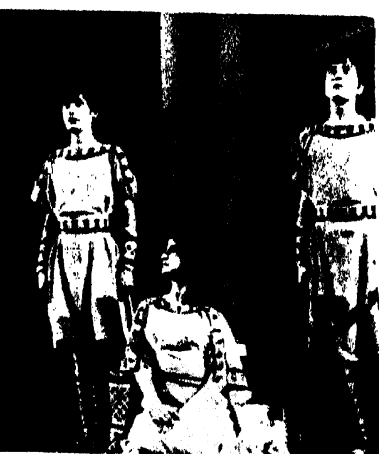
নাট্য নিয়ন্ত্রণ: কংগ্রেস সরকার ১৮৭৬-এর নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন পুনঃপ্রবর্তন করলেন না বটে কিন্তু নানান কায়দায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 'অন্য' থিয়েটারের কণ্ঠরোধ করার কাজে সচেষ্ট হলেন। প্রসঙ্গত, কার্জন পার্কে নাটক বন্ধ করে দেওয়া, প্রবীর দত্তকে হত্যা করা, কমপক্ষে ত্রিশ-জন নাট্য-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা, বিভিন্ন নাট্য-কর্মীকে থানায় নিয়ে অত্যাচার করা, কিছু কংগ্রেস কর্মীর 'লাশ বিপণী', 'দুঃস্বপ্নের নগরী' ইত্যাদি নাটক বন্ধ করে দেওয়ার সময় উদাসীন থাকা ইত্যাদির ঘটনার কথা সকলেরই জানা আছে। অবশ্য ঘটনার চেয়ে রটনা সবসময় বেশী হয়। এমনও হয়েছে, কোন দল নিছক সাংগঠনিক কারণে নাটক বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন অথচ প্রগতিবাদী সাজার লোভে দেখাতে চেয়েছেন যেন কংগ্রেসী অত্যাচারেই নাটক বন্ধ করতে হল। এসব ঘটনা অবশ্য ব্যতিক্রম। একটা ভয়ের আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়েছিল নাট্যজগতে এ সত্য অতিবড় গোঁড়া কংগ্রেসীও অপ্রমাণ করতে পারবেন না।

রঙ্গনা কর্তৃপক্ষ বনাম নান্দীকার: পাঁচ বছর ধরে রঙ্গনায় অভিনয় করার পর রঙ্গনা কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে নান্দীকারকে তাড়ানোর চেষ্টা করলে কলকাতার তাবৎ শিল্পীরা সরকারকে মধ্যস্থতায় অনুরোধ জানান। এ ব্যাপারে কিছু সরকারী আমলা বা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী, সৌগত রায় প্রমুখ কিছু কংগ্রেসকর্মী যে সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী বা তথ্যমন্ত্রীর কাজে (কাজে, কথায় নয়) তার ছিটে-ফোঁটাও দেখা যায় নি। নান্দীকারকে শেষপর্যন্ত চলে যেতে হল, সুব্রতবাবু তার পরের দিন রঙ্গনা কর্তৃপক্ষের নাটক

মঞ্চের আদলে নান্দীকারকে দিয়েছিলেন ওঁরা। কিন্তু এক বছরের মধ্যে সেই আদলে ফাইল-বন্দীই থেকে যায়।

পৌরসভার ভূমিকা : সব দেশে পৌর কর্তৃপক্ষ থিয়েটারকে নানাভাবে নিয়মিত সহায়তা করে থাকে। আমাদের পশ্চিম বাংলায় প্রমোদ ভূমিকা গৃহীতার। সুব্রতবাবুর আমলে এই চরিত্র অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেল। আগে অন্য থিয়েটারের দলগুলিকে অভিনয় প্রতি এক টাকা ট্যাক্স দিতে হত। ১৯৭৫-এর ১লা এপ্রিল নিয়ম চালু হল অব্যবসায়িক অপেশাদারী দলগুলিকে ৫০ থেকে ২০০ টাকা করে কর দিতে হবে। ৪০০ আসনসম্বলিত মঞ্চে অভিনয় প্রতি ৫০.০০ টাকা, ১০০০ আসন পর্যন্ত ১০০.০০ টাকা এবং তার বেশী আসনবিশিষ্ট মঞ্চের জন্য ২০০.০০ টাকা। মজার কথা ব্যবসায়িক প্রযোজনার ওপর কর কিন্তু প্রায় কিছুই বাড়ল না। একটা উদাহরণ দিই। নান্দীকার এই সময় রঙ্গনায় সপ্তাহে গড়ে পাঁচটি অভিনয়ের জন্য এক বছরে পৌরকর দিয়েছে প্রায় ২৬ হাজার টাকা, বহুরূপী অ্যাকাডেমিতে সপ্তাহে দুটি অভিনয়ের জন্য এক বছরে দিয়েছে ১০ হাজার ৬শ টাকা, কিন্তু বিশ্বরূপা বা রঙ্গনা তাদের ব্যবসায়িক প্রযোজনার জন্য বছরে কর দিয়েছে মাত্র আটশো টাকা। পরে এটি বাড়িয়ে বোলশো টাকা করা হয়। বিদায় নেবার আগে অবশ্য কংগ্রেসী সরকার অব্যবসায়িক প্রযোজনার ওপরে করের বোঝা কমিয়ে পাঁচ টাকায় নামিয়ে দেন। জানি না নতুন সরকার এই নির্দেশ অপরিবর্তিত রাখবেন কিনা।

রাজভবনের সভা : ১৯৭৬-এর জুন মাসে মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণে কলকাতার কিছু থিয়েটার কর্মী রাজভবনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। আলোচ্য বিষয় স্বভাবতই থিয়েটার এবং স্বভাবতই কিছু শিল্পী থিয়েটারের ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেন। যাঁরা এদিন প্রধানমন্ত্রী প্রশস্তিতে ব্যস্ত ছিলেন তাঁরা রাজভবনের চা খেয়েই রেহাই পেলেন। কিন্তু যাঁরা থিয়েটার নিয়ে সংভাবে আলোচনার চেষ্টা করেন তাঁদের নিগ্রহ শুরু হয় পরের দিন থেকেই। শ্রীমতী শোভা সেনের বাড়ি গিয়ে পুলিস জিজ্ঞাসাবাদ করে। একজন এস বাগচী নামে পুলিস অফিসার বর্তমান লেখকের কাছে তিন দিন যান এবং জানবার চেষ্টা করেন যে আলোচনাচক্রের আগে শিল্পীদের মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র-বৈঠক বসেছিল কিনা। শুনেছি শ্রীশম্ভু মিত্রও পুলিসী নজরদারি থেকে রেহাই পান নি। ধন্য আতিথেয়তা। ধন্য থিয়েটার-প্রেম!

বছর ঘুরে গেছে। সে সরকার বিদায় হয়েছে এসেছে নতুন সরকার। আজও 'অন্য' থিয়েটার সরকারের কাছ থেকে কিছু আশা করে, আগের চেয়ে অনেক বেশী করে কেননা থিয়েটারের অবস্থা আগের চেয়ে অনেক অনেক খারাপ হয়েছে। 'অন্য' থিয়েটারের মেরুদণ্ড ভগ্নপ্রায়। অনেক দল উঠে গিয়েছে। বেশ কিছু দলের এখন হাফ্-হলিডে। সবিতাব্রত দত্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ প্রমুখ নির্দেশকরা এখন নিয়মিত পেশাদারী মঞ্চের অভিনেতা নয়তো বা কাণ্ডারী। শ্যামল ঘোষ, অসিত বসু এবং বীর সেন নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভুলে যাত্রায় নেমেছেন। অমর গাঙ্গুলী আমেদাবাদে সঙ অ্যাণ্ড ড্রামা ডিভিসনে গুজরাতি ভাষায় পরিবার-পরিকল্পনার নাটক করছেন। বিভাস চক্রবর্তী কলকাতা দূরদর্শনের কাজে ব্যস্ত। অসীম চক্রবর্তী রাসিয়ারের বিজ্ঞাপন দেখিয়ে বারবধূকে একশো-রেকর্ডের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। খালেদ চৌধুরী কার্যত অবসর নিয়েছেন থিয়েটার থেকে। রক্তকরবীর আলোকশিল্পী এবং এল. টি. জি-র একদা সভাপতি তাপস সেন বর্তমানে ব্যবসায়িক থিয়েটারের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। একদা মার্কসবাদী জ্ঞানেশ মুখার্জী এখন যাত্রায় 'সন্তোষী মা' এবং চলচ্চিত্রে 'অচেনা অতিথির' নির্দেশক। 'কল্লোলের' শার্দুল সিং শেখর চট্টোপাধ্যায় কিছুকাল যাবৎ ম্যাক্সমুলার ভবনের সহযোগী হয়েছেন। নান্দীকার এখন আর সপ্তাহে পাঁচবার অভিনয় করে না, করে মাত্র একবার। 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী'র অনন্য 'লালমোহন' অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এখন চলচ্চিত্রের আধবুড়ো বাপ নয়ত প্রবাসিন্দ খলনায়ক। উৎপলবাবুর মিনার্ভায় এখন আর 'কল্লোল', 'অঙ্গার' হয় না, অভিনীত হয় 'ব্যারিচার'-'যৌবন'-'ছেনাল'; যাত্রা এবং হিন্দি-বাংলা সিনেমায় কাজের পরে বাড়তি সময়টুকুতে উৎপলবাবু থিয়েটার করেন। তৃপ্তি মিত্র আকাশবাণীর এমেরিটাস প্রডিউসরের চাকরি নিয়েছেন। শম্ভু মিত্র বর্তমানে বিশ্বভারতীর ভিজিটিং প্রফেসর।* অপরদিকে উঠতি এবং পড়তি চলচ্চিত্র অভিনেতা, ক্যাবারে নর্তকী, 'অন্য' থিয়েটারের রেনিগেড, খর্বকথা আর পচে যাওয়া মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ সম্বল করে ব্যবসায়িক মঞ্চ ফুলে ফেঁপে উঠছে দিন দিন। ও'দের ক্যাশবাক্সের অবস্থা এখন হুহুল-বহুল। বাঙালীর গর্ব বাংলা থিয়েটারের গভীর গভীর অসুখ আজ। জানি এই অধঃপতনের দায় আগের সরকারের মোটেই নয়। এও জানি বর্তমান সরকারও কিছু আলাদীনের প্রদীপ ঘষে সব বদলে দিতে পারবেন না। তবুও একথা তো সত্যি যে এখনো অনেকে আছেন যাঁরা মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে চান বাংলা থিয়েটারের জন্য; যাঁরা অবস্থার পরিবর্তন দেখলে আবার ভরসা পাবেন, পুনরায় জ্বলে উঠবেন আগের দীপ্তিতে। এ'দের প্রতি নতুন সরকারের দায় আছে, নতুন সরকারের কাছে এ'রা অনেক কিছু আশা করেন। নিঃসন্দেহে থিয়েটার কর্মীরা জানেন নতুন সরকারকে অনেক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হবে। কাজেই এমন কিছুই এ'রা চাইবেন না, চাইতে পারেন না যা অবাস্তব। খুব বেশী বৈপ্লবিক

ভালোমানুষ
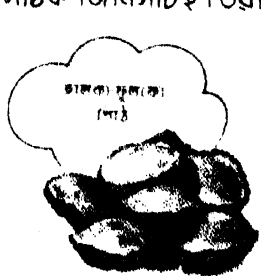
ঝুকি না নিয়েও, ঘাটতি-বাজেটের কথা স্মরণ রেখেও নতুন সরকার থিয়েটারের জন্য নিশ্চই কিছু কিছু কাজ করতে পারেন। যথা :

রবীন্দ্র সদন : আমাদের মতো গরীব দেশে কোন সরকারী নাট্যশালার ভাড়া ১১০০.০০ টাকা ধার্য করা পাপ। অবিলম্বে ভাড়ার অর্ধেক সত্য সম্ভব কমানো যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, সরকারী রংগ-শালার ব্যবহার যে-সে করে যাবে এটা ঠিক নয়। যোগ্যতা এবং প্রয়োজন বিচার করে রবীন্দ্রসদন ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত। সদনের পূর্বদিকে অনেকটা জমি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ওখানে খুব অল্প খরচে একটি ৪০০।৫০০ আসন বিশিষ্ট মুক্ত অংগন তৈরি করলে থিয়েটারের যথেষ্ট উপকার হতে পারে। এরই সংগে সংগে সময় নিয়ে যথেষ্ট পরিকল্পনা করে উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে এই মঞ্চে জাতীয় নাট্যশালা গড়ে তোলার। এ-কাজে পশ্চিমবাংলারই সারা ভারতের পথিকৃৎ হবার দায়িত্ব এবং যোগ্যতা আছে।

নতুন মঞ্চ : বর্তমানে অ্যাকাডেমি অভ্ ফাইন আর্টস ছাড়া অন্য সবগুলি মঞ্চে থিয়েটার করা দুরূহ, হয়ে পড়েছে। কলামন্দিরের ভাড়া ১২০০.০০, রবীন্দ্রসদনের ১১০০.০০, স্টার থিয়েটারের ১৪০০.০০, অন্যান্য থিয়েটারের ভাড়াও তথৈবচ। এছাড়া, ব্যবসায়িক থিয়েটারগুলোতে নাটক করার আরও অনেক অসুবিধা আছে : সব যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় না, ভালো ব্যবহার পাওয়া যায় না, মালপত্র রাখার জায়গা পাওয়া যায় না, রবি, শনি ছুটির দিন অর্থাৎ ভালো ভালো দিনগুলোও পাওয়া যায় না।

এই অবস্থায় সরকার শহরের চারকোণে দশ-বারো কাঠার চার টুকরো জমি জোগাড় করে দিলে সেখানে সরকার এবং নাট্যগোষ্ঠীগুলির যৌথ উদ্যোগে ব্যবহারযোগ্য মঞ্চ তৈরী করা খুব শক্ত কাজ নাও হতে পারে। এছাড়া বহুরূপী, পি এল টি, নান্দীকার প্রমুখ কয়েকটি দলকেও জমি দেওয়ার কথা ভাবা যেতে পারে। এঁদের কোমরে এখনও কিছুটা জোর আছে মনে হয়। প্রসঙ্গত বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির হাতে আড়াই লাখ টাকা আছে, ওঁদের জনবলও আছে কিছু, ওঁরাও এক খন্ড জমি পেলে মঞ্চ তৈরী করে ফেলতে পারবেন। সর্বোপরি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টেনারি বিল্ডিং-এ একটি বিশাল মঞ্চ আছে, আর আছে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে। এই মঞ্চগুলি বিশেষ ব্যবহৃত হয় না। এই জায়গাগুলোর আংশিক ব্যবহারও কি সম্ভব নয়? এরই সংগে সংগে কলকাতার বাইরে বিভিন্ন জেলার রবীন্দ্র ভবনগুলির যথাযোগ্য ব্যবহার নিয়ে ভাবনার অবকাশ আছে। মফস্বলেও থিয়েটার সম্পর্কে উৎসাহ খুব কম নয়।

আর্থিক অনুদান : কেন্দ্রীয় সরকার সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন দলকে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করে থাকেন। রাজ্য সরকারও কিছু যোগ্য দলকে অর্থ-সাহায্যের কথা ভাবতে পারেন। বেশ কয়েকটি গোষ্ঠী আছে যারা সামান্য অর্থসাহায্য পেলেই অনেক সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

নাট্য প্রতিযোগিতা ও নাট্যোৎসব : গত বছর সরকারী উদ্যোগে একটি প্রতিযোগিতা হয়েছিল। কিন্তু নামী দলগুলি অধিকাংশই এতে অংশ গ্রহণ করেননি, সম্ভবত এঁরা জানতেনই না যে এরকম একটা প্রতিযোগিতা হচ্ছে। নতুন সরকারের কাজ হবে প্রতি-যোগিতাটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা এবং যথাযথ মর্যাদা দেওয়া। এরই সংগে সংগে বাৎসরিক নাট্যোৎ-সবেরও ব্যবস্থা করা যায়। রবীন্দ্র সদন কর্তৃপক্ষ নাট্যোৎসব করে থাকেন। কিন্তু সেটির চেহারাও খুব অদ্ভুত; উৎসবটিকে প্রতিনিধিত্বমূলক করে তোলার বিশেষ চেষ্টা এ যাবৎ চোখে পড়েনি।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় : গত এক দশকের ওপর এখানে একটি নাট্যবিভাগ আছে। কিন্তু এটি নিয়ে ছাত্রশিক্ষক কর্তৃপক্ষ কেউই বিশেষ খুশী নন। এটিকে কি করে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা যায়, বাংলা নাট্য আন্দোলনের সংগে যুক্ত করা যায় সে বিষয়েও ভাববার সময় এসেছে।

বিজ্ঞাপন : বর্তমানে যে কোন দল একটি অভিনয়ের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ করে কমবেশী হাজার টাকা। মানে, পারলে করে কেননা এর কম বিজ্ঞাপনে যথেষ্ট লোককে জানানো সম্ভব নয়। এতো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার কোন গ্রুপ থিয়েটারের পক্ষে। সরকার এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে পারেন। শহরের দশটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বড় হোর্ডিং-এর ব্যবস্থা করে শুধুমাত্র অব্যবসায়িক দল-গুলিকে সস্তায় ভাড়া দেওয়া যায়। অর্থাৎ এই দলগুলির অভিনয় সংবাদ নিয়মিত এই জায়গায় পাওয়া যাবে—এরকম একটা অভ্যাস দর্শকদের মধ্যে চালু করা যেতে পারে খুব কম খরচে।

ব্যবসায়িক থিয়েটার : কলকাতায় মালিকদের থিয়েটারে নাটকের নামে সাধারণত যা চলে তা বন্ধ করা বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামোয় সম্ভব নয় আমরা জানি। কিন্তু ওঁরা প্রমোদকর দেবেন না কেন? ধরা যাক বিশ্বরূপা থিয়েটারের কথা। মাসে ১৬। ১৭ দিন ভাড়া দিয়ে মালিক পান প্রায় ১৫ হাজার টাকা। মাসে আনুমানিক ২০টি শোতে টিকিট বিক্রি থেকে আয় অন্তত ১ লক্ষ টাকা (ন্যূনতম টিকিটের হার এখানে ৪ টাকা, সর্বোচ্চ হার ১৫ টাকা)। এছাড়া চারজন ক্যাবারে নর্তকী নাচেন নিয়-মিত ক্যাবারের ট্যাক্স না দিয়ে। প্রশ্ন করা যায়, কোন ছবির ওপর যদি প্রমোদকর থাকে তাহলে এই বিশাল লাভের প্রমোদ-সম্ভারের ওপরেই বা প্রমোদকর বসবে না কেন? কেন ওঁরা বছরে পৌরকর দেবেন মাত্র ১৬০০ টাকা? সে কি এই জন্যে যে ওঁরা দেশকে বিশ্বাস করাতে পেরেছেন ওঁরাই হচ্ছেন দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্রের একমাত্র উত্তরাধিকারী? নাকি ওঁদের সম্পর্কে শাসকশ্রেণীর পক্ষপাত এই কারণে যে যত বেশী ঐরকম 'পাবলিক' নাটক হবে তত বেশী মানুষ নৈতিকভাবে মরবে এবং পৃথিবীটাকে বদলাবার কথা ভুলে যাবে?

পরিশেষে আবার নতুন সরকারের কাছে আবেদন তাঁরা যেন ভাবেন থিয়েটারের প্রতি তাঁদের কি দায়। অসীম রায়ের 'শব্দের খাঁচায়' উপন্যাসের চরিত্রের মত আমরাও জানি কমিউনিজম এলেই সংগে সংগে সবাই কিছু ফেরাজিনির আইস-ক্রীম খাবার সুযোগ পেতে পারে না। কাজেই আমরা এও জানি বর্তমান পরিস্থিতিতে থিয়েটারের জন্য অনেক কিছু করে ফেলা বামপন্থী সরকারের পক্ষে কঠিন। কিন্তু কিছু তো করা যায়, কিছু তো করা উচিতই!

* বর্তমান লেখকও গত কয়েক বছর ধরে ভেবে চলেছেন থিয়েটারের জন্য চাকরী ছাড়া শহীদপনা হবে কিনা।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার

সুপার ৭৭৭

পয়সা বাঁচান, বেশী সাদা করুন

সুপার ৭৭৭ বার—দুনিয়াতে এর জুড়ি নেই। এটি একটি নতুন ফর্মূলা। এতে রয়েছে বেশী কাপড় অনেক বেশী সাদা করার, অনেক বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা—এমনকি যে জলে সাধারণত একেবারেই ফেনা হয় না, তেমন জলে-ও। সাধারণ বার সাবানের তুলনায় দাম-ও কম।

এখন থেকে ব্যবহার করতে শুরু করুন নতুন ধরণের বার—সুপার ৭৭৭ ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার!

shilpi hpma 6A/73 BEN

সাহিত্য

ভ্লাদীমীর নাবোকফ্

শীতকালের ধবল, নিঃসাড়, কুঁকড়ে যাওয়া পিটার্সবার্গ ছেলেটির পক্ষে হয়ে পড়তো বড় বেশি বন্ধুতাহীন অপরিসর—তার চেনা সব স্বচ্ছ নীল নদী লোপাট করে দিত এক রাতের তুষার ঝড়, তাকে নির্বাসিত হতে হত তার সব চেনা উপত্যকা, অরণ্য, পাহাড়ের ক্রীড়া প্রাঙ্গণ থেকে, আর এমন কি তার জানলার আকাশের দৈনন্দিন চেনা টুকরোটুকু পর্যন্ত হয়ে যেত ক্রমেই একাকার ঝাপসা, অবয়বহীন। ছেলেটির পক্ষে যন্ত্রণাময় ছিল প্রতি বছরের এই দীর্ঘ, নিঃসঙ্গ নির্বাসন, যেহেতু তার বারো বছর বয়েস থেকে তাকে পেয়ে বসেছিল এমন একটি নেশা, তার ছেলেবেলার সব ক্লান্ত ঘুম রঙিন করে দিয়েছিল এমন একটি স্বপ্ন যার নাম প্রজাপতি। পিটার্সবার্গ-এর এমন একটিও প্রজাপতি হয়তো ছিল না যাকে ছেলেটি কখনো না কখনো আলতো করে স্পর্শ করেনি, কিংবা যার ডানার রং আর গড়ন আর ওড়ার ভঙ্গি আর ফুলের ওপর বসে থাকার বিভঙ্গ থেকে সে বুঝে নেবার চেষ্টা করেনি সেটি কোন জাতের প্রজাপতি, কি তার নাম আর কোথায় সে অন্যদের চেয়ে আলাদা। কিন্তু কত স্বল্পায়ু রাশিয়ার গ্রীষ্ম আর বসন্ত, আর কি নিষ্ঠুর আকস্মিকতায় নেমে আসে সেখানকার শীত পৃথিবীর সব রঙ, সব স্বপ্নিল উদ্ভাস একেবারে মুহূর্তে মুছে দিতে! ছেলেটির তখন ইচ্ছে করে তুষারের উড়ন্ত ঘন পর্দা সরিয়ে একবার যদি সে দেখতে পেত পিটার্সবার্গ-এর প্রজাপতিরা এখন খেলা করছে কোন সবুজ রোদ্দুরে প্রোজ্জ্বল সুদূর উপত্যকায়। আর তখুনি, ঘরের কোণে নিঃসঙ্গ সান্ধ্য আগুনে নিজেকে সেঁকে নিতে নিতে সে স্বপ্ন দেখে অন্য এক উষ্ণ, রোদালো, সুন্দরতাময় উপত্যকার যেখানে—সে শুনেছে—আছে পৃথিবীর সব চেয়ে মনোরম আর বৃহৎ প্রজাপতির দল। সেখানে তাদের ডানায় ঠিকরে পড়ে এমন এক সোনালি চিক্কন রোদ পিটার্সবার্গ-এর প্রজাপতিরা যা কখনো দেখলো না।

এই কৈশোর-স্বপ্নের প্রায় তিরিশ বছর পরে ছেলেটি পৌঁছে গিয়েছিল তার স্বপ্নের উপত্যকায় যেখানে প্রজাপতিদের অবিরল প্রান্তর কখনো নির্বাসনের নোটিস ঝোলায় না। আর সেখানে, কলোরেডোর অরণ্য প্রান্তরে প্রজাপতি সন্ধানী সে লিখে ফেলেছিল, কেমন করে সে নিজেও কখনো বোঝেনি, এমন একটি উপন্যাস যার ফলে তার নাম—ভ্লাদীমীর নাবোকফ—ঠিকরে পড়লো আমাদের সযত্নে রক্ষিত মধ্যবিত্ত সব ধ্যান-ধারণা আর সংস্কারের স্পর্শকাতর স্তূপের ওপর। "তুমি—লোলিটা, তুমিই আমার জঘনের আগুন"—'লোলিটা' উপন্যাসের একেবারে শুরুর এই কটি অব্যর্থ সাহসী উচ্চারণ মানুষটির কাছে আশ্চর্যভাবে এসেছিল তার ছাপান্ন বছর বয়সে আমেরিকার কলোরেডো উপত্যকায় তার দুর্বার প্রজাপতিবিলাসকে মুহূর্তে থামিয়ে দিয়ে।

কিন্তু প্রজাপতিরা শেষ পর্যন্ত গভীরভাবে ভ্লাদীমীর নাবোকফ-এর অনুপ্রেরণা। তাঁর জীবনবোধ, তাঁর রোম্যানটিকতা, তাঁর উপন্যাসের কাব্যধর্মিতা, তাঁর রাজনৈতিক ঔদাসীন্য, তাঁর দীপ্যমান চাতুর্যময় গুলি—সব কিছুই যেন প্রজাপতির মতো হালকা বাতাসে উড়ন্ত রঙিন। আর তিনি নিজেও তো আজীবন প্রজাপতিদের সঙ্গে সব কাজের ফাঁকেও সম্পৃক্ত থেকেছেন নানাভাবে—আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে নতুন নতুন প্রজাপতির সন্ধানে উধাও হয়ে গেছেন কতোবার; দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন প্রজাপতিদের প্রসঙ্গে, আর শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছেন এমন এক জাতের প্রজাপতি যাদের খোঁজ পৃথিবী রাখতো না। এ-প্রজাপতির নাম তিনি রেখেছিলেন নাবোকফের ইথার-প্রেয়সী।

আর তিনি নিজেও তো তাঁর ইথার-প্রিয়ার মতো সব তীব্র খোঁচা বাতাস থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে—রাশিয়া ছেড়ে চলে এলেন ইউরোপে, শুধু চলে এলেন না, ভুলে গেলেন পিছনে ফেলে আসা আত্মীয়-বন্ধুদের, এমন কি সলঝেনিৎসিন-এর চিঠির উত্তর পর্যন্ত দিলেন না। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইওরোপ যখন তোলপাড় নাবোকফ-এর প্রজাপতি-মন তাঁকে আরো একবার ভারিত্বহীন আকাশে উড্ডীন হতে বলে—তিনি ১৯৪০-এ চলে এলেন আমেরিকায়।

স্ত্রী ভেরা এবং একটিমাত্র সন্তান দিমিত্রিকে নিয়ে তাঁর সংসার—অথচ প্রজাপতির মতই নাবোকফ শিকড় গভীর হতে দিলেন না কোথাও, এমন কি একটি বাড়ি বা ফ্ল্যাট পর্যন্ত কিনলেন না। সারা জীবনই বাস করলেন হোটেলে, কখনো আমেরিকায়, কখনো সুইজারল্যান্ড-এ, যাতে সংসার করেও সাংসারিকতার ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে না হয়। কিন্তু বিদগ্ধ শিল্পীর মতো বহির্মিয়ান বা উড়ুক্কু উদাসীন ছিলেন এমনও নয়, কেননা তিনি সযত্নে তৈরি করেছিলেন এমন এক বিশাল বিচিত্র নিজস্ব পাঠাগার যার প্রতিটি বিরল সংগ্রহের অর্থমূল্য সম্পর্কে তিনি সর্বদা থাকতেন টনটনে

সচেতন, এবং নিজের পুরোনো গ্রন্থের প্রথম বিলুপ্ত সংস্করণ অনেকগুলি করে পাওয়া গেছে তাঁর গ্রন্থাগারে যা থেকে তাঁর একান্ত পার্থিব-বিবেচনাকে অবজ্ঞা করার কোনো পথ নেই আমাদের।

আরো একদিক থেকে প্রজাপতিদের সঙ্গে নাবোকফ-এর আত্মীয়তা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—যখন একের পর এক প্রবন্ধে বালজাক, আর পাস্তেন্ড, টমাস মান আর ডসটোয়েভস্কি, সার্ত্রে, লরেনস আর কামুর বিরুদ্ধে পাটে-পাটে খুলে যায় তাঁর রঙিন দায়িত্বহীন যুক্তিগুলি। এঁরা সবাই 'ভিটেসটেবল মিডিওক্র্যাটস'—মাত্র এই দুটি শব্দে তিনি নাকোচ করে দিয়েছেন আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্য বলতে আমরা প্রায় যা কিছু বুঝি সব। আর আমেরিকার আতিথ্য গ্রহণ করার ফলে যে তাঁর প্রজাপতি-মন মার্কিন সাহিত্যের প্রতি বেশি দায়িত্বশীল হয়ে উঠেছিল এমনও নয়। তিনি যখন প্রায় দায়িত্বহীনভাবে ফকনারকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন, আমরা তাঁর বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট গদ্যের বদান্যতা স্বীকার করেও মনে মনে তাঁর প্রতি কুঁচকে যাই। আর হেমিংওয়ে সম্পর্কে তিনি যখন বলে বসেন, "আই রেড এ নভেল অফ হিজ ইন নাইনটিন-ফরটি। আই কান্ট কোয়াইট রিমেমবার দা টাইটেল। বুলস? বেলস? বলস?" সেই উক্তির ধৃষ্ট ব্যঞ্জনা আমাদের সহ্য শক্তির কাছে বড় বেশি দাবি হয়ে বসে। আর সব শেষে যখন তিনি টলস্টয় এবং পাস্তারনাক-এর প্রতি কটাক্ষ করে রব-গ্রিয়েট আর বর্হেসকে এঁদের ওপরে স্থান দেন, তখন নাবোকফ-এর দায়িত্বহীনতায় শুধু আমরা বিপুলভাবে বিস্মিত হই না, হাতের কাছে তাঁর যতগুলি উপন্যাস আছে পেড়ে ফেলি এবং পাতার পর পাতা বিক্ষিপ্তভাবে উলটে যাই—এমন কিছু কি পেতে পারি আমরা সেখানে, এমন কোনো সমস্যার সমাধান, কোনো অত্যাশ্চর্য প্রশ্নের উপস্থাপনা, কোনো আশ্চর্য, নিপুণ, জটিল দিমাত্রিক চরিত্রায়ণ, কোনো অপূর্ব উদ্ভাস, অনাবিল উদঘাটন, যার পরিবর্তে আমরা অবহেলায় হারাতে রাজী হব বালজাক, স্তাঁদাল আর সার্ত্রেকে, পৃথিবী থেকে 'আনা কারানিনা' আর 'ডক্টর জিভাগো'কে একেবারে লোপাট করে দিয়েও আমাদের বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করবে? এমন কি নাবোকফ-এর সব চেয়ে বিশ্বব্যাপী দুটি উপন্যাস—লোলিটা আর পেল ফ্যায়ারে-ও কি এতটাই আমরা পাই যার পাশে ইয়োরোপীও এবং মার্কিনী সাহিত্যের প্রধান ধারাটিকে নিছক জোলো মামুলী বলে মনে হতে পারে?

সমালোচক জিওফ্রে ওলফ এক সময়ে নাবোকফ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন: "অসহনীয় ক্লান্তি আমাদের ক্রমাগত অধিকার করে নেয় যখন নাবোকফ-এর একটির পর একটি উপন্যাস পড়তে পড়তে আমরা বুঝতে পারি যে, এমন কিছুই তিনি লিখতে পারেন না যার মধ্যে নেই পোশাকী চাকচিক্য, তাঁর প্রতিটি উপন্যাসের প্রতিটি বাক্যই শীলিত নিটোল, এমন কি একটি শব্দও সেখানে আলগাভাবে ঝুলে থাকে না।" অর্থাৎ নাবোকফ মূলত গদ্যকার বা স্টাইলিস্ট—শুধু যে রুশ, ফরাসি এবং ইংরেজি ভাষায় তাঁর সম্রাটের মতো অধিকার তাই না, উপন্যাসের ভাষাকে তিনি দুমড়ে, মুচড়ে, ভেঙে এমন সব দূরপ্রসারী ব্যঞ্জনার মীড় বার করে এনেছেন যাতে আমরা প্রায় নির্দ্বিধায় তাঁর 'পেল ফ্যায়ার' উপন্যাসটিকে জয়েস-এর ফিনেগানস ওয়েক-এর পাশে রাখতে পারি—অন্তত ততক্ষণ, যতক্ষণ না আমরা ধীরে ধীরে বুঝে ফেলি যে 'পেল ফ্যায়ার'-এর জটিল আবর্ত শেষ পর্যন্ত আমাদের সমস্ত উদঘাটনী প্রচেষ্টাকে ফাঁকি দেবার জন্যেই সযত্নে তৈরি; ফিনেগানস-এর কুটিল অন্ধকার স্রোতে যে-সব আচমকা রত্নের সন্ধান পেয়ে যাই আমরা তার কিছুই নেই পেল ফ্যায়ার উপন্যাসে। এবং মেরি ম্যাকার্থি যখন পেল ফ্যায়ার-এর মধ্যে উপন্যাসের চরম উৎকর্ষ দেখতে পান, তখন এই ভেবে আমরা ঢোক গিলতে বাধ্য হই যে, গোলডসওয়ার্থ এবং ওয়ার্ডসম্মিথ (গোলডসম্মিথ এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ)—বারংবার এই ধরনের হাসজারু শব্দচয়নের পিছনে কতোটা ছিল শিল্পের তাগিদ আর কতোটা দেখানোপনা? তবু একথাও অবিরলভাবে স্বীকার্য যে কবিতা এবং গদ্য এমনি পরস্পরের পরিপূরক প্রতিবেশিতায় হয়তো বিশ্বের আর কোনো উপন্যাসে নেই, যেমন আমরা দেখতে পাই পেল ফ্যায়ারে। এবং নাবোকফ-এর এক একটি শব্দ কবিতার মতোই আমাদের কাছে পরতে পরতে খুলে যায়। উপন্যাসের নামটির মধ্যে যেমন শেকসপীয়রীয় প্রতিধ্বনিই একমাত্র অনুরণন এমন নয়, শেলির হোয়াইট রেডিয়েনস অফ ইটারনিটির স্মৃতিও আমাদের মধ্যে মুহূর্তে জেগে ওঠে, আর শেষ পর্যন্ত আমাদের বিদগ্ধ স্মৃতিগুলির ওপর এক রাশ ঠাট্টার মতো ছড়িয়ে দেয়া হয় এই তথ্যটুকু যে হেলেনা রুবিনস্টিন-এর লিপস্টিক আর নেলপালিশ-এর নামও 'পেল ফ্যায়ার'।

নাবোকফ জন্মেছিলেন ১৮৯৯ সালের ২৩শে এপ্রিল রাশিয়ার পিটার্সবার্গ-এ। পনেরো বছর বয়েসে তিনি নিজেই ছাপান তাঁর প্রথম কবিতার বই। প্রথম দিকের সাহিত্য-চর্চা শুরু ছদ্ম ভি সিরিন ছদ্ম নামের আড়ালে। একটি কবিতায় বালক নাবোকফ প্রজাপতির প্রতি তার গভীর আগ্রহ আর

গলাব্যথা ? কাশি ?

একমাত্র গ্ল্যাক্সো'র ডেকোয়াডিন দুই ভাবে কাজ করে

দুই ভাবে কার্যকর ডেকোয়াডিন সংক্রমণ প্রতিরোধ করে, বেদনা দূর করে।

ডেকোয়াডিনই একমাত্র গলার জন্য লজেন্স যা গলাব্যথার সংক্রমণ প্রতিরোধ করে আর সেই সঙ্গে বেদনাও দূর করে। কারণ, এতে রয়েছে ডেকোয়ালিনিয়াম ক্লোরাইড। গ্ল্যাক্সো'র আন্তর্জাতিক গবেষণায় উদ্ভাবিত ডেকোয়াডিন কার্যকর রোগজীবাণু-প্রতিরোধক ও বেদনার উপশমকারী পদার্থ হিসেবে ডাক্তাররা ব্যবহার করতে নির্দেশ দেন।
ডেকোয়াডিন মুখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডেকোয়ালিনিয়াম ক্লোরাইড আপনার গলার সংক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আর বেদনা দূর করার জন্য নিমেষে কাজ করতে শুরু করে। গলার জন্য অন্য কোন লজেন্স এত তাড়াতাড়ি আর এত বেশী সময় ধরে আপনাকে আরাম দেয় না।

গলাব্যথা ও কাশির জন্য গ্ল্যাক্সো'র তৈরী অব্যর্থ উপশম—ডেকোয়াডিন

GLD-8760
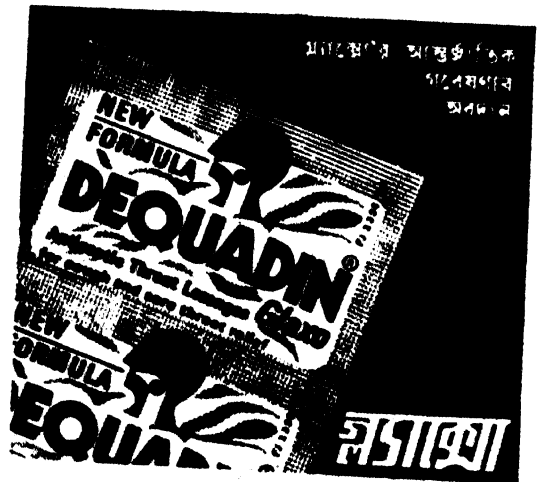
ভালোবাসার কথা জানতে ভোলেনি। তারপর ১৯১৭ সালে বেরুলো আর একটি কবিতার বই এবং ১৯২৩ সালে 'দ্য গ্রেপ' নামের আর একটি কাব্য-গ্রন্থ লিখলেন তিনি। ১৯২০ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি যতগুলি কবিতা লিখেছিলেন সেগুলির একটি সম্পূর্ণ সংকলন প্যারিসে ১৯৫২-তে প্রকাশিত হয়েছিল। আর ১৯৫৯ সালে তাঁর ইংরেজী কবিতাগুলি পোয়েমস নামে একত্রে সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়। প্রথম জীবনে তিনি সব কবিতাই মাতৃভাষায় লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর বেশিরভাগ কবিতাই ইংরেজীতে রচিত। তাঁর কবিতার সংখ্যা নেহাৎ কম নয়, কিন্তু সেগুলি আমাদের আশ্চর্য করে যে কারণে সেটি হল, যদিও নাবোকফ গদ্য লেখেন বিশুদ্ধ কবির মতো, তিনি কবিতা কদাচিৎ-ই কবির মতো লিখে ফেলেন। ফলে, রুশ ভাষায় লেখা তাঁর কবিতাগুলি রুশ কাব্য-সাহিত্যে চিরস্থায়ী জায়গা করে নিতে পেরেছে বলে মনে হয় না। আর তাঁকে আধুনিক ইংরেজ বা মার্কিনী কবিদেরও সমকক্ষ ভাবা যায় না। সবচেয়ে আমাদের যা পীড়া দেয় তা হল আধুনিক সমস্যা আর সংবেদনার সঙ্গে তাঁর কবিতা কোনোভাবেই সংপৃক্ত নয়।

খান বারো নাটকও লিখেছিলেন নাবোকফ, কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি ঈপ্সিত সাফল্যে পৌঁছতে পারেন নি। ১৯২৩ সালে লেখা 'মৃত্যু' নামের প্রথম নাটকটি ছিল কবিতায় লেখা—কিন্তু কাব্যনাট্যের অর্থবহতা এবং আয়তন নাটকটি মুহূর্তের জন্যেও পেল না। ১৯২৪-এ লেখা 'দ্য নর্থ পোল' নাটকটিও কবিতাশ্রয়ী, কিন্তু কোথাও ভাষার মধ্যে আসেনি সেই ঘনতা এবং ব্যঞ্জনা যা কাব্যনাট্যের কাছে আমরা সর্বদা দাবি করি। এমন কি ১৯৩৮-এ লেখা 'দ্য ম্যান ফ্রম দ্য ইউ এস এস আর' থেকে ১৯৬১-এ অভিনীত ইংরেজী নাটক 'দ্য ওয়াল্টজ ইনভেনশন' পর্যন্ত চলে এসেও নাবোকফ-এর নাটকের দ্বারা আমরা কখনই প্রবলভাবে সংক্রামিত হই না। এদের মধ্যে 'পেল ফায়ার'-এ সজীব উজ্জ্বলতার বড় অভাব।

কিন্তু স্মৃতি-বিলাসিতায় নাবোকফ-এর প্রতি-যোগীর সংখ্যা বিশ্বসাহিত্যে খুবই কম। অতীতের ছোটো ছোটো ঘটনা, সব আভাস, ইঙ্গিত, প্রতিধ্বনি, ক্ষণিক বন্ধুতা, সাহচর্য, পলাতক প্রেম, এমন কি যা কিছু ঘটতে পারতো কিন্তু ঘটে নি—সেই সব চতুর, প্রবঞ্চক আবর্ত থেকে তিনি তুলে আনেন অজস্র মনোহর রত্ন। যখন তিনি কনক্লুসিভ এভিডেনস-এ (১৯৫১) লেখেন তাঁর মায় কথা কিংবা ছেলেবেলার অস্পষ্ট স্মৃতিগুলিকে অপার্থিব উদ্ভাসে জাগিয়ে তোলেন কুড়ি কুড়ি বছরের পার, তখন আমাদের অবিরলভাবে মুগ্ধ না হয়ে উপায় থাকে না এবং এই ভেবে আক্ষেপ হয় যে, এমনি স্মৃতিমেদুর, মন-কেমনের সাহিত্য আরো বেশি লিখলেন না কেন তিনি। এই তো তাঁর একান্ত নিজস্ব ক্ষেত্র, এখানেই তো তাঁর দিগন্ত-বিন্দু-ছোঁয়া নিরঙ্কুশ সাম্রাজ্য। নাবোকফ-এর গদ্যের ছাঁদ এই ধরনের কুয়াশা-কুয়াশা স্মৃতিচারণের একেবারে মাপে-মাপে উপযোগী—এ-কথাটা আমরা সন্দেহা-তীত ভাবে বুঝে ফেলি।

তাঁর 'লোলিটা' উপন্যাস-এর মূল আবেদন কিন্তু এখানেই—'লোলিটা'র রোম্যান্টিক স্মৃতি-মেদুরতা বা নস্ট্যালজিয়া আমাদের মধ্যে জীবাণুর মতো ছড়িয়ে পড়ে, আমরা এই ভেবে লজ্জিত হই যে, একদা অশ্লীলতার দায়ে উপন্যাসটিকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। এই স্মৃতিমেদুরতায় কবিতার ব্যঞ্জনা এমনি গভীর এবং সুদূরপ্রসারী যে উপন্যাসটির আটাকা যৌনতা একমাত্র মরচে-পড়া মানসতায় অশ্লীল ঠেকতে পারে, যেখানে সংবেদনা সংস্কারে আচ্ছন্ন।

'লোলিটা' ছাড়া নাবোকফ-এর উল্লেখ্য উপন্যাসের মধ্যে দ্য গিফট এবং দ্য কিং, কুইন অ্যান্ড নেভ অন্যতম। কিন্তু এই উপন্যাসের সব কটির মধ্যে যে অভাববোধ আমাদের সব চেয়ে দুঃখ দেয় তা হল এই যে, কোনো দেশের মাটিতেই আমরা এদের রোপণ করতে পারি না, কোনো বিশেষ সমাজের মূল্যবোধে এরা যেন সংলগ্ন নয়। এরা কোনো সামাজিক, রাজনৈতিক, কিংবা নৈতিক দায়িত্বও পালন করে না হয়তো এবং তা সম্ভবও নয়, কেন না সব রকম রাজনীতি থেকে নাবোকফ উদাসীনভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। আর সেই জন্যেই এই অফুরন্তভাবে উজ্জ্বল কল্পনা-বিলাসী বিশ-শতকী অস্কার ওয়াইল্ডকে আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে দেখতেও আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে পারি না। নাবোকফ যদি আরো কিছুদিন বাঁচতেন কেমনভাবে তাঁর ভবিষ্যতের দিনগুলিকে কাটাতেন তিনি ? —এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি কিছু-দিন আগে বলেছিলেন : 'ইরাণ দেশের পাহাড়ে-অরণ্যে আরো কিছু নতুন প্রজাপতির সন্ধান পেতে হবে আমায়, অবসরে আবার শুরু করবো টেনিস খেলা ; তিনটি সুট বানাতে হবে লন্ডন-এর সেরা দর্জির কাছে ; আমেরিকার কোনো উপত্যকায় এবং গ্রন্থাগারে আরো একবার যেতে হবে ; এবং একটা পেনসিল-এর সন্ধান করতে হবে আমাকে, আরো শক্ত আরো কালো একটা পেনসিল।' এরই পাশাপাশি সল বেলোর হারজগ-এর উক্তিগুলি যখন আমরা একের পর এক রাখি তখন আমাদের এই কলকাতায় দৈনন্দিনতার একঘেয়েমিতে দীর্ণ হতে হতে ডালহৌসীর ভিড়ে কিংবা শেয়ালদার চিঁড়ে-চ্যাপ্টা স্রোতে ভাসতে ভাসতেও আমাদের মনে হয় সুদূর আমেরিকায় আমাদের একজন বন্ধু আছে যে আমাদের কষ্টের কথা ভেবে স্বয়ং ঈশ্বরকেও খোলা চিঠি লিখতে সাহসী। এইভাবে নাবোকফ-এর বন্ধুতা আমরা, এই ছাপোষা বাঙালীরা ক'জন পেয়েছি ?

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলা

আন্তর্জাতিক ফুটবল ও আমরা

অমল দত্ত

॥ ৩ ॥

পেডেস্টালের ফ্যানটা কট কট আওয়াজ করে ঘুরছিল। সকালের অনুশীলনের পর ঘর্মাক্ত ও ক্লান্ত দেহে আমরা সবাই ক্লাব তাঁবুতে বসে। পাখাটার বিশ্রী আওয়াজ আমাদের কথা বলবার আগ্রহটুকুও খতম করে দিয়েছে।

আমার পাশের বেতের চেয়ারে শরীর এলিয়ে বসেছিল পি...। সামনের টেবিলটায় পা দুটো তোলা। অনেক যুদ্ধের সফলকাম সৈনিক। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের রেকর্ড সৃষ্টির গৌরবোজ্জ্বল-অধ্যায় সৃষ্টিতে ওর অবদান সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

পি...আমাকে বলল—যে চার পাঁচটা নতুন মুভ আজ করালেন—লীগের খেলায় তাকে প্রয়োগ করা যাবে?

—না করার কি আছে?

পি—আমরা ত এখানকার লীগের একটানা ছ' বছরের চ্যাম্পিয়ন তবু আমরা কোনো প্ল্যানড ফুটবল খেলতে পারিনি। আসলে আমরা ছিলাম এগারোজন প্রতিভাবান ফুটবলার। আমরা খেলেছি আমাদের ইনডিভিজুয়াল ব্রিলিয়ান্সি দিয়ে। কিন্তু কোরিয়া, বার্মা ও অন্যান্য এশিয়ান কান্ট্রির খেলাতে ত দেখলাম —কি দারুণ 'ভ্যারিয়েশন' আনছে ওরা।

—আমাদের পক্ষেও সম্ভব। তবে দীর্ঘ একটানা অনুশীলন না করলে প্ল্যানড ফুটবল প্রতিযোগিতা-মূলক খেলার ভিতর আসতে চায় না—অনুশীলন-পর্বেই খতম হয়ে যায়।

পি—আজকের এই 'সেট-আপে' তা কেমন করে সম্ভব? সারা দিনের মাত্র দু' ঘণ্টা আমরা খেলার জন্য দিতে পারি; খেলায় সম্পূর্ণ 'ইনভলভড' না হতে পারলে কি আজকের এত বৈচিত্র্যপূর্ণ আধুনিক ফুটবল, যা আমরা আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসরে দেখতে অভ্যস্ত তা আমরা আমাদের খেলায় আনতে পারব?

এ ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি আমাকে বারে বারে হতে হয়। তাই উত্তর দেবার চেষ্টা না করে, চার পাশের খেলোয়াড়দের দেখতে লাগলাম। একজন ছাড়া সকলেই চাকুরিজীবী। তিনজন ত অফিসারের চাকরিও করে। ওরা কেউ আসে খড়দা, দমদম, বেলঘরিয়া থেকে, কেউ বেহালা, নাকতলা এবং গড়িয়া থেকে। রাত চারটে সাড়ে চারটের বিছানা না ছাড়লে, এদের ভেতর কেউই সকালের অনুশীলনে আসতে পারবে না। অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে এদের সকলেরই সন্ধ্যা ৭।৮টা বাজে। ফুটবল মরশুমে এরা সকলেই কমপক্ষে ম্যাচ খেলে সপ্তাহে চারটি। দুটি ক্লাবের দুটি অফিসের।

আমাকে নীরব থাকতে দেখে আরেকজন তমানের প্রথিতযশা খেলোয়াড় বলল—আমাদের খেলোয়াড়ী সত্তারও একটা দুরূহ সমস্যা আছে, যেটা কোনদিন ফুটবল রসিকদের বোঝান হয়নি। আমরা যখন খেলোয়াড় জীবন শুরু করি, তখন আমাদের সকলেরই স্বপ্ন থাকে—কলকাতার কোন বড় ক্লাবে নিয়মিত খেলব তারপর খেলব ভারতের হয়ে। এবং এই স্বপ্নকে সফল করা এবং খেলোয়াড় হিসেবে 'পারফেকশনে' পৌঁছবার জন্য একটা প্রচণ্ড তাগিদও আমরা আমাদের নিজেদের ভেতর অনুভব করি। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছে দেখি যে, আমাদের ভেতরের সেই তাগিদটাও আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। এর দুটো কারণও অবশ্য বলতে পারি। প্রথম—ভারতের ঘরোয়া ফুটবলের 'স্ট্যান্ডার্ড'; দ্বিতীয় অনিয়মিত ও একরকম বিনা প্রস্তুতিতে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অংশ গ্রহণ।

উদাহরণস্বরূপ পাখতাকোরের বিপক্ষে আমাদের খেলাটার কথাই ধরুন! প্রথম খেলায় মোহনবাগানকে তিন গোলে হারানোর পর স্বভাবতই আমরা ভয়ে ভয়ে ছিলাম। কিন্তু খেলতে খেলতে অনুভব করলাম এদেরকে ভয়ের কিছু নেই। খেলার পর মনে হচ্ছিল, আর একটা সুযোগ পেলে এদের বিপক্ষে আরও ভাল খেলা যেত। কিন্তু ট্র্যাজেডির ব্যাপার হল, আমি এবং আমার সতীর্থদের অনেকেই হয়ত সুযোগ পাবে না আবার এ ধরনের দলের বিপক্ষে খেলার। কিন্তু যদি সুযোগ থাকত তা হলে দেখতেন এই আমরাই সময়ের এত টানাটানির ভেতর থেকেও আরও কিছুটা সময় 'ডেডিকেট' করতাম বৃহত্তর প্রস্তুতির জন্য। আমাদের খেলোয়াড়ী সত্তাটা আরও অনুপ্রাণিত হত।

অনেকদিন আগে দেখা একটা ফিচার-ফিল্মের দুটো বিচ্ছিন্ন অংশ এই মুহূর্তে আমার মনে ভেসে উঠল। স্বল্প দৈর্ঘ্যের ফিল্মটি তোলা হয়েছিল ভারতের অতি-প্রখ্যাত খেয়ালিয়া স্বর্গত আমীর খাঁ সাহেবের জীবন নিয়ে। প্রথম ছবিটায়, আমীর খাঁর সুন্দরী

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় ফেরেন্স পুসকাস

স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে—আপনার একমাত্র ছেলে বড় হয়ে কি হবে? দ্বিধাহীন বলিষ্ঠ কণ্ঠে তাঁর জবাব—'ডাক্তার'।

দ্বিতীয় ছবি—গভীর নিশুতি রাত। চারদিক শুনশান। ক্যামেরাকে প্রথমে প্যান করা হয়েছে বাড়িটার চারদিকে, তারপর আমীর খাঁর শোবার ঘরে। এরপরে ক্লোজ আপ শটে দেখান হল খাঁ সাহেবের সুন্দরী স্ত্রী ও ছেলের মুখ। দুজনেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এরপরেই লঙ শটে দেখান হল আমীর খাঁকে। উত্তর দিকের ছোট্ট ঘরটার একটা সরু বিছানার ওপর কোলে তানপুরা নিয়ে উনি বসে। চোখ দুটো আধ-বোজা। ডান হাতটা তানপুরায়, বাঁ হাতটা কখনও কোলের ওপর আবার কখনও আবেগে একটু ওপরে উঠছে। ভাবে বিভোর হয়ে, খুব নিচু স্বরে তান কম্পোজ করে চলেছেন স্বর্গত আমীর খাঁ সাহেব।

॥ ৪ ॥

এ দেশের মাটিতে আমরা প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলছি প্রায় আশি বছর। আন্তর্জাতিক ফুটবলের প্রথম সারিতে পৌঁছাতে না পারলেও, অন্তত সম্মানের সঙ্গে সে আসরে বসবার পক্ষে উপরোক্ত সময়টা নিশ্চয়ই যথেষ্ট।

এই অসাফল্যের কারণগুলো কি? বা কারা দায়ী এর জন্যে?

এই প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে ব্রাজিলের নাম। আর্থার মিলারের বাবা ছিলেন ব্রিটিশ, মা ব্রাজিলিয়ান। ইংল্যান্ডে লেখাপড়া শেষ করে মিলার ঘরে ফেরে ১৮৯৪ সালে। অনেক জিনিসের সঙ্গে তার লাগেজে ছিল সেদিন দুটো ফুটবল। সাও পলোর অ্যাথলেটিক ক্লাবের ছেলেদের মিলার উপহার দেন ঐ বল দুটি। ব্রাজিলে তার আগে কারও ধারণাই ছিল না ফুটবল কেমন করে খেলে। ব্রাজিলিয়ান ফুটবল সংস্থার (সি, বি, ডি) জন্ম ১৯১৪ সালে। কলকাতার ফুটবল-লীগ কিন্তু চালু হয়েছিল ১৮৯৮ সালে।

সুদীর্ঘকাল ভারতীয় ফুটবল সংস্থার সভাপতি 'পঙ্কজ গুপ্তর ধারণা ছিল—শারীরিক গঠনের জন্য আমরা কোনদিন আন্তর্জাতিক ফুটবলে সাফল্য লাভ করতে পারব না। কিন্তু ১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপ-ফুটবলে উঃ কোরিয়ার সাফল্য এই ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে।

তবে কি এই অসাফল্যের জন্য দায়ী আমাদের আর্থিক অসচ্ছলতা? না সাংগঠনিক নিষ্ক্রিয়তা ও কিছু স্বার্থপর লোকের একটানা গদী আঁকড়ে থাকার নির্লজ্জ দলীয় রাজনীতি?

উপরোক্ত বিষয়ের আলোচনার আগে আমরা স্মরণ করব গ্রীক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আরিস্টটলের একটা আপ্তবাক্যকে— He how thus considers things in their first growth and origin, whether a state or anything else, will obtain the clearer view of them.

আন্তর্জাতিক ফুটবল শুরু হয়েছে গত শতাব্দীর শেষ দিক থেকে। যদিও প্রথম প্রথম এই খেলাগুলি দু-একটি নিজেদের দেশের ভেতরই অর্থাৎ প্রায় ঘরোয়া ফুটবলেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ক্রমশ সেটা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

বিশ্বকাপের জন্মলগ্ন ত ১৯৩০ সাল থেকে। আজকের আন্তর্জাতিক ফুটবলের যে বর্ণচ্ছটা, বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে যে হইচই আর মাতামাতি তা শুরু হয়েছে গত বিশ্বযুদ্ধের পর। মানুষ যখন মানুষ হননে ক্লান্ত। তখন সেই ক্লান্তিলগ্নে সে নিজের ভিতর থেকে তাগিদ অনুভব করেছে এমন একটা মাধ্যম বেছে নিতে, যার ভেতর দিয়ে শান্তি অক্ষুণ্ণ রেখে, বিশ্বের সকলের সঙ্গে সে এক আসরে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে।

তাই সে তৈরি করেছে উন্নততর খেলার মাঠ, কম্পোজিট স্টেডিয়াম, আধুনিক জিমন্যাসিয়াম। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, 'জিগীষা' মানুষের মন থেকে অবলুপ্ত। বরঞ্চ তার বিজয়ী হবার ইচ্ছাটা চারদিক থেকে ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে হতে আরও নিবিড়ভাবে কেন্দ্রীভূত হয়ে এসেছে খেলার মাঠে। এবং এই ইচ্ছা-পূরণে খেলাধুলোয় উন্নতমানের প্রতিটি দেশের রাজকুল এগিয়ে আসছে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য নিয়ে, বৈজ্ঞানিকরা তাদের অধীত জ্ঞান এ যজ্ঞে উজাড় করে দিচ্ছে।

আধুনিক ফুটবল আজ অনেক ঘরানায় বিশেষ-ভাবে সমৃদ্ধ। কিন্তু আধুনিক ফুটবলের জনক বলে যদি কাকেও চিহ্নিত করতে হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে সে দেশ—হাঙ্গারী। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে—আধুনিকতার সংজ্ঞা নিয়ে। প্রচলিত চিন্তা-ধারা নস্যাৎ করে দিয়ে নতুন চিন্তাধারার প্রয়োগকেই বলা হয় আধুনিক।

ফুটবল এবং তার আইন-কানুন সৃষ্টি ব্রিটিশেরই। এবং সারা বিশ্বে ফুটবলকে জনপ্রিয় করার জন্য পুরোপুরি কৃতিত্ব ব্রিটিশারদেরই। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ-ফুটবলই আন্তর্জাতিক ফুটবলের জগতে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে এবং সব দেশই এই ব্রিটিশ ফুটবল খেলার ধারাকে অনুসরণ করত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থামার পর অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল থেকেই হাঙ্গারী চাইছিল ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ ফুটবল দল বলে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু

তারও আগে আমা দরকার এই চাওয়ার জন্য কতটা মানসিক-প্রস্তুতি ছিল হাঙ্গারীয়ানদের। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি মিঃ আভেরি ব্রান্ডেজ তাঁর ভাষণে একবার বলেছিলেন—খেলাধুলোই এ শতাব্দীর ধর্ম।

উপরোক্ত উক্তিকে উদ্ধৃত করে, হাঙ্গারীয়ান ক্রীড়া-সাংবাদিক মিঃ অস্কারা ডি মেজর লিখছেন—হাঙ্গারীর প্রত্যেকেই খেলাধুলো ভালবাসে পালন। আমরা পরিশ্রমী ও সৃষ্টিধর্মী মানুষ। আমরা হাড়ভাঙা খাটুনি পছন্দ করি, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্প ও খেলাধুলোয় উৎসর্গীকৃত। ছোট বয়স থেকেই আমাদের বাচ্চাদের খেলাধুলোকে ভালবাসতে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং এই চেতনাই আমার দেশের সম্মানকে ওপর দিকে ধরে রাখতে সাহায্য করে। এ না হলে কেমন করে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার পাড়ে, ইয়োরোপের উত্তর-পূর্ব কোণের কেন্দ্রে অবস্থিত ছোট্ট এই দেশ,

মিড ফিল্ডারগুলি বহু ব্যবহারে সকলের কাছে ধরা পড়ে গেছে। ১৯২৬ সাল থেকে এই পদ্ধতি ডিফেন্সের দিক খানিকটা উন্নতি করেছে ঠিকই, কিন্তু আক্রমণ অথবা সামগ্রিকভাবে খেলাটি দৃষ্টিদীপ্ত-কল্পনার অভাবে ভোঁতা হয়ে গেছে। আমাদের ট্রেনার বিশ্লেষণ করে দেখলেন এই সিস্টেমের মূলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুই হাফ ব্যাক ও দুই ইনসাইড খেলার চাপটা এই চারজনের উপর পড়ায়, সহজে তারা ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছায়। কিন্তু এগার জনের এই খেলায়, বিশেষ করে চারজনের উপর চাপটা পড়বে কেন? সেইজন্য ঠিক হল—যতটা সম্ভব চাপটা সমানভাবে আমরা সমগ্র টীমের ওপর চাপিয়ে দেব। আক্রমণ করব ডিফেন্ড করতে করতেই। অথচ আক্রমণ এবং রক্ষণের ভেতর এমন একটা ঐক্য থাকবে যা খেলায় সব সময় দলকে ক্রিয়াশীল করে রাখবে।

দলের অনুশীলন-পর্ব সম্পর্কে পুসকাসের উ

হাঙ্গেরির দেওয়া একটি গোল বাঁচাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক

যার অধিবাসীর সংখ্যা মাত্র ৯০ লক্ষে সীমাবদ্ধ—১৯৫২'র হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ১৬টা সোনার মেডেল পেয়ে সারা বিশ্বের প্রশংসা কুড়োয়?

১৯৪৯ সালের এক আন্তর্জাতিক খেলায় চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছে হাঙ্গারী ২—৫ গোলে হারার পর হাঙ্গারীর ফুটবল ভবিষ্যত নিয়ে সারা দেশে একটা ঝড় উঠল। হাঙ্গারীয়ান ট্যাকটিকস, স্টাইল, কোচিং পদ্ধতি, দলনায়কের মনোনয়ন—সব কিছুকেই একটা প্রচণ্ড বিতর্কের মুখোমুখি হতে হল।

হাঙ্গারীর ফুটবল-কর্মকর্তারা উপলব্ধি করলেন যে এই লগ্নে 'ঐতিহ্য' অপ্রয়োজনীয়। স্বপ্ন পরিপূরণে এই মুহূর্তে সবচেয়ে দরকার—জেতার জন্য খেলা এবং বিপক্ষের চেয়ে বেশী গোল করা। এতে যদি খেলার মাধুর্যে কিছু ঘাটতি পড়েও, তাহলে নাচার।

হাঙ্গারীর সাফল্যের কারণগুলো বলতে গিয়ে, পৃথিবীর চিরকালের চিরশ্রেষ্ঠ ইনসাইড লেফ্‌ট হাঙ্গারীর অধিনায়ক ফেরেঙ্ক পুসকাস তাঁর আত্মজীবনী 'ক্যাপটেন অফ হাঙ্গারী' বইতে লিখছেন—এই চাপের মুখে আমরা অনুভব করলাম আমাদের দরকার একটা নতুন ধরনের ট্যাকটিকস ও দলের গঠন। কেননা দুটো দল যখন শক্তিতে সমান সমান হয়, তখন যে দলের উন্নত ধরনের ট্যাকটিকস থাকে—তারাই জেতে। কাজেই প্রথমেই আমাদের চূড়ান্তভাবে একটা নিয়মিত আন্তর্জাতিক দল গঠন করতে হবে। এর অর্থ অনেকদিনের জন্য সব খেলোয়াড়কেই এক-সঙ্গে থাকতে হবে। যখন তখন কিছু খেলোয়াড় আন্তর্জাতিক দলে ঢুকিয়ে দেবার যে রেওয়াজ এতদিন ছিল—তা একেবারে বন্ধ করতে হবে। যে ফুটবলার দুটো কি তিনটি খেলায় নিজের পারদর্শিতা দেখাতে পারবে তাকেই এই আন্তর্জাতিক দলের চিরকালের সভ্য করে নেওয়া হবে।

'সিস্টেম' সম্পর্কে পুসকাস লিখছেন—এতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ-আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত তাত্ত্বিক, এর সিস্টেমকেই পৃথিবীর প্রায় সকল দেশগুলি অল্প-বিস্তর অনুসরণ করছিল, কিন্তু এই পদ্ধতির সীমা-

—We planned our training programme for the year as a whole; the complete systematic, day-by-day syllabus for a year, drawn up for each player according to his capabilities and particular duties.

In addition, we had many discussions on the theory of training, tactics, and various other points of football technique.

প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ ক্রীড়া-সাংবাদিক টেরেন্স ডিলানি তাঁর স্মরণীয় গ্রন্থ 'সেনচুরি অব সকার' বইতে হাঙ্গারীর ফুটবলে সেই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় স্মরণ করে লিখছেন—হাঙ্গারী ইউরোপের সকল দেশগুলির সঙ্গেই খেলেছে এবং চার বছর ধরে তারা একটা খেলাতেও হারেনি। যে প্রতিভাধর ফুটবলাররা সেই দলে ছিল, তাদের কথা বাদ দিলেও, হাঙ্গারী সেদিন সারা বিশ্বে একটা নজির সৃষ্টি করেছিল যে, একটি দেশ যদি ফুটবল-অনুরাগী হয় তাহলে কতটা সে তার ফুটবল-টীমের জন্য করতে পারে।

১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি লন্ডনে যখন পৌঁছলাম তখন এমনিতেই দেরি হয়ে গিয়েছিল। এক, এ থেকে যে বইগুলো কিনতে বলা হয়েছিল, তার সবগুলোই আমাদের হ্যাম্পস্টেডের বইয়ের দোকানে পেয়ে গেলাম। পেলাম না শুধু একটা বই—সো বা হাঙ্গারীয়ান ওয়ে। অবশেষে আমার এক বন্ধুর পরামর্শে ছুটলাম ইয়োরোপের সবচেয়ে বড় বইয়ের দোকান ফয়েলসে। ওখানেও বলল—'সরি'। ফিরে আসছি ভারাক্রান্ত মন নিয়ে, একজন সেলসম্যান আমাকে ডেকে বললেন—পুরান বইয়ের দোকানে খোঁজ করুন, পেলেও পেতে পারেন। অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম—নতুন পাব না কেন? উনি হেসে উত্তর দিলেন—বছর খানেক আগে বইটা যেদিন বাজারে বেরোয়, একদিনেই সারা ইয়োরোপে সব কপি বিক্রী হয়ে গেছে।

পরের কিস্তি ১৫ জানুয়ারী ——

নামরহস্য

মেষ (Ovis orientalis—Wild variety)

ভেড়া এবং মেষ যে অভিন্ন, এটা ভারতীয়দের সুপ্রাচীন সংস্কার। মিষ্ ধাতু থেকে মেষ, কিন্তু ভেড়া বললে অমন ধাতু প্রত্যয় করে বোঝানো যায় না। এইটুকু বলা যায়, সাহস নেই, কিন্তু স্পর্ধা করে এমন প্রকৃতিকে ভেড় বলা প্রাচীন অভ্যাস, যার থেকে ভেল হয়েছে। ভেল বা নকলের এমনি শক্তি যে, আসলকে প্রথমটা ছায় মানায়, তারপর আসলের দেখা পেলেই ভেল বা নকলটার মূল্য থাকে না। এই দৃষ্টিতে ভেড় বা ভেল।

এই মেষ নামক প্রাণীটি যখন লড়াইয়ের স্পর্ধা করে তখন মনে হয় সত্যই যোদ্ধা। তার আসল স্বরূপ—সে ভীতু। সেই ভী ধাতুতে ডক্ প্রত্যয় যোগে ভেড়। আবার কোথাও আছে ভী+রব ভেরব; অর্থাৎ ভীরুর ডাকই ভেরব। এই ভেরব থেকে ভেড়ব। পরে ভেড়। এই মেষ সেই প্রকৃতির বলেই ভেড়া বলা হয়।

মেষ শব্দটি সেই প্রাণীটিরই প্রকৃতি-পরিচয় দেয়। কারণ, এই প্রাণীটির প্রকৃতি এবং স্বরূপ সম্বন্ধে অনেকের ধারণা—বৈদিক সংস্কৃতির সময়ে মেষ ও অজ একই ছিল, পরে ভিন্ন হয়েছে। কথাটা ঠিক নয়, ভারতের আয়ুর্বেদ খুবই প্রাচীন শাস্ত্র। অজাদুগ্ধ ও মেষী-দুগ্ধের গুণ দোষ এক নয়। অতএব ভিন্ন প্রকৃতিরই প্রাণী এ দুটি।

তা যা হোক, মেষ খুবই প্রাচীন প্রাণী। এত

প্রাচীন যে, ঋকবেদের প্রথম আমল, মধ্য আমলেও যেমন, আবার যজুর্বেদের আমলেও তার পরিচয়। এইজন্য ঋকের ১।৪৩।৬ সূক্ত ও ১০।২৭।১৭ সূক্তে এবং যজুর্বেদের ৩।৫৯ সূক্তেও মেষের উল্লেখ। মেষের লোমে প্রাবরণ তৈরির উল্লেখ রয়েছে; অর্থাৎ কম্বল তৈরী হতো।

এই মেষ শব্দটি তার প্রকৃতিগত স্বভাবের ভাষায় মিষ+অচ্ = মেষ, অর্থাৎ যে স্পর্ধা করে সে মেষ।

রামায়ণে মেষের মুষ্ক জোড়া দেওয়া হয়েছিল বলে উল্লেখ রয়েছে। অহল্যা-জার (উপপতি) ইন্দ্রের মুষ্কের পতনের পর (অর্থাৎ গৌতমের অভিশাপের জন্যই হোক অথবা ক্রোধবশত মুষ্ক-ছেদনের জন্যই হোক) মেষের মুষ্ক (অণ্ডকোষ) জোড়া দেওয়ার উল্লেখ আছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, মেষ ভারতের সর্বাধিক প্রাচীন প্রাণীদের অন্যতম। মেষাণ্ড জোড়া দেওয়ার কাহিনী রামায়ণের ১।৪৯।৯ শ্লোকে আছে।

অজ (Capra hircus—Domestic goat)

এই শব্দটি প্রাচীন যুগে মেষকেই বোঝাতো। তবুও মেষ ও অজ বা ছাগলের সঙ্গে এর প্রভেদ আছে। বেদে আছে—অনসো জাতঃ কামঃ এব যোনিঃ জায়তে। অর্থাৎ ছাগ অপেক্ষা অজের কাম এত বেশী যে, যখনই মনে কাম জাগে তখন যোনি বিচার করে না। এমন কি, মাদী কি মদ্দা—এ জ্ঞান পর্যন্ত তার থাকে না। সেই জন্য সে অস্পৃশ্য ছিল। কিন্তু বজ্রতেজে রক্ষা অস্পৃশ্য
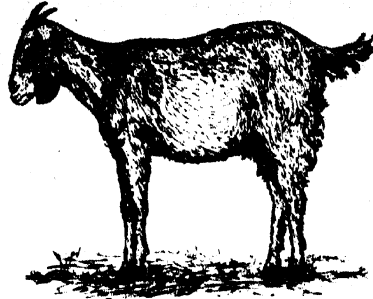
ছাগদেহ ধারণ করে পলায়ন করেছিলেন। মহাভারতে ১।২১১।৫ শ্লোকে এ ইঙ্গিত থাকলেও অথর্ববেদের ৫।১২।৬৩ এবং অন্য সূক্তেও আছে। ওখানে 'অজঃ কামক্ষেপণে জনিষ্যো ইতি অজঃ' বলা হয়েছে।

শশক (খরগোশ) (Lepus nigricollis)

খরগোশ নামের প্রাণীটি ভারতে খুবই পরিচিত। তবে এ শব্দটি ভারতীয় ভাষায় নয়, ফারসী ভাষার। সংস্কৃত ভাষায় শশক। তবে ফারসী ভাষায় খর শব্দের মধ্যে ভারতীয় ভাষার সংযোগ যে নেই তা বলা যায় না। কারণ, খর মানে গর্দভ। আর ফারসী ভাষায় গোশ মানে কর্ণ বা কান। সত্যই গর্দভের কানের-আকারের মতই এই প্রাণীটির কান।

শশক নামটি প্রাচীন ভারতে পরিচিত; তাই ঋকবেদের ১০।২৮।৯ সূক্তে এবং শুক্ল যজুর্বেদের ২৩।৫৬ সূক্তে পাওয়া যায়। তাছাড়া বৃহৎ সংহিতার মত গ্রন্থে—যেটি মনুসংহিতারও পূর্বের গ্রন্থ—৮৮।১ শ্লোকে ৬৯।২ শ্লোকে শশক শব্দের উল্লেখ আছে।

বেদ ভাষ্যকারগণ বলেছেন—শশ+অচ্+(ক) প্রত্যয়ের যোগে শশক। শশ ধাতুর অর্থ লাফিয়ে চলা। এই লাফানোটা প্রহর্ষ, ভয়বেগ,
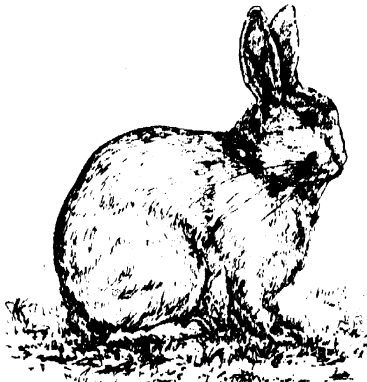
শয়ন প্রবৃত্তি ও ভোজন প্রবৃত্তির কারণে হয়। এটি প্রাচীন ভারতের গ্রন্থমালায় হরিণ শ্রেণীর বলে উল্লেখিত হয়েছে। এটিকে ঋক্‌বেদের ঐ সূক্তের ভাষ্যেই বলা আছে মৃগবিশেষ।

ভারতীয় রসশাস্ত্রে পুরুষের চারটি শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে শশপ্রকৃতিও একটি। সেখানে শশকের কোমল অঙ্গ ও কোমল লোম এবং অঙ্গের কোমলতার সঙ্গে বাক্যেরও মৃদুতার তুলনা করা আছে।

এই জন্তুটির প্রকৃতি থেকেই 'শশব্যস্ত' কথাটির প্রচলন হয়েছে।

শজারু (Hystrix indica)

দেখতে প্রাণীটি খুব ছোট, তবুও পশুর পর্যায়ে পড়ে। পশু শব্দটির শব্দগত তাৎপর্য হলো—সর্বং অ-বিশেষণ পশ্যতি। দৃশ্+কু পশ্যাদেশঃ। অর্থাৎ, যে সবাইকে অবিশেষে দেখে, তাকেই পশু বলা হয়। আর পশ্যতি ইতি পশু, অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা বাধা পড়ে অপরের কাছে বলেও সে পশু। এই অর্থেই শজারুও পশু। তার কাছে যেই যাক অমনি গায়ের কাঁটা ছুঁড়ে দেয়। এর প্রকৃতির দুটি বৈশিষ্ট্য। প্রথম হলো "শ্বাবিধ্"। অর্থাৎ, কুকুর আসছে জানতে পেরেই তাকে বিদ্ধ করে। আর এক স্বভাব—শ্বাবিধ গুহা। এ মাটিতে ঘর করে (গর্তে থাকে) দু দিকে তার দুয়ার করে। কারও পদসঞ্চারের শব্দ পেলেই, অর্থাৎ কেউ আসছে

জানতে পারলেই অন্য দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গায়ের কাঁটা বিঁধিয়ে তাকে জখম করে।

শল্যলোমা : এই নামকরণের কারণ হলো—তার গায়ের সাজানো কাঁটাগুলি শল্যের মত। সেগুলির দুটি মুখ এবং তীরের মত। কারোর শরীরে প্রবেশ করার সময় ক্ষত করে দেয়। প্রাচীন সংস্কৃতে উল্লেখ আছে : 'শুনা অবারিধাতে ইতি শ্বাবিধ্'। অর্থাৎ কুকুর এর আক্রমণ সহ্য করতে পারে না।

ছুছুন্দর (ছুঁচো) (Suncus murinus)

ছুঁচো বললে যে প্রাণীটিকে আমরা সচরাচর বুঝতে পারি সেটি যে খুব সুদূরের সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে তা সহজে বোঝা যায় না। পণ্ডিতরা অনুশীলন করে দেখেছেন সংস্কৃত ভাষায় তুচ্ছ শব্দের বিবর্তন হতে হতে ছুঁচো, ছুচ বা ছুচো হয়েছে।

প্রাকৃত সংস্কৃতে ছুছুন্দরী। অর্থাৎ, ধ্বন্যাত্মক সংস্কৃত ভাষা ছু ছু একটি অব্যক্তধ্বনি। তাতে উন্দুর সংস্কৃত ভাষায় যোগ। তবে ছুছুন্দর শব্দটি নিতান্ত নবীন নয়। মনুসংহিতার ১২।৬৫ শ্লোকে আছে। তা

ছাড়া যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ৩।২১৩ শ্লোকেও আছে। কোনও কোনও গ্রন্থে একে গন্ধমূষিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

বাচস্পতি

৯ই জুলাই—মোহনবাগান মাঠে

অমল দত্ত

॥ ১ ॥

বেশ মনে পড়ে, ভোরবেলা ছাদের টব থেকে পুজোর জন্য গাঁদা আর লঙ্কা-জবা তুলতে তুলতে নীল আকাশের কোলে শুভ্র ছেঁড়া ছেঁড়া ভাসমান মেঘের দিকে চেয়ে, মা জিজ্ঞাসা করতেন—মহালয়া কত তারিখে বউমা?

দুজনের আলোচনায় আমরা কান পেতে থাকতাম। জানবার চেষ্টা করতাম কলাবউ স্নান করাবার দিনটা কবে। কেননা তার আগের রাত্তে আমাদের বাড়ি সুদ্ধ সবাইকে, কলুটোলার ঠাকুর-বাড়িতে গিয়ে থাকতে হত। ফিরতাম পুজো শেষ করে সেই একাদশীর সকালে।

দুর্গাপুজো ঠিক কত বছর বাঙালীদের জীবনে অপেক্ষা আর উন্মাদনার খোরাক জোগাচ্ছে তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়; কিন্তু সারা বছরে অপেক্ষমাণ আর একটি তীব্র উন্মাদনার খোরাক এবং যা ইতিমধ্যে আমাদের জাতীয় জীবনে ঢুকেও গিয়েছে, মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গলের খেলা যে কত বছর ধরে চালু হয়েছে, তা বলে দেওয়া সম্ভব।

১৯১৫ সালে মোহনবাগান এবং ১৯২৬ সাল থেকে ইস্টবেঙ্গল—কলকাতার সিনিয়র ডিভিসন লীগে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে। ইতিমধ্যে লীগে দুজনের দেখা হয়েছে যে ৬০ বার তার ভিতর ইস্টবেঙ্গল জিতেছে—৩৩ বার। মোহনবাগান—২৭ বার।

কতকগুলো ঘটনা আছে যার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা গভীর লজ্জায় মাথা নীচু করি; তাই সেগুলিকে নিঃশেষে ভুলতেও চাই, কিন্তু ঘটনাগুলো ঠিক তার সময়মত প্রতিবারই ঘুরে ঘুরে এসে, জুতোর সুকতলায় পেরেক ওঠার মত অবিরাম আমাদের বিবেককে খোঁচায়—যন্ত্রণায় দগ্ধ করে।

গত বছর ঠিক এমনি বড় খেলার আগের দিন ভোরবেলায় আমাদের পাড়ার সুকুমারকে দেখি পুলিস টেণ্টের সামনে পিচঢালা মসৃণ রাস্তার ওপর অকাতরে ঘুমোচ্ছে। পরনে তার একটিমাত্র ছিন্নভিন্ন পায়জামা। ডাক দিতেই হুড়মুড় করে উঠে পড়ে, আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল—দুদিন ধরে লাইন দিয়েছি একটা টিকিটের জন্য, টিকিট পাওয়া ত দূরের কথা, মাস্তান আর পুলিসের লাঠির ঘায়ে আমার অবস্থাটা দেখুন? ইতিমধ্যে দেখি সুকুমারের মতই যারা ঐ দীর্ঘ মসৃণ পিচঢালা রাস্তায় এতক্ষণ অকাতরে ঘুমোচ্ছিল—তারা প্রায় সবাই একটু একটু করে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

প্রথমে ঠিক ছিল ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগানের এ বছরের লীগের খেলাটি ২রা জুলাই ইডেনে প্রদর্শনী ম্যাচ হিসেবে অনুষ্ঠিত হবে। তাই সমর্থক ও ফুটবল অনুরাগীদের তরফ থেকে স্বস্তি ছিল এই ভেবে যে অন্তত ৬৫।৭০ হাজার লোক এ খেলা দেখতে পাবে। কিন্তু বর্ষার, বিশেষ করে ঐ সময়ে একটানা দু' সপ্তাহ প্রবল বৃষ্টি হওয়াতে ইডেনের পিচের দুরবস্থার কথা ভেবে উভয় শিবিরের কর্মকর্তা ও খেলোয়াড়েরা ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ওঠেন। উভয় তরফ থেকেই আই এফ এ'র সম্পাদক শ্রীঅশোক ঘোষকে বারবার এ বিষয়ে আবেদনও জানান হয়। কিন্তু অশোকবাবু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন এ খেলা ইডেনে করাতে। তার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টাও করেছেন। মাঠের চারপাশে বড় বড় নালা কাটিয়েছিলেন ও ইলেকট্রিক পাম্প বসিয়েছিলেন মাঠ থেকে জল বার করে দেবার জন্য। কিন্তু তার সব প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হয় এবং তিনি বাধ্য হন খেলাটি মোহনবাগান মাঠে বদলি করতে।

এদিকে মোহনবাগান মাঠে খেলাটি সাধারণ ম্যাচ হিসেবে অনুষ্ঠিত হবার খবর পেয়ে, উভয় দলের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা যেমন খুশী হন—অপরদিকে মোহনবাগান মাঠে মাত্র ২৮ হাজার দর্শক ধরার কথা ভেবে গুটিকয় ভাগ্যবান ছাড়া অধিকাংশ ফুটবল-রসিকরাই হতাশায় ভেঙে পড়েন। অবশ্য এবার তাদের সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছিল টেলিভিশন। খেলাটি তাৎক্ষণিক দেখিয়ে তারা কত অগণিত মানুষকে যে আনন্দ ও নিরানন্দ দিয়েছেন তার সঠিক হিসেব নেই।

খেলার বিবরণী লেখবার আগে, যে মাঠে বা পিচে খেলা হয়, সেই প্রসঙ্গে কিছু আলোচনার বিশেষ দরকার। ক্রিকেটিয়ারদের মত মাঠের পিচ নিয়ে অনুযোগ বা প্রতিবাদ করার সুযোগ ফুটবলারদের নেই। আলোর অভাব, চুনের দাগ দেখা না গেলে এবং বল জলে ভাসলে—তবেই খেলা পরিত্যক্ত হতে পারে। তবু ফুটবলাররা তাদের ক্রীড়া-দক্ষতা পরিপূর্ণভাবে দেখাবার জন্য এমন মাঠ খোঁজে যেখানে সে তার শরীরের পুরোপুরি ভারসাম্য রেখে অন্তত ছুটতে পারে এবং বল যেন অযথা না লাফিয়ে কিংবা গতি অনুযায়ী মসৃণভাবে গড়িয়ে যায়।

উপরোক্ত কারণগুলির অভাব ঘটলেই খেলোয়াড়ের ক্রীড়া-দক্ষতায় টান পড়ে এবং সেক্ষেত্রে খেলার মান নেমে যাওয়াই স্বাভাবিক।

॥ ২ ॥

৯ জুলাই, ১৯৭৭, শনিবারের সকালটা বর্ষার ভিজে বাতাস আর হাল্কা রোদে ছিল নয়নমনোহর। খেলার আগে তিনটে নাগাদ এক পশলা বৃষ্টি সমগ্র আবহাওয়াটাকে আরও মসৃণ ও চোয়াল-কষা ফুটবল খেলার উপযোগী করে তুলেছিল। খেলার পিচ অবশ্য অল্প-বিস্তর পিচ্ছিল হয়ে উঠেছিল।

ইস্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক ভাস্কর গাঙ্গুলি একটি আক্রমণ নিষ্ফল করে দিলেন

উগ্র সমর্থকরা বোধহয় খেলার অনেক আগে মাঠে ঢুকে স্নায়ুর উত্তেজনায় ভুগছিলেন। ৬০ পয়সার গ্যালারীর দিকে তাই সামান্য ফ্ল্যাগ টাঙানো নিয়ে দুই দলের মারাত্মক ইঁট ছোড়াছুঁড়ির ফলে প্রায় একশত জন আহত। খানিকক্ষণ পরে দেখি বেড়ার ভিতর দিয়ে একজন বিরোধীপক্ষের অপরজনের দিকে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে সন্ধি স্থাপন করলেন।

স্বাভাবিক কারণে উভয় দলের খেলোয়াড়রাই স্নায়ুর চাপে ভুগছিলেন। তবে তার প্রকাশ অপেক্ষাকৃত ভাবে মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়দের মুখেই বেশি পরিলক্ষিত হয়। তারাই প্রথমে মাঠে নামলেন—মুখে তাদের বিজয়ী হবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। চোখগুলো চিক্‌চিক করে জ্বলছিল।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অধিনায়ক শ্যামল ঘোষ তার দলবল নিয়ে মাঠে নামল সবশেষে। কোন জ্যোতিষী নাকি তাকে এই অনুরোধ করেছিল। কপালে তাদের প্রত্যেকের লাল সিঁদুরের টিপ—লম্বালম্বি টানা। মুখ দেখে তাদের ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, তারা উত্তেজিত না সচকিত।

উভয় দলের খেলোয়াড়রা যখন বল নিয়ে মাঠের ভিতর গা গরম করছিল, রেফারী দিলীপ সেন কোনার দিকে মাঠের লাইন বরাবর অগণিত লোকেদের বসে থাকতে দেখে খেলা শুরু করবেন কিনা সেই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না, অশোক ঘোষ যখন পুলিস কমিশনারের সঙ্গে লোক সরাবার জন্য পাগলের মত ছোটাছুটি করছিলেন—তখন আমি দুদলের খেলোয়াড়দের আলাদা আলাদা ও পরে মিলিতভাবে শক্তির পরিমাপটা বার করবার চেষ্টা করছিলাম।

এই বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে, সুতারকিন স্ট্রীটে, আই, এফ, এ অফিসে মোহনবাগানের পক্ষে যখন বিশ্বজিৎ, সুধীর, গৌতম, শ্যাম ও শুভঙ্কর—একের পর এক সই করছিল তখন এ অপ্রত্যাশিত সাফল্যতা জুড়ে উপচে পড়া মোহনবাগানের সমর্থকদের চোখের ছবিটা প্রতি মুহূর্তে আশা আর প্রত্যাশায় বদলে যাচ্ছিল।

অপরদিকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুর চার পাশে অগণিত ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা অসহায় ক্ষোভে নিজেদের মুঠিটা চেপে ধরে নিজেদের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিলেন—আমাদের উলগা আছে। আমরা দারুণ খেলেছি তুরস্কে আর পাকতাকোরের বিপক্ষে। আমরা নতুন করে দেখিয়ে দেব তরুণদের দিয়ে কি ভেল্কি দেখানো যায়।

ফেডারেশন কাপের ফাইনালে মোহনবাগান যখন হারল এবং সারা টুর্নামেন্টে ৮খানা গোল খেল তখন এ বছরে মোহনবাগানের সাফল্য নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু প্রদীপ ব্যানার্জী আশা দিয়ে বলেছিলেন—আমরা বিনা প্রস্তুতিতে খেলতে গিয়েই এ বিপত্তি।

অপরদিকে ইস্টবেঙ্গল যখন লীগের খেলা শুরু করল তখন তাদের রক্ষণভাগেও ফাটল দেখা গেল। সাধারণ টিমের কাছেই তারা তিনটি গোল খেয়ে বসল। ক্লাব-কোচ অমল দত্তও অবশ্য এক্ষেত্রে আশা দিয়ে বললেন—দল প্রস্তুতির প্রথমদিকে এ ঘটনা এমন কিছু নয়—যা নিয়ে চিন্তার কারণ আছে। চার-পাঁচটা খেলার পর এ ভ্রান্তি আমরা শুধরে নেব।

॥ ৩ ॥

সমর্থকদের উল্লাস, সমবেত হুংকার—সব স্থির হয়ে গেল রেফারী দিলীপ সেনের খেলা শুরুর বাঁশি বাজবার সঙ্গে সঙ্গে। মাঠের ২৮ হাজার দর্শক, সবাই যেন নিজের ভিতর নিজেকে গুটিয়ে নিল—কি এক অপ্রত্যাশিতের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায়, যার জন্য প্রতি মুহূর্তকে তারা তিল তিল করে জমিয়েছে।

মোহনবাগান কোনার এবং ইস্টবেঙ্গল ইডেনের দিক

থেকে খেলা শুরু করল। বারো সেকেন্ডের মাথায় সমরেশ মধ্য-মাঠ থেকে ডান পায়ের ইন-সুইংএ একটা ছু পাস বাড়াল প্রদীপ চৌধুরী আর দিলীপ পালিতের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে অপেক্ষমান উলগানাথনের দিকে। উলগা দিলীপকে পিছনে ফেলে তীব্রবেগে ছুটে এসে বলটিকে ধরে কিছুটা ডানদিকে, ব্যাক-এরিয়ার কোণায় পৌঁছে যায় এবং ঐ দুরূহ কোণ থেকেই শট নেয় একেবারে বিশ্বজিতের হাতে।

খেলা তখন দু'মিনিট গড়িয়েছে—বিদেশ বাম প্রান্তে তীব্র বেগে চিন্ময় ও রমেনকে কাটিয়ে সেন্টার পাস করে দিল অরক্ষিত হাবিবকে। হাবিব সেই বল চকিতে বাঁ পায়ে তীব্র শটও নিয়েছিল ডান দিকের পোস্টের একেবারে উঁচু দিকের কোণায়। কিন্তু ভাস্কর অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেই বল ডান হাতের মুঠি দিয়ে আলতোভাবে পোস্টের ওপর দিয়ে পার করে দেয়।

আট মিনিটের মাথায় রমেন একটা মৃদু গড়ানো সহজ বলকে মেরে বার করতে গিয়ে ফস্কে গেল। সামনেই অপেক্ষমান হাবিব বলটিকে পেয়েওছিল গোল থেকে মাত্র দশ-বারো গজ দূরত্বে বিনা বাধায়—কিন্তু সেও তাড়াহুড়ো করে বলটিকে ভাস্করের হাতে স্রেফ তুলে দিল।

এরপর থেকে ক্রমশ খেলাটা আক্রমণ ও পাল্টা-আক্রমণে বেশ জমে উঠেছিল। এরই ভিতর মোহনবাগান পর পর তিন চারটে কর্নার পায় কিন্তু কোনটাই ইস্টবেঙ্গলের প্রতিরক্ষায় ফাটল ধরাতে পারে না।

চোদ্দ মিনিটের মাথায় মাঝ মাঠে ফ্রি-কিক পেল ইস্টবেঙ্গল। এবং কিকটি নিল সমরেশ। সুরজিতের মাথায় সিধেসিধি তুলে দেওয়া বল বার করতে প্রদীপ চৌধুরী একটু দেরি করেছিল; সেই সুযোগে সুরজিত মাথা দিয়ে বল ফ্লিক করে দেয়—দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মিহিরের দিকে। মিহিরের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা একমাত্র ডিপ-স্টপার সুব্রত ডানদিকে, কিছুটা আয়ত্তের বাইরে খোলা জায়গায় বলটা উঁচু হয়ে পড়ছিল। মিহির আর সুব্রতকে কভার করবার সুযোগ দেয়নি। দুরন্ত লাট্টুর মত শরীরটাকে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ঘুরিয়ে, বাঁ পায়ে তীব্র ভলি নিল গোলের দিকে। আমরা খালি দেখলাম—একটা জ্বলন্ত কামানের গোলার মত বলটা গোলের ভেতর কোণাকুনি ঢুকে গেল। বলটি জাল থেকে স্রেফ কুড়িয়ে দেওয়া ছাড়া বিশ্বজিতের আর কিছু করণীয় ছিল না। আমার পাশ থেকে এক বিদগ্ধ সাংবাদিক কঁকিয়ে উঠলেন—এ ধরনের গোল দেখবার জন্য আমি হাজার মাইল পায়ে হেঁটে যেতেও রাজী।

প্রথম গোলের ঠিক পাঁচ মিনিট পর বাম প্রান্তে সুরজিতকে ফাউল করল সুধীর। এবারও ফ্রি কিক নিতে এগিয়ে এল সমরেশ। অনেক দূর থেকে বলেই বোধ হয় সুধীর ছাড়া আর কোন মোহনবাগানের খেলোয়াড় প্রতিরোধের দেওয়াল তুলতে এগিয়ে এল না। সমরেশের কাছে সেটা আশীর্বাদের মতই। সে সোজাসুজি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বজিতকে দেখবার সুযোগ পেল। বিশ্বজিত দাঁড়িয়ে ছিল পোস্টের মাঝখানে কিছুটা তার বাঁ-দিক চেপে। সমরেশ সেই সুযোগটাই নিল—মারল ডান পায়ের লেট-ইনসুইং অর্থাৎ যে বল একেবারে লক্ষ্যের কাছে গিয়ে বাঁক নেবে। ফার্স্ট-পোস্টের উঁচুদিকে একেবারে বার ঘেঁষে বল ঢুকে গেল জালের ভেতর। বিশ্বজিত ছুটে এসে বল থামাতে গিয়েও বিফল হল। মিহিরের প্রথম গোল যদি শক্তি ও গতির অপূর্ব সমন্বয়ের হয়ে থাকে, তাহলে সমরেশের এই গোল—আধুনিক ফুটবলের আঙ্গিকের উপর বর্তমানে উন্নতমানের ফুটবলের দেশে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং যা বহুদিনের সাধনায় করায়ত্ত করা সম্ভব—তারই সার্থক পরিণতি।

দ্বিতীয় গোল হয়ে যাবার পর আমি আর উল্লসিত দর্শকদের দিকে কিংবা বোবা কান্নায় নিথর—ভ্যান গগের আঁকা সেই লম্বা লম্বা মুখগুলোর দিকে তাকাইনি। আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখছিলাম সেই সব ভারতবর্ষ ফুটবলার গৌতম, সুধীর, প্রসূন, হাবিব, আকবর, প্রদীপ ও অধিনায়ক সুব্রতর মুখ আর চো গুলোর দিকে। যে চোখে আগুন ছিল—সে এ নিষ্প্রভ প্রদীপের মত নিবু নিবু। যে চোয় প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়তায় শক্ত ছিল—তা ঢিলে হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ার্ধে ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণ—বিদেশ ব মিনিট পনেরো পর মিহিরকে যখন আক্রমণ থে সরিয়ে এনে অনেকটা পিছিয়ে আনা হল—ত অনেক কমে গেছে।

সেই তুলনায় মোহনবাগান তার আক্রমণধারা খানিকটা বাড়াতে সক্ষম হয়েছিল। তবে সব আক্রম গুলিই হচ্ছিল মাঝখান দিয়ে এবং এগুলির সৃষ্টি মূলে হাবিবের অবদানই সবচেয়ে বেশী ছিল। এ সময়ে মোহনবাগানের কাছে দুটি গোলের সুযো এসেওছিল। প্রথমটি নিশ্চিত হাতে গোল লাইন থে ধরে ফেলে ভাস্কর। দ্বিতীয়টি গোল লাইন থে বাঁচায় চিন্ময়।

এ উত্তেজনায় ফুটবলের পরিসমাপ্তির বাঁশি যখ বাজল তখন খেলার ফলাফল ইস্টবেঙ্গল—২ মোহনবাগান—০।

সমশক্তির এ ধরনের খেলায় যে ট্যাকটিক্যাল ভ্যারিয়েশন থাকার দরকার তা মোহনবাগানের ছিল না। তারা বোধ হয় কিছু পেটোয়া সাংবাদিকদের লেখা পড়ে স্থির প্রত্যয়ে পৌঁছেছিল যে তারা খেলার আগেই ম্যাচ জিতে গেছে। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসও পতন আনতে পারে।

পক্ষান্তরে গতবারের লীগে অনেক ভাল খেলেও ইস্টবেঙ্গলের পরাজয় তাদের আত্মমুখী ও খেলাকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে শিখিয়েছে। তারই পরিণতি এবারের জয়।

ক্রীড়া-ঐতিহাসিকরা অন্তত এ খেলার ফলাফলের সঙ্গে আর একটি সত্যকে লিখে রাখবেন যে, বয়সের গতিভারে মন্থর দলের পক্ষে তা সে যতই অভিজ্ঞতা-লব্ধ হোক না কেন উদ্দীপ্ত, তরুণ, স্কিলফুল ও লড়াকু টিমকে কোনমতেই হারানো সম্ভব নয়।

ভাস্কর আরো ভাস্বর

এর আগে মোহনবাগানে লেফট উইংগার বিদেশ বসু সম্পর্কে লিখেছিলাম, কলকাতা ময়দানে না খেলে বোম্বাইয়ের কুপারেজে রোভার্স কাপে খেলে বেশ কিছুটা চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল বিদেশ। ইস্টবেঙ্গলের বর্তমান গোলকিপার ভাস্কর গাঙ্গুলীরও বৈশিষ্ট্য আছে। কলকাতার ফুটবল লীগে কোনো ছোট ক্লাবে না খেলেও ভাস্করের প্রথম উদয় হয়েছে চাঁদের দেশে। একেবারে মোহনবাগান ক্লাবে। এবং লীগে জীবনের প্রথম খেলাটিতে যে সুনাম পেয়েছে বোধ করি কলকাতার মাঠে জীবনের প্রথম খেলায় আর কেউই এ সুনাম অর্জন করতে পারেনি। সংবাদপত্রের খেলার পাতায় শিরোনাম পেয়েছিল। লেখা হয়েছিল—"প্রথম খেলায় ভাস্কর ভাস্বর হয়ে উঠেছে।" সেটা ১৯৭৫-এর কথা। খেলাটি ছিল মোহনবাগান বনাম বি এন আর।

অপূর্ব খেলেছিল।, কতগুলি কঠিন শটই শুধু প্রতিরোধ করেনি, অনুমান শক্তি, আত্মপ্রত্যয়, এবং পজিশন জ্ঞানে দর্শকদের বাহবা আদায় করেছিল বার বার। না হলে কি প্রথম ম্যাচেই আনন্দবাজার পত্রিকার মত কাগজের শিরোনামে আসতে পারত?

বলা বাহুল্য, ভাস্কর ছিল তখন মোহনবাগানের দুই নম্বর গোলকিপার। এক নম্বর প্রশান্ত মিত্র। পরে ভাস্করকে আরও কতগুলি ম্যাচ খেলানো হয় এবং লীগের চরম খেলাটিতে ইস্টবেঙ্গলের শ্যাম থাপা মোহনবাগানের বিরুদ্ধে গোল করার কিছু পরে প্রশান্ত'র বদলে খেলানো হয় ভাস্করকে। কোনো খেলাতেই সমর্থকদের সমালোচনার কারণ হয়নি, বরং তাদের প্রতীতিকে আরও বড় করেছে। কিন্তু ভাস্করের ক্রীড়া জীবনের উপর দিয়ে বড় ঝড় বয়ে গেল সেইদিন, যেদিন শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগান ০—৫ গোলে হারল ইস্টবেঙ্গলের কাছে। ভাস্কর অবশ্য পাঁচটি গোল খায়নি। চারটি হয়েছিল তার বিরুদ্ধে, একটি পরিবর্তিত গোলকিপার প্রশান্ত'র বিরুদ্ধে।

সেদিন ভাস্কর সবচেয়ে নিন্দিত ব্যক্তি। প্রায় সবাই গালমন্দ করল। কটাক্ষ করল আনন্দবাজারের বিরুদ্ধেও। অপরাধ, আনন্দবাজার তাকে গাছে চড়িয়ে দিয়েছে। প্রথম ম্যাচেই ভাস্বর করে তুলেছে। কিন্তু কেউ ভেবে দেখল না এত বড় ম্যাচ, যে ম্যাচ খেলতে ঝানু খেলোয়াড়দেরও পা কাঁপে, বুক টিপ্‌টিপ্ করে, সে ম্যাচের লাস্ট লাইন অফ ডিফেন্সে ১৮ বছরের এক আনকোরা তরুণকে নামানো ঠিক হয়েছে কিনা। গোলগুলির ক্ষেত্রে ভাস্করের দায় দায়িত্ব কতখানি ছিল তাও বিচার করা হল না। খেলার শেষে দর্শক সমর্থকদের দুয়ো-র মধ্যে ভাস্কর টেন্টে ফিরলে সেদিন একজনই ওকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। পিঠে হাত রেখে কোচ অরুণ ঘোষ বলেছিলেন, "দুঃখ করিস না, অনেকে অনেক কিছু বলে, খেলায়ও অনেক কিছু ঘটে যায়। ভাল খেলার সময় তোর পড়ে আছে।"

সরল প্রাণে, কাঁচা মনে আঁচড় পড়লে সহজে মেলাতে চায় না। ভাস্কর সান্ত্বনা খুঁজে পায়নি। পরে মাঝে মাঝে ভেবেছে খেলা কি ছেড়ে দেবে? এমন এক অবস্থার মধ্যেই দমদম দুর্গানগরে শ্রীনিত্যগোপাল গাঙ্গুলীর বাড়িতে হঠাৎ হাজির হলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের দুই জবরদস্ত কর্মকর্তা। ভাস্করের বাবা নিত্যগোপালবাবুকে তাঁরা বললেন, "এই পাঁচ-গোল খাওয়া গোলকিপারকেই আমাদের দিন। আমরা জানি ওর মধ্যে কী আছে।"

গতবার ডুরাণ্ডে বর্ডার সিকিউরিটির বিরুদ্ধে ভাস্কর খুবই ভাল খেলে। মনজিৎ সিংয়ের রকেটের মত একটি দুর্দান্ত শট বাঁচানোর পরে মনজিৎ বিড়-বিড় করে বলে, "ইয়ে ভি সেভ হো গিয়া।" এ বছর পাখতাকোরের বিরুদ্ধেও অসাধারণ খেলেছে। কিন্তু লীগে ভাস্করের বিরুদ্ধে দু তিনটি গোল হওয়ায় ওর যোগ্যতা সম্পর্কে আবার প্রশ্ন উঠেছে। কেউ কেউ উপহাস করে বলেছে,—"ভাস্করই বটে, তবে কক্ষচ্যুত।"

গত ৯ জুলাই ইস্টবেঙ্গল—মোহনবাগান খেলার দিন দুপুরে কোচ অমল দত্তর নামে একটি চিঠি আসে। লিখেছেন ইস্টবেঙ্গলের এক পাগলা সমর্থক। তিনি লিখেছেন—"খবরদার অমলদা, ভাস্করকে খেলাবেন না। ওর মত গোলকিপার ডজন ডজন আছে। ওকে খেলালে ইস্টবেঙ্গল হারবে। আপনিও মারা পড়বেন। খবরদার। খবরদার!!"

অমলবাবু হেসে চিঠিখানা পকেটে পুরলেন। ভাস্করকে বললেন, "আজ তোমার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। সব অপবাদের জবাব দিতে হবে।" সাহস জোগালো শ্যামল ঘোষ ও সুরজিৎ সেনগুপ্ত। শঙ্কর মালী হাত দুখানা জড়িয়ে ধরে বলল, "ভাস্কর দাদা, আজ তোমাকে দারুণ খেলতে হবে।"

সত্যিই দারুণ খেলেছে। ফুটবল মাঠে মোহন-বাগান-ইস্টবেঙ্গল মহারণে 'ম্যান অফ দি ম্যাচ'-এর সম্মান পেয়েছে ২০ বছর বয়সী তরুণ গোলকিপার ভাস্কর গাঙ্গুলী। একটিও ভুল করেনি, বিপদের মুখে বিচলিত হয়নি। নিশ্ছিদ্র আত্মপ্রত্যয়ের সব আক্রমণ রুখে দিয়ে আরও ভাস্বর হয়ে উঠেছে। ১৯৭৫-এর ৩০ সেপটেম্বর শীল্ড ফাইনালের কুকম্বৃতি মুছে দিয়েছে ৯ জুলাইয়ে সাফল্যের স্বর্ণদ্যুতিতে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, ফুড কর্পোরেশনের কর্মী ভাস্করের জন্ম ৫৬ সালের ডিসেম্বরে দমদম ক্যান্টনমেন্টের নলতায়। পড়ত বৈদ্যনাথ ইনস্টিটিউশনে। সেখানেই ফুটবলের পায়ে খড়ি। নাকি গোলকিপার বলে হাতে খড়ি? পরে বেলঘরিয়ায় কর্নারে খেলা শিখেছে সুধাব্রত ব্যানার্জীর কাছে। আরও পরে ভেটারেন্স ক্লাবের ট্রেনি হয়ে পরিতোষ চক্রবর্তী, সুনীল ভট্টাচার্য ও অবনী বসু'র কাছে। ৭৪-এ আই এফ এ শীল্ডে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলে খেলে প্রথম ফুটবল বোদ্ধাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার পরের বছরই যায় মোহনবাগানে।

মজবুত দেহ গঠনের জন্য আপাত দৃষ্টিতে ভাস্করকে বেঁটে বলে মনে হয়। কিন্তু মোটেই বেঁটে নয়। এখন মোহনবাগানের গোলকিপার বিশ্বজিতের চেয়ে ভাস্কর ইঞ্চিখানেক মাথায় উঁচু। ৭৬-এ দুজন যখন ইস্টবেঙ্গলে ছিল তখন ভালভাবেই ওটা মালুম হয়। ভাস্করের দেহের উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি।

বেশ বলিষ্ঠ দেহ কিন্তু নমনীয়। ফ্লেক্সিবিলিটি, অ্যালার্টনেস ও এজিলিটি চমৎকার—বিখ্যাত গোলকিপার তরুণ বসুর প্রথম দিকে যেমনটি ছিল ঠিক তেমনই। সদা জাগ্রত তৎপরতা, দেহের নমনীয়তা ও সাবলীলতা ছাড়া কোনো গোলকিপারই বড় গোলকিপার হতে পারে না। শুরু থেকে ভাস্করের এসব গুণ তো ছিলই, তার উপর ছিল দারুণ টেনাসিটি—আরও বড় হবার, আরও ভাল হবার উদগ্র বাসনা। সনৎ শেঠের মত হব, প্রদ্যোত বর্মণ হব কিংবা হব থঙ্গারাজের মত—এই স্বপ্ন দেখত। চোখের সামনে ছিল তরুণ বসু, যার কথা সব সময় বলে এবং মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলার পর যে একশ টাকা ভাস্করকে উপহার দেয়।

সবচেয়ে বড় কথা, সাময়িক বিপর্যয়ে কোনোদিন নিজের উপর বিশ্বাস হারায়নি। খেলার সুযোগ না পেয়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিচলিত হয়নি। নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করেছে প্রতিদিন। এ ব্যাপারে অবশ্য ওর বর্তমান কোচ অমল দত্তর অবদানও অনেকখানি। ৭৬-এ ভাস্কর যখন মোহনবাগান ছেড়ে ইস্টবেঙ্গলে এল অমলবাবু ওকে বললেন, তুমি নিজের উপর আস্থা হারিও না। তোমার সব কিছু আছে, নিয়মিত অনুশীলন করে যাও, নিশ্চয়ই ফল পাবে।

৭৬-এ অমলবাবু ভাস্করকে কিন্তু দু তিনটি অপ্রধান লীগ ম্যাচ ছাড়া বড় ম্যাচে খেলাননি। কারণ-স্বরূপ বললেন, শীল্ড ফাইনালে চারটি গোল খাওয়ার পর ভাস্কর যদি কলকাতায় আবার বড় খেলায় ব্যর্থ হত তবে ওর মনের উপর দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হত। তাই কলকাতার দর্শকদের সামনে বড় ম্যাচে ওকে আমি চান্স দিইনি।

ভাস্করের টেকনিক্যাল দিক সম্পর্কে কোচ অমল দত্তর অভিমত: লাইনের উপর ভাস্করের চেয়ে ভাল গোলকিপার এখন ভারতে নেই। লাইনে খেলার এই গুণ ভাস্করের আগেও ছিল। ঘাটতি ছিল এগোনো পিছানো সম্পর্কে। কখন গোল লাইন ছেড়ে বের হতে হবে, কখন বের হতে হবে না, কতটা এগোতে হবে, এয়ারে কোন বল গ্রিপ করতে হবে, ফিস্ট করতে হবে কোন্ বল—এই সব টেকনিকে ওকে বছর খানেক তালিম দিয়েছি। ওর অধ্যবসায়ও আমাকে মুগ্ধ করেছে।

প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ একজন গোলকিপার যে মোহনবাগান—ইস্টবেঙ্গল লীগ ম্যাচ খেলেছে, খেলেছে শীল্ড ফাইনাল সে খেলার চান্স পাচ্ছে না বলে একটুও মুষড়ে পড়েনি। এখনো অনুশীলনের সময় সবার আগে মাঠে নামে, সবার শেষে মাঠ ছাড়ে। অনেকদিন দেখেছি প্র্যাকটিসের পর ভাস্করকে নিয়েই অমলবাবু পড়ে থাকেন। আরও আধ ঘণ্টা বা তিন কোয়ার্টার। তখন মানি চালেঞ্জে শুটিং চলে। শর্ত থাকে—ভাস্করকে যে গোল দিতে পারবে অমলবাবু তাকে টাকা দেবেন। প্রতি গোলের জন্য এক টাকা। দুই-তিন-পাঁচ-সাত-দশ টাকা পকেট থেকে চলে যায়। পেনাল্টি স্পটের দেড়-দুই গজ দূর থেকে বোমার মত বল চালিত হতে থাকে সুরজিৎ সেনগুপ্ত, উলাগানাথন, মিহির বসু, রঞ্জিৎ মুখার্জি, পিন্টু চৌধুরী প্রভৃতির পা থেকে। বলা বাহুল্য পিন্টুই বেশি সফল হয়, বেশি টাকা পায়। অপর খেলোয়াড়রাও পায় নিশ্চয়ই। তবে একটি টাকার জন্য অনেকখানি কেরামতির দরকার হয়। কারণ লাইনে ভাস্করকে শটে পরাজিত করা খুবই শক্ত।

মুকুল

নতুন বই

উপন্যাস

দ্বিতীয় দিগন্ত। রমেন্দ্রনাথ মল্লিক। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, বিধান সরণী, কলি-৬। আট টাকা

দূরের নদী। সন্তোষকুমার ঘোষ। দে'জ পাবলিশিং প্রাঃ লিঃ, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩। পাঁচ টাকা

বেহুলা। চিত্ত সিংহ। সৃজনী, ৪ ভুপেন বোস এভিন্যু কলকাতা-৪ ; ৯/৩, টেমার লেন, কলকাতা-৯। ছয় টাকা

ঝাঁকি দর্শন। বুদ্ধদেব গুহ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯। ছয় টাকা।

দ্বিতীয়া। রমাপদ চৌধুরী। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ-৭৩। ছয় টাকা।

মহাকালের রথের ঘোড়া। সমরেশ বসু। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলিঃ-৯। দশ টাকা

কবিতা

জন্মের ভিটে। রণজিৎ সিংহ। কথাশিল্প, ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩। ছয় টাকা।

দেবার্চনাকে। জয়ন্ত ঘোষ। পারমিতা প্রকাশনী, ৩/২ কামারডাঙ্গা রোড, কলি-৪৬। প্রাপ্তি-স্থান : লেখক সমবায় সমিতি। এক টাকা

ভেঙে যায় অনন্ত বাদাম। বিজয়া মুখোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিঃ-৯। পাঁচ টাকা

উত্তরে থাকো মৌন। বিষ্ণু দে। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিঃ-৯। পাঁচ টাকা

শিশু সাহিত্য

সেই অদ্ভুত অশ্রুধ্বনি। সুবোধ ঘোষ। আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিঃ-৯। ৫·০০

রাজা হওয়ার ঝকমারি। বিমল মিত্র। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯। ৭·০০

প্রবন্ধ

পথের শেষ কোথায়। আবু সয়ীদ আয়ুব। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলি-৭৩। বারো টাকা

ইন্দিরা-একাদশী। বরুণ সেনগুপ্ত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯। পাঁচ টাকা (সুলভ)।

কাজী নজরুলের গান। নারায়ণ চৌধুরী। এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ-৭৩। পাঁচ টাকা

আমাকে বলতে দাও। গৌর-কিশোর ঘোষ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯। ৭·০০

বিবিধ

পর্যটকের পত্র। প্রবোধকুমার সান্যাল। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩। পনের টাকা

শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মা কথামৃত। গঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী কথিত। দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ-৭৩। দশ টাকা

প্রতিবাদের একাঙ্ক। বোম্মানা বিশ্বনাথম্ সম্পাদিত। নবগ্রন্থ কুটির, ৫৪/৫এ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩। ছয় টাকা

অনুবাদ

কৃষণ চন্দরের গল্প। বোম্মানা বিশ্বনাথম্ অনূদিত। নবগ্রন্থ কুটির, ৫৪/৫এ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩। চার টাকা

ঝাড়লণ্ঠন। আরিগপুড়ি রচিত। বোম্মানা বিশ্বনাথম্ অনূদিত। নবগ্রন্থ কুটির, ৪৫/৫এ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩। ছয় টাকা

চেকভের নির্বাচিত সংকলন। অসিত সরকার। ধ্রুপদী, ৭/১বি অনরেট সেকেন্ড লেন, কলকাতা-১৪। দশ টাকা

জুল ভের্নের বৈজ্ঞানিক নিরুদ্দেশ। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ধ্রুপদী, ৭/১বি অনরেট সেকেন্ড লেন, কলি-১৪। দশ টাকা

ভ্রমণ

লন্ডনের পিয়াসী (২য় খণ্ড)। বিমল দে। ধ্রুপদী, ৭/১বি অনরেট সেকেন্ড লেন, কলকাতা-১৪। দশ টাকা

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি বই

বঙ্কিমচন্দ্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৭৭। মূল্য দশ টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনা ও মন্তব্য সংকলন হয়েছে এই বইতে। একসঙ্গে এই লেখাগুলি পেয়ে মনে হচ্ছে, এই দুই মনীষীকে এক মলাটে বন্দী করা বহু আগেই উচিত ছিল। সংকলয়িতা অমিয়সূদন ভট্টাচার্য এবং বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগকে ধন্যবাদ, বহুদিনের প্রত্যাশিত একটি গুরু দায়িত্ব তাঁরা নিষ্ঠা ও পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে পালন করেছেন। বঙ্কিম জন্মশতবর্ষ এবং রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ এই দুটি বড় উপলক্ষ চলে গেছে, অথচ এই কাজটি হয় নি, এইটেই আশ্চর্য। এই সংকলনের বিষয়সূচীতে আছে বঙ্কিম জন্ম শতবর্ষ উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের কবিতা—পাণ্ডুলিপি চিত্রেই সেই কবিতাটি শোভা পাচ্ছে। তারপরে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর চৈতন্য লাইব্রেরীতে পঠিত বিখ্যাত 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ। তারপর আছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্রে'র দীর্ঘ সমালোচনা, 'রাজসিংহে'র সমালোচনা, জীবন স্মৃতির 'বঙ্কিমচন্দ্র' অধ্যায়, 'প্রচারে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধের উত্তরে লেখা 'ভারতী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ 'একটি পুরাতন কথা' এবং 'প্রচারে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যুত্তর 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও নব হিন্দু সম্প্রদায়' পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'কৈফিয়ত' প্রবন্ধটি। এর পরে 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ' এই শিরোনামে বঙ্কিম-সাহিত্য ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চব্বিশটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য সংকলন করা হয়েছে। অবশেষে বঙ্কিম জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৩৮ সালের ৬ আগস্ট শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাটি ('ভাষণ') দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আছে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের প্রথম স্তবকের রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুরের স্বরলিপি এবং পরিশিষ্টে বঙ্কিমচন্দ্রের যে দুটি প্রবন্ধ বঙ্কিম-রবীন্দ্র বিতর্কের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল সেই দুটি প্রবন্ধ। এতে বঙ্কিম-রবীন্দ্র বিতর্কের সূত্রগুলি অনুসরণ করার পক্ষে পাঠকদের খুবই সুবিধা হবে। প্রচ্ছদে আছে বঙ্কিমের জীবিত-কালেই আঁকা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বঙ্কিম প্রতিকৃতি, ভেতরে আখ্যাপত্রের সামনে আছে তরুণ বঙ্কিমের তেজোদীপ্ত ছবি। 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রয়োজনীয় সংবাদ দেওয়া আছে। কিছু কিছু প্রবন্ধের বর্জিত অংশগুলিও দেওয়া আছে এবং বর্জিত অংশগুলির মধ্যে কিছু কৌতূহলজনক তথ্যও আছে। সব মিলিয়ে সংকলনে যে খুবই যত্ন নেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এবার বঙ্কিম-রবীন্দ্র-পরিচয়ের ক্রমিক ইতিহাসটি এই সংকলিত রচনাগুলি থেকে স্পষ্ট করা যাক। বঙ্কিমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম দেখেন সেই দেখার বিস্ময় ও উপলব্ধি লক্ষ্য করবার মতো। অন্তত দুবার তিনি এই অবিস্মরণীয় স্মৃতিচারণা করেছেন। একবার বঙ্কিমের মৃত্যুর পরেই লেখা 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে, আরেকবার 'জীবনস্মৃতি'র 'বঙ্কিমচন্দ্র' অধ্যায় লিখতে গিয়ে। দুটি স্মৃতিচারণার মূল বক্তব্যে বিশেষ তফাত নেই। সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আমন্ত্রণে 'মরকতকুঞ্জে' 'কলেজ রি-ইউনিয়ন' নামে একটি মিলনসভায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম দেখেন।

সেখানে পরিচিত-অপরিচিত বহু মনীষীর সম্মিলন হয়েছিল। কিন্তু অতো বিখ্যাত পণ্ডিত-মনীষীদের মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বল কৌতুক প্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকান-পরা বুকের ওপর দু হাত আবদ্ধ রেখে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। মনে হয়েছিল তিনি সকলের চেয়ে আলাদা এবং আত্মসমাহিত। 'আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন।' মুখশ্রীতে ছিল প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা। পরে বহু আলাপ-পরিচয়ে সেই প্রখরতা স্নেহে ও হাসিতে অনেকবার গলে গেছে, কিন্তু প্রথম দেখার সেই 'উদ্যত খড়্গের' মতো উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ প্রবলতাই মনের মধ্যে স্থায়ী হয়ে গেছে। সেই উৎসবেই এক পণ্ডিতমশাই পতিত ভারত সন্তানকে লক্ষ্য করে একটি বীভৎস রসিকতা করায় বঙ্কিম ডান হাতে মুখ ঢেকে ঘর থেকে চলে গেলেন। সেই প্রথম স্মৃতির সঙ্গে বঙ্কিমের এই 'সসংকোচ পলায়ন' দৃশ্যটিও স্থায়ী হয়ে আছে।

এর পরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা সন্ধ্যা সংগীতের কবিকে বঙ্কিমের পুষ্পমাল্য অর্পণ। সংকলয়িতা ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন 'নিবেদন'-এ। কিন্তু ঘটনাটি যে 'জীবনস্মৃতির' 'গঙ্গাতীর অধ্যায়ে' আছে তা বলে দিলে ভালো হতো। 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গে' এই ঐতিহাসিক ঘটনাটির উদ্ধৃতি
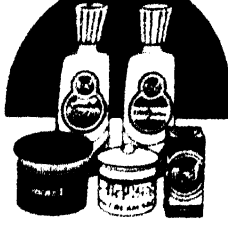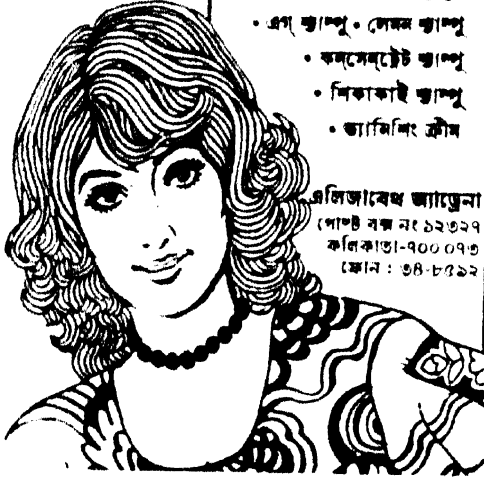
দেওয়াও বোধ হয় উচিত ছিল। এর পরে রবীন্দ্রনাথ যখন 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' লিখে কথাসাহিত্যের আসরে নামলেন তখন বঙ্কিমই তাঁকে অযাচিতভাবে ইংরেজিতে একটি চিঠি লিখে প্রশংসা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, পুরের যে পরিণতি অজানা ছিল সেইটি তাঁর কাছে কিছু আমার আশ্বাস এনেছিল। তাঁর কাছে এই উৎসাহবাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।'

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রবল লেখনী গদ্যে-পদ্যে সৃষ্টি হাঁকিয়ে চলেছে। স্বদেশ-চিন্তা, মাতৃভাষা চেতনা, শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে বঙ্কিমের অসাধারণ কীর্তিকে তিনি সবিনয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছেন। অন্তত 'পঞ্চভূত' পর্যন্ত বেশ কিছু রচনায় বঙ্কিমের বাংলাভাষা চর্চা ও বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা রবীন্দ্রনাথকে সচেতন করেছে, বঙ্কিম সাহিত্যের নারী-পুরুষ চরিত্রের বৈচিত্র্য তাঁকে মুগ্ধ করেছে। ইতিমধ্যে 'বঙ্কিমবাবু'র সঙ্গে 'রবীন্দ্রবাবু'র তর্ক হয়ে গেছে একচোট—'প্রচার' ও 'ভারতী'-তে 'রবীন্দ্রবাবু' বলেছিলেন, 'আদি ব্রাহ্ম সমাজের নিকটে বঙ্কিমবাবু নিতান্তই তরুণ। বোধ করি বঙ্কিমবাবু যখন জীবন আরম্ভ করেন নাই তখন হইতে আদি ব্রাহ্ম সমাজ নানাদিক হইতে নানা আক্রমণ সহ্য করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কখনোই তাঁহার ধৈর্য বিচলিত হয় নাই।' 'বঙ্কিমবাবু' উত্তরে লিখেছিলেন, 'রবীন্দ্রবাবু যখন ক, খ, শিখেন নাই তাহার পূর্ব হইতে এরূপ সুখ-দুঃখ আমার কপালে অনেক ঘটিয়াছে।' শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমবাবু রবীন্দ্রবাবুকে সাবধান করে দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। আর রবীন্দ্রবাবু জানালেন, বঙ্কিমবাবু তাঁর সরল আত্মপ্রকাশকে যেন ভুল না বোঝেন।

যাই হোক, বাদ-বিসম্বাদ, শ্রদ্ধা ও উৎসাহের আদান-প্রদান যখন জমে উঠেছে তখন বঙ্কিমের মৃত্যু হলো। বঙ্কিমের মৃত্যুতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হলো তাকে যে পূরণ করা যায় না এটা সকলেই বুঝেছিলেন, কিন্তু 'শোকসভা' করে তাঁর যথার্থ কীর্তিটিকে বঙ্কিমবান্ধবেরাও যখন বিচার করতে অস্বীকার করলেন তখন সেই তরুণ রবীন্দ্রবাবুই এগিয়ে এসে পিতৃতুল্য বঙ্কিম-বন্ধুদেরই বললেন: 'তাঁহারা বঙ্কিমের নিকট হইতে কেবলমাত্র উপকার পান নাই বন্ধুত্ব পাইয়াছেন, তাঁহারা কেবল রচনা পান নাই, রচয়িতাকে পাইয়াছেন। অর্থ থাকিলে প্রস্তরমূর্তি স্থাপন করা সহজ, কিন্তু বঙ্কিমকে বন্ধুভাবে মনুষ্যভাবে মনুষ্যলোকে প্রতিষ্ঠিত করা কেবল তাঁহাদেরই প্রীতি এবং চেষ্টাসাধ্য। তাঁহাদের বন্ধুকে কেবল তাঁহাদের নিজের স্মরণের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে যথার্থ বন্ধুঋণ শোধ করা হইবে না।'

অতএব পিতৃ-ঋণ, কিংবা বলা যেতে পারে, উত্তরাধিকারীর কৃতজ্ঞতা অবিস্মরণীয় এক প্রবন্ধ 'বঙ্কিম... লিখে। বঙ্কিমের কীর্তি নিরূ... প্রায় শেষ কথাগুলিই তুলনা... ভাষায় বলা হলো। মাতৃভাষার জ... মুক্তির জন্যে বঙ্কিম যে সংগ্রাম ক... গেছেন, সে সংগ্রামের রক্তচিহ্ন তিনি... বুকে নিয়ে গেছেন। তাঁরই প্রতিভা... তাঁর সংগ্রাম চেষ্টাকে আমাদের কা... অনায়াস-সাধ্য করে দিয়ে গেছে... তিনি।

কিন্তু প্রতিভা বৌদ্ধিক প্রদর্শি... পথে চলে না। 'কৃষ্ণচরিত্র' ... 'রাজসিংহে'র আলোচনা করে ... রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের কথাসাহিত্যে... নৈতিক শাসনের সংকীর্ণ পথ ছেড়ে... খাঁটি মনুষ্যের ভিত্তিতে নৈতিক... শাসনমুক্ত এক মাপকাঠি খুঁজে নিলে... 'সাধনা'র যুগে। সজীব মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে সাহিত্য-বিচার করতে বললেন। বঙ্কিমের সাহিত্যিক আদর্শ ছেড়ে তিনি আমাদের কথাসাহিত্যের দুটি দিকের ওপর ঝোঁক দিতে বললেন। এক, মানুষের তত্ত্বকথা চাই না। কাটা-ছেঁড়া মানব চাই না। সম্পূর্ণ মানবপ্রকাশ চাই। দুই, জাতীয় জীবনের মনোময় ও প্রাণময় ধারার সঙ্গে কথাসাহিত্যকে যুক্ত করা চাই। 'সাহিত্যের গৌরব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দুটি কন্টিনেন্টাল উপন্যাসকে সামনে রেখে বঙ্কিমের পথ ছেড়ে চলে আসতে চাইলেন। পরে 'চোখের বালি' ও 'গোরা'-তে তিনি সে আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে নিয়েছেন। সংকলয়িতা যদি 'সাহিত্যের গৌরব' প্রবন্ধের ওই সব অংশ উদ্ধার করতেন তাহলে বঙ্কিমোত্তর কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পদক্ষেপ স্পষ্ট হতো। যে-অংশটুকু তুলেছেন তাতে সাহিত্য পাঠকের বিচার-বুদ্ধির সমালোচনা আছে, বঙ্কিমকে উত্তীর্ণ হবার চেষ্টাটুকু নেই। সেটুকু থাকা উচিত ছিল।

যাই হোক, ...মুটি বঙ্কিম-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা ও মন্তব্যকে প্রায় নিঃশেষে সংকলন করে সংকলয়িতা বহুকালের অপেক্ষিত জাতীয় কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন। কেবল মনে হয়, রচনাগুলিকে বঙ্কিম-রবীন্দ্র পরিচয় ও আলোচনার ঐতিহাসিক সূত্র ধরে পরপর সাজিয়ে দিলে বোধ হয় নাটকীয় হতো। কিংবা, 'নিবেদনে' সংক্ষেপে বলে দিলেও বোধ হয় আরও ভালো হতো। আরও ভালো সব সময়েই হতে পারে, কিন্তু এইবার নানা দৃষ্টিকোণে বিচারের যে সুযোগ পাচ্ছি সে সুযোগ সংকলয়িতাই করে দিয়েছেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

[illegible] ও [illegible] ভূমিকায় [illegible]। [illegible] মুখোপাধ্যায়। [illegible], ৭০ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। বাইশ টাকা।

ইউরোপীয় রেনেসাঁর সঙ্গে বঙ্গীয় রেনেসাঁর তুলনায় আতিশয্য না থেকে পারেই না। প্রথম কথা, এ যুগের ...

…য়েছিল। দ্বিতীয় কথা, ওই পশ্চিমী …জাগরণের মূল কথা সর্বতোভাবে যে …নুষমুখিনতা, তার পরিণত ফসল …ক্রমে বাস্তববাদ এবং এই বাস্তববাদ …রা পশ্চিমে সুস্পষ্ট একটা বিরাট দাগ …খে যেতে পেরেছিল শিল্পসাহিত্যে, …স্কৃতির সংবেদনশীল ক্ষেত্রসমূহে। …ন্তু বঙ্গীয় নবজাগরণের সন্তান …সেবে বাস্তব-বাদ যেন দুয়োরানীর …র্জাত অ।ধিব্যাধিজর্জরিত ন্যাড়া বা …মাকালী। মোটামুটি ১৩৫০ থেকে …৫৫০ পশ্চিমী রেনেসাঁর তরুণকাল। …র জন্মস্থান ইতালি। অথচ সারা …উরোপ ভেসে গিয়েছিল এবং পরের …য়েকটি শতক তার ফেনিল সিক্ততা …খা গেছে। বঙ্গীয় রেনেসাঁর বস্তুত …টো স্থানকালগত প্রসার ও প্রভাব …টেনি। সমুদ্রের তুলনায় একে গোষ্পদ …লতে আপত্তি কি!

তা না ঘটুক। অন্তত দুটি ক্ষেত্রে …লটা সামান্য। ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যা-…ন এবং অন্তত আংশিকভাবে মানুষ-…মুখিনতায়। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় …াঙালী জাগরণের এই দ্বিতীয় পরি-…প্রেক্ষিতটিতে ফেলেই দীনবন্ধু মিত্রের …আলোচনা করেছেন এবং তাই স্বাভাবিক …ছিল। কিন্তু মানুষমুখী হওয়া অর্থাৎ …কি না মানবিকতাবাদ ব্যাপারটা অন্তত …সাহিত্যের ক্ষেত্রে বেশ জটিল। কারণ …াহিত্য নামক শিল্পক্ষেত্রে রোমান্টিকতা …ও বাস্তববাদ দুটোকেই গণ্য করতে হয়। …ক বেশি মানুষমুখী—রোমান্টিক, না …স্তববাদী? এটাই বড় জটিল প্রশ্ন। …দ্যনাথ মুখোপাধ্যায় অবশ্য এই বিতর্ক …ড়িয়ে সাদামাটা বিচারেই অবতীর্ণ …য়েছেন। সেটাই নিরাপদ। কিন্তু আর …তকাল দীনবন্ধুর রচনা নিয়ে শুধু …ামাজিক রাজনৈতিক বিচার চলবে? …াংলা সাহিত্যের ধারাবিশ্লেষণে তাঁর …থক স্বরূপ নির্ণয় কি হবে না?

পশ্চিমী রেনেসাঁর প্রভাবে যে মান-…বকতাবাদের জয়যাত্রা, সত্যিকার অর্থে …ার পরিণত ফসল বাস্তবাদের প্রথম …শারা মেলে ফ্রান্সে, ১৭৪৪ সালে। এক …প্রধান ঔপন্যাসিক বাতেল্লে লেখেন: …লাকে চায় যেমনটি আছে বা হচ্ছে …ক তেমনটি। তারা চায় পৃথিবীর …বিকল প্রতিচ্ছবি। চায় সময়ের পাপ ও …ণ্য বর্তমান চরিত্রগুলোর প্রতিকৃতি।' …র ঠিক … বছর পরে ডঃ জনসন …লখেন 'সাম্প্রতিক প্রজন্মের লেখা …কশনে জীবনকে সত্যিকার অবস্থায় …খা যাচ্ছে।' বিশের শতকে রেনে …য়েলক সাহিত্যে বাস্তববাদের যে …জ্ঞা দিয়েছেন, তার সঙ্গে ওই দুটো …বোর কোন অমিল নেই। তিনি বরং …রও স্পষ্ট করে বলেছেন: 'বাস্তববাদ …হ সমসাময়িক সামাজিক বাস্তবতার …ষয়গত উপস্থাপনা।' বিষয়গত …বজেকটিভ) কথাটা জুড়ে দেওয়ায় …পারটা এবার গভীরতা পেয়েছে। …ক্তমে অবশ্য বাস্তববাদ ও প্রকৃতিবাদ …হিত্যে ওতপ্রোত মিলেমিশে থেকেছে …খা যায়। বালজাক, স্তাঁদাল টলস্টয়, …বার্ট, ফর্তে, ডস্টয়েভস্কি, জোলা— …াই ওই মিশ্র বাস্তববাদের নজির। …রবর্তীকালে কিন্তু বাস্তববাদের …গুতা ক্ষয়ে যেতে থাকে এবং রোমান্টি-…জমের বন্যা এসে ভাসায়। বিশ …কের তিনের দশক থেকে পশ্চিমী

সাহিত্যে আবার কিছুটা বাস্তববাদী অভ্যুত্থান ঘটে। সার্ত্র, কামু প্রমুখ তার নজির। অবশ্য একে নয়া-বাস্তববাদ বলাই সঙ্গত। আতিশয্যবাদীরা একে যদিও নয়া-বুর্জোয়া আখ্যায় ভূষিত করেছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গীয় বাস্তববাদ নিয়ে চমৎকার আলোচনা হতে পারত। সচেতনভাবে কেউ সে-চেষ্টা করেছেন কি না চোখে পড়ে না। আমাদের কৈশোরে মার্কসবাদী পত্রিকার চেষ্টার নামে একটা অপচেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তারপর আর কথা ওঠেনি। বাংলায় রোমান্টিসিজম তথাকথিত রেনেসাঁর সময় থেকে এখনও বিশাল ও খরস্রোত। দীনবন্ধু বা টেকচাঁদের, কিংবা মাইকেলের লেখায় 'জীবনকে সত্যিকার অবস্থায় দেখা' কিংবা 'সমসাময়িক সামাজিক বাস্তবতার বিষয়গত উপ-স্থাপনার' চেষ্টা কতখানি, তার বিচার বিশ্লেষণ যথাযথ হলে আমরা উপকৃত হতাম। উনিশ শতকের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঘটনা নিয়ে প্রচুর ভারি বই

প্রচণ্ড আবেগে লেখা হয়েছে, এইমাত্র। তথাকথিত কল্লোল যুগের সাহিত্যিক-দের লেখাতেও বাস্তববাদী শিল্পচেতনা কতটা ছিল, কতটাই বা রোমান্টিসিজম? এবং পরবর্তী সময় থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বাংলা ফিকশনেই বা শুদ্ধ বাস্তববাদী শিল্পচেতনা কতটা ক্রিয়া-শীল? দুঃখের কথা, এসব নিয়ে কোন পরিচ্ছন্ন সুস্পষ্ট আলোচনা চোখে পড়ে না।

বৈদ্যনাথবাবুকে অন্তত এই দুঃখের মধ্যে অভিনন্দন, তাঁর বইটি প্রকারান্তরে বাংলা বাস্তববাদের প্রারম্ভকালের একটি বড় নজিরকে খুঁটিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছে। সাহিত্যের এই ধারার আঙ্গিক গত দিকটি নিয়ে তাঁর লেখায় কোন বিশ্লেষণ না থাকলেও সংশ্লিষ্ট উপকরণ আছে সুপ্রচুর। দৈত্যের মতো খেটেছেন তিনি। তাঁর দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন এবং আধুনিক। কুসংস্কারবর্জিত। দীন-বন্ধুর নীলদর্পণকে আমরা বড়জোর সাহিত্যের উপকরণমূল্য দিয়ে দেখতে অভ্যস্ত এবং তার সামাজিক রাজনৈতিক প্রভাব নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু দীনবন্ধু যে বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদের একজন প্রফেট, একথা ভাবিই না। উগ্র রোমান্টিকতার মাদকে নিরন্তর আচ্ছন্ন থাকায় 'জীবন অবিকল এইরকমটি' কথাটা কানে ঢোকে না। দীনবন্ধুর কথাবস্তু, আঙ্গিক—বিশেষ করে ভাষা বা শব্দ ব্যবহার এখনও কতখানি আধুনিক, তা বৈদ্যনাথবাবুর আলোচনা থেকে অলক্ষ্যে সায় পেতে-পেতে একটি প্রবল ধারণার জন্ম দেয় এবং সে-ধারণায় নিঃসন্দেহে বিপ্লবের বীজ নিহিত থাকে। বঙ্গীয় রেনেসাঁ নিয়ে যারা লিখেছেন এবং এখনও লিখছেন, বৈদ্য-নাথবাবুকে তাঁদের দলে ফেলা যাবে না। তিনি একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম এবং আমাদের মনে নতুন দিগন্তের পর্দা খুলে দিয়েছেন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **বিবিধ**

শ্রাবণগাথা

জামসেদপুরের 'মালঞ্চ' গোষ্ঠী ১৯৬৪ থেকে ৬৭ সাল পর্যন্ত কল-কাতায় কয়েকটি রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে-ছিলেন। এরপর দীর্ঘ নীরবতা। গত ১০ জুলাই রবীন্দ্র সদনে পুনর্তৎপর এই গোষ্ঠীকে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গেল। তাঁরা মঞ্চস্থ করলেন রবীন্দ্রনাথের 'শ্রাবণগাথা'।

শুরুতে ছিল একক রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসর। দু-জন শিল্পীর কণ্ঠে চারটি করে গান। সুপূর্ণা চৌধুরীর কণ্ঠ তুলনায় স্বাভাবিক স্ফূর্তিময় ছিল সেদিন। উদাত্ত ভঙ্গিতে তিনি যে-গানগুলি শোনালেন তার মধ্যে 'আজি কোন্ সুরে বাঁধিব' ও 'আজি যে রজনী যায়' উল্লেখ করার মতো। জয়শ্রী রায়-এর 'কেন জাগে না জাগে না বেশ পরাণ' বেশী ভাল লেগেছে। তাঁর সেদিনকার নিজস্ব মেজাজের অনুকূল ছিল এই গানের বাণী।

'শ্রাবণ গাথার' মুখ্য আকর্ষণ ছিল নাচ। সুনীত বসুর নৃত্য পরিকল্পনা সুন্দর। বাউল-নৃত্যটি (কৃষ্ণা নন্দী ও ধূর্জটি সেন) চমৎকার মেজাজ এনে দিয়েছিল 'অকারণে চঞ্চল' শিশুর দল ও 'হারেরেরেরে' বালিকাবৃন্দও দারুণ জমিয়েছিল। কৃষ্ণা নন্দী (দে)-র 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে' অসাধারণ।

গান বরং সে-তুলনায় দুর্বল। বেশীর ভাগই সম্মেলক গান। অথচ অসম্ভব ম্রিয়মাণ ভঙ্গিতে পরিবেশিত। একক কণ্ঠে মিতা দস্তিদারের সুরেলা, স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশন (ও শ্রাবণের পূর্ণিমা আমার) বিশিষ্ট ব্যতিক্রম। বিশাখা চৌধুরীর গায়কীও ভালো। অসীম সাধুর বক্ষে তোমার বাজে বাঁশিতে না পাওয়া গেল বক্ষের গাম্ভীর্য, না বাঁশির লালিত্য। মন্দ্র-সপ্তকে তাঁর গলা শোনাই যায়নি। সংঘমিত্রা পাথিরার সঙ্গে তাঁর দ্বৈত-কণ্ঠের গানটিও অতি কর্কশ শুনিয়েছে।

আর বিরক্তিকর ছিল ভাষ্যপাঠ। পার্থ ঘোষ একাই যা সামলেছেন। সভাকবির আধো-আধো উচ্চারণ, নট-রাজের অসংস্কৃত সংস্কৃত পাঠ, তার সঙ্গে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো মাইকের ওপর রঙীন কাপড় জড়ানোর কাঁচা পরিকল্পনা পুরো অনুষ্ঠানটিকেই বড়ো বেশী অ্যামেচারসুলভ করে তুলেছিল।

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **ইন্দ্রজাল**

রবীন্দ্রসদনে সুবীর সরকার

রবীন্দ্রসদনে বহুকাল বাদে ইন্দ্র-জাল-প্রদর্শনী দেখার সুযোগ ঘটল, এ-জন্য সদন-কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিতে হয়। কোনো এক অননুধাবনীয় রহস্য-ময় কারণে রবীন্দ্র সদনের মঞ্চে জাদু-প্রদর্শনীর অনুমতি মিলত না, দীর্ঘ-কাল ধরে প্রচলিত এই 'কালা কানুন' অবশেষে প্রত্যাহৃত হয়েছে। এই সংবাদে শুধু জাদুকর-মহলই যে খুশী হবেন তা নয়, আপামর জনগণই এতে স্বস্তি পাবেন। কেননা জাদু যে বেপুলভাবে জনমনোরঞ্জক এ-সত্য এই শহরের অন্যত্র অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী-গুলিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিফলিত।

বেহালা দৃষ্টিহীন শিল্প নিকেতনের সাহায্যকল্পে রবীন্দ্র সদনে গত ৮ ও ৯ জুলাই দু-দিন ধরে পূর্ণাঙ্গ জাদু-প্রদর্শনী দেখালেন সুবীর সরকার। সুবীর সরকারের এবারের প্রদর্শনীতে নতুন মঞ্চমায়া বলতে একটি: 'রড থ্রু দি লেডি।' এ-ছাড়া 'অ্যালার্ম ক্লক ভ্যানিস' ও পায়রা-আবির্ভাবের মতো দুটি ছোট খেলাও এ-বারের অনুষ্ঠানে নতুন দেখালেন তিনি। পায়রার খেলাটি সুন্দর। 'ক্লক ভ্যানিস' খেলাটি এখনো সম্পূর্ণ ত্রুটি মুক্ত নয়। 'রড থ্রু দি লেডি' খেলাটি সুন্দর, দেখতে অবশ্য তেমন মোহন নয়।

তবে ৯ জুলাই সদন মঞ্চে সুবীরের খেলা যে অনেক ম্রিয়মাণ লেগেছে, তার প্রধান কারণ আলোর নিয়ন্ত্রণজনিত ত্রুটি। অত্যন্ত নিষ্প্রভ পরিবেশ তৈরী হচ্ছিল বারংবার।
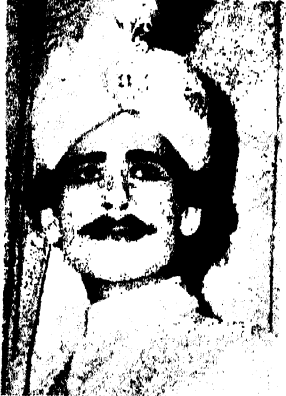
সুবীরও বোধ করি কিঞ্চিৎ মেজাজচ্যুত ছিলেন। তাঁর কথার মধ্যে বার বার দর্শকদের উদ্দেশে 'ওপেন ইওর আইজ' ভীষণ কানে লাগে। দর্শকরা ঘুমিয়ে পড়বেন, এমন আশংকা ছিল নাকি তাঁর? তিনি 'কম কথায় বেশী খেলায়' বিশ্বাসী। কিন্তু তাঁর কম কথার মধ্যেও এত বেশী 'আবিষ্কারের' উদ্ভট দাবি যে আরও কম কথা বললেই বোধ হয় ভাল হত। ভাল হত মিনিট কুড়ি ধরে বস্তাপচা 'কমেডি অ্যাক্ট' (কমেডিয়ান অ্যাক্ট' নয়) না দেখালেও।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

কিশোর জাদুকর প্রদীপকুমার

ময়দান ওল লাইব্রেরী হলে গত ৮ জুলাই ঘণ্টা দুয়েক ধরে কিশোর জাদুকর প্রদীপকুমারের ইন্দ্রজাল দেখে দুটো জিনিস মনে হল। এক, তিনি বাঁধিগতভাবে নিশ্চিত সম্ভাবনাপূর্ণ। তাঁর শোম্যানশিপে নৈপুণ্যের ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু সেই সঙ্গে দুঃখ হয় এই ভেবে যে, তরুণ প্রতিভাধারী হিসেবে নতুন কোনো সম্ভার নিয়ে হাজির হন নি তিনি। অন্য সবাই যা দেখায়, তাই তিনি দেখাতে চান। তাহলে অন্য সকলের খেলা না দেখে তাঁর খেলা লোক দেখবে কেন?

সেদিন প্রদীপকুমারের খেলাতে আলোর দাপট ছিল খেলার মূলের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। 'ফেদার ফ্যানটাসি'র মতো বর্ণময় খেলা মনে হল আলোর নিয়ন্ত্রণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেদিনের শ্রেষ্ঠ খেলা ছিল 'সোর্ড এরিয়েল'। সম্মোহনের জন্য যথার্থ সময় ব্যয় করেছেন এই নবীন শিল্পী, খেলাটিকে বিশ্বাসযোগ্যতার স্তরে উত্তীর্ণ করতে পেরেছেন। মন ভরে যায়। গিনিপিগ-আবির্ভাবের খেলাটিও সুন্দর। 'ইন্ডিয়ান রুম' এবং 'লিংকিং রিং' আরেকটু পরিচ্ছন্ন হতে পারত।

আলোচনা · শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

নিজেরে অপমান

মাঝে মাঝে সকলের অজ্ঞান্তেই অভাবনীয়ের পদসঞ্চার ঘটে। এই দুর্ঘটা প্রচারের। প্রচার না হলে প্রসার ঘটে না। অনেকেই যখন প্রসারিত হতে না পেরে হতাশায় অবসিত, তখন কেউ কেউ কোন প্রচার অথবা নির্বোধ পুরস্কারের পরোয়া না করেই, নিয় বাঁচিয়ে সমর্পিত প্রাণ, আপন স্বপ্নে আত্মমগ্ন। এমনই একজন নিরলস থিয়েটার কর্মীর নাম দেবেশ চক্রবর্তী।

আমার আপনার সকলেরই হয়ত অভিজ্ঞতা আছে, মঞ্চে এবং চলচ্চিত্রেও প্রায় শতকরা ৯০% শিল্পী যখন মারপিট করেন তখন 'যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা' মনে হয়। প্রচণ্ড আঘাতে যখন কেউ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন (নাটকীয় ভাষায় যাকে বলা হয় পতন ও মৃত্যু) তখন বিশ্বাস করা শক্ত, শিল্পী ধরাশায়ী হলেন অথবা 'মাল খেয়ে' ধীরে ধীরে অচেতন হলেন। ঘুঁষি মারার সময় কোন কোন শিল্পী এমন ভঙ্গী করেন যে সংলাপ না থাকলে বোঝা মুশকিল, উনি ঘুঁষি মারছেন অথবা ব্যঙ্গ দেখাচ্ছেন। সবাই অমিয়রী চালে চলেন, বিদ্যুৎগতিতে কিছু করণীয় থাকলেই অপ্রস্তুত হন। শতকরা ৫০% ভাগ মঞ্চশিল্পী ন্যাচারালিস্টিক অভিনয়ে বিশ্বাসী। এই 'স্বাভাবিক' অভিনয় প্রায় সময়ই পশুর সারির দর্শকদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়। অনেকের সংলাপের শেষাংশের অস্পষ্টতা দর্শকদের ছেলেবেলায় ফিরিয়ে নিয়ে যায়। তাঁরা স্কুলের পরীক্ষার শূন্যস্থান পূরণ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। গলা খুলে কথা বলা মানে যে রগ ফুলিয়ে চিৎকার নয় গান গাওয়া মানে যে কিছু অস্ফুট সুর গুঞ্জন নয়, 'ঘুমোলে শুধু চোখ আর শুধু মুগল ছাড়া চোয়াল এবং ঠোঁটেরও কিছু করণীয় আছে একথা অনেকেই ভুলে গেছেন। শরীর দিয়েও যে কথা বলা যায় এটা এখন প্রমাণিত সত্য নয়, গুজবেরই সামিল—শোনা কথা।

দেবেশ চক্রবর্তী এপিক ওয়ার্কশপ নামে একটি ওয়ার্কশপ থিয়েটার চালু

এপিক ওয়ার্কশপের এক অনুষ্ঠানে স্বদেশ ও বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে পরিচালক দেবেশ চক্রবর্তী

করেছেন। অন্যান্য দেশে এটা আবশ্যিক হলেও, এদেশে অনেক ক্ষেত্রেই অবাঞ্ছিত। একজন অভিনেতার মূলধন শরীর এবং কণ্ঠ। অভিনয়কে সজীব করতে হলে পঞ্চেন্দ্রিয়ের যোগ ব্যায়াম, উচ্চারণের বহুবিধ প্রকল্পের মাধ্যমে এমনভাবে তৈরি হচ্ছেন, যা দেখলে অভিজ্ঞ শিল্পীরা (মঞ্চ এবং এবং চলচ্চিত্রের) ঈর্ষান্বিত বোধ করতে পারেন। যদি আত্মতুষ্টি তাঁদের চলার পথে কলার খোসা না হয়ে থাকে। মজার ব্যাপার হল এই যে, একজন অভিজ্ঞ ব্যস্ত শিল্পীর কলার খোসায় আছাড় খাওয়া দেখানো যতটা আয়াসসাধ্য, এই সব শিক্ষার্থীদের কাছে তা অনায়াস। ব্যায়ামে অভ্যস্ত থাকার জন্য তাঁদের শারিরীক মুদ্রা-গুলি হয় ব্যালে নাচের মত মূর্তিমান ভাস্কর্য। ঘুঁষি বা চড় মারার সময় সামনে বসে শিউরে উঠতে হয়। দ্রুত-তম আবৃত্তির সময়ও কোন কথা অস্পষ্ট হয় না। কোনরকম সঙ্গীতা-নুষঙ্গ ছাড়াই, এঁরা যখন গান ধরেন তখন এক লহমায় নিয়ে যেতে পারেন আদিম পৃথিবীতে। সেই আদিম পৃথিবী, যখন ভাষার সৃষ্টি হয় নি, মানুষ নিজেকে প্রকাশ করত শারীরিক ভঙ্গি দিয়ে, আনন্দ বিষাদ সব কিছুই মূর্ত হত—অব্যক্ত অথচ প্রকাশিত। এপিক ওয়ার্কশপ সেই কল্পলোকের চাবিটি আবিষ্কার করেছেন।

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের সামান্য একটি ঘরে সপ্তাহে নিয়মিত-ভাবে কয়েকদিন বিনা দর্শনীতে এই অনুষ্ঠান চলে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান সম্ভবত এই দেশে প্রথম। এ দেশের ও বিদেশের বিদগ্ধ এবং অভিজ্ঞ দর্শকও এই অনুষ্ঠান দেখেছেন। ভাবতে লজ্জা বোধ হয়, বিদেশী প্রখ্যাত নাট্যবিদ রিচার্ড স্বীকার করেছেন, তাঁর ব্যায়ামের মূল কাঠামো পেয়েছেন ভারতীয় যোগব্যায়াম এবং কিছু কিছু কথকলি নাচের মুদ্রা থেকে। সমস্ত দিনের ক্লান্তির পরে শিক্ষার্থী প্রণবকুমার ধর, অনীত ভট্টাচার্য, দিলীপ বিশ্বাস, রতন চক্রবর্তী, সাধনা ঘোষ, সুনীল নাথ, পার্থপ্রতিম সরকার ও আরও অনেকে।

ভেঙে পড়েন না, বরঞ্চ নতুনভাবে সঞ্জীবিত হন, এবং এই প্রস্তুতি তাঁদের 'কনসেনট্রেশন' বাড়াতে সাহায্য করে। আরও বড় জায়গা হলে এই প্রতিষ্ঠান আরও ব্যাপক হত, কিন্তু পরিচালক তাতে বিশেষ আগ্রহী নন, কারণ তিনি বুঝতে পারেন, ব্যাপকতা হয়তো আদর্শভ্রষ্ট হওয়ার প্রথম স্তর।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

কলকাতা'র ইলেকট্রা

বুদ্ধদেব বসুর 'কলকাতার ইলেকট্রা' এই প্রথম কলকাতায় অভিনীত হল। এলাহাবাদের বিতর্কিত নাট্যগোষ্ঠী 'বীচিত্রা' বিদ্যার্থীদের মঞ্চে তাদের কল-কাতায় প্রথম আগমনে উপস্থিত করে-ছিলেন 'কলকাতার ইলেকট্রা'। 'বীচিত্রা' উত্তর ভারতের সর্বত্র পরিচিত নাটকের দল। সাধারণত হিন্দী নাটকই তারা অভিনয় করেন। যদিও শিল্পীরা অধিকাংশই বাঙালী।

ইন্দ্রনাথ ভাদুড়ীর পরিবারকে কেন্দ্র করে এ নাটকের কাহিনী বিন্যাস। ইন্দ্রনাথ ভাদুড়ী স্বাধীনতা সংগ্রামী। স্ত্রী, দুই কন্যা ও এক পুত্রকে রেখে যুদ্ধে যোগদানের জন্য প্রায় সাতবছর বাইরে ছিলেন ইন্দ্রনাথ ভাদুড়ী। ইন্দ্রনাথের বন্ধু ডাক্তার অজেন মজুমদার ইন্দ্রনাথ পরিবারেরও বন্ধু। ইন্দ্রনাথ যুদ্ধে যাওয়ার দীর্ঘ অবসরে ইন্দ্রনাথের স্ত্রী মনোরমা ও ডাঃ মজুমদার পরস্পর পরস্পরের কাছে এসেছেন। ইন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে যে শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়েছিল, সে স্থান পূর্ণ করেছেন অজেন মজুমদার। যুদ্ধশেষে সৈনিক ঘরে ফিরেছেন। কিন্তু ঘর করা সম্ভব হয়নি। সেদিন রাতেই তিনি নিহত হয়েছেন। নিহত হওয়ার কারণ হিসেবে প্রচারিত হয়, সে সময় ইন্দ্রনাথ অত্যন্ত মদ্যপানের জন্য অপ্রকৃতিস্থ ছিল। সে অবস্থায় বাড়ির কুকুর তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনার একমাত্র সাক্ষী ছিল ইন্দ্রনাথের বড় মেয়ে শম্পা। তখন তার বয়স অল্প তবুও সে দেখেছিল অনেক রক্ত, শুনেছিল গুলির শব্দ, এবং ঐ অবস্থার মধ্য থেকে পিতার মৃত্যুর অস্ত্রটিকেও হাতে পেয়ে লুকিয়েছিল।

তারপর দিন এগিয়েছে। অজেন মজুমদার পেয়েছেন বরমাল্য। তিনি এখন মনোরমার দ্বিতীয় স্বামী। ইন্দ্রনাথের একমাত্র ছেলেকে বিদেশে পাঠানো হয়েছে। দ্বিতীয় মেয়ে অনায়াসে মার নতুন স্বামীকে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু শম্পা, ভুলতে পারেনি পিতার মৃত্যুকে। সে কথা প্রতিটি মুহূর্ত কাঁটার মত খচ খচ করেছে মনোরমার চিন্তায়।

মনোরমার চরিত্রে শিপ্রা বন্দ্যো-পাধ্যায় সংযত অভিনয় করেছেন। তিনি যে মঞ্চকে ব্যবহার করতে পারেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রেমিক ও সন্তান এই দুয়ের টানা-পোড়েন-এ সন্তান-বাৎসল্যের দিকটি তাঁর অভিনয়ে প্রায়শই অনুপস্থিত। তাঁর একমাত্র পুত্রের বিদেশ থেকে বহু বছর পরে ফেরার সংবাদে মায়ের যে আনন্দ, তা অভিনয়ের দুর্বলতার জন্য কৃত্রিম মনে হয়েছে।

শম্পা মায়ের কাজকে কোনমতো মেনে নিতে পারেনি। পিতার স্মৃতি পিতার গায়ের পুরুষালি গন্ধ সব-সময়ই তাকে ঘিরে রাখে। সমস্ত ঘটনারই চালক তার মা এই বিশ্বাস তার জীবনে একমাত্র সত্য। শম্পার ভূমিকায় স্বাতীলেখা চট্টোপাধ্যায় এক অসাধারণ অভিনয় উপহার দিয়েছেন। পিতার মৃত্যু-দৃশ্যকে তিনি যখন বর্ণনা করেছেন, সেই মুহূর্তটি তাঁর অভিনয়ের গুণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শম্পার অভিনয়ে মাঝে মাঝে তাকে পাগল বলে মনে হয়েছে। এ ত্রুটি পরিচালকের। পরিচালক চরিত্রটিকে আর পাঁচটা সাধারণ এই জাতীয় চরিত্রের আদলে দেখার জন্যে একজন পাগলের ইমেজ সৃষ্টি করার প্রয়াসী হয়েছেন। যথা কাঁচের মধ্য দিয়ে ছায়ার সাহায্যে শম্পা চিঠি খুঁজছে এই ঘটনাটিকে যেভাবে উপস্থিত করেছেন, তা পরিচালকের দুর্বলতার পরিচয়। পিতার মৃত্যু যে দুর্ঘটনা নয়, আত্মহত্যা, এটা প্রমাণ করার জন্য চিঠি যে খুঁজেছে সে আর যাই হোক পাগল নয়।

অগ্নির ভূমিকায় অমিতেশ বন্দ্যো-পাধ্যায়-এর অভিনয় প্রশংসার যোগ্য। (ব্যক্তিগত জীবনে অমিতেশ ব্যানার্জী শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র।) অমিতেশবাবু অভিনয় বোঝেন। মঞ্চে প্রবেশের পর থেকে তিনি নাটকের গতিকে ধরে রাখতে সার্থক হয়েছেন। তবে বিদেশ ফেরত এই ভাবটি প্রকাশে অত্যধিক যত্নবান হওয়ায় মাঝে মাঝে তাঁকে অত্যন্ত কৃত্রিম বলে বোধ হয়েছে। কনক-এর ভূমিকায় রিণা ঘোষের অভিনয় অত্যন্ত সাধারণ যদিও অবকাশ-ও ছিল না। অজেন মজুমদারের ভূমিকায় অংশু বন্দ্যো-পাধ্যায় একেবারেই বেমানান। তাঁর দুর্বল অভিনয় নাটকের গতিকে ব্যাহত করেছে। তিনি নিজেকে প্রথম থেকেই ভিলেন বলে ভেবে নিয়েছেন। পরি-চালক সুহৃদ চট্টোপাধ্যায় সামগ্রিকভাবে সফল হয়েছেন, তবে এ নাটকে আলোকে তিনি নাটকের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারতেন।

অরুণোদয় ভট্টাচার্য

নতুন গোল্ড মিস্ট

একমাত্র কোলন্ সাবান

কোলনের সুবাসের জন্য...
কোলনের সতেজতার জন্য।

নতুন গোল্ড মিস্ট। এর অনন্য কোলনের সতেজতায় আপনাকে ঘিরে রাখুন। আপনার ত্বকে শিহরণ জাগাবে: কোলনের সুবাস আপনার সারা অঙ্গে মিশে থাকবে সারাদিন ধ'রে।

নতুন গোল্ড মিস্ট। দেখুন, কেমন সুরুচিপূর্ণ এর নতুন গঠন, কেমন অভিজাত এর সোনালী মোড়ক।

নতুন গোল্ড মিস্ট। ওজনে যেন ১০০ গ্রাঃ সোনা! আর ওজনটাও দেখবার মত বৈকি!

একই দামের অন্যান্য অধিকাংশ সাবান ওজনে অনেক কম।

টাটার তৈরী

OBM-7692 BN

কলকাতা ফুটবলের শতবর্ষ

প্রথমেই 'দেশ' পত্রিকাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি শ্রীরাখাল ভট্টাচার্যের 'কলকাতা ফুটবলের শতবর্ষ' প্রকাশ করার জন্য (২৮শে মে, ১৯৭৭)। ঐ লেখায় কয়েকটি তথ্যের ভুল হয়েছে বলে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ধর (২৫শে জুন) তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। শ্রীধরের মতে আই এফ এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৮৯২ সালে। তথ্যটি ভুল। আই এফ এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৮৯৩ সালে। শোভাবাজার ক্লাবের প্রতিষ্ঠা বছর সম্পর্কে শ্রীধরের বক্তব্য সম্পূর্ণই ভুল। এক্ষেত্রে শ্রীভট্টাচার্যের বক্তব্যই ঠিক। শোভাবাজার ক্লাব আসলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শোভাবাজার রাজবাটীতে ১৮৮৫ সালে। পরে ১৮৮৭ সালে তারা ময়দানে তাদের ক্লাব স্থানান্তরিত করে। তাই সম্ভবত ময়দানে যে বছর ক্লাব নিয়ে আসা হয় সেই বছর থেকেই শ্রীধর শোভাবাজার ক্লাবের জন্মবর্ষ বলে অভিহিত করেছেন। শোভাবাজার ক্লাবের আয়ুষ্কাল ১৮৮৫ সাল থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত।

কলকাতা ময়দানে সর্ব প্রাচীন ফুটবল প্রতিযোগিতা ট্রেডস কাপ সম্বন্ধে শ্রীধর যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা আদৌ ঠিক নয়। জানি না কোন তথ্যের উপর ভিত্তি করে তিনি লিখেছেন শোভাবাজার ক্লাব প্রথম ভারতীয় দল যারা ট্রেডস কাপ লাভ করে। আর ট্রেডস কাপ নগেন্দ্রপ্রসাদই সর্বপ্রথম প্রচলন করেন। প্রথমে বলি শোভাবাজার ক্লাব কোনদিনই ট্রেডস কাপ লাভ করেনি। যে সালে শোভাবাজার ট্রেডস কাপ লাভ করেছে বলে শ্রীধর উল্লেখ করেছেন আসলে সেই ১৮৯২ সালে ট্রেডস কাপ লাভ করে ফার্স্ট ইস্ট ল্যাংকাশায়ার রেজিমেণ্ট দল। আসলে শোভাবাজার প্রথম ভারতীয় দল যারা একটি ইউরোপীয়ান দলকে পরাজিত করেছিল। প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে ট্রেডস কাপ লাভ করেছে ন্যাশানাল আসোসিয়েশন ১৯০০ সালে।

ট্রেডস কাপ প্রচলন করে তৎকালীন বণিক সমাজ যারা সর্বপ্রথম ময়দানে ফুটবল খেলা চালু করেছিল। ঐ বণিক সমাজ ৫০০ টাকা দিয়ে একটি কাপ ক্রয় করে ডালহৌসী ক্লাবকে দিয়েছিল একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু করতে। প্রথম বছর ডালহৌসী ক্লাব ট্রফি নিজেদের অনুকূলে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। ১৮৮৯ সালে ট্রেডস কাপের খেলায় শোভাবাজারকে ৩—০ গোলে হার স্বীকার করতে হয়েছে সেনট জেভিয়ার্সের কাছে। ঐ খেলায় সেনট জেভিয়ার্সের পক্ষে হ্যাটট্রিক করেন নরম্যান। অবশ্য তখন হ্যাটট্রিক কথাটার প্রচলন ছিল না।

মোহনবাগানের শীল্ড বিজয়ী দলকে শ্রীনগেন্দ্রপ্রসাদ তৈরি করেছিলেন বলে শ্রীধর যে বক্তব্য রেখেছেন সেটাও ঠিক নয়। তখনকার দিনে কোন প্রশিক্ষকের ব্যবস্থা ছিল না, নিজেরাই নিজেদের তৈরি করতেন। মোহনবাগানের শীল্ড জয়ের পেছনে খেলোয়াড়দের ক্রীড়াদক্ষতার সঙ্গে আর যার অবদান রয়েছে তিনি হলেন শ্যামবাজারের বোসেদের বাড়ির ছেলে শৈলেন বসু। যার উৎসাহ ও ব্যক্তিগত স্নেহে মোহনবাগান ক্লাব এক অনন্য নজীর সৃষ্টি করতে পেরেছিল। অবশ্য তখনকার রাজনৈতিক আবহাওয়াও মোহনবাগানের দলগত সংহতি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। মহামেডান স্পোর্টিংয়ের সাফল্যের মূলে রয়েছে আজিজ সাহেবের অবদান। তিনি প্রথম ভারতীয় খেলোয়াড়দের বুট পরে খেলতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

শ্রীভট্টাচার্য ও শ্রীধর দু'জনেই নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী কিভাবে ফুটবল আবিষ্কার করলেন সে সম্বন্ধে ভিন্ন তথ্য পরিবেশন করেছেন। দু'জনের বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য সামান্যই। তবে নগেন্দ্রপ্রসাদের ফুটবল আবিষ্কারের বহুপূর্ব থেকেই কলকাতার বণিক সমাজ ময়দানে ফুটবল খেলায় অংশ নিত। ফোর্ট উইলিয়ামে আসর বসেছে ১৮৫৪ সালে। সেখান থেকে ময়দানের খোলামাঠে প্রথম আসর বসে ১৮৬৮ সালে। শ্রীধরের লেখায় মোহনবাগানের প্রথম লীগ জয়ের বছর বলে ১৯৫৯ সাল উল্লেখ করা হয়েছে। এটা সম্ভবত ছাপাখানার ভুল। সালটি হবে ১৯৩৯ সাল।

আমার বক্তব্যের সমস্ত তথ্যই আমি পেয়েছি তৎকালীন ফুটবলের উপর লেখা কিছু বই ও ইংলিশম্যানের ক্রীড়া সাংবাদিক হেম মুখার্জীর নাতি শ্রীপ্রভাত মুখার্জীর সৌজন্যে। আই এফ এ অফিসের পুরনো তথ্যও আমার বক্তব্যকে সমর্থন করবে। তবে রাখাল ভট্টাচার্যের এই লেখা ভবিষ্যৎ ফুটবল অনুরাগীদের কাছে একটি বিশেষ সম্পদ হয়ে থাকবে।

শ্যামসুন্দর ঘোষ
কলকাতা-৫৫

ডি কে ও সিগনেট প্রেস

শ্রীযুক্ত নরেশ গুহের লেখা স্বর্গীয় দিলীপকুমার গুপ্তের স্মৃতিচারণ পড়লাম। ডি কে এবং সিগনেট প্রেসের অসংখ্য কৃতিত্বের বর্ণনা করতে গিয়ে নরেশবাবু শেষ পরিচ্ছেদে লিখেছেন— 'পরমপুরুষ' বেরোলে অনেকের মতো আমিও ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। কেন?

নরেশবাবুর উক্তিতে তাচ্ছিল্যের ইঙ্গিত আছে, যেন 'পরমপুরুষ' সৎ-সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না, যেন এই গ্রন্থ প্রকাশে সিগনেটের মর্যাদা এবং ঐতিহ্যের হানি হয়েছে। সমালোচনার অধিকার সকলেরই আছে—ভিন্নরুচির্হি মানবাঃ। অচিন্ত্যকুমারের প্রতি তাঁর পরলোকগমনের অল্পদিনের মধ্যেই এই বক্রোক্তিতে একটি অসৌজন্যবোধই প্রকাশ পাচ্ছে। দিলীপকুমার এবং সিগনেটের গৌরব সম্যক ফোটানোর জন্য নরেশবাবুর এই উক্তিটির কোনো প্রয়োজন ছিল বলে মনে করি না।

আর্যকুমার সেনগুপ্ত
রাঁচি-২

ভ্রম-সংশোধন : সুনীতিকুমার

১৬ মজুলাই, ১৯৭৭ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত "ভাষাচার্য সুনীতিকুমার" প্রবন্ধে একটি গুরুতর ও কয়েকটি ছোটখাট মুদ্রণ-প্রমাদ রয়ে গেছে।

১। ১০ পৃষ্ঠার ১ম কলমের ৩য় ও ৪র্থ অনুচ্ছেদের ১ম পংক্তি দুটি একইরকম ছাপা হয়েছে। ৪র্থ অনুচ্ছেদের ১ম পংক্তির সংশোধিত পাঠ হবে :

সংস্কৃত এবং বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি নব্য ভারতীয় আর্যভাষার বহু শব্দের নিরুক্তি নিয়ে

২। ঐ পৃষ্ঠার ঐ কলমের ২য় অনুচ্ছেদে Sanskrit শব্দটি উল্টো ছাপা হয়েছে।

৩। ১১ পৃষ্ঠার ১ম কলমের ৪র্থ অনুচ্ছেদের শেষের দিকে ক্রল ব্লক-এর শুদ্ধরূপ হবে ব্লুল ব্লক।

৪। ১১ পৃষ্ঠার ২য় কলমের ৭ম পংক্তিতে 'যা লিখেছিলাম তার বিশেষ, হবে 'যা লিখেছিলেন তার অংশ বিশেষ।'

৫। ১৩ পৃষ্ঠার ১ম কলমের ২য় অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যটিতে 'ঘোষবৎ ধ্বনিগুলির উচ্চারণ' হবে 'ঘোষবৎ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির উচ্চারণ।'

৬। ৩য় অনুচ্ছেদে Polygo-ttism হবে Polyglottism

৭। ৪র্থ অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যটিতে 'আগন্তক' হবে 'আগন্তুক'।

৮। ২য় কলমের ২য় পংক্তিতে 'পরিপুত' হবে 'পরিপূর্তি'।

নীলমাধব সেন পুণা-৬

গান্ধীজীর সত্য

শান্তি বসু মহাশয়ের "গান্ধীজীর সত্য" প্রবন্ধটির আলোচনার প্রয়োজন আছে মনে করি।

যীশুখৃস্ট স্বামী বিবেকানন্দ ও গান্ধীজী—এদের কাছে সত্যের সংজ্ঞা এক নয় যদিও উদ্দেশ্য একই—মোক্ষলাভ। খৃস্ট এবং বিবেকানন্দ সরাসরি ঈশ্বর লাভের প্রচেষ্টার উপর জোর দিয়েছেন, গান্ধীজী সত্যকে ব্যবহারিক উপায় হিসাবে গ্রহণ করে মোক্ষলাভের সোপান করেছেন।

যখনই "সত্য" ব্যবহারিক নির্ভর হয় তখনই তার দীপ্তি কিছুটা ম্লান হয় অর্থাৎ নিছক সত্য আর থাকে না, কারণ দৃষ্টিভঙ্গী বদলায়। সেই অর্থে গান্ধীজীর "সত্য" অপেক্ষাকৃত মলিন ছিল বইকি। যেমন ত্রিপুরী কংগ্রেসে পন্থ সিদ্ধান্ত (Pant resolution) তিনি নাকি জানতেন না। সুভাষ বোসকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়নের যে সঙ্কল্প (Resolution) বাক্য তৈরী করা হয় তা গান্ধীজীরই রচনা কারণ তাঁর বিবৃতি ছিল—"It was I who drafted resolutionr" শান্তি বসু মহাশয়ের যুক্তি যে "গান্ধীজী বলতে চেয়েছিলেন যে সুভাষের নীতি তিনি মানেন না কাজেই সুভাষের জয় গান্ধীজীর নীতির পরাজয়।" এটি যে কত কষ্টকল্পিত ও সুবিধাজনক ব্যাখ্যা তার প্রমাণ মেলে ওই বিবৃতির শেষ বাক্যটিতে "After all Subhas Babu is not an enemy of the country."

গান্ধী-আরউইন চুক্তির সময় ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসী রদ করার বিষয়টি আলোচনা হয়। গাড়োয়ালী বাহিনীর সত্যাগ্রহের উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করা ব্যাপারটি কখনও নয়। ফাঁসী রদ করার সম্বন্ধে তিনি প্যাক্ট বাঁচাবার জন্য কোনও জোর দেননি। এ নিয়ে করাচী কংগ্রেসে তুলকালাম কান্ড হয়েছিল।

গান্ধীজী হিটলার ও তোজোকে যুদ্ধ থামাতে আবেদন করে পত্র দিয়েছিলেন, অর্থাৎ ভাইসরয় লিন্‌লিথ্‌গোকে তার চিঠি পাঠিয়ে দিতে বারবার অনুরোধ করেছিলেন। এতে বড়লাট বিস্মিত হয়েছিলেন এবং অসংগত অনুরোধ রক্ষা করতে তিনি যে অপারগ তা জানিয়েছিলেন। কারণ—"we are at war" (আজাদের বই India wins freedom)। গান্ধীজী হিটলার-তোজোর বিরুদ্ধে "অসত্যের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে" বলে সত্যাগ্রহও করেননি বা মৃত্যুকে বরণও করেননি।

গান্ধীজীর অহিংসা আশ্রয়ী সত্যাগ্রহ বৃটিশ রাজত্বে—সাউথ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষে ক্রমবিকাশ ও সফলতা লাভ করেছিল। হিটলার, মুসোলিনী বা স্তালিনের প্রভুত্বকালে এই আন্দোলনের পরিণতি বাঘ-ভাল্লুকের কাছে অহিংসা নীতি প্রচার করার মত হত।

মূলত রাজনীতি এবং ধর্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু। যতটা পারা যায় ততটা দুইয়ের মিলনের চেষ্টা গান্ধীজী করেছিলেন। অর্থাৎ compromise-এর experiment। এবং সত্যকে তার মানদন্ড করে দাঁড়া করেছিলেন। তাই কখনও বাঁকা কখনও সোজা পথে যেতে হয়েছিল।

বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কলিকাতা

চুম্বক

২৩ জুলাই (১৯৭৭)-এর দেশে মানসী রায় লিখিত 'পৃথিবীর চুম্বকত্ব সম্পর্কে দু-চার কথা' প্রবন্ধের ভিতরে আছে—

'পৃথিবীর তরল কেন্দ্রে বিশাল এক ডায়নামো চলছে যা কিনা ক্রমাগত বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি করছে এবং সেই বিদ্যুৎ প্রবাহই হচ্ছে ভূ-চুম্বকের আদি কথা।'

প্রযুক্তিবিদ্যার বইতে আমরা যে ডায়নামোর কথা পাই তাতে তড়িৎপ্রবাহ তৈরী করতে শক্তিশালী চুম্বক লাগে। সেই প্রয়োজনীয় চৌম্বক ক্ষেত্র এখানে আসছে কোথা থেকে?

পৃথিবীর অভ্যন্তরে তড়িৎগ্রস্থ কণিকার আবর্তনে উৎপন্ন তড়িৎপ্রবাহ চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করতে পারে। লেখিকা কি এই কথাটা বলতে গিয়ে ডায়নামোর অবতারণা করেছেন? তা হলে কিন্তু প্রয়োগটি সুষ্ঠু হয়নি। কেননা ডায়নামো বলতে বুঝায় এক ধরনের যন্ত্র যেখানে চুম্বক ও পরিবাহী তারের আপেক্ষিক গতিদ্বারা তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। তড়িতোৎপাদনকারী যে কোন ব্যবস্থাকে ডায়নামো বলা যাবে না।

জীতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রীরামপুর (পশ্চিমবঙ্গ)

প্রকাশিত হল

বিমল করের

এক আশ্চর্য বেদনার,
কিংবা অন্বেষণের,
অথবা ভালোবাসার উপন্যাস

প্রচ্ছন্ন

দাম ১০·০০

একটা আশ্চর্য অসুখ নিয়ে বেঁচে ছিল সুরপতি। বুকের গভীরে প্রচ্ছন্ন প্রবল এক বেদনা। থেকে থেকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে যেন শ্বাসরোধ করে দিতে চাইত। ঠিক কোনখানটিতে যে এর উৎস এবং কিসে এর উপশম, বুঝতে পারত না সুরপতি। তার আযৌবন সৌন্দর্য আর ভালোবাসা অন্বেষণের মধ্যে কি? বোঝেনি মীরাও।
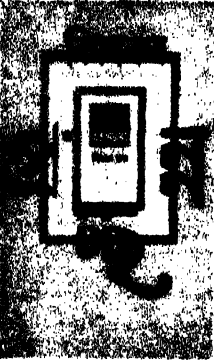
বুঝলে, সুরপতির জীবনে মীরা থেকে আরম্ভ করে রমা তনু, শ্যামা, বকুল একগুলি মেয়ের আগমন ঘটলেও কেন মানুষটা কোথাও দাঁড়াল না—এ প্রশ্ন তার মনে জাগত না। নীতেন্দু, প্রমথ এবং সুরপতির ভালোবাসা পাওয়ার পরেও কেন সত্য হয়ে উঠল না তার নিজেরও চাওয়াটুকু, তাও তার অগোচর থাকত না। আসলে আমরা কেউই বুঝি না, বুঝতে পারি না। যদিও ঐ একই অসুখ নিয়ে আমরা অনেকেই বেঁচে আছি—বেঁচে থাকি। সুরপতির মতন মীরার মতন। 'প্রচ্ছন্ন' এক আশ্চর্য বেদনার গল্প, কিংবা অন্বেষণের, অথবা ভালোবাসার। শুধু সুরপতি আর মীরার নয় আমার, আপনার, আমাদের সকলের॥

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা-৯
ফোন ৩৪ ৪৪৬২

কবিতার বই

সরলাবালা সরকারের
অর্ঘ্য ৩·০০
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর
উলঙ্গ রাজা ৫·০০
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
ছেলে গেছে বনে ৪·০০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
আমার স্বপ্ন ৪·০০
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের
সোনার বাগান ও কিছু নতুন কবিতা ৩·০০
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের
প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই ৪·০০
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ৩·০০
আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল ৫·০০
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের
ছৌ-কাবুকির মুখোশ ৩·০০
তারাপদ রায়ের
নীলদিগন্তে এখন ম্যাজিক ৪·০০
শঙ্খ ঘোষের
মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয় ৪·০০
সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের
ধ্যানে ব্যবধানে ৪·০০
তুষার রায়ের
মরুভূমির আকাশে তারা ৪·০০
প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের
নিজস্ব ঘুড়ির প্রতি ৪·০০
সাধনা মুখোপাধ্যায়ের
রমণী গোলাপ ৩·০০
রাজলক্ষ্মী দেবীর
হৃত জনপদ ৪·০০
পূর্ণেন্দু পত্রীর
তুমি এলে সূর্যোদয় হয় ৪·০০
অমিয় চক্রবর্তীর
অনিঃশেষ ৪·০০
নরেশ গুহর
তাতার সমুদ্র ঘেরা ৪·০০
দিব্যেন্দু পালিতের
কিছু স্মৃতি কিছু অপমান ৫·০০
সুব্রত চক্রবর্তীর
বালক জানে না ৫·০০
সুনীল বসুর
হৃৎপিণ্ডে দারুণ দামামা ৫·০০
কেতকী কুশারী ডাইসন-এর
বল্কল ৫·০০
সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্বপ্নে উপকূলে ৫·০০
আনন্দ বাগচীর
উজ্জ্বল ছুরির নীচে ৫·০০
বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের
ভেঙে যায় অনন্ত বাদাম ৫·০০
বিষ্ণু দে-র
উত্তরে থাকো মৌন ৫·০০

ষষ্ঠ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

সত্যজিৎ রায়ের

ফেলুদার গোয়েন্দা-উপন্যাস

কৈলাসে কেলেঙ্কারি

দাম ৫·০০

এলোরার বিখ্যাত কৈলাস মন্দির এবং তেত্রিশটি গুহায় এক আন্তঃ রাজ্য মূর্তিচোর দলের সঙ্গে ফেলুদার সংঘর্ষে নতুন পটভূমি, নতুন ধরনের অপরাধ, এবং রহস্য উদ্ঘাটনের বিস্ময়কর তদন্তপদ্ধতির এক অভিনব রহস্যকাহিনী॥

প্রকাশিত হয়েছে

শিবকালী ভট্টাচার্যের

ভারতীয় ভেষজ বিষয়ক
অদ্বিতীয় গ্রন্থ

চিরঞ্জীব বনৌষধি

দ্বিতীয় খণ্ড
দাম ২৫·০০

বইটি রেজিস্ট্রি ডাকে পেতে হলে মানি অর্ডার, পোস্টাল অর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে ২৫ টাকা পাঠাতে হবে। ডাকখরচ আমাদের॥

ভি পি-তে পেতে হলে ৫ টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে॥

পুস্তকবিক্রেতাদেরও প্রতি অর্ডারের সঙ্গে কিছু অগ্রিম অবশ্যই পাঠাতে হবে॥

কয়েকটি উপন্যাস

বুদ্ধদেব গুহর
ঝাঁকিদর্শন
দাম ৬·০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
আশ্চর্য ভ্রমণ
দাম ৬·০০

সমরেশ বসুর
বিজড়িত
দাম ৬·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
সংসারে এক সন্ন্যাসী
দাম ৭·০০

রমাপদ চৌধুরীর
বনপলাশির পদাবলী
দাম ১৫·০০

মতি নন্দীর
স্টপার
দাম ১০·০০

দিব্যেন্দু পালিতের
বৃষ্টির পরে
দাম ৬·০০

সুবোধ ঘোষের
কালকেতু
দাম ৭·০০

বিমল মিত্রের
শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন
দাম ১০·০০

মনোজ বসুর
প্রেম নয়, মিছে কথা
দাম ৪·০০

কালকূট-এর
অমৃত বিষের পাত্রে
দাম ৮·০০

শওকত ওসমান-এর
জাহান্নম হইতে বিদায়
দাম ৫·০০

বরুণ সেনগুপ্তের
সব চরিত্র কাল্পনিক
দাম ৮·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর

আত্মকথার প্রথম পর্ব

ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা

দাম ২৫·০০

আত্মকথা যদি হয় এমন এক ব্যক্তিত্বের, যিনি নিরপেক্ষপাত দৃষ্টি দিয়ে অথচ পরম অনুরাগের সঙ্গে তাকাতে পারেন নিজের দিকে, সবার দিকে এবং সব কিছুর দিকে আর তাঁর দেখাকে মূর্ত করতে পারেন সরস পরিহাসের অন্তরালে গভীরতাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে, তা হলে সেই অমৃতক্ষরা জীবনভাষ্যই হয়ে ওঠে ব্রহ্মস্বাদসহোদরোপম চির-আনন্দের উৎস। এ বই তাই-ই॥
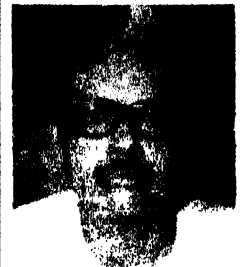
গৌরকিশোর ঘোষের

অসাধারণ উপন্যাস

গড়িয়াহাট ব্রিজের উপর থেকে, দু'জনে

দাম ৪·০০

উনিশ শো একাত্তরের মাঝামাঝি। সন্ত্রাস আর আতঙ্কের এক দুর্ভেদ্য বাতাবরণে মোড়া কলকাতার নাগরিক-জীবনের তখন নাভিশ্বাস শোনা যাচ্ছে। সেই ভয়ংকর দিনগুলির এক অনবদ্য চিত্র 'গড়িয়াহাট ব্রিজের উপর থেকে, দু'জনে'॥

দেশ ৪৪ বর্ষ ৪১ সংখ্যা
২১ শ্রাবণ ১৩৮৪

সূচীপত্র

আগামী সংখ্যায়

অশোক রুদ্রের প্রবন্ধ
চরমপন্থী কে?
সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ
হরিনাথ দে : জীবন ও প্রজ্ঞার জ্যোতির্ময় জলপ্রপাত
রাজেশ্বর মিত্রের প্রবন্ধ
গিরিশচন্দ্রের গান
তাপস সেনের প্রবন্ধ
যথাযথ না যুগান্তকারী?
শেখর বসুর গল্প
ছবির সুন্দরী

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাণাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

সম্পাদকীয়

নিউট্রন বোমার নৈতিক বিচার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও কৃতিত্বের নবতম সৃষ্টি হিসাবে যদি নিউট্রন বোমার নাম উল্লেখ করা হয়, তবে সেটা নিশ্চয়ই কঠোর এক অপ্রশস্তির উল্লেখ বলে বিবেচিত হবে। বস্তুত নিউট্রন বোমার প্রসঙ্গে বিশ্বের জনমতে এইরকমই একটি নৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, যেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের প্রতি আদৌ প্রশস্তিবাচক কোন ধারণার পরিচয় নয়। প্রেসিডেন্ট কার্টার এইবার মার্কিনের কংগ্রেসের কাছে আর্থিক সাহায্যের মঞ্জুরীর জন্য আবেদন করবেন। গত ৮ই জুলাই নিউট্রন বোমার 'সাফল্যজনক বিস্ফোরণের' পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। অতঃপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নতুন ইচ্ছার ঘোষণা অনুযায়ী নিউট্রন বোমার মজুদ সম্ভব করবার জন্য উৎপাদনের কাজ শুরু করা হবে।

বলা বাহুল্য, আণবিক বোমার অতি-ভয়াবহ ও অল্প-ভয়াবহ নানা প্রকারের বিধ্বংসক ক্ষমতার মারণাস্ত্র যখন বড়-বড় শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির সকলেই তৈরী করছেন, তখন নিউট্রন বোমা নামক নতুন মার্কিনী আবিষ্কারের একটি বিধ্বংসক বিস্ফোরকের বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদ মুখরিত করবার অতিরিক্ত কোন হেতু থাকতে পারে না। তবু দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিবাদ বেশ ব্যাপকভাবেই উচ্চারিত হয়েছে। এমন কি স্বয়ং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই জনমতের একাংশকেও উচ্চ-কণ্ঠে আপত্তি ঘোষিত করতে দেখা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিরোসিমার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক বোমা নিক্ষেপ করবার একটি নৈতিক যুক্তি প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের মন্তব্যে ধ্বনিত হয়েছিল। সেই যুক্তির সারমর্মকথা এই যে, বহু-বহু লক্ষ ব্যক্তির প্রাণরক্ষা সম্ভব করবার জন্য এক-আধ লক্ষ ব্যক্তির প্রাণবিনাশের প্রয়োজন অপরিহার্য হলে সেটা সঙ্গত কর্তব্যেরই প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ কমসংখ্যকের প্রাণবিনাশ সম্ভব করে যদি বহু-বহু সংখ্যকের প্রাণরক্ষা সম্ভব করা যায়; তবে তাই করতে হবে। সেটা বিশেষ মানবতাসম্মত কর্তব্য।

লক্ষ্য করতে হয়, নিউট্রন বোমার বিশেষ দক্ষতার যে চমৎকারিতার পক্ষ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী বক্তব্যের একটি নৈতিক ভাষ্য প্রচারিত হয়েছে, তার মধ্যে ট্রুম্যানঘোষিত নীতির প্রায় বিপরীত নীতির কণ্ঠস্বর শোনা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের বড় বড় বিশেষজ্ঞের মতে, নিউট্রন বোমার বিশেষ গুণ এই যে, এই বোমার বিস্ফোরণে যে মৃত্যুর রশ্মি উদ্‌গত হয় ও বিস্তারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সেটা নিতান্ত রকমে তথা বিশেষভাবে মানুষের প্রাণের বিনাশ সম্ভব করে, অথবা মানুষের কায়িক অক্ষমতা সৃষ্টি করে। কিন্তু বস্তুর অর্থাৎ ঘরবাড়ি কিংবা শিল্পকার্যের কারখানা ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদির কোন ক্ষতি করে না। নিউট্রন বোমার বৈশিষ্ট্য ও বিস্ময়ের আরো একটি পরিচয়ের ব্যাখ্যা এই যে, এই বোমা নিতান্ত রকমে রণক্ষেত্রের সীমাগুলের মধ্যে ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ রণক্ষেত্রের বাইরের কোন স্থান ও অবস্থানের লোকজনের পক্ষে নিউট্রন বোমার আঘাতে বিপন্ন হবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। 'মিত্র শক্তি অথবা নিকটবর্তী জনসাধারণের ক্ষতি না করে' শুধু রণক্ষেত্রের আয়তনের মধ্যে বিপক্ষের সেনাবাহিনীর প্রাণবিনাশ সম্ভব করবার যোগ্যতা এই বোমার ক্রিয়াচার ও কার্যকারিতার একটি বৈশিষ্ট্য।

সমালোচক বলবেন, এবং মানবতার তত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁদের বুদ্ধি-বিচারের সঙ্গে আন্তরিক মমতার কিছু স্পর্শ থাকে তাঁরাও বলবেন যে, এ অতি চমৎকার-নির্মম একটি বৈশিষ্ট্য। এ ক্ষেত্রে মানুষের প্রাণের তুলনায় বৈষয়িক বস্তুর মূল্য ও মর্যাদা বড় করে দেখা হয়েছে। কিন্তু আবার সেই প্রশ্নেই ফিরে যেতে হয় : যখন পরমাণু-অস্ত্রের অক্লান্ত নির্মাণ বড়-বড় শক্তিধর দেশগুলির অভ্যান্ত ব্রতাচারে পরিণত হয়েছে, এবং জড়-অজড় এবং বস্তু ও প্রাণের উভয়েরই ব্যাপক ও প্রবল বিধ্বংস যখন এই ভয়ানক সাধনার আকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধি, তখন নিউট্রন মারণাস্ত্রের অভিনবতার মধ্যে অতিরিক্ত কোন ধ্বংসের সঙ্কেত আছে বলে মনে করবার কোন যুক্তিও নেই। কোন-কোন সমালোচক বলবেন, অভিনব মারণক্রিয়ার বিস্ময় দিয়ে নির্মিত এই নিউট্রন বোমা মার্কিনী প্রতিভার দান, সুতরাং, এক্ষেত্রে মার্কিন নীতিরই সম্পর্কে মানবতা ও মমতার প্রশ্ন বেশ কঠোর হয়ে দেখা দিয়েছে। আর-এক শ্রেণীর সমালোচক বলবেন, অন্যান্য বড়-বড় শক্তিধর দেশগুলি যে মার্কিনের কৃতিত্ব অনুসরণ করবেন না ও নিউট্রন বোমা নির্মাণ করবেন না, এমন কোন অমোঘ নৈতিক সংযম ও সাধুতার কোন অঙ্গীকার কি কোথাও আছে? নেই। সুতরাং, ঘটনার মধ্যে রাজনীতিক সাধুবাদ অথবা অসাধুবাদের কোন বিচার না করে, শুধু এই সত্যটুকু উপলব্ধি করলেই হবে যে, বিশ্বের শান্তিকে উদ্বিগ্ন করবারই একটি নতুন দুর্ভাগ্যের নমুনা হলো এই নিউট্রন বোমা।

ব্যঙ্গচিত্র
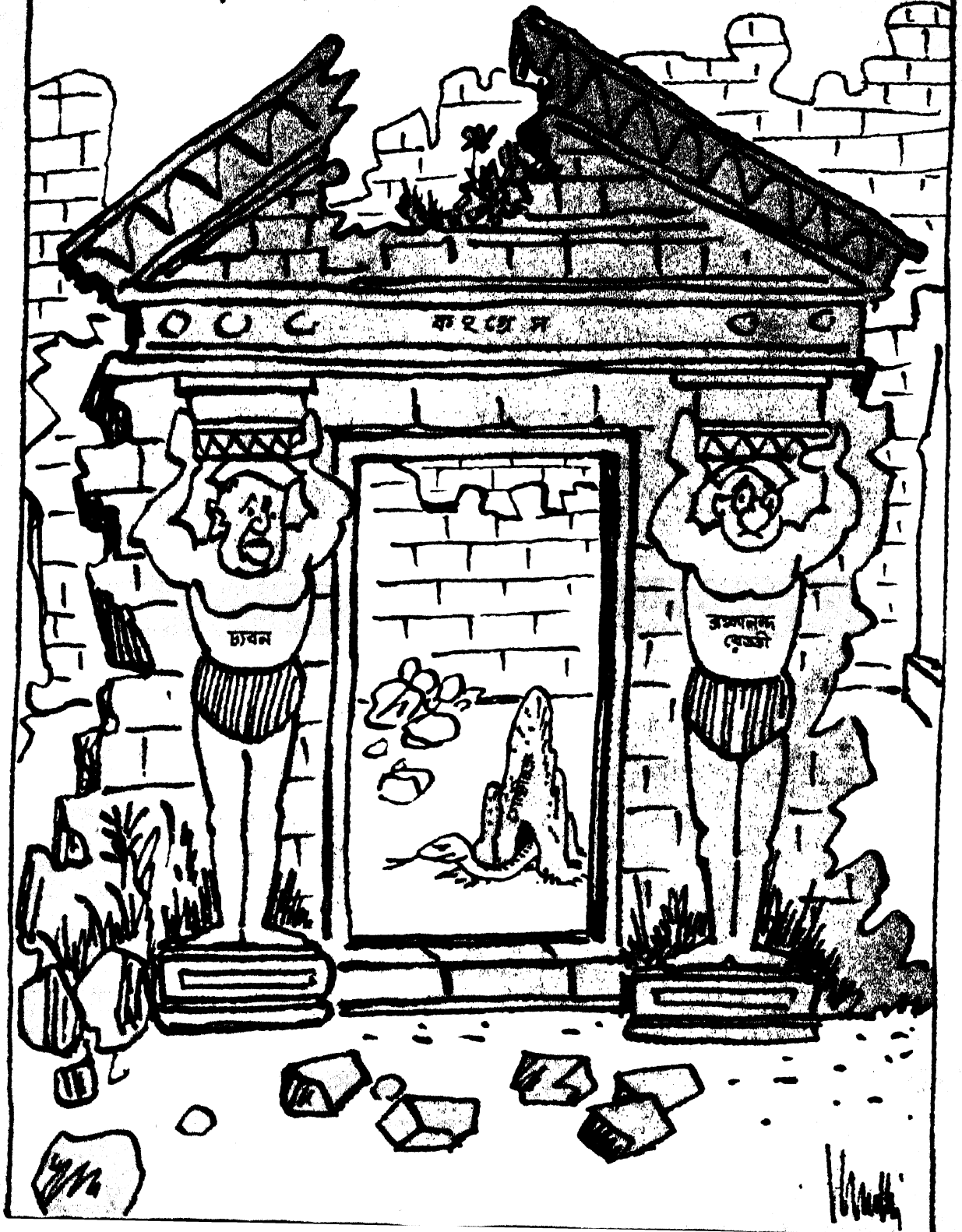
সমস্যা-সঙ্কুল সিকিম

মানস দাশগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিকে পার্বত্য অঞ্চল চড়াই উৎরাই নিয়ে ধীরে ধীরে দুই ভাগে ভাগ হয়েছে—সিংগিলালা আর চোলা। এরই মাঝখানে অসংখ্য শৃঙ্গ দিয়ে ঘেরা সিকিম—উত্তরে যার তিব্বত, পশ্চিমে নেপাল, আর দক্ষিণ-পশ্চিমে ভুটান। এ দেশটির মধ্য দিয়ে তিস্তা বয়ে গেছে—আর তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে রঙ্গিত, রঙ্গিনী-চু, লাচেন আর লাচুং। সামনে অভ্রংলিহ কাঞ্চনজঙ্ঘা। মৌসুমী বায়ুর সরাসরি পথের উপর বলে সিকিম সারা বছর ধরে বৃষ্টি পায়। সবুজ উপত্যকা ধীরে ধীরে উত্তরে তুষারস্তূপে হারিয়ে যায়। নদীতে জল থাকে সারা বছর, আর উপত্যকায় নদীর অববাহিকার চারপাশে আছে বন অরণ্যানী—আছে জানা-অজানা গাছ, আর নাম-না-জানা ফুল ও অর্কিডের সমারোহ।

সারা সিকিমে মাত্র দুই লক্ষ লোকের বাস—উত্তর অঞ্চলে লোকবসতি কম। রাজধানী গ্যাংটককে আর তার আশপাশ ঘিরে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ হাজার লোক থাকে। দ্বিতীয় শহর রংপোতে কিছু কম লোকবসতি। গ্রামগুলো অনেক দূরে দূরে—পশ্চিমবঙ্গের মত গ্রাম নয়—পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট "গ্রামাণু"। গ্রামগুলিতে সপ্তাহের হাট থেকে কেনাবেচা চলে; হাটগুলি ঠিক যেন সাপ্তাহিক মেলা—হাট থেকে আসে খাদ্যদ্রব্য, আসে তৈজসপত্র, পোশাক পরিচ্ছদ। দু লক্ষ লোকের বাসভূমি সিকিম—জনসমষ্টি তার বিচিত্র ও বিভিন্ন। বৈসাদৃশ্য সিকিমের লোকবৈশিষ্ট্যে, বৈসাদৃশ্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয়। এদিক দিয়ে সিকিম যেন একটি ছোট ভারতবর্ষ। সিকিমের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার ভূত-ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানও এই জনসমষ্টির বিচিত্র বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে আছে।

সিকিমের জনসমষ্টিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। লেপচা—যারা সিকিমের আদিবাসী; সিকিমে প্রথম উপনিবেশ এরাই গড়ে তোলে। মঙ্গোলীয় হলেও তিব্বতী বা ভোটিয়াদের সঙ্গে অনেক অমিল। দ্বিতীয় দলে আছে ভোটিয়া। এরা প্রায় ৫০০ বৎসর আগে এসেছে তিব্বত ও ভুটান থেকে। সিকিমের মালভূমিতে দেখা গেলেও এদের আকর্ষণ উত্তরের আরও উঁচু অঞ্চল। পারিপার্শ্বিক প্রভাবে এদের অনেকেই পশুজীবী। ধর্মে এরা এবং লেপচারা দুই গোষ্ঠীই বৌদ্ধ। সিকিমে লেপচা ও ভোটিয়া ছাড়া আছে নেপালীরা। গত শতকে বা তার কিছু আগে তারা সিকিমে এসে নানা কারণে বসবাস করতে আরম্ভ করেছে। ধর্মে তারা অধিকাংশই হিন্দু এবং সাধারণ হিন্দুর মত বর্ণবিভাগ মানে। লেপচা-ভোটিয়া-নেপালী ছাড়া আরও একটি উপদল আছে, যাদের বলা হয় "সোঙ্গ"—এরা নেপাল-মঙ্গোপো উপত্যকা বহু দিন আগে এসেছিল। "সোঙ্গরা" সংখ্যায় কম।

নেপালীরা সিকিমে বর্তমানে সংখ্যায় বেশী—লোকসংখ্যার প্রায় সত্তর শতাংশ বা তার কিছু বেশী। বাকী ত্রিশ শতাংশ লেপচা-ভোটিয়ারা প্রায় সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছে। সিকিমে "আদিবাসী" লেপচা-ভোটিয়ারা বর্তমানে সংখ্যালঘিষ্ঠ, কিন্তু অনুপ্রবেশকারী নেপালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সিকিমের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার মূল এরই মধ্যে নিহিত আছে।

এই হিন্দু নেপালীদের প্রাধান্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বা মধ্যভাগেও বিশেষ ছিল না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই নেপালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠের পর্যায়ে পড়ে যায়। সিকিমের বর্তমান রাজা বা চোগিয়াল নামগ্যাল বা ভোটিয়া। লেপচাদের বহু দিন আগে হারিয়ে ভোটিয়ারা সিকিমে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। লেপচারা শান্ত, নিরীহ ও প্রধানত কৃষিজীবী। অন্য দিকে সামন্ত ও লামাদের মধ্যে ভোটিয়া প্রাধান্যই বেশী। "অনুপ্রবেশকারী" হিন্দু নেপালীদের জমির 'ভাগীদার' বলে মেনে নিতে তাই ভোটিয়াদের প্রবল আপত্তি—বহু দিন ধরে তারা প্রতিবাদে সোচ্চার।

১৮৯৪ সালে তদানীন্তন এক ব্রিটিশ অফিসার সিকিম সম্বন্ধে ব্রিটিশদের নীতি খুব পরিষ্কার করে লিখে গেছেন। তার সারমর্ম হলো—

"সিকিমে ব্রিটিশদের অবস্থা ক্রমশ শক্তিশালী হবে, জনসংখ্যার গঠন-কাঠামোর পরিবর্তন এর কারণ। লেপচারা ক্রমশ হটে যাচ্ছে, পশ্চিমে নেপাল থেকে আসছে পরিশ্রমী নেয়ার ও গুর্খারা। তারা পশ্চিম দিকের জমিগুলিতে চাষবাস আরম্ভ করেছে, আর এইসব জমির উপর ইউরোপীয় চা-মালিকদের লুব্ধ দৃষ্টি আছে। আনন্দের কথা যে, নেয়ার ও গুর্খারা যুগ যুগ ধরে তিব্বতীদের শত্রু। সুতরাং যত নেপালী আসবে তত তিব্বতীদের আওতা থেকে সিকিমকে সরিয়ে রাখা সম্ভব হবে। এ ছাড়া ধর্মের ব্যাপারেও নজর রাখা দরকার। ভারতবর্ষের মতো সিকিমেও নেপালী হিন্দুরা নিশ্চিতভাবে বৌদ্ধদের হটিয়ে দেবে আর লামাদের উপাসনার জায়গায় শোনা যাবে ব্রাহ্মণদের প্রার্থনা। ধর্মকে অনুসরণ করে দেশের আইন—অতএব তিব্বতীরা ক্রমশ তাদের জমির মালিকানা হারাবে। জাতি আর ধর্মই তো এশিয়ার রাজনীতির মূলমন্ত্র।......সুতরাং সিকিমে নেপালী বসবাসের যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে।"

ব্রিটিশদের আনুকূল্যেই হোক, অথবা অন্য কোন কারণে নেপালী "অনুপ্রবেশ" ক্রমশ এত বেশী বেড়ে গেল যে, রাজা ভোটিয়া এবং মন্ত্রী বা [illegible] ভোটিয়া হলেও প্রজারা হয়ে দাঁড়াল অধিকাংশই নেপালী।

রুমটেক্ বিহার
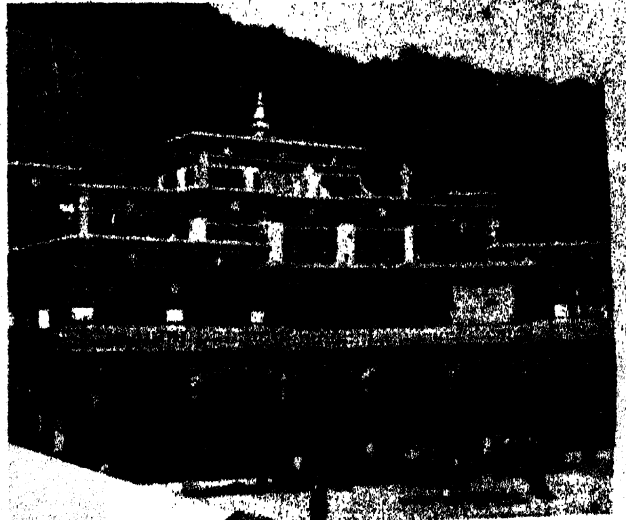
সিকিমের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গণ্ডগোল, বিপ্লব, বিদ্রোহ—সবই এই গোষ্ঠীভেদের কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে।

নেপালীরা পরিশ্রমী। কঠোর শ্রম-মেহনত করে স্থানীয় অধিবাসীদের হাত থেকে ধীরে ধীরে জমি-চাষের অধিকার নিতে শুরু করে। হঠাৎ সচকিত হয়ে "স্থানীয় অধিবাসীরা" নিজেদের জমি বেহাত হবার সম্ভাবনা দেখল। এই নিয়ে রাজদরবারে বিভিন্ন নালিশ জমা হয়। জমি হারাবার সম্ভাবনার ক্রোধ ভোটিয়া-নেপালীদের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার রূপ নিয়ে ১৮৮০ সনে প্রথম প্রকাশ পায়। হাঙ্গামার পূর্ণ উপশম কিন্তু ঘটল না—ছোট বড় সাম্প্রদায়িক ঘটনা বা মারদাঙ্গা মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে।

ব্রিটিশ ও চোগিয়ালের দ্বন্দ্ব শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্র বলে কোন কিছু সিকিমে চালু হয়নি। কিন্তু "নয়া প্রজা" নেপালীদের উপর রাজার আইন-শাসন অনেক কঠোর ছিল। অনেক কাজই নেপালীদের কাছে মুক্ত ছিল না, জমি হস্তান্তরের নানা লিখিত বা অলিখিত নিয়মকানুনের মারফত নেপালীদের জমির মালিকানা পাওয়া সহজ রইল না। এ ছাড়া সিকিমের "প্রজা" কাকে বলা হবে, সেই অনুশাসনের ব্যাখ্যায় নেপালীরা দ্বিতীয় স্তরের প্রজা হয়ে দাঁড়াল। "স্থানীয় অধিবাসী" ভোটিয়া-লেপচারা যেটুকু রাজনৈতিক ক্ষমতা রাজার কাছে পেয়েছিল, "বহিরাগত" নেপালীদের ভাগ্যে সেটুকু কৃপাও জোটেনি।

একটা কথা লেপচাদের সম্পর্কে শোনা যায়—এটি সত্যি, না গল্পকল্প জানা নেই। রাজা নেপালীদের অনুপ্রবেশ নিয়ে যত চিন্তিত, ভোটিয়া-প্রজারা যত ক্ষুব্ধ, অনেক লেপচা-প্রজা ঠিক ততটা উত্তেজিত ছিল না। লেপচাদের ধারণা, সিকিম তাদেরই দেশ, তাদেরই রাজ্য। এই দেশ ভোটিয়ারা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। নেপালী অনুপ্রবেশে ভোটিয়া আধিপত্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ।

গ্যাংটক শহর

তাই অনেক অভিজাত লেপচা-জনগণ এবং তাদের অ্যারিস্টোক্রেসির এক অংশ নেপালী রাজনৈতিক জাগরণের শামিল সহজেই হতে পেরেছিল।

॥ ২ ॥

তিব্বত-চীন সীমান্ত সড়কপথের একটি ঘাঁটি হিসেবে সিকিম রাজ্যটিকে ব্যবহার করতে ব্রিটিশরা চেয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে সিকিমে ব্রিটিশ শাসনের গোড়াপত্তন হলো। সিকিমের রাজা বা চোগিয়ালের চেয়ে ব্রিটিশ রিজেন্টের ক্ষমতা স্বভাবতই বেশী ছিল। তবুও ভারতীয় করদরাজ্যের রাজা-নবাবের তুলনায় চোগিয়ালের স্বাতন্ত্র্য কিছুটা অনন্য এবং অসাধারণ। আভিজাত্য মান-মর্যাদা এবং ক্ষমতার মহিমায় চোগিয়ালকে খুশী রেখে পৃথিবীব্যাপী শাসনের ইতিহাসে যে মূলমন্ত্র ব্রিটিশ-দের হাতিয়ার সেই "Divide And Rule" নীতি এ রাজ্যেও পুরো মাত্রায় তারা চালু করে। হিন্দুদের সঙ্গে বৌদ্ধদের, নেপালীদের সঙ্গে লেপচা-ভোটিয়াদের বিরোধের বীজ বপন করে বিবাদের বিষবৃক্ষকে সযত্নে লালনপালন করে সমস্যাজর্জরিত রাজ্যটিকে তারা আরও কণ্টকিত করে তোলে।

এই আদিম রাজতন্ত্রে রাজা সব জমির মালিক—তারাই প্রতিভূ হয়ে জমির দেখাশোনা করে ধনী সামন্তরা। এ ছাড়া কিছু বড় বৌদ্ধ সংঘের আছে দেবোত্তর সম্পত্তি, লামাদের উপর তার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব। রাজা যদিও সব জমির মালিক তবুও গ্রামে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে সামন্ত জমিদার ও লামারাই সর্বেসর্বা। রাজাদের নামে এরাই রাজস্ব আদায় করে, আইন শৃঙ্খলা এরাই বজায় রাখে। সোজা কথায়, এই ফিউডাল সমাজ পিরামিডের শীর্ষে আছেন রাজা বা চোগিয়াল—তিনি দেবপ্রতিম, সর্বনিম্নে আছে অসংখ্য দরিদ্র কৃষক প্রজা আর মাঝখানে আছে সামান্য কয়েক ঘর ভূস্বামী-জমিদার, যারা একেকজন ক্ষুদে নবাব—নামে মাত্র রাজার নামে রাজস্ব আদায় করে—এরাই সমাজের শিরোমণি, এদের মুখের কথা আইন, বাধ্যতামূলক এদের বিচার মানা, এরাই প্রজাদের ভালমন্দ সব চেয়ে ভাল জানে, বোঝে। রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের এই যুগ্ম মডেল বহু দিন ধরে সিকিমে চলে এসেছে—চলে আসছে।

প্রথম ব্রিটিশ পলিটিক্যাল অফিসার জন ক্লড হোয়াইট দেখেন—"সিকিমে সম্পূর্ণ অরাজকতা, এখানে কোনও ভূমিনীতি নেই। নেই রাজস্ব আদায়ের নির্দিষ্ট ধারা। প্রজাদের কাছে করের অজুহাতে যতটা পারেন চোগিয়াল বা রাজা কেড়ে নেন। রাজধানী বা রাজার কাছাকাছি যাঁরা আছেন, রাজার প্রত্যক্ষ জুলুম তাঁদের উপর বেশী। দূরে রাজার সামন্তরা রাজার নামে রাজস্ব আদায় করে—তার কতটা যে রাজা পান তাতে সন্দেহ থেকে যায়।......আইনের শাসন বলে কিছু নেই; নেই পুলিস, নেই কোনও শিক্ষাব্যবস্থা।"

এই প্রতিবেদন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লেখা; বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকে রাজনৈতিক মুক্তির আগেও এই ব্যবস্থার ও অবস্থার কোনও পরি-বর্তন বিশেষ ঘটেনি। যে পরিবর্তন রাজ্যে এসেছিল তা নিতান্তই প্রান্তিক—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজার মুখের কথা আইন—দেওয়ানী বা ফৌজদারী আইনের ব্যাখ্যাতা স্বয়ং রাজা—সমস্ত চুক্তির স্বাক্ষরকারী রাজা—জমিদারের ক্ষমতা, মন্ত্রীদের ক্ষমতা, মন্ত্রিসভার ক্ষমতা, জনগণের ক্ষমতা—সবই রাজা ঠিক করেন। সামান্য প্রান্তিক পরিবর্তন যে হয়নি তা নয়—কাজির বিচারব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন অবশ্য হয়েছিল, শিক্ষার নামে দু-একটা স্কুল প্রতিষ্ঠাও হয়—জমি জরিপ করার সাধু প্রচেষ্টা কয়েকবার করা হয়েছিল। তবু ক্ষমতা যা ছিল তা রাজা, সামন্ত এবং লামাদের হাতে আগের মতই থেকে গেল। গণতন্ত্রের মতো বিলাসকে রাজারা পাত্তা দেননি, বরং তাদের একমাত্র ইচ্ছা "বহিরাগত" সংখ্যাগরিষ্ঠ নেপালীদের কিভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা যায়—দূরে রাখা যায়। সিকিম নেপালীদের দেশ নয়, সুতরাং ভোটিয়া রাজা এবং তাঁর সামন্তদের ইচ্ছা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে সিকিমের "আদিবাসীরা" তাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলবে, তাদের জমির অধিকার যাবে—অতএব গণতন্ত্রের বদলে তথাকথিত "আধুনিকীকরণের" ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু এটা লক্ষ রাখা হলো যে, আধুনিকীকরণের ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ নেপালীরা যেন প্রকৃত ক্ষমতা না পায়। রাজার ইচ্ছা ভোটিয়া, লেপচা ও নেপালীদের মধ্যে ক্ষমতা এমন-ভাবে বণ্টন করা, যার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এক "ভারসাম্য" থাকে। তাই "অনুপ্রবেশকারী" নেপালী সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে "আদি বসবাসকারী" সংখ্যালঘিষ্ঠ ভোটিয়া-লেপচাদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ভারসাম্যকেই রাজা "আধুনিকীকরণ" বিশেষণে ভূষিত করলেন।

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত নিজেদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বজায় রেখে "আধুনিক-করণের" চেষ্টা রাজা ও তার অমাত্যরা ব্রিটিশদের সাহায্যে চালিয়ে গেলেন। গণতন্ত্রের দাবি কিন্তু সহজে দমন করা গেল না; নেপালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা সিকিমের জনসংখ্যার সিংহভাগ, সুতরাং রাজার এই পক্ষপাতদুষ্ট "আধুনিকীকরণের" বিরুদ্ধে কখনও সরবে, কখনও নীরবে তারা প্রতিবাদ জানাতে শুরু করলে। এই কৃষিপ্রধান দেশে জমির মালিক নেপালীরা নয়, জমির হস্তান্তরের আইন তাদের বিরুদ্ধে, অনেক সুযোগ-সুবিধাও তাদের জন্য নয়, ফলে ভোটিয়া রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদমুখর হতে লাগল। নেপালীরা ইতিমধ্যে ছোট ব্যবসা, অফিসে চাকরি এবং কিছু বড় ব্যবসায়ে জড়িত হয়েছে, কন্ট্রাক্টরিও তারা করে, যানবাহনের ব্যবসায়ে তারা প্রায় একচেটিয়া। তথাকথিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম নেপালীদের মধ্যে শুরু হলো। কিন্তু এই রাজতন্ত্রী প্রায় ফিউডাল সমাজব্যবস্থায় অনেক আইনই তাদের উন্নতির অন্তরায়। ফিউডাল প্রথার আইন-শৃঙ্খলা তাদের কাছে এক অবরোধ সৃষ্টিকারী অহেতুক উৎপাত। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পর থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ নেপালীদের প্রতিবাদ ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ভারতের স্বাধীনতার পর সিকিম ভারতের সঙ্গে এক "বিশেষ চুক্তিতে" আবদ্ধ হলো। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এই সময়ে জানালেন, "সিকিম অন্য সব রাজ্যের মতই ভারতের অংশ, তবে একটু বিশিষ্ট, একটু পৃথক।" ১৯৪৭ সালের পর ১৯৫০ সালেও আরেকটি চুক্তি হলো—সেই সময়েও ভারত-তিব্বত সীমানারাজ্য সিকিমের "বিশেষ অবস্থার" কথার উপর জোর দেওয়া হলো। এই দুই চুক্তিতেই ভারতের অভিভাবকত্বের কথা বলে সিকিমকে "আশ্রিত রাজ্য" বলা হয়েছিল। কিন্তু এই দুই চুক্তিতে অনেক প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া হলো না, অনেক বক্তব্যই উচ্চারিত হতে হতে অনুচ্চারিত থেকে গেল। সিকিম ভারতের কি ধরনের "আশ্রিত রাজ্য" বা কি ধরনের "অংশ", রাজার ক্ষমতা কতটা, ভারতের অভিভাবকত্বের সীমা কোথায়; গণতন্ত্র কতদূর পর্যন্ত সহনীয়, মন্ত্রিসভা নির্বাচিত হবে কিনা, নির্বাচিত হলে কি উপায়ে হবে, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা ইত্যাদি বহু প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যাওয়া হলো। এই বিশেষ চুক্তির বিশেষ ধারাগুলি রাজা পরবর্তী কালে যেমনভাবে করতে চাইলেন, ভারত সরকার ঠিক তেমনভাবে করলেন না, নেপালী প্রজারা যেমনভাবে ভাবছিলেন ভোটিয়া-লেপচাদের ভাবনা আবার অন্যরকম। চিন্তার টানাপোড়েনের আড়াল থেকে সিকিমে নতুন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হলো।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসেই জন্ম হলো সিকিম রাজ্য কংগ্রেস বা Sikkim State Congress। সর্বশ্রী তাশি শেরিং ও কাজি লেন্ডুপ দর্জি এর নেতৃত্ব দিলেন। সিকিম রাজ্য কংগ্রেসের নেতারা চাইলেন অবাধ নির্বাচন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও জমিদারি প্রথার বিলোপ, দাসপ্রথা ও বেগার খাটার অপসারণ। এ ছাড়াও তাঁরা চাইলেন সিকিমের পূর্ণ ভারতভুক্তি।

অন্য দিকে কিছু দিনের মধ্যে সিকিম জাতীয় পার্টির বা Sikkim National Party-র প্রতিষ্ঠা হলো, যার নেতৃত্ব দিলেন রাজার ভোটিয়া সেক্রেটারী শ্রীসোনাম শেরিং। এদের মুখ্য বক্তব্য: সিকিম ভারতের অচ্ছেদ্য

সিকিম সীমান্তরক্ষী ভারতীয় জোয়ান

অংশ কখনই নয়—ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বিচার করলে তুলনামূলকভাবে সিকিমের সম্পর্ক ভারতের চেয়ে তিব্বত ও ভুটানের সঙ্গে অনেক বেশী। তাঁরা চাইলেন রাজার ক্ষমতার কিছুটা পুনর্বিন্যাস। অর্থাৎ এক দল চাইল ভারতের সঙ্গে সম্পূর্ণভুক্তি, আরেক দল সেটা চাইল না। এক দল চাইল গণতন্ত্র, কারণ তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ; অন্য দিকে সংখ্যালঘিষ্ঠের দল চাইল স্বগোষ্ঠীর রাজার সুশাসন।

এর পর ঘটনা দ্রুত গতিতে বইতে লাগল। ১৯৪৯ সালে রাজ্য কংগ্রেসের নেতৃত্বে "No Representation No Rent" আন্দোলন আরম্ভ হয়। রাজা নেতাদের গ্রেপ্তারের আদেশ দিলেন। এর প্রতিবাদে হাজার হাজার লোক রাজ-ধানী গ্যাংটকের দিকে অগ্রসর হলো। বাধ্য হয়ে রাজা নেতাদের ছেড়ে দিলেন আর ভারত সরকারের পরামর্শে তাসি শেরিং-এর নেতৃত্বে এক মন্ত্রি-সভা গঠন করতে রাজী হলেন। তবুও সমস্যার সমাধান সহজে হলো না, রাজার ক্ষমতা ও জনগণের প্রতিনিধির ক্ষমতার সীমা জানা না থাকায় গোলমাল আর দ্বন্দ্ব লেগেই থাকল। এই "জনগণের সরকারের" স্থায়িত্ব ছিল মাত্র ঊনত্রিশ দিন। এর পর রাজার অনুরোধে ভারত সরকার সিকিমে দেওয়ান নিযুক্ত করলেন। ভারত থেকে পাঠানো, জনগণের উপর চাপানো এই দেওয়ানকে নেপালী বা ভোটিয়ারা কেউই ভাল চোখে দেখলেন না। ভারত সরকারের দেওয়ান কারুর বিরাগভাজন হতে চাইলেন না; ফলে হিতোপদেশের গল্পের মত সব পক্ষই ভারত সরকারের দেওয়ানের বিরূপ সমালোচক হলেন।

১৯৫০ সালে সিকিমে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো; উল্লেখ করার মত বেশ কতগুলি ঘটনা দেখা গেল। প্রতিনিধি নির্বাচনে রাজার ইচ্ছা জিতল। এমনভাবে আসন বণ্টনের হিসাব হলো যাতে নেপালীরা ক্ষমতায়

না আসে, নেপালী-ভোটিয়াদের দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকে এবং এই সাম্প্রদায়িকতার সুযোগে রাজা নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে পারেন। রাজা ঠিক করলেন কাউন্সিলে থাকবেন সতেরোজন সদস্য—তার মধ্যে বারোজন হবে নির্বাচিত আর পাঁচজন হবে রাজার অনুমোদিত। এই নির্বাচিত বারোজনের মধ্যে লেপচা-ভোটিয়াদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে ছয়টি, আর নেপালীদের জন্য ছয়টি। নির্বাচনের ফলে দেখা গেল, মুখ্যত লেপচা-ভোটিয়াদের "সিকিম জাতীয় পার্টি" জিতেছে লেপচা-ভোটিয়াদের জন্য সংরক্ষিত ছয়টি আসনেই, আর মুখ্যত নেপালীদের "সিকিম রাজ্য কংগ্রেস" জিতেছে নেপালীদের জন্য সংরক্ষিত ছয়টি আসনে। রাজা যেমন ভেবেছিলেন, নির্বাচনের ফল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ ও দ্বন্দ্ব না কমিয়ে বরং বাড়িয়ে চললো। অন্য দিকে জনগণের নির্বাচিত সদস্যদের কাছে ক্ষমতা দেবার কোনও সদিচ্ছা রাজার ছিল না, বরং সাম্প্রদায়িকতার বিষ যাতে ভালভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তারই চেষ্টা করলেন। অনেকের কাছে সিকিমের এই নির্বাচন এক ধরনের সার্কাসের খেলা—যে খেলায় রাজা প্রজাদের নড়তে-চড়তে দিলেন কিন্তু চাবুক রাখলেন নিজের হাতে। প্রজাদের স্বাধীনতায় বাধা হয়ে দাঁড়াল রাজার বিশেষ বিভেদ নীতি।

১৯৫৮ সালে দ্বিতীয় নির্বাচন হলো—সূত্র অনুযায়ী এই নির্বাচন আরও জটিল, আরও সাম্প্রদায়িক। সিকিম কাউন্সিলে সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে সতেরো থেকে কুড়ি করা হলো—তার মধ্যে ছয়টি আসন ভোটিয়া-লেপচাদের জন্য সংরক্ষিত, ছয়টি নেপালীদের, একটি নেওয়া হবে লামাদের থেকে, আর "সমগ্র সিকিম" থেকে একজন। বাকি ছয়জন রাজার অনুমোদিত। প্রথম নির্বাচনের মত এই নির্বাচনও ভোটিয়া-লেপচাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের পাঁচটিতে জিতলো প্রধানত ভোটিয়া-লেপচাপ্রধান "সিকিম জাতীয় দল", আর নেপালীদের আসন সব ক'টিতে জিতলো "সিকিম রাজ্য কংগ্রেস"। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, সিকিম রাজ্য কংগ্রেস লেপচা-ভোটিয়ার জন্য সংরক্ষিত একটি আসনে জিততে সক্ষম হলো। কিন্তু রিগিং-এর নালিশ ও পাল্টা নালিশে কিছু আসনে আবার নির্বাচন হলো।

শুরু থেকেই "রাজ্য কংগ্রেস" কিছুটা সাম্প্রদায়িক নিরপেক্ষতা বজায় রাখবার চেষ্টা করেছিল—তবুও "রাজ্য কংগ্রেসে" ঘরোয়া লড়াই আরম্ভ হয়। কাজী লেন্ডুপ দোর্জি "রাজ্য কংগ্রেস" থেকে বেরিয়ে গিয়ে 'স্বতন্ত্র দল' নামে একটি নতুন পার্টি করলেন। এই কাজী লেন্ডুপ দোর্জি তাসি শেরিং-এর মৃত্যুর পর (১৯৫০ সাল) থেকে রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন।

সিকিম রাজ্য কংগ্রেসে যেমন গৃহবিবাদ শুরু হলো তেমনি গৃহবিবাদ আরম্ভ হলো সিকিম জাতীয় পার্টিতে। সোনাম শেরিং-এর নেতৃত্ব অনেকের কাছে অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়াল। পরিশেষে সভাপতির পদে তাঁর বদলে এলেন মার্তাম টভ্‌পেন।

দ্বিতীয় নির্বাচনের পর অনেকেই উপলব্ধি করলেন যে, সাম্প্রদায়িকতার অজুহাতে রাজ্যে গণতন্ত্রের প্রসারে আরও বিঘ্ন আসবে। নির্বাচিত সদস্যরা বুঝলেন যে, নির্বাচিত হলেও তাঁদের হাতে প্রকৃত কোনও ক্ষমতা নেই—কারণ রাজার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর সব কিছু নির্ভর করে। ১৯৫৯ সালে কাজী লেন্ডুপ দোর্জি একটি সম্মেলন ডাকলেন; এই সম্মেলনে সব দলকেই আমন্ত্রণ জানানো হলো। সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য, দেশে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা, যাতে গণতন্ত্রের দাবি ও তার প্রতিষ্ঠা সাম্প্রদায়িকতার বুলডোজারের ধাক্কায় ধ্বংস হয়ে না যায়। সম্মেলনে বিভিন্ন দলের মধ্যে বোঝাপড়া তেমন কিছু হলো না এবং রাজার ক্ষমতা কতখানি কমানো দরকার তা নিয়েও তর্কের শেষ থাকল না; তবুও চোগিয়ালের ক্ষমতা যে কিছু সীমায়িত করা দরকার এই নিয়ে অন্তত একটা সমঝোতার আলোচনা হলো। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা হলো কাজী লেন্ডুপ দোর্জির নেতৃত্বাধীনে নতুন এক রাজনৈতিক দল—নাম "সিকিম জাতীয় কংগ্রেস" বা Sikkim National Congress; সিকিম "রাজ্য কংগ্রেস" ও "সিকিম জাতীয় পার্টি" থেকে বেরিয়ে আসা দল-উপদল নিয়ে এর জন্ম হলো। সাম্প্রদায়িক বিভেদনীতিতে যাঁরা অভ্যস্ত, নানা সম্প্রদায় নিয়ে গড়া এই পার্টিকে তাঁরা বিশেষ ভাল চোখে দেখলেন না। চোগিয়াল স্বয়ং সরাসরি সিকিম জাতীয় কংগ্রেসকে উপেক্ষা করতে চাইলেন।

রাজা কাজী লেন্ডুপ দোর্জিকে বাদ দিয়ে সিকিম জাতীয় পার্টির মার্তাম টভ্‌পেনকে প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত করলেন। ১৯৬০ সালের উপ-নির্বাচনে কাজী লেন্ডুপ দোর্জির পার্টি যদিও অনেক বেশী ভোট পেলেন, জটিল ভোট প্রণালীর জটিলতর নিয়ম বের করে মার্তাম টভ্‌পেন পার্টির সদস্যকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হলো। সাম্প্রদায়িকতা যাতে দূর না হয়ে যায় তার জন্য রাজা সচেষ্ট হলেন। অন্য দিকে কাজী লেন্ডুপ দোর্জি গণতন্ত্রের আন্দোলনের মারফত দেশের জনগণকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন। দু বছর কাটল; ১৯৬২ সালে চীন-ভারতের যুদ্ধের পর নির্বাচনের সংস্কারে রাজা স্বীকৃত হলেন, তবু নানান ছুতোয় তাকে স্থগিত রাখলেন।

গণতন্ত্রের আন্দোলন ক্রমশ প্রত্যক্ষ হতে থাকে। ইতিমধ্যে পণ্ডিত নেহরুর বিশ্বাসভাজন ও স্নেহধন্য মহারাজা তাসি নামগিয়ালের মৃত্যু হয়েছে। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর সিকিমের শাসন চালিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজা হলেন বর্তমান মহারাজা পালডেন থনডুপ। এই রাজার আমলেই প্রজার সঙ্গে বিবাদটা ক্রমশ বাড়তে লাগল।

১৯৬৭ সালে তৃতীয় নির্বাচনের সময় এসে গেল। নির্বাচনের রীতি-নীতির সংস্কার করা হলো—যেমন কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে করা হলো [illegible], আর নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা করা হলো আঠারো। সাম্প্রদায়িকতার সূত্রও জোরদার করা হলো—রাজা ঠিক করলেন ভোটিয়া-লেপচাদের সংখ্যা হবে সাত আর নেপালীদের সংখ্যা হবে সাত। একজনকে নির্বাচন করা হবে লামাদের মধ্য থেকে; আর তিনজনকে "সমগ্র সিকিম থেকে"—তার মধ্যে একজন হবে তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত, একজন "সোঙ্গা" সম্প্রদায়ের, আর একজন হবে "সাধারণ" যে-কোনও একজন। নেপালীরা বলতে চাইলেন যে, 'সোঙ্গারা' নেপালী, রাজার বক্তব্য, "সোঙ্গারা" নেপালী নয়। গোষ্ঠী-ধর্মের বিভেদ আবার বেড়ে গেল। যা হোক, এই নির্বাচনে কাজী লেন্ডুপ দোর্জি নেপালীদের সংরক্ষিত আসনের পাঁচটি আসন লাভ করলেন আর বাকী দুটি আসন লাভ করলেন সিকিম রাজ্য কংগ্রেস। এ ছাড়া কাজী লেন্ডুপ দোর্জির পার্টি সিকিম জাতীয় কংগ্রেস ভোটিয়া-লেপচাদের জন্য সংরক্ষিত দুটি আসনও পেলেন—বাকী পাঁচটি আসন পেল সিকিম জাতীয় পার্টি। এই নির্বাচনে প্রমাণ হলো কাজী লেন্ডুপ দোর্জি সিকিমের গোষ্ঠী ও ধর্মের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ও তিনি সংস্কারমুক্ত উদার নীতির প্রতীক।

চতুর্থ নির্বাচন হলো ১৯৭০ সালে। এই নির্বাচনে দেখা গেল ব্যাঙের ছাতার মতো অনেক নতুন দল ও উপদল। দল-উপদলের ঝগড়া, নেতা-উপনেতার কলহ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আদর্শগত পার্থক্য এইসব পার্টিগুলির মধ্যে বিশেষ কিছুই নয়—শুধু নেপালী-প্রধান পার্টিগুলো বহু দিন ধরে ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তি চাইছিল, অন্য দিকে ভোটিয়া-লেপচা-প্রধান পার্টিগুলো তা চাইছিল না। গত তিনটি নির্বাচনের মতই এখানেও সেই একই সাম্প্রদায়িকতার তত্ত্ব অনুযায়ী আসন বণ্টন, সেই অনুমোদিত সভ্য দিয়ে রাজার কাউন্সিল হস্তগত করার চেষ্টা—সেই আগেকার নির্বাচনের মতই কাজী লেন্ডুপ পরিচালিত সিকিম জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মার্তাম টভ্‌পেন পরিচালিত সিকিম জাতীয় পার্টির মধ্যে মূল দ্বন্দ্ব। নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক, যতবারই নির্বাচন হোক, আসল ক্ষমতা সেই রাজার হাতে। কাউন্সিলের যে-কোনও উপদেশের বিরুদ্ধে দরকার মনে করলে রাজা "ভেটো" প্রয়োগ করতে পারতেন। সমস্ত বিষয়ে রাজার কথা আইন এবং রাজা পছন্দ না করলে কোনও উপদেশই কার্যকরী হবে না।

ভারত সরকার ভাল করেই জানতেন যে, সিকিমে নেপালীরা ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তি চায়। আর ভোটিয়া-লেপচারা তা চায় না। ভারত সরকার এই

একটি লেপচা পরিবার

দুই দল থেকে সমদূরত্ব বজায় রেখে স্থানীয় রাজনীতিতে কোনরকম মতামত প্রকাশ বিশেষ করেননি। ভারত সরকারের এই দ্বিধাগ্রস্ত নীতির কারণ সহজ ও স্বাভাবিক। স্বাধীনতার পর ভারত সরকার কিছুতেই মনঃস্থির করতে পারছিলেন না সিকিমের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ঠিক কি হবে। এর প্রধান কারণ সিকিমের ভৌগোলিক অবস্থান—যার উত্তরে তিব্বত ও চীন। সিকিমবাসী একদল বৌদ্ধ তিব্বতের সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক সমধর্মিতা স্বীকার করে এসেছেন এবং তিব্বতের প্রচলিত ধর্মের মধ্যেই নিজেদের স্বকীয়তা অনুভব করেন। তাই "Merger"-এর বদলে এই সীমান্তরাজ্যে ভারত অনেক ভেবেই "Special Status"-এর কথার উপর জোর দিয়েছিল। কিন্তু "Special Status" কথাটির মধ্যে অনেক ফাঁক আছে—ভারত সরকার যেভাবে ভাবছিলেন চোগিয়াল ঠিক একই সুরে কথা বলছিলেন না। অন্য আরেকটি সমস্যাও ভারতের কাছে ছিল। হিমালয়ের এই রাজ্যকে ভারতের অন্য সব করদরাজ্যের মতো যদি জোর করে অন্তর্ভুক্ত করা হতো তা হলে প্রতিবেশী নেপাল ও ভুটানের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারত। নেপাল ও ভুটান হয়তো মনে করতো যে, এটা ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতির প্রথম পদক্ষেপ এবং ক্রমশ ভুটান ও নেপালকেও ভারত গ্রাস করে নেবে এই সংকট থেকে মুক্তি পাবার জন্য নেপাল ও ভুটান হয়তো তখন চীনের দিকে বেশী ঝুঁকবে এবং চীনের সঙ্গে নেপাল ও ভুটানের বন্ধুত্ব ভারতের কাছে আশঙ্কার।

এ ছাড়া সিকিমে জনসংখ্যার গঠনও বড় গোলমেলে; এখানকার আদি বসবাসকারী লেপচা-ভোটিয়ারা সংখ্যালঘিষ্ঠ, অথচ নেপাল থেকে আগত হিন্দু নেপালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। যদি সিকিমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় তবে সেটা

হবে নেপালীপ্রধান গণতন্ত্র। পাশেই এক স্বাধীন নেপাল। নেপাল দেশের নেপালীরা বহু দিন থেকে "বৃহত্তর নেপালের" জন্য আন্দোলন করে আসছে। নেপাল দেশের নেপালীদের ধারণায় সিকিমের সঙ্গে নেপালের এক সম্পর্ক গড়ে উঠুক—তা ছাড়া ভুটানের দক্ষিণেও নেপালীদের বাস। এই তিন দেশের নেপালীদের নিয়ে বা তিন রাজ্য নিয়ে নেপাল এক "হিমালয় ফেডারেশনের" কথা বলে আসছে। এই হিমালয় ফেডারেশনে নেপালীরা হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কাজেই গণতন্ত্রী সিকিম ভারতের স্বার্থের ঠিক কতটা অনুকূলে যাবে তা সরকার ভেবে উঠতে পারেননি।

অন্য দিকে চীন কখনই সিকিমকে ভারতের অচ্ছেদ্য অংশ বলে স্বীকার করে নেয়নি। চীনের ধারণায় সিকিম তিব্বতের অংশ এবং যেহেতু তিব্বত চীনের অংশ অতএব সিকিমও চীনের অংশ—ব্রিটিশ সরকার কিছু দিনের জন্য সিকিমকে জয় করে রেখেছিল বলেই তা ভারতের অংশ হতে পারে না। ১৯৫৯ সালে চীনের জেনারেল লাসায় যে বক্তৃতা দেয় তার সারমর্ম হলো—"ভুটান, সিকিম ও লাডাক, তিব্বতের পরিবারের লোক। তারা চিরকালই তিব্বতের অংশ ছিল এবং তারা মহান চীনের এই মহৎ আদর্শ মেনে নিয়েছে। তাদের আবার নিজেদের পরিবারের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাদের মধ্যে ঐক্য ফিরিয়ে এনে কম্যুনিজম আদর্শে দীক্ষা দিতে হবে।" চীন বহু দিন ধরে বলে আসছিল তিব্বত চীনের "হাতের তালু"—তার পাঁচটা আঙ্গুল আছে—নেপাল, ভুটান, সিকিম, লাডাক আর আসামের অরুণাচল। যদি হাতের তালু চীনের কাছে থাকে তবে আঙুলগুলিকেও চীনকে ফেরত দিতে হবে। এ ছাড়া নেপালের মতো চীন সিকিম, ভুটান, নেপাল নিয়ে চীনের আনুকূল্যে এক কনফেডারেশনের কথা প্রায়ই বলে আসছিল। এই ত্রয়ী রাজ্য চীন ও ভারতের মধ্যে "বাফার" হিসেবে রইবে এবং তিনটি রাজ্যে চীন তার আধিপত্য সহজেই বহাল রাখবে।

বর্তমান চোগিয়াল ১৯৬৪ সালে রাজা হওয়ার পর থেকে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কটা দৃঢ় করবার পরিবর্তে যদি ঢিলে করার চেষ্টা না করতেন—তবে ঘটনাপ্রবাহ এত দ্রুতগতিতে বোধ হয় বইতো না। তিনি রাজা হয়েই সিকিম সম্বন্ধে এমন সব বক্তব্য রাখলেন যাতে অনেকের মনে এই ধারণা হলো যে রাজা ভারতের সঙ্গে চুক্তিগুলি যেন তেন প্রকারেণ ভাঙাতে চাইছেন, আর অন্য দিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ নেপালীদের ছলে বলে কৌশলে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে আগ্রহী। তিনি দেশে বিদেশে ভারত সম্পর্কে কল্পিত অনেক অভিযোগ আনলেন, নানান প্ররোচনামূলক উক্তি করলেন আর ভারত-বিদ্বেষীদের অযথা প্রশ্রয় দিলেন। অনেকেই এর জন্য তাঁর আমেরিকান রাণীকে দায়ী করেন। আমেরিকান রাণী দার্জিলিঙকে সিকিমের অংশ বলে জোরাল বক্তব্য রাখলেন। অনেকে সন্দেহ করেন যে রাজা ও রাণীর এই ভারত-বিদ্বেষী নীতির পেছনে পশ্চিমী দুনিয়ার ইন্ধন আছে। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা হয়তো সিকিমকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে স্বীকার করতে চাইছিলেন—যাতে ভারত ও চীনের মধ্যে দরিদ্র ও ছোট রাষ্ট্রকে আমেরিকা একটা তাঁবেদার রাজ্য তৈরী করে তাকে দরকার মতো ডাইনে বা বামে খেলাতে পারবে। চোগিয়াল তার নিজস্ব মিলিটারী বা মিলিশিয়া তৈরী করতে আগ্রহী হলেন—এতে নেপালী প্রজারা আতঙ্কিত হয়ে উঠল। তা ছাড়া রাজা দেশে যে "যোজনা" চালাচ্ছিলেন সেটি প্রকৃত উন্নতি আনছে কি না তাতে সন্দেহ দেখা গেল। যোজনায় দুর্নীতি এমন ভাবে বেড়ে গিয়েছিল মূল্যাস্তর এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে সাধারণ লোকদের প্রায় নাভিশ্বাস উপস্থিত। অনেকের মতে ব্রিটিশরা রাজ্য শাসন করতো "Divide and Rule"-এর সফল প্রয়োগে আর চোগিয়াল যে রাজ্য চালাচ্ছিলেন তার মূলমন্ত্র ছিল—"Corrupt and Rule", উপরন্তু ১৯৭০ সালে যে নির্বাচন হয়, তার ফলকে তিনি "রিগিং" করে উলটপালট করে দেবার চেষ্টা করলেন—যাতে কাজী লেণ্ডুপ দর্জি ক্ষমতায় না আসতে পারেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যে বিদ্রোহ আরম্ভ হয় তারই ফলে রাজা ক্ষমতা হারালেন আর বিদ্রোহীরা কাজী লেণ্ডুপ দর্জির নেতৃত্বে "গণতন্ত্র" প্রতিষ্ঠা করলেন। এখানে একটা কথায় জোর দেওয়া দরকার—রাজার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে ধর্ম ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে নেপালী, ভোটিয়া ও লেপচা-দের সম্মতি ছিল। দেশে দুর্নীতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমন ভাবে প্রবেশ করেছিল যে মুষ্টিমেয় কিছু খয়ের খাঁ কিছু আমীর অমাত্য ছাড়া সবাই যেন এর থেকে মুক্তি চাইছিল। কাজী লেণ্ডুপ দর্জি লেপচা সম্প্রদায়ভুক্ত তবুও দলমত ভোটিয়া-লেপচা-নেপালী নির্বিশেষে গণতন্ত্র আদর্শের প্রতীক। অসাম্প্রদায়িক লেপচা কাজীর নেতৃত্বে এই জন-উত্থান ভারত সরকার মেনে নিতে আপত্তি করলেন না। সিকিমের ইতিহাসে গণতন্ত্রের সূচনা হলো, সিকিম ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলো, আর কাজী ভারতের নতুন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হলেন। নতুন মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম কাজ সিকিম রাজ্যের উন্নতি।

॥ ৩ ॥

কাজী লেণ্ডুপ দর্জি উন্নতির পথে পা বাড়ালেন, তবে সে পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। যে আবর্জনার স্তূপ রাজারা রেখে গিয়েছেন তাকে পরিস্কার করা সহজসাধ্য নয়। দেশে ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার প্রায় নেই বললেই চলে—থাকলেও তা নগণ্য। সুতরাং উন্নয়নমূলক কোনও প্রকল্প যদি নেওয়া হয়, তা হলে ভারতের অন্য রাজ্য থেকে দক্ষ শ্রমিক আনতে হবে; অথচ বড় বড় চাকরি যদি ভারতের অন্য প্রান্তের অধিবাসীরা নেয়, তবে সিকিমবাসীরা মনে করতে পারে, সিকিম ভারতের অংশ নয়, দিল্লী থেকে পরিচালিত এক কলোনী মাত্র। সিকিমবাসীদের বর্তমান মূল্যায়নে এই আশঙ্কাকে অমূলক বলা যায় না।

বড় ব্যবসা সিকিমবাসীদের হাতে নেই বললেই চলে—ভারতের পশ্চিম প্রান্তের অধিবাসীরা সেখানে একচেটিয়া অধিপতি। দু-চারটি শিল্প যা আছে তা প্রায় এদেরই হাতে। সমস্ত খুচরো ও পাইকারী ব্যবসার কলকাঠি নাড়ে দুই-একটি পশ্চিম ভারতীয় ব্যবসাদার। স্থানীয় লোকদের ধারণা ভারতভুক্তিতে লাভ হয়েছে এই পশ্চিম ভারতীয় ব্যবসাদারদের—এই নয়া-বড়লোকরাই নয়া-জমানার নয়া-বাদশা। এই ব্যবসাদার-বাদশারা আবার পেছনের দরজা দিয়ে রাজনীতির সুতো নাড়তে আরম্ভ করেছে।

ভারত থেকে আগত এই মুষ্টিমেয় ব্যবসাদাররা সিকিমের উন্নতি সম্বন্ধে কোনও আগ্রহ দেখায়নি, বরং মুনাফার টাকা এই রাজ্য থেকে ভারতের অন্যান্য অংশে কিভাবে পাঠানো যায় তার কৌশল ঠিক করতেই সময় ব্যয় করেন। অন্যদিকে উন্নতির নামে যে টাকা খরচ হচ্ছে তা কতটা গরীব ও দরিদ্র সিকিমবাসীদের কাছে পৌঁছাচ্ছে তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে এবং গবেষণা করা যেতে পারে; তবে কন্ট্রাক্টাররা যে প্রচুর মুনাফা করছে সে কথা বলাই বাহুল্য। কন্ট্রাক্টারদের মধ্যে সিকিমবাসীদের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে—সমতলবাসী ও উত্তর ভারতীয়রা সেখানেও সবলে আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে; তারাই স্বমহিমায় কাঁচা টাকার গরবে মহিমান্বিত। টাকা খরচের হাওয়ায় দেশের কতটা উন্নতি হয়েছে তা বলা মুশকিল কিন্তু কিছু ঠিকেদার এবং তাদের অনুগত একদল ব্যুরোক্রেসী সদর্পে ও সদম্ভে অর্থের যে ব্যবহারটা করেন, তা কতটা সৎপথে অর্জিত সেই বিষয়ে সন্দেহের কারণ আছে। টাকা ঢাললেই দেশের যে উন্নতি হয় না এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ সিকিম।

সিকিমের শতকরা আশি-নব্বই ভাগ লোক কৃষির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। সুতরাং কৃষির উন্নয়নই সিকিমের উন্নতির মূল শর্ত। বিগত কয়েকশত বছর ধরে জমির মালিকানা রাজা, কয়েকটি সামন্ত, কিছু বৌদ্ধ-সংঘের হাতে ছিল। রাজা নিজেই সিকিমের প্রায় পনের শতাংশ জমির প্রত্যক্ষ মালিক। আটটি সামন্ত পরিবারের হাতে রয়েছে প্রায় ত্রিশ শতাংশ আর বুদ্ধবিহার বা সংঘের হাতে আছে প্রায় দশ শতাংশ। বাকী

তিব্বতীতত্ত্ব গবেষণাগার
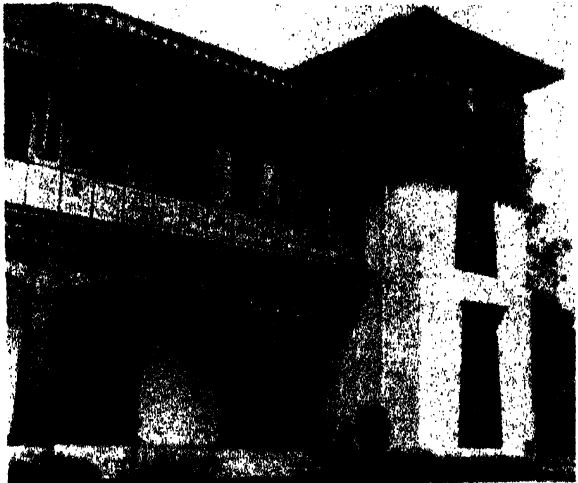
পঁয়তাল্লিশ ভাগ জমি প্রায় লাখ খানেক লোকের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। এই জমি আবার উর্বরা নয়। এই চাষীরা অধিকাংশই প্রান্তিক, অল্পস্বল্প জমি সামান্য চাষ করে কোনও মতে বেঁচে আছে। এই প্রান্তিক চাষীদের মধ্যেই জমি নিয়ে কাড়াকাড়ি, ভোটিয়া-লেপচা-নেপালীদের তথাকথিত জমির অধিকার নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন।

সিকিমে রাজস্ব আদায় ক্ষেত্রে ঠিকেদারী বা ম্যানেজারী প্রথা বহু দিন ধরে চলে আসছে। এই নিয়মে সমস্ত জমিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে ঠিকেদার বা ম্যানেজাররা চাষীদের কাছে রাজস্ব আদায় করতো। রাজা বা ভূস্বামীকে তারা ন্যূনতম নির্দিষ্ট কর দিত ঠিকই, কিন্তু নিজেরা গরীব চাষীদের কাছে যতটা সম্ভব জোর করে আদায় করে নিত। যে ম্যানেজার বা ঠিকাদার যত বেশী কর রাজা বা জমিদারকে দেবে তার কদর তত বেশী। কৃষকরা তাদের অবস্থার উন্নতি করে লাভবান হয় না উন্নতি মানে বেশী কর আদায়ের সুযোগ, তারই চেষ্টায় ঠিকেদাররা তাদের উপর অত্যাচার করবে।

আবার বৌদ্ধ সংঘের জমির উপর রাজার কিছুটা দখল ছিল; অনেক সময়েই তার ম্যানেজাররা এ সব জমি থেকে সরাসরি কর আদায় করত। এই আদায় যে কত তা সংঘের লোকরা অনেক সময়েই জানত না। তাদের সংঘ চালাতে হবে, অতএব একই কৃষকের কাছে তারা বারবার রাজস্ব আদায় করত অথবা "চাঁদা" তুলে নিজেদের সংঘ চালাবার বন্দোবস্ত করত।

ভাগচাষীদের জমির উপর কোনও অধিকারই ছিল না—জমিদাররা দরকার-মত তাদের যখন-তখন উৎখাত করতে পারে। কৃষির কোনও উন্নতি চোগিয়ালের সিকিমে হওয়া সম্ভব ছিল না। উপরন্তু জমিদার বা রাজা বা

জমিদাররা কৃষকদের কাছে শুধু যে কর বা রাজস্ব আদায় করতেন তাই নয়, বেগার খাটা সিকিমের রাজস্ব নীতির একটা অংশ। যখন সরকার মনে করা হবে তখনই এসে বিনা পারিশ্রমিকে সরকার বা জমিদারদের জন্য খেটে দিতে হবে। খেটে না দিলে হয়তো পরের বছর জমিতে চাষ করা বন্ধ। সিকিমের প্রথার বশেও কৃষকদের উপর অত্যাচার করা যায় বলে ধারণা তার থেকেও হয়তো বেশী অত্যাচার বহু শতাব্দী ধরে সিকিমের দরিদ্র প্রজাদের উপর করা হয়েছে।

ভূমিরাজস্ব প্রথার পরিবর্তনের চেষ্টা যে চোগিয়াল করেননি তা নয়; কিন্তু এই পরিবর্তনে তাঁর বিশেষ ইচ্ছা ছিল না বলে চেষ্টা ছিল পঙ্গু। মুখ্যমন্ত্রী হবার অনেক আগের থেকেই কাজী লেন্ডুপ দর্জি রাজস্ব প্রথার পরিবর্তন চাচ্ছিলেন—কিন্তু রাজস্ব পদ্ধতির পরিবর্তন এক আমূল পরিবর্তন এবং এটি দ্রুত করা সম্ভব হবে কিনা তা পরবর্তী ইতিহাস থেকে জানা যাবে। সমস্যাটা প্রবল ও সমাধানের চেষ্টা সবাই করে যাচ্ছে। হয়তো এবার ইচ্ছা আছে।

সিকিম সরকার অবশ্য বহু দিন ধরে দাবি করে আসছেন যে সিকিমে "মাথাপিছু আয়" ভারতের সমতল ভূমির অধিবাসীদের তুলনায় বেশী, দেশে ভিখারী নেই, বেকার নেই। এই বক্তব্য এক চিমটে নুন মেখে নিতে হবে। সিকিমের অর্থ বৈষম্য যে কি ভয়ংকর, ভয়াবহ তা জানলে ভারতের আমলাতন্ত্রও চমকিয়ে উঠবেন। মাথাপিছু আয় কথাটা হাস্যজনক—বেকার নেই কথাটি মূল্যহীন—কারণ বেগার খাটা যেখানে রীতির পর্যায়ে সেখানে বেকার কথাটির মানে এই অনুন্নত দেশে অন্তত আলাদা।

সিকিমের উন্নতির খাতে বরাদ্দ অর্থ অধিকাংশ আসে ভারত সরকারের কাছ থেকে। উন্নতির নাম করে ভারতের সমতলবাসী করদাতারা যে সাহায্য

সিকিমের বন্দী জনতা

সিকিমকে দেয় সেটা মাথাপিছু আয় হিসেবে এক ভাল অংক। এই দরিদ্র দেশে ব্যুরোক্রেসীর সংগঠনের এমনই বিশেষত্ব যে, যাদের দরকার তারা পায় না, যাদের দরকার নেই সেই ভারত থেকে আগত বড়লোকেরা আরও বড়লোক হয়েছে। এ কথাও মনে রাখা দরকার, ভারতের সরকারী সাহায্য যদি কোনও কারণে (ভগবান না করুন) বন্ধ হয়ে যায় তবে সিকিমের তথাকথিত উন্নতি ও কৃত্রিম শিল্পায়ন তখনই স্তব্ধ হয়ে যাবে।

সিকিমে যোজনা বা প্ল্যানিং আরম্ভ হয়েছিল ১৯৫৪ সালে। কিন্তু যোজনা বলতে যা বোঝায় ঠিক এই ধরনের চেষ্টা এখানে আরম্ভ হয়নি। বস্তুত কতগুলি প্রকল্প বা প্রোজেক্ট ইচ্ছামত ঠিক করা হয় তার জন্য ভারত সরকারের অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। ভালভাবে কোনও টারগেট এখানে করার চেষ্টা হয়নি। কারণ সিকিমে কোনও ডাটা বা তথ্য যোগাড় করা সম্ভব ছিল না। এই তথ্য না থাকার ফলে অন্ধের মত কতকগুলি প্রকল্প করার চেষ্টায় প্রাথমিক ভারসাম্য হারিয়ে যায়, দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, আর সাধারণ লোকেরা হয় আরও দুর্দশাগ্রস্ত। প্রকল্প আরম্ভ করলেও সেটি সাফল্য লাভ করলো কি না, করদাতাদের অর্থ কোথায় গেল, তাতে সমস্ত দেশের কোনও উপকার হলো কি না, সিকিম সরকার ও ভারত সরকার এই মূল্যায়ন থেকে বিরত থেকেছে। ফলে প্রকল্পের সাফল্য ও অসাফল্য নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে কত সংখ্যায় কত বেশী কতগুলি প্রকল্প করা যায় সে সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করাটাই যোজনার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক অনুন্নত দেশের মতই এখানে যোজনা মানে "কত খরচ হলো"—যেন যত বেশী খরচ তত বেশী উন্নতি। বিনিয়োগ বাড়লেই যে সমৃদ্ধি আসে না, এর পরিষ্কার উদাহরণ সিকিম। বিনিয়োগ বাড়ার সঙ্গে এসেছে মুদ্রাস্ফীতি আর মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে এসেছে দুর্নীতি আর বৈষম্য। যোজনা করে কিছু ধনী আরও ধনী হলেও অর্থনৈতিক বৈষম্য বস্তুত বাড়বে বই কমবে না।

মার্চ ১৯৭৫ সালে যে মাসে বিপ্লবের পরে সিকিম ভারতের অঙ্গরাজ্য হয়েছে। যে দেশ যুগ যুগ ধরে সামন্তরা ও ধর্মের পান্ডারা শোষণ করে এসেছে তার থেকে মুক্তি এত সহজে আসে না। সামন্তদের ক্ষমতা কিছুটা

উচ্চাভিলাষী, এরা যোজনার ক্ষমতা, সম্পদ পেয়েছে, আর পেয়েছে আকাশ-চুম্বী আকাঙ্ক্ষা। এই শহরবাসীদের উৎসাহে যে পরিকল্পনা তৈরী হচ্ছে তার মূল প্রয়াস হলো একটি বা দুটি শহরে উন্নতি ও মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যবিত্তদের উন্নতি। এই সীমাবদ্ধ উন্নতির ফলে দূরের গ্রামে উন্নতির আলো এখনও যায়নি।

ভারতভুক্তির সময় আশা করা গিয়েছিল যে, সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতিকে সিকিম থেকে চিরতরে বিসর্জন দেওয়া হলো। কিন্তু তা যে হলো না, স্বাধীন সিকিমে পরবর্তী ঘটনাবলীই তার প্রমাণ। নেপালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা শতকরা সত্তর ভাগ তবুও বর্তমানে অ্যাসেম্বলীতে তাদের ষোলটি আসন, আর শতকরা ত্রিশ ভাগ জনসংখ্যা লেপচা-ভোটিয়াদের জন্য আবার সেই ষোলটি আসন। নেপালীদের এই বিক্ষোভ আজ নানান আকারে প্রকাশ পাচ্ছে রাজনীতিতে, "আয়ারাম গয়ারাম" আবহাওয়াকে উত্তপ্ত রাখছে, আর এই দেশে ঐক্যের একদা একমাত্র সূত্র লেপচা কাজী লেন্ডুপ দর্জির হাত থেকে ক্ষমতা ও উদার নীতির বাঁধন ক্রমশ আলগা হয়ে যাচ্ছে। ফলে ক্লান্তিকর সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে এসেছে পরস্পরের প্রতি দোষারোপ, আর ক্লান্তিহীন রাজনৈতিক আস্থা-অনাস্থার অনিয়ম টাগ-অফ-ওয়ার। একদা জনগণমন-অধিনায়ক কাজী আজ সিকিমে বহুলবিতর্কিত ব্যক্তি মাত্র।

নেপালীদের বিশ্বাস ভারত সরকার এই যে "Parity" ফর্মুলায় অঙ্গরাজ্য সিকিমকে শাসন করছে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য নেপালীদের ক্ষমতা থেকে দূরে রাখা—কারণ ভারত সরকার নেপালীদের পূর্ণ বিশ্বাস করেন না। নেপালীরা অবশ্যই লেপচা-ভোটিয়াদের জন্য, তাদের স্বার্থের জন্য রক্ষাকবচ দিতে রাজী কিন্তু তার মানে এই নয় সত্তর শতাংশ লোকও যা নির্বাচিত প্রতিনিধি পাঠাবে, ত্রিশ শতাংশ লোকও সেই একই সংখ্যায় সেই প্রতিনিধি পাঠাবে।

নেপালীদের ক্ষোভের আরও কারণ আছে—ভারত সরকার কিছুতেই নেপালী ভাষাকে রাজ্যভাষা বলে স্বীকার করতে রাজী নয়। ভারত সরকারের ভয় নেপালী রাজ্যভাষা হলে পাশের স্বাধীন নেপালে "বৃহত্তর নেপাল" আন্দোলন ঝটিকার মত এসে উত্তর ভারতের এই হিমালয় রাজ্যগুলিতে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করবে। নেপালীরা এই যুক্তিকে হাস্যকর বলে উড়িয়ে দেন এবং বলেন পশ্চিমবঙ্গের ভাষা বাংলা, পাশে স্বাধীন পূর্ববঙ্গ বা "বাংলাদেশে" ভাষা বাংলা, কিন্তু এর মানে এই নয় যে, পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গকে গ্রাস করবে। তাদের ধারণায় ভারত সরকার নেপালীদের বিশ্বাস করতে চান না—তাদের ভোটাধিকার নিয়ে আসামে হাস্যকর ও কদর্য যুক্তি চালান; তাদের অধিকার খর্ব করে "Parity Formula" রাখার জন্য সিকিমে কুৎসিতভাবে তৎপর। তাদের ধারণায় সিকিমের বিপ্লবকে ভারত সরকার বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন—নেপালী ভাষাকে স্বীকৃতি না দিয়ে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করে। যদি এই দুটো অধিকার স্বীকার করে না নেওয়া হয় তবে ভারত সরকার বিরোধীরা সিকিমে বেড়ে যাবে—ফলে এই সীমান্ত রাজ্যে অশান্তির আগুন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়বে।

নেপালীদের পূর্ণ অধিকার না দেওয়ার জন্য ও এইখানে গণতন্ত্রে ভারতের আস্থা কম বলেই হয়তো সিকিমের গভর্নরের হাতে "অনেক বিশেষ ক্ষমতা" দেওয়া আছে, যা অন্যত্র বা ভারতের অন্য অঙ্গরাজ্যে নেই। "ব্যক্তিগত বিবেচনায়" গভর্নর সিকিমে অনেক কিছু করার ক্ষমতা রাখেন এবং করেন। কাজেই নির্বাচিত মন্ত্রিসভার ক্ষমতা কোথায় শেষ আর মনোনীত গভর্নরের ক্ষমতা কোথায় আরম্ভ তার সীমারেখা স্পষ্ট নয়। গভর্নর বা লাটসাহেব ঠিক করেন কোথায় উন্নতি হবে, কত খরচ হবে অথবা কোন আমলার হাতে তার কতটা ভার থাকবে। উন্নয়নের নামে ভারত সরকার যেহেতু অনুদান দেন সে জন্যই ভারত সরকারের মনোনীত গভর্নর বা লাটসাহেব ব্যক্তিগত বিবেচনায় অনেক কিছু করছেন বা করতে পারেন। অনেক সিকিমবাসীর কাছে প্রশ্ন—সিকিমে "রাজতন্ত্রের" বদলে ভারত সরকার কি 'লাটতন্ত্র' চালু করলেন?

এই "লাটতন্ত্রের" পরিপূরক আরও একটি প্রথা এখানে চালু হতে চলেছে—সেটি হলো "বড়া-সাহেব তন্ত্র"। সিকিমবাসীদের "সেবা" করবার জন্য ভারতবর্ষ থেকে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্য থেকে সিভিল সার্ভিসের উচ্চ পদে (হয়তো উচ্চ মান) উচ্চ অফিসাররা নিযুক্ত হলেন। রাজতন্ত্রী ব্যুরোক্রেসী আজ পেছনে হটেছে—আরম্ভ হয়েছে দেশে নতুন "বড়া-সাহেবদের" যুগ। এই নয়া সাহেবদের আসরে পুরানো ব্যুরোক্রেসী আজ কিছুটা বিক্ষুব্ধ, সচকিত এবং হয়তো ক্ষুব্ধ। এই নতুন বড়া-সাহেবদের আমলেও যতটা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, কাজ ততটা এগোয় না—ঘড়ির ফ্যাক্টরী হবে বলেও হচ্ছে না, কাগজ তৈরির কারখানা হচ্ছে হচ্ছে হয়েও হলো না। হবে হবে "মুক্তোর কলেজ" ভাঁওতা দিয়ে অধিবাসীদের আর কদ্দিন ভুলিয়ে রাখা যাবে?

একজন শিক্ষিত সিকিমবাসীর মতে দ্বিধাবিভক্ত সিকিমে আজ এক "ঐক্য" দেখা যাচ্ছে—এবং ভোটিয়া-লেপচা-নেপালীদের 'ঐক্যের' কারণ ভারত সরকারের দ্বিধাগ্রস্ত নীতি আর গর্বিত অহংকারী ভারতের সমতলবাসীদের ব্যবহার। "ঐক্য" মানে সবাই ভারতের নীতির একযোগে সমালোচক। তাই সিকিমের "ঐক্য" ভারত সরকারই সম্ভব করেছেন।

সিকিমের ভবিষ্যৎ কি? ভবিষ্যৎ নির্ভর করে বর্তমানের উপর আর সেই

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাপর্বে রবীন্দ্র-বিরোধিতা

শান্তিদেব ঘোষ

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন লেখায় এবং চিঠিপত্রে জানিয়ে গেছেন যে, দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কথা চিন্তা করে, যে কটি গঠনমূলক কাজের প্রস্তাব দেশনেতাদের কাছে তিনি পেশ করেছিলেন, তার পূর্ণ সমর্থন তাঁদের কাছ থেকে তিনি পাননি। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকালেও তিনি যখন ভারতের যুগোপযোগী নতুন এক শিক্ষাধারার প্রবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন—সঙ্গীত চিত্রকলা সহ ভারতীয় নানা বিদ্যার অনুশীলন ভারতের দরিদ্র গ্রামবাসীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রয়োজনীয় কর্মপ্রচেষ্টা এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয় জ্ঞানের যোগরক্ষাকারী উপযোগী কেন্দ্র হিসেবে তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে চান, তখন দেশের শিক্ষিতদের একদল গুরুদেবের এই নতুন শিক্ষাচিন্তাকে স্বীকৃতি দিতে ত চাইলেনই না, উপরন্তু বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে একটি আন্দোলনেরও সৃষ্টি করেছিলেন। দেশবাসীর এইরূপ প্রতিকূল মনোভাবের পরিচয়ে গুরুদেব মনে দুঃখ পেলেও বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার কাজ বন্ধ রাখেন নি। গুরুদেব আশা করেছিলেন, সে যুগের শিক্ষিত দেশবাসী তাঁর এই শিক্ষা-চিন্তাকে সমর্থন করবেন এবং তার রূপায়ণে তাঁকে নানাভাবে সাহায্যও করবেন। কিন্তু তার কোনটিই তিনি তাঁদের কাছ থেকে পাননি। গুরুদেবকে প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। বিশ্বভারতীর প্রতি এইরূপ অসহযোগিতার ইতিহাস এ যুগের অধিকাংশ ব্যক্তির কাছে অজানা থাকার দরুন, তাঁরা যখন গুরুদেবের লেখা চিঠিপত্রে, গুরুদেবের প্রতি দেশবাসীর অবহেলার কথা পড়েন, তখন তার প্রকৃত কারণ তাঁরা বুঝে উঠতে পারেন না। এ যুগের রবীন্দ্রানুরাগী জনসাধারণের ধারণা গুরুদেবের মত মনীষীর প্রতি দেশবাসীর প্রবল অনুরাগের কখনো অভাব ঘটেনি। একথা যে সর্বাংশে যথার্থ নয়, তাঁকেও যে মাঝে মাঝে প্রবল প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সে কথাও সকলের জানা দরকার। তাই, বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে কি কারণে এবং কিভাবে শিক্ষিত দেশবাসীর এক দল আন্দোলন তুলেছিলেন এবং গুরুদেবের মন সেই কারণে কতখানি ব্যথিত হয়েছিল, তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছি এই প্রবন্ধটিতে। এছাড়া, বিশ্বভারতী সংক্রান্ত গুরুদেবের যে সব উক্তি এতে ব্যবহৃত হয়েছে, তার দ্বারা বিশ্বভারতীকে তিনি কোন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, সে কথাও পরিষ্কারভাবে জানা যাবে বলে আশা করি।

"দেশ" পত্রিকার, ১৩৮২ সালের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের লেখা ১৬ নম্বর চিঠিটি পড়ে মনে হবে, তিনি যেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন সম্পর্কে সাধারণভাবে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছেন। মূলে কিন্তু তা নয়। এর পিছনের প্রকৃত ইতিহাস ভিন্ন কথাই বলে। ১৩২৭-২৮ সালের ভারতের অসহযোগ আন্দোলনের সময় একদল শিক্ষিত দেশবাসী, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে যে আপত্তি তুলেছিলেন, গুরুদেবের এই চিঠিটি তারই প্রতিবাদ সূচক ব্যাখ্যা। চিঠিটি, গুরুদেব লিখেছিলেন ১৩২৮ সালের ১৩ই মাঘ তারিখে বিশ্বভারতী, আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ রূপে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রায় একমাস পরে। গুরুদেব লিখছেন :—

"আমার মনে বিশ্বভারতীর যে ধ্যানটি আছে সেটি আমার ধর্মসাধনার অঙ্গ। ... বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমার ধর্মসাধনাকে স্বীকার করে তাকেই স্বীকার করতে চাই। মানুষের ইতিহাসে বিধাতারূপে তিনি যুগে যুগে মানুষকে পরস্পরের কাছে ডাকছেন—সকল বাধার ভিতর দিয়ে এই আহ্বানকে সত্য করার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের উপরেই আছে। এই দায়িত্ব আমি গ্রহণ করতে চাই। তা করতে গেলে আমার অহং-এর মধ্যে তার যত বাধা আছে দূর করতে হবে—দূর করবার একমাত্র উপায় কর্মের মধ্যে। বিশ্বভারতী সেই কর্ম—এই কর্মে আমার অনেক বদ্ধমূল সংস্কার ক্ষয় হবে—অন্তরে বাহিরে অনেক আঘাত লাভ করব—সেই আঘাতে আমার কল্যাণ। আমার চিত্তে বর্তমান যুগ একটি মিলনের আহ্বান এনেছে। এই আহ্বানকে আমি আমার দীক্ষারূপে যদি গ্রহণ না করি তাহলে আমি সত্য থেকে ভ্রষ্ট হব, অর্থাৎ উপনিষদ যাকে বলেন "মহতী বিনষ্টি" তাই আমার ঘটবে। তুমি বলেচ, আমার দেশের লোক জিজ্ঞাসা করচে আজকের দিনে দেশের বর্তমান চিত্তবিক্ষোভের মধ্যে এই বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠায় কি এমন প্রয়োজন? তার উত্তর এই যে, বিশ্বভারতী আমার পক্ষে এবং আমার দেশের পক্ষে প্রয়োজনের সামগ্রী নয়—তার মধ্যে যে সত্য কল্যাণ আছে তা প্রয়োজনের অতীত—এইজন্যে তার পক্ষে কোনো সময়ই অসময় নয়—বরঞ্চ যে সময়ে বাহিরে তার প্রতিকূলতা অর্থাৎ বাহিরের দিকে যেটা অসময়, সেইই তার প্রকৃত সময়।"

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকালে অসহযোগ আন্দোলনের স্বরূপ এবং দেশবাসী কেন বিশ্বভারতীর প্রতি বিমুখ ছিলেন তার সঠিক বিবরণ না জানা পর্যন্ত, গুরুদেবের এই চিঠিটির প্রকৃত মর্ম বোঝা যাবে না।

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, কলিকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল সবরকম সরকারী উপাধি বর্জন, সরকারী অনুষ্ঠান বর্জন, সরকারী এবং সরকার অনুমোদিত স্কুল কলেজ বর্জন, সরকারী আদালত বর্জন আইনসভা বর্জন, বিদেশী দ্রব্য বয়কটের কথা। পরবর্তী ডিসেম্বর মাসে, নাগপুর কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে, এই প্রস্তাবটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। নাগপুরের কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজী দেশবাসীর কাছে বিশেষভাবে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা এক বছরের মধ্যে, অর্থাৎ ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের মধ্যে ভারত স্বরাজ লাভে সমর্থ হবে। এইরূপ ঘোষণার ফলে দেশব্যাপী এক অভাবনীয় উদ্দীপনা বা উৎসাহের সঞ্চার হয়। ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে, তখনকার বাংলা প্রদেশের প্রায় তিন হাজার ছাত্রছাত্রী স্কুল কলেজ বর্জন করেন। ভারতের প্রখ্যাত আইন ব্যবসায়ীদের একদল তাঁদের ব্যবসা বর্জন করেন, তাঁদের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছিলেন অন্যতম। সরকারী চাকরি অনেকে বর্জন করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র সিভিল সার্ভিসের চাকরি ত্যাগ করে ন্যাশনাল কলেজে অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। এ যুগেই বাংলায় বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের আবির্ভাব। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তির উন্মাদনা জাগানো তাঁর গান ও কবিতার প্রথম সূত্রপাত হল এই আন্দোলনেরই প্রভাবে।

এইরূপ রাজনৈতিক বিক্ষোভের মধ্যে গুরুদেব ইয়োরোপ এবং আমেরিকা ভ্রমণ শেষ করে, ১৯২১ সালের জুলাই মাসে দেশে ফিরে গান্ধীজীকে দেশের জনগণের অবিসংবাদিত নেতারূপে প্রত্যক্ষ করে অত্যন্ত খুশি হলেন। কিন্তু গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের যে কার্যসূচী কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল তার অনেক গুলিকেই গুরুদেব সমর্থন করলেন না।

ইংরেজ প্রবর্তিত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির প্রভাবে আমাদের মনে একপ্রকার হীনমন্যতা যেভাবে স্থান গ্রহণ করেছিল, তার প্রতি ভারতীয় মনীষীদের দৃষ্টি পড়লেও কার্যকরীভাবে তার নাগপাশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারিনি। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে দেশনেতারা প্রথম এই শিক্ষা পদ্ধতির প্রভাব থেকে মুক্তির জন্য উৎসাহিত হয়ে নিজেদের চেষ্টায় কয়েকটি স্কুল ও কলেজ স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাপকভাবে তা কার্যকর হয়নি। শিক্ষাবিষয়ক এই অসম্পূর্ণতার কারণেই ১৯২১-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলনের যুগে পুনরায় সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বয়কট করার প্রস্তাব গৃহীত হলেও পরিবর্তে দেশব্যাপী বিকল্প পরিকল্পনা না থাকায় এ বয়কটও বিফল হয়। দেশব্যাপী এইরূপ বয়কট আন্দোলনের উদ্দীপনার মধ্যে গুরুদেব বিশ্বভারতীকে স্থায়ী-

এচিং : মুকুল দে

ভাবে প্রতিষ্ঠার ইচ্ছায় "শিক্ষার মিলন" নামক এক প্রবন্ধের দ্বারা বিশ্বভারতীর শিক্ষাদর্শের চিন্তা দেশবাসীর কাছে পেশ করলেন। ১৯২১ সালের অগস্ট মাসে, শান্তিনিকেতনে এবং কলকাতায়, শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে এই প্রবন্ধটি পরপর কয়েকবারই পড়ে শোনান। "প্রবাসী" এবং "সবুজপত্রে" সেটি মুদ্রিত হয়। গুরুদেবের এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য ছিল :—

"পশ্চিমের লোকে যে-বিদ্যার জোরে বিশ্বজয় করেছে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে। কেননা বিদ্যা যে সত্য।"

"যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাইরে বড়ো করে তোলায় পশ্চিম সমাজে মানব-সম্বন্ধে বিশ্লিষ্টতা ঘটেছে।"

"এই যান্ত্রিকতায় যাদের মন পেকে যায় তারা যতই ফল লাভ করে, ফল লাভের দিকে তাদের লোভের ততই অন্ত থাকে না। লোভ যতই বাড়তে থাকে, মানুষকে মানুষ খাটো করতে ততই আর দ্বিধা করে না।"

"ভারত আচারের বাহ্য বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে নির্জীব করেছে আর য়ুরোপ ব্যবহারের বাহ্য বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে সে বিশ্লিষ্ট করেছে।"

"পশ্চিম মহাদেশ বাহ্যবিশ্বে মুক্তির সাধনা করছে সেই সাধনা ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম রোগ দৈন্যের মূল খুঁজে বের করে সেইখানে লাগাচ্ছে ঘা, এই হচ্ছে মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা। আর পূর্ব মহাদেশ অন্তরাত্মার যে সাধনা করেছে সেই হচ্ছে অমৃতের অধিকার লাভ করবার উপায়। অতএব পূর্ব পশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে উভয়েই ব্যর্থ হবে : ...।"

"একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। ...... পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্র্য গ্রহণ করে, তারাই সর্বজাতির ঐক্য লোপ করে।"

"শিক্ষাদানের ব্যাপারে জলে স্থলে আকাশে আজ এত পথ খুলেছে, এত রথ ছুটেছে যে ভূগোলের বেড়া আজ তার বেড়া নেই। এমন সময় বাঙালীর হু-হু করে এগোল, এক কয়মার অন্তর-শীত পিছিয়ে পড়ে রইল।"

"আজ জাতিতে জাতিতে একত্র হচ্ছে অথচ মিলছে না।"

"বর্তমান যুগের সাধনার সঙ্গেই বর্তমান যুগের শিক্ষার সঙ্গতি হওয়া চাই। স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা।"

"আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্ব পশ্চিমের মিলন-নিকেতন করে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়-লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটেনি, সহজে মিটতেও চায় না। সত্য লাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই।"

"প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের তোরণশালা দিয়ে চলবে না, তার অতিথিশালা চাই, সেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থনা করে সে ধন্য হবে। শিক্ষাক্ষেত্রেই তার প্রধান অতিথিশালা।"

"আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্ব-ভূভাগের হয়ে সত্য সাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক।"

কিন্তু, তখনকার রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রভাবে, গুরুদেবের এই চিন্তাকে শিক্ষিত দেশবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন না। একদল তার তীব্র প্রতিবাদে যে কতখানি মুখর হয়ে উঠেছিলেন, সে যুগের পত্র-পত্রিকা ঘাঁটলে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রথম প্রতিবাদ উত্থাপিত হয় খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তিনি "শিক্ষার বিরোধ" নামক একটি প্রবন্ধ রচনা করে গুরুদেবের "শিক্ষার মিলন" প্রবন্ধটির বিরোধিতা করেন। শরৎচন্দ্রও, তাঁর প্রবন্ধটি প্রথমে কলিকাতার "গৌড়ীয় সর্ববিদ্যা আয়তনে"-র জনসমাবেশে পড়েছিলেন। পরে "নারায়ণ" নামক মাসিক পত্রিকার ১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায়, দু-দফায় সেটি মুদ্রিত হয়। শরৎচন্দ্র প্রতিবাদে যা বলতে চেয়েছিলেন, সংক্ষেপে তা হল :—

"কিছুদিন ধরে সমস্ত শিক্ষাবিধানটাই বনিয়াদ সমেত এমনি টলমল করতে লাগল যে, একদল বললেন পড়ে যাবে। অন্যদল সভায় মাথা নেড়ে বললেন না, ভয় নেই—পড়বে না। পড়লও না।"

"এমনি যখন অবস্থা তখন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলেত থেকে ফিরে এলেন, এবং পূর্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার মিলন সম্বন্ধে উপর্যুপরি কয়েকটা বক্তৃতায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করলেন।"

"পূর্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার মিলনে আসল কথা কবি কি বলেছেন? প্রথম কথা বলেছেন এই যে, আজকের দিনে পশ্চিম জয়ী হয়েছে সুতরাং সেই জয়ের কৌশলটা তাদের কাছে আমাদের শেখা চাই। বেশ। দ্বিতীয় কথা, লড়াইয়ের পরে পশ্চিম শোকাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করছে "ভারতের বাণী কই?" অতএব তাদের সেটা বলে দেওয়া আবশ্যক। এও ভাল কথা। আমি যতদূর জানি অসহযোগ পন্থীরা কেউ এ বিষয়ে কোন আপত্তি করে না। তৃতীয় বক্তায় কবি উপনিষদের ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করে বলেছেন, ঈশাবাস্য মিদং সর্বং, অতএব মা গৃধঃ। চমৎকার কথা, —কারও কোন সন্দেহ নেই। তাঁর প্রথমেই বলেছেন, একথা মানতেই হবে যে আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মত দোহন করেছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। অধিকার ওরা কেন পেয়েছে? নিশ্চয়ই সে কোন একটা সত্যের জোরে।"

"এ একটা ফ্যাক্ট : আজকের দিনে একে কিছুতেই না বলবার পথ নেই, —আমরা উপবাসী জাতি সবাই কিন্তু তাই বলেই কি একথা মানতেই হবে যে, এ অধিকার পেয়েছে তারা নিশ্চয়ই একটা সত্যের জোরে। এবং ওই সত্য তাদের কাছে আমাদের শিখতেই হবে।"

"কেবলমাত্র জয় করেছে বলে এই জয় করার বিদ্যাটাও সত্য বিদ্যা, অতএব শেখা চাই-ই একথা কোন মতেই মেনে নেওয়া যায় না।"

"সংসারে জয় করা বা পরের কেড়ে নেওয়ার বিদ্যাকেই একমাত্র সত্য ভেবে লুব্ধ হয়ে ওঠাই মানুষের বড় সার্থকতা নয়।"

"কে বলেছে সত্যকার বিদ্যা যদি কিছু তার থাকে তা শিখতে হবে না? কে বলেছে তার জন্য পশ্চিমমুখো থাকায় তাকে অহিন্দু বলে বয়কট করতে হবে? কি পদার্থবিদ্যা, কি রসায়নশাস্ত্র, কি ধর্মবিজ্ঞান—এ সকল পশ্চিমে দিয়ে। শেখবার আবশ্যক নেই বলে কে বিবাদ করেছে? বিবাদ যদি কিছু থাকে সে তার বিদ্যার উপরে নয়—সে তার শেখানোর ভান করার ওপর। শিক্ষার বদলে কুশিক্ষার আয়তনের ওপর।"

"আমাদেরই বা এত দুঃখ, এত বেদনা কেন? কবি বলেছেন, সেটা একেবারে নিছক আমাদেরই অপরাধ। আমি কিন্তু এই উক্তিটাকে পুরোপুরি স্বীকার করতে পারিনে। আমার মনে হয় প্রত্যেক মানবজীবনের দুঃখের অধ্যায়েই তার অপরাধ ছাড়াও একটা জিনিস আছে যা তার অদৃষ্ট। যে বস্তু তার দৃষ্টির বাইরে, এবং যার ওপর তার কোন হাত নেই। তেমনি একটা সমগ্র জাতিরও দুঃখের মূলে তার দোষ ছাড়াও এমন বস্তু আছে যা তার সাধ্যের অতীত, যা তার দুর্ভাগ্য। আমাদের দেশের ইতিহাস যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা বোধহয় সম্পূর্ণ অসত্য বলে একথা উড়িয়ে দেবেন না দুঃখ ও হীনতার মূলে আমাদের অদৃষ্ট বস্তুও অনেকটা দায়ী। যার ওপর আমাদের কর্তৃত্ব ছিল না।"

"মনের মিলনই বা কি, আর শিক্ষার মিলনই বা কি, সে কেবল হতে পারে সমানে সমানে, শ্রদ্ধার আদান-প্রদানে। এমন কাঙালের মত, ভিক্ষুকের মত কিছুতেই হবে না।"

"পশ্চিমের সভ্যতার আদর্শে মানুষ মারবার শতকোটি যন্ত্র-তন্ত্র, পরের দেশ ও তার মুখের গ্রাস অপহরণ করবার ততোধিক কলকারখানা, এ সমস্তই তার প্রয়োজনে তার নিজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে, —কিন্তু ঠিক ওই সকল আর একদেশের সভ্যতার আদর্শে প্রয়োজন কিনা আমি জানি না।"

"বিদ্যার জাত নেই একথা সত্য, কিন্তু তাই বলে কালচার জিনিসটারও জাত নেই একথা কিছুতেই সত্য নয়। এবং ওদের শিক্ষা যদি কেউ বিষের মত পরিহারের ব্যবস্থাই দিয়ে থাকে ত সে কেবল এইজন্যেই, বিদ্যার জন্যে নয়।"

"এদের মধ্যে (ইয়োরোপীয়) আজ যদি কেউ শোকাকুল চিত্তে কবিকে প্রশ্ন করে থাকে, ভারতের বাণী কই? তাহলে সন্দেহ হয় তারা কিঞ্চিৎ রসিকতা করেছে মাত্র। এবং এইজন্যেই তাদের নিমন্ত্রণ করে ঘরে ডেকে এনে নিভৃতে 'মা গৃধঃ' মন্ত্র দিয়ে বশ করা যাবে, —এ ভরসা আমাদের নেই।"

"...বিদ্যা এবং বিদ্যালয় এক বস্তু নয়, শিক্ষা ও শিক্ষার প্রণালী এ দুটো আলাদা জিনিস। সুতরাং কোন একটা ত্যাগ করাই অপরটা বর্জন করা নয়।"

"যারা এ তত্ত্ব জানে না তাদের একটু ধৈর্য থাকা ভাল, অমন উতলা হয়ে নিন্দে করতে নেই।"

এর উত্তর গুরুদেব দিলেন "সত্যের আহ্বান" নামক প্রবন্ধে। ১০ই ভাদ্র তারিখে, কলিকাতার এক জনসমাবেশে এটি পাঠ করেন। গুরুদেবের মূল বক্তব্য ছিল :–

"এবার দেশে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে তার পরিমাণ অনেক বড়ো; সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে তার প্রভাব। বহুদিন ধরে আমাদের পোলিটিকাল নেতারা ইংরেজি-পড়া দলের বাইরে ফিরে তাকান নি, কেননা তাদের দেশ ছিল ইংরেজি ইতিহাস পড়া একটা পুঁথিগত দেশ। ....তার মধ্যে প্রকৃত আত্মত্যাগ বা দেশের মানুষের প্রতি যথার্থ দরদ দেখা যায়নি। এমন সময়ে মহাত্মা গান্ধী এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহু কোটি গরিবের দ্বারে—তাদেরই আপন বেশে এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। ...আজকের দিনেও দেশের অনেক বিজ্ঞ লোকেই মহাত্মার চেষ্টাকেও নিজের পোলিটিকাল জুয়ো খেলার একটা গোপন চালেরই সামিল করে নিতে চান।"

"প্রেমের ডাকে ভারতবর্ষের হৃদয়ের এই যে আশ্চর্য উদ্বোধনী এর কিছু সুর সমুদ্র পারে আমার কানে গিয়ে পৌঁচেছিল। তখন বড়ো আনন্দে এই কথা আমার মনে হয়েছিল যে, এইবার এই উদ্বোধনের দরবারে আমাদের সকলেরই ডাক পড়বে, ভারতবাসীর চিত্তশক্তির যে বিচিত্র রূপ প্রচ্ছন্ন আছে সমস্তই প্রকাশিত হবে। কারণ, আমি একেই আমার দেশের মুক্তি বলি; প্রকাশই হচ্ছে মুক্তি।"

"এতদিন পরে আমার দেশে সেই আনন্দময় মুক্তির হাওয়া বইছে, এইটেই আমি কল্পনা করে এসেছিলুম। এসে একটা জিনিস দেখে আমি হতাশ হয়েছি। দেখেছি, দেশের মনের উপর বিষম একটা চাপ। বাইরে থেকে কিসের তাড়নায় সবাইকে এক কথা বলাতে, এক কাজ করাতে ভয়ংকর তাগিদ দিচ্ছে।"

"অতি সহজ অতি দুর্লভ ধন অতি সস্তায় পাবার একটা আশ্বাস দেশের সামনে জাগছে। এ যেন সন্ন্যাসীর মন্ত্রশক্তিতে সোনা ফলাবার আশ্বাস। এই আশ্বাসের প্রলোভনে মানুষ নিজের বিচার বুদ্ধি অনায়াসে জলাঞ্জলি দিতে পারে এবং অন্য যারা জলাঞ্জলি দিতে রাজি হয় না তাদের 'পরে বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে।"

"স্বরাজ গড়ে তোলবার তত্ত্ব বহুবিস্তৃত, তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কালসাধ্য, তাতে যেমন আকাঙ্ক্ষা এবং হৃদয়াবেগ তেমনি তথ্যানুসন্ধান এবং বিচার বুদ্ধি চাই। তাতে যাঁরা অর্থশাস্ত্রবিৎ তাঁদের ভাবতে হবে, যন্ত্রতত্ত্ববিৎ তাঁদের খাটতে হবে, শিক্ষা-তত্ত্ববিৎ রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ সকলকেই ধ্যানে এবং কর্মে লাগতে হবে। অর্থাৎ দেশের অন্তঃকরণকে সকল দিক থেকে পূর্ণ উদ্যমে জাগতে হবে। তাতে দেশের লোকের জিজ্ঞাসাবৃত্তি যেন সর্বদা নির্মল ও নিরভিভূত থাকে, কোনো গূঢ় বা প্রকাশ্য শাসনের দ্বারা সকলের বুদ্ধিকে যেন ভীরু এবং নিশ্চেষ্ট করে তোলা না হয়।"

"আমাকে কেউ কেউ বলেছেন, দেশের চিত্ত-শক্তিকে আমরা তো চিরদিনের জন্যে সংকীর্ণ করতে চাইনে, কেবল অল্পকালের জন্যে। কেনই বা অল্পকালের জন্যে? যেহেতু এই অল্পকালের মধ্যে এই উপায়ে আমরা স্বরাজ পাব। তার যুক্তি কোথায়?"

"এখন থেকে প্রত্যেক দেশকে নিজের মধ্যে যে চিন্তা করতে হবে তার সে চিন্তার ক্ষেত্র হবে জগৎ জোড়া। চিত্তের এই বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চা করাই বর্তমান যুগের শিক্ষার সাধনা।"

"আজ এই বিশ্বচিত্ত উদ্বোধনের প্রভাতে আমাদের দেশে জাতীয় কোনো প্রচেষ্টার মধ্যে যদি নিখিলের সর্বজনীন কোনো বাণী না থাকে তাহলে তাতে আমাদের দীনতা প্রকাশ করবে। আমি বলছিনে, আমাদের আশু প্রয়োজনের যা কিছু কাজ আছে তা আমরা ছেড়ে দেব। ...আজ সর্বমানবের চিত্ত আমাদের চিত্তে তার ডাক পাঠিয়েছে; আমাদের চিত্ত আমাদের ভাষায় তার সাড়া দিক, কেননা ডাকের যোগ্য সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাই হচ্ছে প্রাণ-শক্তির লক্ষণ। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত ভারতের বিরাট রূপ চোখে না পড়াতে আমাদের কর্মে ও চিন্তায় ভারতের যে পরিচয় আমরা দিতে প্রবৃত্ত হয়েছি সে অতি ছোটো, তার দীপ্তি নেই; সে আমাদের ব্যবসায়বুদ্ধিকেই প্রধান করে চলছে এই বুদ্ধি কখনো কোনো বড় জিনিসকে সৃষ্টি করেনি।"

এর কদিন পরেই, গুরুদেব কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে "বর্ষামঙ্গল" অনুষ্ঠান করলেন, একটি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন. জোড়াসাঁকোয় একদিন গুরুদেবের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী নিভৃতে সাক্ষাৎ করে গেলেন, তার পরে দেখা

কেন তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে, পূজোর ছুটির পূর্বে, "রক্তশোধ" নাটকের অভিনয়ের জন্যে মহড়া শুরু করেছেন। শান্তিনিকেতনে অভিনয় হলো— আশ্বিন মাসের চতুর্থ সপ্তাহের গোড়াতে, পূজোর ছুটি আরম্ভের আগের দিন। এতরকমের নানা প্রকৃতির কাজের মধ্যেও পরবর্তী পৌষ উৎসবের সময়ে বিশ্বভারতীকে পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় কাজও নানাভাবে করে যাচ্ছেন।

দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে একমত হতে না পারায় জন্যে দেশের একদল নেতার মন গুরুদেবের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠায় তিনি যে কতখানি নিরাশ হয়েছিলেন, তা জানা যায় তাঁরই লেখা তখনকার দুটি চিঠি থেকে। প্রথমটিতে বলছেন :—

"এবারে দেশে ফিরে এসে অবধি আমার শান্তি নেই, বিশ্রাম নেই। আজকাল তাই কেবলি ইচ্ছে করে চারিদিকের বেড়া সমস্ত ভেঙেচুরে ফেলে সেই আমার অল্পবয়সের সাহিত্যের খেলাঘরে পালিয়ে যাই।"

এর পরেই প্রমথ চৌধুরীকে ১৮ই কার্তিকে লিখছেন :—

"প্রমথ, আমার মনটা অত্যান্ত ক্লান্ত হয়ে আছে—সেইজন্যেই কোনো রীতিমত লেখায় হাত দিতে পারিনি। মন বলে যে, পৃথিবীর উপকার করা তোমার কাজ নয়। ঐ কাজে বিস্তর লোক লেগেচে, আর ভিড় বাড়ালে বসুন্ধরার তার হরণের জন্যে খুব মজবুৎ গোছের অবতারের দরকার হবে। অত্যান্ত গম্ভীর কর্তব্যগুলো দেখলে আজকাল কেবল যে ক্লান্তি আসে তা নয়, হাসি পায়। মনে হয় ওর বারো আনাই মুখোশ পরা ফাঁকি। আমি এখানে যে মস্ত একটা কাজ ফেঁদে বসেচি তার মহিমা আমাকে আর দাবিয়ে রাখতে পারচে না।"

"মজুরির চিঠি মজুরির প্রবন্ধ সমস্ত ঠেলে রেখে মাঝে মাঝে প্রায়ই গান লিখি। যখন লিখি তখন মনে হয় স্বরাজ ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর জিনিস নয়—মানুষের ইতিহাসে অনেক স্বরাজ বুদ্বুদের মত উঠেচে আর ফেটে গেছে—কিন্তু যে গানগুলোকে দেখতে বুদ্বুদের মত তারা আলোর বুদ্বুদ নক্ষত্রের মতই। ....দেশের কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে হুকুম আসচে যে, 'সময় খারাপ অতএব বাঁশি রাখ, লাঠি ধর'। যদি তা করি তাহলে কর্তারা খুশি হবেন, কিন্তু আমার এক বাঁশওয়ালা মিতা আছেন কর্তাদের অনেক উপরে, তিনি আমাকে একেবারে বরখাস্ত করে দেবেন। কর্তারা বলেন, 'তিনি আবার কে? এক ত আছে বন্দেমাতরং'। তাঁদের গড় করে আমাকে আজ বলতে হচ্চে—'আমার বন্দেমাতরং ভুলিয়েচেন ঐ তিনি। আমি দেশছাড়া লক্ষ্মীছাড়ার দলে। আমি ভূগোলের প্রতিমার পান্ডাদের যদি আজ মানতে যাই তাহলে আমার জাত যাবে।' কিন্তু বর্তমানকালে ভূগোলের প্রতিমার পান্ডারা শুধু পান্ডা নয় তারা গুন্ডা—অতএব মার খেতে হবে। তাই সই। মার শুরু হয়েচে। 'মরার বাড়া গাল নেই' আমাদের ভাষায় বলে, সে কথাটা মিথ্যে। মরাটা গাল নয় মরার ভয় করাটাই গাল।"

"আমার মন ধাপের গর্তের মধ্যে আর কোনদিন দেবতা খুঁজবে না। বুঝতে পেরেচি এই নিয়ে ঘরে পরে আমাকে ত্যাগ করবে। আমি ঠিক করেচি, যার যা মনের সাধ মিটিয়ে নিক, আমি তার কথা কইব না।"

"আমাকে জানিয়েচে দেশে যখন আগুন লেগেছে তখন বর্ষামঙ্গলের গান করা অকর্তব্য এবং যে মেয়েরা সেদিন গানের সভায় সেজে এসেছিল তারা এই অগ্নিকান্ডে আহুতি দিয়েচে।"

কলিকাতায়, ১৩২৮ সালের ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি "বর্ষামঙ্গল" নাম দিয়ে সঙ্গীতানুষ্ঠানটি গুরুদেব করিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর জন্যে অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় টিকিট করে। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একদলে এইরূপ অনুষ্ঠান পূর্বে কখনো হয়নি শান্তিনিকেতন থেকে। কলিকাতায় শিক্ষিত সমাজের একদল যে এই অনুষ্ঠানটিকে ভাল মনে গ্রহণ করেননি সে খবর গুরুদেবের এই চিঠি থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে। এ বিষয়ে তাঁর মনের প্রতিক্রিয়ার পরিচয় তিনি তাঁর গানেতেও রেখে গিয়েছেন। সে বছরের, অর্থাৎ ১৩২৮ সালের ভাদ্র মাসের 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠানটির পর, পরবর্তী ৭ই পৌষের উৎসবের পূর্ব পর্যন্ত রচিত কটি গান থেকে তা জানা যায়। গানগুলি হল :—

১। হায় গো, ব্যথায় কথা যায় ডুবে যায় যায় গো।

২। আমার যাওয়ো বলে সে কি তুমি।

৩। পাছে সুর ভুলি যে ভয় হয়।

৪। সবার কারো যে নাই ওরা চলে দলে দলে।

৫। সাধন কি মোর আসন নেবে হট্টগোলের কাঁধে?

বিরুদ্ধবাদীরা গুরুদেবকে লক্ষ করে যে আন্দোলন পত্রিকা মারফৎ তুলেছিলেন, সেবারকার ৭ই পৌষ উৎসবের উপাসনার ভাষণে তিনি তার জবাব দিলেন। এই ভাষণের মূল বক্তব্য ছিল :—

"এক একটি জাতি ছোটো সীমানার মধ্যে স্বজাতাভিমানের বীজ বপন করেছিল, কিন্তু কালের গতির সঙ্গে তার ভৌগোলিক সীমা অসত্য হয়ে গেছে। জলে স্থলে আকাশে পথ উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে। অতীতের বাধা দূর হয়ে গেছে। চিরাভ্যাস বশে এই বাধাকে আজও যে স্বীকার করে সে এই বাধাগুলিকে দৃঢ় করে তোলাই আজও তার সাধনা বলে কল্পনা করেছে। জাতীয় বিচ্ছেদের সীমাগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে সে পাকা করে খাড়া করবার চেষ্টা করছে।"

"স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের সঙ্গে মানুষ যে এক হয়েছে এই বৃহৎ ঘটনাকে আমরা আজও সত্য বলে অনুভব করতে পারছিনে। তাই আমাদের শিক্ষাদীক্ষার সেই প্রাচীন অভ্যাসটাকে মনের মধ্যে পাকা করে তোলবার চেষ্টা এখনও চলছে—তাই স্বাজাত্যের অভিমানকে অতিশয় করে তোলাকেই আমরা কর্তব্য বলে স্থির করেছি। এসব অবস্থায় কোনো এক জায়গায় আজ সেই বাণী ঘোষণার কেন্দ্র থাকা চাই, যে বাণী সীমাবদ্ধ অতীত কালের বাণী নয়, যে বাণী ভবিষ্যতের বিরাট মুক্তিক্ষেত্রের বাণী। সেইখান থেকে বলতে হবে, নবযুগ এসেছে নব অরুণোদয় হয়েছে। এই বাণী কারা ঘোষণা করবে? ঐশ্বর্যমদে মত্ত যারা তারা নয়।........অকিঞ্চনের কণ্ঠ থেকে নব যুগের জয়ধ্বনি উঠবে এমন আশা আছে।"

"এমন কথা মাঝে মাঝে শুনতে পাই যে, যতক্ষণ রাষ্ট্রশক্তিতে আমরা শক্তিমান না হই ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে আমাদের সত্য প্রচারের অধিকার নেই। অর্থাৎ অন্যের সঙ্গে ধনে মানে সমকক্ষ না হলে তার কাছে আমরা আত্মার বাণী বহন করতে পারব না। কিন্তু পৃথিবীতে সত্যের যাঁরা দৌত্য করেছেন তাঁদের কয়জনই বা বাহ্য সম্মানের পাথেয় নিয়ে কার্যক্ষেত্রে যাত্রা করেছেন? দারিদ্র্য ও অপমানে কি তাঁদের বাণীর অধিকারকে হরণ ও তার তেজকে খর্ব করেছে? কত কৌপীনধারী ভিক্ষু মানুষের ইতিহাসকে চিরকালের মতো অগ্রসর করে দিয়েছেন। আমরা বাহ্য ক্ষমতায় হীন হলেও আত্মার বাণী আমাদেরই কণ্ঠের অপেক্ষা করেছে। আমরা বলব, তোমরা লোভকে বিশ্বাস করো, আমরা ত্যাগকে বিশ্বাস করি, তোমরা অহংকারকে বিশ্বাস করো, আমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি।

এসো অপরাজিত বাণী
অসত্য হানি',
অপহত শঙ্কা অপগত সংশয়।"

শেষের এই পংক্তি কটি হল, এবারকার উপাসনার উদ্বোধন সঙ্গীত "জয় হোক জয় হোক নব অরুণোদয়" গানটির শেষ কলি। এবারের উপাসনায় প্রয়োজনে যে কটি নতুন গান গুরুদেব রচনা করেছিলেন এটি তারই একটি। এ গানে গুরুদেব বিশ্বভারতীকে নিয়ে নতুন পথে যাত্রার প্রারম্ভে প্রার্থনা জানালেন জয়ী হবার। অপরটিতে প্রকাশ পেয়েছে, দেশবাসীর প্রতিকূল মনোভাবের কথা ভুলে গিয়ে মনকে শান্ত করবার আন্তরিক ব্যাকুলতা। গান দুটি হল :—

১। "জয় হোক জয় হোক নব অরুণোদয়
পূর্ব দিগঞ্চল হোক জ্যোতির্ময়।
এস অপরাজিত বাণী
অসত্য হানি
অপহত শঙ্কা অপগত সংশয়।
এস নব জাগ্রত প্রাণ
চির যৌবন জয় গান।
এস মৃত্যুঞ্জয় আশা
জড়ত্বনাশা
ক্রন্দন দূর হোক বন্ধন হোক ক্ষয়।"

২। "আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের
দোলে দোলাও
কে আমারে কি যে বলে ভোলাও ভোলাও।
ওরা কেবল কথার পাকে
নিত্য আমায় বেঁধে রাখে
বাঁশির ডাকে সকল বাঁধন খোলাও।
মনে পড়ে কত না দিন রাতি
আমি ছিলেম, তোমার খেলার সাথী।
আজকে তুমি তেমনি করে
সামনে তোমার রাখ ধরে
আমার প্রাণে খেলার সে ঢেউ তোলাও।"

পরের দিন, ৮ পৌষের প্রভাতে, মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সভাপতিত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে, বিশ্বভারতীকে আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ করে, নানাপ্রকার ভারতীয় এবং প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলনের কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করা হল। এর পরেও বিশ্বভারতী এবং গুরুদেবের প্রতি দেশবাসীর প্রতিবাদ বন্ধ হলো না। "নারায়ণ" পত্রিকার পৌষ সংখ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়ের "বর্তমান ভারত ও রবীন্দ্রনাথ নামে" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির ভাষা ছিল অত্যান্ত রূঢ়। নমুনা হিসেবে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি। লেখক বলছেন :—

"কবিকুলতিলক, বিশ্ববিশ্রুত শ্রীরবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর নানা স্থানে 'বিশ্বভারতীর বার্তা' প্রচার করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন, জগতের লোক তাঁহার মুখে বিশ্বপ্রীতি ও বিশ্বমানবিকতার অপূর্ব ব্যাখ্যান শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে—চারিদিক হইতে প্রতিদিন অজস্রভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হইতেছে। দেশের ভিতরে ও বাহিরে এতাদৃশ সম্মান লাভ করা, বোধ করি কোন যুগে কবির ভাগ্যে ঘটে নাই। আমরা বাঙ্গালী—বাঙ্গালী কবির এই সম্মানে গৌরবান্বিত।"

"প্রায় পনের বৎসর পূর্বে, যে কবি, 'ওমা সোনার বাঙলা তোমায় ভালবাসি', 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী', 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' প্রভৃতি সঙ্গীত রচনা করিয়া সমগ্র দেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, এখন আর সে রবীন্দ্রনাথ নাই। সমগ্র জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও সাধনা, তাঁহার সঙ্গীত ও রচনায় আর তেমন করিয়া ফুটিয়া উঠে না। রবীন্দ্রনাথ এখন আর জাতীয় কবি নহেন, তিনি বিশ্বমানবের কবি, জগতের কবি।"

"যেদিন তাঁহার কবি-প্রতিভা বিশ্বমানবিকতার প্রথম সন্ধান পাইয়া, দেশে বিদেশে, সেই বার্তা প্রচার করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল, সেই দিন হইতেই, দেশের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ক্রমশঃ শিথিল হইতে লাগিল। দেশের সুখ, দুঃখ, আশা নিরাশা আর তেমন ভাবে তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিল না। তিনি ভাবুক-ভাবের রাজ্যেই চলাফেরা করিতে লাগিলেন এবং ক্ষুদ্র জাতীয়তার গণ্ডী ছাড়াইয়া যতই ঊর্দ্ধতর প্রদেশে আরোহণ করিতে লাগিলেন—বিশ্বমানবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ততই ঘনিষ্ঠতর হইতে লাগিল বটে, কিন্তু দেশের প্রাণবস্তু হইতে তিনি সেই পরিমাণে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। ইহার জন্য আমরা তাঁহাকে দোষ দিই নাই—কল্পনা লইয়াই যাঁহাদিগের কারবার—ইহাই তাঁহাদিগের স্বাভাবিক পরিণতি। জগতের অনেক প্রসিদ্ধ কবিই এইরূপে কল্পনা লইয়া খেলা করিতে

আজ রাত্তিরেই ঐ দামী কাপড় থেকে
কিছুটা গায়েব হবে,
কি ভাবে ?
কাপড় কুঁচকে কমে গিয়ে
সাবধান !
প্রতি বাঁধা কাপড় কেনার সময়েই কিছুটা কাপড়
নষ্ট হয় কুঁচকে খাটো হয়ে গিয়ে। তার পরিণাম?
যখনই আপনি সেলাই করাতে যান, দেখেন
কাপড় কম পড়ে গেছে।
এই কাপড় কুঁচকে খাটো হবে যাওয়ার হাত থেকে
বাঁচার কি কোনও রাস্তা আছে? নিশ্চয়ই আছে...
কেনবার আগে দেখে নিন...'স্যানফোরাইজড'
লেবেল লাগানো আছে কি না।
'স্যানফোরাইজড' লেবেল একমাত্র সেই কাপড়েই
লাগানো হয় যা অনেক কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে
কাপড় কোঁচকানো সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে।
সারা পৃথিবীতে ৫০২টিরও বেশী কাপড়ের মিল এই
লেবেল ব্যবহার করছেন।
এরপর যখনই কাপড় কিনবেন, দেখে নেবেন
'স্যানফোরাইজড' লেবেল লাগানো আছে কিনা। এই লেবেল
কাপড় কোঁচকানো থেকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতীক।
একমাত্র সেই কাপড়ই কিনুন
যাতে লেবেল লাগানো আছে
'স্যানফোরাইজড'— কাপড়
কোঁচকানো থেকে সম্পূর্ণ
নিরাপত্তার
'SANFORIZED'
"স্যানফোরাইজড" রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্কের স্বত্বাধিকারী ক্লুয়েট, পীবডী অ্যাণ্ড কোম্পানী ইনক্ (আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সীমিত দায়) দ্বারা প্রচারিত। স্বত্বাধিকারী এই ট্রেডমার্ক শুধু ব্যবহার করেন
কিংবা পরীক্ষার পর কুঁচকে খাটো হবে না এই দৃঢ় শর্ত পূরণ করে এমন একমাত্র পরীক্ষিত কাপড়ের জন্য রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারীদের এর ব্যবহারের অনুমতি দেন।
CHAITRA-88-40 BEN

করিতে পরিশেষে কল্পনা-বিলাসী হইয়া—mystic নামে অভিহিত হইয়াছেন আমাদিগের রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে।"

"এই ত জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। কিন্তু জগতের মধ্যে বিরোধ ও অশান্তির মাত্রা কমিল কি? বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছে।"

"আমাদিগের মনে হয় এই জাতিসংঘ যেভাবে ও যতটুকু গড়িয়া উঠিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের "বিশ্ব-ভারতী"-র কল্পনা সে ভাবেও ততটুকুও গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই। এই কল্পনা গড়িয়া তুলিবে কে? রবীন্দ্রনাথ? রবীন্দ্রনাথের পিছনে সে জনশক্তি কোথায়? যে দুর্বার দুর্জয় শক্তি জগতের জাতি সমূহকে আদেশ করিতে পারে—বাধ্য করিতে পারে—অন্ততঃ—তাহাদিগের সহিত সমপর্যায়ে অধিষ্ঠিত হইয়া জগতের সকলে আপনার আহ্বান লিপি প্রেরণ করিতে পারে ভারতের সে শক্তি কই?"

"আমরা বক্তৃতার সঙ্গে দুই চারিটি উপনিষদের বাণী ছিটাইয়া দিয়া সমগ্র বিশ্ববাসীকে চমকিত করিয়া দিতে পারি এবং তাহাই আমাদিগের আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ দাবী ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি, কিন্তু জগতের লোক কি শুধু মুখের কথায় ভুলিবে? আমরা মোটা কাপড় পরি না, পাছে গায়ে আঁচড় লাগে, দেশের কথা ভাবি না বা ভাবিতেও চাহি না, পাছে দেশের জন্য কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। দেশ চুলায় যাক, আমি এবং আমার স্বজনগণ সুখে থাকিলেই হইল—ইহাই আমাদিগের বুদ্ধি—ইহাই আমাদিগের প্রবৃত্তি। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদিগের আধ্যাত্মিকতার দাবী সাজিবে কেন? ত্যাগ ও সংযমই আধ্যাত্মজীবনের ভিত্তি স্বরূপ। সেই ত্যাগ ও সংযমকে বাদ দিয়া শুধু ফাঁকা কথার উপরে জগতে প্রেমের রাজ্য গড়িয়া উঠিবে কি?"

"ভারত এক্ষণে ঘোর দুর্দশাপঙ্কে নিমগ্ন। "বিশ্বমৈত্রী" 'বিশ্বভারতী'র কথা এক্ষণে তাহার ভাল লাগিবে কি? অগ্রে তাহাকে এই দুর্দশাপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া, তাহার পর বড় বড় কল্পনা বা আদর্শ তাহার সম্মুখে ধারণ করিলে ভাল হইত না কি? আমরা পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞান বর্জন করিতে চাহি না—মহাত্মারও তাহা উদ্দেশ্য নহে, তবে, তাহার সময় আছে।"

"এই সকল কারণে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ভারতে আপাতত স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে না। ভারত চায় ত্যাগ। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই ত্যাগের আদর্শ তেমনভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। সুতরাং বাহিরে তাঁহার যতই সমাদর হউক, দেশমধ্যে তিনি কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ লাভ করিতে পারেন কিন্তু কখনই বর্তমান জাতীয় যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারিবেন না।"

প্রবন্ধটিতে লেখক গুরুদেবকে কল্পনাবিলাসী কবি এবং তিনি দেশের জন্য কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করেননি প্রভৃতি বিভিন্ন কটূবাক্যে ভূষিত করেছেন। অথচ, গুরুদেব ১৯০১ সালে শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর, তার পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব নিজের উপর রেখে, দেশবাসী বা সরকারী আর্থিক সাহায্য ব্যতিরেকে, নিজের আর্থিক সম্পদের অধিকাংশ বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় করে,. প্রভূত ত্যাগ ও পরিশ্রমের দ্বারা বিদ্যালয়টির বিংশতিবর্ষ পূর্ণ হবার পর বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করেন। দেশবাসীর সুখ, দুঃখ আশা-নিরাশার কথা গভীর-ভাবে চিন্তা করতেন বলেই ১৯২২ সালের মাঘ মাসে, অসহযোগের আন্দোলনের যুগে, বিশ্বভারতীর একটি অতি আবশ্যকীয় অঙ্গ রূপে ইংলন্ডবাসী ইংরেজ—এলমহার্স্টের আর্থিক সহায়তায়, বীরভূমের দরিদ্রতম গ্রামবাসীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কল্পে, শ্রীনিকেতন স্থাপন করলেন। দরিদ্র দেশবাসীর কথা গুরুদেব যে গভীরভাবে চিন্তা করতেন, শ্রীনিকেতন হল তার একটি প্রত্যক্ষ পরিচয়।

"নারায়ণ" পত্রিকার পরবর্তী ফাল্গুন সংখ্যায় "স্বাধীনতার স্বরূপ" নামে একটি প্রবন্ধ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রকাশ করলেন। প্রবন্ধটির নীচে বলা হয়েছে:—

"আহমদাবাদ জাতীয় মহাসমিতির (১৯২১ সালের ডিসেম্বর) নির্বাচিত সভাপতির অভিভাষণের কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ।" গুরুদেবের বিশ্বভারতী সংক্রান্ত শিক্ষা পরিকল্পনার প্রতিবাদ যে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনেও স্থান পেয়েছিল এই উক্তি থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। দেশবন্ধু কংগ্রেসে বললেন:—

"আমাদের চরম লক্ষ স্বাধীনতা, কেননা জাতীয় ধারার অনুযায়ী করিয়া আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য ফুটাইয়া তুলিবার এবং জাতির ভাগ্য গঠন করিবার অধিকার দাবি করিতেছি। আমরা চাই না ইহাতে পাশ্চাত্ত্যের আরোপিত অনুষ্ঠানগুলি আমাদের প্রতিবন্ধকতা করে, অথবা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা তাহার শিক্ষাদ্বারা আমাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে। এইখানে আমি ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথের বাণী শুনিতে পাইতেছি, তাহা আমার বাধা দিয়া বলিতেছে পাশ্চাত্ত্যের সভ্যতা আজ আমাদের দ্বারে অতিথি হইয়া আসিয়াছে আমরা কি আতিথেয়তা ভুলিয়া গিয়া তাহাকে বিমুখ করিব; আমরা কি স্বীকার করিব না যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষার সম্মেলনেই জগতের মুক্তি নিহিত রহিয়াছে।"

"আমি স্বীকার করি ভারতীয় জাতীয়তাকে বাঁচিতে হইলে অন্যান্য জাতির সংস্পর্শে আসিতেই হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উক্তির বিরুদ্ধে আমার দুইটি কথা বলিবার আছে। প্রথম কথা এই যে, আতিথেয়তা প্রদর্শনের পূর্বে আমাদের নিজস্ব একখানি আবাস থাকা প্রয়োজন, আর দ্বিতীয় কথা এই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে বরণ করিবার পূর্বে ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতাকে তাহার আত্ম-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস স্বাধীনতা না আসিলে প্রকৃত মিলন অসম্ভব, যদিও অন্ধ দাসোচিত অনুকরণ হইতে পারে, যেমনটি এতাবৎকাল হইয়া আসিয়াছে। বৈদেশিক শিক্ষা-দীক্ষার নিকট ভারতীয় সভ্যতার পরাজয় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে—ইহা রাজনৈতিক অধীনতার অসম্ভাবী পরিণাম। ভারতকে ইহার প্রতিরোধ করিতেই হইবে। যখন ভারতীয় জীবনের অন্তর স্পন্দন অনুভূত হইবে, কেবল তখনই উভয় সভ্যতার সম্মেলনের কথা উঠিতে পারে।"

প্রতিষ্ঠাকালে, বিশ্বভারতী ছিল অতি ক্ষুদ্র এবং আর্থিক সম্বলে অতি দরিদ্র একটি প্রতিষ্ঠান। বিদেশে বা আমাদের দেশে, বিশ্ববিদ্যালয় বলতে যা সকলে বুঝতেন, বাইরের আকৃতিতে তার কোন পরিচয় ছিল না। তা সত্ত্বেও ভারতীয় সর্ববিদ্যার সমাবেশে, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আত্ম-স্বরূপের উপলব্ধি যাতে সকলের কাছে সহজ হয় গুরুদেব তারই আয়োজন বিশ্বভারতীতে করেছিলেন। দেশ ও বিদেশের বহু মনীষীকে তিনি এখানে একত্রিত করতে পেরেছিলেন। বিদেশীরা সকলেই ভারতীয়দের গ্রহণ করেছিলেন, বন্ধুরূপে। ইংরেজরাও এখানে এসেছিলেন, একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, দরিদ্র মানব সেবার কাজে। এইভাবে বিশ্বভারতীর মত একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গুরুদেব প্রমাণ করেছিলেন যে, উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে মনের মিলন সম্ভব।

দেশবন্ধুর মুদ্রিত ভাষণটির পরেই, সেই সংখ্যায় "নারায়ণে" মুদ্রিত আছে 'শরবেণ' ছদ্মনামে এক কবির একটি কবিতা। কবিতার নাম "কবির প্রতি"। কবি বলেছেন:—

"জাগো কবি। জাগো কবি।
স্বপন-রচিত নন্দন হতে
দেখ এ ধূলার ছবি।"

কবিতাটির তৃতীয় কলিতে লিখেছেন:—

বিশ্বভারতী-শ্রীকর-দীপ্ত
নিয়ে এস তব বীণা;
নিঃস্বাধিক ভাইরা তোমার
জননী তোমার ক্ষীণা।"

সমগ্র কবিতাটির মূল বক্তব্য ছিল, গুরুদেব যেন দীপ্ত-সঙ্গীত-স্বরাগিণীর শক্তি সকল-প্রাণের গানে দরিদ্র দেশকে জাগিয়ে তোলেন। যদিও তিনি বিশ্বজনের বন্দিত পুরুষ, তবুও নিঃস্বজনের গাঢ় নিশ্বাসে তাঁর মন যেন কেঁপে ওঠে।

বিশ্বভারতীকে নিয়ে এসকলো বাদপ্রতিবাদের জবাব না দিয়ে, গুরুদেব শুধু নিজে কাজ করে যেতে লাগলেন। বিশ্বভারতীর প্রথম সূচনা হয়েছিল ১৩২৫ সালে। তখন থেকেই মাঝে মাঝে সেখানকার ছাত্র ও অধ্যাপক এবং শান্তিনিকেতনের বাইরে শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে তাঁকে বলতে হয়েছিল, কেন তিনি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন; এবং তার কাজকর্ম কিভাবে চলবে। পাকাপোক্তভাবে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হবার পর, ১৩২৮ সালের ২০শে ফাল্গুনে, ছাত্রদের অনুরোধে গুরুদেব পুনরায় সে বিষয়ে যা বুঝিয়ে বললেন, তা হল:—

"আধুনিক কালে পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমা ভেঙে গেছে, মানুষ পরস্পরের নিকটতর হয়েছে, এই সত্যকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। মানুষের এই মিলনের ভিত্তি হবে প্রেম, বিদ্বেষ নয়। মানুষের বিষয় ব্যবহারে আজ পরস্পরকে পীড়ন করছে, বঞ্চিত করছে, একথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সত্য সাধনায় পূর্ব-পশ্চিম নেই।....... চিরন্তন সত্যের পূর্ব-পশ্চিমের ভেদ নেই। এই বিশ্ব-ভারতীতে সেই সত্য সাধনার ক্ষেত্রকে আমার গড়ে তুলতে হবে। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া দরকার। আমরা এতদিন পর্যন্ত ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল বয়' ছিলাম, কেবলই পশ্চিমের কাছে হাত পেতে পাঠ নিয়েছি। কিন্তু পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের আদান-প্রদানের সম্বন্ধ হয়নি। সাহসপূর্বক য়ুরোপকে আমি আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে আমন্ত্রণ করে এনেছি এখানে এইরূপে সত্যসম্মিলন হবে, জ্ঞানের তীর্থ ক্ষেত্র গড়ে উঠবে। আমরা রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে শুধু মৌখিক বড়াই করে থাকি, কিন্তু অন্তরে আমাদে আত্মবিশ্বাস নেই, যথেষ্ট দীনতা আছে। যেখানে মনের ঐশ্বর্যের প্রকৃত প্রাচুর্য আছে সেখানে কার্পণ্য সন্তর্পণ হয় না। আপন সম্পদের প্রতি যে জাতির যথার্থ আশা ও বিশ্বাস আছে অন্যকে বিতরণ করতে তার সংকোচ হয় না, সে পরকে ডেকে বিলোতে চায়।"

"বিশ্বের জ্ঞানজগৎ থেকে ভারতবর্ষ একঘরে হয়ে আছে, তাকে শিক্ষার ছিটেফোঁটা দিয়ে চিরকেলে পাঠশালায় পোড়ো করে রাখা হয়েছে। আমরা পৃথিবীর জ্ঞানধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিগত অবমাননা থেকে মুক্তি পেতে চাই।"

"ভারতবর্ষ তার আপন মানুষকে জানুক এবং আধুনিক সকল লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধারলাভ করুক। রামানুজ শংকরাচার্য বুদ্ধদেব প্রভৃতি বড়ো বড়ো মনীষীরা ভারতবর্ষে বিশ্বসমস্যার যে সমাধান করবার চেষ্টা করেছিলেন তা আমাদের জানতে হবে। জোরাস্টেরীয় ইসলাম প্রভৃতি এশিয়ার বড়ো বড়ো শিক্ষাসাধনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। ভারতবর্ষের কেবল হিন্দুচিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থপতিবিজ্ঞান প্রভৃতিতেও হিন্দু-মুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র সৃষ্টি জেগে উঠেছে। তারই পরিচয়ে ভারতবর্ষীয়ের পূর্ণ পরিচয়।"

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়টির আর্থিক অনটন কিভাবে বৎসরের পর বৎসর নিজের সামান্য আয় থেকে গুরুদেব মেটাতেন-এই ভাষণের একাংশে তারও উল্লেখ আছে। যেমন:—

"তখন আমার ঘাড়ে, মস্ত একটা দেনা ছিল; সে দেনা আমার সম্পূর্ণ স্বকৃত নয়, কিন্তু তার দায়

আমারই একলার। ৭ বেনার পরিমাণ লক্ষ টাকারও অধিক ছিল। আমার এক পয়সার সম্পত্তি ছিল না, মাসিক বরাদ্দ অতি সামান্য। আমার বইয়ের কপি-রাইট প্রভৃতি আমার সাধ্যমত সামগ্রী কিছু কিছু সওদা করে অসাধ্য সাধনে লেগে গেলাম।"

এর পূর্বে তিনি প্রকাশ্যে এ ধরনের কোন কথা কোথাও বলেছিলেন বলে জানা যায় না। এখানেই প্রথম তা প্রকাশ করলেন। কিন্তু কেন করলেন? অনুমান করি, "নারায়ণে" যতীন্দ্রনাথ রায়-এর উক্তি তার মূল কারণ। গুরুদেবের প্রতি দোষারোপ করে লেখক লিখেছিলেন, "ত্যাগ ও সংযমই আধ্যাত্মজীবনে ভিত্তিস্বরূপ। সেই ত্যাগ ও সংযমকে বাদ দিয়া শুধু ফাঁকা কথার উপরে জগতে প্রেমের রাজ্য গড়িয়া উঠিবে কি?" ... "ভারত চায় ত্যাগ। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই ত্যাগের আদর্শ তেমন ভাবে ফুটিয়া উঠে নাই।"

এই কথাগুলি "নারায়ণ" পত্রিকার লেখকেরই উক্তি বলে মনে হয় না। অনুমান করি, তখনকার দিনের দেশ নেতাদের মধ্যে যাঁরা গুরুদেবের বিরুদ্ধে এইরূপ মত মনে পোষণ করতেন, তাঁদেরই সর্মথিতক্রমে এটি লেখা হয়েছিল।

দেশবাসীর কাছ থেকে, দেশের জন্য ত্যাগ না করার অপবাদের দুঃখ গুরুদেব বহুদিন ভুলতে পারেননি বলেই, ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসে, দক্ষিণ আমেরিকা অভিমুখে যাত্রার পূর্বে, শান্তি-নিকেতনবাসী কর্তৃক আয়োজিত বিদায়সভায় অভিভাষণে গুরুদেব বললেন, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের "ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নিতুম না. ছেলেদের অশনবসন, প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যেমন করে হোক আমাকেই যোগাতে হত, অধ্যাপকদের সাংসারিক অভাব মোচন করতে হত। বৎসরের পর বৎসর যায়, অর্থাভাব সমানই রইল, বিদ্যালয় বাড়তে লাগল। দেখা গেল, বেতন না নিলে বিদ্যালয় রক্ষা করা যায় না। বেতনের প্রবর্তন হল; কিন্তু অভাব দূর হল না। আমার গ্রন্থের স্বত্ব কিছু কিছু করে বিক্রয় করতে হল। এদিকে ওদিকে দু-একটা যা সম্পত্তি ছিল তা গেল, অলংকার বিক্রয় করলুম —নিজের সংসারকে রিক্ত করে কাজ চালাতে হল। কী দুঃসাহসে তখন প্রবৃত্ত হয়েছিলুম জানি না।"

এই ভাবে, ১৯২১ সাল থেকে বিশ্বভারতীকে নিয়ে দেশের মধ্যে প্রতিকূলতার প্রবল পরিবেশের সৃষ্টি হওয়াতে গুরুদেব যে কতখানি ব্যথিত হয়েছিলেন তা জানা যায় তাঁরই লেখা পরবর্তী সময়ের কয়েকটি চিঠি থেকে। শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা তাঁর ১৩৩৮ সালের ১৬ চৈত্রের চিঠিতে আছে :—"এ পর্যন্ত আমি অনেক মার খেয়েছি কিন্তু মরিনি অতএব এই মারগুলিতে আমার গৌরব বৃদ্ধি করেচে—বাংলা সাহিত্যে আমি অভিমন্যু, অথচ অভিমন্যুর শেষ দশা আমার ঘটেনি। অতএব সপ্তরথীগুলিকে আমি সাদর অভিবাদন করে সম্মানে বিদায় নিতে পারব।"

১১শে জ্যৈষ্ঠের চিঠিতে প্রশান্ত মহলানবিশকে গুরুদেব লিখলেন :—"যদুনাথ সরকার মহাশয়ের একখানি দীর্ঘ পত্র পেয়েছি। তার সারমর্ম এই যে তিনি বিশ্বভারতীর সদস্যপদ গ্রহণ করতে অসম্মত। সমস্ত চিঠিটা দেখলে বুঝতে পারবে একটা প্রবল প্রতিকূলতা এর মধ্যে আছে। অথচ যদুবাবুকে চিরদিনই অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে এসেচি এবং এখনো করি। আমি কিছুই বুঝতে পারচিনে আমার মধ্যে এমন কি আছে যার জন্যে আমার সুহৃদরা আমার বিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়ান? এই জন্যে থেকে থেকে আমার ভয় লাগে, মনে হয় আমার মত লোকের এমন কোন কাজে হাত দেওয়া উচিত নয় যাতে অনেকের সম্মতি ও সহযোগিতার প্রয়োজন। আমি অনেককে আকর্ষণ করতে পারিনে—আমার মধ্যে সেই একটা ত্রুটি আছে। অথচ ত্রুটি আকারে আমি নিজেই তার চেহারা দেখতে পাইনে—পেলে সে সম্বন্ধে অন্তত কিছু চেষ্টা করা সম্ভবপর হতে পারত। যদুবাবুর মধ্যে খুব একটি সত্য আছে—তিনি আমাকে অনাদর করলেও আমি তাঁকে করতে পারিনে সেই জন্যেই তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান পেয়ে আমি এমন ব্যথা বোধ করচি।" অনুমান করি, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, বিশ্বভারতীর সদস্যপদ গ্রহণে অসম্মতি জানিয়েছিলেন তখনকার রাজনৈতিক প্রতিকূলতার কথা চিন্তা করে।

৩০শে আশ্বিনে, ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে :—

"যখন মন শ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন বিশ্বভারতীকে মরীচিকা বলে মনে হয়—তখন বুঝতে পারি যখন কবিত্ব রচনা করেচি সেই ছিল আমার বাস্তব কাজ, আর আজ যখন অনুষ্ঠানের পাকা ভিত্তি পত্তন করতে বসেচি এই হচ্চে মায়া। এ কি টিকবে? আইডিয়া জিনিসটা সজীব, কিন্তু কোনো ইনস্টিট্যুশনের লোহার সিন্দুকে ত তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না—মানুষের চিত্তক্ষেত্রে যদি সে স্থান পায় তবেই সে বর্তে গেল। দেশের চিত্তের দিকে যখন তাকিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই বিপুল কাঁটা বন—সেখানে খোঁচার আইডিয়ার মধ্যে ফসলের আইডিয়া কি জায়গা পাবে? যাই হোক আমাদের শাস্ত্র বলেচেন বপন করতে, ফলের হিসেব করতে নিষেধ করেচেন।"

১৩৩০ সালের ৩১শে ভাদ্রের চিঠিতে আছে, "ঘরে বাইরে সবাই বিশ্বভারতীর নাম শুনলেই বলে, আগে ঘরের কাজ সারো, তার পরে বাইরের দিকে মন দিয়ো—আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আমি তাদের দোষ দিইনে, এর মধ্যে শনিগ্রহের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। বড় আইডিয়াকে "বড়" বদনাম দিয়েই লোকে গাল দিয়ে থাকে।"

লেডিজ ঘড়ি

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
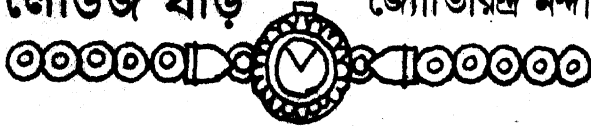
আমি প্রায়ই শীতলের দোকানে গিয়ে বসে থাকি। শীতল ঘড়ি সারায়। আমি ঘড়ি সারাতে যাই না সেখানে। আমার ঘড়ি নেই। ঘড়ি ব্যবহার করার দিন ফুরিয়েছে। রিটায়ার্ড জীবন। অঢেল সময় আমার হাতে—যাকে বলে সময় নিয়ে একেবারে হেলাফেলা অবস্থা। সুতরাং অবসর কাটাতে শীতলের দোকান। আমার পক্ষে প্রশস্ত জায়গা। ভারি নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাট দোকানের ভিতরটা। যদিও বাজারের মুখে। তবু শীতলের দোকানে ঢুকলে মনে হয় কি —হাঁ-হাঁ নেই, খাঁ-খাঁ নেই, লোকের আনাগোনা নেই—যেন নীরবতার ঠাসা পুরোদস্তুর একটা আইসক্রীম। একটা জানালার পাশ ঘেঁষে বসে শীতল মাথা গুঁজে ঘড়ি সারায়। আর তার ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে—দেওয়ালে শো-কেস-এ শুধু ঘড়ি ঘড়ি ঘড়ি। গোল ওভ্যাল চৌকো ত্রিকোণ ছ-কোণ রকমারী ডিজাইনের ছোট বড় মাঝারি অসংখ্য ঘড়ি। তা চৌকো হোক কি ডিমের আকারের হোক বা তিন কোণা চেহারা—ঘড়ি ঘড়িই। ঘড়ির মূল চেহারা পৃথিবীর কোনো চাঁদমেকার আজ পর্যন্ত পাল্টাতে পারল না। পারল কি? সেই দুটো কাঁটা। আর বারোটা ঘর। কোনোটার গায়ে 1 2 3....বসান—কোনোটার I II III....আবার কোনো ঘড়িতে কেবল বারোটা ফোঁটা বসিয়ে কাজ সারা হয়। কথা হচ্ছে সেখানেই। কাজ সারা নিয়ে কথা। মানুষ ঘড়ি দেখে দেখে এমন ধূর্ত হয়ে গেছে—চাই কি, যদি আদৌ কোনো দাগ বা ফোঁটা নাও থাকে, সাদা ডায়ালের গায়ে দুটো কাঁটা কত ডিগ্রী কোণ তৈরী করে ধুকপুক করছে কেবল তাই দেখে ঘণ্টা মিনিট সেকেন্ড ঠাহর করে নিতে কারো পক্ষে এখন কষ্টই হয় না। কোনো কোনো ঘড়িতে আবশ্যি ইঞ্চির মাছের মিহি পাতলা কাঁটার মতন ফাউ হিসেবে একটা সেকেন্ডের দাঁড়াও থাকে। অনেক ঘড়িতে আবার থাকেও না। সেটা কিছু না।

শীতলের সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে আগুণতি ঘড়ি। কোনোটা ক্লক কোনোটা ওয়াচ। যে ঘড়ি মানুষ পকেটে রাখে গলায় ঝোলায় বা হাতে পরে তার নাম ওয়াচ। যে যে ঘড়ি দেওয়ালে ঝুলছে কি টেবিলে আলমারীর মাথায় বা জানালার তাকে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে সে সব ক্লক। টাইমপীসও বলা হয় কোনো কোনোটাকে। ক্লক থেকে অ্যারাউন্ড-দি-ক্লক কথার উৎপত্তি। ওয়াচ-ডগ। সেদিন ডিকশন্যারি ঘেঁটে আমি সব দেখে নিয়েছি।

সত্যি শীতলের দোকানের প্রশান্তির তুলনা হয় না। তাই বলি নীরবতা জাম জাম একটা নিটোল পরিচ্ছন্ন আইসক্রীম তৈরী হয়ে আছে সেখানে। হাঁ-হাঁ খাঁ-খাঁ নেই, লোকের আনাগোনা নেই—কাজেই এতটুকু উত্তাপও নেই। উত্তাপ থাকলে তো আইসক্রীম গলত নীরবতা ভাঙত। শীতল সেদিক থেকে ভাগ্যবান। সঙ্গে সঙ্গে আমিও। উত্তাপ দেখবেন তো শীতলের দোকানের পাশের ঘরটা দেখুন। ডাক্তারখানা। এক হোমিওপ্যাথ বসেন সেখানে। অহো কী ভিড় কী ভিড়। মুহুর্মুহু নাড়ি দেখা হচ্ছে, জিভ চোখের রং দেখা হচ্ছে—বুকে পিঠে স্টেথো চাপান হচ্ছে। তারপর প্রেসক্রিপশান। তারপর ওষুধ। ডাক্তারের মতন কম্পাউন্ডারকেও রুগীরা গিলে খেতে চায়। কাকে ল্যাং মেরে কে আগে ওষুধ নেবে। ডাক্তারে কম্পাউন্ডারে রুগীতে মিলে ধুন্ধুমার কাণ্ড।

তেমনি তার পরের দোকানটা। মাংসের দোকান। মাংস খাবে কি। মানুষের মাথা মানুষে খায়। কাকে ধাক্কা দিয়ে পিছনে ঠেলে কে আগে দাঁড়াবে—কার নাকের ওপর দিয়ে কে থলে বাড়িয়ে দেবে, কেবল এইসব। আর খপাখপ মাংস কোপানোর শব্দ। কাটা মাংস পাল্লায় উঠছে। তারপর ঝুপঝুপ থলের মধ্যে ঢুকছে। রক্ত মাছিতে—তদুপরি মাংসওয়ালার মুখের জর্দা পানের পিকে থিকথিকে ব্যাপার। একটু বেশি সময় সেদিকে তাকালে মাথা ঝিমঝিম করে। আমি তাকাই না।

মাংসের দোকানের লাগোয়া আর এক দোকান। রেশন-শপ। বুঝুন। কতবড় ভুখা মিছিল সেখানে দাঁড়িয়ে। আর খাই খাই রব। এসবের পাশে শীতলের ছিমছাম পরিচ্ছন্ন ঘড়ির দোকান আমার কাছে স্বর্গপুরী।

মাংসের দোকান, রেশন-শপ বা ডাক্তারখানা সারাদিন খোলা থাকে না। তাদের কাজকারবার সকালে ও বিকালে। দুপুরে তালাবন্ধ থাকে। তখন ডাক্তারবাবুর দরজার সামনে ছাগল বসে ঝিমোয়। রেশন-শপের বারান্দায় ভিকিরি মেয়ে পা ছড়িয়ে কাঠের কাঁকুই দিয়ে চুল আঁচড়ায় ও উকুন মারে। মাংসের দোকানের সামনে রাজ্যের বেওয়ারিশ কুকুরের জটলা। দরজা বন্ধ থাকলে হবে কি—ভিতর থেকে বাসি রক্ত ও ছাল বাকলের পচাটে গন্ধ চমৎকার ভেসে আসছে তারা টের পায়।

ব্যতিক্রম শীতলের দোকান। সারাদিন খোলা থাকে। সেই সকাল আটটায় এসে শীতল দরজা খোলে। তারপর এক মনে এক জায়গায় বসে ঘড়ি সারায়। মধ্যমগ্রাম থেকে আসে শীতল। তার স্ত্রী ভোর রাত্রে উঠে গরম ভাত রেঁধে দেয়। দুদিনই শীতল কথাটা আমায় বলেছে। বাড়ি থেকে একেবারে চান সেরে ঝোল ভাত খেয়ে সে দোকানে চলে আসে।

বস্তুত শীতলকে দেখে এক এক সময় ভাবি। স্থৈর্য ধৈর্য নিষ্ঠা ও নিরবচ্ছিন্ন কর্মতৎপরতার প্রতিমূর্তি যেন। আটচল্লিশ বছর বয়স হল। মাথায় বেশ বড়সড় টাক। এবং ইদানীং শক্ত চওড়া কাঁধ দুটো একটু নরম হয়ে সামান্য ঝুঁকে পড়েছে। কতদিন তো মানুষটাকে দেখছি। কি আশ্চর্য নিরলস। বোঝা যায় নিজের কাজ সে কত ভালবাসে। সারাক্ষণ টেবিলটার ওপর ঝুঁকে আছে। এভাবে ঝুঁকে থেকে যখন ঘড়ির কলকব্জা নাড়াচাড়া করে তখন শীতলকে কেমন দেখায় একচক্ষু হরিণ। আসলে ও তাই। ডান চোখে একটা গাঢ় নীল কাচের ঠুলি পরে শীতল টুকটাক যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘড়ি সারায়। বাঁ-চোখটা তখন একেবারে বোজা থাকে। তখন পৃথিবীর অন্য কোনো কথা বা শব্দ বা দৃশ্যের দিকে তার চোখ কান নেই, মন নেই। সম্পূর্ণ বধির হয়ে যায় সে। অন্ধ হয়ে থাকে। শুনছি শেতলদা—সেদিন দরজার কাছে এসে কেউ বলছিল, মাথা পিছু রেশনের চাল আবার কিন্তু কমল। শীতল নিরুত্তর। এক কানে শুনল আর এক কান দিয়ে কথাটা বের করে দিল। একবার চোখ তুলে দেখল না কে তার সঙ্গে কথা বলছে। বা যদি কেউ এসে বলে, শীতলবাবু আজ কাগজে লিখেছে, বিকেলে বিদ্যুৎ বজ্রপাত সহ ঝড় বৃষ্টি হবে। তেমনি নির্বিকার উদাসীন থাকবে শীতল। হয়তো কথাটা কানেই তুলবে না। যেমন পরশু বিকেলে। ভোট দাও ভোট দাও চিৎকার করে রাস্তা কাঁপিয়ে এক দঙ্গল মানুষ চলে গেল। তখন ঘরে বাইরে রাস্তায় বারান্দায় এই দোকানে সেই দোকানে—যে যেখানে ছিল—অন্তত একবার ঘাড় ঘুরিয়ে বা গলা বাড়িয়ে অনেক দিন পর আবার নতুন করে ভোটের আওয়াজ তোলা মানুষগুলিকে দেখে নিল। অনেকে একবারের জায়গায় তিনবার দেখল। এবং অবাক কাণ্ড, কিছু মানুষ ওদের পিছু পিছু খানিকটা পথ এগিয়েও গেছে। দেখল না তাকাল না, নিজে আসন ছেড়ে একচুল নড়ল না একমাত্র মানুষ শীতল। সে তার জগতে ডুবে আছে। ঘড়ি নিয়ে নিমগ্ন।

ঘড়ির কাঁটা নির্ভুল নিয়মে এগিয়ে চলে। টিক টিক টিক। অন্তত যতক্ষণ দম থাকে। শীতলও তাই। কাজের সময় কোনোরকম শৈথিল্য অমনোযোগিতা—এক সেকেন্ডের ছেদ বিরতি সে সহ্য করে না। সেই যে বউ বাড়িতে গরম ঝোল ভাত খাইয়ে তাকে দম দিয়ে দেয়—যেন এই জিনিস অনেকক্ষণ ধরে চলে। ওই বউয়ের হাতের রান্না খাওয়ার জোরে শীতল সারাদিন কাজ করে যায়।

তা কি হয়! বললাম বটে। একবার অন্তত বেলা বারোটা সাড়ে বারোটা নাগাদ হাতের যন্ত্রপাতি গুটিয়ে রেখে টেবিল ছেড়ে শীতলকে উঠতে হয়। নীল ঠুলি চোখ থেকে সরিয়ে রাখে। তখন কিন্তু শীতল নিছক একটা নিয়মের ঘড়ি না। নম্রতায় মণ্ডিত একটি সুন্দর মানুষ। মিষ্টি অমায়িক কথাবার্তা। টেবিল থেকে সরে এসে আমার চোখে চোখ রেখে বলবে, আজ গরমটা বেশি। আমি হুঁ হাঁ করি। ঘাড় ঘুরিয়ে শীতল তখন বাইরের দিকে একবার তাকায়। রোদের ঝাঁজ লক্ষ করে। বা মেঘলা দিন থাকলে ঘাড়টা আর একটু বেঁকিয়ে আকাশের মেজাজ মর্জি দেখে নেয়। তারপর আমার দিকে আর একবার চোখ রেখে নরম গলায় বলে, দাদা একটু বসুন। আমি আসছি।

দোকানের ভিতরের দিকে একটা বাক্সের মতন ছোট খুপরি। শীতল সেখানে ঢুকে পড়ে। জায়গাটা অন্ধকার অন্ধকার। একটা জলের বালতি ও একটা কালো মাটির কুঁজো চোখে পড়ে। শীতলের লাল রঙের বাঁদিপোতা গামছাটা সেখানে একভাবে ঝুলতে দেখা যায়। ওদিকের তাকের ওপর থেকে শীতল একটা অ্যালুমিনিয়মের বাটি পেড়ে নেয়। বাটির মধ্যে চিঁড়ে ভিজানো থাকে অথবা জল দিয়ে তখন তখন চিঁড়েটা ভিজিয়ে নেয়। তার দুপুরের জল-খাবার। কস্মিনকালেও শীতল দোকানের খাবার মুখে তুলবে না। স্বাস্থ্যের নিয়ম-টিয়ম সম্পর্কে সে অতিমাত্রায় সচেতন। মাঝে মাঝে পাকা কলার গন্ধ আমার নাকে লাগে। চিঁড়ে কলা চিনি—উত্তম টিফিন। শীতল আমায় একদিন বলেওছিল। খাওয়া সেরে গামছায় মুখ হাত মুছে শীতল ফিরে আসে।—দাদা একটু চা হোক। আদর করে আমাকে একবার তখন সে বলবেই। আমি মাথা নাড়ি। বলি—এখন না। পরে। তুমি যখন খাবে।

অর্থাৎ বেলা তিনটে বাজতে আর একবার মিনিট দশেকের জন্যে ঘড়ি সারানোর কাজ বন্ধ রেখে শীতল চা খায়। আমার জন্যও চা আসে।

চা শেষ করে চোখে ঠুলি এঁটে সেই যে শীতল আবার টেবিলের ওপর ঝুঁকবে—রাত নটা। কোন্ দিক দিয়ে বিকেল হয় সন্ধ্যে হয় তার হুঁশ থাকে না। থাকে। অন্ধকার হব হব মুখে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে শীতল আলো জেলে দেয়। ঘড়ির কাজ বড় সূক্ষ্ম কাজ। আলো ছাড়া চলে না। অনেকদিন আমিও সুইচটা টিপে আলো জেলে দিই। তখন শীতল চোখে ঠুলি নিয়ে আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে মিষ্টি করে একটু হাসবে। কথা বলবে না। অর্থাৎ আলোটা জেলে দিলাম বলে হেসে আমাকে ধন্যবাদ জানাবে। দারুণ ভদ্র তো। সব সময় সে কিছু ঘড়ি হয়ে থাকে না।

ন'টা—কোনোদিন রাত দশটাও বাজে। এই জন্যই একটু আগে অ্যারাউন্ড-দি-ক্লক কথাটা উল্লেখ করেছি। যেন দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টা ঘড়ি মেরামত করতে পারলে শীতল সুখী। তা কি আর সম্ভব। রাত্রে তাকে বাড়ি ফিরতে হয়। কাঁটায় কাঁটায় দশটায় দোকান বন্ধ করে বেরিয়ে পড়তে না পারলে মধ্যমগ্রামের বাস ধরতে পারে না। কলকাতা আসার সময় শীতল ট্রেন ধরে। ফেরার সময় বাস। এইটেই নাকি তার সুবিধে। শীতল বলে। দুবারই ট্রেন নয় কেন বা দুবারই বাস নয় কেন, আমি চিন্তা করি। কারণ সকাল সাতটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে আটটার মধ্যে কলকাতায় এসে পৌঁছতে ট্রেনের মতন বাসও সে অনায়াসে ধরতে পারে। ভোর চারটে থেকে মধ্যমগ্রাম থেকে কলকাতার বাস ছাড়তে শুরু করে শুনেছি। আবার এদিকে রাত দশটা কেন, এগারোটায়ও ট্রেনে চেপে তার মধ্যমগ্রাম ফেরা যায়। কোনো অসুবিধে হয় না। তবে? কিন্তু এই নিয়ে কোনোদিন শীতলকে আমি প্রশ্ন করিনি। যার যেমন ভাল

লাগে। ব্যক্তিগত মানসিকতার ওপর এসব জিনিস নির্ভর করে। বাসে যাওয়া বা ট্রেনে আসা। হয়তো এমনও হতে পারে—শীতল একবেলা ট্রেন আর একবেলা বাসে চড়ার স্বাদ পেতে ভালবাসে। একদিনে দুবার ট্রেন-জার্নি কি দুবারই বাস-জার্নির একঘেয়েমি রুখতে এভাবে দুরকম যানে সে যাওয়া-আসা পছন্দ করে।

আমি কি করতাম। রোজ অফিসে যাবার সময় ডালোসীর ট্রাম ধরেছি। বিকেলে বাড়ি ফেরার সময় শ্যামপুকুরের বাস ধরেছি। যদি এই নিয়ে কেউ সেদিন প্রশ্ন করত, সঠিক উত্তর খুঁজতে আমাকে তিনবার ভাবতে হত।

যা বলছিলাম। শীতল মাথা গুঁজে কাজ করে। আমি চুপ করে বসে থাকি। তা মুখ বন্ধ রাখলেও আমার চোখের কাজ কিন্তু সমানে চলতে থাকে। আমি খুঁটিয়ে শীতলকে দেখি। তার মাথার টাক দিন দিন বড় হচ্ছে। শীতলের একটা কান ফুটো। নিশ্চয় তার মায়ের আগের সন্তানগুলি বাঁচত না। আঁতুড়ে মারা যেত। তাই জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে শীতলের কান ফুটো করে দেওয়া হয়। আদ্যি-কালের যেমন নিয়ম ছিল। তা হলে সন্তানকে আর পেঁচোয় ধরে না—বেঁচে যায়। এভাবে শীতলও বেঁচে গেছে। কল্পনা করি, যদি আঁতুড়ে মানুষটি শেষ হত, তবে আজকের মতন ঐ সবুজ রঙের লোহার চেয়ারটায় বসে চোখে নীল ঠুলি পরে এত মনোযোগ সহকারে ঘড়ি সারাত কে! শীতলের পিঠটা বেশ চওড়া। বোঝা যায় ভাল রকম চর্বি জমেছে গায়ে। আধ ময়লা গেঞ্জিটা আঁটো হয়ে লেগে আছে। পরনে পায়জামা। দোকানে এসে, এখন গরমকাল, শার্টটা খুলে পিছনের খুপরিতে তার লাল গামছার পাশে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখে। গেঞ্জি গায়ে কাজ করতে সে ভালবাসে। ঘাড়ের পিছন একটা জড়ুল। কে জানে জন্ম থেকে ওটা ওখানে আছে কিনা। অনেক সময় কিন্তু জড়ুল মনে হয় না। যেন একটা কালো ডাঁউস মাছি চুপ করে শীতলের ঘাড়ের ওপর বসে আছে। বলেছি বটে ডান চোখে ঠুলি আর বাঁ চোখ বুজে সে যখন ঘড়ি সারায় তখন তাকে এক চক্ষু হরিণের মতন দেখায়। আসলে কি তাই! মোটেই হরিণের মতন সরু লম্বাটে মুখের ডৌল নয় কিন্তু শীতলের। বরং বড়সড় চ্যাপ্টা গোলমতন মুখ। মাটির সরার মতন। নাকটাও মোটা। ডার্ক-ব্লু মনকুল পরা শীতলকে কিন্তু হঠাৎ কোনো ম্যাজিসিয়ান ভেবে আমার ভ্রম হয়। যেন ভাল ভাল ম্যাজিকের খেলা জানে সে! রংটা ফরসা। তার ওপর সারাক্ষণ ঘাড় গুঁজে কাজ করে বলে মুখটা কেমন লালচে রং ধরে থাকে। যে জন্য চেহারাটা আরও বেশি রহস্যময় ঠেকে। সত্যি কি তাই! শীতল বড়ো সাদাসিধে সরল মিঠে মেজাজের মানুষ। বলেছি, তার সঙ্গে কথা বললে বোঝা যায় কত সে কাছের লোক—আপনজন। কোনোরকম হেঁয়ালি লুকোচুরি কৃত্রিমতা বা রহস্য এই মানুষের স্বভাবে থাকতে পারে কেউ বিশ্বাস করবে না।

এখানে একটা কথা বলি। শীতল নীরবে কাজ করে। আমার কিছু কাজ থাকে না। আমার শুধু চুপচাপ বসে থাকা। যখন তখন কথা বলে শীতলের কাজের ব্যাঘাত ঘটাব এমন অবিবেচক আমি নই। তা হলে শীতল আমায় পছন্দ করত না। কিন্তু চুপ করে দোকানে বসে আমি যে কেবল শীতল—শীতলের মাথার টাক, তার গায়ের চর্বি, আঁটো ময়লা গেঞ্জি কি ঘাড়ের জড়ুল দেখি তা নয়। তার দোকানের ঘড়িগুলিও দেখি। ঘড়ি দেখা মানে কি—কোন্ ঘড়ির কাঁটায় এখন ক'টা বাজে—কোন্ ঘড়ি দৌড়ে চলেছে, কোন্‌টা খুঁড়িয়ে চলছে, কোনটা একেবারে চলছে না, ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চোখ বেঁকিয়ে সুজিয়ে আমি লক্ষ করি। বেশ মজা পাই। একটা খেলার মতন। ঘড়ি সারাইয়ের দোকানে সব ঘড়ির কাঁটা একভাবে চলে না বা সব কাঁটা এক সময়ে এক দাগে এসে পৌঁছোয় না। আগে পিছে চলবেই। না হলে আর সারাতে দেওয়া! ছ মাস আগে একটা ঘড়িতে দুটো বেজে সাত হয়েছিল। আজও ঐ ঘড়িতে দুটো বেজে সাত হয়ে আছে। দেড় বছর আগে একটা ঘড়িতে সাড়ে চারটে বেজেছিল। আজও কাঁটা দুটো চারটে ত্রিশের ঘরে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। এর মধ্যে একবার জাগে নি, একচুল নড়েনি। একটা ঘড়িতে ন' মাস আগে ন-টা বেজে দশ হয়েছিল— আজও সেই ঘড়িতে ন'টা বেজে দশ বাজছে। এখন মুশকিল কি—আপনি একদিন কাঁটায় কাঁটায় ন-টায় শীতলের দোকানে-এসে ঢুকলেন। দেখলেন কম করেও সেখানে এক ডজন ঘড়িতে ন-টা বেজে গেছে। কোনোটায় ঠিক ন'টা, কোনোটায় ন'টা দশ, আবার কোনোটায় ন'টা বেজে আট হতে চলল।

এর মধ্যে এখন কোন্ ঘড়িটা ঠিক তা আপনি কেমন করে বুঝবেন? না, দুটো সাত বাজিয়ে যে-ঘড়ি ছ মাস ধরে দেওয়ালে ঝুলছে বা যে-ঘড়ি চারটে ত্রিশ বেজে দেড় বছর শীতলের শো-কেস্-এ শুয়ে আছে সে সব ঘড়ি নিয়ে গোলমাল নেই। গোলমাল বাধাচ্ছে ন' মাস আগের ন'টা দশ বেজে থাকা ঘড়ি। কারণ দোকানে আরও দশটা ঘড়িতে এখন ন'টা, ন'টা আট অথবা ন-টা দশ বেজেছে। এই অবস্থায় কোন্ কোন্ ঘড়ি চলছে এবং কোনটা একদম চলছে না ঠিক করতে গিয়ে আপনি বিষম ধোঁকায় পড়বেন। যেমন একবার পুজোর সময় সস্ত্রীক কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের একটা শাড়ি-কাপড়ের দোকানে ঢুকে আমাকে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল। বিশাল দোকান। সারি সারি শো-কেস্, ঝকমকে পোশাক সব আলমারী চারদিকে। সেজেগুজে মহিলা তরুণীরা এসেছেন, কেনাকাটা করছেন। ঘুরে ঘুরে তাঁরা মনের মতন শাড়ি খুঁজছেন। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে কতজন দরদস্তুর করছেন। অথবা ইতিমধ্যে মনের মতন জিনিসটি পেয়ে অনেকে কেনাকাটা সেরেও ফেলেছেন। আবার মাঝপথে দুজন তিনজন করে দাঁড়িয়ে পড়ে গল্পসল্প করছেন, এ-ও দেখছিলাম। বা, দোকানের এ-ধারে ও-ধারে বড় বড় মিরর দাঁড় করানো—কেউ কেউ যেন শাড়ি কাপড় দেখার বদলে আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজেদের মুখ দেখে সময় কাটাচ্ছেন বেশি। তখন একবার কি যে দুর্বুদ্ধি মাথায় এসেছিল—গিন্নির কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিলাম, দূরে কোণায় ঐ যে মহিলাটি দাঁড়িয়ে তাঁর ভুরু জোড়ার তুলনা হয় না। গিন্নী চুপ। শুনলেন, কিছু বললেন না। [illegible] চেয়ে আর একবার পশ্চিম সারির শো-কেসগুলির দিকে তাকিয়ে

বাড়িয়ে বলেছিলাম—ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে মেয়েটি, তার নিটোল দীঘল গড়ন এখানকার সবাইকে কিন্তু হার মানিয়েছে। এত সুন্দর শরীরের মেয়ে আর একটিও নেই। এবার গিন্নী ভুরু কুঁচকে আমার ওপর রাগ করলেন এবং শেষ পর্যন্ত ফুলফুল করে হেসেও ফেললেন। বলিহারী তোমার চোখ—গিন্নী বললেন, আসল নকল মেয়েমানুষ তুমি আজও চিনতে পারলে না—শাড়ি কাপড়ের দোকান এটা। এখানে শাড়ি জামা পরিয়ে সাজিয়ে টাজিয়ে এদিক ওদিক ক'গাণ্ডা ডামি ওরা দাঁড় করিয়ে রেখেছে খেয়াল রাখ!

জব্দ আমি। এখন ঈর্ষাপরবশ হয়ে—না কি আমাকে ঠকাবার জন্য আসল মেয়েকে নকল বলে গিন্নী চালাতে চেয়েছিলেন—না কি সত্যি একটা ডামি—শাড়ি জুতো পরা পুতুলকে জ্যান্ত তরুণী বলে আমি সেদিন ভুল করেছিলাম ঠিক করতে না পেরে হাঁদারাম বনে গেলাম। আজও পরিষ্কার মনে আছে, দ্বিতীয়বার জব্দ হবার ভয়ে গিন্নীর কাছে দোকানের আর কোনো তরুণী বা মহিলার রূপের প্রশংসা করিনি। চুপ করে থেকে তাঁর কেনাকাটায় সাহায্য করেছি।

তাই বলি, হঠাৎ একটা ঘড়ির দোকানে ঢুকে আপনার এই অবস্থা হতে পারে কোনটা অচল কোনটা সচল ঘড়ি ধরতে পারবেন না। দু পাঁচ দশ মিনিট বা আধ ঘণ্টা আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। কেবল তাই না, 'কারেক্ট সময়' দেয় এমন একটা ঘড়ি আপনার সঙ্গে থাকতে হবে। তবেই কিছুক্ষণের মধ্যে আপনি বুঝতে পারবেন কোন্ ঘড়ি চলছে, কোন্‌টা খুঁড়িয়ে চলছে, কোনটা লাফিয়ে লাফিয়ে ক্রমে খোঁড়া হয়ে যাচ্ছে এবং কোন্ ঘড়ি কোনোদিনই চলে না।

আচ্ছা, ঘড়ি সারাইয়ের দোকানে এত ঘড়ি জমে থাকে কেন! শীতল কি একলা হাতে সব সারিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না? খুব পারে। একদিন আমার প্রশ্ন শুনে গম্ভীর হয়ে সে বলেছিল, একটা ঘড়ি সারিয়ে টারিয়ে সে ঠিক করে রাখল। দেখা গেল ছ মাস ন মাস যায়—বছর ঘোরে, ঘড়ির মালিক আর ঘড়ি ফিরিয়ে নিতে এল না। কারণ? আমার প্রশ্ন শুনে শীতল তৎক্ষণাৎ চোখ বুজে জবাব দিয়েছিল, হয়তো চোরাই ঘড়ি। চুরি করে এনে দোকানে সারাতে দিয়েছিল,—তারপর ধরা পড়বে ভয়ে মহাশয়টি এদিকে আর আসতে চাইল না। শুনে একটু হেসেছিলাম, তারপর গম্ভীর হয়ে বলেছিলাম, তবে কি তার দোকানের সবই চোরাই ঘড়ি। ওই যে রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলের কারুকাজ করা জাঁদরেল ক্লকটা আট বছর ধরে দেওয়ালে ঝুলছে—আঙুল দিয়ে দেখাই, টেবিলের ওপর চার চারটে টাইমপীস—শো-কেসের ঐ আধ ডজন লেডিজ ঘড়ি বা জানলার পাশে আলমারীর ভিতর...

আমি চুপ করে গেলাম। কেননা ইতিমধ্যে হাত তুলে শীতল আমাকে অভয় বাণী শোনাবার মতন করে বলতে আরম্ভ করল—গরীব দেশ, একটা ঘড়ি কিনব কিনব করে অনেকের সারাজীবন কেটে যায়। আবার বিগড়ে যাচ্ছে ঘড়ি দোকানে-সারাতে দিয়েও পরে তা ফিরিয়ে নিতে কতজনের আর এক জীবন কাটে। উপযুক্ত চার্জ দিয়ে সময় মতন অনেকেই ঘড়ি ফিরিয়ে নিতে আসে না। পারে না। ফলে দিনের পর দিন বছরের পর বছর দোকানে ঘড়ি পড়ে থাকে।

কথাটার যৌক্তিকতা আমি উড়িয়ে দিতে পারিনি। আর? আর কি কারণ থাকতে পারে এভাবে ঘড়ি জমে থাকার! বিচিত্র সব কারণ। শীতল এবার খানিকটা হালকা গলায় কথা বলছিল। ঘড়ি চশমা পেন সেতার রেডিও দোকানে সারাই করতে দিয়ে মানুষ নানা কারণে আর সেসব ফিরিয়ে নেয় না। যেমন বেলগাছের হাসপাতালে এক ভদ্রলোক অসুখ সারাতে বউকে ভর্তি করিয়ে দিয়ে তারপর কোনোদিন আর গিন্নীকে ফিরিয়ে নিতে এল না। বলে শীতল মুচকি হাসল। বুঝলাম এটা একটা চুটকি। আমিও হাসলাম। বলেছি ঘড়ির মেকানিক হলেও শীতল কিছু মেশিন নয়। কাজের ফাঁকে কখনো সখনো এক আধটু রসালাপ করতে তার ইচ্ছে করে বইকি। খুব কম যদিও। বছরে এক আধদিন।

যাক যা বলছি, শীতল যখন মাথা গুঁজে একটা ঘড়ি সারায় আমি তখন চুপ থেকে তার দোকানের আর দশটা ঘড়ি দেখি। যে ঘড়ি চলছে না সেই ঘড়ি নিয়ে আর মাথা ঘামাই না। যে ঘড়ি চলছে সেই ঘড়ির দিকে আমার সপ্রেম দৃষ্টি। আমি ঘড়ি ভালবাসি। আমার মনে হয় কি, ঘড়ির কাঁটা ঘোরার সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কিছুর ঘোরার তুলনা হয় না। স্থির নির্ধারিত পরিমিত, ভয়ানক মেপে জোখে তার পা ফেলা—তাড়াহুড়ো নেই—অসামান্য শিষ্টতা নিয়ে দুটো কাঁটা টিক টিক করে ঘুরছে। বা যেন দুটি সরলা কিশোরী—ছিপছিপে গড়ন ছিমছাম কাঁটা দুটোকে ওই-রকম কিছু কল্পনা করে আমি তৃপ্তি পাই। যেন হাতের ভাঙ্গা খোলামকুচি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ওরা এক্কা দুক্কা খেলছে। মুখে শব্দ করছে কিত কিত কিত। লাফিয়ে ছ'ঘর নিচে নামছে. আবার ছোট ছোট লাফ দিয়ে ছ'ঘর ওপরে উঠছে। এভাবে বারোটা ঘর পার হয়ে তারা দিনের খেলা শেষ করে। তারপর রাতের খেলা শুরু হয়। কিত কিত কিত টিক টিক টিক। আবার বারোটা ঘর বারো ঘণ্টায় ডিঙোনো। খেলা শেষ হতে একটা সোনালি সকাল এসে যায়। চমৎকার।

শীতলের দোকানের উল্টোদিকে বনবন করে গমকলের চাকা ঘোরে। বেশিক্ষণ সেদিকে তাকান যায় না। মাথা ঘোরে। শীতলের দোকানের আর একদিকের জানালা ঘেঁষে একটা মস্ত বকুল গাছ। গাছের কাণ্ড ঘিরে একদঙ্গল কাঠ পিঁপড়ে অনবরত পাক খায়। কিন্তু কেমন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলে তারা। এবং তা-ও কত এলোমেলো অনিয়মিত। বৃষ্টি পড়লে পিঁপড়ের ঝাঁক পালিয়ে যায়। মেঘলা দিনে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা করে। ঝকমকে রোদ উঠলে আবার তারা গাছের বাকল বেয়ে বেয়ে চক্কর দেয়। তেমনি শীতলের মাথার ওপর পাখার ব্লেডগুলি। রুদ্ধশ্বাসে ঘুরছে। এই খোলা চোখে দেখা যায় কি! হাওয়ার মতন। তাকিয়ে থাকলে অস্বস্তি লাগে। দমবন্ধ হয়ে আসে। এখন গ্রীষ্ম। শীত আসুক। —[illegible] পাথর হয়ে পাখা গুলো ঝুলবে। তখন আর একচুল নড়বে না।

তাই বলি শিশুদের গতির মন্থরতা—বা ইলেকট্রিক পাখা ও দমকলের চাকার অতি ঘূর্ণি—দুটোই অস্বাভাবিক, অ্যাবনর্মাল। যে জন্য ঘড়ির ধবধবে দুধ রং ডায়ালের ওপর বেগুনি নীল ইস্পাতের কাঁটা দুটোর পরিক্রমণ এত মসৃণ সুরুচিপূর্ণ মনে হয়। আমি মাঝে মাঝে এ-ও কল্পনা করি—যেন দুধের পুকুরে দুই কুমারী গা ভাসিয়ে এলেবেলে সাঁতার কাটছে আর টুকটুক কথা বলে গল্প করছে।

বলা চলে বইকি—যন্ত্র যুগ, বেগের যুগ এটা। ঘড়ি বড় ঢিলেঢালা। কাজে তার ভয়ানক আলস্য। দমকল তো ভাল, শীতলের দোকানের সামনে দিয়ে সুবৃহৎ শরীর নিয়ে রোলা রং রোলা রং শব্দ করে জগত সংসার কাঁপিয়ে দমকল ছুটেছে। মনে হয় তার চেয়ে জরুরী কঠিন ভয়াবহ কাজ পৃথিবীতে আর কেউ করে না। মিথ্যা কি। আগুনের সঙ্গে যার যুদ্ধ। সেই তুলনায় ঘড়ি কি করে!

না, তা বললে চলবে কেন। আমি প্রতিবাদ করব। আকারে ঘড়ি যত তুচ্ছ হোক ক্ষুদ্র হোক— ঐ যে দমকলের মালিক তুষার পাণ্ডা মিনিটে মিনিটে দম পেবাইয়ের পয়সা গুণে ক্যাসবাক্সে তুলছে সে-ও হাতে ঘড়ি পরে বসে আছে। দমকল ছুটিয়ে যারা গেল তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে ঘড়ি। ঘড়ি ছাড়া কাজ হয় না। কিপ্রতার শুরুতে ঘড়ি—শেষেও ঘড়ি। ঐ যে আগুন নিবে গেছে। ঘড়ি ধরে পনেরো মিনিট প্রপাতের মতন হোজ পাইপের জল ছিটিয়ে সব ঠাণ্ডা করে দিয়ে রোলাং রোলাং ঢেঙাং ঢেঙাং শব্দ করে দমকল ফিরে যায়। কাজ শেষ করে আর এক সেকেণ্ড তার অপেক্ষা করার সাধ্য নেই। শুনেছি জাপানীরা ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে রেঙ্গুন শহরের ওপর উড়ে এসে বোমা ফেলে চলে যেত। এক সেকেণ্ড এদিক ওদিক হত না। ঘড়ি ধরে বাজি রেখে সাঁতারুরা ইংলিশ চ্যানেল পার হয়। ঘড়ির মতন মূল্যবান কিছু আছে নাকি। অ্যাটমিক ক্লক-এর নাম কে না শুনেছে। ঘড়ি সামনে রেখে হিউসটনের বিজ্ঞানীরা বোতাম টিপে আকাশে রকেট উড়িয়ে দেয়। অপারেশন থিয়েটারে ডাক্তার নার্সদের চোখের সামনে ঘড়ি থাকে, বাসরের কনের হাতে ঘড়ি। ঘড়ি এই সভ্যতার চুলের মুঠি ধরে বসে আছে।

এভাবে ঘাড় গুঁজে শীতল যখন একমনে ঘড়ি সারায়—তার দোকানে চুপচাপ বসে ঘড়ি দেখে দেখে আমি অনেক কিছু ভাবি। ভাবতে ভাবতে নানা আজগুবি চিন্তা মাথায় এসে ঢোকে। কথায় বলে না idle brain is the......

তবে শুনুন কাণ্ড। সেদিন ঝুপ করে লোড শেডিং হয়ে শীতলের মাথার ওপর পাখা থেমে গেল। মুহূর্তের মধ্যে কে যেন আমাদের কম্বল চাপা দিয়ে ধরল। শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল। গ্রীষ্মের খর মধ্যাহ্ন। কিন্তু আমার সতর্ক চোখ শীতলের দিকে। মোটা মানুষ দুর্দান্ত ঘামছে। গেঞ্জির নিচের ঘাম তখনও চোখে পড়ছিল না। গেঞ্জি ভিজে উঠলে ঘাম বোঝা যেত। আপাতত দেখছিলাম তার মাথার মসৃণ টাক জুড়ে আলপিনের আগার মতন ফুটি ফুটি অগুনতি ঘামের বিন্দু চাড়িয়ে উঠেছে। না, শীতলের টাকের ঘাম আমাকে বিচলিত করল না। উদ্ভট চিন্তাটা মাথায় ঢুকল তার ঘাড়ের ঘাম দেখে। কালো জড়ুলটা ঘিরে ইতিমধ্যে কয়েক শ' ঘামের ফোঁটা জমেছে। রোদ লাগা শিশিরের মতন বেশ ঝকমক করছিল ফোঁটাগুলি। কিন্তু আমার চিন্তা তখন কোন্ খাতে বইছে বুঝুন! আমার যেন মনে হল সেসব মোটেই ঘামের ফোঁটা নয়। যেন কয়েক শ' ছোট ছোট ঘড়ি। রিস্টওয়াচ। কয়েক শ' রিস্টওয়াচ যেন কেউ শীতলের ঘাড়ের ওপর সাজিয়ে রেখেছে। এত ছোট হাত-ঘড়ি হয় না? আমি বলছি হয়। মেয়েদের কবজির ঘড়ি এককালে ছোট হতে হতে তেঁতুলবীচির আকারে ধারণ করেছিল। লকেটের পাথর খুলে তাঁরা সেখানে ঘড়ি পরতে চাইতেন। শুনেছি অভিজাত ফরাসী মহিলারা আংটির পাথরের বদলে তাঁদের জুয়েলারকে দিয়ে মিনি ওয়াচ সেট্ করিয়ে নিতেন ফ্যাশানের কি মা বাপ আছে।

যাই হোক, আমার উদ্ভট কল্পনা তখন চরমে পোঁচেছে। শীতলের ডান হাতে সূক্ষ্ম শনের মতন একটা চিমটে। ওই দিয়ে একটা বিগড়ান ঘড়ির পেটের ভিতরের স্প্রীং হুইল জুয়েল লিভার ইত্যাদি টেনে টেনে বার করছে। তার কাজ সে বোঝে ভাল। ওস্তাদ ঘড়ি সারিয়ে, এই নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। আমি চিন্তা করছিলাম—যেহেতু তার বাঁ হাতটা ফ্রি—যদি এই মুহূর্তে পাখা বন্ধ থাকার দরুন গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে বাঁ-হাত দিয়ে শীতল তার ঘাড়ের জলমলে ঘামের ফোঁটাগুলি মুছে ফেলে। ঘামের ফোঁটা মুছবে কি—আমি যেন কল্পনা করছিলাম ঘাড়ের ওপর জমে ওঠা চকচকে ঘড়িগুলি শীতল ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা উৎকট ভয় আমার হৃৎপিণ্ড চেপে ধরল। কারণ দুশ্চিন্তাটা সেখানেই থেমে থাকল না। আমি দেখছিলাম তার ঘাড়ের জড়ুলের কাছে জমে থাকা কয়েক শ' রিস্টওয়াচ ভেঙে ফেলার পর শীতল চঞ্চল হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। কি রকম উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে তখন। চিরকালের ধীর স্থির ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ। উত্তেজনা কাকে বলে জানে না। কিন্তু এখন দেখলাম তার দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত। চোখ দুটো টকটকে লাল। স্ফীত নাসারন্ধ্র। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। এবং যা আশঙ্কা করছিলাম—ঝপ করে চেয়ার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়ায়। ধাক্কা লেগে লোহার চেয়ারটা শব্দ করে উল্টে মেঝেয় পড়ে যায়। আর শীতল, বলব কি, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, দু হাতে দেওয়ালের বড় বড় ক্লক টেনে নামিয়ে নিচে ছুঁড়ে ফেলছে। এত জোরে আঘাত করছে—এক একটা ঘড়ি ভেঙে খান খান হয়ে টুকরোগুলি মেঝেয় সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে। একটা একটা করে দেওয়ালের সব ঘড়ি সে ভাঙল। এবার শো-কেস-এর ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। কিলিয়ে কিলিয়ে রিস্টওয়াচগুলি ভাঙছে। ডায়ালের কাচ চুরমার হয়ে সূক্ষ্ম টুকরোগুলি তার হাতে বিঁধছে। ভ্রূক্ষেপ নেই। হাত কেটে রক্ত ঝরছে। শীতল থামছে না। ঐ যে লোকে বলে পাগলের গোঁ। এক নিশ্বাসে সে তার কাজ করে যাচ্ছে। তারা তারা? দেখতে দেখতে শীতলের মাথাটা যে এত খারাপ হয়ে যাবে কে জানত। শো-কেস-এর ঘড়ি শেষ করে আলমারির মাথার ওপর দাঁড় করান টাইমপীসগুলি এবার ধরল সে। সেসব আর মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলছে না। জানালা গলিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে দিচ্ছে। না, ঠিক এই মুহূর্তে তার মুখের দিকে কেউ তাকাতে পারত না। কপাল ও থুতনির চামড়া কুঁচকে গেছে। সৌম্য সুন্দর চেহারা মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে বিকৃত বীভৎস হয়ে গেছে। আমার রীতিমত ভয় করছিল শীতলকে দেখতে। চিন্তা করলাম, এভাবে একা একা একটা উন্মাদের সামনে বসে থাকা ঠিক না। একবার ভাবলাম ভিতরের দিকের অন্ধকার খুপরিটার মধ্যে ঢুকে পড়ি। শীতল যেখানে চিঁড়ে ভিজিয়ে কলা মেখে রোজ টিফিন খায়। একবার ভাবলাম রাস্তায় নেমে যাই। কিন্তু তক্ষনি রাস্তার দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠি। অনেক মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে সেখানে। শীতলের দোকানের দিকে সবাই তাকিয়ে। এদিকে আসতে কেউ সাহস পাচ্ছে না। বুঝলাম শীতল পাগল হয়ে গেছে—ইতিমধ্যেই কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আর শীতল, ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দোকানে আর ঘড়ি আছে কিনা হন্যে হয়ে খুঁজছে। একটা টেবিলের টানা খুলতে দুটো জেন্টস ওয়াচ ও তিনটে লেডিজ রিস্ট ওয়াচ বেরিয়ে পড়ল। দেখে শীতলের উল্লাস ধরে না। দাঁত ছড়িয়ে হাসছে। ঘড়িগুলি তক্ষনি মাটিতে রেখে জুতোর গোড়ালি দিয়ে ঠুকতে আরম্ভ করল। মুড় মুড় করে এক-একটা ঘড়ি ভাঙে আর তাই দেখে রাস্তার লোক হেসে বাঁচে না। আমার দু কান গরম হয়ে যায়, মুখটা লাল হয়ে ওঠে। শীতল পাগল হয়ে গেছে, এই জন্য কি লোকের এত আনন্দ? দুঃখে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছিল। স্বাভাবিক। আমি শীতলের নিত্যসঙ্গী। সর্বদা তার দোকানে এসে বসে থাকি। তার সম্মান অসম্মান গৌরব অগৌরব আমাকেই তো পাবে। শীতল এখন অপ্রকৃতিস্থ। বুঝতে পারছে না তাকে দেখে লোকে কেন হাসছে। যেমার হতাশায় আমার চোখ বুজে থাকতে ইচ্ছে করছিল।

কদ্দুর দুঃস্বপ্নটা যে কতদূর গড়াত! ঈশ্বর রক্ষা করলেন। ঝপ করে কারেন্ট এসে যায়। শীতলের মাথার ওপর পাখা ঘুরতে আরম্ভ করল। দেখতে দেখতে এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে তার টাকের ঘাম তো বটেই—ঘাড়ের জড়ুল ঘিরে ছোট ছোট ঘড়ির আকারের ঘামের ফোঁটাগুলি শুকিয়ে কর্পূরের মতন মিলিয়ে গেল। শীতল অবশ্য তখনও মাথা গুঁজে এক মনে কাজ করছে। তাকে নিয়ে যে এতক্ষণ এত সব কাণ্ড কারখানা হয়ে গেল বা হতে পারত, কিছুই সে টের পেল না জানল না। আমার হাসি পেল।

হুঁ, পাখা ঘুরতে আরম্ভ করল, আর এক সঙ্গে তার দোকানের চার পাঁচটা ওয়ালক্লক টং ঢং ঠং বং নানা আওয়াজ ধ্বনি করে তিনটে বাজিয়ে দিল। বেলা তিনটে। এত বড় দুপুরটা যে কোনদিক দিয়ে কাটল বুঝতে পারলাম না। এবার শীতল শনের মতন যন্ত্রটা হাত থেকে নামিয়ে রাখল। চোখের ঠুলি খুলে ফেলল ও আমার দিকে তাকাল।

—একটু চা হোক দাদা।

কাছ থেকে মাছটাকে এবার দেখল দাউদ। কাত হয়ে ভাসছে। চোখে দেখা বঁড়শির ক্ষত দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

শালার মত জোড়নে পড়িয়েছে। কুৎসিত জঙ্গুর মত দাউদের উল্লাস যেন পুরো ছেড়ে বেরিয়ে এল। বাপ্পান না থাকি কোনো শালাই বশ মানে না, তা সে মানুষই হোক আর মেয়েমানুষই হোক। দাউদ দম নেবার জন্য উপরে ভাসল। কিন্তু দম নিতে না নিতেই মাছের টানে ডুবে গেল দাউদ। আচমকা তার শ্বাসনালীর মধ্যে জল ঢুকে গেল। খক খক কাশল জলের মধ্যে। বুড়বুড়ি উঠল। আরও খানিকটা জল গেল পেটে। আরও অনেকগুলো বুড়বুড়ি উঠল। ভয় পেয়ে দাউদ জলের উপর ভেসে উঠতে চাইল। উঠলও। কিন্তু একটা খাবি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার তলিয়ে গেল। তার দু হাত থেকেই বঁড়শির দড়ি ছিটকে পড়ল। বঁড়শির একটা খুঁটো আর দড়ি আর তার পা এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছে যে সে কিছুতেই তা খুলতে পারছে না। তবু বঁড়শির দড়িটা হাতে থাকা মানে একটা ভরসা। কেননা তাতে সে মাছটাকে আঘাত হানতে পারছিল। মাছের শক্তিটাকে সে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল। এখন ক্রমাগত পায়ের উপর টান পড়ায় দাউদের পায়ের দিকটা মাছের দিকে এবং তার মাথাটা বিপরীত দিকে ঘুরে গেল। অসহায় সম্পূর্ণ অসহায় দাউদ মাছের টানে চরকির মত ঘুরপাক খেতে লাগল। এই সে চিত হয়ে ঘুরছে, এই সে কাত হচ্ছে, উপুড় হচ্ছে আবার চিত হচ্ছে। মাছটা তাকে ইচ্ছে মত চরকির পাক খাওয়াচ্ছে। বাতাস! দাউদের শ্বাস কষ্ট শুরু হল। বাতাস! আল্লাহ বাতাস! মাছটা খুব ঘোরাচ্ছে ওকে। বাতাস! খুব খেলাচ্ছে। আল্লাহ! উঃ! বাতাস, একটু বাতাস। দাউদের মাথাটা সীসার মত ভারি হয়ে উঠছে। বাতাস! নদীর তলদেশের দিকে ক্রমশ নেমে যেতে চাইছে। বাতাস! বাতাস! হঠাৎ মাছের টানটা একটু কমল। মাছই এখন ভেসে উঠতে চাইছে। শ্রান্ত ক্লান্ত দাউদ নিরিবিলি বৃত্তি করে না। কিন্তু ওদের আবহমান রক্তের অভিজ্ঞতা, ওদের আজন্ম সংস্কার দাউদকে জানিয়ে দিল যে তার দুষমনের দমও ফুরিয়ে এসেছে। এখন তাদের দুজনের মধ্যে যে আগে থামবে সেই মরবে। না, দাউদ মরবে না। সে মুসলমান। নিশ্চেষ্ট আত্মসমর্পণ তার ধাতে লেখা নেই। সে ঐ মাছের জেদই ভাঙবে। এবং এই চেষ্টায় যদি সে মরেও সে শহীদের দরজা পাবে। আল্লাহ! শেষ শক্তি সংগ্রহ করে সে দুটো ক্লান্ত ডানা দিয়ে জল সরিয়ে সরিয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগল। বাতাস বাতাস! পানির কালো পুরু ঢাকনাটা তার ডানার প্রতিটি ধাক্কায় একটু একটু করে রঙ বদলাচ্ছে। বাতাস! কালো থেকে গাঢ় নীল। বাতাস, বাতাস! দাউদের ডানা আর বুঝি পারে না। বাতাস বাতাস বাতাস! নীল ঢাকনাটাও রঙ বদলাচ্ছে। বাতাস বাতাস বাতাস বাতাস! দাউদের ডানায় চাপ ক্রমশ কমজোরি হয়ে আসছে। বাতাস বাতাস বাতাস! দাউদের নাক থেকে একটা দুটো করে বুড়বুড়ি বেরিয়ে ওর চোখের উপর দিয়ে উপরে উঠছে। একবার মুখ থেকে ভক্ করে একসঙ্গে অনেকটা বাতাস বেরিয়ে একটা জলের গোলাকে উপরে তুলে দিল। বাতাস বাতাস বাতাস! নীল ঢাকনা ফিকে নীল হয়ে উঠল। দাউদ তার ডানা দুটো আর বুঝি নাড়াতে পারে না। সে দেখল তার মাথায় পানির ছাদ পাতলা হয়ে আসছে। উপরে ঝিলিঝিলি খেল শুরু হয়েছে। বাতাস বাতাস! দাউদ আল্লার দিকে তার চোখ দুটোকে মেলে ধরে আছে। এবং দেখছে আল্লা তার দিকে কচুরি পানার গুচ্ছকে ঝুলিয়ে রেখে ইশারা দিচ্ছেন আয় বান্দা নিজের হিম্মতে উঠে আয়। ঐ কচুরিপানার পাতার উপরেই খেলে বেড়াচ্ছে সেই প্রার্থনা আশীর্বাদ, বাতাস, যা তুই চাইছিস আমার কাছে। ওঠ বান্দা ওঠ। নিজের হিম্মতে ওঠ। তার নিরাশ প্রাণে এই বার্তা প্রচণ্ড উৎসাহের সঞ্চার করল। এবং আল্লার হেদায়েত সে প্রাণপণে অনুসরণ করল। এবং পরক্ষণেই ক্লান্ত একখানা মুখ এক চাপড়া কচুরিপানাকে ঠেলে সরিয়ে নদীর ঝিকিমিকিনে একটা দুপোঙ্গী পাঁচিল যেন হয়ে ফুটিয়ে করে ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দাউদের উপোসী ফুসফুস তাজা বাতাসে ভরে গেল। বার কয়েক টানা নিঃশ্বাস নিল। তার হাতে পায়ে জোর ফিরে এল। ইয়া আল্লাহ, ইয়া রহমান, ইয়া পরওয়ারদিগার রহিম! দাউদ চিত সাঁতার দিতে দিতে কেঁপে কেঁপে দেখল, ভাসতে ভাসতে সে ওপারের দহের মুখে, তুলতুলে জলে যেখানে চারদিকে আর ধরা মাছ ধরার জন্য জানাল জাল পেতে রেখেছে, না পেতে রাখেনি, জালটা তুলেই রেখে দিয়েছে, সেই জালের একেবারে গোড়ায় এসে পড়েছে। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক তাড়নায় সে খপ করে একটা বাঁশ চেপে ধরল। এতক্ষণে সে একটা শক্ত আশ্রয় পেল। তারপর চোখ বুজে চিত হয়ে ভেসে কেবল হাঁপাতে লাগল। আর আশ্চর্য, গেঁজি হয়ে থাকা কুৎসিত মুখখানা তার চোখে ভেসে উঠল। তেজ, তেজ! ওর তেজ ভাঙবার কত চেষ্টা করেছে দাউদ। কিন্তু কিছুমাত্র পারেনি।

হঠাৎ ওর পায়ের দড়িতে টান লাগল এবং ওর মনে পড়ল বঁড়শির দড়ি যেমন মাছটার গলায় গাঁথা তেমনি তার আরেকটা দিক ওর পায়েও জড়ানো। এবং দুজনের নাড়িবাঁই এক সুতোয় গাঁথা। যে আগে হাল ছেড়ে দেবে তার মৃত্যুই এগিয়ে আসবে। দাউদ সতর্ক হল। তার দুষমন এখনও তেজ দেখাচ্ছে। অবিশ্যি ভাসাল জালের পোক্ত খুঁটি এখন তার হাতের মুঠোয়। এটা তার পক্ষে একটা বড় ভরসা। এবং দাউদ জানে মাছটার সাধ্য হবে না, তাকে এই আশ্রয় থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। কেননা, কোনও মাছ যখন কাত হয়ে ভেসে ওঠে তখন বুঝতে হবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে দাউদের বিপদ কেটেছে। মাছ যতক্ষণ জলে ততক্ষণ দাউদ নিরাপদ নয়। তবে ভাসাল জালের শক্তপোক্ত বাঁশের খুঁটি হাতের মুঠোয় আসার পর থেকে সে একটু ভাববার অবকাশ পাচ্ছে এই যা। এতক্ষণ প্রাণ রাখতেই তার প্রাণান্ত হবার জো হয়েছিল। আল্লার দয়ায় তার জানটা এখনও আছে।

এবার কী করা? দাউদ ভাবল। আশু ভয় এবং উত্তেজনা দূর হওয়ায় সে এখন ঠাণ্ডা মাথায় বেশ ভাবতে পারছে। তার প্রথম কাজ পা থেকে বঁড়শির দড়িটা ছাড়িয়ে নেওয়া এবং দ্বিতীয় কাজ মাছটাকে ডাঙায় তোলা। যদিও সে রহমান নিকিরির ছাওয়াল, তবু মাছ ধরাটা তার ধাতে তেমন সয় না। ছোট বয়সে ইশকুল পালিয়ে সে যখন বাড়িতে এসে বসে থাকত, তখন দু একদিন বাপের সঙ্গে জাল বাইতে গিয়েছে বটে, কিন্তু ঝঞ্ঝাট ঝামেলার বহর দেখে আর এ-মুখো হয়নি। নিজের হাতে এই তার প্রথম মাছ মারা। অবিশ্যি মাছ মারা কথাটা ঠিক নয়। সে তো এই মাছটা মারতে চায়নি। মাছটাই [illegible] পড়ল তার সঙ্গে। দাউদকেই সে জড়িয়ে ফেলেছে, এটা বলাই ঠিক। তার জীবন বিপন্ন করে তুলেছিল শালা। তাকে প্রায় জানে মেরে ফেলেছিল আর কী? এখনও তার বিপদ কাটেনি। কে জানে মাছটা ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছে কিনা। তাকে অসতর্ক, অন্যমনস্ক করে তুলে সে তার শয়তানি হাছিল করবে কিনা, সেই মতলবেই চুপ করে পড়ে আছে কিনা তাই বা কে জানে? অতএব দাউদকেও হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে। আপাতত তার সমস্যা, পায়ের দড়িটা বের করে ফেলা।

দাউদ যতটা পারে দম নিয়ে খুঁটি ধরে ডুব দিল। এখানে জল বেশ পরিষ্কার। বেশ খানিকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়। তার মনে হল বঁড়শি-গাঁথা মাছটা দহের ঢালের কাছে পড়ে আছে। নড়ছে চড়ছে না। এটা ভাল। সে সন্তর্পণে তার বাঁ পায়ের দিকে এগিয়ে গেল। ডান পাটাকে টেনে এনে খুঁটিতে একটা প্যাঁচ দিল। তারপর মুখটাকে যতটা পারা যায় বাঁ পায়ের কাছে নিয়ে গেল। দড়িটা একটা ফাঁসের মত তার পাটাকে পেঁচিয়ে বঁড়শির উপড়ে-আসা একটা খুঁটোর সঙ্গে গিঁট বাঁধিয়ে দিয়েছে। বুঝল কাজটা সোজা নয়। যা হয়ে আছে তাতে হয় তোমাকে ছুরি দিয়ে দড়ি কেটে গিঁট খুলতে হবে, আর না হয় দড়িটা ঢিলে দিয়ে তার ফাঁসটা একটু একটু করে আলগা করে, বড় করে এনে তার ভিতর দিয়ে পাটাকে বের করে আনতে হবে। তার কাছে ছুরি নেই, অতএব দড়ি কাটার প্রশ্নই ওঠে না। এখন একমাত্র পথ, দড়ির ফাঁস বড় করে এনে পা বের করে ফেলা।

ভুস করে ভেসে উঠল দাউদ। একটু জিরিয়ে নিল। আবার ডুব মারল খুঁটি ধরে।

নেই তো? সে দড়িতে একটা টান দিল। অমনি মাছটা একেবারে ওর পিঠের কাছে ঝপাং করে লাফিয়ে উঠল। ভাসাল জালের আড়া বাঁশে গতর করে আছড়ে পড়ল মাছটা। বাঁশগুলো সব মড় মড় করে উঠল। ঐ এক লাফেই দাউদের বাঁ পাখানা ছিঁড়ে যেন বেরিয়ে যাবার উপক্রম হল। ওর হাতও খুঁটি ছেড়ে বেরিয়ে যেত। নিতান্ত সতর্ক ছিল তাই বেঁচে গেল। দড়ির ঘসটানিতে পায়ের ছাল উঠেছে বোধ হয়। জ্বলছে। মাছটা আবার লাফ দিল। কিন্তু বিশেষ তেমন লাফাতে পারল না এবার। তার মানে ওর শক্তিও ফুরিয়ে এসেছে। দাউদ খুশি হল।

খুঁটি বেয়ে উপরে উঠে নিঃশ্বাস নিল দাউদ। তারপরেই দাঁতে দাঁত ঘষে গাল দিয়ে উঠল, "সুমুন্দির মাছ। সুমুন্দির মাছ। আজ তুমার একদিন কি আমার একদিন।"

কিন্তু এখন কী করা? পাড়ায়ে বের ক'রে আনি কী করে? চেঁচাব? লোক ডাকব? একজন কারো সাহায্য পেলেই সে বেরিয়ে আসতে পারে। সেই ভালো। চিৎকার দেবার কথা মনে হতেই ফুটকির জেদী মুখখানা চোখের উপর ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন ওর গলাটা টিপে চিৎকার করা থামিয়ে দিল। ফুটকির অবজ্ঞাভরা চোখের দৃষ্টি, যে দৃষ্টির সামনে দাউদ কেমন কুঁকড়ে যায়, ছোট হয়ে যায়, দাউদের চোখে এখন সেই দৃষ্টিটা ভেসে উঠল। বিবির গায়ে হাত তুলার ব্যাপারে মিঞা ছাহেবের তো দেখি সাহসের আর সীমে থাকে না। আর একটা পুঁটি মাছের কামড় খাতি না খাতি মিঞার বাবাগো বাঁচাও গো ডাকে দেখি গিরাম ফাটে যায়। মন্দ বটে। ফুটকির বোবা চাহনীটাই যেন কথাগুলো উগরে দিল।

দাউদ ক্ষিপ্ত হয়ে একটা শান্ত মুখশ্রীকে উদ্দেশ করে দাঁত কিড়মিড় করে বলে উঠল, শালী জাত-মারানী, এখেনে আয়, আ'সে দেখে যা, মাছটা কী? কিন্তু এটাও ঠিক, দাউদ ভেবে দেখল, এর পর সাহায্যের জন্য আর চেঁচান যায় না। সম্ভব নয়। অন্তত দাউদের পক্ষে সেটা আর সম্ভব নয়। তাহলে খাড়-ত্যাড়া বিবিটারই জিত হয়ে যাবে। একটা মাছ মারতে গিয়ে নিকিরির জোয়ান ছেলে বাপুরে মাগো বাঁচাও রে করে চেঁচিয়েছে, অন্যেরা সাহায্য করতে ছুটে এসে দেখবে বাঘ নয়, ভালুক নয়, একটা মাছের হাত থেকে তারা তাকে বাঁচাতে এসেছে। তারপর গল্প রটবে গ্রামে। কথাটা ফুটকির কানেও উঠবে। একটা কথাও ফুটকি বলবে না। বলে না। কেমন অদ্ভুত এক ঠান্ডা চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। আর তার নিজেকে ছোট মনে হতে থাকে। তার বিবির সামনে ক্রমশ কেমন ছোট হয়ে যায়। তার ধারণা তার বিবি তার সমস্ত রকম পাপ কাজের সব খবর রাখে। কিন্তু কিছু বলে না। দাউদ যেন তার খছম নয়, তার গুলাম। অতএব গুলাম যদি মোকামে গিয়ে মেয়েমানুষ রাখে, নেশা করে, তাতে তার যেন কিছু আসে যায় না। দাউদ আর ফুটকি অর্থাৎ নাজমা বেগম যেন এক স্তরের লোকই নয়! এই রকম সময় বেশ অসহায় বোধ করতে থাকে দাউদ। তার নীচে থেকে মাটি সরে যায় যেন। তার সত্যিই মনে হতে থাকে এই মহীয়সী বেগম ছাহেবার খছম সে নয়, সে তার গোলাম, গোলাম, গোলাম। এই সময় তার রক্তে প্রচণ্ড রাগের তুফান ওঠে। অ্যাত ঠ্যাকার তোর কিসির? পাখায় বাঁট দিয়ে কয়েক ঘা কষিয়ে দাউদ রাগে গসগস করে। কেন এই সব সময় তার বিবি কথা বলে না? কান্নাকাটা করে না? আরও পেটায়। ঝগড়া করে না? রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যায় না? দাউদ তার বিবিকে আরও মারে, আরও মারে। আত্মরক্ষার চেষ্টা পর্যন্ত করে না ফুটকি। কেন? শুধু ঘাড় ত্যাড়া করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। আর অদ্ভুতভাবে চুপ করে চেয়ে থাকে। সান্ত্বনা একেবারে দেয় না। হারামজাদী!

যেমন দিচ্ছে না এই মাছটা। হারামজাদী! খপ্ করে ওর মাথায় রাগ উঠে গেল। চুপ করে আছে মাছটা। সুমুন্দির মাছ। তুমার আজ জান নেবো। এদিকে ওদিকে চাইতে লাগল দাউদ। হঠাৎ দেখে বড়শির অন্য খুঁটোটা একটু দূরেই ভাসছে। ভাসাল জালের ভে-বাঁশের কাঠামোটার একেবারে গোড়ায় শালার মাছ! দাউদ সন্তর্পণে তার আগের, আড়া খুঁটিটা ছেড়ে, আড়াআড়ি লম্বা বাঁশটাকে বেশ জড়িয়ে করে দুহাতে চেপে ধরল। শয়তান মাছটা যেন এরই অপেক্ষায় ছিল। জোরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল। কিন্তু দাউদকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারল না। এমন কিছু একটা ঘটবে এটা তার হিসেবেই ছিল। তাই আড়-করা বাঁশটাকে সে প্রাণপণে দুহাতে চেপে ধরে মাছের এই আক্রমণটা ব্যর্থ করে দিল। ওর পায়ের ক্ষতে দড়িটা আবার ঘষটে গেল। পায়ের ব্যথা ওর মগজে গিয়ে ঘা দিল। আহত জন্তুর মত যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চিপে সে বলে উঠল, "সুমুন্দির মাছ! তোর মায় জাত মারি।"

মাছটা আর কোনও সাড়া দিল না। দাউদ এখন সম্পূর্ণ এক খুনী। তার আর কোনও রকম উত্তেজনা নেই। শরীরে কোনও রকম যন্ত্রণাও সে আর বোধ করছে না। তার মনে এখন শুধু একটা শীতল এবং সুদৃঢ় এবং একমুখী প্রতিজ্ঞা : শালার মাছ! তুমার আমি জান নেবো। দাউদের মনে দয়া মায়া কান্ডা কান্ড জ্ঞান এখন আর কিছুই নেই। ওর যখন এই রকম অবস্থা আসে, কোণঠাসা হয়ে না পড়লে অবশ্য আসে না, দাউদ তখন সম্পূর্ণ একটা অন্য মানুষ হয়ে ওঠে। একটা নির্দয় নিষ্ঠুর দুঃসাহসী খুনে যেন ওর ঘাড়ে এসে ভর করে। শালার মাছ!

দাউদ মাথাটা ঠাণ্ডা রেখে আড়-বাঁশটাকে দুহাতে চেপে ধরে সরীসৃপের মত তার উপর বুক ঠেকিয়ে একটু এগোলো। তারপর কিছুক্ষণ বাঁশটার উপর চুপ করে শুয়ে থাকল। মাছটা সাড়া দিল না। দাউদ আর একটু এগোলো। আবার থেমে পড়ল। বড়শির খুঁটোটা এখনও নিশ্চল। তার মানে মাছটা এখনও নিশ্চুপ। দাউদ আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। এখানে বাঁশের গায়ে হড়হড়ে শ্যাওলা। খুব পিছল। দাউদ জানে এখন যদি মাছটা ঘাই মারে তবে আর রক্ষে নেই। এই পিছল বাঁশটা ধরে সে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। ছিটকে বেরিয়ে যাবে অগাধ জলে। মাছের অধীনে গিয়ে পড়বে। তা সত্ত্বেও একটুও তাড়াহুড়ো করছে না। কী করছে না করছে দাউদ জানে না। কারণ তার আত্মরক্ষার ব্যাপারটা এখন আর তার হাতে নেই। যে সহজাত সংস্কার স্নায়ুমণ্ডলীকে আপনাআপনি নিয়ন্ত্রণ ক'রে প্রাণীদের রক্ষা করে, সেই সংস্কারই এখন দাউদকে চালনা করছে। দাউদ পিছল জায়গাটা নির্বিঘ্নে পেরিয়ে গেল। আর একটু। বুক ঘষটে এগিয়ে গেল। বাঁশের গিঁটে খোঁচা লেগে দাউদের বুক ছড়ে গেল। আর সামান্য একটু এগোলো দাউদ তারপরই বড়শির খুঁটোটা বিদ্যুৎবেগে জল থেকে তুলে নিয়ে বাঁশের গায়ে জড়িয়ে নিল এবং খুঁটোটা শক্ত হাতে ধরে রাখল। শালার মাছ! বিরাট জোরে লাফ মেরে জল থেকে শূন্যে উঠে মাছটা আবার ধপাস করে আছাড় খেয়ে জলে পড়ল। ওর ঝাঁপাঝাঁপির চোটে ভাসাল জালের কাঠামোটা মট মট করে উঠল। থরথর করে কাঁপতে লাগল। লাফ লাফ লাফ। মাছটা অনবরত লাফ দিচ্ছে। এবং প্রতিটি লাফ দাউদের বাঁ পাটাকে জখম করে দিচ্ছে। কিন্তু দাউদের ভ্রূক্ষেপ নেই। চাটমোহরের মোকামে তার রসের ভাবী দুলি বিবির কথা মনে পড়ল। তার ইয়ার মোকছেদের বিবি। খুব ছিনালপানা করত। দাউদের এখন উঠতি বৈবন। মেয়েমানুষকে ভালো করে চেনেনি। কোন্‌টা যে ওদের মনের কথা আর কোন্‌টাই বা মুখের, কখনও ভালো করে বুঝতে শেখেনি। সেই দুলিবিবি, একবার ওর খছম যখন বাইরে, ওকে বাড়িতে দাওয়াত দিয়েছিল, বলেছিল একা বাড়িতে মেয়েছেলে সে, তার থাকতে বড় ভয় করে। আরও কত সোহাগের কথা, রসের কথা বলেছিল দুলিভাবি। সে বাচ্চা ছেলে তার মুখে দুধের গন্ধ, বলে তার গাল টিপে দিয়েছিল। এ-সব ইয়ার্কি তার ঠিক সহ্য হচ্ছিল না। দুলি বিবি তার বন্ধুর বিবি। এ ভাল না। আরও কত রকম সোহাগীই করছিল। ভয় পেয়ে গিয়েছিল দাউদ। তার অস্বস্তি লাগছিল। খোদা মালুম, সে চলে আসতে চাইছিল। কেন না, সে জেনাকার হতে চায় না। খবরদার ভাই মোহসেন! তার চাচার বাড়িতে আলেম মৌলভীরা এসে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। এক মৌলভীর সতর্ক বাণী তার হয়ে পড়েছিল, খবরদার ভাই মোহসেন। কখনও কাহারও বাড়িতে উপস্থিত হইয়া কেউ মেয়ের ইজ্জতের হানি করিবে না। কোনো স্ত্রীলোকের দিকে দৃষ্টি দিবে না ও জেনাকারীর পথ খুঁজিয়া লইবে না। একেবারে বালক বয়স থেকেই সে এইসব আদেশের কথা শুনে আসছে।

সে এও জানে যে, কেয়ামতের দিন জেনাকারের ন্যায় কঠিন আজাব আর কাহারও হইবে না। এবং সে আজাব বা শাস্তি যে কী ভীষণ তাও তার অজানা নয়। যে রমণী ও পুরুষ ইহকালে জেনাকার্য করিবে, কেয়ামতের অর্থাৎ শেষ বিচারের দিনে সেই পাপী পুরুষের জন্য এক অগ্নিময়ী স্ত্রী এবং সেই পাপিষ্ঠা রমণীর জন্য এক অগ্নিময় পুরুষ সৃষ্টি করিয়া খোদা তায়ালা হুকুম করিবেন, যাও হে অগ্নি নির্মিত স্ত্রী ও পুরুষ! তোমাদের মাশুক ও মাশুকাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া লও ও তাহাদের সহিত জোরপূর্বক ছোহবৎ কর ও করাইয়া লও। ইহা শুনিবামাত্র উভয়েই ছুটিয়া যাইবে ও খোদাতায়ালার হুকুম অনুযায়ী অগ্নিময় পুরুষ জেনাকারিণী রমণীকে ও অগ্নিময়ী স্ত্রী জেনাকার পুরুষকে খুঁজিয়া পাইবে এবং জোরপূর্বক জেনা করিতে ও করাইতে থাকিবে। তখন অগ্নিনির্মিত সেই স্ত্রী ও পুরুষের এতই তাপ হইবে যে, ছোহবতের সঙ্গে সঙ্গে গরমের চোটে সেই পাপীদিগের নাড়িভুঁড়ি এবং নিকটস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জ্বলিয়া খাক হইয়া যাইবে, তথাপি প্রাণ বাহির হইবে না. তাহারা কেবল চিল্লাইতে থাকিবে এবং অগ্নি-নির্মিত সেই পুরুষ ও স্ত্রী বলিতে থাকিবে, এখন কেন চিৎকার করিতেছ? দুনিয়ায় যেমন কোনো স্ত্রী পুরুষের গলায় গলায় বুকে বুকে মিলিয়া ও মিলাইয়া মজা চিকিয়াছিলে ও চিকাইতেছিলে, এখনও তদ্রূপ মজা চিক আমাদের গলায় গলায় বুকে বুকে মিলিয়া মজা চিক না কেন বা চিকাও না কেন?

তোহ্‌বনাল্লাহ্‌! এখন সে যখন এক ক্ষুদ্র নদীর পানিতে, তার পায়ের সঙ্গে একটা বৃহৎ ও তেজী মাছের মুখে বেঁধা বড়শির দড়ি জড়ানো, আহত [illegible] সঙ্গে আত্মরক্ষার অবিশ্রান্ত সংগ্রামে ক্লান্ত, আশ্রয় শুধু একটা পিছল বাঁশ, নদীতীর জনশূন্য এবং মাথার উপরে উড্ডীন কয়েকটা ধৈর্যশীল ক্ষুধার্ত শকুন এবং সে আহত এবং নিস্তেজ, তখন, ঠিক সেই সময়েই, বা তার মনে তার প্রথম পাপের স্মৃতি এমনভাবে ভেসে উঠল কেন? তার হৃদয় কেঁপে গেল। আল্লাহ্‌, তুমি জানো, তুমি তো সব জানো সে দিনের কথা। দাউদ সেদিন চলে আসতে চাইছিল। দুলি ভাবীর ঐরকম নির্লজ্জ আচরণ দেখে, কেয়ামতের সেই ভীষণ দিনের কথা ভেবেই সে পালাতে চাইছিল। কিন্তু দেখ, কী রকম নছিব তার! শেষ পর্যন্ত সে জড়িয়ে পড়ল তাকে জড়িয়ে ফেলা হল। শালী! এই মাছটারই মতন। দুলি বিবির দিল্লাগী তখন এত দূর এগিয়ে গিয়েছে যে, সংযমের বেড়া ভেঙে দাউদের ভিতরের ক্ষুধার্ত বাঘটা দুলি বিবির উপর লাফিয়ে পড়ল। হঠাৎ আক্রমণে ভয় পেয়ে দুলি বিবি না না না না বলে ওকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিল। ওর ভারী বুকের তলায় চাপা পড়ে বেরিয়ে আসবার জন্য ওকে আঁচড়ে কামড়ে অস্থির করে তুলেছিল। কিন্তু দাউদকে ঠেকাতে পারেনি। নারীসঙ্গের সুতীব্র আস্বাদ পাওয়া বাঘ তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত দুলি বিবিকে রেহাই দেয় নি। সেদিনও এই রকম একটা শীতল সিদ্ধান্ত দুলি বিবির বজ্জাতি ভাঙতে তাকে সাহায্য করেছিল। হারামজাদী! ছিনাল বজ্জাত! এই মাছটাকে তার হঠাৎ দুলি বিবি বলে মনে হল। বজ্জাত! আগে একবার মাছটা তাকে ফুটকির কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছিল। ঘাড় ত্যাড়া! হঠাৎ মাছটাকে তার আবার কালোজিরে বলে মনে হয়। এই শালীও তাকে জড়িয়ে ফেলবে। প্যাঁচে ফেলবে, সে বিষয়ে তার সন্দেহ নেই।

মাছটা একটু দম নেবার জন্যই বোধ হয় চুপ হয়েছিল। তারপর আবার কয়েকটা ঘপাং ঘপাং ঘাই মারল। বাঁশগুলো মচ্‌মচ্‌ করতে লাগল। একটা গাঙ চিল ভাসাল জালের একেবারে উঁচু ডগায় বসে আর্ত স্বরে চিৎকার করছিল। বাঁশগুলো নড়ে উঠতেই উড়ে পালাল।

সুন্দরীদের মাছ! পাঁজরে ছিঁড়ে ফেলার মতলব করেছে।

দাউদ বড়শির খুঁটোটা সেই পিছনে বাঁশে বেশ করে জড়িয়ে নিল। শক্ত করে বাঁধল তারপর দড়ি ধরে মারল হ্যাঁচকা টান। বড়শি-গাঁথা মাছের মাথাটা এবার খানিকটা এগিয়ে এল ভাসাল জালের আড়া বাঁশটার কাছে। মাছটা খুব আছাড়ি পিছাড়ি করছে। বড়শিটা গলা থেকে খুলে ফেলার জন্য পাগলের মত মাথা আর লেজ আছড়াচ্ছে। যেমন করেছিল দুলি বিবি ওর বুকের তলায় চাপা পড়ে। খালি তাকে বুকের উপর থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা। হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারছিল। উল্টে যাবার চেষ্টা করছিল। নখ দিয়ে মুখ আঁচড়ে দিয়েছিল। দাউদ দুহাত দিয়ে দুলির সেই সরু সরু নরম নরম হিংস্র হাত দুটোকে যেন মেঝের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছিল। হাতে কামড়ে ধরেছিল দুলি। রক্ত বের করে দিয়েছিল। মাসে তুলে নেবারও চেষ্টা করছিল বোধ হয়। দুলির দাঁতের ফাঁকে আটকানো তার সেই হাতখানা দিয়েই দুলির মুখে এমন জোরে চাপ দিয়েছিল যে তার প্রায় দম বন্ধ হয়ে এসেছিল। ঠাণ্ডা গলায় দাউদ বলেছিল চুপ করে থাক। অ্যাতক্ষণ ধরে তাতায়ে তাতায়ে অ্যাখন ন্যাকরা হচ্ছে। ফের যদি নড়াচড়া করবি তো গলা টিপে মারে রাখে যাব। ডাকেই বা আনলে ক্যান্? শাগের খেতটা দ্যাখালেই বা ক্যান্? আবার অ্যাখনই বা তারে ঠেলে দেচ্ছ ক্যান্? জানো না হাভাতেরে শাগের খেত দ্যাখাতি নেই। বাঁচতি যদি চাউ, চুপ্ করে থাকো। শালীর সেদিন বশে আনতি দম বেরোয়ে গিছিল। দড়িটা বাঁশের সঙ্গে বাঁধতে বাঁধতে নিজের মনেই বলল দাউদ। মাছের আছড়ানি এমন জোরে শুরু হয়েছিল যে বড়শির দড়ির আরেকটা মুড়ো যে সে বাঁশের গায়ে বেঁধে ফেলতে পারবে, এমন আশা করতে পারছিল না। দুলি বিবি, দুলি বিবি! ঐ হারামজাদীর মতই এই মাছটার নষ্টামি। দুলি যেমন তাকে ওর বুকের উপর থেকে ফেলে দেবার জন্য অনবরত কটকান দিচ্ছিল, এই মাছটাও তাকে এই বাঁশের উপর থেকে ফেলবার জন্য কত চেষ্টাই না করছে। শেষ পর্যন্ত মাছটাকে বাঁশের সঙ্গে শেষ শক্তি দিয়ে বেঁধে ফেলল দাউদ।

দুলিরেউ বশে আনিছিলাম। ইবার তোরেউ আনলাম।

উল্লাস ভরে মনের ভিতরে চেঁচিয়ে বলে উঠল দাউদ। যেন এটা মাছ নয়, অবাধ্য একটা মেয়েমানুষ। লোভ দেখিয়ে তাকে নাচিয়ে নাচিয়ে শেষে সরে পড়ার তালে ছিল, দাউদ তাকে চিত করে পেড়ে ফেলে বুক হাত আর হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে এবার তার তেজ ভাঙতে লেগেছে।

"তোর তেজ ভাঙব!" দাউদ বাঁশটার উপর বুক দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল। এবং কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে আবার হাঁফাতে লাগল। মাছ আর তার দূরত্ব এখন আর খুব বেশি নয়। মাছটা আর সে একই রকম শ্রান্ত। তার কেমন যেন ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু এখন ঘুমিয়ে পড়ার সময় নয়। মাছ এখনও জলে। মাছের দড়িটা থেকে তার পা-টাকে এখনও মুক্ত করতে পারেনি। দাউদ ভাসালের বাঁশে দেহের ভর ন্যস্ত করে হাঁফাতে লাগল। একটু পরে যখন খানিকটা বল ফিরে পেল, তখন নিজেকেই বলল, না আর দেরি নয়। পাঁজরে এখনই হাঙ্গামা হবে। নাহলে উদ্ধার আর কিছু থাকবে না।

দাউদ আবার ঘষটে ঘষটে সরে গেল সেই খাড়া খুঁটিটার কাছে। তার কলজের যতটা পারে বাতাস ভরে নিল। তারপর খুঁটিটা ধরে সড়সড় করে নেমে গেল জলের নিচে। তার পর বড়শির দড়িটা ধরল। মাছটা একটা ঘাই মারবার চেষ্টা করল। কিন্তু বাঁশের সঙ্গে সে তখন বাঁধা। মারে না, দুহাই তুমার আমারে জানে মারে না। দুলির ভয়ার্ত চোখ সেই জলের মধ্যে ভেসে উঠল। আমি চাঁচাবো না, আমারে জানে মারে না। তুমি যা কও আমি শোনবো। দাউদ বুকের চাপ আলগা করে দিয়ে বলেছিল, ন্যাও তালি খাড়ে ওঠো। দুধির ছাওয়াল রা কত দূর যাওয়াতি পার দেখি। দাউদ দড়িটাকে একটু টেনে ঢিলে করে আনল। মাছটা কিছু বলল না। পায়ের গোড়ালির উপরে যে ফাঁসটা পড়েছিল, আস্তে আস্তে সেটা বড় করতে লাগল। মাছটা কিছু বলল না। দাউদ ধীরে ধীরে একটু একটু করে ফাঁসটা আলগা করল তারপর অনায়াসে তার পা-টাকে দড়ির ফাঁস থেকে বের করে ফেলল। মাছটা কিছু বলল না। দুলি বিবি ওর কথা শুনে যেমনভাবে সুড়সুড় করে খাটে গিয়ে শুলো, তা দেখে তার মনে হল, শালী যেন মানুষই নয়, একটা কুত্তার বাচ্চা। বড়শির দড়ির সেই খুঁটোটা হাতে করে দাউদ আবার ভেসে উঠল। সেদিকের দড়িটাও বাঁশের সঙ্গে পেঁচিয়ে নিল। তারপর খাড়া খুঁটিটাকে পা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে হাত দুটো মুক্ত করে ফেলল। শালার মাছ! এইবার! আড়া বাঁশের গায়ে একটা প্যাঁচ দিয়ে সে এক হাত দিয়ে দড়ি ধরে আহতে এবং মুহুর্মুহু মাছটাকে টেনে আনতে লাগল আর একটা হাত দিয়ে দড়িটাকে বাঁশের গায়ে ক্রমশ পেঁচিয়ে ফেলতে লাগল। মাছটা এবার বাধ্য। বশীভূত। লক্ষ্মী মেয়ের মত এগিয়ে আসছে। বাধা দিচ্ছে না। তেজ দেখাচ্ছে না। দাউদ খানিকটা ঠাণ্ডা হল।

মাছ আর মেয়েমানুষ, শালীরা সব সমান। এতক্ষণে দাউদের মনটা হাল্কা হল। ওগের যা কিছু তেজ সন্ধ্যার মুখে। ঘাপাও বেশ করে, সব দ্যাখবা পুষা কুকুর। মাছটা এতক্ষণ টানে টানে বেশ এগুচ্ছিল। এবার লেজ বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। খানিকটা টানাটানি করে দাউদ বুঝল সুবিধে হবে না। উডা আবার নতুন নষ্টামি শুরু করিছে। বয়াল আর চিতল খুবই পাজি মাছ। লেজ বেঁকিয়ে এমনভাবে জল আটকে দাঁড়ায়, তখন কারও সাধ্য নেই তাদের টেনে আনে। এখন কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে তার ঠিক কী? যতটুকু মাছটাকে আনতে পেরেছে দাউদ, ঠিক সেখানেই তাকে বাঁশের সঙ্গে বাঁধল। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। তারপর আর একটু শক্তি ফিরে এলে দু হাতের ভর দিয়ে আড় বাঁশের উপর উঠে বসল। পাশের খাড়া বাঁশ ধরে ভারসাম্য বজায় রাখল। অনেকক্ষণ ধরে জলে পড়ে রয়েছে দাউদ। এতক্ষণ খেয়াল হয়নি। দেখল সমস্ত শরীরটা হেজে গিয়েছে। শীত করছে তার। চোখ দুটো জ্বালা করছে। বাঁ পাটা তুলতে কষ্ট হচ্ছিল। তুলল। এঃ! মনে হল কে যেন পায়ের গোছটা চিবিয়ে শেষ করে দিয়েছে। দড়ির ঘস্‌টানিতে চামড়া উঠে গিয়েছে। জল থেকে পা টা তুলতেই মনে হল যেন পায়ে কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। পা-টা তৎক্ষণাৎ জলে ডুবিয়ে দিল, কিন্তু জ্বলুনি কমল না। দাউদ এবার সত্যিই অস্থির হয়ে উঠল। খপ্ করে তার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সুন্দরীর মাছ! দাঁতে দাঁত ঘষল দাউদ। তারপর এপার ওপারটা দেখে নিল। তাদের গিরামের পারটা একটু দূরে, ওপারটা একটু কাছে। কোন্ পারে গিয়ে উঠবে সেটাই চিন্তা করে নিল। তারপর ঘাড় ফেরাতেই দেখল তার নৌকোটা একটু দূরে কচুরিপানার জঙ্গলে আটকে আছে। হিসেব করে দেখল, এপার ওপারের চাইতে, এখান থেকে নৌকোর দূরত্বটাই ওর কাছে কম। সে ঠিক করল নৌকোতে গিয়েই উঠতে। পারবে তো?

দাউদ সংশয়কে কচুরিপানার মত দুহাতে সরাতে সরাতে জলে নেমে পড়ল। যদিও তার ডানা দুটো শ্রান্ত এবং শরীর ক্ষত বিক্ষত, পায়ের যন্ত্রণায় প্রায় পাগল, তবু সে দৃঢ়ভাবে জল কেটে কেটে এগিয়ে চলল তার নৌকোটার দিকে। যেন প্রায় মৃত্যুর পরপার থেকে সে সারাজীবন ধরে সাঁতার দিতে দিতে এগিয়ে চলেছে পাকাপোক্ত একটা আশ্রয়ের সন্ধানে। যাতে হাত দেয় তাই ফসকে যায়। তবু সে হাল ছাড়েনি। সে তার নৌকোর টলমল আশ্রয়ে এসে উঠল। এবং নৌকোয় উঠেই খোলের মধ্যে অতিশ্রমে কাতর সে প্রায় জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল। এবং সঙ্গে সঙ্গে কুটকি ওর সামনে এসে মুখ গোঁজ করে দাঁড়াল। তার দুই গালে দুটো ছিপে বড়শি বেঁধা। মুখ তার রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু ঘাড় তার ত্যাড়া। নরম হবার কোনও লক্ষণ কোথাও নেই।

দাউদ চোখ বুঁজে শ্রান্তভাবে বিড় বিড় করতে লাগল, "তেজ তেজ তেজ! বিবি তুই আরো তেজ করে যাস।"

[illegible]।

ভারতের শিল্পকীর্তি

শৈলজ মুখোপাধ্যায় (১৯০৭-১৯৬০)

বাংলা ভাষায় আরভিং স্টোনের মতো লেখক নেই। তাই শৈলজ মুখোপাধ্যায়ের মতো অকৃতদার বোহেমীয় শিল্পীকে নিয়ে জনপ্রিয় উপন্যাসোপম জীবনীগ্রন্থ লেখা হলো না আজও। সামাজিক ভূমিকাচ্যুত শিল্পী প্রচলিত মূল্যবোধকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে, তিনি যে ভীষণরকম বেঁচে আছেন এটা প্রমাণ করেন। শৈলজ মুখোপাধ্যায়ও করেছিলেন। সেই কারণে শেষ জীবনে কষ্টও পেয়েছিলেন। সংক্ষিপ্ত পরিসরে সে বিষয়ে আলোচনা করা গেল না।

কলকাতায় জন্ম হলেও শৈশবের অনেকটাই কেটেছিল বর্ধমানে। ১৯২৮ সালে তিনি সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পাশ করে বেরিয়ে তিনি ইম্পেরিয়াল টোবাকো কোম্পানীর আর্ট ডিরেকটারের পদে যোগদান করেন। ১৯৩৭ সালে কলকাতায় তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনীর পর তিনি ইউরোপ পরিক্রমা করতে যান। ইউরোপের ক্যাথিড্রাল, যাদুঘর এবং চিত্রশালা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। পরে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য মিশর, সিকিম এবং তিব্বত পরিভ্রমণ করেন। যুদ্ধের সময় কলকাতায় সুন্দর কয়েকটি প্রদর্শনীর আয়োজনের পেছনে তাঁর সক্রিয় হাত ছিল। এরপর তিনি আরও কয়েকটি একক প্রদর্শনী করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি দিল্লিতে চলে যান। দিল্লিতে একাধিক প্রদর্শনী করেন। বারবার পুরস্কৃত হন। ১৯৫১ সালে প্যারিসের সালোঁ দ্য মে-তে তাঁর দুটি ছবি প্রদর্শিত হয়।

দিল্লিতে তিনি সারদা উকিল শিল্পকলায়তনে শিল্পকলা শেখাতেন। পরে তিনি দিল্লি পলিটেকনিকের শিল্পকলা বিভাগে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। দিল্লির মতো কলকাতায় আকাদমী অব ফাইন আর্টসে তাঁর একটি মরণোত্তর প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল ১৯৬২তে।

ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি তিরিশের দশকে পুরাতন ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় শিল্পীরা লোকায়নের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। পরবর্তী প্রজন্মের চিত্রকরবা ওয়াশ টেম্পেরার বেড়া টপকে সরাসরি তৈলচিত্র আঁকার দিকে ঝুঁকেছেন। পাশ্চাত্য প্রভাবের ঝুঁকি নেবার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় যুদ্ধ অর্থাৎ ক্যালকাটা গ্রুপের আবির্ভাব পর্যন্ত সময়টুকুর মধ্যে লোকায়নোত্তর পর্বের ছোটখাটো বিদ্রোহ বিস্ফোরণের কাল। সুতরাং অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল, যামিনী রায় এবং সমকালীন শিল্পধারার মধ্যে বিনোদবিহারী, রামকিংকর, রমেন চক্রবর্তী, ভবেশ সান্যাল এবং শৈলজ মুখোপাধ্যায় এক হিসাবে সেতুর কাজ করেন। এঁরা কেউই কিন্তু ইউরোপের প্রবাগত ঐতিহ্য সম্বন্ধে তেমনভাবে আগ্রহ দেখাননি। বরং ১৯শ এবং ২০শ শতকের শিল্প আন্দোলনকে পরিপাক করে দেশজ ধারার সঙ্গে মেশাবার দিকে ঝুঁকেছিলেন। এ কাজে তাঁদের সাফল্য সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

শৈলজ মুখোপাধ্যায়ের ছবি খুবই রোমান্টিক। হয়তো কখনো বা স্নিগ্ধ। নারী বা নিসর্গের মধ্যে কাব্যের ভাগটা বেশি। অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলালের জগতের খুব কাছের হয়েও খুবই দূরের। আসলে তাঁর মাধ্যম ওয়াশ বা টেম্পেরা নয়, কিন্তু তেলরং। সুতরাং ভিন্ন মাধ্যম বলে স্বাদটাও অন্য হয়েছে। রূপবন্ধের দিক দিয়ে বিচার করলে তাঁর কাজের সঙ্গে যামিনী রায়ের আত্মীয়তা আছে। যদিও শৈলজ মুখোপাধ্যায়ের রেখা অনেক বেশি অস্থির। বর্ণের ব্যাপারেও তাঁর বুনোটের ভেতর চাঞ্চল্য বেশি। প্রথম দিকে প্রকৃতি এবং সহজ গ্রাম্য নারীরা তাঁর পটে একটা বিশেষ অংশ থাকত। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে নারী ছিল স্বাভাবিকতার ব্যঞ্জনা। নিসর্গের বর্ণের সমারোহের মধ্যে রক্তমাংসের সহজ কিন্তু অসাধারণ উপস্থিতি। তাঁর গালে একটা আঙুল দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা 'তামাটে নারী' বা 'কাপড় কেচে শুকাতে দেবার দিন' বা 'মোষ' গ্রামীণ জীবনের ধুলোমাটিকে সহজভাবে ধরার চেষ্টা। এসব ছবিতে নিসর্গ শুধু পশ্চাদপট নয় কিন্তু পটের সম্মুখ-

ভাগ। তাঁর গাছপালা ঘরবাড়ি যেন রঙে রসে উপচে পড়ছে। ক্রান্তীয় বলয়ের সূর্যের উষ্ণতা, গা জুড়োনো হাওয়া, ঠাণ্ডা ছায়া সর্বদা উপস্থিত। শৈলজ শরীর উপস্থাপন করে দেখাতেন যেন সবকিছুই মাটিরই নানাভাবে সাকার হবার দুরন্ত বাসনা। আঁকাবাঁকা রেখা যেন অরূপকে রূপায়িত করছে। কী আশ্চর্য স্বাধীনতা নিয়েছেন রঙ চাপানোর ব্যাপারে। বুনোটের মজাই তাঁর ছবির বিশেষত্ব। রঙের প্রতি এই আসক্তির জন্যেই তিনি আদিবাসী রমণী, রাজপুতানী এবং ভিন্ন প্রদেশী মেয়ে এঁকেছেন, বাঙালী হয়েও বাঙালী মেয়েকে পটে স্থান দেননি। ভেতর থেকে শক্তি আর প্রবাহ উপচে উঠে ফেটে পড়ছে। প্রথমদিকের রচনাসৌকর্যের [illegible] অবশ্য শেষে অনেক [illegible] আর পরিণত হয়ে[illegible] 'অরণ্য' (১৯৬০) প্রভৃতি শে[illegible]দিকের ছবিতে বর্ণপ্রধান স্থান জু[illegible] আছে। বিশেষত সবুজ হলুদ ন[illegible]লের উল্লাসের অভিব্যক্তি বলা চ[illegible] তুলায় [illegible] ভেতর থেকে নি[illegible] পটে উজাড় করে [illegible] করার প্রচে[illegible] মতো।

'হা[illegible]' (৬০.৫×৫০.৫ সি এম)—ছবিতে দিগন্তজোড়া মাঠের পরিবেশ তৈরী করেছেন অল্প আয়াসে। হাওয়ার তোড়ে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে দুপাশের দুটি গাছ। বর্ষার পর মাঠের পাশে নীচু জায়গা জলে থই থই করছে। দিগন্তে একটি বেগুনী রঙের রেখা। ওপারে নীল ধূসর আকাশ। নীচে সবুজ হলুদ খয়েরী রঙ অনুভূমিকভাবে টেনে এবং সাদা লেপে পটের মধ্যে বিস্তার এনেছেন। মাঠের পাশে রাস্তার ওপর দিয়ে কোনো এক গাঁয়ের বধূ তার ন্যাংটো ছেলের হাত ধরে চলেছে। একপাশে একটা মোষের পিঠে একটা রাখাল। রচনার মধ্যে রয়েছে ভারসাম্য। আবহ তৈরী করার ব্যাপারে তিনি সিদ্ধহস্ত।

এমন শক্তিমান শিল্পীর তিপ্পান্ন বছরে মৃত্যু ঠিক যেন মেনে নেওয়া যায় না।

নীরার কাছে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যেই দরজা খুললে আমি জন্তু থেকে মানুষ হলাম
শরীর ভরে ঘূর্ণি খেললো লম্বা একটা হলদে রঙের আনন্দ
না খুললেও পারতে তুমি, বলতে পারতে এখন বড় অসময়
সেই না-বলার দয়ায় হলো স্বর্ণ দিন, পুষ্পবৃষ্টি
ঝরে পড়লো বাসনায়।

এখন তুমি অসম্ভব দূরে থাকো, দূরত্বকে সুদূর করো
নীরা, তোমার মনে পড়ে না স্বর্ণ নদীর পারের দৃশ্য?
যূথীর মালা গলায় পরে বাতাস ওড়ে একলা একলা দুপুর বেলা
পথের যত হা-ঘরে আর খেয়ো কুকুর তারাই এখন আমার সঙ্গী।

বুকের ওপর রাখবো এই তৃষিত মুখ, উষ্ণ শ্বাস হৃদয় ছোঁবে
এই সাধারণ সাধটুকু কি শৌখিনতা ক্ষুধার্তের ভাতরুটি নয়?
না পেলে সে অখাদ্য কুখাদ্য খাবে, খেয়ার ঘাটে কপাল কুটবে
মনে পড়ে না মধ্যরাতে দৈত্যসাজে দরজা ভেঙে কে এসেছিল?

ভুলে যাওয়ার ভেতর থেকে যেন একটা অতসী রং হল্‌কা এলো
যেই দরজা খুললে আমি জন্তু থেকে মানুষ হলাম।

অবসাদ

আলোক সরকার

সেই আনন্দের খবর আমাকে কেউ দিল না
কতদিন প্রতীক্ষায় ছিলুম—
যখনই কেউ কথা বলে চমকে ফিরে তাকাই
আর তারপর মুখ ম্লান হয়ে আসে।

ওরা আমাকে এনে দেয় কত খুশির খবর
ওরা ভেবেই পায় না
কেন মেতে উঠি না হাসিতে—এক একটা খবর
সাদা ফুলের মতো লুটিয়ে পড়ে ধুলোয়।

আগে আগে খুব রাগ হতো শরীর কাঁপতে থাকতো ব্যর্থতায়—
যা হবার তা কেন হবে না!
কত সহজেই হতে পারতো, কত সহজেই
একদিন ঘুম থেকে উঠে শুনতে পেতুম আনন্দ।

আজকাল আর রাগ হয় না, আজকাল
আমার শরীর কেমন যেন ভিজে পাপড়ি।
কত অবহেলায় চোখের দিকে তাকাই, কত অবহেলায়
দেখি নখের রক্ত—শুনতেও পাই না ওরা কি বলছে।

বাসা বদল

জীবিতেশ চক্রবর্তী

মাসখানেক হ'ল আমার বাতায়ন বদলে গেছে।
যেদিকে কৃষ্ণচূড়া গাছটা ছিল
সেদিকে বিশাল এক মন্দিরের চূড়া
আকাশ ফুঁড়ে আমার দৃষ্টিকে প্রতিনিয়ত উর্ধ্বমুখী ক[illegible]।
আমি অবাক হয়ে ঋতুবদলের কত খেলাই না দেখেছি
এখন প্রৌঢ়ত্বের হাতছানিতে কেঁপে কেঁপে উঠছি।

বাসা বদলে কার সঙ্গে মালা বদল হ'ল?
আরে দূর, দুটো আলাদা, বিলকুল আলাদা :—
দাদা, একটা দুই আত্মাকে এক করে,
আর একটা এক আত্মাকে দুই ক'রে দেয়।
এই তো দেখুন, আমার এক আমি এই বাতায়নে
জগন্নাথ মন্দিরের চূড়ায় চোখ রেখে বসে আছি,
আর সেই আমি, সেই বাতায়নের কৃষ্ণচূড়া গাছটার
কচি পাতার কাঁপন দেখছে চোখ বুজে।
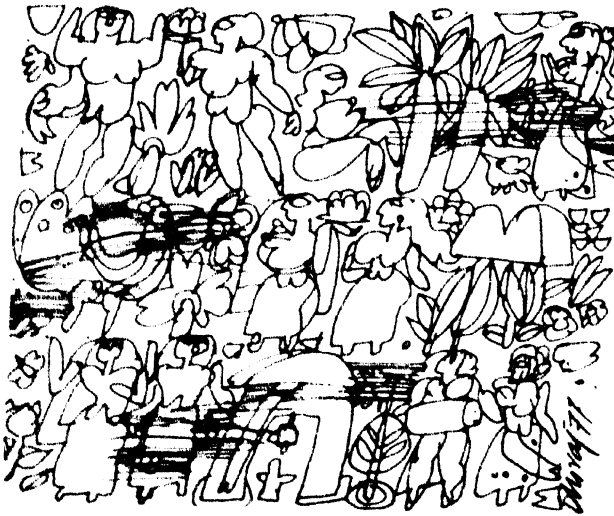
ধীরাজ চৌধুরী সুপরিচিত শিল্পী। বর্তমানে দিল্লী প্রবাসী হলেও ধীরাজ চৌধুরী ক্যালকাটা পেইন্টারস শিল্পী গোষ্ঠীর সভ্য। ড্রইং করতে ভালোবাসেন। এমন সাবলীল অঙ্কনকৌশল কম দেখা যায়। অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ; শিল্পীর কল্পনা প্রায়শই বাস্তবভিত্তিক। কিন্তু অতিরঞ্জিত আকৃতি এবং রচনাবৈচিত্র্যে পেইন্টিং এবং ড্রইং রিয়ালিটির গণ্ডী পেরিয়ে দর্শককে নিয়ে যায় অতি অপ্রাকৃত এক এলাকায় যেখানকার বুদ্ধিবিদ্যার সঙ্গে স্বাভাবিক ধারণা নিয়ে কখনই মীমাংসায় পৌঁছান যাবে না।

পালযুগের চিত্রকলা

সরসীকুমার সরস্বতী

॥ ১ ॥

কথামুখ
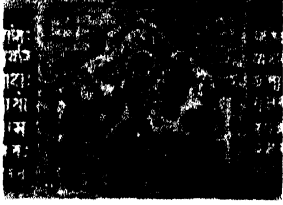
তিব্বতীয় ইতিহাসকার লামা তারনাথ 'বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস' নামে একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির রচনা শেষ হয় ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে। গ্রন্থখানি তথ্যসমৃদ্ধ, তবে এই তথ্যের কতটা কিম্বদন্তীমূলক আর কতটা সত্যের ভিত্তির উপর আশ্রিত তা নির্ধারণ করা কঠিন। রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে তারনাথের তথ্যের উপর সবসময় নির্ভর করা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, তারনাথের পাল রাজবংশের ইতিহাসের বিবরণের সঙ্গে এই রাজবংশের প্রকৃত ইতিহাসের কিছু অনৈক্য দেখা যায়। অবশ্য একথাও ঠিক যে কিম্বদন্তীর কেন্দ্রবিন্দুরূপে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার আভাস থাকা একেবারে অসম্ভব নয়; তবে কালের অমোঘ নিয়মে তার উপর অনেক অপ্রাকৃত ও অবান্তর স্তরের প্রলেপ দেখা দিয়েছে। বস্তুতঃ বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি সম্পর্কে তারনাথ এমন অনেব তথ্য দিয়েছেন যার সমষ্টিগত সাক্ষ্য অনেকাংশে নির্ভরযোগ্য।

এই গ্রন্থে তারনাথ প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় শিল্পকলার বিবর্তন সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার একটি অংশ পাল যুগের শিল্পকলা সম্পর্কীয়। ধর্মপালদেব ও দেবপাল-দেবের আমলের ধীমান ও তাঁর পুত্র বীতপাল নামে দুইজন বরেন্দ্রবাসী শিল্পীর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তারনাথ তাঁর গ্রন্থের এই অংশে। দুই-জনই ভাস্কর্যে ধাতুমূর্তি গড়নে আর চিত্রকর্মে বিশেষ নিপুণ ও পারদর্শী ছিলেন। তারনাথের মতে পিতা ও পুত্র তখনকার শিল্পকলায় দুটি বিশেষ রীতির প্রবর্তন করেন। এই দুই রীতির নাম তিনি দিয়েছেন পূর্বদেশীয় রীতি ও মধ্যদেশীয় রীতি। ভাস্কর্য আর ধাতুমূর্তি গড়নে বীতপালকে পূর্ব-দেশীয় রীতির আর ধীমানকে মধ্য-দেশীয় রীতির প্রবর্তক বলা হয়েছে; চিত্রকর্মে পূর্বদেশীয় ও মধ্যদেশীয় রীতির প্রবর্তক হচ্ছেন যথাক্রমে ধীমান আর বীতপাল। তারনাথ আরও বলেছেন যে নেপালী ভাস্কর্য ও চিত্রকর্ম পূর্ব-দেশীয় রীতির অনুসরণ করেছে।

তারনাথ অবশ্য পিতা ও পুত্র প্রবর্তিত দুটি রীতির বৈশিষ্ট্য বা পরস্পরের মধ্যে আঙ্গিক ও গুণগত পার্থক্যের কোন উল্লেখ করেন নি। পিতা ও পুত্রের দুটি রীতির তিনি পৃথক সংজ্ঞা দিয়েছেন ভাস্কর্যে ও চিত্রকর্মে পিতা ও পুত্রের শিষ্য ও অনুগামীদের আবাসস্থল বা কর্মক্ষেত্রের ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে। এই বিষয়ে তিনি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিভাগ সম্পর্কে বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন। এই ঐতিহ্য অনুযায়ী মগধ ছিল মধ্যদেশের অন্তর্ভুক্ত, আর তার পূর্ববর্তী অঞ্চল ছিল প্রাচ্য বা পূর্ব দেশ। এই ধারণার বশে পাল যুগের মগধ ও তার পূর্বাঞ্চলের শিল্পকর্মকে মধ্যদেশীয় ও পূর্বদেশীয় রীতির পরিচায়করূপে তারনাথ বর্ণনা করেছেন।

বিজ্ঞানসম্মত বিচারে প্রাচীন বা মধ্যযুগে এই দুই অঞ্চলের শিল্পকর্মের শ্রেণী বিভাগ করা যায় না। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে দীর্ঘকাল

বসুধারা। আঃ একাদশ শতক

পুঁথির চিত্রিত পাটা—[illegible]; আঃ দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগ

বেগন®
বেট
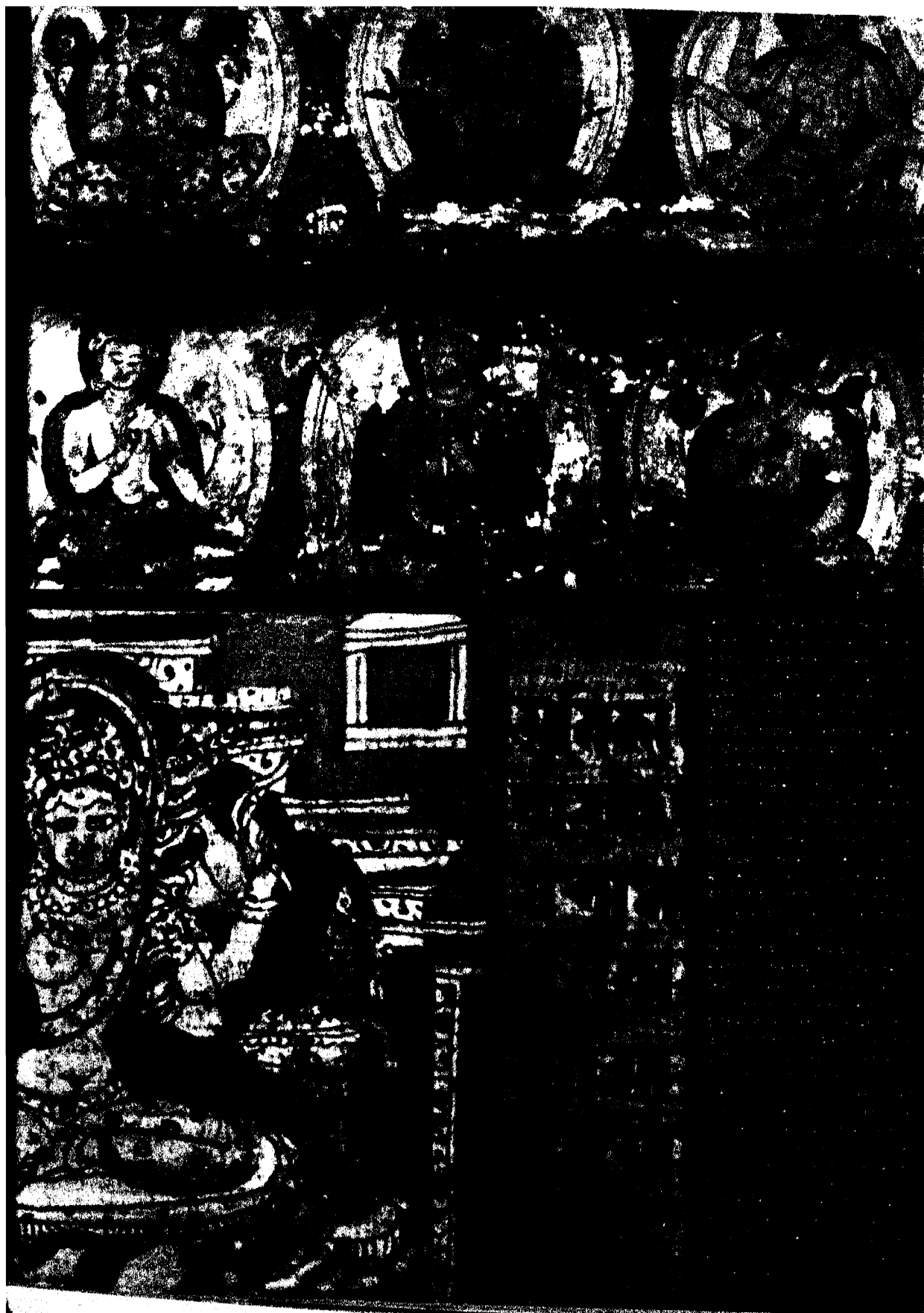
দু'ভাবে অনন্য ক্রিয়াশীল
আরশোলা আর মাছির থেকে রেহাই পেতে

বেগন বেট কিভাবে কাজ করে:
যেখানেই আরশোলা আর মাছি দেখবেন সেখানেই বেগন বেট ছিটিয়ে দিন: এর প্রতি এই সব পোকামাকড় খুব তাড়াতাড়ি আপনা থেকেই আকৃষ্ট হবে—এবং এতে শক্তিশালী উপাদান 'বেগন' থাকায় এরা চিরতরে নিপাত যাবে নিশ্চিতভাবে।
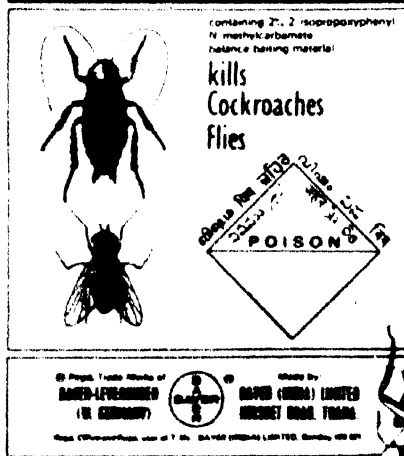
পাল যুগের ভাস্কর্যনিদর্শনের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় সকলেরই আছে। আর ভাস্কর্যকর্মের নিদর্শন দেশ-বিদেশের সংগ্রহশালায় যা আছে তার সংখ্যাও অপ্রচুর নয়। যে কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির পক্ষে এসব উপকরণ সহজেই অধিগম্য। কিন্তু পাল যুগের চিত্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ বা অবকাশ অনেকাংশে সংকীর্ণ। এ কারণে এই চিত্রকলা ততটা সুপরিচিত নয়। এ চিত্রকলার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগারে ও সংগ্রহশালায়; আর কিছু আছে ব্যক্তিগত ভাণ্ডারে। অধিকাংশ নিদর্শনই চলে গেছে দেশের বাইরে। এসব নিদর্শন সাধারণের একান্তভাবে দুরধিগম্য। স্বাভাবিক কারণেই প্রতিটি সংগ্রহে এসব বস্তুর বিশেষ ধরনের সংরক্ষণ ও প্রদর্শন ব্যবস্থার ফলে এই দুরধিগম্যতা বৃদ্ধিই পেয়েছে।

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন, ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে পাল যুগের চিত্রকৃতির একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। আর এই চিত্রকৃতি বিষয়বস্তু ও গুণগত সৌকর্যে কম সমৃদ্ধ নয়। আজ পর্যন্ত যে সব নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে তার সংখ্যাও একেবারে অল্প নয়। অথচ ভারতীয় শিল্পকলা বা চিত্রকলা সম্বন্ধীয় গ্রন্থে পাল চিত্রকলা সম্পর্কিত আলোচনা অবিশ্বাস্য রকমে সংক্ষিপ্ত। নিদর্শনের অপ্রতুলতা নয় নিদর্শনের দুরধিগম্যতাই এই পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছে। এই কারণে এই প্রবন্ধ পর্যায়ে পাল যুগের চিত্রকলার কিছু পরিচয় দেবার মানস করেছি।

পাল যুগের চিত্রকলার নিদর্শন আমরা পাই সে সময়কার চিত্রসংযুক্ত পুঁথিতে। দুএকখানি ছাড়া পুঁথিগুলি সবই বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অনুলিপি, পাল সম্রাটদের যুগে পূর্ব ভারতে প্রস্তুত হয়েছিল। অধিকাংশ পুঁথিতেই বিভিন্ন পাল সম্রাটদের নামাঙ্কিত তারিখ দেখা যায়। কতকগুলিতে পাওয়া যায় সমসাময়িক অন্য রাজাদের তারিখ। কয়েকখানিতে আবার তারিখ দেখা যায় তখনকার প্রচলিত অব্দে। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের শেষ পাদ হতে দ্বাদশ শতকের অন্ত অবধি কম করে চব্বিশখানি তারিখ যুক্ত চিত্রিত পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে এ পর্যন্ত। মোট চিত্র সংখ্যা তার প্রায় চারশ। অধিকাংশ পুঁথিরই চিত্রিত কাঠের পাটা বিদ্যমান —উপরের হিসাবে অবশ্য পাটার চিত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, কারণ পাটার চিত্র কোন কোন ক্ষেত্রে পরবর্তীকালের মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের পরবর্তী কালের তারিখযুক্ত তিনখানি চিত্রিত পুঁথি মুসলমান শাসনের যুগে পূর্ব ভারতে এই চিত্ররীতির অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। তখন অবশ্য পূর্ব সৌষ্ঠবের কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই।

তারিখযুক্ত চিত্রিত পুঁথি ছাড়াও তারিখ বিহীন পূর্বভারতীয় চিত্রিত পুঁথিও কিছু বিদ্যমান আছে। তারিখ লুপ্ত হলেও তুলনামূলক বিচারে সেগুলিও পাল আমলের বলে সিদ্ধান্ত করা চলে। এছাড়া তারিখযুক্ত ও তারিখবিহীন নেপালী চিত্রিত পুঁথির সংখ্যাও কম নয়। নেপালী চিত্রকর্মে পূর্বভারতীয় রীতি অনুসৃত হয়েছিল

ভগবান বুদ্ধের জন্ম—প্রথম মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্ক, আঃ দশম শতক, শেষ পাদ

—তারনাথের এই মন্তব্যের উদ্ধৃতি আগেই দেওয়া হয়েছে। পূর্বভারতীয় চিত্ররীতির আলোচনায় তুলনীয় উপাদান হিসেবে নেপালী পুঁথিচিত্রের তাৎপর্য ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সব মিলিয়ে পাল যুগের চিত্রকলা বা পূর্বভারতীয় চিত্ররীতি সম্পর্কিত আলোচনার আবশ্যকীয় উপাদান সম্ভারের যথেষ্ট প্রাচুর্য রয়েছে। এ রীতির পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা এখন আর অস্বীকার করবার উপায় নেই।

এইসব চিত্রিত পুঁথির বিবরণ প্রথম পাওয়া যায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Sanskrit Buddhist Literature of Nepal নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই তালিকা গ্রন্থে B H Hodgson কর্তৃক নেপালে সংগৃহীত পুঁথির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Catalogue of Sanskrit Buddhist Manuscripts in the cambridge University Library নামক গ্রন্থে Cecil Bendall কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত অনুরূপ পুঁথি সংগ্রহের পরিচয় দেন। এই দুখানি তালিকা গ্রন্থের প্রকাশে এসব পুঁথি ও তার চিত্রের প্রতি পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। পরে British Museum Catalogue, Asiatic Society catalogue, Museum Bulletin, Musuem Handbook প্রভৃতি গ্রন্থে আরও কিছু এই ধরনের পুঁথির পরিচয় প্রকাশিত হয়। এই শতকের শুরুতে ফরাসী মনীষী A. Foucher বৌদ্ধ মূর্তিতত্ত্বের আলোচনা করেন, বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে, এইরূপ কয়েকখানি পুঁথিচিত্রের অবলম্বনে (Etude sur L'Iconographic Bouddhique de l'Inde, pts. 1 & 2. 1900 & 1905)।

এই পুঁথিচিত্র সম্বন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই সংশ্লিষ্ট পুঁথির চিত্রের মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধীয়। বৌদ্ধ মূর্তিতত্ত্বের সামগ্রিক আলোচনায় এইসব পুঁথিচিত্রের গুরুত্ব রয়েছে যথেষ্ট—আর এ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত অনুশীলনের আবশ্যকতা আছে। চিত্ররীতির বিচার বিশ্লেষণ সম্পর্কেও আলোচনা আজ পর্যন্ত যা হয়েছে তাও খুব সামান্য আর বিক্ষিপ্ত ও ও বিচ্ছিন্ন ধরনের; সামগ্রিক দৃষ্টিতে চিত্রকলার রীতি বিচারের কোন প্রয়াসই এ পর্যন্ত দেখা যায়নি। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ পর্যন্ত এসব চিত্রিত পুঁথি সম্পর্কে যত আলোচনা হয়েছে তার অধিকাংশই নেপালী উপাদানের ভিত্তিতে আশ্রিত। পূর্ব ভারতীয় পুঁথিচিত্র প্রেরণা জুগিয়েছে এই চিত্ররীতির প্রবর্তন ও ক্রমবিকাশে। অথচ এই ধরনের আলোচনায় পূর্বভারতীয় উপাদানগুলো বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। চিত্ররীতি ও মূর্তিতত্ত্ব দুদিক থেকেই পূর্ব ভারতীয় পুঁথিচিত্রের সামগ্রিক অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা এখন স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়।

এই প্রবন্ধ পর্যায়ে পূর্ব ভারতীয় চিত্ররীতির কয়েকটা দিক সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও অনুশীলনের প্রয়াস করা হয়েছে। প্রবন্ধগুলো কয়েকটা অনুচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। 'নিদর্শন-কথা' নামে একটি অনুচ্ছেদে এই চিত্ররীতির নিদর্শনসমূহ যথাযথ পরীক্ষা করে তাদের কালপঞ্জী ও পৌর্বাপর্য নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। 'আঙ্গিক-কথা' নামে পরের অনুচ্ছেদে পুঁথি প্রস্তুতি ও চিত্রাঙ্কনের বিধি ও প্রক্রিয়াদি সম্পর্কে কিছু অনুসন্ধান করা হয়েছে কয়েকখানি শিল্পগ্রন্থের তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে। 'চিত্র-কথা' নামে শেষের অনুচ্ছেদে প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে পুঁথি ও চিত্রের মধ্যে আপাতবিরোধ সম্পর্কে আর পরে তাতে যুক্ত হয়েছে এই চিত্ররীতির সামগ্রিক বিচার ও বিশ্লেষণ। এক একটি অনুচ্ছেদ একাধিক কিস্তিতে পরিবেশিত হবে।

॥ ২ ॥

নিদর্শন-কথা—১

পাল যুগের চিত্রকলার নিদর্শন হিসাবে এ পর্যন্ত সাতাশখানি তারিখযুক্ত চিত্রিত পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে। আর কোন ভারতীয় চিত্ররীতি বিচারে এত সংখ্যক তারিখযুক্ত নিদর্শনের সমাবেশ দেখা যায় না। এই তালিকার কুড়িটি পুঁথি প্রস্তুত হয়েছিল বিভিন্ন পাল সম্রাটদের রাজত্বকালে, একটি পুঁথি চন্দ্রবংশীয় গোবিন্দচন্দ্রদেবের সময়ে; দুটি বর্মবংশীয় হরিবর্মদেবের তারিখযুক্ত। চন্দ্র ও বর্মবংশীয় রাজারা পূর্ববঙ্গে পাল রাজাদের সমসময়ে রাজত্ব করতেন। আরেকটি পুঁথিতে তারিখে দেখা যায় 'লক্ষ্মণসেন—গতসম্বত'। এই চব্বিশটি পুঁথি প্রস্তুত হয়েছিল পূর্ব ভারতে মুসলমান অধিকার স্থাপনের আগে; অবশিষ্ট তিনটি পুঁথি মুসলমান শাসনের যুগে। এই তিনটিতে তারিখ দেওয়া আছে প্রচলিত অব্দে—যথাক্রমে শকাব্দ ১২১১ (খ্রীষ্টাব্দ ১২৮৯); বিক্রমাব্দ ১৫০৩ (খ্রীষ্টাব্দ ১৪৪৬); বিক্রমাব্দ ১৫১২ (খ্রীষ্টাব্দ ১৪৫৫)। বিষয়বস্তু ও রীতির বিচারে এই তিনটি পুঁথির সঙ্গে অন্যের চব্বিশটি পুঁথির নিকট-সম্বন্ধ দেখা যায়। বলা বাহুল্য পুঁথির পত্রে বিন্যস্ত চিত্র পুঁথি লেখার তারিখের সময়েই অঙ্কিত হয়েছিল। পরবর্তী এক অনুচ্ছেদে সামগ্রিকভাবে এই চিত্ররীতির বিচার বিশ্লেষণ করা হবে।

এইসব পুঁথির তারিখ সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে। পুঁথি লেখার তারিখ আছে পুঁথির অন্তে পুষ্পিকায়। শেষের তিনটি পুঁথি ছাড়া অন্যগুলিতে প্রচলিত বা পরিচিত অব্দের কোন উল্লেখ নেই। তারিখ দেওয়া হয়েছে সমকালীন রাজাদের রাজ্যাঙ্কে, তাঁদের সিংহাসনারোহণের বছর থেকে গণনানুসারে। কুড়িটি পুঁথির তারিখ আছে বিভিন্ন পাল সম্রাটদের রাজ্যাঙ্কে। একমাত্র মদনপাল ও গোবিন্দপাল ছাড়া আর কোন পাল নৃপতির রাজ্য লাভের বছর আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না। চন্দ্রবংশীয় গোবিন্দচন্দ্র ও বর্মবংশীয় হরিবর্ম সম্বন্ধেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। এই কারণে পুঁথিতে উল্লেখিত রাজ্যাঙ্কের সঠিক তারিখ নির্ণয় করা কঠিন। পুঁথিগুলির তারিখ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত সে কারণে কতকাংশে অনুমানের উপর নির্ভরশীল।

পুঁথিগুলির তারিখ নির্ধারণ সম্পর্কে আরও একটি গুরুতর সমস্যার আলোচনার প্রয়োজন আছে। পালবংশে একই নামে একাধিক রাজা ছিলেন। আমাদের পুঁথি-সম্ভারে মহীপাল, নয়পাল, রামপাল, গোপাল, মদনপাল ও গোবিন্দপাল প্রভৃতি রাজার নামাঙ্কিত তারিখ দেখা যায়। একটি পুঁথির গোমীন্দ্রপালও সম্ভবত পালবংশীয়ই ছিলেন। পাল বংশে মহীপাল নামে দুজন ও গোপাল নামে তিনজন রাজা ছিলেন। একই নামের বিভিন্ন রাজার মধ্যে কালের দূরত্বও কম নয়। মহীপাল-নামাঙ্কিত তারিখ পাওয়া যায় চারটি পুঁথিতে আর গোপালের তারিখ দুটিতে। এই অবস্থায় পুঁথিগুলির কাল-নির্ধারণ নির্ভর করে কোন মহীপাল বা কোন গোপালের আমলে সংশ্লিষ্ট পুঁথি প্রস্তুত হয়েছিল এই সিদ্ধান্তের উপর।

সংশ্লিষ্ট পুঁথিগুলির আনুমানিক কাল নিরূপণ করতে পারলে এক্ষেত্রে রাজাদের সনাক্তকরণ অনেকাংশে সহজ হবে। এই কাল নির্ধারণ নির্ভর করে দুটি পরীক্ষাগত প্রমাণের উপর। একটি হচ্ছে লেখার ধরন ও অক্ষরের রূপ পরীক্ষা আর একটি চিত্ররীতির বিচার বিশ্লেষণ—এই দুই প্রমাণের মাধ্যমে পুঁথিগুলির আনুমানিক কাল নির্ধারণ সম্ভব, আর সেই প্রমাণে এক নামে একাধিক রাজার কোন জনের আমলে পুঁথি প্রস্তুত হয়েছিল, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। পূর্ব ভারতীয় পুঁথির ক্ষেত্রে লেখার ধরন বা অক্ষরের রূপ বিশ্লেষণ খুব বেশী সহায়ক হবে বলে মনে হয় না, কারণ ধর্মগ্রন্থের পুঁথিগুলো লেখা হয়েছিল এক রকমের আলঙ্কারিক লিপিতে, যার বিশেষ কোন বিবর্তন বা পরিবর্তন দীর্ঘকালের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় না। পণ্ডিতেরা এই লিপিকে 'কুটিল' নামে অভিহিত করেছেন। (ক্রমশ)

তোমাকে শহরে নিয়ে পুলিসে দেব, নাকি এদের হাতে ছেড়ে দেব?
শহরে নিয়ে চলুন।

লোকটা ভেবে-ছিল, আমরা ওকে মেরে ফেলব!
মারাই উচিত! শয়তান!

ওদিকে... যার আংটি চুরি গেছে .....
আংটিটা হারাবার পর থেকেই একটার-পর-একটা দুর্ভোগ চলছে।
ঠিক বলেছ।

'সেদিন মাছ ধরতে গিয়ে..
ছিপটা ভেঙে গেল!
ইস্, অত বড় মাছটা!

'তারপর টেনিস-কোর্টে আছাড় খেলুম! তারপর মাথায় আছড়ে পড়ল ফুলের টব!

'তারপর মনিব্যাগ, প্লেনের টিকিট... সমস্ত হারালুম।'
কে চুরি করল মনিব্যাগ আর টিকিট?
কী জা !
12/19

আরে, এই তো আমার আংটি!
এখানে কোত্থেকে এল?
স্যর, আপনার মনিব্যাগ আর টিকিট খুঁজে পাওয়া গেছে।

ডাক্তার বলছেন, মাথার আঘাতটা তেমন মারাত্মক নয়।
আংটিটা দেখছি সত্যিই খুব পয়মন্ত। নাকি এটা কাকতালীয় ব্যাপার?
আগামী সপ্তাহে : নতুন কাহিনী (১৬)

কণ্টকজিত

অতুল্য ঘোষ

॥ ১০ ॥

কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হলো ১৯২৮ সালে। মতিলাল সভাপতি। এর পিছনে একটু ইতিহাস আছে। সে সময়ে সাইমন কমিশন সারা ভারতবর্ষে ঘুরেছে। উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষকে আরও কিছু প্রশাসনিক ক্ষমতা দেওয়া যায় কিনা তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কংগ্রেস সাইমন কমিশন বয়কট করেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটি কমিশন গঠিত হয়েছে, যার চেয়ারম্যান মতিলাল। এঁদের বিচার্য বিষয়, ইংরেজের সঙ্গে কোনরকম রফায় এসে স্বায়ত্তশাসন পাবার চেষ্টা। কলকাতা কংগ্রেসের অব্যবহিত আগেই মাদ্রাজ কংগ্রেসে এবং তার আগে গৌহাটি কংগ্রেসে স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এই অবস্থায় কলকাতায় যদি আবার স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হয়, তা হলে নেহরু কমিশনের চেয়ারম্যান কি করে দুটোকে মেলাবেন! গান্ধীজীর মধ্যস্থতায় মতিলাল সম্মত হলেন কংগ্রেস সভাপতি হতে। তবে জওহরলাল এবং আরও অনেকে মতিলালের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, কলকাতা কংগ্রেসে স্বাধীনতা প্রস্তাব আনা হবে না। উত্তেজনা যথেষ্ট রয়েছে। সাইমন কমিশন বয়কট উপলক্ষে লালা লাজপৎ রায়, গোবিন্দবল্লভ পন্থ প্রভৃতি নেতা পুলিসের লাঠিতে আহত হয়েছেন। এই পটভূমিকায় কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন।

আমার কথা স্বতন্ত্র। আগে কংগ্রেস দেখেছি, ১৯১৭য় কলকাতায় বেসান্ত কংগ্রেস। ১৯২০এ কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন কলকাতায়, লালা লাজপৎ রায় সভাপতি, গান্ধীজীর নেতৃত্বে সেখানে অসহযোগ আন্দোলন প্রস্তাব গৃহীত হলো। তারপর নাগপুর, গয়া, কোকোনাদা, মাদ্রাজ, গৌহাটি ও আরও অনেক জায়গায় হয়েছে ; তার কোন কোনটায় গেছি দর্শক হিসেবে। এই প্রথম প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসে যোগদান। মনের মধ্যে বেশ একটু খুশি-খুশি ভাব এসে গিয়েছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি জে এম সেনগুপ্ত, সম্পাদক ডঃ বি সি রায়, আর সেবাদলের সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু। আর সুভাষচন্দ্রের পরই যে দুজন সর্বোচ্চ পদাধিকারী ছিলেন, একজন হচ্ছেন হেমন্তদা (বোস), আর একজন হলেন রবি সেন। স্বাভাবিকভাবেই হেমন্তদার কাছেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। হেমন্তদার শিবিরে থাকার ফলেই কংগ্রেসের আর একটা রূপের সঙ্গে পরিচয় হলো। দলাদলি, মনান্তর ও মতান্তরের কথা খানিকটা শোনা ছিল এবং জানাও ছিল। ১৯২৩এর বি-পি-সি-সির সাধারণ সভা। এক দিকে দেশবন্ধু স্বয়ং, অন্য দিকে শক্তিশালী দৈনিক 'সার্ভেন্ট' সংবাদপত্রের নির্ভীক সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ; তাঁর সঙ্গে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। প্রফুল্লচন্দ্র গরীবের ছেলে। নিজের চেষ্টায় ও মেধায় প্রথম ভারতীয় 'অ্যাসে মাস্টার' হয়েছিলেন। মিন্ট-মিন্ট-এর পদ, হাজার টাকা মাইনে। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে চাকরি ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসে যোগদান করেছেন ; খাদি প্রতিষ্ঠান সংগঠনে সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সাথী। আর অভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠায় ডঃ সুরেন বাড়ুজ্জে মশায়ের সঙ্গী। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনএর সভায় নো-চেঞ্জার বা প্রো-চেঞ্জার যে দলেরই শক্তি বৃদ্ধি হোক, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃপক্ষের খুবই ক্ষতি হয়েছিল। একটি টেবিল-চেয়ারও আস্ত ছিল না। এ ছাড়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও ছিল। ১৯২৫-এর শেষে বা ২৬শে বীরেন শাসমলের সভাপতিত্বে কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক সম্মেলন। সম্মেলনের সভাপতি বীরেন শাসমল মশায় বিপ্লবীদের সম্পর্কে অসঙ্গত মন্তব্য করেন। অনেকেই ক্ষুব্ধ হন। আবার ক্রুদ্ধও অনেকে হয়েছিলেন। বগুড়ার যতীনদার (রায়) মত ঋষিকল্প লোক, তাঁরও ক্রোধের সীমা ছিল

না। ঢেউ এসে লাগলো প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে। তখন সভাপতি অধ্যাপক জে এল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয় তাঁদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলো। তাঁরা অনাস্থা প্রস্তাবকে স্বীকৃতি না দিয়ে আফিস দখল করে বসে রইলেন। সামনে করপোরেশন ইলেকশন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি করপোরেশন ইলেকশনের জন্যে আর একটি নির্বাচনী কমিটি করে দিলেন; তার আফিস ডাঃ রায়ের বাড়িতে। ফলে করপোরেশনের নির্বাচনে দু দল কংগ্রেস প্রার্থী দাঁড়ালো। এক দল ওয়ার্কিং কমিটির নামে, আর এক দল বাতিল পি-পি-সি-সির নামে। এসব বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা খানিকটা ছিল। কিন্তু কংগ্রেস শিবিরে বাস করে যা দেখলুম তা কল্পনাতীত। ডঃ কানাই গাঙ্গুলী মশায় সন্ধ্যের সময় যখন প্রতিনিধি-শিবিরে ফিরছিলেন তখন এক দল প্রতিনিধি প্রকাশ্যভাবে গিয়ে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেয়। তার পরের দিনই একদল সেবাদল-কর্মী সামরিক কায়দায় মার্চ করে গিয়ে অস্থায়ী হাসপাতাল ও ফার্স্ট এইড সেণ্টার ভেঙে দিলো। সন্ধ্যেবেলা তিন লরী ইঁটের টুকরো এলো ঘুরে কংগ্রেস মণ্ডপ ভাঙবার জন্যে। যারা ভাঙতে এসেছিল তাদের মোকাবিলা করার জন্যে জওহরলাল একটি ঘোড়ায় চাপলেন। এ কাহিনী আর বেশী না লেখাই ভাল। ডাঃ রায় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের পদ থেকে তিনবার অব্যাহতি চেয়েছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বয়ং যতীন্দ্রমোহন, তিনি আর কার কাছে পদত্যাগ করবেন! তিনিও একান্ত ক্ষুব্ধ। এই হলো আভ্যন্তরীণ অবস্থা।

কংগ্রেস কার্যক্রমেও জটিল অবস্থা। যথারীতি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে জওহরলাল পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব আনলেন। সঙ্গে সুভাষচন্দ্র ও আরও অনেকে। বেশির ভাগই বাংলার প্রতিনিধি। কিন্তু বাংলার কয়েকজন খ্যাতনামা বিপ্লবী বিপিনদা (গাঙ্গুলী)। অমরদা (চট্টোপাধ্যায়) ও আরও কয়েকজন—তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় নৃপেনদাও (বন্দোপাধ্যায়) ছিলেন—কোনও পক্ষেই ভোট দিলেন না। তাঁদের যুক্তি ছিল যে, মতিলালকে যখন কথা দেওয়া হয়েছে, আমরা বাংলার ডেলিগেট, আমাদের অন্তত সে কথার মর্যাদা রাখা উচিত। ভোটে অবশ্য স্বাধীনতা প্রস্তাব বাতিল হয়। প্রায় সাড়ে তিন শ' ভোটের ব্যবধানে। যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে ইংরেজকে সময় দেওয়া হয়েছিল এক বছর। ঠিক এক বছর বাদে ১৯২৯-এর ৩১শে ডিসেম্বর রাত বারটার পর অর্থাৎ ইংরাজী ক্যালেণ্ডার মতে ১৯৩০-এর ১লা জানুয়ারী পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাপতি জওহরলাল। সেই লাহোর কংগ্রেসেই ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ঘোষিত হয়, যা বরাবর প্রতিপালিত হয়ে আসছে।

আগে কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে অনেক আরো অধিবেশন হতো। একটা উল্লেখযোগ্য সম্মেলন ছিল—'জাতপাত তোড় সম্মেলন'। প্রধানত অস্পৃশ্যতা নিয়ে বক্তৃতা হতো, আর তার সঙ্গে ছিল এক সঙ্গে পাত পেড়ে খাওয়া। সেইসব ভোজনশালায় যেসব মন্তব্য হতো তার বাংলা করলে দাঁড়ায় ঃ ভটচাযি্য মশায়ের পাতের দই আমার পাতে এসে পড়ছে, আর আমার পাতের দই ভটচার্যি মশায়ের পাতে পড়ছে।' বর্তমানে এসব শুনলে হয়তো অনেকেই অদ্ভুত মনে করবেন ; কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে এ ঘটনা খুব বিরল ছিল। দক্ষিণাঞ্চলে তো ছিলই, পূর্ব এবং উত্তরাঞ্চলেও ছিল। আর যুব সম্মেলনও মাঝে মাঝে হতো, সেটা খুব জোরদার ছিল না। ১৯২৮এর কলকাতা কংগ্রেসের সময় একটি যুব সম্মেলন হয়েছিল। বিনু (অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) বোধ হয় ছিল সংগঠক। এই যুব সম্মেলনে একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটতো। কংগ্রেস অধিবেশনে হিন্দী এবং ইংরেজী প্রায় সমান সমানই চলতো। কিন্তু যুব সম্মেলনে পাক্কা ইংরাজী কথা। ফলে, মাদ্রাজ এবং বোম্বের যুবকরাই বেশী হাততালি পেত। একটি বেশ

জন প্রদর্শনীও হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন নলিনীরঞ্জন সরকার। মাঝে মাঝে মনে হতো যেন কংগ্রেসের সঙ্গে প্রদর্শনীর বোধ হয় কোন যোগ নেই। বাস্তবে কিন্তু কংগ্রেস সংগঠনই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা ছিলেন।

গান্ধীজী সব সময়েই মঞ্চে থাকতেন। বহু উত্তেজক বক্তৃতাও তাঁর সামনে হতো। কিন্তু কি যেন একটা তাঁর কথার মধ্যে ফুটে বেরুতো, যাতে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তাতেই উত্তেজনার ভাব অনেক কমে যেত। আমরা কয়েকজন একসঙ্গে ভোট দিতে ঢুকেছিলুম—হেমন্তদা (বোস), প্রফুল্লদা (সেন), ধীরেনদা (মুখোপাধ্যায়), আরও কেউ কেউ। আমি আর হেমন্তদা আলাদা হয়ে গেলুম। হেমন্তদা বললেন, 'দেখ, গান্ধীজীর বক্তৃতার পর অন্য কথা ভাবাই যায় না। তবুও...।' ভোটপর্ব তো শেষ হলো। ভোটে যাঁরা জিতলেন তাঁরাও খুশী নন, আর যাঁরা হারলেন তাঁরা তো নিরানন্দ বটেই। ফলে, ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বারদের ঘন ঘন বৈঠক। পাকা চুলওলা মতিলাল, তাঁর এমন একটা সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণ ছিল যে, সকলেই তাঁকে একটু সমীহ করতো। তাঁর বক্তৃতা হলো যেমন মর্মস্পর্শী, তেমনই কমনীয়। কঠোরতা ছিল, কিন্তু সে কঠোরতায় তিক্ততা ছিল না। মহামর্যাদাময় এ মানুষটি অত বাধার মধ্যেও সেদিন সকলের মনকে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। আর একজন মানুষ—গায়ে একটা 'ওপেন ব্রেস্ট' কোট, আর বগলে গোল করে জড়ানো একটা চাদর—বলছিলেন, 'মনকষাকষি করে লাভ কি? আমরা তো কংগ্রেসকে আহ্বান করেছি! সকলেই আমাদের অতিথি। কোনও অতিথির যদি অমর্যাদা হয় তা হলে লজ্জা ও ক্ষোভের সীমা থাকবে না।'। সুরেশদার (মজুমদার) একটা সুবিধে ছিল। উনি ছিলেন আবাস-গৃহ-বিভাগের কর্তা। সব প্রতিনিধির সঙ্গেই দেখা হতো, আর সব সময়েই ঐ এক কথা। রাতে সেনগুপ্ত মশায় স্বয়ং সব শিবিরে হাজির হলেন। যতীন্দ্রমোহন ছিলেন রাজনীতিতে এক অসাধারণ মানুষ। ইংরাজীতে স্পোর্টসম্যান বলতে যা বোঝায়—এর বাংলা আমি জানি না—যতীন্দ্রমোহন ছিলেন তাই। কোনও ছোট জিনিস কখনো তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। মতান্তর হয়তো অনেকের সঙ্গেই হতো, কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে মনান্তর হবার সুযোগ কখনো কাউকে দেননি। ডায়াবেটিসের রুগী, কিন্তু খেতে খুব ভালবাসতেন, অনেক সময় বন্ধুবান্ধবরা জোর করে খাওয়া থেকে নিবৃত্ত করতো। অসহযোগ আন্দোলনে কংগ্রেসে যোগদান করেন, কিন্তু তখনো ব্যারিস্টারি ছাড়েননি। আসাম-বেংগল রেলওয়ে স্ট্রাইকের সময় দেশবন্ধুর যাবার কথা, দেশবন্ধু যেতে পারলেন না, পাঠিয়ে দিলেন যতীন্দ্রমোহনকে। লোকে জানতো না, স্টেশনে স্টেশনে বিপুল অভ্যর্থনা। যতীন্দ্রমোহনের অবস্থা সঙ্গীন। ফিরে এসে প্র্যাকটিস ছাড়লেন এবং ধীরে ধীরে দেশবন্ধুর একান্ত আপনজন হয়ে উঠলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর উনি যে দেশবন্ধুর উত্তরাধিকারী, বাংলা কংগ্রেস সেটা ভারতবর্ষকে জানিয়ে দিলো ত্রিমুকুটে অভিষিক্ত করে। বি-পি-সি-সির প্রেসিডেন্ট, আইনসভার দলপতি ও করপোরেশনের মেয়র। ওঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যখন বিলাতী বর্জন হলো তখন কয়েকজন ওঁর কাছে গিয়ে হাজির, 'স্যার, এইবার তো মেমসাহেবকে ছাড়তে হবে। বিলাতী মেম।' উনি হেসে বললেন, 'তোমরা বিলাতী বেগুন (টোম্যাটো) ছেড়ে দাও।' এইসব কথার মধ্যে এসে হাজির হলেন ওঁর যোগ্য সহধর্মিণী শ্রীমতী নেলি সেনগুপ্ত। তিনি সব শুনে হেসে বললেন, 'আমি তো বাঙালী বিয়ে করেছি। উনি আমায় ত্যাগ করতে পারেন ; কিন্তু আমি তো ভারতবর্ষ ছাড়বো না, এটাই তো আমার দেশ।' যাঁরা পরিহাস করতে গিয়েছিলেন তাঁদের অবস্থা তখন সঙ্গীন। একবার একটা সম্মেলনে নিয়ে গিয়েছিলুম। মৌরলা মাছ, কচু, লাউ—এইসব তো খাওয়ার ব্যবস্থা। বিকেলবেলা প্রতাপদা (গুহ রায়) বললেন, 'ওরে সাহেব তো সব কচু খেয়ে ফেলেছে—মানে আধ সের।' আমরা তো হতভম্ব, আবার কচু পাই কোথায়! যতীন্দ্রমোহন নিজেই সমস্যার সমাধান করে দিলেন; বললেন, 'তোমাদের ঐ প্রদর্শনীতে যে ছানার হাতী করেছো ঐটা নিয়ে এসো না। কাল সকালে প্রদর্শনী খুললে বলবে, হাতী বনে পালিয়েছে।'

অচেনা চীন

মৈত্রেয়ী দেবী
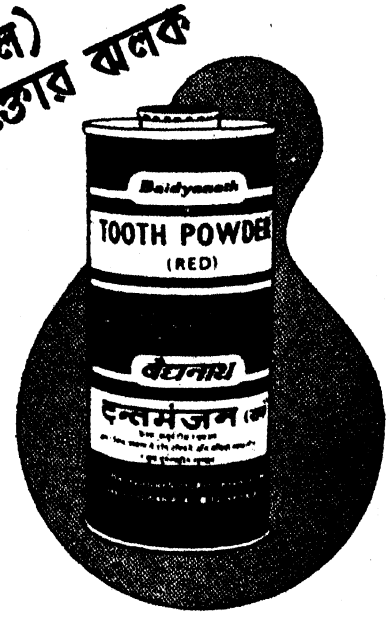
সাংহাই ইনডাস্ট্রিয়াল শহর। এর পুরনো অংশগুলো খুব ঘিঞ্জি। এখানে নানা ইয়োরোপীয় জাতি তাদের থাবা বসিয়ে বসিয়ে লুটপাট করেছে। গাড়ি চলতে চলতে ওরা দেখায়—এটা ব্রিটিশ কনসেসন, এটা ফ্রেঞ্চ কনসেসন ইত্যাদি।

প্রথম দিনই আমরা শহর থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে হোয়াংডু বলে একটা কমিউন দেখতে গেলাম। আমরা সিজিয়া চুয়াং-এ যে কমিউন দেখেছিলাম, এ তার চেয়ে অনেক বড়। এখানে নানা ধরনের জিনিসের উৎপাদন হচ্ছে। এখানে পাঁচ হাজার গৃহস্থ বাস করছে—সর্বসমেত তেইশ হাজার লোক রয়েছে। এক শত তেত্রিশটি প্রডাকশন টিম ও ষোলটি প্রডাকশন ব্রিগেড রয়েছে। চাষযোগ্য জমি দু হাজার এক শত হেক্টর। চাষ হয় শস্য, সবজি ও তুলোর। বারটি ফ্যাক্টরী চলছে। প্রতি হেক্টরে চৌদ্দ হাজার কিলো শস্য উৎপন্ন হয়। ১৯৫৭ সালে কমিউন প্রতিষ্ঠিত হবার আগে যা ফলন হত তার চেয়ে এখন ২·৮ ভাগ বেশী হচ্ছে। চাষবাসে যন্ত্র ব্যবহার হচ্ছে। চারা তুলে লাগানো, গম কাটা, জল দেওয়া—সবই মেশিনে হচ্ছে। ষোলটি পাম্প স্টেশন আছে এবং সাঁইত্রিশটি খাল কাটা হয়েছে। গত দশের বছর ধরে 'বাম্পার হারভেস্ট' হচ্ছে। ফলে জীবনের মান অনেক উন্নত হয়েছে। পঁচিশটি মিডল স্কুল আর আটাশটি প্রাইমারী স্কুল আছে। মিডল স্কুলের পঁচাত্তর ভাগ ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা পায়। একত্রিশজন ডাক্তার আছে। প্রত্যেক ক্লিনিকে তিন-চারটি বেয়ারফুট ডাক্তার আছে। তারা রোগীও দেখে, চাষও করে। কঠিন অসুখ হলে অবশ্য কাউন্টি মিউনিসিপ্যালিটি হাসপাতালে যায়। চিকিৎসার জন্য প্রত্যেকে বছরে দু ইউয়ান করে টাকা দেয়। পাঁচজনের পরিবারে বাৎসরিক আয় গড়পড়তা বার শ' ইউয়ান। বছরে তাদের খরচ হয় সাত শ' ইউয়ান। কাজেই, বছরে পাঁচ শ' ইউয়ান অনায়াসে বাঁচে। এই টাকা তারা জমিয়ে বাড়িঘর করে বা ছেলেমেয়েদের বিয়েতে খরচ করে।

এত তথ্য শুনতে শুনতে হাঁপিয়ে উঠেছি। ওরা সহজে ছাড়ে না। আমরা আরো শুনলাম—সিনেমা হাউস ছাড়া তিনটি ভ্রাম্যমাণ সিনেমা ঘুরছে। এ ছাড়া আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, লাইব্রেরী—ভ্রাম্যমাণ ও স্থায়ী।

কাজের সময়ের স্থিরতা নেই। প্রয়োজন অনুসারে ঠিক হয় চাষের সময়। হয়তো কখনো দিনে দশ ঘণ্টা খাটতে হয়, আবার কখনো বা চার ঘণ্টার বেশী কাজ থাকে না। সেই সময় তারা নিজেদের বাড়িঘর বানায়, কাঠ ও বাঁশের কাজ করে ও সেসব জিনিস বিক্রি করে। খুব সুন্দর সুন্দর ফার্নিচার বানানো হচ্ছে। আমরা কতগুলি কারখানা দেখলাম চাষের যন্ত্রপাতি তৈরি ও মেরামতের। সবচেয়ে ভালো লাগল বাঁশের বাস্কেট ও নানারকম জিনিসপত্তর কুটিরশিল্প। কুটির অবশ্য নয়—বিরাট বড় দালানে বহু লোক কাজ করছে—যন্ত্রে বাঁশ চেরা হচ্ছে। খুব সূক্ষ্মভাবে চিরে ফেলা হচ্ছে। হাতে অত সরু করতে পারলেও তা সময়সাধ্য। এরা কটেজ ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে সর্বত্রই ছোট ছোট মেশিনের সমন্বয় করেছে। কিন্তু বাঁশের কাজ এত অপূর্ব যে, আমার লোভীর মত সবই তুলে আনার ইচ্ছা। ওরা ডাঃ বাসুকে একটা ঝুড়ি দিয়েছিল। তিনি সেটা কিংকরনাথ পাণ্ডেকে দিয়ে দিলেন। কারণ, তিনি দেরিতে আসায় সিজিয়া চুয়াং-এর উপহারদ্রব্যগুলো পাননি।

এখান থেকে আমরা কমিউনের বাড়িঘর দেখতে গেলাম। আমাদের দেখবার জন্য গ্রাম থেকে ছেলেপিলে বুড়োবুড়ী সব ভিড় করে এলো। আমি যে বাড়িতে ঢুকলাম সেখানে খালি ঠাকুমা উপস্থিত ছিলেন—অন্যরা কাজে গেছে। ঠাকুমার সঙ্গে ফুটফুটে বছরখানেকের নাতিও ছিল। বাড়িটি দোতলা—ইঁটের দেওয়াল, মেঝে বাঁধানো। নয়খানি ঘর—ছোট বড় রান্নাঘর মিলিয়ে। ছেলে বউ নাতি মেয়ে ও ঠাকুমা তো আছেই, মনে হল আরো একজন কেউ আছে। নিচের তলায় চাষের যন্ত্রপাতি, উপরে বসবাস। রেডিও আছে। পরিচ্ছন্ন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাড়ির মত। রান্নাঘরে ঢুকে দেখলাম—ভাত ও ডালসেদ্ধ তৈরী হয়ে আছে, সুপ ফুটছে। বধূমাতা এর মধ্যে কাজ থেকে এসে তরকারি কুটতে বসেছেন। ওদের চুলাও উঁচু—দাঁড়িয়ে রাঁধার ব্যবস্থা। এইখান থেকে আমি গ্রামের পায়খানার খবর নিতে শুরু করলাম। আমরা যেখানেই যেতাম, হঠাৎ হঠাৎ ঝিংড়াজী ও মহার্কাব অন্তর্ধান করতেন। দিনেশ দত্ত, ও'রা দেশে ফিরে গিয়ে চীনের 'টয়লেট' সম্বন্ধে রিসার্চের ফল লিখবেন। ওঁরা না লিখলেও আমি লিখছি। আশা করি আমার পাঠকরা এই বিষয়ের অবতারণার জন্য ক্ষুব্ধ হবেন না। অনেকে আমাকে শিল্পসাহিত্য সম্বন্ধে লিখতে বলছেন। তার আগে আমি এই নোংরা বিষয়টাই একটু লিখি।

দীর্ঘদিন ধরে চীনের চাষীর কাছে 'নয়বর' বা নাইট সয়েল হচ্ছে একটি সম্পত্তি। সার হিসাবে চিরদিন এর ব্যবহার হয়েছে। আমি সাংহাইতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে বর্তমানে গ্রামে কি হচ্ছে তা শুনলাম। প্রত্যেক বাড়ির সঙ্গে যে পায়খানা আছে তার পাত্রটি প্রতিদিনই বাড়ির একজন ময়লা নেবার গাড়িতে নিজেই ঢেলে দেয়; কিংবা নিকটস্থ বড় একটি চৌবাচ্চার ঢাকনা তুলে ঢেলে দেয়। তারপর সেখান থেকে ক্ষেতে চলে যায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, এ কাজ অত্যন্ত লজ্জাজনক মনে হয় না? তাতে ভদ্রলোক বললেন, একেবারেই না। এ কাজের জন্য আলাদা কোনো মেথরজাতি নেই। যে যার নিজের ময়লা নিজে পরিষ্কার করে। সমস্ত গ্রামের ভিতরটা পরিচ্ছন্ন—কোনো দুর্গন্ধ নেই। রেলগাড়ীতে মোটরে যাবার সময় গ্রামের মধ্যে যখন আমরা নেমেছি, পথের কাছাকাছি সাধারণের ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা রয়েছে। সেগুলো খাটাই; তবে ব্যবহার করতে শিক্ষা দেবার ফলে একেবারে নোংরা নয়। দুর্গন্ধ আমাদের নাকে কিছুটা লাগবেই। আর একটা কথা। সব শীতের দেশের মানুষের মতই এরা জল ব্যবহার করে না। টয়লেট কাগজ ব্যবহৃত হয়। এগুলি কর্মস্থল থেকে কিনতেও পাওয়া যায়। জলের যেমন পরিষ্কার করার ক্ষমতা তেমনি নোংরা করার ক্ষমতাও কম নয়। জল-কাদা, জল-মল ও শ্যাওলা মিলে যে অবস্থা হয় ওখানে তা হতে পায় না। এইসব সাধারণ "টয়লেটের" ময়লাও ক্ষেতের কাজের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। যা হোক, খাটা পায়খানা সত্ত্বেও গ্রামের মধ্যে মাছি দেখলাম না।

২০ তারিখ বিকেলবেলা আমরা 'পাইওনীয়ার্স'-এ গেলাম—শিশুভবন। মস্কোর পাইওনীয়ার প্যালেস দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ছেলেদের নাচগান, জিমনাস্টিক, ছবি আঁকা, কাঠের কাজ ইত্যাদি দেখে খুবই ভালো লেগেছিল। কিছুদিন আগে রুমানিয়াতেও পাইওনীয়ার প্যালেসে গিয়েছিলাম। বরফ-ঢাকা বিস্তীর্ণ বাগানের মধ্যে একটি প্রাসাদে খেলাধুলো, ছবি আঁকা, মডেলিং প্রভৃতি হচ্ছে। কিন্তু চীনে পাইওনীয়ার্সের কাছে তা ছেলেখেলা মনে হল। ছোট একখানি বাগানের মধ্যে পাঁচতলা বাড়ি। সাংহাই শহরের দশটি পাড়ায় দশটি এরকম শিশুভবন আছে।

প্রথমে ঢুকেই দেখলাম—বার-তের বছরের দুটি ছেলে একটি পাঁচ-ছ' ফুট লম্বা এরোপ্লেন রেডিও ওয়েভ দিয়ে ওড়াবার চেষ্টা করছে। এসব এখানেও ছেলেরা করে; কিন্তু বাহুল্য বলে মুষ্টিমেয় বড়লোকের ছেলেরাই হবি-র চর্চা করতে পারে। স্কুলের সুবিধা ও পিতামাতার সুবিধা অনুসারে ছেলেমেয়েরা আসে। নানারকম হাতের কাজ, নাচগান ও পড়াশুনো হয়। পড়াশুনোর বিষয় মার্কস লেনিন কি বলেন, মাও-সে-তুং কি বলেন এবং ইন্টারন্যাশনাল চিন্তাই বা কি। আমার অবশ্য এত ছোট বয়সে রাজনীতি শিক্ষা ভালো লাগে না; যেমন ছোট বয়সে ধর্মশিক্ষাও আমার মতে ভালো নয়। আমাকে এক পাদ্রী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনার স্কুলে কি ধর্মশিক্ষা দেন?' আমি বলেছিলুম, 'ওদের নিউক্লিয়ার ফিজিকসও পড়াই না, ধর্মও শেখাই না।' 'নিউক্লিয়ার ফিজিকস আর ধর্ম এক হলো?' তিনি রূঢ় উত্তেজিত করেছিলেন। 'এক নয়—ধর্ম আরও কঠিন। ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং—এতটুকু-টুকু ছেলেমেয়ে তার বুঝবে কি?' এত ছোট বয়স থেকে একটা খোদল-কাটা পথে মনকে মাখিয়ে দিলে তার স্বাধীন চলায় কেবলই অপরিসর হবে। মানুষের জীবনে সময়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েই অভিজ্ঞতা জন্মায়—অসময়ের পাকা ফল সুস্বাদু নয়। তা দেখি—যাদের যেদিকে ঝোঁক তারা আজকাল শিশুকাল থেকেই তার তালিম শুরু করেছে। চীনেরা পলিটিকস ভালোবাসে, তারা পলিটিকস শেখাচ্ছে। বালক-বালিকা এবং শিশুদেরও—তাদেরও গানে গ্যাং অফ ফোর-কে ধিক্কার। আর পাশ্চাত্য দেশে ওরা যৌন ব্যাপারের চর্চায় উন্মত্ত। ওরা ভুলে গেছে—যৌনতা জীবনের একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যাপার; তা সারা জীবনব্যাপী নয়। ইস্কুলে একেবারে শিশুদেরও যৌনশিক্ষা দিতে শুরু করেছে—সেটা নাকি দরকারী। কত যে সুফল ফলছে তাতে, তা দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু শিশুমনের উপর এ জবরদস্তির প্রয়োজন তো নেই-ই—অন্যায়ও। শুনেছি একটি বালক তার মাকে স্কুল থেকে শিক্ষা পেয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেছে:—"Ma, do you have sex relations?" মা থতমত খেয়ে গেলেও শিখেছে, শিশুদের কাছে মিথ্যা বলবে না; তাই বলেছে, eh eh, perhaps we have!" বালক উৎসাহিত—"But whose are

চাষী ঠাকুমা ও আমরা

হরিতা ওষধিনা ওষধিঃ সোমঃ সাদন্যঃ বিদুষ্য সতেজঃ।
হিরণ্যগর্ভা সৌদিবাপ্লু শোণিতং ইচ্ছন্তি
তাবাণঃ সাবিত্রীবানে অগ্নৌ॥

VOGUE
Approximate nutritional composition of Ground Turmeric (Haldi) per teaspoon
* Present in Trace Amounts
Wt/tsp 1·9 gms
Water 110 mg.
Calorie 7
Calcium 3·8 mg
Protein 163 mg
Phosphorous 4·94
Niacin 91 meg
Fat 166 mg
Sodium 0·19 mg.
Iron 902 meg.
Thiamine 1·71* meg
Riboflavin 3·61 meg.
Ascorbic acid 946 meg.
Carbohydrate 1328 mg.
Potassium 47·5 mg.
Vit 'A' 3 Int'l Units
Fibre Carbohydrate 31 mg
Ash 129 mg.
Analyses Performed by Research 900 Laboratories St Louis U S A
অর্থাৎ হে হরিদ্রে! তোমার বর্ণ সূর্যের একটি উজ্জ্বল কিরণের মত তাই হরিৎ। তুমি দেবতাদের দেহ উজ্জ্বল স্বর্ণ বর্ণ করে দাও। শোনিত মন্থন করে স্বর্ণ বর্ণ করে দাও॥
ঋক বেদের ঋষি হইতে আয়ুর্বেদাচার্য বাগভট্ট, চরক সুশ্রুত, চক্রদত্ত সকলেই হরিদ্রার গুণে পঞ্চমুখ। প্রাগবৈদিক যুগ হইতে হরিদ্রা রন্ধনে ব্যবহৃত।
inka
NATURALLY SMOOTHER THAN ORDINARY GROUND SPICES
TURMERIC COMPOUNDED COOKING POWDER
আয়ুর্বেদমতে হলুদের গুণ ঃ কটু-তিক্ত-রস, কফ ও পিত্তনাশক বর্ণকর, ত্বকদোষ মেহ রক্ত শোথ-পান্ডু-ব্রণ নিবারক। কুষ্ঠ ও বিষদোষ নাশক॥
● চন্দন বাটার মত মিহি।
● স্বাদ-গন্ধ-বর্ণ একটি নির্দিষ্ট মানে রাখার জন্য Compounded ও Blended করা।
● Oleoresin বের করা হয়নি, এমন ভালজাতের হলুদই গুড়ো করা যাতে Vitamin অক্ষুন্ন থাকে।
● ইনকা হলুদের দাম একটু বেশি, কিন্তু রান্নাতে ঢের কম লাগে—তাই মূল্যায়নে দাম অনেক কম।
খুচরা মূল্য (স্থানীয় কর আলাদা)
৫০ গ্রাম প্যাক···১.০০
১০০ ,, ,, ১.৮৫
গুড়ো হলুদ জলে কাদার মত গুলে ১০ মিনিট রেখে, তবে রান্নাতে ব্যবহার করবেন-তাতে হলুদের গুণ গুলি প্রকাশিত হয়।
পি-শ্রী স্পাইসেস্ এন্ড কন্ডিমেন্টস্'এর উৎপাদন

those relations— I do not see them!' এর চেয়ে অবনা পলিটিক্স শিক্ষা ভালো।

পাইওনীয়ার প্রাসাদে ছেলেমেয়েদের হাতের কাজ অভাবনীয়। তার বর্ণনা লিখতে অনেক সময় লাগবে। যতরকমের শিল্পবিদ্যা আছে সবই যেন শেখানো হচ্ছে। পেপার কাটিং, কাঠের এরোপ্লেন, রাইস ডল, ছবি আঁকা সেলাই এমব্রয়ডারি—এমন কি, পুতুল-মানুষের শরীরে আকুপাংচার। সেই ঘরে বসে ছোট ছোট ছেলেরা আমার ব্লাডপ্রেসার মেপে ফেলল। ব্যালেও দেখলুম চমৎকার। এদের ছোটরা খুব ভালো ব্যালে নাচে। এতে ইয়োরোপীয় ধরন আছে। খাঁটি চীনা নৃত্য বলে আমার মনে হল না। তবে আমার ভুল হতে পারে। ছেলেরা কাজ করছে বড়দেরই মতন সমগ্র মন দিয়ে। এলোমেলো কিছু নেই। তৈরী বস্তুগুলো নিখুঁত সুন্দর। কিন্তু শিক্ষার আর একটি দিকের কথা ওরা আমাদের বলেছিল। সেটাই আমার সবচেয়ে ভালো লাগল। ওরা বলল, 'আমরা খুব ছোট বয়স থেকে ওদের দেশের মানুষকে সেবা করতে শেখাই। আমাদের মহান বিপ্লবের যারা উত্তরাধিকারী তাদের জানতে হবে কি করে মানুষের সেবা করতে হয়, মানুষকে সাহায্য করতে হয়।'

আমাদের একটি মূকাভিনয় দেখালে। বিষয়বস্তুটা এইরকম : চায়ের দোকানে একটি ছেলে ও মেয়ে চা বিক্রি করছে। সামনে রাস্তা। সেখানে সাইকেল চড়ে একটি লোক চলেছে। সাইকেলের পিছনে ঝুড়িতে সবজি। হঠাৎ একটা ধাক্কা লেগে সাইকেল থেকে লোকটি পড়ে গেল। তার পণ্যসামগ্রীও ছড়িয়ে পড়ল। চা-বিক্রেতারা ছুটে এল, লোকটিকে তুলল। দেখল—ওর পা ভেঙেছে। ধরাধরি করে সরিয়ে নিল (এ-সবই মূকাভিনয়ে হচ্ছে)। তারপর হাসপাতালে ফোন করল। অ্যাম্বুলেন্স এল। তাতে তুলে দিয়ে তারপর ওর বাড়ির ঠিকানা নিল। সবজিগুলি টুকরিতে তুলে মাথায় করে নিয়ে চলল তার বাড়ি পৌঁছে দিতে। সমস্ত নাটকটি অতি সু-অভিনীত। আমার মনে হয়—এ ধরনের নাটক আমাদেরও বিদ্যালয়ে হওয়া উচিত। বিপদগ্রস্তকে সাহায্যের নীতি সম্প্রতি এ-দেশে বিস্মৃত। আক্রান্তের আর্ত চিৎকার শুনলে লোকে দরজা বন্ধ করে দেয়। তার নিজেরও যে একসময় ঐ অবস্থা হতে পারে তা মনে পড়ে না। আর রাস্তায় পথচারী যদি গাড়ির ধাক্কা খেয়ে পড়ে তা হলে সেই আহত লোকটার দিকে না তাকিয়ে আগেই ড্রাইভারের বিচার ও 'এক্সি-কিউশনের' দিকে ঝোঁক পড়ে। এবং এ কাজে প্রবণতা কলেজে-পড়া ছেলেদেরও কম নয়। এই প্রসঙ্গে একটা আশ্চর্য সুন্দর গল্প খুব সম্ভব রুই আলির কাছে শুনেছি। একটি চীনা ইউরোপিয়ান ছেলে কমিউনের ভিতর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যেতে যেতে একটি বৃদ্ধকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে। বৃদ্ধের পায়ে খুব চোট লাগে। তখন মুশকিল এই যে, তার ঘরে দেখাশোনা করার কেউ নেই—ছেলেটিও একা। তাই কমিউনের সভায় ঠিক হল—বৃদ্ধ যতদিন সেরে না ওঠে, ছেলেটি তার সঙ্গে থাকবে ও তার দেখাশোনা করবে। মাস দুই সে ছিল। তারপর পরস্পরের প্রতি এমনি স্নেহ জন্মাল যে, রয়েই গেল। পরে ছেলেটি বিয়ে করল ও ঐ বৃদ্ধ একটি পুত্র ও পুত্রবধূ লাভ করল। মানব-সম্বন্ধের ভিত্তিভূমি তৈরি করাই দেশের বুনিয়াদ তৈরি করা। এ বিষয়ে একদিন আমাদের দেশ অনেকখানি এগিয়ে ছিল। তা পুরানো জগতের পুরানো মতে। নূতন জগতে মানব-সম্বন্ধকে মসৃণ করার ঝোঁক কমই। এ প্রসঙ্গে বলা ভালো, চীনে এখনও পিতা-মাতা সম্মানিত। বিয়ে ওরা নিজেরা আলাপ করে স্থির করে, কিন্তু মা-বাবার মত নেয়। এই সাংহাইতেই একটি শ্রমিকের বাড়ি গিয়েছিলাম। গিন্নী স্কুলে পড়াতেন, রিটায়ার করেছেন। ওগুলো ব্লক-বাড়ি—তিনখানি ঘর। গ্যাস ও ইলেকট্রিক সমেত সাত ইউয়ান, অর্থাৎ আটাশ টাকা, ভাড়া। দেখলাম—নূতন ফার্নিচার ও রেডিও কিনে তিনি ছেলের জন্য ঘর সাজিয়েছেন। ছেলে বিয়ে করে ওঁদের সঙ্গেই থাকবে। এখানে দেখলাম ইয়োরোপীয়ান স্টাইলে বাথরুম। কিন্তু ওদের পুরানো প্রথা 'স্কোয়াটিং' আমাদের মত।

একটি কিণ্ডারগার্টেন দেখে বেরিয়ে আসবার সময় বাচ্চাগুলো আমাদের 'চাই চিয়েন নানা চাই চিয়েন' বলতে লাগল। ওরা দাদামশায়কে 'নানা' বলে; দিদিমাকে কি বলে, ঠিক মনে নেই। চীনের শিশুরা অত্যন্ত সপ্রতিভ। ফট্ করে কোলে আসে, আকারে-ইঙ্গিতে আলাপ করে, একটু ভয় বা লজ্জা পায় না। বড়দের চেয়েও ওরা 'এক্সপ্লোভার্ট'। দেখতেও সব লাল টুকটুকে গোলাপফুল বা আপেল। বিশ্বম্ভর পাণ্ডে সব কিছু সম্বন্ধে বেশী উৎসাহিত ন। কমিউনিজম সম্বন্ধে তো নয়ই। কিন্তু শিশুদের দেখে তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন। এত স্বাস্থ্য, এত আমুদে, চেনা-অচেনার চিহ্নমাত্র নেই—আমাদের মন ভরিয়ে দিত।

সাংহাই-তে আমাদের প্রধান দ্রষ্টব্য স্থল ছিল সাংহাই জেল। সাংহাই-তে দশ মিলিয়ন লোক আছে—জেল এই একটি। এই জেলটি ব্রিটিশদের তৈরী। তখন চীনের এ অংশে ব্রিটিশ রাজত্ব। ১৯১৮ সালে তৈরি শুরু হয়ে ১৯২৫-এ শেষ হয়। জাপান ও কুমিনটাং-এর আধিপত্যের সময় অনেক কমিউনিস্ট এখানে বন্দী ছিল। আমরা জেলে ঢুকলাম। নীল পোশাক পরা পুলিস অনুসরণ করল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। দোতলায় উঠে আমরা প্রথম বন্দীদের রাত্রিবাসের সেলগুলো দেখলাম। মেঝেতে পাটির গদি পাতা, তাতে লেপ পরিপাটি করে ভাঁজ করা, তিনটি বর্ণা দেয়ালে ঝুলছে। ঘর খালি—বাসিন্দারা অন্যত্র কাজে গেছে। আমার মনে হল, ঘরগুলো তিনজনের পক্ষে একটু ঠাসাঠাসি। সব ঘরই খালি। একটি ঘরে একজন বসে ছিল। আমি লী-কে বললাম, 'ঘরগুলো বড় ছোট'। ওরা বললে, 'এটা

আমরা ওদের কাজের জায়গা দেখলাম। ঘড়ির পার্টস তৈরী হচ্ছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাকে এরা শৃঙ্খলাবদ্ধ আসনে বসে যে যার কাজ করে যাচ্ছে। বেশ কম জায়গার মধ্যে কয়েক শত লোক কাজ করছে। সমস্ত ব্যবস্থা খুবই সুনিপুণ। ঘড়ির পার্টস তৈরির কারখানার পর আমরা একটা প্রেস দেখলাম। বিরাট প্রেস চলছে। প্রচুর লোক কাজ করছে। তারা যে বন্দী তা বোঝবার উপায় নেই। সকলের কাছে চায়ের জাগ রয়েছে। কিন্তু মুখ না তুলে একাগ্রভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তারপর দেখলুম কাটা কাপড়ের ফ্যাক্টরী। কয়েক শত মেয়েপুরুষ কাজ করছে। কেউ সেলাইয়ের কল নিয়ে বসেছে, কেউ কাপড় কাটছে, কেউ প্যাক করছে।

জেলের কর্তা বললেন, 'এই জেল যখন ব্রিটিশ জেল ছিল তখনকার সঙ্গে এখনকার পার্থক্য আছে। এই জেল সাধারণের আপদ নিবারণ ও দুষ্টের দমনের জন্য হলেও আমরা বাধ্যতামূলক কষ্টের মাধ্যমে এদের চরিত্র বদলে দেবার চেষ্টা করি। জেলে সর্বসমেত দু হাজার আট শত বন্দী আছে। তার মধ্যে দুই শত নারী। নানারকম দোষের জন্য এদের শাস্তি হয়েছে—চুরি, দুর্নীতি, হুজুগেপনা। তবে বেশির ভাগই কাউন্টার রেভোলিউশনারি। এখানে রীতিমত মাও-সে-তুং-এর রচনা পড়ানো হয়—যাতে জেল থেকে এরা সুশিক্ষিত হয়ে বেরিয়ে পরবর্তী জীবনে সৎ জীবনযাপন করতে পারে। আমরা নানারকম আলোচনার মাধ্যমে সর্বদা সৎ আদর্শ ওদের সামনে আনি, ওদের মত বদলাবার চেষ্টা করি, খবরের কাগজ পড়াই, দেশবিদেশের খবর আলোচনা করি। ওদের আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে আনি। তাদের সঙ্গে আলোচনা করে অনুরোধ করি বন্দী স্বজনদের বোঝাতে। যখন এইভাবে চরিত্র পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে তখন আমরা তাদের প্রশংসা করি, সুযোগ সুবিধা দিই। যারা জেলেও অসভ্যতা করে তাদের মেয়াদ বেড়ে যায়। আর একটু ভালো ভাব দেখালেই বহু প্রশংসা পায়। মাও-সে-তুং বলেছেন—বন্দীদের সঙ্গে মনুষ্যোচিত ব্যবহার করবে। কেমনো বন্দীকে মারবে তো নাই, গালও দেবে না, অপমানও করবে না। দুর্ব্যবহার করে কোনো সুফল পাওয়া যায় না। এদের ভালো খাবার দেওয়া হয়, হাতখরচও দেওয়া হয়। ইনসিওরেন্স করা হয়। আট ঘণ্টা কাজ, দু ঘণ্টা পড়া, তারপর বিশ্রাম। মাঝে খেলাধুলো বা আমোদপ্রমোদ।' সকালবেলাতেই একদল বাস্কেট বল খেলছিল। তারা শুনলাম রুগী। কিন্তু রুগীর মত দেখাচ্ছিল না। ফিল্ম প্রায়ই দেখানো হয়। জেল থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই চাকরির ব্যবস্থা করা হয়। সৎ ব্যবহার ও শিক্ষার ফলে বেশির

পাইওনীয়ার হাউসে নবীন বাদক দল

ভাগ অপরাধীর পরিবর্তন হয়। নিজেদের ভেঙে গড়ে নূতনভাবে। কিন্তু কেউ কেউ আছে যারা কিছুতেই বদলায় না। ডিরেক্টার বললেন এবং দিনেশ, যিনি আইনজ্ঞ তিনিও, সায় দিলেন যে, দশ মিলিয়ন লোকের শহরে দু হাজার আট শ' মাত্র বন্দী—এতে বোঝা যায়, অপরাধীর সংখ্যা বেশী নয়। শুনলাম গত ছয় মাসে মাত্র তিন শ' জন লোক অ্যারেস্ট হয়েছে। বেশির ভাগই নানা-রকম অপরাধের। কিছু পোলিটিক্যাল। তারা ভিন্ন সেলে থাকে। সাধারণ অপরাধীদের সঙ্গে তারা থাকে না।

দিনেশ প্রশ্ন করলেন বিচারের পদ্ধতি সম্বন্ধে। এসে অবধি তিনি আইন ও আইন সংক্রান্ত ব্যাপার সম্বন্ধে জানবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'অপরাধ প্রমাণ-অপ্রমাণের ব্যবস্থা কি ?' এ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছিল। আমি যত দূর বুঝতে পেরেছি তা এই—এ দেশে উকিল ব্যারিস্টার লাগিয়ে দিনকে রাত করা চলে না। টাকা পেয়ে সত্যকে মিথ্যা বা মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করবার উপায় নেই। সে উপায় ভালো নয়। তা হলে যার টাকা আছে তার সঙ্গে যার নেই সে পেরে ওঠে না, সুবিচার হয় না। এখানে আছে ল ওয়ার্কার্স। তারা আইন শিক্ষা করেছে, আইন জানে। তারাই বাদী ও বিবাদীকে নিজ নিজ অবস্থা বুঝিয়ে দিতে সাহায্য করবে। পিপলস কোর্ট কতদিন কারা-মেয়াদ হবে তার সিদ্ধান্ত নিলে আসামীর আপীল করবার অধিকার থাকবে।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাউন্টার রেভোলিউশনারি বলে এখানে যারা

কথা তারা কি করেছে?' উত্তরে জানলাম, তাদের মধ্যে আছে আমেরিকার গুপ্তচর—যারা তাইওয়ানের স্বপক্ষে কাজ করছে। আর আছে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল—যারা বিদ্রূপ মত প্রচার করে চলেছে ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখবার দিকে উৎসাহ দিচ্ছে এবং বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। এ ছাড়া সোভিয়েট রাশিয়ার স্পাইও আছে। ১৯৭৪ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত তিন জন গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে পিকিং-এ ধরা পড়ে বন্দী হয়ে আছে।

এই জেলে খুব ভালো হাসপাতাল আছে সবরকম আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত। কর্মী আছে দু'শ জন। মেয়েদের ঘরে ঢুকে দেখলাম তিনটি নারী বসে খবরের কাগজ পড়ছে। তাদের দেখে বিশ্রী লাগল। চেহারার মধ্যে একটা রুক্ষ ভাবের ছাপ ছিল—যা অন্য বন্দীদের মধ্যে দেখিনি। তাদের কি অপরাধ জিজ্ঞাসা করিনি।

জেল থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমার মনে হল—একটা বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে এলাম।

সাংহাইতে আমার একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি মিউনিসিপ্যালিটিতে বড় কাজ করেন। তিনি ভালো ইংরেজী জানেন—বইও লিখেছেন। তাঁর বই অ্যামেরিকাতে ছাপা হয়েছে। ইনটারপ্রেটার ছাড়া স্বচ্ছন্দভাবে একজনের সঙ্গে কথা বলতে পেরে খুবই ভালো লাগছিল। সাংহাই শহর পরিচ্ছন্ন রাখা সম্বন্ধে তাঁর কাছে অনেক খবর পেলাম। আমি পূর্বেই বলেছি—নূতন চীনের সবচেয়ে যা আমায় আকর্ষণ করেছিল তা এদের পরিচ্ছন্নতা। আমাদের দেশে একমাত্র গান্ধীজী ছাড়া আর কোনো রাজনৈতিক নেতা সাফাইয়ের কথা চিন্তা করেননি। কিন্তু আমার মতে, পরিচ্ছন্নতা একটা দেশের সভ্যতার মাপকাঠি। শহরের পরিচ্ছন্নতা দেখেই বোঝা [illegible]—আমরা দেশকে ভালবাসি, না দেশের মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে উদাসী[illegible] কলকাতার রাস্তায় জঞ্জালের স্তূপ দেখা অভ্যাস আমাদের। রাস্তায় ভিখারী দেখাও। অথচ এই দুটি দেখেই বিদেশীরা আমাদের সম্বন্ধে হীন ধারণা করে। তাতে দোষ দেওয়া যায় না। সাংহাই খুব ঘিঞ্জি শহর। পুরানো পুরানো ভাঙাচোরা বাড়িও দেখেছি গলির মধ্যে। বড় রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে যেখানে যত গলি আছে দূর পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করেছি, কোথাও এতটুকু ময়লা বা আবর্জনা চোখে পড়েনি। অথচ এখানে এক কোটি লোকের বাস এবং আগে অত্যন্ত নোংরা শহর ছিল। ইংরেজীভাষী এই ভদ্রলোকের নামটি ভুলে গেছি। ধরা যাক, তাঁর নাম মিঃ চিয়াও। তিনি বললেন, অতি প্রত্যুষে শহরের সমস্ত জঞ্জাল বাইরে চলে যায়। শহরের সমস্ত মল ড্রেন দিয়ে গ্রামে চলে যায় ও সার করা হয়। রাস্তায় আর কেউ এক টুকরো ময়লা ফেলে না। প্রথমে মুভমেন্ট করতে হয়েছিল; এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। তবে কখনো কখনো লোকে থুতু ফেলে। যদিও দেখেছি প্রত্যেক সাধারণের বড় বড় ব্যবহারের স্থানে চেম্বার পটের মত পাত্র রয়েছে কোণে কোণে। তার উপরে লম্বা লাঠি লাগানো ঢাকনা। লাঠি দিয়ে ঢাকনা তুলে নিচু হয়ে থুতু ফেলে ঢেকে দিতে হবে। আমাদের এখানে যা ব্যবস্থা আছে তা যেমন কুদৃশ্য তেমনি নিরর্থক। বিশেষত পানের পিকের জন্য। আমি যদি কোনো দিন এ-দেশের ডিকটেটর হই তাহলে তাম্বুলচর্বন বন্ধ করে দিই। মনে হয় একমাত্র হিটলার ছাড়া পানের পিক ফেলে সাধারণের ব্যবহারের জায়গা নোংরা করা আর কেউ বন্ধ করতে পারবে না। তাও কি জানি, বোধ হয় বরং গ্যাস চেম্বারে যাবে, তবুও ফেলবে। মিঃ চিয়াও বললেন, পরিচ্ছন্নতার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সফল রাখবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় কমিটি আছে। এদের বলে প্রতিবেশী কমিটি। অবসরপ্রাপ্ত কর্মক্ষম বৃদ্ধবৃদ্ধারা এ কাজ করেন। তাতে তাঁদেরও উপকার, অন্যেরও। নিজেদের নিরর্থক বোঝা মনে হয় না। কাজের মত কাজ করেন। এঁদের তদারকির ফলে রাস্তায় ময়লা ফেলা, এমন কি নিজের বাড়ি নোংরা করে মশামাছির উৎপাদন-কেন্দ্র সৃষ্টি করারও উপায় নেই। একটা রাস্তায় রাস্তার দৈর্ঘ্য অনুসারে অনেকগুলি প্রতিবেশী সংঘ থাকতে পারে। তাদের নিয়ে স্ট্রীট কমিটি। চীনের পরিচালন-ব্যবস্থা সর্বত্রই এইরকম। নিচ থেকে গড়ে উঠেছে। প্রতিবেশী সংঘ গ্রামেও আছে। এদের কাজ [illegible]—প্রতিবেশীর সমস্ত সমস্যা দেখা, আলোচনা করা এবং সমালোচনাও করা। পথঘাট নোংরা করলে শিখিয়ে, আলোচনা করে, আত্মসমালোচনা করিয়ে [illegible] করে দেবে। অনাথালয় বলে কিছু নেই। এ বিষয়ে উৎসাহ থাকায় অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি। প্রয়োজন হয় না। কোনো বালক-বালিকা অনাথ হলে প্রতিবেশীরা ব্যবস্থা করে।

মিঃ চিয়াও তাঁর পরিচ্ছন্ন ইংরেজীতে বহু বিষয়ে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কালচারাল রেভোলিউশনের পরে আপনিও কি কায়িক শ্রম করেছিলেন? কোথায় গিয়েছিলেন?' তিনি বললেন, 'আমি একটা ফ্যাক্টরীতে রোজ কিছুক্ষণ ধরে শ্রমিকের কাজ করি। এখনও করি।' 'পারলেন করতে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'কাজটা বড় কথা নয়—ওরা তা মানে। আমায় কোনো শক্ত কাজ দেয় না। প্রথম যে একটা স্ক্রু টাইট করতেই হিমসিম খেয়ে গেলাম। ওরা হেসে অস্থির! এখন একটু পারি।' তখন আমি ভাবলুম—ইন্টারপ্রেটার বাদ গেছে, ভালই হয়েছে। এঁকে একটু স্পষ্ট কথা জিজ্ঞাসা করি। 'এই কায়িক শ্রমে আপনার লাভ কি হচ্ছে?' তিনি বললেন, 'আমি বুঝতে পেরেছি, আমি খুব বিদ্বান হলেও এমন অনেক কাজ আছে যাদের আমরা অবজ্ঞা করি তারা অনেক ভালো পারে। কোনো দিকে আমি কুশলী হলেও বহু দিকে বহু মানুষ আরো বেশী কুশলী। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একথা যেদিন বুঝলাম সেদিন জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষালাভ হল—"হিউমিলিটি" বিনয়।'

(ক্রমশ)

শংকর

॥ ৬১ ॥

থ্যাকারে ম্যানসনে আজ আমার ছ'মাস পূর্ণ হলো। অথচ যেন পেরিয়ে এলাম অন্তহীন পথ। এই ছ'মাসে এতো মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলো, এত ঘটনার মুখোমুখি হলাম, এতো সুখ-দুঃখের নীরব সাক্ষী হয়ে রইলাম, যে নিজের হিসেবনিকেশ মেলাবার অবকাশ হয়নি।

কে বলবে, ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিনের এই আশীর্বাদহীন ম্যানসন বাড়িতে মাত্র ছ'মাস জীবিকা উপার্জন করেছি আমি? সাতার স্ট্রীটের ধারে, স্কুলের কাছে জীবনের এই নতুন অধ্যায়ে আমি যেন পুরো ছ' যুগ অতিবাহিত করেছি। নানা ঘটনা, নানা সমস্যা দিন-রাত্রির সিঁড়ি বেয়ে একের পর এক আমার অনভিজ্ঞ জীবনকে এমন কর্মমুখর করে তুলেছে যে মনে হচ্ছে, এই থ্যাকারে ম্যানসনকে আমি যুগ-যুগান্ত ধরে চিনি। এই থ্যাকারে ম্যানসনেই আমার যেন জন্ম, এই থ্যাকারে ম্যানসনেই মৃত্যু লঘু পদক্ষেপে এসে আমার এই অতৃপ্ত অস্থির অসহায় জীবনে অবশেষে চিরশান্তির তিলক এঁকে দেবে। শেষ হবে আমার এই অনিচ্ছুক জীবিকা সন্ধান ও অক্ষম জীবন সংগ্রাম।

আজ এই মুহূর্তে আমার মনের শামিয়ানা স্নিগ্ধ প্রীতির সোনালী আলোতে ঝলমল করছে। আজ কারও ওপর এমন কি সেই খেয়ালী বিধাতা যিনি অকারণ কৌতুকে আমাকে বারংবার সংসারের হাটে হাটে নিরন্তর পদযাত্রার অভিশাপ বর্ষণ করেছেন তাঁর ওপরেও আমার কোনো অভিযোগ নেই।

ম্যানেজারবাবুর জন্যে পাঠানো দোকানের স্পেশাল চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে ভাবছি, নিজেরই অজ্ঞাতে আমি কেমনভাবে এই থ্যাকারে ম্যানসনের বিচিত্র মানুষমেলায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। যে-মানুষ একদিন মানুষের মতো মানুষ হবার স্বপ্ন দেখতো, যে একদিন লেখাপড়া করার আর্থিক সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে চোখের জল ফেলেছিল, যে-মানুষ একদা বিদেশী বায়ওয়েল সায়েবের আশীর্বাদে মানবসাগরের তীরে মহামানবতার সাক্ষাৎ পেয়ে বিদেহী বিধাতাকে বিনম্র প্রণাম জানিয়েছিল, সাজাহান হোটেলের ভোগ-ঐশ্বর্যের মধ্যে নররূপী সত্যসুন্দরদার স্নেহস্পর্শে মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা ফিরে পেয়েছিল, সে-ই এই ক'মাসে কেমন হয়ে ক্যান কোন কল জল ভাড়াটে ও ভাড়ার তাড়ায় নিজেকেই ভুলতে বসেছে?

এই ক' মাসে কত সহজে মানুষের ওপর কত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারিয়েছো তুমি, শংকর। আজ নিজেকেই আমি নিজের প্রশ্নে জর্জরিত করতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছি।

শংকর, এই ক'মাসে তুমি অনেক বিষয় বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছো। ছোট আইনের ছোট কূটকৌশল এখন তোমার আয়ত্তে, মানুষকে আজ তুমি কত সহজে সন্দেহ করতে পারো, অথচ একদা অনভিজ্ঞ গ্রাম্য বালকের সরলতা তোমার দুঃখী জীবনকে সযত্নে সজীব করে রেখেছিল।

এই ক'মাসে আমার জীবনে কী কী ঘটেছে তা আমার সিনেমা ছবির মতো মনের রুপোলী পর্দায় দৃশ্য আলোছায়ায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। প্রতিদিনের এই সব সামান্য খুঁটিনাটি, এই সব দৈনন্দিন মানসিক দ্বন্দ্ব ও স্বার্থপরতার সঙ্গে আমাকে জীবনের অনির্দিষ্ট সময় বসবাস করতে হতে পারে ভেবে মনটা নিজের জন্য বিদ্রোহী হয়ে উঠলো।

এই মুহূর্তে আমার বরদাপ্রসন্ন হালদারের কথাও মনে পড়ছে। তীর্থদর্শনের নাম করে ভদ্রলোক সেই যে উধাও হলেন, তারপর অনেকদিন তাঁর কোনো হদিশ নেই। কলকাতা থেকে বেরিয়ে হরিদ্বার, বারাণসী এবং বদ্রীনাথ থেকে ডাকযোগে বরদাপ্রসন্ন হালদার অ.ম্বরের জন্যে দেবতার আশির্বাদী ফুল ও প্রসাদ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর সম্পূর্ণ নীরবতা। যাঁরা তাঁর সঙ্গে অনেকদিন ঘর করেছেন, তাঁদের কারও কারও ধারণা, বরদাপ্রসন্ন থ্যাকারে ম্যানসনের এই কসাইখানা থেকে পালিয়ে বেঁচেছেন। বিষয় বৈরাগী মানুষ এতোদিন ভাগ্যদোষে বিষয়বিষে জর্জরিত হচ্ছিলেন এবার আমার ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে তিনি মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করছেন। হয়তো আর কখনও ফিরবেন না।

কেউ কেউ অবশ্য ...[illegible] অন্য কথাও বলে। মানা কাল ও মুখের জটিল ...[illegible]-পথ ঘুরে সেইসব বিষাক্ত শব্দ আমাকে অবশ্যই বিব্রত করে, আমাকে বিবর্ণ করে তোলে। বরদাপ্রসন্নের কলকাতা ত্যাগের কারণ নাকি আমি নিজে। পিতৃপুরুষের এই কর্মক্ষেত্রে অপরিচিত ব্যক্তির আকস্মিক উড়ে এসে জুড়ে বসায় তিনি নাকি গোপনে ব্যথিত হয়েছেন এবং প্রথম সুযোগেই বেরিয়ে পড়েছেন তীর্থের দেবতাসন্ধানে।

এই খবর আজকেও আমাকে বিব্রত ও অস্থির করে তুলছে। আমি অসহায়বোধ করছি। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, বরদাবাবু আপনার দীর্ঘদিনের কর্মক্ষেত্রকে অস্বস্তিকর করে তুলবার জন্যে জেনে-শুনে এই থ্যাকারে ম্যানসনে আমি আসিনি। এই বিরাট বিশ্বে আমার একটা কাজের এবং সামান্য একটু আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল। তারই সন্ধানে, নানা ঘাটে ঠেকতে-ঠেকতে অবশেষে আমি থ্যাকারে ম্যানসনে হাজির হয়েছি। আত্মরক্ষা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই আমার। বরদাবাবু, বিশ্বাস করুন।

বরদাবাবুর চিন্তা-প্রসঙ্গে হঠাৎ খেয়াল হলো, আমি নিজেও আমার দায়িত্ব পালন করিনি। বিলাসিনী দেবী, পদ্মা অথবা বিপুলভূষণ বারিক কারও সঙ্গে যথাসময়ে যোগাযোগ করিনি। শুধু দিনের পুরনো ব্যবস্থা অনুযায়ী টাকাকড়ির লেনদেন রামসিংহাসন মারফতই চলে আসছে। আমাদের সামান্য মাইনে এবং অন্য খরচাপাতি ভাড়ার টাকা থেকেই কেটে নেওয়া হয়। মনে হলো, একবার কিডন স্ট্রীটে বিলাসিনী দেবীকে বরদাপ্রসন্ন সম্বন্ধে অবহিত করাটা বিশেষ প্রয়োজন। এমনও হতে পারে বরদাপ্রসন্নর খবরাখবর ওখানে আসছে, অথচ এখানে আমরা কিছুই জানতে পারছি না।

"বাবু, আপনার চিঠি", সুইপারের পরিচিত গলা আমার চিন্তাস্রোতে বাধা দিল। এ-বাড়িতে সুইপাররাই আমার বিশেষ অনুগত এবং অবসর সময়ে তারা অন্য কাজ করতে ভালবাসে। সুযোগ এবং স্বাধীনতা পেলে এরা যে একদিনও জমাদারের কাজ করবে না, তা আমি লিখে দিতে পারি। এদের নিজস্ব পেশায় কোথাও গোপন বেদনা আছে; আমাদের চরম অবহেলাও বোধ হয় এদের নজর এড়ায় না।

চিঠি! আমাকে কে আবার চিঠি লিখতে পারে? সংসারের পুরনো দিনের সব সম্পর্কের কথা ভুলেই তো থ্যাকারে ম্যানসনের এই আত্মনির্বাসনে এসেছি। লোকে শুধু শুধু আমার খোঁজ খবর নিয়ে কেন অযথা সময় নষ্ট করবে?

রাজকীয় রয়াল ব্লু কালিতে অন্তর্দেশীয় পত্রে গোটা গোটা বাংলা অক্ষরে আমার নামটাই কিন্তু জ্বলজ্বল করছে।

আরও যা আশ্চর্য, লেখার ধাঁজটি একটি নারীর অদৃশ্য ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করছে। আমার এই ষাণ্মাসিক প্রতিষ্ঠা দিবসে থ্যাকারে ম্যানসনের ঠিকানা খুঁজে কে এইভাবে আমাকে স্মরণ করলেন? এবং কৌতূহল আরও বাড়লো। কারণ চিঠির এক কোণে আরও একটি সুমধুর ঘোষণা : 'ব্যক্তিগত'।

থ্যাকারে ম্যানসনের মানুষের ভিড়ে আমার ব্যক্তিসত্তা তো কোথায় হারিয়ে গিয়েছে, যেটুকু এখানে কর্মতৎপর রয়েছে সেটি আমার প্রতিষ্ঠানগত ব্যক্তিত্ব। থ্যাকারে ম্যানসনের অস্থায়ী ম্যানেজারকে অবশ্যই জল, পাইপ, কল, ইলেকট্রিসিটি ইত্যাদি সম্বন্ধে চিঠি লেখা যায়। তা বলে ব্যক্তিগত চিঠি?

উৎসুক মুহূর্তিতেই আমি চিঠিটা খুলে ফেলেছি। না, কোনো ভুল হয় নি, চিঠিটা আমারই, কারণ ভিতরেও আমার নামটা রাজকীয় নীলিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

নামের পরেই, সম্বোধনের স্থলে কাটাকুটি পত্র-লেখিকার দ্বিধায় নিশ্চিত সাক্ষ্য দিচ্ছে। প্রথমে বোধ হয় অন্য কোনো সম্ভাষণ ছিল, 'প্রীতিভাজনেষু' অথবা 'শ্রদ্ধেয়' তা পাঠোদ্ধারের কোনো পথ রাখা হয়নি। অসতর্ক সম্বোধনটি সযত্নে বার বার লেখনিতে কণ্টকিত করা হয়েছে।

এরপর ব্যক্তিগত সম্বোধনের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। তার বদলে 'সবিনয় নিবেদন':

'সবিনয় নিবেদন,

আজ ভোরবেলায় স্নানের সময় হঠাৎ আপনার কথা মনে পড়লো। আরও মনে পড়লো, ব্যাকারে ম্যান-সন থেকে বিদায় নেবার পরে আপনাকে কোনো খবরই দেওয়া হয়নি। এতোদিন কেন জানি না, একটা ধারণা ছিল আপনিই আমাদের খবরাখবর নেবেন। কিন্তু আজ খেয়াল হলো, আপনাকে ঠিকানা দিয়ে আসা হয়নি; আপনার ঠিকানা আমি জানলেও, আপনি আমার ঠিকানা জানেন না।

বাবা এখানকার নতুন পরিবেশে ভালই আছেন, মধ্যিখানের গ্লানিময় স্মৃতি ভুলবার পক্ষে জায়গাটা খারাপ নয়। বাবাকে সুখী দেখলে সীমার আনন্দ হবারই কথা। সে বেশী সুখী। কিন্তু সঞ্চয়ের কলসী ক্রমশই শূন্য হয়ে আসছে, তাই সুলেখার চিন্তা বাড়ছে।

সুলেখাকে নিয়েই যত মুশকিল। সে কী করবে এখনও বুঝে উঠতে পারছে না। তার জন্যে আপনি একটু প্রার্থনা করবেন। আপনার কাছে সে এবং আমি দুজনেই কৃতজ্ঞ।

ইতি

সীমা

চিঠিটা পর পর কয়েকবার পড়ে ফেলবার ইচ্ছা দমন করতে পারলাম না।

সীমা, তুমি আমাকে চিঠি না লিখলেই পারতে। বাবার সঙ্গে দেশে পাঠিয়ে দিয়েই তোমায় আমি ভুলে যেতে চেয়েছিলাম। সীমা, আমি ভাবতে চেয়েছিলাম, কোনো কর্মফলে তোমার কিছু দিনের নরক নির্বাসন হয়েছিল; তারপর নিজের বাবার হাত ধরে তুমি আবার পৃথিবীর বৃহৎ জনারণ্যে মিশে গিয়েছো। সীমা, তাইতো ভাল ছিল। তুমি কেন আবার চিঠি লিখতে গেলে? বিশেষ করে আমাকে, যার কোনো সম্পত্তি নেই, শক্তি নেই, সহায় নেই। একটা ভদ্রস্থ চাকরিও এই এতোদিন ধরে কলকাতার পথে পথে ঘুরে যে সংগ্রহ করতে পারেনি তাকে আবার চিঠি লেখা কেন? তার প্রার্থনা অথবা শুভেচ্ছার কী মূল্য আছে এই পৃথিবীতে?

সীমাকে চিঠির উত্তর দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। আমি সীমাকে লিখতে চাই: সুলেখার কথা তুমি আর মুখে এনো না। সুলেখাকে শেষ করে, মাটির অনেক তলায় পুঁতে ফেলে, সীমা তুমি তোমার বাবাকে নিয়ে গ্রামের দেশে থাকো। সীমা, প্লিজ সুলেখার কথা তুমি আর কখনও মুখে এনো না।

সীমাকে আমি এখনই একটা চিঠি লিখতে চাই। তার এক কোণেও বড় বড় করে লেখা থাকবে 'ব্যক্তিগত'। চিঠির ভিতরে C/o সীমা দেবী, সুলেখা সেনকেও একটা কড়া চিঠি লিখবো আমি। দোহাই, সীমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন না আপনি, সীমাকে আপনি শান্তিতে থাকতে দিন।

বোকার মতো চিঠি দুটো খস খস করে লিখে ফেলেছি আমি। কাগজ দুটো সযত্নে মুড়ে খামের মধ্যে ঢুকোতে গিয়ে আমার খেয়াল হলো সীমাকে চিঠি লেখার কোনো উপায় নেই। সীমা নিজের ঠিকানা লেখেনি।

নিজের ঠিকানা লিখতে ভুলে গেল নাকি সীমা? অথবা সীমা আমাকে চিঠিই দিয়েছে, উত্তর চায়নি। সীমা আমার উত্তর চাইবে না কেন? উত্তরই যদি না-চাইবে, তাহলে সীমা হঠাৎ আমাকে এইভাবে চিঠি লিখলো কেন? এই সব নানা ব্যক্তিগত প্রশ্ন আজকের বিকেলের সমস্ত সময়কে হঠাৎ যেন জটিল করে তুলো

সীমার চিঠিখানা হাতে করে অফিস ঘরে এসেছি। কর্মাধ্যক্ষের কিছু খুঁটিনাটি কাজকর্ম অসম্পূ অবস্থায় টেবিলে পড়ে রয়েছে। বিশেষ করে বিলাসি দেবীর সঙ্গে সাক্ষাতে গেলে, অবশ্যই হিসেবপ গুলো একেবারে আপটুডেট রাখা প্রয়োজন।

আমার হাতে এখন অনেক কাজ, সীমা, এই স এইভাবে ঠিকানাবিহীন চিঠি আমাকে না লিখ পারতে।

ভেবেছিলাম, সীমার সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ হয়ে গিয়েছে। ব্যাকারে ম্যানসনের চৌহদ্দিতে অন তার সঙ্গে আমার আর কোনোদিন দেখা হবে ন কিন্তু এই মুহূর্তে অন্যরকম ভাবনা চিন্তার মাথার মধ্যে জড়ো হচ্ছে। মনে হচ্ছে সীমার ব্যাপা শেষ কথা এখনও আমার জানা হয়নি। আমাকে সীমাকে হয় এখানে অথবা অন্য কোথাও আব মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।

"গুড মর্ণিং, স্যর!" মর্নিংকে মর্ণিং বলে তৃপ্ত পায় এমন একটি লোককেই আমার জানা আছে। ত নাম মদনা।

"আরে মদন! এতোদিন কোথায় ছিলে? তোম দেখাই নেই।" মদনার সঙ্গে সত্যিই অনেকদিন দে হয় নি।

মদনা সলজ্জভাবে নোখ কাটতে কাটতে আম দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, "আমাদে কথা সবই তো জানেন, স্যর। আমাদের তো যাব একটিই জায়গা আছে।"

উত্তর শেষ না করে মদনা নাখের নির্দিষ্ট অংশ দাঁত দিয়ে কেটে ফেললো। তারপর বললো, "আ বলেন কেন স্যর, এক ঘেটে খাকিপোষাকের পাল্লা পড়ে কিছুদিন হোটেলে ফ্রিতে খাটটা খেয়ে আসতে হলো।"

আমি ভাবলাম, ক পাল্লায় পড়ে মদন কলকাতার বাইরে কোনো হোটেলে কিছুদিন কাটি এসেছে; কিন্তু সেখানে মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি।

কিন্তু মদনা নিজেই আমার ভুল ভাঙালো— জানালো সে কিছুদিন জেলে কাটিয়ে এল। খাটটা মা যে জেলের খাবার, হোটেলে মানে জেল এবং ঘেটে খাকিপিরান যে দুষ্ট পুলিস তা আমি জানবো ক করে?

"কী করিছিলি এবার? কোথায় ধরা পড়লি? আমি জানতে চাই মদনার কাছ থেকে।

কিন্তু মনের দুঃখে মদনা বললো, "মা কালী দিব্যি, কিছুই করিনি। শুধু শুধু জেলার থে আসতে হলো।"

"মানে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

বেশ তিক্তভাবে মদনা উত্তর দিল, "আর বলে কেন, স্যর। থানার ওই ধম্মের ষাঁড় মিত্তিরবাবু। অনে দিন চেনাশোনা, ওঁর আমার লিস্টিতে নাম আছে মাঝে-মাঝে একটু-আধটু দেখাশোনা না করলে চ না। যখন যা বলে ফাইফরমাশ খেটে দিয়েছি। কয়ে বার এধার-ওধারের খবর দিয়ে দু' চারটে কেস ধরি দিয়েছি, তাতে মিত্তিরবাবু গরমেন্টের রিওয়ার্ড পেয়েছেন।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"তারপর মিত্তিরবাবু বলে কিনা তুই আমাদে সব সময় খবরাখবর দে, মাঝে মাঝে কিছু হাত-খ পাবি। আমি হাতজোড় করে বলেছিলাম, "না স আমি পার্মেন্ট 'ইনফর্মার' হতে পারবো না—ওপ ভগবান রয়েছেন, কখনও ক্ষমা করবেন না।"

আমি আন্দাজ করছি, ইনফর্মারের বিশ্বাসঘাতক।

রেগে মেগে মদনা বললো, "মিত্তিরবাবুর মত কালোমাযাগুলো যা হয়েছে না! সব সময় দুপ পয়সায় পেট্রোল টেনে-টেনে মোটকা হচ্ছে আর ঘু মেরে যাচ্ছে। নিজে থেকে চোর ধরবার আর খ্যামত নেই! তোমার ভুঁড়ির ওপর দিয়ে চোর পালাবে, আ অত্যাচার বাড়বে আমাদের ওপর।"

আমি বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি মদনার দিকে

[illegible] বললো, "[illegible] কথা আপনাকে
[illegible] বলবো। অবনাশি ম্যানেজার স্পেশ্যাল [illegible] পেট্রোল
[illegible] একটা মুটকী ডবলডেকার মেয়ের কপালের হাত
[illegible] বসে আছে। সেই অবস্থায় আমাকে দেখে
[illegible] ফেলেছে। কোনো লজ্জা শরম নেই। হাতভর্তি [illegible]
[illegible] হবে পয়সা খরচ করে [illegible] এসেছেন। [illegible]
[illegible]-পয়সের প্যাকেজাম!"

মদনা বলে চলেছে, "আমি তো স্যার বাধা হয়ে [illegible] করে খাঁকশিয়ালের সামনে কাঠের মতো [illegible] আছি। লোকে স্যার যোদ্-খোকা দেখলেও এই [illegible] সামলেসুমলে নেয়। মিত্তিরবাবুর ভাব [illegible] কোনো চেষ্টা হলো না, শুধু বললেন, মদনা [illegible] এসেছিস। আমি তখনও সেলাম করে স্ট্যাচুর মতো [illegible] আছি। উনি তখন ডবলডেকার মেয়ের তুল্-তুল্-[illegible] তলা দিয়ে ডালিম দুখানার সুড়সুড়ি দিচ্ছেন। [illegible] আহা! বোটাকাটা বেলফুল।"

"আঃ, মদনা," আমি বিরক্তভাবে বকুনি লাগালাম।

কাঁদ-কাঁদ হয়ে মদনা বললো, "আমি একটুও [illegible] বলছি না, স্যার। ঐ অবস্থায় মিত্তিরবাবু [illegible] বললেন, 'একটা কেসে তুই চালান হয়ে [illegible] হেল্প করবি, মদনা? এই মাস তিনেক জেল [illegible] তোর। কিন্তু আমার প্রমোশন মারে কে?' [illegible] চুরির কেসে ব্যাটা মিত্তিরবাবু আমাকে [illegible] চাইলো।"

এই কোলকে জিনিসটা যে রিভলবার, তাও [illegible] আমাকে বুঝিয়ে দিল।

মদনা বললো, "আমি স্যার ওই অবস্থায় মিত্তির-[illegible] পা জড়িয়ে ধরলাম। ব্যাটা আমার কথা [illegible] না। শেষে ওই ডবলডেকার মেয়ে আমার [illegible] কষ্ট পেয়ে মিত্তিরবাবুকে বললে, আহা ওইটুকু [illegible] রিভলবার কেসে জড়াবেন না। মিত্তির তখন [illegible] টং হয়ে দিদিমণির খাম খুলেছেন। আমাকে [illegible] বিদেয় করবার জন্যে বললেন, তাহলে, তুই [illegible] এক চক্কর [illegible] কেসটা উদ্ধার করে দে।"

আমি স্তম্ভিত হয়ে মদনার কথা শুনছি।

মদনা বললো, "আমার কোনো উপায় ছিল না। কোথায় কে কার বাড়িতে পাইপ বেয়ে ওপরে উঠে চুরি করতে গিয়ে কেটে পড়লো, আর আমাকে বাবুর সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখবার জন্যে এবং বাবুর প্রমোশনের জন্যে ছ' মাসের জেল খেটে আসতে হলো। তাও আমার ভাগ্য ভাল বলতে হবে। অবনাশি ম্যানেজারের ওই দিদিমণি তো বলেছিলেন, তোর কপালে ছ মাসের দুঃখ আছে। কিন্তু আদালতের খোকাবাবুটি ভাল মানুষ—কী ভেবে আমাকে মাত্তর ছ' সপ্তাহের শ্বশুরবাড়িতে পাঠালেন।"

মদনা বললো, "জেল থেকে বেরিয়ে এসে এ লাইনে জমা ধরে গিয়েছে, স্যার। বিশ্বাস করবেন না স্যার, দু' একবার লোটাপিরি ছাড়া ত্রেফ নুলো জগন্নাথ হয়ে বসে আছি।"

"লোটো জিনিসটা কী, মদনা?" আমি জানতে চাই।

জিভ কেটে সলজ্জভাবে মদনা উত্তর দিল "বিনা নেমন্তন্নে যারা কাজের বাড়িতে ঢুকে পেটপুরে খেয়ে আসে, স্যার। পুলিস এদেরই 'লোটো' বলে।"

মদনাদের জীবনের এই অন্ধকার দিক সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। মদনার কথা শুনে এক বিজাতীয় ঘৃণায় আমার রক্ত জ্বলছে; কিন্তু মদনার কথাবার্তায় কোনো ক্রোধের পরিচয় নেই।

মদনা বললো, "আপনি একটা কোম্পানির সায়েব হবার জন্যে মা কালীর কাছে মানত করুন, স্যার। ডানলপ, কেনার ওয়ানকোর্ট—কাছাকাছি কত কোম্পানিই তো রয়েছে।"

"তাতে তোমার কী লাভ হবে, মদনা?" আমি প্রশ্ন না করে থাকতে পারলাম না।

এক গাল হেসে মদনা উত্তর দিল, "সায়েব হলেই তো আপনার চাপরাসী লাগবে। তখন আপনি এই মদনাকে নিয়ে নেবেন, স্যার।"

মনের গোপন কোণে গভীর দুঃখ বোধ করলাম। আমিও সজ্জন হয়েছি, আর তোমারও দুঃখ ঘুচিয়েছি আমি, মদনা।

"এখন তুমি কী করছো, মদনা?" আমি এবার জানতে চাই।

মদনা বললো "সিলভার স্ক্রিনেই জয়েন করলাম, স্যার। চাওলা মেমসায়েব এর আগেও আমাকে বলে-ছিলেন, কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু এখন আমার আর ফিরে দাঁড়ানো নেই—একটা কিছু তো করতেই হবে।"

মিসেস শকুন্তলা চাওলা। এ-পাড়ায় একটি বিখ্যাত নাম। ব্যাংকের ম্যানেজারের একতলায় বিখ্যাত রেস্তোরাঁ সিলভার স্ক্রিনের সর্বময় কর্তৃ এই প্রাতঃস্মরণীয় মহিলার।

মদনা বললো, "আপনার সঙ্গে খুব জরুরী কথাবার্তা ছিল, স্যার।"

"মদনা যখন এসেই পড়েছো, তখন জরুরী কথা-বার্তাগুলো এখনই সেরে নাও।"

আকাশ থেকে পড়লো মদনা। "আমার কী জরুরী কথাবার্তা থাকতে পারে, স্যার? আমি তো সামান্য বেয়ারা।"

"তাহলে," আমি এবার একটু বিরক্ত হয়ে উঠেছি।

মদনা বললো, "চাওলা মেমসায়েব নিজেই জানতে চাইলেন, ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে তোমার কী রকম সম্পর্ক? আমি বললাম, 'একেবারে ফার্স্ট ক্লাস সম্পর্ক!' সেই না শুনে মেমসায়েব খুব খুশী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক টাকা বকশিশ দিলেন এবং বললেন, এখনই ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে দেখা করে এসো।"

মদনা এবার আমার দিকে এগিয়ে এলো। একটা কিছু স্পেশাল কথা যে সে এবার বলবে তা আমি বেশ বুঝতে পারছি।

(ক্রমশ)

শিল্পী অতুল বসু

শুদ্ধশীল বসু

অতুল বসু সেই বিরল এক চিত্রশিল্পী যিনি ৮০ বছরের সুদীর্ঘ জীবনের কোনো বাঁকেই নিজের মত বা পথের প্রতি আস্থা হারাননি—বরং স্বীয় বিশ্বাসকে একের পর এক উদাহরণে প্রমাণ করে তুলেছিলেন তর্কাতীতভাবে সত্য এবং অভ্রান্ত। স্রোত প্রবাহে এই শিল্পী সেই বিরল সাহসী যোদ্ধা যিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লড়াই করেছেন নন্দনতত্ত্বে সস্তা দেশপ্রেমের উন্মাদনায় (ন্যাকামিও বলা যেতে পারে) বিরুদ্ধে।

বাস্তবধর্মী চিত্রকলাকে ইউরোপীয় অঙ্কনরীতির মূর্খ অনুকরণ বলার জোয়ার এল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'খোয়াবনামা'র সঙ্গে সঙ্গেই বলা চলে। প্রখ্যাত শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় 'শিল্পগুরুরূপে অবনীন্দ্রনাথের জীবন শুরু হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় হইতে অবনীন্দ্রনাথের জীবন অনেক পরিমাণে কর্মতৎপর হইয়া উঠে এবং ভারতীয় শিল্পের নবজন্মদাতারূপে তিনি শিক্ষিত সমাজে স্বীকৃতি গ্রহণ করেন।' অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু প্রভৃতি কয়েকজনের মহত্ত্ব অনস্বীকার্য কিন্তু এঁদের ধ্বজাধারী অনুকারকবৃন্দ তরল স্বদেশীয়ানায় শিকার হন। ১৯০৭ সালে হ্যাভেল, উড্রফ, ভগিনী নিবেদিতা অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাদর্শের ব্যাপক প্রচার ও অভ্যাস, এবং তাঁকে জাতীয় জীবনের অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতির উদ্দেশ্যে ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির পত্তন করেন। কলকাতায় ১৮৭০ সাল থেকে কোনো নিয়মিত চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল না। ১৯০৭ সালে যখন তার ব্যবস্থা হয় তখন দেখা গেল তা মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের, যাঁরা ইউরোপীয় বাস্তববাদের উগ্র সমালোচক ও ভারতীয় রীতিতে চিত্ররচনায় চেষ্টা করেন, তাঁদের ছবি ছাড়া অন্য কোনো চিত্রকরের ছবির প্রদর্শনী করতে দেওয়া হোতো না। অথচ বাস্তবধর্মী চিত্রকলায় জগতে তখন অনেক ক্ষমতাসম্পন্ন চিত্রকর বর্তমান, কিন্তু ওরিয়েন্টাল সোসাইটির দাপটে অবহেলিত এবং লোকচক্ষুর আসরে আসতে অক্ষম। রূপদাপ্রসাদ গুপ্ত বাস্তবধর্মী চিত্রকলায় সেই প্রধান পুরুত যাঁর হাত দিয়ে সেই সব তরুণ শিল্পী আত্মপ্রকাশ করেছেন যাদের অন্যতম অতুল বসু, হেমেন মজুমদার, সতীশ সিংহ, শশী হেশ, যোগেশ শীল প্রভৃতি। গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্‌ট থেকে এঁদের অনেকেই তখন স্নাতক, এবং ওরিয়েন্টাল সোসাইটির গোঁড়ামিতে ক্ষুব্ধ। এঁরা দলবদ্ধভাবে একটি শিল্পচক্র গড়তে বদ্ধপরিকর হলেন। অতুল বসু, হেমেন মজুমদার প্রভৃতি যামিনী রায়কে সামনে রেখে ১৯১৯ সালে একটি শিল্পচক্র গড়ে তোলেন যার নাম দেওয়া হয় ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব আর্ট। একটি ত্রৈমাসিকও বের করা হয় ১৯২০ সালে। সুকুমার রায় ব্লক করে দিতেন, ছাপা হোতো লক্ষ্মীবিলাস প্রেসে—মূল্য নামমাত্র। অর্থবান পৃষ্ঠপোষকের অভাবে পত্রিকাটি চার সংখ্যা পরেই উঠে যায়। এবং ১৯২১ সালে অতুল বসু যোগেশ শীলের সঙ্গে সোসাইটি অফ ফাইন আর্টস বলে একটি প্রদর্শনী-সংস্থার পত্তন করেন। প্রদর্শনী সংস্থার মূল লক্ষ 'শিল্পীর স্বাধীনতা', যে কোনো অঙ্কন রীতিতে ভারতবর্ষের যে কোনো শিল্পীর ছবি প্রদর্শিত হ'তে

রবীন্দ্রনাথ

পারবে—সম্পূর্ণ গোঁড়ামি বহির্ভূত। প্রথম প্রদর্শনীর সভাপতি ছিলেন স্যার রাজেন মুখার্জি এবং উদ্বোধক বাংলার গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসে। অতুল বসুর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে, যেখানে তাঁর বিখ্যাত পোর্ট্রেট কাঠ কয়লায় আঁকা স্যার আশুতোষ রাখা হয়েছিল। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল নাম, 'বাংলার বাঘের' তেজী ব্যক্তিত্ব রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে, চরিত্রের দার্ঢ্য অস্বাভাবিকভাবে দীপ্যমান। অসামান্য পোর্ট্রেট আঁকিয়ে এই তরুণ শিল্পী, অতি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাঁর সামনে, এ বিষয়ে সমালোচকদের কারুর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। ১৯২৪ সালে অতুল বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি পেলেন বিদেশ যাবার—বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে আর কোনো চিত্রশিল্পীকে এই বৃত্তি আগে দেওয়া হয়নি। ইংলণ্ডে শ্রীবসু রয়াল অ্যাকাডেমিতে অঙ্কন অভ্যাস আরম্ভ করলেন। বাস্তবধর্মী চিত্রকলায়, বিশেষ ক'রে তেল রঙে বিরাট ক্যানভাসে পোর্ট্রেট অঙ্কনে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করে দু' বছর পরে ১৯২৬-এ দেশে ফিরে আর্টস স্কুলে অস্থায়ী চাকরি নিলেন। সোসাইটি অফ ফাইন আর্টস-এর প্রদর্শনীগুলি আর্টস স্কুলে হত কিন্তু আর্টস স্কুল কর্তৃপক্ষ ১৯২৮-এ প্রদর্শনী বন্ধ করে দিলেন। অতুল বসুর পক্ষে এই ঘটনার পর চাকরি করা সম্ভব নয়, কাজে ইস্তফা দিলেন। সোসাইটি অফ ফাইন আর্টসও উঠে গেল।—একটা কথা বলা হয়নি, বিলেতে থাকাকালে অতুল বসু রয়াল অ্যাকাডেমি থেকে বিশেষ "Ivory" সম্মানে ভূষিত হন, যা পৃথিবীর সমস্ত শিল্পীরই তখন সবচেয়ে লোভনীয় সম্মান। এই সময় অতুল বসু বাকিংহাম প্যালেস-এ বিশেষভাবে ইংলণ্ডের রাজা-রানীর সুবিশাল পোর্ট্রেট আঁকবার আমন্ত্রণ পান, এবং শ্রীবসুর অঙ্কনশৈলী মুগ্ধ করে বিদেশের চিত্রবিশারদদের।

আজকের অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস যা কলকাতায় চিত্রকলায় প্রাণকেন্দ্র তার প্রতিষ্ঠাতা যে অতুল বসু তা অনেকেই হয়তো জানেন না। এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক Johann Von Mannen এবং অতুল বসু ১৯৩৩ সালে স্থাপন করেন অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস—মূল পেট্রন মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর। ১৯৩৪-এ অতুল বসু কিছুকালের জন্য আবার বিলেতে ফিরে যান। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে এই ঈর্ষাকাতর দেশ অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস কেন জানিনা মেনে নিতে পারেনি, মেনে নিতে পারেনি সর্বভারতীয়, সর্ব রীতির শিল্পীর এই নিজস্ব ভবন, দলবাজিহীন এক চিত্রসংস্থার বীজবপন। বম্বে থেকে টাইমস অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদকীয়তে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হয় এই প্রচেষ্টাকে, এবং জে. জে. স্কুল অফ আর্ট-এর ডিরেক্টর গ্ল্যাডস্টোন সলোমন বড়লাটের কাছে আকুতি জানিয়ে চিঠি লেখেন এই মর্মে যে অ্যাকাডেমিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে হবে চিত্রকলাকে বাঁচাতে
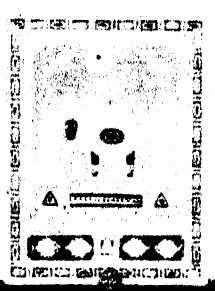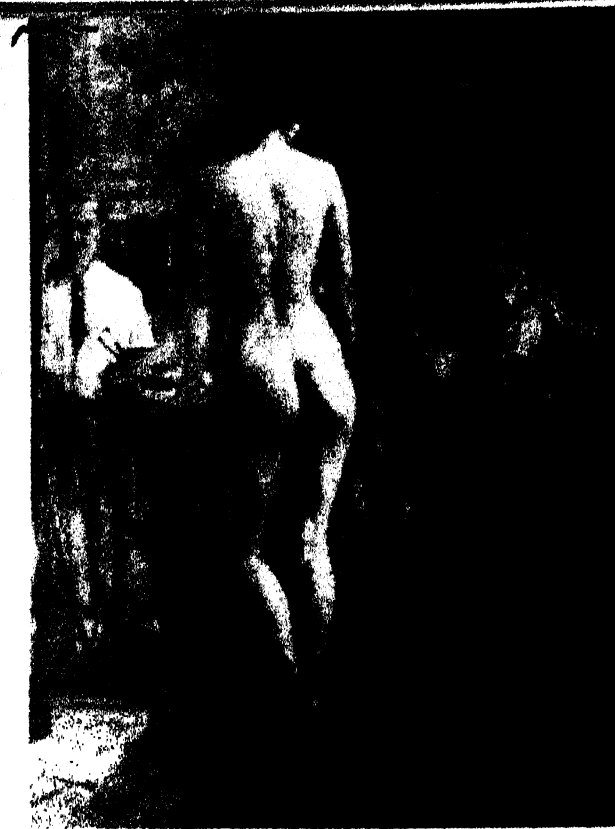
…নী রায়ের বার্ষিক সম্বর্ধনায় অতুল বসুর সঙ্গে, ১৯৬৬

চিত্রকরের স্টুডিও

হলো। তবুও অতুল বসু বিরোধিতা গ্রাহ্য করেননি, চিত্রকলায় পাশ্চাত্যের জগৎকম্প কল্যাণ করে টেনে নিয়ে গেছেন অ্যাকাডেমিকে, যা আজ মহীরুহে পরিণত।

ওপরে তৎকালীন ঘটনার বিবৃতি দেবার বিশেষ উদ্দেশ্য আমার এই যে শ্রীবসু শুধুমাত্র একজন বিরাট শিল্পীই ছিলেন না, ছিলেন একই সঙ্গে চিত্রকলার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে উৎসর্গীকৃত প্রাণ দৃঢ় অপরাজেয় এক সংগঠক, যাঁর অবদান কখনই বিস্মৃত হতে পারে না এই ভূখণ্ডের কোনো শিল্পীর কাছেই।

অতুল বসুর ছবির কথায় আসা যাক। মূলত পোর্ট্রেট আঁকিয়ে এই কথাটাই বারে বারে আমরা বলে থাকি তাঁর বিষয়ে, কিন্তু পোর্ট্রেট ছাড়াও শিল্পী অসংখ্য ল্যান্ডস্কেপ এঁকেছেন তাঁর শিল্পী জীবনে। তাঁর পোর্ট্রেটগুলিতে সবচাইতে যা লক্ষণীয় তা হলো রঙের সুমিত ব্যবহার, কাঠামোর সৌকর্য এবং নিখুঁত তুলির টান। অতি সূক্ষ্মভাবে হালকা-হালকা তুলির টানে, রঙের উপর রঙ চাপিয়ে তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত টোনটি বের করে নিতেন অসীম ধৈর্যের সঙ্গে। তাঁর ছাত্রদের কাছে শুনেছি একটি ছবি আঁকবার সময় তিনি প্যালেটের পাশে-পাশে অসংখ্য ক্যানভাসের টুকরো রাখতেন। রঙের ল্যাবরেটরিতে দক্ষ গবেষকের মত একটা রঙের ওপর আরেকটি রঙ ব্যবহার করলে ঠিক কী ফলাফল পাওয়া যায় তা পরীক্ষা করে নিতেন টেস্টক্যানভাসগুলিতে এবং যথাযথ ফলাফল পেলে বসাতেন তিনি তা মূল ক্যানভাসে। ধীরে-ধীরে রঙের ও রেখার সাযুজ্যে ফর্মটা বেরিয়ে আসত এবং তখন শিল্পী মন দিতেন, যে ব্যক্তিকে তিনি আঁকছেন তাঁর চরিত্র কীভাবে বের করে আনা যায়। অনেক শিল্পীর মতই অতুল বসুর কাছেও নগ্ন নারীর শরীর কাঠামোগত ভাবে ঈশ্বরের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর সৃষ্টি, এবং তা ক্যানভাসে যথাযথভাবে তুলে আনা শিল্পীর কাছে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। আমি আর কোনো ভারতীয় শিল্পীকে জানি না যিনি এত দক্ষভাবে ন্যুড-স্টাডি করেছেন। তাঁর ন্যুডগুলি এত সপ্রাণ, মনে হয় কাছে গেলে নিশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাবে, ছুঁলে অনুভব করা যাবে শরীরের উত্তাপ। এই প্রসঙ্গে একটি ছবির কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। ছবিটি একজন শিল্পীর স্টুডিওর, চাপা আলোয় দেখা যাচ্ছে পেছনে চিত্রকরের নানা সরঞ্জাম কিন্তু পেছন ফিরে যে সবচেয়ে দৃষ্টি-আকর্ষক সে একটি নগ্ন যুবতী, ক্যানভাসের প্রথম তলে দৃশ্যমান। কী সাবলীল তার দাঁড়ানোর ভঙ্গী। কী অসম্ভব জীবন তার সমস্ত অঙ্গে, কী নিটোল তার সুন্দর দেহভঙ্গি। ছবিটা দেখতে-দেখতে ফরাসী বাস্তববাদী চিত্রকর গুস্তাভ কুরবের The Studio ছবিটি মনে পড়ে।

অতুল বসুর অসংখ্য পোর্ট্রেটের মধ্যে সবচেয়ে বেশিবার যার ছবি দেখা যায় তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিল্পীর শেষ কাজও মন থেকে আঁকা রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধ বয়সের পোর্ট্রেট। প্রায় আশির কাছে এসে এমন এক দক্ষ ছবি তিনি এঁকেছিলেন, অবিশ্বাস্য। মোটামুটি পঁচাত্তরের ভিত্তি থেকে নেওয়া 'রবীন্দ্রনাথ' শারীরিকভাবে বয়স প্রকাশ করলেও মনের তারুণ্যে প্রসন্ন। সাদা দাড়ি হালকা হয়ে এসেছে একটু

বৃদ্ধা রমণী

তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে হালকা গোলাপী ঠোঁটের আভাস, উন্নত মস্তকে তিনি তাকিয়ে আছেন, কোথায় যেন কিঞ্চিৎ কৌতুকের দ্যুতি। ছবিটিতে অসম্ভব সুন্দর রঙের ব্যবহার; বিশেষত টারকোয়াজ ব্লুর সঙ্গে হাল্কা গোলাপী আর রুপোলী দাড়ির সমন্বয় এক অদ্ভুত চিত্র-অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ল যা অতুল বসু বারেবারেই বলতেন। একবার অতুল বসু শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের একটি পোর্ট্রেট আঁকছিলেন কবিকে সামনে বসিয়ে, কাছেই বসে ছিলেন নন্দলাল। রবীন্দ্রনাথ পরিহাস ছলে, অতুল বসুকে বললেন, "অতুল, আমার ছবি আঁকছ ঠিক আছে, কিন্তু একটি গুরুদক্ষিণা দিতে হবে।" —"নিশ্চয়, কী দেব বলুন?" —"তুমি নন্দলালের একটা ভালো পোর্ট্রেট এঁকে দেবে।" —নন্দলাল বসুর তো গায়ের রঙ খুব কালো ছিল, তিনি নিজেই সঙ্গে সঙ্গে একটি রসিকতা ছুঁড়লেন। বললেন, "অতুল তোমার যে ওই আইভরি ব্ল্যাক রঙের টিউবটা আছে, শুধু সেটা থাকলেই আমার ছবি তুমি আঁকতে পারবে, ক্যানভাসে ওটা বুলিয়ে দিও, নন্দলাল হয়ে যাবে।" —হাস্যরোলের মধ্যে অতুল বসু আইভরি-ব্ল্যাক টিউবটি নন্দলালের পায়ের দিকে ছুঁড়ে দিলেন, তারপর বললেন, "আপনার পোর্ট্রেট আমি আঁকব, কিন্তু আইভরি ব্ল্যাকের একটি ছোঁয়াও তাতে থাকবে না।" সত্যিই কালো রঙ ছাড়াই এক জীবন্ত যথাযথ পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন শ্রীবসু নন্দলালের। অতুল বসুর পোর্ট্রেট প্যানেলে দেশনেতা, শিল্পী, সাহিত্যিক, বন্ধু, সমাজ-সংস্কারক, সাধারণ লোক এমন কারুরই অনুপস্থিতি নেই। ভারত সরকারের কমিশনে তাঁর একাধিক পোর্ট্রেট পাওয়া যাবে পার্লামেণ্ট কক্ষে, রাজ্য অ্যাসেম্বলিতেও তাঁর একাধিক ফুল সাইজ পোর্ট্রেট রয়েছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালেও বেশ কয়েকখানা দেখা যায়। অতুল বসুর প্রায় দুশো ছবি Academyর permanent galleryতে রয়েছে। স্বগৃহেও রয়েছে তাঁর অনেক ছবি। সেখানেই আমি শ্রীবসুর ল্যান্ডস্কেপগুলি দেখলাম। হিমালয়ের অনেকগুলি তেল রঙের চিত্র দেখলাম, দেখলাম অতি সুন্দর মজঃফরপুরের লাল মাটির ধুলো ভরা রাস্তার ছবি, দূরে থেকে দেখা Constable-এর মতো কয়েকখানি স্টাডি। তাছাড়া দেখলাম অজস্র স্কেচ, ড্রইং, এবং কাল্পনিক মানুষের চিত্র। অতুল বসুর ছবিতে কখনো মুভমেন্ট দেখিনি, সাধারণভাবে স্থিরচিত্রই আঁকতেন তিনি, মানুষের মুখের অভিব্যক্তি, বসবার বা দাঁড়াবার ঠাম, গঠনের এবং রঙের পারম্পর্য। এই পৃথিবীতে তিনি মানুষের মুখে দেখেছিলেন সবচেয়ে গভীরতম ক্রমবিবর্তমান অভিব্যক্তি—তা তুলে আনতে সবচেয়ে উৎসাহী ছিলেন ক্যানভাসে। দৃশ্যগতভাবে Perspective তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানাতো তীক্ষ্ণভাবে, তার পরীক্ষায় তিনি ছিলেন সদাপ্রচেষ্টা এবং সাতাকারের সার্থক। রঙ তাঁকে মুগ্ধ করত ক্ষণে ক্ষণে, সেই রঙ তিনি ধরে আনতেন নিজের ছবিতে; সপ্রাণ ও অকৃত্রিমভাবে রহস্যময় এই রঙিন পৃথিবী তাঁকে মুগ্ধ করত, বিস্মিত করত। অতুল বসু সেই পৃথিবী থেকে কিছুদিন আগে বিদায় নিলেন।

বিজ্ঞান

পদার্থের গঠন জানতে এখন প্রতিবস্তুকণার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে

আজকাল সবার মুখেই শোনা যায়, 'মশাই, যতই দাম দিন, খাঁটি জিনিস আপনি পাবেন না। সব ভেজাল। ভেজালে ভরা।' খাদ্যসামগ্রী কিনতে গিয়েই বেশির ভাগ সময় এ ধরনের মন্তব্য করেন তাঁরা ভেজাল খাবার শরীরের ক্ষতি করে বলে। আর এক দল লোক আছেন, তাঁদের সুর কিন্তু ঠিক এর উল্টো। যে বস্তুটি তাঁরা চান তার কথা উঠলেই তাঁরা বলতে শুরু করেন, খাদটা ঠিক মত মেশান হয়েছে তো? কারণ তাঁরা জানেন খাদ মানে ওই ভেজাল না থাকলে ওই বস্তু দিয়ে তাঁদের কোন কাজই হবে না।

ইদানীং ইলেকট্রনিকস যন্ত্রপাতিতে ব্যবহার করা হচ্ছে নানা রকম ক্রিস্টাল বা কেলাস। এই সব কেলাসের কার্যকারিতা বাড়াতে গেলে এদের পারমাণবিক সজ্জার মধ্যে কিছুটা ত্রুটি রাখা দরকার। অর্থাৎ একটি আদর্শ কেলাসের মধ্যে বস্তুর পরমাণুগুলি যে ভাবে সাজান থাকে, এ ক্ষেত্রে সেই সাজানর মধ্যেই থাকবে কিছুটা ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমটুকু বজায় রাখার জন্যে কেলাসে কিছুটা খাদ প্রয়োগ করতে হয়।

অথবা ধাতুর কথাই ধরুন। অনেকেই জানেন, বিশুদ্ধ ধাতু মাত্রই নমনীয় হয়। কিন্তু যেই তার মধ্যে কিছুটা খাদ মিশিয়ে দিলেন, অমনি হয়ে উঠল যথেষ্ট শক্ত এবং সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি তৈরির ব্যাপারে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। প্রাচীন পৃথিবীর মানুষের কাছেও এ তথ্যটি জানা ছিল বলেই, দেখা যায়, লোহাকে শক্ত করার জন্যে তারা লোহাকে গলিয়ে তার মধ্যে মিশিয়ে নিত উপযুক্ত পরিমাণ কার্বন কণা। কখনও বা পর্যায়ক্রমে গরম করে এবং ঠান্ডা জলে মিশিয়ে গুণগত মান বাড়িয়ে নিত। অথবা একই ধাতুর মধ্যে একাধিক ধাতু মিশিয়ে তৈরি করত ধাতু সংকর। কাচের কেলাসে অপদ্রব্য মিশিয়েই তৈরি করা হয় রঙিন চশমার কাচ।

তবে খাদেরও খানিকটা মাত্রা থাকা দরকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তৈরি করা হল নানা রকম সংকর ধাতু। এমন সব ধাতু যারা উচ্চতর তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে, সহ্য করতে পারে প্রচণ্ড যান্ত্রিক বল। অবশেষে ওই সব সংকর ধাতু দিয়ে তৈরি করা হল জেট ইঞ্জিন। কিন্তু সেই ইঞ্জিন নিয়ে বেশ খানিকটা অসুবিধেয় পড়লেন বিমান কোম্পানির ইঞ্জিনিয়াররা। তাঁরা দেখলেন, প্রতি এক শ' ঘণ্টা ওড়ার পর প্রত্যেকটি জেট ইঞ্জিন পুরোপুরি মেরামত না করলে কাজ চলে না। সেই সঙ্গে কিছু কিছু অংশও পালটাতে হয়। পরীক্ষা করে জানা গেল, যে সব ধাতু সংকর দিয়ে ওই সব যন্ত্রপাতি তৈরি তারা প্রচণ্ড উত্তাপ এবং যান্ত্রিক চাপে অল্প সময়ের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দেখা দেয় নানা রকম ত্রুটি।

এই ত্রুটি দূর করার জন্যে শুরু হল নতুন পর্যায়ে গবেষণার কাজ। তৈরি হল নতুন ধরনের সংকর ধাতু। জানা গেল, একটি ধাতুর মধ্যে একাধিক ধাতু মেশালেই আরাধ্য সংকর ধাতু পাওয়া যায় না। আরাধ্য সংকর ধাতু পেতে গেলে জানা দরকার : এক, কোন কোন ধাতু কি পরিমাণে মেশাতে হবে সে সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান। দুই, মেশানর পর ওই সব ধাতুর পরমাণু সংকর ধাতুর মধ্যে কি ভাবে সজ্জিত হবে সে সম্পর্কে যথাযথ তথ্য। এই সব তথ্য পরে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হল আধুনিক জেট ইঞ্জিন। যাদের ওজন আগেকার ইঞ্জিনগুলি থেকে অনেক কম। তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র। তেল পোড়ে আগের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। বড় রকমের সাফাই বা মেরামতি ছাড়া এই সব ইঞ্জিন মোট ১২০০০ ঘণ্টা পর্যন্ত কার্যক্ষম থাকে।

শুধু জেট ইঞ্জিনই নয়। নানা রকম যন্ত্রপাতি বা সাজসরঞ্জাম তৈরির জন্যে আজকাল কত রকম সংকর ধাতুই না তৈরি হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে বড় বড় পারমাণবিক চুল্লী। সেই সব চুল্লী থেকে যাতে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্যে সংকর ধাতুর তৈরি আচ্ছাদন ব্যবহার করা হয়। তবে তার আগে দেখা দরকার ওই আচ্ছাদনের মধ্যে এতটুকুও ত্রুটি যেন না থাকে। থাকলেই বিপদ। কেলাসের পারমাণবিক গঠন জানার জন্যে অনেক সময় কাজে লাগান হয় একস-রশ্মি। অনেক সময় দেখা যায় একস-রশ্মি দিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে মূল কেলাসের গঠন বৈচিত্র্যই পালটে যায়।

এ সব সমস্যার কথা ভেবে পদার্থের সূক্ষ্মতম গঠন জানার ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা এখন নতুন একটি পদ্ধতি কাজে লাগাচ্ছেন। নাম পজিট্রন পদ্ধতি। পজিট্রন এক ধরনের প্রতিবস্তুকণা।

*

১৯২৮ সালের আগে পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে এ ধরনের কণা কল্পনারও বাইরে ছিল। নিউট্রন তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তাঁরা মনে করতেন মৌলিক পরমাণু মাত্রই দু রকমের মৌল কণা দিয়ে তৈরি। ইলেকট্রন এবং প্রোটন। কিন্তু ১৯২৯ সালে পরমাণুর এই সরল চিত্রটি পালটে দিলেন নোবেল বিজ্ঞানী ডঃ পি এ এম ডিরাক। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করলেন, যে কোন পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন এবং প্রোটন ছাড়াও আরও এক ধরনের বিচিত্র কণা থাকা সম্ভব। এরা ইলেকট্রনেরই 'অ্যান্টিপারটিকেল' বা প্রতিবস্তুকণা। ইলেকট্রনের সঙ্গে এই সব কণার মিল যথেষ্ট। যেটুকু অমিল সেটা হল, ইলেকট্রনে থাকে নেগেটিভ বিদ্যুৎ আধান, আর পজিট্রনে থাকে পজিটিভ বিদ্যুৎ আধান। ইলেকট্রনের এই প্রতিবস্তুকণার নাম দেয়া হয় পজিট্রন। ডিরাকের এই তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার পর পদার্থবিজ্ঞানী মহলে তুমুল বিতর্কের ঝড় ওঠে। বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই মন্তব্য করেন, ডিরাকের এটা পাগলামি। ব্রহ্মাণ্ডে এ ধরনের কণা থাকতেই পারে না। কিন্তু ১৯৩১ সালে এই বিতর্কের ওপর হঠাৎ যবনিকা পড়ল। মার্কিন পদার্থ-বিজ্ঞানী কার্ল অ্যানডারসন ওই বছর পরীক্ষাগারে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে প্রমাণ করলেন, ডিরাক ভুল করেন নি। পজিট্রনের অস্তিত্ব মিথ্যে নয়।

বলা হল, ইলেকট্রন এবং পজিট্রন পরস্পর মিলিত হলে ওদের বস্তুগত অস্তিত্ব লোপ পায়। উভয়ের বস্তুই তখন রূপান্তরিত হয় শক্তিতে। এই শক্তি গামা রশ্মি হিসেবে প্রকাশ পেয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা লক্ষ করলেন, এই রূপান্তর পরমাণুর অভ্যন্তরে ঘটলে গামা রশ্মির বিকিরণে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। যাদের বিচার করে বস্তুর গঠন সম্পর্কে সূক্ষ্মতম পর্যায়ে অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

কঠিন অথবা ঘনীভূত তরলের মধ্যে ইলেকট্রন এবং পজিট্রন পরস্পর সংস্পর্শে এলে তাদের বস্তুগত অস্তিত্বের বিলোপ ঘটে। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'অ্যানাইহিলেশন'। এই বিলোপের ফলে যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয় আইনস্টাইনের সমীকরণ $E=mc^2$ দিয়ে তা প্রকাশ করা যায়। এখানে E বস্তুর শক্তি, m বস্তুর ভর এবং c আলোর বেগ। ইলেকট্রনের মধ্যে থাকে নেগেটিভ আধান এবং পজিট্রনের থাকে পজিটিভ। এদের বিলুপ্তির পর শক্তি হিসেবে গামা রশ্মির উদ্ভব। এই গামা রশ্মির ফোটনে কোন বিদ্যুৎ আধান থাকে না। থাকে শক্তি। ইলেকট্রন এবং পজিট্রন এই দুটি কণা সৃষ্টি করে দুটি গামা রশ্মির ফোটন। এই ফোটনের এক-একটির মধ্যে থাকে ০.৫১১ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট-এর মত শক্তি। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ফোটন দুটি সৃষ্ট বিন্দু থেকে পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ধাবিত হয়। অর্থাৎ তাদের গতিপথের মধ্যেকার কোণ তখন দাঁড়ায় ১৮০ ডিগ্রি।

প্রসঙ্গত বলা চলে, ইলেকট্রনের প্রতিবস্তুকণা পজিট্রন আবিষ্কৃত হওয়ার পর তাত্ত্বিক পদার্থ-বিজ্ঞানীরা একে একে আরও নানা রকম প্রতিবস্তু-কণার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। এদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক কণা পরীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত করাও সম্ভব হয়েছে। জানা গেছে প্রোটনেরও প্রতিবস্তুকণা আছে। যার নাম দেয়া হয়েছে অ্যান্টিপ্রোটন। প্রোটনে থাকে পজিটিভ বিদ্যুৎ আধান, আর অ্যান্টিপ্রোটনে থাকে নেগেটিভ বিদ্যুৎ আধান। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে আর এক ধরনের কণা। যাকে বলা হয় নিউট্রন। প্রোটন এবং নিউট্রনের মধ্যে কাজ করে পারমাণবিক বল বা নিউক্লিয়ার ফোর্স। এই নিউট্রনেরও আছে প্রতিবস্তুকণা। নাম অ্যান্টিনিউট্রন। পরীক্ষা করে দেখা গেছে অ্যান্টিপ্রোটন এবং অ্যান্টিনিউট্রনের মধ্যেও পারমাণবিক বল বিদ্যমান।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বস্তু এবং প্রতিবস্তু অর্থাৎ 'ম্যাটার' এবং 'অ্যান্টিম্যাটার' দুই বাস করছে। এবং সমপরিমাণে। এই সব প্রতিবস্তুর পরমাণুর চেহারা হবে সাধারণ বস্তুর পরমাণুর ঠিক বিপরীত। সাধারণ বস্তুর পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন। আর সেই নিউক্লিয়াসের আশ-পাশে বিচরণ করে নেগেটিভ আধানযুক্ত কণা ইলেকট্রন। প্রতিবস্তুর নিউক্লিয়াসে আছে অ্যান্টিপ্রোটন এবং অ্যান্টিনিউট্রন। আর তার নিউক্লিয়াসকে ঘিরে বিচরণ করছে পজিটিভ আধানযুক্ত কণা পজিট্রন। এবং শুধু এখানেই শেষ নয়। সুইডেনের পদার্থবিজ্ঞানী অসকার ক্লাইন এমন কথাও বলেছেন, আমাদের পরিচিত নক্ষত্র জগৎগুলি বা গ্যালাকসি যেমন তৈরি হয়েছে সাধারণ বস্তু দিয়ে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে হয়ত আরও এক ধরনের নক্ষত্র জগৎ বাস করছে। প্রতিবস্তু দিয়ে যারা তৈরি। যাদের বলা চলে অ্যান্টি-গ্যালাকসি। হয়ত কেউ কেউ বলবেন, তাই যদি হয়, তা হলে গ্যালাকসি এবং অ্যান্টি-গ্যালাকসিরা পাশাপাশি এসে ওই ইলেকট্রন এবং পজিট্রনের মত বিলুপ্ত হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে না কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর হয়ত একটিই। মাধ্যাকর্ষণ বা

নোবেল বিজ্ঞানী পি এ এম ডিরাক (বাঁ দিকে) তাত্ত্বিক গবেষণা করে সর্বপ্রথম পজিট্রন এবং প্রতিবস্তুকণার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করেন। এর অনতিকাল পর নোবেল বিজ্ঞানী এবং 'পারমাণবিক চুল্লী' বা 'নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটার'এর জনক এনরিকো ফের্মি (ডান দিকে) প্রতিষ্ঠা করলেন 'ফের্মি' এক্সক্লুশন প্রিন্সিপল' সৃষ্টি হল 'ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন। এরাই ধাতু এবং ধাতু-সংকরের গঠন জানার ব্যাপারে এক নতুন এবং বলিষ্ঠ তাত্ত্বিক মতবাদ তুলে ধরেন

আপনার জন্ম যদি ১৯৫৩ সালের আগে হ'য়ে থাকে আপনার চুল উঠতে থাকবে...চিরকালের মত!

পিওর সিলভিক্রিন চুল ওঠা বন্ধ করে সত্যিসত্যিই চুলের একেবারে গোড়া থেকেই চুলকে শক্ত ক'রে তোলে।

পিওর সিলভিক্রিন একটি অনন্য, বিজ্ঞান-সম্মতভাবে গবেষণাকৃত ফরমুলা।

যাঁদের বয়স ২৫ বা তা'র বেশী তাঁদের ১০ জনের মধ্যে ৯ জনেরই চুলের গোড়ায় একান্ত প্রয়োজনীয় অ্যামিনো এসিডের ঘাটতির দরুন চুলের বৃদ্ধি অস্বাস্থ্যকর হয়। এর প্রতিকার না করলে, চুলের গোড়া দুর্বল হ'য়ে চুল উঠতে শুরু করে। পিওর সিলভিক্রিন হ'ল একটি বিজ্ঞানসম্মতভাবে গবেষণাকৃত ফরমুলা যা'তে রয়েছে ১৭টি অ্যামিনো-এসিডের সবগুলি, স্বাভাবিক প্রোটিন,—যা চুল সুস্থ হয়ে বেড়ে ওঠার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

চুল ওঠা বন্ধ করে, চুলের গোড়া থেকেই চুলকে শক্ত ক'রে তোলে

পিওর সিলভিক্রিন তাড়াতাড়ি চুলের গোড়ার গভীরে প্রবেশ করে, চুলে স্বাভাবিক প্রোটিনের যে ঘাটতি ছিল—সেই চাহিদা মেটায়। অল্প সময়ের মধ্যেই, পিওর সিলভিক্রিন চুলকে শক্ত ক'রে তোলে, চুলকে ফিরিয়ে দেয় আগের স্বাস্থ্য আর নব বৃদ্ধি। যতদিন না আপনার চুল আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসছে, ততদিন প্রত্যহ দু বার ক'রে কয়েক ফোঁটা পিওর সিলভিক্রিন ব্যবহার করুন।

প্রমাণিত ফল

"পিওর সিলভিক্রিন ব্যবহার ক'রে আমি খুব ভাল ফল পাচ্ছি... আমার চুল ওঠা বন্ধ হ'য়েছে।"
ডি. শাহিন, তারাবাগপার্ক, ১৩ হাসা মহল, কাফ প্যারেড, বোম্বাই।

"পিওর সিলভিক্রিন-এর ওপর আমার পুরো আস্থা আছে... কারণ এটি আমার চুলের স্বাস্থ্য অটুট রাখে।" এম, ভেনুগোপাল, সুদেশ্চাব পবাইল, নেমারা, পালঘাট (ডিস্ট্রি), কেরালা।

চুলের স্বাভাবিক আহার

পিওর সিলভিক্রিন

OBM-8153-BEN

সিলভিক্রিন হেয়ার ড্রেসিং
সুস্থ চুলের জন্য দৈনিক আহার

চুল পড়তে থাকা যখন একটা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ায়, ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না। সুস্থ চুলের দৈনিক যত্ন নেওয়া দরকার। এজন্য আপনি যে হেয়ার ড্রেসিং প্রত্যেক দিন (এবং দিনের পর দিন) ব্যবহার করেন সেটিকে দুরকমভাবে কাজ করতে হবে: এটি যেমন আপনার চুল ঘন্টার পর ঘন্টা সুবিন্যস্ত রাখবে তেমনি চুলের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও উন্নতি সাধন করবে। একমাত্র সিলভিক্রিন হেয়ার-ড্রেসিং-এ রয়েছে তেলের গুণ ও পিওর সিলভিক্রিনের সমন্বয়—যা আপনার চুল চমৎকারভাবে সুবিন্যস্ত রাখে এবং চুলে স্বাভাবিক পুষ্টি যোগায়। অন্য কোনো হেয়ার ড্রেসিং আপনার চুলের এত যত্ন নেয়না।

গ্র্যাভিটি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে কোন দুটি বস্তুর মধ্যে কাজ করে মাধ্যাকর্ষণ বল। প্রতিতুলনায় এই বলের চরিত্রটি হয়ত বিপরীত। আকর্ষণের পরিবর্তে বিকর্ষণ। এই বিকর্ষণ বলকে আমরা অ্যান্টিগ্র্যাভিটি বলতে পারি। অ্যান্টিগ্র্যাভিটি বা প্রতি-মাধ্যাকর্ষণের দরুনই হয়ত গ্যালাক্সি এবং অ্যান্টি-গ্যালাক্সি পরস্পর কাছাকাছি হতে পারে না। আর পারে না বলেই তাদের বিলোপ সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি বা প্রতি-মাধ্যাকর্ষণের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনও পর্যন্ত এক মত হতে পারেন নি।

*

'বিশেষ বিশেষ যন্ত্রপাতি অথবা যন্ত্রাংশের জন্যে এখন আমাদের নানা রকম ধাতু সংকরের (বা অ্যালয়) কথা ভাবতে হয়। এমন সব ধাতু-সংকর, যাদের ওপর প্রচণ্ড যান্ত্রিক-বল প্রয়োগ করলেও সহজে ভাঙ্গে না, প্রচণ্ড উত্তাপ অথবা শূন্য ডিগ্রি তাপমাত্রার অনেক নিচেও যাদের কার্যক্ষমতা থাকে অক্ষুণ্ণ। কিন্তু ঠিক কি ধরনের ধাতু-সংকর হলে নির্দিষ্ট কাজটি চালান সম্ভব হতে পারে, সেটা জানবেন কি করে?' কিছুদিন আগে এই প্রশ্নটিই তুলে ধরেছিলেন কিংস্টোন-এর কুইনস বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক এ টি স্টুয়ার্ট।

অধ্যাপক স্টুয়ার্টের বক্তব্য, 'বিশুদ্ধ ধাতুর গুণাগুণ জানার ব্যাপারে নানা রকম পদ্ধতি কাজে লাগান হয়। তাতে নির্ভরযোগ্য তথ্যও পাওয়া যায়। কিন্তু গোলমাল ওই ধাতু-সংকরের বেলায়। ধরুন, কোন একটি যন্ত্রাংশ তৈরি করতে হবে। বিশুদ্ধ ধাতু দিয়ে এটি তৈরি করা সম্ভব নয়। ভাবতে হবে ধাতু-সংকরের কথা। এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, কি ধরনের ধাতু-সংকর হলে আপনার কাজ চলতে পারে? অর্থাৎ কোন কোন মৌলিক-ধাতু মিশিয়ে নির্দিষ্ট ওই ধাতু-সংকরটি আপনি তৈরি করবেন? এবং শুধু মৌলিক-ধাতুগুলি জানলেই চলবে না, জানা দরকার, ওই সব ধাতু কি কি অনুপাতে মেশাতে হবে, মেশানর পর কত তাপমাত্রায় কতক্ষণ ধরে রাখতে হবে, মিশ্রণের পর বিভিন্ন ধাতুর পরমাণু কি ভাবে সজ্জিত হবে, সজ্জিত হওয়ার পর তাদের পারস্পরিক পারমাণবিক আচরণই বা কেমন দাঁড়াবে, এমন নানা রকম তথ্য। তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে এ সব কথা হয়ত বলে দেয়া যায়। কিন্তু তত্ত্ব অনুযায়ী ধাতু-সংকরটি সত্যিই তৈরি করা গেল কি না সেটা পরীক্ষা করে যাচাই করার যে সব প্রচলিত পদ্ধতি কাজে লাগান হয় অনেক সময় তারা নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। পজিট্রন-ইলেকট্রনের পারস্পরিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে এই অসুবিধেটি আমরা দূর করতে পারব।'

সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই রকম : যে ধাতু-সংকরটি আপনি পরীক্ষা করতে চান তার এক টুকরো নমুনা নিন। তার কাছে রাখুন পজিট্রনের উৎস। সেই উৎস থেকে পজিট্রন কণা বেরিয়ে এসে ঢুকবে ওই নমুনার মধ্যে। গিয়ে হাজির হবে নমুনাটির কোন একটি পরমাণুর ভেতর। এখন পরমাণুর মধ্যে বিচরণ করে একাধিক ইলেকট্রন কণা। ধরা যাক, ওই ইলেকট্রনের যে কোন একটি গতিসাম্য অবস্থায় পজিট্রন কণাটির সঙ্গে মিলিত হল। মিলনের সঙ্গে সঙ্গে ঘটবে 'অ্যানিহাইলেশন' বা তাদের বস্তু অস্তিত্বের বিলুপ্তি। পরিবর্তে তৈরি হবে দুটি গামা রশ্মির ফোটন। সৃষ্টির পর এই ফোটন দুটি পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ধাবিত হবে। অর্থাৎ তাদের গতিপথের মধ্যে সৃষ্ট হবে ১৮০ ডিগ্রি কোণ। এবার ধরা যাক, ইলেকট্রনটি গতিশীল অবস্থায় রয়েছে। ওই অবস্থায় সেটি গিয়ে আছড়ে পড়ল পজিট্রনের ওপর। এক্ষেত্রেও দুটি গামা-ফোটন তৈরি হবে। তৈরি হওয়ার পর এবারও ওই ফোটন দুটি পরস্পর বিপরীত অভিমুখে ছুটবে ঠিকই। কিন্তু তাদের গতিপথের অন্তবর্তী কোণ এবার আর ১৮০ ডিগ্রি হবে না, হবে তার চেয়ে কিছুটা কম। কতটা কম হবে সেটা মাপা যায়। এবং তা থেকে বলে দেয়া সম্ভব, যে ইলেকট্রনটি পজিট্রনের ওপর গিয়ে আঘাত করেছিল তার বেগ বা ভেলোসিটি কত।

পজিট্রনের উৎসটি কি?

বিভিন্ন ধরনের তেজস্ক্রিয় পদার্থকে পজিট্রনের উৎস হিসেবে কাজে লাগান যেতে পারে। তবে আদর্শ উৎস হিসেবে গবেষকরা আপাতত সোডিয়াম-২২কেই কাজে লাগাচ্ছেন বেশী। খাবারের সঙ্গে যে লবণ ব্যবহার করা হয় তাকেই বলে সোডিয়াম ক্লোরাইড-২৩। সাইক্লোট্রনের সাহায্যে এই সোডিয়াম-২৩ এর কিছু কিছু পরমাণুকে রূপান্তরিত করা হয় সোডিয়াম-২২ আইসোটোপে। বাংলায় যাদের বলা হয় সমস্থানিক পদার্থ। সোডিয়াম-২২ একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। এই আইসোটোপটি থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকীর্ণ হয় দুই ধরনের রশ্মি। পজিট্রন কণা বা পজিট্রন রশ্মি এবং গামা রশ্মি বা গামা ফোটন। দেখা যায় যে মুহূর্তে সোডিয়াম-২২ থেকে একটি পজিট্রন কণা বেরিয়ে এল, ঠিক সেই মুহূর্তেই তার সঙ্গী হিসেবে জন্ম নিল একটি গামা ফোটন। এই গামা ফোটনের শক্তির পরিমাণ ১.৩ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট। ডিটেকটার বা সন্ধানী যন্ত্রের সাহায্যে এই

উন্নততর জেট ইঞ্জিন তৈরি করার জন্যে দরকার বিশেষ ধরনের ধাতু-সংকর। যা সহজে ভাঙবে না, উচ্চতর তাপমাত্রায় গলবে না। ইলেকট্রন-পজিট্রন বিক্রিয়ার সাহায্যে বিজ্ঞানীরা এখন এই ধরনের ধাতু-সংকর তৈরি জন্যে গবেষণা চালাচ্ছেন

গামা ফোটনের আবির্ভাব জানা যেতে পারে। অতএব ব্যাপারটা দাঁড়াল এই : পজিট্রনের উৎস হিসেবে নেয়া হল কিছুটা সোডিয়াম-২২। তার সামনে রেখে দেয়া হল একটি গামা-ফোটন সন্ধানী যন্ত্র। সেই যন্ত্রের নির্দেশক যে মুহূর্তে জানিয়ে দেবে এবার তার 'রিডিং' বা পাঠ উঠল ১.৩ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট, তখন বুঝতে হবে একটি গামা-ফোটনের জন্ম হল। তার মানে একটি পজিট্রনও জন্মাল সেই সঙ্গে। আর এই ভাবেই একের পর এক পাঠ দেখে বলে দেয়া সম্ভব সোডিয়াম-২২ থেকে মোট কতগুলি পজিট্রন বেরিয়ে এসেছে।

এই পজিট্রন কণার গতিপথের সামনে রেখে দেয়া হয় যার গঠন মাপা হবে সেই বস্তুটির কিছু নমুনা। পজিট্রন কণারা সেই নমুনার পারমাণবিক পরিমণ্ডলে গিয়ে থেমে পড়বে। থেমে পড়বে খুব কম সময়ের মধ্যে। এক সেকেণ্ডের এক হাজার কোটি ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যেই থেমে পড়বে। আর এই স্থিতি-শীল হওয়ার পরমুহূর্তেই এক একটি পজিট্রনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে নমুনার পরমাণুর এক একটি ইলেকট্রন। সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রন-পজিট্রনের বিক্রিয়া এবং বিলুপ্তি। পরিবর্তে জোড়ায় জোড়ায় গামা-ফোটনের জন্ম। যাদের এক একটির শক্তির পরিমাণ ০.৫১১ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট। ইলেকট্রন-পজিট্রন বিক্রিয়াজনিত এই গামা রশ্মির অস্তিত্ব অপর একটি নির্দেশক যন্ত্রের সাহায্যে জানা যায়। জানা যায় তাদের গতিপথের নিশানাও। আগেই বলেছি, ইলেকট্রন এবং পজিট্রন যদি স্থির অবস্থায় থাকে এবং তখন যদি তাদের মধ্যে মিলন ঘটে, তখন যে দুটি গামা-ফোটন জন্মায় তাদের গতিপথ হয় ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ উভয়ের গতিপথের মধ্যে রচিত হয় ১৮০ ডিগ্রি কোণ। কিন্তু এই নমুনাটির ক্ষেত্রে পজিট্রন রইল স্থির অবস্থায়। আর সেই পজিট্রনকে আঘাত করল একটি চলমান ইলেকট্রন। এবার যে দুটি গামা-ফোটন তৈরি হবে তাদের গতিপথ পরস্পর বিপরীত হলেও তাদের অন্তবর্তী কোণ কিন্তু আর ১৮০ ডিগ্রি হবে না। তার চেয়ে কম হবে। কতটা কম হবে সেটা নির্ভর করবে কত বেগে ইলেকট্রনটি পজিট্রনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। অতএব
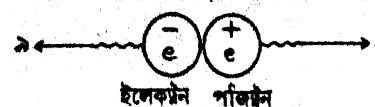
পরস্পর স্থিতিশীল অবস্থায় যখন একটি ইলেকট্রন এবং একটি পজিট্রন মিলিত হয় তখন সৃষ্ট হয় দুটি গামা ফোটন। তখন ওই গামা-ফোটন দুটির গতি-পথের অন্তবর্তী কোণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮০ ডিগ্রি

কোণ কতটা কম হল তা মেপে ওই সব ইলেকট্রনের বেগ সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

প্রশ্ন এই : ইলেকট্রনগুলির বেগ মেপে হবেটা কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর : পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস। সেই নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে বিচরণ করে একাধিক ইলেকট্রন (হাইড্রোজেন বাদে, কারণ এক মাত্র হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যেই থাকে একটি মাত্র ইলেকট্রন)। এই সব ইলেকট্রনের মধ্যে যারা নিউক্লিয়াসের খুব কাছাকাছি থাকে তাদের বলা হয় 'কোর ইলেকট্রনস' বা আভ্যন্তরিক ইলেকট্রনস। নিউক্লিয়াসের টানে এরা সম্বদ্ধ অবস্থায় বিচরণ করে। অবশিষ্ট ইলেকট্রনদের বলা হয় 'সারফেস ইলেকট্রনস'। পুকুরের জলের ওপরের স্তর যেমন যৎসামান্য আঘাতে বা বাতাসের স্পর্শে চঞ্চল হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি পারমাণবিক পরিমণ্ডলে এতটুকু পরিবর্তন ঘটলেই ওই সারফেস ইলেকট্রনগুলির বেগ এবং বিচরণের কায়দাকানুন পরিবর্তিত হয়। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, পদার্থের নানা রকম গুণাগুণ, যেমন তাদের তাপ সহশীলতা, কাঠিন্য, নমনীয়তা, ক্লান্তি, প্রভৃতি এই সব ইলেকট্রনের মতিগতির ওপরই নির্ভর করে বেশি। তারা কি ভাবে ছড়িয়ে থাকে, কি ভাবে আনাগোনা করে এ সবের ওপর বিস্তৃত তথ্য জানা গেলে ওই সব
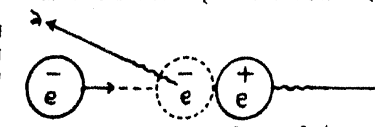
চলমান ইলেকট্রন গিয়ে আঘাত করছে একটি পজিট্রনকে। তৈরি হল দুটি গামা ফোটন। লক্ষ করুন, এদের গতিপথের অন্তর্বর্তী কোণটি কেমন ছোট হয়ে গেছে।

গুণাগুণ কোন ধাতু অথবা ধাতু-সংকরের মধ্যে কতটা রয়েছে সে সম্পর্কে যথেষ্ট স্থির নিশ্চয় হওয়া সম্ভব।

শুধু পদার্থের গঠনই নয়, নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটির পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ ভার্নার ব্রান্ড মনে করেন, 'না, স্থূল পদার্থের গুণাগুণই শুধু নয়, পজিট্রনের সাহায্যে অনেক কিছুই হয়ত ভবিষ্যতে আমরা করতে পারব। শরীরের অভ্যন্তরে টিউমার সারানর ব্যাপারে আমরা পজিট্রনকে কাজে লাগাতে পারি।' অথবা ধরুন, কাউকে নাইট্রোজেন-১৩ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ মিশ্রিত অক্সিজেন নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিতে বলা হল। এই আইসোটোপটি থেকে পজিট্রন কণা বিকীর্ণ হয়। অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে থাকা ওই নাইট্রোজেন শরীরের যে যে অংশে যাবে সেখানে পজিট্রনের অস্তিত্ব ধরা পড়বে। এ থেকে শ্বাসকষ্টজনিত রোগ নির্ণয়ের কাজটি সহজতর হবে। কারণ ওই পজিট্রনই জানিয়ে দেবে অক্সিজেন শরীরের কোন অংশে ঠিক মত যাচ্ছে, কোথায় যেতে পারছে না। ফুসফুসের রোগ চিকিৎসায় পদ্ধতিটি কাজে লাগবে। পজিট্রনের উৎস হিসেবে অক্সিজেন-১৬কেও ব্যবহার করা হচ্ছে মস্তিষ্কের টিউমারজনিত রোগের চিকিৎসায়।

সমরজিৎ কর

দু আনা। 'ভারতী' পাঠাইবার টিকিট বাবদ ৬৪ খানা এক আনা হিসাবে ৪ টাকা" আর ২০ খানা তৎকালীন দু পয়সা হিসাবে দশ আনা। ৩১ জুলাই ভারতী প্রথম সংখ্যা প্রথম বিদেশ পাড়ি দিয়েছে। সেদিন একখানি পাঠানো হয়েছে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে—তিনি তখন স্কটল্যান্ডবাসী। অন্যখানি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। তখন বিদেশ পাঠানোর ডাকটিকিট খরচ ছিল মাত্র দু আনা। ৩০ আগস্ট ১৩০ জন গ্রাহককে 'ভারতী' পাঠানোর খরচ ধরা হয়েছে দু পয়সা হিসেবে ৪ টাকা ১ আনা। ৫ সেপ্টেম্বর 'শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জমীদার মহাশয়ের নিকট ২য় সংখ্যা ১ কপি' বম্বে পাঠানোর জন্য খরচ হয় ২ পয়সা। ৪ অক্টোবর মফস্বলে আশ্বিন কার্তিক দু মাসের ৫৫০ কপি ভারতী পাঠানোর খরচ লেখা হয়েছে ১৭ টাকা ৩ আনা। তেমনি ২৭ ফেব্রুয়ারি ৩২২ খানা অষ্টম সংখ্যা ভারতী পাঠানোর খরচ ১২ টাকা ১১ আনা। ২৮ ফেব্রুয়ারি হিসাবখাতায় লেখা হয়েছে "বিলি সরকার দীননাথ ঘোষের অনুপস্থিতিতে ছোটবাবুর নির্দেশে" ১০২ জন গ্রাহককে (কলকাতা অঞ্চলের) পত্রিকা ডাকযোগে পাঠানোর খরচ ৩ টাকা ৩ আনা।

পত্রিকা পাঠানোর ব্যাপারে মাঝে মাঝে বিলম্বও যে ঘটতো তার প্রমাণ আছে ক্যাশ বইতে। ২১ আগস্ট তারিখে তাতে লেখা হয়েছে "ভারতী পাঠানোর বিলম্বের কারণ দর্শাইয়া পত্রলেখা হয় ১৫ জনকে"—তার জন্য দু পয়সা হিসেবে ত্রিশ পয়সা অর্থাৎ সাড়ে সাত আনা খরচ। পরিচালক গোষ্ঠীর এরকম সৌজন্যবোধ একালে সচরাচর দেখা যায় না।

গ্রাহকদের কাছে তাগাদাও দিতে হয়েছে ভারতী-কর্তৃপক্ষকে। ২ সেপ্টেম্বরে হিসাবের বিবরণে আছে—"পূর্বে যে সমস্ত ব্যক্তিগণের নিকট গ্রাহক হবার জন্য ১ খণ্ড ভারতী ও পত্র লেখা হয় তাহাতে অদ্যাপি কোনো উত্তর না পাওয়ায় পুনরায় তাহাদের অভিপ্রায় জানার জন্য পত্র লেখা হয়"। ৫৯ জন গ্রাহককে চিঠি লেখার খরচ ১ টাকা ১০ আনা ২ পয়সা। ঐ একই কারণে ৪ সেপটেম্বর আবার ১৬ জনকে পত্রাঘাত করা হয়েছে—খরচ ২ পয়সা হিসাবে ৩২ পয়সা অর্থাৎ আট আনা।

ক্যাশবইতে আরো কয়েকটি বিশেষ ধরনের খরচের হিসাব পাওয়া যায়। এখান থেকেই জানা যায় ১৮৮৪ সালে 'ভারতী'র কয়েকটি সংখ্যা এক হাজার কপি ছাপানো হত। তেসরা ডিসেম্বর ১৯ অগ্রহায়ণ লেখা হয়েছে—"নেহারাম্পদন দপ্তরি—৫ম সংখ্যা ভারতী বান্দাই প্রত্যেক ফর্মা সাত পয়সা হিসাবে একহাজার কপির—৫/৩ অর্থাৎ ৫ টাকা সাত পয়সা"। পৌষমাসে ওই একই দপ্তরি পেয়েছেন ৫ টাকা ১১ আনা। এখানে একটি বিশেষ খরচের উল্লেখ করি। বিলি সরকার দীননাথ হাওড়ায় পত্রিকা বিলি করতে যেতেন। ১৫ আগস্ট লেখা হয়েছে—"দীননাথ বিলি সরকার হাওড়ায় বিলি করিতে যায় তাহার পোলের মাশুল (হাওড়া সেতু পার হওয়ার জন্য)—দু পয়সা।" ২১ আগস্ট 'ভারতী' ছাপাবার জন্য তিনজনকে জলপানি দেওয়া হয় ছ'আনা। ৩ অক্টোবর রাধাবাজার থেকে দুশো কপি 'ভারতী' বয়ে আনায় মুটে খরচ লেগেছে একআনা। সম্পাদক-মণ্ডলী মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই মজলিস বসাতেন—সেখানে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও হত—১৮৭৮এর ৫ জানুয়ারির হিসাবে লেখা আছে 'বাহিরের এবং নিজবাটীর বাবুদিগের আহারের ব্যয়। ছোটবাবু মহাশয়—আঠার টাকা দশআনা তিন পয়সা। বলা বাহুল্য, ছোটবাবু অর্থাৎ 'ভারতী'র প্রাণপুরুষ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-ই এই মজলিসের উদ্যোক্তা। ঠিক এই সময়েই ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে 'বিদ্বজ্জন সমাগম' নামে সুখ্যাত সাহিত্যিক সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা হয়। সেই 'বিদ্বজ্জন সমাগম'-এর সদস্যদের কাছে চিঠি লেখার ডাকমাশুল দেওয়া হয়েছে। ভারতী ভাণ্ডার থেকে ১ ফেব্রুয়ারি ৪৯ জন সদস্যকে চিঠি লেখা হয়েছে—আনা।

'ভারতী'র সূচনাকালে বেতনভোগী কর্মচারী ছিলেন তিনজন। কালিবর সেন, দীননাথ ঘোষ ও উদয়চাঁদ দাস। শেষোক্ত দুজন যে বিলি সরকার ছিলেন তা আগেই উল্লেখ করেছি—ওই দুজনের মাসিক বেতন ছিল চার টাকা হিসেবে—আর কালিবর সেনের বেতন ছিল মাসিক কুড়ি টাকা। বেতনের টাকা প্রথমদিকে নিয়মিত কাজে ভাগ্যে জুটতো না।

ক্যাশে সব সময় যথেষ্ট টাকাও থাকত না ফলে একই সঙ্গে একই দিনে তিন জনে কদাচি বেতন পেতেন। পৃথক পৃথক দিনে বেতন নিতে হা তাঁদের। তাছাড়া প্রতিমাসে নিয়মিত বেতন দেবা ক্ষমতা পরিচালকগোষ্ঠীর ছিল না। তার দৃষ্টান্ত—১৮৭৭ এর ২৭ সেপটেম্বর দীননাথ ঘোষ এবং অকটোবর উদয়চাঁদ দাস আষাঢ় শ্রাবণ ও ভাদ্র—তিন মাসেই বেতন চার টাকা হিসেবে মোট বারো টাকা করে পেয়েছেন। ৮ অকটোবর কালিবর সেনকে পু আশ্বিনের বেতন দেওয়া হয়েছে কুড়ি টাকা। ১৮৮

বিলিজন রীতিতে যাদের 'ভারতী' দেওয়া হত

সালে সম্ভবত কালিবর সেনের স্থলে প্রিয়নাথ সেন (রবীন্দ্রনাথের বন্ধু) নিযুক্ত হন। কেননা ১৮৮০এর ৭ অকটোবর হিসাবে লেখা হয়েছে প্রিয়নাথ সেনকে আশ্বিন মাসের কুড়ি টাকা বেতন শোধ করা হল। কার্তিক মাসের বেতনটা অবশ্য তাঁকে সরকারী তহবিল (অর্থাৎ ঠাকুর পরিবারের জমিদারি তহবিল) থেকে দিতে হয়েছে কেন না 'ভারতী' ভাণ্ডার তখন শূন্য। অবশ্য মজার ব্যাপার, প্রিয়নাথ সেনকে বেতন দিয়েই তেসরা নবেম্বর আবার তাঁর কাছ থেকেই দশ টাকা 'হাওলাত' নিতে হয়েছে। "ভারতী" পাঠাবার ডাকটিকিট কেনার জন্য ওই টাকা খরচ করা হয়েছে তবে দুদিন পরেই পাঁচই নবেম্বর আবার প্রিয়নাথবাবুকে ওই টাকা শোধ করা হয়েছে—তারও উল্লেখ আছে।

ঠাকুর পরিবারের বিত্তবান সন্তানরা 'ভারতী' পরিচালনার দায়িত্ব নিলেও কখনো কখনো 'ভারতী'র অর্থ তহবিলে ভয়ানক ঘাটতি দেখা যেত তার দৃষ্টান্ত আরো আছে। ১৮৮০ সালেই ওই আর্থিক দৈন্য প্রকট হয়ে ওঠে। ওই বছরে "ভারতী"র তহবিলে টাকা না থাকায় বাল্মীকি প্রেসের এক বিল শোধ

দেওয়ার জন্য [illegible] তহবিল থেকে পঞ্চাশ টাকা দেওয়া হয়। একত্রিশ আগস্টের হিসাব-বিবরণীতে লেখা হয়েছে ১—বাল্মীকি প্রেস—১২৮৬ সালের মাঘ মাসের ভারতী সাত ফর্মায় ছয়শো কপি ছাপান হয় প্রতি ফর্মা সাত টাকা হিসাবে ৪৯ টাকা এবং উহার কভারং অর্ধ ফর্মা ছাপান ব্যয় সাতটাকা হিসাবে সাড়ে তিনটাকা একুনে বাহান্ন টাকা আট আনায় ২০৪ নং এক বিল শোধ দেওয়া যায়। অর্থাৎ মুদ্রণ খরচও নিয়মিত শোধ করা সম্ভব হচ্ছে না—এমনই টানাটানি! মাঘ মাসের বিল শোধ করা হচ্ছে ভাদ্র মাসে—এই তো আর্থিক অবস্থা। ১ সেপটেম্বর 'ভারতী' পাঠানোর ডাকটিকিট খরচ ছ'টাকা আবার সরকারী তহবিল থেকে 'হাওলাত' নিতে হয়েছে—তা শোধ করা হয়েছে ৬ সেপটেম্বর। আবার ২৭ সেপটেম্বর সরকারী তহবিলের শরণাপন্ন হতে হয়। কারণ—আদি ব্রাহ্মসমাজে ভারতী ছাপানোর বিল—আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র সংখ্যা—প্রতি সংখ্যা ছয় ফর্মা—প্রতি ফর্মা সাড়ে ছ'টাকা হিসাবে একশো সতেরো টাকা এবং কভারং অর্ধ ফর্মা হিসাবে দেড় ফর্মা

সোমপ্রকাশ ৮। বঙ্গহিতৈষী (ভবানীপুর, পাকুড়তলা) ৯। সম্পাদক, চিকিৎসাতত্ত্ব ১০। আর্যদর্শন ১১। বান্ধব ১২। ঢাকাপ্রকাশ ১৩। শ্রীহট্টপ্রকাশ ১৪। সাধারণী পত্রিকা (হুগলি) ১৫। কুশদহ পত্রিকা (মেছোবাজার) ১৬। আর্যপ্রদীপ (ময়মনসিংহ) ১৭। কোরাণ (বরতলা, কলকাতা) ১৮। সম্পাদক, ইন্ডিয়ান মিরর ১৯। গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক, মাসিক সমালোচক (খাগড়া) ২০। রাজকৃষ্ণ রায়, সম্পাদক, বীণা ২১। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পঞ্চানন্দ), ভবানীপুর।

বিনামূল্যে যাঁদের সৌজন্য-সংখ্যা দেওয়া হত তাঁদের সংখ্যা হল আটত্রিশ। কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হল :—১। কর্তাবাবু মহাশয় (দেবেন্দ্রনাথ) ২। বড়বাবু মহাশয় (দ্বিজেন্দ্রনাথ) ৩। ছোটবাবু মহাশয় (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) ৪। শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায় (জ্যোতিবাবুর শ্বশুর) ৫। রবিবাবু মহাশয় ৬। ব্রজনাথ দে (মাস্টার) ৭। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ৮। পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৯। বিহারীলাল চক্রবর্তী ১০। রাজনারায়ণ বসু,

যাদের 'ভারতী'র সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হত

ছাপার মূল্য নয় টাকা একুনে একশো ছাব্বিশ টাকা—সরকারী তহবিল থেকেই মেটাতে হয়।

এই হল ভারতী পত্রিকার দুখানি ক্যাশ বইয়ের হিসাবের কিছু কিছু বিবরণ। মোটামুটি জানা গেল—'ভারতী' কখনো পাঁচশো, কখনো ছয়শো কখনো বা এক হাজার কপি ছাপানো হত। তাতে ছয় বা সাত ফর্মা থাকত। মাসিক পত্রিকার মূল্য ছিল মাত্র চার আনা, বার্ষিক মূল্য সডাক তিনটাকা ছয় আনা। আরো জানা গেল গ্রাহকদের চাঁদায় পত্রিকার খরচ চলতো না, অনেকখানি ঠাকুরবাড়ির জমিদারি তহবিলের উপরে নির্ভর করতে হত। এবার পত্রিকার গ্রাহক এবং পাঠকদের প্রসঙ্গে আসা যাক।

১২৮৬ সালের (অর্থাৎ পত্রিকা প্রকাশের তৃতীয় বছরের) গ্রাহক তালিকার বইটি পাওয়া গেছে রবীন্দ্র-ভবনে। তার থেকে যে সব তথ্য মিলেছে তাই এখানে উল্লেখ করছি। প্রথমেই বিনিময়-প্রথায় 'ভারতী' যেখানে বা যাঁদের কাছে পাঠানো হত তার বিবরণ দিচ্ছি। সবসুদ্ধ ত্রিশখানি ভারতী এই প্রথায় বিলি হত। কয়েকজনের নাম, কয়েকটি পত্রিকার নাম—১। শ্রীযুত পন্ডিত হরনাথ ঘোষ সম্পাদক মেদিনীপুর সমাচার। ২। বঙ্গদর্শন কার্যাধ্যক্ষ কাঁঠালপাড়া, ৩। এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক হুগলী, ৪। হিন্দুহিতৈষী সম্পাদক, ঢাকা ৫ [illegible] পত্রিকার সম্পাদক ৬। [illegible] ৭।

১১। ক্যালকাটা রিডিং রুম ১২। যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (ডাক্তার) ১৩। অক্ষয়কুমার চৌধুরী ১৪। রামদাস সেন (বহরমপুর) ১৫। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ১৬। হেরম্বনাথ তর্করত্ন ১৭। কৈলাশচন্দ্র সিংহ (ত্রিপুরা) ১৮। এস এন টেগোর—ভায়া ব্রিনদিসি, কেয়ার অব জি এম টেগোর এসকোয়ার, সাউথ কেনসিংটন—লন্ডন—এস ডবলুউ (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ১৯। জে ঘোষাল, লন্ডন, (জানকীনাথ ঘোষাল, স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী) ২০। এন কে সি—সেন্ট পিটার্সবার্গ ইউনিভার্সিটি জার্মানি, রুশিয়া (নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে এঁর কথা উল্লেখ করেছেন)।

এবার চাঁদা দিয়ে মফস্বলের যাঁরা গ্রাহক হয়েছিলেন (১২৮৬ সালে) তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি। যে তালিকাটি পাওয়া গেছে তার অধিকাংশ গ্রাহকই ডাকযোগে 'ভারতী' পেতেন। তালিকাটি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো—প্রতিটি নামের পাশে ঠিকানা এবং বারো মাসে পত্রিকা পাঠানোর বিবরণ। তারপরে - গ্রাহকদের কেউ চাঁদা দেওয়া বন্ধ করলে তার উল্লেখ যেমন আছে, তেমনি আছে কোনো গ্রাহকের মৃত্যু ঘটলে কিংবা ঠিকানা বদল করলে তার উল্লেখ। সবসুদ্ধ ৩৬৫ জনের নাম এই তালিকায় পেয়েছি—তার মধ্যে কয়েকটি সুপরিচিত এবং অপরিচিত নাম [illegible]

হল। দেখা যাবে, ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে—যথা বোম্বাই, রাওয়ালপিণ্ডি, সিমলা, রায়বেরিলী, মুলতান এলাহাবাদ, জব্বলপুর, গৌহাটি, মওগাঁ, কটক প্রভৃতি স্থানে 'ভারতী'র গ্রাহক ছিলেন। আর বাংলাদেশে সব চেয়ে বেশি গ্রাহক ছিলেন শ্রীহট্ট জেলায়। তারপরে ঢাকা, ময়মনসিংহ, রংপুর প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য। সব চেয়ে কম গ্রাহক ছিলেন বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের জেলা বীরভূমে—মাত্র দুজন—আমেদপুরের প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও রামপুর হাট স্টেশনের হরিদাস মুখোপাধ্যায়।

বাংলাদেশের বাইরের কয়েকজন গ্রাহকের নাম

১। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর—প্রফেসর অব ওরিয়েন্টাল ল্যাংগুয়েজ, ডেকান, ২। রজনীকান্ত কর অ্যাকাউনটেন্ট জেনারেল অফিস বম্বে ৩। রেভারেণ্ড ই কে ব্রুমহার্ড, ক্রাইস্ট চার্চ, সিমলা, ৪। সুরেশচন্দ্র বসু, মুসৌরি, ৫। সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পোস্টমাস্টার, রায়বেরিলি, ৬। শশধর বড়ুয়া, মওগাঁ ৭। সত্যবাদী পন্থী—ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সম্বলপুর, ৮। সূর্যনারায়ণ সিংহ, উকিল, ভাগলপুর ৯। অম্বিকাচরণ আদিত্য, মিলিটারি একাউনটস ডিপার্টমেন্ট, এলাহাবাদ, ১০। কালীমোহন ঘোষ, দেরাদুন ১১। শ্রীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় রাওয়ালপিণ্ডি, ১২। গোবিন্দচন্দ্র পট্টনায়ক, সম্পাদক, বালেশ্বর সম্বাদবাহিকা, ১৩। গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রেলবিভাগ, মুলতান ১৪। চারুচন্দ্র মিত্র, এলাহাবাদ ১৫। চন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, দেওঘর, ১৬। নবকুমার চৌধুরী, রাঁচি, ১৭। তিনকড়ি ঘোষ, জব্বলপুর হাইস্কুল, ১৮। দ্বারকানাথ রায়, মুলতান ১৯। দেবেন্দ্রনাথ বসু, অ্যাসিস টেন্ট ইনজিনিয়র, মজঃফরপুর, ২০। দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোরখপুর, ২১। দিননাথ সিংহ, বাঁকিপুর ২২। দুর্গাচরণ রক্ষিত বারাণসী, সোনারপুর, ২৩। প্রসন্নকুমার দাস, ক্ষেত্রী, জয়পুর, ২৪। পণ্ডিত গঙ্গারাম, পি ডব্লু ডি ডিপার্টমেন্ট, মুলতান ২৫। প্রিয়নাথ মিত্র, জ্ঞানদীপিকা পুস্তকালয় এলাহাবাদ, ২৬। বিহুগনাথ দাস, সাহেবগঞ্জ ২৭। তনকান্ত বড়ুয়া শিবসাগর স্কুল, ২৮। ব্রজপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌহাটি, ২৯। হরিহর চট্টোপাধ্যায়, অরডনান্স ডিপার্টমেন্ট, কানপুর, ৩০। ক্ষেত্রচন্দ্র আদিত্য বঙ্গ সাহিত্যোৎসাহিনী সভা, এলাহাবাদ।

গ্রাহকদের মধ্যে যাঁদের নাম সুপরিচিত তাঁরা হলেন— ১। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। প্যারীচাঁদ মিত্র, ৩। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, বহরমপুর সংস্কৃত কলেজ, ৪। প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, বহরমপুর কলেজ, ৫। দেওয়ান কার্তিকচন্দ্র রায়, রায়বাটী, কৃষ্ণনগর (দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা), ৬। প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া, ৭। স্বর্ণময়ী দেবী, ৮। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৯। প্রিয়নাথ সেন। ১২৮৭ সালের ক্যাশ বইতে রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর-ও গ্রাহক হিসেবে চাঁদা জমা দিয়েছেন দেখা যায়।

তালিকাটি লক্ষ করলে দেখা যাবে গ্রাহকরা বিচিত্র রকমের পেশায় নিযুক্ত। বেশ কয়েক জন মহারাণী, রাজা মহারাজ, জমিদার ভারতীর গ্রাহক ছিলেন—যেমন ১। কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবীর নাম তো আগেই উল্লেখিত হয়েছে, তাছাড়া ২। পুটিয়ার মহারাণী শরৎকুমারী দেবীর ৩। মহারাজা অব কুচবিহার, ৪। লক্ষ্মীনারায়ণ রায় জমিদার, কাজিবাজার কটক, ৫। কিশোরীমোহন চৌধুরী, জমিদার সেরপুর ময়মনসিংহ, ৬। কালিকিশোর গুপ্ত, জমিদার হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট, ৭। রাজা কালীপ্রসাদ সিংহ পূর্বধলা সুসঙ্গ ৮। রাজা কালীশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর থাগড়াগ্রাম সুসঙ্গ ৯। যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ১০। রাজা জগৎকৃষ্ণ সিংহ, দুর্গাপুর সুসঙ্গ, ১১। রাজা ধনপৎ সিং বাহাদুর, আজিমগঞ্জ। জমিদার ছাড়া গ্রাহকদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন রাজকর্মচারী—যেমন—১। কটকের ডেপুটি কালেকটর জগমোহন রায়, ২। উপেন্দ্রনাথ বসু, অ্যাডিশনাল মুনসেফ হোসেনপুর ময়মনসিংহ, ৩। ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চন্দ্রনারায়ণ সিংহ, ৪। রামসাহীর (রামপুর বোয়ালিয়ার) আবগারী দারোগা গুরুদাস সেন ও ৫। কাছাড়ের জেল দারোগা ঈশ্বরচন্দ্র দত্তগুপ্ত। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন—১। সিরাজগঞ্জের মোক্তার মধুসূদন দাস, ২। নেত্রকোনার মুনসেফ গোবিন্দচন্দ্র বসু, ৩। নবাবগঞ্জের হোমিওপ্যাথি ডাক্তার কালীচরণ রায়, ৪। কিশোরীলাল সরকার, রামপুর বোয়ালিয়ার জজকোর্টের উকিল, ৫। যশোরের সৈলকুপা-নাগপাড়াবাসী মতিলাল ঘোষ, ৬। টাকি স্কুলের হেডমাস্টার কেদারনাথ রায়, ৭। ছিদির স্টেশনমাস্টার কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৮। টাঙাইল জাহ্নবী স্কুলের চতুর্থ শিক্ষক কালীকুমার চক্রবর্তী ৯। হুগলীর ছোট আদালতের হেড ক্লার্ক গোকুলকৃষ্ণ সিংহ, ১০। জলপাইগুড়ির সদরবঙ্গ বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক নুরমহম্মদ, ১১। নোয়াখালি সরকারী স্কুলের ছাত্র প্রসন্নকুমার রায়, ১২। কাছাড় সরকারী স্কুলের প্রথমশ্রেণীর (দশম) ছাত্র কামিনীকুমার চৌধুরী, ১৩। শ্রীরামপুর নিউজ পেপার ক্লাবের অবৈতনিক সম্পাদক, ১৪। সালকিয়া স্কুল রিডিং রুমের ম্যানেজার অখিলচন্দ্র মিত্র, ১৫। বগুড়া-সেরপুর রিডিং রুমের সেক্রেটারি আনন্দকিশোর তরফদার প্রমুখ। দুজন সুপরিচিত গ্রাহকের নাম উল্লেখ করা হয়নি—তাঁরা হলেন ১। ডাঃ কে ডি ঘোষ, (অরবিন্দ ঘোষের পিতা) সিভিল সারজেন, রঙপুর আর দ্বিতীয় জন ২। পি মিটার, ব্যারিসটার এট্ ল, কেয়ার অব ডাঃ কে ডি ঘোষ, রঙপুর।

এই হল 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম দু-তিন বছরের নেপথ্যের ইতিহাস। কি ভাবে পত্রিকার খরচ চলতো, কি ভাবে তা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছতো আর কারাই বা ছিলেন সেই প্রথম পর্বের গ্রাহক তারই বিবরণ দেওয়া হল এই রচনায়।

আলোকচিত্র রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে

সাহিত্য

বাংলাদেশের কবিতা

বাংলাদেশের সাহিত্য ও কবিতা বিষয়ক আলোচনায় অনেকেই দেখি অদ্ভুত এক নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হন। নস্টালজিয়া রোগ নয়, সাহিত্য ও কাব্য সৃষ্টিতে তা অনেকখানি সাহায্যও করে থাকে। কিন্তু সৃষ্টি-কর্মকে নির্মমভাবে বিশ্লেষণের প্রয়োজনে নস্টালজিয়া সমালোচকের দৃষ্টিকে শুধু ঝাপসাই করে তোলে। খ্যাতিহীন পাখির ডিমের মতো ছেড়ে আসা গ্রাম কিংবা মফস্বল শহরের হারানো সূর্যাস্তের স্মৃতি আবেগকে যতই নাড়া দিক না কেন, তা সাহিত্যের যথার্থ রসগ্রহণের পরিপন্থী বলেই স্বীকার করতে হবে। তাই আলোচনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কবিতাকে আমরা অনেকেই যখন কিছু না কিছু কনসেশন দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি সে মুহূর্তে সবিনয়ে এটুকু অন্তত জানিয়ে রাখা প্রয়োজন যে ব্যাপারটা খুব স্বাস্থ্যকর নয়। বলগাহীন বিশ্লেষণ ও কৃত্রিম ভালো-লাগায় স্রোতাতে আলালের ঘরের দুলালের মতো সাহিত্যও হঠাৎ বখে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তার আর উদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। ঠিক সময়ে উচিত সমালোচনাই পারে তাকে বাঁচাতে।

এত কথা মনে হল সম্প্রতি রবীন্দ্রসদন মঞ্চে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের কবিতা পাঠের আসরে উপস্থিত থেকে। বাংলাদেশের নবীন কবি দাউদ হায়দার, যিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে পড়াশুনো করেন, এই আসরের আয়োজনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে জসীমউদ্দীনের কবিতা থেকে শুরু করে বাংলাদেশের একেবারে হালফিলের কবিতা পর্যন্ত পড়া হয়েছিল। ইদানীংকালে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ নামক ভূখণ্ডে বাংলাদেশের কবিতা নিয়ে এত মাতামাতি ও হইচই হয়েছে যে তারপর নিতান্ত সাদামাটা এই সত্য কথাটা লেখাও বড় দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে যে, বাংলাদেশের কবিতার নিছক ভৌগোলিক গুরুত্বই আমাদের দৃষ্টি অধিকার করে থাকে, ফলে নিরপেক্ষ সাহিত্য বিচার প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। শিশুপাঠের ভূগোলে যেমন বিশেষভাবে চিহ্নিত হয় সরল বর্গীয় বৃক্ষের বন, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল কিংবা মোরব্বা বা ল্যাংচার জন্য বিখ্যাত কোন না কোন শহর—সেরকম কি এই বাংলাদেশের কবিতা? বাংলাদেশের লেবেল দিয়েই তাকে আমাদের আদর যত্ন করতে হবে? কিন্তু এদিকে ওদিকে যে অজস্র নতুন ভালো কবিতা লেখা হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কবিতার আলোচনাও আমরা মুখ ফুটে করতে পারি না। ১৯৫২র ২১শে ফেব্রুয়ারি আর ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম আমাদের আবেগতাড়িত করে। ওপারের ভাই ও বন্ধুদের জন্য ভালোবাসায় আমরা উদ্বেল হয়ে পড়ি। পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রথমে পূর্ব বাংলা ও পরে বাংলাদেশ আমাদের মন কেড়ে নেয়। তাবার কখন স্নেহের মতোই অতি বিষম বস্তু। তরল আবেগ ও মুক্ত বাষ্পের টানে সত্যিকারের সমালোচনার স্পৃহা অনেকখানি দ্রবীভূত হয়ে যায়।

এ সত্ত্বেও কিন্তু সমালোচনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না। এবং আশার কথা যে, ওপার বাংলার কোন কোন সমালোচক চপল হাওয়ায় মাতাল তরণীতে পা ভাসিয়ে দেননি। একটা উদাহরণ দিই। ১৯৭৬-এর জুনে ঢাকার মুক্তধারা প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের বই আমার হাতে এসেছে। কাজী মোতাহার হোসেনের নির্বাচিত প্রবন্ধ। শ্রদ্ধেয় কাজী মোতাহার হোসেন বাংলাদেশের একজন অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবী। ঢাকায় তিনি কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় বুদ্ধি-মুক্তি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। 'সাহিত্য সমাজ' ছিল তাঁদের মুক্ত বুদ্ধি চর্চার কেন্দ্র। কাজীসাহেবের নির্বাচিত প্রবন্ধের প্রথম খণ্ডে আছে কিভাগোত্তর ওপার বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমস্যাদির ওপর লেখা বেশ কিছু ভালো প্রবন্ধ। 'সাহিত্য সৃষ্টির পরিবেশ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন : 'বর্তমান পরিবেশে [illegible]

থেকে বেরিয়ে আসবার পরেও আমাদের লেখকেরা দিশেহারা অবস্থায় এটা সেটা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই সময় কাটাতে বাধ্য হচ্ছে।' এই রচনার সংস্কার-মুক্ত চিত্তে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন—আমাদের সাহিত্য ক্ষেত্রে যে একটা অকিঞ্চিৎকরতা দেখতে পাচ্ছি, সেটা হয়ত সামগ্রিকভাবে আমাদের সমুদয় জীবন-যাপনের ফাঁকিরই প্রতিধ্বনি।...এই যখন আমাদের নৈতিক মান-দণ্ড, তখন আর সাহিত্যের মান কত উন্নত হবে? আমাদের এই সমাজই ত' সাহিত্যের বিচারক, এই পাঠকই ত' সাহিত্যের রসিক। প্রবন্ধের শেষে প্রাবন্ধিক আশা প্রকাশ করেছেন,—উদ্দাম বর্ষায় 'নবজীবনের ঢল'-এর সঙ্গে ঘোলা পানি ও আবর্জনা আসে আসুক, শান্ত শরতে আবার তা স্বচ্ছ ও কলুষমুক্ত হয়ে যাবেই —এই ত প্রকৃতির নিয়ম।

আশাবাদী আমি নিজেও। নবলব্ধ স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সাহিত্যে এসেছে 'উদ্দাম বর্ষায় নবজীবনের ঢল'! হয়ত এতক্ষণ ঘোলা পানি ও আবর্জনার কথাই বললাম। বাংলাদেশের কবিদের অনেকেরই নিজস্ব কণ্ঠস্বর নেই। কারও আবার কবিতার ভাষা বড় আড়ষ্ট। কৃত্রিম। এসব হচ্ছে অন্ধকারের দিক। এপার বঙ্গেও তো সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি। অনেকেরই তো ভাষা বেশ কৃত্রিম, জীবনবোধ অসম্পূর্ণ। পাশাপাশি বড় কবিরও আবার অভাব নেই। সাহিত্যের আলোচনায় শুধু আবেগের শাসন

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়

নিয়েই আমার আপত্তি। জোলো আবেগ বাদ দিলে বাংলাদেশের কবিতা থেকে ফুসফুস ভরে সুবাতাস নিশ্চয় আমরা নিতে পারব।

'নিষিদ্ধ জর্নাল থেকে' কবিতায় শহীদ কাদরী লিখেছেন—

ধ্বংসস্তূপের পাশে, ভোরের আলোয়
একটা বিকলাঙ্গ ভায়োলিনের মতো—দেখলাম—
তে-রাস্তার মোড়ে
সমস্ত বাংলাদেশ পড়ে আছে আর সেই কিশোর, যে তাকে
ইঁদুরের ছড় দিয়ে নিজের মতো ক'রে বাজাবে বলে
ক্ষেপে উঠেছিলো
সেও শুয়ে আছে পাশে, রক্তাপ্লুত শার্ট প'রে।

তবে কি এই নিয়তি আমাদের, এই হিরন্ময়
ধ্বংসাবশেষ,
এই রক্তাপ্লুত শার্ট আজীবন, এই বাঁকাচোরা ভাঙা
ভায়োলিন?

কিন্তু প্রশ্ন চিহ্ন দিয়েই কবিতাটি শেষ হয়নি। কবিতাটির প্রথম পঙক্তি হল—ভোরের আলো এসে পড়েছে ধ্বংসস্তূপের ওপর। কবিতাটি শেষ হয়েছে 'স্বাধীনতা' শব্দ দিয়ে যার স্বাদ কালক্রমে ওখানের কবিদের বিশিষ্টতার সন্ধান দেবে। অন্ধ নিয়তি তাঁদের পথরোধ করবে না বলেই আমার বিশ্বাস। এই প্রসঙ্গে আল মাহমুদের রচনার কথা মনে পড়ে। তিনি লিখেছেন—

আমি জানতাম প্রত্যেক বিজয়ীদের জন্যে থাকে পুরস্কার। কবি ছাড়া জয়ের কথা চিন্তা করা যায় না। দুঃখ ও সুখের অন্তহীন যাত্রায় কবিতা দিয়েই জয় করা যায় তাবৎ সোনার সাম্রাজ্য। প্রিয় কবিতা সম্পর্কে কবির ধারণা—

কবিতা তো কৈশোরের স্মৃতি। সে তো ভেসে ওঠা
ম্লান
আমার মায়ের মুখ; নিম ডালে বসে থাকা হলুদ
পাখিটি

পাতার আগুন ঘিরে রাত জাগা ছোট ভাই-বোন
আব্বার ফিরে আসা, সাইকেলের ঘণ্টাধ্বনি—রাবেয়া
রাবেয়া

কবিতা তো ছেচল্লিশে বেড়ে ওঠা অসুখী কিশোর
ইস্কুল পালানো সভা, স্বাধীনতা, মিছিল, নিশান
চতুর্দিকে হতবাক দাঙ্গার আগুনে
নিঃস্ব হয়ে ফিরে আসা অগ্রজের কাতর বর্ণনা।

কবিতা চরের পাখি, কুড়ানো হাঁসের ডিম, গন্ধভরা
ঘাস

ম্লানমুখ বউটির দড়ি-ছেঁড়া হারানো বাছুর
গোপন চিঠির প্যাডে নীল খামে সাজানো অক্ষর
কবিতা তো মক্তবের মেয়ে চুলখোলা আয়েশা আক্তার।

কবিতার প্রতি এই দ্রুপদী ভালোবাসা নিয়েই কবি যুদ্ধ ও দাঙ্গার তিক্ততাকে ভুলে থাকেন। শামসুর রাহমান লিখেছেন—

কী যুগে আমরা করি বাস। প্রাণ খুলে কথা বলা
মহা পাপ; যদি চেয়ার টেবিল কিংবা দরজার গলা
খাটো ক'রে বলি কোন কথা, তবে তারাও চটাৎ
যেন বনে যাবে ধড়ো খানু গুপ্তচর। এমনকি
গাছপালা
টিলা, নদীনালা
কারুকে বিশ্বাস নেই বাস্তবিক। আমাদের এমনই
বরাত।

কিন্তু আমরা জানি 'বরাত' বা 'নিয়তিই' শেষ কথা নয়। অচলায়তন পরিস্থিতি ভাঙতে কবিতা সর্বজনস্বীকৃত এক বড় হাতিয়ার। বাংলাদেশের কবিরা তাঁদের কবিতায় যে উত্তাল সমাজচেতনার পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁদের বরাবর মুক্তির পথ দেখিয়েছে। সমকালীন পটভূমিকার প্রতিবাদের কবিতা লিখতে তাঁরা সিদ্ধহস্ত। দেখতে হবে ভিজে আবেগ যেন তাঁদের কবিতাকে স্যাঁতসেঁতে করে না তোলে। এবং তাঁদের কবিতা বিচারে কাঁচা আবেগের ঊর্ধ্বে যেন যুক্তি ও মননকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়। সেদিন রবীন্দ্র সদনের আসরে পেশাদার অপেশাদার আবৃত্তিকারদের পাশাপাশি প্রথম সারির বাঙালী কবিদের মধ্যে শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিরা বাংলাদেশের কবিতা পাঠ করে সীমান্তের ওপারের সবুজ দেশমাতৃকার সঙ্গে শুধু তাঁদের চির-পুরাতন হৃদয়ের যোগাযোগই আবার নতুন করে স্থাপিত করলেন না, ওইসব রচনার পুনর্মূল্যায়নের নিরুচ্চার আবেদনও যেন আমাদের সামনে রাখলেন। সত্যরক্ষার নিষ্ঠাবান সাংবাদিক ও সাহিত্যিক গৌর-কিশোর ঘোষ অসুস্থ শরীরে উপস্থিত থেকে শামসুর রাহমানের একটি কবিতা পড়েন। এসবই গভীর ভালোবাসা ও ঐকান্তিকতার পরিচায়ক। দুই সীমান্তের মধ্যে বহমান অবিচল অবিচ্ছিন্ন বাতাসের মতোই এই ভালোবাসা ও অনুরাগের অস্তিত্ব আমরা টের পাই বুকের গভীরে। ওপার বাংলার কবিতা নিয়ে ধুলো ওড়ানোর সময় শুধু মাঝে মধ্যে দুঃখ পাই ভেবে যে কেন আমরা ওখানের দার্শনিক, বিজ্ঞানী বা সমাজতাত্ত্বিকদের বিষয়ে অনুরূপ মনোযোগ দিতে পারি না। কবি ও কবিতা কি তাঁদের বাদ দিয়ে? কিন্তু ব্যক্তিগত এ দুঃখ নিতান্ত সাময়িক। ভালোবাসা বা অনুরাগ কোন প্রশ্ন করতে চায় না। জড়িয়ে পড়তে চায় না কোন কূট বিতর্কে বা জটিলতায়। হয়ত তাই অনুরাগ ও ভালোবাসা মাখা প্রিয় নারীর উষ্ণ সান্নিধ্যের মতো এই কবিতার ভালোবাসা প্রশ্নাতীত-ভাবে আমাদের চিরদিন দুর্বল করে রাখবে।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

নামরহস্য

ইন্দুর (Rattur rattus)

ইন্দুর শব্দটি যদিও সংস্কৃত ভাষা থেকে জন্ম নিয়েছে তবুও বলা যায়, এটি বৈদিক নয়। তবে ভারতের প্রায় সব প্রদেশের অল্পবিস্তর লোকই ইন্দুর বলে। এই প্রাণীটির চারটি নাম। (১) ইন্দুর, (২) উন্দুর, (৩) মূষিক, (৪) আখু। ইন্দুর ও উন্দুর দুটি শব্দই ইন্দ্‌ ও উন্দ্‌ ধাতু থেকে জন্ম নিয়েছে—ইন্দ্‌+উর্‌+র্‌, এবং উন্দ্‌+উর্‌+র্‌ প্রত্যয়ের যোগে। ইন্দ্‌ এবং উন্দ্‌ ধাতুর অর্থ—ক্লেদযুক্ত ও দুর্গন্ধময়। মৃত ইন্দুরের শরীর থেকে ক্লেদযুক্ত দুর্গন্ধ বের হয়। তা ছাড়া, এই প্রাণী কামড়ালেও শরীরে ক্লেদযুক্ত ক্ষত সৃষ্ট হয়।

মূষিক : মুষ্‌ ধাতুর উত্তরে কিকন্‌ প্রত্যয় করে মূষিক শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ—দল বেঁধে লুট করা, মূষিকরা প্রকৃতই লুট করে এবং দল বেঁধেই করে, তাই এরা মূষিক। মহাভারতের ১৬।২।৫ শ্লোকে মূষিকের বানান নীলকণ্ঠের টীকায় দীর্ঘ উকার করা হয়েছে, অর্থাৎ 'মূষিক' করা হয়েছে। ওখানে মুষ ধাতুর আরও বিচিত্র অর্থ করে তিনি বলেছেন, এরা লুঠ তো করেই, পলায়ন করার জন্য আগেই রথ্যা অর্থাৎ এভিনিউ (পথ) করে রাখে। তাই ধরে দ্রুত পলায়ন করে।

মুষা অর্থে স্ত্রী-জাতি। সে লুঠ করা অপেক্ষা লুণ্ঠিত করে বেশী; অর্থাৎ কাপড়চোপড় কেটে কুচি-কুচি করে দেয় এবং ওইখানেই নিশ্চিন্তে থাকে। অর্থাৎ, ইন্দুরীর স্বভাব কাটাকুটি করা। মূষা বা মুষা শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গবাচী।

আখু : ইন্দুরের আখু নামটি খুব প্রাচীন সংস্কৃত থেকে এসেছে। এই শব্দটির বিন্যাস করা হয়েছে—আ+খন্‌+ডু। অর্থাৎ, আপ্রাণ চেষ্টা করে যে খনন করে।

ইন্দুর মাটি খুঁড়ে গর্ত তৈরি করে এবং তাতে দ্রব্য সঞ্চয় করে। নিজে ভোগ করে না। ভোগ করার প্রবৃত্তিটা যায়ে লুণ্ঠন করার সময়েই। আখুর এই প্রবৃত্তি লক্ষ করেই কৃপণতাকে আখুবৃত্তি বলে প্রাচীন ভারতীয়গণ উল্লেখ করেছেন। কারণ, বিত্ত থাকলেও কৃপণ ব্যক্তি না তা ভোগ করে, না তা কাউকে দান করে। অবশেষে চোর, অগ্নি, জল এবং ভূমিতেই তা বিনষ্ট হয়। যেমন আ-খু এত চেষ্টা করে মাটি খুঁড়ে যে গর্ত করে, সেই গর্তে সাপ এসে নিঃশব্দে প্রবেশ করে এবং খাদ্য সংগ্রহ করে নিয়ে সে যেই সেই গর্তে প্রবেশ করে অমনি সাপের কবলে পড়ে।

এই শব্দটি বিন্যাস করা হয়েছে ইন্দুর আ+সম্যক চেষ্টয়া খনতি ইতি আ+খন্‌+উ।

গন্ধমার্জার/খটাশ/খট্টাশী

Viverricula indica (Desmarest)
Viverra zibetha Linnaeus
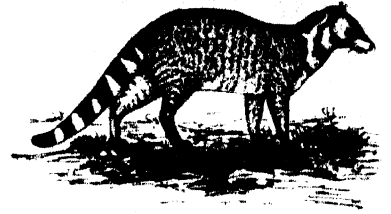
গন্ধ শব্দের আগে সু বা দু কিছু না থাকলে ঠিক বোঝা যায় না। কারণ, গন্ধ শব্দটির অর্থ—ঘ্রাণ। এটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীর একটি গুণ মাত্র। কিন্তু সেই গন্ধ শব্দটির বৈদিক ব্যুৎপত্তিতে হিংসা অর্থও প্রকাশ করে; অর্থাৎ গন্ধের আর একটি অর্থ হিংসা। গন্ধ-মার্জার গৃহপালিত জন্তুর কোনও স্বভাবই পায় না। তাকে গন্ধমার্জার বলা হয়েছে এই হেতু যে, আকারে মার্জারের (বিড়ালের) মত, আর হিংসা তার স্বভাব-ধর্ম। একে গন্ধ গোকুলও বলে।
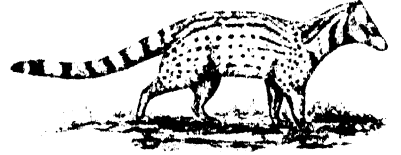
খট্টাশী বা খটাশ : সংস্কৃতে খট্‌ ধাতুর অর্থ—আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষা এবং ভোজন ছাড়া খটাশের অন্য কোনও প্রবৃত্তি দেখা যায় না। এর আকৃতি অনেকটা বিড়ালের মত। এর আর এক নাম ভাম। ভাম শব্দের অর্থ—ক্রোধ। ভাম বৈদিক শব্দ। ঋকের ১।৭৭।১ সূক্তে আছে ক্রোধের পরিভাষা ভাম। এই প্রাণী ক্রোধী, হিংস্রক এবং আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য অশন বা ভক্ষণ করে, তাই ভাম গন্ধমার্জার।

বাচস্পতি

একটি স্বপ্নের দল

অশোক দাশগুপ্ত

জাকার্তার এশিয়ান গেমস থেকে ভারতীয় ফুটবলাররা সোনার মেডেল এনেছে বাড়িতে, কিন্তু রহিম সাহেবের প্রশিক্ষণে উনিশশো বাটের রোম অলিম্পিককেই একটি আধুনিক এবং উন্নত-মানের ফুটবল দল মাথা তুলে দাঁড়ায়। সেই সময় থেকে এই উনিশশো সাতাত্তর—এই আঠারো বছরের সেরা ভারতীয় দল গড়লে কেমন হয় ?

কিন্তু প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, যাঁরা নির্বাচক হিসেবে কাজ করবেন, তাঁদের নির্বাচিত করা দরকার। আসুন, একে একে নির্বাচকমণ্ডলীর পাঁচজন সদস্যকে আমরা বেছে নিই।

কমিটির প্রথম সদস্য চুণী গোস্বামী। এই আঠারো বছরের সেরা দলে যাঁর স্থান অবধারিত, তাঁকে কমিটিতে রাখা হচ্ছে কেন ? কারণ, এটা তো একটা সাধারণ দল গড়া নয়। আঠারো বছরের সেরা দল গড়তে গিয়ে এমন দুর্দান্ত নির্বাচককে আমরা হাতছাড়া করতে চাই না।

চুনী গোস্বামী : অধিনায়ক

কমিটির দ্বিতীয় সদস্য প্রদীপ ব্যানার্জী। প্রবলতম শত্রুর চোখেও "ভারতের প্রথম মডার্ন ফরোয়ার্ড" পি কে এখনও ফুটবলের শিরোনাম। ফুটবলার হিসেবে তো বটেই, কোচ হিসেবেও তাঁর কথার গুরুত্ব কারো চেয়ে কম নয়।

তৃতীয় সদস্য অরুণ ঘোষ। আমার দেখা ভারতের সেরা ডিফেন্ডার। এই বিরাট মাপের ফুটবলারটি সদস্য থাকায় সকলে আশ্বস্ত থাকবেন, প্রয়োজনে প্রতিবাদ করার মতো একজন কমিটিতে আছেন।

একই আকাশে সূর্য এবং চাঁদের উপস্থিতি সম্ভব নয়। তাই বছরের পর বছর সমস্ত যুবক-ভাগ তছনছ করেও সুকুমার সমাজপতি ভারতীয় দলে স্থায়ী জায়গা পাননি। প্রদীপ ব্যানার্জিকে বাদ দিলে, সমাজপতির মতো রাইট উইঙ্গার আমরা সম্প্রতি দেখেছি কি ? কিন্তু সুকুমার সমাজপতিকে এই নির্বাচন কমিটির সদস্য করা হচ্ছে ওর অসাধারণ ফুটবল-সেন্সের জন্য।

জানি, এতক্ষণে কেউ কেউ ভাবতে শুরু করেছেন, নির্বাচন কমিটিতে ব্যালান্স কোথায় ? সবাই তো একই সময়ের ফুটবলার। ফুটবল টীম চালানোর অভিজ্ঞতা আছে, খেলোয়াড়দের বোঝেন, এমন একজন প্রবীণ সদস্য নেই কেন ? আছেন। আমাদের নির্বাচন কমিটির শেষ সদস্য হলেন জ্যোতিষচন্দ্র গুহ।

এই দলটি গড়ার ব্যাপারে পাঁচজন নির্বাচকই যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছেন। অবশ্য, বলা বাহুল্য,

জার্নেল সিং

বলরাম

চুণী গোস্বামীর সঙ্গে কথা শুরু করেছিলাম স্ট্র্যান্ড রোডে স্টেট ব্যাঙ্কের অফিসে ওঁর চেম্বারে। কথা শেষ হল মোহনবাগান টেন্টে। পি কে জবাব দিয়েছেন খুব অল্প সময়ে ফেয়ারলি প্লেসে ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অফিসে। অরুণ ঘোষ রায় দিয়েছেন অনেক ভেবেচিন্তে, সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের টেন্টে পড়ন্ত বিকেলে। পাশে ছিলেন বলরাম। সুকুমার সমাজপতি স্টেট ব্যাঙ্কের এলিয়ট রোডের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের চেয়ারটিকেই নির্বাচকের আসন হিসেবে ব্যবহার করেছেন, অবশ্য শেষ পর্যন্ত আলোচনা ওঁর বাড়ির ড্রইং রুম পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। জ্যোতিষ গুহ কাজটি সেরেছেন ভবানীপুর টেন্টে বসে, অবশ্য শেষ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন টেলিফোনে।

সনৎ শেঠ সেরা খেলা খেলেছেন উনিশশো বাটের আগে। সুতরাং এই দলে গোল কীপার হিসেবে থঙ্গরাজ ছাড়া আর কেউ আসে না—চুণী গোস্বামীর এই মন্তব্যের সায় দিয়েছেন সকলে—শুধু একজন বাদে। অরুণ ঘোষ বলেছেন : "প্রদ্যোত বর্মন নিঃসন্দেহে এই সময়ের সেরা গোল কীপার। এ ব্যাপারে আমার কোনো দ্বিধা নেই। জাকার্তার এশিয়ান গেমস ফাইনালে আমরা যে গোলটি খেয়ে-ছিলাম, আমার ধারণা বর্মন থাকলে সেটি হত না। জাকার্তায় ভারতীয়দের মধ্যে থঙ্গরাজ খুবই জনপ্রিয়। এবং ভারতীয় হাই কমিশনারের নির্দেশেই ফাইনালে বর্মনকে বাদ দিয়ে থঙ্গরাজকে খেলাতে রহিম সাহেব বাধ্য হয়েছিলেন।"

যাই হোক, বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে থঙ্গরাজ টীমে এসে গেছেন।

চার জন ব্যাক কে কে দাঁড়াবে ? পাঁচজন নির্বাচকই একমত শুধু একজনের ব্যাপারে : রহমান। রহমান, প্রায় সকলেরই মতে, এই আঠারো বছরের সেরা ব্যাক।

দুজন স্টপার হবে জার্নেল সিং এবং অরুণ ঘোষ—এটা নিয়েও যে দ্বিমত থাকতে পারে তা কে ভাবতে পেরেছিল ? জার্নেল সিংকে সরাসরি নাকচ করে নঈমকে দলে নিতে চেয়েছেন প্রবীণতম নির্বাচক জে সি গুহ। কেন ? জ্যোতিষ গুহ বলছেন, "আসলে, জার্নেলের খেলা আমার কোনদিনই ভালো লাগত না। আমার টীমে ওকে আমি চাই না। কে কী বলল তাতে আমার কিছু এসে যায় না, জার্নেল আমার ভোট পাবে না।"

প্রদীপ ব্যানার্জি

অরুণ ঘোষ

আর অরুণ ঘোষকে বাদ দিতে চেয়েছেন কে ? কে আবার, স্বয়ং অরুণ ঘোষ। ওঁর বক্তব্য, চার ব্যাকের ফিক্সড্ স্টপার হিসেবে রহমান নিশ্চয়ই ভাল খেলত। ওর ধাতটাই ছিল একটু নিজের মতো করে খেলার। অরুণ ঘোষ রহমানকে স্টপারে খেলিয়ে সাইড ব্যাক হিসেবে চন্দ্রশেখরকে চেয়েছেন।

অরুণ ঘোষের কথা শুনে জ্যোতিষ গুহ সস্নেহে হেসেছেন। এবং আমি অরুণ ঘোষকে বলেছি : "কি আজেবাজে বলছেন! অরুণ ঘোষকে বাদ দিয়ে টীম আমরা, মানে পাবলিক, মাঠে নামতে দেব ভেবেছেন ?"

অরুণ ঘোষের উত্তর : "মহা মুশকিল! বেস্ট টীমকে মাঠে নামতে দেবে না ? আমি তো থাকবই, রিজার্ভ হিসেবে মাঠের বাইরে।"

যাই হোক, জ্যোতিষ গুহ এবং অরুণ ঘোষের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে স্টপারের জায়গায় নির্বাচিত হচ্ছেন জার্নেল সিং এবং অরুণ ঘোষ।

কিন্তু আরেকজন সাইডব্যাক কে হবে ? অরুণ ঘোষ অবশ্য রহমানকে মাঝখানে ঢুকিয়ে চন্দ্রশেখর এবং সুধীর কর্মকারকে দুই সাইড ব্যাক করতে চেয়েছেন। চুণী গোস্বামী, প্রদীপ ব্যানার্জি এবং জে সি গুহও এককথায় সুধীর কর্মকারকে দলে নিয়েছেন। কিন্তু এবার অন্য সুর তুলেছেন সুকুমার সমাজপতি। সুধীরের বদলে নঈমকে না খেলানোর কোনো যুক্তিই উনি খুঁজে পাননি। সুতরাং, চতুর্থ ব্যাক হিসেবে নাম উঠেছে নঈম, চন্দ্রশেখর এবং সুধীর কর্মকারের। শুধু অরুণ ঘোষ নয়, চন্দ্রশেখরের অসাধারণ ট্যাকলিং-এর প্রশংসা করেছেন

থঙ্গরাজ

সুধীর কর্মকার

প্রদীপ ব্যানার্জি এবং চুণী গোস্বামী—যাঁরা দীর্ঘ-দিন চন্দ্রশেখরের সঙ্গে একই ভারতীয় দলে খেলেছেন। নঈমের হয়ে জ্যোতিষ গুহ এবং সুকুমার সমাজপতিও কম লড়েননি। তবু, শেষ বিচারে চারটি ভোট পেয়ে সুধীর কর্মকারই দাঁড়াবে রহমান, জার্নেল সিং এবং অরুণ ঘোষের পাশে।

দুই উইং হাফের মধ্যে একজন—কেম্পিয়াকে পাঁচজন নির্বাচকই একবাক্যে নির্বাচিত করেছেন। চুণী গোস্বামী বলেছেন : "কেম্পিয়ার খেলা হয়তো দর্শনীয় ছিল না। কিন্তু ওকে বাদ দিয়ে ইণ্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলার কথা ভাবা যায় না।" সমাজপতির মতে, "ওর কভারিং এবং পজিশনাল প্লে যে কী অসাধারণ ছিল, এ শুধু তারাই জানে যারা ওর বিরুদ্ধে খেলেছে। অরুণ ঘোষ সরাসরি বলেছেন, "এগারো জন চুণী গোস্বামী নিয়ে কিন্তু টীম খেলতে পারবে না। একটি অফিসে সবাই যদি অফিসার হয়, কাজ চলবে ? কেম্পিয়া না থাকলে আমার টীমের হয়ে মাঝমাঠে বলগুলো ছিনিয়ে নেবে কে ?"

সুতরাং কেম্পিয়া। কিন্তু আরেকজন উইং হাফের জায়গায় হচ্ছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দুই প্রধান প্রার্থী প্রশান্ত সিংহ এবং ইউসুফ খান। অরুণ ঘোষ এবং প্রদীপ ব্যানার্জি ভোট দিয়েছেন ইউসুফ খানকে। চুণী গোস্বামী এবং সুকুমার সমাজপতির [illegible] সিংহের দিকে।

কেম্পিয়া
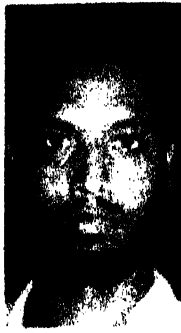
ইউসুফ খাঁ

অবশ্য, অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলের বিরুদ্ধে চুণী গোস্বামী দলে নিতে চেয়েছেন একজন বল প্লেয়ারকে। সেক্ষেত্রে, চুণী গোস্বামীর মতে, পিণ্টু চৌধুরীর নাম আসবে। কাজল মুখার্জি নয়, কারণ যথাসময়ে বল ছাড়তে কাজল কখনও চাইত না।

প্রশান্ত সিংহ এবং ইউসুফ খান দুটি করে ভোট পেয়ে সমান-সমান। সুতরাং, নির্বাচক-মণ্ডলীর পঞ্চম সদস্য জ্যোতিষ গুহ যাকে ভোট দেবেন, কেম্পিয়ার সঙ্গী হবে সে। কিন্তু জ্যোতিষ গুহ আমাদের বিপদে ফেলে বলেছেন: "আমি চাই মান বাহাদুরকে।" সমস্যাটা থেকেই গেল। তাই শেষ মুহূর্তে, একরকম নিরুপায় হয়েই টেলিফোনে বললাম: "জ্যোতিষদা, প্রশান্ত সিংহ এবং ইউসুফ খান—এই দুজনের মধ্যে কাকে আপনি সেকেণ্ড প্রেফারেন্স ভোট দেবেন?" সমস্যা মিটে গেল। জ্যোতিষ গুহ তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন: "ডেফিনিটলি ইউসুফ খান।"

ফরোয়ার্ড লাইনে তিনজনকে নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। প্রদীপ ব্যানার্জি, চুণী গোস্বামী এবং বলরাম। কিন্তু আশা করি সকলেই প্রস্তুত, চতুর্থ ফরোয়ার্ডের জায়গায় এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য। প্রদীপ ব্যানার্জি স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ়তায় সোজাসুজি বলেছেন: "কোনো প্রশ্ন নেই, চতুর্থ ফরোয়ার্ড ইন্দর সিং।"

জ্যোতিষ গুহ প্রথমে হাবিবের নাম বলেছিলেন। পরে বলেছেন: "একদম মনে ছিল না, খেলবে অবশ্যই ইন্দর সিং। বাকী তিনজনের সাথে খেলার বোঝাপড়া ওরই আছে।"

চুণী গোস্বামীর মতে, চার-দুই চারের খেলায় হাবিবকে নিতেই হবে। নাহলে নম্বুই মিনিট ফাইট করবে কে?

সুকুমার সমাজপতি হাবিবকে বাদ দেবার পক্ষে জোরালো যুক্তি দেখিয়েছেন: "চুণী-বলরাম-প্রদীপ ব্যানার্জির দলে অতিরিক্ত খাটবার লোকের দরকার নেই। পরিমল দে খেলুক। হাবিব খেলবে আর জংলা বাইরে বসে থাকবে—এটা হয় না।

চতুর্থ ফরোয়ার্ড হিসেবে অরুণ ঘোষ কি হাবিবকে চান? অথবা ইন্দর সিং? না অরুণ ঘোষ এমন একজনের নাম করেছেন যার কথা কেউই ভাবেননি। অরুণ ঘোষ প্রায় আক্রমণের ভঙ্গীতে বললেন: "পরিমল দে বা হাবিবকে কেন নিতে হবে, স্কীম করার জন্য? স্কীম করার জন্য এই টীমে আছে তিন-তিনজন জাত স্কীমার—ইউসুফ খান, চুণী গোস্বামী এবং বলরাম। স্ট্রাইক করবে প্রদীপ ব্যানার্জি এবং—। এবং কে? আপ্পালারাজু। তিন কাঠি আপ্পালা ভালই চিনত। বাকী তিনজন যা বল দেবে, তা থেকে দুটো গোল আপ্পালা নিশ্চয় করবে।"

কিন্তু নানা মত সত্ত্বেও, দুটি ভোট পেয়ে কোনরকমে নির্বাচিত হয়ে গেলেন পাঞ্জাবকেশরী ইন্দর সিং।
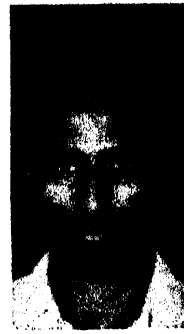
ইন্দর সিং

মান

আমাদের টীম: পিটার থঙ্গরাজ; সুধীর কর্মকার, জার্নেল সিং, অরুণ ঘোষ এবং রহমান, কেম্পিয়া এবং ইউসুফ খান; প্রদীপ ব্যানার্জি, ইন্দর সিং, চুণী গোস্বামী এবং বলরাম। টীম এখন মাঠে নামবে। কিন্তু একটা কথা কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি। বল নিয়ে সবার আগে মাঠে নামবে কে? বিশেষজ্ঞদের কাছে না গিয়ে, আসুন, এবার পাবলিকের মত নিই। 'পাবলিক' একটা কথার গুরু ভক্ত: "লাকি ক্যাপ্টেন!" নিঃসন্দেহে সেই লাকি ক্যাপ্টেন চুণী গোস্বামী। শেষবার যার নেতৃত্বে ভারতের গলায় সোনার মেডেল দুলেছে।

চুণী গোস্বামী বল এবং দল নিয়ে মাঠে নামছেন। প্রতিপক্ষ এশিয়ারই কোনো শক্তিশালী দেশ। চুণীর পিছনে বিশালদেহী থঙ্গরাজ, আপাতনিরীহ বলরাম, তেজী পি কে, জার্নেল, অরুণ ঘোষ—। আসুন, মনে মনে খেলাটি আমরা দেখি।

মিহির বসু এবং সেই গোলটি

গ্রামে গঞ্জে, শহরের অলিতে-গলিতে সেই জয়-বার্তা ছুটি যাবার পর মিহির বসু ও ভাস্কর গাঙ্গুলীকে ডাকা হয়েছিল টেলিভিশন সংস্থায়। টেলিভিশনের পর্দায় ছবিটা ভেসে উঠতেই মিহির হেসে উঠল। ভাষ্যকার বললেন, "ওই দেখুন, গোলদাতা মিহির বসু নিজের গোলটি দেখে নিজেই কেমন হাসছেন।" সুখ-স্মৃতির ছোঁয়াচ লেগে হাসিটি আনন্দেই ফুটে উঠেছিল মিহিরের মুখে। দর্শকদের কাছে ছিল ওটি বাড়তি উপহার।

কোন গোলটির কথা বলছি? ৯ জুলাই ফুটবলের মহারণে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম গোলটির কথা—যে গোলকে অতীতের স্বনামধন্য খেলোয়াড় জারনেল সিং বলেছেন, 'এ জেম অফ এ গোল।' চুনী গোস্বামী বলেছেন, 'সাত রাজার ধন এক মানিক'। একদা ভলি মারায় সিদ্ধ-পদ চুনী গোস্বামী আরও বলেছেন, 'অন দ্য মুভ যে ভলিটিতে ওই গোল শতেক যোজন দূরে থেকে মানুষ মাঠে আসে ওই শিল্প-কর্ম দেখতে।'

সর্বনাশ! মেঠো ফুটবলেও শিল্পকর্ম? ক্রিকেট হলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ উঠত না। কেননা ক্রিকেটের বিভিন্ন মারের মধ্যে বিজ্ঞানের দুরূহ নিয়মের মূর্ত প্রকাশ। মানা স্ট্রোকে পেলব কব্জির শিল্পীসুলভ দক্ষতা। ফুটবল খেলা বলেই হয়তো মুষ্টিমেয় প্রতিবাদ তুলেছেন চুনীর সৌন্দর্যসত্তার জাগরণ দেখে।

কিন্তু শিল্পের ব্যাখ্যা কী? না, সহজ ও সুষম ক্রিয়ার আনন্দই শিল্পের লক্ষণ। সৃষ্টির নিপুণতায় দৃষ্টির ভিতর টেনে এনে শিল্পী এমন কিছু দেখাবে, যা সাধারণভাবে আগে দেখা যায়নি, এমন কিছু দৃষ্টিগোচর করাবে—যা আগে চোখকে এতখানি তৃপ্তি দেয়নি। শিল্পে থাকবে প্রগলভতার চেয়ে মিতভাষ বেশী বাহুল্যের চেয়ে সারল্যের সাবলীল সংকলন। আর্ট সম্পর্কে এই সওয়াল আর কারো নয়, শিল্পী ও কবি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের।

মুষ্টিমেয় মোহান্ধ সমর্থক যাই বলুন, মিহিরের ওই গোলের মধ্যে অবশ্যই শিল্পের ছাপ ছিল। বিপক্ষ ব্যূহের বাধা ভেঙে অতি সহজে, অনায়াস ভঙ্গিতে বল ধরে ডান পায়ের ছোট টানে বাঁ পায়ের একটা বড় ব্যাপার। বিদ্যুৎ গতির শটে গোলের জাল কেঁপে উঠতেই চুনীর মত হাজার হাজার দর্শকের সৌন্দর্যসত্তা জেগে ওঠে। এমন জিনিস তো আগে দেখিনি।

সত্যিই এ মরসুমে মিহির কি ওইভাবে আর গোল করতে পেরেছে? কিংবা আর কেউ? ওই খেলার পরে ১৮ জুলাই ইস্টার্ন কমান্ডের বিরুদ্ধে মিহিরই তো নষ্ট করেছে গোল করার দুটি সুবর্ণ সুযোগ। কেউ বাধা দেবার ছিল না। সামনে শুধু সামরিক দলের গোলরক্ষক। তবু মিহির একবার দুর্বল শট তার হাতে তুলে দিল। আর একবার শট হল লক্ষ্যভ্রষ্ট।

অস্বীকার করব না ৯ জুলাই ভাগ্যদেবী মিহিরের উপর সুপ্রসন্না ছিলেন। কিন্তু কে ভাগ্যের প্রসন্নতা পায়? অসাধ্যকে সাধ্যায়ত্ত করতে যে নিরবচ্ছিন্ন সাধনা করে। এই মরসুমে মিহির অন্তত পাঁচশোবার ওই ধরনের ভলি মারা প্র্যাক্টিস করেছে। হ্যাঁ, ওই খেলার আগের কথাই বলছি। প্র্যাক্টিসের সময় বল তুলে দিত সুরজিৎ কিংবা উলাগা অথবা রঞ্জিৎ। কোনো কোনো সময় কোচ অমল দত্ত নিজে। মিহির প্রাণ খুলে ভলি মারত ডান পায়ে। কচিৎ বাঁ পায়ে শট নিত। কখনো গোল হত কখনো শট হত লক্ষ্যভ্রষ্ট, কখনো গোল আটকে দিত ভাস্কর গাঙ্গুলী। মোহনবাগানের সঙ্গে খেলার দিন পাঁচেক আগে অমল দত্ত বললেন, মিহির এবার বাঁ পাটা বেশী চালাও। এমনও তো হতে পারে বড় ম্যাচে বাঁ পায়ের সামনেই উঁচু বলটা পেয়ে গেলে। শেষ দিকে প্র্যাক্টিসের পর অমল দত্ত নিজেই বল তুলে দিতেন। কখনো নীচু হাইটে, কখনো উঁচু হাইটে। আবার কখনো বক্স থেকে একটু দূরে, কখনো বক্সের খুব কাছে। মিহির বাঁ পায়ে সব কিলিং করত। বড় ম্যাচে সেই বাঁ পায়েই ভলি গেল; আর পরের বলটা হয়ে গেল মহারণের ইতিহাস।

যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়েই কলকাতার ফুটবল সমাজে মিহিরের প্রবেশ। বসিরহাটের ছেলে। জন্ম ১৯৫৫-র ৩ মে তারিখে। কালিভূষণ বসুর দশটি সন্তানের মধ্যে মিহির সপ্তম, চার ভাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয়। বসিরহাট ইয়ংস্টার ক্লাবে ফুটবল শুরু। ছোটবেলা থেকে গোল করার সহজাত দক্ষতা ছিল। দেহের উচ্চতা ভিত্তিক ছোটদের প্রতিযোগিতায় অর্থাৎ ৪ ফুট ১০ ইঞ্চি থেকে ৫ ফুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ খেলোয়াড়দের টুর্নামেন্টে প্রচুর গোল করত। কোনো খেলায় ডাবল হ্যাটট্রিকও। ৭২-এ চলে আসে কলকাতার সোনালী শিবির ক্লাবে। সেই প্রথম কলকাতা ময়দানে খেলা। ভালই খেলেছিল। যার ফলে পরের বছর প্রথম ডিভিসন টিম ক্যালকাটা পোর্ট কমিশনার্সে খেলার সুযোগ। সম্ভাবনাময় তরুণদের একটা মস্ত সুবিধাই বলুন, আর অসুবিধাই বলুন, কেউ তাদের হাঁড়িতে কালি পড়তে দেয় না। ঘন ঘন ডাক আসে এ ক্লাব সে ক্লাব থেকে। সুবিধাই বলতে হবে। ক্লাব না বদলালে মিহির কি আজকের মিহির হয়ে উঠতে পারত? মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ওই ধরনের গোল করলেও?

যাই হোক ৭৪-এ মিহিরের ডাক এল বি এন আর থেকে। বয়স তখন সবে উনিশ। প্রথম বছর খেলা দেখে কেউ বলল ছোট সুভাষ ভৌমিক, কেউ বলল ছোট হাবিব। রেলে একটা চাকরীও জুটে গেল। তাই ৭৬ পর্যন্ত ছিল বি এন আর-এ। তিন বছর মোটামুটি ভাল খেলার সুবাদে এবং গোলদাতা হিসাবে মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে মিহিরের নাম প্রকাশিত হওয়ায় পরিচয়ের পরিবেশটা বেশ বড় সড় হয়ে উঠল। জাতীয় ফুটবলে সর্বভারতীয় রেলওয়েজ দলে খেলেছে শেষ দু বছর। পাটনায় জাতীয় ফুটবল আসরে পাঁচটি গোল করেছিল গ্রুপ লীগের খেলায়। পটেনশিয়াল বড় প্লেয়ার হিসাবে জার্সির উপর অদৃশ্য অক্ষরে লেখাটা এতদিনে পোড়খাওয়া দৃষ্টির ফুটবল পণ্ডিতদের কাছে দৃশ্যমান হয়েছে।

বিগত ডুরান্ড কাপে খেলায় হেরে দিল্লি থেকে বি এন আর-এর কলকাতায় ফিরে আসা, আর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কলকাতা থেকে ডুরান্ড খেলতে দিল্লীতে যাত্রা এক সময়েই ঘটে। অফিসে এসে মিহির দেখে ওর টেবিলে চাপা দেওয়া একখানা আঁটা খাম। উপরে ওরই নাম লেখা। খুলে দেখে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এক কর্মকর্তার লেখা চিঠি। বিষয়বস্তু: 'আমরা ডুরান্ড খেলতে চললাম। তুমি আমাদের সঙ্গে কথা না বলে আর কারো সঙ্গে কথা বলো না। কিছু ঠিক করো না।'

খেলোয়াড়দের দল বদলের মরসুম শুরু হওয়ার দুই সপ্তাহ আগে প্রায় রোজই ভোরে ইস্টবেঙ্গলের এক জোড়া কর্মকর্তা যেতেন বেলেঘাটায় মিহিরের দিদির বাড়িতে। ওই বাড়িই ওর কলকাতার আস্তানা।

দল বদলের কথাটা জানাজানি হওয়ার পর মিহিরের বাবা আপত্তি তুললেন। বললেন, রেলের ভাল চাকরি ছেড়ে যাবি? আপত্তি উঠল বি এন আর থেকেও। তাঁরা মিহিরকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। মিহির বাবাকে বোঝালো ভাল খেলতে পারলে চাকরী একটা পেয়ে যাবেই এবং সই করল ইস্টবেঙ্গলে খেলার জন্য। সইয়ের পরই রেল দপ্তর থেকে মিহিরের বিরুদ্ধে চার্জশিট এবং কর্তব্যে অবহেলার জন্য চাকরী খতম। প্রথমে মনটা একটু খারাপ হয়েছিল বইকি। এখন আর অনুশোচনা নেই। এখন বেকার হলেও বি এ পার্ট ওয়ান পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত মিহিরের চাকরিও হয়ে যাচ্ছে অনতিবিলম্বে। হয় ইউ কো ব্যাঙ্কে, না হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে।

বি এন আর ছেড়ে এলেও ক্লাবের কর্মকর্তারা চান মিহির আরও বড় হোক। কারণ ওর মধ্যে বড় হওয়ার উপাদান রয়েছে। কিছুদিন আগে ইস্টবেঙ্গল-ভার্জ টেলিগ্রাফ ম্যাচ দেখে বি এন আর-এর কয়েকজন খেলোয়াড় যখন নিজেদের তাঁবুতে ফিরলেন তখন অরুণ ঘোষ এবং বলরাম কোচিং চেয়ারে বসে। প্রথমেই খোঁজ নিলেন মিহির কেমন খেলল। প্রায়ই খোঁজ নেন। মিহিরের উপর ওঁদের অনেক আশা।

খুব ছোট বেলায় মিহির দেখেছে অরুণ ঘোষ, বলরাম, চুনী গোস্বামী প্রভৃতির চোখ জুড়ানো খেলা। বি এন আর-এ এসে সেই অরুণ-বলরামের হাতে পড়ে নিজের হাতে যেন স্বর্গ পেয়েছিল। ফুটবলের প্রথম ব্যাকরণিক শিক্ষা ওদের কাছেই। কোচিং নিয়েছে দেবু ঘোষ এবং আলিফ খাঁর কাছ থেকেও। সবার কাছে ও ঋণী। বলল, শ্যুটিংয়ে পোক্ত করেছেন দেবু ঘোষ, ভলি-এর কলাকৌশল অনেকটা জেনেছে বলরামের কাছ থেকে। অরুণ ঘোষ বাড়িয়েছেন স্ট্যামিনা। এখন ইস্টবেঙ্গল কোচ অমল দত্তর কাছে চলছে সার্বিক প্রশিক্ষণ—পরিমার্জনের প্রশিক্ষণ।

মিহিরের কাছে আদর্শ খেলোয়াড় হচ্ছে হাবিব। খেলার ধাঁচ অনেকটা হাবিবেরই মত। চেষ্টার ত্রুটি করে না, বড় ম্যাচে কোন টেনশনে ভোগে না।

শ্যুটিং, ভলিং, স্পীড; স্ট্যামিনা—এ সবই হচ্ছে পাঁচ ফুট সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি মাথায় উঁচু, ৬০ কিলোগ্রাম ওজনের শক্তসমর্থ ছেলেটির প্লাস পয়েন্ট। শুধু ট্র্যাপিংয়ে এখনো পরিমার্জনের অভাব আছে। ঠিকমত বল রিসিভের ত্রুটি শুধরে গেলে খুব ভাল ফরোয়ার্ড হয়ে উঠবেই। মিহির মূলত ছিল অ্যাটাকিং ফরোয়ার্ড। এ বছরই দলের প্রয়োজনে ডিপ থেকে উঠে চমৎকার খেলছে। বড়-প্লেয়ার হিসাবে বেড়ে ওঠারও সম্ভাবনা প্রচুর।

৯ জুলাইয়ের ম্যাচ খাং করে কেমন লাগছিল? ক্লাব তাঁবুতে হই-হুল্লোড় ও মাতামাতির পরই বা কি করলে? এই দুটি প্রশ্নের উত্তরে মিহির একটু হাসল। বলল, এখন ঠিক বলে বোঝাতে পারব না তখন কেমন লাগছিল। পরে একটু যেন অবসাদও এসেছিল। খাবারে রুচি ছিল না। সাতটায় ক্লাব তাঁবু থেকে রওনা হয়ে যাই বেলেঘাটায় দিদির বাড়ি। সেখান থেকে শ্যামবাজার। শ্যামবাজার থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা যখন বসিরহাট পৌঁছলাম তখন রাত ১১টা। এক হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে গিয়েছিলাম। মা সেই মিষ্টি মুখে পুরে দিলেন। দুপুর বেলাটায় টোস্ট ও ওমলেট খেয়েছিলাম। টেস্টে। তারপর ওই প্রথম সলিড ফুড। আর কিছুই খেতে ইচ্ছে করেনি।

মিহির বলল, 'আমার ওই গোলে সব চেয়ে খুশী বোধ হয় জীবনদা।' ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জীবন চক্রবর্তী যিনি অজানা কাননের আয়ামগের পেছনে ছোটায় নিষেধ উপেক্ষা করে স্বর্ণমৃগ ধরে এনেছেন। একটি গোলই তো চ্যাম্পিয়নশিপের ভাগ্য তৈরী করে দিতে পারে। ৭৫-এ করেছে শ্যাম থাপার গোল, ৭৬-এ আকবরের গোল। এ বছর মিহিরের গোল ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মান দিতে পারে, যদিও সমরেশ চৌধুরীর পরের গোলটির ভূমিকাও কম নয়।

মুকুল

নতুন বই

উপন্যাস

...রের নদী। সন্তোষকুমার ঘোষ। দে'জ পাবলিশিং প্রাঃ লিঃ, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩। পাঁচ টাকা

...ভাতীয়া। রমাপদ চৌধুরী। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ-৭৩। ছয় টাকা।

নজরুল উপন্যাস সমগ্র। কাজী নজরুল ইসলাম। রূপায়ণী প্রকাশনী, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২। দশ টাকা

রাজা গেল রাজ্য এল। আলফ্রেড ...রাজুল মুখার্জি। রূপায়ণী প্রকাশনী, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২। চোদ্দ টাকা

...অন্তরে হত্যাকান্ড। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। অনন্যা প্রকাশন, ৬৬ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। সাত টাকা।

মোগলসরাই জংশন। নিমাই ভট্টাচার্য। দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩। পাঁচ টাকা।

বেহুলা। চিত্ত সিংহ। সুজনী, ৪ ভূপেন বোস এভিন্যু, কলিকাতা-৪ ; ৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯। ছয় টাকা

...জল তরঙ্গ। সলিল লাহিড়ী। বিশ্বজ্ঞান, ৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯। সাত টাকা

কবিতা

জন্মের ভিটে। রণজিৎ সিংহ। কথাশিল্প, ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩। ছয় টাকা।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩। বারো টাকা

দ্বিতীয় বৃত্ত। কণা বসু। বিশ্বজ্ঞান, ৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯। চার টাকা

হেমন্ত যেখানে থাকে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়। অনন্য প্রকাশন, ৬৬ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২। চার টাকা

শিশু সাহিত্য

রাজা হওয়ার কারবারি। বিমল মিত্র। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯। ৭.০০

সাগরপারের রূপকথা (সচিত্র)। সলিল লাহিড়ী। বিশ্বজ্ঞান, ৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯। সাত টাকা

সেই অদ্ভুত জন্তুখানি। সুবোধ ঘোষ। আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিঃ-৯। ৫.০০

প্রবন্ধ

পথের শেষ কোথায়। আবু সয়ীদ আয়ুব। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলি-৭৩। বারো টাকা

একটি নক্ষত্র আসে (জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কিত)। অম্বুজ বসু। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩। বাইশ টাকা

কাজী নজরুলের গান। নারায়ণ চৌধুরী। এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ-৭৩। পাঁচ টাকা

ইন্দিরা-একাদশী। বরুণ সেনগুপ্ত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯। পাঁচ টাকা (সুলভ)।

বিবিধ

চৌদিকে পায়ের শব্দ। (কাব্য নাটক)। সমীর চক্রবর্তী। বিশ্বজ্ঞান, ৯/৩ টেমার লেন, কলি-৯। পাঁচ টাকা

রবি-অনুরাগিনী। অমিতাভ চৌধুরী। অনন্য প্রকাশন, ৬৬, কলেজ স্ট্রীট, কলি-১২। আট টাকা

আমার জীবনী। মীর মোশাররফ হোসেন। ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স, ১১৯, লেনিন সরণি, কলি-১৩। কুড়ি টাকা

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আমি আমরা। নমিতা বসু মজুমদার। অনন্য প্রকাশন, ৬৬ কলেজ স্ট্রীট, কলি-১২। এগার টাকা

পাকুড় হত্যার মামলা। চিরঞ্জীব সেন। রূপায়ণী প্রকাশনী ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২। পাঁচ টাকা

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **বই**

ইন্দিরা একাদশী—শ্রীবরুণ সেনগুপ্ত (আনন্দ পাবলিশার্স, মূল্য : ১০.০০, পৃ ১১৯)।

পূর্ব ভূখণ্ডে সাম্প্রতিককালে তিনটি মহিলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার তুঙ্গে উঠে পশ্চিমের "মুক্ত" মহিলাদের বিস্মিত ও ঈর্ষান্বিত করেছিলেন। তাঁদের তিন জনই অধুনা অস্তমিত।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক অভ্যুদয় ও অধঃপতন নিঃসন্দেহে দ্রুত ও নাটকীয়। সংক্ষিপ্ত কিন্তু নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ইতিহাসের এই অধ্যায়টি সম্বন্ধে অচিরেই বহুবিধ রচনা স্তূপীকৃত হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যে শ্রীবরুণ সেনগুপ্ত দ্রুত হাত চালিয়ে তাঁর ক্ষেতের ফসল প্রথম কিস্তি আমাদের হাতে পৌঁছে দিয়েছেন। বাংলা সাংবাদিকতা-ক্ষেত্রের এই দৌড় প্রতিযোগিতায় সম্ভবত প্রথম হওয়ার পুরস্কার তিনি দাবী করতে পারেন। এগারো বৎসর ব্যাপী যে কাহিনীর শেষ (?) হয়েছে মাত্র তিন মাস আগে তার একটি ছিমছাম একসূত্রবন্ধ পাঠযোগ্য বিবরণ এত দ্রুত তৈরী করে ফেলা খুব সহজ নয়। অথচ সাংবাদিকদের আবার তর সয় না। এবং সম্ভবত এ জাতীয় সংবাদ-সাহিত্যে রচনার সৌকর্য কেউ তেমন প্রত্যাশা করেন না। তাই তথ্য ভারাক্রান্ত ঊর্ধশ্বাস এই বর্ণনায় সাহিত্য রসের অভাব উপেক্ষা করা চলে। তবে অন্য রসের উপস্থিতি এই অভাবটুকু পুষিয়ে দেবে বলে মনে হয়। সর্বজনবিদিত ঘটনার অন্তরালে বড় বড় মানুষের ছোট ছোট কাজকর্ম সম্বন্ধে আজকাল সংবাদপত্র পাঠকের অপরিমিত কৌতূহল; সেই তৃষ্ণা মেটাবার কিছুটা আয়োজন এই বইয়ে আছে, অর্থাৎ "ইন্দিরা একাদশী" নিরম্বু ইতিহাস নয়। বইয়ের প্রচ্ছদেও একটু নাটকীয়তা আছে। শ্রীমতী গান্ধীর আলোকচিত্রটির সঙ্গে এক্সরে ফোটোর একটা অস্পষ্ট সাদৃশ্য থাকায় প্রথম থেকেই লেখকের বিষয় উপস্থাপনায় গভীরতা সম্বন্ধে পাঠকের মনে একটা অসংজাত প্রত্যাশা জাগায়।

পশ্চাদদৃষ্টি ভবিষ্যদৃষ্টির মতন দুর্লভ নয় বলেই সদ্য-অতীত ঘটনাবলীর ব্যাখ্যানে এবং ঘটনা ও পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আবিষ্কারে নিপুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকেন অনেকেই। বরুণবাবুর গুণ এই যে তাঁর অনেকগুলি ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পেরেছেন। অবশ্য সব ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে হয়ত কেউ কেউ ইতস্তত করবেন—বিশেষত যেখানে কিছু কিছু তথ্যের মূল কেবলমাত্র জনশ্রুতি। বইখানি পড়তে পড়তে আমার তো মনে হয়েছে যেন চাণক্যস্বভাবী (অবশ্যই নিন্দার্থে) ঐ একটি মহিলাই ব্যক্তি এই ষাট কোটি মানুষের জটিল রাজনৈতিক নাটকটিকে গত সাড়ে-আট বছর যাবৎ চতুর সূত্রধারের মতন এতবড় দেশের রঙ্গমঞ্চে খেলিয়ে নিয়ে গেছেন দশটি দক্ষ আঙুলির সঞ্চালনে। এমন কি স্নেহান্ধ মুমূর্ষু পিতার সনির্বন্ধ অনুরোধও (যদি বা সে কাহিনী সর্বাংশে সত্যও হয়) শেষ পর্যন্ত কন্যার ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে খুব কিছু সুবিধা করে দেয়নি। নিজের যুদ্ধ ইন্দিরা প্রায় একা হাতে নিজেই লড়ে গেছেন—অবশ্য কখনই সোৎসাহী মন্ত্রণাদাতা ও পারিষদবর্গের অভাব হয়নি। অন্তর্দলীয় ও অন্যবিধ যুদ্ধের সৈন্য-সংস্থাপনে ও লড়াইয়ের মারপ্যাঁচে সুদক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। তবে বল এবং কৌশলের সঙ্গে ছলেরও পর্যাপ্ত ব্যবহারে উনি পরাঙ্মুখ হননি। গান্ধীর নাম নিয়ে রাজনীতিকে নীতিবিমুখ করে তোলার

যে একটা ভারতীয় অহঙ্কার ছিল সে অহঙ্কার চূর্ণ করায় পিতার চেয়ে কন্যা আরও বহু দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন এই এগারো বৎসরে।

১৯৫৯ সালে কংগ্রেস সভাপতির পদলাভের ব্যাপারে পৈতৃক আনুকূল্য তাঁর প্রধান সম্বল ছিল বটে এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পিতা সুচতুর কামরাজ পরিকল্পনার সাহায্যে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরিয়ে দিয়ে কন্যার পথ অনেকটা নিষ্কণ্টক করে রেখেছিলেন এমন ব্যাখ্যানও অসঙ্গত মনে হয় না। তবে এই অসমকুশলিনী মহিলাও ক্ষিপ্র চাতুর্যের সঙ্গে নিজেই নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর আসনে ও গণমানসে—দুইই অবশ্য পরে নিতান্ত তাৎক্ষণিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। আবার একথাও স্বীকার করতে হবে যে অন্তত দুবার ভাগ্যও তাঁকে দুটি চমৎকার বর দিয়েছিল : এক বরে তাসখন্দে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যু এবং অপর বরে পূর্ব-পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের জন্ম। প্রথম বরে তিনি প্রধানমন্ত্রিত্ব পেলেন, দ্বিতীয় বরে বাংলাদেশের যুদ্ধ জয় করে সর্বাধিনায়িকা, দুর্গা দুর্গতিনাশিনী হয়ে উঠলেন ভারত-বাসীর চোখে; এও এক হুসেনের ছবি নিতান্ত খামখেয়ালী ব্যক্তিগত মতের

প্রাতিজ্ঞান নয়। বলা বাহুল্য যে এই মহিলার ধমকেতু তুল্য অভ্যুত্থানে শুধু দৈব নয়, পুরুষকারও প্রবল ছিল। সবাই জানেন ইদানীং তাঁর শত্রু-মিত্র সকলেই অন্তত একটি ধারণায় একমত হয়েছিলেন: কংগ্রেসে ইন্দিরা গান্ধীই একমাত্র পুরুষ। তবে সেই নির্বিবেক নির্মম 'পৌরুষ'ও অন্ধ পুত্রস্নেহের কাছে পরাজিত হল, এবং সেই পরাজয় পিছনে রেখে গেল কী নিদারুণ মনস্তাপ!

দুটি রহস্য এখনও বহুদিন ধরে একাধারে সাধারণ পাঠক, বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও ইতিহাস পণ্ডিতদের আন্দোলিত করতে থাকবে যতদিন না শ্রীমতী গান্ধী নিজে মুখ ফুটে সত্যি কথাটা বলেন। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষীগত করার ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধীর প্রধান উৎসাহদাতা কে, সোভিয়েট রাশিয়া না সঞ্জয়-শনিচক্র, এ নিয়ে দেশে বিদেশে খুব জল্পনা চলছে। ধরুণ্যা ঐ শনিচক্রের চক্রান্তই বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে চাপ যারাই দিক, যত দিক থেকেই দিক, এই কুকর্মের আসল দায়িত্ব হতে শ্রীমতী গান্ধীকে অব্যাহতি দেওয়া যায় না। অপর রহস্য: হঠাৎ এভাবে লোকসভার নির্বাচনই বা আহ্বান করা হল কোন হিসাব অনুযায়ী? লেখক বলছেন ঘোষণাটা আমাদের কাছে হঠাৎ মনে হলেও, শ্রীমতী গান্ধী বহু দিন যাবৎ এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। গোয়েন্দা দফতরও ওঁকে ভুল আশ্বাস দিয়েছিল। নয়ত তিনি ক্ষমতা থেকে আত্মনির্বাসনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন এমন কথা নিশ্চয়ই তাঁর অন্ধ ভক্তও বলবে না। সে যাই হোক, তাঁর কুপরামর্শদাতাদের অগ্রাহ্য করেও তিনি যে শেষ পর্যন্ত লোকসভার নির্বাচন ডেকে ছিলেন তাতে করেই শেষ রক্ষা হয়েছে, তাঁর না হলেও, তাঁর দেশের। এর জন্য অন্তত ইতিহাস তাঁকে ক্ষমা করবে।

কিন্তু আমাদের কে ক্ষমা করবে—আমরা যারা ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় সহযোগিতা করেছিলাম? সেই সহযোগিতার খতিয়ানও "ইন্দিরা একাদশী"-তে কিছুটা আছে। ভয়ে লোভে যারা শ্রীমতী গান্ধীকে শিরোধার্য করেছিল এবং ইন্দিরাই ইন্ডিয়া এত বড় মিথ্যা এবং সেজন্যই ধৃষ্ট ও নির্লজ্জ উক্তি উচ্চারণ করতে যাদের বাধেনি তাদের ভূমিকাটাও নিশ্চয় একদিন বিশদ আলোচনা করবেন কেউ ধীরে সুস্থে। একজন কি করে ডিকটেটর হয়ে ওঠে সে কাহিনীর চেয়েও একজনকে কি করে ডিকটেটর করে তোলা হয়—সমাজতত্ত্বের দিক থেকে তার আলোচনা বোধ হয় আরও বেশি ফলপ্রদ। নয়ত কোথা থেকে ব্যাখ্যা পাব এই অবিশ্বাস্য ঘটনার যে, যখন সরকার আমাদের নাগরিক স্বাধীনতা শুধু নয় এমন কি জীবন-ধারণের মৌলিক অধিকার পর্যন্ত অপহরণ করেছে তখনও আমাদের বুদ্ধিজীবীরা বলে চলেছেন "কিন্তু রেল ট্রেন তো ঠিক সময়ে চলছে।"

ইন্দিরা যদি সত্যিই ইন্ডিয়া হয়ে উঠতেন, আমি অন্তত তাঁকে কিছুই পূজো করতে আপত্তি করতাম না, একজন "ব্যক্তি-কে" তার যোগ্যতার সীমার মধ্যে যতটুকু পূজো করা সম্ভব ততটুকুই। 'ইন্দিরা একাদশী' পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক কথার কথা মনে আসে গোলডা মায়ারের আত্মজীবনী হাতে এসে পড়ল। এই 'দুর্দান্ত' 'উন্মত্ত' মহিলার আত্মজীবনীটি কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে উত্তমপুরুষ এক-বচন-বর্জিত। সম্ভবত এই কারণেই যে ইজরায়েল এবং বিশ্বের তাবৎ ইহুদী সমাজের কাছে তিনি একান্তই 'আত্ম'-সমর্পণ করেছিলেন। ফলে সম্মিলিত যুযুধান আরব শক্তির চক্রব্যূহ আক্রমণের মাঝখানে ইজরায়েলের আত্মরক্ষা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার মরণপণ লড়াইয়ের আর ইহুদীদের দু-হাজার বছরের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে উঠতে পেরেছিলেন গোলডা মায়ার। এবং হয়ে ওঠাটা স্তাবককুলের নির্লজ্জ প্রশস্তির পিচ্ছিল পথে নয়। মরুভূমির মাঝখানে কিবুৎসে গড়ে তোলার হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পথে। ছেলের নার্সারি ইস্কুলের মাইনে দেবার সামর্থ্য ছিল না বলে সেই ইস্কুলের সমস্ত কাপড় চোপড় বাড়ি এনে কেচে ইস্তিরী করে দিয়েছেন তিনি। পরে যখন ইজরায়েলের শ্রমমন্ত্রী তখনও কয়েক ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে সারা সপ্তাহের জন্য তিনটি ডিম, কয়েকটি আলু আর খানিকটা শুকনো মাছ ধরে এনেছেন, অন্য যে কোনো সাধারণ গৃহিণীর মতনই। পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী লেভি এশকলের আকস্মিক মৃত্যুর পর সত্তর-উত্তীর্ণা গোলডাকে সব দল একমত হয়ে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করেছিল ১৯৬৯-এ। সেই স্মৃতিচারণ করে তিনি সবিনয়ে লিখছেন: "ইজরায়েলে [illegible] ককেই দেশের প্রয়োজনে যে কোনো দায়িত্ব নিতে হয়। যুদ্ধের ডাক আসতেই আমাদের গয়লাকে যেমন হঠাৎ মাউন্ট হারমনে সামরিক অফিসারের পদ নিতে হয়েছিল, আমাকেও তেমনি হঠাৎ প্রধানমন্ত্রীর পদ নিতে হল। সেও এ দায়িত্বটা খুব পছন্দ করেনি, আমারও আমার পদটা খুব ভাল লাগত না। তবু আমরা দুজনেই সাধ্যমত যে যার কাজ ভাল করে করবার চেষ্টা করেছিলাম।" নিজেদের সামরিক বিপর্যয়ের সংবাদ পেয়ে এহেন বৃদ্ধা প্রধানমন্ত্রীর যখন রাতের পর রাত নিদ্রায় ব্যাঘাত হত তখন তিনি নিঃসঙ্গ প্রধানমন্ত্রীভবনে পায়চারী করতেন বহুক্ষণ। কখনও হয়ত রান্নাঘরে যেতেন নিজের জন্য এক কাপ চা করে নিতে। রান্নাঘরে আলো জ্বলতে দেখে বাগান থেকে বডিগার্ড-দের কেউ হয়ত জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখত, বৃদ্ধার শরীর খারাপ লাগছে না তো? তখন সেই গার্ডের জন্যও এককাপ চা করে নিয়ে রান্নাঘরে বসে দুজনে চা খেতেন, সুয়েজ খালে, গোলান পর্বতে ইজরায়েলের পরিস্থিতি কেমন তার আলোচনা করত শেষ রাত পর্যন্ত।

মা হওয়া যদি সুখের কথা না

হয় তবে দোষী হওয়াও শোভাযাত্রার ঠিক নয়। "স্নেহ বলে তিনি মাতা, বাহুবলে তিনি রাজা।" গোলড়া তা হয়ে উঠতে পেরেছিলেন, ইন্দিরা পারেননি। তাঁর স্নেহবল সবটুকুই আত্মজের প্রতি এবং বাহুবল এমন একান্তভাবে দেশবাসীর প্রতি যদি অপব্যয়িত না হত তবে বোধ হয় এ ভাবে একাদশীতেই অমাবস্যার অন্ধকার নামত না। এই কাহিনী শেষিত পূর্ণিমায়।

গোবী আইয়ুব

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চিত্রকলা**

একটি প্রদর্শনী প্রসঙ্গে

বছর তিনেক আগে বিখ্যাত বৃটিশ শিল্পী হাওয়ার্ড হজকিনের ছাপ ছবির একটা প্রদর্শনী হয়েছিল ফাইন আর্টসের নিউ সাউথ গ্যালারীতে। উদ্যোক্তা বৃটিশ কাউন্সিল। সুতরাং প্রচুর ইংরাজ সাহেব-মেমের আবির্ভাব হয়েছিল। বেশিরভাগ কোম্পানীর বড় মেজ ছোট সাহেব এবং রাষ্ট্রদূত আপিসের কর্মচারী। মার্জিতরুচি এবং শিক্ষার

পালিশ অর্থাৎ বৈদগ্ধ্যের বড়ই অভাব। সুতরাং ছবি দেখে তাঁরা ক্যাস্টেরঅয়েল খাবার মতো মুখভঙ্গি করছিলেন অনেকেই।

একজন পতিপদগর্বে মত্ত মেম-সাহেব হিলতোলা জুতো ঘোড়ার নালের মতো খটখট করে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, আপনিই মিঃ হজকিন ?

হজকিন বাও করে বললেন, আজ্ঞে হাঁ ম্যাডাম।

হঠাৎ ফেটে পড়ে সেই মহিলা বললেন, What do mean by these things ?

মেমসাহেবের পাঁচ বছরের ছেলে হঠাৎ বলল, Don't be silly Mum. He has drawn pictures from the window of a train.

মার হাত ধরে একটা ছবির সামনে নিয়ে গিয়ে সে বলল, See Moma, this is a sun set drawn when the train was crossing a bridge.

হজকিন তখন হো-হো করে হেসে বলল, Let the children come to me, and do not hinder them; for to such belong the kingdom of heaven.

অনুষ্ঠিতার মুখের রঙ তখন বহুরূপী গিরগিটির মতো দ্রুত বদলাচ্ছে। লাল হলো কিছুটা। তারপর প্রায় বেগুনী। শেষে একদম সাদা। ছেলেটা মার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল হজকিনের দিকে।

ভুবনমোহন হাসি হেসে এগিয়ে এল। বলল You mustn't mind Mama. She dosen't even understand my pictures ! But you are a real painter.

লাজুকভাবে পকেট থেকে কচি হাত বের করে সে হজকিনের দিকে এগিয়ে দিল।

হজকিন গম্ভীর হয়ে করমর্দন করে বলল, Thank you very much. I appreciate that.

শিশুরা বড়দের চেয়ে ছবি বোঝে বেশি। অনেকের চেয়ে আঁকেও ভাল। কিন্তু সব শিশু বড় হয়ে নাম-করা আঁকিয়ে হয় না। সঙ্গীত এবং শিল্পকলায় মোৎসার্ট, মেনুহিন, পিকাসো প্রভৃতি কিছু উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও শিশুকে প্রতিভাবান বলার বিরোধী আমি। কারণ অনেকেই শৈশবের প্রতিশ্রুতি বড় হয়ে রাখতে পারেননি। ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দিতে পারি।

অতিরিক্ত প্রশংসা কী রকম ক্ষতি করতে পারে অতনু দে-র সাম্প্রতিক প্রদর্শনী (কলকাতা তথ্য-কেন্দ্র ৪ঠা—১০ জুলাই) তার একটা উদাহরণ। সতেরো বছর বয়সে যারা শিল্পব্রতী হতে চায় তারা শিল্প বিদ্যালয়ে ঢুকে পড়ে। সুতরাং অতনু দে-র ছবি আর্ট কলেজের এইসব ছাত্রের সঙ্গেই তুলনীয়। তুলনা করতে গেলে দেখা যাবে তার কাজ ভীষণ কাঁচা। শিশু বা কিশোর শিল্পীর অশিক্ষিত পটুত্বের মধ্যে যে ধরনের মজা থাকে, তা আর তার কাজের মধ্যে থাকার কথা নয়। নেইও। পরিণত মানুষ স্বশিক্ষিত হলেও যে মুনশী-য়ানা আয়ত্ত করে, তাও তার ছবিতে নেই। বড়দের মতো কাজ করতে গিয়ে সে তার দুর্বলতা সব প্রকাশ করে দিয়েছে।

বাঁচার একমাত্র উপায় হলো কোনো আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়া কিংবা কোনো বিখ্যাত শিল্পীর কাছে নাড়া বেঁধে কাজ শেখা।

সন্দীপ সরকার

নৃত্য

সবুজ পাহাড়ের দেশ

আগে ছিল লুসাই পাহাড়। এখন মিজোরাম। ১৯৭২ সালে মিজোরাম আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। সবুজ পাহাড়ের দেশ মিজোরাম থেকে ৩২ জনের একটি সাংস্কৃতিক দল সরকারী সফরে সম্প্রতি পশ্চিম বাংলায় এসেছে। সেই দলটির মাধ্যমে মর্মস্পর্শী একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখা গেল গত ১৯ জুলাই। ভারতীয় জাদুঘরের আশুতোষ শতবার্ষিকী হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে পরিবেশিত হল 'মিজো সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা।' নতুন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছিলেন সভাপতি।

সোয়া এক ঘণ্টার এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষণ ছিল মিজোরামের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নৃত্যানুষ্ঠান। বিখ্যাত 'চেরা' নৃত্য দেখা গেল। দারুণ দক্ষ পদক্ষেপ ও সতর্ক মনের এই নাচে বিরাট বাঁশ দু পাশে ধরে বাজাতে থাকে

একদল, অন্যদল মাঝখানে পা ফেলে-ফেলে নেচে যাচ্ছে। একটু অসতর্ক হলেই দুর্ঘটনা ঘটতে বাধা। ছন্দোপতন হলেও তাই। 'খুয়াল্লাম' নৃত্যও গোষ্ঠী-বদ্ধভাবে পরিবেশিত। মিজো সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের অন্যতম অঙ্গ নানান অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেওয়া—এমনই একটি হল চালাও নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো। এই নিমন্ত্রণে বন্ধুবান্ধব ও কাছাকাছি গ্রামবাসীরা যোগ দেয়। 'খুয়াল্লাম' সেই অ ভ্যা গ ত দে র নৃত্যানুষ্ঠান। এ ছাড়াও দেখা গেল, 'ছেইলাম' নামের হুল্লোড়-নৃত্য। সন্ধ্যার ঠাণ্ডা বাতাসে 'খুঁড়িয়াল্লু' নেশার অনুকম্প-জড়ানো এই নৃত্যে তাৎক্ষণিক কবির লড়াই জাতীয় গানও বাঁধা হয়।

গানের অনুষ্ঠানে জোর পড়েছিল চটুল 'পপ' গানের ওপর। লোক-সঙ্গীতের অনুষ্ঠানের পাল্লা ভারী হলে বেশী ভাল হত।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

নাটক

পদাতিক

যে-সমস্ত সংস্থা জন্মলগ্ন থেকেই পরম নিষ্ঠায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে "অন্য থিয়েটার" গড়বার প্রয়াসী, রূপদক্ষ তাঁদের অন্যতম। প্রচার প্রায় নেই বললেই চলে। অনুষ্ঠানও অনিয়মিত এবং যে-কোনও আদর্শনিষ্ঠ সংস্থার যে কণ্টক-কীর্ণ পথচলা, রূপদক্ষ তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু কণ্টকাবলের জন্য রূপদক্ষ কোন সময় হাসির ভবকে মোড় রাজনীতি, গানের ভণিতায় সংগ্রামের কথা, অথবা 'জনিপপ' মার্কা কোন কাহিনীর চুষিকাঠিতে "সুবর্ণসন্ধানী" হননি। তাঁরা সংস্থাকে শিরোধার্য করেছেন এবং অনেক পরিশ্রমে তাঁরা কাজ করে চলেন কোনও ব্যক্তিগত সুযোগের আশা না রেখে, অথবা সুযোগের জন্য কোনও শিহনের দরজা দিয়ে না ঢুকে।

সম্প্রতি মুক্ত অঙ্গনে রূপদক্ষ প্রযোজিত 'পদাতিক' দেখে আরও একবার আধুনিক বাংলা নাটকের অভাব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেল। এইসব সংস্থা যাঁরা সব কিছু অতল পূরণ করতে পারেন নিজেদের নিষ্ঠায়, তাঁরাও নাটকীয় চোরাবালিতে আটকা পড়েন। বাংলা নাটকে সর্বাঙ্গীণ পরীক্ষা হয় শুধু নাটক ছাড়া। কিছু নাট্যকার একইভাবে বহুব্যবহৃত ফর্মুলায় নাটক লিখে যান। সব কিছুই বাজার-চলতি গোয়েন্দা-কাহিনীর ছকে বাঁধা। শোষণের এবং শোষিতের চেহারা বারবার একইরকম। আরও মজা, উৎপীড়ন, হত্যা, লালসা—সর্বক্ষেত্রেই মোটামুটি একই কাহিনীসূত্রে গ্রথিত। এই কাহিনীসূত্র, চরিত্র কতবার আমরা দেখলাম। নবান্ন থেকে রাহু-মুক্ত পর্যন্ত, আ⸺ পেরিয়ে নীল-দর্পণেও দেখেছি। অথচ ঐসব নাটকে নাট্যকারেরা ছি⸺ মমতানিপুণ, তাঁ তাঁদের ছিল ⸺শন', যার ঔজ্জ্বল্য আজও অম্লান। পক্ষান্তরে পদাতিক নাট্যকার মনোরঞ্জন বিশ্বাসের লেখনীতে পূর্বসূরীর কাহিনীসূ শুধুই 'ফ্যাশন'—তাই ক্লান্তিকর একঘেয়ে।

অভিনয়াংশে অনেকেই দ অনুযায়ী অভিনয় করেছেন। গতানু-গতিক কাহিনীর আবাল্যপোষি ধারণার চরিত্রায়ণ। এরই মধ্যে তাঁ চৌধুরী মিখিল চক্রবর্তী কির লাহিড়ী আলাদাভাবে দর্শকের মন ছাপ রাখেন। শাশ্বতী চৌধুরী আপ্রা চেষ্টা করেছেন এবং অভিপ্রা ট্রাজেডি তাঁর অভিনয়ে মূর্ত। কিন তাঁর ভূমিকা 'রাহুমুক্তের পদ্ম' এব আরও অনেক স্মরণীয় চরিত্রে কাঠামোয় রচিত হয়েই বিপদে ফেলেছে। শিল্পী পূর্ণ ক্ষমতা সুযোগ না পাবার জন্য নাট্যকার দায়ী। চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের প্র পরিকল্পনা খুব সাধারণ ইঙ্গিতে পরিবেশকে ভরাট করেছে। বিশেষ শোষক প্রভুর দুর্গে নায়কদের পশ্চাৎ-পট একটি নতুন দ্যোতনা। রাজেন্দ্র ভট্টাচার্যের আবহ বহুলাংশে সার্থক। একটি গান আছে, "আমি মাটির কাছে গান শিখেছি"—মোটেই মাটির কাছে শেখা গান নয়, ট্রানজিস্টারে শেখা। মাটির কাছে গান শিখলে যেমন মুখার্জীর অনুকরণ হয় না। তাঁ চৌধুরী এই মামুলী নাটককে অনে

...রচনার নির্দেশনা-নৈপুণ্যে আধুনিক ...রে তুলেছেন। মঞ্চসজ্জা ভাল হলেও ...ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত ছিল না। ...মিদারের বাড়িতে একবার পূর্ব

...শ্যের ব্যবহৃত চাষীগৃহের মুড়ির ...টি পড়ে থাকতে দেখা যায় এবং ...চাষীর দাওয়ায় আগের দৃশ্যের ...মিদার ব্যবহৃত মদের গ্লাস পড়েই ...থাকে।

...দেবাশিস দাশগুপ্ত

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

দ্য ডগ্-ডে আফটারনুন

ছবিটি আসার অনেক আগে নাম এসে পৌঁছেছিল কলকাতায়। দারুণ ...ছবি, চমকে দেবার মতো ছবি, মনে ...রাখার মতো ছবি—এমনি ছোটো ছোটো ...উড়ন্ত কথা ক্রমাগত বেশ কয়েক মাস ...ধরে উসকে দিয়েছে আমাদের কৌতূহল, ...আর কোনো এক বন্ধুর ঘরে ছবিটির ...পোস্টার—যা আমি বেশ কিছুদিন হল ...দেখছি, আমার কাছে অন্তত এইটুকু ...পৌঁছে দিয়েছে যে, ছবিটির পেছনে ...আছে সচেতন সযত্ন শিল্পিতা।

পরিচালক যেহেতু সিডনি লুমেট, ...কলকাতায় 'দ্য ডগ ডে আফটারনুন' ...ছবিটি দেখতে পাব, এ কথাটায় ...উত্তেজিত না হয়ে আমরা অনেকেই পারি ...নি। এবং সবচেয়ে যে কথাটা ভাবতে ...ভাল লাগছে তা হল, লুমেট আমাদের ...প্রত্যাশা এবং উদ্দীপনার মর্যাদা ...রেখেছেন। 'দ্য ডগ ডে আফটারনুন' ...লুমেট-এর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির একটি—...অনেকে মনে করেন এই ছবিতেই তাঁর ...প্রতিভার চূড়ান্ত বিন্দুটি আবিষ্কৃত ...হল। লুমেট-এর 'এ লং ডেজ জার্নি ...ইনটু নাইট' একটি প্রচণ্ড ছবি সন্দেহ ...নেই, কিন্তু স্বয়ং ইউজিন ও'নীল সে ...ছবির কাহিনীকার, অভিনয়ে আছেন ...রালফ রিচার্ডসন, ক্যাথারিন হেপবার্ন, ...জ্যাসন রোবার্ডস—অর্থাৎ এমন সব ...মালমশলা নিয়ে সেখানে লুমেট কাজ ...করেছেন যে, নেহাত বসিয়ে দেবার মতো ...ছবি করাটাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। ...১৯৭৪-এ তৈরি 'মার্ডার অন দি ...ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস' লুমেট-এর ...সাম্প্রতিককালের সার্থক ছবিগুলির ...একটি। সেই যে ১৯৫৭ সালে ...'টুয়েলভ অ্যাংরি মেন'-এর ...চমকপ্রদ [illegible] নিশান উঁচিয়ে ...লুমেট পরিচালক হিসেবে বেশ দুঃ-...সাহসের সম্মান [illegible], সেই ...থেকে গত বিশ বছর ধরে তাঁর উপার্জিত ...[illegible] পরিচালকের ইমেজটি নষ্ট করার মতো ছবি তিনি বোধ হয় একটিও করেননি—এতোটা কিন্তু অনেকটাই। মনে করুন, একের পর এক তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি, এ ভিউ ফ্রম দ্য ব্রিজ, দ্য পনব্রোকার, দ্য সারপিকো, দ্য ডেডলি অ্যাফেয়ার, দ্য সিগাল। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৭৭-এর মধ্যে তিনি পরিচালনা করেছেন কুড়িটিরও বেশি ছবি এবং পরিচালক হিসেবে পেয়েছেন সন্দেহাতীত স্বীকৃতি।

'দ্য ডগ ডে আফটারনুন' একটু ভিন্ন ধরনের লুমেট এই অর্থে যে, ছবিটি কমার্শিয়াল ছবির ছকে বাঁধা চাল দিয়ে একপাও এগুতে চায়নি। প্রথমত, ছবিটির কাহিনীকারের নাম বিজ্ঞাপনের কাজ করে না। পি এফ ক্লুজ এবং টমাস মুর নামের দুজন সাংবাদিকের লেখা একটি ব্যাংক ডাকাতির রিপোর্ট থেকে ছবির মূল ব্যাপারটা তৈরি করা হয়েছে। চিত্রনাট্য লিখেছেন ফ্র্যাংক পিয়ারসন। ছবির ঘটনাটা ঘটে ছিল আমেরিকার ব্রুকলিন শহরে, ১৯৭২ সালের ২২ অগাস্ট। সত্যি সত্যিই তিনটি ছেলে (একটি পরে ভয় পেয়ে পালায়) ব্রুকলিন-এর চেজ ম্যানহাটান ব্যাংক-এর একটি শাখা অফিসে লুট করার জন্যে ঢুকলে পুলিস চারধার থেকে ব্যাংকটি ঘিরে ফেলে। এবং শেষ পর্যন্ত পুলিসের সঙ্গে এই দুটি অ্যামেচার ডাকাতের এই রফা হয় যে, পুলিস যদি দুটি ছেলেকে বিদেশে পালিয়ে যাবার জন্যে একটি জেট প্লেন-এর ব্যবস্থা করে দেয় তা হলে ব্যাংকের বন্দী কর্মচারীদের তারা মুক্তি দেবে। সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা ঘটে ছিল যখন মারডি গ্রাস-এ (যেখানকার ব্যাংকে ঘটনাটা ঘটছিল) এই অভিনব ব্যাংক ডাকাতিটি টিভিতে সরাসরি দেখানো হয়।

লুমেট এই একান্ত শহুরে কাহিনী নিয়ে এমন একটি সফিসটিকেটেড কমেডি বানিয়েছেন যেখানে হাসির সঙ্গে

অ্যাল প্যাসিনো

বিদ্রুপের, ঠাণ্ডা কাহিনীবিন্যাসের সঙ্গে ইচ্ছাকৃত মেলোড্রামার, কমেডির সঙ্গে ফারস-এর, এবং ফারস-এর সঙ্গে মোটা দাগের ল্যামপুন-এর ভারসাম্য কোথাও এতটুকু বিনষ্ট হয়নি, এবং এই টাইট-রোপ-ওয়াকিং-এ লুমেট তাঁর আত্ম-বিশ্বাস মুহূর্তের জন্যেও হারাননি। ফলে 'দ্য ডগ ডে আফটারনুন' এমন একটি সার্থক ব্ল্যাক কমেডি যার সবচেয়ে বড় আকর্ষণের দিকটা হল শহুরে মেজাজ, বিপরীতের সমন্বয়, এবং সচেতন শিল্পিতা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে,

ঘটনাটা যেহেতু অগাস্ট মাসে ঘটেছে, হয়তো সেই কারণেই ছবিটির নাম 'দ্য ডগ ডে', কেননা ঐ সময়ের মধ্যে তির্যক-ভাবে দ্য ডগ-স্টার বা ক্যানিস মেজর-এর সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র সিরিয়াস-এর অনুবন্ধ নিশ্চিতভাবে ধরা পড়ে, এবং আমরা এই সিরিও-কমিক সিচুয়েশনটির জন্যে মনে মনে সিরিয়াস-এর প্রভাবকে দায়ী করি হয়তো। নাম-করণের মধ্যেও রয়েছে চূড়ান্ত শহুরে সফিসটিকেশন।

মূল ভূমিকায় অ্যাল প্যাসিনোর, অভিনয় কোনো অভিনয় নয়—তিনি শুধু নিজেকে লোপ করে দেন এবং পুরোপুরিভাবে সিনেমার চরিত্রটি হয়ে ওঠেন। ফলে, দ্য ডগ ডে আফটারনুন-এর সানি সিনেম্যাটিক চরিত্রাভিনয়ের একটি চরম উদাহরণ হয়ে রইল। সানির মধ্যে বিপরীতের বা অ্যামবিগুইটির সমন্বয় এই কমেডির মূল আকর্ষণের অনেকটাই। সে বিবাহিত এবং সন্তানের পিতা এবং স্ত্রীকে হয়তো ভালোওবাসে। কিন্তু সে তার হোমোসেকশুয়ালিটি সম্বন্ধে প্রায় অস্কারওয়াইলড-এর মতো কথা বলে—আই লাভড দিস ম্যান (লিয়ন) অ্যাজ নো ওম্যান এভার ডিড। এবং সে লিয়নকে বিয়েও করে। আর তারই সেকসচেঞ্জ অপারেশন-এর টাকার প্রয়োজনে সানি শেষ পর্যন্ত ব্যাংক ডাকাতির পথ বেছে নেয়।

দ্য ডগ ডে আফটারনুন-এর সফিসটিকেশন-এর অনেকটাই এসেছে ক্রেমপার-এর ফটোগ্রাফি এবং অ্যালেন-এর নিখুঁত এডিটিং থেকে। আর সেই সঙ্গে আছে এমনি সংলাপ : "মাই ইয়ারস আরনট পারফেক্ট ক্যান", কিংবা "আই ডোনট স্মোক বিকজ দ্য বডি ইজ দ্য টেম্পল অব দ্য লর্ড!"

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সংধ্যারাগ

ছবির ভাষা আয়ত্তে থাকলে সংলাপ যে ভাষাতেই হোক না কেন, কাহিনী উপলব্ধিতে এবং সেটি উপভোগ করায় যে কোন বিঘ্ন ঘটে না—অসমীয়া ছবি 'সন্ধ্যারাগ' তারই একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

ছবির পরিচালক ভবেন্দ্রনাথ সাইকিয়া পদার্থবিজ্ঞানে লন্ডন ইউনিভার্সিটির ডক্টরেট এবং লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজির ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হলেও আসলে তিনি আসামের অগ্রণী সাহিত্যিকদের অন্যতম। ১৯৭৬-এ 'প্রহরী' নামক গল্পগ্রন্থের জন্য তিনি সাহিত্য আকাদমীর পুরস্কার লাভ করেন।

গ্রামের নিঃসম্বল এবং অনাহারক্লিষ্ট নিতান্তই বালিকা চারু (আজানি দাস) ওদের পরিবারের হিতাকাঙ্ক্ষী মদনের (বিষ্ণু বড়ুয়া) সহায়তায় শহরের ধনী নন্দন দাসের (ঈশান দাসের) গৃহে পরিচারিকার কাজ নিয়ে আসে। নন্দন দাসের স্ত্রী অমলা (মায়া বড়ুয়া) ঘরের কাজকর্ম শিখিয়ে সংসারের ভার এইটুকু মেয়ের ওপরে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন। মদন-অমলার কন্যা কান্তা (সঙ্গীতা সাইকিয়া) চারুরই সমবয়সী। চারু পরিচারিকা হলেও ও সকলের মন জয় করে নেয়। কান্তার কাছে চারু সখীর মর্যাদাই পায়। ইতিমধ্যে চারুর ছোট বোন তারুও (তৃপ্তিকমল হাজারিকা) শহরে আসে আর এক বাড়িতে পরিচারিকার কাজ নিয়ে। বাড়িতে দীর্ঘদিন থাকার ফলে বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে সঙ্গে চারু ও তারু দুই বোনেরই রুচি মেজাজ এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে যায়। গ্রামের দুঃসহ দারিদ্র্যের ছাপ ওদের মন থেকে মুছে যায়। পরিণত

মৃদু দেবী

বয়সে কান্তার (কাশ্মীরী সাইকা) বিয়ের পরই সমস্যা দেখা দিল। যুবতী চারুর (মৃদু দেবী) ও তারুর (রাজু বরদোলোই) পক্ষে ওই বয়সে শহরে থাকা সম্ভব হল না। গ্রামে ফিরে আবার নতুন করে দারিদ্র্যের মুখোমুখী হতে হলো তাদের।

চারু ও তারু বাল্য থেকে যৌবনে পৌঁছানো পর্যন্ত শহরে বসবাস করলেও সহানুভূতিশীল মনিবদের আনুকূল্যে সেলাই আদি বিভিন্ন হাতের কাজ রপ্ত করেছিল। মদন ও মতির (অরুণ শর্মা) মতো ওদের প্রতি সহৃদয় ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। ওদের সাহায্যে চারু ও তারু, আর কিছু না হোক, দু বেলা নিজেদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা কি করতে পারতো না? দৈর্ঘ্য অনেকটা সংক্ষিপ্ত করারও অবকাশ ছিল কিছু কিছু অংশের পুনরাবৃত্তি রোধ করে। এমনি আরও কিছু প্রশ্ন মনে জাগলেও বাস্তব জীবনের একটা স্পষ্ট প্রতিরূপ পরিচালক দর্শকসমক্ষে উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছেন।

ভবেন্দ্রনাথ সাইকিয়ার এইটাই প্রথম চিত্রপরিচালনা। কিন্তু কোন রকম আতিশয্য বা অাতনাটকীয়তা পরিহার করে চলেছেন। সেই সঙ্গে কোন রকম চটকদার কৃত্রিম প্রসাদ উপাদানের প্রয়োগে দর্শকমনকে সহজে আকৃষ্ট করার সহজ পথ থেকেও পরিচালক নিজেকে প্রলুব্ধ হতে দেননি। ছবির বিন্যাসে দৃশ্যের পর দৃশ্য গেঁথে গেঁথে ঘটনা সাজিয়ে যাওয়ায় পরিচালক কবি মনের পরিচয় দিয়েছেন যা দর্শককে নিবিষ্টমনা হতে বাধ্য করে। ইন্দুকল্প হাজারিকার আলোকচিত্রের কাজ এ বিষয়ে পরিচালককে সহায়তা দান করেছে। সুরযোজনায় পরিকল্পনাও পরিচালকের এবং ঘটনার পরিবেশানুগ আবহ-সংগীত রচনায় তাঁকে সহায়তা করেছেন রমেন চৌধুরী, ইন্দ্রেশ্বর শর্মা এবং প্রভাত শর্মা।

বড় ও ছোট নিয়ে চরিত্র অনেক এবং দু'একজন ছাড়া বাকিদের এই প্রথম অভিনয়। কিন্তু কোন একটি চরিত্রচিত্রণে অ্যামেচারপনার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ওঁদের মধ্যে বিশেষ ছাপ রাখেন মৃদু দেবী, রাজু বরদোলোই চারু ও তারুর মায়ের চরিত্রে আরতি বড়ুয়া, মায়া বড়ুয়া, কাশ্মীরী সাইকা ঈশান বড়ুয়া, বিষ্ণু বড়ুয়া ও অরুণ বড়ুয়া।

শমশের বসু

আপনার টিয়াঁরা কোনটি?

আপনি কি ভাবে আপনার শ্যাম্পু পছন্দ করেন? বোতলের আকৃতি দেখে? রংদেখে? অথবা গন্ধ শুঁকে ভালো লাগলে? শ্যাম্পু কেনার সময় মনে রাখবেন আপনার চুলের প্রয়োজনেই কিনছেন। সেইকারণে, বিভিন্ন প্রকারের চুলের জন্তে, টিয়ারা পাঁচটি বিভিন্ন প্রকারের শ্যাম্পু তৈরী করেছে। আপনার কোনটি প্রয়োজন, খুজে বেছে নিন।

টিয়ারা এগ শ্যাম্পু:
নির্জীব ও রুক্ষ চুলের জন্তে। তাজা ডিমের সংমিশ্রণে তৈরী, চুলের পক্ষে পুষ্টিকর এই শ্যাম্পু অ্যালবুমেন, মিনো এসিড, ও ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি'তে ভরপুর।

টিয়ারা শিকাকাই শ্যাম্পু:
সব রকম চুলের কোমল ও চিরাচরিত যত্নের জন্তে। প্রকৃতির স্বাভাবিক পুষ্টিকর উপাদান, আপনার চুলের জন্তে কত সহজে পাচ্ছেন।

টিয়ারা স্থপার ফোম:
যাঁরা পয়সা বাঁচাতে চান, তাঁদের জন্তে। মাত্র একটুখানিতে অপর্য্যাপ্ত ফেনা হয়। —চুলকে নিখুঁতভাবে পরিষ্কার ও মোলায়েম করে।

টিয়ারা ল্যানোলীন শ্যাম্পু:
কোঁকড়ানো, অবিন্যস্ত চুলের পক্ষে অপরিহার্য্য। এই শ্যাম্পু ঐরকমের চুলকেও বশে এনে সুন্দর ও সুবিন্যস্ত করে। চুল আরও নরম হয় এবং সহজেই সামলানো যায়।

টিয়ারা লেমন শ্যাম্পু:
টাটকা লেবু দিয়ে তৈরী—চুলের বাড়তি তেলকে বিনষ্ট করার প্রাকৃতিক উপায়। এর ফলে, চুলের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য উপচে পড়ে।

টিয়াঁরা

টিয়ারা মানে একটি সুন্দর মুকুট। আমাদের শ্যাম্পুর নাম টিয়ারা. কারণ এটি আপনার চুলে সৌন্দর্য্যের মুকুট পরিয়ে দেয়।

ভারতে প্রস্তুতকারী: জে.কে. হেলেন কার্টিস লিমিটেড, বোম্বাই ৪০০ ০৩৮

Interpub/JK/1/76 BN

অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন:
প্যারী এণ্ড কোং লিমিটেড, মাদ্রাজ, দি এরাউইন এণ্ড কোম্পানী (প্রাইভেট), লিমিটেড, কলিকাতা ও মার্কেটিং ডিভিশন, জে. কে. হেলেন কার্টিস লিমিটেড, বোম্বাই ও দিল্লী।

দেশ

আমার পরিবারের জন্যে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবর্ধক পানীয়ই চাই!

স্বামীর বড্ড তাড়া, খাবার সময় নেই···
কমপ্লান স্থল নিয়েছে আহার।
এক্সিকিউটিভ, পর্যটক, অফিস-যাত্রী
— তাড়াহুড়ো করা সব স্বামীদের
পক্ষেই আদর্শ!

রবি খাওয়া নিয়ে ঝামেলা করে···
ওর পুষ্টির যতই অভাব হোক না কেন,
সুস্থ সবল হবার জন্যে অন্য কোনো
স্বাস্থ্যবর্ধক পানীয় ওকে কমপ্লানের ২৩টি
একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণের
'সম্পূর্ণ' পুষ্টি দিতে পারে না।

মা'র অসুখ করেছিল —
খেতে চান না।
কমপ্লান খেলে উনি চটপট সেরে
উঠবেন। 'সম্পূর্ণ' পুষ্টির জন্যে এটি
ডাক্তাররাই বেশী খেতে বলেন।

আমি এত ক্লান্ত
যে খেতেই পারি না।
রোজ এক কাপ কমপ্লান আমাকে
সুস্থ আর প্রাণশক্তিতে ভরপুর রাখে,
অজ্ঞাত পুষ্টিহীনতা থেকে রক্ষা করে।

একমাত্র কমপ্লান-ই হল স্বাস্থ্য ও শক্তির জন্যে ২৩টি একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণে ভরপুর সম্পূর্ণ আহার!

একমাত্র কমপ্লান-এই আছে বিজ্ঞানসম্মতভাবে
নির্ধারিত অনুপাতে প্রোটিন, ভিটামিন,
খনিজ পদার্থ, কার্বোহাইড্রেট ও অন্যান্য একান্ত
প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান যা প্রতিদিন
আপনার শরীরের জন্যে দরকার।

দুধ মেশানোর
দরকার নেই।

কমপ্লান®
সারা দুনিয়ায় নির্ভরযোগ্য

CAGGC-27-134 BEN

চিঠিপত্র

প্রিয়নাথ সেন

৬ই আগস্টের "দেশ" পত্রিকায় শ্রীপূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় "ভারতীর ক্যাশবই ও গ্রাহক তালিকা" প্রবন্ধে লিখেছেন ভারতীর সূচনাকালে বেতন ভোগী কর্মচারী ছিলেন তিনজন এবং তাদের মধ্যে "কালিবর সেনের বেতন ছিল মাসিক কুড়ি টাকা.. ১৮৮০ সালে সম্ভবত কালিবর সেনের স্থলে প্রিয়নাথ সেন (রবীন্দ্রনাথের বন্ধু) নিযুক্ত হন। কেননা ১৮৮০-এর ৭ অক্টোবরের হিসাবে লেখা হয়েছে প্রিয়নাথ সেনকে আশ্বিন মাসের কুড়ি টাকা বেতন শোধ করা হল। কার্তিক মাসের বেতনটা অবশ্য তাঁকে সরকারী তহবিল (অর্থাৎ ঠাকুর পরিবারের জমিদারী তহবিল) থেকে দিতে হয়েছে...।"

এ প্রিয়নাথ সেন আর যেই হ'ননা কেন তিনি সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের বন্ধু নামে পরিচিত কবি প্রিয়নাথ সেন নন।

বিশ্ব-ভারতী প্রকাশিত চিঠিপত্র অষ্টম খণ্ড থেকে জানা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের সাহিত্য-সঙ্গীদের মধ্যে আত্মীয়-গোষ্ঠীর বাহিরে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় নাম প্রিয়নাথ সেনের। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কখন তাঁর পরিচয় হয়েছিল তা নিশ্চিত করে জানা যায় না। সম্ভবত ১৮৮০ সালে প্রথমবার বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হয়। প্রিয়নাথ সেনে' প্রতিবেশী বিহারী লাল চক্রবর্তী, বিহারীলাল ঠাকুর বাড়ীতেও বিশেষ পরিচিত ও সমাদৃত ছিলেন, পরিচয়ের সূত্র সম্ভবত তিনিই। ঠিক রূপোর চামচ মুখে না নিয়ে জন্মালেও প্রিয়নাথ সেন সে যুগের বিশিষ্ট বনেদী ও ধনী বংশের সন্তান এবং আজীবন আইন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আনুমানিক ১৮৮০ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপিত হবার পরের বছরেই মাসিক মাত্র কুড়ি টাকা মাইনেতে তাঁদের বাড়িতে চাকরী নিয়েছিলেন এমন কল্পনাও অবাস্তব ও উদ্ভট বলে মনে হয়। শুধু তাই-ই নয়, মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে নিযুক্ত ভারতীর কর্মচারীর কাছে ১৮৮১ সালে লেখার দরবার করে রবীন্দ্রনাথ নিজে চিঠি লিখছেন, "প্রিয়বাবু, আগামী ভারতীতে আপনার প্রস্তাব ফুটিয়ে পাঠাইলেই হইবে—অন্যটি আমার ভাল মনে পড়িতেছে না...আপনি এখানে যেদিন ইচ্ছা দুপুরবেলা আসিলেই হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-স্মৃতিতে প্রিয়বাবু অধ্যায়ে এক জায়গায় লিখেছেন, "তাঁহার সঙ্গে যাহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার বড় রাস্তায় ও গলিতে তাঁর সর্বদা আনাগোনা, তাঁহার কাছে বসিলে ভাব-রাজ্যের [illegible]

এই সাহিত্যের সাত-সমুদ্রের নাবিক মাসিক মাত্র কুড়ি টাকায় ভারতী-তে চাকরী নিয়েছেন এ কথা অকল্পনীয় ও অসত্য। বহু সাহিত্যিকের লেখায় পড়েছি প্রিয়নাথ সেনের নিজস্ব একটি মহামূল্যবান লাইব্রেরী ছিল এবং এমন দিন যায়নি বা সপ্তাহ যায়নি যে সেই লাইব্রেরীতে তিনি নতুন বইয়ের সংযোজন করেননি। মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে চাকরী করে বিরাট সংসার চালিয়ে প্রিয়বাবু হাজার টাকার বই কিনলেন কি করে, কোথা থেকে? পূর্ণানন্দবাবু না জেনে শুনে সে যুগের এক বিদগ্ধ সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ সম্পর্কে কেন অযৌক্তিক ও অসত্য মন্তব্য করলেন?

শচীন সেন

কলকাতা-৬

ফুটবলের শতবর্ষ : লেখকের জবাব

আপনার পত্রিকার ৪ জুন সংখ্যায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ "কলকাতা ফুটবলের শতবর্ষ" প্রসঙ্গে বিরাটি থেকে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ধর কর্তৃক লিখিত যে বিবৃতিটি 'দেশ'-এর ২৫ জুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, তাতে লেখক আমার উপস্থাপিত তথ্যগুলি খণ্ডন করে অনেক স্বকীয় তথ্যের সন্নিবেশ করেছেন, কিন্তু তাঁর তথ্যের সমর্থনে কোনও প্রমাণ দাখিল করেননি। ইতিহাস বিষয়ক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রমাণবিহীন তথ্য যথেষ্ট নয়, প্রতিক্ষেত্রেই প্রমাণ উদ্ধৃতি অবশ্য দেয়। 'প্রবীণদের ও সাংবাদিকদের মুখে শুনেছি' এমন কথা বলা অবান্তর, যাদের মুখে শোনা তাঁদের নামের উল্লেখ না থাকলে তাঁদের বলার [illegible] স্বীকৃতি পায় না। বিগত ৫০ বছর কলকাতার ক্রীড়াসাংবাদিক ও খেলাধুলো ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রত্যেকের সঙ্গেই আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল, কে কি বলেছেন সঠিকভাবে তা বললে তা খণ্ডন করা সহজ হত।

পত্রলেখককে আমি জানাতে চাই হকির প্রাগৈতিহাসিক তত্ত্ব বা নগেন্দ্রপ্রসাদের বিস্তৃত জীবনী আমার রচনার বিষয়বস্তু নয়, আনুষঙ্গিক উল্লেখ মাত্র, তিনি ওই দুই বিষয়েই অনেক তথ্য দিয়েছেন, কিন্তু তার অধিকাংশই ভ্রান্তিপূর্ণ। হকি যে খৃস্টপূর্বকালে খেলা হয়েছে তার প্রমাণের জন্য আমাদের জার্মানীর "কোপেনহেগেন" সংগ্রহশালায় যাবার প্রয়োজন নেই, এদেশের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ হকি খেলার চিত্রের অজস্র প্রতিলিপি এদেশে ছাপা হয়েছে।

ভারতে প্রথম হকি খেলা ১৮৮৬, এ তথ্য শ্রীধর কোথায় পেলেন জানি না। তাঁর অবগতির জন্য জানাই যে ইংল্যাণ্ডের আদি হকিক্লাব মিডলসেক্সের টেডিংটন-এর (প্রতিষ্ঠা ১৮৭১)। এক পত্রের ভিত্তিতে ভারতীয় হকি ফেডারেশনের দীর্ঘদিনের সভাপতি অশ্বিনীকুমার ভারতে প্রথম হকি খেলার সাল নির্ণয় করেছিলেন ১৮৮৫; আর টেডিংটন দাবি করেছে তাদেরই অনেক সদস্য এক এক জায়গায়(?) —[illegible]

১৮৯০ সালে। ওই দুই তারিখই সম্ভবত হয়ে যায় ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের দাবির প্রমাণে। ১৮৮৪-তে ক্লাবের দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরুর সময় লেখা হয়েছিল যে প্রথম পর্যায়ে (১৮৭২-৬) ক্লাব নিয়মিত রাগবি খেলার সঙ্গে একটি হকি টীমও চালিয়েছিল।

নগেন্দ্রপ্রসাদ প্রসঙ্গে পত্রলেখক বলেছেন যে তিনি ১৯১১ পর্যন্ত ফুটবল খেলেছেন। আমি কিন্তু তাঁর খেলা প্রসঙ্গে পুরোজন সংবাদপত্রে কোনও উল্লেখ খুঁজে পাইনি। ১৮৮৯-এ ট্রেডস কাপের খেলায় এবং ১৮৯০-এ আই এফ এ শীল্ডের খেলায় শোভাবাজার-এর হয়ে যাঁরা খেলেছিলেন সেই নামের তালিকায় নগেন্দ্রপ্রসাদ অনুপস্থিত, দলের রাইট-ইন হিসেবে নাম আছে যি সর্বাধিকারী যাকে নগেন্দ্রানুজ সুশীলপ্রসাদ ও সুশীলপ্রসাদের পুত্র বেরী সর্বাধিকারী অন্যতম ভাই বিনয়প্রসাদ বলে জানিয়েছেন। ১৮৯৮-এ ভারতে অনুষ্ঠিত প্রথম 'ওপেন' টেনিস টুর্নামেন্টের সিঙ্গলস বিজয়ী বলে ওই বিনয়প্রসাদেরই উল্লেখ আছে।

সকলেই জানে যে মহামেডান স্পোর্টিং-এর দিগ্বিজয়ী দলের (১৯৩৪-১৯৪১) অধিকাংশ খেলোয়াড়ই ছিল বহিরাগত, এমন কি তারও আগে থেকেই ক্লাবের তদানীন্তন মুখ্য পরিচালক খাঁ সাহেব এস এ রসিদ ও মিঃ আজিজ—কেউই নগেন্দ্রপ্রসাদ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। তবু ক্লাবের দিগ্বিজয় সাধনে নগেন্দ্র-শিষ্যদের ভূমিকা শ্রীধর কোথায় পেলেন? তাছাড়া বয়সের দিক থেকেও তিশের দশকের তরুণ খেলোয়াড়দের নগেন্দ্রপ্রসাদের শিষ্য হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

১৮৯২ সালে শোভাবাজার ট্রেডস কাপ জিতেছে বলে শ্রীধর-এর বক্তব্যও সত্য নয়, প্রথম ভারতীয় ট্রেডস কাপ বিজয়ী দল ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশান, তবে শোভাবাজার ওই বছর (১৮৯২) এক বিলেতী ফৌজী দলকে হারিয়ে প্রভূত সাড়া জাগিয়েছিল।

শোভাবাজার ক্লাবের প্রতিষ্ঠা ১৮৮৭ বলে পত্রলেখকের দাবি ধোপে টেঁকে না। ক্লাবের মুখ্য প্রতিষ্ঠাতা রাজবাড়ির কুমার জিতেন্দ্রকৃষ্ণের ব্যক্তিগত ডাইরিতে ১৮৮৫ ক্লাব প্রতিষ্ঠার সাল বলে উল্লিখিত আছে, এমন কবুল আমার কাছে করেছেন ওই পরিবারের প্রখ্যাত ইতিহাস-গবেষক হরিকৃষ্ণ। তাছাড়া আই এফ এ-র বিভিন্ন স্মারকগ্রন্থেও ১৮৮৫ সালের উল্লেখ আছে এই প্রসঙ্গে এবং যে প্রসঙ্গের প্রবন্ধের লেখক পঙ্কজ গুপ্ত ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে সুপরিচিত।

ট্রেডস কাপ প্রতিষ্ঠায় নগেন্দ্রপ্রসাদের কোনো অংশ ছিল, এমন দাবিও ভিত্তিহীন। শ্বেতাঙ্গ বণিকদের সংগঠন ট্রেডস অ্যাসোসিয়েশনই ট্রেডস কাপ প্রবর্তন ও পরিচালনা করেছিল প্রথম চার বছর। ১৮৯২-এ নগেন্দ্রপ্রসাদ আই এফ এ প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীধর এই উক্তিরও কোন প্রমাণ দাখিল করেননি। প্রমাণ রয়েছে তিনি আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত হয়ে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় যোগ দেন। আই এফ এ প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় শুরু হয়ে [illegible]

হয় ১৮৯৪-এ, আই এফ এ-র প্রথম ভারতীয় যুগ্ম-সম্পাদক সোমনাথ গাঙ্গুলির পুত্র সাংবাদিক প্রবর রমেশ গাঙ্গুলির কাছে তাই শুনেছি। এবং আই এফ এ তখন পূর্ণসংগঠিত নয় বলেই ১৮৯৩-এর আই এফ এ শীল্ড দুভাগে অনুষ্ঠিত হয়, এলাহাবাদে ও কলকাতায়।

সর্বশেষ যা বলতে চাই তা হল: মায়ের সঙ্গে পূর্বদিনের অপরাহ্নে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে গঙ্গাস্নানে যেতে পথে গাড়ি থামিয়ে এবং গাড়ি থেকে নগেন্দ্রনাথ সাহেবদের বল খেলা দেখতে দেখতে নিজে বলে একটা লাথি মেরেছিলেন, এমন কাহিনী ঘটনার ৬৯ বছর বাদে ১৯৪৪-এ স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সেদিনের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাটি অস্বাভাবিক নয়, একেবারে অসম্ভব। অভিজাত সর্বাধিকারী পরিবারের কুলবধূ সাহেবদের খেলার মাঠের ধারে গাড়ি থামিয়ে বসে থাকবেন, তাঁর ৯।১০ বছর বয়সী ছেলের খেলা দেখার শখ মেটাতে তা কখনই হতে পারতো না সে যুগে। যিনিই ওই কথা বলে থাকুন, তিনি নিছক গল্প ফেঁদেছেন।

রাখাল ভট্টাচার্য

অশোক ব্যানার্জির বিলাপ

অশোকলাল ব্যানার্জিকে ধীরস্থির স্টপার ব্যাক হিসেবেই বরাবর দেখেছি। খেলার মাঠে ভুল বা মাথা গরম সে কদাচিৎ করেছে। 'দেশ' পত্রিকার ১৩ জুলাই সংখ্যায় মাত্র একটি পৃষ্ঠায় যখন সে অন্তত তিনটি ভুল কথা বলে ফেলে, তখন এ কথা মনে না হয়ে পারে না যে, সেই বিখ্যাত মাথাটি আর তেমন ঠান্ডা নেই।

অশোক ব্যানার্জির দীর্ঘ এবং করুণ বিলাপ থেকে এই তিনটি প্রশ্ন বেছে তোলা যায়:

(১) ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাখিল করা সত্ত্বেও, মোকাবো খেলতে না যাবার জন্য অশোককে শাস্তি দেওয়া হলো কেন?

(২) ১৯৭৫-'৭৬-এ রোভার্স কাপ খেলার সময় কলকাতায় খেলোয়াড়দের অনুপস্থিতিতেই দু'বার লীগ জয়ের বিজয়োৎসব হয়েছিল কেন? কেনইবা রোভার্সজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলোয়াড়দের স্বাগত জানাতে এয়ারপোর্টে কোনো কর্মকর্তা হাজির ছিলেন না?

(৩) পর পর পাঁচবার লীগ পেলে সব খেলোয়াড়কে বেনিফিট দেওয়া হবে—এমন কথা দিয়েও রাখা হল না কেন?

উপরোক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর এইভাবে দেওয়া যায়:

(১) অশোকের আঘাতের ব্যাপারে প্রশ্ন না তুলে, আমরা শুধু অশোককে টীমের সঙ্গে যেতে বলেছিলাম। যাতে মোকাবোর দর্শকেরা দেখেন এবং জেনেন, অশোক ব্যানার্জি এসেছিল, কিন্তু আহত থাকায় খেলতে পারেনি। কিন্তু অশোক গেলই না। প্যারা খালাও তো মোকাবোয় খেলেনি। শুধু ও [illegible]

ক্লাবের কৃতজ্ঞতাও জানানো হয়নি।

(২) মোহনবাগান কাল খেলা প্রথম সময়েই হওয়ার প্রতি বছরের উৎসব হয়েছিল কলকাতায়, এটা অসত্য। কবে, কোথায় এবং কীভাবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে এই উৎসব হয়েছিল, অশোক ব্যানার্জি জানাবেন কি?

মো হা ন বা গা ন ক্লাব কর্তৃপক্ষের অভ্যর্থনা জানাতে এয়ারপোর্টে কোনো কর্মকর্তা আসেননি? দলের সঙ্গে আমরাও ফিরেছিলাম। স্পষ্ট মনে আছে, ফুটবল সম্পাদক শ্রীঅমল ভট্টাচার্য এয়ারপোর্টে হাজির ছিলেন। অশোক কি ক্লাবের ফুটবল সম্পাদককে উল্লেখ-যোগ্য কর্মকর্তা মনে করছেন না?

(৩) টেলিভিশন সেট দেব—এমন প্রতিশ্রুতি কি ক্লাবের পক্ষ থেকে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা ফুটবল সম্পাদক দিয়েছিলেন? ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি কিছু বলে থাকেন, তার দায়িত্ব নিশ্চয় ক্লাবের নয়।

যাক, অশোক জানিয়েছেন, ইস্ট বেঙ্গলের দেওয়া শেষ চিঠিটিই ওর কাছে ক্লাবের 'শেষ দান' হিসেবে 'চির-জীবনের স্মৃতি' হয়ে থাকবে। আমাদের কাছে কিন্তু অশোকের শেষ দান হিসেবে এই ক্লাবের প্রতি কটূক্তিগুলিই জেগে থাকবে না, আমাদের কাছে চির-জীবনের স্মৃতি হয়ে থাকবে ধীরস্থির স্টপার অশোকলাল ব্যানার্জির পরিচ্ছন্ন ফুটবল।

পল্টু দাস
জীবন চক্রবর্তী
কলকাতা

হুমায়ুন কবীর

২০ জুলাই-এর দেশ-এ আবু সয়ীদ আইয়ুবের চিঠিতে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হুমায়ুন কবীর-এর একটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। বইটির নাম Poetry Monads and Society (Art Monad and Society নয়)। প্রকাশক : কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়। প্রকাশ বর্ষ : ১৯৪১। স্যর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে উৎসর্গ করা। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে 'স্যর . ... স্ট্যানলী বক্তৃতামালা : ১৯৪১'-এর বিষয় বস্তু এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।

মিহিরকুমার সেন
বর্ধমান-১৪

বাংলা থিয়েটার

'দেশ' পত্রিকায় আমি ইদানীং-কালের কিছু ভালো নাটকের দর্শক হিসেবে শ্রীরুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের "বাংলা থিয়েটার ও সরকারী দায়িত্ব" লেখাটি খুব আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। একটা খাপ-ছাড়া চোখে পড়লো।

থিয়েটার কমিউনের নাম নেই, নেই নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তের নাম। অথচ অভিনীত ভাল পাঁচটি নাটক নিয়ে অথবা নাট্য আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে থিয়েটার কমিউনের নাম আসবে, আসবে নাট্যকার নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তের নাম। এঁদের সর্বশেষ প্রযোজনা "জনতাজননী"-এর নাম আসবেই। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে রচনাটির কোথাও এঁদের নাম নেই কেন?

বিপ্লব সেনগুপ্ত
কলকাতা-৬০

॥ ২ ॥

শ্রীরুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, ৩০ জুলাই ১৯৭৭, আপনার পত্রিকায় উক্ত শিরোনামায় যে নিবন্ধ লিখেছেন তার শুরুতেই তিনি বলেছেন, বাঙালীদের থিয়েটার নিয়ে খুব গর্ব। সত্যি কথাই বলেছেন। এ গর্ব দু'চার দশক ধরে নয়, শতাধিক বর্ষ ধরে গড়ে উঠেছে শহর কলকাতার পাবলিক থিয়েটারকে কেন্দ্র করে।

বেশীর ভাগ গ্রুপ থিয়েটার চটকদার বিদেশী নাটকের রূপান্তর মঞ্চস্থ করে এক শ্রেণীর দর্শক আকর্ষণ করছে বটে কিন্তু সাধারণ বাঙালী থিয়েটার-দর্শকের সঙ্গে তার নাড়ির যোগ স্থাপিত হয়েছে বলে মনে হয় না। পাবলিক থিয়েটার একশো বছর ধরে সেই তার প্রথম নাটক নীল-দর্পণ থেকে শুরু করে এমন অনেক কালজয়ী মহৎ নাটক জাতির মর্ম-সন্ধানী নাট্যকার ও প্রতিভাধর অভিনয় শিল্পী দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করেছে যাঁদের চিরকাল ধরে বাঙালী নাট্যানুরাগীরা স্মরণ করছে এবং করবে। একশো বছর আগেকার নাটক তাই আজও সমাদৃত, পাবলিক থিয়েটার 'বুড়ো' হয়নি।

রুদ্রবাবু থিয়েটারের উপর প্রমোদ কর বসাতে বলেছেন। যখন রাজ্য সরকার চিন্তা করছেন এবং জনসাধারণও চাইছেন যে, আরও থিয়েটার-গৃহ গড়ে উঠুক, তার সম্প্রসারণ ঘটুক, বাঙালী আরও বেশী থিয়েটার-অভিমুখী হোক এবং সেই উদ্দেশ্যে ... কাজকর্মের উদ্যোগ শুরু হয়েছে ... সময় প্রমোদ কর বসিয়ে দর্শককে থিয়েটারের প্রতি বিমুখ করা কি যুক্তিযুক্ত বা যুক্তিযুক্ত কাজ হবে। রুদ্রবাবু এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সিনেমা যখন প্রমোদকর দেয় তখন থিয়েটারই বা দেবে না কেন? এই বক্তব্যের মধ্যে অনেক ফাঁক আছে। সিনেমার টিকিটের হার অল্প তাই তাকে প্রমোদকর সেই অনুপাতে অল্প দিতে হয়, থিয়েটারের টিকিটের হার বেশী তাই তার প্রমোদকরও বেশী হবে যেটা দর্শক-সাধারণের পক্ষে দুর্বিষহ বোধ হতে পারে।

রুদ্রবাবু তাঁর লেখায় এক জায়গায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চেয়েছেন যে, পাবলিক থিয়েটারে যা চলছে তা বন্ধ হলেই ভাল হয়। তিনি আরও বলেছেন যে, শাসকশ্রেণী পাবলিক থিয়েটারের প্রতি পক্ষপাত দেখাচ্ছেন এই কারণে যে, "যত বেশী ঐ রকম পাবলিক নাটক হবে তত বেশী মানুষ নৈতিকভাবে মরবে এবং পৃথিবীটাকে পালটানোর কথা ভুলে যাবে।" বাঙালীর চরিত্র ও নৈতিকতাবোধ এত ঠুনকো নয় যে, থিয়েটার দেখে বা পাবলিক থিয়েটারে অধুনা-প্রচলিত পাশ্চাত্ত্য-নৃত্য দেখে নৈতিকভাবে তারা সবাই মরবে।

রুদ্রবাবুর লেখার মধ্যে পাবলিক থিয়েটারের প্রতি বিদ্বিষ্ট মনোভাব ও অবজ্ঞা অতিশয় স্পষ্ট। ... দিক থেকে এর কারণ খুঁজে পাওয়া

হওয়া শক্ত নয়। তিনি বলেছেন, গ্রুপ থিয়েটারের মেরুদণ্ড আর একান্ত উপলব্ধি। উক্তিটি নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রুপ থিয়েটার ও পেশাদার থিয়েটার যে যার নিজের পথে চলুক, কিন্তু তার মধ্যে অসূয়া, বিদ্বেষ বা প্রতিযোগিতা থাকবে কেন।

অভয় মুখোপাধ্যায়
কলকাতা ৫

॥ ৩ ॥

"বাংলা থিয়েটার ও সরকারী দায়িত্ব" শীর্ষক শ্রীরুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের প্রবন্ধে রবীন্দ্র সদন সংক্রান্ত তাঁর কয়েকটি মন্তব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্র সদনের বক্তব্য আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত হলে সুখী হবো।

রবীন্দ্র সদনকে অত্যন্ত ব্যয়বহুল ভাড়াটে থিয়েটার-বাড়ি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে সুযোগ, সুবিধা ও আসনসংখ্যার বিচারে কলিকাতার যে কোনো প্রেক্ষাগৃহের তুলনায় রবীন্দ্র সদনকে 'অত্যন্ত ব্যয়বহুল' বলা চলে না। রবীন্দ্র সদন নিছক ভাড়াটে থিয়েটার-বাড়ি নয়—সারা বৎসর নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা রবীন্দ্র সদনের অন্যতম করণীয় কর্তব্য। কার্যনির্ধারক সমিতির সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা অনুযায়ী নানা সাংস্কৃতিক সংস্থার সহযোগিতায় রবীন্দ্র জন্মোৎসব বা অন্যান্য অনুষ্ঠান হয়। সে কারণে রবীন্দ্র সদন আয়োজিত অনুষ্ঠানকে 'পরিকল্পনাহীন' অনুষ্ঠান বলার যুক্তিসংগত কারণ আছে বলে মনে হয় না।

রবীন্দ্র সদন সরকারী রঙ্গশালা, তাকে যে-সে ব্যবহার করা উচিত নয় বলে তিনি যে মন্তব্য করেছেন সে প্রসঙ্গে বলা যায় যে, কার্যনির্ধারক সমিতি যোগ্যতা ও প্রয়োজন বিচার করে আবেদনকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে প্রেক্ষাগৃহ বণ্টন করে থাকেন। রুদ্রপ্রসাদবাবু প্রস্তাব করেছেন রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গণে চারশো-পাঁচশো আসনযুক্ত মুক্তাঙ্গন মঞ্চ নির্মাণ করা উচিত। কার্যনির্ধারক সমিতি ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে নকশা তৈরী, পূর্ত বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ, বিশেষ উপসমিতি গঠন, আলোচনাচক্রের আয়োজন প্রভৃতির মাধ্যমে মুক্তাঙ্গন মঞ্চের প্রাথমিক প্রস্তুতি পর্ব সমাপন করেছেন।

রবীন্দ্র সদনের আয়োজনে নাট্যোৎসব অদ্ভুত বলে উল্লেখ করে শ্রীসেনগুপ্ত এটিকে প্রতিনিধিত্বমূলক করার আবেদন জানিয়েছেন। রবীন্দ্র সদন কর্তৃপক্ষ কলকাতা এবং কলকাতার বাইরের বহু নাট্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রতি বৎসর এই নাট্যোৎসবের আয়োজন করে থাকেন এবং অনুষ্ঠানটি যাতে প্রতিনিধিত্বমূলক হয় সেদিকে লক্ষ রাখেন। রবীন্দ্র সদন সম্বন্ধে জনগণের মনে যাতে কোন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি না হয় সে কারণে সঠিক তথ্যাদি প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

[illegible]
[illegible]

'ভারত মহাসাগরে নৌবহরের টহল কেন ?'

ডাঃ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের "ভারত মহাসাগরে বৃহৎ শক্তির টহল কেন"? (২রা জুলাই) প্রবন্ধের উপর কিছু বক্তব্য পড়েছি।

মনে হয় উপরোক্ত প্রবন্ধে সোভিয়েট সাবমেরিনের ছবির নীচে যে caption দেয়া হয়েছে তাতে করে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। captionটি হওয়া উচিত ছিল সোভিয়েট সাবমেরিন ক্রুইজ মিসাইল শ্রেণী (শুধু ক্রুইজ মিসাইল নয়)। বোধ হয় ছাপার ভুলেই এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

এ খবর জানা আছে যে ষষ্ঠ দশকের প্রথম দিকে রাশিয়া এই শ্রেণীর (cruisie missile type) সাবমেরিন তৈরী এবং ব্যবহার করতে শুরু করেছে। যেহেতু এই শ্রেণীর সাবমেরিনের প্রধান অস্ত্র (weapons system) হল ক্রুইজ মিসাইল সেহেতু এর আখ্যা দেয়া হয়েছে ক্রুইজ মিসাইল সাবমেরিন বলে। ক্রুইজ মিসাইল সাবমেরিনেরও আবার শ্রেণী বিভাগ আছে—যেমন (Charlie-class, Juliet-class বা Echo-II-class) ছবিতে দেখান সাবমেরিনটি ইকো-২ শ্রেণীর, এটি আণবিক শক্তিচালিত। এতে আটটি ক্রুইজ মিসাইল (SSN-3 type) ক্ষেপণের টিউব রয়েছে। এছাড়া টরপেডো ছোঁড়ার টিউবও রয়েছে। এই সাবমেরিনগুলি বর্তমানেও সক্রিয় এবং উত্তর ও প্রশান্ত নৌবহরের সঙ্গে যুক্ত আছে।

মনে রাখতে হবে ক্রুইজ মিসাইল নতুন কোন অস্ত্র নয়। এগুলি প্রথম যুগের (first generation) রকেট; চল্লিশ এবং পঞ্চাশ দশকে এর বিকাশ এবং তৈরী হয়েছিল, এবং এখনও এগুলির সীমায়িত প্রচলন আছে। এর পরে আসে গাইডেড ব্যালিস্টিক মিসাইলের (guided ballistic missile) যুগ (MRBM, IRBM, ICBM, SLBM প্রভৃতি)। বর্তমানে যে ক্রুইজ মিসাইল নিয়ে আমেরিকা এবং রাশিয়ার SALT টেবিলে দ্বন্দ্ব হচ্ছে, সে মিসাইলও পুরাতন ক্রুইজ মিসাইলের ভিত্তিতে তৈরী, শুধু এতে সময়োচিত উন্নতি করা হয়েছে। এর সব চাইতে সুবিধা হল এ মিসাইল খুব নীচু দিয়ে (treep-top level) ভ্রমণ করে, ফলে একে রাডার (radar) যন্ত্রে লক্ষ্য করা শক্ত হয়।

সুধাংশুকুমার ঘোষ
নতুনদিল্লি-১

ইয়োরোপ নয়, ইংল্যান্ড

'দেশ' পত্রিকার শ্রীযুক্ত অমল দত্ত মহাশয় তাঁর "আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও আমরা" শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন, "ইয়োরোপের সবচেয়ে বড় বইয়ের দোকান ফয়েলসে"। এটি বোধ হয় তাঁর অনৈচ্ছিক অত্যুক্তি। W. C. Foyles Ltd. লণ্ডনের তথা ইংলণ্ডের সবচেয়ে বড় বইয়ের দোকান, ইয়োরোপের নয়। ঐ নিবন্ধেরই শেষের দিকে লিখেছেন, "বইটা খোলা বাজারে বেরোবার, একদিনেই সারা ইউরোপে সব কপি বিক্রী হয়ে গেছে।" এখানেও

নিশ্চয়ই লেখক সারা হুলেন্ত বোঝাতে চেয়েছেন।

অনিল সোম

জামশেদপুর-১

অচেনা চীন

মাও-সে-তুঙের কবিতা এখানেই সহজলভ্য, তার জন্যে কোন চীন পরিব্রাজকের বিবরণের দরকার করে না। আর ওই কবিতা সম্বন্ধে নিজস্ব ধারণা করে নেবার মত রসগ্রাহিতার অভাব এদেশে আছে—লেখিকার এ ধারণা করার কোন হেতু নেই। ও'র কাছ থেকে মাও-সে-তুঙের নয়—বরং এখন যে সব নতুন লেখা চীনে দেখা যাচ্ছে—তার কিছু নমুনা প্রার্থিত ছিল।

রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' ইত্যাদি যেসব রচনা সম্বন্ধে লেখিকা মন্তব্য রেখেছেন তাও তাঁর প্রকৃত বোধের অভাবেই। 'অচলায়তন' ধর্মীয় পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়—মুক্ত চিন্তায় এই ব্যাপক অর্থে রাজনৈতিক পুরোহিতরাও বাদ যান না। বিশেষ করে এই রাজনৈতিক পুরোহিততন্ত্র তো স্বৈরতন্ত্রী (totaliterian) দেশেই প্রবল, 'মুক্ত ধারায়' রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রের শৃঙ্খল মোচনের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস—প্রকৃতির অবাধ মুক্তিতে। সেখানেই তাকে শৃঙ্খলিত করে—তা মানুষের চিন্তা অথবা জীবনে কিংবা প্রকৃতির বেলায়—তা মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনে। লেখিকা বর্তমান চীনের শিল্পকলার যে কটি নমুনা দিয়েছেন তা যে চীনের ঐতিহ্যময় শিল্পকলার গৌরবময় উত্তরসূরী একমাত্র অন্ধ-বিশ্বাসী ছাড়া কেউই বলবেন না। এগুলো দেখে চীনের বর্তমান শিল্পকীর্তির ধারণা যদি নিতে হয়—তাহলে তা হতাশাই নিয়ে আসে। মাও-সে-তুঙের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে ছবি—লেখিকা যাকে একটি অসাধারণ চলচ্চিত্র বলেছেন তা তাঁর বর্ণনা থেকে কারুরই মনে হবে না।

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

হাওড়া-৭১১১০৪

॥ ২ ॥

মৈত্রেয়ী দেবী 'অচেনা চীন' প্রসঙ্গে (দেশ ৬ই আগস্ট '৭৭) চীন সম্পর্কে বেশি উচ্ছ্বাস প্রদর্শন করতে গিয়ে এদেশের মানুষ সম্পর্কে কতগুলো অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে ফেলেছেন। উনি বলেছেন, "বিপদগ্রস্তকে সাহায্যের নীতি সম্প্রতি এ দেশে বিস্মৃত।" বলেছেন, "আর রাস্তায় পথচারী যদি গাড়ির ধাক্কা খেয়ে পড়ে তা হলে সেই আহত লোকটার দিকে না তাকিয়ে আগেই ড্রাইভারের বিচার ও 'এক্সিকিউশনের' দিকে ঝোঁক পড়ে। এবং একাজে প্রধানত কলেজে-পড়া ছেলেদেরও কম নয়।" অপ্রাসঙ্গিক এই কারণেই বলছি যে, বিগত শতাব্দীর শেষাশেষি এ দেশের যুবকদের সম্পর্কে উনি যাই ভাবুন না কেন, বিশেষত উপরোক্ত বিষয়ে, যুবকদের একনিষ্ঠতা ও তৎপরতার দিকে উনি সম্পূর্ণ উদাসীন নীতি পালন করেছেন। পথচারীকে যখন কোন গাড়ি ধাক্কা মারে তখন মানুষরাই, বিশেষভাবে যুবকরাই ধাক্কা খাওয়া লোককে হাসপাতালে পাঠানোর উদ্দেশ্যে ট্যাক্সি ডেকে আনে, যুবকরাই ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকে, আবার যুবকরাই ড্রাইভারের বিচার ও এক্সিকিউশনের দিকে তৎপর হয়ে থাকে। আজ পর্যন্ত বোধ হয় এমন ঘটনা কোথাও ঘটেনি যেখানে গাড়িতে ধাক্কা খাওয়া লোককে ফেলে দিয়ে শুধু ড্রাইভারের পেছনে লোক ছুটেছে। আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লব হয়তো হয়নি তাই বলে বিপদগ্রস্তকে সাহায্যের নীতি এ দেশ সম্প্রতি বিস্মৃত নয়। আমাদের দেশে সম্প্রতি সামাজিক বিকাশে, মানুষের কল্যাণসাধনে যুবকদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের ব্যাপারে উনি বোধ হয় ইচ্ছে করেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করেননি।

মলয় চক্রবর্তী

কলকাতা-৩০

সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ

'সংস্কৃত সাহিত্যের তিব্বতী অনুবাদ (দেশ, ২৩ জুলাই) নিবন্ধটির জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে কয়েকটি তথ্যগত দিকে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এক : চীনা পণ্ডিত ও পরিব্রাজক (আমার মতে ঐ সঙ্গে একজন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অভিযাত্রী—explorer) হিউয়েন সাং-কে চীন সম্রাটের দৃষ্টি এড়িয়ে, গোপনে ভারত যাত্রা করতে হয়েছিল এবং তাঁকে কিছুদিন দিনে লুকিয়ে থেকে রাতে পথ চলতে হত ধরা পড়ে যাবার ভয়ে। কারণ, তদানীন্তন চীন সম্রাট হিউয়েন সাং-সহ কয়েকজন চীনা পণ্ডিতের চীন ত্যাগের আবেদন নাকচ করে দেন। (উৎস : 2500 Years of Buddhism, chapter X এবং A History of Exploration—Sir Percy Sykes)

সুতরাং এই সময়ে চীনের সম্রাট অর্থাৎ তিব্বতের রাজার শ্বশুর একই উদ্দেশ্যে বিখ্যাত চীনা পণ্ডিত ও পরিব্রাজক হিউয়েন সাংকে ভারতবর্ষে পাঠান। —এ তথ্য লেখক পেলেন কোথায় ?

দুই : লেখকের মতে তিব্বতী সাহিত্যের জনক Thin-mi Sambho-ta (লেখক : থোন্মি সমভোটা) এবং চীনা পণ্ডিত হিউয়েন সাং 'একই উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত তথ্য কি তাই ?

Sambho-ta-র ভারতবর্ষে আসার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় প্রস্তরলিপি উৎকিরণ বিদ্যা (epigraphy), ধ্বনি বিজ্ঞান (phonetics) ও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করে তিব্বতী ভাষার জন্য একটি লিপি (Alphabetic script) আবিষ্কার করা এবং সেটিকে ব্যাকরণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা।

অপর দিকে চীনা পণ্ডিত হিউয়েন সাং ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র ও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র সংক্রান্ত কিছু জটিলতার মীমাংসার জন্য সঠিক তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধানে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। (উৎস : ঐ)

তিন : হিউয়েন সাং তাঁর ভারত ভ্রমণের সময় কাশ্মীর রাজ্যে আসেন।

প্রথমবার আনুমানিক ৬৩৭ খৃস্টাব্দের ৯০শে মার্চ এবং দ্বিতীয়বার ৬৪২ খৃস্টাব্দের ১লা এপ্রিল এবং সেই সময়ে প্রায় দুই মাস সেখানে থাকেন। (উৎস : The Ancient Geography of India, Part I —Alexander Cunningham)

লেখক Sam-bho-ta ও হিউয়েন সাংএর মগধ অবস্থানের 'একই সময়' বলতে কোন সময়টি বোঝাতে চান ?

চার : তিব্বত সম্রাট Sron-btsam-sgam-po-র (লেখক স্রোং চেন গমবো) জন্ম ৬১৭ খৃস্টাব্দে। (উৎস : 2500 Years of Buddhism, Chapter X) লেখক ৬২৯ খৃস্টাব্দে তার সিংহাসন আরোহণের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে কি মাত্র ১৩ বছর বয়সেই তিনি তিব্বতের সম্রাট হন ?

তপন পাল
চুঁচুড়া

॥ ২ ॥

দেশ পত্রিকার ২৩ জুলাই সংখ্যার 'সাহিত্য' বিভাগে অরবিন্দ পালিত মহাশয়ের 'সংস্কৃত সাহিত্যের তিব্বতী অনুবাদ' প্রবন্ধে সুভিরত্নাবলীর যে ছোট্ট শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে গুরুতর ভুল রয়ে গিয়েছে। তিনি লিখেছেন—"সর্প ক্রূরঃ খলঃ সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ" এক্ষেত্রে হবে—"সর্প ক্রূরঃ খলঃ ক্রূরঃ সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ" এবং পরের লাইনে তিনি যেখানে লিখেছেন—"মন্ত্রৌষধবশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবর্য্যতে" এখানে হবে—মন্ত্রৌষধিবশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবার্যতে, এ ছাড়া তিনি যেখানে লিখেছেন——সংস্কৃতর অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, "সর্প ক্রূরঃ দুর্জনঃ ক্রূরঃ..." ইত্যাদি, এর তৃতীয় চরণে তিনি যা লিখেছেন—"সর্প ক্রূরঃ ঔষধেন মন্ত্রেণশক্যঃ"—এতে কি করতে শক্যঃ কিছু মানে দাঁড়াচ্ছে না। সংস্কৃত শ্লোকসমূহ শব্দ এবং শব্দের বানানে ভীষণভাবে নির্ভরশীল তবুও ছোট্ট এই প্রবন্ধে এই ভুলগুলো কি করে হল বুঝতে পারছি না।

প্রদীপ পাল
হাওড়া ১

মোনালিসার হাসি

শ্রীপুষ্পেন্দু লাহিড়ী গত ২০শে জুলাইয়ের দেশ পত্রিকায় যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তার শিরোনামা দিয়েছেন "মোনালিসার হাসি", কিন্তু মোনালিসা সম্বন্ধে অনেক কথা বললেও তার হাসিটির কোন ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন নি। তিনি লিখেছেন, "মোনালিসার হাসিকে আরও ব্যঞ্জনাময় করে তুলতে পটভূমিকায় লিওনারদো জুড়িয়ে দিলেন কিছু টুকরো পাহাড়, বাঁকানো পথ (ঐ পরিবেশে কি ওটা পথ ?), আর হাল্কা রঙের জলস্রোত"। কিন্তু পাহাড়, জলস্রোত দিয়ে নারীর মৃদু হাসিকে কি করে ব্যঞ্জনাময় করা যায় ? মোনালিসা সম্বন্ধে নানা [illegible] উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, মোনালিসার অঙ্গে [illegible] [illegible] [illegible] ?

বিশেষজ্ঞ নই। তবে বহুদিন আগে লুভরে মোনালিসা দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেই সময় একজন ইংরেজ দর্শক ছবিটির যে তাৎপর্য আমাকে বুঝিয়ে দেন তাই আমি এখানে তুলে ধরছি। লিওনারদো এই ছবিতে দেখিয়েছেন জগতের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ (an epitome of the universe)। সৃষ্টিকে তিনি দু ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন : পশ্চাদ্‌ভূমিতে বিরাট প্রকৃতি আর পুরোভূমিতে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। মানবজাতির মধ্যে নারীকেই শিল্পী সৃষ্টির রহস্যময়তার প্রতীক হিসাবে দেখিয়েছেন। আর নারীর রহস্যময়ী ভাব ঠিকমত ফুটিয়ে তোলার জন্যেই ঐ মৃদু হাসিটি। পশ্চাদ্‌ভূমিতে আবছা আলো, নরম রং, দূরত্বের আভাস, পর্বতশ্রেণী, সমুদ্র প্রভৃতি দিয়ে শিল্পী ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রকৃতির বিরাটত্ব, বিচিত্রতা ও মহিমা দেখিয়েছেন।

মোনালিসার অঙ্গে যে পোশাক সেটা অশৌচের কালো পোশাক নয়। ছবির পশ্চাদ্‌ভূমিতে লক্ষ করলে দেখা যাবে সামান্য একটু লাল রং—অর্থাৎ সূর্য তখনও উঠতে দেরি আছে বা ডুবে গেছে। সেই মৃদু আলোর সামনে মোনালিসা বসে আছে বলেই তার গাঢ় রঙের পোশাক কালো দেখাচ্ছে—তাই দেখায়। লিওনারদোই প্রথম শিল্পী যিনি এই আলো-ছায়ার রহস্য (chiaroscuro) প্রথম কাজে লাগান। মোনালিসার অঙ্গে যে ঢিলা পোশাক সেটা বিধবার নয়, অন্তসত্ত্বা নারীর। কাজেই পোশাকের ভেতর দিয়েও শিল্পী সৃষ্টির রহস্যের আরও আভাস দিয়েছেন।

ছবিটির মৃদু রং, আলো-ছায়া, পশ্চাদ্‌ভূমির বিরাটত্ব, হাসি, পোশাক—সব কিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টির মহিমা ও রহস্যের আভাস দিচ্ছে। এই দার্শনিক দৃষ্টিকোণ, যাকে লিওনারদো বলতেন cosa mentale, আর ছবিটির একমুখিনতা (unity in diversity) আছে বলেই ছবিটির এত দাম। আশ্চর্য কি যে লিওনারদো নিজেই ছবিটির প্রেমে পড়বেন !

সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা

জনসংখ্যা হ্রাস

গত ১৪ শ্রাবণ, দেশের সম্পাদকীয় পড়ে এই আলোচনা করছি। "ভারতের জনসংখ্যার দ্রুত হ্রাস চাই"—এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। তবে জনসংখ্যা হ্রাসের পদ্ধতি নিয়ে কথা।

পৃথিবীতে ভারতই একমাত্র দেশ, যেখানে পরিবার পরিকল্পনা একটি সরকারী প্রচেষ্টা। এর কারণ ভারত শিক্ষায় এবং অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর। গত ১৯৫৫ সাল থেকে এদেশে পরিবার পরিকল্পনা চালু হয়েছে।
বর্তমানে সারা দুনিয়াতে পরিবার সীমারিত রাখার জন্য 'বড়ি' জনপ্রিয় হয়েছে। আমরাও 'বড়ি' পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। তবে শিক্ষিতের মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ। নির্বীজকরণ পরিবার সীমারিত করার স্থায়ী ব্যবস্থা। তবে এটা বেশী বয়সের লোকেদের মধ্যেই [illegible] [illegible] [illegible]।

প্রকাশিত হল

বরুণ সেনগুপ্তের

রাজনৈতিক রচনাসমূহের সুনির্বাচিত সংকলন

রাজ্য ও রাজনীতি

দাম ৮·০০

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বরুণ সেনগুপ্ত 'রাজ্য ও রাজনীতি' পর্যায়ে নিজনামে এবং 'দেশ' পত্রিকায় 'দৃশ্য-পট' পর্যায়ে নবারুণ গুপ্ত নামের আড়ালে বিভিন্ন সময়ে পশ্চিম বাংলা ও সর্ব-ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন। সেই-সব প্রবন্ধে তিনি সমকালীন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক রঙ্গমঞ্চের পর্দার পেছনের অনেক গোপন তথ্য ও সংবাদ জনসাধারণের কাছে ফাঁস করে দিয়ে জনসাধারণকে যেমন সতর্ক করে দিয়েছেন, তেমনি বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাকে তার পৌর্বাপর্য সম্পর্ক বিচারান্তে সেটিকে যথাযথ প্রেক্ষিতে স্থাপনপূর্বক তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে পাঠককে সচেতন করেছেন। তাঁর আজকের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার মূলে সেইসব লেখা থেকে সেরা রচনাগুলি বাছাই করে গ্রন্থিত হয়েছে এই সংকলন : রাজ্য ও রাজনীতি ॥

এই লেখকের অন্যান্য বই :
পালাবদলের পালা ১২·০০
বিপাক-ই-স্তান ৬·০০
নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য ৭·০০ ইন্দিরা একাদশী (শোভন) ১০·০০ (সুলভ) ৫·০০ সব চরিত্র কাল্পনিক (উপন্যাস) ৮·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা-৯
ফোন ৩৪ ৪৩৫২

প্রকাশিত হল

আনন্দবাজার পত্রিকার বিশিষ্ট সাংবাদিক

সুখরঞ্জন দাশগুপ্তের

চাঞ্চল্যকর বই

সিদ্ধার্থশংকর : সিদ্ধি ও নির্বাণ

দাম ৬·০০

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে সিদ্ধার্থশংকর রায় বসে পড়লেন যেন একেবারে হঠাৎই—যাকে বলে দুম করে। তাঁর আগে এবং পরে আর যাঁরা এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, সকলেরই মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে আদর্শপ্রাণতা, ত্যাগ এবং দুঃখবরণে সমুজ্জ্বল একটা দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন ছিল। সিদ্ধার্থ রায় সেদিক থেকে ছিলেন প্রায় নিঃস্ব। সেই মানুষ যখন রাজপাটে বসলেন, এবং পাঁচ বছরেরও বেশী কাল বিরোধী দলবিহীন রাজ্যে জরুরী অবস্থার ছত্রছায়ায় একচ্ছত্র সাম্রাজ্য চালিয়ে গেলেন, তার বাইরের দিকটা আমরা দেখেছি আমাদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতায় ও খবরের কাগজের পাতায় ; কিন্তু তার ভেতরের দিকটা, যাকে বলে অন্দরমহলের ব্যাপারটা—কেমন, কিভাবে তিনি রাজত্ব চালিয়ে গেছেন, কেমন করে সব কিছুর ওপরে নিজের ব্যক্তিগত আধিপত্য কায়েমের চেষ্টা করেছেন, কিভাবে নিজের দলের ছোটবড় নানা নেতাকে খতমের চেষ্টা করেছিলেন, কিভাবেই বা পুলিশী জাল ছড়িয়েছিলেন সারা রাজ্যে এবং শেষ পর্যন্ত কোন মোক্ষ লাভ করে-ছিলেন—আমরা কিছুই জানি না। এ বই তারই নেপথ্যকাহিনী—অপ্রকাশিত ও চাঞ্চল্যকর নানা তথ্যে ভরা। লিখেছেন আনন্দবাজার পত্রিকার বিশিষ্ট সাংবাদিক সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত ॥

কয়েকটি উপন্যাস

সমরেশ বসুর
মহাকালের রথের ঘোড়া
দাম ১০·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
আমিই সে
দাম ৭·০০

রমাপদ চৌধুরীর
যে যেখানে দাঁড়িয়ে
দাম ৫·০০

বিমল করের
অসময়
দাম ১২·০০

বুদ্ধদেব গুহর
বাতিঘর
দাম ৪·০০

মতি নন্দীর
নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান
দাম ৪·০০

আশাপূর্ণা দেবীর
দর্শকের ভূমিকায়
দাম ৫·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বেণীসংহার
দাম ৫·০০

কালকূট-এর
কোথায় পাবো তারে
দাম ৩৫·০০

বিমল মিত্রের
হাতে রইলো তিন
দাম ৬·০০

প্রফুল্লকুমার সরকারের
লোকারণ্য
দাম ৪·০০

বুদ্ধদেব বসুর
গোলাপ কেন কালো
দাম ৫·০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
ঘুণপোকা
দাম ৬·০০

পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত হল

শৈলেন ঘোষের

রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত ছোটদের অপরূপ রূপকথা

মিতুল নামে পুতুলটি

দাম ৪·০০
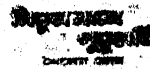
ছোট্ট একটুকুনি এক পুতুল। নামটি তার মিতুল। দুষ্টু-দুষ্টু চোখ—মিটিমিটি চায়। টুকটুকে ঠোঁট—মুচকি মুচকি হাসে। তার ছিল এক পুচকে পুতুল-বোন। যেমন তার দেহের গড়ন, তেমনি তার দুধের বরন। মিতুলের সেই ছোট্ট অত্তটুকুনি বোনটি হারিয়ে গেল একদিন। বেচারা মিতুল খুঁজে খুঁজে সারা, চোখে জলের ধারা। সবশেষে, ক-ত-তো কাণ্ড করে মিতুল খুঁজে পেল তার পুচকে পুতুল-বোনটিকে। পুতুল মিতুলের সেই অ্যাড-ভেনচারের রূপময় রূপকথা 'মিতুল নামে পুতুলটি'। পাঁচটি পুরো-পাতা দু-রঙা ছবিতে ঝলমলে ॥

এই লেখকের অন্যান্য বই :
অরুণ বরুণ কিরণমালা ৩·০০ ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬·০০ বাজনা ৫·০০ দুষ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫·০০ আমার নাম টায়রা ৫·০০

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর

নতুন কবিতার বই

হিমযুগ

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

অম্লান দত্তের

প্রগতি ও উন্নতির মূল শর্তগুলি সম্পর্কিত আলোচনা

প্রগতির পথ

দাম ৬·০০

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশে প্রগতি ও উন্নতির মূল শর্তগুলি নিয়ে যথার্থ সতর্ক আলোচনা আজও তেমনভাবে শুরু হয়নি। সেরকম তর্ক ও আলোচনা যাতে বিস্তৃতি লাভ করে সে উদ্দেশ্যেই এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি রচিত ॥
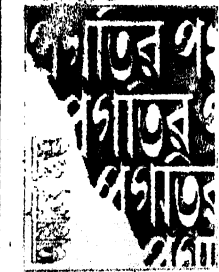
এই লেখকের অন্যান্য বই :
গণযুগ ও গণতন্ত্র ৪·০০
সমাজ ও ইতিহাস ৩·০০
পল্লী ও নগর ৩·০০

শংকর-এর

অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি

দাম ৮·০০

এক বিশ্ববিখ্যাত বাঙালী বৈজ্ঞানিকের জীবন ও সাধনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই কাহিনী। 'চৌরঙ্গী', 'কত অজানারে' না লিখেও বোধ হয় এই একটি মাত্র বইতেই শংকর বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন ॥

এই লেখকের আর একটি উপন্যাস :

দেশ ৪৪ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা
১৮ ভাদ্র ১৩৮৪

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : আলোকচিত্র মোনা চৌধুরী
প্রচ্ছদ পরিচিতি : বাঁকুড়ায় নির্মিত পোড়ামাটির তিনতলা বিশিষ্ট মনসার চালা প্রচলিত নাম 'ধাপ'। একটি নৌকার উপর নির্মিত। প্রচলিত ধারণা, মনসা সব সময়ই নৌকায় যাত্রা করতেন উপরের তলায় কার্তিক, ময়ূরের উপর বসে।

আগামী সংখ্যায়

অম্লান দত্তের প্রবন্ধ
তিন দিগন্ত
জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের রচনা
ইউরেনাসের বলয় : সৌরজগতের নতুন আবিষ্কার
কণা বসুমিত্রের গল্প
কন্দন
বরুণ সেনগুপ্তের প্রবন্ধ
ইন্দিরার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা

ভারতজীবনে গঙ্গাধারা

হেয়ারডালের কেন-টিকি অভিযান দুঃসাহসিক সমুদ্রযাত্রার ঘটনা হিসাবে অদ্বিতীয় ও তুলনাহীন। ছোট্ট একটি আদ্যিকেলে, গেঁয়ো নৌকার যাত্রী হেয়ারডাল যে বিপুল সমুদ্রভাগ অতিক্রম করেছিলেন, তার মধ্যে অজস্র অজানা সংকট ও বিস্ময়ের এবং কখনও বা কৌতুকের নির্মম খেলা ছিল। ঐতিহাসিক টয়নবি কেন-টিকি অভিযানের গূঢ়তর তাৎপর্যের পরিচয় উপলব্ধি করেছিলেন। যদিও তিনি বিশদ প্রকারে তাঁর উপলব্ধির তত্ত্ব ব্যাখ্যাত করেন নি। মানবীয় কৌতূহল ও সন্ধিৎসার সব দুঃসাহসিক অভিযান জ্ঞানের নতুন সম্বল লাভ করবার প্রয়াস। অনেক ক্ষেত্রে এটা পুনরাবিষ্কারের কৃতিত্বে প্রসন্ন হয়ে ওঠে। হারিয়ে-যাওয়া উপলব্ধির পুনরাগমন। স্যার এডমণ্ড হিলারীর গঙ্গাভিযানের পরিকল্পনা অনেকের কাছে এইরকমই একটি অধ্যবসায়ের উদাহরণ বলে বিবেচিত হবে। সুন্দরবনের গঙ্গা থেকে নৌকাযোগে তিনি বাইরের গঙ্গায় আসবেন, তারপর গঙ্গার সাগরমুখীন প্রবাহ-পথের বিপরীতমুখী পথে অগ্রসর হয়ে ক্রমে ক্রমে একেবারে গঙ্গার উৎসজলের প্রবাহক্ষেত্রে উপস্থিত হবেন।

আশা করা যায় এডমণ্ড হিলারীর নৌকা হিমালয়ের উচ্চপ্রস্থের গঙ্গাপ্রবাহের পরিবেশ সম্বন্ধে নতুন তথ্যের কিছু 'সোনার-ধান' বহন করে নিয়ে আসতে পারবে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোন ঐতিহাসিক টয়নবি এসে ঘটনার ঐতিহাসিক মর্যাদা সম্বন্ধে মন্তব্য না করতে পারেন। কিন্তু স্যার এডমণ্ডের গঙ্গাভিযান একাধারে দুঃসাহসিক ভৌগোলিক সন্ধান, এবং ভারতীয় জীবনের একটি রূপলোকের অনুসন্ধান। গবেষণার আগারের ভিতরে কোনও তথ্যের পরীক্ষা উদ্‌যাপন করবার বড়-বড় ব্যবস্থা থাকে বটে, কিন্তু এর দ্বারা মানুষের আত্মিক পরিচয়ের কোন উদ্দীপ্ত নিদর্শনের এবং কোন প্রেরণার আবিষ্কার সম্ভব নয়। তাই দুঃসাহসিক অভিযান, যাকে দুঃসাহসিক কৌতূহলযাত্রা বলা যায়; তার যেমন ঐতিহাসিক মর্যাদা থাকে, সাধারণ গবেষকের সন্ধান ও আবিষ্কারের মধ্যে ঠিক তেমন কোন কোন ঐতিহাসিক মর্যাদার অস্তিত্ব থাকে না। নৃতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞের ধারণা, নবপ্রস্তর যুগের পর হতে, অর্থাৎ বিগত দশ-বারো হাজার বছরের মধ্যে মানুষ জাতি নতুন করে আর একটিও বনপ্রাণীকে বশীভূত করে গৃহপালিত প্রাণীতে পরিণত করতে পারে নি। এটা এক হিসাবে আধুনিক মানুষের 'প্রতিভা'র' উচ্চাকাঙ্ক্ষার লক্ষণ নয়। বরং বলতে হয়, স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার স্মৃতি দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে থেকে বন্যপ্রাণীকে বশীভূত করবার যে কৃতিত্ব নবপ্রস্তরযুগের মানুষের প্রতিভায় সম্প্রসারিত হয়েছিল, সেটা পরবর্তী কালের মানবীয় প্রতিভার মধ্যে আর জাগ্রত হয়ে থাকবার সুযোগ পায় নি।

জাতির জীবনের বৃহত্তর স্বার্থের কোন বড় কর্তব্য সুনিশ্চিত করবার আগে আসন্ন নতুনের তথ্য যত না নির্ভরযোগ্য উপাদান, অতীতের অভিজ্ঞতার তথ্য তার চেয়ে অনেক বেশী নির্ভর-যোগ্য তথ্য। সাম্প্রতিক দুই-এক মাসের মধ্যে ভারতেরই পরিণামের নতুন বিনির্ণয়ের নানা কথা শোনা যাচ্ছে। সেগুলি ঠিক পরস্পরের সঙ্গে যুক্তিসহ কোন সম্বন্ধে যুক্ত বলে মনে হবে না। অর্থাৎ, এডমণ্ড হিলারীর গঙ্গাভিযানের সঙ্গে ভারতের সব নদীকে শাখাপ্রবাহের দ্বারা যুক্ত করবার বেশ দুঃসাহসিক সদিচ্ছার কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নিশ্চয়ই নেই। আবার ভারতের ভৌগোলিক রূপ ও চরিত্রের বিচিত্রতার উপরে এধরনের বিরাট রকমের একটি আত্মীয়তা-সাধনের অনুরূপ পূর্তবিস্ময়ের কোন কৃতিত্বের কোন সম্পর্ক নেই।

গঙ্গা-কাবেরী-নর্মদা-কৃষ্ণা-তাপ্তী; পূর্ব পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণের সব নদীকে শাখা-প্রবাহের দ্বারা যুক্ত করলে কি ভারতীয় নদী-প্রকৃতির বিরাট রকমের কোন নতুন 'ঐক্য' রূপান্বিত হবে? সে কিসের ঐক্য, কেমন ঐক্য? স্মরণ করতে হয়, কয়েক বৎসর আগে এধরনের প্রস্তাব নিয়ে দেশের এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীই অত্যন্ত রকমের প্রচার সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু প্রচারিত হলেই যে সেটা সত্যতার একটা প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে এমন কোন কথা নেই। নতুন জনতা সরকারই বা এক্ষেত্রে অর্থাৎ নদীর ঐক্যবিষয়ক পরিকল্পনায় কী ধরনের এবং কতটুকু প্রত্যক্ষ সমর্থন উৎসর্গ করেছেন, বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তবে কোন-কোন প্রবক্তার বিবৃতিতে ধারণা ও প্রস্তাব সব নদীকে যুক্ত করবার পরিকল্পনাকে জাতীয় সমৃদ্ধির একটি পরিকল্পনা বলে প্রচার করা হচ্ছে।

ভারতের সব নদীকে যুক্ত করা কি অবশেষে দুঃসাহসিক অভিযানের একটি খেলা-মাত্র হয়ে জাতির সৌভাগ্যের অশেষ দুর্গতি সত্য করে তুলবে না তো! এত বড় দুঃসাহসিক অভিযানে প্রবৃত্ত হবার আগে সরকারের পক্ষে একেবারে সুনিশ্চিত হওয়া উচিত যে, এর ফলে বন্যার প্রকোপ সত্যই খুব হ্রাস পাবে। ভূতাত্ত্বিক স্তরের বিন্যাস উপদ্রুত হবে না। অত্যন্ত দক্ষ ও বিজ্ঞ একটি বিবেচক-কমিটির মুক্তকণ্ঠ সুপারিশ থাকলে তবেই এই প্রস্তাব সরকারের বিবেচনার অধীন হতে পারে।

গঙ্গোত্রী প্রদেশে, হিমালয়ের ক্রোড়াশ্রিত গঙ্গাপথের অভিযাত্রা অবশ্যই দুঃসাহসিক সংকেতে পরিপূর্ণ অজানা বিস্ময়ের আহ্বান। এই গঙ্গা যুগ-যুগ ধরে ভারতজীবনের ভাবলোকে বিস্ময়ের শ্রদ্ধাময় কলনাদ সঞ্চারিত করে চলেছে। ভারতের ঐতিহাসিক জীবনেরও স্রষ্টা। কবি বার্নস্ টেমস নদীকে 'লিকুইড হিস্ট্রি' তথা সুতরল ইতিহাস বলে অভিহিত করেছেন। কথাটি ভারতের [illegible]

ব্যঙ্গচিত্র

গৃহমন্ত্রী এখন
ঘরবাড়ি বানাতে ব্যস্ত।

মনসা পূজা

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

বীরভূমের লাভপুর থানার আবাডাঙ্গা গ্রামে বেশ কয়েক বছর আগে সর্প-চিকিৎসার একটি পাণ্ডুলিপি আমার হাতে আসে। পাণ্ডুলিপির বৈশিষ্ট্য হল তা আগাগোড়া লাল কালিতে লেখা। প্রচলিত ধারণায় সাপের বিষের রং কালো বা নীল। নীল বা কালো কালির রচনায় বিষনাশ মন্ত্রে আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ ঘটবে না বলে লাল কালি ব্যবহার করা হয়। এমন কি, ১৩২০ সালে শ্রীযুক্ত দীনদয়াল তীর্থস্বামী মহাশয় কলকাতা থেকে যে সর্প-চিকিৎসার পুস্তিকা প্রকাশ করেন তাও লাল কালিতে ছাপা। মলাটেও কোথাও কালো রং ব্যবহার করা হয়নি। কালো কালি বর্জনের পিছনে হয়তো আছে কোনও সংস্কার বা বিশ্বাসের বন্ধমূল ছায়া, যা বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীরও পুজোর্চনার অন্যতম কারণ। ভয় থেকে ভক্তির উদ্ভব হয়েছে। এবং এই ভয় ও বিস্ময় থেকেই প্রায় প্রতিটি সমাজে প্রাথমিক অবস্থায় প্রকৃতি ও বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের উপাসনার সূচনা হয়েছিল বলে বিজ্ঞজনেরা মনে করেন। আজকের সর্পমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার পিছনেও আছে ভয় ও বিস্ময়ের যোগসূত্র। মহাভারতে এই মনসা জরৎকারুর পত্নী, আস্তিকের মাতা এবং বাসুকির ভগিনী। ঋষি কশ্যপ ব্রহ্মার আদেশে তপোবলে মন দ্বারা এঁকে সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের এই আখ্যান হেতুই ইনি মনসা। কিন্তু মহাকাব্য ও পুরাণে যে কথাই লেখা হোক না কেন, আমরা জানি ওফিওলেট্রি বা সর্পপুজো শুধু প্রাচীন ভারতীয়দের মধ্যেই নয়, তা পৃথিবীর অন্যান্য বহু জাতিরও একটি অতি প্রাচীন সুপরিচিত অনুষ্ঠান। আজকের মত সভ্যতা তখন এত বহুবিস্তৃত হয়নি বলে মানুষ অরণ্যসংকুল প্রদেশ ও গুহায় বসবাস করতেন। সাপ ও নানা জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে সংগ্রাম করেই তখন মানুষকে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হত। ভারতের পুরাতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগের প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্ট জে পি এইচ ফোগেল তাঁর বহুখ্যাত 'ইণ্ডিয়ান সারপেনট লোর' বা 'দি নাগস ইন হিন্দু লেজেন্ড অ্যান্ড আর্ট' গ্রন্থে একটি সংখ্যাতত্ত্বের উল্লেখ করেছেন। ১৯১৯ সালে ভারতে কুড়ি হাজারেরও বেশী লোক সাপের শিকারে পরিণত হন। সে বছর অন্যান্য জন্তুর দ্বারা নিহতের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৬৩৭ জন। ফলে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, এই ভারতবর্ষে বিভিন্ন আদর্শে সৃষ্ট সাপ, বৃক্ষ ও মনসাপুজো অন্যান্য দেশের অনুরূপ পুজোর তুলনায় বৈচিত্র্যে ও সংখ্যায় অনেক বেশী। মনসাপুজোর সংখ্যা বেশী বলেই হয়তো বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল কাব্য অধিক সংখ্যায় রচিত হয়েছে। এবং মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গলই শুধু প্রাচীনতম কাব্য নয়, মনসার মাহাত্ম্যসূচক বিভিন্ন পালাগান রচনায় অন্তত ষাটজন কবির সন্ধান পাওয়া যায়।

মনসামঙ্গলের আদি কবি হরি দত্ত মনসার মূর্তি বর্ণনা করে লিখেছেন—

> বিচিত্র নাগে করে দেবী গলায় সুতলি।
> শ্বেত নাগে করে দেবী বুকের কাঁচুলি॥
> অনন্ত নারায়ণে পদ্মার মাথার মণি।
> বেত নাগে করে দেবী কাঁকালি কাছনি॥
> সোনা নাগে দেবী করিলা চাকী বলি।
> মকর নাগে করে দেবী পায়ের পাসুলি॥
> অমৃত নয়ান এড়ি দেবী বিষ নয়ানে চায়।
> চন্দ্র সূর্য গিয়া তবে আচ্ছেতে লুকায়॥
> দর্পণ হাতে করি দেবী বেশ বানায়।
> মনসার চরণে লাচাড়ী হরি দত্তে গায়॥

এবং পঞ্চদশ শতকের কবি বিজয়গুপ্তের রচনা থেকে মনসার জন্ম বা উৎপত্তি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি—

> পদ্মপত্রে হইয়া বন্দী পাইয়া মৃণাল সন্ধি
> পাতালে নামিল মহাজন।
> পাইয়া পাতালপুরী জন্মিল নাগিনী নারী
> মোহনরূপ মোহিতে ভুবন॥

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীতে কিভাবে মনসাপুজোর প্রচলন হল এবং কালক্রমে এই পুজো কিভাবে ছড়িয়ে পড়ল সমাজের নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে। তা ছাড়া মনসাপুজোর ব্রত ও আচার-অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে যেমন কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায় এইসব রচনায়, তেমনই আবার জানা যায় লৌকিক মনসার উৎপত্তির পিছনে অনার্য উৎসের কথা। সমাজের উচ্চ শ্রেণীতে স্থান পাওয়ার জন্য মনসাকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। বিশেষ করে শৈব সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই এসেছিল প্রবল বাধা। চাঁদ সদাগরের কাহিনীই এর আভাস দেয়। শিবের উপাসক চাঁদ সদাগর শেষ পর্যন্ত মনসার কাছে নতি স্বীকার করেন। চৈতন্য-পরবর্তী যুগের মনসামঙ্গলের কবি ক্ষেমানন্দ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> গলায় বসন দিয়া চাঁদ বেনে দাণ্ডাইয়া
> মনসারে করে স্তুতিবাণী।
> দেবের দেবতা শিব নিস্তার কারণ জীব
> তব স্তুতি কি বলিতে জানি॥
> দেবাসুর নাগ নর পশুপক্ষী জলচর
> তুমি সবাকার পরিত্রাণ।
> বলে চাঁদ অধিকারী তুমি মূল মন্ত্রধারী
> কি করিব দেবী তব ধ্যান॥
> তুমি দেবী ভগবতী অযোনিসম্ভবা সতী
> অনন্তাদি পাতালবাসিনী।
> রামের ভামিনী সীতা লক্ষ্মীস্বরূপিণী মাতা
> মহাকাল রাত্রি তপস্বিনী॥

কিন্তু এই মহাকালরাত্রি তপস্বিনীর পুজোর উদ্ভব নিয়ে নানারকমের মত প্রচলিত আছে। মহেঞ্জোদাড়োর সীলমোহরে প্রোটো শিবের প্রতীক অথবা ভক্তসম্প্রদায়ের টোটেম হিসেবে সর্পমূর্তি দেখা যায়। তদানীন্তন ভক্তরা নাগসম্প্রদায়ভুক্ত বলে অনেকে মনে করেন। ফার্গুসন ও ওল্ডহামের ধারণা, নাগগণ সর্পপুজারী। আর্যরা যখন ভারতে আসেন তখন তাঁদের মধ্যে সর্পপুজোর প্রচলন ছিল না। ঋগ্বেদে সর্পপুজোর সুনির্দিষ্ট কোনও উল্লেখ নেই। মনে করা হয় যে, দ্রাবিড় ভাষাভাষী জাতিই ভারতে সর্পপুজোর প্রচলন করেছিলেন। ঋগ্বেদের পরবর্তী আমলের কয়েকটি বেদে সর্পপুজো সংক্রান্ত নানাবিধ ক্রিয়াকর্মের উল্লেখ ও ইঙ্গিত আছে। ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের আখ্যান এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বৈদিক স্তোত্রের মনোযোগী বিশ্লেষণে তৎপর হলে দেখা যাবে, ইন্দ্র ও দেবগণের শত্রু এই বৃত্রকে অসুর, দস্যু, দানব ও সর্পবংশীয় অহি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বৃত্রসংহারের উপাখ্যান বৈদিক আর্যদের সৃষ্টি। অসুর, দস্যু ও দানব অর্থে হয়তো আর্যদের আগমনকালীন ভারতের আদি বাসিন্দাদের বোঝানো হয়েছে। তাঁদের প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান আর্যদের ভালো লাগেনি। দেবাধিপতি ইন্দ্রের বৃত্রসংহারের আখ্যানে এ কথাই সূচিত হয়েছে যে, আর্যরা অনার্যদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। কিন্তু বিজিতদের মন থেকে নানা বিশ্বাস, সংস্কার ও সর্পারাধনার বীজগুলি সম্পূর্ণ দূর করতে গিয়ে হয়তো আর্যরা ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং কোন-না-কোন-ভাবে তাঁরাও প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তাই ঋগ্বেদের পরবর্তী কালের কয়েকটি বেদে সর্পপুজোর উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে হয়তো আর্যরা এইসব পুজোর্চনায় বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু নিজেরা ক্রমে বিভাবিত হন এবং সর্পপুজোর আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিকে নিজের রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী স্বীকরণ করেন। বৌধায়ন গৃহ্যসূত্রে সর্পপুজোর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সর্পের সম্মানে সর্পবলি অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। অধিকাংশ সূত্রেই শ্রাবণ-পূর্ণিমার দিন এই অনুষ্ঠান পালনের নির্দেশ দেখতে পাই। সাপ যাতে কোনও এলাকায় প্রবেশ না করে তার জন্য সেই বিশেষ এলাকাটি তিনবার প্রদক্ষিণ করে জলধারা সহকারে মন্ত্র উচ্চারণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিষ্ণুর বিধানে গৃহস্থের অবশ্যকর্তব্য হিসেবে সর্পদানব তক্ষক ও উপতক্ষককে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে। আর্যরা যে এভাবে সর্পপুজো ও তৎসংক্রান্ত কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠানকে নিজেদের করে নিয়েছিলেন এর থেকেই তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পরিস্থিতি বদলাতে গিয়ে মানুষ নিজেও কিছুটা পরিবর্তিত হন। ভারতবর্ষের বিশেষ পরিস্থিতিতে আর্যরাও কিছুটা বদলে গিয়েছিলেন। পরবর্তী যুগে তাঁদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রভাব কার্যকরী হয়েছিল।

বাংলায় মনসার উদ্ভবের ইতিহাস বেশ জটিল। প্রচলিত লোকবিশ্বাস যে, মনসা শিবের কন্যা। শিবের সঙ্গে সাপের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ। নাগেশ্বরে শিবকে নাগরূপে পুজো করা হয়। গুজরাট ও কংকনে শিব-মন্দিরে সর্পমূর্তি রাখা হয়। শিবের সঙ্গে এই সর্পমূর্তিরও পুজো হয়। শিবের অলংকার হল সর্প। শিবের আয়ুধ সর্প নয়। এমন অনেক উদাহরণ আছে যার থেকে বোঝা যায়, শৈব সম্প্রদায় তাঁদের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সর্পপুজোকেও গ্রহণ করেছিলেন কিছু লোক আগে শিব ও সাপ উভয়কেই পুজো করতেন। এখনও ভারতের নানা অংশে এই পুজোর প্রচলন ব্যাপকভাবে দেখা যায়। শিবের মত বিষ্ণুর সঙ্গে সাপের সম্পর্ক খুব একটা ঘনিষ্ঠ নয়। বিষ্ণুর 'শেষ নারায়ণ' মূর্তি খুবই পরিচিত। এলোরায় একটি গুহামন্দিরে 'শেষ নারায়ণ' ভাস্কর্য দেখা যায়। বিশ্রামরত বিষ্ণু সাপের ওপর শুয়ে আছেন। তাঁর নাভি থেকে উৎপন্ন হয়েছে একটি পদ্ম। পদ্মাসীন চতুর্মুখ ব্রহ্মা। কৃষ্ণের কালীয়দমনের কথাও প্রসঙ্গত মনে পড়ে। মথুরার কালীমর্দন ঘাটে নাগলীলার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। অনুমান করা হয় মথুরা একসময় ছিল নাগপুজোর কেন্দ্র। কৃষ্ণের মাধ্যমে

আরও আদিম নাগ কাল্টকে বশীভূত করার কথাই নাকি সূচিত হয়েছে কালীয়দমনের ঘটনায়। কোশোল জেনক কাল্টের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের সম্পর্ক প্রসঙ্গে লিখেছেন, কৃষ্ণের বড় ভাই হিসেবে নাগকে পরিগ্রহণ করা হয়েছে। মথুরা থেকে ৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে বলদেব গ্রামে বলরামের মূর্তি হিসেবে নাগমূর্তি দেখা যায়। ওড়িশার কয়েকটি স্থানে বলদেবের পূজায় জেনক কাল্টের বহু উপাদান স্বীকরণ করা হয়েছে।

ভারতের জনপ্রিয় বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে নাগের অন্তরঙ্গ যোগাযোগ ছিল। ফার্গুসন মনে করেন, বুদ্ধের সময়ে মগধের রাজারা ছিলেন নাগ-সম্প্রদায়ভুক্ত। বৌদ্ধসাহিত্যে নাগের বহু উল্লেখ আছে। জাতক-কাহিনী থেকেও এর অনেক পরিচয় পাবো। বৌদ্ধ রচনায় দেখা যায়, বুদ্ধের জন্মের সময় দুই নাগ নন্দ ও উপনন্দ খুবই সাহায্য করেছিলেন। ধ্যানের সময় নাগরাজ মুচিলিন্দ বুদ্ধকে বৃষ্টি ও ঝড়ো বাতাসের হাত থেকে রক্ষা করে এক সপ্তাহের জন্য আশ্রয় দিয়েছিলেন। সাঁচি ও অমরাবতীতে এর ভাস্কর্য আছে। সাঁচির প্রায় এক শতক আগে নির্মিত ভারহুত স্তূপের রিলিফেও পাঁচটি ফণা সংবলিত নাগমূর্তি দেখা যায়।

গুপ্তযুগের শিল্পকলায় নাগমূর্তির শৈল্পিক রূপায়ণ বিশেষ আয়তন পেয়েছিল। অজন্তার বহু বিখ্যাত ফ্রেসকোয় নাগপ্রতিকৃতি দেখা যায়। বিশেষত দুই নম্বর গুহায় প্রচলিত প্রতিটি নাগমূর্তির অবস্থিতি। সর্পমূর্তি (Zoomorphic form), নারীমূর্তি (anthropomorphic form) ও ঊর্ধ্বাঙ্গ নারী এবং নিম্নাঙ্গ সর্পের আকারে বিশিষ্ট মূর্তি এখানে পরিলক্ষিত হয়। এই সর্বশেষ মূর্তিটি কোনারকের মন্দিরগাত্রের সাবলীল ভাস্কর্যেও ধরা পড়েছে।

কিন্তু উত্তর ও মধ্যভারতে প্রচলিত নাগপূজা কিংবা দক্ষিণ ভারতের সাধারণ সর্পপূজার সঙ্গে বাংলার লৌকিক মনসাপূজার পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। দাক্ষিণাত্যে সর্পপূজার আদিরূপ আজও অটুট। জীবন্ত সর্পপূজার পরবর্তী স্তরে আসে

পোড়ামাটির চিত্রিত শিবের মুখ, নবদ্বীপ

নাগরাজ বাসুকির সরীসৃপ মূর্তি। বৌদ্ধ মহাযানী জাঙ্গুলীই হচ্ছেন পরিবর্তিত রূপে বাঙালীর মা মনসা। মনসাপূজায় ভাবমূর্তি ছাড়া নাগমূর্তিও ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবহৃত হয়। নাগমূর্তি রূপে ঘটের প্রচলন। মনসাঘটের জন্য পূর্ব বাংলার বানারীপাড়া খুবই বিখ্যাত ছিল। বরিশালের পোড়ামাটির চিত্রিত মনসাঘটের সুন্দর কিছু নিদর্শন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ শিল্পসংগ্রহালয়ে দেখা যায়। এরকমই একটি ঈষৎ লম্বা আকারের ঘটে পদ্মাসীন মা মনসার দু পাশে দুটি শ্বেত পালকবিশিষ্ট হাঁস আঁকা হয়েছে। শোলার মা মনসা ও তাঁর সহচর-সহচরীদের সুন্দর মূর্তি আগে পূর্ব বাংলায় প্রভূত পরিমাণে প্রস্তুত হত। দেশবিভাগের পর পূর্ব বাংলার মনসাঘটের শিল্পীরা কেউ কেউ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গণ্ডগ্রামে এসে বাসা বেঁধেছেন। মনসাপূজার সময় কয়েকদিন ধরে যাদবপুর, বিজয়গড় ইত্যাদি এলাকায় চমৎকার সব মনসাঘট এখনও বিক্রি হয়। জলজঙ্গল পরিবেষ্টিত অজ পাড়াগ্রাম ছেড়ে শহর বা মহানগরের বাসিন্দা হলেও মানুষ কিন্তু এখনও পুরনো অভ্যাসবশত মনসাপূজাকে পরিত্যাগ করতে পারেনি।

পোড়ামাটির কাজের জন্য বিখ্যাত বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া গ্রামে বহুরকমের মনসার ঝাড় (ঝাদ) ও মেড় তৈরী হয়। ঢোকরারাও বেল মেটালে মনসার দৃষ্টি-সুখকর ঘট তৈরি করেন। - বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের পটুয়াদের বেহুলার পটের কথা প্রসঙ্গত স্মরণীয়। বেহুলা-লখীন্দরের অমর কাহিনী বীরভূমের পটুয়াদের পটেও স্থান পেয়েছে। তবে অন্যান্য পটের তুলনায় তা সংখ্যায় খুব কম। কৃষ্ণলীলা পটে অনিবার্যভাবে স্থান পেয়েছে কালীয়দমন।

মনসার বারি বা মনসাঘটের মধ্যে ঢাকা-বিক্রমপুরের নাগঘটের রূপকল্পনা বহু বিচিত্র। পঞ্চনাগ, অষ্টনাগ এমন কি বিয়াল্লিশ নাগের ঘটও দেখা যায়। ময়মনসিংহের নাগনাগিনীর মূর্তি সংবলিত কৈতরীঘট ও ঘটের উপর প্রান্তে মনসার মুখ বিশিষ্ট অষ্টনাগের ঘটও পূজার কাজে সমাদৃত হয়। ঘট বিভিন্ন প্রকার হলেও, মনসার পূজায় ব্যবহৃত হওয়াই এর উদ্দেশ্য। বস্তুত এক মনসাপূজাকে লক্ষ্য করে লোকশিল্পীর কল্পনা যে কতভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। মেয়েরা মনসাপূজায় যে আলপনা দেন সেগুলিরও শিল্পমূল্য অসাধারণ।

বৃক্ষপূজার কথা বাদ দিয়ে ঘট, মূর্তি ও জীবন্ত সর্পের পূজার কথা বলা না হলে মনসাপূজার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এখন নানা স্থানে বৃক্ষ-পূজার প্রচলনই সবচেয়ে বেশী। বৃক্ষকে সর্পাধিষ্ঠিত মনে করে সেই বৃক্ষে মনসার পূজা হয়। এই বৃক্ষ মনসা সিজ বৃক্ষ। সংস্কৃতে একে স্নুহীবৃক্ষ বলা হয়।
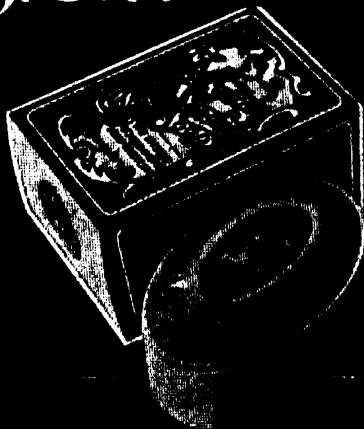
সিদ্ধাইদের [illegible] কিছু কোন প্রতিষেধক গুণ ও কিছু জিনিস বিষনাশের ক্ষমতা আছে। এই জন্যই এখনো [illegible] মনসাপুজোর [illegible] আছে।

বীরভূমে এই সিদ্ধাইদের পুজোর ব্যাপক প্রচলন। [illegible] ও কৌলিক নিয়মে কোনও কোনও বাড়িতে প্রথম পুজো শুরু হয় [illegible] দিন। একচালা, টিনেরচাল ও খড়ের [illegible] সিজ গাছ স্থাপন করা হয়। একচালে তিনটি বা পাঁচটি শাখা থাকে। শুদ্ধ পুরুষ দিনে বাড়ির গৃহিণী বা অভিভাবক শ্রেণীর কেউ নিরম্বু উপবাস থেকে খাওয়া দাওয়া করেন। যেমন, [illegible] ও [illegible]। কোনও বাড়িতে আবার একজন সমস্ত দিনে মাত্র একবার চিঁড়ে খেতে পান। কেউ আবার সারা দিনের উপবাস-শেষে সন্ধ্যায় ফলমূল খান, কোনও কোনও বাড়িতে দেখা যায় তেলহলুদ বর্জিত [illegible] ও নিরামিষ আহারের প্রচলন। পুজো শুরু হওয়ার পর [illegible] মনসাতলে প্রতি পঞ্চমীতে পুরোহিত দিয়ে পুজো হয়। শেষ হয় শ্রাবণের শেষ পঞ্চমীতে। পুজো করে মনসার বিসর্জন হয়। সিজ ডাল থেকে যায়। দুর্গাপুজার পর প্রথম বিসর্জনের দিন সিজ ডাল তুলে জলে বিসর্জন দেওয়া হয়।

অনেক গ্রামেই মনসার থান থাকে। সেখানে মেয়েরা মানত করে, ঘটে পুজো দেয়।

এই পুজো উপলক্ষে মনসামঙ্গল পালা গাওয়ার প্রচলন আছে। লোকসঙ্গীতে মনসার ভাসানী গানের বিশিষ্ট মর্যাদা। কয়েকটি পালায় বিস্তৃত মনসার মাহাত্ম্যসূচক সুদীর্ঘ গীতিকাহিনী শুনতে মানুষের উৎসাহের অন্ত থাকে না। আগে কয়েকটি পালা পর-পর কয়েকদিন ধরে চলত। বর্তমানে সময় সংক্ষেপ করা হয়েছে।

ডোকরা শিল্পে মনসাঘট

মনসাপুজোর বৈশিষ্ট্য হল, এই পুজো উপলক্ষে লোকসাহিত্য, লোকশিল্প ও লোকসঙ্গীতের সব কটি শাখাই সমানভাবে উপকৃত হয়েছে। পাল ও সেন আমলে বাংলায় মনসা ও নাগের বিভিন্ন কৌতূহলোদ্দীপক প্রস্তরমূর্তি নির্মিত হয়েছে। এই সময়ে বহু লৌকিক দেবদেবীও পৌরাণিক মর্যাদা পায়।

সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে প্রচলিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের একটি বিশ্বাসযোগ্য চিত্র নথিভুক্ত হয়েছে। দেবীর অলৌকিক ক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তির আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে সম্প্রতি পুরুলিয়ায় ছো নাচে। চাঁদ সদাগর ও মনসার ক্ষমতার লড়াই-এ শেষ পর্যন্ত দেখা গেল প্রবল পরাক্রান্তা দেবী চাঁদের কাছে পরাজিত হলেন। দেব-দেবীর অলৌকিক ক্ষমতার উপর এইভাবে আধিপত্য বিস্তার করলেন একজন ব্যক্তি। ঐশী ক্ষমতাকে চাঁদ তাঁর পুরুষকার দিয়ে জয় করলেন। এই ছবি কিন্তু প্রাচীন মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখা যায়নি।

এর কারণ হল মনসাকাব্যগুলিতে তন্ত্রের প্রভাব। যার ফলে কবিরা মনসাকে অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন রূপে চিত্রিত করেন। বাংলার অধিকাংশ লোককাহিনী (Folk tales)-এর জন্ম খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। এগুলিতেও তান্ত্রিক প্রভাব যথেষ্ট। বেদ, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম থেকে তন্ত্র তার বিশিষ্ট অভিধা সংগ্রহ করেছিল। মানিকচন্দ্র রাজার গানে ময়নামতী যে সাত দিন সাত রাত অক্ষত অবস্থায় আগুনের মধ্যে কাটিয়েছিলেন, তার মূলে তন্ত্রের ভাবধারা নিহিত। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারতেও বিভিন্ন চরিত্র অত্যাশ্চর্য যেসব কান্ড-কারখানা ঘটায় তার মূলেও তন্ত্রের প্রভাব আবিষ্কার করা যায়। কৃত্তিবাস ও কাশীরামের রচনায় এমন কিছু আখ্যান আছে, যা মূল রামায়ণ বা মহাভারতে নেই। এগুলি দুই বাঙালী কবির সংযোজন। স্পষ্টতই কবিরা প্রচলিত ও কালোত্তীর্ণ তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাবে সংযোজনকর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। বেহুলার নানা অত্যাশ্চর্য কান্ডকারখানার মধ্যে ইন্দ্রজাল ও তান্ত্রিক ম্যাজিকের প্রভাব লক্ষ করা যাবে। বেহুলা ও লখীন্দর এমন অলৌকিক সব ঘটনার মধ্যে নিজেদের

প্রাণ রক্ষা করেছেন, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

শুধু মনসাকাব্যগুলিতেই নয়, তন্ত্রের প্রভাব সর্পচিকিৎসার নানা মন্ত্রে ও তাকতুকের মধ্যেও বর্তমান। চাঁদসদাগর যে মনসার শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, তার কারণ তিনি শিবের কাছ থেকে অর্জন করেছিলেন। 'মহাজ্ঞান'। মহাজ্ঞানের কথা সর্পচিকিৎসার মন্ত্রেও পাওয়া যায়, যা ওঝারা সর্পদষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন, 'মন্ত্র অপেক্ষা মহৌষধ আর নাই।' আস্তসার মন্ত্রে আছে—

ধূল ফুল হেলার মাটি।
চৌদিকে তার চারি দোপাটী॥
এ কোণে রাম ও কোণে লক্ষ্মণ।
ভয়ে কাঁপে রাক্ষস রাবণ॥
কুজ্ঞান দুর্জ্ঞান আর মহাজ্ঞান।
ফুৎকারে সব করি খান খান॥
কার আজ্ঞা সিদ্ধিগুরুর পাও।
যথায় ইচ্ছা তথায় যাও॥

সাপের যে-কোনও মন্ত্র এবং বেদে ও ওঝাদের তুলসী পড়া, ভাটাই ঝাড়া, চুল বান্ধা, বিষনাশ থুৎকার প্রভৃতি কাজের মধ্যে কোন-না-কোনভাবে তন্ত্রের ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপের প্রভাব থাকতে পারে। মন্ত্রে ডাকিনীদেরও স্মরণ করা হয়। যেমনঃ

তুলসী তুলসী তুলসী পাতা।
তোমার কাছে কি সাপালতা॥
তোমরা রস লাগিলো ঘায়।
পুড়িয়ে সাপ অমনি পালায়॥
ডাকিনী সাপিনী আপা কাকিনী আর।
অমুকের অঙ্গের বিষ ছাড় শীঘ্র ছাড়॥
নাই বিষ বিষ নাই আর।
পালায় বিষ সাগরের পার॥
কিলি কিলি হিলি হিলি রাং রাং ঠঃ ঠঃ।
কার আজ্ঞা দোহাই মনসার আজ্ঞা॥

এইসব মন্ত্রে কখনও আবার চণ্ডীর দোহাই দেওয়া
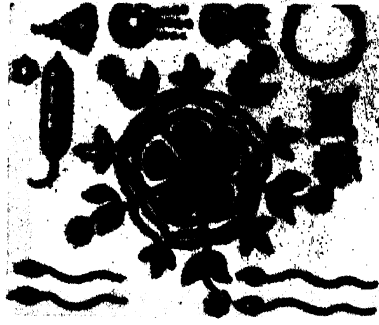
মনসাপুজার আলপনা

হয়। বিষনাশ খোলা পড়া মন্ত্রে দেখা যায়—

খোলা খোলা সাত খোলা।
তুমি মা চণ্ডীর পোলা॥
আইতে কাটুম যাইতে কাটুম।
অমুকের অঙ্গের বিষ বিনাশ করম॥
বাত খাই সাগর ছেঁচি বিষ নাই আর।
লাগ লাগ আজ্ঞা লাগ চণ্ডিকার॥

ঝাপান উৎসবে ওঝা ও সাপুড়ে ও বেদেরা এক জায়গায় মিলিত হয়ে নানারকম কলাকৌশল প্রদর্শন করেন। পশ্চিমবঙ্গের কবি বিপ্রদাস ও কেতকাদাসের রচনায় এর উল্লেখ আছে। বস্তুত ওঝা, বেদে ও সাপুড়েদের জীবনধারা, মন্ত্র ও নানাবিধ কলাকৌশলের পূর্ণাঙ্গ নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষার প্রয়োজন। ওঝারা প্রথমে দেখেন কোন্ সাপ পুরুষজাতীয়, কোন্ সাপ স্ত্রীজাতীয় এবং কোনটি বা নপুংসক; কোন সাপের বিষ কিরকম তাঁরা নিজস্ব উপায়ে ও গুরুপ্রদত্ত শিক্ষাবলে নির্ধারণ করেন। কোন্ সাপের দংশনে কেমন চিহ্ন প্রকাশ পায় তাও তাঁদের শিক্ষার বিষয়। তাঁরা বলেন, সর্পজাতি আশি প্রকার। শ্রীযুক্ত দীনদয়াল গোস্বামী তাঁর পুস্তিকায় সর্পের জাতিভেদকথন অধ্যায়ে লিখেছেন—"সর্প চারি জাতীয় অর্থাৎ কতকগুলি ব্রাহ্মণ, কতকগুলি ক্ষত্রিয়, কতকগুলি বৈশ্য ও কতকগুলি শূদ্র জাতীয়। যে-সমস্ত সর্পের দেহ সদ্‌গন্ধে পূর্ণ এবং যাহাদিগের দেহের কান্তি স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল, তাহারা, বিপ্রজাতীয়। যে সমস্ত সর্প হঠাৎ ক্রোধপরায়ণ হয় এবং যাহাদিগের দেহ চাকচিক্যশালী, তাহারা ক্ষত্রিয়। যাহাদিগের দেহে সূর্য, চন্দ্র, ছত্র ও পদ্ম চিহ্ন দৃষ্ট হয়, যাহাদিগের দেহ কৃষ্ণ, রক্ত, ধূম্র কিংবা কপোতের বর্ণের ন্যায় এবং যাহাদিগের দেহ বজ্রের ন্যায় কঠিন, তাহারা বৈশ্য বলিয়া অভিহিত। যে সমস্ত ভুজঙ্গের দেহ মহিষ অথবা হস্তির বর্ণের ন্যায়, যাহাদিগের গাত্রচর্ম কর্কশ, সেই সকল সর্পকে শূদ্র জাতীয় জানিতে হইবে।" আধুনিক জীববিজ্ঞানে সাপকে নিশ্চয় এভাবে জাতিবিচার করে দেখা হয় না। কিন্তু প্রচলিত মতবাদ ও সংকলিত ধারণার কথা উৎসাহী গবেষকদের কৌতূহলী করে তুলতে পারে ভেবে এখানে তা ব্যক্ত করলাম। সত্য কিছু থাক বা না থাক, প্রচলিত ধারণা ও মন্ত্রগুলি যে বেশ অদ্ভুত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অধ্যাপক এ এল বেশাম বাংলার দেবী মনসার কাহিনীতে সার্‌রিয়ালিজমের বিচিত্র নানা উপাদান খুঁজে পেয়েছেন।

আমরা যতই আধুনিক হই না কেন, গৃহাশ্রিত বিষধর সাপকে বাস্তুসাপ হিসেবে শ্রদ্ধা করতে এখনও আমাদের সংস্কারে বাধে না। এই সংস্কার ও বিশ্বাস যতদিন থাকবে ততদিন আমাদের মেয়েরা কেউ-না-কেউ মনসাব্রত পালন করবেন, ভাদ্র সংক্রান্তিতে কোথাও-না-কোথাও অনুষ্ঠিত হবে অরন্ধন, জাগরণ গান, ভাসান যাত্রা ও রয়ানী গানের অনুষ্ঠানে আমরা মুগ্ধ হব, পূর্ব বাংলায় দেখব মনসার ভাসানে নদীর বুকে অপরূপ নৌকাবাইচ, মেদিনীপুর বা চব্বিশ পরগনায় বারোয়ারী মনসাপুজোয় হবে পুতুলনাচ, অনাথ পটুয়ারা গাইবেন গান আর চোখের সামনে মেলে ধরবেন অপরূপ বর্ণসুষমাময় পট। এবং ততদিন মা মনসার পুজোর উন্মাদনাও এতটুকু কমবে না।

আধুনিক সাহিত্যের সেরা সম্ভার

প্রেম নেই

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ ২৫ ॥

হঠাৎ ঝড় উঠল। প্রচণ্ড ঝড়। একটা বুড়ো-সুপারিগাছের মাথা কে যেন মড়াত করে মুচড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল। মোছফেকা আর নয়মোন বাড়িতে ঢোকা মাত্র ঝড়ের ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলেন, রান্নাঘরের খুঁটি ধরে সামলে নিলেন। কী প্রচণ্ড গোঁ গোঁ শব্দ। কিছু শোনা যায় না।

নয়মোন বললেন, "শিগগির কত্তাবিবির ঘরে যা।"

মড়মড় করে কোথায় যেন ডাল ভেঙে পড়ল। তার শব্দে নয়মোন বিবির কথা চাপা পড়ে গেল। গোঁ গোঁ শোঁ শোঁ। পাগলা ঝড়টা যেন হাজী-বাড়ির অন্দরের উঠোনে আচমকা ঢুকে পড়েছিল, এখন বেরিয়ে যাবার পথ পাচ্ছে না। গোঁ গোঁ শব্দে কেবলই এদিকে ওদিকে গুঁতো মারছে।

"কী?" মোছফেকা চিৎকার করে বলল, "কী কলে বউবিবি?"

পাগলা মোষটা যেন বেরিয়ে যাবার জন্য বাড়িময় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। মড়াত। ডাল ভাঙল। দড়াম করে কত্তাবিবির ঘরের দরজা হাট হয়ে খুলে গেল। দড়াম করে হাজী ছাহেবের ঘরের খোলা জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল।

নয়মোন খুঁটি ছাড়তে ভরসা পাচ্ছেন না, হাওয়ার জোর এমনই।

বেশ চেঁচিয়েই বললেন, "কত্তাবিবির দরজা বন্ধ করে আয়।"

মোছফেকা খুঁটি ছেড়ে এগুতে যাবে, প্রচণ্ড দমকায় আঁচল খুলে গিয়ে তাকে বিপর্যস্ত করে তুলল। কাপড় সামলাতে যেই খুঁটিটা ছেড়েছে অমনি মোছফেকা ঝড়ের ধাক্কায় উঠোনে গিয়ে পড়ল। তার ভয়ার্ত চিৎকার বাতাসে ফালা ফালা হয়ে উড়ে গেল। নয়মোন গাছকোমর এঁটে উঠোনে নেমে মোছ-ফেকাকে ধরে তুললেন। তারপর দুজনে কোনো-ক্রমে কত্তাবিবির ঘরে গিয়ে উঠলেন।

নয়মোন বললেন, "তুই এই ঘরডা দ্যাখ, আমি আমাগের ঘরডা বন্ধ করিগে।" কত্তাবিবি উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "হাঁব? হাঁব আইছে তো? ও বউবিবি। ও মোছফেকা।"

মোছফেকা বলল, "আইছেন। অনেকক্ষণ আইছেন। মিঞাবিবি ঘরেই আছেন। ভয় নেই।" [illegible] [illegible]। [illegible] মিয়াজান ঘরে ঢুকলেন।

এ ঘর থেকে ও ঘর। কিন্তু এইটুকু যেতেই নয়মোন বিবি নাস্তানাবুদ হতে লাগলেন। এক দমকায় ওদের ঢেঁকশালের চালা উড়ে গেল। আমরুল গাছের একটা ভাঙা ডাল ওর কানের পাশ দিয়ে উড়ে এসে উঠোনে ধড়াস করে পড়ল। নয়মোনও বাতাসের ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে বারান্দায় পড়লেন। ওঁর হাঁটুতে চোট লাগল। চোখে কালো কালো ফুটকি ভাসতে লাগল। হাত দিয়ে পতনের ভার খানিকটা ঠ্যাকালেন। তারপর ঘরে ঢুকে গেলেন। প্রথমে তীব্র তীক্ষ্ন বিদ্যুতের ঝোখল। তারপর কড়কড় করে বাজের আওয়াজ। কত্তাবিবি বাজ পড়ার দোওয়া পড়তে লাগলেন, বিদ্যুৎ আল্লাহ্ পাকের প্রশংসায় তছবীহ্ পড়ে এবং ফেরেশতারা সব আল্লাহর ভয়ে তাঁর মহিমা কীর্তন করে।

হাজী ছাহেবের কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে না, তবু তিনি দহলিজ থেকে সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছেন।

"নফরা, এই নফরা! গোরুগুলোন ঠিক আছে কিনা দ্যাখ। নফরা, এই নফরা! সাড়া দিসনে ক্যান? বলি অন্দরে সব ঠিকঠাক আছে তো?"

সারা বাড়িতে যখন এত হুলুস্থুল, তখন বিলকিসের ঘরটাই সব থেকে নিঃসাড়। কী হয়েছে, কী ঘটেছে, কোনও বোধ নেই তার। যেন চেতনাও তেমন নেই। সে নিদ্রিত না মূর্চ্ছিত না সম্মোহিত বোঝার উপায় নেই। বিপর্যস্ত দেহটা শিথিল, এলিয়ে পড়ে আছে বিছানায়। উপুড় হয়ে। চুল এলোমেলো। একটা দুরন্ত ঘূর্ণী ঝড় যেন তার দেহ তার মন তার শাড়ি জামার উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে সব তচনচ করে দিয়ে গেছে। তার শরীরের সব জোড় খুলে দিয়ে গিয়েছে। সে আর কখনোই উঠে আসতে পারবে না, উঠে দাঁড়াতে পারবে না রমণীয় অবসাদের এই অতলস্পর্শ কুণ্ড থেকে। সে এখনও ভেসে চলেছে প্রচণ্ড প্লাবনে ভেসে যাওয়া অসহায় একখানা ঘরের মত। প্লাবন না ঘূর্ণী ঝড়? কিসের মুখে পড়েছিল বিলকিস?

ফটিক চিত হয়ে শুয়ে চালের দিকে তাকিয়ে ছিল। ঝড় উঠেছে বাইরে। তার ক্রুদ্ধ আওয়াজ টিনের চালে আছড়ে পড়ছে। শব্দটা কানে যাচ্ছে। কিন্তু তার শরীরে তার মনে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। একটা অনির্বচনীয় তৃপ্তি একটা অচেনা সুখস্বাদ তাকে তার পরিপার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে যেন শোক তাপ জরা দিয়ে ঘেরা ভূমণ্ডলের বাইরে কামনা বাসনাহীন নিরুদ্বেগ কোন লোকে ঠাঁই করে দিয়েছে। তার আর ফেরার ইচ্ছে নেই। ঝড়ের ঝাপটায় ঘরটা দুলছে। ঘর নয়, তার অতীত। ফটিকের বোধও কেমন যেন তীক্ষ্নতা হারিয়েছে। ঝড়ের শব্দ ক্রমশ তাকে অবসন্ন করে আনছে। তার শরীর ঝিমিয়ে আসছে। নেশা-গ্রস্তের মত কেমন বুঁদ হয়ে আছে সে।

সে যেন ঢেউ-এর দোলায় দোল খাচ্ছে। বিলকিস যেন ঘুমের দোলায় শুয়ে একবার উপরে উঠছে, একবার অতলে নামছে। অতি ধীরে বেশ ঢিমে তালে শ্বাস বইছে তার। কী যেন একটা ঘটেছে তার। বার বার সে উঠতে চেষ্টা করছে। পারছে না। কোথায় যেন বেশ ঝড় হচ্ছে। খুব দূরে। তার আওয়াজ পাচ্ছে বিলকিস। এখন রাত না দিন? চোখ মেলতে ইচ্ছে করছে না। সে এইভাবে থাকতে চাইছে। জাগবে না। উঠবে না।

কী একটা কাজ করতে হবে ফটিকের। কী একটা জরুরি কাজ তার বাকি ছিল? কাজটা কী? কিছুতেই মনে করতে পারছে না। তার চিন্তা যেন শরতের মেঘের মত ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। কোনও কেন্দ্রবিন্দুকে আশ্রয় করে জমাট হয়ে উঠতে পারছে না। সে যদিও জাগ্রত তবু যেন মনে হয় তার ইন্দ্রিয়সকল আপাতত বিশ্রামে রত। বুকের উপর থেকে তার শিথিল হাত দুখানা দুপাশে গড়িয়ে পড়ল। একটা হাত রেশমের স্তূপে। বিদ্যুৎ খেলে গেল ফটিকের শরীরে। মুহূর্তে তার ঝিমুনির ভাব কেটে গেল। সে ঈষৎ পাশ ফিরে দেখল আলুথালু বিলকিস। একেবারে তার হাতের নাগালে। এবার ফটিকের মনে পড়ল, শুধু বাইরেই নয়, কিছুক্ষণ আগে এই ঘরের ভিতরেও প্রবলতর একটা ঝড় বয়ে গিয়েছে। সমূল উপড়ে পড়া দুটি অস্তিত্ব এই যে ভেঙে চুরমার হয়ে পড়ে আছে এই খাটে। বিলকিস। তার বিবি। না স্বপ্নে দেখা নয় একেবারে রক্তে মাংসে গড়া। কী মোলায়েম! দেখলে মনে হয় কত ঠুনকো। হাত দিলেই বুঝি জখম হবে। হয়ত বা ভেঙেও যেতে পারে। ফটিক দেখতে লাগল। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে তার বিবি। একরাশ চুল তার পিঠে মুখে বালিশে ছড়ানো। বেশবাস অসম্বৃত। আঁচলটা বুক থেকে সরে গিয়েছে। শাড়িটা হাঁটুর উপর উঠে এসেছে। চুলের ফাঁকে সুন্দর দুটো ঠোঁট পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে। যেন যুঁই ফুলের পাপড়ি। আর সে-কিনা এর মর্যাদা রক্ষা করেনি! ক্ষুধার্ত দস্যুর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মায়া মমতা কিছুই জাগেনি তার মনে। শুধু এক হিংস্র পিপাসা। তাই শুধু লুণ্ঠনই করে গিয়েছে নির্বিচারে। তার তিরিশ বছরের সংযমের বাঁধ এইটুকু একটা মেয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল।

এও তো বড় আশ্চর্য। সে বিস্মিতভাবে আল্লাহর এই আজব সৃষ্টিকে দেখতে লাগল।

ফটিকের মনে মমতা বিস্ময় এবং সম্ভ্রম এই তিনই জেগে উঠল। সে খুব আলতোভাবে তার বিবির চুলে হাত দিল। ধীরে ধীরে তার রক্তস্রোত দ্রুত গতি পেতে লাগল। সে আস্তে করে তার হাতখানা বিলকিসের পিঠে রাখল। বিলকিস শিউরে উঠল। ওর ঠোঁটে আলতো চুমু এঁকে দেবার একটা প্রবল ইচ্ছা জেগে উঠল।

ফটিকের হাতখানা গায়ে ঠেকতেই বিলকিসের শরীরটা মুহূর্তে শক্ত হয়ে উঠে আবার এলিয়ে পড়ল। আবার তার শরীরের রক্তে তোলপাড় শুরু হল। না, সে এবার সাবধান হবে। বিলকিসের ঘুম ঘুম ভাব একেবারে ছুটে গেল। ব্যাপারটা এইভাবে ঘটে যাবে তা আদৌ বুঝতে পারেনি সে। তাই সে সতর্ক হবার সময় পায়নি। তার চাইতেও লজ্জার কথা, এখন তার মনে হচ্ছে, তার গোলাপফুলের কথামত যেখানে যেখানে তার আপত্তি করা উচিত, না না বলা উচিত, সেসব জায়গায় সে কিছুই করেনি। প্রবল জোয়ারে সে অসহায় তৃণের মত ভেসে গিয়েছে। খুবই বেশরম বেহায়ার কাজ হয়েছে। এমন কি মোজামেয়াতের তরতীবও পালন করা হয়নি। বিলকিস মরমে মরে গেল। এবং বদদোয়ার ভয় পেল। সে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকল। কিন্তু লোকটার ছনবনে হাতে কী জাদু আছে? কেন আমাকে এত অস্থির করে ছাড়ছে? বিলকিস দাঁতে দাঁত চিপে পড়ে রইল। কিন্তু ওর বুকের স্পন্দন ক্রমশ এত দ্রুত হয়ে উঠল যে ওর সমগ্র শরীরটা তার তালে তালে ওঠা নামা করতে লাগল। লোকটার হাত এখন আর কোনো কিছুই বাধা মানছে না। যেখানে সেখানে হানা মারছে। ওর উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলছে। আমারে ছাড়ে দ্যান, ছাড়ে দ্যান। দোহাই আপনার। কিন্তু তার মনের প্রার্থনা কিছুতেই সে মুখে ফোটাতে পারল না।

ঝড় কমে ততক্ষণে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। টিনের চালে প্রথমে ঠপ ঠপ তারপর ক্রমাগত চড়বড় শব্দ হতে থাকায় বিলকিস বুঝল শিল পড়ছে। তবে ঠিক যে কোথায়, টিনের চালে না তার বুকের ভিতরে, সে ঠাহর করতে পারল না।

হঠাৎ বিলকিসের মনে হল এখন সন্ধ্যা রাত্তির আর ওরা কিনা দরজা দিয়ে শুয়ে রয়েছে। মোছ-ফেকার মুখখানা, তার বাঁকা হাসি বিলকিসের চোখে ভেসে উঠল। তার বেজায় লজ্জা এসে গেল। শুধু কি তাই?

"তখন মিঞা বিবি অজু করিয়া কোনও পরিষ্কার স্থানে থাকিয়া একখানা চাদর দ্বারা ঢাকনি লইয়া মোজামেয়াতের দোওয়া পাঠ করতঃ ছাত্র-

ঘরনে কার্য সমাধা করিবে। কারণ শরীর না ঢাকিলে উক্ত সময় ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে বেপর্দা বলিয়া বদ দোওয়া করেন।" মুখস্থ করে রেখেছে বিলকিস। কিন্তু কোনোই কাজে এল না। এখন তার ফেরেশতার ভয় ঢুকল। সে ধড়মড় করে উঠে পড়ল। ফটিক হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে টেনে নিল।

এবার বিলকিস কাঁদো কাঁদো হয়ে মিনতি করল, "আর না, আর না। দোহাই আপনার, অ্যাখন মন্যো, অ্যাখন মন্দে, অ্যাখন আমারে ছাড়ে দ্যান।'

ফটিকের সঙ্গে বিলকিসের এই প্রথম কথা। তার আর্ত কণ্ঠ ফটিকের গালে যেন জোর করে একটা চড় মারল। লজ্জা পেয়ে ফটিক আলগা দিতেই বিলকিস দ্রুতগতিতে তার নাগালের বাইরে চলে গেল। তারপর দরজার খিল সন্তর্পণে খুলে বাইরে। তখনও বৃষ্টি পড়ছে।

ছবি ভিজতে ভিজতে হাঁফাতে হাঁফাতে একেবারে দাদীর ঘরে চলে গেল। তারপর দাদীর কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে শুয়ে পড়ল। কত্তাবিবি তসবিহ্ সরিয়ে রেখে ছবির মাথায় হাত দিয়েই একটা দোওয়া পড়লেন। তারপর বলে উঠলেন, ও মণি, মিঞারে চা'খে দ্যাখা যান্ হয়ে গেছে মনে লাগতিছে।"

ছবি মুখখানা দাদীর কোলে আরও জোরে গুঁজে দিল।

দাদী আদর করে ছবির সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দোওয়া পড়তে লাগলেন। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই গুণগান করিতেছি। তোমার নাম মঙ্গলপ্রদ তোমারই গৌরব সবচেয়ে মহান। তুমি ছাড়া উপাস্য নাই।

দাদী এবার ছবির কাছে মুখ নামিয়ে এনে বললেন, "মণি রে, অ্যাকটা কথা কই। খছম মিঞাগের খিয়ালের আর শেষ পাওয়া যায় না। এক মাত্তর যদি মনে মনে মিল হয়ে যায় তখনই তেজী ঘুড়া বশে আসে। বুঝলে? হ্যাঁ, ইবার অ্যাকটা কাম করো। ভিজেই যখন গেছো তখন যাও আর ভিজে কাপড়ে বুড়ীর ঘরে বসে বসে সুমায় নষ্ট করো না। চুলডারে আবার বাঁধো। ছাফ ছুতরো হয়ে ন্যাও। তারপর যাও মিঞার কাছে বসে বসে দুটো খুশিখুশালির কথা কও গে।"

এতক্ষণ পরে বিলকিসের কেমন যেন ভালো লাগতে আরম্ভ করল। অদ্ভুত এক আনন্দের জোয়ারে অন্তর ছাপিয়ে যেতে লাগল। মোছফেকা ফটিকদের বাড়ি থেকে বোয়াল মাছের বিরাট একটা টুকরো এনে কত্তাবিবিকে দেখাল।

বলল, "ইবার আনজাদ করলেন তো কত বড় ছিল মাছটা।" তারপর বিলকিস্কে সেই ঘরে দেখে বলল, "দরজা যে অ্যাত তাড়াতাড়ি খু'লল?"

বিলকিস সে কথা এবার আদৌ গায়ে মাখল না। বলল, "বিষ্টি কমে গেল তাই।"

মোছফেকা বলল, "কিন্তু দরজাখান ম্যান্ বিষ্টির আগেই বন্ধ হইছিল।"

বিলকিস বলল "তখন যে ঝড় হতিছিল।"

মোছফেকা বলল, "আমার তো মনে হ'লো ঝড়ের আগেই দরজায় খিল পড়িছে। তখন ছিল কী?"

বিলকিস বলল, "তখন ছিল তুমার মাথা।"

বলেই হেসে ফেলল। তারপর নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

মোছফেকা বলল, "ছবি এক ব্যালায় মাথাই মানুষ হয়ে গেল।"

কত্তাবিবি বললেন, "আল্লাহ্ ওগেরে ভালো করুন। শান্তিতি রাখুন।"

বিলকিস্কে আদর করার জন্য ফটিকের বাসনা যখন তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করল, বিলকিস তক্ষুণি নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। একটা আতৃপ্তি ফটিকের মনে কটু স্বাদ এনে দিল। বিলকিসকে যে [illegible] কাছে তো পেয়েছিল। কেন তবে ছেড়ে দিল? আসলে এটা বোঝা গেল বিলকিস তাকে ভয় পাচ্ছে। সে মনের দুঃখে যে ব্যবহারটা করেছে তার বিবির সঙ্গে, তাতে নিজের উপর লজ্জিত হ'ল ফটিক। নানা চিন্তার ভাবনায় মন তার উদ্‌ভ্রান্ত ছিল। সেই কারণেই সে নিজেকে সংযত রাখতে পারে নি। কাম রিপু তাকে সম্পূর্ণত গ্রাস করে ফেলেছিল। সে বোধ হয় মাতাল হয়ে উঠেছিল। কিংবা পাগল। কেন না, কী সে করেছে, এখন কিছুই বিশেষ মনে নেই। শুধু যা মনে আছে তা এই, শুধুমাত্র তার বিবি বলে, একটি বালিকাকে, তার সম্মতি অসম্মতির তোয়াক্কা না করে, জবরদস্তি ভোগ করেছে। ছিঃ! এ কী কোনও শিক্ষিত লোকের কাজ! তাহলে তার সঙ্গে আর কলকাতার আন্টুনি বাগান মেসের ইদ্রিস মিঞা, সেই খাজা লোকটার তফাত কোথায়?

বিবিদের সে কীভাবে বশ করেছে ইদ্রিস মাঝে মাঝে সবিস্তারে তাদের শোনাতো। আরে মাতারিগো কথা ছাড়ান দ্যান মিঞা। আল্লা মিঞায় অগো পয়দাই করচেন আমাগোর ছিনার থিক্যা ত্যাড়া হাড় খুইলা নিয়া। বুঝছেন নি। অগোর তাই ত্যাড়া বুঝ। আপনে সোজা বুঝ দিয়া অগো নাগাল পাইবেন ক্যামনে। এই আমার মাইঝলা বিবি, আমি আবার তারে একটুক বেশী ইচ্ছা করি, তা হেই মাতারি পরথম পরথম আমরে কি কম হয়রান করছে। নিকা পইড়া ঘরে আনছি, চুরি কইরা আনি নাই, লুঠ কইরা আনি নাই। হালায় আমারে পাশে ঘেষতে দিবো না। হালায় তখন আমি সোমথ যোবতী, আর আমার মাইঝলা বিবি, তার কথা মিঞা ওক্ আপনেরে আর কী কমু? কী দ্যাখতে, কী শরীল, কী তার গমক ঠমক, কাছ দিয়া হাইটা গ্যালে মনে হয় ম্যান নারানগঞ্জের মেলের ইসটিমার হালায় আমার বুকের ভিতরের খুনে তুফান তুইলা বারাইয়া গ্যালো গিয়া। আর আমি য্যান তার ধাক্কায় পানির মাঝে গিইয়া গিয়া হাবুডুবু খাইতে লাগছি। কত ভালো কথা কইছি, কত মিঠা কথা কইছি, হিন্দি পিক্‌চার দেইখা অশোককুমার দেবিকারানীকে লীলা চিট্‌নিসরে যা যা মহাব্বতের কথা কইছে হেই গুলান বেবাক কইয়া দিছি বিবিরে কিছু আর বাকি রাখি নাই বুঝছেন। হালায় আমার মাইঝলা বিবি পিকচারের মাতারি হইলে কবেই কাইত হইয়া পড়ত। অশোককুমারের পিকচার দ্যাখছেন নি? মার বনকা পন্‌ছি বনমে বন বন বলু রে, হায় হায়! অ্যাকবার হুনলেই দেলে গাইথা যায়। কী কইলেন? দ্যাখেন নাই! অশোককুমাররে দ্যাখেন নাই! দেবিকা-রানীরে দ্যা—খেন নাই! লীলা চিটনিসরে দ্যা-খে-নই না-ই! ইদ্রিস মিঞা এমন বিস্ময়ভরা চোখে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে ফটিকের দিকে চেয়েছিল যেন ফটিক মানুষই নয়, একটা ভয় পেয়ে গোরু বা কোনও জলজ্যান্ত জলজন্তু হঠাৎ উঠে এসে ইদ্রিসের সঙ্গে মানুষের ভাষায় কথা বলতে লেগেছে। তারপর অত্যন্ত হতাশ কণ্ঠে বলে উঠেছিল, দূর মিঞা আপনের লগে রসের কথা কইয়া একটুও সুখ নাই। খালি সময় নষ্ট। আরে ওই বরকাইতা বইস্যা আছস্ ক্যান্? সিগরেট আনবার লাগব না। বিরান ব্যালাতেই এই নাদান মিঞা মুখটারে অ্যাক্করে খাট্টা কইরা দিছে। তারপর সিগারেটে গোটা কতক লম্বা টান দিয়ে অত্যন্ত করুণা-ভরে ইদ্রিস ফটিককে বলতে লাগল, শাদী যখন করচেনই মিঞা আ্যাকদিন না অ্যাকদিন বিবিরে তো ফেইস্ করতে লাগব। হের লাইগাই কইতাছি, মাতারি ক্যামুন চিজ্ আগে থাইকা জাইনা লন। নইলে ঐ নরম সরম মুখ ডোলা ডোলা চউখ ফোলা ফোলা বুক মুচকি মোহন হাসি আর ঢং ঢং দেইখ্যা যদি কাইত হইয়া পড়েন তো আপনের জিন্দগী বরবাদ। কান্দাইয়া ছাড়ব। কচুর ফুল দ্যাখছে নি? কী খুব সুরত। কী তার বাসের ত্যাজ। ঐ রূপ দেইখ্যা, ঐ গন্ধ হুঁইকা যে পোকডা কচুর ফুলে ঝাঁপ দিয়া পড়ছে মিঞা, তার জিন্দগী খতম। ব্যাবাক মাতারি ঐ কচুর ফুল। বুঝচেন। উপরে উপরে কত যান বাহারো ভিতরে ভিতরে অ্যাক্কেরে বিচ্ছু। আপনে আবার যে রকম নাদান উল্টা সিলাই না সুজা সিলাই হেইডাই বোঝবার পারেন নি, হেইডেই তো আমার সন্দ যায় না। সত্য

তোমাদের মনের মতো রঙীন পূজাবার্ষিকী

বিশেষ আকর্ষণ

শিল্পাচার্য নন্দলালের 'হেলা ফেলার কাজ'
'রবীন্দ্রনাথের এক কবিতার দুই রূপ'

ভ্রমণ কাহিনী

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কবিতা

অন্নদাশঙ্কর রায়, অজিত দত্ত ও আরও অনেকে

কীভাবে আবৃত্তি করতে হয়—লিখেছেন
দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পরীক্ষার্থীদের জন্য

'কী করে নম্বর বাড়াতে হয়'
'পর্ষৎ কী রকম উত্তর চায়'

ওয়ালট ডিজনির পুরো একটি
'ছবিতে উপন্যাস'

আর একটি কমিকস : 'নলেদার কাণ্ডকারখানা'

খেলার কথা

অমল দত্ত আর পি কে লিখেছেন
'কী ভাবে কোচিং করি'

এছাড়া আরও লেখা, ধাঁধা, ছবি ও
অনেক অনেক মজা

উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শৈলেন ঘোষ
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
শেখর বসু

এবং

সত্যজিৎ রায়ের

রচনা

বড় গল্প

বিমল মিত্র / শংকর

গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র / সুবোধ ঘোষ / লীলা মজুমদার
মনোজ বসু / সমরেশ বসু / বিমল কর
গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় / বুদ্ধদেব গুহ
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও আরও অনেকে

সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হচ্ছে

১২.০০/রেজিস্ট্রি ডাকে ১৪.২০

তোমাদের কপির জন্যে আজই এজেন্টকে বলে রাখো বা
আমাদের লেখো :
সার্কুলেশন ম্যানেজার, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড
কলকাতা-৭০০ ০০১

AAM/CAS-11/77 BEN

বলতে কি, সবাই যখন ইদ্রিসের এই মন্তব্য শুনে হো হো করে হেসে উঠল, ফটিক এর কোনও মানে বুঝতে পারল না। বলল, আমি কিন্তু কিছু বুঝতে পারলাম না। ইদ্রিস বলল, কাথা খান গায়ে না দিলে ক্যামনে বোঝবেন? হালায় কাথা আগে গায়ে উঠুক তখন স্যান্ উল্টা সিধা বোঝবেন? কি কইস্, বরকইতা? এ রসের কাথা মিঞা, রসিক ছাড়া হের উল্টা সিধা বোঝা মুশকিল। এ কাথা ত্যামুন ত্যামুন লোক পাইলে আপনে আপনেই হামাগুড়ি দিয়া গায়ে ওঠে। বুঝছেন নি। খোদা আমাগো পাঞ্জরার থিক্যা অ্যাকটা ত্যাড়া হাড় বার কইরা এই সব কাথা পয়দা করছেন। তাই অগো উল্টা সিধা চট্ কইরা বোঝা যায় না। কোন্টা অগো হাঁ আর কোন্টা অগো না, কিছুই আন্দাজ হয় না। আমার মাইঝ্লা বিবি, এই মনে লয়, এই বুঝি ধরা দিতে রাজী কিন্তু হাত বাড়াইতে যাও অমনি ফোঁস কইরা উঠে। এই রকম টালিবালি অ্যাকদিন দ্যাখলাম, দুইদিন দ্যাখলাম, ব্যস্ মনে মনে কই আর না। এবার কড়া দাওয়াই দিবার লাগব। এ ঘি সোজা আঙুলে উঠব না। সেইদিন রাইতে বিবি আইসা যেই ঘরে ঢুকছে আর আমি গিয়া তারে কাছে নিয়া বসাইছি। আস্তে আস্তে এক ডোজ দুই ডোজ সোহাগের ফোটা ঢালতা আছি আর চ্যাততে আছি আর ভাবতে আছি পাখি বোধ হয় কাঠির আঠায় আটকাইছে। আস্তে ধীরে আউগাইয়া আউগাইয়া যেই না বদর বদর কইলা মোকাম বরাবর রওয়ানা দিছি অমনি বিচ্ছুটা উলটাইয়া পালটাইয়া কোমর মাইরা আমারে নাস্তানাবুদ কইরা দিল। হা মিঞা! খোদা কছম। একটুকও মিছা কথা কইতাছি না। মাতারি গো কোনটা একরার আর কোনটাই বা এন্কার কিছুই বোঝন যায় না। আমি হালায় পরথমে তো অ্যাক্কেরে বেকুব বইনা গ্যালাম। তত্খনে দেখি বিবি বিছনার থনে নাইমা পইড়তাছে। তখন আর আমি আমাতে নাই। চউক্ষের নিমিষে অ্যাকটা গইড় দিয়া বিছনার বাজুতে আইসা হাতের ব্যাড় দিয়া হালায় বিচ্ছুটার কোমর সাপটাইয়া ধরছি। এইবার ভাগ দেখি, কেমুন ভাগনেওয়ালা মাতারি তুমি আইজ দেইখ্যা নিমু। কিন্তুক তারে তো আর বিছনায় উঠাইবার পারি না। খালি না না না, খালি না না না, আবার পায় ধরতে চায়, আবার ফোঁত ফোঁত কান্দেও, আবার কয় মইরা যামু, মইরা যামু, কত রকম বাহানা। অনেক সহ্য করছি আর না। আজ তল দেইখ্যা তবে ছাড়ুম। এই ভ্যাইব্যা শ্যাষে আমিও নাইমা গ্যালাম গিয়া। তারপর কেঁইচি মাইরা বিবিরে বিছানার উপরে দড়াম কইরা ফালাইয়া বুকের চাপ দিয়া ঠাইসা ধরলাম। তারপর সমানে বিবির প্যাটে আর বুকে দুই চার বার অ্যাইসা ঠাপ দিলাম যে বিবির কইলজার থনে সব হাওয়া বাইর হইয়া গেল। মাতারির ফাইজলামি ঐখানেই শ্যাষ। তারপর যখন মোকামে গিয়া ভিড়লাম তখন দেখি আর বিবির কান্দন কাটন কিচ্ছু নাই। জিগাইলাম, কী, তবে নাকি মইরা যাইবা? কই, গ্যালা না? তখন ভূতে পাওয়া মাইয়ার মত আমাকে জাপটাইয়া ধরল। তারপর থিকা বিবি আমার অন্য মানুষ। তাই কই মিঞা, বিবিগোর ছোট বড় নাই। ব্যাবাকই বিচ্ছু। কেউ কম কেউ বেশী। সোজা আংগুলে কাম না হইলে বোতলে ত্যাড়া আংগুল ঢুকাইতে লাগব। বুঝছেন তো।

চুলের ভিতর আঙুল চালাতে চালাতে ফটিকের ইদ্রিস মিঞার উপদেশ মনে পড়ল। সত্যি বলতে কি ইদ্রিস মিঞার চালচলন বাচনভঙ্গী এত মোটা দাগের যে ফটিক সেদিন তার কোনও কথা উপভোগ করতে পারেনি। গোটা ব্যাপারটাই তার স্থূল বলে মনে হয়েছিল। তার সদ্য অর্জিত ভদ্র রুচিতে আঘাত লেগেছিল। সে দেখেছে তাদের সমাজে মেয়েদের সম্পর্কে কেমন একটা অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করা হয়। পুরুষের নারীর উপর কর্তৃত্ব আছে, কেননা আল্লাহ্ তাহাদের একজনকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন এবং এই হেতু যে পুরুষ তাহাদের ভরণ পোষণের জন্য নিজের ধন ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী নারীরা পুরুষের হুকুম মত চলিবে এবং তাহাদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্ যাহা হেফাজত করিতে বলিয়াছেন তাহা রক্ষা করিবে। এই বাণী ফটিক জন্মাবধি শুনে আসছে। এবং [illegible] ইদ্রিস মিঞা বিশ্বাস

করে এবং সেই মত আচরণ করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রী পুরুষের হুকুম মত চলিবে। ইদ্রিস তার অনিচ্ছুক মাঝ্লা বিবিকে কেঁইচি মেরে বিছানায় গেঁথে ফেলে তার অভিলাষ চরিতার্থ করে যাবে। ইদ্রিসের পক্ষে এটা তার ধর্ম পালনেরই অঙ্গ। একই সঙ্গে রথ দেখা এবং কলা বেচা, এই দুই কাজই সফল হচ্ছে তার। কথাটা মনে পড়তেই তার মনটা কেমন খচ্ খচ্ করতে থাকে। বিশেষ করে তার গ্রামীণ সমাজের গন্ডি কেটে সে যখন কলকাতার বৃহত্তর গন্ডিতে এসে পড়ল তখন তার নবার্জিত অনেক অভিজ্ঞতাই পুরাতন বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে ক্রমাগত ঘা দিতে লাগল। যেমন আল্লাহ্ যেখানে নারীকে পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং পুরুষের হুকুম মত চলিবে বলিয়া নির্দেশ দিয়েছেন, সে-ব্যাপারটা, যতদিন সে গ্রামে ছিল এবং যে ধরনের নারীদের সে চারপাশে দেখেছে, তার কাছে অবিচার বলে মনেই হয়নি।

কিন্তু কলকাতায় দুজন মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ 'মহিলারা পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট' এই বিষয়ে তার মনে প্রথম প্রশ্ন তোলে। এক মহিলা হচ্ছেন তার সহপাঠিনী মিস্ লতিকা পালিত। আরেকজন মহিলা হচ্ছেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। মিস্ পালিতই ফটিকে একবার একটা ঘরোয়া বৈঠকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। প্রথমে ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন সরোজিনী, রাজনৈতিক বক্তৃতা। তাঁর ইংরাজী উচ্চারণ এবং অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠস্বর তাকে একেবারে আবিষ্ট করে ফেলেছিল। আর তারপরই হল সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা, যখন তিনি সকলের অনুরোধে স্বরচিত কয়েকটা কবিতা পড়লেন। বীণার ধ্বনি বলে একটা কথা বইতে পড়েছে ফটিক। শ্রীমতী নাইডুর আবৃত্তি শুনে মনে তার আর দ্বিতীয় কোনও উপমা এল না। তার মন এক কথায় রায় দিয়ে দিল, এই হল সেই বীণাধ্বনি। আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই জানেন। তবে তিনি কী করে ভুলে গেলেন তাঁর নিজের এই অপূর্ব সৃষ্টি সরোজিনী নাইডুর কথা? আল্লাহ্ তো সব বিচারের মালিক এবং সুবিচারক। তিনি কি তাঁর বিচারের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ন করতে পারেন, যে কোনও পুরুষের পাশে সরোজিনীকে দাঁড় করিয়ে, এবং তারপর এই রায় দিয়ে যে পুরুষের নারীর উপর কর্তৃত্ব আছে, কেননা আল্লাহ্ নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। এই প্রশ্ন বহুদিন ধরে নাড়া দিয়েছে তাকে। এবং এখনও দেয়। কিম্বা এই চরম রসিকতা হয়ত আল্লাহ্ই, একমাত্র তিনিই করতে পারেন, যিনি পরম রহস্যময়। সে যখন তার বিশ্বাস এবং তার অভিজ্ঞতার এই রকম টানাপোড়েনে বিব্রত এবং বিভ্রান্ত এমন সময় আরেকজন মুসলিম রমণী তার পুরাতন বিশ্বাসের মূলে দিলেন প্রচন্ড আঘাত। এই মহীয়সী মহিলা, মিসেস রোকেয়া এস রহমান, যাঁকে সে কখনো চোখে দেখেনি, তার পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন। "যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণী-শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত বোধ হয় কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত যাইয়া 'রমণী জাতিকে নরের অধীন থাকিতে হইবে' ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন? ঈশ্বর কি কেবল এশিয়ারই ঈশ্বর? আমেরিকায় কি তাঁহার রাজত্ব ছিল না? ঈশ্বরদত্ত জলবায়ু ত সকল দেশেই আছে, কেবল দূতগণ সর্বদেশময় ব্যাপ্ত হন নাই কেন?" নবনূর নামে একটা মাসিকপত্রের পুরানো সংখ্যায় এই লেখাটা পড়েছিল ফটিক। এবং পড়েই মনে হয়েছিল কী আশ্চর্য এ তো তারই মনের কথা। অথচ এতদিন এই মহিলার নামই কখনো শোনেনি। মুসলমান শিক্ষিত সমাজ এঁর নাম নেয় না আর হিন্দু সমাজ এই বিপ্লবিনী নারীর নাম শুনেছে কিনা সন্দেহ। বস্তুত মহিলাটি আদৌ মুসলমান কিনা সে সম্পর্কে তার সন্দেহই জেগেছিল। কোনও শিক্ষিত মুসলমান পুরুষের লেখাতে সে এর সিকির সিকি আগুনও দেখতে পায়নি। আর এই মহিলা কিনা সেখানে অম্লান বদনে লিখে গিয়েছেন, "যাহা হউক, এখন আমাদের আর ধর্মের নামে নতমস্তকে নরের অযথা প্রভুত্ব সহা উচিত নহে। আরও দেখ, যেখানে ধর্মের বন্ধন অতি-শয় দৃঢ় সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক।

চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের **রঙীন পূজাবার্ষিকী**

বিচিত্র স্বাদের ৬টি উপন্যাস

নীললোহিত

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

প্রতিভা বসু

দিব্যেন্দু পালিত

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

দীপালি দত্তরায়

বিশেষ আকর্ষণ

শচীন কর্তা—সংসারে, স্বভাবে, সঙ্গীতে

অভিনয় থমকে দাঁড়াবে না—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (অভিনেতা অভিনেত্রীদের ফিল্মে অভিনয় সম্পর্কে একটি ভিন্ন স্বাদের রচনা)

অন্যান্য লেখা

সিনেমার চার প্রধান

শান্তারাম, নৌশাদ, দিলীপকুমার ও লতা মঙ্গেশকরের প্রতিভা সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক আলোচনা

বোম্বাইয়ে উত্তমকুমার

শতরঞ্জ কে খিলাড়ি ও তারপর?

এ ছাড়া বম্বে—কলকাতার বহু নামী চিত্রতারকার ব্লো-আপ ও রঙীন ছবি এবং আরও অনেক কৌতূহল জাগানো রচনা

সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হচ্ছে

১২.০০/রেজিস্ট্রি ডাকে ১৪.২০

আপনার কপির জন্যে আজই এজেন্টকে বলে রাখুন বা আমাদের লিখুন :
সার্কুলেশন ম্যানেজার, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড কলকাতা ৭০০ ০০১

AAI/CAS.18/77

প্রমাণ—সতীদাহ। যেখানে ধর্মবন্ধন শিথিল, সেখানে রমণী প্রায় পুরুষের ন্যায় উন্নত আছেন। এ স্থলে ধর্ম অর্থে ধর্মের সামাজিক বিধান বুঝিতে হইবে।" ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ বাংলা পাঠ্য সংকলনে কই, কত মহিলার আলুনি সব ছেলেভুলানো লেখা স্থান পেয়েছে, কিন্তু রোকেয়ার যাঁর তেজ এবং বিদ্যোৎ-সাহিতা একমাত্র নিবেদিতাকেই মনে পড়িয়ে দেয়, তো ঠাঁই মেলেনি সেখানে? কেন? যেদিন থেকে ফটিক বুঝতে পেয়েছে তাদের সমাজে নারীজাতিকে কোনও সম্মান দেওয়া হয় না, এবং এটা ঠিক সামাজিক ন্যায় বিচারের মধ্যে পড়ে না, সেদিন থেকেই সে ঠিক করেছে তার বিবিকে সে শুধু তার বিবি বলে নয়, মানুষ বলেই গ্রহণ করবে। সে আর বিবি হবে সমান। সে কখনোই তাকে তার হুকুমের বাঁদীতে পরিণত করবে না। কিন্তু তুমি কি তা করেছো? হঠাৎ যেন ফটিক তার মনের মধ্যে গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেল। তুমি যে তোমার বিবির উপর স্বামীর অধিকার খাটালে, তাতে তোমার বিবির সম্মতি ছিল কি না জেনে নিয়েছিলে? কী, চুপ করে আছো কেন, জবাব দাও। ফটিক মরমে মরে গেল। তুমি তোমার বিবিকে যেভাবে ব্যবহার করেছো, তার সঙ্গে ইদ্রিস মিঞার কেঁইচি মারা পদ্ধতির কোনও তফাত আছে? এবার ফটিক অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে মনে মনে আকুল হয়ে বলে উঠল, না না। আমি ওরই মত পশু। এবং আমি অনুতপ্ত।

হঠাৎ দৃশ্যটা তার চোখে ভেসে উঠল। দরজায় খিল দিয়ে বিলকিস তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আসলে ফটিকের এই মেয়েটার সঙ্গে একটু মজা করারই ইচ্ছে হয়েছিল।

বিলকিস সুন্দর চকচকে একটা বড় কাচের বাতি এনে মাথার দিকে একটা বাতিদানের উপর রেখে দিল। ঘরটা আলোয় ভরে গেল। পাছে বিলকিসের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায় তাই ফটিক চট করে পাশ ফিরে শুল। সে কি তার অসংযত ব্যবহারের জন্য বিবির কাছে ক্ষমা চাইবে?

বিলকিস এরই মধ্যে যথাসাধ্য একটু সাজগোজ করে এসেছে। সে ভেবেছিল ফটিককে জানাবে যে তখন উঠে যেতে তার ভাল লাগছিল না। ফটিকের কাছে থাকতেই তার ভাল লাগছিল। কিন্তু বাড়ি ভর্তি লোক সন্ধ্যেবেলা দরজা দিয়ে পড়ে থাকলে পাছে এ নিয়ে কোনও কথা ওঠে, তাই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে চলে যেতে হয়েছিল। আপনি নারাজ হবেন না। নারাজ হবেন না। আমার অবস্থাডা একটু ভা'বে দ্যাখেন। অত অবুঝ হয়ে পাশ ফিরে শুয়ে থাকলি কি চলে? আমাগের মেয়েগের যে কত অসুবিধে তা এটটু ভাবেন। শুধু শুধু রাগ করবেন না।

আসলে ব্যাপারটা কি হয়েছিল জানো? ব্যাপারটা যে শেষ পর্যন্ত অতদূর গড়াবে বা ঐ ধরনের বিশ্রী একটা ব্যাপার ঘটে যাবে মানে তোমার সম্মতি না নিয়েই যে আমি অতটা মানে অতটা আত্মহারা হয়ে পড়ব এবং যাক গে যাক আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। দেখে নিও ভবিষ্যতে আর কখনো এমন হবে না।

ফটিক বিলকিসের দিকে পিঠ ফিরে শুয়ে এবং বিলকিস খাটের শিথেনের নকশায় হাত দিয়ে ঠাঁই দাঁড়িয়ে এবং বাতির আলোয় ঘরখানা উদ্ভাসিত এবং কারো মুখে টুঁ শব্দ নেই।

পাছে আপনি রাগ করেন তাই আমি আলোডা নিয়েই চ'লে আলাম। বউ বিটি, মোছফেকা, দাদীজান সকলেই জানে আমি অ্যাখন এই ঘরে আইছি। তাই অ্যাখন আর কেউ কিছু মনে করবেনা নে। আপনি আমার উপরে নারাজ হবেন না। আজ সারাদিন আপনি ছেলেন না, আমার খুব কষ্ট হইছে মনে। আপনারে ছাড়ে থাকতি আমার খুব কষ্ট হয়। তাই আপনারে ঐ চিঠিখানা লিখিছিলাম। আপনি কি তার জন্যি রাগ

তোমার ঐ চিঠি। চিঠিখানা বেশ ভালো লেখা হয়েছে। আর ঐ যে ঐ খানতায়, ঐ যে যেখানে গোলাপফুলের কথা লিখেছ, ঐ যে অদ্যও মাঝে মাঝে গুলাপফুল তাহার পতীর দিল্লাগীর কারণে বিরক্ত হইয়াছে বলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া ফেলে। ইহাতে কী গুলাপফুল বিরক্ত বুঝাই?' হ্যাঁ, ঐ জায়গাটা, যদিও কথাটা 'বুঝাই' হবে না হবে 'বুঝায়,' তা হোগ্‌গে, ঐখানটা পড়ে আমার মনটা বেশ ভালো হয়ে গেল জানো, সারাটা দিন কত যে দুশ্চিন্তা গিয়েছে তাই মন ভালো ছিল না, কিন্তু ঐখানটা অদ্ভুত লিখেছ, মানে খুব সুন্দর লেখা, পড়ে মনটা বেশ হাল্কা হয়ে গেল আর তাই ভাবলাম তোমার সঙ্গেও একটু দিল্লাগী করে দেখি, যেমন তোমার গুলাপফুলের সঙ্গে তার বর করে, তোমাকে চমকে দিতে পারি কিনা? বিশ্বাস কর, আমার না, আর কোনও খারাপ মতলব ছিল না। কিন্তু কী বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল। না? দেখে নিও আর হবে না। এবারে সংযম। হ্যাঁ বিবি, তোমার কিছু ভয় নেই। সংযমের রশি একটুও ঢিলে হবে না।

বিলকিস ফটিকের রাগ ভাঙছে না দেখে সাত পাঁচ ভেবে খাটের দিকে একটু এগিয়ে গেল। ফটিক সেই সময় চোখ মেলল। বিলকিসের মুখে বাতির আলোটা পড়েছে। ফটিক আর চোখ বুজতে পারল না। সাজ-গোজের ঐ সামান্য একটু হেরফেরেই বিলকিসকে একেবারে নতুন বলে মনে হচ্ছে। এবং আরও লোভনীয়। এবং এ যেন আর অপাপবিদ্ধ আগেকার সেই বালিকাটি নয়। এর চোখ এর মুখ এর সমস্ত অবয়বই ঘোষণা করছে যে, পরিণত এক তরুণীই এখন খোলস-ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। এবং ক্রমাগত তার চোখ, তার ঠোঁট, তার শরীর উত্তেজক সব ইঙ্গিত পাঠিয়ে তাকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করছে। ফটিক তার অনুশোচনা এরই মধ্যে ভুলতে শুরু করেছে। কিন্তু বিলকিসের এত পরিণত বলেই বা ওর মনে হচ্ছে কেন? আ, এতক্ষণে নজর পড়ল ফটিকের, বিলকিসের নাকে নোলকটা নেই। চুলেও পাতা কেটে এসেছে। তার মানে তার তখনকার অসভ্যতায় বিলকিস কিছু মনে করেনি।

ফটিকের ঠোঁটে অদ্ভুত একটা মায়াবী হাসি ফুটে উঠল। বিলকিস যেন সম্মোহিত হয়ে গেল। সেও হাসল। তার ঠোঁট দুটো অল্প একটু ফাঁক হতেই দাঁতের পাতি কিঞ্চিৎ অনাবৃত হয়ে গেল। ফটিকের দেহে একটা শিহরণ খেলে গেল। তার চোখ দুটো ঈষৎ স্ফীত এবং অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ফটিক হাসল।

বিলকিসের চোখ দুটো এখন স্ফটিক। তার নাসারন্ধ্র ক্রমশ স্ফুরিত হচ্ছে নাকের ডগায় ঘাম ফুটে উঠেছে। স্তনাগ্র ক্রমশ কঠিন হয়ে আসছে। বিলকিস হাসল।

ফটিকের রক্তে আদিম চঞ্চলতা। তার শরীর অবসাদ মুক্ত হয়ে প্রাণের জোয়ারে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠছে। সে একটু সরে শুলো।

বিলকিসের এখনই একটা শক্ত কিছু আশ্রয় দরকার। না হলে সে পড়ে যাবে। ভেসে যাবে। সেই প্লাবনটা তার সমস্ত রক্ত তোলপাড় করতে করতে আসছে। সে এগিয়ে গেল। তারপর কী মনে হতেই থমকে দাঁড়াল। তারপর দ্রুত এগিয়ে গিয়ে আলনা থেকে একটা ঢাকা দেবার চাদর নিয়ে এল। তারপর খাটের কিনারে গিয়ে বসল। তারপর সে ভেসে যাওয়া রোধ করতে ফটিকের এগিয়ে দেওয়া হাতখানা ধরল। তারপর উত্তেজনার প্রবল ঢেউয়ে ঢেউয়ে ওর সমগ্র শরীরটার সমস্ত জোড়গুলো খুলে খান খান। চারদিকে যেন ছিটকে ছড়িয়ে পড়ল। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে যথা বিদীর্ণ এক বাড়ি। অথবা ডুবো পাহাড়ে গুঁতো খাওয়া এক জাহাজ। হাড়গোড়বিহীন একটা অস্তিত্ব ফটিকের দেহের উপর আছড়ে পড়ল। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে চাদর দিয়ে দুজনেরই আপাদমস্তক ঢেকে দিতে লাগল সে। এবং ফটিকের দুটো বাহু সাঁড়াশীর মত যখন তাকে চেপে ধরছিল তখন শুধু দুটো মিনতি নিমজ্জমান বিলকিসের কণ্ঠ দিয়ে বুদ্‌-বুদের মত অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে এল, "দরজাটা,

ফুলের মেলার মনমাতানো সুরভি...

ল্যাকমে
এক্সোটিকা
লাক্সারী ট্যাল্ক

মনমাতানো অজস্র সুরভির রেশ
কখনও মেলায় না

ল্যাকমে

daCunha/LE/6 C Ben.

হে অরণ্যদেব রমানাথ রায়

আমাদের বাড়ির নাম গোলকধাম। আমাদের বাড়ির উত্তর দিকে হোমিও-হাসপাতাল। দক্ষিণদিকে বোবা-কালাদের স্কুল। পূর্বদিকে নারকেলডাঙার খাল। পশ্চিমদিকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। আমাদের দোতলা বাড়ি। আমাদের বাড়ির রঙ গোলাপী। আমাদের বাড়ির মধ্যে একটা উঠোন। উঠোনে দশটা ফুলের টব। তার মধ্যে তিনটে গোলাপী, দুটো জবা, দুটো বেল, একটা গন্ধরাজ, একটা জুঁই, একটা রঙ্গন। এখন কোন গাছে ফুল নেই। তবে জবাগাছে চারটে কুঁড়ি এসেছে। জবাগাছের সব কুঁড়ি আবার ফোটে না। বেশীর ভাগ কুঁড়ি হলদে হয়ে ঝরে যায়। আমাদের উঠোনে একটা বড় বাথরুম আছে। এই বাথরুমে আমরা স্নান করি। বাথরুমের ভিতর একটা বড় চৌবাচ্চা আছে। চৌবাচ্চায় সারাদিন জল থকে।

আমাদের বাড়িতে মোট আটখানা ঘর। একতলায় চারখানা। দোতলায় চারখানা। একতলার চারখানার মধ্যে একটা রান্নার ঘর, একটা ভাঁড়ার ঘর, একটা খাওয়ার ঘর, একটা বসার ঘর। দোতলার চারটে ঘরের মধ্যে একটা শুধু পড়ার ঘর। বাকি তিনটে শোবার ঘর। সব থেকে বড় ঘরটায় মা আর বাবা শোন। সে-ঘরে একটা বড় খাট আছে। একটা স্টিলের আলমারি আছে। একটা ড্রেসিং টেবিল আছে। একটা রেডিও আছে। সে ঘরে আমি বড় একটা ঢুকি না। ঢুকলে মা বকে। আর দুটো ঘরের একটায় দাদা আর ভাই শোয়। সব থেকে ছোট ঘরটায় আমি আর মধু শুই। মধু আমাদের বাড়িতে কাজ করে। সে তাই মাটিতে শোয়। আমি খাটে শুই। মধু আগে একতলায় শুত। একদিন নাকি কি দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে ওপরে শোয়। নিচের শুধু বাঘা থাকে। বাঘা আমাদের বাড়ির কুকুর। বাঘা কাউকে কামড়ায় না। বাঘা এমনিতে ভাল। তবে বাড়িতে অচেনা লোক এলে ভীষণ ঘেউ ঘেউ করে। তখন তাকে সামলানো দায়। বাঘা আমাদের কাউকে ভয় করে না। আমাদের কারোর কথা শোনে না। বাঘা কেবল বাবাকে ভয় করে। বাবা যা বলেন বাঘা তাই শোনে। তবে বাঘা মধুকে খুব ভালবাসে। মধু বাঘাকে প্রতিদিন খেতে দেয়। বাঘা সপ্তাহে দুদিন মাংস-ভাত খায়। অন্যান্য দিন দুধ-ভাত খায়। প্রতিদিন রাত্রে দুধ-রুটি খায়। খাবার সময় বাঘার থালায় কেউ হাত দিতে পারে না। দিলেই রেগে যায়। কিন্তু মধুকে কিছু বলে না।

আমরা তিন ভাই। আমরা তিন জনেই এক স্কুলে পড়ি। আমাদের স্কুলের নাম জগদীশচন্দ্র ইনস্টিটিউসন। আমাদের স্কুল চারতলা। দেখতে অনেকটা ইংরেজী 'এল' অক্ষরের মত। আমাদের স্কুলের রঙ সাদা। আমাদের স্কুল খুব বড়। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। দাদা ক্লাস টেন-এ পড়ে। আমি এইট-এ। ভাই সিক্স-এ। আমরা তিনজনে একসঙ্গে স্কুলে যাই। তবে একসঙ্গে বাড়ি ফিরি না।

আমাদের স্কুলের হেডমাস্টারের নাম ইন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি এম এ বি টি। আমরা তাঁকে খুব ভয় করি। তাঁর ঘরের দরজায় একটা সবুজ রঙের পর্দা ঝোলে। কাউকে ভিতরে ঢুকতে হলে সেই পর্দা সরিয়ে ঢুকতে হয়। আমি কোনদিন তাঁর ঘরে ঢুকিনি। আমাদের মনিটার প্রায়ই তাঁর ঘরে ঢোকে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে। আমি সেদিন জল খেতে বেরিয়ে তাঁর সামনে পড়ে গিয়েছিলাম। তিনি বোধ হয় রাউন্ডে বেরিয়েছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কার্ড আছে ? সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে কার্ড বের করে তাঁকে দেখালাম। তিনি আর কিছু বললেন না। চলে গেলেন। আমাদের স্কুলে কার্ড ছাড়া বাইরে বেরনো নিষেধ। বেরুলেই শাস্তি। তাপসের খুব সাহস। মাঝে মাঝে কার্ড ছাড়াই বেরিয়ে যায়। একদিন ধরা পড়ে দু-পিরিয়ড নীল-ডাউন হয়ে থাকল। তারপর কদিন তাপসের আর সাহস ছিল না। কার্ড ছাড়া বাইরে বেরতো না। এখন আবার সাহস হয়েছে। কার্ড ছাড়া বাইরে বেরয়। আবার কোনদিন ধরা পড়বে। এবার ধরা পড়লে সারাদিন নীলডাউন হয়ে থাকতে হবে।

আমাদের অ্যাসিসট্যান্ট হেড মাস্টারের নাম বিপুল বসু। বিপুলবাবুও এম এ বি টি। বিপুলবাবু ভীষণ কড়া। বেত হাতে সারা স্কুল ঘুরে বেড়ান। কার্ড ছাড়া কাউকে দেখলেই নীলডাউন করিয়ে রাখেন। কেউ ইউনিফর্ম না পরে এলে তাকে ক্লাস থেকে বের করে দেন। কেউ মারামারি করলে বা খারাপ কথা বললে তার আর রেহাই নেই। সপাং সপাং করে তার পিঠে বেত পড়বে। একবার একটা ছেলে বই চুরি করে ধরা পড়ে গিয়েছিল। বিপুলবাবু তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আমাদের স্কুল এগারোটায় আরম্ভ হয়। চারটেয় শেষ হয়। আমাদের প্রতিদিন প্রথমেই বাংলার ক্লাস। তারপর অংকের ক্লাস। তারপর ইংরেজীর ক্লাস। পরের ক্লাসগুলো এক-একদিন এক এক রকম। ভূপেনবাবু আমাদের বাংলার ক্লাস নেন। তিনি আমাদের ক্লাস টিচার। তিনি আমাদের বাংলা টেক্সট আর ব্যাকরণ পড়ান। আমাদের অংকের ক্লাস নেন সুশীতলবাবু। তাঁর ক্লাস আমার ভাল লাগে না। আমি অংক ভাল বুঝি না। এবার হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষায় আমি অংকে ফেল করেছি। বাবা তার জন্যে আমাকে খুব মেরেছেন। সোমেনবাবু আমাদের ইংরেজী পড়ান। তাঁর ক্লাসে গোলমাল হয়। সবাই তাঁকে আড়ালে 'উচ্ছে' বলে ডাকে। আমিও ডাকি। 'উচ্ছে' ডাক শুনলে তিনি খুব রেগে যান। একদিন তাপস বোর্ডে বড় বড় করে 'উচ্ছে' লিখে রেখেছিল। সোমেনবাবু ক্লাসে ঢুকে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে আমাদের যাচ্ছেতাই করে বলতে লাগলেন। তিনি বারবার জানতে চাইলেন কথাটা কে লিখেছে। আমরা সবাই চুপ করে রইলাম। কেউ তাপসের নাম বললাম না। তার জন্যে সে পিরিয়ডে আমরা সবাই খুব মার খেলাম। তবু আমাদের কিছু হয়নি। তাকে আজো পিছন থেকে 'উচ্ছে' ডেকেই পালিয়ে যাই। আমরা আর একজনকে 'দই' বলে ডাকি। তিনি আমাদের ইতিহাস পড়ান। তাঁকে দেখলেই সবাই পিছন থেকে দই দই বলে চিৎকার করে ওঠে। আমিও বাদ যাই না।

ঠিক একটা পঁয়তাল্লিশ-এ আমাদের টিফিনের ঘণ্টা পড়ে। আধ ঘণ্টার জন্যে আমাদের টিফিন হয়। আমার সঙ্গে দু'পিস পাঁউরুটি আর একটা কলা থাকে। আমার পাঁউরুটি খেতে ভাল লাগে না। কলাও না। আমার আইসক্রীম খেতে ইচ্ছে করে। গেটের বাইরে আইসক্রীমওয়ালা বসে থাকে। দাদা মাঝে মাঝে আইসক্রীম খায়। ভাইও। বাড়ি থেকে নিশ্চয় পয়সা নিয়ে আসে। জিজ্ঞেস করলে কিছু বলে না। আমি একদিন ভাইয়ের হাত থেকে আইসক্রীম কেড়ে একটু খেয়েছিলাম। ভাইয়ের সে কি কান্না। বাড়ি এসে ভাই আবার সেকথা মাকে বলে দিয়েছিল। আমার মার খাইয়েছিল। তারপর থেকেই আমি আর কোনদিন ভাইয়ের আইসক্রীম কেড়ে খাইনি। আমার বন্ধুরা মাঝে মাঝে আমাকে আইসক্রীম খাওয়ায়। বিনিময়ে আমি তাদের আমার পাঁউরুটি দিই কলা দিই।

আমাদের স্কুলের মধ্যে একটা মাঠ আছে। টিফিনের সময় সবাই সেই মাঠে ছুটোছুটি করে। মাঠের চারদিকে উঁচু পাঁচিল। মাঠের উত্তরদিকে পাঁচিল ঘেঁষে একটা বড় আমগাছ। কোনদিন তাতে আম হয় না। তার উঁচু ডালে কাকের বাসা। বাসার চারপাশে সারাদিন কাক কা-কা করে। একদিন একটা ছেলে ডিম পাড়বে বলে গাছে উঠেছিল। বেশী দূর উঠতে পারেনি। একটা কাক তার মাথা ঠুকরে রক্ত বের করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাকে অফিসঘরে নিয়ে গেলাম। অফিস থেকে শ্যামাদাসবাবু তার মাথায় তুলো দিয়ে ডেটল লাগিয়ে দিলেন। বিপুলবাবু ছেলেটাকে খুব বকলেন। তবে তাকে সেদিন আর ক্লাস করতে হয়নি। তার ছুটি হয়ে গেল।

টিফিনের পর বেশীর ভাগ দিন হয় বিজ্ঞানের নয় ভূগোলের ক্লাস থাকে। আমার তখন ক্লাস করতে একদম ভাল লাগে না। ছুটোছুটি করে শরীরটা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। রমেশবাবু আমাদের বিজ্ঞান পড়ান। তিনি ভাল বোঝাতে পারেন না। গড়গড় করে রিডিং পড়ে যান। আমরা যে যার সঙ্গে কথা বলতে থাকি। তিনি কাউকে কিছু বলেন না। সুধীরবাবু আমাদের ভূগোল পড়ান। তিনি সঙ্গে ওয়াল ম্যাপ নিয়ে আসেন। সেটা দেয়ালে টাঙানো থাকে। ঘণ্টা পড়লে সেটা আবার গুটিয়ে নিয়ে চলে যান। বেশীর ভাগ দিন ম্যাপ টাঙানোই থাকে। কোন কাজে লাগে না। তিনি পড়িয়ে যান। এই সময় কেউ কথা বললে তিনি খুব রেগে যান। তাকে দাঁড় করিয়ে দেন। নয় ম্যাপ পয়েন্টিং-এ ডাকেন। আমি তাই চুপ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার কাছে রানীগঞ্জ আর জামশেদপুর একাকার হয়ে যায়। আমি তাঁর শুধু ঠোঁট নাড়া দেখতে পাই। কিছু অর্থহীন শব্দ আমার কানে ভেসে আসে। আমি কিছু বুঝতে পারি না। সুধীরবাবুর মুখ আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে যায়। আমি আর তখন চেষ্টা করেও চোখ খুলে রাখতে পারি না। সিকস্থ পিরিয়ডে কোন কোনদিন বাংলা রচনার ক্লাস থাকে। মিহিরবাবু আমাদের রচনা করান। আমার রচনা লিখতে খুব ভাল লাগে। রচনায় আমি সব থেকে বেশী নম্বর পাই। মিহিরবাবু আমাকে তাই ভালবাসেন। মিহিরবাবু খুব ভাল। মিহিরবাবু আমাদের এক-একদিন অরণ্যদেবের গল্প বলেন। অরণ্যদেবের গল্প শুনতে আমার ভীষণ ভাল লাগে। মিহিরবাবু নাকি স্কুলের চাকরি ছেড়ে চলে যাবেন। মিহিরবাবু চলে গেলে আমার খুব খারাপ লাগবে। সিকস্থ পিরিয়ডে এক-একদিন সংস্কৃতের ক্লাস থাকে। সংস্কৃতের ক্লাসে খুব গোলমাল হয়। পণ্ডিতমশাইকে কেউ মানে না। তিনি কি পড়ান তা আমরা কেউ শুনতে পাই না। সেভেন্থ পিরিয়ডে আমাদের ক্যারোর ক্লাস করতে ভাল লাগে না। বাড়ি চলে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু যাবার উপায় নেই। সেভেনথ পিরিয়ডে কোনদিন রোলকল হয়। আবসেন্ট থাকলে ক্যাপিটাল 'এ' হয়ে যায়। ক্যাপিটাল 'এ' হলে পঞ্চাশ পয়সা ফাইন। ছুটি নিয়ে গেলে কিছু হয় না। সপ্তাহে একদিন সেভেন্থ পিরিয়ডে ওয়ার্ক এডুকেশনের ক্লাস হয়। একদিন পি টি-র ক্লাস হয়। খালি পেটে আমি ব্যায়াম করতে পারি না। কেউই পারে না। আমাদের খুব কষ্ট হয়। তবু করতে হবে। ঠিক চারটে বাজলেই ছুটির ঘণ্টা পড়ে। আমরা হই হই করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে পড়ি। আমাদের তখন ভীষণ ভাল লাগে। গোবিন্দ আমাদের বাড়ির কাছেই থাকে। আমি গোবিন্দর সঙ্গে গল্প করতে করতে বাড়ি যাই। গোবিন্দর খুব কষ্ট। গোবিন্দর মা নেই, বাবা নেই। গোবিন্দ মাসির কাছে থাকে। মাসি ওকে খুব বকে। বাড়ির সব কাজ ওকে দিয়ে করিয়ে নেয়। গোবিন্দ একবার বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পুলিসের হাতে ধরা পড়ে। আমারো মাঝে মাঝে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। পুলিসের ভয়ে পালাতে পারি না। তবে বড় হলে আমি পালিয়ে যাব। তখন আর কোন ভয় থাকবে না। জানি না কবে আমি বড় হব। বড় হতে খুব সময় লাগে!

বাড়িতে আমার মা আছে, বাবা আছেন। তবু বাড়িতে ভাল লাগে না। সবাই আমাকে বকে। আমার নাকি পড়াশুনো হবে না। পড়াশুনো হবে শুধু দাদার আর ভাইয়ের। বাবা দাদাকে ডাক্তারি পড়াবে। মা ভাইকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াবে। আমি সব শুনি। কিছু বলি না। আমি জানি দাদা কি। দাদা লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খায়। আমি নিজের চোখে দেখেছি। ভাইও কম যায় না। খারাপ খারাপ কথা বলে। ভাইয়ের ক্লাসের একটা ছেলে আমাকে সব বলেছে।

বাবা দাদাকে মাঝে মাঝে ইংরেজী সিনেমা দেখান। মাঝে মাঝে বেড়াতে নিয়ে যান। দামী দামী জামা-প্যান্ট কিনে দেন। গল্পের বই কিনে দেন। দাদা সে সব বই আমাকে পড়তে দেয় না। সব সময় আগলে রাখে। হাত দিলে বকে। কিছুদিন আগে বাবা দাদাকে একটা ক্রিকেটের ব্যাট আর বল [illegible] একটা ক্যারামও কিনে দেবেন। দাদার খুব মজা।

ভাইও খুব জিনিস পায়। মা কিনে দেয়। মা সেদিন ভাইকে একবাক্স রঙ পেনসিল কিনে দিয়েছে। হাতঘড়ি কিনে দিয়েছে। দিক্‌গে। আমার কিছু চাই না।

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে আমি খেয়ে দেয়ে কোথাও বেরই না। বাড়িতেই থাকি। দাদা বাড়িতে থাকে না। ক্লাবে খেলতে যায়। ভাইও বেশীর ভাগ দিন বাড়িতে থাকে না। মার সঙ্গে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। আমি আর মধু ছাদে উঠে বাবার সঙ্গে খেলা করি। বাবার সঙ্গে খেলা করতে আমার ভাল লাগে। বাবার খেলার জন্যে একটা কাঠের বল আছে। বলটাকে কখনো আমি ছুঁড়ে দিই। কখনো মধু ছুঁড়ে দেয়। বাবা দৌড়ে সেটা মুখে করে নিয়ে আসে। কখনো আমার কাছে। কখনো মধুর কাছে। কখনো বলটাকে মুখে পুরে ছাদের চারদিকে ছুটতে থাকে। কাউকে দেয় না। আমরা তখন ওর পিছনে পিছনে ঘুরতে থাকি। মাঝে মাঝে আমরা বাবাকে দু'পায়ে হাঁটতে শেখাই। বাবাকে হাঁটাতে আমাদের খুব ভাল লাগে। আমরা খুব মজা পাই। বাবাও খুব মজা পায়। এক-এক সময় বাবার কি যেন হয়। বাবা রেগে যায়। তখন কান দুটো তার খাড়া হয়ে ওঠে। মুখ দিয়ে গরুর গরুর শব্দ বেরয়। মধু তখন ওকে ধমক দেয়, বকে। বাবা আস্তে আস্তে শান্ত হয়। বাবা খুশি হলে আমরা বুঝতে পারি। বাবা তখন পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে। সামনের দু'পা দিয়ে আমাদের

জড়িয়ে ধরবে। আমাদের গা চেটে দেবে। আমাদের কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে দেবে। আর কেবলই কুঁই কুঁই শব্দ করবে। বাবার তখন আদর চাই। আদর না পেলে কিছুতেই শান্ত হবে না।

আমি আর মধু মাঝে মাঝে লুডো খেলি। বাবা আমাদের পাশে চুপ করে বসে থাকে। আমাদের লুডো খেলা দেখে। লুডোর সব ঘুঁটি নেই। তিনটে ঘুঁটি হারিয়ে গেছে। তাতে কোন অসুবিধে হয় না। লাল আর হলদে ঘুঁটিগুলো ঠিক আছে। মধু এক একদিন লাল ঘুঁটি নিয়ে খেলে। আমি হলদে ঘুঁটি নিয়ে খেলি। আমিও এক একদিন লাল ঘুঁটি নিয়ে খেলি। মধু হলদে ঘুঁটি নিয়ে খেলে। লাল ঘুঁটি খুব পয়া। লাল ঘুঁটি নিয়ে খেললে জেতা যায়। খুব ছক্কা পড়ে। হলদে ঘুঁটি নিয়ে জেতা কষ্ট। কিছুতেই ছক্কা পড়তে চায় না। আমি খেলায় চোরামি করি না। মধু খুব চোরামি করে। আমি প্রায়ই ধরে ফেলি। অত চোরামি ভাল লাগে না। আমরা এক একদিন সাপলুডো খেলি। সাপলুডো খেলতে আমার খুব মজা লাগে। এই একদানে মইতে চড়ে কত ওপরে উঠে যাই। আবার পরের দানে সাপের মুখে পড়ে কত নীচে নেমে আসি। মধু সাপলুডোতে খুব হারে। মধু তাই সাপলুডো খেলতে চায় না।

মাঝে মাঝে আমাদের লুডো খেলতে ভাল লাগে না। আমরা বসে বসে গল্প করি। মধু আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। মধুর বাড়ি মেদিনীপুর। মধুরা খুব গরীব। মধুরা ছ' ভাইবোন। মধু সকলের বড়। মধুর এক

মনের
অনেক সুন্দর
VIMAL
A RELIANCE PRODUCT
শাড়ী • ড্রেস মেটিরিয়াল
® is the Registered trademark of Reliance Textile Industries Ltd.

ছোট বোন আছে। তার নাম গঙ্গা। মধু গঙ্গাকে খুব ভালবাসে। মধু এবার পুজোয় গঙ্গাকে একটা শাড়ি কিনে দেবে। আমারও গঙ্গাকে কিছু দিতে ইচ্ছে করে। কি দেব? এই লুডো ছাড়া আমার দেবার কিছু নেই। আমি তাই দিয়ে দেব। গঙ্গা লুডো পেলে নিশ্চয় খুশী হবে।

চার বছর হল মধু আমাদের বাড়িতে কাজ করছে। মধু যখন এসেছিল তখন তার মাইনে ছিল পনের টাকা। ক'মাস হল পাঁচ টাকা বেড়েছে। এখন মধুর মাইনে কুড়ি টাকা। মধু নিজের কাছে টাকা রাখে না। মানি অর্ডার করে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। তবু মধু ফাঁক পেলেই পয়সা চুরি করে। মা বাবা কেউ মধুকে বিশ্বাস করে না। একবার হাতে নাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল। বাবা খুব বকেছিল। মাও। তবু বাবা মধুকে তাড়ায়নি। মধু খুব কাজের। মধু বাজার করে, রেশন তোলে, রান্না করে, বাসন মাজে ঘর মোছে। মধু আগে ভাত ডাল ছাড়া কিছু রাঁধতে পারত না। মা মধুকে মাছ রান্না শিখিয়েছে। মাংস রান্নাও শিখিয়েছে। মার এখন খুব মজা। মাকে আর রান্না করতে হয় না। সারাদিন শুয়ে থাকে আর ঘুরে বেড়ায়। আর থেকে থেকে হুকুম চালায়। মধুর আর এখানে ভাল লাগছে না। লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ দেখছে। কাজ পেলেই চলে যাবে। আমি মধুর সব কথা জানি। মধু আমাকে সব বলে। আমি এসব কথা কাউকে বলি না। মধু আমাকে বারণ করে দিয়েছে। বারণ না করলেও আমি কাউকে বলতাম না। মধুর মত আমারো কোথাও কাজ নিয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমাকে কে কাজ দেবে? আমি কি কাজ জানি?

আমাদের দু'জন মাস্টারমশাই আছেন। একজন আমাদের ইংরেজী পড়ান। তিনি সপ্তাহে দু'দিন আসেন। সোমবার আর বুধবার। দু'ঘণ্টা পড়ান। সাতটায় আসেন, নটায় যান। আর একজন মাস্টারমশাই মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবার আসেন। অংক করান আর বিজ্ঞান পড়ান। তিনিও দু' ঘণ্টা পড়ান। সাতটায় আসেন, নটায় যান। শুক্রবার, শনিবার। রবিবার কেউ পড়াতে আসেন না। এই তিনদিন আমরা নিজেরাই পড়ি। মাস্টার মশাইরা যা যা করতে দিয়ে যান আমরা তাই তাই করি। না করে উপায় নেই। বকুনি খেতে হয়। বাবার কাছে রিপোর্ট যায়। অংক নিয়ে আমার বড় গোলমাল হয়। কিছুতেই উত্তর মেলাতে পারি না। বারবার ভুল হয়। দাদার ভুল হয় না। উত্তর দেখে ঠিক মিলিয়ে দেয়। ভাইও তাই করে। তবে অনেক অংক ভাই পারে না। দাদা করে দেয়। আমি কাউকে দিয়ে অঙ্ক করাই না। দাদা ভাল ইংরেজী জানে না। প্রায়ই বানান ভুল করে। প্রিপোজি-সানের ভুল করে। টেনসের ভুল করে। ভাই অনেক সময় দাদাকে দিয়ে ট্রানশ্লেসন করিয়ে নেয়। তাতে অনেক ভুল থাকে। মাস্টারমশাই লাল কালি দিয়ে সেগুলো কেটে দেন। আমার লেখাতেও ভুল থাকে। তবে অত ভুল থাকে না। তবু মাস্টারমশাই আমাকে বেশী নম্বর দেন না। দাদা সব সময় আমার থেকে বেশী নম্বর পায়। ভাইও। আমার মনে হয় মাস্টারমশাই দাদা আর ভাইকে বেশী ভালবাসেন।

পড়তে পড়তে আমার ভীষণ ঘুম পায়। মাস্টারমশাই থাকলেও পায়, না থাকলেও পায়। আমি না ঘুমোনোর আপ্রাণ চেষ্টা করি। চোখে জল দিই। বারান্দায় পায়চারি করি। কিন্তু ঘুম ঠেকাতে পারি না। ইংরেজীর মাস্টার মশাই আমাকে ঘুমোতে দেখলে শুধু ধমক দেন। অংকের মাস্টারমশাই আমাকে কান ধরে দাঁড়াতে বলেন। কান ধরে দাঁড়াতে আমার বিশ্রী লাগে। দাদা মুখ টিপে হাসে। ভাইও। এক এক সময় আমি তাই কান থেকে হাত নামিয়ে মুখ টিপে হাসে। ভাইও। এক-এক সময় আমি তাই কান থেকে হাত নামিয়ে নিই। নামালে হবে কি। মাস্টারমশাই-এর চোখ খাতার দিকে থাকে, কিন্তু দাদার চোখ খাতার দিকে থাকে না। থাকে আমার দিকে। কান থেকে হাত নামাতে দেখলেই দাদা মাস্টারমশাইকে নালিশ করে দেয়। আমি সংগে সংগে আবার কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকি। মাস্টারমশাইরা না এলেও রেহাই নেই। শুক্রবার, শনিবার, রবিবার কোন মাস্টারমশাই আসেন না। কিন্তু মা বাড়িতে থাকে। কোন কোনদিন বাবাও থাকেন। আমি ঘুমোতে থাকলে দাদা ছুটে মার কাছে নালিশ করে আসে। বাবা থাকলে বাবার কাছে। আমি তখন পড়ে পড়ে বকুনি খাই, কানমলা খাই, চড় খাই, অথচ দাদাও মাঝে মাঝে ঘুমোয়। ভাইও। আমি ওদের নামে নালিশ করি না। ওরা ঘুমোলে আমি ওদের জাগিয়ে দিই। আমি এবার থেকে আর জাগিয়ে দেব না। যত পারে ঘুমোক। আমার কি দরকার। মার চোখ আছে। বাবারও চোখ আছে। একদিন ঠিক ধরা পড়ে যাবে।

রাত দশটার সময় আমরা সবাই খেয়ে নিই। বাবার এক একদিন ফিরতে রাত হয়। বাবার খাবার টেবিলে ঢাকা থাকে। বাবা কোনদিন খান। কোনোদিন খান না। বাবা এসেই কলিং বেল টেপেন। আমার ঠিক ঘুম ভেঙে যায়। মধুর ঘুম ভাঙে না। আমি মধুকে ঠেলে জাগিয়ে দিই। মধু ঢুলতে ঢুলতে নিচে নেমে যায়। দরজা খুলে দেয়। দরজা বন্ধ করে দেয়। বাবা মসমস শব্দ করে ওপরে উঠে আসেন। আমি শুয়ে শুয়ে সব টের পাই। এক একদিন মধুর ঘুম আর ভাঙে না। মধু খুব ঘুমকাতুরে। সেদিন আমিই নিচে নেমে আসি। দরজা খুলে দিই। দরজা লাগিয়ে দিই। বাবাকে এই সময় আমার ভীষণ ভয় করে। বাবার পা টলতে থাকে। বাবার মুখ দিয়ে বিশ্রী গন্ধ বেরয়। আমি তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে আসি। নিজের ঘরে ঢুকে দরজার খিল তুলে দিই। তারপর শুয়ে পড়ি। এই সময় মার সংগে বাবার কথা কাটাকাটি হয়। মা কি যেন জোরে জোরে বলে। বাবাও কি যেন জোরে জোরে বলেন। আমি সব কথা বুঝতে পারি না। সব [illegible]। একদিন একটা গ্লাস ভাঙার শব্দ হয়েছিল। আর একদিন চেয়ার পড়ার শব্দ হয়েছিল। আজকাল এ রকম শব্দ হয় না। সামান্য কথা কাটাকাটির পর সব শান্ত হয়ে যায়। আমিও আস্তে আস্তে ঘুমোবার চেষ্টা করি। ঘুমোবার আগে প্রতিদিন আমার অরণ্যদেবের কথা মনে পড়ে।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতে আমার কষ্ট হয়। বিশেষ করে শীতকালে। লেপ মুড়ি দিয়ে বেলা পর্যন্ত পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে। এখন বর্ষাকাল। এখন শীত করে না। না করলেও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারি না। এক একদিন ভোরে বৃষ্টি হয়। শুয়ে শুয়ে আমার বৃষ্টি দেখতে ভাল লাগে। লাগলেও উপায় নেই। মার ডাকাডাকি, বকুনি শুরু হয়ে যায়। আমি উঠে পড়ি। দাদাও উঠে পড়ে। ভাইও। আমরা দোতলা থেকে একতলায় নেমে আসি। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে নিই। মুখ ধুয়ে চা খাই। চার সংগে চিনি মাখানো টোস্ট খাই। মধু আমাদের চা করে দেয়। টোস্ট করে দেয়। তারপর আবার আমরা দোতলায় উঠে আসি। পড়ার ঘরে ঢুকে পড়তে বসি। বাবা তখনো ঘুমোতে থাকেন। বাবা ওঠেন আরো পরে। বাবাকে কেউ কিছু বলে না। বাবাকে সবাই ভয় করে। মা-ও করে। দাদাও।

সকালবেলা আমরা স্কুলের পড়া করি। বাবা এক-একদিন কাগজ হাতে নিয়ে আমাদের ঘরে এসে বসেন। মাঝে মাঝে কাগজ পড়া বন্ধ করে আমাদের পড়া ধরেন। বাবা পড়া ধরলে আমি কোনদিনই ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারি না। আমার কেবলি ভুল হয়ে যায়। আর ভুল হলে রেহাই নেই। কানমলা খেতে হয়। চড় খেতে হয়। বাবা খুব জোরে মারেন। বেশীর ভাগ সময় গালে মারেন। গালে আঙুলের দাগ বসে যায়। তবে দাদাকে বাবা মারেন না। শুধু বকেন। ভাইকেও তাই।

বাবা আমাদের প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়তে বলেন। আমাদের বাড়িতে ইংরেজী বাংলা দুটো কাগজই আসে। আমি ইংরেজী পড়ে মানে বুঝি না। তাই ইংরেজী কাগজ পড়ি না। দাদাও বোঝে না। তবে পড়ে যায়। বোঝার ভান করে। আমি বাংলা কাগজ পড়ি। আমার অরণ্যদেবের গল্প পড়তে ভীষণ ভাল লাগে। জাদুকর ম্যানড্রেক বা গোয়েন্দা রিপের গল্পও ভাল লাগে। কিন্তু অরণ্যদেবের মত কোনটাই ভাল লাগে না। আমার মাঝে মাঝে অরণ্যদেবকে দেখতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে অরণ্য-দেবের মত হতে ইচ্ছে করে।

মা-ও থেকে থেকে আমাদের পড়ার ঘরে আসে। মা বি এ পাস। কিন্তু ভাল ইংরেজী জানে না। দাদা তাই মাকে ট্রানশ্লেসন জিজ্ঞেস করে। মা পারে না। দাদা খুব মজা পায়। বাবা পাশে থাকলে মুচকে মুচকে হাসেন। মা তাতে রেগে যায়। মা তাই দাদাকে পড়ায় না। ভাইকে পড়ায়। বেশীর ভাগ সময় ইংরেজী পড়ায়। ভাইয়ের ইংরেজী খুব সহজ।

সে ইংরেজী আমিও পারি। মা পারে না। মাকে মাঝে মাঝে ডিকশনারি খুঁজতে হয়। মা ব্যাকরণও জানে না। যে আর ক্যানে কেবলি গুলিয়ে ফেলে। তবু মা-র ইংরেজী পড়ানো চাই। ইংরেজী পড়াতে মা-র ভাল লাগে। মা কখনো কখনো আমাকেও ইংরেজী পড়ায়। খেয়াল হলে ইতিহাস ভূগোলও পড়ায়। মা হাতে বই নিয়ে পড়ায়। বই বন্ধ করে পড়াতে পারে না। মাকে আমি এক এক সময় ম্যাপ খুলে জায়গা বের করতে বলি। জায়গা বের করতে মার পাঁচ-সাত মিনিট লেগে যায়। আমি তখন চুপ করে বসে থাকি। পড়তে হয় না।

এক-একদিন আমাদের পড়ার ঘরে বাবা আসেন না। মাও না। আমরা তিন জন পড়তে থাকি। আমার তখন ঘন ঘন বাথরুমে যেতে ইচ্ছে করে। দাদার জল পিপাসা পায়। ভাইয়ের মুখে কেবলি থুতু আসে। আমরা ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাতে থাকি। আমাদের পড়ার ঘরে একটা দেয়াল ঘড়ি আছে। ঘড়িটা বার বার স্লো হয়ে যায়। কতবার সারানো হল। তবু ঠিক হল না।

ঠিক ন-টার সময় ভোঁ বাজে। বাবা তখন স্নান করতে যান। আমরা উঠি না। আমরা পড়তে থাকি। আমরা উঠি সাড়ে ন-টায়। তারপর আমরা একে একে স্নান করতে যাই। দাদা আগে স্নান করে। তারপর আমি। তারপর ভাই। দাদা প্রতিদিন সাবান মাখে। দাদার গা থেকে মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বেরোয়। আমি সাবান মাখি না। সাবান মাখতে আমার ভাল লাগে না। তবে মাঝে মাঝে মাখতে হয়। না মাখলে মা বকে। ভাইও প্রতিদিন সাবান মাখে। নিজে ভাল মাখতে পারে না। মা তাই এক-একদিন মাখিয়ে দেয়। শীতকালে আমরা কেউ সাবান মাখি না। না মাখলেও স্নান করতে হয়। শীতকালে স্নান করা খুব কষ্ট। খুব শীত লাগে। মা তা বোঝে না।

স্নান করার পর আমরা খেতে বসি। বাবার তখন খাওয়া হয়ে যায়। আমরা ডাইনিং টেবিলে বসে খাই। প্রতিদিন আমরা ডাল খাই, মাছ খাই, দুধ খাই। কোন কোনদিন পোস্ত হয়। কোন কোনদিন চচ্চড়ি হয়। এক একদিন ডিমের ডালনা হয়। সেদিন মাছ হয় না। আমার ডিম খেতে ভাল লাগে না। কেমন একটা আঁশটে গন্ধ লাগে। মাকে আমি কতদিন সে-কথা বলেছি। মা শোনে না। ভাই বললে ঠিক শুনত। আমি যেন এলে-বেলে। আমার কথার দাম নেই। আমার পাতে তাই ডিম পড়ে থাকে। মুখে দিই না। সে ডিমটা ভাই খায়। ভাইয়ের খাওয়ার দিকে মার খুব নজর। মাছের মুড়ো আগে বাবার পাতে পড়ত। এখন আর বাবার পাতে পড়ে না। এখন ভাইয়ের পাতে পড়ে। দাদা মাছের মুড়ো খেতে পারে না। তাই চুপ করে থাকে। ভাইও মাছের মুড়ো খেতে পারে না। মা ভাইকে ভেঙে খাইয়ে দেয়। আমার এক-একদিন মাছের মুড়ো খেতে লোভ হয়। চেয়েও ফেলি। মা দেয় না। ভাই প্রতিদিন আমাদের থেকে বেশী দুধ পায়। সঙ্গে দুধের সরটাও পায়। দাদা তাই নিয়ে মাঝে মাঝে চেঁচামেচি করে। মা তখন দাদাকে একটু সর দেয়। সেই সঙ্গে আমিও একটু পেয়ে যাই। চিনি দিয়ে সর খেতে আমার খুব ভাল লাগে। তবে টিফিন আমাদের এক রকম। দু পিস পাঁউরুটি আর একটা কলা। ভাই আলাদা কিছু পায় না।

খাওয়া শেষ হলে আমরা মুখ হাত ধুয়ে নিই। আমরা জামা-প্যান্ট পরতে শুরু করি। বাবা এই সময় বেরিয়ে যান। জামা-প্যান্ট পরতে চুল আঁচড়াতে আমার দেরী হয়ে যায়। চুলের সিঁথি কিছুতেই ঠিক হতে চায় না। কেবল বেঁকে যায়। দাদা তাড়াতাড়ি জামা-প্যান্ট পরে। চুল আঁচড়ায়। দেরী হয় না। ভাইয়েরও না। মা এক-একদিন ভাইয়ের সিঁথি ঠিক করে দেয়। ভাই এখনো সোজা করে সিঁথি কাটতে পারে না। আমার বেরতে দেরী হলে সবাই কথা শোনায়। ভাইও।

আমাদের কাছেই স্কুল। স্কুলে যেতে দেরী হয় না। দশ পনের মিনিট লাগে। আমরা হেঁটে যাই। বৃষ্টির মধ্যেও হাঁটি। রিকশা করি না। তখন আমাদের তিনজনের হাতে তিনটে ছাতা থাকে। দাদার আর আমার ছাতা কালো রঙের। ভাইয়ের ছাতা চার রঙের। ভারি সুন্দর দেখতে। মা গত বছর ভাইকে কিনে দিয়েছে। রাস্তায় আমরা কেউ কারো সঙ্গে কথা বলি না। ভাই দাদার পাশাপাশি হাঁটে। আমি পিছনে পিছনে আসতে থাকি। দাদা খুব জোরে হাঁটতে পারে। ভাইও। আমি জোরে হাঁটতে পারি না।

স্কুলে ঢুকে আমরা আলাদা হয়ে যাই। ভাইয়ের ক্লাস একতলায়। ভাই একতলায় থেকে যায়। আমার ক্লাস দোতলায়। আমি দোতলায় উঠে যাই। দাদার ক্লাস তিনতলায়। দাদা তিনতলায় উঠে যায়। আমাদের ক্লাসে চল্লিশ জন ছাত্র। কুড়িটা ডেস্ক। দশ দশটা করে কুড়িটা ডেস্ক দুদিকে সাজানো থাকে। প্রত্যেক ডেস্কে দু-জন করে ছাত্র বসে। আমি ক্লাসে ঢুকে নিজের ডেস্কে বসে পড়ি। আমার পাশে গোবিন্দ বসে। আমি কোনদিন আগে আসি। কোনদিন গোবিন্দ আগে আসে। গোবিন্দ না এলে আমার খারাপ লাগে।

এগারোটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে প্রেয়ারের ঘণ্টা পড়ে। আমরা তখন হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে পড়ি। সবাই গাইতে শুরু করে : তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে.... ....। আমি গান গাইতে পারি না। আমার গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। আমি শুধু ঠোঁট নাড়ি। আর মনে মনে বলি : হে ভগবান! আমার এখানে একদম ভাল লাগে না। তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও। আমি তোমার সঙ্গে জেমকাকির জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াব।

কণ্টকস্মিত

অতুল্য ঘোষ

॥ ১৪ ॥

বিজু আর জ্ঞান (পট্টনায়ক দম্পতি) এসে হাজির হল। বিজুর মত এরকম প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর মানুষ খুব কম দেখা যায়। সব সময় অস্থির। মাথায় যখন যেটা ঢুকবে তার শেষ পর্যন্ত যাওয়া চাই। সে যাওয়াটা হবে একেবারে উদ্দাম, লাভ-লোকসানের হিসেব নেই। জওহরলাল বলতেন, Remarkable man, but...'; পণ্ডিতপ্রবর জুলিয়ান হাক্সলে বলেছেন, 'A remarkable Indian, a man whose adventures would fill a book.' জুলিয়ান হাক্সলে 'কলিঙ্গ প্রাইজ' পেয়েছিলেন। মূল্য এক হাজার পাউন্ড। কলিঙ্গ প্রাইজের প্রবর্তক বিজু পট্টনায়ক।

বিজুরা আসছে পহলগাঁও থেকে। সেখানে জওহরলালের সঙ্গে কয়েকদিন ছিল। খুব উৎসাহ করে বলল, 'দাদা, সব ঠিক হয়ে গেছে। এইবারে কংগ্রেস সংগঠনকে মজবুত করতে হবে।' আমি বললুম, 'অঃ, তা উপায়টা কি?' বিজু সোৎসাহে বলল যে, অভিজ্ঞ ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতাদের মন্ত্রিত্ব ছেড়ে সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আমার কাছে এটা অবশ্য পুরানো কথা। 'আবাদি কংগ্রেসের' পর থেকেই এ নিয়ে কয়েকজন আলোচনা করছেন, এবং কয়েকটা বৈঠকও হয়ে গেছে। সঞ্জীবিয়ার বাড়িতে বৈঠক হয়েছে। মূল কথক সুব্রহ্মনিয়াম। কিন্তু কিছুই ঘটে উঠছে না। উদ্দেশ্য —মোরারজীভাই, জগজ্জীবন রাম এবং এস কে পাতিলকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়া। আমি বললুম, 'বিজু, এ তো জানা কথা। অনেক বছর থেকেই আলোচনা হচ্ছে। মোরারজীভাই, জগজীবন রাম আর এস কে পাতিলকে বাদ দিলেই কি কংগ্রেস শক্তিশালী হবে?' বিজু বলল, 'না, না। আমরা অনেকেই ছেড়ে দেব।' উত্তর দিলুম, 'তুমি কি করে অভিজ্ঞ আর প্রবীণ হলে?' বিজুর সঙ্গে আলোচনা করে বুঝতে পারলুম যে, পহলগাঁও-এ জওহরলাল, বক্সী (গোলাম মহম্মদ) ও বিজু আলোচনা করে ব্যাপারটি প্রায় পাকাপাকি করে ফেলেছে।

কিছুদিন বাদেই হায়দ্রাবাদে জওহরলাল আর কামরাজের সাক্ষাৎকার এবং 'কামরাজ প্ল্যান'-এর ঘোষণা। চতুর্দিকে হইচই পড়ে গেল। কারুর কারুর কণ্ঠে আবার ধন্য ধন্য আওয়াজ। যাঁরা সমর্থনে মুখর হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করলে বেশ বোঝা যেত যে মন থেকে, কারুরই সায় নেই। ওয়ার্কিং কমিটির পরামর্শে সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন কংগ্রেসী মন্ত্রী তাঁদের পদত্যাগপত্র এ আই সি সি-তে পাঠিয়ে দিলেন। যেন সকলেই উন্মুখ মন্ত্রিত্ব ছেড়ে মাঠে বেরোবার জন্যে। একমাত্র ব্যতিক্রম মোরারজীভাই। তিনি কোনও আলোচনা বা সমালোচনায় যোগ দেন নি। এ আই সি সি-র মিটিং হল। পুরো সমর্থন। আমি চা খেতে খেতে বিজুকে বলেছিলুম, 'Fraudulent' পরের দিন ওয়ার্কিং কমিটিতে বিজু অভিযোগ করল, দাদা বলছেন—'Fraudulent' জওহরলাল আমার মুখের দিকে চাইলেন। আমি সভয়ে বললুম— 'এ তো অনেক দিন থেকেই জানা কথা। কামরাজ কিছুদিন থেকেই ছাড়ব ছাড়ব করছে—সে একটা পথ পেয়ে গেল। আর বিজু কি করে প্রবীণ আর অভিজ্ঞ হল।' বক্সী বলে উঠল, 'আমিও ছেড়ে দেব।' উত্তরে বললুম, 'তুমি তো কংগ্রেসের মেম্বার নও। তোমার ছাড়া না-ছাড়ায় কি এসে যায়।' সেই ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এ বক্সী মেম্বার হয়ে গেল। সঙ্গে টাকা নেই। লালবাহাদুর টাকা দিতে গেল—নিল না। নিল ইন্দিরার কাছ থেকে। সে একটা দৃশ্য। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পদত্যাগপত্র গৃহীত হল মোরারজীভাই, জগজীবন রাম, এস কে পাতিল, লালবাহাদুর ও অন্য দুজন মন্ত্রীর। লালবাহাদুরের নাম তালিকায় ছিল না। তিনি জোর করে নাম ঢোকালেন। বাকী দুজন প্রবীণও নন, আর অভিজ্ঞও নন। খালি সংখ্যা পূরণের জন্য তাঁদের ছাড়তে হল। তারপর রাজ্য মন্ত্রিসভা। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের নাম জওহরলাল করলেন। আমি বাড়িতে দেখা করে বললুম, 'এ হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে এখন হাত দেবেন না।' তারপরই আসামের বিমলা চালিহার নাম এল। আপত্তি করলুম। চীন যুদ্ধের ঘা এখনও শুকোয়নি। আর আপনি এখন ঐ সীমান্ত-রাজ্যে পরিবর্তন আনতে চান—আমার মনে হয়, সেটা ঠিক হবে না।' তারপরই রাজস্থানের মোহনলাল সুখাদিয়ার নাম। সুখাদিয়ার বদলে যাঁর মুখ্যমন্ত্রী হবার নাম হল সেই বালকৃষ্ণ কাউল দিল্লী ছুটে এসে জানালেন যে, তিনি এক দিনও চালাতে পারবেন না। অগত্যা সুখাদিয়া রইলেন। পরেই সঞ্জীব রেড্ডির নাম। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। ক্যাবিনেটের অধিকাংশ মন্ত্রী আর রাজ্য কংগ্রেসের কর্মকর্তারা ছুটে দিল্লী এলেন। হইচই শোরগোল। সঞ্জীব রেড্ডিকে কেউ ছাড়তে রাজী নন। অথচ ছজন মুখ্যমন্ত্রী চাই। কেননা, কেন্দ্রে ছজন মন্ত্রী বাদ পড়ছে। উত্তরপ্রদেশের চন্দ্রভানু গেলেন। ওড়িশার বিজু। জম্মু-কাশ্মীরের বক্সী। মাদ্রাজে কামরাজ স্বয়ং। বিহারে বিনোদানন্দর নাম ছিল না। তিনি এসে জওহরলালের কাছে আছড়ে পড়লেন। আমি সংগঠনের কাজে যোগদান করবই। পঞ্চম যখন হয়ে গেল তখন অগত্যা ষষ্ঠ স্থান পূরণ করার জন্যে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী গেলেন। এই হল 'কামরাজ প্ল্যান'। যে উদ্দেশ্য সাধারণকে জানানো হয়েছিল তার সঙ্গে সত্যের কোনও সম্পর্ক ছিল না। এবং এর প্রতিক্রিয়া ভালভাবে ফুটে উঠল ১৯৬৭র সাধারণ নির্বাচনে। কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি মাদ্রাজ। সেখানে হল শোচনীয় পরাজয়। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা—কোনও রাজ্যেই কংগ্রেস সংখ্যাধিক্য হল না। কারণ, পদত্যাগ যাঁরা করেছিলেন তাঁরা কেউ মন থেকে করেননি। তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঐসব রাজ্যে কংগ্রেস কর্মীরা কেউই মনে করেননি যে, 'কামরাজ প্ল্যানে' কংগ্রেস সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা হল। বরং বিপরীত ফল ফলেছিল। কর্মীদের মধ্যে দ্বিধা, সংশয়। মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে বিরোধ ও দলাদলি চরমে উঠেছিল। মাদ্রাজে ১৯৬২তে ডি এম কে যা পেয়েছিল, ১৯৬৭তে কংগ্রেস তাই পেয়ে নগণ্য দলে পরিণত হয়। আর যাঁর নামে 'কামরাজ প্ল্যান' তিনি নিজে পরাজিত হন।

এমন কথা আমি বলছি না যে, কেবলমাত্র 'কামরাজ প্ল্যানে'র জন্যে বহু রাজ্যে পরাজয় ঘটেছিল। এটা একটা বড় কারণ। সুশৃঙ্খলায় যেসব রাজ্যে কংগ্রেসী দল শাসনযন্ত্র পরিচালনা করছিলেন তাঁদের মধ্যে অস্থিরতা আনবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। আর দেশের মাঝেও তেমন কোনও জরুরী অবস্থার উদ্ভব হয়নি যে, এইরকম উদ্ভট পন্থা গ্রহণ করতে হল। পৃথিবীতে আরও বহু দেশে গণতন্ত্র চালু। কিন্তু কোথাও তো এমন প্রয়োজনীয়তা আছে—এরকম মনে করবার কারণ হয়নি। আমরা আর্থিক অবস্থায় অনগ্রসর। রাজনীতির চিন্তাতেও আমরা নাবালক। 'কামরাজ প্ল্যান' তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তখনও আমরা ভয়ের রাজত্বে বাস করতুম। পদত্যাগ না করলে বা সমর্থন না করলে যদি জওহরলাল কিছু মনে করেন।

জওহরলালের নিজেরও পদত্যাগ করার কথা উঠেছিল। সকলের কণ্ঠে তারস্বরে প্রতিবাদ। অর্থাৎ ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৪র মধ্যে দেশে একজনও সাবালক সৃষ্টি হয়নি। সেইজন্যে জওহরলালের থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই মনোভাব থেকে আমি নিজেকেও বাদ দিচ্ছি না। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাধি কংগ্রেসনেতা ও কর্মীদের পঙ্গু করে ফেলেছিল। জওহরলাল একবার কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির মিটিং-এ পদত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ব্যাস! আমাদের সকাতর কান্নার আওয়াজ ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে অন্য দেশে গিয়েও পৌঁছেছিল। ব্যক্তিপূজো বোঝা যায়, ধর্মের উন্মাদনা বোঝা শক্ত নয়। কিন্তু একটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে এইরকম সার্বিক ভয় বুদ্ধির অগম্য।

স্বাধীনতার পরেই জয়পুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। দেশীয় রাজ্যে এই প্রথম অধিবেশন। উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত ছিল না। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রস্তাব এলো যে, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কোনও কর্মকর্তা পর পর দুবার স্বপদে নির্বাচিত হতে পারবেন না। জওহরলাল সমর্থন করে বক্তৃতা দিলেন। সকলে নিশ্চিত জানে যে, প্রস্তাব গৃহীত হবে। জওহরলাল চলে যাবার পর আমরা দেবেনকে (দে, পরে পঃ বঙ্গের মন্ত্রী) দিয়ে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনি—'প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কর্মকর্তা এবং রাজ্য ও কেন্দ্রের মন্ত্রী'—তুমুল হর্ষধ্বনি আর হাততালির মধ্য দিয়ে সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হল। আমরা জানতুম যে, এ প্রস্তাব টিকবে না। ঠিক তাই হল। বিকেলের সভায় জওহরলাল এসে খুব রাগ করলেন। ফলে সমস্ত প্রস্তাবটাই বাতিল হয়ে গেল। এ ঘটনার মূলেও সেই ভীতি।

নামরহস্য

গোসাপ

গোসাপ এমনই একটি সরীসৃপ যার [illegible] না থাকে, [illegible] এই শব্দটি: [illegible] চট্টগ্রামের [illegible] এবং [illegible], [illegible] প্রদেশেই এর ভিন্ন ভিন্ন নাম। অভিধানে দেখা যায়, ভারতে সর্বত্র বিচরণকারী এই প্রাণীটি। এর সংস্কৃত নাম গোধার, গোধিকা এবং গোধেরা। এই প্রাণীটি কিন্তু আর্যবংশীয় হিন্দুদের অভক্ষ্য। [illegible]

[illegible] গোসাপ ও [illegible]—এই পাঁচটি পঞ্চনখ প্রাণীদের ভক্ষণীয় বলে মনুসংহিতার ৫।১৮ শ্লোকে বলা হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় এর ব্যুৎপত্তি—গুধ+অ। অর্থাৎ যে সর্বাঙ্গ [illegible] বেড়ায়। এর একটুকু শব্দ বা স্পর্শ পেলে সাপ পালিয়ে যায়, বেজির চেয়েও ভীষণ শত্রু, সাপের।

প্রাচীন সংস্কৃতে গোধা বলা হয়; গোধেয় আরও প্রাচীন ভাষা।

কুম্ভীর (কুমির)

এটি জলজন্তু হলেও স্থলে চলাফেরা করে এবং ডিম পাড়ে। এর এই নামটি বৈদিক নয়, তবে বেশ প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা। এর নামকরণটি এইরকম: 'কুম্ভিনং [illegible] অপি [illegible]'। অর্থাৎ, কুম্ভী বা কুম্ভীরকেও জলে টেনে নামাতে পারে। কারণ, জলে কুমিরের বল বাড়ে। এখানে বলে রাখি, কুম্ভীর এক নাম 'কুম্ভী'—যেহেতু মাথাটি তার কুম্ভের মত। এই কুম্ভ শব্দে প্রত্যয় করে 'কুম্ভীর'।

এর আরও কয়েকটি নাম আছে। ষষ্ঠ শতকের 'অমরকোষ' অভিধানে 'অবহার', 'নক্র'; একাদশ শতকের হেমচন্দ্রের 'নিঘণ্টুশেষ' অভিধানে 'জলশূকর', 'তালুজিহ্ব', 'নিধনগতি', 'পিঙ্গচক্ষু', 'মহামুখ' ও 'শঙ্কুমুখ' নামের উল্লেখ দেখা যায়। এবং 'চরক'-এ আছে 'জলজিহ্ব'। 'রাজনিঘণ্টু'তে নাম পাওয়া যায় 'গিলগ্রাহ' ও 'মহাবল'। তারপর ষোড়শ শতাব্দীর 'শব্দরত্নমালা'য় আর একটি নাম আছে 'অম্বুকণ্টক'।

নক্র : কুমিরের এই নামটি পাণিনি ব্যাকরণের ৬।৩।৭৫ সূত্রে আছে। ন ক্রম (অ)। এর অর্থ হচ্ছে যে, এই প্রাণীটির দেহে ও প্রকৃতিতে কোন ক্রম নেই, অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনও রীতি নিয়েও চলে না।

অবহার : কুমিরের এই নামটির অর্থ—চোর। তার এই নামকরণ এই হিসেবে করা হয়েছে যে, সে থাকে জলে, কিন্তু স্থলের প্রাণীগুলোকে চোরের মত ধরে নিয়ে যায়। পাণিনির ৩।৩।১১২ সূত্রে অব+হৃ+ঘঞ—এইভাবে প্রত্যয় করা হয়েছে।

গ্রাহ : কুমিরের গ্রাহ নামটি বেশ প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা। এই নামটির প্রকৃতিপ্রত্যয় করা হয়েছে এইভাবে—গ্রহ+অন্। গ্রাহ যে কুমিরকে বোঝায়, তা মহাভারতের বিরাটপর্বের ৫১।৭ শ্লোকে ও রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ৭৭।১০ শ্লোকেও দেখা যায়। মোট

কথা, গোটা জিনিসটা গিলে খায় বলেই তাকে বলা হয়েছে গ্রাহ।

অবশ্য 'গ্রাহ' বলতে অন্যান্য জলজন্তু এবং রাজকর্মচারীকেও বোঝায়।

তালুজিহ্ব : কুমিরের তালুতে জিহ্বা থাকে বলেই যে এর এই নাম তা নয়, ওর জিহ্বাই নেই। তালুতে আবারই রসাস্বাদ করে—চেটে চেটে খায়। তাই তালুজিহ্ব।

জলশূকর : কুমির জলে ভাসলে ঠিক শূকরের মত মনে হয়। তাই তার এই নাম।

পিঙ্গচক্ষু : কুমিরের চোখ পিঙ্গল রঙের। পিঙ্গ শব্দটি বৈদিক ঋকের ৮।৬১।১ সূত্রে আছে। আর চক্ষু নামও বৈদিক। এটা আছে ঋকের ১০।১০।১৩ এবং অথর্ববেদের ৪।২০।৫ সূত্রে; কিন্তু পিঙ্গচক্ষু এই শব্দটি নেই।

কুলীর

যদিও কুলির বা কুলীর বললে সাধারণ লোক বোঝে না, কিন্তু সংস্কৃত ভাষাবিদ্‌গণ বোঝেন। 'অমর কোষে' এই নামটি আছে এবং 'হিতোপদেশ', 'পঞ্চতন্ত্রে'ও আছে। এমন কি, জ্যোতিষ গ্রন্থেও বলা

আছে। আমাদের ১২টি রাশির মধ্যে একটি রাশির আকৃতি কুলিরের মত। কুলির মানে কাঁকড়া। খুঁদে খুঁদে যে খায়, তাকে বলা হয় কুলীর বা কুলীর। শব্দটি এসেছে ঋক্‌বেদের ১।৩২।৫ সূত্র থেকে।

কর্কট : আমাদের দেশে বিষাক্ত ক্ষত (ঘা) বা দ্রুত পচনশীল ঘা হলে কর্কট ক্ষত বা ক্যান্সার বলা চলছে। কর্ক মানে সর্বতোভাবে কুরে কুরে খেয়ে খেয়ে চলে। তাই থেকে কর্কট। কুলীর ও কর্কট একই।

বাচস্পতি

অতুলনীয় রূপ-লাবণ্য.
মনোহর. রেশম কোমল. স্নিগ্ধ সুন্দর.
LUX
LUX
SUPREME
এর পর আপনার
আর কিছুই পছন্দ হবে না
HLLS 9490
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

ক্ষণে ক্ষণে প্রতি ক্ষণে খাবার বিস্কুট

ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট

যেমন হাল্কা তেমনি সহজপাচ্য

পালযুগের চিত্রকলা

সরসীকুমার সরস্বতী

॥ ৫ ॥

চিত্রকথা—১

চিত্র প্রস্তুতির সমস্ত আঙ্গিক প্রক্রিয়ার সমাপ্তিতে আমরা পাই সম্পূর্ণ চিত্র। আঙ্গিক কথার পরে চিত্র সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা স্বতঃই অনুভূত হয়।

চিত্র আলোচনার শুরুতে চিত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্মগ্রন্থের পুঁথিতে এই ধরনের চিত্র রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। চিত্রের বিষয়বস্তু অধিকাংশ-ক্ষেত্রে একই পর্যায়ের। দু-একটি ক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম দেখা যায় তার প্রতি পূর্বেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মূলত বলতে গেলে পুঁথি নির্বিশেষে সব সময়ই চিত্রিত হয়েছে ভগবান বুদ্ধের মহান জীবনের প্রধান ঘটনাবলী আর বৌদ্ধ প্রতিমাশাস্ত্রোক্ত অসংখ্য দেব দেবীর রূপ। বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসারে ভগবান বুদ্ধের জীবনের আটটি মুখ্য ঘটনা কীর্তন আর চিত্রনের যোগ্য। যেমন—১। লুম্বিনী বনে গৌতম বুদ্ধের জন্ম; ২। বুদ্ধগয়ায় বোধিলাভ; ৩। ঈসিপতনের (সারনাথের) মৃগদাবে ধর্ম-চক্র-প্রবর্তন; ৪। কুশীনগরে মহাপরি-নির্বাণ; ৫। শ্রাবস্তী নগরে মহাপ্রাতি-হার্য; ৬। সঙ্কাশ্যে দেবাবতরণ; ৭। রাজগৃহ নগরে নালগিরি বশীকরণ; আর ৮। বৈশালীর আম্রবনে বানরের মধুদান। ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রে এই ঘটনাবলী বারবার বর্ণিত হয়েছে প্রচলিত বিধি ও নিয়ম অনুযায়ী। আমাদের পুঁথিতেও এই ঘটনাবলীর চিত্রণ দেখা যায় প্রায়শ। এছাড়া নানা বৌদ্ধ দেব-দেবীর রূপ বার বার চিত্রিত হয়েছে এইসব পুঁথিতে। ধর্মগ্রন্থের পুঁথিতে এই ধরনের চিত্রের সম্বন্ধ ও সার্থকতা নির্ণয় করা আবশ্যক বলে মনে হবে।

আমরা আগেই বলেছি দু-তিনখানি বাদে আমাদের জানা সব চিত্রিত পুঁথিই বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অনুলিপি। তার মধ্যে আবার অধিকাংশই অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞা-পারমিতার; একখানি হচ্ছে পঞ্চ-বিংশতি -সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার। বাকী পুঁথিগুলি বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অনুলিপি—এই পর্যায়ের পুঁথির মধ্যে পঞ্চরক্ষা নামক একখানি তন্ত্রগ্রন্থের অনুলিপির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী; তাছাড়াও গ্রন্থের অনুলিপি। পুঁথির প্রতিপাদ্য বিষয় নির্বিশেষে সব পুঁথিতেই চিত্র দেখা যায় একই ধরনের আর একই শ্রেণীর যার উল্লেখ আমরা গোড়াতেই করেছি।

সূক্ষ্মতর পর্যালোচনায় দেখা যায় আমাদের জানা পুঁথির মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতার চিত্রিত পুঁথি একক-ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। সামগ্রিক চিত্র-সংখ্যার অনুপাতে প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথির চিত্র ও সংখ্যায় অনেক বেশী। প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা ও বিচার। এই গ্রন্থের পুঁথিতে চিত্রাঙ্কনের কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এই যুগের চিত্রিত পুঁথির মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতার চিত্রিত পুঁথি সংখ্যায় সর্বাধিক। এই সমস্যার সঠিক সমাধান আপাতদৃষ্টিতে দুরূহ বলেই মনে হবে।

বৌদ্ধ উপাসকদের মানসে প্রজ্ঞা-পারমিতা গ্রন্থ সকল তথাগত জ্ঞানের উৎসস্বরূপ; আর এই গ্রন্থের অনু-লিপির দান, আবৃত্তি ও অর্চনা বিশেষ পুণ্যকর্ম বলে স্বীকৃত। এই মানসের প্রতিফলন দেখা যায় সকল জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে প্রজ্ঞাপারমিতার কল্পনায়। আমাদের কয়েকখানি পুঁথিতে গ্রন্থের শুরু হয়েছে দেবী প্রজ্ঞাপারমিতার নিম্নোক্ত বন্দনায়—

> নির্বিকল্পেনমস্তুভ্যং প্রজ্ঞাপার-
> মিতে'মিতে।
> যা ত্বং সর্বানবদ্যাঙ্গি নিরবদ্যৈ
> নিরীক্ষ্যসে ॥
> আকাশমিব নির্লেপা নিষ্প্রপঞ্চা
> নিরক্ষরা।
> যস্ত্বাং পশ্যতি ভাবেন স পশ্যতি
> তথাগতম্ ॥

এই বন্দনায় সকল জ্ঞানের উৎস ও প্রতীক প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ আর জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রজ্ঞাপারমিতা একই ধারায় কীর্তিতা হয়েছেন। এই দৃষ্টিতে প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থের পুঁথিতে দেবী প্রজ্ঞাপারমিতার চিত্রাঙ্কনের সম্ভাব্য কারণ পাওয়া যায়। আর এই দেবীর চিত্র আছে প্রতিটি চিত্রসংযুক্ত প্রজ্ঞা-পারমিতার পুঁথিতে। কিন্তু আমাদের পুঁথিচিত্রের অন্য সব বিষয়বস্তু—যেমন বুদ্ধজীবনের ঘটনাবলী বা অন্যান্য অসংখ্য দেবদেবীর রূপ—এসবের সঙ্গে প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থের কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্বন্ধ নেই। এসবের উল্লেখ পর্যন্ত পাওয়া যায় না প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থে। এমনকি প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথিতে চিত্রিত অনেক দেবদেবীর কল্পনা বৌদ্ধ প্রতিমা মণ্ডলীতে স্থান পেয়েছে প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ রচনার অনেককাল পরে।

পুঁথির তত্ত্ব আর চিত্রের বিষয়-বস্তুতে এই যে অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য দেখা যায় তা অনেক পণ্ডিতের মনো-যোগ আকর্ষণ করেছে। দুইয়ের সম্বন্ধহীনতা দেখে তাঁরা এই চিত্রগুলিকে ঠিক পুঁথি-চিত্রের পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে এগুলি পড়ে নিছক অলঙ্করণের পর্যায়ে আর এই অলঙ্করণেও, তাঁরা আরও বলেন,

মৈত্রেয়—আঃ দশম শতক

আগেই বলা হয়েছে প্রজ্ঞাপার-মিতার চিত্রিত পুঁথি শুধু এককভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, এই পুঁথির চিত্র সমষ্টিগতভাবে সংখ্যায়ও সব চাইতে বেশী। আবার চিত্রগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করলে এগুলো যথেচ্ছ অলঙ্করণ মনে করতেও স্বতঃই দ্বিধা জাগে। প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথিতে এই ধরনের চিত্রাঙ্কনের পেছনে একটা সচেতন মনোভাব ও অভিপ্রায়ের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় সংগত কারণেই।

পালযুগের এই পূর্বভারতীয় পুঁথিচিত্র আর তার নেপালী সমপ্রকাশ সে যুগের বৌদ্ধ ধর্মমানসের বিশেষ প্রতিধ্বনি
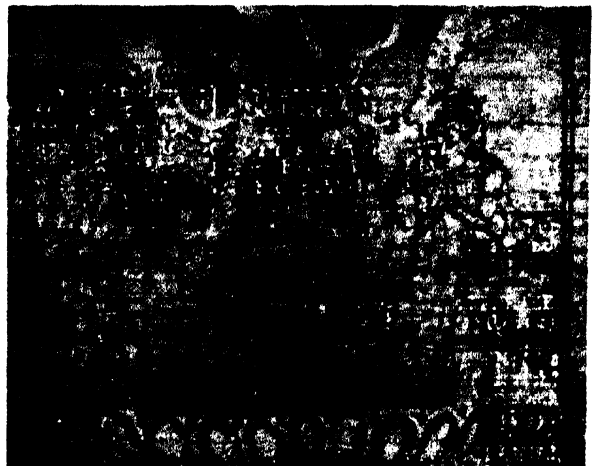
[illegible] চীনদের ফলক

তান্ত্রিক দেবী—নয়পালের চতুর্দশ রাজ্যাঙ্ক, আঃ একাদশ শতকের চল্লিশের দশক

মোরার ছেলেমেয়ে জলায় হারিয়েছে...
অরণ্যদেবের সাহায্য চাই...
?!
অরণ্যদেব রওনা হয়ে পড়েছেন
সাংকেতিক বার্তা বিনিময়...

মোরা, ওই আমাদের বন্ধু এসেছেন।
আসুন।

তাড়াতাড়ি করুন.. আমার ছেলেমেয়ে... জলায়...
ভয় পেও না... খুঁজে বার করব ... কোন পথে গেছে?
আসুন, দেখাচ্ছি!

মোরাকে বলিনি... ওই পথে... ওইদিকেই সেই দৈত্য থাকে!
দৈত্য? কুমির নাকি?
1-16

একবার দেখেছিলুম... কুমির না... দৈত্য!
!
?!
হিস্‌স্‌-

অন্ধকারে সবকিছুই বিকট দেখায়!
না, না, সত্যি দেখেছি!

বুড়োর চোখ নিশ্চয় খারাপ হয়েছে। কী দেখতে কী দেখেছে, কে জানে...
তাড়াতাড়ি চল তেজিল... দেখিপ কী হয়!

আরে, ওটা কী?
উঃ!
হিস্‌স্‌স্‌...
ঝপাং
এরপর : জলার দৈজ্য

শংকর

॥ ৬৫ ॥
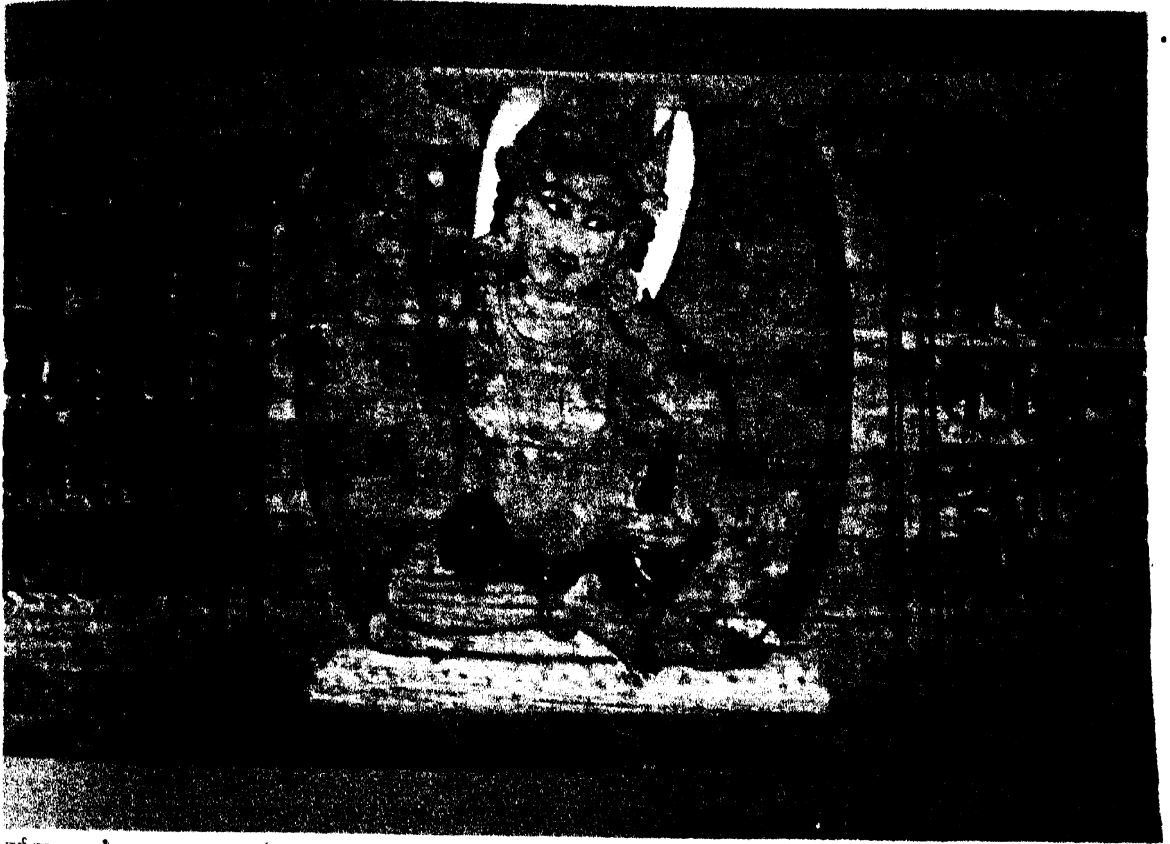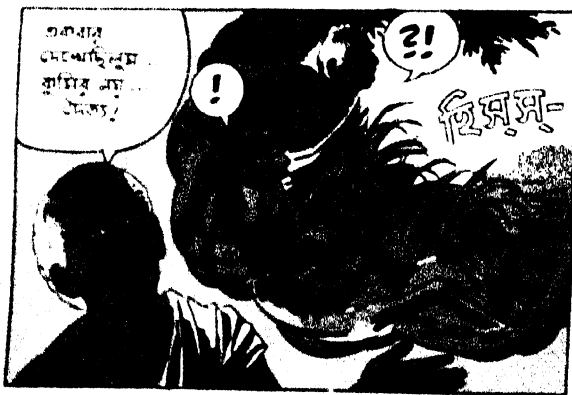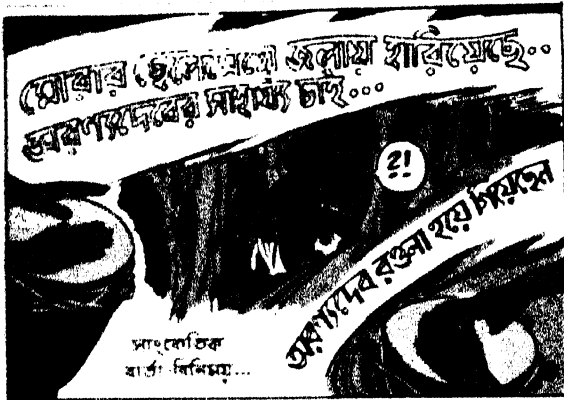
বিডন স্ট্রীটের বিলাসিনী দেবীর কাছ থেকে এখন কোনোও খবর না পেয়ে ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম।

রোজই ভাবি, আজ কোনো সুখবর এসে পৌঁছবে। রামসিংহাসনের মুখের দিকে তাকিয়েও থাকি। কাজকর্ম সেরে রামসিংহাসন চোরাশিয়া আপিস ঘরে ফিরে রুপোর পাতে-মোড়া লাঠিখানা এক কোণে দাঁড় করিয়ে রাখলেই জিজ্ঞেস করি, "আমার জন্যে কোনো খবর আছে নাকি?"

রামসিংহাসন অবশ্যই নিরাশ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে গেয়ে রাখে, খবর থাকলে সে এক মুহূর্ত দেরি না-করে আমার কাছে ছুটে আসবে।

তেলকালিবাবু একদিন এই অবস্থায় আমাকে লক্ষ করলেন। রামসিংহাসন ঘর থেকে বিদায় নিতেই ফিস-ফিস করে জানতে চাইলেন, "কিছু যদি মনে না করেন, স্যার। রামসিংহাসন আপনার জন্যে কী খবর নিয়ে আসবে?"

ব্যাপারটা আর চেপে রাখতে পারলাম না। আর আমার উত্তর শুনে তেলকালিবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। "এই বুদ্ধি নিয়ে আপনি হাইকোর্টের ব্যারিস্টারি করে এলেন?"

"ব্যারিস্টারি কোথায় করলাম?" তেলকালিবাবুর ভুল ভেঙে দেবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম।

"ওই হলো। নিজে ব্যারিস্টার না-হলেও, অতো বড়ো ব্যারিস্টারকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস সামলেছেন তো? সেন্ট পারসেন্ট বিলিতী ব্যারিস্টার, সে কি সোজা কথা!"

তেলকালিবাবু বিরক্তভাবে ঠোঁট উল্টে বললেন, "পৃথিবীতে এতো লোক থাকতে আপনি রামসিংহাসনকে বললেন, মেন সুইচের সঙ্গে আপনার কানেকশন করে দিতে। আপনার সঙ্গে মেন সুইচের ডিরেক্ট যোগাযোগ হলে রামসিংহাসনের সুইচ কী হবে? সে তো জ্বলে-পুড়ে ফিউজ হয়ে কোথায় উবে যাবে!"

"কানেকশন আর কী! আমি শুধু একবার একটু মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ চেয়েছি।" আমি এবার তেলকালিবাবুর কাছে কিছুই লুকোলাম না।

"ওই হলো! একবার আপনার লাইন সোজাসুজি মেন সুইচে চলে গেলে, এ-বাড়ির সমস্ত লাইনকে আপনার কাছ থেকেই পাওয়ার নিতে হবে। না-হলে আলো জ্বলবে না, স্যার। ইলেকট্রিক লাইনের এই নিয়ম!"

তেলকালিবাবু এরপর সাবধান করে দিলেন, "রামসিংহাসনের আশায় আপনার বসে থাকাটা মোটেই নিরাপদ মনে হচ্ছে না, স্যার। আপনার ঐ চিঠি রানীমা তো দূরের কথা, রাজকুমারীর মাস্টারমশায়ের কাছে পৌঁছেছে কিনা সন্দেহ!"

সন্দেহ নিরসনের জন্যে রামসিংহাসনকে পরের দিন আবার জিজ্ঞাসা করলাম এবং তেলকালিবাবুর ভবিষ্যদ্বাণী একশ ভাগ ফলে গেল। রামসিংহাসন আমার চিঠিটা বিলাসিনী দেবীর হাতে দেয়নি। পয়ার মাস্টারমশায় বিপুলকুমার বাগ্চির জন্যেই সে চিঠিটা রেখে এসেছে, এবং যথাসময়ে আমি নিশ্চয় দেখা করবার অনুমতি পাবো।

তেলকালিবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আবার আলোচনা হয়েছে। এবং তিনি বললেন, "যদ্দিন আছি তদ্দিন অন্তত একটু আধটু কনসালটেশন করবেন, যতখানি

মাথা চুলকোলেন তেলকালিবাবু। বললেন, "দাঁড়ান স্যার, বুদ্ধির মোটরে একটু তেল দিয়ে নিই।"

কয়েক মুহূর্ত পরেই তেলকালিবাবু ঘোষণা করলেন, "পেয়েছি! মগজের গোড়ায় তেল ঢুকতেই মতলব বেরিয়ে এসেছে।"

আমি এই স্নেহশীল সদাশিব লোকটির প্রসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই সব মানুষের সান্নিধ্য ও করুণা সংসারের দুর্গম পথে আমাকে বারবার নিশ্চিত বিপদ থেকে রক্ষা করেছে, আমাকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছে।

তেলকালিবাবু বললেন, "শুনুন স্যার। আপনি এতো বড়ো ম্যানসনের ম্যানেজার। মালিকের সঙ্গে দেখা করা আপনার পক্ষে একটুও শক্ত নয়। আপনি লাস্ট তিন দিনের ভাড়া কালেকশনের টাকা একটা তবিলে পুরুন এবং সোজা বিডন স্ট্রীটে রওনা দিন। তেমন দরকার হলে রামসিংহাসনকে আমি অন্য-পথে নিয়ে যাবো। ওখানে গিয়ে সোজা টাকাগুলো রানী-মাকে দিন।"

তেলকালিবাবু এবার হাসলেন। বললেন, "খাজনার টাকা হাতে পেয়ে খুশী হন না এমন রাজারানী এখনও জন্মায়নি! তারপর ঝোপ বুঝে কোপ মারুন। বলুন, কয়েকখানা খাস ফ্ল্যাটের কী হবে? সেলামীর কথাও তুলুন। অনেক বাড়িওয়ালা আজকাল শুধু ভাড়ার টাকায় নড়েন না চড়েন না; সেলামীর টনিক ছাড়া তাঁদের উৎসাহ আসে না!"

তেলকালিবাবুর কাছে সেদিন বিডন স্ট্রীটের কিছু অজানা খবরও সংগ্রহ করা গিয়েছিল। আমি বিডন স্ট্রীট যাচ্ছি শুনে তিনি বলেছিলেন, "বিডন স্ট্রীটের গুপ্তদের তারিফ করতে হয়, স্যার। এরা বাঘের বাচ্চা।"

"বাঘের বাচ্চা মাত্রই বীর হয়, এমন একটা ধারণা আমাদের সকলেরই কীভাবে হলো?"

"অতশত জানি না, মশাই। বাঘের বাচ্চা বলতে আমি গুপ্তদেরই বুঝি।" এর পর তেলকালিবাবু উপদেশ দিয়েছিলেন, "এসব জেনে রাখুন, স্যার। খবরই শক্তি!"

তেলকালিবাবু বললেন, এই তেলকালির তো বাড়ি-ঘর লাইনে কম দিন হলো না! দুধে দাঁত ভাঙবার পরেই পেটের জন্যে এই মোশন-তেলানো লাইনে এসেছি। কলকাতার বাড়িঘরদোরের হিসাব তো জানতে বাকি নেই কিছু।"

তেলকালিবাবু দুঃখ করলেন, "সে একদিন ছিল মশাই। কলকাতা শহরে বাড়ির মালিক বলতেই দে, দত্ত, লাহা, সাহা, গুপ্তু, গুপ্ত এই সব টাইটেল বোঝাতো। পুরো নর্থ ক্যালকাটা এবং সেন্ট্রাল ক্যালকাটা, এমনকি সমস্ত বড়বাজারের মালিকানা তখন ও'দের হাতে। সায়েবপাড়ায় দু'একটা আর্মেনিয়ান এজরা, গলস্টন, স্টিফেন কিংবা মাজদা থাকলেও, লাহা সাহারা এখানেও কম যেতেন না।"

তেলকালিবাবু বলে চললেন, "বলিহারি যাই এই সব মল্লিকের পো'দের। ব্যবসাবাণিজ্যে টাকা করে, সেই পয়সা জলে ফেলে না দিয়ে এরা একের পর এক বাড়ি করেছে এবং কিনেছে। ওই যে সিটি অব প্যালেসেস না কি বলতো প্রাসাদপুরীর সেই কলকাতা স্যার ইংরেজ বাচ্চার তৈরি নয়, তার ফুল ক্রেডিট এই বাঙালী বেনে এবং আর্মানি ইহুদিদের।"

"বাড়ি কী, মশাই! সেকালের এক একখানা বাড়ির সাইজ দেখলে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়! ক'খানা পাখা আর লাইট পয়েন্ট আছে গুনতেই আমার পাকা দেড় সপ্তাহ লেগে যাবে! তখনকার কলকাতায় তো আর মশাই এতো বাজে লোকের আমদানি হয়নি। আরশোলার মতো এই শহরে লোক কিলবিল করবে তা তো সে যুগের কেউ জানতেন না; তবে মল্লিকের পো, লাহার নাতিরা স্বপ্ন দেখেছিলেন? যথাসর্বস্ব এই ভিতকেটে ইটের মধ্যে তাঁরা পুঁতে দিয়েছিলেন।"

তেলকালিবাবু বললেন, "আমি যখন এ লাইনে প্রথম এসেছি, তখনও গোঁফ গজায়নি। তখনই আমাদের [illegible] বলতেন. ধন্য বেনের পো! স্থানীয় লোকদের মান সম্মান তোমাদের জন্যেই রক্ষে হলো।"

"ক্যানিং লাইন থেকে খ্রীস্টান হয়ে দেশত্যাগ করে বাবা এন্টালিতে চলে এসেছিলেন। বাবার মুখেও এ সব কথা শুনতাম; আর সেই শুনে গর্বে বুক ফুলে উঠতো, স্যার।" তেলকালিবাবু পুরনো দিনের কথা শোনাতে বেশ আনন্দ পাচ্ছেন।

"আপনার গর্ব হবার কারণ?"

"আমিও তো অরিজিন্যাল বেনের পো, স্যার। বাবা ধর্মো পাল্টালেও জাত তো পাল্টাননি! ছিলেন হিন্দু বেনে, হলেন খৃস্টান বেনে।"

তেলকালিবাবুর ব্যক্তিজীবনের এই সব খবর আমার এতদিন জানা ছিল না।

"তা, যা বলছিলাম, লোকাল লোকদের এই সব বাড়িঘর দেখে সত্যি গর্বে বুক ফুলে উঠতো। আপনি হয়তো বলবেন, বেল পাকলে কাকের কী? আমার মধ্যেও যে ওরকম প্রশ্ন মাঝে-মাঝে ভেংচি দিতো না এমন নয়। তবু কেন জানি না, আনন্দ হতো, মশাই। ভাবতাম, বেলটা তো কাকদেরই কনট্রোলে রয়েছে; গাছ থেকে পড়ে ফাটলে কাকদেরই সেবায় লাগবে।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করলাম তেলকালি-বাবুকে।

ভদ্রলোক বললেন, "তারপর আর কি! একতরফা নাটক দেখেই যাচ্ছি। দেখে-দেখে মনমেজাজ খারাপ হয়েছে—কিন্তু সহ্যও হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে ওইটাই বাংলার নিয়ম। লাহা সাহা দে দত্তরা রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে একের পর এক দলিলে সই লাগিয়ে সম্পত্তিগুলো চামেরিয়া, কানোরিয়া, কারনানি, ভাবনানির হাতে তুলে দেবেন। মল্লিক ম্যানসনেরই নাম হয়ে যাবে কানোরিয়া কোঠি! আমরা তাতেই অভ্যস্ত। কোনো দুঃখ নেই, কোনো লজ্জা নেই। বরং রসিকতা।"

তেলকালিবাবু শুনিয়ে দিলেন, "যা বলছি হয়তো বিশ্বাস হবে না, কিন্তু একটুও বানানো নয়!"

"শুনুন মশাই। গণেশ লাহা। নামকরা ফ্যামিলির ছেলে। বাপ পিতামহকে লোকে একডাকে চিনতো। লক্ষ্মীর সাধনা করে খেটেখুটে তাঁরা এই শহরে জাঁকিয়ে বসেছিলেন। গণেশ লাহা রহিস আদমী। ইয়ার বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত হয়ে দিন কাটান। একদিন মশাই কোর্টে কী এক সাক্ষী দিতে গিয়ে ধর্মাবতার জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করা হয়?'

'এই একটু ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজকর্ম!' গণেশ লাহা মাথা চুলকে উত্তর দিলেন।

অপর পক্ষের উকিল জিজ্ঞেস করলো, 'কী ধরনের কাজকর্ম?'

গণেশ লাহা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'এই সেলস লাইনে একটু-আধটু আছি।'

'কী সেল করেন?' জজ ধরে নিয়েছেন কোনো সেলস্-এর কোম্পানি-টোম্পানি খুলেছেন এই গণেশ লাহা। কিংবা কোনো কোম্পানির সেলস ম্যানেজার।

মাথা চুলকে গণেশ লাহা এবার উত্তর দিলেন, 'অন্য কিছু নয়। কেবল বাপের সম্পত্তি সেল করি। এক-একটা বাড়ি বেচি, কিছুদিন চলে যায়।'

কোর্টসুদ্ধ লোকের কী হাসি! গণেশ লাহা নিজেও ওদের হাসিতে যোগ দিলেন।

"কিন্তু এটা কী হাসির বিষয়? আপনি বলুন?" তেলকালিবাবু বেশ দুঃখের সঙ্গে আমার মতামত আহ্বান করলেন।

তেলকালিবাবু বলে চললেন এই গণেশ লাহার সেলস-এর খদ্দের ছিলেন একজনই। দুর্লভচাঁদ রাজধারিয়া। শেষের দিকে দুর্লভচাঁদজী আর উকিলকেও খবর পাঠাতেন না। লাহাবাবুর জন্যে সম্পত্তি বিক্রির ব্ল্যাংক দলিল স্পেশাল তৈরি করে রেখেছিলেন। স্রেফ ব্ল্যাংক জায়গায় সম্পত্তির বিশদ বিবরণটা ঢুকিয়ে দিতেন এবং গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। পরের সেই গাড়িতে চড়ে আমাদের গণেশ লাহা ড্যাং ড্যাং করে রেজিস্ট্রি আপিসে হাজির হতেন, পকেট থেকে সোনার কলম বার করে খসখস করে নিজের নাম সই করে দিতেন। কোনো লাজলজ্জা নেই, পিতৃ-পুরুষের জন্যে কোনো বিবেচনা নেই।"

দুর্লভচাঁদ রাজঘরিয়ার মোটর গাড়িতেই রোজসাঁঝে আপিস থেকে সোজা চলে আসতেন বিন্দুবাসিনীর ঘরে। বিন্দুবাসিনী! ওরে বাবা! আবার থ্যাকারে ম্যানসন।" একটু থামলেন তেলকালিবাবু।

তেলকালিবাবু বললেন, "গণেশবাবুর রিকোয়েস্টে দুর্লভচাঁদ রাজঘরিয়াই কালোয়ার শ্যামলাল গুপ্তাকে ধরে বিন্দুবাসিনীকে এই থ্যাকারে ম্যানসনে প্রোভাইড করেছিলেন।"

সেই বিন্দুবাসিনীর ঘরে গণেশ লাহা এলে কী কাণ্ড হতো! স্বয়ং প্রিন্স অব ওয়েলস যেন ভবানী-পুরের গুপ্ত বাড়ি ভিজিটে আসছেন! সে কি এলাহি ব্যবস্থা। তখনকার যুগে বিন্দুবাসিনীর ঘরে আমি দুখানা ফ্যান ঝুলিয়েছিলাম, কারণ একখানা ফ্যানে গণেশবাবু পুরো হাওয়া পেতেন না। কষ্ট অনুভব করতেন। এ ছাড়াও নিজের চোখে দেখেছি, পাঞ্জাবির বোতাম খুলে দিয়ে বিন্দুবাসিনী নিজের হাতে গণেশ লাহার বুকে হাওয়া করেছে, জিজ্ঞেস করছে, "আহা আজ খুব খাটাখাটনি হয়েছে বুঝি? সমস্ত বুকটা ঘামে ভিজে রয়েছে।"

তেলকালিবাবু বললেন, "গরম! কিন্তু কীসের গরম ভগবান জানেন। হ্যান্ডনোটের টাকার কী করে এতো গরম হয় আমরা বুঝতে পারতাম না।"

"শেষ পর্যন্ত গরম থাকলোও না", দুঃখ করলেন তেলকালিবাবু। "যে-বিন্দুবাসিনী নিজের হাতে বাবুর বুকে হাত বুলোতে বুলোতে পাখার হাওয়া করতো সেই একদিন গণেশ লাহাকে নিজের ফ্ল্যাট থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল। সবার সামনে বললো, "আপনি আর এই ঘরে পা বাড়াবেন না। আমার সময়ের ক্ষতি হয়।"

তেলকালিবাবু বললেন, "বিন্দুবাসিনীকেও দোষ দেওয়া যায় না। প্রেমের ফ্রি পাশ সাপ্লাই করবার জন্যে তো সে-বেচারা এই লাইনে আসেনি। তাকেও নিজের পেট চালাতে হবে। যার টাকা নেই, কেবল দম্ভ আছে তাকে নিয়ে সময় নষ্ট কে করতে পারে?"

তেলকালিবাবুর মুখে আরও শুনলাম, "গণেশ লাহার তখন ঘোর দুর্দিন। বাড়িঘর সব শেষ হয়েছে। সেল করবার মতো আর কিছুই নেই। নিজের বাড়িতেই তিনি তখন ভাড়াটে হয়ে আছেন। ওখানেই ছোট্ট একখানা ঘরে গণেশ লাহা অনেক অভিমান বুকে জড়ো করে মারা গেলেন। কলকাতা শহরের কালা জাদু তিনি বুঝে যেতে পারলেন না।"

"আর বিন্দুবাসিনী?" আমি জিজ্ঞেস করি।

তেলকালিবাবু বললেন, "সেও একদিন কোথায় হারিয়ে গেল এই থ্যাকারে ম্যানসন থেকে। এই কলকাতা শহর কত বড় বুঝতেই তো পারছেন। বছরে বছরে কত মেয়েমানুষের যৌবন ফুটছে, তখন টানাটানি দরাদরি হচ্ছে। দাম উঠছে। তারপর সেই ফুল শুকিয়ে ঝরে পড়ছে, ততক্ষণ দুধ ছানা মাছ মাংস ইত্যাদির সঙ্গে আবার নতুন ফুলের সাপ্লাই কলকাতায় এসে পড়ছে, কে মশায় অতশত খবর রাখবে? শুকনো ফুলের গোমস্তা হলে তো সুস্থ লোকের মাথা খারাপ হয়ে যাবে। ওসব দিকে তাকাতে নেই মশাই", সাবধান-বাণী উচ্চারণ করলেন তেলকালিবাবু।

তেলকালিবাবুর শেষ কথাগুলো যে আমার ভাল লাগছে না তা ভদ্রলোক বোধ হয় বুঝতে পারলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এসব কী আজকের কথা যে অতশত মনে রাখবো? বিন্দুবাসিনী যখন প্র্যাকটিস করছে, গণেশ লাহার ডেথ সার্টিফিকেট যখন লেখা হলো, তখনও দ্বিতীয় যুদ্ধ বাধেনি।"

"সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার বাধবার আগে থেকেই দে দত্ত লাহা সাহা মল্লিকরা নিজেদের বিষয় সম্পত্তি রাজঘরিয়া কানোরিয়াদের কাছে বেচে দেওয়ার ব্যাপারে উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছেন। ইংরিজীতে যাকে বলে বিগিনিং অব দি এন্ড'। শেষ পর্বের শুরু হয়ে গিয়েছে বেশ ভালভাবে, বুঝলেন স্যার।" মনের দুঃখে বললেন তেলকালিবাবু।

মুখ বুজে আপন মনে কলের মধ্যে তেল দেওয়ার কাজে যিনি ব্যস্ত থাকেন তাঁর ভিতরে যে এতো জিনিস লুকিয়ে আছে তা আবিষ্কার করে আমি শ্রদ্ধায় মাথা নত করলাম।

তেলকালিবাবু এবার চেয়ারের পিছনে ঠেস দিলেন। ডান পা'টা অন্য পায়ের ওপর তুলতে তুলতে বললেন, "পুরনো ব্যথাটা যেয়েও যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে টনটন করে ওঠে।"

পায়ের ব্যথা সামলে নিয়ে তেলকালিবাবু বললেন, "এক সময় এই বিডন স্ট্রীটের গুপ্তদের কত তারিফ করেছি। তারিফ করবার মতই লোক, মশাই।"

একটু থামলেন তেলকালিবাবু। "আপনি তো সার বরদাবাবুর কাছে শুধু ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিন সায়েবের গপ্পো শুনেছেন। পাকেচক্রে কী করে এই সোনার সম্পত্তি কালোয়ার শ্যামলাল গুপ্তর হাতে চলে গেল তা নিশ্চয় শুনেছেন। কিন্তু তার পরের ঘটনা তো শোনেন নি। শুনলে আপনিও বিডন স্ট্রীটের গুপ্তদের তারিফ করবেন।"

তেলকালিবাবুর মুখের দিকে তাকালাম আমি। আজ যখন বিডন স্ট্রীটে রাজদর্শনে যাচ্ছি তখন যতটা পারি জেনে রাখাই ভাল।

তেলকালিবাবু বললেন, "শ্যামলাল গুপ্তাজী হাফ প্যান্ট পরে এই কলকাতায় ছেঁড়া কাগজ বেচা-কেনা করতেন। ওই অবস্থা থেকে ভগবানের দয়ায় এই এতো বড় থ্যাকারে ম্যানসনের মালিক হয়েছিলেন। দেবদ্বিজে ভক্তি হওয়াটা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল পিতৃভক্তি।"

"বাবা তো বলতে গেলে জন্ম দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেন নি। না শিখিয়েছিলেন লেখাপড়া, না রেখে গিয়েছিলেন অর্থ। তবু শ্যামলাল গুপ্তা অনেক খরচা করে পুরনো একখানা পোস্টকার্ড সাইজের ছবি থেকে বাপ প্রভুদয়াল গুপ্তার বিরাট রঙীন ছবি তৈরি করিয়েছিলেন। ওই যে উনি এখনও আমাদের মাথার ওপর অবস্থান করছেন।" এই বলে অফিসঘরে এখনও অক্ষত ছবিটার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

বললেন, "আগে প্রতিদিন এই ছবির সামনে ধুনো দেওয়া এবং ধূপ জেবলে দেবার অর্ডার ছিল। আমি নিজের চোখে দেখেছি কত সম্মান ছিল এই ছবির। আমি খৃস্টান হয়েও দুএকদিন ধূপ জ্বালানোর ডিউটি দিয়েছি—রামসিংহাসনের বাবা তখন দেশে গিয়েছে।"

নিজের জখম পায়ে নিজেই একটু হাত বুলিয়ে নিলেন তেলকালিবাবু। তারপর বললেন, "বাপকে ভক্তি শ্রদ্ধা করলে খুব রমরমা হয়। শ্যামলালজীরও তাই হলো। কিন্তু পিতৃভক্তি থাকলেই যে নিজের পুত্রভাগ্য ভাল হবে এমন কোনো কথা নেই, মশাই।"

আমি তেলকালিবাবুর মুখের দিকে তাকাচ্ছি। তেলকালিবাবু বললেন, "এও ভগবানের এক খেলা বলতে পারেন। বাপের ছেলে সব সময় বাপের মতো হলে তো একই বংশে বারবার সূর্য উঠতো; অন্য কাউকে আর বড় হতে হতো না।"

তেলকালিবাবু বললেন, "ওসব কথা থাকগে। যার যা-খুশী করুক; তাতে আমাদের কী? ওই যে দে দত্ত লাহা সাহাদের কথা বলছিলাম না, ওখানেই ফিরে আসি। আমি তো ভেবে নিয়ে বসে ছিলুম, এদের এখন থেকে ক্ষয়ে যাবারই সময়। পূর্ণিমার চাঁদ যেভাবে ক্ষইছে তাতে ঘোর অমাবস্যার জন্যে পনেরোদিনও অপেক্ষা করতে হবে না!"

"কিন্তু!" তেলকালিবাবুর কণ্ঠস্বর হঠাৎ নাটকীয় হয়ে উঠলো। বুঝলাম পরবর্তী ঘটনা ভদ্রলোককে বেশ উৎসাহিত করে তুলছে।

তেলকালিবাবু চোখ বড় বড় করে বললেন, "হঠাৎ যেন কী হলো! ভাটার টাইমে যদি দেখেন কল কল করে নদীতে জোয়ার আসছে তা হলে কেমন অবাক লাগে বলুন তো? থ্যাকারে ম্যানসনে হঠাৎ আমাদের সেই অবস্থা হলো।"

পরেশ লাহার ভগ্নিপতি পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত। শালা ভগ্নিপতিতে স্বভাবে মেজাজে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। পূর্ণচন্দ্র গুপ্তর সামান্য কী সব কারবার ছিল; কিন্তু সেগুলোই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে চললেন। কিন্তু পয়সা এলেই তাকে লাথি মেরে বার করে না দিয়ে, কীভাবে বাঁধ দিয়ে আটকে রাখা যায় সে-বিষয়ে চিন্তা করতেন বিডন স্ট্রীটের পূর্ণচন্দ্র গুপ্তমশায়।

"তখন ঘোর যুদ্ধের সময়। হঠাৎ একদিন আমরা অবাক হয়ে শুনলাম, ঝানু কালোয়ার কানহাইয়ালাল গুপ্তা এই থ্যাকারে ম্যানসন ছেড়ে দিচ্ছেন এবং নতুন মালিক হচ্ছেন আর এক গুপ্তর পো। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম, নতুন গুপ্ত আমাদের পুরনো গুপ্তর কোনো আত্মীয়স্বজন হবেন। বিশেষ কোনো সুযোগ-সুবিধের জন্যে শ্যামলালজীর ছেলে সম্পত্তি বেনামা করে রাখছেন।"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তেলকালিবাবুদের ভুল ভাঙলো। পূর্ণচন্দ্র গুপ্তর সঙ্গে শ্যামলাল পুত্র কানহাইয়ালাল গুপ্তার কোনো পারিবারিক সম্পর্ক নেই।

তেলকালিবাবু বললেন, "তখন জাপানী বোমার হিড়িক পড়েছে। কলকাতার একটি লোকও জাপানীদের হাতে বেঘোরে প্রাণ দিতে চায় না। মানে গরীব বড়-লোক সবাই তখন কলকাতা ছেড়ে পালাবার জন্যে যে যেদিকে পারে ছুটছে। এক শ টাকার সম্পত্তি তখন রাতারাতি কুড়ি পঁচিশ টাকায় নেমে যাচ্ছে—সে দামেও খদ্দের পাওয়া যাচ্ছে না। উঃ সে এক যুগ—জাপানী বোমার হিড়িক তো আপনারা দেখলেন না! হিড়িকের শহর কলকাতা। সব সময় কিছু না কিছু হিড়িক এখানে লেগে আছে।"

"জাপানী হিড়িকের মধ্যে এক ব্যাটা জ্যোতিষী এসে কানহাইয়ালালজীকে ভবিষ্যদ্বাণী করলো, থ্যাকারে ম্যানসনের ভবিষ্যৎ ভাল নয়। এ বাড়ির পরমায়ু নাকি খুব কম। কানহাইয়ালালজী ধরে নিলেন এই থ্যাকারে ম্যানসনের ঘাড়েই তা হলে জাপানীদের পয়লা নম্বর বোমা এসে পড়বে।"

"কানহাইয়ালালজী নিজেও কিছুদিন কলকাতা ছেড়ে কানপুরে পালাবার মতলব আঁটলেন। এবং তার আগেই পূর্ণচন্দ্র গুপ্তমশায় আসরে অবতীর্ণ হলেন। যে-বাড়ি থেকে তাঁর শালাকে বার করে দেওয়া হয়েছিল, সেই ম্যানসনখানাই তিনি নগদ টাকায় কিনে নিলেন। ঘড়ির কাঁটা হঠাৎ যেন পিছনে হাঁটতে লাগলো, স্যার। দে দত্ত লাহা সাহারা যে আবার কিছু সম্পত্তি ছিনিয়ে নিতে পারবে তেমন আশা তো আমরা কখনোই করিনি।"

সেই থেকেই এ-বাড়ির সমস্ত কর্তৃত্ব ওই বিডন স্ট্রীটের। পূর্ণচন্দ্র ওই সময় নিজের নামে ঝটপট বেশ কিছু ভাল সম্পত্তি গুছিয়ে নিয়েছিলেন।

"বেশ তো। ভাল খবর। এঁরাও তা হলে মন দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করলে লক্ষ্মীকে ঘরে বাঁধতে পারেন", তেলকালিবাবুর গল্প শুনতে শুনতে আমি মন্তব্য করলাম।

তেলকালিবাবু কিন্তু আমার কথায় তেমন সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "দাঁড়ান, স্যার। অত তাড়াহুড়ি কোনো মতামত প্রকাশ করে বসবেন না।"

তেলকালিবাবু বললেন, "টাকাকড়ি ছিল। চান্স পেয়ে সস্তা দরে থ্যাকারে ম্যানসন কিনলেন পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত মশাই, ওই পর্যন্ত ভাল। কিন্তু তারপর আর ভাল নয়। অ্যাদ্দিন বেশ ভাল চলছিল, কিন্তু থ্যাকারে ম্যানসনের মালিকানা হাতে আসার পরেই যেন গোলমাল শুরু হলো", সখেদে মন্তব্য করলেন তেলকালিবাবু।

তেলকালিবাবু বোধ হয় সুযোগ পেলে একবার এই থ্যাকারে ম্যানসনের কুষ্টিটা নিজেই যাচাই করে নিতেন।

একবার তেলকালিবাবু শুনেছিলেন, পূর্ণচন্দ্র

একটা অংশে বসবাস শুরু করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মতের পরিবর্তন হলো।

বরদাপ্রসন্ন সেই সময় নাকি পূর্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন, মহাসমারোহে যাগযজ্ঞ করিয়ে এ-বাড়ির পুরনো দোষটুকু কাটিয়ে নিতে। কিন্তু পূর্ণচন্দ্র বিশেষ উৎসাহ দেখান নি।

এর পর পূর্ণচন্দ্রের সংসারেও নাকি অশান্তির ছায়া পড়েছিল। "পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত নিজে তখন সাবধানী সাত্ত্বিক মানুষ হলে কী হয়, ছেলেটি মোটেই বাপের লাইনে গেল না। বাপ কত আশা করে নাম রেখেছিলেন অর্ধচন্দ্র গুপ্ত। কিন্তু বাপের অর্ধেক গুণও ছোকরা পেলো না", দুঃখ করলেন তেলকালিবাবু।

তারপর বললেন, "এর পরের ব্যাপার তো জানেন নিশ্চয়। হাইকোর্টে কাজ করেছেন যখন তখন শুনেছেন নিশ্চয়। পুত্রের হালচাল নিরাপদ নয় বুঝে, পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত জীবিতকালেই আটঘাট বাঁধবার ব্যবস্থা করলেন। অ্যাটর্নি ডেকে সম্পত্তির নতুন ব্যবস্থা করলেন। তাঁর অবর্তমানে বিষয়-সম্পত্তির অধিকার তাঁর ছেলের থাকবে না—এসব কর্তৃত্ব থাকবে বউ-মা বিলাসিনী দেবীর ওপর। বিলাসিনীর গর্ভজাত সন্তান আঠারো বছর বয়সে সব দায়িত্ব বুঝে নেবে। অর্ধচন্দ্র গুপ্ত বাড়িতে বসবাস করবেন কিন্তু তাঁর কোনো অধিকার থাকবে না।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করি। কারণ অতীতের ব্যাপার-স্যাপার গণপতিবাবু আমাকে অত বিস্তারিত-ভাবে বলেননি।

তেলকালিবাবু বললেন, "অমন লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো বউ মা—বাপ-মা কত আশা করে নাম দিয়েছিলেন বিলাসিনী। কিন্তু কোনো বিলাসই সহ্য হতে চায় না। শ্বশুর নিজের হাতে বউমার ঘাড়ে ওই সব দায়িত্ব চাপিয়ে গেলেন। তারপর শোনা যায়, অর্ধচন্দ্র গুপ্ত খুব মনোকষ্ট পেয়েছিলেন। স্ত্রীকে নাকি বলেছিলেন, এই সব ছেড়ে চলো আমরা অন্য কোথাও পালিয়ে যাই। বেচারা বিলাসিনী দেবীর উভয়সংকট। শ্বশুর রাখি না স্বামী রাখি?"

একটু থামলেন তেলকালিবাবু। "সেকালের মেয়ে তো। ইচ্ছে করলেই শ্বশুরকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তার ওপর শ্বশুর তখন অসুস্থ, শয্যাশায়ী।"

বিলাসিনী ভেবেছিলেন, বাপ এবং ছেলেতে মান-অভিমানের পালা চলেছে। ক্রমশ সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু থ্যাকারে ম্যানসন কেনার পর থেকে ভুল বোঝা-বুঝি বেড়েই চললো। পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত একদিন ছেলেকে কিছুই না-দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

বাবার সেই অপমান ছেলে সহ্য করতে পারলো না। বউ-এর অন্ন খাওয়ার চেয়ে জীবন না রাখাই ভাল, এই বলে মশাই, অর্ধচন্দ্র গুপ্ত একদিন আত্মহত্যা করে বসলেন। কী অবস্থা ভাবুন। বিলাসিনী দেবী তখন অন্তঃস্বত্ত্বা। শ্বশুর তিন মাস আগে গত হয়েছেন। স্বামী এইভাবে বাপের ওপর প্রতিশোধ নিলেন।

বিলাসিনী দেবীর জীবনে আর কী রইলো? তাঁর পরিচয়: এস্টেট লেট পি সি গুপ্ত, W/O উইডো অফ লেট অর্ধচন্দ্র গুপ্ত।

বিলাসিনী দেবীর নাম হতেই, বহু দিন আগে বিডন স্ট্রীটের জলসাঘরের অস্বস্তিকর দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। মোমের পুতুল একটি—পদ্মা। আমার হাবভাব দেখে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।

তেলকালিবাবু বললেন, "বিলাসিনী যথাসময়ে একটি মেয়ের জন্ম দিলে। পূর্ণচন্দ্র গুপ্তর ডাইরেক্ট বংশধারা রক্ষা সম্ভব হলো না। এখন ওই পদ্মার মুখ চেয়েই বিলাসিনী দেবী বসে আছেন। বাকি সময়টা পুজোর মধ্যেই ডুবে থাকেন। পুজো ছাড়া আর কিছুই জানেন না, ওই বিলাসিনী দেবী।"

তেলকালিবাবু এবার ঘড়ির দিকে তাকালেন। পুরনো ক্লকে টং টং করে নটা বাজলো। তেলকালিবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন। বললেন, "আপনি আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করবেন না। এখান থেকে ট্রামে-বাসে বিডন স্ট্রীট যেতে আপনার এক ঘণ্টা। সাড়ে দশটার সময় মা জননী একবার পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। এখনই ভগবানের নাম করে থ্যাকারে ম্যানসন

ঘামাচির চুলকানি আর জ্বালা-যন্ত্রনা ভুলে যান!

অচেনা চীন

মৈত্রেয়ী দেবী

॥ ২৫ ॥

আমরা রাত্রি এগারোটায় কুইলীন ছেড়ে মধ্যরাত্রে ক্যানটন পৌঁছলাম।
ায় পোর্টে ডাঃ কোটনিসের বন্ধু, পত্নী ও তাঁর দুই কন্যা বৎসলা ও
ংগর্দের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁরা দূরে থাকেন, কিন্তু আমাদের
স্ট হাউসে তাঁদের জন্যও ঘর ঠিক করা ছিল। যে ক'দিন আমরা ক্যানটন
াম তাঁরাও আমাদের সঙ্গে রইলেন। ডাঃ কোটনিসের বন্ধুটি কবে কি-
বে মারা গেছেন ঠিক মনে নেই, তবে তাঁর স্ত্রীর মুখে যে একটা সকরুণ
গ আছে তাতে তাঁকে আজও সদ্য-বিধবা মনে হয়। মেয়ে দুটির ব্যবহারও
ব আপনজনের মত। এরা বৎসলাকে যেন নিজের লোকের মত কাছে টেনে
ন। যেন একই পরিবার, যেন বহু দিনের চেনা। ভারত-চীন সংঘর্ষের
য় এইসব ভারত-বন্ধুদের বড় মনঃকষ্ট হয়েছিল।

ক্যানটনের গেস্ট হাউসটি পুরানো ধরনের বাড়ি। বিরাট প্রাসাদ, কিন্তু
ণ্ট্রাল হিটিং' নেই। ঘরে একটা হীটার দিয়ে গেল। তাতে ঠাণ্ডা কমে
। শীত যেন তাড়া করে ফিরছে। এখানে পেঁাছে সেই মধ্য রাত্রে কলকাতার
ঠগুলি পেলাম। লী পাঁচখানা চিঠি প্রথম দিয়ে গেল, তারপর আবার
য় এল আরো দুখানা। বললে, 'বাম্পার হারভেস্ট।' এ পর্যন্ত দেশের
খানা চিঠি পাইনি। বিজয়বাবু বলতেন, আপনাকে কেউ লেখেনি।
ামান পথিকদের পিছনে ছুটে চিঠিপত্র হারিয়ে যাবে বলে চিঠিপত্র সব
স ক্যানটনে জমা হচ্ছিল। আর এদের জন্য আমার কত বিনিদ্র রাত গেছে।
বললে, 'তুমি তো কখনও বলোনি তুমি ভাবছ, তা হলে তখুনি খবর
ন দিতাম।'

ক্যানটনের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে 'পার্ল রিভার'। তার উপর মালবাহী
াজ যাতায়াত করছে। পুরানো শহর। খুব ঘিঞ্জি জায়গায়ও দেখলাম
টি গোল পার্কে হাতের নাগালের মধ্যেই প্রস্ফুটিত ফুলের টবের সারি
ানো রয়েছে। ক্যানটনে এসে আমাদের খুব বাজার করবার তাড়া পড়ে
দ। যে কটি ইয়েন আছে, খরচ করে ফেলতে হবে!

৬ই জানুয়ারী আমরা একটি স্বাস্থ্যনিবাসে গেলাম। সেখানে গরম জলের
দ। তবে উৎসে স্নান করবার জন্য রাজগীরের মত লাইনে যেতে
না—ঘরেই নল দিয়ে জল আসে। তবে বাইরেও পাইপ আছে
ঃ সেখানে অনেকে স্নান করছে দেখলাম। পঞ্চাশ কিলোমিটার
গাড়ি চালিয়ে আমরা ঐ স্বাস্থ্যনিবাসে পৌঁছলাম। পথে একটি বাড়ি
খিয়ে ওরা বললে, এই গেস্ট হাউসে জিয়া আছেন। চার পাশে পতাকা
ছিল। দেশগুলো ভাগ হলে নূতন নূতন লোক উচ্চপদে যাবার সুযোগ
য়। সেটা তাই কারু কারু পক্ষে আকাঙ্ক্ষিত। পাকিস্তানের কবল থেকে
রিয়ে এর থেকে আর এদের বেশি কি লাভ হয়েছে। মং আমাদের গাড়িতে
ল না, নইলে ওর সঙ্গে আর একটা বিতর্ক শুরু করতাম। গাড়িতে সর্বদা
ন জন থাকে। ভিতরে দু-জন অতিথি, বাইরে একজন ইনটারপ্রেটার।
মি, বৎসলা আর লী চলেছি ঘোরানো পার্বত্য পথ দিয়ে ছোট ছোট গ্রাম
র হয়ে, ইচ্ছে করে নেমে গিয়ে দুটো কথা কয়ে আসি। আমি বললাম,
ী, যাবার দিন তো এগিয়ে এল। এখন মনে হচ্ছে কিছুই জানা হল না,
খা হল না।' 'আবার এস। তোমার জন্যে চীনের দরজা সর্বদা খোলা।
দ যুদ্ধ বাধে আবার?' তাতে তোমারই বা কি, আমারই বা কি?
ঠিক। তবে আবার এসে লাভ নেই। আমি যা শুনলাম দেখলাম তার
র বেশী কোনো দিনও শুনতে বা দেখতে পাব না। কারণ, আমি ভাষা
ন না। স্বাভাবিকভাবে কথা বলবার ক্ষমতা আমার নেই। জানো,
দের কবি বলেছেন, কাঁটা-চামচ দিয়ে খাওয়া আর ইনটারপ্রেটারের মাধ্যমে
র্টশিপ করা একই। অতএব তোমার দেশের লোকের সঙ্গে মন জানা-
ন হল না, হবে না।' এ কথাটা ওকে কিভাবে লাগবে খেয়াল করিনি।
ানের সীট থেকে লী ফিরে তাকাল। মুখে একটু মলিন হাসি—
you are using me as a fork— আমায় তা হলে একটা
ার তুল্য ব্যবহার করছ।

স্বাস্থ্যনিবাসের নামটা বোধ হয় চুংহোয়া। সেখান থেকে আমরা
টা হাইড্রলিক পাওয়ার স্টেশন দেখতে গেলাম। পার্বত্য নদীর জল-
ধারাকে বাঁধ দিয়ে তৈরী হয়েছে এই পাওয়ার স্টেশন ১৯৫৮ সালে, 'গ্রেট
প ফরওয়ার্ড'-এর বছরে। সমস্ত প্রজেক্টটা দু বছর তের দিনে সম্পন্ন
েছে। এই যন্ত্রশালার গুণ ও গতি চমৎকার। সমস্ত প্রকল্পটি তৈরির
। তিন বছর সময় নির্ধারিত ছিল; কিন্তু উৎসাহী কর্মীরা তার অনেক
গেই কর্ম সুসম্পন্ন করেছে। চৌদ্দ হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার স্থানে
পাওয়ার স্টেশনের সাহায্য পৌঁছয়। বাইরে বেরিয়ে দেখি পর্বতচূড়ায়
বড় অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে মাও সে-তুং-এর অনুশাসন—'go all out,
a high, work faster and better so as to achieve more
nomical results to build Socialism'.

রকম কথা সব জায়গায়ই যে-কেউ লিখতে পারে। সে লেখার পাশ দিয়ে
লীন জনস্রোত বয়ে যায়। কিন্তু পাহাড়ে উৎকীর্ণ ঐ অক্ষরগুলো প্রাণ
য়েছে। পাথর থেকে নেমে এসে ওরা হাইড্রলিক যন্ত্রে মূর্তমান। নির্দিষ্ট
য়ের ন-মাস পূর্বে কাজ শেষ করে ফেলা সোজা কথা নয়।

ঐ পার্বত্য এলাকায় অনেকগুলো ছোট ছোট নদী। সেগুলোকেও কাজে
ানো হয়েছে। গ্রামের লোকেরা মিলে ছোট ছোট পাওয়ার স্টেশন বানিয়েছে।
[illegible]

সেচ জল নিয়ে এসেছে দেখলাম। ফলে দুশো ক্ষেত জমির বন্যা বন্ধ হয়েছে,
আলো তো এসেছেই। এইটাই চীনের বড় আশ্চর্য ব্যাপার। বিরাট বিরাট প্রজেক্ট
না করে যেখানে সুবিধা পাওয়া যায় কাজে লাগানো। নিজেরাই পাওয়ার
স্টেশন বানিয়েছে। স্ট্রাইক করবে কে? সাবোটাজ করবে কে? গো-স্লো করবে
কে? গ্রাম্য চাষীরা এই 'প্ল্যান্ট' কি করে বানাল জিজ্ঞাসা করে জানলাম, কালচারাল
রেভলিউশনের সময় শহর থেকে ছেলেরা এসেছিল—তাদেরই সাহায্যে এই
যন্ত্রপাতি বানানো হয়েছে। এ-রকম ছোট ছোট বাহান্নটি পাওয়ার স্টেশন
আছে এই এলাকায়। উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎশক্তি শহরের জন্য চলে যায়। শুনলাম
কাছাকাছি আরো আঠারটি এ রকম স্টেশন হবে। ওরা গল্প করছিল:
পাহাড়ের উপরে এক বৃদ্ধা একাকী বাস করত। প্রকৃতির এই দান পাহাড় থেকে
দ্রুত পতনশীল জলধারাকে সে নানা কাজে লাগাত। তাই দেখে গ্রামের লোকেরা
উৎসাহী হল। সরকার থেকে তারা আর্থিক ও বৈজ্ঞানিকের সাহায্য পায়, কিন্তু
তৈরি করেছে নিজেরাই। আমরা একটি মাঝারি গোছের পাওয়ার স্টেশন
দেখলাম। এটা অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েরা চালাচ্ছে। একটি ফুটফুটে মেয়ে—
ইংরেজী বলে—তাকে বড় ভালো লাগল। সবচেয়ে আনন্দ হল যে, কারু
সাহায্য ছাড়াই তার সঙ্গে গল্প করতে পারলাম। সে বললে, ওদের আদর্শ হচ্ছে:
'dare to scale the heights, dare to follow the road, dare to
work hard, take class-struggle as keylink to make use of
local conditions, use the local people.

উচ্চ পাহাড়ে আরোহণ করতে সাহস কর, সাহসী হও সামনে এগিয়ে যেতে,
কঠিন শ্রম করতে সাহস কর, শ্রেণী সংগ্রামের সূত্রটি মনে রেখে স্থানীয়
সুযোগের ব্যবহার কর, স্থানীয় মানুষদের সাহায্য নাও।' বাস্তব ও কবিতায়
মেশামেশি এই মাও সে-তুং। এইজনাই তাঁর বাণীতে প্রেরণা।

নদীর ধারে সুন্দর স্বাস্থ্যনিবাসে বেশ বিশ্রামে দু দিন কাটল। ফেরার
আগের দিন খাওয়ার পর আমরা চার জন—আমি, বৎসলা লী ও মং আলোচনায়
বসলাম। বহু রাত পর্যন্ত চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলো-
চনা চলল। আমি প্রশ্ন করি, মং উত্তর দেয়। বৎসলা নীরব শ্রোতা। আমাদের
প্রশ্ন ছিল লিউ শাও চি সম্বন্ধে। অত উচ্চ পদে থেকে মাও সে-তুং-এর
অনুগত হয়েও তাঁর সঙ্গে বিরোধ বাধল কেন? উত্তরে যা শুনলাম তার
সত্যাসত্য নির্ধারণের মত উপকরণ আমাদের হাতে নেই। মং-এর বক্তব্য,
তিনি বরাবরই দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। ১৯২৭ সালে তিনি একবার
'হোয়াইট টেররিস্ট'-দের কাছে আত্মসমর্পণ করতে উদ্যত হয়ে-
ছিলেন। তিনি তখন একটা নূতন থিয়োরী বলতেন—'পীস অ্যান্ড
ডেমোক্রেসী'। মুক্তির পরও তিনি ডেমোক্রেসীর কথা বলেছেন। ১৯৬৬
সালে তাঁর প্রভাব খুবই ব্যাপ্ত হয়েছিল সারা দেশে। যদিও লিউ শাও চি নয়,
চেয়ারম্যান মাও-ই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করেন। কিন্তু তিনি মাও-
সে-তুংকে অগ্রাহ্য করে একটি গোপন বিরুদ্ধ চক্র গড়েন। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ
হলে আমরাও সোভিয়েট ইউনিয়নের পথে যেতাম। তাই মাও সে-তুং
একেবারে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ বিপ্লবের সূচনা করলেন। লিউ শাও চি-র
ঘাঁটি (headquarters) ধ্বংস করাই শুধু তার উদ্দেশ্য ছিল না,
উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মনের পরিবর্তন যাতে তারা পুরানো পথে ফিরে
যাওয়ার ভ্রমটা বুঝতে পারে। কিন্তু সেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় অনেক
বাজে লোক তার মধ্যে ঢুকে পড়ে। তারা এই গোলমালের সুযোগ নিয়ে
নিজেদের স্বার্থ সাধনে লেগে যায়। এই সময় পর্যন্ত চ্যাং চিং একজন সাধারণ
কমিউনিস্ট পার্টি মেম্বার ছিল। এখন তারা সেণ্ট্রাল কমিটিতে ঢুকল এবং
খুব বিপ্লবের কথা শুরু করল। ডিফেন্স মিনিস্টার লিন পি আও চ্যাং
চিং-কে খুব প্রশংসা করলে। ক্রমে অন্য তিনজনও ঐ সময়ে দারুণ বিপ্লবী
হয়ে ঢুকে পড়ল। তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাড়তে লাগল। নবম পার্টি কংগ্রেসে
১৯৬৯ সালে তারা পলিট ব্যুরোর মেম্বার হল। জনসাধারণ বুঝতে পারত
না। চ্যাং চিং যা বলছে তা মাও সে-তুং-এর বক্তব্য কি না। তারা যাকে
খুশি বরখাস্ত করে দিত, বদনাম দিত এরা ক্যাপিটালিস্ট লিউ শাও চি-র
অনুগত। যাতে অন্য লোককে সরিয়ে নিজেদের লোক দিয়ে ঘিরে ফেলতে
পারে। মাও সে-তুং-কে কেবল বলত, একে সরাও, ওকে সরাও। যাতে
সিংহাসনে তাঁকে বসিয়ে রেখেও তাঁর সমস্ত শক্তি অপহরণ করতে পারে।
যাকে বলে ঠুঁটো জগন্নাথ করা। কিন্তু সবচেয়ে বড় বাধা ছিল প্রিমিয়ার
চৌ এন লাই। তাই ওরা মাও সে-তুং-এর কাছে তাঁর নিন্দা শুরু করে।
তিনি বিশ্বাস করেননি। তাই তখনই তিনি বলেছিলেন—
'Do not conspire, be open, do not behave like the gang of

our, write with the two hundred members of the Polit ureau.'

১৯৭৪ সালের অক্টোবরে, জাতীয় কংগ্রেস ডাকা হবে। ঐ সভায় নতুন ন্ত্রিসভা গঠন হবে। তখন চৌ এন লাই খুব অসুস্থ। ওয়াং হো (চার জনের একজন) মাও সে-তুং-কে বললে, উনি অসুখের ভাণ করছেন। তিনি াদের বিশ্বাস করলেন না। থাং সিও পিং প্রধান ও উপ-প্রধান মন্ত্রী হলেন। ৯৭৪ সালে গ্যাং অফ ফোর তাঁর কোনো ত্রুটির দায়ে তাঁকে তাড়িয়ে দেয়। ৯৭৬ সালের আটই জানুয়ারী চৌ এন-লাই মারা যান। মাও সে-তুং তাই য়াকে প্রধানমন্ত্রী ও প্রথম ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে বলেন, হুয়ার হাতে শের ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। গ্যাং অফ ফোর হুয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন লাতে থাকে। মাও ক্রমে ক্রমে বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওরাও সুযোগ য়। মাও-এর মৃত্যুর পরে ওরা তাড়াতাড়ি ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। াগজ, রেডিও ইত্যাদি (mass media) ওদের দখলে ছিল। ওরা াও সে-তুং-এর একটা উইলও জাল করেছিল। কিন্তু হুয়া হুয়ে চি চিন দের সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে ৭ই অক্টোবর ১৯৭৬ সালে ওদের বন্দী করেন। চনি তাই বলেন, এক বিন্দু রক্তপাত হয়নি, চারজনকে বন্দী করেই কার্যোদ্ধার য়ে গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তবে যে শুনি গুরুতর যুদ্ধ হয়েছিল, হাজার াজার লোক মরেছে।'

মং বললে, 'কোথা থেকে খবর পাও? হংকং থেকে বোধ হয়। আমাদের শত্রু কম?'

রাত্রি গভীর হয়ে এসেছে। লী ঘুমে ঢুলছে। আমাদের চীন দেশে ার দুটি রাত্রি বাকি আছে।

গভীর অন্ধকারের মধ্যে পরের দিন আমরা গাড়িতে ক্যানটন ফিরলাম। আমার াশ্চর্য লাগছিল যে, এই মানুষগুলির জন্য আমার বেশ একটু স্নেহ জন্মেছে, ন্তু এদের সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না।। আমার যা বয়স, আমার কি ার আসা হবে? আর কোনো ডেলিগেশন যদি এ-দেশ থেকে ভারতে যায়, রা কি আর যাবে? মং বললে, 'স্নেহ জন্মানো আশ্চর্য নয়—আজ পাঁচ প্তাহ আমরা সব সময় একসঙ্গে আছি। মানুষ এইরকমই।' আমার মুশকিল য়েছে এই যে, এদের কিছু উপহার দিতে চাই, কিন্তু আমার কাছে আর ছুই নেই। পিকিং-এই সব দিয়েছি বোঝা হাল্কা করবার জন্য। কিন্তু দিন যাদের দিয়েছিলাম তারা ছিল অন্য মানুষ। সে ছিল ভদ্রতার দেওয়া। জ পরিচয়ের বন্ধনে তারা আত্মীয়। একই মানুষের মূল্য কত বদলে যায়।

দূরে কে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই। 'জানো লী, তোমাকে প্রথমে আমার একটুও ভালো লাগেনি। আমি ভেবেছিলাম এই উদ্ধত ছেলেটাকে সামলাব কি করে?' 'অ্যাঃ, কেন?' 'কারণ, তুমি আমার কবিতাটা টাইপ করোনি।' 'ও, তারপর কখন থেকে সামলাতে পারছ?' 'সে ঠিক মনে নেই। যাই হোক, তোমার স্ত্রীকে আমার অনেক ভালোবাসা আশীর্বাদ জানিয়ে এই শাড়িটা দিও। সে যেন পর্দা করে ব্যবহার করে।' 'কেন তুমি জিনিসপত্র নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছ? জিনিস ছাড়া কি স্নেহ ভালোবাসা বোঝা যায় না?' আমার ব্যস্ততার কারণ আরো যে, বৎসলা অনেক জিনিস এনেছে —সকলকে দিতে লাগল। সে শেষ দিন পর্যন্ত জমা করে রেখেছিল।

৭ই জানুয়ারী ক্যানটনে আমরা একটা 'বোবা-কালা' ছেলেমেয়েদের স্কুল দেখতে গেলাম। আকুপাংচারের সাহায্যে চিকিৎসা হচ্ছে। সবাই যে সম্পূর্ণ সারে তা নয়। তাদের চিকিৎসা ও শিক্ষার বিস্তৃত বিবরণ দেব না। তবে তারা যে নাচগুলো দেখাল তার বিষয়বস্তুগুলো লিখছি—রাস্তায় একজনের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও রেডগার্ডরা তাকে সাহায্য করছে। আর একটি—সাধারণের জিনিস নষ্ট হচ্ছে দেখে প্রাণ বিপন্ন করেও একটি ছেলে ভেসে যাওয়া কাঠ রক্ষা করল। তৃতীয় নাচ হচ্ছে—নিষ্প্রত্র বৃক্ষে ফুল ফুটছে। এর নিহিতার্থ হচ্ছে বোবা-কালারাও কথা বলছে। চতুর্থ নাচ হচ্ছে—রেডগার্ডরা একজন পথভ্রান্ত বৃদ্ধের বাড়ি খুঁজে দিল। পঞ্চম নাচটি সবচেয়ে সুন্দর—মৈত্রী নৃত্য। ভারতের ত্রিবর্ণ ও চীনের পতাকা নিয়ে স্টেজ জুড়ে ছেলেমেয়ে টেবিল টেনিস নৃত্য করল। সঙ্গের গানের কথা ছিল—'Friendship first Compition Second' এই নৃত্যগীতে আমরা সম্মানিত ও অভিভূত বোধ করলাম।

৭ই জানুয়ারী থেকেই আমরা লক্ষ করছি রাস্তায় ছেলেমেয়েরা কাগজের পুষ্পস্তবক নিয়ে চলেছে। কিছু কিছু আসল ফুলও আছে। ৮ই জানুয়ারী আমরা পঞ্চাশ বছর আগে মাও-সে-তুং-এর প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান দেখতে গেলাম। এটি ছিল চাষীদের শিক্ষণ-কেন্দ্র। এখানে কমিউনিস্ট পার্টি তাদের কেডার তৈরি করত। ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এর পরমায়ু ছিল কয়েক মাস কিন্তু এর মধ্যেই দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে তিন শত ছাত্র এসেছিল। তাদের জন্য বইও লিখতে হয়েছিল মাও-সে-তুংকে। ছাব্বিশটা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। শাস্ত্র এবং শাস্ত্রে শিক্ষিত হয়ে তারা নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে শিক্ষণকেন্দ্র খুলেছিল। এটা বোর্ডিং স্কুল ছিল। ছুতোর দেওয়া সারি সারি খাটে মাদুর পাতা সাজানো রয়েছে। চৌ এন লাইও একজন শিক্ষক ছিলেন এখানে। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছি; আর চত্বরের উপরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে

বহুজাতিকবাদী নয়; প্রকৃতিবাদী মানুষ কি করে এমন একটি একসূত্রে বাঁধা হল, তার কতটুকু বুঝলাম? পাশ্চাত্য দেশে দেখেছি, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে কি এক অশান্তির দাপাদাপি করে ফিরছে। মদ্যাভ্যাস, ফ্যাশান, অর্থ, যৌনতা ইত্যাদিতে বাস্তবতাড়িত জীবনের উগ্র চেহারা আগে এমন করে কখনো চোখে পড়েনি। কারণ, যতই ভারতের ত্যাগধর্ম, উপনিষদের বাণী, আধ্যাত্মিকতার কথা আলোচনা হোক না কেন, পশ্চিমের অনুকরণ এবং লোভের তাড়না এখানেও তো ক্রমে ক্রমে উৎকট হয়ে উঠছে। তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা তো বিশেষ দেখিনি। তাই চীনে এসে বিস্মিত হয়েছি। চীনেরা চীনেই, তারা ইয়োরোপের সঙ্গে কোনোরকমভাবে পাল্লা দিচ্ছে না। বসনে-ভূষণে ধরনে-ধারণেও তাদের ইয়োরোপীয় হবার ইচ্ছা নেই। 'বিলাতী ধরনে হাসি বিলাতী ধরনে কাশি'—এ জাতটা লক্ষ করলাম না। এই স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস তাদের অনেকেরই চরিত্রে একটা স্থৈর্য এনেছে। এমন কি অল্পবয়সীদেরও। যদিও উত্তরে-প্রত্যুত্তরে, বুদ্ধির দীপ্তিতে, চরিত্রমাধুর্যে ঘাটতি পড়েনি। দেশের কি আমূল পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে মানুষের পরিবর্তন ঘটিয়েই। অন্তত আমার এইরকম মনে হয়েছিল।

কুইলীনে ব্যাঙ্কোয়েটে আমি বলবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তখন আমি এ কথাই ওদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ওরা হয় নিজেদের ধর্মে বিশ্বাসী নয় বলে, সেটা সত্য নয়। ধর্মের যে মূল কথা—ত্যাগ, নির্লোভতা ও সৌভ্রাত্র, তাই যদি তোমাদের আদর্শ হয়, তবে তোমরা ধর্মহীন কেন? দশ অনুশাসনের যে অনুশাসনটি সর্বজনগ্রাহ্য, তা হচ্ছে 'thou shall not steal;' তাই যদি তোমরা এমন করে প্রয়োগ করছ, তবে তোমাদের ধর্মহীন বলা চলে না।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে আমি বৎসলাকে ভোররাতে ঘুম ভাঙিয়েছিলুম। আমি তাঁকে বলেছিলুম, 'আমার এ-দেশ ছেড়ে যেতে মন কেমন করছে। কাল আমরা অন্য জগতে চলে যাব।' তিনি তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'হাঁ, সেই জগৎ আমার হংকং। আমাদের যা বদঅভ্যাস হয়ে গেছে—যেখানে-সেখানে জিনিস ফেলে রাখা।'

হংকং-এর জগতে প্রবেশ করেছি হোটেল এম্পটনে। ঘরে ঢুকে মাল-পত্তরের জন্য অপেক্ষা করছি এমন সময় লম্বা চুল স্মার্ট ইউনিফর্মে দুটি অল্পবয়সী ছেলে বাক্স এনে রাখল। তারপর একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে, 'আমরা বকশিশ আশা করতে পারি কি?' একেবারেই পারো না। কারণ, সার্ভিস চার্জ ধরাই আছে। বৎসলা বললেন, 'আমরা তো টাকা চেঞ্জ করিনি।' আমি ভাবলুম শুধু হল আর এক জগৎ। চীনে যারা হোটেলে পরিচর্যা করত তারা ছিল ঘরের ছেলেমেয়ের মত। কেউ কোনো কলেজ থেকে এসেছে, কেউ কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে। তাদের বকশিশ দিতে গেলে তারা অপমানিত হবে। এরকম অন্য কোনো কমিউনিস্ট দেশেও নয়। চীনে এরা ভৃত্য নয়। ভৃত্যোচিত মনোভাবই নেই কারু—না যারা সেবক, না যারা সেবিত।

বৎসলা টেলিভিশন চালিয়ে দিলেন। অমনি পর্দায় অর্ধোলঙ্গ, নর-নারীর নৃত্যলীলা ভেসে উঠল। একটুক্ষণ দেখে আমি বললাম, বৎসলা, এতদিন আমরা regimented art নিয়ে অনেক নিন্দা করেছি; এবার তোমার unregimented art একটু থামাও তো।' বৎসলা আর একটা চ্যানেল ঘুরিয়ে দিলেন। সেখানে বিজ্ঞাপনের ধুমধাড়াক্কা শোনা গেল। অগত্যা বৎসলা এবার তৃতীয় চ্যানেল দিলেন। সেখানে একটি খুনের গল্প চলেছে। টেলিভিশন বন্ধ করে আমরা চুপ করে বসে রইলাম। আমার আর বাজারে যাবার ইচ্ছা রইল না। ভারত সরকার আমাদের আটাশ আমেরিকান ডলার দিয়েছিলেন। সেগুলো সকলেই আঁকড়ে ছিলাম—যাতে হংকং-এ কিছু জিনিস কিনতে পারি। 'বৎসলা, আমি আর দোকানে যাব না। আমার প্রবৃত্তি নেই। এখন আমার চীনের জন্য মন কেমন করছে।' বৎসলা স্নান করে তৈরী হতে গেলেন। ওঁর দাদাকে নিয়ে বেরুবেন। আমি শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম—এবার কি আমি স্বপ্ন দেখব যেন একটা প্লেনের সিঁড়ি বেয়ে জামাকাপড়ের বোঝা সামলিয়ে নড়বড় করতে করতে উঠছি, আর পিছনে লী আমার কনুইয়ের কাছটা ধরে উঠতে সাহায্য করতে করতে বলছে— 'Be careful Mrs. Devi, there is a step down'— সাবধানে নাম, নিচে একটা সিঁড়ি আছে।' আর ঠিক তখনই আমি নিচে না তাকিয়ে উপরে তাকিয়ে দেখি, সেটা একটা মন্দিরের সিংহদ্বার। তার ওপাশ দিয়ে আমি নেমে চলে গেছি একটা বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে। সেখানে সবুজের বন্যার মধ্যে আবালবৃদ্ধ নরনারী নীল কোট পরে মাথায় স্কার্ফ বেঁধে কাজ করছে। কিংবা একটা আপেল-বাগান—যেখানে একটি বৃদ্ধ চাষীর নির্দেশে একটা গোটা স্কুলের ছেলেমেয়ে ফল পেড়ে ঝুড়িতে ভরছে। কিংবা একটা গ্রাম—যেখানে দু-একটি কলেজের ছেলের তত্ত্বাবধানে গ্রামের লোকেরা নিজেদের গ্রামে বাতি জ্বালাবার জন্য হাইড্রলিক যন্ত্র বসাচ্ছে। না, স্বপ্ন নয়। কারণ, তখন আমার প্রসুপ্তির মুহূর্ত নয়—জাগরণ ও মননের সময়। আমি জানি—মন্দিরের সৌধ একই, শুধু বিগ্রহের বদল হয়েছে। হয়তো আরো বদল হবে। কারণ, চলাই সংসারের রীতি। শুধু ভাবছি, সামনের দিকেই চলবে তো?

॥ শেষ ॥

বিজ্ঞান

পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র

ট্রম্বে থেকে ফিরে ঃ ১

ট্রম্বে। কে রেখেছিল এই নাম? বম্বের বিমান্ ...র সাক্ষাৎকারে এই প্রশ্নই প্রথম জিজ্ঞেস করেছিলাম ...নক বিজ্ঞানীকে। ভদ্রলোক প্রশ্নটির জন্যে হয়ত ...তুত ছিলেন না। মুহূর্তের জন্যে নীরব হলেন ...নি। তারপর বললেন, বলা শক্ত। শুনেছি, স্থানীয় ...কেরা বলত তুরুম্বে। এই তুরুম্বেই এখন হয়ে ...ড়য়েছে ট্রম্বে। আর ট্রম্বে মানেই ভাবা পারমাণবিক ...বষণা কেন্দ্র। তবে এত বড় নাম স্থানীয় লোকেরা ... মনে রাখতে পারে না। তাদের কাছে এর একমাত্র ...রচয় 'ভাবা'।

বোম্বের উপকণ্ঠ চেম্বুর থেকে মোটরে দশ ...নটের পথ। সেই পথেরই এক প্রান্তে বিরাট এলাকা। ...রক্ষিত। নর্থ গেট দিয়ে সেই সংরক্ষিত এলাকায় ...য় যখন হাজির হলাম, মনে হল আমি যেন ভিন্ন ...তের অধিবাসী। নিখুঁত। সব কিছুই নিখুঁত। ...স্ত পথ। কখনও সোজা, কখনও পাশাপাশি। তাদের পাশে গাছের সারি। আর তার ফাঁকে ফাঁকে এক-...টি জ্যামিতি সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে বহুতল বাড়ি। ...জ্ঞানী প্রযুক্তিবিদ এবং অন্যান্য কর্মীদের আবাস। ...হ সেকটর মার্কেট। কয়েক হাজার কর্মীর ...চ্ছন্দ্যের জন্যে যা কিছু দরকার সবই পাবেন এখানে। ...ছ চব্বিশ তলা ছাত্রাবাস। এক পাশে এ তল্লাটের ...চেয়ে উঁচু পাহাড়। নাম ট্রম্বে। আর এক পাশেও ...াড়। দক্ষিণে আরব সাগরের খাঁড়ি। ইংরেজিতে ...ক বলে ক্রিক। ক্রিকের মাঝখানে অদূরে এলিফেন্টা ...াড়।

কড়া সিকিউরিটি পেরিয়ে গবেষণাগারের মূল ...র। একটু এগুলেই বাঁ পাশে চোখে পড়বে গগন-...ী চিমনি। এই হল পূর্ণিমা। প্লুটোনিয়াম ...কাশনের চুল্লি। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় প্লুটো-...াম রিঅ্যাকটর ফর নিউট্রোনিক ইনভেসটিগেশনস ... মালটিপ্লাইং অ্যাসেমব্লিজ। ১৯৭২ সালে সম্পূর্ণ ...তীয় চেষ্টায় তৈরি যে চুল্লি কাজ শুরু করে। কাজ ...র পর আন্তর্জাতিক পরমাণু বিজ্ঞানী মহলে যা রীতিমত সাড়া জাগিয়েছিল। তুলেছিল বিতর্কের ঝড়।

আরও এগিয়ে গেলে চোখে পড়বে আরও তিনটি পারমাণবিক চুল্লি। জারলিনা এবং সাইরাস। সাইরাসের পাশে এখন শক্তিশালী একটি পারমাণবিক চুল্লি তৈরির কাজ চলছে। আপাতত যার নাম রাখা হয়েছে আর-৫। এখানে চোখে পড়বে ভারতের বৃহত্তম পারমাণবিক স্মারক বন্দ ভাণ্ডি গ্রাফ। একের তিন মাইল লম্বা বহুতল গবেষণাগার মণ্ডলার ল্যাব। তার কাছাকাছি একের পর এক ওয়ার্কশপ। এই সব ওয়ার্কশপেই তৈরি হচ্ছে নানা রকম যন্ত্রপাতি। এই সব ওয়ার্কশপই ভারতের আধুনিক ইলেকট্রনিক শিল্পের সূতিকাগার। দেশকে পারমাণবিক শক্তির ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার বিরাট আয়োজন চলেছে ওখানে। কলকাতার সল্টলেকের ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রনের ইলেক-ট্রনিক যন্ত্রপাতি এবং নানা রকম সাজসরঞ্জামের পরি-কল্পনা এবং উদ্ভাবনার কৃতিত্বও এখানকার বিজ্ঞানী এবং কুশলীদের। কাজ চলছে লেজারের ওপর, ম্যাগনেটো হাইড্রোডায়নামিক্স বা 'এম এইচ ডি' পদ্ধতির সাহায্যে কিভাবে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা যায় তার ওপর গবেষণা।

পারমাণবিক শক্তিই শুধু নয়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে পরমাণু বিজ্ঞানের সাহায্যে কি ভাবে আরও বেশি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সে ব্যাপারেও এক ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে এখানকার বিজ্ঞানী এবং কুশলীরা দিন রাত গবেষণা করে চলেছেন। গবেষণা করছেন কৃষি বিজ্ঞানে, চিকিৎসা বিজ্ঞানে, ধাতু অথবা খাদ্য সংরক্ষণ বিষয়ক বিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে।

রেডিয়েশন মেডিসিন ল্যাবোরেটারিতে বসে জনৈক বিজ্ঞানীকে প্রশ্ন করেছিলাম, আপনাদের মূল লক্ষ তো ছিল পারমাণবিক গবেষণা। তবে এত সব কেন? এসব কাজ তো দেশের অন্য সব গবেষণাগারেও হতে পারে?

ভদ্রলোকের তাৎক্ষণিক উত্তর ঃ নিশ্চয় হতে পারে। হচ্ছেও তো। কিন্তু আমাদেরও এসব কাজে হাত না দেবার কোন মানে হয় না। বরং বলব, অনিবার্য কারণে তা প্রয়োজনও। আমাদের মূল লক্ষ ছিল পারমাণবিক গবেষণা। শক্তির প্রচলিত উৎসের বিকল্প হিসেবে এ-দেশে একদিন পরমাণুকে কাজে লাগাতে হবে, ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার এটাই ছিল স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্যে দরকার মৌলিক এবং
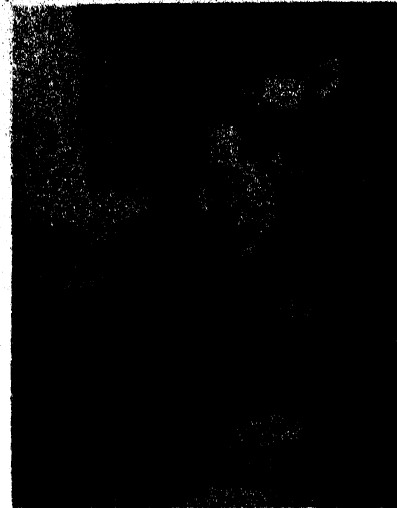
ভারতে পারমাণবিক শক্তির রূপকার ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা।

প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা। তার জন্যেই তৈরি করেছি আমরা একের পর এক গবেষণাগত পারমাণবিক চুল্লি। অপ্সরা, জারলিনা, সাইরাস ইত্যাদি। এ সব চুল্লিতে নিয়মিত নানা রকম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি হচ্ছে। কৃষি বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাদের ভূমিকা কেউই আজ আর অস্বীকার করতে পারেন না। কোন কোন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি হচ্ছে এখানে যাদের জীবনকাল ক্ষণস্থায়ী। সেই সব বস্তুর সাহায্যে কৃষি বিজ্ঞানের যদি কাজ করতে হয়, অথবা চিকিৎসা বিজ্ঞানের, তা হলে সে সব কাজ এখানেই করতে হবে। অন্তত করার সুযোগ এখানেই বেশি। এই জন্যেই পারমাণবিক গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি এবং চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণারও ব্যবস্থা করতে হয়েছে আমাদের।

হ্যাঁ। এটা শুধু একটি মাত্র উদাহরণ। যথা সময়ে
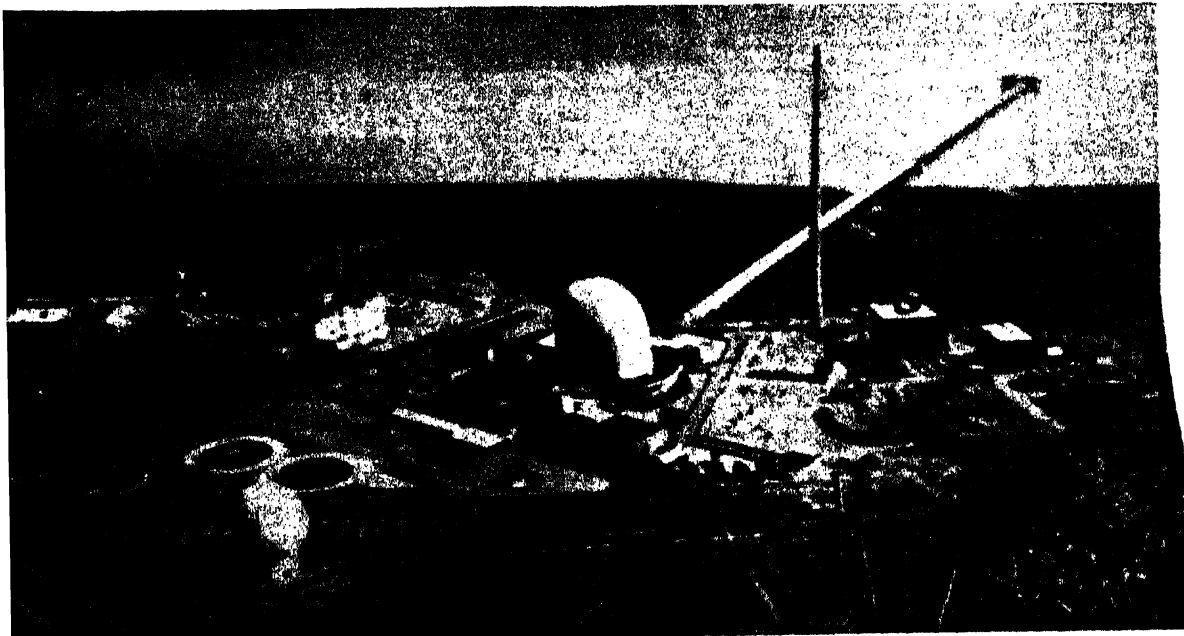
...পাশের মোচাকৃতি ট্যাঙ্ক থেকে প্রয়োজনে ঠাণ্ডা জল সরবরাহ করে গম্বুজাকৃতি সাইরাস রিঅ্যাকটারটিকে ঠাণ্ডা রাখা হয়। তবে বেশির ভাগ সময় এ কাজ করা হয় ...দ্র থেকে পাইপ যোগে জল সরবরাহ করে। রিঅ্যাকটার ঠাণ্ডা করার পর জলটিকে ফেরার সময় লক্ষ রাখা হয় সেই জলে এতটুকু তেজস্ক্রিয়তা যাতে না থাকে। বাঁ দিকে ... তৈরি হচ্ছে নতুন পরীক্ষামূলক চুল্লি আর-৫। এর শক্তির পরিমাণ দাঁড়াবে ১০০ মেগাওয়াট।

এ নিয়ে পরে বিশদ আলোচনা করব। তার আগে বরং এই গবেষণাগারের পরিচালক এবং বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ রাজা রামান্নার মন্তব্যটি শুনুন।

ডঃ রামান্নার ঘরে বসেই কথা বলছিলাম। তিনি বললেন, ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং কুশলীরা যে পৃথিবীর যে কোন দেশের বিজ্ঞানী এবং কুশলীদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, বরং কোন কোন ব্যাপারে আরও বেশি দক্ষ, ভাবা পারমাণবিক গবেষণাগার তা প্রমাণ করেছে। আমাদের লক্ষ্য ছিল পারমাণবিক প্রযুক্তিতে আমরা স্বয়ম্ভর হব। এখন আমরা স্বয়ম্ভর। ক্রমপর্যায়ে ফাস্ট রিঅ্যাকটার নিয়ে আমরা কাজ করছি। থোরিয়াম এ-দেশে আছে বিস্তর। থোরিয়াম-২৩২। এই থোরিয়ামকে কিভাবে বিভাজনক্ষম ফেরিয়াম-২৩৩-এ পরিণত করা যায়, সে রহস্যেরও আমরা সমাধান করেছি। আমার বিশ্বাস, ১৯৮০ সালের মধ্যেই আমরা থোরিয়াম থেকে পরীক্ষামূলক ভাবে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে সমর্থ হব। আর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে থোরিয়াম থেকে আমরা বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করব ১৯৯০ নাগাদ। তখন এখনকার মত আমাদের আর ইউরেনিয়ামের ওপর বেশি নির্ভর করতে হবে না।

তা যদি হয়, বলতে হবে, পারমাণবিক গবেষণায় এবং মানব কল্যাণে পারমাণবিক উদ্ভাবনায় ভারত এখন পৃথিবীর প্রথম সারির দেশগুলির মধ্যে অন্যতম।

দেখেছি। ছিলাম পুরো ছয় দিন। এই ছয় দিন ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের যাবতীয় কার্যক্রম বিশদভাবে বুঝে ওঠার চেষ্টা করেছি। দেখেছি, সব কিছুর পেছনেই রয়েছে সুষ্ঠু পরিকল্পনা। বহুমুখী। কিন্তু একই সূত্রে গাঁথা। প্রতিটি কাজ চলছে রুটিন মাফিক। ঘড়ির কাঁটা ধরে। এখানকার পরিবেশ, এখানকার কাজের ধারা পৃথিবীর যে কোন দেশের বিজ্ঞানীর কাছেই আমার মনে হয়েছে ঈর্ষার মত। যে ঈর্ষা মানুষের মনে গর্ববোধ জাগায়। যে ঈর্ষা মানুষকে আশাবাদী করে তোলে। আর সেই সঙ্গে বার বার মনে পড়েছে একটি মাত্র মুখ। হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা।

*

চাই সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। প্রয়োজন সুপরিকল্পিত আর্থিক সাহায্য। এদের অভাবেই ভারতীয় বিজ্ঞান অগ্রগতির পথে বাধা পাচ্ছে। কিছুটা অভিমান হয়ত। কিন্তু সুস্পষ্ট প্রত্যয়ের সঙ্গে নিজের ধারণাটি তুলে ধরেছিলেন ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা। তুলে ধরেছিলেন আর একজন ব্যক্তিত্বের কাছে। জে আর ডি টাটা। ১৯ অগাস্ট তাঁর কাছে লেখা একটি চিঠিতে ডঃ ভাবা মন্তব্য করেন : সত্যিই যদি আমরা ভারতীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতি কামনা করি, মৌল অথবা বিশুদ্ধ গবেষণার ওপর আমাদের অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। জানি, তার হয়ত কোন তাৎক্ষণিক প্রাপ্তি নেই। কিন্তু বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে গেলে এটা দরকার। কেন? সোভিয়েত দেশের দিকে চেয়ে দেখুন না! আর্থিক এবং সামাজিক উন্নয়নে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং উদ্ভাবনার ওপর সে দেশের মানুষ গুরুত্ব আরোপ করলেও মৌল গবেষণাকে কখনই তাঁরা অবহেলা করেন নি।

ওই চিঠিতেই ভাবা ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছিলেন : এক, বিজ্ঞানকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে গবেষণায় সফল হতে গেলে দরকার উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম, সুযোগ সুবিধে এবং সুষ্ঠু পরিবেশ। তার একান্তই অভাব। দুই, বিজ্ঞানীদের ওপর খুব বেশি প্রশাসনিক দায়িত্ব এবং পঠনপাঠনের চাপ পড়লে উচ্চতর গবেষণায় তাঁদের পক্ষে মনোনিবেশ করা শক্ত। তিন, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব এবং গবেষণাগারগুলির চরম দুর্গতির দরুন অনেক বিজ্ঞানীই বিশ্ববিদ্যালয়ে টিঁকে থাকতে চান না। পেশা হিসেবে তাঁরা প্রশাসন অথবা বাণিজ্যিক সংস্থাকে বেছে নেন।

জে আর ডি টাটা ভাবার এই চিঠির উত্তর দিলেন ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ : আপনার চিঠিতে যে কথা আপনি বলতে চেয়েছেন, তাতে বুঝতে পারছি, ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক কিছু ভাল দের মধ্যে এ ব্যাপারে যদি কোন সঠিক এবং নির্দিষ্ট প্রকল্পের কথা জানান, আমার বিশ্বাস আপনাদের সেই প্রকল্প স্যার দোরাবজি টাটা ট্রাস্ট এবং হয়ত বা স্যার রতন টাটা ট্রাস্টও যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করে দেখবেন।

অনুপ্রাণিত হলেন ভাবা। ১২ মার্চ, ১৯৪৪ নিজের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দিলেন স্যার দোরাবজি টাটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান স্যার সোরাব ডি সকলাটভালার কাছে। নানা রকম প্রসঙ্গ এই প্রকল্পে তুলে ধরেছিলেন তিনি। পারমাণবিক গবেষণা তাদের মধ্যে অন্যতম।

ভাবা লিখলেন, আগামী দুই দশকের মধ্যে এ দেশ যখন সাফল্যের সঙ্গে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে সমর্থ হবে, ভারতকে তখন আর বিশেষজ্ঞের খোঁজে বিদেশে হাত বাড়াতে হবে না। তখন তাঁদের আমরা হাতের কাছেই পেয়ে যাব।

অদ্ভুত দূরদৃষ্টি। ১৯৪৫ সালের অগাস্টে হিরোসিমার ওপর ফেলা হয়েছিল পরমাণু বোমা। আর তার আঠারো মাস আগে বাঙ্গালোরে বসে শুধু 'পারমাণবিক বিভাজন করা সম্ভব' একমাত্র তার তাত্ত্বিক খবরাখবরের ওপর নির্ভর করে পরমাণু বিজ্ঞানের কল্যাণময়ী ভূমিকার এমন একটি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্থির নিশ্চয় হয়েছিলেন ভাবা। এই ঘটনার মাত্র এগার বছর পর ১৯৫৬ সালে এ দেশে বসল প্রথম পারমাণবিক চুল্লি 'অপ্সরা'। শুধু ভারতে নয়, সারা এশিয়ায় প্রথম। আর তার তেরো বছর পর ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ তারাপুরে চালু হল প্রথম পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটিই পরমাণু বিজ্ঞান এবং বিশেষ করে পারমাণবিক প্রযুক্তি বিদ্যায় ভারতকে আত্মনির্ভর হতে সাহায্য করল।

*

ডঃ রাজা রামান্না বলছিলেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং উদ্ভাবনার ব্যাপারে কলকাতার একটি নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, দেবেন্দ্রমোহন বসু, কত নাম। তবে সবচেয়ে আগে জগদীশচন্দ্র এবং সি ভি রামন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে এ দেশে প্রথম যে প্রতিষ্ঠানটি তৈরি হয়েছিল, যে প্রতিষ্ঠান এখন পরিবর্ধিত—সেই ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়ান্স, সেও এই কলকাতাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরমাণু বিজ্ঞানের সুষ্ঠু চর্চাও প্রথম শুরু হয়েছিল এই শহরেই। ট্রম্বেতে শুরু হল আর এক অধ্যায়।

ভাবার চেষ্টায় এবং তাঁর সুষ্ঠু নেতৃত্বে বোম্বাই-এ প্রতিষ্ঠিত হল টাটা ইনসটিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ। সেটা জুন, ১৯৪৫। প্রতিষ্ঠার অল্প দিনের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটি হয়ে দাঁড়াল ভারতীয় পারমাণবিক গবেষণা, বিশেষ করে পারমাণবিক শক্তি বিষয়ক গবেষণার প্রাণকেন্দ্র। পৃথিবীর বিশিষ্টতমদের মধ্যে অন্যতম। শুরু হল মৌলিক গবেষণা। পৃথিবীর অগ্রণী দেশগুলির কেউই চায় না, বিজ্ঞানের এই বিশেষ ক্ষেত্রে ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশ কোন ভূমিকা নিক। বিশেষ কারণে পারমাণবিক গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সম্পর্কে তারা যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা করে কাজ করে চলেছে। অতএব যদি এ ব্যাপারে কিছু করতে হয়, এ দেশের বিজ্ঞানীদের নিজের চেষ্টাতেই তা করতে হবে। জানতে হবে পারমাণবিক বিক্রিয়ার মূল রহস্য। জানতে হবে পারমাণবিক বিভাজনকে নিয়ন্ত্রিত করে কি ভাবে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা যায় তার গুপ্ত কথা। প্রয়োজন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের প্রযুক্তি। সে ব্যাপারে পয়সা খরচ করেও বিদেশের সাহায্য পাওয়া দুষ্কর। বিপজ্জনক পারমাণবিক বিকিরণের দরুন পরিবেশ যাতে না দূষিত হয়, মানুষ, পশুপাখি, গাছপালার যাতে না কোন রকম ক্ষতি হয়, এ দিকটাও একটা বড় রকমের সমস্যা। এ সমস্যারও সমাধান করতে হবে নিজেদের। পারমাণবিক চুল্লির জন্যে দরকার ইউরেনিয়াম। আকরিক থেকে সেই ইউরেনিয়ামকে নিষ্কাশিত করে বিভাজনযোগ্য বস্তুতে রূপান্তরিত করতে হবে। ভারতে ইউরেনিয়ামের পরিমাণ কম। আছে থোরিয়াম। পর্যাপ্ত থোরিয়াম। কিন্তু সেই থোরিয়ামকে পারমাণবিক জ্বালানিতে পরিণত করার কলাকৌশল তখনও অজানা। অজানা পৃথিবীর সর্বত্র। এ ধরনের বহু সমস্যা নিয়ে গবেষণার কাজে নেমে পড়লেন টাটা ইনসটিটিউট অব ফানডামেন্টাল রিসার্চ। বলিষ্ঠ পদক্ষেপে।

ক্রমে স্থান সংকুলানের সমস্যা দেখা দিল। ভাবার

আজকের ট্রম্বে। সামনে গামলার মত দুটি জলাধার। পিছে ফুলের বাগান। বাগানের সামনে প্রশাসনিক ভবন।

পরিকল্পনা মত টাটা ইনস্টিটিউটের পরমাণু বিজ্ঞানীদের একটি বড় রকমের দলকে সরিয়ে আনা হল ট্রম্বেতে। সেটা জানুয়ারি, ১৯৫৪। তৈরি হল পৃথক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে পারমাণবিক শক্তি গবেষণা কেন্দ্র। গবেষণা কেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু। ২০ জানুয়ারি, ১৯৫৭। দুর্ভাগ্য, তার ন'বছর পর ২৪ জানুয়ারি, ১৯৬৬ ইউরোপে যাওয়ার পথে মন্ট ব্লাঙ্কে এক বিমান দুর্ঘটনায় ভাবা পরলোকে গমন করেন। ১৯৬৭র জানুয়ারি মাসে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে ট্রম্বের গবেষণা কেন্দ্রটি উৎসর্গ করা হল। তার নতুন নামকরণ হল ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেণ্টার। সংক্ষেপে এখন যার পরিচয় বি এ আর সি।

এ গবেষণাগার পৃথিবীর বৃহত্তম গবেষণাগারগুলির একটি। সুসজ্জিতও। প্রতিষ্ঠার মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে শাখা প্রশাখায় পল্লবিত। এর মোট কর্মী সংখ্যা এখন ১১০০০। তাঁদের মধ্যে ৩০০০ বিজ্ঞানী এবং এনজিনিয়ার।

*

ভারতে পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প প্রসঙ্গে আপাতত এই প্রতিষ্ঠানটির কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। পরবর্তী সংখ্যায় এসব নিয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করব। সেই সঙ্গে সেখানকার বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলে যা বুঝেছি, সেখানকার বিভিন্ন গবেষণাগারে যা দেখেছি তার কিছু কিছু বিবরণ।

১। এপ্রিল, ১৯৪৮। ভাবার উদ্যোগে এবং জহরলাল নেহরুর সমর্থনে ভারতে প্রথম রচিত হল অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাক্ট। বা পারমাণবিক শক্তি আইন।

২। অগাস্ট, ১৯৪৮। পারমাণবিক শক্তি আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হল এদেশের পারমাণবিক শক্তি কমিশন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তরের অধীনে।

৩। সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮। কেরালার সমুদ্রবেলা থেকে মোনাজাইট (থোরিয়ামের উৎস) রপ্তানির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ।

৪। জুলাই, ১৯৪৯। দেশে রেয়ার আর্থ মিনারেল অনুসন্ধানের কাজ শুরু। এ কাজ এখন করছে বি এ আর সি'র অ্যাটমিক মিনারেলস ডিভিশন।

৫। অগাস্ট, ১৯৫০। সরকারী তত্ত্বাবধানে কেরালায় তৈরি হল ইনডিয়ান রেয়ার আর্থ লিমিটেড। মোনাজাইট বালু থেকে রেয়ার আর্থ পৃথক করার দায়িত্ব পড়ল এই প্রতিষ্ঠানটির ওপর।

৬। সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। বিহারের যদুগোড়ায় সন্ধান পাওয়া গেল ইউরেনিয়াম খনির।

৭। এপ্রিল, ১৯৫২। টাটা ইনস্টিটিউট অব ফানডামেণ্টাল রিসার্চ পারমাণবিক যন্ত্রপাতি এবং পারমাণবিক চুল্লির নিয়ন্ত্রণের জন্যে গবেষণায় হাত দিল। তৈরি হল ইলেকট্রনিক প্রোডাকশন ইউনিট। পরে এই ইউনিট ট্রম্বের ইলেকট্রনিক ডিভিশনে সম্প্রসারিত হয়। অবশেষে এখনকার ইলেকট্রনিক কর্পোরেশন অব ইনডিয়া লিমিটেডে।

৮। জানুয়ারি, ১৯৫৪। পরমাণু শক্তি কমিশন পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের উদ্যোগ নিলেন। গবেষণাগার বসল ট্রম্বেতে।

৯। অগাস্ট, ১৯৫৪। পারমাণবিক শক্তি দপ্তর নামে একটি নতুন দপ্তর তৈরি করলেন ভারত সরকার। ঠিক হল পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে এই দপ্তরের সচিব হিসেবে গণ্য হবেন। ডঃ ভাবার ওপর এই দায়িত্বটি এসে বর্তাল।

১০। নভেম্বর, ১৯৫৪। ডঃ ভাবা ভারতে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তিন পর্যায়ের একটি পরিকল্পনা রচনা করলেন। প্রথম পর্যায়ে ঠিক হল এমন ধরনের পারমাণবিক চুল্লি তৈরি হোক, যা শুধু শক্তিই উৎপাদন করবে না, সেই সঙ্গে উৎপাদন করবে পারমাণবিক জ্বালানি প্লুটোনিয়াম। এই চুল্লিতে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হবে। উল্লেখ্য, প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামে থাকে শতকরা ৯৯.৩ ভাগ ইউরেনিয়াম-২৩৮ এবং ০.৩ ভাগ ইউরেনিয়াম ২৩৫। দ্বিতীয় পর্যায়ে ঠিক হল, এর • তৈরি করা হবে ফাস্ট রিঅ্যাকটার। যা জ্বালানি হিসেবে থাকবে থোরিয়াম এ প্লুটোনিয়াম। এই চুল্লিতে তৈরি হবে ইউরেনিয়াম-২৩৩। তৃতীয় পর্যায়ে তৈরি করা হ ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাকটার। ভারতের থোরিয় সম্ভারকে যাতে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদ পুরোপুরি কাজে লাগান যায় এ পরিকল্পন মুখ্য উদ্দেশ্য সেটাই।

১১। মার্চ, ১৯৫৫। কমিশন ইউ কে'র সাহায্য নি 'অপসরা' চুল্লির কাজে হাত দিলেন। এ ব্যাপা ইউ কে প্রয়োজনীয় ইউরেনিয়াম দিয়ে সাহা করে। যে ইউরেনিয়ামে ইউরেনিয়াম-২৩৫-এ মাত্রা অনেক বেশি। একেই বলা হয় এনরিচ ইউরেনিয়াম।

১২। অগাস্ট, ১৯৫৫। ট্রম্বেতে থোরিয়াম নিষ্কাশনে কাজ শুরু হল।

১৩। এপ্রিল, ১৯৫৬। কলম্বো প্ল্যান অনুযায় কানাডার সঙ্গে 'সাইরাস' চুল্লির কাজে হা দেয়া হল।

১৪। অগাস্ট, ১৯৫৬। 'অপসরা' চুল্লি চালু হল।

১৫। অগাস্ট, ১৯৫৮। ভারত সরকার এ দেশে প্রথ পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র তৈরির প্রস্তা গ্রহণ করলেন।

১৬। জানুয়ারি, ১৯৫৯। ট্রম্বের ইউরেনিয়াম মেটাল প্ল্যান্ট পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কাজে লাগে এমন ধরনের ইউরেনিয়াম উৎপাদনে হাত দিল।

১৭। ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০। ট্রম্বেতে তৈরি হল প্রথম প্রস্থ পারমাণবিক জ্বালানি।

১৮। জুলাই, ১৯৬০। 'সাইরাস' চালু হল।

১৯। জানুয়ারি, ১৯৬১। চালু হল আর একটি রিঅ্যাকটার বা চুল্লি। নাম 'জারলিনা' বা জিরো এনার্জি রিঅ্যাকটার ফর ল্যাটিস ইনভেসটিগেশনস অ্যান্ড নিউ অ্যাসেমব্লিজ।

১৯। অগাস্ট, ১৯৬২। নাঙ্গালে হেভী ওয়াটার প্ল্যান্ট উৎপাদন শুরু করল।

২০। অগাস্ট, ১৯৬২। রাজ... পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র তৈরির ...ভার নেয়া হল।

২১। ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪। ট্রম্বের পারমাণবিক জ্বালানি শোধনাগার তৈরির কাজ শেষ হল।

২২। এপ্রিল, ১৯৬৭। ট্রম্বের গবেষণাগারে পরীক্ষিত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পৃথক ভাবে তৈরি করা হল ইলেকট্রনিক কর্পোরেশন অব ইনডিয়া।

২৩। অক্টোবর, ১৯৬৭। ইউরেনিয়াম খনি থেকে ইউরেনিয়াম সংগ্রহ এবং তার পৃথকীকরণের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হল ইউরেনিয়াম কর্পোরেশন অব ইনডিয়া।

২৪। ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯। তারাপুরের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হল।

২৫। সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। হায়দ্রাবাদে জারকোনিয়াম উৎপাদন শুরু করল নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেকস।

২৬। মে, ১৯৭২। 'পূর্ণিমা' চুল্লি চালু হল।

২৭। অগাস্ট, ১৯৭২। রাজস্থানের পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রের উৎপাদন শুরু।

২৮। মে, ১৯৭৪। রাজস্থানের পোখরানে মালকা-কল্যাণে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অসামান্য সাফল্য অর্জন করলেন আমাদের পরমাণু বিজ্ঞানীরা।

২৯। জুন, ১৯৭৭। ভারতীয় পরমাণু বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদরা নিজস্ব নকশা এবং দেশজ চেষ্টায় কলকাতায় চালু করলেন অন্যতম বৃহত্তম সাইক্লোট্রন।

বলা বাহুল্য, সংক্ষিপ্ত এই ঘটনাবলী প্রমাণ করে, পারমাণবিক গবেষণা এবং তার প্রয়োগের ব্যাপারে এ দেশের প্রচেষ্টা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য এবং আত্মনির্ভর। অত্যাধুনিক ...

ফুলের দিন হ'ল যে অবসান

কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

'পির না জানিয়ে পিয়া'—কতবার শুনেছি, এই বাণীটিকে কেন্দ্র করে কতভাবে সুরের বিন্যাস আজও মনটাকে ছেয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করেছি এ বাণীর অর্থ, জেনেছি 'পির' মানে ব্যথা। কি যে ব্যথা অনুক্ষণ তাঁকে ঘিরে রেখেছিল বুঝিনি। শুধু এইটুকুই বুঝেছি, "জীবনের মধুরতম সঙ্গীতের উৎস ব্যথা" আর সেই ব্যথাই বুকে বেঁধে তিনি চলমানসে ফিরে গেলেন সুরের অমৃতলোকের সন্ধানে।

ওস্তাদ সম্বন্ধে কিছু লেখার জন্য দেশ পত্রিকার কাছ থেকে ইতিপূর্বে তাগিদ এসেছে অনেকবার, কিন্তু লেখার অভ্যাস না থাকায়, এবং তার চেয়ে বড় কথা তাঁর মহিমময় কীর্তির যথাযথ রূপারোপে পাছে ত্রুটি ঘটে এই আশঙ্কায় সযত্নে সে অনুরোধ এড়িয়ে গেছি, আজ কিন্তু সেই 'পির'ই প্রেরণা যোগাল তাঁর স্মৃতিচারণায়।

'সঙ্গীতাচার্য ভীষ্মদেব' সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে 'ওস্তাদ' সম্বন্ধে অনেক কিছুই অপূর্ণ থেকে যায়, তাই মহামানব ভীষ্মদেবকে স্মরণ করাটাই বোধ করি শ্রেয় হবে। ব্যক্তিগত জীবনে কিছু মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয়েছে আমার, সুযোগ হয়েছে কিছু গ্রন্থপাঠের। ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণী "টাকা মাটি, মাটি টাকা"-র যে নিগূঢ় অর্থ তার সার্থক প্রতিফলন দেখলাম ওস্তাদের জীবনে। তারই দু-একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

আগ্রায় 'ওস্তাদ খলিফা বাদল খাঁ' সাহেবকে যে জায়গায় কবর দেওয়া হয়, সেই আড়াই হাত কবর স্থানটুকু কেনার জন্যে ওস্তাদ (ভীষ্মদেববাবু) খুবই ব্যগ্র হয়ে পড়েন। সেই খবর পেয়ে ওস্তাদের অত্যন্ত পরিচিত আগ্রা নিবাসী এক ভদ্রলোক কলকাতায় ওস্তাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি ওস্তাদকে আশ্বাস দিলেন ঐ জমিটুকু কেনার ব্যাপারে সব রকম সাহায্য তিনি করবেন, তবে ঐ জমির মূল্যস্বরূপ ৭৫০ টাকা দিতে হবে। সেই সময় আগ্রা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং আগ্রা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীমতী দীপালি নাগের পিতা জীবন তালুকদার মশাই। দৈবক্রমে তালুকদার মশাই মাত্র কয়েকদিন আগে আগ্রা থেকে তাঁর বালিগঞ্জস্থ জনক রোডের বাসভবনে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ওস্তাদের আদেশে জমি সংক্রান্ত আরও বিশদ তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমি তালুকদার মশায়ের সঙ্গে কলকাতার বাসভবনে দেখা করলাম আর ওস্তাদের মনোবাসনার কথাও জানালাম। তিনি সানন্দে সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং জানালেন মাত্র পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে ওই জমির বন্দোবস্ত করে দেবেন। আর দিন কয়েক পরেই তিনি আগ্রা রওনা হবেন এবং সেখানে পৌঁছে সর্বপ্রথম ওই কাজটি তিনি সমাধা করবেন।

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, তালুকদার মশাই ওস্তাদের বিশেষ পরিচিত এবং অন্যতম সুহৃদ।

সেই দিনই দুপুরে ওস্তাদের বাড়ীতে দু-জনে একসঙ্গে খেতে খেতে তালুকদার মশায়ের মতামত সবিস্তারে বললাম। তাঁকে অনেকভাবে বোঝালাম, যে জমি মাত্র পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে হতে পারে তার জন্য ৭৫০ টাকা দেওয়ার কোন অর্থই হয় না। গভীর মনযোগের সঙ্গে আমার বক্তব্য শুনে গেলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। মনে মনে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলাম এই ভেবে যে অকারণ এতগুলি টাকার অপব্যয়ের গুরুত্ব হয়ত তিনি উপলব্ধি করেছেন। সেদিনই বিকালে আমি ওস্তাদের কাছে বসে আছি এমন সময় আগ্রার সেই ভদ্রলোক এসে

ওস্তাদ তাঁকে বললেন, "আপনি কাল সকালে টাকাটা নিয়ে যাবেন।" আমি নীরবে ওস্তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম এবং মনেমনে ক্ষুব্ধও হলাম। কারণ, ৫০ টাকা আর ৭৫০ টাকার মধ্যে ফারাকটা যে অনেক। তাছাড়া তখনকার দিনে ৭৫০ টাকার মূল্যটাও বড় কম নয়। কিন্তু ওস্তাদ ছিলেন অন্তর্যামী। ভদ্রলোক বিদায় নেবার পরই তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ী করে রওনা হলেন ফিল্ম কর্পোরেশনের কাজে। গাড়ীতে বসে একান্তে আমাকে পেয়ে বললেন, "জানি জমিটা কেনার ব্যাপারে হয়ত কিছু টাকা বেশী লাগছে সত্যি, তা হোক, খবরটা যখন উনিই এনেছেন এবং আমাদের জানা-শোনা লোক তখন ওঁকেই টাকাটা দিয়ে দেবো।"

রামু পণ্ডিতজী ছিলেন ফিল্ম কর্পোরেশনে ওস্তাদের ইউনিটের একজন সুদক্ষ ট্রামপেট' শিল্পী। অন্যান্য শিল্পীদের মত তিনিও ওস্তাদের একজন স্নেহভাজন। পণ্ডিতজী তাঁর মেয়ের বিবাহের সব বন্দোবস্ত পাকাপাকি করে ফেলেছেন। সে উপলক্ষে টাকারও বেশ কিছু প্রয়োজন। সেদিন ছিল ফিল্ম অফিসের কর্মীদের বেতনের দিন। সকাল বেলায় সেই অফিসেই পণ্ডিতজী ধরে বসলেন ওস্তাদকে, "আপনি দয়া করে কোম্পানীকে বলে আমায় বাড়তি কিছু টাকা পাইয়ে দিন। আপনি তো জানেন আমার মেয়ের বিয়ের সব কিছু ঠিক ঠাক হয়ে গেছে।"

ভীষ্মদেব—যৌবনে

ওস্তাদ কোন কথা বললেন না। কেবলমাত্র পণ্ডিতজীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। বেতন পর্বও যথাসময়ে সমাধা হলো। বাড়ী ফেরার পূর্ব মুহূর্তে পণ্ডিতজীকে একান্তে ডেকে যেমন নীরবে তাঁকে নিরীক্ষণ করেছিলেন তেমনই নীরবে নিজের বেতনের খাম ভর্তি পুরো টাকাটাই তাঁর হাতে তুলে দিলেন। কবে ফেরত দিতে হবে, বা আদৌ ফেরত দিতে হবে কি-না কোন প্রশ্নই নয়। পণ্ডিতজীর সকৃতজ্ঞ সজল দৃষ্টির সামনে দিয়ে গাড়ীতে এসে উঠলেন ওস্তাদ, আমি শুধু ছায়ার মত তাঁকে অনুসরণ করে চললাম।

সন তারিখ আজ আর ঠিক স্মরণ করতে পারছি না। তবে এটুকু মনে আছে গারস্টিন প্লেসে রেডিও স্টেশন থেকে রাত্রে অনুষ্ঠান শেষ করে বেরিয়ে আসছেন ওস্তাদ, পিছনে আছি আমি আর কয়েকজন শিল্পী। হঠাৎ এক ভদ্রলোক দৌড়তে দৌড়তে এসে ওস্তাদকে বললেন, "আপনার চেকটা নিলেন না।" আবার ফিরলেন ওস্তাদ। যথারীতি সই করে চেকটাকে ডান হাতের দুই আঙ্গুলের ফাঁকে চেপে হাত দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে এলেন। এমন সময় রেডিও স্টেশনের গলির মুখে অত রাত্রে সরা হাতে মুখে কুটো দিয়ে একটা লোক কিছু ভিক্ষার আশায় ওস্তাদের দিকে সরাটা বাড়িয়ে দিলে। কিছু বুঝতে পারার আগেই চেকটা সেই সরাটার মধ্যে ফেলে দিয়ে ... এগিয়ে গেলেন

ওস্তাদ। ... দেওয়া চেক ... রইল। ... হয়ে বেশ কিছুটা পথ অনুসরণ করে এলাম। নিশ্চিত হয়ে গেলে কিছুটা ভীত হয়েই তাঁকে প্রশ্ন করলাম, "ওস্তাদ আপনি চেকটা ওকে দিয়ে দিলেন ?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয় টাকার ওর খুব প্রয়োজন, তা না হলে এত রাত্রে ভিক্ষের আশায় এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন ?"

এ রকম বহু ঘটনাই ঘটতে দেখেছি। বোধ করি আমার অজানিত আরও কত বিচিত্র ঘটনা ঘটে গেছে। কিন্তু অর্থের প্রতি কেবলমাত্র এ হেন নিস্পৃহতাই নয়, এমন নিঃস্বার্থ গোপন দানের তুলনাবিহীন নজিরও খুবই স্বল্প।

চালচলন, খাওয়া-দাওয়া সব কিছুর মধ্যেই ওস্তাদের শিশুসুলভ আচরণ লক্ষ করেছি। সেদিন সকাল গড়িয়ে গেছে, দুপুর ছুঁই ছুঁই, এমন সময় একটা রিকশায় চেপে ওস্তাদ আমার সার্কাস অ্যাভেনুর বাড়ীতে উপস্থিত। সোজা উপরে উঠে এসেই বললেন, "কেষ্ট, রিকশাওয়ালাকে পয়সা দিয়ে দাও।" জিজ্ঞাসা করলাম, "কত ভাড়া দেবো ওস্তাদ ?" উত্তর দিলেন, "তা তো জানি না।" ফের জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথা থেকে রিকশায় উঠলেন ?" বললেন, "শ্রীমানী মার্কেট থেকে।" রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে, ওস্তাদকে বসিয়ে বললাম, "ট্যাক্সিতে এলেন না কেন ? রোদের মধ্যে এত দূর পথ রিকশা করে এলেন, কষ্ট হলো না ?" বেশ প্রসন্ন মুখেই উত্তর দিলেন, "রিকশাতে আসতেই বেশ ভাল লাগে, কেমন চারদিক দেখতে দেখতে আসতে পারি, আজকালকার ট্যাক্সিগুলো তো দেশলাই বাক্সের মত চারদিক চাপা। আগের সেই হুড্খোলা গাড়িগুলোতে চড়তে ভাল লাগত।"

আত্মভোলা, সহজ, সরল অনাড়ম্বর এই মানুষটি যে কেবলমাত্র তাঁর শিষ্য-সহচরবৃন্দের কাছেই প্রিয় ছিলেন তাই নয়, জনসাধারণের হৃদয়েও শ্রদ্ধা ভালবাসার যে আসন ওস্তাদের জন্য পাতা আছে তার ছোট্ট ঘটনা তুলে ধরছি।

সেবার বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে ওস্তাদের গানের অনুষ্ঠান ছিল। গান গাইতে বসলেন ওস্তাদ, শেষ হতে হতে ভোর হয়ে গেল। অনুষ্ঠান শেষে ওস্তাদকে এনে ভিতরে বসানো হলো। ওদিকে জনসাধারণের বন্যা তখন বেড়া ভেঙে স্টেজের চারিদিক ঘিরে ফেলেছে। একমাত্র বাসনা দিনের আলোয় সামনে থেকে তাঁরা ওস্তাদকে দর্শন করবেন। বাধ্য হয়েই স্টেজের পিছন দিয়ে তাঁকে নিয়ে এসে ময়দানে একটা চেয়ারে বসানো হল। কাতারে কাতারে দর্শনার্থী লুটিয়ে পড়ল তাঁর পায়ে। 'কেবা আগে ধূলি, লইবেক তুলি, তারি লাগি কাড়াকাড়ি'। সে এক অপূর্ব দৃশ্য, বিপুলায়তন এ শ্রদ্ধার্ঘ্য দেখে রোমাঞ্চিত হতে হয়।

গত ৯ই আগস্ট মঙ্গলবার নিমতলা শ্মশানে দাঁড়িয়ে আছি। এক অব্যক্ত যন্ত্রণা বুকের ভিতরটাকে দুমড়ে মুচড়ে একাকার করে দিচ্ছে। অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি আভার সঙ্গে ওস্তাদের চিতাগ্নির শেষ শিখাটুকু মিলে চারিদিক লালে লাল হয়ে গেছে, অর্ধ অচৈতন্য অবস্থায় সেই দৃশ্যই দেখছি। হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন বলে উঠলো, "মালাটা দিয়ে দেবো ?" চমকে উঠলাম কথাটা কানে যেতেই। মনে পড়ে গেল দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর আগের আর এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।

সঙ্গীতজগতে ওস্তাদ তখন মধ্যাহ্ন সূর্যের মত জ্বলজ্বল করছেন, খ্যাতি, যশ, পাণ্ডিত্যের হিমালয় শিখরে আসীন, এ হেন সময় হঠাৎ তিনি সব কিছু ছেড়ে, সব পেছনে ফেলে চলে গেলেন পণ্ডিচেরী। সেটা ১৯৪০ সাল। এরই বছর তিনেক পরে ১৯৪৩ সালে আমারই এক গুরুভাই জোর করে পণ্ডিচেরী থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন ওস্তাদকে। ভীষণ রোগা হয়ে গেছেন, দাড়ি-গোঁফ পর্যন্ত কামান না। ...

গ্রহণ করে নিয়েছেন নিরামিষ আহার। ভাবতে আশ্চর্য লাগছে। যাই হোক, যাতে তিনি লুকিয়ে আবার পন্ডিচেরী চলে যেতে না পারেন, সেজন্য দুপুরবেলাটা ওস্তাদকে দেখাশোনার ভার পড়ল আমার উপর। সেদিনই সকালে পন্ডিচেরী থেকে ওস্তাদকে নিয়ে আসা হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে উনি বসে আছেন, আমিও ওঁর ঠিক পাশটিতে বসে আছি। এমন সময় হঠাৎ উনি উঠে দাঁড়িয়ে "খড়ম" পায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। আমিও সংগে সংগে ওঁর পিছু নিলাম। সোজা বিবেকানন্দ রোড ধরে হাওড়া স্টেশনের দিকে এগিয়ে চললেন। আমি মনে মনে চিন্তা করে নিলাম দেখাই যাক না কি করেন। পালাবার প্রশ্ন: যদি হাওড়া থেকে ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করেন আমিও সংগে সংগে ঝাপটে ধরবো। একে রাস্তায় অসংখ্য লোকের ভিড়, তার উপর তাঁর শারীরিক অবস্থা মোটেই ভাল নয় অথচ সেদিকে তাঁর কোন খেয়ালই নেই, সোজা হেঁটে চলেছেন এক মনে। পোস্তা পেরিয়ে আমাকে অবাক করে তিনি নিমতলা শ্মশানের পথ ধরলেন। আমি যে তাঁকে অনুসরণ করছি এটা বুঝতে পেরেও এই সুদীর্ঘ পথ তিনি একটি কথাও বলেননি। শ্মশানে পৌঁছে প্রথম মুখ খুললেন, "কেষ্ট, একটু ফুলের যোগাড় করে দেবে ?" আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি কিছু ফুল কিনে এনে তাঁর হাতে দিলাম। তখনই আবার বলে উঠলেন, "আমাকে একটা মালা এনে দেবে ?" সংগে সংগে একটা মালা কিনে এনে ওঁর হাতে তুলে দিলাম বটে কিন্তু ভীষণ দুর্ভাবনার মধ্যে পড়ে গেলাম। কারণ তিনি সদ্য পন্ডিচেরী থেকে ফিরেছেন, হয়ত এখনই ফুল-মালা নিয়ে গায়ে ভস্ম মেখে ধ্যানে বসবেন। আমি তখনও পর্যন্ত অস্নাত, অভুক্ত, সর্বোপরি তাঁর এই সাধন-ভজন কতক্ষণ সময় নেবে আর সে সময় আমারই বা কি কর্তব্য ইত্যাদি চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ওস্তাদ কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন, "রবিঠাকুরের শেষ শয্যার স্থান কোনটা ?" আমি তাঁকে সংগে করে এনে দাঁড় করিয়ে দিলাম সেই বিশেষ স্থানে। বিস্মিত হয়ে দেখতে লাগলাম তাঁর কার্যকলাপ। সেই ফুল, সেই মালা দিয়ে একান্ত আন্তরিকতার সংগে তিনি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন। কবিগুরুর তিরোধানের সময় ওস্তাদ ছিলেন পন্ডিচেরীতে। তাই কলকাতায় ফিরে প্রথমেই সেই ঋষির উদ্দেশে তিনি নিবেদন করে এলেন তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। অথচ এতক্ষণ ওঁর সংগে থেকেও তিলার্ধ মাত্র চিন্তা করতে পারিনি, ঐ পবিত্র স্মৃতিকে স্মরণ করেই তিনি এই মহাশ্মশানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছেন। সেদিন ভাবতে পারিনি এত তাড়াতাড়ি এই মহাশ্মশানেই "ঋষি রবীন্দ্রনাথের" স্থান করে দিতে হবে "মহাযোগী ভীষ্মদেবকে"।

ওস্তাদের গান সম্বন্ধে আমি দেখেছি যে বহু লোক যাঁরা আজকাল বলেন বা যাঁদের লেখা দেখতে পাই ওঁর গান সম্পর্কে, তাঁরা ও'র পন্ডিচেরী থেকে ফিরে আসার পর এই দীর্ঘ ২১ বছর, এই সময়ের গানবাজনা শুনেছেন। রেকর্ডে যে গানগুলি আছে সাড়ে তিন মিনিটের মধ্যে সেইগুলি ১৯৩১এর আগে রেকর্ড করা হয়েছিল। তার মধ্যে ওঁর প্রথম রেকর্ড তের বৎসর বয়সের বাংলা গান দুটি পন্ডিচেরী থেকে ফিরে আসার পর আবার ওঁকে দিয়ে রেকর্ড করান হয়। আমার মনে হয় সে রেকর্ড না করালেই বোধ হয় ভাল হত। কারণ, সে সময় তাঁর শরীর অসুস্থ ছিল, তা ছাড়া বৃদ্ধ বয়সে গলাটাও ভাল আসেনি। যাঁরা এই রেকর্ড শোনেন, প্রথমদিকের সেই রেকর্ডগুলি চোঙের সাহায্যে করা, কিন্তু শেষের দিকে কামোদ, শংকরা, মালকোষ বাংলায় তিনটি রেকর্ড মাইক্রোফোনে করা। সেই সময় লং-প্লেয়িং বা টেপের চলন ছিল না। কাজেই যে সমস্ত রাগের গান যেমন মালকোষের "পিয়া না জানি রে" বিলম্বিত খেয়াল বা আসরে ওস্তাদদের শুধু স্থায়ী শেষ করতেই আড়াই মিনিট লাগত, তা সাড়ে তিন মিনিটের মধ্যে ...

বিলম্বিত-এ তাঁর মেজাজের রূপ কি ছিল তা এই রেকর্ড শুনে কোন ধারণাই করা যাবে না। ও'র মেজাজের গান যাঁরা শুনেছেন তাঁদের মধ্যে দু-তিনজনকে আমার মনে পড়ছে—যাঁরা আমার গুরুভাই নন কারণ গুরুভাইরা তাঁর মেজাজের গান অনেক শুনেছেন, তাছাড়া শিষ্য গুরুর গুণগান বা প্রশংসাই করে থাকেন—তাঁদের মধ্যে শ্রীদিলীপ রায়, হীরুবাবু, মুস্তাক আলি খাঁ সাহেব যাঁরা এখন বেঁচে আছেন এবং যাঁরা গত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে "ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং মনে পড়ে সেই সময়ে অর্থাৎ ১৯০৫ কি ৩৬ সালে প্রবাসী অথবা সমসাময়িক কোন পত্রিকায় ওস্তাদের গান শুনে ধূর্জটিবাবুর যে অনুভূতি ঘটেছিল তা সবিস্তারে তিনি প্রকাশ করেন। তিনি বলেছিলেন যে সংগীতজগতে ওস্তাদ বা পন্ডিত হয়ত অনেক আসবেন কিন্তু আগামী একশো বছরের মধ্যে এ রকম একটা musical brain জন্মাবে কি না সন্দেহ।

১৯৩১ সালে পন্ডিচেরী যাবার ঠিক আগে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব কলকাতায় ওস্তাদের বাড়িতে এসেছিলেন সংগে ছিলেন আতা হোসেন, গোলাম রসুল প্রভৃতি। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর কাছে ভীষ্মবাবু যখন বরোদায় বেড়াতে গিয়েছিলেন তখন কয়েকটি রাগের স্থায়ী-অন্তরা গানের তালিম নিয়েছিলেন। যখন ফৈয়াজ খাঁ সাহেব ওঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন তখন ওস্তাদ গান গাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। কারণ বলতেন "আমার গলা খারাপ।" এ সমস্ত শুনেই ফৈয়াজ খাঁ সাহেব তাঁর সংগে দেখা করতে আসেন। খাঁ সাহেব ওস্তাদকে গাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করেন। কিন্তু ওস্তাদ কিছুতেই সম্মত হলেন না। শেষে তিনি ওস্তাদকে হারমোনিয়াম বাজাতে অনুরোধ করেন কিন্তু ওস্তাদ সে অনুরোধও রাখলেন না। শেষে নিরুপায় হয়ে ফৈয়াজ খাঁ সাহেব গোলাম রসুলকে (যিনি এখন বরোদা মিউজিক কলেজের অধ্যক্ষ) হারমোনিয়াম বাজাতে বলেন এবং ওস্তাদকে তবলায় সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করেন। ওস্তাদ রাজি হলেন এবং হারমোনিয়াম সংগে সংগত ও সওয়াল জবাব দিয়ে রচিত হল এক অপূর্ব সুরের স্বর্গ। এরপর অতিথিদের খাওয়ার বন্দোবস্ত করার জন্য ওস্তাদ কিছুক্ষণের জন্য দোতলায় চলে যান। তখন ফৈয়াজ খাঁ সাহেব বলেন, "ভারতবর্ষের অনেক শিল্পীই আমার কাছে তালিম নিয়েছেন, কিন্তু ভীষ্মদেবের মত জাত-শিল্পী একটিও দেখিনি। কোন একটি রাগের স্থায়ী, অন্তরা আয়ত্ত করতে শিল্পী বিশেষে ষোল দিন থেকে আড়াই মাস পর্যন্ত সময় লেগেছে। অথচ ভীষ্মদেব মাত্র তেতাল্লিশ মিনিটে আয়ত্ত করে সংগে সংগে তা এমন নিখুঁত অথচ সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন, মনে হয় আমিও এত সুন্দরভাবে পরিবেশন করতে পারিনি।" উনি ছিলেন ক্রিয়েটিভ জিনিয়াস, গাইতে বসলেই বহুবার তাকে নতুন ভঙ্গিমায় পরিবেশন করতেন। যখনই প্রশ্ন করেছিলাম, রেকর্ডে কামোদ রাগের উপর "মোতি মালোনিয়া" গানটিতে এমন অপূর্ব একটা সাপাট তান করেছেন যা শুনলে গা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, অথচ, কই পরে আর সেরকম তান করলেন না তো ?" উত্তরে বলেছেন, "ওটা তো একবার করেই দিয়েছি আবার তার পুনরাবৃত্তি করবো কেন ?"

একবার একটি আসরে স্বনামধন্য তবলিয়া এবং সারেঙ্গীবাদক বলেছেন ওস্তাদকে সহযোগিতা করতে। কিন্তু সম্প্রতিকালে ওস্তাদ গান আরম্ভই করতেন ঝড়ের বেগে এক বিদ্যুৎ তান দিয়ে। এক কথায় পূর্ববর্তী শিল্পী যে জায়গা থেকে শেষ করতেন ওস্তাদের গান সেইখান থেকে শুরু হত। উক্ত আসরে সারেঙ্গীবাদক ওস্তাদের কানে কানে বললেন, "ওস্তাদ, নিয়মমাফিকভাবে গান শুরু করলে কেমন হয় ?" অর্থাৎ প্রথমে বিলম্বিত বিস্তার—এই পদ্ধতিতে। ওস্তাদ হেসে উঠলেন, "এটা কি ...

আক্রমণ করতে হবে। একবার গোহরজানের মুখে "নয়নে ও মেহেরওয়া" গানটি মধ্য-রাত্রে পরিবেশন করতে বসেছেন হাওড়ায় এক বিরাট সঙ্গীত অনুষ্ঠানে। জনসমাবেশ ঘটেছে প্রচুর। তবলা এবং সারেঙ্গীতে সহযোগিতা করছেন দুই লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী। লক্ষ করলাম ওস্তাদ কেবল "নয়নে মেহেরওয়া" গানের এই মুখড়াটুকু বলে চা খাচ্ছেন আর পান খাচ্ছেন। অথচ তবলিয়া এবং সারেঙ্গীবাদক দুজনেই ঐ মুখড়াটুকুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন তান বাট করে সমে আসছেন। তাঁরা ভাবছিলেন ওস্তাদের গলায় আর মেজাজ নেই—তাই ওস্তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েই ঐ ভাবে আসরটিকে জমিয়ে রাখছিলেন এবং প্রচুর বাহবাও কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন। আবার ওস্তাদ ঐ মুখড়াটুকু দিয়ে চুপ। এদিকে ঐ দুই শিল্পী তবলিয়া এবং সারেঙ্গীবাদক সেটিকে কেন্দ্র করে এক বিরাট তান শুরু করে দিয়েছেন. ঘন আবর্তন পরে সমে আসবার আর মাত্র আধমাত্রা বাকি ঠিক এই সময়টুকুর মধ্যে পলকে হঠাৎ এক বিদ্যুৎগতিতে তান করে ওস্তাদ সম কেড়ে নিলেন। তবলিয়া এবং সারেঙ্গীবাদক দুজনেই হতবাক। তাঁদের মাথায় বজ্রপাত ঘটলেও বোধ করি তাঁরা এত আশ্চর্য হতেন না। উল্লাসে ফেটে পড়লেন জনতা। করতালিতে স্বাগত জানালেন ওস্তাদকে। ওস্তাদ কিন্তু চুপ। সেই চা-এ চুমুক। আমি ছিলাম হারমোনিয়াম সহযোগিতায়। কিন্তু এ যেন অভাবনীয় সুরের খেলা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। হাত তো বন্ধই। শুধু অনুভব করলাম সমস্ত শরীরে এক বিদ্যুৎ শিহরণ।।

এখন যে আসরের কথা বলতে চলেছি সেটি পণ্ডিচেরী যাবার অনেক আগের ঘটনা। ইউনিভার-সিটি ইন্সটিটিউট হলে আব্দুল করিম খাঁ সাহেব গেয়েছিলেন সকালে মিয়াঁ কি টোড়ী এবং ভৈরবীতে "যমুনাকে তীর" এবং রাতে মালকোষ ও ঝিঁঝিট ঠুংরী। সেই আসরেই পরে ওস্তাদের অনুষ্ঠান ছিল।

কিন্তু আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের সুরের সেই মায়াজাল শুনে মনে হয়েছিল আমার জীবন ব্যর্থ। কি প্রয়োজন আর বেঁচে থাকার। সে সময়েই দেখলাম ওস্তাদ সর্বপ্রথম করিম খাঁ সাহেবের গান কান পেতে শোনার জন্যে চেয়ার ছেড়ে একেবারে খাঁ সাহেবের সামনে আসন পেতে বসলেন। এবং তাঁকে অনুকরণ করে বহু শিল্পীই খাঁ সাহেবকে ঘিরে জড় হয়ে বসলেন। এই কনফারেন্স-এই ওস্তাদ "হেম কল্যাণ" খেয়াল পরিবেশন করছিলেন। কিন্তু মিনিট কুড়ি যেতে না যেতেই হঠাৎ ওঁর সামনে লাল আলো জ্বালিয়ে এই ইঙ্গিত করা হয় যে সময় স্বল্প। উনি তখনও পর্যন্ত অন্তরায় পৌঁছননি। হঠাৎ তিনি গান বন্ধ করে শ্রোতাবর্গকে নমস্কার করে স্টেজ ছেড়ে চলে গেলেন। এ ধারে তবলা-সারেঙ্গী প্রভৃতি সহযোগী শিল্পীরা হতবাক হয়ে বসে রইলেন। এমন সময় নাটোরের মহারাজা জোর করে দুহাতে ওস্তাদকে জড়িয়ে ধরে স্টেজের দিকে নিয়ে আসতে আসতে বললেন, "একি? কে এমন করে আলো জ্বালালো, বাংলাদেশে মুখ উজ্জ্বল করার মতন শিল্পী তো কেবল মাত্র এক আপনিই।" ওস্তাদ ফিরে এসে আবার স্টেজে বসলেন। এবার আর খেয়াল নয়, তাঁর সেই বিখ্যাত ঠুংরী "সেঁইয়া তু এক বেরী আজা"। পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে গেয়ে চললেন। আর যতবারই সমে আসছেন ততবারই তাতে আরোপ করছেন বিভিন্ন রাগের রূপ। একে সুরেলা কণ্ঠ তায় অপূর্ব পরিবেশন ভঙ্গি। সমস্ত পরিবেশটাই সুরে সুরময়। শ্রোতাবর্গ নিশ্বাস ফেলার অবকাশ পাচ্ছেন না। আব্দুল করিম খাঁ সাহেবও এই সুরের জালে আটকা পড়ে ছটফট করছেন এবং উদ্গ্রীব হয়ে পড়েছেন জানার জন্য কে এই শিল্পী? খলিফা বাদল খাঁ সাহেবকে ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—"য়ে বাচ্চা কৌন হ্যায়?" সহাস্যে উত্তর দিলেন বাদল খাঁ সাহেব, "য়ে মেরী বেটা হ্যায়।" শুধু মাত্র তাই নয়, আমারই সামনের সারিতে বসেছিলেন এক বৃদ্ধ মুখ ভর্তি লম্বা দাড়ি। হঠাৎ বলে উঠলেন, "কি বারবার সেঁইয়া তু একেবেরি আজা করছে। বেটা চোখ বুজে কেবল গেয়েই চলেছে। আরে চোখ খুলে দেখ পৃথিবীর সমস্ত সেঁইয়ারাই তোর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে তোরই দর্শনের আশায়।" বোধ করি এত বড় প্রশংসা, এত গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের ঘটনা তাঁর জীবনে বহু বারই ঘটেছে।

তিনি যে কেবলমাত্র সুরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন তাই নয়। রুচি, নিষ্ঠা, সহনশীলতা প্রভৃতি গুণের তিনি ছিলেন ঐশ্বর্যের অধিকারী।

তাই বিশ্বাস করতে মন চাইছে না যে আর আর ওস্তাদের সেই কণ্ঠ, সেই বিচিত্র সুরারোপ শুনতে পাবো না। ভাবতে পারছি না সমগ্র ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণ ফুলের ডালি ভর্তি করে তাঁর পায়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে আর আসবে না। নিয়তির মত নিষ্ঠুর হয়ে ওস্তাদেরই গাওয়া "ফুলের দিন হল যে অবসান" আজ কি নির্মম সত্য হয়ে দেখা দিল?

হাসি শুধু হাসি নয়

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

হয়ে উঠেছিল মননহীন, ক্ষণিক দমফাটা অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেক বেশি কিছু, শুধু পেশী সংকোচন নয়, শুধু কিছুক্ষণের জন্যে দুমড়ে, ভেঙে আবার পাঁজর বিদীর্ণ বিস্ফোরণের অভিঘাতে চেয়ারে সোজা হয়ে যাওয়া নয়,—এ-সবের চেয়ে জহর রায়ের অভিনয়ে হাসি ক্রমাগত হয়ে উঠেছিলো অনেক ব্যাপকতর, বৃহত্তর এক অভিজ্ঞতা—এমন কিছু যা আমাদের দুমড়ে, ভেঙে আবার সোজা করে দেবার মুহূর্তে এক অপ্রত্যাশিত, ভেজা-ভেজা, নরম পর্দা টেনে দিতো চোখের সামনে, যার মধ্যে দিয়ে টুকরো একটি ঘটনা, কিংবা পরিচিত একটি মুখ, কিংবা কোনো চাপা গভীর নিজস্ব দুঃখকে করুণ, সুন্দর দেখাতো। যখন স্টেজের ওপর মন্ত্রী হবার অদম্য বাসনায় টাকা বিলোতে-বিলোতে তিনি প্রায় দেউলে হয়ে যেতেন, তাঁর কিংকর্তব্যবিমূঢ় দুনিয়া তাঁকে নিংড়ে নিতো ক্রমাগত, তখন অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে হাসির হালকা বাতাস ক্রমেই হয়ে উঠতো দ্রব, ঘন, ভিজে-ভিজে নরম। শ্রাবণের বিদ্যুতের মতো চমকে উঠতো হাসি মেঘ-করে-আসা মনের আকাশে। কিংবা যখন তিনি এক ঘর ভিড়ের অস্পষ্টতা থেকে ইন্দিরা গান্ধীকে একদা বলেছিলেন, 'ম্যাডাম, অভিনেতাদের জন্যে এ-দেশে নেই কোনো পেনশান-এর ব্যবস্থা, আছে শুধু টেনশান', সেই মুহূর্তে দমকা হাসির সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিলো একরাশ বেদনা। অর্থাৎ শুধুমাত্র মনহীন, ভাবনাহীন কমিক থেকে সরে আসতে চেয়েছিলেন এমন একটি নিজস্ব বিন্দুতে যেখানে হাস্যরসকে তিনি জীবনের ব্যাপক, চেতনাক্লিষ্ট অভিজ্ঞতায় সংযুক্ত রাখতে পারবেন, যেখান থেকে আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন এই সত্যটুকু যে হাসি এবং কান্না, কমেডি এবং ট্র্যাজেডি শেষ পর্যন্ত পরস্পরের বিপ্রতীপ নয়। বরং, হাসি এবং কান্না, এ-দুটি স্রোত পরস্পরে এত দূর সংলগ্ন যে কখনো-কখনো এদের আলাদা করে চেনাই যায় না। এবং এই যে জহর রায় হাসি এবং কান্নাকে তাঁর বিশেষ অভিনয়-স্টাইল-এর মাধ্যমে পরস্পরের পরিপূরক, ও প্রতিবেশী হিসেবে দেখাতে পেরেছিলেন, এইখানেই তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। আমরা তাঁর অভিনয়-ধারাটির সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠ হই, ব্যবসায়িক ভেজাল বাদ দিয়ে যতই ছেঁকে তুলতে পারি তাঁর প্রতিভার নির্যাস, ততই বুঝতে পারি যে চ্যাপলিন-এর দ্বারা ঠিক কতখানি আপ্লুত ছিলেন তিনি, তাঁর একান্ত বাঙালীপনা, সব নিজস্বতা এবং অবিরল ব্যবসায়িক কমপ্রোমাইজ সত্ত্বেও।

তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে একটি সাক্ষাৎকারের সুযোগে জহর রায়ের সঙ্গে আমার সুদীর্ঘ আলোচনার সুযোগ হয়েছিল। মৃত্যুর এত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে, হাতে সময় প্রায় ফুরিয়ে এসেছে জেনেও যে এতখানি সময় তিনি আমার জন্যে এমনি উদাসীনভাবে বিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন, তাতে তাঁর কমিক সেনস-এর একটা চূড়ান্ত উদাহরণ পেতে পারি আমরা। গত কয়েক মাস ধরে তাঁর শরীর—উদাসীন অত্যাচারের ধাপে-ধাপে এমনি দ্রুত ধ্বসে যাচ্ছিল যে আর যে বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, এটা তিনি নিশ্চিতভাবে জেনে গিয়েছিলেন, অথচ এই উপলব্ধি সত্ত্বেও তাঁর নিঃসঙ্গতাবোধ, হতাশা এবং নিজস্ব গভীর ক্ষত-গুলিকে তিনি তাঁর সহজাত কৌতুকবোধ থেকে ছাড়িয়ে এনে বিচ্ছিন্নভাবে কোনোদিন দেখতে চাননি। তাঁর মেসবাড়ির সামান্য নির্লিপ্ত, সাংসারিকতাশূন্য ঘরটিতে বসে আমার মনে হয়েছিল, এই যে তিনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যায় একটি সম্পূর্ণ পরিবারের কর্তা হয়েও তাঁর নিজস্ব বাসগৃহ থেকে একটু দূরেই সারা জীবন একটি মেস-বাড়ির নির্লিপ্ত বিচ্ছিন্নতাকে তাঁর শিল্পী মনের পক্ষে এমন একটি কৌতূহলবোধ ধরা পড়ে যা একান্ত গৃহমুখী বাঙালী-মানসে বিরল। আদর্শ পিতা কিংবা স্বামী ছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি যে সংসারের পিচ্ছিল, প্রতারক কেন্দ্রবিন্দু থেকে কিছুটা দূরে সরে গিয়ে সকৌতুকে জীবনের দিকে তাকাতে পেরেছিলেন, সেটা সম্ভব হয়েছিল তাঁর সহজাত কমিক-সেনস বা কৌতুকবোধের জন্য।

ইদানীং তাঁর আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না এমন বলা যায় না। কিন্তু মানসিক শান্তি এবং বিলাসিতাকে তিনি কখনই পরস্পরের পক্ষে অপরিহার্য বলে ভাববার মতো মূঢ়তা দেখাননি। তাঁর মনের

গ্ল্যামার-বিমুখতার চূড়ান্ত উদাহরণ আমরা পাই তাঁর জীবনযাপনের মূল ধরনটি থেকে। কখনো তিনি নিজের অভ্যস্ত জীবন-ছন্দকে বাহ্যিক আড়ম্বরের বেড়ি পরিয়ে বেতালা, শ্লথ করে তুলতে চাননি। মেস-বাড়ির একটি সামান্য, জীর্ণ ঘরই তাঁর জীবনের তুঙ্গ মুহূর্তেও তাঁর পক্ষে যথেষ্ট ছিল—একটি ছোট্ট নির্জন দ্বীপের মতো যেখানে তিনি কিছু গভীর দুঃখ, কিছু ভালোবাসার স্মৃতি, এবং দু-একটি স্বার্থহীন, বিরল বন্ধুত্ব নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বাসিত ছিলেন।

এবং তাঁর ছোট্ট খাটিয়ার চারপাশে ছিল একটি ক্রমেই বেড়েওঠা, আশ্চর্য, অসংলগ্ন একান্ত নিজস্ব এক গ্রন্থ-সংগ্রহ। কিন্তু অসংলগ্ন শুধুমাত্র আপাতিক দৃষ্টিতে, কেননা সেখানেও এই বিপুল গ্রন্থ-সংগ্রহের সযত্ন বিন্যাসে জহর রায়ের সহজাত কৌতুকবোধটি স্পষ্টতই অতি সূক্ষ্মভাবে কাজ করে গেছে। না-হলে কোন্ সম্ভাব্য যুক্তির সাহায্যে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি এমনি কৌতুকপ্রদ বিন্যাস যার ফলে কবিতার পক্ষে শেলীর সোচ্চার ঘোষণার একেবারে ঘনিষ্ঠ প্রতি-যোগিতায় রয়েছে প্লেটোর 'ইউটোপিয়া'—সেই কল্পনার ভূস্বর্গ যেখান থেকে কবিতা নামক পাপ চিরদিনের জন্য নির্বাসিত; কিংবা, অস্কার ওয়াইলড-এর ডে-প্রোফানডিস বইটি—সম-কামুকতার অভিজ্ঞতা থেকে প্রস্তুত এক তিক্ত, তীব্র, গদ্যকাব্য—রয়েছে বাইবেল-এর সাহসী সান্নিধ্যে; কিংবা, রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' আর বোদলেয়র-এর 'ফ্লর দু মাল' মধ্যে ইয়েটস আর নিয়জন সালামে', প্রবল্লা কোলরিজ আর প্রুস্ট র‍্যাঁবো—

কৌতুকরস-বোধের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে আমায় বিস্মিত করেছিল জহর রায়ের নিজস্ব গ্রন্থাগারে বিপুল নাটকের সংগ্রহ—শুধুমাত্র প্রাচীন গ্রীক নাটকের সব কিছুই নয়, সেনেকা থেকে রেপর্ট পর্যন্ত সুরু বিশাল দৈর্ঘ্যিক সংগ্রহ তাঁর পাঠাগারের অন্তর্গত।

আগেই বলেছি, তিনি আদর্শ পিতা কিংবা গৃহস্বামী ছিলেন কি না জানি না, কিন্তু সেদিন শুধু বিপুল গ্রন্থ সংগ্রহের দিকে আমাকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলেছিলেন, 'একদিন আমি থাকবো না। সেদিন হয়তো আমার ছেলেমেয়েরা মনে মনে ভাববে, বাবা আমাদের জন্যে কি রেখে গেল। মনেমনে হয়তো লজ্জা পাবে এই ভেবে যে, আসলে তাদের বাবা ভাঁড়ামো আর লোক হাসানোর চেয়ে বড় কিছু করে যেতে পারেনি। লোকের মুখে তারা তাদের বাবার নিন্দেও অনেক শুনবে। সত্যিই তো আমার ছেলেমেয়েদের জন্যে খুব বড় একটা আদর্শ আমি রেখে যেতে পারলাম না। আসলে এই বইগুলো ছাড়া আর কিছুই থাকবে না তাদের জন্যে। তারা কি বুঝবে, এর চেয়ে মূল্যবান, এর চেয়ে বৃহৎ আর কিছু হতে পারে না?'

রঙ-বেরঙের—কখনো-কখনো ভারী মজাদার—সব পরিচ্ছদ বানাতে ভালোবাসতেন এক সময়। নিজের একটি দর্জির দোকান ছিল—সেইখানে নিজের খেয়ালে তিনি ছিলেন চলতি-রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, এবং নতুন-নতুন পোশাক-ফ্যাশন-এর প্রবর্তক। তাঁর এই পরিচ্ছদ-কল্পনার মধ্যে সহজাত কৌতুকপ্রবণতাটা এত সহজে যে প্রকাশিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি তিনি নিজে নানান রকম জামা-কাপড় পরতে মজা পেতেন। ফ্যাশন-এর ব্যাপারেও তাঁর কৌতুকবোধ তাঁকে চর্বিতচর্বণের সড়ক থেকে দূরে রেখেছিল।

অভিনয় প্রতিভা পেয়েছিলেন পৈতৃক সূত্রে। পিতা সতু রায় ছিলেন রঙ্গমঞ্চের এবং নীরব-সিনেমার নামী অভিনেতা। জহর রায় সিনেমায় অভিনয় করবেন বলে খুব কম বয়েসে পাটনা থেকে বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী যাচ্ছি বলে কলকাতায় পালিয়ে আসেন। সঙ্গে একটি কানাকড়িও ছিল না। তাঁর প্রথম ছবি 'পূর্বরাগ' (অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় পরিচালিত) পর্যন্ত পৌঁছতে তাঁকে এত বিচিত্র এবং কষ্টকর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত সেই সব টুকরো-টুকরো ঘটনা থেকে তিনি ছিনিয়ে এনেছিলেন তাঁর অনেক ভবিষ্যৎ কমেডির মালমশলা। এ জহর সে জহর নয়, ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিসট্যান্ট, সাহেব বিবি গোলাম, রাজির তপস্যা—তাঁর অভিনীত যে-কোনো ছবির কথাই আমরা ভাবি না কেন, আমরা বুঝতে পারি যে তাঁর অভিনয়-ধরনটি একমনই যে হাসি সেখানে আর শুধু হাসি নয়, নয় কেবলমাত্র ক্ষণপ্রভ অভিজ্ঞতা—তাঁর অতিরঞ্জিত দুঃসাহসিকতার মধ্যেও থাকে এমনি এক আকস্মিক সংকেত বা ব্যঞ্জনা। আমি মন্ত্রী হব, কিংবা উল্কা, কিংবা অপরিচিত—তাঁর প্রতিটি ব্যঙ্গাভিনয়ের মধ্যেও এমন এক ভাবাবর্জিত সার্বিক নিস্বন আমাদের ছুঁয়ে যায় যে, আমরা প্রায় স্বার্থপরের মতো ভাবতে পারি যে দুঃখ পাওয়াটা তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল, না-হলে বাংলা সিনেমায় এমনি নরম, দুর কমিক-স্টাইল-এর তিনি প্রণেতা হতে পারতেন না।

জহর রায়ের প্রতিভা সবচেয়ে সোচ্চারভাবে ঘোষিত হল, সত্যজিৎ রায়ের গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবিতে। 'আমাদের দেশে এত বড়-বড় কমেডিয়ান জন্মালেন, কিন্তু সার্থক কমেডির সংখ্যা হাতে গোনা যায়। অধিকাংশ বাঙালী পরিচালকদের কমিক সেনস বলে কিছু নেই। তাঁরা হাসাতে-হাসাতে কিভাবে কাঁদাতে হয় সেটা জানেন না। তাছাড়া সিনেমায় কমেডি ব্যাপারটা ভারী শক্ত। ওটা সহজে আসে না। সত্যজিৎবাবুর ছবিতে অভিনয় করতে গিয়ে এই ভেবে অবাক হলাম যে, আমি এতটা পারি। সেটা আমিই জানতাম না', বলেছিলেন জহর রায়। সত্যজিৎ রায়কে জহর রায় সম্পর্কে প্রশ্ন করায় উনি জানালেন, 'জহর রায় খুব শক্তিমান অভিনেতা ছিলেন সন্দেহ নেই। কমেডির ব্যাপারটা বুঝতেন খুব ভালো, ওটা একেবারে ভেতরের ব্যাপার ছিল, খুব সহজে আসতো। কিন্তু এখানে কমেডিয়ানদের তেমন সুযোগ কোথায়, তুলসী চক্রবর্তীর মতো কমেডিয়ান তো পাওয়াই যায় না। কিন্তু তাঁকেও তো বাজে বাজে ছবিতে অভিনয় করতে হয়েছে বাধ্য হয়েই। ওতে অভিনয়টা ক্রমশ ভাঁড়ামোর পর্যায়ে চলে যায়। দুঃখের কথা, জহর রায় তাঁর প্রতিভার তুলনায় খুবই কম সুযোগ পেয়েছেন।'

কিন্তু তাঁর কৌতুকবোধ ছিল এমনি তীব্র আর ব্যাপক যে যে-কোনো অভিজ্ঞতাই তাঁর পক্ষে হাস্যরসের বাহক হয়ে উঠতে পারতো—কোনো তথাকথিত সুযোগের জন্যে তাঁকে প্রতীক্ষিত থাকতে হত না। মৃত্যুর কয়েকমাস আগে কলকাতা নিয়ে তিনি ভাবছিলেন সবচেয়ে বেশি—কলকাতার রাস্তা, কল্লোলিনী তিলোত্তমা শেয়ালদা, বর্ষার কলেজ স্ট্রীট, এই উক্তি, 'কলকাতার বুকে আমরা জুড়ে দেব ডানা যার নাম গতি', কলকাতার লোডশেডিং, কলকাতার টেলিফোন, কলকাতার পাতাল রেল, কলকাতার পুলিস আর রাজনৈতিক নেতারা—এ-সবের চেয়ে অব্যর্থ কমেডির বিষয়বস্তু দুনিয়ায় আর কোথায় পাওয়া যাবে?

কিন্তু তাঁর শরীরের ধ্বংস নামছিল এই সব ভাবনারই পাশে-পাশে—তিনি হয়ে পড়ছিলেন আরো বেশি দুর্বল, ক্ষীণ, কৃশ। জন্ম ১৯১৯-এর ১৯শে সেপটেম্বর বরিশালে। মৃত্যু ১লা আগসট, সোমবার ১৯৭৭—কলকাতার মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে। এই দুই চূড়ান্ত বিন্দুর মধ্যে মাত্র আটান্ন বছরের ব্যবধান। কলকাতায় লোড শেডিং ব্যাপকতর হোক, খুলে যাক সব বিপজ্জনক ম্যানহোল, রাস্তার জল ঠেলে উঠুক আমাদের নির্বিঘ্ন হেঁসেল পর্যন্ত—আমরা তবু নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারি এই ভেবে যে এবার পুজোয় উনি আর কোনো রেকর্ড করছেন না!

আলোকচিত্র : নিমাই ঘোষ

সাহিত্য

লেখাটা শুরু করি গুরু-বাক্য দিয়ে। তাঁর 'নির্বাচিত গদ্য' নামের বইটির প্রথম রচনার প্রথম পাতার একেবারে শেষ লাইনে এলিয়ট জানিয়েছিলেন—

"Each generation, like each individual, brings to the contemplation of art its own categories of appriciation, makes its own demands upon art and has its own uses of art."

এলিয়ট প্রমুখ মনীষীরা যখন কোনো কথা বলেন, আমাদের ভাবায়। আর ভাবনার বোঝাটা পাহাড়ের মত গুরুভার হয়ে ঘাড়ে চেপে বসে, যখন তাঁদের উক্তির যথার্থতার সন্ধানে আমরা হাতড়াতে থাকি আমাদের নিজের দেশের শিল্প সাহিত্য।

আমাদের আলোচ্য বিষয় সাহিত্য। এবং বিশেষ করে উপন্যাস। এলিয়টকে মনে রেখে এবার প্রশ্ন করা যাক, আমাদের দেশের নতুন জেনারেশন কি তার নিজের মানসিকতার মাপে সাহিত্য গড়ে নিয়েছে? বা নিতে চাইছে? তাঁরা কি আজকের উপন্যাসে আজকের জীবনকে দেখার জন্যে ব্যগ্র? তাঁদের সাগ্রহ চাহিদা অথবা স্বতন্ত্র উপলব্ধির ফলে আজকের সাহিত্য কি আপাদমস্তক বদলে যাচ্ছে গতকালের সাহিত্যধারার চেয়ে? নতুন যুগের পাঠক কি বুঝে নিতে শিখেছেন যে কোন ধরনের সাহিত্য পুরনো এবং পচা এবং পুষ্টিহীন এবং অস্বাস্থ্যকর?

এতগুলি প্রশ্নের উত্তর কিন্তু একটাই। একটি অতি সংক্ষিপ্ত—না। আসলে গলদটা রয়ে গেছে প্রশ্নের মধ্যেই। প্রশ্ন উচ্চারণের আগে আমাদের জেনে নেওয়া উচিত ছিল এলিয়ট এখানে জেনারেশন বলে বোঝাতে চাইছেন কাদের। একটু ভাবলেই আমরা বুঝতে পারবো তাঁর অঙ্গুলি নির্দেশ পাঠক অথবা জনতার দিকে নয়, লেখক অর্থাৎ রচয়িতার দিকে।

এতক্ষণে অনুমান করা গেল যে, প্রত্যেক যুগের সাহিত্যিক স্বতন্ত্র হতে চান স্বমহিমায়, তাঁর পূর্ববর্তী যুগের সীমারেখা পার হয়ে। তিনি সম্মান দেন অথবা তাঁর সম্মান দেওয়া কর্তব্য মনে করেন পাঠকের চাহিদাকে নয়, তাঁর নিজস্ব যুগের চাহিদাকে। তিনি স্রষ্টা বলেই অহংকারী। তিনি তাঁর শিল্পকলায় এমন কিছু ভরে দিতে চান যার দ্বারা প্রমাণিত হবে তিনি তাঁর নিজস্ব যুগের একজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী।

আমাদের আলোচনা বাংলা সাহিত্য নিয়ে নয়। বাংলা সাহিত্যের মাত্র তিনটি উপন্যাস নিয়ে। এমন তিনটি উপন্যাস, যার লেখক কোথাও না লিখেও জানিয়ে দিয়েছেন, এই তিনটিতে মিলে একটি ট্রিলজী।

ট্রিলজী আজকাল সাহিত্য থেকে নির্বাসিত। তার সাম্প্রতিক বসত চলচ্চিত্রে। কেন আর লেখা হয় না ট্রিলজী? বিস্তৃত পরিকল্পনা আর ব্যাপক মনোযোগের প্রয়োজন বলে? বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক আবহাওয়ায় এই ধরনের পরিকল্পিত মনোনিবেশ অসম্ভব অথবা অপ্রয়োজনীয় অথবা অবান্তর বলে? তাৎক্ষণিক তৃপ্তিদানের বাইরে সাহিত্যের আর সব মূল্য ক্রমশ প্রাচীন স্থাপত্যের মত ভেঙে ধ্বসে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বলে?

ট্রিলজীর কথা থাক। আজকের এই আলোচ্য তিনটি উপন্যাসের লেখককে আমরা যদি ধন্যবাদ জানাতে চাই, তার কারণ এই নয় যে, তিনি একটি ট্রিলজী রচনা করে আমাদের উপহার দিয়েছেন। ধন্যবাদ জানাবো এই কারণে যে তিনি এলিয়টের উক্তিকে সত্য এবং অভ্রান্ত প্রমাণ করে নিজের সমকালের ছবিকে মূর্তি দিয়েছেন, হয়তো যুক্তিও দিয়েছেন অক্ষরে অক্ষরে। তিনি তার চেয়েও সামান্য কিছু বেশী করেছেন। বিদ্রোহ অথবা বিপ্লব অথবা গণতন্ত্র জাতীয় প্রচুর ভারী ভারী শব্দের মত সমকাল বা সমকালীন শব্দটিও আজ ধারহীন, মর্যাদাহীন। এসব বাক্য আজ আর আমাদের চেতনায় মন্ত্রের মত, যজ্ঞের আগুনের মত দীপ্তি ফোটায় না। সমকাল বললেই তাই আমরা বুঝে নিই এমন কিছু যার মধ্যে একটা যুগের অজস্র ভালপালা আছে কিন্তু কোনো শিকড় নেই, অজস্র সংবাদ আছে কিন্তু কোনো সত্য নেই। রমাপদ চৌধুরীকে ধন্যবাদ যে তিনি শিকড় অথবা সত্যকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে কি সেই সত্য? তখন আমরা নিজেদেরই প্রশ্ন করবো, সাম্প্রতিককালে আমাদের মর্মমূলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকারক আঘাত হেনেছে কি? মুদ্রাস্ফীতি? না। আর্থিক দৈন্য? না। জীবনযাপনের ক্ষেত্রে মূল্যবোধের পচন অথবা অপচয়? না। তাহলে কি? ভয়। আমরা ভীত। ভয় আমাদের প্রতি মুহূর্তের সহচর। নিরাপত্তাহীন ভয়ের একটা বিকট থাবা মনে হচ্ছে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব। তাই অপরাধের আগেই অপরাধজনিত
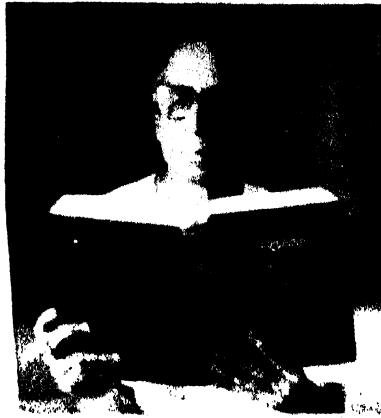
শাস্তির ভয়ে আমরা দিশেহারা, বিধ্বস্ত। মার্কসবাদী সমালোচক জর্জ লুকাস এই কথাটা বলেছিলেন বহুকাল আগেই—'Now the basic ingredients over fear and insecurity.'

বলেছিলেন তাঁর কাফকা বনাম মান-এর বিষয়ে একটি আলোচনায়। বলেছিলেন ডিটেকটিভ উপন্যাস অথবা হরর কমিকসের সাম্প্রতিক জনপ্রিয়তার মূলে কারণও সেটাই। কিন্তু ওগুলো সাহিত্য নয়। অবাস্তব। অথচ ঐ একই মূল বিষয় নিয়ে কাফকা যে উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন মহত্ত্বে, লুকাসের মতে সে সার্থকতার প্রধানতম কারণটি হল, বাস্তবের ডিটেল।

আমাদের আলোচ্য উপন্যাস-ত্রয়ের প্রথমটির নাম, খারিজ। এই উপন্যাসের প্রথম কয়েকটি পাতা পড়ার পর আমরা কি সত্যিই স্বাদ পাই না কোনো ক্রাইম নভেলের? যে কোনো ক্রাইম নভেলও কি ঠিক এমনিভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির গায়ে আচমকা একটা ঘা মেরে সেতারের তারের মত কাঁপিয়ে দেয় না থরথরিয়ে? তবুও যে খারিজ নিছক একটা হত্যাকাহিনীর সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল একটা স্মরণীয় সাহিত্যের দিকে, সে যে কোনো একটি ভয়ার্ত মানুষের ব্যক্তিগত জীবন-কাহিনীর বদলে হয়ে উঠলো আমাদের এই বিপর্যস্ত কালের জীবনচরিত, তার মূলে রয়েছে কি? বলা বাহুল্য, মনোমুগ্ধকর গল্প নয়, কারুকার্যময় ভাষা নয়, চমকদারী চরিত্রসৃষ্টি নয়। বইটি শেষ করার পর আমরা অবাক হয়ে দেখি এর কোনখানেই ছড়াছড়ি নেই উপমা-অলঙ্কারের। উপমার ব্যবহার ঘটেছে মাত্র এক জায়গায়। আর সেটাই এই কাহিনীতে সবচেয়ে জরুরী। সে হল পালানের বর্ণনা। এবং মাত্র এক লাইনে।

"চোখে তার দাম-শ্যাওলার আভা, মুখে নিকোনো উঠোনের ঠাণ্ডা প্রলেপ।" আদ্যোপান্ত এই উপন্যাসের ভাষা এমনই সহজ, সরল, অলঙ্কারহীন আর কাব্যগন্ধবর্জিত যে, এরই মাঝখানে নায়কের জীবনের প্রথম প্রেমের বর্ণনায় যখন লেখক মাত্র এক-বারের জন্যে ঈষৎ রঙীন করে দেন তাঁর ভাষাকে এবং লেখেন "যেন একটি পদ্মের কুঁড়িকে আমি ভোরে শিশির আর ঊষার আলো উপহার দিয়ে স্নিগ্ধ বাতাসের চামর দুলিয়ে একটু একটু করে পাপড়ি খুলে দিয়েছি।" তখন এই নিষ্পাপ ... মধুরতাকেও মনে হয় যেন হোঁচট খাওয়ার একটা ...

মূলত এই উপন্যাসকে মাধুর্য এবং ... দিয়েছে বাস্তবতার ডিটেল। আর এখানে ... ডিটেলের আধার হয়ে উঠেছে তার নায়ক চরিত্র ঘটনার এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে তার সম্পর্কের অদল-বদল ঘটছে, অন্যান্য চরিত্রদের সঙ্গে। ক্ষণে ক্ষণে বদলানো তার মানসিক প্রতিক্রিয়া এবং মানবিক অনুভূতির ভিতর দিয়ে আমরা শুধু একটা জীবনকে দেখি না, অভিজ্ঞ হয়ে উঠি জীবন সম্পর্কে।

কেউ যদি প্রশ্ন করেন, কাহিনীহীন এই উপন্যাসের মূল কাহিনীটা কী, তাহলে কাফকার সেই অবিস্মরণীয় 'মেটামরফোসিস'কে মনে রেখে আমার বলতে ইচ্ছে করবে জয়দীপ নামের একটি মধ্যবিত্ত যুবক একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আরশোলার মত তুচ্ছ হয়ে গেল। নিজেকে সে আবিষ্কার করল একজন হত্যাকারী হিসেবে। আত্মরক্ষার তাগিদে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল দিশেহারা। আর তার ঐ ঘূর্ণীর সঙ্গী হয়ে আমরা পরিচিত হলাম সমাজের প্রায় সর্বস্তরের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্রদের সঙ্গে। সমাজের সর্বস্তরের পাপ, পতন, হৃদয়হীনতা, যান্ত্রিক সৌজন্য, মজ্জাগত শৈথিল্য, স্বার্থপরতা এবং বহু রকমের মুখোশও দেখা হয়ে যায় সেই সঙ্গে। একটি বালকের মৃত্যুর সঙ্গে এইসব অভিজ্ঞতা এমন এফোঁড়-ওফোঁড় সেলায়ে জুড়ে যায় যে, কোনো একটা সময়ে পালানের মৃত্যুর চেয়ে আমরা অনেক বেশী বিপন্ন হয়ে পড়ি ভিতর-থেকে-ঘুণ-ধরা এই সময় অথবা সমাজের মৃত্যু-সম্ভাবনায়। খারিজ যেন আজকের গোটা সমাজের একটা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট। আমরা দেখতে পাই হত্যাপরাধের রক্ত লেগে আছে আমাদের প্রত্যেকের হাতে।

লেখক কি নিপুণ কৌশলে চীনে টাচের কাজের মত অল্প আঁচড়ে আমাদের সামনে গোটা সমাজের পরিমণ্ডল খাড়া করে দিয়েছেন, তার নমুনাগুলোর দিকে একবার তাকানো যাক।

১। "পুলিশ-ভ্যানে যেতে যেতে এস-আই ভদ্রলোক নানান রকম গল্প করছিলেন। বাজারে জিনিসপত্তরের দাম কি রকম হু হু করে বাড়ছে, আজকালকার মেয়েদের চরিত্র, হিন্দি সিনেমা।"

২। "আমার বলার ভঙ্গী নকল করে (অদিতি) টেনে টেনে বলেছিল, সোনা চাই না, রুপো চাই না, আমি বহুমূল্য বস্ত্রালংকার চাই না, লাকসারি ফ্ল্যাট চাই না, আমি শাড়ী, গাড়ি, ফ্রীজ রেডিওগ্রাম চাই না, কালো টাকা রাখার জন্যে ব্যাংকের লকার চাই না, আমি শুধু একটি বালক ভৃত্য চাই।"

৪। "ঘোষ সাহেব আবার খোঁজ করল কেন? শালা নতুন এসেছে, সকলের পিছনে লাগছে। অথচ কাজ কিছু জানে না। শুধু ছুরি আর কাঁটা-চামচ ধরতে শিখে এসেছে। দেদার ঘুষ খাচ্ছে। আজকাল অবশ্য দিনকাল বদলে গেছে—যে ঘুষ খায় সেই এফিসিয়েন্ট।"

৫। "পালানের মৃতদেহটা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েও যেন আমাকে রেহাই দিতে চাইছে না। 'বদলা নেবোই, সমীরণ, তোর মৃত্যুর আমরা বদলা নেবোই'। সেই শ্মশানঘাটের দেয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে লেখা প্রতিজ্ঞাপত্রটা যেন এখনো ভয় দেখাচ্ছে। চিতার আগুনে নিঃশেষ হয়েও পালান চোখ রাঙিয়ে শাসন করতে চাইছে। যেন প্রতিটি মানুষ বলছে, 'বদলা নেবোই, জয়দীপ, পালানের মৃত্যুর আমরা বদলা নেবোই'।"

খারিজে অনেক চরিত্র ছোট বড় মাঝারি মিলিয়ে; তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের আগেই চেনা। কেউ কেউ পোশাক পালটে ভিন্ন। নায়ক জয়দীপ স্বাদে-গন্ধে আনকোরা নতুন, একই সঙ্গে তার স্বার্থপরতা আর মানবিকতা, তার আত্মসম্মান

আর আত্মদমন নিয়ে। কিন্তু তার চেয়েও মর্মন্তুদ পলাশের বাবা, তাকে মাত্র দু'বার দেখতে পেয়েছি এই উপন্যাসে। অতি স্বল্পস্থায়ী উপস্থিতি। প্রথম একজন ছেলেকে পৌঁছে দিতে। শেষ বার ছেলের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে। এই উপন্যাসে একমাত্র তারই মুখে সবচেয়ে কম সংলাপ। আর তার শেষ সংলাপটি যখন আমাদের সামনে প্রবল আর্তনাদে ফেটে পড়ে—'আমার পলাশকে ফিরিয়ে দেন বাবু', তখন পাঠক হিসেবে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে অশ্রুর ধারা সামলানো। আর এই আর্তনাদের নীচে প্রদীপের প্রজ্বলন হিসেবে লেখক যখন জুড়ে দেন একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য "ঈশ্বরের কাছেও মানুষ বোধ হয় এমনভাবে প্রার্থনা জানায় না" তখন সমগ্র দৃশ্যটি অর্জন করে যেন এক ঐশিক মহিমা।

ত্রিলজীর দ্বিতীয় উপন্যাস, লজ্জা। লেখক এখানে সম্ভবত ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছেন বাইরের বদলে ঘর। বিপুল সমাজের দিকে নয়, বিত্তশালী একটি পরিবারের পলেস্তারা-খসা ফাটলগুলির দিকেই এখানে তাঁর মনোনিবেশ। এ উপন্যাসেও কাহিনীর কথক উত্তম পুরুষ অর্থাৎ আমি। এখানেও আমি চরিত্রটিকে ঠাঁইই পুলওভারের মত আকণ্ঠ জড়িয়ে রয়েছে অপরাধবোধের ভয় এবং উদ্বেগ। যেন সেই-ই এই পরিবারের যাবতীয় ধ্বংসের অন্তর্নিহিত কারণ। খাঁচা উপন্যাসের আত্মকথকেরই পরবেশধারণেই যেন এই কাহিনীতে নাম এবং পরিচয় পালটে গিয়েছে মাত্র। তিনিই সূত্রকর্তা, নায়ক যে সূত্রে আশ্রিত। খাঁচার মত এ উপন্যাসও টান-টান উৎকণ্ঠা নিয়ে শুরু। অর্থাৎ শুরুতেই মৃত্যুজনিত সাসপেন্স। কিন্তু না, এ উপন্যাসে দৈহিক মৃত্যু ঘটেনি কারোরই। মৃত্যু ঘটে যায় মর্মমূলে। কতকগুলি সম্ভ্রান্ত চরিত্র ক্রমশ হারাতে থাকেন তাঁদের বিশ্বাসের সুস্থতা, বিশ্বাসের ভিত্তি। যে অপবাদকে তাঁরা মনে প্রাণে ভাবেন অলীক, সেটাই তাঁদের পাঁজরের ভিতর গড়তে থাকে ক্ষতের ঘা। রেণু, যাকে কেন্দ্র করে কাহিনীর ওলোট-পালট সেই; বিয়ের অল্প কিছুদিন পরেই সে ফিরে এল বাপের বাড়িতে, স্বামীর দেওয়া অপবাদ মাথায় নিয়ে, ইনস্যানিটি। নায়ক, অথবা উপন্যাসের কথক, সন্তোষের ঘাড়ে সেই মুহূর্ত থেকে চেপে বসল নিস্তারহীন এক অপরাধবোধ। একদিকে তার নিজস্ব অস্তিত্বের ভিতরে কাটা-ছেঁড়া রক্তারক্তি। অন্যদিকে সে প্রত্যক্ষদর্শী সারা সংসারের বাকী চরিত্রের নিঃশব্দ রূপান্তরের। আমরাও দেখতে পেলাম একটা অপ্রকৃতিস্থ মানুষ আছে চার দেয়ালের মধ্যে, এই লজ্জায় তাই সব মানুষগুলোই অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠছে কেমন করে।

লজ্জার মধ্যে পাকা-কলমের স্পর্শ আছে অনেক। পড়তে পড়তে অলংকারের বাসন ভাঙার মত শব্দ হয় বুকের মধ্যে। কিন্তু সব মিলিয়ে 'লজ্জা'র কোন বৃহৎ উদ্ঘাটন নেই। লেখক যেন ঘোমটা সরিয়ে কিছু দেখালেন। মনে করে কিছু দেখালেন না। উপন্যাসটির সীমাবদ্ধতার কারণ কি এই যে, বড় বেশী পারিবারিক?

না, বড় বেশী পারিবারিক হয়েও একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাঙন কেমন করে গোটা সমাজের ক্ষেত্রে ভূমিকম্পের কাঁপুনি হয়ে ওঠে, তার প্রমাণ তো এই লেখকেরই 'হৃদয়'-এ, ত্রিলজীর শেষ উপন্যাস।

ত্রিলজী হতে হলে কোথাও একটা যোগসূত্র থাকতে হয় তিনটির মধ্যে। হৃদয়ে তা আছে। মাত্র প্রথম দুটো পাতার পরই এ উপন্যাসেও ফিরে আসে খাঁচা-এর সেই দুঃস্বপ্নময় পরিবেশ, যা মৃত্যু আশঙ্কায় থরো থরো, সেই ডাক্তার ডাকাডাকি, সেই অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে ব্যস্ততা।

হৃদয়-এর বাবা চরিত্রটি একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ। অথবা লেখকের ভাষায়, প্রাচীন স্বপ্ন। অর্থাৎ এমন এক স্বপ্ন যা আজকের দিনে মূর্খ ছাড়া কেউ দেখবে না।

স্বপ্নে কি দেখেছিলেন তিনি?

"বাবা একদিন ঠাট্টা করে কাকে যেন বলেছিল, বোটানিক্সের বট গাছের মত সংসারটা গড়ে তুলতে চাই। গুঁড়িটা না থাকলেও ঝুরি নামিয়ে নামিয়ে গাছটা থাকবে মাথা তুলে। বিশাল, ছায়াঘন, শান্ত পরিচ্ছন্ন।"

সেই স্বপ্ন-দেখা মানুষটির স্ট্রোক। সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক। তিনি কেন্দ্রে, কিন্তু মুখ্য চরিত্র নন। মুখ্য চরিত্রেরা কয়েকটি ঝুরি, তাঁর সন্তান-সন্ততিরা। শুভেন্দু, সুখেন্দু, নবেন্দু আর সুখেন্দু-র বউ বীণা। নবেন্দুর বউ রমা। আর অবিবাহিত শুভেন্দুর প্রেমিকা ইন্দু। শুভেন্দুই বাড়ির বড় ছেলে। সেই-ই এই উপাখ্যানের কথক। কিন্তু যেহেতু বেকার, অথবা তার চাকরীটা এমনই নগণ্য যে তা দিয়ে ঘসে তোলা যায় না বেকারত্বের অপমান।

বাবার অসুখ, হৃদরোগ, যার চিকিৎসা চলে। তাঁর সুস্থ সকল সন্তান-সন্ততিরা আক্রান্ত এক অসুস্থ সময়ের ভাইরাসে, যার চিকিৎসা নেই। খাঁচা-এ ছিল ভেন্টিলেশনের সমস্যা। অর্থাৎ বাইরের আলো বাতাসের অভাব। হৃদয়-এ বাইরের পৃথিবীর অফুরন্ত আলো বাতাসটাই বয়ে এনেছে যাবতীয় সমস্যার জীবাণু। বদলে-যাওয়া অথবা নতুন হয়ে ওঠা পৃথিবীর সেই আলো বাতাসকে নিজের জীবনে ঠাঁই দিতে গিয়ে সংসারের ছোট্ট কাঠামোয় সবই হয়ে উঠছে স্বার্থপর এবং হৃদয়হীন। অথচ প্রত্যেকের এই আপাত হৃদয়-হীনতার দিকে ঘনিষ্ঠ অথবা অন্তরঙ্গ চোখে তাকিয়ে দেখলে বোঝা যাবে প্রত্যেকের কাছে তার নিজস্ব দাবী-দাওয়া কত অভ্রান্ত এবং খাঁটি এবং জরুরী। সেই কারণেই নবেন্দুর পোশাক-আশাক এমন উগ্র রকমের আধুনিক। সেই কারণেই বীণা চায় সুখেন্দুর সঙ্গে ডিভোর্স। সেই কারণেই সুখেন্দু মোটা মাইনের থেকে মাত্র দুশো টাকা মায়ের হাতে বেশী তুলে দিতে পারে না। সেই কারণে শুভেন্দুকে ছেড়ে দিতে হয় তার আজন্মের প্রিয় দক্ষিণের ঘরটা। সেই কারণেই বাবার জীবনের শেষ আশ্রয় হয়ে ওঠে, সংসার নয়, শুধু একটা হুইলচেয়ার। হায়! পৃথিবীর এত উজ্জ্বল উন্নতির পরও, পৃথিবীর সাহিত্যে এখনো ট্রাজেডীই সুন্দর।

উপন্যাসটা যখন আগাগোড়া পড়া শেষ, তখন হৃদয় নামক শব্দটা একটা বিরাট ঠাট্টা হয়ে পেটা ঘড়ির ঢং ঢং আওয়াজে কানে বাজতে থাকে আমাদের। এই হৃদয়কে নিয়ে কত না বন্দনা গান কবিতায়। আর যেখানে জীবন আকাড়া জীবন, সেখানে হৃদয় মানে এমন এক জটিল অঙ্ক কষাকষি, কোনো পাটীগণিতেরই শেষ পাতায় যার উত্তর ছাপানো নেই। তাই হৃদয়ের পরিবর্তে অথবা হৃদয়ের কাজ-কর্মকে অন্তত বাবার প্রয়োজনে যখন বাবা চরিত্রটির জন্যে প্রয়োজন হয় পেস-মেকার নামক যন্ত্রের আমরা বুকে নিই লেখকের বেদনা এবং বিদ্রূপ। মানুষের রক্ত মাংসের হৃৎপিণ্ডেও যান্ত্রিক কলকব্জার আধিপত্য, আমাদের ন্যায়-নীতি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, হয়তো যাবতীয় মূল্যবোধেরই যান্ত্রিকতার প্রতীক। মাঝে মাঝে হিম হয়ে আসে আমাদের রক্ত, যখন পড়ি—

"তার (বাবার) বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক আওয়াজটা আমরা শুনতে পাবো, চতুর্দিকে এখনো সকলেই যে শব্দটা শুনতে পাচ্ছে। শুধু জানে না, ওটার আয়ু শেষ হয়ে আসছে, কারণ শব্দটা পেস-মেকার যন্ত্রের, যেটা ঐ হৃৎপিণ্ডটাকে এখনো চালু রেখেছে। ঐ যন্ত্রটার আয়ু একদিন শেষ হয়ে যাবে। তখন এই পৃথিবীতে, এই সমাজে আমরা সবাই অসীম শূন্যতার মধ্যে একেবারে একা হয়ে যাবো।"

জীবনানন্দের কোনো কোনো ভয়ংকর কবিতার মতই আমাদের চেতনার নরম মাটিতে গোপন গর্ত খোঁড়ে এই জাতীয় পংক্তিগুলো। একা হয়ে যাওয়ার ভয় কোটো-খোলা ঘড়ির মতো মিইয়ে-ঝিমিয়ে আনে আমাদের সমস্ত স্পন্দন। এমন যে শূন্যতার পরিমণ্ডল, সেখানেও আমরা এমন দুটি দুঃখী চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই, যারা এখনো আছে বলেই পুরোপুরি নষ্ট নাশ-পাতি হয়ে ওঠেনি এই পৃথিবী। তার একজন মা, অপরজন ইন্দু। এখনকার বাংলা সাহিত্য বস্তুত মাতৃহারা। আনন্দময়ীর মতো মা আর ফিরে আসবে না কোনোদিন। যে-সংসারের কয়লা কাঠ-কয়লাকে জীবিকার পাথরে [illegible] তাঁরা, সেই সংসারে মায়েরাই এখন সবচেয়ে মূল্যহীন, মর্যাদাহীন। হৃদয়-এর মা সেই রকমই একটি টুকরো-জোড়া মা, বাবা পেয়েও, আঘাতে দীর্ণ হয়েও পুরোনো কালের দেয়াল-ঘড়ির পেন্ডুলামের মত দুলে চলেছেন সংসারের স্বপ্ন এবং ধ্বংসের দুদিকেই।

আর ইন্দু? হৃদয়-এর মা চরিত্রটিকে যদি বলি স্বপ্নের ধ্বংস, ইন্দুকে বোলবো ধ্বংসের স্বপ্ন। সমাজের হিসেবে অযোগ্য বলেই ইন্দু যাকে ভালবাসে, তাকে পেল না। স্বপ্নের গোলাপ ঝরে ঝরে তাকে টেনে নিয়ে চলল যৌবনের শ্মশানের দিকে। তবু তার আসল ভালবাসাটা মরল না। সংকটময় প্রয়োজনের মুহূর্তে সে তার সর্বস্ব তুলে দিতে পারল অনায়াসে তাকেই, তার শুকনো জীবনের জন্যে যাবতীয় দায়ভাগ যার।

খাঁচা প্রসঙ্গে আমি কোনও একটি স্তবক তুলে বলেছিলাম, যেন হোঁচট খাওয়ার গর্ত। লেখক যেন আমাকে লজ্জিত করার জন্যেই তাঁর হৃদয়-এ, ঠিক সেই ভালবাসার ছবি আঁকতে গিয়েই, এমন একটি কাব্যময় মুহূর্ত তৈরী করে দিয়েছেন, যাকে যথার্থ কবিতার সম্মান দিতে বাধবে না কারো।

"'আমি তোমার হৃৎপিণ্ডটা চাইতে এসেছি। কারণ আমার একটা হৃৎপিণ্ডের বড় প্রয়োজন।'

ইন্দু অবাক হয়ে তাকালো আমার দিকে। তারপর নিঃশব্দে, কোন প্রশ্ন না করে ইন্দু ধীরে ধীরে তার দুটি স্বর্গীয় শ্বেতপদ্মের বুক উন্মুক্ত করে দিলো, বললে—নাও।"

পড়লে প্রথমেই মনে হয়, ইন্দু নায়ককে দিল তার শরীরময় প্রেম। একটু পরে বুঝতে পারি, শরীর নয়, তার সারা জীবনের যা-কিছু সঞ্চয়, সেই টাকা। ওতেই কেনা হ'ল বাবার পেস-মেকার।

উপন্যাসের আরেকটি কৃতিত্ব সম্বন্ধে কোনও কথা না বললে পাঠকদের কাছে অপরাধী থেকে যাবো। সেটি এই উপন্যাসের শেষ। ফিউচার টেনস-এ আঁকা হয়েছে এক ভবিষ্যতের ছবি। যেন একটা সাদা-কালোর চলচ্চিত্র শেষ দৃশ্যে এসে রঙীন হয়ে উঠেছে হঠাৎ। মনোরম, স্বপ্নালু। তবু তার মধ্যেও সংক্রামিত আছে শূন্যতার ঘোর।

এই উপন্যাসের একেবারে শেষ লাইনটিতে এসে আমরা পড়ি, 'খোকা, টাকাটাই সব নয়, তুই তো আমার হীরের টুকরো ছেলে রে।' ঠিক তেমনি, এই তিনটি উপন্যাস এক সঙ্গে পড়ার পর, পাঠকের বুক থেকেও উচ্চারিত হয়ে উঠবে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন, যার ভাষা—

'রমাপদবাবু, নিছক টাকার জন্যে লেখাটাই সব নয়, আপনি তো হীরের টুকরোই উপহার দিয়েছেন আমাদের।'

বুকে পেস-মেকার এঁটে হাসপাতাল থেকে ঘরে ফিরে এসে হৃদয় উপন্যাসের বাবা চরিত্রটি একথা বলে উঠেছিলেন—

"একে কি তোরা বাঁচা বলিস।" এর নাম টিকে থাকা, দু হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরা, আগলে থাকা। ...দেখছিস না কত দ্রুত সব কিছু পাল্টে যাচ্ছে। সমাজ, সংসার, আদর্শ।

একে কী আমরা বাঁচা বলি, যেন এই বিষয়ের উপরই রমাপদ চৌধুরীর তিনখানি উপন্যাস, যার প্রথমটি সমাজ, দ্বিতীয়টি সংসার, তৃতীয়টি আদর্শ। সার্থক, সুন্দর, সমৃদ্ধ। তাঁর এ-জাতীয় সাহস অথবা দুঃসাহস আরো দীর্ঘদিন টিকে থাকলে বাংলা সাহিত্য উর্বরতার সম্মান পাবে।

পরিশেষে একটি নিবেদন। লেখক এবং প্রকাশক, উভয়ের কাছেই। এই তিনটি উপন্যাসকে কী একটু অন্যভাবে পরিবেশন করা যায় না? একটি মলাটের ভিতরে তিনটি বই। প্রারম্ভে লেখকের একটি দীর্ঘ ভূমিকা। আর সে ভূমিকা যদি এই তিনটি উপন্যাসের উঠোন ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে বাইরের রাস্তাঘাটে, সে তো আরোই সুখের।

পূর্ণেন্দু পত্রী

খাঁচা, লজ্জা, হৃদয়। রমাপদ চৌধুরী। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, [illegible]

সফল উইঙ্গার মানস ভট্টাচার্য

কাবুল সফর থেকে ফিরে এসে মোহনবাগানের রাইট আউট মানস ভট্টাচার্য যেদিন পোর্ট কমিশনার্স-এর বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করল সেদিন সারা মাঠে অনেকের মুখেই একটি কথা : মানস থাকলে ৯ জুলাইয়ের ম্যাচে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের কাছে হারত না, লীগও হত না মোহনবাগানের হাতছাড়া। অনেকে ক্লাব কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও কটূক্তি করতে কসুর করেননি। তাঁদের বক্তব্য : ক্লাবের উপরই যখন খেলোয়াড় ছাড়ার ভার ছিল তখন সম্ভাবনাময় উঠতি খেলোয়াড়টিকে ছাড়া হল কেন?

মানস থাকলেও মোহনবাগান জিতত কি-না সেটা পৃথক কথা। হয়তো হারতেও পারত। কিন্তু যে খেলোয়াড়টি 'তিন কাঠি' সবার চেয়ে ভাল চেনে তাকে ছাড়াতেই সমালোচকরা সুবিধাটা পেয়ে গেছে। আর এ কথাও তো সত্যি এই লেখার সময় পর্যন্ত মোহনবাগানে আটটি ম্যাচ খেলে মানস দশটি গোল করেছে। কাবুল থেকে ফিরে এসে চারটি ম্যাচে করেছে সাতটি গোল।

ব্যক্তিগতভাবে কাবুল সফরে অবশ্য মানসের লাভই হয়েছে। আর্থিক লাভ বা ভারত দলের হয়ে খেলার কথা বলছি না। বলছি অভিজ্ঞতা ও পরিমার্জনের কথা। সত্যিই মানস এখন অনেক পরিমার্জিত উইংগার।

নিজেই বলছিল পাতিয়ালার কোচিং ক্যাম্পে এবং কাবুলে কোচ অরুণ ঘোষ ওদের উপর যথেষ্ট নজর রেখেছিলেন। ওদের মানে, মানসের ও ইস্টবেঙ্গলের প্রশান্ত ব্যানার্জীর উপর।

"অরুণদা বলেছিলেন, তোরা কলকাতায় ফিরে অনেক বেটার খেলবি। দেখবি ফুটবলের টেকনিক-ট্যাকটিকস এবং আক্রমণ রচনা সম্পর্কে তোদের ধারণা আগের চেয়ে অনেক স্বচ্ছ হয়েছে।"

"হয়েছে কি?"

"সঠিক বলতে পারছি না। সেটা তো আমাদের চেয়ে আপনাদেরই ভাল বোঝার কথা। তবে আমি বলতে পারি, আমার আত্মবিশ্বাস আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। তাই অরুণদার কাছে আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ এবং আমাদের ক্লাব-কোচ প্রদীপদার কাছেও আমার কৃতজ্ঞতা কোন অংশে কম নয়।"

প্রতিশ্রুতিবান ফুটবলার হিসাবেই কলকাতা ময়দানে মানসের আবির্ভাব। এক সময় পিতৃপুরুষের আদি বাড়ি ছিল খুলনা জেলার রতনপুর গ্রামে। বাবা সমারত ভট্টাচার্য চাকরী করেন বাটা কোম্পানীতে। থাকেনও বাটানগরে। সেখানেই মানসের জন্ম ১৯৫৬ সালের ২৫ এপ্রিল। মানস পড়ত বাটা স্কুলে। ছাত্র ভালই ছিল। খেলাধুলোয় উৎসাহ দিতেন দাদা মানব ভট্টাচার্য ও মা। বাবা কিন্তু পড়াশুনোর জনাই তাগিদ দিতেন বেশী। খেলাধুলোয় বিশেষ উৎসাহ দেখাতেন না। মানস এখন বলে বাবার খবরদারি না থাকলে এত খেলাধুলোর মধ্যে পড়াটা হয়তো ঠিকমত করতে পারতাম না।

বাটা স্কুল থেকেই মানস হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে ১৯৭২ সালে। আশুতোষ কলেজ থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক হয়েছে ১৯৭৫-এ। আগে চাকরী করত এ জি বেঙ্গলে। এখন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের খিদিরপুর ব্রাঞ্চে সেভিংস ডিপার্টমেণ্টে।

বাটানগরেই ফুটবলের পারেখড়ি। ছোটবেলায় খেলা শিখেছে গোলকিপার অমিতাভ ঘোষের কাছে। পরে প্রশিক্ষণ পেয়েছে কোচ সুভাষ সাহা, শচীন হালদার, প্রদীপ ব্যানার্জী, অরুণ ঘোষ প্রভৃতির কাছ থেকে।

কলকাতা ময়দানে খেলা শুরু ১৯৭৩-এ। তখন খানার উদীয়মান রাইট উইংগার হিসাবে প্রথম বছরেই নজর কেড়েছিল। দু বছর ছিল ক্যালকাটা জিমখানায়। ৭৫' ও ৭৬'-এ খেলেছে এরিয়ান ক্লাবে। এই '৭৭-এ খেলেছে এরিয়ান ক্লাবে। এই '৭৭-এ এসেছে মোহনবাগানে।

প্রতিনিধিমূলক খেলাতেও ডাক পেয়েছে '৭৩ থেকে। ঐ বছর খেলে বাংলা স্কুল দলে। ৭৩-৭৪ এবং '৭৪-৭৫-এ জুনিয়র বাংলা দলে। সিনিয়র বাংলা দলের হয়ে সন্তোষ ট্রফিতে এ বছর এবং এ বছরই তেহেরানে অনুষ্ঠিত এশীয় যুব ফুটবলে খেলেছে ভারতের যুব দলে আর আফগানিস্তানের স্বাধীনতা উৎসব ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতের বড় দলে।

কলকাতা ময়দানে মানসের প্রথম ডিভিসনের প্রথম ম্যাচটিতেই মোহনবাগানের কর্মকর্তারা ছেলেটিকে চিনে রেখেছিলেন। '৭৩-এ জিমখানার সঙ্গে ছিল মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচ। সুরজিৎ সেনগুপ্ত তখন মোহনবাগানের খেলোয়াড়। সুরজিতের গোলে মোহনবাগান এগিয়ে গেল। কিন্তু মানসের গোলেই খেলার ফল হল ১—১। যে গোলটি সেদিন মানস করেছিল সুরজিতের গোলের তুলনায় তার সৌন্দর্য ছিল কিছু বেশীই। তাই খেলার শেষে অনেকের মুখে মুখে 'মানস' নামটি উচ্চারিত হয়েছিল।

গোল করার ব্যাপারে মানস সত্যিই সিদ্ধপদ। '৭৪-৭৫-এ কোয়েম্বাটোরের জাতীয় জুনিয়র ফুটবলের ফাইনালে কেরালাকে ২—০ গোলে হারিয়ে

বাংলা চ্যাম্পিয়ন হয়। দুটি গোলই করে মানস ভট্টাচার্য। এ বছর তেহরানে এশীয় যুব ফুটবলে বাংলা দেশের বিরুদ্ধে মানসের দুটি গোল ছিল দেখার মত। কাবুলে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিনটি গোলের মধ্যে দুটি করেছে মানস। গত বছর ইস্টবেঙ্গল বনাম এরিয়ান খেলার ফল ছিল ১—১। মানসই করেছিল এরিয়ানের গোলটি। '৭৫-এ বরদলুই ট্রফির সেমি ফাইনালে এরিয়ান হারে মোহনবাগানের কাছে ২—৫ গোলে। মোহনবাগানের কর্তারা দ্বিতীয় বার মানসকে চিনেছিলেন ওর চমৎকার খেলা এবং একটি গোল করা দেখে। এবার মোহনবাগানের পক্ষে লীগের প্রথম খেলাতেই ও গোল পায় চন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লাবের বিরুদ্ধে এবং এরিয়ানের বিরুদ্ধেও মোহনবাগান জেতে মানসের গোলে। অবশ্য চারটি সুযোগ নষ্ট করার পর। হাফ টাইমের আগেই সুযোগগুলি নষ্ট হয়। বিরতির সময় কেউ কেউ ঠাট্টা করেছিল —ছেড়ে আসা ক্লাবের বিরুদ্ধে গোল করতে হয়তো মানসের মায়া হচ্ছে। উৎসাহ দিয়েছিল সুভাষ ও হাবিব। শ্যাম থাপা বলেছিল—"তোমার গোলেই আজ টিম জিতবে। ঘাবড়াও মৎ।"

সত্যিই তিন কাঠি মানস ভাল চেনে। দু-পায়ের শটেও সমান জোর। যে-কোন অ্যাঙ্গেল থেকে গোলে শট নিতে পারে। লেফট উইংগার বিদেশই মোহনবাগান আক্রমণের জোড়া ফলা হিসাবে স্বীকৃত।

ছেলেটির খেলার আর এক বৈশিষ্ট্য উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কোন বল পাস করে না। বহু বড় খেলোয়াড়ের খেলা দেখেছি। কিন্তু আমি বিশেষ করে দু-জন খেলোয়াড়ের কথা বলব। উইথাউট পারপাস তাঁদের একটি বলও মারতে দেখিনি। একজন পাগসলে, আর একজন মেওয়ালাল। ভুল হয়তো তাঁদেরও হয়েছে কিন্তু যখনই বল মেরেছেন হয় সতীর্থের কাছে দিয়েছেন, না হয় এমন জায়গায় বল দিয়েছেন, যেখানে দৌড়ের মুখে সতীর্থ বলটি পেতে পারে। বিনা প্রয়োজনে মাঠের বাইরে বা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে মাঠের মধ্যে কাউকে বল মারতে দেখিনি। মানসের খেলার মধ্যে সেই গুণেরই আধিক্য।

মানসকে প্রশ্ন করেছিলাম—৯ জুলাই ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান খেলার দিন নিশ্চয়ই তোমরা মনমরা হয়ে ছিলে। খেলতেও পারলে না, খেলা দেখতেও পেলে না।

মানস বলল, "আমরা যখন মোহনবাগানে খেলি তখন বুঝতে পারি না বাইরে এই খেলা নিয়ে কী উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। অন্য খেলায় হয়তো ততটা উত্তেজনা হয় না। কিন্তু এবারে পাতিয়ালার ট্রেনিং ক্যাম্পে থেকে দেখেছি ওই খেলা সম্পর্কে সকলের কী ঔৎসুক্য। শুধু ফুটবল রসিকরাই নয়, ক্যাম্পে যারা ছিল সকলেই যেন মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল দুটি ক্যাম্পে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। ভারত বিখ্যাত অ্যাথলীট যোহানন এবং পরভীন কুমার পর্যন্ত।

মানস বলে চলেছে, "সেদিন প্র্যাকটিস ছিল। আমি ও ইস্টবেঙ্গলের প্রশান্ত ব্যানার্জী প্র্যাকটিসে না গিয়ে একটি ঘরে রেডিও খুলে বসলাম। মিহির গোল করতেই প্রশান্ত আমার পিঠে সজোরে একটা চাপড় মেরে বলল, কী রে, কেমন দিলাম। আমি বললাম অতো লাফাচ্ছিস কেন, এখনই শোধ হয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় শোধ। পিণ্টু দ্বিতীয় গোল করতে প্রশান্ত আবার লাফিয়ে উঠল। ওকে তখন পায় কে? খেলা শেষ হবার পর শুধু প্রশান্ত নয়, সবাই লাগল আমার পেছনে। অন্য রাজ্যের খেলোয়াড়রা আমাকে নিয়েই সন্ধ্যেটা কাটালো হাসি-ঠাট্টা ও ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মধ্যে। অরুণদা ওদের বললেন, এই তোমরা কেউ মানসের পেছনে লাগবে না। আমাকে বললেন, দুঃখ করে কী লাভ। খেলায় হারজিৎ তো আছেই শীলডে ভাল খেলে জিততে চেষ্টা করবি, তবেই তো প্লেয়ার। যোহানন ও পরভীন কুমার বলল, এত ভাল টিম নিয়েও মোহনবাগান হেরে গেল। সেদিন ক্যাম্পে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল। ভাবছিলাম রিলে না শুনে প্র্যাকটিসে গেলেই ভাল করতাম। প্র্যাকটিসে না যাবার জন্য অবশ্য অরুণদার কাছে বকুনিও খেয়েছিলাম।"

বাড়ির সকলের সঙ্গে মানসও এক সময় ছিল ইস্টবেঙ্গলের দারুণ সাপোর্টার। এখন মোহনবাগান অন্ত প্রাণ। যখন এরিয়ানে ছিল সেখানেও খেলেছে প্রাণ দিয়ে। বাটার ছেলে শঙ্কর ব্যানার্জীর কাছে ও নানাভাবে কৃতজ্ঞ। কলকাতা থেকে দু-জন একসঙ্গেই ফেরে বাটানগরে। ওর প্রিয় খেলোয়াড় সুরজিৎ সেনগুপ্ত। প্রিয় বন্ধু বিদেশ বসু। বিদেশের সঙ্গেই চাকরি করত এ জি বেঙ্গলে। এখন দু-জনই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে। মানসের হবি অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়া।

আধুনিক পাওয়ার ফুটবলের পক্ষে মানসের দেহ খুব অনুকূল নয়। পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি মাথায় উঁচু। ওজন ৫৬ কিলোগ্রাম।

'এই শরীর নিয়ে তোমার অসুবিধা হয় না?'

মানস সহাস্যে জানাল, এখানে হয় না তবে কাবুলে হয়েছে। বিশেষ করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে খেলার সময়।

মুকুল

নতুন বই

উপন্যাস

মৃত্যুর নদী। সন্তোষকুমার ঘোষ। দে'জ পাবলিশিং প্রাঃ লিঃ, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩। পাঁচ টাকা

দ্বিতীয়া। রমাপদ চৌধুরী। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ-৭৩। ছয় টাকা।

ঝাঁকি দর্শন। বুদ্ধদেব গুহ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯। ছয় টাকা।

মহাকালের রথের ঘোড়া। সমরেশ বসু। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলিঃ-৯। দশ টাকা।

প্রস্থম। বিমল কর। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯। দশ টাকা।

কনভয়। সঞ্জিত দাস। ভোলানাথ প্রকাশনী, ৩৭।১৯ বেনিয়াটোলা লেন, কলিঃ-৯। দশ টাকা

অনামুখ। সঞ্জিত দাস। জ্যোতি প্রকাশন, ২এ নবীন কুণ্ডু লেন, কলিঃ-৯। আট টাকা

রোদ্দুরে সোনার রঙ। চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত। এস দাস অ্যান্ড কোং ৩৭।৬ বেনিয়াটোলা লেন, কলিঃ-৯। দশ টাকা

নরক পেরিয়ে। দীপক দত্ত। এস দাশ অ্যান্ড কোং। ৩৭।৬ বেনিয়াটোলা লেন, কলিঃ-৯। ছয় টাকা

কবিতা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩। বারো টাকা।

উত্তরে থাকো মৌন। বিষ্ণু দে। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিঃ-৯। পাঁচ টাকা।

এক বসন্ত। উষানাথ বিজলী। শৈব্যা পুস্তকালয়, ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২। চার টাকা।

(নিগ্রো) কালো কবিতা সংকলন। সম্পাঃ অচিন্ত্য সাতরা, দিলীপ মিত্র। সিগনেট বা ৭০ বসাক বাগান, কলিঃ-৪৮। তিন টাকা

প্রবন্ধ

পথের শেষ কোথায়। আবু সয়ীদ আয়ুব। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলি-৭৩।

একটি নক্ষত্র আসে (জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কিত)। অম্বুজ বসু। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩। বাইশ টাকা।

ইন্দিরা-একাদশী। বরুণ সেনগুপ্ত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯। দশ টাকা (শোভন) এবং পাঁচ টাকা (সুলভ)।

শিশু সাহিত্য

রাজা হওয়ার ঝকমারি। বিমল মিত্র। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯। ৭·০০

মজার মজার শিকারের গল্প। অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ। ভাব ও লেখা, ১০এ তেলীপাড়া রোড, কলিঃ-২৫। তিন টাকা

অনুবাদ

পাবলো নেরুদার প্রেমের কবিতা। শক্তি চট্টোপাধ্যায় অনূদিত। দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩। পাঁচ টাকা।

হো-চি মিনের কবিতা। অনুবাদ নির্মল ব্রহ্মচারী। অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির। এ-১৮-এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭। চার টাকা

বিবিধ

পর্যটকের পত্র। প্রবোধকুমার সান্যাল। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩। পনের টাকা।

শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মা কথামৃত। গণেশচন্দ্র চক্রবর্তী কথিত। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ-৭৩। দশ টাকা।

রুম্যাণি বীক্ষ্য (মরু ভারত পর্ব)। সুবোধকুমার চক্রবর্তী। এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলিঃ-৭৩ আঠার টাকা

দাক্ষিণী। তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩। বারো টাকা।

চিরঞ্জীব বনৌষধি (দ্বিতীয় খণ্ড) আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন,

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **বই**

আমাকে বলতে দাও। গৌর-কিশোর ঘোষ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কলকাতা-৯। মূল্য সাত টাকা।

ভারতবর্ষের অর্ধউলঙ্গ এবং প্রায় উপবাসী জনসাধারণকে ধন্যবাদ, গৌর-কিশোর ঘোষের বইয়ের নামটি ইতিমধ্যেই আউট অব ডেট হয়ে গেছে। কেউ এখন আর ওঁকে বলতে বাধা দেবে বলে মনে হয় না। ওঁর বদ্ধমূল বলবার অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার সপক্ষে রায় দিয়ে দিয়েছেন অক্ষর পরিচয়হীন কোটি কোটি ভারতবাসী, যাঁরা তাঁর লেখা পড়তেও জানেন না। স্ববিরোধজর্জরিত ভারতীয় গণতন্ত্রের এও এক মজা।

১৯৭০ থেকে ৭৬—এই আধ যুগের একটা মূল্যবান দলিল 'আমাকে বলতে দাও।' প্রতিবাদের সাহিত্য হিসাবে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে প্রায় বেনজীর, দুচারটি শ্লাঘনীয় ব্যতিক্রম স্মরণে রেখেই বলছি। নির্ভীক সাংবাদিকতার জন্য এই সেদিন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভ করে গৌরকিশোর এখন ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও পরিচিত হলেন। নয়ত এই বহুভাষাভাষীর দেশে কে কাকে চেনে? বিশেষত বাংলার মত নিতান্ত 'আঞ্চলিক' ভাষাই যাঁর আত্মপ্রকাশের একমাত্র মাধ্যম। তাঁর 'পিতার পত্র' গুজরাতীতে অনুবাদ করে প্রকাশ করার অপরাধে 'ভূমিপত্র' পত্রিকা ১৯৭৬-এর গোড়ায় দণ্ডিত হয়েছিল। ইদানীং সর্বভারতীয় দুচারটি ইংরিজি পত্র-পত্রিকার নির্ভীক সাংবাদিকতার যেসব খতিয়ান প্রকাশিত হচ্ছে তাতে অধমর্ণ 'ভূমিপত্রে'র নাম দেখেছি অথচ উত্তমর্ণ 'কলকাতা' পত্রিকা বা গৌরকিশোরের নাম দেখতে পাইনি। কোরিয়ার ডং আ ইলবো পত্রিকা আমাদের সেই ক্ষোভ কিছুটা দূর করেছে।

এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলির উপলক্ষ তাৎক্ষণিক হলেও যে মূল্যবোধ ও প্রত্যয়ের পুনরুক্তি করেছেন লেখক, সেগুলি চিরন্তন। সাময়িক পত্রে পড়তে পড়তে অনেক সময়েই মনে হত যে এগুলি বই আকারে সংকলিত না হলে একেবারেই হারিয়ে যাবে। অন্তত ৪০।৪৫টি প্রবন্ধিকাও যে এই বইয়ে একত্র পাচ্ছি তাতেও অনেকটা স্বস্তি পাচ্ছি। কারণ এগুলি বার বার পড়ার প্রয়োজন আছে।

লেখক প্রথম থেকেই ধরে নিয়েছেন যে সামাজিক ও ব্যক্তিক জীবনের সর্বনাশ ও ক্ষয় ঠেকাবার একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে সৎ ও আদর্শবান লেখক এবং সাংবাদিকের। গৌরকিশোর ঘোষ সংবাদ-ভাষাই লিখুন আর উপন্যাসই লিখুন তিনি একজন কমিটেড লেখক—তাঁর সর্বান্তকরণের কমিটমেন্ট গণতন্ত্রের প্রতি। তাঁর রচনায় একটা কিশোরসুলভ সরল উদ্দীপনা আছে—সিনিসিজম যার থেকে শত হস্ত দূরে থাকে। বাঙালী বুদ্ধিজীবী যিনি যত বুদ্ধিমান তিনি তত সিনিক—তিনি তত নিশ্চিত জানেন যে এদেশের কিছুতেই কিছু হবার নয়। প্রতি তুলনায় মানুষের ভবিষ্যৎ, এমন কি বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও, নিতান্ত অনভিজ্ঞ তরুণের মতনই আস্থাশীল এই প্রবীণ পোড়খাওয়া লেখকটি। সেই জন্যেই আমাদের পতন স্খলন নিয়ে তাঁর এত উষ্মা, ভুল ধরিয়ে সৎপথে ফিরিয়ে আনতে তিনি এমন বদ্ধকটি। তাঁর ধারালো বিদ্রূপ, তীব্র ধিক্কার এবং কচিৎ অসহায় হাহাকারের উৎস একই : বিপন্ন আত্মসম্মান, মনুষ্যত্বের সার্বিক অবক্ষয়।

মোটামুটি রকমের সুস্থ সভ্য একটা সমাজে শিরদাঁড়া সোজা করে বাঁচবার

Maintenance of Internal Security
to reconsider on the 9th ...
of Shri Gour Kishore Ghosh,
Flat-4, Block 'C', ...
cutta-2
of whom a declaration bearing ...
6.10.75 was made under ...
Maintenance of Internal Security
Calcutta continues to be
ation, to decide that the detention
Ghosh should continue ...
th the emergency.

অধিকার যখন যেদিক থেকেই বিপন্ন হয়েছে তখনই গৌরকিশোর সেইদিকে ছুটেছেন, উদ্যতযষ্টি। তাঁর কলমই তখন তাঁর যষ্টি। হিংসাশ্রয়ী রাজনীতি, পুলিসের প্রতিহিংসাকামী চণ্ডনীতি, নির্বাচন নিয়ে ধাপ্পাবাজী, রাজ্যসরকারের দুর্নীতি, কেন্দ্রীয় সরকারের গণতন্ত্রবিরোধী কার্যকলাপ—কাউকেই তিনি রেহাই দেননি। তাছাড়া যেসব প্রসঙ্গ প্রায়ই ভদ্রজনেরা ভীমরুলের চাকের মতন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন, সেখানেও আগ বাড়িয়ে গা পেতে হুল খাওয়া গৌরকিশোরের স্বভাব। নয়ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিপ্লবী' ছাত্রদের এমনতর কুমন্ত্রণা দেওয়া কেন যে তারা আওয়াজ তুলুক, "আমাদের ক্যান্টিনে গোমাংস দিতে হবে, শূকর মাংস দিতে হবে?" অথবা 'সত্যিই কি ষড়যন্ত্র'—ধরনের লেখা পড়ে কোন্ আত্মসম্মানসম্পন্ন বাঙালীরই না গা জ্বলে যাবে? "ভারতের সর্বত্র বাঙালী-দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠেছে"—এ তো চক্ষুষ্মানের কাছে দিবালোকের মত স্বতোপ্রমাণিত! অথচ এই প্রসঙ্গেই এত বড় কটু মন্তব্য করা যে "মানুষ যখন নিজের উপর বিশ্বাস হারায়, তখন হয় সে তার চারধারে ষড়যন্ত্র দেখে, নয় দেখে অদৃষ্টের অভিশাপ"—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া ছাড়া আর কি? কিন্তু এটাই এই ভদ্রলোকের স্বভাব, গায়ে পড়ে গা-জ্বালানো 'হিতকথা' শোনানো।

অন্যায় করা এবং সহ্য উভয়ের

প্রতিই তিনি সমান নিষ্ঠুর। 'আত্মগোপনকারী' নকশাল ঘাতক মহাশয়'-এর মুখের উপর ছুঁড়ি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'হেলপলেস' অধ্যাপক কিংবা স্ত্রীর সম্মান-রক্ষায় অক্ষম 'পুরুষদের' ছেড়ে কথা কননি। তবে আধমরাদের ঘা দিয়ে বাঁচানো যে বড় সহজ কাজ নয় তার অন্তত একটি প্রমাণ এই যে এই বইয়েরই প্রথম চল্লিশটি প্রবন্ধ পশ্চিম বাংলার সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক ও দৈনিকে পাঁচ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকা সত্ত্বেও জরুরী অবস্থা ঘোষিত হতেই পরবর্তী দুটি প্রবন্ধ—'ইন্দিরা দেশ গণতন্ত্র' এবং 'পিতার পথ'—প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছিল একমাত্র ঐ মুষ্টিমেয়-পাঠ কলকাতা পত্রিকাই। জরুরী অবস্থা প্রবর্তনের অব্যবহিত পরবর্তী সংখ্যায় 'দেশ' দু-তিন পাতা আক্ষরিক অর্থে কাঁচিকাটা হয়ে আমাদের হাতে এসেছিল বলে মনে পড়ছে। ছাঁটাই হওয়া রচনার মধ্যে যতদূর জানি একটি ছিল 'ইন্দিরা দেশ গণতন্ত্র।' অন্যটি কি ছিল সেই সপ্তাহের সম্পাদকীয়? যাই হোক গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্রের সম্মুখ সমরে এগিয়ে যাবার জন্য সৈনিকের দলে খুব বেশি সংখ্যক বাঙালীকে ঠেলে দাঁড় করাতে পারেন নি। এই লেখকও, তাঁর কলম দিয়ে নিরন্তর খুঁচিয়েও। নিভৃতে যাঁরা তাঁকে বাহবা দিয়েছেন, প্রকাশ্যে তাঁরাই অনেকে তাঁকে সর্পবিবরে প্লেগবৎ পরিহার করেছেন।

অতএব এ জাতীয় লেখার সার্থকতা কোথায়? এ তো বিশুদ্ধ সাহিত্য নয়, এ ফলিত সাহিত্য। পড়া শেষ হয়ে গেল, আর 'বাঃ বেশ হয়েছে, চমৎকার তেজী লেখা' বলে বইখানি মুড়ে রেখে দিয়ে পাশ ফিরে শুলাম—এতেই যদি এই রচনার সম্প্রতি হয় তবে তো এগুলি লেখার দরকারই ছিল না। এই সাহিত্য বিশুদ্ধ উপভোগের জিনিস নয়। জীবনবোধকে সামান্য একটু বদলে দেবার পাঠককে আরও একটু চনমনে ও সক্রিয় করে তুলবার একটা দুরাকাঙ্ক্ষা নেই কি এই রচনায়? অথচ গৌরকিশোরের লেখার এই নিরাবরণ নৈতিক উদ্দেশ্যটাই কি ব্যর্থ হয়ে যেতে দেখলাম না, দুবছর আগে যখন বেশ বড় রকমের একটা চোট এসেছিল স্বাধীন দেশের নাগরিকদের আত্মসম্মানেই শুধু নয় অস্তিত্বের উপরেও? কজন উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তখন কিছু করতে? এত সব ওজস্বিনী বক্তৃতায় তবে লাভ হল কি?

কিছুই না? হয়ত ততদূর হতাশ হওয়া ঠিক হবে না। আমরা বেশির ভাগ মানুষই বীরের ভূমিকা নেবার জন্য জন্মাই না। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে কেন, কালো অক্ষরেও আমাদের ঠাঁই হবে না। তবু আমাদের 'জীবন-যাত্রা'য় বিবেকের পার্টে এমন দু-চারজনের থাকা ভীষণ দরকার। নইলে 'যাত্রাটা' আদ্যো-পান্ত দুঃসহনীয় ভাবে ডিপ্রেসিং হয়ে পড়ে। নীরেন্দ্র আর চাটুজ্যেদের অবদানেও এমন কয়েকটি প্রতিবাদের কণ্ঠ একেবারে বোধ হয় নিশ্চিহ্ন হারিয়ে যায় না। তাছাড়া আমাদের দেশটা কত বড়, আবহাওয়াটা কী জটিল ও বিচিত্র। এরই মধ্যে কিছু সত্য ভাবনা হোক না তা স্থির, তাতেও একটা স্পন্দন হয় হাওয়ায়, মুখে মুখে মনে মনে তা ছড়িয়ে পড়ে, এমন কি নিরক্ষর মানুষকেও তা স্পর্শ করে কোনো এক রকমে।

অন্তত আমার তো ভাবতে ইচ্ছা করে যে এই রচনাগুলির ব্যবহারিক ফল-শ্রুতিও নিতান্ত শূন্য নয়। এবং গৌরকিশোর ঘোষও আর একজন ডন কুইকসোট নন—এই নামের বিশুদ্ধ উচ্চারণটি আমার অভ্যস্ত হয়নি। তিনি কতগুলি হাওয়াচাকী নয়, সত্যকারের দুর্গই আক্রমণ করেছেন বার বার। সেসব দুর্গ অধিকার করে রয়েছে প্রবল প্রতাপান্বিত 'রাজনৈতিক অতএব পবিত্র হিংসা', নিরাপত্তা সন্ধানী , ভয়, নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা-সমর্থিত অত্যাচার, নানা চেহারার লোভ—এবং আরও কত কী।

গৌরী আইয়ুব

আলোচনা শিল্প সংস্কৃতি চিত্রকলা

পুরনো ছবি

প্রথমেই বলে রাখা ভাল খুঁজে পাওয়া এই ছবিগুলি শিল্পীরা প্রদর্শনীর জন্যে আঁকেননি। এর মধ্যে অবশ্য কয়েকজন নামকরা শিল্পী আছেন। কতগুলো ছবি নামগোত্রহীন—অজ্ঞাত শিল্পীর আঁকা। প্রদর্শনী চলেছে ৮-১৪ অগাস্ট পর্যন্ত আকাদমী অব ফাইন আর্টসে। সম্প্রতি এই ছবি-গুলো খুঁজে পেয়েছেন শ্রীমতী রানু মুখোপাধ্যায়। দেখলেই বোঝা যায় শিল্পীদের অল্পবয়সে আঁকা ছবি। যেমন শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের এগারোখানা সাদা কালোয় আঁকা ব্যঙ্গ-চিত্র দেখলেই মনে হয় গগনেন্দ্রনাথের অক্ষম নকল।

মনীষী দে-র স্নানরতা দুটি মেয়ের পেন্সিল স্কেচে বেশ মুন্সীয়ানা আছে। তাঁর সাদা [illegible] আঁকা 'ফলওয়ালী'-তে অংক[illegible]তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে তাঁর একটি এচিং—'পুটো কুঁড়েঘর'। খুব সংবেদনশীল কাজ।

নলিনী বলে পর্দানহীন কোনো সেকালের আর্টিস্টের আঁকা একটি জল-রঙের ছবির মধ্যে গ্রামবাংলার পরিবেশ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

আরেকটি ছবি—অজ্ঞাতনামা শিল্পীর আঁকা—বিমূর্ততার ধার ঘেঁষে গেছে। কমলা, ফিকে, সবুজ এবং কালো রঙের রূপ-গন্ধ ভাঙ্গার চেষ্টা গগনেন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই কাজটি সত্যিই ভাল।

বাসুদেব রায়ের একটি ছোট্ট এচিং আমার ভাল লেগেছে। ইনি এককালে জলরঙে বেশ নাম করেছিলেন।

'জেলেদের জাল' একটি রঙীন কাঠ খোদাই যেটার ভেতর লাল হলুদ এবং কালোর সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। এ ছবির শিল্পীও অজ্ঞাতনামা। প্রভাত নিয়োগীর একটি ছোট্ট জলরঙের স্কেচ-চিত্র 'বৃদ্ধা'-র মধ্যে বয়সের অসহায়তা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করেছেন। প্রভাত-বাবু জীবনের বেশির ভাগ সময় গোয়ালিয়রে কাটিয়ে দিয়েছেন। [illegible]

পরিচিত) চারখানা ছবি আছে জল-রঙের। এঁর যে ধরনের ছবি দেখতে অভ্যস্ত এ যেন তার থেকে আলাদা। দেখে মনে হয় উনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন—প্রথাগত চিত্র-রচনার ধারা ভংগ ক'রে ভিন্নখাতে গেছেন। সেইজন্যে তাঁর দু-একটি ছবি কিঞ্চিত দুর্বল হলেও, ভাল লাগে তাঁর দুঃসাহস।

গোপাল ঘোষের চীনেকালিতে ধানের পেছনে আঁকা 'পাখি' খুবই জীবন্ত—তার নিজস্ব বাসায় ডিমের পরিচর্যায় ব্যস্ত এবং আক্রান্ত হবার ব্যাপারে সতর্ক।

নন্দলালের কয়েকটি এচিং এবং সাদা কালো কাজ আছে। অনেক আগেকার কাজ হ'লেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ প্রতিটি ছবিতে বর্তমান।

এগুলি শিল্পীদের প্রতিনিধি স্থানীয় কাজ নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এতে আছে তাদের বেড়ে ওঠার বিভিন্ন ধাঁচের ছাপ যেটা কৌতূহলোদ্দীপক এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিস্ময়কর 'বেংগল স্কুলের' কাজের মিষ্টি মিষ্টি ভাব, অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং একঘেয়েমী শিল্পীদের গোড়ার কাজেই সুপ্রকাশিত।

রথীন মৈত্র

শুধু ভংগী দিয়ে

দেব মহলানবীশের কাজ ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হয়নি। ডেকর সার্ভিসে তাঁর প্রদর্শনী দেখলাম (২৮শে জুলাই—২রা অগাস্ট)। বয়স? তা এই বছর তেইশ হবে। ষোল বছর বয়স থেকে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত কলকাতার একটি নামী কিশোর পত্রিকায় তিনি সচিত্রকরণ করতে শুরু করেন। লা মার্টিনিয়ার থেকে হিউম্যানিটিস নিয়ে পাশ ক'রে তিনি পরে সেই পত্রিকায় সচিত্রকরণকারীর চাকরি নেন। কাগজের আফিসে চাকরি করতে করতে তিনি প্রযুক্তি শিল্পকলা, পত্রিকার অঙ্গসজ্জা, অক্ষরকলা এবং ছাপ-ছবির বিষয় কাজ হাতে তুলিতে শিখে নেন। সম্প্রতি তিনি বৃত্তি পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মেমফিস, টেনেসিতে শিল্পকলা শিখতে যাচ্ছেন। কী ধরনের বৃত্তি জানি না। কিন্তু এসব কিভাবে পাওয়া যায়? পশ্চিম বংলার পাশ করা নামী শিল্পীদের পক্ষে এগুলো জোগাড় করা সম্ভব হয় না। অবশ্য দেববাবু পড়াশুনা ক'রে হয়তো মার্কিন মুলুকে থেকে যাবেন। তাতে কি মার্কিন দেশের শিল্পকলা লাভবান হবে? মনে হয় না। ভারত-বর্ষের শিল্পকলার ক্ষতি হবে? মনে হয় না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!!

বস্তুত এই প্রদর্শনীতে যাঁদের দেখলাম, তাঁরা সবাই ঢোল্লা পাতলুন পরা, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ইংরাজীতে দড়ো। ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ বর্ষীয় তরুণ তরুণী। মুখে সিগারেট। তাঁদের ব্যবহারে শ্রেণী চরিত্রটি পরিস্কার। দেববাবু এঁদের পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ ক'রে ধন্য হয়েছেন। এঁরাই তাঁর সমজদার। এঁদেরই তিনি শিল্পী।

এবার আসা যাক ছবি প্রসঙ্গে। ভারতীয় পরিভাষায়। বিশেষত তাঁর রেখা-চিত্র জাতীয় কাজে এক ধরনের বাজারে মুনশীয়ানা আছে। ছবিই হোক আর পোস্টারই হোক—এ-সবে বিজ্ঞাপনী শিল্পের কায়দাকানুন প্রয়োগ করেছেন। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে পপ আর্টের বিস্ফোরণের একটা উপযোগিতা আছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক তন্দ্রাজড়িত পরি-বেশে এসব আমদানী করার চেষ্টা অপ্রাসংগিক। এ অনেকটা ইদি আমিন এবং তাঁর স্যাঙ্গোপাঙ্গদের ইউরোপ থেকে চার্টার্ড প্লাইটে কসমেটিক সওদা করার মতো। ধরুন সেই ছবিটা—ডবল

বেস, সেক্সোফোন ইত্যাদি বাজনাদারদের নিয়ে একজন বিলিতী কায়দায় বাদ্য-বৃন্দ পরিচালনা করছেন। কিংবা গোলাকার ফ্রেমের মধ্যে অত্যাধুনিক প্রজাপতির পাখনা-আঁটা যুবক। কিংবা খিলানের তলা দিয়ে পেঁচালো সিঁড়ি, একপাশে চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া পোড়োবাড়ি, আর পাশ থেকে আঁকা যুবক। একটি দেবীপ্রতিমা সদৃশ মুখ, নীচের দিকটা পেঁচার মতো।

ছবিগুলো দেখলেই মনে হয় এ ভিন দেশী ফুলের অাদরযত্নের যোগ্য নয়, আবার স্বদেশের মাটির তলায় প্রোথিত নয় এর মূল। ইঙ্গোবঙ্গো সমাজের 'বাবুলোগকে লিয়ে' এই শিল্প। সুতরাং অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সন্দীপ সরকার

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নৃত্য**

দেবযানী চলিহার মণিপুরী নাচ

সম্প্রতি রবীন্দ্রসদন মঞ্চে দেবযানী চলিহা পরিবেশন করলেন অসাধারণ দুটি মণিপুরী নাচ। প্রথমে মানভিক্ষা অংশে জয়দেবের গীতগোবিন্দ অবলম্বনে বসন্ত রাসের মাধ্যমে তিনি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুললেন শ্রীরাধার খণ্ডিতা ও শ্রীকৃষ্ণের বিরহের ভাবরূপকল্প। শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপিনীদের প্রতি অভিনিবিষ্ট হওয়ায় শ্রীরাধা সাময়িকভাবে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। বিরহ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার কাছে নিয়ে আসে। মানভিক্ষা পর্বে তিনি শ্রীরাধার মন জয় করেন। চির নতুন এই বৈষ্ণব কাহিনীর মণিপুরী নৃত্য সংস্করণে—শ্রীমতী চলিহা রাধা-কৃষ্ণের মিলনের আধ্যাত্মিক রসটিকে দেন সুস্নিগ্ধ শিল্পরূপ। মণিপুরী নাচের প্রখ্যাত শিল্পী ও গুরু বৈমনব আমুবি সিং-এর তিনি সুযোগ্য ছাত্রী।

মানীতিকা পর্বের দশ মাত্রার ঝাঁপতালে মঞ্চে তিনি উজাড় করে ঢেলে দেন লাবণ্য। এই নাচ সব দিক থেকেই লিরিকধর্মী। মুদ্রা বা অভিব্যক্তি এখানে গৌণ। একটি বিশেষ ধর্মীয় ভাবপরিমণ্ডল সৃষ্টিই বৈষ্ণব ধর্ম অনুপ্রাণিত এই নৃত্যকলার বৈশিষ্ট্য। দৈনন্দিন কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে এই নাচ। মণ্ডল নৃত্য বা বৃত্তায়িত নৃত্যে মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনের রূপকল্প সৃষ্টিই মূল লক্ষ। দেববানী চলিহা এই মূল লক্ষে উত্তীর্ণ হয়েছেন স্বচ্ছন্দে।

শোনা যায়, অষ্টাদশ শতকে মণিপুরে এই বৈষ্ণব ধর্ম বিভাবিত নৃত্যকলার প্রচার। এর সহযোগী কীর্তনাঙ্গ গান ও রাসলীলার অনবদ্য নাচ আজ মণিপুরের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু ঐতিহ্যানুগ সুপ্রাচীন মণিপুরী নাচেরও সেদিন একটি সুষ্ঠু পরিচয় রাখেন দেববানী চলিহা। নাচের দ্বিতীয়াংশে তিনি চিত্রবাহন ও চিত্রাঙ্গদাকে নিয়ে একটি 'নৃত্যনাট্য' পরিবেশন করেন যা পরিবেশননৈপুণ্যে হয়ে উঠেছিল হৃদয়-গ্রাহী। মানীতিকার একটি ছাড়া বসন্ত রাসের সব গানগুলিই জয়দেবের রচনা। মাঝখানে সূত্রধারী একবার মঞ্চে এসে সাঙ্গীতিক ভাষায় কাহিনী বর্ণনা করেন। তুলনায় চিত্রবাহন, চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের কাহিনী অনেক বেশি নাটকীয়। গন্ধর্বরাজ চিত্রবাহন তাঁর মেয়ে চিত্রাঙ্গদাকে সর্বশিল্পবিশারদ করে তোলেন। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা নাচের একটি তাল ভুল করায় পিতা তাঁকে অভিশাপ দেন। এই অভিশাপ চিত্রাঙ্গদাকে সর্পে পরিণত করবে। কিন্তু পরে পিতৃহৃদয় কন্যার প্রতি অভিশাপে কাতর হয়ে পড়ে। অভিশাপ তো আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। চিত্রবাহন তাই কন্যার উদ্ধারের উপায় নির্দেশ করেন। এক ক্ষত্রীয় বীর চিত্রাঙ্গদাকে স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবে। শেষ পর্যন্ত চিত্রাঙ্গদাকে উদ্ধার করেন অর্জুন। এখানে চিত্রবাহন ও অর্জুন হয়েছেন যথাক্রমে গুরু টি নদীয়া সিং ও চৌরজিৎ সিং। স্বভূমিকায় এঁদের তুলনা নেই। চৌরজিৎ সিং বয়সে তরুণ। কিন্তু এই বয়সেই তিনি একজন পরিণত শিল্পী হয়ে উঠেছেন। ঢোলক চোলমে তাঁর কাজ অনবদ্য। পুং চোলমে গুরু টি নদীয়া সিং-এর অনায়াস দখল আমাদের যথার্থই বিস্মিত করেছে। সরোজিনী দেবীর গানও আমরা অনেক দিন মনে রাখব। মঞ্চের পিছনে ঝাপসা আলো-আঁধারের মধ্যে বসে থেকে তিনি তাঁর মৃদু অথচ প্রভাববিস্তারী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সেখানে ছিলেন সারিবদ্ধ আরও দু'তিনজন বাদকবৃন্দ। নৃত্যের ভাবকল্প ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে এই গায়নপদ্ধতি ও বাদ্যমূর্ছনা। ছবির যেমন ফ্রেম সেরকম নৃত্যকে এরা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে নিজের পায়ে। সব মিলে দেববানী চলিহার প্রোডাকশন এবং টিমওয়ার্ক'ও ছিল নিখুঁত ও নির্ভুল। দেখেশুনে সাবলিমিটির অনিবার্য এক বোধ মনে বাসা বাঁধে। শ্যামল ও রৌদ্রময় পরি-প্লাবিত জগতে শান্ত রসও যে সুদূর, গভীর অনুরণন সৃষ্টি করতে পারে [illegible]

প্রমাণ করলেন। দুঃখের কথা, মণিপুরী নাচের প্রোডাকশন খরচ খুব বেশি। শ্রীমতী চলিহা বিবাহসূত্রে কলকাতার বাসিন্দা হলেও তাঁর সহশিল্পীরা এসেছিলেন সুদূর মণিপুর থেকে। তাই চাইলেও হঠাৎ যে কোন দিন আমরা এই নাচ আবার দেখতে পাব না।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

হবো ইতিহাস

আমায় ক্ষমা করবেন, দুই ঘণ্টার জন্য আমি সমাজ বিরোধীদের সঙ্গে কাটিয়ে এলাম। কিন্তু আমি বিভ্রান্ত, কে সমাজ বিরোধী? যে শুধুমাত্র পেটের জন্য চোলাই মদ বানায়, না অলীক আশ্বাস দিয়ে যে সমাজবিধাতা তাঁদের অনিবার্য সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেয়? বড় কঠিন সেই জীবিকা, চারদিকে প্রতি মুহূর্তের প্রহরার মাঝখানে দিনযাপনের গ্লানি বেড়েই চলে। এই লজ্জা, স্বাধীন দেশে এটাই পরিহাস, মানুষের ক্ষুধাই আর এক শ্রেণীর মানুষের ব্যবসা।

চতুরঙ্গ নিবেদিত 'হবো ইতিহাস' এই সব জালে আটকে পড়া মানুষের কথা। চতুরঙ্গের এই নাটকে একই কথা (যদিও চিরন্তন সত্য) বলা হয়েছে, শুধু পটভূমি বদলে গেছে। চাষী বা শ্রমিকের জায়গা নিয়েছে বেআইনী চোলাই কারিগর, আর জমিদার বা জোতদারের জায়গা নিয়েছে সেই চতুর মৃত্যু ব্যবসায়ী যে শুধু আশ্বাসের জাল বিছিয়ে সন্তর্পণে জাল গুটিয়ে আনে। আটকে পড়া বোবা বেদনায় মানুষগুলো শুধু ছটফট করে, বিদ্রোহ করলে সে সমাজবিরোধী হিসেবে জেলে স্থান পায়। এটাই হয়ে থাকে, বহু ব্যবহৃত হলেও এটাই সত্য।

'সুদেব' নামের আড়ালে যেই থাকুন না কেন, তিনি নাটক বাঁধতে জানেন অভিজ্ঞ নাট্যকারের মত। সবচেয়ে বড় কথা হল উদ্দেশ্য থেকে তিনি বিচ্যুত হন না। পরিচালক সুজন সেনগুপ্তের সজাগ দৃষ্টিতে কখনই হাস্যরস প্রশ্রয় পেয়ে বিষয় গাম্ভীর্যকে হারাতে দেয় না। সেই সব মানুষ মুখ্য হয়ে ওঠে যাদের "বেঁচে থাকাটাই বড় কষ্টের ব্যাপার।" আগেই বলেছি, পটভূমি [illegible]

রকম তাই কখন কি ঘটবে, অর্থাৎ সাসপেন্স থ্রিলার থিয়েটারি কায়দায় যা যা ঘটতে পারে, তাই আর একবার ঘটে গেল। প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়া জনতার সঙ্গে দর্শক একাত্ম হলেও, শেষে লাল লাইট ও জাগো জাগো' চিৎকারের সঙ্গে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের কথা জানানো হল। এবং ঘটনাক্রমে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত, জীবনধারণে ব্যতিব্যস্ত মানুষদের নিয়ে লেখা নাটকের নাম দেওয়া হলো 'হবো ইতিহাস'—এই নামকরণ সূত্রে কবি সুকান্তের আত্মীয়তার ইন্‌টেলেকচুয়াল বিপ্লবের সুযোগ নেওয়া গেল।

নির্দেশক সুজন সেনগুপ্ত সব সময় সামগ্রিক অভিনয়কে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করেছেন। এর আগে অভ্যুদয়ের অভিনয়ে যে অতি অভিনয়ের ঝোঁক ছিল, সেটি অনেকাংশেই বর্জিত। বিশেষভাবে লক্ষণীয় তাঁরা নাটকের প্রতি অনুগত থেকেছেন, কোন রকম কসরত নিয়ে আসর জমানোর চেষ্টায় মূলশক্তিকে ডুবিয়ে যাননি। শিল্পী-গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তত তিনজন দক্ষ অভিনেতা, মিহির চট্টোপাধ্যায়, সুজন সেনগুপ্ত ও অরুণ সেনগুপ্ত। এই দলের অনেক অভিনেতাই নিজেদের ত্রুটি ঢাকা দেন স্বাভাবিক অভিনয়ের দোহাই দিয়ে। আসলে অভিনেতার সব গুণ থাকলেই তবে স্বর কিংবা মুভমেন্ট নিয়ন্ত্রণ করা যায়, আর শুধু কথা বলে গেলেই স্বাভাবিক অভিনয় হয় না। 'হবো ইতিহাস' নাটকে শিল্পীরা অনেক ক্ষেত্রেই সংযত হয়ে দুর্লভ মুহূর্ত সৃষ্টি করেন, আবার অনেক জায়গায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। একটি মাতালের মাস্তানির দৃশ্য আছে। এই দৃশ্যে মাতলামি খুব স্বাভাবিক, কিন্তু স্টেজের মাতালদের শুধু স্বাভাবিক জড়ানো উচ্চারণে কথা বললেই হয় না, দর্শকদের শোনাতে হয় ও বোঝাতে হয়। নাটকের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশ দর্শকদের কাছে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। অভিনয় না জেনে স্বাভাবিক হওয়ার এই বিপত্তি। মিহির চট্টোপাধ্যায় নায়কের যন্ত্রণা, বিক্ষোভ সব কিছুতেই সংযত স্ফুলিঙ্গ। অরুণ সেনগুপ্তের ভূমিকায় ফাঁদেপড়া মানুষের বেদনা মূর্ত এবং সুজন সেনগুপ্তের ভিলেন কখনই প্রথাগত নয়। কিন্তু মাঝে মাঝেই এঁরাও ঠিক করতে পারেন না, কোন অভিনয় রীতি গ্রাহ্য? এই দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার জন্য নাটক জমে উঠতে দেরি হয়। একটি অসাধারণ চরিত্র বন্দের ভূমিকায় সবিতা রাহা কিছুতেই একাত্ম হতে পারেন না, অথচ অভিনেত্রী হিসেবে সবিতা রাহা অনেক দুঃসাধ্য সাধন করেছেন। শাশ্বতী চৌধুরীর অভিনয় পুরোপুরি স্বচ্ছন্দ নয়। এই দলের দ্বিধাগ্রস্ত ভাব দূরে গেলে, সম্পূর্ণ চরিত্রগুলি অবিশ্বাসীন বলে 'হবো ইতিহাস' অভিনয় সম্পদে সমৃদ্ধ একটি প্রযোজনা হবে। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেন, সলিল সেন, মানিক দত্ত, অর্ধেন্দু সেনগুপ্ত, রণজিৎ দাস। এই নাটকে একটি চরিত্র আছে—মুকুল। মুকুলের ভূমিকায় দিলীপ পালিত প্রথম থেকে ন্যাঁ ন্যাঁ করে কথা বলে হাবাগোবার ভাব করেন, দর্শক প্রচুর হাসেন, তিনি আরও অঙ্গভঙ্গি করেন। তারপর বেরিয়ে পড়ে। পরিষ্কার উচ্চারণে উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'পদ্মদীদা—কালুদা খুন হয়ে গেছে'। বোঝা গেল, হাবাগোবা চরিত্র শুধু দর্শকদের হাসানোর জন্য ভাঁড়ামির নামান্তর, থিয়েটারের একটি পুরোনো চাল। এই নাটক অন্ধকারের নাটক, সীতানাথ ব্যানার্জির আলো, এই রহস্যময়তাকে ঘনীভূত করেছে। আসন্ন সন্তানের মঙ্গল কামনায় বাড়িতে পুজো হয়, পরে সেই দৃশ্যেই চরম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে। এই দৃশ্যে প্রথম থেকে মন্ত্র উচ্চারণ, উলুধ্বনি শাঁখ ক্রমশ অন্য রূপ নেয় শঙ্খধারক হিমাদ্রি ভট্টাচার্যের অসামান্য কৃতিত্বে, শঙ্খধ্বনি কোন সময় প্রলয় বিষাণ এবং উলুধ্বনি একটানা কান্নায় রূপান্তরিত। আবারও বলি, নির্দেশক সুজন সেনগুপ্ত অনেক বিরল নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন, যা সামগ্রিক অভিনয় আরো জমে উঠলে একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হিসাবে স্বীকৃত হবে।

স্মারক মিত্র

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে

গ্রামীণ পটভূমিকায় যেমন পদাতিক শহর কলকাতার পটভূমিতে তেমনি সায়ন্তনী প্রযোজিত 'মুখোমুখি দাঁড়িয়ে'। এখানেও সেই ছকের ক্রমানুবৃত্তি—সেই ব্যবসাদার (অবশ্যই মাড়োয়ারী) সেই পুলিস, সেই মুনাফাবাজ আর মনুষ্যত্বের অনেক টালবাহানার পর শেষে অবশ্যম্ভাবী 'ফ্রিজ'। রতনকুমার ঘোষ অভিজ্ঞ নাট্যকার অভ্যস্ত ফরমুলাকেও অন্যতর রূপে তুলতে পারেন, যাতে নিছক ডকুমেনটেশনও মাঝে মাঝে চমক সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রয়োগপদ্ধতি বা অভিনয়ে গতানুগতিকতা প্রশ্রয় পেলে কোনও বিশেষত্বই চোখে পড়ে না। রতনবাবুকে ধন্যবাদ, তিনি ঢোল, কাঁসি বাজিয়ে পাঁচালি পড়ার মত গান গাইতে কোন সূত্রধারের অবতারণা না ঘটিয়ে একজন ম্যাজিসিয়ানকে দিয়ে সুদীর্ঘ কাহিনী-মালাকে সংক্ষিপ্ত এবং অর্থবহ করেছেন। কিন্তু অভিনেতা সুশান্ত বর চড়া সুরে অভিনয় করে প্রথম থেকেই অতিনাটকীয়তাকে প্রশ্রয় দেন। প্রথাসিদ্ধ অভিনয়ে সুবিমল রায়, কল্যাণ বোস, কিশলয় সেন—সকলেই বেশ দক্ষ, কিন্তু আধুনিক নাটকে পুরাতন অভিনয় রীতি দর্শককে দূরে সরিয়ে রাখে। ব্যতিক্রম সুভাষ চট্টোপাধ্যায়। আদ্যোপান্ত নাটকটিকে তিনিই ধরে রাখেন তাঁর স্বাভাবিক অভিনয়ে। কয়েকটি ছোট ভূমিকায় অঞ্জন দেব অথবা মন্ত্রীর ভূমিকায় জয়ন্ত ভট্টাচার্য সহজেই নজর কাড়েন তাঁদের স্বাভাবিক চরিত্র-চিত্রণে। মহিলা চরিত্রটি নিষ্প্রয়োজন একমাত্র ভিলেনকে মোটা দাগে চিহ্নিত করানো ছাড়া। নায়ক চরিত্রে প্রতাপাদিত্য চট্টোপাধ্যায় নিষ্প্রাণ, তাঁর মেক-আপটাও চোখে লাগে। নির্দেশক মিহির চট্টোপাধ্যায় অনেক স্থায়ী নাট্য-মুহূর্ত পরিকল্পনা করেছেন, যার অনেকাংশই 'ফ্রিজ' ওন হোম মঞ্চে মার খেয়ে গেছে। প্রদীপ চক্রবর্তীর

রেকর্ডার-এর অসহযোগিতায়। রতনকুমার ঘোষের 'মুখোমুখি দাঁড়িয়ে' প্রচলিত রীতির নাটক হয়েও সার্থক হতে পারত যদি প্রযোজনায় সর্বতোভাবে শৃঙ্খলা বজায় রেখে সামগ্রিক প্রযোজনাকে একটি সুরে বাঁধা যেত—কিন্তু এলোমেলো চিন্তার কিছুই দানা বাঁধল না—এটাই দুঃখের।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

আলোচনা শিল্প সংস্কৃতি **বিবিধ**

আবৃত্তির আসর, রবীন্দ্র সদনে

গত ২২ জুলাই রবীন্দ্রসদনে সুরসপ্তক-নিবেদিত রবীন্দ্র-উৎসবের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে রবীন্দ্ররচনা থেকে পাঠ ও আবৃত্তির আসর আয়োজিত হয়েছিল। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়—এই তিনজন প্রধান কবিও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন রবীন্দ্র-কবিতা আবৃত্তির জন্যে। শ্রোতৃমণ্ডলীর এক গরিষ্ঠ অংশ তাঁদের কণ্ঠে স্বরচিত কবিতা শুনতেই যে বেশী আগ্রহী তার প্রমাণ সেদিন ফুটে উঠল তাঁদের প্রচণ্ড সোচ্চার দাবিতে। কবিরা অবশ্য বিনীতভাবে সেই দাবি পালন করায় অক্ষমতা জানালেন। বিশেষত, নীরেন্দ্রনাথ দারুণ সুন্দরভাবে জয় করলেন শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়। তিনি অবশ্য রবীন্দ্র কবিতাও পড়লেন নিজস্ব অনন্য একটি ভঙ্গিতে। গলায় উঠানো-নামানো- কাঁপানো- বাঁকানো না দেখিয়েও কবিতার অন্তর্নিহিত ছবি-সুর-ছন্দকে শ্রোতার মনে চমৎকারভাবে গেঁথে দিলেন তিনি। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ভঙ্গিকার 'একপারে' এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের চিত্রার 'সাধনা'ও প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম। আবৃত্তি নয়, পাঠ। কিন্তু অর্থকে সঞ্চারিত করতে ব্যর্থ হয়নি।

কিন্তু আবৃত্তির প্রচলিত রীতিটি কি? এই আসরের বেশীর ভাগ আবৃত্তিকার যেভাবে শোনালেন রবীন্দ্র-কবিতা তা ভয়াবহ রকমের হতাশাব্যঞ্জক। সন্দেহ জাগে, আবৃত্তিকারের যথার্থ দায়িত্ব সম্পর্কে ওঁরা আদৌ সচেতন কিনা। কবিতার ছন্দ স্খলিত করে, স্বাভাবিক বাকস্পন্দকে বিঘ্নিত করে, অর্থের সামঞ্জস্য ও যতিচিহ্ন বিস্মৃত হয়ে বেশীর ভাগ আবৃত্তিকার দেখাতে চাইলেন তাঁদের গলা কীরকম খেলে। শঙ্খ ঘোষ একবার দুঃখ করে লিখেছিলেন যে, "তাঁরা (আবৃত্তিকারেরা) যে বিশেষ করেই শ্রোতার মনে পৌঁছে দিতে চাইছেন শব্দের মহিমা, এই ইচ্ছেটা এতই স্বপ্রকাশ হয়ে ওঠে যে কবিতাটি শেষ অবধি পৌঁছয় না হয়তো, শ্রোতার কাছে পৌঁছয় কেবল আবৃত্তিকারের একটা সাটুকে আবেগ।" কথাটা যে কত দূর সত্যি আবৃত্তির এই বড়ো-মাপের আসরে তার প্রমাণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাওয়া গেল।

ব্যতিক্রম নিশ্চিত ছিল। যেমন শম্ভু মিত্র। যদিও ঠিক আবৃত্তি বলতে যা বোঝায় তা নয়, কিন্তু শব্দের মহিমা একটুকুও ক্ষুণ্ণ না করে তিনি অনায়াসে আবৃত্তিকে উন্নীত করেন এক স্বমহিম শিল্পে। তিনি যে কবিতার অর্থকে সঠিক চালে ধরতে পারেন তার নানান প্রমাণ তিনি নানাভাবে রাখলেন সেদিন। বিশেষত, 'জন্মান্তর' কবিতাটি তাঁর কণ্ঠে এই আসরে দ্বিতীয়বার শোনা গেল। কিন্তু কী আশ্চর্য ভিন্নতা দুটি আবৃত্তির মধ্যে। প্রথম আবৃত্তিকার, জয়ন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, কবিতার মেজাজটিই ধরতে পারেননি। তবে শাঁওলী মিত্রের একটি মন্তব্য বোঝা গেল না। শ্রোতারা তাঁকে 'দুলেন' কবিতাটি আবৃত্তির জন্য বারবোর অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও তিনি এই বলে অক্ষমতা জানালেন যে, "মা (তৃপ্তি মিত্র) যেসব কবিতা শোনান আমি সেগুলো শোনাব না ঠিক করেছি।" যুক্তিটি বিস্ময়কর। তাঁর আবৃত্তিতে তৃপ্তি মিত্রের সর্বাঙ্গীণ মেজাজ তো বিষময়রকম প্রকট। তা যখন বাদ দেওয়া সম্ভব নয়, শুধু শুধু রবীন্দ্রনাথের কিছু আশ্চর্য রচনা বাদ দেওয়ার অর্থহীন ইচ্ছে কেন? সেদিন আরেকজন আবৃত্তিকার বিস্মৃত করে দিয়েছেন। তিনি নীলাদ্রিশেখর বসু। 'খেয়ার' 'পথের শেষ' ও 'আগমন' কবিতা দুটি প্রথমে শোনালেন তিনি। সজীব, ভরাট তাঁর কণ্ঠ, পরিচ্ছন্ন উচ্চারণ, স্বরক্ষেপণের ভঙ্গি গভীর, নাটুকেপ্রবণতাবর্জিত। সব শেষে শোনালেন তিনি 'প্রহাসিনী'। কাব্যগ্রন্থের 'নাসিক হইতে খুড়ার পত্র'। হিন্দী-মেশানো সরস কৌতুকের এই কবিতাটি শুধুই সুন্দরভাবে বেছে নেননি নীলাদ্রিশেখর, শুনিয়েছেনও অতি মার্জিত, যথাযথ কৌতুকময় পরিবেশ নির্মাণ করে। রূপশ্রী কাঞ্জিলাল শিশুসুলভ আবৃত্তির ঢঙ নির্বাচিত কবিতার মেজাজের সঙ্গে সুন্দর মানানসই। [illegible] ঘোষের 'পৃথিবী' বেশী [illegible] লেগেছে। দীপঙ্কর মজুমদারের নির্বাচন (আবির্ভাব, বিদায়) প্রশংসার যোগ্য। আবৃত্তি এখনো প্রত্যাশিত মানে পৌঁছয়নি।

সমবেত আবৃত্তির একটি অনুষ্ঠান শোনালেন ইনস্টিটিউট অব অডিও-ভিস্যুয়াল কালচার। পঙ্কজ সাহার পরিকল্পনা প্রশংসনীয়, কিন্তু সব মিলিয়ে 'নারী' জমেনি। দ্বৈত কণ্ঠের দুটি অনুষ্ঠানের মধ্যে মুরারি চক্রবর্তী ও শুভ্রা বসুর 'সতী' উল্লেখ করা যায়। 'রাজা ও রানী'তে দেখা গেল সুন্দর কণ্ঠের অপব্যবহার। 'মালিনী'তে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বা 'গান্ধারীর আবেদনে' সুচিত্রা মিত্র নামের মহিমায় আসর উজ্জ্বল করেছেন, আবৃত্তির মহিমায় নয়। কাজল চৌধুরী বা দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একক কণ্ঠের আবৃত্তির অনুষ্ঠান শোনা গেল না—আক্ষেপ থেকে যায়। এই অনুষ্ঠানের পরিচালক গৌরী ঘোষ সম্পর্কেও এই আক্ষেপ প্রযোজ্য। তাঁরাও নেপথ্যেই থেকে গেলেন। অনুপকুমার সেদিন আসরের একমাত্র অনুপস্থিত আবৃত্তিকার।

কোঁচকানো জামাকাপড় ভাল চোখে কে দেখে? টেবিলাইজড়্*পরুন।

টেবিলাইজড়্ পলিএস্টার/কটন বা সুতীর কাপড়ে সহজে ভাঁজ পড়েনা। পরিপাটি দেখায় সারাদিন। দিনের পর দিন।

সাধারণ সুতীর কাপড় বড্ড সহজে কুঁচকে যায়। 'টেবিলাইজড়্' পদ্ধতি ঠিক এই কারণেই আবিষ্কার হয়েছে: যাতে সুতীর কাপড়ে সহজে ভাঁজ না পড়ে বা পড়লেও আবার তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে যায়।

পলিএস্টার/কটনে কি সত্যি ভাঁজ পড়েনা?

হ্যাঁ, পড়ে। যদি অবশ্য 'টেবিলাইজড়্' না হয়। পলিএস্টার/কটনে যে সুতীর ভাগ আছে, টেবিলাইজড়্ না হলে তা সহজেই কুঁচকে যাবে।

'টেবিলাইজড়্' মার্কা নজর করে কিনবেন

এর পরের বার পলিএস্টার/কটন বা এমনি সুতীর কাপড় যাই কিনুন, তাতে টেবিলাইজড়্ মার্কা যেন নিশ্চয় থাকে। শুধু নাম করা মিলের কাপড়েই ওই ছাপ দেখতে পাবেন—অরবিন্দ, বম্বে ডাইং, লক্ষ্মী বিষ্ণু, মফতলাল, শ্রী অম্বিকা, থ্যাকারসে।

OBM-3719/1.BEN

জান, ও যথোচিত প্রতিকার না হলে জনচেতনার মাঝে আমরা সেই রবীন্দ্র-বিরোধীদের দলেই নাম লেখাতে বাধ্য হবো। তখন তাকে অদৃষ্টের পরিহাস বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেও মানসিক স্থৈর্য মিলবে কোথায়?

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাপর্বে রবীন্দ্র-বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে যে অমূল্য ইতিহাস শ্রীঘোষের নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে এবং যে সত্যদ্রষ্টা ঋষি রবীন্দ্রনাথের হৃদয় থেকে উৎসারিত বাণীর সঙ্গে আমরা পরিচিত হই, সেই সূত্র ধরেই কয়েকটি প্রশ্ন শ্রীঘোষের কাছে আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে রাখছি :

॥ এক ॥

বিরোধিতা-পর্বে নিদারুণ মানসিক কষ্টকালে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : জরুরি চিঠি জরুরি প্রবন্ধ সমস্ত ঠেলে রেখে মাঝে মাঝে প্রায়ই গান লিখি। এই গান লেখার মাধ্যমে দেশবাসীর প্রতিকূল মনোভাবের কথা ভুলে নিজের মনকে শান্ত করার আন্তরিক ব্যাকুলতা রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করতেন একথা স্বীকার্য। তবু প্রশ্ন জাগে : যে গানের অসীম ও স্বর্গীয় আনন্দলোকে রবীন্দ্রনাথ মানসিক শান্তায়নের ঈপ্সিত স্তরে পৌঁছতে চাইতেন তার বাড়তি পাওনা হিসেবে তিনি কি আমাদের এমন এক অক্ষয় সম্পদ দিয়ে যাননি, যা তাঁর সৃষ্টি-সত্তার অনপিনদ্ধ ও সবচেয়ে প্রাণময় প্রকাশ? গানগুলো কি তাঁর জীবন-সাধনারই চুম্বক নয়?

॥ দুই ॥

যে-গানগুলো আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিক আশা - আকাঙ্ক্ষা - অনুভূতিরই বাঙ্ময় প্রকাশ এবং যেগুলি সকল বিরোধিতার বিরুদ্ধে প্রত্যুত্তর, অথচ তাঁর প্রতিবাদ সে গানগুলি কেনই বা এত জনপ্রিয়, এমনকি বিরোধিতা-পর্বের চরমক্ষণেও? নইলে, 'কাল্‌নী' অভিনীত হওয়ার কালে কিংবা ২৮-এর 'নবীনসজ্জা' অনুষ্ঠানেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা এত বেশী ছিল কেন?

॥ তিন ॥

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাপর্বে যে 'শনিগ্রহ'-এর সাথে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল, সেই 'শনি'র প্রকোপ কতদিন পর্যন্ত বিশ্বভারতীকে প্রভাবিত করেছিল? এসবের পেছনে, তদানীন্তন সরকারের সঙ্গে বিশ্বভারতীর কী ধরনের সম্পর্ক ছিল? সে-সম্পর্কে স্বাধীনতার পরেও কেন অপ্রকাশিত ইতিহাস হয়ে রইলো?

পরিশেষে, এ-সব প্রশ্নের ঊর্ধ্বে যে-কথাটি বারবার আমার মনে আসে তা হলো :

'It is easy in the world to live after the world's opinion —it is easy in solitude to live after your own; but the great man is he who, in the midst of the world, keeps with perfect sweetness the independence of solitude.'

এমারসন-এর উপরি-উক্ত মহামূল্যবান কথাগুলো গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কী বর্ণে বর্ণে সত্য!

মোহিত চক্রবর্তী
বিশ্বভারতী, শিক্ষাসত্র

যে কোনও বয়সেই
ক্লিন
স্যানিটারী
ন্যাপকিন
অস্বস্তির দিনে,
স্বস্তি আনে
ক্লিন ইণ্ডাস্ট্রিজ
ক্লিন স্যানিটারী ন্যাপকিন সবজায়গায় পাওয়া যায়
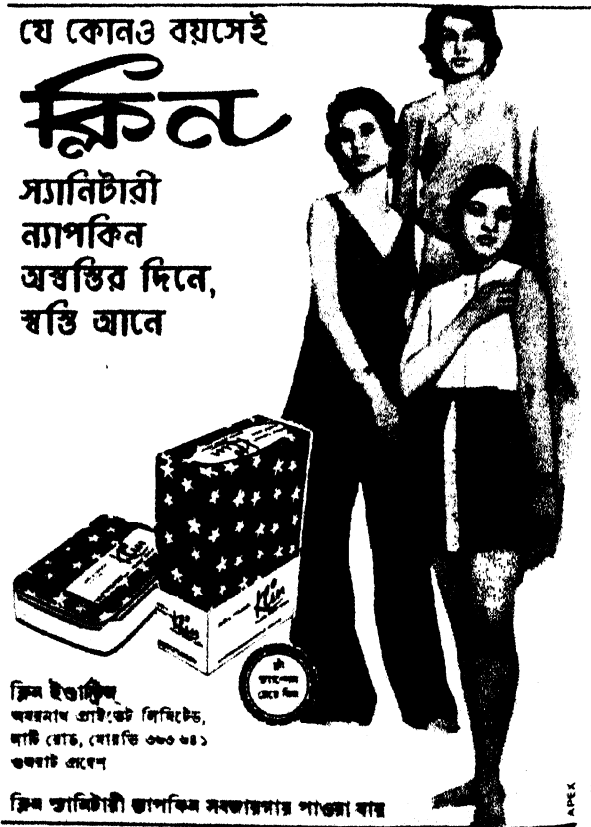
ধাম্‌ড়

আমি নদীয়া জেলার শান্তিপুরের আদিবাসী। আমার ছেলেবেলায় আমাদের অঞ্চলে অর্থাৎ শান্তিপুরে, নবদ্বীপ, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর ইত্যাদি শহরে এবং কাছাকাছি গ্রামাঞ্চলে 'ধাম্‌ড়' শব্দটি যে কতবার শুনেছি তার ইয়ত্তা নেই। বছর চল্লিশ আগেও আমরা এই "ধাম্‌ড়" শব্দটির সঙ্গে সুপরিচিত ছিলাম। শব্দটি বর্তমানে ধড়িবাজ বা সেয়ানা শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সেই অর্থে বা ঘুঘুর মত সেয়ানা—এই অর্থেই ব্যবহৃত হত, এখনও হয়।

অনাথবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-১৬

গিরিশচন্দ্রের গান

১৩ আগস্টের দেশ-এ প্রকাশিত 'গিরিশচন্দ্রের গান' প্রবন্ধটির জন্য রত্নেশ্বর মিত্রের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। বাংলা নাট্যসঙ্গীত রাগসঙ্গীত ও খেয়াল-টপ্পা ইত্যাদি অঙ্গের প্রয়োগে সেকালে যে কত সুসমৃদ্ধ ছিল তা গিরিশচন্দ্রের গানের রাগ ও সুর-বৈচিত্র্যের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। তবে কীর্তন বা লৌকিক ঢঙে তাঁর কোন গান ছিল কিনা সে বিষয়ে শ্রীমিত্র কোন আলোকপাত করলেন না। গিরিশচন্দ্রের কোন গান বর্তমানে কোন আসরেই প্রায় শুনতে পাওয়া যায় না। তবে প্রখ্যাত গায়ক শ্রদ্ধেয় জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর রেকর্ডে 'দুর্গে দুঃখহারিণী' গানটি আছে। কিন্তু সেখানে গানটি 'দুর্গা' রাগে গাওয়া হয়েছে, কীর্তন শ্রীমতীর উদ্দেশে গানটির নাম আড়ালে থাকায়।

সন্দীপ মুখোপাধ্যায়
[illegible]

হরিনাথ দে

'দেশে'র ১৩ই আগস্ট ১৯৭৭ সংখ্যায় শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হরিনাথ দে : জীবন ও প্রজ্ঞার জ্যোতির্ময় অনুভূতি' প্রবন্ধে একটি ভুল লক্ষ করলাম। লেখক লিখেছেন, "কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজ (সঠিকভাবে লিখতে গেলে Christ's College লেখা উচিত) তিনি ম্যাট্রিকুলেশন (Michaelmus term) পাশ করেন।" (পৃঃ ৯৯) কিন্তু Michaelmus term কোন পরীক্ষা নয়।

অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজে তিনটি term বা ভাগে বছরকে ভাগ করা হয়—মিকেলমাস (উচ্চারণ মাইকেলমাস নয়।), হিলারী ও ট্রিনিটি আর ঐ দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে Matriculationও কোন পরীক্ষা নয়—আসলে মিকেলমাস ভাগে সমস্ত নতুন ছাত্রছাত্রীকে উপাচার্যের কাছে উপস্থিত করানোর প্রথাকেই Matriculation বলে।

শঙ্কর বসু মল্লিক
হাওড়া-১

সংশোধন

২০ আগস্ট 'দেশে' প্রকাশিত 'আকুপাংচার' শিরোনামের পত্রে লেখকদ্বয়ের একজনের নাম ভুলক্রমে অরুণকুমার গণ-এর স্থানে অরুণকুমার নান ছাপা হয়েছিল।

প্রকাশিত হল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

নতুন উপন্যাস

ঘ্যাওলা দাম ৮.০০

একটা নতুন জিনিস
নাম পাড়ার কিংবা লং মার্চ
করার স্বপ্নে মেতে উঠেছিল
এক দল যুবক। ভুল হোক,
সাচ্চা হোক, একটা বিপ্লব
হয়েছিল। সেই বিপ্লবের এক
নায়ক হিরণ্ময়। পেট কেটেছে
বিচলনায়, উনটোনে স্নায়ু,
সঞ্চার পেশী। আর ছিল
বুলালি— হিরণ্ময়ের দিকে যে
বাড়িয়ে দিয়েছিল ভালবাসার
মোহময় হাত। হিরণ্ময়ের এক
চোখে ভালবাসা, অন্য চোখে
শূন্য। তারপর এল 'গহীন
মুলক' দিন। মুছে গেল
গেল দেশ। পুলিসের বুটের
ওঠানামায় একবার 'গহীন'
একবার 'মুলক' শব্দে ভরে
গেল নতুন সমাজ। গড়ে
উঠল নতুন যুব আন্দোলন।
সেই নতুন সমাজে ফিরে এল
ব্যর্থ বিপ্লবী হিরণ্ময়। নিঃস্ব,
নিঃসহায়, নিঃসম্পর্ক। অচল
টেলিফোনের মতো যোগা-
যোগহীন। নতুন সমাজে
সকলেই কিছু বলতে চায়
তাকে। কিন্তু কিছু বোঝে
যায় না... পৌঁছয় না।
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর
এই নতুন উপন্যাসে এক
দিকে আশ্চর্য মমতায় ফুটিয়ে
তুলেছেন অভিমানী আত্ম-
ঘাতী যুবসমাজের নিঃসঙ্গ
দেয়ালালিপির মতো অমোঘ
নিয়তি, অন্য দিকে দুঃসহ
ক্ষমতায় চিহ্নিত করেছেন
দুঃসময়ের এক জীবন্ত
চালচিত্র।

এই লেখকের অন্যান্য উপন্যাস :
কাগজের বউ ৮.০০ ঘাও
পাখি ২৫.০০ আশ্চর্য ভ্রমণ
৬.০০ দিন যায় ৮.০০
পারাপার ১২.০০ ঘুণপোকা
৬.০০

প্রকাশিত হল

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের

নতুন কবিতার বই

হিমযুগ দাম ৫.০০

পঞ্চাশের পরবর্তী সময়ে
বাংলা কবিতাকে আরো দীপ্ত
ও উজ্জীবিত করেছেন যে
স্বল্প কয়েকজন, তাঁদের মধ্যে
বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত বিশিষ্ট
এবং উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব।
সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার
মাঝখানে তিনি এমন প্রাজ্ঞ,
গম্ভীর, সময়-সচেতন, শান্ত
এবং, সর্বোপরি, প্রখর
ব্যক্তিত্বময় যে, ভাবতে বিস্ময়
লাগে। এমন নয় যে, বুদ্ধদেব
সরব সযোগ সুলভ তির্যক
ভঙ্গিতে উচ্চকণ্ঠ। মুখ্যত
কবিতারই ভাবা তাঁর, অত্যন্ত
সংযত তাঁর তুলির আঁচড়
দুটি-একটি তাৎপর্যময়
রেখায় তুলে ধরেছেন একটি
গোটা সময়কে, সমসময়ের
প্রতি দুর্বার মমতা তাঁর
কবিতায় যোগ করেছে একটি
নতুন মাত্রা, সমসাময়িক বহু
কবির ভিড়ে তাঁকে চিহ্নিত
করে দিয়েছে স্পষ্ট, সাহসী,
আলাদা একজন হিসেবে।

বিষয় হিসেবে তিনি 'মাগুর-
মাছ' থেকে 'হ্যাঙ্গার' এরকম
অনেক কিছুই বেছে নিয়েছেন
এবং সমস্ত কিছুকেই মূর্ত
করে তুলেছেন বিরলতম
কবিতার দ্যুতিতে। কবিতা-
ভাস্কর্যে তিনি যে কত
চিত্তচমৎকারী এবং কবিসুলভ
প্রাজ্ঞমনস্কতাসম্পন্ন, তার
প্রমাণ রয়েছে স্বচ্ছন্দ,
সপ্রতিভ, গতিময়, ভাষায়
সুবিন্যস্ত ভঙ্গিতে আঁকা
পারম্পর্যময় ছবিগুলিতে।
তাঁর কবিতায় আছে এক উদার
সৌন্দর্য, প্রাকৃতিক দৃশ্যের
মতই যা মোহময় এবং আছে
আমাদের ধূসর ও ধূসরতম
দিনযাপনের মর্মগাথা ॥

কয়েকটি উপন্যাস

সমরেশ বসুর

ওদের বলতে দাও

দাম ৫.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

কবি ও নর্তকী

দাম ৬.০০

বিমল করের

একা একা

দাম ৫.০০

বুদ্ধদেব গুহর

হলুদ বসন্ত

দাম ৪.০০

আশাপূর্ণা দেবীর

সেই রাত্রি এই দিন

দাম ৭.০০

রমাপদ চৌধুরীর

পরাজিত সম্রাট

দাম ৭.০০

বিমল মিত্রের

বেগম মেরী বিশ্বাস

দাম ৩০.০০

শংকর-এর

নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি

দাম ৮.০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তুঙ্গভদ্রার তীরে

দাম ৭.০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর

প্রেম

দাম ৫.০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

অমাবস্যার গান

দাম ৩.০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

সূর্যসাক্ষী

দাম ২০.০০

সুবোধ ঘোষের

বন উপবন

দাম ৬.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা-৯

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

বিরাট ক্যানভাসে আঁকা
নতুন উপন্যাস

ছবির মানুষ

দাম ৭.০০

একটি জাহাজ আন্দামানের
দিকে চলেছে ; সেই জাহাজে
আছেন একদা স্বাধীনতা-
সংগ্রামী কয়েকজন মানুষ।
তাঁরা তাঁদের পূর্ববাস
সেলুলার জেল দেখতে
যাচ্ছেন। এই যাওয়া মানে
অনেক স্মৃতি, অনেক
অভিজ্ঞতাকে সাক্ষী রেখে
যাওয়া। প্রায়বৃদ্ধ মানুষ-
গুলির এই মুহূর্তে তাঁদের
যৌবনের দিকে ফেরা। আর
সেই কাহিনী নিয়েই উপন্যাস
'ছবির মানুষ'। এতে সুনীল
গঙ্গোপাধ্যায় বিরাট ক্যান-
ভাসে নিখুঁত ছবি এঁকেছেন
অতীতের, বর্তমানের ;
আর মানুষ সৃষ্টি করেছেন
সেকালের, চিরকালের। সব
মিলিয়ে 'ছবির মানুষ' এক
নতুন স্বাদের রচনা, যা
উপন্যাস হয়েও ইতিহাস—
ইতিহাস হয়েও উপন্যাসতর ॥

এই লেখকের অন্যান্য বই :
রাধাকৃষ্ণ ১০.০০ সংসারে
এক সন্ন্যাসী ৭.০০ একা
এবং কয়েকজন ৩০.০০
আমিই সে ৭.০০ স্বর্গের
নীচে মানুষ ৭.০০ কবি
ও নর্তকী ৬.০০ অর্জুন
৭.০০ কালো রাস্তা সাদা
বাড়ি ৪.০০ জীবন যেরকম
১৫.০০ তুমি কে? ৪.০০
সরল সত্য ৫.০০ অরণ্যের
দিনরাত্রি ৪.০০ আত্মপ্রকাশ
১০.০০ আমার স্বপ্ন
(কবিতা) ৪.০০ তিন নম্বর
চোখ (কিশোর-উপন্যাস)
৫.০০ সবুজ দ্বীপের রাজা
(কিশোর-উপন্যাস) ৫.০০
ভয়ংকর সুন্দর (কিশোর-
উপন্যাস) ৪.০০

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

সত্যজিৎ রায়ের

ফেলুদার রহস্য অ্যাড-
ভেঞ্চারের দুটি কাহিনী

ফেলুদা এণ্ড কোং

দাম ৮.০০

ফেলুদার দুটি নতুন রহস্য
অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী
সংগ্রথিত হয়েছে 'ফেলুদা
এন্ড কোং'-এ। দুটি
অ্যাডভেঞ্চারেই, বলা বাহুল্য,
ফেলুদা বিজয়ী। তার এই
জোড়া-জয় তার জোড়া-
অনুচর তোপসে-জটায়ুর
মতো নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত করবে
তার অজস্র অনুরাগী
পাঠককে ॥

এই লেখকের অন্যান্য বই :
ফটিকচাঁদ ... জয় বাবা
ফেলুনাথ ...০০ আরো
এক ডজন ১০.০০ রয়েল
বেঙ্গল রহস্য ৫.০০ সাবাস
প্রোফেসর শঙ্কু ৬.০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫.০০
বাক্সরহস্য ৫.০০ সোনার
কেল্লা ৬.০০ গ্যাংটকে
গণ্ডগোল ৫.০০ প্রোফেসর
শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৫.০০
এক ডজন গপ্পো ১০.০০
বাদশাহী আংটি ৫.০০
বিষয় চলচ্চিত্র ১০.০০

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের

হাসির গল্প-সংকলন

শ্বেত পাথরের টেবিল

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

দেশ দেশ ৪৪ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা
১ আশ্বিন ১৩৮৪

সূচীপত্র

বিদেশে ভারতীয় ব্যক্তি

সম্পাদকীয়

ভারতের জনৈক ভারতীয় সেনাপতি ইউরোপে তাঁর সফরকালের কয়েকটি বিবৃতিতে ভারতের 'অহিংসা'র বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিলেন। ভারতীয় সেনাপতির এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন সেদিনের ভারতের বহু বিশিষ্ট নেতা ও মনস্বী। শুধু অহিংসার সত্যতা ও সার্থকতার পক্ষে যুক্তির সমর্থন বিবৃত করবার জন্যে নয়, ব্যক্তির পক্ষে ও-রকম মন্তব্য করবার নৈতিক অধিকার সম্বন্ধেও তাঁরা প্রশ্ন উত্থাপিত করবার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। তাঁদের প্রশ্ন ছিল, কোন সরকারী ভারতীয় ব্যক্তির পক্ষে বিদেশে সফরকালে বিবৃতিতে স্বদেশের ঐতিহাসিক ভাবনার একটি সিদ্ধিস্বরূপ 'অহিংসা' আদর্শকে নিন্দিত করবার কি কোন পদগত অধিকার আছে? এবং কোন বে-সরকারী ভারতীয় ব্যক্তির পক্ষেও কি এক্ষেত্রে নিন্দাবাদ প্রচার করবার কোন নৈতিক অধিকার আছে?

শুক্রনীতিসার অনুযায়ী 'বৈধ হিংসা' সম্বন্ধে অনেকের শ্রদ্ধার ভাব দেখা যায়। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার শুক্রনীতিসারের 'বৈধ হিংসা'র সমর্থক ছিলেন, কিন্তু দেখা গিয়েছে তিনি তাঁর বিদেশ সফরকালে কোন লেখা বিবৃতি ও বক্তৃতায় ভারতের বুদ্ধ ও গান্ধীর প্রচারিত অহিংসার বিরুদ্ধে মন্তব্য করেন নি। বিদেশে প্রত্যেক ভারতীয়ের পক্ষে তাঁর বাক্‌সংযমের একটি সঙ্গত ও নির্ধারিত মাত্রা থাকা চাই। বে-সরকারী ভারতীয়ের পক্ষে সেটা হবে নিজের বিবেক-সঙ্গত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংযম, এবং সরকারী ভারতীয়ের (যথা রাষ্ট্রদূত বাণিজ্যদূত প্রভৃতি) পক্ষে তাঁর কর্মবিধি ও কর্তব্যের সম্পর্কে বাধ্যতার একটি প্রশাসনিক নির্দেশ।

ভারতের অনেকে এখনও স্মরণ করতে পারবেন যে, একদা ইউরোপের একটি দেশে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত তাঁর সাংস্কৃতিক পাণ্ডিত্যের অহমিকায় 'গীতা' নামক ভারতীয় তাত্ত্বিক চিন্তার বিখ্যাত গ্রন্থটি সম্পর্কে কটূক্তি নিক্ষেপ করেছিলেন। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, পৃথিবীতে এত অধন্য ও নিন্দনীয় চিন্তার গ্রন্থ থাকতে একজন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত কিসের জন্য তাঁর স্বদেশেরই বহু-বহু জনের এবং যুগ-যুগের শ্রদ্ধান্বিত গীতাকে অবমানিত করবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন? চেষ্টা করলে বা খুঁজলে ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে অবশ্যই দু-চারটে বিকৃত-অভিরুচির গ্রন্থ পাওয়া যাবে, যার সম্বন্ধে পণ্ডিতসমাজের তর্কবিচারণার আসরে কঠোর আলোচনা মুখরিত হতে পারে। এটা সব দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের পক্ষে একটি সঙ্গত স্বাধীনতার প্রশ্ন। কিন্তু জনসাধারণের সম্মুখে অভিমত বিবৃত করতে হলে একটি অভ্রান্ত সংযমের শাসন চাই, যেন সাংস্কৃতিক বক্তব্যটি স্বদেশের নিন্দাবাদের মন্তব্যে পরিণত না হয়।

ভারতীয় জনমতের পক্ষে এটা চমকিত হবার মতো কোন অদ্ভুত সংযমের কথা নয়। ভারতে অবস্থান কালে বিদেশীয় ব্যক্তি এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত তাঁর স্বদেশের কোন ঘটনা অথবা ধর্ম-নীতি-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রশ্নের সম্পর্কে যে বাক্‌সংযমের নীতি অনুসরণ করতে অভ্যস্ত সেটা ভারতীয় জনমতের পক্ষে একটি শিক্ষণীয় আদর্শ। অতীতের একটি ঘটনাকে এ বিষয়ে তথ্য হিসাবে মান্য করা চলে। ইংলণ্ডে 'শ্রমিক দল' যখন প্রথম সংগঠিত হয়, তখন শ্রমিক দলের প্রতিনিধি-প্রচারক ভারতে এসে ভারতের জাতীয় নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল। লোকমান্য টিলক ব্রিটিশ শ্রমিক দলের সংগঠন ফাণ্ডে অর্থ দান করেছিলেন। ভারতের জাতীয় নেতারা সকলেই দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন যে, শ্রমিক দলের প্রচারক-প্রতিনিধি তাঁর দেশের কনজারভেটিভ কিংবা অন্য দলের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক কিছু বলেন নি।

এই সংযম জাতীয় জীবনেরই একটি শক্তির পরিচয় বলে মান্য হতে পারে। এই শক্তির নীতিটি মহাভারতের কাহিনীতেও ব্যাখ্যাত হয়েছে। 'যুধিষ্ঠির কন ভাই যাও শীঘ্রগতি'—গন্ধর্বেরা যখন পাণ্ডবেরই শত্রু কুরুপক্ষের গৃহনারীদের অপহরণ করে নিয়ে যেতে থাকে, তখন অন্যান্য পাণ্ডব ভ্রাতা খুশি হলেও যুধিষ্ঠির খুশি হননি। ভীম অর্জুনাদি চারি-ভ্রাতার বক্তব্য, কুরুসৈন্য একাই যুদ্ধ করে গন্ধর্বদের আক্রমণ প্রতিহত করুক। কিন্তু যুধিষ্ঠির যে নীতির বাণী উচ্চারিত করলেন তার মধ্যে জাতীয় সংহতির এবং জাতীয় শক্তির একটি উৎস নিহিত আছে। যুধিষ্ঠিরের নীতি—কুরু-পাণ্ডবে যখন যুদ্ধ হবে, তখন আমরা একদিকে পঞ্চজন পাণ্ডব ভ্রাতা, অন্যদিকে একশত জন কৌরবভ্রাতা। কিন্তু তৃতীয় কোন পক্ষ আমাদের দু-পক্ষের কাউকে আক্রমণ করলে আমরা তখন 'পঞ্চাধিক শত'।

বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের বাক্‌-স্বাধীনতা সম্বন্ধে আর একটি যুক্তিসঙ্গত প্রশ্নের দাবি অনুমান করা যায়। বিদেশে যাঁরা রাষ্ট্রদূতের পদে নিযুক্ত হয়ে থাকেন, তাঁদের সরকারী ব্যক্তিত্বে যথেষ্ট উৎকর্ষ থাকতে পারে, তাঁদের চিন্তা কর্মবিভাগীয় প্রয়োজনের পক্ষে খুবই পরিপক্ক হতে পারে। কিন্তু দেশের সংস্কৃতি এবং জ্ঞান-চিন্তার ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাঁদের অনেকের ধারণা নিতান্ত সামান্য হতেও পারে; ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের জন্য নির্বাচিত ও প্রশিক্ষিত ব্যক্তিটি খুব গুণী মানুষ হলেও তিনি ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের বিচিত্রবিপুল পরিচয় সম্পর্কে যথাযোগ্য গুণিত্বের মানুষ না হতেও পারেন। অভিযোগ করবার সঙ্গত যুক্তি আছে যে, আই-এফ (বিদেশ)-এস এবং আই-এ-এস ইত্যাদি সরকারী কর্মপদের জন্য সংগৃহীত ব্যক্তিদের অনেকেই জাতির সংস্কৃতি বিষয়ে যথোচিত অথবা প্রয়োজনোচিত শিক্ষা লাভ করেন না।

আগামী সংখ্যায়

সুজিতকুমার সেনগুপ্তের প্রবন্ধ
ভারতী-র ১০০ বছর
নিখিলচন্দ্র সরকার-এর গল্প
খেলা
অশোক মুখোপাধ্যায়ের রচনা
আধুনিক বাংলা নাটক
অশোক রুদ্রের প্রবন্ধ
কারো পৌষ মাস

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যাল প্রকল্প

বাপ্ রে! বাপ্!!

আচার বিচার আনন্দ

অম্লান দত্ত

আচার ও ধর্মের ওপর সনাতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেকালে পিতার বৃত্তি পুত্র গ্রহণ করত। পিতার অত্যন্ত কুশলতার উত্তরাধিকার পুত্রের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হত। পিতার প্রতি পুত্রের, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক কর্তব্য, এসবই পরিচিত পৌরাণিক আদর্শে ও ধর্মশাস্ত্রে নিভুর্লভাবে বলা ছিল। সমাজের কোন স্তরে কোন অবস্থায় কার কি করণীয় এ বিষয়ে একটা ঐকমত্য ছিল। ভগবানের স্বরূপ অথবা ন্যায়শাস্ত্রের প্রশ্ন নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক হত; কিন্তু বিধবার ব্রত, ব্রাহ্মণের অধিকার অথবা ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে কৃত্যাকৃত্য যেন প্রশ্নাতীত একটা নিশ্চয়তায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।

এদেশের বৃহত্তর সমাজ বর্ণে ও জাতিতে বিভক্ত ছিল; বিভিন্ন বর্ণের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল শাস্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্য দেশেও সামাজিক উচ্চ-নীচ ভেদ স্বীকৃত ছিল; আচার ও ধর্মের ওপর এই ভেদাভেদের প্রতিষ্ঠা। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের বেশভূষা, গতিবিধি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে ধারণা, সবই ছিল স্বীকৃত ঐতিহ্যের দ্বারা স্থিরীকৃত। এরই ভিতর কখনও কখনও অস্থিরতা দেখা দিত। বিশেষত বাইরের অচেনা শত্রু যখন পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তখন আচারের অচলায়তনও কিছুক্ষণের জন্য কেঁপে উঠত। কিন্তু এটা ছিল ব্যতিক্রম, সাময়িক চাঞ্চল্য।

সনাতন সমাজে ব্যক্তিকে বড় বেশী চিন্তা ভাবনা করে পথ বেছে নিতে হত না। কোন পথ ভালো আর কোনটা মন্দ, এ নিয়ে সন্দেহের তেমন অবকাশ ছিল না। মনের ভিতর তবুও যে দ্বন্দ্ব চলত, তার প্রধান কারণ কলুষ হৃদয়দৌর্বল্য। শাস্ত্রের আলোতে যেটা স্পষ্টভাবেই ভালো বলে চেনা যায়, হৃদয় কখনও কখনও সেটা মানতে চাইত না। কাজেই দুর্বল চিত্তবৃত্তিকে শাসন করাটাই ছিল প্রধান সমস্যা। নয় তো বিচার অটল ও অভ্রান্ত। সনাতনী দৃষ্টিতে, নারী ও পুরুষ, এই চঞ্চল হৃদয়বৃত্তি এবং অবিচল বিচারবুদ্ধির দ্বন্দ্ব প্রতীক। দৈনন্দিন জীবনে অবশ্য নারী ছিল আচারের বিশ্বস্ত সেবিকা। প্রাচীন সমাজ এইভাবে আচারের প্রাচীরে ঘেরা একটি নিঃসংশয় আত্মিক নিরাপত্তার ভিতর ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছিল।

আধুনিক যুগের প্রান্তে এসে ভাঙন দেখা দিল। প্রাচীন সমাজ ছিল পরিবারভিত্তিক। পরিবার ছেড়ে মানুষ যখন ক্রমশ বেশী সংখ্যায় জীবিকার উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোনো আকর্ষণে বাইরে বেরোতে শুরু করল, তখন থেকেই আচারের পাকাবাড়িতেও ভাঙন শুরু। পিতা এবং পুত্রের বৃত্তি আর অভিন্ন রইল না। ব্যক্তির আবাল্য পরিচিত গৃহপ্রাঙ্গণের বাইরেও যে অন্য দেশ ও সমাজ আছে, ভিন্ন মানুষ যে ভিন্ন ধর্ম ও আচারকে আশ্রয় করে ভগবানের এই সৃষ্টির মধ্যেই স্বচ্ছন্দে স্থান করে নিয়েছে, এই বৈচিত্র্য ব্যক্তির চিন্তায় ও কল্পনায় একটা আলোড়ন সৃষ্টি করল। নিজ সমাজের, এমন কি ধর্মপ্রতিষ্ঠানেরও, নানা দুর্নীতি ও কুসংস্কার ব্যক্তির আলোড়িত চেতনার দৃষ্টিতে এবার অসহনীয় মনে হতে লাগল।

এমনি করে সংশয়ের শুরু। বেদ, বাইবেল, কোরান অভ্রান্ত। কিন্তু অভ্রান্ত বাণীরও নানা ব্যাখ্যা সম্ভব। কোন ব্যাখ্যাটি নির্ভুল? সনাতনপন্থীরা বললেন, শাস্ত্রকারদের ব্যাখ্যাই গ্রাহ্য। বিদ্রোহীরা বললেন, ব্যক্তির বিবেকই হবে তার পথপ্রদর্শক। আবার মৌল সংশয়বাদীরা বললেন যে, সত্যনির্ণয়ের আসলে কোনো অভ্রান্ত উপায়ই নেই। তাহলে?

সত্য নির্ধারণের অভ্রান্ত উপায় থাক বা না-থাক জীবননির্বাহ করা আবশ্যক। অতএব কিছু সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। এই অবস্থায় একটি সুখবাদী দর্শন ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করল, যুক্তির ওপর যার নির্ভর। সুখ ও দুঃখকে আমরা পাই প্রত্যক্ষ অনুভূতির ভিতর। সত্য সম্বন্ধে যত সংশয়ই থাক না কেন, সুখ আছে, দুঃখ আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এজন্য আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে কোনো প্রমাণের দ্বারস্থ হতে হয় না। সুখ কাম্য। অন্তত সুখবাদীর কাছে এটাই সরল অকাট্য সত্য।

সুখ যাতে বাড়ে তাই ভালো, দুঃখের যাতে বৃদ্ধি ঘটে তাই মন্দ। যিনি বুদ্ধিমান তিনি শুধু এই মুহূর্তের সুখের কথা চিন্তা করেন না। যেসব উপায়ে সারা জীবনে সুখের যোগফলটা সবচেয়ে বড় হয়, সেই সব উপায় খুঁজে বের করাটাই বুদ্ধির কাজ। বুদ্ধি নির্লিপ্ত শুধু এই অর্থে। বুদ্ধি এই মুহূর্তের সুখ অন্যের মতো লিপ্ত নয়। তবু বুদ্ধির দৃষ্টিতে ব্যাপকতর অর্থে সুখই কাম্য। আচারের কোনো নিজস্ব মূল্য নেই; সুখেরই নিজস্ব মূল্য আছে। এই হল বিচারনির্ভর সুখবাদের কথা।

কিন্তু এই সহজ কথাটিরও অর্থের বিস্তৃতি সম্ভব। যুক্তির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এই সহজ কথাটিও সত্যের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তীর্ণ হয়। আমরা যে সুখ দুঃখকে প্রত্যক্ষ অনুভবের ভিতর পাই, সেটা ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ। ব্যক্তিগত সুখবাদে বিশ্বাস রাখলে ব্যক্তি চাইবেন, নিজের জীবনে বৃহত্তম সুখ। অন্যের সুখ দুঃখ প্রত্যক্ষভাবে এখানে গণনার মধ্যে আসছে না। কিন্তু যুক্তির ভিতর অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণের দিকে একটা ঝোঁক আছে। সুখ নামক অভিজ্ঞতার যদি এমন কোনো নিজস্ব গুণ থাকে যাতে তাকে ভালো বলা যায়, তবে সেটা বন্ধুর অভিজ্ঞতা হলেও ভালো, শত্রুর হলেও ভালো। অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের জন্যই ভালো নয়, সকলের জন্যই ভালো। যদি তাই হয়, তবে ভালোমন্দের বিচারে আমরা একটা বৃহত্তর সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাই। বহুতম মানুষের বৃহত্তম

যেটাই নীতির বিচারে শ্রেয়। কোনো ব্যক্তি যদি নিজের অল্প সুখের জন্য অপরের বেশী সুখ বর্জন দিতে চান, তবে তাকে অন্তত নৈতিক কারণে সমর্থন করা যায় না। কার্যত সুখবাদকে এইভাবে আমরা আরোহণ করি বিশ্বজনীন সুখবাদে। এই আরোহণ একান্তই যুক্তিবাদের ওপর নির্ভরশীল। এতে রহস্যবাদের কথা নেই। এই বিশ্বজনীন সুখবাদ মূলত মানবতামুখী।

বিশ্বজনীন সুখবাদে, আমার সুখও মূল্যবান, অপরের সুখও মূল্যবান; এবং বিশেষ কোনো কারণ না থাকলে ধরে নেওয়া সঙ্গত যে কোনোটিই অন্যটির চেয়ে কম অথবা বেশী মূল্যবান নয়, অর্থাৎ দুটির সমান মূল্য। অথচ অপরের দুঃখ নিবারণের জন্য আমরা যে কাজ করি, তার একটি বিশেষ মূল্য সমাজে স্বীকৃত। আমাদের নিজের চেতনার ভিতরও এমন একটি স্বীকৃতি আমরা অনুভব করি। এই স্বীকৃতি কি শুধুই কুসংস্কার, না যুক্তিতে এরও একটা ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়? ষোল শতকের গোড়ায় টমাস মোর 'উটোপিয়া' নামে যে পুস্তকটি রচনা করেছিলেন, তাতে এই প্রশ্নের একটা উত্তর পাওয়া যায়। বইটি অতি সুপাঠ্য, চাপা কৌতুকের ছোঁয়ায় লেখা; তবু এর চিন্তায় এমন একটা দূরদর্শিতা আছে যে, বিশ শতকের শেষেও বইটিকে আমরা ভুলতে পারিনি।

'উটোপিয়া'র অধিবাসীরা সুখবাদী। কিন্তু সেখানে কেউ নিজে কিছু কষ্ট স্বীকার করেও অপরের সুখ বর্ধন করতে আগ্রহী। এর একটি কারণ এই যে, এর ফলে অপরের কাছ থেকেও প্রয়োজনের সময়ে অযাচিতভাবে উপকার পাওয়া যায়, তাতেই ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের হিসেবেও শেষ পর্যন্ত কোনো ঘাটতি পড়ে না। উপরন্তু অন্যের দুঃখ দূর করতে গিয়ে নিজের মনে এমন একটি প্রসন্নতা লাভ করা যায় যেটা একেবারেই বাড়তি লাভ। এই চিত্তের প্রসন্নতা এর স্বীকৃতিমাত্রই কিন্তু সুখবাদী দর্শন গুণগত একটি ভিন্ন স্তরে পৌঁছে যায়। বস্তুত এখানেই সুখবাদের মুক্তি এবং পুনর্জন্ম। উটোপিয়া'র নায়কও এইখানে একটু নীচু গলায়, সম্পূর্ণ অনুত্তেজিতভাবে, ভগবানকে স্মরণ করেন।

মনুষ্যেতর জীবেরাও পরস্পরকে সাহায্য করে। কিন্তু এই জৈব সহযোগিতার সঙ্গে পরোপকারিতার একটা পার্থক্য আছে। সাধারণ জীব আত্মসচেতন নয়। মানুষ যখন ব্যক্তিস্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হয়েও সেই স্বার্থকে অতিক্রম করে যায়, তখনই তাকে পরোপকারী বলি। এই অতিক্রমণের ভিতর দিয়ে ব্যক্তিমানুষ নিজেকে একটি বৃহত্তর উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করে, যোগ ঘটে তার মঙ্গলবোধের সঙ্গে। এই যোগের ভিতর দিয়ে সে সুখের অধিক কিছু একটা লাভ করে, যার নাম চরিতার্থতা, যেটা অধ্যাত্ম আনন্দের সগোত্র।

সাধারণ মানুষের জীবনে বিশেষভাবে কর্মের ভিতর দিয়েই এই যোগ সম্ভব। সনাতন সমাজে কর্ম বলতে বোঝাতো প্রধানত পরিবার ও স্ববর্ণের প্রতি শাস্ত্র নির্ধারিত কৃত্যকর্ম। এটাকেই একদিন আমরা মঙ্গল বলে সহজে মেনে নিয়েছিলাম। এ-যুগের সমস্যা ভিন্ন।

আধুনিককালে, বিশেষত নাগরজীবনে, পরিবার ও কর্মপ্রতিষ্ঠানের ভিতর একটা দূরত্ব স্থাপিত হয়েছে। কুটিরশিল্পের যুগে এমন ছিল না। গৃহ ও কর্মস্থান অভিন্ন ছিল; ভৃত্য অথবা দাসকেও পরিবারভুক্ত মনে করা হত। ফলে পরিবারের প্রতি আনুগত্য এবং কর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্বের ভিতর সেকালে বিরোধ ছিল না। কৃষি ও কুটিরশিল্পের সীমানা ভেঙে আধুনিক শিল্প যখন বড় আকার ধারণ করল, এদিক থেকে তখনই একটা নৈতিক সমস্যা দেখা দিল। পরিবারের প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রীতির যোগ ও আনুগত্যবোধ স্বাভাবিক। ছেলে সমর্থ হলে কিছু না দিয়ে পরিবারের অন্ন গ্রহণ করতে লজ্জা বোধ করে। পরিবারকে কিছু দিয়ে সে নিজে তৃপ্ত হয়। পরিবারের বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এই বোধটা সহজে আসে না। বাইরের প্রতিষ্ঠানকে ঠকাতে ব্যক্তি তেমন সংকোচ বোধ করে না। অথচ শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ক্রমশই বেশী করে এমন সব প্রতিষ্ঠানে কাজের সূত্রে মিলিত হচ্ছি, যেখানে অধিকাংশের সঙ্গে আমাদের কোনো পারিবারিক সম্পর্ক নেই। বৃহত্তর সমাজকে যা দেবার, প্রধানত এই সব প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়েই আমাদের তা দিতে হবে। এই নতুন পরিস্থিতিতে তাই একটা নতুন কর্মভিত্তিক নীতিবোধের প্রয়োজন দেখা দেয়।

কর্মকে ভিত্তি করে এই যে নীতিবোধ, জাপানে এটা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। সেখানে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানেও পারিবারিক আনুগত্যের একটা বিকল্প গড়ে উঠেছে, যেন কর্মের সূত্রে কর্মীরা এক পরিবারভুক্ত। এর ভিতর দিয়েই ওরা জাতিকে শক্তিশালী করছে। জাপানে জাতীয়তাবাদ ও কর্মভিত্তিক নীতিবোধের এইখানে যোগ।

পাশ্চাত্ত্য জগতে কর্মভিত্তিক নতুন নীতিবোধ গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছিল, প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম। শিল্প ও ব্যবসায়ের অভ্যুত্থানের প্রথম যুগে ধর্মেরও সংস্কার ঘটল। সংস্কারকেরা বললেন যে, ব্যক্তির একটা বিশেষ ঐহিক কর্তব্য আছে, যেটা ধর্মীয় কর্তব্যেরই তুল্য। প্রাকৃতিক সম্পদ ভগবান যখন মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন, তখন এতে তাঁর কোনো অভিপ্রায় আছে। মানুষ এই সম্পদ অবহেলা করে ফেলে রাখবে, এটা ঈশ্বরের অভিপ্রায় হতে পারে না। বরং প্রত্যেকে নিজের সামর্থ্যকে ভগবানের দান বলে বিনীতভাবে গ্রহণ করবে, যে যেখানে নিযুক্ত সে সেখানে নিষ্ঠার সঙ্গে নিপুণভাবে কাজ করবে, আর এই জাগতিক সাধনার ভিতর দিয়ে দেহ ও মনের শক্তি হবে একাগ্র ও অনুশীলিত, এতেই ঈশ্বরের প্রতি মানুষের আনুগত্যের প্রকাশ। ওঁরা বললেন যে, কর্মই উপাসনা। সংস্কারকেরা শুরু করলেন, ক্রমে এই ভাবটা ছড়িয়ে পড়ল অনেকের মধ্যে।

যুক্তিবাদ তথা সুখবাদী দর্শনের প্রসারিত প্রান্ত

র আমরা এই কথাটিতে এসে পৌঁছেছিলাম যে, কটা বৃহৎ উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত হলে তবেই নুষের চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতা। আধুনিক ইতি-সের একটি বিশেষ যুগে শিল্পায়নই এই বৃহৎ দ্দেশ্য রূপে দেখা দিল। পরোপকার ভালো; ন্তু শুধু ব্যক্তিগত দানের ভিতর দিয়ে সমাজের লী মানুষের বেশী উপকার করা যায় না। ফরাসী লে সাঁ সিমঁ বললেন যে পরোপকারের শ্রেষ্ঠ পথ শিল্পোন্নয়ন। আর সে জন্য চাই বিজ্ঞান ও শ্রম।

শ্রমের সঙ্গে যুক্ত আছে পারিশ্রমিকের প্রশ্নটা। দুটি নীতির এখানে উল্লেখ আবশ্যক। এক হল, ম অনুযায়ী পারিশ্রমিক। শ্রমের গুণগত উৎকর্ষের কটাও অবশ্য এখানে ধরতে হবে। শ্রমের সঙ্গে পারিশ্রমিকের যদি একটা সদর্থক সম্পর্ক থাকে তবে মের ইচ্ছা আরো জোরালো হয়। আদর্শবোধ এবং বার্থবোধ, দুটোকেই কাজে লাগানো চাই। শ্রমের ঙ্গে পারিশ্রমিকের যোগ থাকলে তবেই ব্যক্তিস্বার্থকে াজে লাগানো যায়, আর কাজের ইচ্ছা অন্যায়বোধের গে দুর্বল হয় না।

প্রয়োজন অনুযায়ী পারিশ্রমিক, এই হল দ্বিতীয় নীতি। এর সঙ্গে পরিবারতান্ত্রিক আদর্শের একটা যোগ আছে। যার যেমন প্রয়োজন তাকে তেমন দেওয়া আত্মীয়তার সহজ নিয়ম। কেউ হয় তো শিশু অথবা অসুস্থ, শ্রমে অক্ষম অথবা অপটু। ার প্রয়োজন অনুযায়ী তবু সে পাবে, আত্মীয়তা অথবা মানবিক সহানুভূতির রায় এটাই।

বিশ্বজনীন সুখবাদী দর্শনেও সাম্যের দিকে কটা ঝোঁক আছে। যদি বলি যে, বৃহত্তম মানুষের হত্তম সুখই কাম্য, তবে ধনী নির্ধনের অসাম্য মর্থন করা কঠিন হয়। ধনীর সামান্য সুখের রিবর্তে যদি দরিদ্রের বেশী দুঃখ লাঘব করা ম্ভব হয়, তবে সুখবাদী বিচারে সেটাই কাম্য। নের বণ্টনের প্রশ্নে বিশ্বজনীন সুখবাদ এবং য়োজনতত্ত্ব যেন একই মেরুর অভিযাত্রী।

অবশ্য এখানেও কিছু তাত্ত্বিক সমস্যা আছে। বার রোগীর চিকিৎসার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক থবা বার্ধক্যের প্রশ্নে। রোগীর জীবনকে উপভোগ করবার ক্ষমতা কম, চিররুগ্নের ক্ষেত্রে তো এই অবস্থাটাই স্থায়ী। বার্ধক্যেও ভোগশক্তি দুর্বল। তবে কি রুগ্ন এবং চিররুগ্নদের যথাসম্ভব বাদ দিয়ে সুস্থসবলদের ভোগের আয়োজন বাড়ানোটাই সুখবাদী যুক্তির কথা? যারা মানসিকভাবে রুগ্ন তাদের ব্যাপারেও কি একই ব্যবস্থা কাম্য? অথচ অর্থের প্রয়োজন তো এদেরও আছে। প্রয়োজন-বাদের সঙ্গে, মনে হতে পারে, সুখবাদের এখানেই বড় পার্থক্য। বিষয়টা কিন্তু অত সহজ নয়। প্রয়োজনের বিচার হবে কার দৃষ্টিতে? যে মানুষ রোগে শোকে আচ্ছন্ন, তার ভিতর জীবনের প্রতি আকর্ষণ অনেক সময় ক্ষীণ হয়ে আসে, কাজেই তার প্রয়োজনবোধ দুর্বল। প্রয়োজনটা শোকার্তের দৃষ্টিতে হয়তো ততটা নয়, যতটা প্রিয়জনের দৃষ্টিতে। রোগীর চিকিৎসা না হওয়া অবধি—এমন কি আরোগ্যের সম্ভাবনা যেখানে নেই সেখানেও শুশ্রূষার যথাসম্ভব ব্যবস্থা না হলে—প্রিয়জন সুখ পায় না, শান্তি পায় না। প্রয়োজনটাকে যখন আমরা এইভাবে দেখি তখন দুই তত্ত্বের মধ্যে আবারও একটা সাযুজ্য স্থাপিত হয়। সুখেরও স্তরভেদ আছে; প্রয়োজনেরও তাই। স্তরভেদে অর্থভেদ হয়।

সুখবাদ যদিও চার্বাক থেকে সাম্প্রতিক কাল অবধি ইতিহাসে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, তবু আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতায় এর একটা বিশেষ স্থান ছিল। বেন্থামের যুগে ঝোঁক পড়েছিল, শিল্পের প্রসার এবং ধনোৎপাদন বৃদ্ধির ওপর। অসাম্য সেদিন প্রয়োজন মনে হয়েছিল, অনেকখানি অসাম্য মেনে নেওয়া হয়েছিলো, ধনোৎপাদনের জন্য। ধনীরা সঞ্চয় করবে, সঞ্চিত ধন শিল্পবাণিজ্যে নিযুক্ত হবে, জাতির সম্পদ এতে বাড়বে। এই রকম একটা যুক্তির ছিল প্রাধান্য। এরই জোরে সুখবাদী দর্শনও সে-দিন অনেকখানি অসাম্য সমর্থন করেছিল। ক্রমে আর্থিক সাম্যের প্রশ্নটা বড় হয়ে উঠল। অর্থের বণ্টনের কথাটা প্রাধান্য পেল। জমিদার বিলাসী; শিল্পবিপ্লবের প্রথম যুগের পুঁজিপতিরা সঞ্চয়ী; এ যুগের ধনীরা আবারও বিলাসী। এ যুগে দারিদ্র্য ও বিলাসিতার অসামঞ্জস্য পীড়াদায়ক।

সমবণ্টনেও অবশ্য সমস্যার শেষ সমাধান নেই। সমস্যার নানা স্তর। কাজের ভিতর মুক্তির আস্বাদ চাই। আধুনিক শিল্প শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এখানেই তার জোর; এটাই তার দুর্বলতা। আধুনিক অর্থশাস্ত্রের আদিগুরুরা এটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করেছিলেন। যে শিল্পী প্রতিমা গড়েন তিনি কাজের ভিতর দিয়ে নিজের কল্পনাকে রূপদান করেন, নিজেকে প্রকাশ করেন। কিন্তু যদি বলা হয় যে, কাজটাকে দশ টুকরো করে দশ জনের ভিতর ভাগ করে দেওয়া যাক, তারপর টুকরোর সঙ্গে টুকরো জুড়ে সম্পূর্ণ জিনিসটা পাওয়া যাবে, তবে কাজটা তাতে তাড়াতাড়ি হতেও পারে, কিন্তু কাজের ভিতর থেকে সৃষ্টির আনন্দ পালাই পালাই করে। কাজটা তখন হয়ে ওঠে কর্মীর পক্ষে বন্ধনদশা। আধুনিক শিল্পের যুগে, কর্মবিভাগই কর্মবন্ধন। এই বন্ধন থেকে মানুষ মুক্তি চায়, যদিও মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। শিল্পোন্নত সমাজ আজ জীবনের একটা নতুন দিগন্ত খুঁজছে।

অর্থাৎ, প্রতিটি স্তরের নিজস্ব কিছু সমস্যা আছে, আবার নিজস্ব সার্থকতাও আছে। কর্মবিভাগ যুক্তিরই দান। এতে শিল্পের উৎপাদিকা শক্তি বেড়েছে। সেই সঙ্গে এসেছে কাজের ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস। এই স্তরের শিক্ষা গ্রহণ করতে যাদের অনীহা তারা যখন পরবর্তী স্তরের মুক্তি দাবী করে, তখন বিভ্রাট ঘটে। মুক্তিরও একটা বাস্তব পূর্ব শর্ত আছে। সেটা বিচারের আলোতে চিনে নিতে পারলে এগোবার পথ সহজ হয়। আজকের বিচার কাল পথের বাধা হয়ে ওঠে। তবু আজকের যুদ্ধটাও জেতা চাই। নয় তো আমরা একই সঙ্গে হই, বর্তমানে নষ্ট এবং ভবিষ্যৎ থেকে ভ্রষ্ট।

পথের শেষ নেই। কর্মই বন্ধন, আবার কর্মই মুক্তি। আচার বিচারের মধ্য দিয়ে সে আমাদের উত্তীর্ণ করে দেয় আনন্দে। একবার নয়, বার বার। দীর্ঘপথের আমরা যে যেখানে আছি সেখানেই এই আশ্চর্য উত্তরণ সম্ভব।

ক্ষণে ক্ষণে প্রতি ক্ষণে খাবার বিস্কুট
BRITA
TH
ARROW

ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট
যেমন হাল্কা তেমনি সহজপাচ্য
দিন শুরু করুন বেশ মচমচে আর তাজা ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট বিস্কুট দিয়ে। বাস্তবিক এই বিস্কুট যেমন হাল্কা, তেমনি হজম করাও সহজ। শিশু থেকে বৃদ্ধ—বাড়ীর সবার জন্য। সকালে, কাজের অবসরে চায়ের সঙ্গে—যে কোনো সময়েই ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট খেতে ভাল।
লিনটাস-BBC.AR.3-140 BG
Arrowroot
BRITANNIA
Thin Arrowroot
ব্রিটানিয়া
সেরা ভাল বিস্কুট –
60 বছরের অভিজ্ঞতায়
ব্রিটানিয়া
বিস্কুট সবচেয়ে সেরা

ফিরেছো তোমরা? সহেরা আলোও ছিল না, সানাইয়ের কাটা রেকর্ডও ছিল না, খাটও ছিল না, ড্রেসিং টেবিলও ছিল না। ছিল কেবল বিবাহের মন্ত্র, যদিদং হৃদয়ং মম। শিখী শুয়ে শুয়েই ভারি শরীরটাকে বার কতক নাচাল। যাবার আগে এটার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে যাবো। খাট আবার সোফা-কাম-বেড বউ আবার পাঁচ ফুটের নবাব! অর্ধেক রাজত্ব প্লাস রাজকন্যা! মলের আগায় আবার চুটকি! রাগের চোটে শিখী নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পুবের বারান্দা। গায়ে বেশ চড়চড়ে রোদ পড়তেই শিখীর ঘুম ভেঙে গেল। সর্বাঙ্গ লঙ্কাবাটার মত জ্বলছে। রোদের তাতে নয়, মশার কামড়ে। শিখী অবাক হয়ে দেখল, সে মশারির ঘেরাটোপে নেই, উদোম পড়ে আছে সোফা-কাম-বেডে চিৎ হয়ে। মশারিটা গেল কোথায়? চোরের ওপর বাটপাড়ি কে করলে? শিখী উঠে পড়ল। রাস্তা শ্যালক তখনো দুমড়ে মুচড়ে বিছানায় পড়ে আছে। ফন-ফন করে পাখা ঘুরছে। সারা রাতের গরম হাওয়া সারা ঘরে ঘুলিয়ে উঠছে। বাইরের ঠান্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকতে পারছে না। না, মশারিটা শ্যালক নেয় নি। দরজার পাশে ঝোলানো বড় আয়নায় নিজের মুখ দেখে শিখী চমকে উঠলো। সারা মুখ লাল লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। যেন বুড়ো বয়েসে হাম হয়েছে। যেটুকু রক্ত সঙ্গে করে এনেছিল, হাফ শ্বশুর বাড়ির ব্লাডব্যাংকে জমা করে দিতে হল। একটি লার্জ সাইজের মশাকে তো বিয়েই করেছে। সারা জীবন কানের কাছে পিন পিন করছে আর রক্ত শুষে নিচ্ছে।

ঘাঁস ঘাঁস করে চুলকোবার জন্যে আর গায়ে একটু ঠান্ডা বাতাস লাগাবার জন্যে শিখী ছাদে গিয়ে উঠলো। শামিয়ানার তলায় মশারি ফেলে একটা হোলড্-অল বিছিয়ে রুমা শিখীর ছেলেকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোচ্ছে। এই তো সেই মশারি! ওই বলি বউ ছাড়া কার এমন সাহস হবে, ঘুমন্ত জামাইকে গড়ের মাঠে ফেলে মশারি খুলে নিয়ে পালাবে! শিখী ছাদে পড়ে থাকা একটা বাঁখারি দিয়ে মশারির বাইরে থেকেই রুমাকে বার কতক খোঁচা মারল। রুমা উঠে বসল। শিখী গা চুল-কোতে চুলকোতে বলল—

—আর ইয়্যু এ ম্যান?

—নো, আই অ্যাম এ ওম্যান।

——তুমি, ওই মশার আড়তে আমাকে ফেলে রেখে মশারিটা খুলে নিয়ে এলে কোন আক্কেলে বেআক্কেলে?

—তুমিই বা কোন আক্কেলে নিজে মশারিতে শুয়ে দিব্যি ঘুমোলে, একবার ভাবলে না ছেলেটার কি হবে! তোমার তো গন্ডারের চামড়া, মশা তোমার কি করবে!

শিখী জানে, কথায় কথা বাড়ে টাকায় বাড়ে সুদ। রুমার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। এই হল সংসার। তার নাকি গন্ডারের চামড়া আর ওনারা সব স্পেস-ক্রাফ্ট যেমন পালিশ, তেমনি ফিনিশ, তেমনি মোলায়েম। একেবারে ডিসটিংটে দু ভাগ। মা-ছেলে এক তরফ, শিখী আর এক তরফ। শিখী হল মেহনতী জনতা। শ্রমিক মৌমাছি। ওই যে আমার কুইন বি, কেড়ে-নেওয়া মশারির মধ্যে বোঁচা রাজপুত্রকে নিয়ে আরাম করছেন। শিখী গজগজ করতে করতে চা, বাসী লুচি কি তোলা মিষ্টি কিম্বা গেঁজে ওঠা রস কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করেই বেরিয়ে পড়ল। যা হবার নিজের বাড়িতেই হবে, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম ভয়াবহ।

॥ ২ ॥

প্রথমে মেজোর ঘর থেকে তেড়াবেঁকা হয়ে বেরিয়ে এল মেজোর বড়ছেলে, বিজু। সেজোর ঘর থেকে বেরোলো রাজু। ছোটোর ঘর থেকে বেরোলো বুলবুলি, সবে চলতে শিখেছে। ছাদ থেকে নেমে এল শিখীর ছেলে শুভো। বছর দশেক বয়েস হবে। সিঁড়ির মুখে সকলে জমায়েত হয়ে পরস্পর কুশল বিনিময় করল, একে অন্যকে স্পর্শ করে, গাঁট্টা মেরে, চিমটি কেটে, খামচে দিয়ে। বোঝা গেল সকলেই বেশ সুস্থ আছে। কাল রাতের বড়াখানা কাউকেই কাবু করতে পারেনি। আগামী চব্বিশ ঘণ্টার যত রকম শয়তানীর জন্যে টিম প্রস্তুত হয়েই রয়েছে। বিজুর মত বিচ্ছু খুব কম দেখা যায়! বিজুর মা বলেন ছেলে আমার নদের নিমাই হবে। একমাত্র অবতাররাই ছেলেবেলায় এইরকম পাজী হয়। অন্যান্যরা অবশ্য অন্যকথা বলেন। তাঁদের ধারণা বিজু চম্বলে জন্মাতে গিয়ে পথ ভুল করে মেজোর গর্ভে এসে ঢুকেছিল। ষোড়শ বর্ষে অবশ্যই সরকারী অতিথি হবে। মেয়াদ যাবজ্জীবন।

বিজু বললে, দাঁড়া, দাঁড়া তোদের একটা জিনিস দোবো।

জিনিসের লোভে সকলেই অ্যাটেনসানের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিজু যা বলে তাই করে। রাজু বললে, কিসে দাদা! বিজু সকলকে একটু সাসপেনসে রেখে ব্যাপারটাকে খুব একটা পরিষ্কার না করে বললে, দেখবি, দেখবি।

বাহিনী মার্চ করে বিজুদের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। এলোমেলো ঘর, কাজের বাড়িতে যেমন হয়। বড়রা কাল রাতের পার্ট গুছোতে সকাল থেকেই ব্যস্ত। মেজো মাঝরাতেই হাফ ক্যানেস্তারা কমলাভোগ কবজা করে খাটের কোণায় সংগ্রহ করে রেখেছিল। দিনকতকের রসদ। বিজু সকালেই সেই মৌচাকটি আবিষ্কার করে বসে আছে। বিজুর কাছে কিছুই লুকোনো থাকে না। সে নাসিকায় সারমেয়। গোঁয়ে গন্ডার। বদরামীতে বানর। আক্রমণে বরাহ। ধূর্ততায় শৃগাল। প্রকৃতই অবতারের সমস্ত লক্ষণ তাতে প্রকট।

বিজু তার টিমকে মার্চ করিয়ে টিনের কাছে নিয়ে গেল। নে নে একটা করে নে। বলুই অবাধ রসে ডুবিয়ে একটি করে কমলা ভোগ সকলে তুলে নিল। বুলবুলি নাগালে পাচ্ছিল না বলে খাঁত খাঁত করে কেঁদে উঠল। বিজু প্রথমে একটা থাপ্পড় মারল। বুলবুলি এতখানি হাঁ করে ঘর ফাটানো কান্না ছেড়ে গৃহস্থকে প্রায় সজাগ করে ফেলার উপক্রম করে ফেলেছিল। বিজু তাড়াতাড়ি নিজেরটা তার হাতে দিয়ে বিকট শব্দ বেরোবার আগেই থামিয়ে দিল। নিজে ঝট করে আর একটা তুলে নিল। বিদ্যুৎ বেগে কাজ হাসিল।

তোরাইমাল হজম করার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা আপাতত, রাস্তার দিকের খোলা বারান্দা। বারান্দায় এসে রাজু বললে, 'উলে দাদা, কি পেত্তে লোখেছে দেখ দেখ।' বিজু বললে, 'এতা আমার বাবা কিনেছে'। বিজু বেশ আরাম করে জাঁকিয়ে বসে, কমলাভোগ খেতে শুরু করল। রাজু, শুভো, বুলবুলি তিনজনেই বসতে চায়। বুলবুলি বয়েসে সবচেয়ে ছোটো উচ্চতায় ফুটখানেক কিন্তু কালের ধর্মে চলতেও শিখেছে, ব্যাব্যাও করতে পারে। তোমার নোজ কোথায় বললে, নাক দেখায়, বেলি বললে ফ্রক তুলে ইঁদুড়ো পেট দেখায়, টুইস্ট বললে নাচতে গিয়ে উল্টে পড়ে যায়। বুলবুলি উঠে বসার জন্যে খামচা খামচি করতে গিয়ে চারিদিক রসে মাখামাখি করে বসল। রাজু বসার চেষ্টা করতেই বিজু এক ধাক্কা মেরে রাজুকে উল্টে ফেলে দিল। শুভো প্রতিবাদে রাজুর পক্ষ নিয়ে বিজুর মাথায় খটাখট করে কয়েকটা গাঁট্টা বসিয়ে দিতে দ্বিধা করল না। বুলবুলি সঙ্গে সঙ্গে হিসি করে ফেললে। বিজু অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে সোফা-কাম-বেডের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে তাল ঠুকতে ঠুকতে বললে, যা বললে স্প্রিংয়ের নেপথ্য সংগীতের সঙ্গে কিম্বা আবহ সংগীতের সঙ্গে মিশে এইরকম দাঁড়াল,

ক্যাঁচ কেঁচ কোঁচোর কোঁচোর, তব তালাকে তেব কোরবো, ক্যাঁচ কোচ ক্যাচর ক্যাচ, তব তালার পিন্দি ওত্তকাবো, কাঁচ ক্যাঁচ, আমাল বাবাল দিনিস, ক্যাঁচ কোঁচো কেঁচ।

রাজু এদিকে চিৎপাত হয়ে তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করেছে। কমলাভোগের আধখানা বুলবুলির জলে ভাসছে। শুভো মাটিতে দাঁড়িয়ে, বিজু ওপরে দাঁড়িয়ে দুই পালোয়ানের মত শ্যাডো ফাইট করে যাচ্ছে। আর এই ভায়োলেন্স সহ্য করতে না পেরে বুলবুলি এতক্ষণের চেপে রাখা কান্নার বাঁধ মুক্ত করে দিয়েছে। অসাধারণ প্রভাতী অর্কেস্ট্রা। ওদিকে ছাদ থেকে ম্যারাপের বাঁশ ফেলছে ডেকরেটারের লোক। সব মিলিয়ে শব্দ ব্রহ্মের পূর্ণ প্রকাশ।

রাজুর মা বিজুর ভয়ে এমনিই অস্থির। প্রায়ই বলেন, বাঘের সঙ্গে হরিণ কি বাস করতে পারে গো! ছেলেটাকে যদি বাঁচাতে চাও আলাদা বাড়ি দেখো। রাজুর বাবা বলেন, ভাটপাড়ার বামনীর বুদ্ধি দেখো, এই বাড়ির একেরপাঁচ অংশের মালিক আমি। মা মরলেই পাঁচিল তুলবো। মুখ্যু মেয়েছেলের বুদ্ধিতে বিষয় ছেড়ে পালাই আর কি! তুমি থাকলে ছেলে একটা কেন দশটা হবে। বাড়ি হবে? গাধা কোথাকার! রাজুর মা সুর করে বলেছিলেন, ওরে আমার লাখ টাকার বিষয়ীরে! ভাগে পড়বে একটা ঘর, পাঁচিল তুললে বেরোবে কোন পথে? না সব কটা ঘরে ঢুকে মরে যক্ষ হয়ে সম্পত্তি পাহারা দেবে।

বিজুর মা হেঁকে ডেকে বলেন, হাঁ ছেলে আমার শের। শের কা বাচ্চে শের। সব বেটাকে চিট করে ছেড়ে দেবে। বউমাদের শাশুড়ী আচারের শিশির ঢাকনা খোলা দেখে মহাবেগে বলেন, শেরই বটে, শেরের গর্ভ কিনা, সবক'টা মিচকে শেয়াল।

রাজুর গলা শুনে রাজুর মা অনেকটা মুরগির মার মত ফরফর করে ঘটনা-স্থলে দৌড়ে এলেন। বিজু মুখপোড়া আমার সোনারচাঁদ ছেলেটাকে শেষ করে দেবে দেখছি। 'এই কি হয়েছে রে? সকাল থেকেই ধরে ধরে মারতে শুরু করেছিস? মগের মুলুক পেয়েছিস না? আদরে আদরে একবারে বাঁদর তৈরি হয়েছো।'

বিজু বুকে হাত মুড়ে স্বামী বিবেকানন্দের মত দাঁড়িয়ে জবাব দিল, 'বেচ কলেছি, বেচ কলেছি, বেএচ কোলেচি।'

সাতসকালেই বিজুর এই ঔদ্ধত্য সহ্য হল না। দালানে টাঙানো ঘড়িতে ট্যাং ট্যাং করে সবে আটটা বাজছে। চারিদিকে খাঁ খাঁ করছে রোদ। কুটুম-ঠাসা বাড়ির রান্না চাপবে বাগানে পাতা ভিয়েনের বিশাল উনুনে। রাজুর মার চোখে ভাসছে বিশাল কড়া, হাসফাঁস তরকারি, হাঁড়িতে আঁকুপাঁকু ভাত। ঘ্যাস ঘ্যাস কুটনো। কেটলি কেটলি চা। সব জা তো কেটে পড়বেন ফাঁকতালে। মর শালা তুই পিঁড়ি চটকে মর। এমনিই মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে। অন্য সময় হলে রাজুর মা রাজুর একটা হাত ধরে হেঁচকা টান মেরে একটা হাতল ছেঁড়া বাজারের ব্যাগের মত ঝোলাতে ঝোলাতে নিজেদের ঘরে নিয়ে গিয়ে খাটের ওপর ডাম্প করে ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিতেন। মরতে হয় নিজের চৌহদ্দির মধ্যে কঁকিয়ে মর। এক-পঞ্চমাংশ বিষয়ের উত্তরাধিকারীর এক-দশমাংশের উত্তরাধিকারী। আর একজন ঠামা দিচ্ছে। আর একজন যিনি তলপেটে কাতুকুতু দিচ্ছেন তিনি ছেলে কি মেয়ে মা ষষ্ঠীই জানেন। রাজুর মা লম্বা একটা হাত বাড়িয়ে বিজুর চুলের মুঠি ধরে বেশ কষকষে করে নেড়ে দিলেন, 'বাঁদর ছেলে সভ্যতা ভদ্রতা কিছুই শেখোনি না?'

এদিকে বুলবুলির চিল চেঁচানি শুনে বুলবুলির মা প্রায় কাছাকোঁচা খোলা অবস্থায় দৌড়ে এসেছেন। বড় আদরের মেয়ে। তিনটে ফল্‌সের পর এই একটা আসল বেরিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর ব্লাড গ্রুপ এক হবার ফলে, না রক্তে কি এক গন্ডগোলে রেসাস ফ্যাকটারের জন্যে বুলবুলির মার মা হওয়া প্রকৃতই সহজ কথা হয় নি। অনেক ওষুধ বদ্যি করে এই জাপানী জল পুতুলের ধরায় আগমন। তিনি আবার বাংলা বোঝেন না। বিলাতি দুর্ঘটনার ফলে। মাথা বললে পা দেখায়। হেড বললে তবেই মাথা ঝাঁকায়। বুলবুলির মা জলসিক্ত মেয়েকে মেঝের আঁকাবাঁকা নদী থেকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন, 'আমার মা মণিতা, সোনা মণিত্তা, কি হয়েচে, কু হয়েচে, কে মেলেছে, কে বকেচে, মাউ হাউ, খাউ, এই ছোঁড়া মেরেছিস কেন।' শেষের কথাটা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ খ্যার খেয়ে গলায়। বুলবুলির মার ধারণা রাজুটা মিটমিটে শয়তান। 'এই মেরেছিস কেন রে? মহা শয়তান। গাঁটে গাঁটে শয়তানী। মা মণিত্তা।' বুলবুলির মা বুলবুলিকে নাচাতে নাচাতে চলে যাচ্ছিল। রাজুর মা ছাড়বেন কেন? রাজুকে শয়তান বলে সরে পড়লেই হল, ইয়ার্কি! মারধোরের রাজা তো ওই গেঁটে শয়তান বিজু। এখন সোফা-কাম-বেডের ওপর হাত পা জড়িয়ে ত্রিভঙ্গ মুরারী হয়ে গলা ফাটাচ্ছে। যেমন মা তার তেমনি ছেলে। রাজুর মা বললেন,

কোঁচকানো জামাকাপড় ভাল চোখে কে দেখে? টেবিলাইজড্*পরুন।

টেবিলাইজড্ পলিএস্টার/কটন বা সুতীর কাপড়ে সহজে ভাঁজ পড়েনা। পরিপাটি দেখায় সারাদিন। দিনের পর দিন।

সাধারণ সুতীর কাপড় বড্ড সহজে কুঁচকে যায়। 'টেবিলাইজড্' পদ্ধতি ঠিক এই কারণেই আবিষ্কার হয়েছে ; যাতে সুতীর কাপড়ে সহজে ভাঁজ না পড়ে বা পড়লেও আবার তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে যায়।

পলিএস্টার/কটনে কি সত্যি ভাঁজ পড়েনা ?

হ্যাঁ, পড়ে। যদি অবশ্য 'টেবিলাইজড্' না হয়। পলিএস্টার/কটনে যে সুতীর ভাগ আছে, টেবিলাইজড্ না হলে তা সহজেই কুঁচকে যাবে।

'টেবিলাইজড্' মার্কা নজর করে কিনবেন

এর পরের বার পলিএস্টার/কটন বা এমনি সুতীর কাপড় যাই কিনুন, তাতে টেবিলাইজড্ মার্কা যেন নিশ্চয় থাকে। শুধু নাম করা মিলের কাপড়েই ওই ছাপ দেখতে পাবেন—অরবিন্দ, বম্বে ডাইং, লক্ষ্মী বিষ্ণু, মফতলাল, শ্রী অম্বিকা, থ্যাকারসে।

OBM-3719/1 BEN

'তুমি দেখেছো রাজু মেরেছে?'

'না দেখলেও আমি জানি। আমার মা মণিস্তা, হুঁ-উঁ-উম।'

'শুভো, বুলবুলিকে কে মেরেছে রে?' রাজুর মা শুভোকে সাক্ষী করলেন। এক কথায় মামলা ডিসমিস করে সরে পড়বেন জজসাহেব। ওঃ বি এ পাশ বলে দেমাকে পা পড়ছে না মাটিতে। ঘরে আবার পেলমেট লাগিয়ে ভারি ভারি পর্দা ঝুলিয়ে বাহার হয়েছে! কাজের মধ্যে তো সারাদিন স্বামী-স্ত্রীতে ঘরে বসে বকবকম! আমরা সব দাসীবাঁদী আর উনি প্রেম করা বউ বলে প্রেমের নুরজাহান!'

শুভো সত্যি কথাই বললে, 'কেউ মারেনি তো মাইমা, ও এইটার ওপর উঠতে পারছিল না বলে কাঁদছিল।'

'তবে? শুনলে? না জেনেশুনে সব সময় আমার ছেলের নামে দোষ! তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি ভবিষ্যতে...' রাজুর মার কথা শেষ হল না। বুলবুলির মা চোখ পাকিয়ে বললে,

'ভয় দেখাচ্ছো নাকি? এখন না হয় মারে নি, কাল, গত পরশু, গত তরশু, বারো মাস, তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তোমার ছেলে ঠুসঠাস কি করে? কি করে? বেশ করেছি বলেছি, একশোবার বলবোও, ক্ষমতায় কুলোয়, ক্ষেমতায় কুলোয় আমার গর্দান নিয়ে নিও।' বুলবুলির মা গমগম করে চলে গেল।

রাজুর মা অপস্রিয়মান বুলবুলির মার দিকে অপাঙ্গভঙ্গি করে বিকৃত গলায় বললেন, 'ওঃ, স্বামীও মস্তান বউও মস্তান!' এতক্ষণে তাঁর ছেলের দিকে নজর পড়ল। ছেলে মার অপেক্ষায় চিৎ হয়ে মেঝেতে পড়ে পড়ে আরশোলার মত হাত পা ছুঁড়ছে।

'চল রে রাজু, চল, কোথায় লেগেছে? আহা বাছারে, মেরে মেরেই ছেলেটাকে শেষ করে দিলে!' রাজু শুয়ে শুয়েই বললে, 'বিজু তালা, ওই যে বিজু তালা।'

'ছিঃ বাবা তালা বলতে নেই, ছিঃ তুমি কত সভ্য ছেলে! কেন মেরেছে বাবা? তুমি কি করেছিলে মানিক? কি হয়েছিল রে শুভো?' আবার প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য তলব। শুভো বললে,

'রাজু ওইটার ওপর বসতে যাচ্ছিল, বিজু বললে, এটা আমাদের জিনিস, ধাক্কা মেরে রাজুকে ফেলে দিয়েছে, দেয়ালে মাথা ঠুকে গেল আলু!'

'হ্যাঁ ওর জিনিস! ওর বাবা কিনে এনেছে কিনা? নেপো বেটা!' রাজুর মার কথা শেষ হল না, বিজুর মা বাড়ির মেজো গিন্নি শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে প্রায় গড়িয়ে গড়িয়ে ঘটনাস্থলে প্রবেশ করলেন। ইদানীং খুব মোটা হয়ে যাবার ফলে বেঁটেখাটো মানুষটির চলনে একটু গড়িয়ে যাবার ধরন এসেছে। গলাটি চি শার্পে বাঁধা। কথা বলেন দ্রুত। অনেকটা স্টেনগান থেকে গুলি ছোঁড়বার বেগে।

'কি হয়েছে রে? অ্যাঁ কি হয়েছে, কি হয়েছে?'

'মেরেছে!' বিজু আবার বৃষ্টির মত কাঁদতে শুরু করল।

'কে মেরেছে, মেরেছে কে, কে মেরেছে, অ্যাঁ, কে মেরেছে, মেরেছে কে?'

মেজো গিন্নী অনেক অপরাধীর মধ্যে থেকে আসল অপরাধী হাটিকে পাটকে কাঠি খোঁচা করে বের করতে চাইছেন।

'কাকিমা, কাকি ম্যা অ্যা।' বিজু মাকে সাহায্য করল।

'মেরেছো কেন, অ্যা মেরেছো কেন, মেরেছো কেন, মেরেছো কেন?'

'মারবো না কেন? আর একটু হলে রাজুটার মাথা ফেটে যাচ্ছিল! তোর যত আক্রোশ এই ছেলেটার ওপর তাই না, গুন্ডা শয়তান।' শেষের কথা ক'টা রাজুর মা বিজুকে উদ্দেশ্য করে বললেন।

'ছেলের ছেলের মারামারি তুমি দামড়ী তার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়লে কেন! আমি সব সময় দেখি বিজুকে মারার জন্যে তোমার হাত যেন উঠেই আছে। ছেলে কি আমার বে-ওয়ারিশ মাল! বললেই পারতে, বললেই পারতে, আমাকে বললেই পারতে। অ্যায় শুভো কি হয়েছিল রে?' আবার শুভোর সাক্ষ্য। শুভো বললে, 'বিজু আমাদের তোমার ঘরের টিন থেকে একটা করে কমলাভোগ তুলে নিতে বললে, আমরা নিলুম, তারপর এখানে এসে বিজু ওইটার চেপে বসল। আমরা বসতে গেলুম, বললে আমার বাবার জিনিস, তোরা কেউ উঠবি না। রাজু তাও উঠতে গেল, বিজু এই রকম করে বুকে ধাক্কা মেরে ওই অতদূরে ছিটকে ফেলে দিলে, ওর মিষ্টিটা পড়ে গেল, বুলবুলি তার ওপর পেচ্ছাপ করে দিলে, তারপর সেজো মাইমা এসে বিজুর চুল ধরে এই রকম, এই রকম করে...' শুভো বিজুর চুল ধরে সেজোমাইমার একটু আগের কেরামতিটা হাতে কলমে করে দেখাতে চাইল। হাত বাড়িয়েওছিল, মেজমাইমা এক ঝাপটায় শুভোর হাত সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'থাক থাক দেখাতে হবে না, ছেলের বদলে মা এসেছেন এইটুকু দুধের বাচ্চার সঙ্গে লড়তে, লজ্জাও করে না খ্যাংরা কাঠির মাথায় আলুর্দম।' মেজো সাক্ষীকে ঝাপটা মেরে সরিয়ে দিয়ে তাঁর বিখ্যাত আনুনাসিক গলাকে একেবারে সপ্তমে নিয়ে গিয়ে বসের একটা রেখা ওপর থেকে খাদের দিকে টেনে আনলেন,

'ওরে শয়তান, ওরে শয়তান, উরে শয়তান', শয়তানের ঢেউ খেলে গেল। মেজো কি করতে চাইছেন বোঝার আগেই, মেজোর থামের মত মোটা মোটা হাতের একটা বজ্র চুলের দিকে এগিয়ে গেল। সেজো সেলুনওলাদের মত বিজুর চুলে একটু বম্বা চাক করেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। মেজো কিন্তু তা করলেন না, চুল সমেত মাথাটাকে ঝড়ে নারকেলগাছ নাড়ানোর মত করে সামনে পেছনে ডাইনে বামে খেলাতে লাগলেন। মেজো যদি মা কালী হতেন বিজুর মাথাটা ধড় থেকে খুলে হাতেই চলে আসত। তখন ভক্তের দল পায়ের তলায় বসে স্তব পাঠ করত, সর্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে, নৃমুণ্ডমালিনী, অসুর মুণ্ড খণ্ড খণ্ড ইত্যাদি।

মার হঠাৎ আক্রমণে বিজুও হতভম্ব, সেজো গিন্নীও হতভম্ব। হাওয়া কোন দিকে বইছে কে জানে! বিজু প্রথমটায় কাঁদতেই ভুলে গেল। এই সব পরিস্থিতিতে মার স্বরযন্ত্র ব্রজ ভেদ করে থাকে। সেজো ভাবলেন মেজো বোধ হয় রাজুকে মারার শাস্তি দিচ্ছেন, তাই আর একটু উসকে দেবার জন্যে বললেন, 'কম শয়তান, শয়তানী দিন দিন বেড়েই চলেছে। সকাল আটটা থেকেই আজ শুরু করেছে।' আটটার পরে হলে যেন ব্যাপারটা তবু সহ্য করা যেত। সেজোর উল্লাস কিন্তু স্থায়ী হল না। বিজুর চুল পাকড়ানো মেজোর হাত থেমে গেল, ঘাড় ঘুরিয়ে সেজোকে বললেন, 'তুমি আর মুখ নেড়ো না শুঁটকি। এ শয়তান সে শয়তান নয়। এ শয়তান, অন্য শয়তান।' মেজো আবার ছেলের মাথা ঝাঁকাতে শুরু করলেন, 'ওরে হতচ্ছাড়া ওরে, ওরে, ওরে'। মেজোর ওরে যখন বিষ্ণুর চক্রের মত চারিদিকে ফরফর করে ঘুরছে, বিজুর গলা যখন আগের রাতের ফাটা সানাইয়ের মত পোঁ ধরে মার ওরের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে, ঘটনাস্থলে এলেন মেজকর্তা। পরনে বাটিকের কাজ করা মাদ্রাজী লুঙ্গি। দেখলে মনে হবে স্ত্রীর শাড়ি দুপাট করে পরেছেন। গায়ে ছত্রিশ মাপের পারফোরেটেড গোল-গলা হাতাওলা গেঞ্জি। বাঁ হাতে প্লাস্টিকের নস্যির ডিবে আর রুমাল। নাক মুছে মুছে রুমালের আদি রঙ বোঝার উপায় নেই। স্নাফ কলার হয়ে গেছে। বারান্দায় আসার আগেই হাতে বোধ হয় একটা টিপ নেওয়া ছিল। বারান্দায় পা দিয়েই নাকটাকে সামনের দিকে অল্প একটু ঝুঁকিয়ে বাঁ হাত দিয়ে নাকের গোড়াটা দু আঙুলে ধরে বেশ খেলিয়ে খেলিয়ে নস্যির টিপটা নাকের দুটো ফুটোর গুঁজে দিলেন। ফোঁ ফোঁ করে শব্দ হল। তবে শব্দটা অন্য সময়ের মত তেমন খেলতে পারল না—ছেলে আর স্ত্রীর কোরাসে চাপা পড়ে গেল। নস্যি নেওয়া আঙুলের অবশিষ্টাংশ অভ্যাস মত লুঙ্গিতে মুছে ঈষৎ আরক্ত চোখে বারান্দায় ঘটমান বর্তমানটাকে একবার ভাল করে দেখে নিলেন। মেজকর্তার চোখের দৃষ্টি বেশ ধারালো। যাঁরা চোখ দেখে মানুষ চেনেন তাঁরা বলবেন ধূর্তের চোখ। যে কোনো চাল চালায় মেজকর্তা ওস্তাদ। দাবা অসম্ভব ভাল খেলেন। যৌবনে ফুটবলে নাম ছিল। ছিটকে গোলে তাঁর জুড়ি ছিল না। নস্যি নেবার পর চোখ এমনিই একটু লাল হয়, এখন আর একটু বেশি দেখাচ্ছে কারণ রাত্রি জাগরণ। সারা রাত ছেঁচড়া নেড়েছেন, রস জ্বাল দিয়েছেন, হিসাবের মাল হুঁয়া করেছেন, মানে নিজের ঘরে সরিয়েছেন।

মেজোকর্তা আবার স্ত্রী ছাড়া বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না। লোনলি ফিল করেন। পাশে সব সময় শক্তি না থাকলে শক্তিহীন বোধ করেন। স্ত্রীর হাঁকাহাঁকি শুনে বারান্দায় ছুটে এসেছেন। কর্তা নাকে রুমাল ঘষতে ঘষতে নাকবোজা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল কি, কি হল কি, মারছো কেন?' গলায় কর্কশতা শুনে মনে হতে পারে স্ত্রীকে বোধ হয় শাসন করতে এসেছেন। হয়তো বলবেন, ছোটদের অত মারধোর করা ঠিক নয়, কিংবা মেয়েছেলের বিশেষত বাড়ির বউদের অত দজ্জাল গলা ভাল নয়। তা কিন্তু নয়। এঁরা দুজন হলেন আদর্শ দম্পতি। স্ত্রীর সমস্ত কাজেই কর্তার সমর্থন, কর্তার সমস্ত কাজে গিন্নীর সমর্থন। কর্তা যদি বিজুকে ঠেঙাতে চান গিন্নী চিরুনি এগিয়ে দেন। কর্তা আবার মেয়েদের চিরুনির পেছন দিকটা দিয়ে প্রহার করতে না পারলে খোলসা বোধ করেন না। আবার গিন্নী যখন বিজুকে পেটাবেন কর্তা তখন ফুল ঝাড়ু এগিয়ে দেন। গিন্নী এই ব্যাপারে ফুলঝাড়ুর পেছনটাই বেশি পছন্দ করেন।

মেজোকর্তাই বাড়ির বড় কর্তা। বড় ভাই অনেক আগেই মারা গেছেন। সম্মানীয় ব্যক্তি। সেজোগিন্নী জড়োসড়ো হয়ে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মেজ ঠাকুরকে সামনে যাবার পথ করে দিলেন। খুব একটা চওড়া বারান্দা নয়। সোফা-কাম-বেড অনেকটা জায়গা দখল করেছে। তা ছাড়া দেওয়াল ঠেসে দাঁড় করানো রয়েছে একটা সাইকেল। সেজোকে পাশ কাটিয়ে মেজোকর্তা এগিয়ে এসে বিজুর একটা কান ধরে মুখটাকে টেনে ওপর দিকে তোলার চেষ্টা করতে করতে ধমকাতে লাগলেন, 'চোপ, চোপ, চোপ, চোপ।' কর্তা যখন কান ধরেছেন গিন্নীর এখন বিশ্রাম। কর্তা আর নতুন করে জানতে চাইলেন না, কি হয়েছে? তাঁর ধারণা স্ত্রী যখন ঠেঙাতে শুরু করেছেন তখন বিজু নিশ্চয় অপরাধী, সুতরাং সহধর্মিণীর ধর্মের অংশীদার হয়ে যাই।

মেজোগিন্নী, হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'ছাল ছাড়াও ছাল ছাড়াও, খটাখট, গাঁটে মার, গাঁটে গাঁটে মার। শয়তানটা লুকোনো কমলাভোগের সন্ধান পেয়েছে। চুরি করে খেয়েছে। সব্বাইকে জানিয়ে দিয়েছে। টিন খালি করে দিয়েছে। লুট হয়ে গেছে। উরে, উরে, উরে। এর জ্বালায় কিছু রাখার উপায় নেই রে!'

মেজোগিন্নীর মর্মভেদী 'উরে, উরে' শব্দ দূর থেকে শুনলে মনে হবে গায়ে বুঝি এক ডেকচি ফুটন্ত গরম জল পড়ে গেছে। মেজকর্তা বড় বিপদে পড়ে গেলেন। ইদানীং স্ত্রী বড় মোটা হয়ে গেছেন। প্রেসার হাই। কমলাভোগের শোকে স্ট্রোক না হয়ে যায়। মেজকর্তা বারেবারে বলতে লাগলেন, 'আহা তুমি চুপ কর, আহা তুমি চুপ কর, কটা খেয়েছে, কটা খেয়েছিস রাসকেল।'

সেজো গিন্নী ছেলেকে কোলে নিয়ে আস্তে আস্তে পেছন থেকে সরে পড়লেন।

॥ ৩ ॥

সেজোকর্তার সংসার যত বড় হচ্ছে, শরীর যত খারাপ হচ্ছে, ধর্মকর্মও তত বাড়ছে। ঘরের চারটে দেওয়াল নানা দেব-দেবী আর মহাপুরুষের ছবিতে ভরে গেছে। বেশির ভাগ ক্যালেন্ডার, কিছু ফ্রেমে বাঁধানো। ঘরের জানলা ঘেঁষে একটা প্রমাণ মাপের খাট। খাটে গা লাগিয়ে একটা চৌকি। চৌকির সঙ্গে জোড়া লাগানো একটা বেন্‌চি। সংসার শুরু হয়েছিল খাটে। বাড়তে বাড়তে বেনচিতে এসে ঠেকেছে। দুপাশে ছড়ানো বেতআঁটা একসেট সোফা। মাঝে রুমালের মত লাল চৌকো মেঝে। সেজোকর্তা মেঝেতে সকালের পুজোয় বসেছেন। সামনে একটা গঙ্গাজলের ছোটো তামার ঘটি। বহুকাল না মাজার ফলে সীসার মত চেহারা হয়েছে। খাটের ওপর রবার ক্লথে চিৎ হয়ে বছরখানেকের একটা শিশু ঘুমোচ্ছে। ফনফন করে পাখা ঘুরছে। খাটের ছত্রিতে সারি সারি মুতেভেজা কাঁথা হাওয়া খাচ্ছে।

সেজোগিন্নী দুম করে রাজুকে বাপের পাশে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'আদিখ্যেতা! বারোটা বছর চোখ বুজিয়েই কাটিয়ে দিলেন। এদিকে মেজোর

ভারতের সর্বাধিক বিক্রীত রেকর্ড প্লেয়ারটির দিকে তাকিয়ে দেখুন !

এখন মাত্র ৪২৫ টাকায়

এইচ এম ভি

ফিয়েস্টা পপুলার

GC 9334

দেখতে দারুণ

এইচ এম ভি ফিয়েস্টা পপুলার মজবুত ও টেকসই। তাছাড়া ভারি সুন্দর এর দুরঙা ক্যাবিনেট। নয়নাভিরাম বসার ঘরে বেশ চমৎকার মানায়।

এখন মনোরম বাহারী কার্টনে পাওয়া যাচ্ছে। যে কোন উপলক্ষেই এটি একটি সেরা উপহার।

কাজে অতুলনীয়

এর বিল্ট-ইন অ্যাম্প্লিফায়ার ধ্বনির গুণ-মান নির্ভুত রাখে। একটি জোরদার লিড-মাউন্টেড স্পীকার, আপনার সুবিধা মত যে কোনো দিকে বসিয়ে আরো ভালভাবে শোনা যায়। এর হাল্কা টোন আর্ম, স্টাইলাস ও রেকর্ডের ক্ষয়ক্ষতি হতে দেয় না।

দাম সত্যিই কম

উৎপাদন বেশি হওয়ায় তৈরি করার খরচ যায় কমে। সেই সুবিধাই আমরা আপনাদের দিচ্ছি। বহু জিনিসের দাম বেড়ে চলেছে। কিন্তু আমরা বেশি উৎপাদন করছি বলে আপনাকে ব্যয় করতে হচ্ছে কম !

ফিয়েস্টা ২,০০,০০০ এরও বেশি ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করেছে

আজই এইচ এম ভি ডিলারের সঙ্গে দেখা করুন

কোলেই সব খেলো।' রাজু মেঝেতে বসেই একটা পা ছুঁড়ে থাঁত থাঁত করে কেঁদে উঠল। পা লেগে গঙ্গাজলের ছোটো ঘটিটা উল্টে একফালি জল সাপের মত এঁকেবেঁকে খাটের তলায় ঢুকে গেল। ওখানে আছে সেজোগিন্নীর হারমোনিয়াম। বিয়ের আগে সংগীতের চর্চা ছিল। বিয়ের পর বছরখানেক ছিল। এখন ন'মাসে ছ'মাসে একবার। সেজোগিন্নী হাঁ হাঁ করে খাটের দিকে ছুটলেন। হারমোনিয়ামে জল ঢুকে যাবে। ছত্রির ধার থেকে একটা কাঁথা টেনে নিয়ে হামা দিয়ে খাটের তলায় ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'হারামজাদা ছেলে! বিজু ধরে ধরে মারে বেশ করে।' রাজু তখন আর একবার পা ছুঁড়ে তামার ঘটিটাকে খাটের তলায় পাঠিয়ে দিল। না আর সহ্য করা যায় না। সেজোগিন্নী হামা দিয়ে ব্যাক করে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে এসেই রাজুর পিঠে দুই দুই করে খান দশেক কিল বসিয়ে দিলেন। রাজু মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল। চিৎকারে ঘর ফেটে যাবার উপক্রম।

সেজোকর্তা এতক্ষণে চোখ খুললেন। ধ্যান ভঙ্গ হল। রাজুর চিৎকারে খাটের ঘুমন্ত বাচ্চাটাও জেগে উঠে চেঁচাতে শুরু করল। সেজোগিন্নী, 'উরে বাবারে' বলে একটা বুকফাটা চিৎকার করে বাচ্চাটার পাশে কাত হয়ে শুয়ে দুধ খাওয়াতে আর অঁর, অঁর করে থাবড়াতে থাবড়াতে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে রাজুকে শাসানি, 'চুপ কর, চুপ কর, ভাই যদি উঠে পড়ে রাজু তোকে আস্ত রাখবো না, চেলা করে উনুনে ফেলে দেবো।' সেজোগিন্নী লম্বা মানুষ। রোগারোগা দুটো পা খাটের একদিকে ঝুলছে।

সেজোকর্তা নির্বিকার। এই সব চিৎকার চেঁচামেচিতে এতই অভ্যস্ত, ...কের কাছে ভুরুটাও বিরক্তিতে কোঁচকায় না। শরীরে রাগ নেই বললেই চলে। ছ'টা বড় রিপুর দুটো প্রায় জয় করে ফেলেছেন, ক্রোধ আর লোভ। লোভ জয়ের ফলে ব্যাঙ্কের পাশ বইটা দেখলে এই বাজারেও আনন্দ হয়। সংসারে বাজারের দায়িত্বটা তাঁর। মাছ এনে যখন রান্নাঘরে ফেলেন বউরা তখন একটু ব্লিচিং পাউডারের অভাব বোধ করেন।

সেজোকর্তা স্ত্রীর ছড়ানো ঠ্যাঙের তলা দিয়ে খাটের তলায় সাষ্টাঙ্গ হলেন তামার ঘটি উদ্ধারে। ঘটি হাতে বেরিয়ে এসে রাজুকে বললেন, 'কি হয়েছে রে?' রাজু শুয়ে শুয়েই বললে, 'বিজু মেরেছে।' সেজোকর্তা এখন দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে সমস্ত ছবিতে প্রণাম করবেন। এক একটা ছবিতে কপাল ঠেকাচ্ছেন আর বলছেন, 'ও কিছু না।' প্রায় চল্লিশবার 'ও কিছু না' বলা হয়েছে। সেজোগিন্নী বাচ্চার মুখ থেকে দুধ ছাড়িয়ে ঝাঁ করে ঘুরে খাট থেকে নেমে খাঁকিয়ে উঠলেন, 'ও কিছু না কি? মেজো ভেবেছে কি শুনি? বিজু কি এ বাড়ির লাট?' কেন রাজুকে সোফা-কাম-বেডের ওপর উঠতে দেয়নি? ওটা কি ওর বাপের সম্পত্তি! কেন মেজগিন্নী আমাকে দামড়ী, শুঁটকি বলেছে? কেন সমস্ত কমলাভোগ মেজর ঘরে গিয়ে ঢুকেছে? কেন, কেন, শুনি?'

সেজকর্তার নমস্কার তখনো শেষ হয়নি। নমস্কার করতে করতে সমস্ত প্রশ্নবাণের তিনি এক উত্তর দিয়ে চলেছেন, 'তাতে কি হয়েছে? তাতে কি হয়েছে?'

'তাতে কি হয়েছে? তোমার কিছু হয়নি আমার অনেক কিছু হয়েছে। আমি আর সহ্য করব না। বাড়িটা একা মেজোর তাই না? উনি তাই মনে করেন, এবার মনে করিয়ে দেবো। আঁচলে ভাঁড়ারের চাবি বেঁধে গিন্নীপনা ঘুচিয়ে দেবো। ...শুলো। কমলাভোগ বেঁচেছে ওঁদের, কর্তা-গিন্নীর একা খাবার জন্যে! সোফা-কাম-বেডটা ছোট ঠাকুরপোর বিয়েতে দিয়েছে একা ওনার ছেলে নাচবার জন্যে!' সেজোগিন্নীর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল রাজুর ওপর, 'পারিস না, পারিস না হাঁদা ...লে বিজুর সঙ্গে পারিস না! না, যেমন বাপ তেমনি ছেলে! কেবলাকান্ত ...ভোদাস।'

সেজোকর্তা ভিজে গামছা পরে পুজোয় বসেছিলেন। গামছা ছেড়ে পাজামা ...তে পরতে রাজুকে বললেন, 'চল, তোকে আমি সোফা-কাম-বেডে বসিয়ে নিয়ে আসছি। দেখবি কি সুন্দর লাগবে। এমনি এমনি করে নাচবে।' সেজোকর্তা ...সে উঠে নাচটা ছেলেকে দেখালেন। গিন্নী বললেন—সং! কর্তা ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, তিনি যেন ঘটা করে বিদেশ ...ন যাচ্ছেন। হঠাৎ সেজোগিন্নী রায় দিলেন, 'ওটা আমাদের ঘরে থাকবে।'

'কোনটা?'

'ওই সোফা-কাম-বেডটা।'

'কেন?'

'ওটা তো তোমার কথাতেই মেরে পাক দিয়েছে। তুমিই তো বলেছিলে বাড়িতে ...ই আছে ওইটারই অভাব। তোমারই যোগাযোগে বিয়ে, পাওনা। ছোট ঠাকুরপোর ছোটো ঘরে ও জিনিস ঢুকবে না, মেজ দখলের তালে আছে। ওটা আমাদের ঘরেই থাকবে। বাড়িতে যখন আলাদা বৈঠকখানা নেই, আমরাই মালিক। চৌকিটা ...র করে দিয়ে ওই জানলার ধারে পাতবো, তুমি শোবে, আমি দুটোকে নিয়ে ...টে।'

সেজকর্তা ভালমানুষের মত মুখ করে বললেন, 'আর একটা আসছে যে! তখন ...া আবার চৌকি চাই।'

সেজোগিন্নী মরিয়া হয়ে বললেন, 'আসছে আসুক, সে এখনো অনেক দেরি, ...ে তো তিন মাস।' কর্তার আর কথা বাড়াতে ইচ্ছে হল না, ছেলে কোলে ঘরের ...িরে চলে এলেন।

পুবের বারান্দায় এসে সেজোকর্তা দেখলেন, ফাঁকা বারান্দা। সকালের ঝকঝকে রোদ হামাগুড়ি দিচ্ছে। একপাশে একটা সাইকেল দেওয়ালে ঠেসানো। আধখানা কমলাভোগ মেঝেতে পড়ে আছে। একসার ডেয়ো পিঁপড়ে লাইন দিয়ে ...ড় এসেছে। সেজোকর্তা ছেলেকে বললেন, 'যাঃ পালিয়েছে।' ছেলে বললে, ...ে বাবা?' বাবা বললেন, 'অন্দর চলে গেছে। আর বর্গীর কোথায়! এবার বর্গীর কোথায়!' ছেলের ততক্ষণে কমলাভোগের টুকরোটার ওপর নজর পড়েছে। থাঁত থাঁত করে উঠল, 'মিস্তি খাবো, ও বাবা মিস্তি খাবো।' সেজোকর্তা ছেলেকে বললেন, 'খাবি, খাবি।'

লম্বা করিডর দিয়ে নিজের ঘরের দিকে ফিরতে ফিরতে সেজোকর্তা মেজোর ঘরের সামনে এসে শুনতে পেল, কর্তা গিন্নীতে কথা হচ্ছে। গিন্নী বলছেন, 'এর একটা কভার করতে হবে কি বল?' কর্তা বলছেন, দাঁড়াও দখলি স্বত্বটা আগে জন্মাক তা না হলে কাপড়ের দামটাই লস। আজকাল কাপড়ের অনেক দাম গো!' গিন্নী বললেন, 'একবার যখন ঘরে ঢোকাতে পেরেছি বের করবে কোন শালা।' কর্তা একটু তারিফের হাসি হাসলেন।

সেজো, ছেলে কোলে নিজের ঘরে ঢুকলেন। এইবার একটু রাগ হচ্ছে। জিনিসটা কাল যখন ছোটোর ঘরে ঢুকলো না তখন সেজো ভেবেছিলেন কাজের হাঙ্গামা চুকে গেলে মার ঘরে ওটাকে রাখবেন। মার ঘরটা কমন-রুমের মত জায়গাও আছে, মাঝে মাঝে পালা করে সবাই গিয়ে শুয়ে বসে আসবে। জামাইরা মাঝে মধ্যে এলে শুতেও পারবে। ভাবনাটা আর কাজে করা গেল না। মেজ তার আগেই নেপো হয়ে দই মেরে দিয়েছে। বউ ঠিকই বলেছে। থাকতে হলে তার ঘরেই থাকা উচিত। মেয়েপক্ষের সঙ্গে কম ঝুলোঝুলি করে আদায় করতে হয়েছে! মেয়ের একটু চাপা নাকের জন্যে পাত্রীপক্ষের এই গুনাগার। চাপা রঙের জন্যে পণের টাকা আরো হাজার বাড়িয়েছে। খাটো উচ্চতার জন্যে স্টিলকেবিনেটের একপাশে পাল্লার আয়না হয়েছে। একটু মোটা বলে এক ভরি সোনা বেড়েছে। বাঃ মেজো। সেজো হতাশ হয়ে শুয়ে পড়লেন। রাজু বুকের ওপর চেপে বসল। অনেকটা পেপার ওয়েট দিয়ে কাগজ চেপে রাখার মত অবস্থা। অফিস সহকর্মীর ভাইঝির সঙ্গে প্রায় জোর করেই ছোটো ভাইয়ের বিয়ে দিয়েছে। বিয়ের রাত থেকেই কানাঘুষো শুনছে ছোটোর বউ পছন্দ হয়নি। সেজো গলাটা বিকৃত করে নিজে নিজেই বললে, 'বউ পছন্দ হয়নি!' রাজু অবাক হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকাল। তার ডান পাটা ধীরে ধীরে ঘুমন্ত ভাইকে খোঁচা মারার জন্যে এগোচ্ছিল। সেজোকর্তা খপ করে পাটা চেপে ধরলেন। এক্ষুণি কেঁদে উঠলে দুটোকেই ঘাড়ে করে ঘুরতে হবে।

সেজো ভাবতে থাকলেন, জয়েন্ট ফ্যামিলিতে ফ্যানসি বউ রাখতে পারবি হতভাগা। নিজের বউকে পেরেছি। কি সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল, পাঞ্জাবী মেয়েদের মত লম্বা চওড়া। এখন একবারে কাঠামো বেরিয়ে পড়েছে! তাই না মেজো বলতে পারছে শুঁটকি। ওরে বউ হল লালন পালনের জিনিস। হর্টিকালচারের মত কালচার করতে হয়, সার দিতে হয়, বোনমিল ছড়াতে হয়, গোড়া খুঁড়ে দিতে হয়, একটিমাত্র কুঁড়ি রেখে সব ছিঁড়ে ফেলতে হয়। তবেই না গোড়া! বউ হল ফার্নিচারের মত। বছর বছর পালিশ চাই। বাহারি কভার চাই। ভাল ভাল শাড়ি চাই। ঝাড়পোঁছ চাই। বউ পছন্দ হয়নি সেজদা! সেজদা কি করবে শুনি! সেজকর্তা এতই হতাশ যে, সেজ গিন্নী পাশে বাসী লুচি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সে খেয়ালই নেই।

॥ ৪ ॥

মেজোকর্তা যেমন কর্মিতকর্মা, মেজোগিন্নী তেমনি ধুরন্ধর। তককে তককে ছিলেন কখন ওঠে ছোটো ঠাকুরপো! রান্নাঘরের পাশে বাড়ির উত্তর অংশে ঘুপচি মত ছোটো একটা ঘর ছোটো ঠাকুরপোর নবীন জীবনের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আলোও নেই বাতাসও নেই। ভালই হয়েছে, কর্তা কালো গিন্নী শ্যাম। এই আধো আলো ঘরে কয়েক মাস থাকলেই রং ফর্সা হয়ে যাবে। ছেলেমেয়েরা তো ফর্সা হবেই, ইট চাপা ঘাস যেমন হয় আর কি!

মেজো গিন্নী ইতিমধ্যেই বারকতক ঘরের বাইরে উসখুস করে গেছেন। সারা রাত জেগে ভোরের দিকে ঘুমিয়েছে। ভোরের ঘুম সহজে ভাঙে! নতুন বউ টকটকে লাল শাড়ি পরে চা করতে বসেছে। মেজোর রাজনীতিটা খারাপ নয়। আগেভাগেই ছোট ঠাকুরপোকে বলা, 'বাইরের বারান্দায় পড়ে পড়ে নষ্ট হওয়ার চেয়ে জিনিসটা ঘর পেয়েছে, আশ্রয় পেয়েছে, যত্নআত্তি পাবে, পরিচর্যা পাবে, তুমিও নির্ভাবনায় থাকবে। দোতলা তুলতে পার বড় ঘর পাবে তখন নিজের জিনিস নিজের ঘরে পেতে স্বামী-স্ত্রীতে পাশাপাশি পার্কের বেঞ্চিতে বসে থাকার মত বসে থাকবে!' মেজো জানে সাত মণ তেলও পুড়বে না রাধাও নাচবে না। যা মাইনে পাও সংসার চালিয়ে দোতলা আর করতে হচ্ছে না। অতএব কেয়া মজা বগল বাজা, বগল বাজা। জিনিসটা আমারই হয়ে গেল। মোটা মেজোগিন্নীর ভেতরটা আনন্দে জলভরা বেলুনের মত থলথল ধড়ফড় করে উঠল।

নতুন বউকে মেজগিন্নী তাড়া লাগাচ্ছেন, 'যাও ডেকে তোলো, চাটা খাবে তো! এদিকে যে ভাত খাবার সময় হয়ে এল।' তাঁর আর তর সইছে না যেন। ব্যাপারটার আগেভাগে ফয়সালা হয়ে গেলে নিশ্চিন্তে অন্য ব্যাপারে মাথা ঘামানো যায়। অতগুলো শাড়ি কাল রাতে প্রেজেন্টেশান পেয়েছে তার খানকতকের জন্যে মনটা বড় আঁকুপাঁকু করছে। ঝঞ্জাট কি একটা! সংসারের চারদিকে এত প্রলোভন!

নতুন বউ বলছেন, 'না বাবা! আমি ডাকতেটাকতে পারবো না। নিজে থেকে যখন উঠবে তখন উঠবে, চা খাবে।' নতুন বউ চা ছাঁকছেন। মেজোগিন্নী রান্নাঘর থেকে আর একবার মুখ বাড়ালেন। পাশের ঘরেই তো মালিক শুয়ে আছেন। ভাগ্য ভালই বলতে হবে। ছোটো ভাই বেরোবার জন্যে দরজার পর্দা উঁচু করছেন। দুপাট করে পরা দিশী কাপড়ের ঝকঝকে পাড় পর্দার তলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। 'বাবু উঠেছেন', মেজো উবু হয়ে বসেছিলেন তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে একটু টাল খেলেন, হাত লেগে একটা কাপ ঠ্যানানঠ্যান করে ছিটকে কাত হয়ে পড়ল।

বেঁটে খাটো মেজবউদি হাসি হাসি মুখে লম্বা ছোটো ঠাকুরপোর ঘুম ভাঙা ফোলা ফোলা মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি গো ঘুম ভাঙলো।' হাসি হাসি মুখ দেখলে স্নেহময়ী জননী বলে ভুল হতে পারে। প্রশ্নটা ঠাকুরপোর তেমন

জীবনের সেরা মুহূর্তগুলির জন্যে
সেরা ফ্যাব্রিকস্
পরবার জন্যে
যা আপনি সর্বদাই
পছন্দ করেন

ব্রিটানিয়া দুধ বিস্কুট

বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!

সুস্বাদু, পুষ্টিকর
ব্রিটানিয়া গ্ল্যাক্সো বিস্কুট

ব্রিটানিয়া

ব্রিটানিয়া বিস্কুট সবচেয়ে সেরা
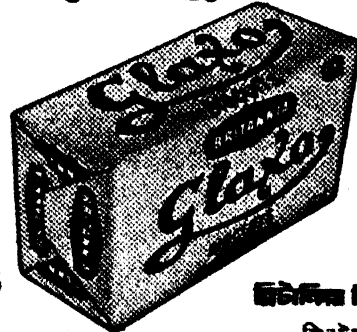
লিনটাস-BBC.GLX.36-203 BG

প্রেম নেই

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ ২৭ ॥
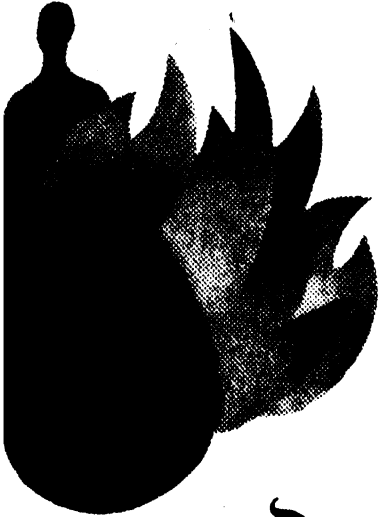
বিলকিস তার সঙ্গে যাবার জন্য যে শেষ পর্যন্ত এমন গোঁ ধরে বসবে, ফটিক তা বুঝতে পারেনি। সে রীতিমত বিপাকে হয়ে উঠল। সে কি কম বোঝাবার চেষ্টা করেছে! কিন্তু বিলকিসের মুখে এক কথা। আমারেও সঙ্গে নিয়ে যান। আপনাদের ছাড়ে আমি থাকতি পারব না। প্রথম দিকে বিলকিসের মুখে এই ধরনের কথা ফটিকের কানে মধু বর্ষণ করছিল। সে ছবিকে কাছে টেনে নিচ্ছিল। আর সোহাগে সোহাগে তাকে অস্থির করে তুলছিল। রাত কত হবে এখন।

ফটিক এবং ছবির মনের দরজা এখন হাট হয়ে খোলা। ফটিক অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। তার দারিদ্র্যের কথা, তার আশঙ্কার কথা, তার ভবিষ্যৎ স্বপ্নের কথা, সবই সে বলেছে বিলকিসকে। এমন শ্রোতা আর পায়নি ফটিক। কাউকে এমন করে বলতেও ইচ্ছে হয়নি।

"ভাবছি ওকালতির আশা ছেড়েই দেব," ফটিক হতাশ হয়ে বলল।

"ক্যান্ উকালতির আশা ছাড়ে দেবেন, এ কথা কতিছেন ক্যান?"

"টাকা লাগে জানো? ওকালতি তো গ্রামে থেকে করা যায় না। শহরে যেতে হয়। সেখানে বাসা নিতে হয়। খরচ আছে না! তারপর ধর, পসার জমানো। সে কি আর এক আধদিনের কাজ? কাজেই বুঝতে পারছ, আমার মত যারা গরিব, তাদের দিয়ে ওকালতি হয় না।"

ছবি বলল, "খুব হয়।"

ফটিক হাসল। ছেলেমানুষ। ছবির মুখটাকে সে অন্ধকারে ঠাহর করে নিল। তারপর ওর ছুঁচ্ঠোঁটের উপর অত্যন্ত যত্নে আঙুল বুলিয়ে দিল। কী মোলায়েম রোমের গুচ্ছ দিয়ে ছবির ছুঁচ্ ঠোঁট দুটো তৈরি। ফটিক উপস্থিত এক চিত্রকর। নিপুণ চিত্রকার অথবা। যার আঙুলের ডগায় নকশার প্রতিমার মুখের ছিরিছাঁদ ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। ফটিক তার বুড়ো আঙুল দিয়ে নিখুঁতভাবে সেই অন্ধকারেও আবার ছবির ছুঁচ্ ঠোঁট দুটো টেনে দিল। সেই যেন আঁকল।

"খুব হয়।" ফটিক হাসল। "তুমি কী করে জানলে?"

ছুঁচ্ থেকে ফটিকের আঙুল নেমে এল ছবির নাকে। ফটিক এবার সযত্নে তার নাক এঁকে দিচ্ছে।

বিলকিস দৃঢ়স্বরে বলল, "আপনি উকিল হবেন।"

ফটিকের আঙুল বিলকিসের নাকের মাঝ বরাবর এসে থমকে গেল।

"আমি উকিল হব!" ছবির গলার স্বরে একটা পরিণত আত্মবিশ্বাস ফটিককে বিস্মিত করল। এবং তাকে যেন জাগিয়ে দিল। "আমি উকিল হব?"

"জে।" ছবি যেন অবুঝ আবদার করছে। "আপনি উকিল হবেন।" কোনও সংশয় নেই ছবির সেই অন্ধকারে উচ্চারিত স্পষ্ট প্রতিবেদনে। ফটিক জানে বাস্তবের চেহারা কী? ছবি জানে না। ফটিক জানে তার নৈরাশ্যের কারণ কী। তবুও এখন ছবির এই আশাবাদ, যদিও তার ভিত কাঁচা, খুবই কাঁচা, ফটিকের ভাল লাগল। একেবারে ছেলেমানুষ। ছবিকে তার খুব ভালো লাগতে লাগল। ছবির নাকের মসৃণ ডগা বেয়ে খুব ধীরে খুবই আলতোভাবে ফটিকের পর্যটনবিলাসী সুখাবিষ্ট তর্জনী অবতরণ করল অত্যন্ত স্পর্শকাতর এক রমণীর ওষ্ঠের উপত্যকায়।

"বাইরের দুনিয়াকে তুমি জান না," ফটিক বলল, এবং "তুমি ছেলেমানুষ" এই কথাটা বলতে গিয়ে, পাছে তাকে বাধা দিয়ে ফেলে তাই বলল না। "আমাকে এখন একটা চাকরি জোগাড় করতেই হবে। না হলে চলবে না।"

বিলকিসের ওষ্ঠপুটের বাম থেকে দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে এল ফটিকের তর্জনী তারপর অধরের খাঁজ বেয়ে অনায়াসে নেমে এল নিরোম চিবুকের সুখদা সানুদেশে।

"না, আমি বাইরির দুনিয়ারে জানিনে।" বিলকিসের সাহস ক্রমেই বাড়ছে। "কিন্তু আল্লারে জানি আর আপনারে জানি। আপনার অন্য কোনো কিছু করতি হবে না। আপনি উকালতি করবেন।"

ফটিকের তর্জনী বিলকিসের চিবুকের প্রান্তে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"আমি ওকালতি করব?"

"জে।" বিলকিসের উত্তর স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত।

"অন্য কোনও কাজ করব না!"

"জে, না।"

"তাহলে খাব কী?"

"তার জন্য আপনারে ভাবতি হবে না।"

"তবে কে ভাববে?"

"আল্লাহ্। আমরা যদি আল্লার রাস্তা না ছাড়ি, তা'লি আল্লাউ আমাদের ছাড়বেন না।"

ফটিক বিলকিসের কাছ থেকে এমন একটা উত্তর আশা করেনি। সে ভেবেছিল ও ওর বাপের কথা বলবে। ছবির মুখে এমন পরিণত উক্তি সত্যিই সে আশা করেনি। সে বিস্মিত হল। এতো ঠিক ছেলেমানুষের কথা নয়। ছবিকে যতটা বালিকা বলে ভেবেছিল সে, এখন দেখল ছবি তার চেয়ে অনেক পরিণত। সে চুপ করে ভাবতে লাগল। ছবি যা বলছে সেটা বিশ্বাসের কথা। যুক্তির কথা নয়। তবুও মনের বিশেষ অবস্থায় যুক্তিবাদ যেখানে পথ দেখাতে পারে না, যেখানে তাকে দুর্বল করে তোলে, শুধুই নৈরাশ্য সৃষ্টি করে মানুষকে যেখানে নিষ্ক্রিয় করে দেয়, যেমন বর্তমানে সে, সেখানে ছবির কথা, তার ভিত্তি যদি শুধু বিশ্বাসই হয়, সে দেখল তার প্রাণে আশার সঞ্চার করছে, লড়ে যাবার প্রেরণা দিচ্ছে।

ফটিক চুপ করে রয়েছে। তার আঙুলও স্তব্ধ। ফটিক কি ভাবছে, না তার উপর রাগ করেছে? বিলকিস আস্তে করে ফটিকের দিকে এগিয়ে এল।

কাতর হয়ে বলল, "আমার উপর নারাজ হবেন না। আমি লাখাপড়া শিখিনি। আমার যা মনে হইছে আমি তাই কয়ে ফেলিছি। আমি যদি বেয়াদবি করে থাকি আমারে মাফ করবেন।"

"তোমার উপর আমি নারাজ হব কেন?" ফটিক ওকে আরেকটু কাছে টেনে নিল। "আমি বরং অবাক হয়ে ভাবছি, তোমার মনে এত জোর কোত্থেকে আসছে। জান ছবি, আজ সকালে বাড়ি গিয়ে বাজান আর আম্মাজানির অবস্থা আমাদের বাড়ির হাল দেখে বড্ড মুষড়ে পড়েছিলাম। আমরা যে কত গরিব তুমি ধারণা করতে পারবে না। আমি এতদিন পরে বাড়ি ফিরেছি, আম্মা একবারও আমার কাছে এসে বসতে পারেনি। আজ সারাদিন শুধু ধান ভেনেছে। জানো? আব্বাজান সারাদিন জ্বরে ধুঁকেছেন, তাঁর কাছে এসেও বসতে পারেনি। অবিশ্রান্ত শুধু ঢেঁকি পাড় দিয়েছে আর ঢেঁকশাল থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে দেখেছে।"

প্রহরের জমাট অন্ধকার ফটিকের হতশ্বাসে যেন আরও ঘন হয়ে উঠল। তীব্র একটা বেদনাবোধে বিলকিসের প্রাণটা হা হা করে উঠল। তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছিল। সে অতিকষ্টে নিজেকে সামলে রাখল। কেমন করে না জানি সে হু হু করে বড় হয়ে উঠল। তার নিজের থেকে বড় ফটিকের চাইতেও বড়। ফটিক সম্পর্কে তার আর কোনও ভয়ডর নেই, দ্বিধা সংকোচ নেই। সে ফটিকের মাথাটা টেনে এনে নিজের বুকে চেপে ধরল। তারপর তার চুলের ভিতরে আঙুল চালিয়ে বিলি কেটে দিতে লাগল।

"আমি না আজ সারাদিন পথ হারিয়ে যেন জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছি।" অশান্ত ফটিক যেন তার মায়ের বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে। তার মনে প্রশান্তির শীতল ছায়াটা যেন ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে। সে শান্তভাবে বলল, "তোমার কথা শুনে, বিশ্বাস করো ছবি, আমি যেন এই প্রথম একটা পথ দেখতে পাচ্ছি।"

বিলকিসের চোখ ঝপ্ করে জলে ভরে এল। কেমন একটা আনন্দ, কেমন একটা সমব্যথায় তীব্র এক মিশ্র অনুভূতিতে তার মনটা টনটন করে উঠল।

"বিশ্বাস করো, আমার যেন আবার উৎসাহ ফিরে আসছে। আমি আজ সারাদিন কী ভেবেছি জানো ওকালতি পড়তে যাওয়াটা আমার হয়ত ঠিক কাজ হয়নি। হয়ত গোঁয়ারতুমিই হয়ে গিয়েছে। হয়ত কোনও একটা চাকরি নিয়ে সংসারে কিছু টাকা দিয়ে গেলেই ঠিক হত। তোমার কী মনে হয় ছবি, তাই ভালো হত না?"

ছবির চোখের ধারা আর বাঁধ মানল না। তার পরামর্শ জিজ্ঞেস করছে ফটিক। সে পরম মমতায় ফটিকের চুলে আরও মোলায়েম হাতে বিলি কাটতে লাগল আর নিজেকে সামলাতে লাগল।

"তোমার কী মনে হয়, ছবি?"

ছবি অনেক কষ্টে শান্ত ও সহজ করে আনা গলায় বলল, "আমি কী বা বুঝি আর কীই বা জানি। আল্লার মর্জি যদি তাই হ'তো, তা'লি তিনি আপনারে চাকরি না করায়ে উকালতি পাশ দিতি পাঠালেন ক্যান?"

ফটিক এবার হাসল। তার এমন কী উত্তর জানা আছে, যা দিয়ে ছবির এই সহজ অথচ সরল প্রশ্নের মীমাংসা করা যায়? সে হাতের কাছে তেমন কিছু খুঁজে পেল না। তাই চুপ করে রইল। এবং দেখল তার মনটা ধীরে ধীরে শান্ত এবং সতেজ হয়ে উঠছে।

ফটিক আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার একটু হাসল। তারপর বিলকিসের বুক থেকে নিজের মাথাটা সরিয়ে নিল। এবার সেই বিলকিসের মাথাটা নিজের বুকে তুলে নিল। তারপর খুব হাল্কাভাবে বলল, "জানো, আজ সারা দুপুর না, কত সব আজে বাজে কথা ভেবেছি। এমন কি একবার এও ভেবেছিলাম তোমাকে শাদী করে আমি হয়ত ঠিক কাজ করিনি। আমার হাতে পড়ে, তোমার কষ্টের আর সীমা থাকবে না।"

বিলকিস একেবারে আর্তনাদ করে উঠল, "না না, দুহাই আপনার ,ও কথা কবেন না, কবেন না। আপনারে পাইছি, এ আল্লার মেহেরবাণী। আমার কোনও কষ্ট হবে না।"

বিলকিস ফটিকের বুকে মুখ ঘষতে লাগল।

ফটিক বিলকিসকে বলল, "ছবি, আমি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছিনে। যা সত্যি তাই বলছি। না-খাওয়ার কষ্ট কাকে বলে তা তুমি তো জানো না। আমার মা জানে। তাই ভাবছিলাম, আমার সঙ্গে জড়িয়ে তোমার প্রতি অবিচার করেছি।"

ছবি বলল, "আপনি কষ্ট কারে কন, তা জানিনে, তবে আপনারে কই কষ্ট কারে কয় তা এতদিন জানতাম না, আজ জানিছি। সারাটা দিন আজ দোজখের আগুনে য্যানো জ্বলিছি। এর চাইতি কষ্ট মানুষ আর পায় না। আপনি বিয়ান ব্যালা চলে গ্যালেন। বাজান ফিরে আসে কলেন আপনি বাড়ি গেছেন, দুপুরে ফেরবেন না, ফেরবেন সেই সন্ধ্যেয়। তারপর সারাদিন তো আর কাটে না। দেল জ্বলে খাক হয়ে যাতি থেকে। সে যে কী কষ্ট আপনি পুরুষ মানুষ আপনি বোঝবেন না। দুহাই আপনার, আপনার পায় পড়ি, আমারে আর অ্যাকা ফেলে চলে যাবেন না।"

ফটিককে দুহাতে জড়িয়ে ধরল বিলকিস। তারপর বুকে মাথা রেখে ঝরঝর কেঁদে ফেলল। এবং কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, "আমারে ফেলে যাবেন না, আমারে ফেলে যাবেন না। আপনারে ছাড়ে থাকতি পারব না। আমি তালি মরে যাবো, মরে যাবো"

ফটিক দেখল একটু আগেকার সেই পরিণত বড়সড় মেয়েটা আবার এখন কেমন এক ছোট্ট খুকি হয়ে গেল। ওর অদ্ভুত মায়া হল মেয়েটার প্রতি। সে হাতের তালু দিয়ে আলতোভাবে ওর চোখের পানি মুছিয়ে দিতে লাগল।

ফটিক বলল, "তুমি কাঁদছ কেন? আমি তোমাকে ফেলে যাব কেন? তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাব বলেই তো ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। কাল সকালে যাব। গোছগাছ করতে বড় জোর দু চারদিন লাগবে। তারপর এসে দুলহনকে নিয়ে যাব।"

বিলকিস ফটিককে জোরে জড়িয়ে ধরল যেন সে এই মুহূর্তেই পালিয়ে যাবে। আর তারপর পাগলের মত বলতে লাগল, "না না না। আমারে ফেলে যাবেন না। কাল আপনার সঙ্গে আমারেও নিয়ে চলেন।"

ফটিক বেশ বিব্রত হয়ে উঠল।

"তুমি এমন করছ কেন ছবি? তুমি কাঁদছ কেন? আমি তো তোমাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থাই করতে যাচ্ছি। তুমি তো জানো না, আমাদের বাড়ির অবস্থাটা কী হয়ে আছে এখন। তোমাদের এই বাড়ির ব্যবস্থা বন্দোবস্ত দেখে আমাদের বাড়ির আন্দাজ করতে পারবে না। আমাদের বাড়িতে দুটো মাত্র ঘর। তার একটা আমার। আমি গিয়ে দেখি আমার ঘরময় ভর্তি কুন্টা। সে-সব সরাতে হবে। সাফ করতে হবে। তবে তো গিয়ে তুমি ঢুকবে? নাহলে পর, এই মানে রাত্তিরে শোবে কোথায়?"

ফটিক দুহাতে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বিলকিস রায় দিল, "আপনার পাশে।"

"আমার পাশে।" ফটিক হেসে উঠল। "আরে আমি কোথায় শোবো তাই তো জানিনে।"

বিলকিস বলল, "কিন্তু রাত্তিরি শোবেন তো কুথাও না কুথাও? জাগে তো আর থাকবেন না?"

ফটিক বলল, "সে ব্যবস্থা কোনোরকমে না হয় একটা হয়ে যাবে।

বিলকিস বলল, তাহলি আমার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। আমারে নিয়ে চলেন। দ্যাখবেন, কোনও অসুবিধে আপনার হবে না। আপনারে অ্যাকটুকুনিও অসুবিধের ফ্যালব না। আমার একথা বিশ্বাস করেন।"

ফটিক এখন এই অবুঝ মেয়েটাকে বোঝায় কী করে? প্রচণ্ড জোরে তাকে আঁকড়ে ধরে আছে বিলকিস। কেন যে মরতে নিয়েছে এ লোকটা তাকে ... ছেড়ে পালাবে। পাগল! একেবারে পাগল! একেবারে পাগল! এত নরম, এত বাধ্য, এত ভীতু সেই মেয়েটা কোথায় গেল! একটু আগেই না এই মেয়েটাই তাকে আন্তরিকভাবে উৎসাহ দিয়েছে। নৈরাশ্য ঝেড়ে ফেলতে তাকে সাহায্য করেছে। এখন আবার সেই মেয়েটাকেই দ্যাখ। কী প্রচণ্ড জেদ। ফটিক এঁটে উঠতে পারছে না যেন।

হাল ছেড়ে দিয়ে সে বলল, "বেশ ছবি! তুমি আমাকে একটা দিন সময় দাও। আমি কথা দিচ্ছি, আমি পরশু এসে তোমাকে নিয়ে যাব। কেমন? শুধু একটা দিন সবুর কর। আমাকে একটু সময় দাও।"

বিলকিস এবার মাথাটা তুলল। ধীরে শান্ত স্বরে সে বল, একটা কথা কব, নারাজ হবেন না? আমার অনেক ভাগ্যি, তাই আল্লাহ' আপনারে আমারে মিলিয়ে দেছেন। আপনি আমার মালিক, আপনার হাত ধরে আমি আমার মালিকির বাড়ি গিয়ে ওঠবো? সে য্যামন বাড়িই হোক। আপনি কিন্তু-কিন্তু করতিছেন ক্যান? সে কি আমি হাজী বাড়ির মেয়ে বলে? তা যদি হয়, আপনি আমার উপর এই বিশ্বাস রাখতি পারেন যে আপনার সঙ্গে মাঠে জঙ্গলে থাকলিও আমি সুখি থাকব। আমার কোনও কষ্ট হবে না। আর আপনি না যদি নিয়ে যান আমারে তালি আমি বুঝে নেবো, আল্লাহ আমার উপর নাখোশ হইছেন, তিনি যাঁর হাতে আমারে তুলে দেছেন, সেই আমার মালেক আমারে বিশ্বাস করেন না।"

বিলকিস ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। তারপর বলল, "আমি আপনার দুঃখির ভাগ নিতি চাই। আমার এই আরজ আপনি মনজুর করবেন না?"

বিলকিস কেঁদেই চলল। ফটিক মনে মনে বিচার করে দেখল, ছবি খুব পাকা উকিলের মত সওয়াল করেছে। এর পর তার কোনও আপত্তিই টেঁকা উচিত নয়। মেয়েটাকে তার আশ্চর্য রকম ভালো লেগে গেল। এমন কি তার এও মনে হল, বিয়েটা সে ঝোঁকের মাথায়, মেন্দাগের উপর এক হাত নেবে বলেই হয়ত, হঠাৎ-ই করে ফেলেছিল, কিন্তু কাজটা সে ভালোই করেছে কেননা ছবির মত এমন বিবি খুব বেশি লোকের কপালে জোটে না।

সে ছবিকে কাছে টেনে নিল। তার নোনতা ঠোঁটে একটা দীর্ঘ চুমু খেল। তারপর তার চোখ থেকে মুখ থেকে গাল থেকে নোনতা জল মুছতে মুছতে বলল, "বিবিজান, তোমার আর্জি মনজুর। খালি একটা কথা, দেখো তোমাদের বাড়ির কেউ যেন এ ব্যাপারে আঘাত না পান। তুমি চলে গেলে এ বাড়ি ওদের কাছে ফাঁকা হয়ে যাবে।"

ছবি এদিকটার কথা ভাবেইনি এতক্ষণ। ফটিকের কথায় তার বাপ মা দাদীজানের মুখগুলো সব চোখের উপর ভাসতে লাগল। তার মুখ আবার মলিন হয়ে এল। ধীরে ধীরে সে তার মাথাটা ফটিকের বুকের উপর রাখল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার চোখের কোল দিয়ে আবার নতুন একটা জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল। সে এবার পরম নির্ভরতায় ফটিকের বুকে নিজেকে এলিয়ে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওদের বাড়ির কুঁকড়োটার তীক্ষ্ণ জোরালো ডাকে রাতের অন্ধকার যেন ফালা ফালা হয়ে যেতে লাগল।

ব্যাপারটা যে ঠিক কী হয়ে গেল, ফাঁকা বাড়িটার দিকে চেয়ে হাজী ছাহেব বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ছবিরা চলে গেল। বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। ছবি চলে গেল! মনে হচ্ছে কেউ নেই। পড়ো বাড়ি। এক পহর বেলা হয়েছে।

অন্যদিন নাস্তা টাস্তা খেয়ে দহলিজে গিয়ে তিনি এই সময় কিছুক্ষণ বিষয় কর্ম সব সেরে নেন। আজ আর ও মুখো হবার সময় পাননি। নিজের শোবার ঘরে বসে বসেই, ছবি চলে গেল, এই একটা অদ্ভুত প্রাজগুবি অংক মিলোতে চেষ্টা করছিলেন। যা হই হুড়ুদ্দুমটা গেল। তার তামাক খেতে ইচ্ছে হল।

অভ্যাস বশে ডাক ছাড়লেন, "নফরা।"

ছবি চলে গেল! ফজর নামাজের পর নয়মোনের মুখে কথাটা শুনে তিনি তো আকাশ থেকে পড়লেন। নয়মোন যখন আস্তে করে বলল, "শোনেন, আপনার মেয়ে তো কোট ধরিছে, আজই সে শ্বশুরবাড়ি যাবে।" হাজী ছাহেব কথাটার মানেটা, সত্যি বলতে কি, তখনও ঠিক ধরতে পারেননি। হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন। ঘুম থেকে উঠে ইস্তক গত রাত্তিরের ঘটনার রেশ তার মনের খুশি-খুশি ভাবটাকে উঁচু পর্দায় বেঁধে রেখেছিল। "হাঃ হাঃ হাঃ। জামাই তাহলি বিটিটার এর মধ্যিই একেবারে বশ করে ফেলিছেন। ওগের আর তর সচ্ছে না। কী কোস্? নয়মোন হাসছে না ক্যান? তখনই হাজী ছাহেবের আন্দাজ করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি নিজের মনের উপচে পড়া আনন্দেই মশগুল হয়েছিলেন। এবং এই রহমত তাঁর উপর বর্ষণ করার জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন। ছুব্হানাল্লাহে অ বেহামদিহী ছুব্হানাল্লাহিল আজীম—যিনি মহান, যিনি বিরাট ও যিনি শ্রেষ্ঠ, সর্ববিধ প্রশংসা ও মাহাত্ম্য তাঁরই জন্য। হাজী ছাহেবের অন্তরে আনন্দের গোপন উৎস-মুখটা যেন খুলে গিয়েছে। আল্লাহর বরকতযুক্ত এ রকম সকাল হাজী ছাহেবের জীবনে অনেক দিন পরে এল। আকাশে মেঘ নেই। মিঠে বাতাস বইছে। হাঁসগুলো হৃষ্টপুষ্ট, প্যাঁক প্যাঁক করে উঠোনে ঘুরছে আর হঠাৎ হঠাৎ তাদের গলাগুলো গত সন্ধ্যের বৃষ্টিতে আনাচে কানাচে জমে যাওয়া জলের মধ্যে বাড়িয়ে দিয়ে দ্রুত বেগে কী সব যেন খেয়ে চলেছে। ঠ্যাকারে কুঁকড়োটা ডিঙি মেরে মেরে উঠোনময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর হাজী ছাহেব যেন তন্ময় হয়ে আল্লাহর মহান তুলিতে আঁকা এই জীবন্ত চিত্রপট দেখে চলেছেন।

নয়মোন বললেন, "তা এখন এমন করে বসে থাকলিই কি চলবে? মেয়ের একটা ব্যবস্থা বন্দোবস্ত তো কত্তি হবে, না কি? জামাই তো নাস্তা খায়েই চলে যাবেন।"

"হবে হবে", সুখে ডগমগ হাজী ছাহেব বললেন, "বেটি কী কয়? ওর জন্যিই তো ভাবনা। অ্যাতদিন অ্যাক রকম অবস্থায় মানুষ হইছে। অ্যাখন অ্যাকেবারে অন্য রকম অবস্থার মধ্যি গিয়ে পড়বে তো। তুরা বরং এই কয়দিন ওরে বেশ করে বুজোয়ে সুজোয়ে ওর মনডারে তৈরি করে দে। কোনোদিন তো আমাগের ছাড়ে থাকেনি। পেরথম পেরথম মন খারাপ হবে। তা কী করা যাবে? শাদী যখন হইছে, তখন মেয়েরে তো শ্বশুরবাড়ি যাতিই হবে। কী কোস? মনেরে বুঝ দিতি, ছবিরি খুব ভা—লো করে কোয়ে দিবি। বুঝলি। কোবি? কোবি? হ্যাঁ কোবি, দ্যাখো মনি তুমি অ্যাখন ডাগর হইছ, অ্যাখন খসমের ঘরই তুমার ঘর। বুঝিছ। বিবি আয়েশা য্যামন নবীর ঘর আলো করে ছেলেন, তুমিও তুমার খসমের ঘর তেমনি আলো করে থাকবা। বুঝলি, এই সব কথা কোয়ে কোয়ে ছবির মনডারে বেশ ভালো করে তৈরি করে রাখ যাতে জামাই যেদিন ওরে নিতি আসবে সেদিন য্যান আমাগের ছাড়ে যাতি বেশি কষ্ট না পায়।"

হাজী ছাহেব এতখানি উপদেশ দিয়ে একটুক্ষণ থামলেন। নয়মোন আশ্চর্য হয়ে দেখলেন একটা প্রশান্তির নূর এই বিয়েন বালায় হাজী ছাহেবের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।

হাজী ছাহেব নয়মোনের মুখে বিস্ময়ের ভাব লক্ষ্য করে হাসলেন। বললেন, "দ্যাখ, আমি ছলি ছবিরি কী কতাম জানিস? কতাম, মা তুমি বিবি আয়েশার মত হও কিম্বা তুমার মার মত হও। হাঃ হাঃ হাঃ।"

নয়মোন করুণ চোখে হাজী ছাহেবের মুখের দিকে চাইলেন তারপর ভারী গলায় বললেন, "ছবি তো বাবিক ওর দাদীর ঘরে যায়ে কোট ধরে পড়িছে।

কণ্টকবল্পিত
অতুল্য ঘোষ

॥ ১৬ ॥

১৯২৯এর ৩১শে ডিসেম্বর রাত বারোটার সময় লাহোরে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হল। "This Congress therefore, in pursuance of the resolution passed as its session at Calcutta last year, declares that the word 'Swaraj' in Art. I of the Congress constitution shall mean complete Independence, and further declares the entire scheme of the Nehru Committee's Report to have lapsed and hopes that all Congressmen will henceforth devote their exclusive attention to the attainment of complete Independence of India."

কলকাতায় সভাপতি মতিলাল, লাহোরে সভাপতি জওহরলাল। পিতাপুত্রের দ্বন্দ্বের অবসান হল। জওহরলাল এবং অন্যান্যরা কথার খেলাপ করে কলকাতা কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব আনায় গান্ধীজী তীব্র মন্তব্য করেছিলেন,

"You may take the name of Independence on your lips, as the Muslims utter the name of Allah, or the pious Hindu utters the name of Krishna or Ram, but all that muttering will be an empty formula if there is no honour behind it. If you are not prepared to stand by your own words, where will Independence be ? Independence is a thing, after all, made of sterner stuff. It is not made by the juggling of words'.

লাহোরে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবে সব মতান্তরের অবসান হল। স্বাধীনতা প্রস্তাবের মধ্যে আরও বলা হয়,

"This Congress appeals to the Nation zealously to prosecute the constructive programme of the Congress and authorises the All India Congress Committee whenever it deems fit, to launch upon a programme of civil disobedience including non-payment of taxes, whether in selected areas or otherwise, and under such safeguards as it may consider necessary." এবং প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা-দিবস পালন করবার প্রস্তাব গৃহীত হল।

আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রশ্ন বরাবরই জড়িয়ে ছিল। ১৯২১এ অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হবার পর স্থির হয়, আইন অমান্য আন্দোলন বিশেষ বিশেষ স্থানে আরম্ভ হবে। গান্ধীজী গুজরাটের বরদোলি তালুকে ট্যাক্স বন্ধের মাধ্যমে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। পুরোদমে প্রস্তুতি শুরু হয় এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এ সম্বন্ধে প্রস্তাবও গ্রহণ করেন। আন্দোলন আরম্ভ করার কিছু আগে উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জেলার চৌরিচৌরায় একটি কংগ্রেসী শোভাযাত্রা বাহির হওয়ায় ফলে পুলিস বাধা দেবার চেষ্টা করে। জনতার আক্রমণে থানার মধ্যে একজন সাব-ইনস্পেকটর ও একুশজন কনস্টেবল আগুনে পুড়ে মারা যায়। অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের শুরুতেই এই হিংসাত্মক ঘটনায় গান্ধীজী বরদোলিতে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত করেন এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস দলভুক্ত সকলকে আইন অমান্য থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন। এই নিয়ে সে সময়ে খুব মতান্তর হয়েছিল। পণ্ডিত মতিলাল জেল থেকে লেখেন, 'চৌরিচৌরার ঘটনার জন্য সারা ভারতবর্ষে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। ভারতবর্ষের কোনও এক অঞ্চলে কোনও ঘটনার জন্য সারা ভারতবর্ষে আন্দোলন বন্ধ থাকা উচিত নয়।' লালা লাজপত রায়ও কারান্তরাল থেকে অনুরূপ মন্তব্য করেন। গান্ধীজী অচল-অটল। আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা তখনকার মত স্থগিত হয়। ১৯২৮এ কলকাতা কংগ্রেসের আগে ঐ বরদোলিতেই আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সেটেলমেন্ট-এর ফলে বর্ধিত হারে খাজনা ধার্য হয়েছিল, তা দেওয়া হবে না। স্বাধীনতা-সংগ্রামের কোনও প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল না। তবু বরদোলি সত্যাগ্রহ সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বল্লভভাই প্যাটেল এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। যত-রকম অত্যাচার করার উপায় আছে সরকার তার সবগুলোই গ্রহণ করেন। হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাধাবারও চেষ্টা করা হয়। সামান্য কয়েক পণ্ডা পয়সার জন্য লোকের সমস্ত অস্থাবর নিয়ে নেওয়া হয়। অনেক বাড়ি হয়ে ওঠে ভগ্নস্তূপ। আর মানুষের ওপর শারীরিক নির্যাতন ছিল বর্ণনাতীত। কৃষকরা অচল-অটল। সেই সময় একটা ছড়া হয়েছিল 'charge of the light brigade'-এর অনুকরণে—

'Police to the right of them
Police to the left of them
Police to the front of them
Police at the tail of them
Marched the buffalo brigade

কৃষকরা তাদের জমির ফসল পুড়িয়ে দিল, তবু সরকারকে ক্রোক করতে দিল না। সারা ভারতবর্ষের বুকে যেন একটা ভাববন্যা এল। বম্বে শহর টলমল। দিল্লীতে তখৎতাউসে সুখাসীন বড়লাটের কাছেও ধাক্কা গিয়ে পৌঁছল। চতুর্দিকেই আলোচনা। সারা দেশ থেকে নেতারা গিয়ে হাজির হলেন বরদোলিতে আন্দোলনে যোগদান করবার জন্য নয়, আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য। বোম্বাই থেকে নরীম্যান সাহেব এসে নতুন স্লোগান সৃষ্টি করলেন — 'Bardolise the Country.' ওদিকে বোম্বাইয়ের লাটসাহেব বিধানসভায় ঘোষণা করলেন—সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি দিয়ে বরদোলির আন্দোলনকে দমন করা হবে। আপোসের কথা আরম্ভ হয়ে গেল। কিন্তু গভর্নমেন্টের সব নির্যাতন ব্যর্থ করে দিয়ে বরদোলির কৃষকগণ জয়ী হলেন। এক পয়সা ট্যাক্স বাড়েনি। গান্ধীজী বল্লভভাইকে 'সর্দার' বলে অভিহিত করলেন এবং তিনি আমৃত্যু সেই নামেই পরিচিত ছিলেন।

১৯২৮ থেকেই দেশবাসী আইন অমান্য আন্দোলনের যৌক্তিকতা ও সার্থকতা বুঝতে আরম্ভ করেছেন। বরদোলির মত না হলেও আরও ছোট-বড় বহু আইন অমান্য আন্দোলন দেশের নানা স্থানেই সুপরীক্ষিত। লাহোরে স্বাধীনতা প্রস্তাবের মধ্য দিয়েই দেশবাসীর

কেঁদো না, তোমরা। অরণ্যদেব নিশ্চয়ই তোমাদের বাচ্চাদের খুঁজে পাবেন।
হে ভগবান!
যদি না দৈত্যটা আগেই তাদের খোঁজ পেয়ে যায়!

কী ওটা?
জানি না। এ-রকম কিছু আগে দেখিনি!
?!
হিস্‌স্‌

বিরাট জলায় অরণ্যদেব শুধু শিশুদের নয়, দানোরও খোঁজ পেলেন!
এইদিকেই আসছে! শিগগির উঠে পড়ো!
?!

জলার দানো।
হিস্‌স্‌স্‌

ডেভিল কিন্তু অকুতোভয়!
ডেভিল, কাছে আসবে!
হিস্‌স্‌

এ-রকম কিছু কখনো দেখিনি! গণ্ডারের চেয়ে বড়ো! সেইভাবেই তেড়ে আসছে!

যেন একটা চলন্ত ট্যাঙ্ক!

আঁকড়ে খোকা!
1-30
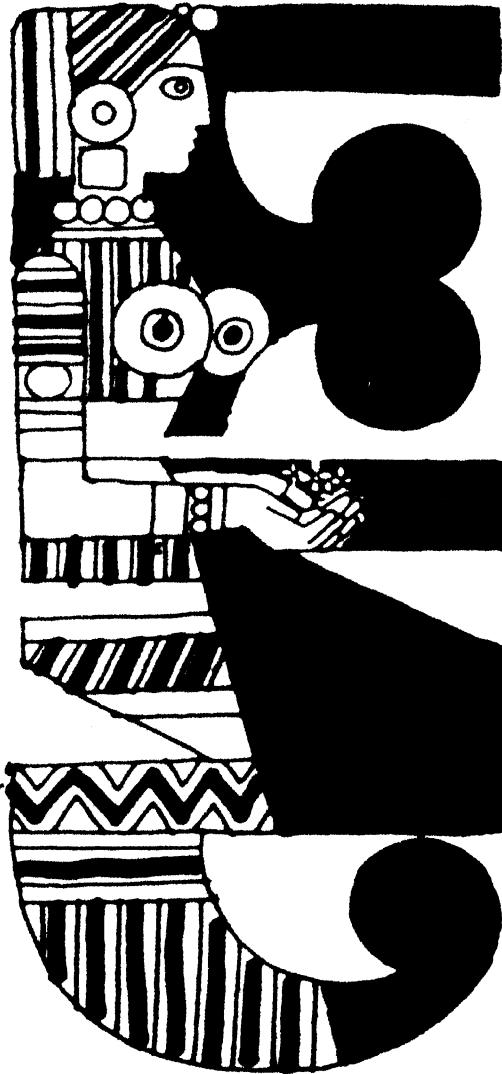
এবারের বিশেষ আকর্ষণ

রবীন্দ্রনাথের শতাধিক দুষ্প্রাপ্য রচনা

রবীন্দ্রনাথের শতাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ-সমালোচনা সম্পূর্ণ বিলুপ্তির পথে। বিভিন্ন সাময়িক পত্রপত্রিকার পাতায় তাঁর বিপুল সংখ্যক মূল্যবান রচনা আজও ছড়িয়ে রয়েছে। সেইসব বিলুপ্ত রচনার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকাসহ দীর্ঘ আলোচনা এবং সেই সঙ্গে দুটি দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রণ এ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ।

ABP/CAS-14/77 BEN

৬টি সম্পূর্ণ উপন্যাস

সত্যজিৎ রায়
(ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার)

শংকর

কালকূট

বিমল কর

কণা বসু মিশ্র

এবং **হাসির উপন্যাস**

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

গল্প

সুবোধ ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, প্রতিভা বসু, রমাপদ চৌধুরী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও আরও অনেকে

ভ্রমণ কাহিনী

কুম্ভমেলা : নবনীতা দেব সেন
(কবি ও অধ্যাপিকার চোখে)

এছাড়াও সুনির্বাচিত কবিতা ও অন্যান্য রচনা আর রঙীন আর্টপ্লেট

সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হচ্ছে

১২.০০/রেজিস্ট্রি ডাকে ১৪.২০

শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৪

কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৭৬ ॥

মাহবুব তালুকদার

কি আশ্চর্য বদলে গেছ। যেন তুমি
আমাকে চিনতেই পারলে না।
পাঁচ বছরের ব্যবধানে কতখানি পাল্টে গেছ তুমি
এক পলক তাকিয়ে
মাথা নীচু করে বললে, 'কেমন আছেন, কখন এলেন' ইত্যাদি।

যোজনামূলক কথাবার্তা
যেন কেউ টিয়েপাখির মত শিখিয়ে দিয়েছে,
না কি এসব শিষ্টাচার পালনের তাগিদে
মেপে মেপে ওজন করতে হয়
তারপর দোকানীর মত কাগজের মোড়কে মুড়ে
কথাগুলো তুলে ধরতে হয় সামনে। এবং
সবশেষে জানাতে হয়—'আচ্ছা দেখা হবে'।

কিছু একটা বলব ভেবে শুরু করেছিলাম, কিন্তু
বলার আগেই
কথার পাখিরা কোথায় উধাও! আমি বারবার
নিষ্পলক তোমার দিকে তাকিয়ে
নিরুত্তর হয়ে রইলাম। যেন
গণ্ডগ্রামের চিরন্তন সুবোধ বালক
প্রথম শহরে এসে
সব কথা খুইয়ে ফেলে আড়ষ্ট হয়ে যায়।

একবার, দুবার, অনেকবার,
অনেকক্ষণ চেষ্টা করে অবশেষে
দুটি শব্দের প্রশ্ন বানিয়ে
তোমার সামনে তুলে ধরে বললাম—'মনে পড়ে?'

হঠাৎ তোমার দৃষ্টি উদাস
আর চোখের কোলে
অতীতকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার প্রচেষ্টা।

কেননা, বৈপরীত্য

সোমেশলাল মুখোপাধ্যায়

প্রণয়, আমার আমরণ দুঃখ প্রণয়!
এখনো রেখেছো সবুজ পুকুরে ভরসা?
চারদিকে বুঝি চিরালাতচক্র নয়?
নিবেছে আগুন? মাহভাদরের বরষায়?

বহু বহুবার দেয়ালে বেড়েছে রাত্রি,
বহু বিকেলের আঙিনা মেখেছে রক্ত,
বহু সর্পিল ফণা দুলেছিলো দুকুরে……

এখনো ভরসা রেখেছো সবুজ পুকুরে?
কাঁপা-কলজেও আজো আছে সংশক্ত?
দিগন্তে আজো খোঁজো চতুর্থ মাত্রা!

কেননা, চেতনা বাস্তবে বন্দ্য নয়:
হয়তো আছেই এ-চির বৈপরীত্য—
হয়তো দেখেছে আমরণদুঃখ প্রণয়
দয়া মেখে ঢাকা আমানয়ারণ-চিত্ত!

বাউল হে

রণজিৎ দাশ

মেয়েদের কানাকানি একবার শুনেছি জীবনে।
কানের গহ্বরে এত অন্ধকার, কুন্তীর জরায়ু—
ময়ূরপালক তার কতোটুকু জানে।
আমিও বুঝিনি:
বাসস্টপে দেখা হলো, জানিস পূরবী, এমন বিউটিফুল
ওর চোখ দুটো, আমি তাকাতে পারি না
কার সঙ্গে দেখা হলো? তবে তো রহস্য আছে, বাউল হে
গান ধরো—রমনী দোফসা জমি, গ্রীষ্মে ফলে পাপপুণ্য,
শীতে জপমালা!
বাউলের গান নয়, অভিমান শোনা যায়:
নচ্ছার মাসীটা ওর সঙ্গে ছিল, জানিস পূরবী, ওটা এমন বেহায়া,
খালি গায়ে ঢলে পড়ে
ঢলে পড়ে—কথাটির মারাত্মক চোরাটানে পূরবী কি কাত হয়ে আসে?
তবে তো সোহাগ আছে এখনো, বাউল, তুমি গান ধরো ফাল্গুন বাতাসে

সমকালীন কলকাতার শিল্পীদের অন্যতম শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ছবি সম্বন্ধে খুব ভাবেন। ছবির মধ্যে সব সময়ই কিছু বক্তব্য রাখার চেষ্টা থাকে, শুধু কতকগুলি ফর্মের বিন্যাসে রচনা নয়, কিছু দর্শনের উপস্থাপনাই শুভাপ্রসন্নের উদ্দেশ্য। ছবির বাহ্যিক রূপে কিছুটা ফরাসী সুররিয়ালিস্ট মানসিকতার বিকাশ ঘটলেও শুভাপ্রসন্ন নিজেকে সুররিয়ালিস্ট বলতে আগ্রহী নন। শুভাপ্রসন্নের রচনা অধি-বিদ্যক গোষ্ঠীভুক্ত হতে পারে। নিজের ভাবনায় অন্যকে ভাবিয়ে তুলতে শুভাপ্রসন্ন ধুরন্ধর। খুব দক্ষ শিল্পী।

তারা—মহীপালদেবের চতুর্দশ রাজ্যাঙ্ক, আঃ একাদশ শতক, চিত্রদেবের সময়

বজ্রযোগিনী — মহীপালদেবের চতুর্দশ রাজ্যাঙ্ক, আঃ একাদশ শতক চিত্রদেবের সময়

পালযুগের চিত্রকলা

সরসীকুমার সরস্বতী

॥ ৭ ॥

চিত্রকথা—৩

মার্গরীতির আর মধ্যযুগীয় রীতির দুই ভিন্নাদর্শ সম্বন্ধে আমাদের শিল্পীদের মনে এই যে দ্বিধা ও দোলায়মানতা দেখা যায় তার দৃষ্টান্ত আমরা পাই আমাদের জানা সব চাইতে প্রাচীন পুঁথির চিত্রেই। এ পুঁথির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে আগেই।

পুঁথিখানি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার অনুলিপি, এখন রক্ষিত আছে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে (No G 4713)। পুঁথিখানি প্রস্তুত হয়েছিল প্রথম মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে নালন্দা মহাবিহারে। চারখানি পত্রে, প্রত্যেক খানিতে তিনটে করে, মোট বারখানি চিত্র আছে এই পুঁথিতে। প্রতিটি পাতার দু পাশে আছে বুদ্ধের জীবন-চিত্র, আর মাঝখানে বিভিন্ন দেবদেবীর রূপ। কাঠের পাটার চিত্র অবশ্য পরবর্তীকালের।

কালের প্রকোপে পত্রের চিত্রগুলো কিছুটা অস্পষ্ট। তবুও সূক্ষ্ম পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় চিত্রগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু ধারণা করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে আমরা একখানি চিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সামগ্রিকভাবে এই পুঁথির চিত্ররীতির পরিচায়ক হিসেবে। এই চিত্রে লুম্বিনী বনে ভগবান বুদ্ধের জন্মকাহিনী অঙ্কিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর রচনভঙ্গীটি (motif) সুপরিচিত, এ সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। অঙ্কনরীতিতে অবশ্য কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপিকা স্টেলা ক্রামরিশ মহোদয়ার মন্তব্যের উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। অনবদ্য ভাষায় এই বৈশিষ্ট্যগুলো তিনি উপস্থাপিত করেছেন :

"There is much modelling in colour and also of the sinuous lines which increase or decrease in thickness in accordance with the surging roundness which they outline or accompany. This is most evident in the left arm of Mayadevi's sister, while her face is modelled with highlights in the same summary manner which is to be found in the modelling itself in its plastic version. This somewhat rigid treatment occurs as in the case of this miniature along with subtle transitions, as in the modelling of the face etc. of

ভগবান বুদ্ধের জন্ম—প্রথম মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্ক, আঃ দশম শতক, শেষ পাদ

মহাসাহস্রপ্রমর্দনী — নয়পালদেবের চতুর্দশ রাজ্যাঙ্ক, আঃ একাদশ শতক, চল্লিশের দশক

নালগিরি বশীকরণ—প্রথম মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্ক, আঃ দশম শতক, শেষ পাদ

NEW
FORMULA
DEQUADIN
গ্ল্যাক্সো

Mayadevi, and if this treatment in either application belongs to the family of Ajanta paintings, that of Mayadevi's face stands nearer to the type of modelling in Ajanta at its height, whereas that of the sister's face is nearer to the stagnating treatment which is noticeable especially in Ellora ...." (JISCA, vol. I, No. 2).

এই উধৃতির সারানুবাদ নীচে দেওয়া হল :

"এই চিত্রে বর্তনার ব্যঞ্জনা দেখা যায় প্রচুর। রেখাবর্তনা ও বর্ণবর্তনা দুই আছে এই চিত্রে। বর্ণবর্তনার মায়াদেবীর অবয়বে, বিশেষ করে তাঁর মুখমণ্ডলে রঙের স্নিগ্ধ ও সুষম ছায়ে [illegible] প্রকাশ অজন্তা চিত্রের গৌরবময় যুগের কথা স্বতঃ স্মরণ করিয়ে দেয়। [illegible] অংশের বিভাজনে রেখার [illegible] বিন্যাসও বেশ স্পষ্ট। মায়াদেবীর ভগিনীর চিত্রে রঙের বর্তন [illegible] অস্পষ্ট। তবুও রঙ ও রেখার বিন্যাসে সামগ্রিকভাবে চিত্রখানি গুহা-চিত্রাবলীর সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ যুক্ত। [illegible] বর্তনার অস্পষ্টতা ইলোরার চিত্রে লক্ষ করা যায়—মায়াদেবীর ভগিনীর চিত্রে দেখা যায় সেই আদর্শের [illegible]।"

মনে রাখা প্রয়োজন, রঙের বর্তনায় এই অস্পষ্টতা থেকেই মধ্যযুগীয় শিল্পাদর্শের সূচনা হয়েছে। দুই আদর্শের স্বীকৃতি সম্বন্ধে যে দ্বিধাবোধ তা অধুনা বর্তমান সর্বপ্রথম পুঁথির চিত্রেই দেখা যায়।

আমাদের এই পুঁথিখানির চিত্র [illegible]কৌশলে স্পষ্টত আর প্রধানত মার্গরীতিআশ্রিত বলেই ধারণা করা সঙ্গত। প্রথম মহীপালদেব-নামাঙ্কিত অন্য দুখানি পুঁথির তারিখ যথাক্রম রাজ্যাঙ্ক ৭, আর রাজ্যাঙ্ক ২৭। এ
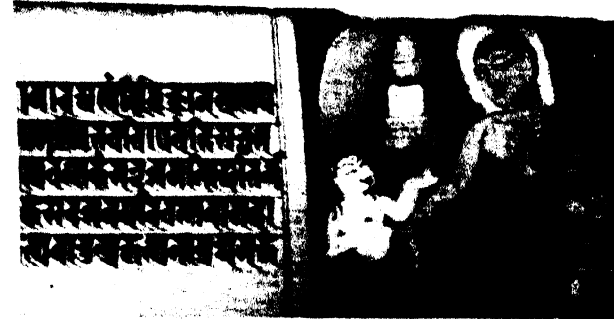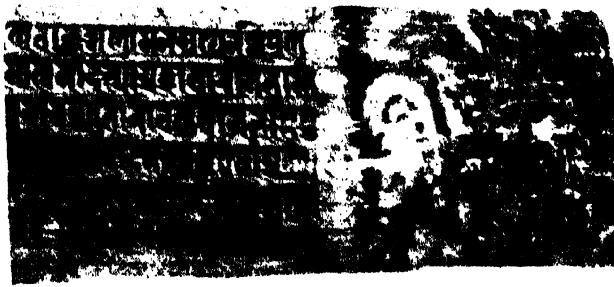
দুখানি চিত্রিত পাতা—দ্বিতীয় মহীপালদেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্ক, আঃ একাদশ শতক, সত্তরের দশক

দুখানি পুঁথির চিত্র সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য।

প্রথম মহীপালদেবের সমসাময়িক চন্দ্রবংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্রের একখানি চিত্রিত পুঁথির কথা আমরা আগেই বলেছি। এ পুঁথির চিত্রের পরীক্ষা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

প্রথম মহীপালদেবের পুত্র ছিলেন নয়পালদেব। পিতার পর তিনি পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই রাজার চতুর্দশ রাজ্যাঙ্কের দুখানি চিত্রিত পুঁথি এখন বর্তমান আছে। প্রথমখানি পঞ্চরক্ষার অনুলিপি—এখন রক্ষিত আছে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে (No Add 1688)। প্রতি-পত্রে তিনখানি করে বারখানি পত্রে মোট ছত্রিশখানি চিত্র আছে এই পুঁথিতে। রক্ষামণ্ডলীর পঞ্চ মহাদেবীর চিত্র ছাড়াও অবলোকিতেশ্বর মঞ্জুশ্রী, তারা, মানুষী বুদ্ধ, যোগিনী প্রভৃতির রূপও অঙ্কিত আছে এই পুঁথিতে। এই পুঁথির চিত্রে বর্তনা-সৃষ্টির প্রয়াস যেমন লক্ষ করা যায় রেখার সাবলীল [illegible] সুষম ছাঁদে। অবশ্য সুললিত [illegible] তরঙ্গায়িত রেখাই বর্তনা-ব্যঞ্জনা মুখ্য মাধ্যম—ব্যঞ্জনা প্রধানত প্রতিফলিত হয়েছে, রেখাবিন্যাসেই। রঙের আস্তরণ কিছুটা পাতলা হয়েছে, কিন্তু মধ্যযুগীয় আদর্শ অনুযায়ী সমমাত্রিক নয়। রঙের ব্যবহারে আছে শ্যামোজ্জ্বলতার সূক্ষ্ম আভাস। রেখা ও রঙের সুষম ব্যবহারে চিত্রের সৌকর্য ও মাধুর্য পরিস্ফুট হয়েছে এই পুঁথিতে। নয়পালদেবের তারিখ যুক্ত আর একখানি চিত্রিত পুঁথি এখন আছে Los Angeles County Museum-এ। এটি একখানি ধারণী গ্রন্থের খণ্ডিত অনুলিপি—শেষ পত্রসহ মাত্র দুখানি পত্র এখন বর্তমান। রামজীব নামে এক নেপালী উপাসক পুঁথিখানি দান করেছিলেন ; পুঁথি প্রস্তুত হয়েছিল নালন্দা মহাবিহারে। দুখানি পত্রে আছে [illegible]খানি চিত্র। চিত্রগুলো নিঃসন্দেহে পূর্বভারতীয় চিত্রকরের আঁকা। কৃতি-সৌকর্যে এই পুঁথির চিত্র প্রথম পুঁথিখানির চিত্রের অনুরূপ। মার্গরীতির আদর্শ ও মানস সম্পর্কে নয়পালদেবের আমলের চিত্রকরেরা বেশ সচেতন ছিলেন। মধ্যযুগীয় আদর্শের স্বীকৃতি রেখায় বা রঙে, একালের চিত্রে দেখা যায় না। তবে রঙের পাতলা আস্তরণের ফলে বর্ণবর্তনার ব্যঞ্জনা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। মধ্যযুগীয় আদর্শের অনুপ্রবেশ হয়তো আসন্ন।

মধ্যযুগীয় আদর্শের দৃঢ় পদক্ষেপ প্রথম লক্ষ করা যায় দ্বিতীয় মহীপালদেবের তারিখ যুক্ত একখানি পুঁথিতে। এ পুঁথির চিত্রের কথা আমরা আগেই বলেছি। পুঁথিখানি এখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে (No Add 1464)। এখানি প্রস্তুত হয়েছিল মহীপাল নামে এক রাজার
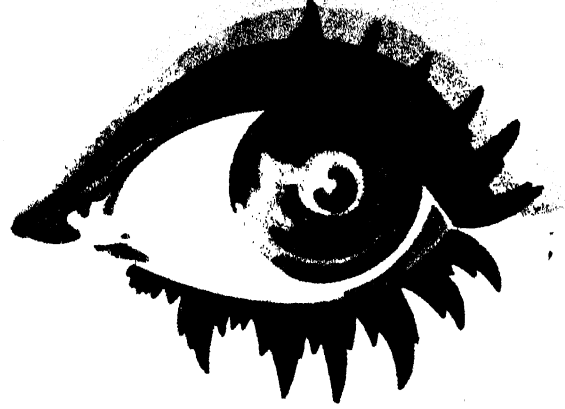
দেয়ালেরও চোখ আছে!

সেই চোখে তার, রঙের জোয়ার...
আনে,
অ্যাপকোলাইট সুপার অ্যাক্রিলিক ইমালশান!

ঘরের রূপকে অপরূপ
করে তোলার জন্যে

এশিয়ান পেন্টস্

CASAP-23-224 BEN

তারা—রামপালদেবের নবম রাজ্যাঙ্ক, আঃ একাদশ শতক, শেষ পাদ

পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে। চিত্র বিচারে পুঁথিখানি দ্বিতীয় মহীপালদেবের সমকালের বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে সঙ্গত কারণেই। দ্বিতীয় মহীপালদেব ছিলেন নয়পালদেবের পৌত্র। পুঁথিখানি অষ্টসাহস্রিক প্রজ্ঞাপারমিতার অনুলিপি পাঁচখানি পাতে. পনেরখানি চিত্র আছে এই পুঁথিতে, আর আছে সমকালের দুখানি চিত্রিত পাটা। পুঁথির পাতায় চিত্রে আছে বুদ্ধ জীবনের ঘটনাবলী আর বৌদ্ধ দেবদেবীর রূপ। বুদ্ধজীবনের ঘটনাবলীর চিত্রবিন্যাসে নতুন রীতির সঙ্কেত মেলে এই পুঁথির চিত্রে—তার আলোচনা পরে করা হবে।

আগেই বলা হয়েছে এই পুঁথির চিত্রগুলি একটি পৃথক আদর্শের, একটি ভিন্ন শিল্পমানসের পরিচয় দেয়। রঙের উজ্জ্বলা আস্তরণ নয়পালদেবের সময়কার পুঁথির চিত্রে লক্ষিত হয়। তবে তখনও তা একেবারে বর্তনাব্যঞ্জনাবিহীন নয়। মহীপালদেবের এই পুঁথিতে রঙ শুধু উজ্জ্বলাই নয়, একেবারে সমমাত্রিক ও চাপল্যহীন। বর্ণবর্তনার সামান্য আভাসও এই পুঁথির চিত্রে মেলে না তা ছাড়াও রেখাবিন্যাসে দেখা যায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ছেদহীন সাবলীল, তরঙ্গায়িত রেখার পরিবর্তে এ পুঁথির চিত্রে আছে কঠিন, ভঙ্গুরশীল, কুটিল ও বিচ্ছিন্ন রেখার সমাবেশ, আর এই ধরনের রেখার সমাবেশে বর্তনাব্যঞ্জনাও ক্ষুন্ন হয়েছে স্বাভাবিকভাবে। রেখাবর্তনায় কোন চিহ্নগতই এই পুঁথির চিত্রের রেখাবিন্যাসে লক্ষ করা যায় না। চিত্রে বর্ণিত গুণ সম্পর্কে এই বিরূপতা এ পুঁথির চিত্রে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান; সেটি একটি পৃথক শিল্পদৃষ্টির সূচক। আর এই পৃথক শিল্পদৃষ্টি মধ্যযুগীয় শিল্পাদর্শের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধযুক্ত বলে মনে করা অসঙ্গত হবে না। পালযুগের চিত্রকলায় তার আবির্ভাব স্পষ্টভাবে প্রথম লক্ষ করা যায় এই পুঁথির চিত্রে।

রেখাবিন্যাসের ব্যাপারে শিল্পাদর্শ ও শিল্পদৃষ্টি পরিবর্তনের ফলে দণ্ডায়মান ভঙ্গী পরিণত হয়েছে অর্ধচন্দ্রাকারে। Kramrisch এই আকৃতির নাম দিয়েছেন 'sickle shape'। এইরূপ একান্ত অস্বাভাবিক। ভারত শিল্পের চিরাচরিত সাবলীলতা গুণ বর্তমান পুঁথি চিত্রের এই ভঙ্গীতে দেখা যায় না। সবার উপরে আছে পার্শ্বগত ভঙ্গীতে একটি চোখের দেহগণ্ডীর বাইরে উদ্গত অতিক্রমণ—এটি একেবারেই অস্বাভাবিক।

মহীপালদেবের এই পুঁথিখানির চিত্রের সব বৈশিষ্ট্যই সৃষ্ট হয়েছে দেখা যায় মধ্যযুগীয় শিল্পদৃষ্টি ও শিল্পমানসের অনুসরণে। মধ্যযুগীয় আদর্শের এই পরিপূর্ণ স্বীকৃতি প্রথম মহীপালদেব বা নয়পালদেবের সময়কার পুঁথির চিত্রে দেখা যায় না। সে সব রীতিবৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল মার্গচিত্রের রীতির আদর্শ ও মানস আশ্রয় করে। এই দুই পৃথক আদর্শ আর দৃষ্টির একত্রাবস্থান আপাতবিরোধী বলে মনে করাই সঙ্গত হবে। মহীপালদেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কের এই পুঁথিখানি মহীপালদেব-নামাঙ্কিত ষষ্ঠ, সপ্তম আর সপ্তবিংশতিতম রাজ্যাঙ্কের তিনখানি পুঁথি আর নয়পালদেবের আমলের দুখানি পুঁথির চাইতে পরবর্তীকালের বলে আমরা মনে করি। এসব কারণেই বর্তমান পুঁথিখানি দ্বিতীয় মহীপালদেবের আমলের আর একাদশ শতকের সত্তরের দশকের সমকালের বলে আমরা সিদ্ধান্ত করেছি। এই পুঁথির চিত্রের এসব বৈশিষ্ট্যগুলো একাদশ শতকের পাল চিত্রকলায় আকস্মিক বলে মনে হতে পারে, কারণ এগুলো পাল চিত্রকলায় সাধারণভাবে সম্মতি পায় পরের শতকের মধ্যভাগের সমসময়ে।

দুখানি চিত্রিত পাটা—দ্বিতীয় মহীপালদেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্ক, আঃ একাদশ শতক, সত্তরের দশক

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পাল চিত্রকলায় মধ্যযুগীয় আদর্শের এ সব লক্ষণগুলোর ব্যাপারে বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া কয়েকখানি তাম্রপটে খোদাই রেখাঙ্কনের তুলনা করা হয়েছে। এই তাম্রপটগুলোর সব চাইতে পুরোনোখানির তারিখ ১১১৮ শকাব্দ বা ১১৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে এই ধরনের রেখাঙ্কনের সঙ্গে আমরা পরিচিত। বিচ্ছিন্ন, কুটিল রেখা, দেহগণ্ডীর বাইরে অতিক্রান্ত চোখ ইত্যাদি এই রেখাঙ্কনগুলোতে বিশেষভাবে স্পষ্ট। এগুলো মধ্যযুগীয় আদর্শের বিশিষ্ট লক্ষণ সন্দেহ নেই। তবুও এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে তাম্রপটে খোদাই রেখাঙ্কনে এ সব লক্ষণ কিছুটা বিশেষ খোদাই-বিধি প্রয়োগের ফলেও এসে থাকতে পারে।

সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়

সংশোধন

দেশ ২৭ অগস্ট, ১৯৭৭, ৩৫ পৃষ্ঠার উপরের ছবিটি অনবধানতা বশত উল্টো ছাপা হয়েছে।

সাহিত্য

দত্ত

ইঙ্গভারতীয় কবিতার গৌরবময় সূচনা যাঁর অতি স্বল্পস্থায়ী জীবনে সম্ভাবিত হয় "কলকাতার সেই কন্যা হিন্দু তরুণী" তরু দত্তের অকালমৃত্যু দেখে শাউতুস বর্ণিত প্রাচীন প্রবচনের ("কোএম দিলিগুন্ত, আদোলেসেন্স মোরিতুর") আপাতিক সম্ভবত স্মরণ করায়। এই লাতিন প্রবাদটির অনুবাদ করেন লর্ড বাইরন—"হুম দি গডস লাভ ডাইস ইয়াং।" একুশ বছর বয়সে তরুর মৃত্যুতে ইঙ্গভারতীয় সাহিত্যই নয়, অংশত হয় ফরাসী সাহিত্যও। কেননা, ভারতীয়, ও ফরাসী সংস্কৃতির এক আশ্চর্য সমন্বয় তাঁর সাহিত্যচিন্তায়। আর তাই তরুর বিষয়ে উল্লিখিত তিনটি দেশের সামাজিকের আসও বুঝি বা স্বাভাবিক।

দীর্ঘকালেরই বলা যায়, বাঙালী তথা কাব্যার্চনার ইতিহাস এবং অদ্যাবধি সে অক্ষুণ্ণ। অবশ্য সমকালীন কাব্যপ্রয়াসের সঙ্গে শতকীয় চর্চায় চারিত্রিক মিল অন্বেষণ ক। ইঙ্গভারতীয় কাব্যসাহিত্যের পুরোধা প্রসাদ ঘোষ জন্মসূত্রে পেয়েছিলেন স্বদেশকে বিদ্যাচর্চায় অর্জন করেছিলেন প্রায় ইওরোপীয় অধিকার। হিন্দু বা অ্যাংগলো-ইন্ডিয়ান (বর্ত-প্রেসিডেন্সি) কলেজে "ফ্রী স্কলার" হিসাবে যোগদানের (৮ অক্টোবর ১৮২১) ছ বছর পরে, ৭-এর শেষাশেষি একদা উক্ত কলেজের পরিদর্শক ও ভারতবিদ্যাবিৎ হর‍্যাস হেম্যান উইলসন ছাত্রদের রচনায় উৎসাহিত করেন। এবং সতীর্থদের একমাত্র কাশীপ্রসাদই এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাফল্য- সমর্থ হন। এ কথা লিপিবদ্ধ করেছেন কবি তাঁর ইংরেজীতে লেখা আত্মজীবনীমূলক পত্রে (সেপ্টেম্বর ১৮৩৪)। ইতিমধ্যে ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষকরূপে কাশীপ্রসাদের সমবয়সী ফিরিঙ্গি যুবক হেনরি লুইস ভিভিয়ান ডিরোজিও, যিনি প্রতীকী হয়ে ওঠেন আপন যুগের ও নবজন্মে, যোগদান (১৮২৬) করেছেন ঐ কলেজে। আর তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ পোয়েমস' প্রকাশিত হয় বৎসরান্তে। পরের বছর তাঁর সুবিখ্যাত খণ্ডকাব্য 'দি ফকির অভ জঙ্ঘীরা' (১৮২৮)। কাশীপ্রসাদের কাব্যসাধনার নীতিজ্ঞান, নিসর্গ বর্ণনায় গতানুগতিকতা, প্রায়শই বাংলা, সংস্কৃত ও আঠার শতকী ইংরেজী প্রকটিত, পাঠককে পীড়িত করে; কচিৎ উপমা-উৎপ্রেক্ষার উজ্জ্বল আভা। আপন কাব্য-প্রসঙ্গে এক দীর্ঘ প্রতিবেদনের শেষে স্বয়ং লিখেছেন যে, তাঁর 'দি শায়ের অ্যান্ড আদার পোয়েমস' (১৮৩০) নামীয় আখ্যানকাব্যে অসংখ্য বিচ্যুতি বর্তমান এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তা প্রকাশনার অযোগ্য। কাশীপ্রসাদের পর আমাদের রেনেসাঁসের ফসল, ডেভিড লেস্টর রিচার্ডসনের সৌহৃদ্য ও আকাঙ্ক্ষা যাঁর প্রমত্ত কবিকল্পনাকে প্রাণিত করেছিল "নিঃসঙ্গ গানে-পাওয়া মানুষ" মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'দি ক্যাপটিভ লেডি' (১৮৪৯) প্রণয়নের প্রসঙ্গও উল্লেখযোগ্য। মাইকেল রোম্যান্টিক বর্ণনায় অধিকতর অনুবর্তী হন। প্রকৃতিবর্ণনে সৌন্দর্য উচ্চারণ আদৌ তাঁর অভিপ্রেত ছিল না; বায়রনীয় ছন্দঃপতনের দৌরাত্ম্য কখনও কাশীপ্রসাদের হাতে ছন্দোশাস্ত্রের সন্ধানে নাজেহাল হতে হয়নি। তবুও এ সত্য তো সর্বজনবিদিত যে, আঙ্গিক এবং স্বচ্ছন্দ মিল্টন অনুকৃতি ব্যতীত তাঁর ইংরেজী কবিতা ক্ষণমাত্র উত্তরিত হয়েছে মাত্রার ঊর্ধ্বে।

মধুসূদনের আংশিক সাফল্য সম্ভবত রামবাগানের বিস্ময়কর দত্ত পরিবারকে প্রাণনা যোগায়। ১৮৬৯-এর নভেম্বরে তরুর পিতা গোবিন্দচন্দ্র সপরি-বারে ইওরোপ যান। দক্ষিণ ফ্রান্সে কয়েক মাস কাটিয়ে তাঁরা গেলেন "বিশ্বের রাজধানী" প্যারিসে। আর বেশ কিছুকাল প্যারিসে বসবাসের পর ১৮৭০-এর বসন্তে বুলোঞের পথে তাঁরা ইংল্যান্ডের দিকে পাড়ি জমান। ইওরোপের একাধিক স্বনামখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের পরিবারের পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। প্রসঙ্গত ভিকতর মারি উগোর সুহৃৎ, চসর ও শেকসপিয়র অনুবাদক, শেভালিএ দ শাতলাকি সঙ্গে দত্ত পরিবারের পত্রবিনিময় তথা সৌহার্দ্যের কথা স্মর্তব্য। 'দি দত্ত ফ্যামিলি অ্যালবাম' (১৮৭০)-এ সঙ্কলিত প্রায় দু' শ' কবিতার মধ্যে বেশির ভাগই গোবিন্দচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় ওয়াকিবহাল উমেশচন্দ্রের, অপর তিনজন হলেন গোবিন্দচন্দ্র (কবিতার সংখ্যা ছেষট্টি) গিরিশচন্দ্র ও হরচন্দ্র। ঐতিহাসিক তথা রোম্যান্টিক কবিকল্পনায় ওয়ালটর স্কট এবং লর্ড বাইরনের প্রভাব প্রত্যক্ষতর হলেও বলা যায়, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, ছন্দের স্বাচ্ছন্দ্য এবং ভাষাগত অবহিতিতে এই কবিতাগুলি আজও আমাদের ঔৎসুক্য জাগায়। স্বনামধন্য লালবিহারী দে সম্পাদিত 'দি বেঙ্গল ম্যাগাজীন'-এর নিয়মিত লেখক হরচন্দ্রের 'ফিউজিটিভ পীসেস' (১৮৫১) কবিতাগুচ্ছের অধিকাংশই বিশ বছর পরে নূতন নামে 'লোটাস লীভস' প্রকাশিত হয়। আর চিরায়ত সাহিত্যানুরাগী এক সংস্কৃতিবান সামাজিক, যিনি সন্তর্পণে ফরাসীচর্চা ব্যতীত মূল জার্মানে ক্লিসটক ফ্রীডরিশ ফন শিলার পাঠ করেছিলেন সেই গিরিশ-চন্দ্রের 'চেরি ব্লসামস' (১৮৮৭)-এ নানান ভাবনা

বিচিত্র রীতিতে চিত্রিত হলেও সনেটের পারম্পর্যময় আঙ্গিকে আপন স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টতর। প্রসঙ্গত দত্ত পরিবারের আর একজন পরিশীলিত পুরুষ, যিনি আমৃত্যু বিদ্যাচর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন, শশিচন্দ্রের 'এ ভিসন অভ সুমেরু অ্যান্ড আদার পোয়েমস' (১৮৭৮) প্রকাশনার বিবরটিও উল্লেখ্য।

উপর্যুক্ত কবিকুল কর্তৃক প্রবর্তিত ঐতিহ্যের অবসান তথা নূতনতর চিন্তনে ইঙ্গভারতীয় কাব্য-প্রয়াসকে প্রাণিত করেন এই প্রতিভাময়ী তরুণী তরু দত্ত। তাঁর কবিকল্পনা কার্যত মুক্তি পেয়েছিল সংস্কৃত, জার্মান, ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি সাহিত্যের স্বাস্থ্যবান চিত্রকল্পের আমদানিতে। তেরো বছর বয়সে তরু নিসের এক পাঁসিয়ঁনাতে পাঠগ্রহণ করেন। প্রতিভার প্রকৃতি নির্ধারণ যথার্থই অসাধ্যসাধন। ইওরোপে চার বছর কাটিয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় বিস্ময়কর প্রবেশের পর ১৮৭৩-এর সেপ্টেম্বরে গোবিন্দচন্দ্রের গৌরবিত কন্যা তরু স্বদেশে ফেরেন। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন উনিশ শতকী ফরাসী কবিতার তিনি যে অনুবাদ আরম্ভ করেন, 'দি বেঙ্গল ম্যাগাজীন' (১৮৭৪-এর মার্চ থেকে ১৮৭৭-এর মার্চ পর্যন্ত)-এ ধারাবাহিকভাবে তা প্রকাশিত হয়। স্বদেশ আবার আত্মসমর্পণের পূর্বে তিনি পরিশীলনের প্রয়াস পেয়েছিলেন প্রতীচীসন্ধানে। 'এ শীফ গ্লীনড ইন ফ্রেঞ্চ ফীল্ডস' (১৮৭৬)-এ টীকা সহ প্রায় দু' শ' কবিতার তরজমা ঠাঁই পায়। এই অনুবাদ সঙ্কলনটির একটি বৈশিষ্ট্য হল—পূর্বেয়ার শক্তিধর স্রষ্টারাই তরুকে বিস্ময়ান্বিত করেননি; বহু ছোট কবিকেও তিনি সমান উৎসাহে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত এই একমাত্র গ্রন্থটি প্রথম দিকে পাঠকসমাজে আশান্বিত আলোড়ন তুলতে অপারগ হয়। বিশেষত স্বদেশে তো একদা তাঁর এই অনুবাদকর্মকে পাঠককুল ধরেই নিয়েছিলেন যে, কোনও এক ইওরোপীয় লেখকই বুঝি বা তরু দত্ত এই ছদ্মনামে উক্ত অনুবাদকর্মে ব্যাপৃত। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তরুর ভাগ্য ভালই ছিল বলতে হবে; কেননা, তাঁর 'শীফ' নিমেষপক্ষে দুজন হৃদয়বান ইওরোপীয় বিদ্বজ্জনের হাতে গিয়ে পৌঁছয়। এডমান্ড গস এবং আঁদ্রে তারিএ যথাক্রমে 'দি এগজ্যামিনার' (২৬ অগাস্ট ১৮৭৬) ও 'রেভ্যু দে দ্যো মঁদ' (১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৭)-এ তরুকে তারিফ জানান।

আর ফরাসী পণ্ডিত গারস্যাঁ দ তাসি থেকে শুরু করে ভারতের বড়লাট কবি লর্ড লিটন পর্যন্ত সকলেই যখন ছিলেন তরুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাই গোবিন্দ-চন্দ্র তাঁর গুণবতী কন্যার পাণ্ডুলিপিগুলি পরীক্ষণে যত্নবান হন। ফরাসী ভাষায় লেখা তরুর একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস 'ল জুর্নাল দ মাদমোআজেল দারভার' (শ্রীমতী আরভার দিনপঞ্জী) নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ আবিষ্কার; কিন্তু পাণ্ডুলিপির মধ্যে কৎ দ গাম'র বেশ কিছুসংখ্যক সনেটের তরু-কৃত ইংরেজী অনুবাদ ব্যতীত মিলল মৌল এক অসম্পূর্ণ উপ-ন্যাসের আটটি অধ্যায়।

তরুর শেষোক্ত ইংরেজী উপন্যাসটি 'বিআংকা, অর দি ইয়াং স্প্যানিশ মেডেন' গোবিন্দচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত পাদটীকা সহ 'দি বেঙ্গল ম্যাগাজীন' (জানু-য়ারি—এপ্রিল ১৮৭৮)-এ প্রকাশিত হয়। সমকালীন পাঠকের কাছে 'বিআংকা'-র আখ্যানবস্তু এবং আঙ্গিক অত্যন্ত সাদাসিধে ঠেকবে। এবং তরুর এই উপন্যাসেও মিলবে কিঞ্চিৎ অসঙ্গতি। তৎসত্ত্বেও তরুর আপন জীবনের নৈঃসঙ্গ্য এবং পারিবারিক দুর্বিপাকের কিছু মর্মস্পর্শী ছবি এই রচনাতেও বর্তমান।

তরুর 'লে জুর্নাল দ মাদমোআজেল দারভার' ক্লারিস বাদ্যার ভূমিকা সমেত পারিস থেকে প্রকাশিত হয় (১৮৭৯)। তাঁর এই উপন্যাসের বিষয়বস্তুও রোমান্টিক এবং কাব্যময়; কার্যত এক নিষ্পাপ প্রেমের আকৃতিতে আভাসিত। স্রষ্টার আপন দুঃখময় জীবনের কশিসুলভ আত্মচিত্রণ প্রায়শ সংবেদনশীল পাঠকের চেতনায় প্রতিবিম্বিত হয়। এবং সে ক্ষেত্রে লেখিকার জীবন ও অভিজ্ঞতার অগভীরতার অন্বেষণ অপেক্ষা পাঠক ও সমালোচকের পক্ষে বেদনাতুর হওয়াই স্বাভাবিক।

তরুর 'এনশেণ্ট ব্যালাডস অ্যান্ড লেজেন্ডস অব হিন্দুস্থান' (১৮৮২)-এ ভারতমাহাত্ম্য কীর্তনই একমাত্র আকর্ষণ নয়, ব্যক্তিগত অনুষঙ্গের সংক্রমণ পাঠকচেতনায় অনিবার্য। বস্তুত 'বাগমারী' বা 'আওয়ার ক্যাসিউরীনা ট্রী'-তে তরুর নৈপুণ্য নিঃসন্দেহে পরিণত পর্যায়ের। এই বিস্ময়কর মহিলাকে তাই সাপফো কিংবা এমিলি ব্রন্টির সম-গোত্রজ ভাবাও বুঝি বা আদৌ অযৌক্তিক নয়। তরুর অকালমৃত্যুতে (৩০ অগাস্ট ১৮৭৭) কলকাতার 'দি ইংলিশম্যান' (৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭৭) পত্রিকা মন্তব্য করেন:

"We regret to have to record the death of Miss Toru Datt,.... whose poetical compositions in the English language, written at an age when many English girls are at school, not only bear the stamp of genius, but display a finish which only high culture could bestow!"

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন আপনি ওর দাঁত যন্ত্রণাদায়ক ছিদ্রের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন

কিনুন সিগন্যাল 2

এতে আছে সবচেয়ে কার্য্যকরী ফ্লোরাইড ফর্মুলা যা দাঁত মজবুত ক'রে দন্তক্ষয় রোধ করে

দাঁতের ব্যথা শুধু যন্ত্রণাদায়কই নয়—এ দন্তক্ষয়েরও লক্ষণ। অবহেলা করলে ক্ষয় আরও গভীর হবে, পরিণামে দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক গর্তের সৃষ্টি হবে।

সাধারণ টুথপেস্ট ভালো এসিড রোধ করতে পারেনা, যে-এসিড দাঁতের ভেতরে ঢুকে ক্ষয় সৃষ্টি করে।

সিগন্যাল 2-তে আছে সবচেয়ে কার্য্যকরী ফ্লোরাইড ফর্মুলা যা মুখের এসিডকে দাঁতের ভেতরে ঢুকে ক্ষয় সৃষ্টি করতে বাধা দেয়।

দন্তছিদ্র রোধ করে

বেশী দেরী হয়ে যাবার আগে এখনই পরিবারের সবাই এমন এক টুথপেস্ট ব্যবহার শুরু করুন যা দন্তক্ষয় রোধ করে ব'লে প্রমাণিত হয়েছে, আর তা হোল —সিগন্যাল-2। এর বিশেষ ফ্লোরাইড ফর্মুলা দাঁতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে দাঁত আরও মজবুত করে, ক্ষতিকারক মুখের এসিডকে আরও ভালভাবে প্রতিরোধ করে— আর দাঁতে গর্ত সৃষ্টি রোধ করতে সাহায্য করে। দন্তক্ষয় রোধ করার ব্যাপারে আর কোন টুথপেস্টই এর চেয়ে ভাল ফল দেয়না।

শুধু আমাদের কথাই মেনে নেবেন না। আপনার দাঁতের ডাক্তারকেও জিজ্ঞেস করুন।

পরিবারের সবার দাঁতে ছিদ্র রোধ করে।

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-SG2.1-2416 BG

অম্রুতাঞ্জন

ব্যথা কমানোর জোরালো মলম

অ্যানোলিয়াম

সর্দি সারানোর আরামদায়ক মলম

অম্রুতাঞ্জন জোরালো ওষুধ। এতে দশটি চমৎকার ভেষজ আছে যা মাথাধরা, পিঠব্যথা, পেশীর যন্ত্রণা, মচকানি ও সর্দিতে চটপট আরাম এনে দেয়।

অ্যানোলিয়ামে আছে সর্দিকাশি সারানোর অব্যর্থ ভেষজ। এবং কোমল ত্বকের কথা ভেবেই এটি বিশেষভাবে তৈরী।

এই দুটি মলমই ঘরে হাতের কাছে রাখুন। কে জানে কখন দরকার হয়।
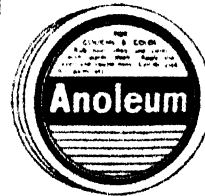
অম্রুতাঞ্জন ও অ্যানোলিয়াম - নির্ভরযোগ্য ঘরোয়া ওষুধ।

অম্রুতাঞ্জন লিমিটেড
৮০ বছরের বেশি সময় ধরে নির্ভরযোগ্য ঘরোয়া ওষুধ প্রস্তুতকারক

AM 1578

লাগতে চাইছে গোরা ডিগ্রীতে। আর জগদীশ তাকে বাধা দিচ্ছে।

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়েই বললাম : কি জগদীশ, ওকে আসতে দিচ্ছ না কেন?

শৈলেন্দ্র সিং-এর এতক্ষণে আমার দিকে নজর পড়ল। বলল : দেখিয়ে বাবুজী, উধার পানি নাহি আছে, আমি আপনাদের ওখানে একটু নাহাতে চাইছি। কিন্তু জগদীশ যেতে দেবে না।

আমার রাগ হয়ে গেল। এত লোক গোরা ডিগ্রীতে এসে রোজ স্নান করে যায়, আর শৈলেন্দ্র সিং-এর বেলাই আপত্তি! বললাম : জগদীশ, ওকে আসতে দাও। ও স্নান করে যাক।

জগদীশ বলল : কিন্তু দাদাবাবু, চৌবাচ্চায় বেশী জল নেই এখন। ও সবটা শেষ করে যাবে।

শৈলেন্দ্র সিং এবং জগদীশ দুজনকে উদ্দেশ্য করেই বললাম : ঠিক আছে, ও অল্প জলে স্নান করবে। ওকে আসতে দাও।

জগদীশ আর আপত্তি করল না। শৈলেন্দ্র সিংও খুব খুশী। তবু, জগদীশ যখন বসন্তকে নিয়ে বাথরুমের দিকে চলে যাচ্ছে এবং শৈলেন্দ্র সিং গোরা ডিগ্রীর গেটের দিকে এগিয়ে আসছে তখন ও বলতে ছাড়ল না : জগদীশ, ইয়াদ রাখ্‌খো, হাম ফিল্মকা এক্টার হ্যায়!

সেলে গিয়ে আবার বই নিয়ে শুলাম। পাশের বেডে তখন বিমানবাবু ঘুমোচ্ছেন। মাঝে-মধ্যে তাঁর নাসিকাধ্বনিও শোনা যাচ্ছে। এবং কিছুক্ষণ পরেই শুনে এল, স্নান সেরে একটা হিন্দী ফিল্মী গান গাইতে গাইতে হৃষ্টচিত্তে শৈলেন্দ্রচন্দ্র ফিরে যাচ্ছে!

কিন্তু সেদিন বিকালে আর শৈলেন্দ্র সিংকে দেখতে পেলাম না। পরদিন ভোরে মাঠে না, সকালে বা বিকালে গোরা ডিগ্রীতেও না। চলতে ফিরতে কোথাও শৈলেন্দ্র সিং-এর দর্শনই মিলল না। একটু চিন্তা হল। হল কি লোকটার? তা হলে কি খালাস হয়ে গিয়েছে? বা জামিনে ছাড়া? স্বরাজবাবুকে পরদিন জিজ্ঞেস করলাম : শৈলেন্দ্র সিংকে দেখছি না তো আর, খালাস পেয়ে চলে গেল নাকি? স্বরাজবাবু তখন কাগজ পড়ছিলেন। বললেন : না, না মশাই, আছে কোথাও। পাগল মানুষ। অন্য কোনও দিকে আছে। এত তাড়াতাড়ি ও খালাস পাবে না।

তৃতীয় দিন বেলা সাড়ে নটা নাগাদ হঠাৎ আবার শৈলেন্দ্র সিং-এর উদয়। চেহারাটা একটু শুকিয়ে গিয়েছে। চুলগুলিও বেশ উসকোখুসকো। চোখটা অনেকটা লাল।

আশ্চর্য হয়ে বললাম : কি হয়েছে শৈলেন্দ্র সিং? এতদিন ছিলে কোথায়?

শৈলেন্দ্র সিং কাতর কণ্ঠে জবাব দিল : বাবুজী, জগদীশ বড়া জমাদারকে বলে আমাকে ২৩-৪৪ সেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ওখানে স্নান করার জল নেই। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই আটক। কাইটার লোকের একঘরে চলে। কসরত নেই; খানা নেই আচ্ছা; বড়াবাবু খানায় দিত তাও নেই; আর এস এস। এস-র ছেলেরা ছোলা দিত ও ভি মিলছে না! বাবুজী দেখুন, জগদীশ আমার নামে ঝুটমুট বাজে কথা বলে সেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

তখন নীচের বারান্দায় আমি ছিলাম, স্বরাজবাবু, অশোকবাবু ছিলেন আর সুশীলবাবু তাঁর এক পাল বেড়ালকে পাশে বসিয়ে তরকারি কুটছিলেন। আমাদের সবাইয়েরই জগদীশের ওপর রাগ হল। স্বরাজবাবু বললেন : এটা জগদীশের অত্যন্ত অন্যায়। অশোকবাবুরও সেই রায়। আমি বললাম : জগদীশের এতটা বাড়াবাড়ি করা উচিত হয় নি।

এই ১-১২ আর ২৩-৪৪ সেলই হল প্রেসিডেন্সী জেলে সবচেয়ে খারাপ সেল। সামনেই উঁচু দেওয়াল। এতটুকু হাওয়া-বাতাস চলে না। অস্বাস্থ্যকরতম পরিবেশ। জেল কর্তৃপক্ষ কাউকে শাস্তি দিতে চাইলে বা 'মারাত্মক' বন্দী বলে মনে করলে এই সেলগুলিতে রাখার ব্যবস্থা করেন। সেল এলাকা থেকে বের হওয়ারও নানা বাধানিষেধ। কাউকে কাউকে তো প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই আটকে রাখা হয় এই সেলগুলিতে। গেটে গেটে সেপাই। বড় জমাদারের হুকুম ছাড়া তারা কাউকে বের হতে দেয় না সেল এলাকা থেকে।

জগদীশের মত মেটের পক্ষে অবশ্য সাধারণ কোনও কয়েদীকে সেলে ঢোকানো তেমন কঠিন কাজ নয়। প্রত্যেক জেলেই সেপাইদের শাসই মেটরা। প্রত্যেক জেলেই আবার মেটদের মধ্যে একটা আগাআগি থাকে। এক দল বড় জমাদারের পক্ষে, আর এক দল তার বিপক্ষে। জেলের ভেতরটার বড় জমাদারের কর্তৃত্ব। জেলারবাবুর হয়ে। সাধারণত বুদ্ধিমান ও কৌশলী জেলাররা আবার বড় জমাদারের উপর নজর রাখার জন্য এক দল মেটকে পোষেন। এবং এদেরই মধ্যে একজনকে নিজের আর্দালি করে রাখেন। এই জেলারবাবুর আর্দালি হয় যে মেট তার দলের সঙ্গে বড় জমাদারের দলের একটা রেষারেষি বরাবর এবং সব সেন্ট্রাল জেলেই থাকে। প্রেসিডেন্সী জেলে কিন্তু তখন তা ছিল না। প্রেসিডেন্সী জেলে তখন যিনি জেলার তিনি সোজাই ভালমানুষ এবং অত্যন্ত মৃদু প্রকৃতির লোক। সবে দার্জিলিং জেল থেকে এসেছেন। এর আগে কোনও সেন্ট্রাল জেলে জেলারিও করেননি। একে ভালমানুষ, তার উপর সেন্ট্রাল জেলের অভিজ্ঞতাই নেই। দার্জিলিং জেলের তুলনায় প্রেসিডেন্সী জেল তোবা আর সমুদ্রের মত ব্যাপার! একেই প্রেসিডেন্সী 'বি ক্লাস' জেল। তার উপর কলকাতার সব আচ্ছা আচ্ছা ওস্তাদের আখড়া ওখানে। অন্য দিকে প্রেসিডেন্সীতে যে তখন বড় জমাদার সে ঝানু ঝানু তস্য ঝানু। লোকে বলে, বড় জমাদারি করেই লক্ষপতি হয়েছে। গোটা জেলটা তার নখদর্পণে। জেলের ভেতরের কর্তা সেই-ই। জেলারবাবুর নিজস্ব দল-টল বলতে কিছুই নেই। সবাই বড় জমাদারের দলে। যে তার দলে নয় সে বেচারা মেট।

আমাদের গোরা ডিগ্রীর মেট এই জগদীশও ছিল বড় জমাদারের দলে। কিন্তু বড় জমাদারের দলের হলে হবে কি, জগদীশ খুব ধান্দাবাজ মেট ছিল না। ধান্দাবাজ মেট কখনও গোরা ডিগ্রীর মেট হবে না। কারণ, গোরা ডিগ্রীর মেট হলে এক পয়সা আমদানিরও ব্যবস্থা নেই। তবে, গোরা ডিগ্রীর মেটের প্রেসটিজ আছে। জগদীশ এই প্রেসটিজ বা মর্যাদা নিয়েই খুশী ছিল। ফিটফাট থাকত। হুকুম দেওয়ার টানে কালচু অর্থাৎ কালাপিঠারদের সঙ্গে কথা বলত। এমন কি,

জমাদার ও ছোটখাট কেরানীদেরও তেমন পাত্তা দিত না। জগদীশ জেল থেকে স্কুল ফাইনালও দিয়েছিল। অবশ্য, জেলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই। তাতেও পাস করেছিল।

এ-হেন জগদীশকে ফাইটিং দেখাতে গিয়েছিল শৈলেন্দ্র সিং, সুতরাং বড় জমাদার তাকে জেলে ঢুকেই! জগদীশের তুলনায় শৈলেন্দ্র সিং নগণ্য। শৈলেন্দ্র সিং-এর কণ্ঠস্বর শুনেও মনে হল এবার ও-ও ব্যাপারটা বুঝেছে। বুঝেছে যে, জগদীশকে ফাইটিং দেখানো উচিত হয়নি। ভুল হয়েছে। শৈলেন্দ্র সিং তাই স্বরাজের বলল : জগদীশকে একটু বুঝিয়ে বলুন। নইলে ওই সেলে থাকলে মরে যাব।

স্বরাজবাবুই আগে উত্তর দিলেন। বললেন : না, আমরা সব ঠিক করে দেব। তবে, তুই আর জগদীশের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাস না। এই বলে শৈলেন্দ্র সিংকে আশ্বস্ত করে কয়েকটা বাদাম এনে দিলেন বড়বাবু। ও মনের আনন্দে বাদাম চিবোতে চিবোতে চলে গেল।

পাগলও বোঝে, কে ভাল লোক, কে খারাপ লোক। শৈলেন্দ্র সিংও বুঝত স্বরাজবাবু কত ভাল লোক। স্বরাজবাবুর মুখের কথায় আশ্বস্ত হয়েই তাই ও চলে গেল। স্বরাজবাবু দুঃখী দেখলেই কাতর হতেন, তাকে স্নেহ করতেন। শৈলেন্দ্র সিংও সেইভাবেই বড়বাবুর স্নেহ পেত।

সেইদিনই বিকেলে লম্বা দিবানিদ্রাটি সেরে বাবু জগদীশচন্দ্র যখন তার ইস্তিরি-করা ধপধপে জামা-প্যান্টটি পরে বের হচ্ছেন তখন একমাত্র আমিই বারান্দায় বসে। স্বরাজবাবু আর অশোকবাবু অফিসে গেছেন। ক্ষিতীশবাবু, বিমানবাবু সব মাঠে। গুনোজী, সুশীলবাবু এবং দীনেশদা বাগানে গাছ কাটাচ্ছেন। একমাত্র আমিই নীচের তলার বারান্দায়। একটা পায়চারি করে বসে আছি। এই সময় জগদীশ বার হল। ও রাতে আমাদের ওখানে শুত না। রাতে শুত মেটদের ওয়ার্ডে। কিন্তু দিনে ঘুমত দীনেশদার ঘরে। স্নানাহার আমাদের ওখানেই। আমি ওকে দেখেই বললাম : কি জগদীশ, তুমি শৈলেন্দ্র সিংকে সেলে ঢুকিয়ে দিয়েছ?

জগদীশ হেসে ফেলল : পাগলা এসেছিল বুঝি?

আমিও আর রাগতে পারলাম না। বললাম : ছেলেমানুষি কর! বেচারাকে দিনরাত আটকে রেখেছ! একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে!

জগদীশ আবার হাসল : দাদা, ও ওখানে কয়েকদিন থাক। ঠিক হয়ে যাবে দেখবেন। শুধু সিনেমার ফাইটিং! এবার দেখবেন ওর মাথা থেকে ফাইটিং-এর ভূত ছাড়বে!...জানেন দাদা, ওর বউ, শালা সব পাগলা হয়ে গিয়েছে এই ফাইটিং দেখতে দেখতে। ওর বউ একদিন এসেছিল। জেলারবাবুকে বলে গিয়েছে, ছাড়বেন না ওকে, ও পাগল, সিনেমা-পাগল। ফাইটিং-পাগল। আমাদের প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে তাকে নিয়ে। ধানবাদ থেকে এসেছিল বউটা। ওর একটা ছোট্ট ছেলেও আছে। ও যে এই জেলে এসেছে তা-ও ওই ফাইটিং-এর জন্যই। ট্যাক্সি চালাত। তারপর সেই ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গেই ফাইটিং! তাকেও নাকি বলেছিল : জানতা হ্যায়, হাম ফিল্মকা ফাইটার হ্যায়। সে ছাড়বে কেন? আরও কয়েকজন ট্যাক্সিওয়ালাকে ধরে এনে ওকে আচ্ছাসে ধোলাই দিয়ে থানায় পৌঁছে দেয়। সেই থানা থেকেই এই জেলে। কিন্তু এখানেও ফাইটিং ছাড়ছে না! সবাইকে ফাইটিং দেখায়! থাক সেলে এক মাস। দেখবেন ফাইটিং শুকিয়ে গিয়েছে।

আমি জগদীশের কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। তবু বললাম : একটু যাতে ছাড়া পায়, বেড়িয়ে ফিরতে পারে তার ব্যবস্থা অন্তত করে দিও। মাঠে ও দৌড়ত। সেটা কেন দেবে না?

জগদীশ বলল : আচ্ছা, বড় জমাদারকে বলব। বড়বাবুও আমাকে দুপুরে বলেছেন।

পরদিন ভোরে মাঠে গিয়ে দেখি, হ্যাঁ, জগদীশ বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। শৈলেন্দ্র সিং বনবন করে পুকুরপাড়ে দৌড়চ্ছে! আমাকে দেখেই বলল : দেবে। দুপুরে আপনাদের ওখানে স্নান করতে যেতে দেবে। পাঞ্জাব ভায়েট পাব। ভাল রোটি, ভাল তরকারি। জগদীশ সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। জগদীশ বহুত আচ্ছা লড়কা, হামরা দোস্ত বন গিয়া।

শুনে ভাল লাগল। জগদীশ তা হলে সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। হেসে বললাম : আউর ওই ফাইটিং ফাইটিং মৎ বোলো!

ও যেন আশ্চর্য হয়ে গেল : কেন বাবুজী?

বললাম : ওই ফাইটিং বলেই তো সেলে ঢুকেছ। ভুলে গেলে এত তাড়াতাড়ি?

শৈলেন্দ্র সিং হাসল : বাবুজী, আমি ফিল্মের ফাইটার হব, আর ফাইটিং বলব না! তব কোন্ ফাইটিং বোলেগা! লেকিন জগদীশকে বলব না।

দেখলাম এর পর আর ওর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। আমি হাঁটতে শুরু করলাম, ওর পুকুর প্রদক্ষিণও আবার শুরু হয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আর এস এস-র ছেলেরা এসে গেল মাঠে। একজন দুজন করে। খাকি প্যান্ট, সাদা হাফ শার্ট। ছোলা চিবোচ্ছে সবাই। দেখতে দেখতে ওদের শ' খানেক ছেলে মাঠে এসে হাজির হল। শৈলেন্দ্র সিং-এরও ততক্ষণে দৌড় শেষ হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকটি ছেলে ওকে দুটি করে ছোলা দিচ্ছে। আর ও হাসতে হাসতে বলছে : দেও, দেও, ছোলা নেহি খায়েঙ্গে ফাইটার ক্যায়সে বনে গা!

সেদিন ও যথারীতি সকালে এবং বিকালে তোয়া ডিগ্রীতেও এল। জগদীশকে দেখেই একেবারে জড়িয়ে ধরল : তুম মেরা দোস্ত জগদীশ! জগদীশ বহুত আচ্ছা লড়কা হ্যায়!

আমরা সবাই তাই দেখে হাসলাম। বড়বাবু ওর জন্য অনেকগুলি বাদাম জমিয়ে রেখেছিলেন। সব একসঙ্গে দিয়ে দিলেন। এবং এমন যে বিমানবাবু, যিনি বড়বাবু ও শৈলেন্দ্র সিংকে নিয়ে প্রায়ই টিপ্পনী কাটতেন তিনিও এদিন ওর কুশল জিজ্ঞেস করলেন। বড়বাবু একসঙ্গে অতগুলি বাদাম দেওয়াতেও কোনও বিরূপ মন্তব্য করলেন না!

দু দিন পরেই কিন্তু শৈলেন্দ্র সিং আবার একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসল। সেদিন ভোরেও দেখেছি সব ঠিক আছে। দৌড়বার পর ছোলা চিবোতে চিবোতে যখন ফিরছিল তখন আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে গেল : বাবুজী, কুছ খবর আছে রিলিজের? আমার থ্রি ডায়মেনসান পিকচারের কথা মনে আছে তো? হিরো রাজেশ খান্না, হিরোইন হেমা মালিনী, ডাইরেকটর অ্যান্ড ফাইটার শৈলেন্দ্র সিং?

আমি তখন গৌরদার সঙ্গে হাঁটছিলাম। হেসে বললাম : সব মনে আছে। কিন্তু রিলিজের কোনও খবর নেই। আর তুমি তো জান, মিসার বেল হয় না।

শুনে ও যেন একটু দমে গেল। কিন্তু দাঁড়াল না।

কেন জানি না, শৈলেন্দ্র সিং গৌরদাকে একটু এড়িয়ে চলত। বলত : আরে বাবা, ওই দাড়িওয়ালা-বাবু! বহুত পণ্ডিত আদমী, সব আদমী বাতা উনকা বাত শুননে কো। সব আদমী বোলতা বহুত পণ্ডিত। হাম ফিল্মকা হিরো, হাম নেই বাতা। কেয়া হোগা বাকে!

গৌরদার আড্ডা থেকেই ফিরছিলাম তখন। বেলা এগারোটা নাগাদ। হঠাৎ দেখি দড়ি হাজতের গেটে ভিড়। এগিয়ে গেলাম। কি ব্যাপার? দেখে তো চোখ ছানাবড়া! শৈলেন্দ্র সিং-এর সেই মূর্তি। লাল চোখ। ঝাঁকড়া চুল। কোমরে গামছা বাঁধা। বলছে এক কয়েদীকে : মৎ লাগো হামারা সাথ। হাম ফিল্মকা ফাইটার। দো ফাইট দেগা, তুম খতম। সেও ছাড়বার পাত্র নয়। রুখে আসছে : এস একবার, দেখে নেব তুমি কেমন ফাইটার। তোমার মত ফাইটার আমি ঢের দেখেছি। কি নিয়ে ঝগড়া তা কিন্তু বুঝলাম না। তবে দেখলাম মজা দেখার জন্য ত্রিশ-চল্লিশ জন লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছে। মায় দড়ি হাজতের সেপাই পর্যন্ত! আমি বুঝলাম শৈলেন্দ্র সিং-এর আজ একটা বিপত্তি হবে। ওই কয়েদীর হাতে মার না খাক, মারামারির দায়ে জমাদার-সেপাইদের হাতে ঠেঙানি অনিবার্য। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম। ওর হাত ধরে টেনে বের করে নিয়ে চলে এলাম। বললাম : চল বড়বাবুর [illegible]

বড়বাবুর নাম শুনেই ও যেন একটু নরম হল। বলল : নেহি বাবুজী, হামারা কাহিনী, তুমি কখনও ফিল্মের ফাইটার হতে পারবে না। তুমি ফাইটিং জানোই না। হাম কেয়া বোলেগা। জরুর হাম ফাইটার হ্যায়! হাম ফিল্মকা ফাইটার। আও......

বললাম : ঢের হয়েছে, এবার চল বড়বাবুর কাছে, তোমার ফাইটারি ঘোচাবে।

ও আরও একটু যেন মিইয়ে পড়ল। আমার সঙ্গে সঙ্গেই চলল। তখন আর ওকে হাত ধরে টেনে আনতে হচ্ছে না।

কিন্তু তোয়া ডিগ্রীতে পৌঁছে দেখি বড়বাবু নেই। কোথায় যেন আড্ডা মারতে বেরিয়ে গিয়েছেন। অগত্যা ওকে ওপরে নিয়ে এলাম। আমার সেলে। চেয়ার টেনে দিয়ে বললাম : বস। তারপর আস্তে আস্তে বললাম : আচ্ছা শৈলেন্দ্র সিং, তুমি ফাইটার ফাইটার বলে এত পাগলামি কর কেন বল দেখি? শুনেছি বাড়িতেও এ নিয়ে উৎপাত করতে। বাড়ির লোকজনেরও প্রাণ বের করে দিয়েছিলে। কেন এরকম কর! তুমি যে কিছু সমঝো না তা তো নয়! তা হলে এরকম কর কেন? শুনেছি তোমার স্ত্রী, ভাই, শালারা —সবাই এই নিয়ে তোমার উপর বিরক্ত।

ও হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। আমাকে বাধা দিল। বলল : না, না বাবুজী, এসব ঝুট বাত। কেউ আপনাকে ঝুট বলেছে। আসলী বাত কিয়া জানেন?

এই বলে হিন্দী-বাংলায় মিলিয়ে যে আসলী বাত বলল তার সারমর্ম এই : আই-এ পাস করে ও ট্রাকের ব্যবসা শুরু করে ধানবাদ অঞ্চলে। কয়লা টানা ব্যবসা। বেশ ভাল পয়সা আসত। তারপর বিয়ে করে। একটি ছেলেও আছে। ফুটফুটে ছেলে। এখন বয়স চার বছর। ও তাকে বাবুয়া বলে ডাকে। এই ট্রাকের ব্যবসা যখন বেশ ভাল চলছে, যখন একটা ট্রাক দুটো হয়েছে তখন ওর স্ত্রী আর শালা মিলে ষড়যন্ত্র করল। ওর কাছ থেকে একটা ট্রাক লিখিয়ে নেওয়ার প্ল্যান শুরু হল। শালার নামে। ও কিন্তু তাতে কিছুতেই রাজী নয়। তখন ওরা এক ডাক্তারের সঙ্গে যোগসাজস করে ওকে পাগল ডিক্লেয়ার করার চেষ্টা করল। সেই ষড়যন্ত্রের কথা শুনেই বলল, দেখি ভেবে। কিন্তু ওরা তবুও ওকে ছাড়ল না। জোর করে রাঁচির পাগলা হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করিয়ে দিল। সেইখান থেকে ও কোনওমতে পালিয়ে এসেছে। এসেই সেদিন পড়ে গিয়েছে এক চোর ট্যাক্সিওয়ালার পাল্লায়। সে ওর কাছ থেকে বেশী ভাড়া চাইল। ও লাগাল দুই ফাইট। সব ট্যাক্সিওয়ালা এক হয়ে পেটাল তাকে। ধরে নিয়ে গেল থানায়। সেখান থেকে এই জেলে। দু মাস আছে। জামিন হতে পারে। তিন শ' টাকার জামিনের হুকুম আছে। সেই জামিনের টাকার জন্য বউকে চিঠি লিখেছিল। বউ জামিনের ব্যবস্থা তো করেইনি, উল্টে জেলারবাবুকে ওর নামে নাকি যা-তা বলে গিয়েছে। 'এমন কি জানেন, ছেলেটাকে পর্যন্ত সঙ্গে আনেনি। যাতে আমি একবার দেখতে পারি......'

এই ছেলের কথা বলতে বলতেই দেখলাম ওর চোখে জল এসে গিয়েছে। বলল : বাবুজী মেরা বহুত প্যারারকা বাবুয়া, উসকো ভি লায়া নেহি শালী।

শুনে আমারও মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। উঠে ওর পিঠে হাত বুলোলাম। বললাম : দুঃখ ক'রো না শৈলেন্দ্র সিং। আবার তুমি বাবুয়ার কাছে যাবে, আবার ট্রাক চালাবে। এই কেসে সাজাই তোমার হবে না, পরের ডেটেই দেখবে ছাড়া পেয়ে গিয়েছ।

ও চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর অমন সুন্দর চোখটা একেবারে ঝাপসা হয়ে এল। যেন রক্ত-পদ্মের পাতার উপর টলটল করছে জল। তারপর সেই অশ্রু ঝরঝর করে ঝরে পড়ল দুই গাল দিয়ে। তখন শৈলেন্দ্র সিং শুধু কাঁদছে আর বলছে : বাবুজী, ম্যায় ফাইটার নাহি বনুংগা; বাবুজী, ম্যায় বাবুয়াকো পাস যাউংগা বাবুজী, মুঝে বাবুয়াকো পাস লে চলো।

বলছে আর কাঁদছে। কাঁদছে আর বলছে।

আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। তারপর নিজের চোখের জল সামলে নিতে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।

ও তখনও কেঁদে চলেছে : বাবুজী, মেরা [illegible] সুন্দর বাবুয়া। বাবুজী, মুঝে বাবুয়াকো পাস [illegible] চলো, বাবুজী, ম্যায় ফাইটার নাহি বনুংগা... [illegible]

আমরা
তাঁদেরই
সেবায়
যাঁরা
জনসাধারণের
সেবায়

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস
সাথে যদি থাকে
ব্যাঙ্ক অফ্ বরোদা'র

প্রয়াস

স্মৃতি সততই সুখের

প্রতিভা বসু

নিউ ইয়র্কের অবস্থিতি

ইনল্যুলু থেকে বেলা সাড়ে বারোটায় বিমান ছাড়লো। তিন হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে সানফ্রান্সিসকোতে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত দশটা।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এই প্রথম বন্দর যেখানে আমাদের কেউ নিতে আসেনি। আসার প্রশ্নও নেই। এখানে কোনো কাজে আসেননি বুদ্ধদেব, নিউইয়র্কে যাবার পথে একদিন বেড়িয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।

হোটেল আগে থেকেই ঠিক করা ছিলো, বাইরে এসে একটা ক্যাব ধরে সহজেই সেখানে পৌঁছোনো গেল।

অন্যান্য বন্দরে যেমন গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়ে এসেছি, বলাই বাহুল্য, এখানে সেটা সম্ভব হলো না। হবার কথা নয়, এখানে আমাদের নিজেদের দায় নিজেদের।

স্যুটকেস দুটি নিয়ে একেবারে গলদঘর্ম। টেনে-হেঁচড়ে দু-বারের চেষ্টায় মাল নিয়ে যখন কাস্টমস-এর বিধিনির্দেশ পেরিয়ে ট্যাক্সিতে এসে উঠে বসলাম, মনে যুদ্ধ জয় করার আনন্দ হলো।

এই রাত্রিবেলা এই অচেনা শহরে পৌঁছে কোনো তৃতীয় সঙ্গীকে অভ্যর্থনায় এগিয়ে আসতে না দেখে আমাদের দু-জনেরই বেশ মন খারাপ হয়ে গেল। খারাপ যে হবে এটা কিন্তু আগে ভাবিনি।

আগাগোড়াই যদি এভাবে দেশ ভ্রমণ করতুম তা হলে নিশ্চয়ই এই অভাববোধ হতো না। দেখা যাচ্ছে অভ্যাস বড়ো চরিত্রনাশক। স্বজনদের জন্য ভুলে থাকা বিরহবেদনা তৎক্ষণাৎ মাথা তুলে দাঁড়ালো। ভাবলাম হোটেলে পৌঁছেই লম্বা লম্বা চিঠি লিখবো তাদের।

হোটেলটি জাঁদরেল। তার জাঁকজমক খাদ্য মদ্য আলো সবই প্রায় 'আমাকে দ্যাখো' গোছের। নাম 'মার্ক-হবকীন'। ক্যাব থেকে নামতেই পোর্টার ছুটে এলো, পাপোষে পা দিতেই দরজা খুলে গেল, ভিতরে ঢুকে এই বিলাসী আবহাওয়ায় শ্রান্ত-ক্লান্ত ক্ষীণ দুটি বঙ্গদেহ বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলো। খানিক দূরে হেঁটে গিয়ে কাউন্টারে দাঁড়াতেই 'ইনচার্জ' ভদ্রলোকটি চোখে চোখে হেসে সম্ভাষণ করলেন, গমগমে গলায় ফুর্তি মিশিয়ে বললেন, 'তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম, এবার আমার আজ রাতের জন্য ডিউটি শেষ।'

আমার দিকে আপাদমস্তক তাকালেন, 'কোন দেশ থেকে?'

'ভারতবর্ষ।'

'ভালো। খুব ভালো।' মুখ তুলে নাকি সুরে একটু ঢেউ দিয়ে ডাকলেন 'জিইম—'

ভারি সুন্দর একটি কিশোর ছুটে এলো, উনি ঘরের চাবি দিয়ে বললেন, 'যাও, পৌঁছে দিয়ে এসো।'

আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আবার কাল সকালে দেখা হবে, কেমন?' মুখে হাসির বিরাম নেই। হাত ঝাঁকালেন জোরে জোরে। বেশ লাগলো।

জিমের মুখেও হাসি। ওরা অতিথিদের দিকে তাকিয়ে ওরকমই হাসে, এই হাসি ওদের চর্চার ফল, শিক্ষার অঙ্গ। মুখে কোনো ক্লান্তির চিহ্ন, বিরক্তির চিহ্ন কিছুতেই ফুটতে দেয় না। অন্যের চোখের পক্ষে সেটা অত্যন্তই প্রীতিপ্রদ।

মস্ত লবি পেরিয়ে অনেক এলিভেটরের কোনো একটার কাছে জিম নিয়ে গেলো আমাদের আরো অনেকের সঙ্গে ঢুকে, সোঁ করে ষোলোতলায় উঠে এলাম। সেটি জিনিসপত্র সব ক্লসেটে ঢুকিয়ে তেমনিই হাসিমুখে বিদায় নিল।

খাওয়া-দাওয়া তো প্লেনেই সারা হয়েছে, ক্লান্তিও লাগছিলো, রাতও হয়েছে বেশ, এবার শুয়ে পড়লেই হয়। কিন্তু এখানে মাত্রই এক রাতের অবস্থান বিবেচনা করে সামান্য হাত-পা ছড়িয়ে নিয়েই আবার নিচে নেমে এলুম। উদ্দেশ্য কোনো নাইট ক্লাবে যাওয়া। হোটেল থেকেই কোনো বাস রাতের শহর দেখাতে নিয়ে যায় কি-না, অথবা নিজেরাই যদি যাই, কোথায় কোন ক্লাবে যাওয়া যায় এসব খবর নেবার জন্য আবার কাউন্টারে এলাম। এবার অন্য লোক বসে বসে একটি গোয়েন্দা উপন্যাস পড়ছে দেখলাম।

জিজ্ঞেস করতেই প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললো, 'না না, আমাদের এখান থেকে এখন কোনো বাস ছাড়ে না রাত্তিরে। কদিন যা বৃষ্টি, দেখছেন তো শহরের হাল। আর নিজেরা একা যাবেন? প্রশ্নই ওঠে না। নাইট ক্লাবে কী দেখবেন? নষ্টামি! সানফ্রান্সিসকো থেকে পুলিশ সে পাপ দূর করেছে।' বলেই বড়ো মোটা গলায় হাসতে লাগলো। খুব পরিতৃপ্তির হাসি। যেন বেশ এক হাত নিলেন।

অগত্যা এক কাপ চা বা কফি পাওয়া যেতে পারে কিনা তাই জিজ্ঞেস করা গেলো। তখন উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমাদের বার সারা-দিন সারারাত খোলা থাকে, সেখানে এসব পানীয়েরও বন্দোবস্ত আছে। এ কি যেমন তেমন হোটেল? জানেন তো ক্রুশ্চেভ এসেও এই হোটেলেই উঠে-ছিলেন।'

আগের ভদ্রলোকের মতোই নাকি সুরে ঢেউ তুলে সেই জিমকেই ডাকলেন। ছুটে এলো জিম। নির্দেশমতো নিয়ে গেল আমাদের একেবারে সর্বোচ্চতলে। এসে দেখি একেবারে কিন্নর কিন্নরীদের লীলাখেলা! আমোদের অব্যাহত স্রোত তরল বেগে বয়ে যাচ্ছে। রাত বারোটা কী! মনে হয় সবে সন্ধে।

বাজনা বাজছে, নাচ হচ্ছে, খাবার খাচ্ছে, প্রেম করছে। মহা হুল্লোড়। কোণের দিকে একটু নিরিবিলিতে একটা টেবিলে বসে এইসব দেখতে দেখতে দু-কাপ চা খেয়ে চলে এলাম খানিকক্ষণ বাদে।

ভাগ্য প্রসন্ন ছিলো, পরের দিন সকালে সুন্দর রোদ উঠলো। মেইড এসে ঘরদোর ফিটফাট করে দিল, পর্দা সরিয়ে দিতেই আলোয় ভেসে গেল ঘর। কাচের বাইরে তাকিয়ে দেখি ষোলোতলার উপর থেকে ছড়ানো ছিটোনো খই মুড়ির মতো সারা শহরটা ঝক ঝক করছে পাহাড়ের ধাপে ধাপে। দূরে সমুদ্র ঘিরে আছে চারদিক। সমুদ্রের মাঝে মাঝে দ্বীপ, দ্বীপের মধ্যে অস্পষ্ট সব ছোটো ছোটো শহরের আভাস। জলের বুক থেকে দৈত্যাকৃতি লালচে রং পাহাড় উঁচিয়ে আছে যেখানে সেখানে। যে দ্বীপটির বাড়িঘর অপেক্ষাকৃত একটু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সেখানে কড়ে আঙুলের মতো ছোট্ট কোনো অবয়বকে নড়তে চড়তে দেখে মনে হচ্ছে মানুষ, সেটি একটি কয়েদখানা এবং ওরা কয়েদী।

কয়েদীরা সব ছাড়া আছে সেখানে। পালাবার কোনোই উপায় নেই, চতুর্দিক ঘিরে শুধু জল আর জল আর জল। সেই জল এমন নয় যে কেউ অতিক্রম করতে পারে। সেখানকার জলের ঘূর্ণি এমনিই প্রবল যে নামলেই অতলে টেনে নেয়। দু-একজন যে পালাবার চেষ্টা না করে তা নয়, কিন্তু সেটা সম্ভাবনার পরপারে।

দ্বীপটি খুব ছোটো, ঘর বাড়িও অল্প দু একটি। অতি কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধীদেরই সেখানে নির্বাসিত করা হয়। মেইডটি বললো, জল দেখতে দেখতে ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে ঐ জনমনুষ্যহীন বৃক্ষলতাহীন বালুবেলায় পরস্পর পরস্পরকে কামড়াতে চায়, কেউ কেউ ঘোর উন্মাদে পরিণত হয়।

কী ভয়ঙ্কর শাস্তি। পরিণতির এই নিষ্ঠুর চিন্তাটাও আমার অসহ্য মনে হলো। মানুষ কী হৃদয়হীন।

অথচ আপাতদৃষ্টিতে দূর থেকে দ্বীপটিকে একটি শান্তির আশ্রম বলে ভ্রম হচ্ছিলো, মনে হচ্ছিলো, ঈশ্বর সাধনার যজ্ঞভূমি।

মাত্রই কয়েক ঘণ্টার জন্য আসা, বেরিয়ে পড়লাম তাড়াতাড়ি। ট্যাক্সিওলাই পথপ্রদর্শক হলো। অনেক ঘোরালো সে। শহরের কোনো কোনো রাস্তা এমন খাড়া যে যখন উঠছিলো মনে হচ্ছিলো পিছন থেকে পতন অনিবার্য। আবার যখন নামছিলো ভাবছিলাম এক্ষুণি হুড়মুড়িয়ে গড়িয়ে যাবো। অবশেষে বহু বিখ্যাত বহুশ্রুত গোল্ডেন গেটের উপর দিয়ে এপার ওপার করে যখন ফিরে এলাম, রওনা হবার সময় হয়ে গেছে প্রায়।

হোক। এখন নিউইয়র্কে গিয়ে পৌঁছতে পারলেই বাঁচি। এই মুহূর্তে সেটাই গন্তব্য, সেখানেই কিছুকালের জন্য স্থায়ী বাস। এক মাস যাবত ঘোরা-ঘুরি করে দেহ-মন এবার একটু বিশ্রাম চাইছিলো। হোটেলের নিবাস থেকে স্বাধীনভাবে নিজেরা সংসার পেতে বসতে ইচ্ছে করছিলো।

শুনেছি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জন্য ছ-তলার উপরে বেশ ভালো একটি অ্যাপার্টমেন্ট ঠিক করে রেখেছে সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরত্ব মাত্রই কয়েক ব্লক। অর্থাৎ বুদ্ধদেব হেঁটেই যাতায়াত করতে পারবেন। নিজের বাড়ি দশ হাজার মাইল দূরে, কাছের এই ক্ষণিক বাড়ির জন্যই ব্যাকুলতা বোধ করছিলাম।

আমি নতুন কিন্তু বুদ্ধদেব সেখানে আগেও এসে গেছেন, থেকে গেছেন, আমেরিকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বদান্যতা বন্ধুতা সব কিছুতেই তিনি মুগ্ধ। সেই মুগ্ধতা আমার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিলো। আমি দুশো দুই নম্বর রাসবিহারী অ্যাভিনিউর বাড়িতে বসে একদিন অন্তর একদিন একটি চিঠির মারফত সব কিছুর খুঁটিনাটিই এদেশ সম্পর্কে জেনে ফেলেছিলুম। আমি জানতাম পৃথিবীর সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য এই শহরটি কী পরিচ্ছন্ন, মানহাটানের ঔজ্জ্বল্য কতো চোখ ধাঁধানো, মেসি নিমবেলস নামক দুটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর কী বিশাল, ফিফথ অ্যাভিনিউর জনস্রোত কী উতরোল, গ্রীনিচ ভিলেজের রাত্রি কতো উত্তেজনা, লোক-জনেরা কী বন্ধুতা সম্পন্ন, খাদ্যসম্ভার কী উপাদেয়—আর সংসার করার আরামের তো কোনো তুলনাই নেই। নইলে তাঁর মতো একজন নির্ভরশীল মানুষও নিজে রেঁধে বেড়ে খেয়ে বেঁচেবর্তে ফিরে আসে দেশে?

এখন আমি সেই স্বপ্নের দেশে আরামের সংসার পেতে বসতে পারলে সত্যিই বাঁচি।

এখানকার সব এয়ারপোর্টই দেখছি সমুদ্রতীরে। প্লেন যখন নামে তাকিয়ে ভয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটে। একবার নিরাপদে অবতীর্ণ হতে পেরেছিলাম বলেই যে আবারো ঠিকঠাক মতো প্রাণ নিয়ে নামতে পারবো তেমন ভরসা হয় না। ভাবতেই পারি না ডুবে না গিয়ে আবার পায়ের তলায় কখনো মাটি পাবো। হাজার যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করেও মনকে আশ্বস্ত করা যায় না। জানালা দিয়ে যখন জলের ঢেউ প্রায় দেখা যায়, তখন নিজের ভিতরে আর জল থাকে না। অথচ দাঁতমুখ চেপে চোখ বুজতে না বুজতেই ঠক করে শক্ত মাটিতে চাকা ঠেকিয়ে ছুটতে শুরু করে বিমান।

নিউইয়র্কের আইডেলওয়াইল্ড (এখন কেনেডি) এয়ারপোর্টেও অনুরূপ

... অন্ধকার ছেয়ে গেছে চারিদিকে। নেমেই বরফের স্তূপে হুমড়ি খেলাম। পায়ে শৌখিন জুতো, গায়ে হালকা। সিল্কের লুটানো শাড়ি, হাতে পর্যটনপ্রমাণ মালপত্র—কুমিলয়ার মতন তুষার পর্বতের এই অপ্রত্যাশিত মারাত্মক আদরে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে যেতে একজন শ্বেতাঙ্গের হস্তক্ষেপে উদ্ধার পেলাম।

রাস্তায় এসে দেখি অর্ধগলিত, পূর্ণগলিত, বিগলিত বরফের রাশি মানুষ আর গাড়ির চাপে যেমন নোংরা তেমনি কাদা কাদা, তেমনিই পথরোধকারী হয়ে যায়। বরফ বলতেই আমাদের চোখে যে শ্বেতশুভ্র একটি ছবি ফুটে ওঠে তার সঙ্গে তার কোনোই মিল নেই। মনে হয় সারা শহর ধ্বংস করে এই জেতা ময়লা পাহাড় তৈরী হয়ে আছে ভূমিতে। কোনো কোনো জায়গায় কেউ কোনো এই পাহাড় মানুষ প্রমাণ উঁচু। কুয়াশায় রাস্তার আলোগুলো ঝাপসা, কাছেই ভালো নজরেও আসে না।

নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন মিঃ রাসেল স্মীথ আমাদের নিতে এসেছিলেন। আমার অবস্থা দেখে দুঃখিত হয়ে বললেন, 'এই সময়টা নতুন আগন্তুকদের পক্ষে বড়ো অসুবিধের। আজ সাত দিন কেবল বৃষ্টি আর বরফ, এক ফোঁটা রোদের দেখা নেই, তাই গলছেও না।'

আমি মনে মনে বললাম, এরা তো শুনি সব পারে, ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়া বরফ গলাতে পারে না কেন?

আমার মনের কথারই প্রতিধ্বনি করে রাসেল স্মীথ আবার বললেন, 'সতেরো দিন পরে, বরফে শহর ঢাকা, এমন বরফ চল্লিশ বছরের মধ্যে পড়েনি, সারাদিন বুলডোজার চালিয়ে কোনো রকমে গাড়ি চলার মতো রাস্তাটুকু মুক্ত রাখা যাচ্ছে, প্রতি ঘণ্টায় এর খরচ কতো জানেন? এই বলে এমন একটা দুঃসহ সংখ্যা বললেন যে ঐ ধনীদেশের রাজকোষও তাতে দরিদ্র হয়ে যাবে। সুতরাং এখন ভগবানই ভরসা। একদিনও যদি ভালোমতো রোদ ওঠে এবং সারাদিন থাকে তাহলেও অনেক সুরাহা হবে। বরফ নিজে থেকেই গলে গিয়ে হাডসন নদীতে গড়িয়ে জলে মিশে যাবে।'

আমি সভয়ে বললাম, 'আর রোদ না উঠে যদি সমানেই বৃষ্টি আর বরফ পড়তে থাকে তাহলে?'

উনি হাসলেন, 'তাহলে তো খুবই মুশকিল। একটা উপায় অবিশ্যি ভাবা হচ্ছে, রোদ্দুরই যদি নিজে থেকে প্রাকৃতিক সাহায্যে গলে যাবার কোনো আশা না দেখা যায়, তাহলে সুড়ঙ্গ কেটে আগুন দেয়া হবে, সেই তাপে গলবে।'

চলতে চলতে দেখলাম, সত্যিই সারা শহর একেবারে কুয়াশাবৃত। খুব সন্তর্পণে গাড়ি চালাচ্ছিলো ড্রাইভার, ভয় পাচ্ছিলো পাছে হড়কে যায়। আলো-গুলোর উপরেও বরফের মোটা আস্তরণ। যে সব জায়গা শহরের হৃৎপিণ্ড, যেখানে ... দশ-তলা বিশ-তলা ত্রিশ-তলার ভিড়, খোপে খোপে দেশলাইয়ের বাক্সের মতো ঘষা কাঁচের জানালা দিয়ে অজস্র আলোর কৌটাগুলোকে মনে হচ্ছিলো কোনো রহস্যময় গ্রহের সব জাদুকরের বাড়ি। কেবল বন্ধ দোকানের শো-কেইস-গুলোর আলোই খুব উজ্জ্বল। রাস্তা একান্তই জনবিরল। অবশ্য পরে জেনে-ছিলাম, এ সময়ে মাটির তলা দিয়েই লোকেরা চলাচল করে। শীতের জন্য কেউ ওঠে না উপরে, গাড়ি নিয়েও বেরোয় না। গাড়ি পার্ক করে যেখানে যাবে, যদি বরফ পড়তে শুরু হয় তাহলে ফিরে এসে সে গাড়ি আর সে পাবে না, বরলে দেখবে একটি অতিকায় সাদা জন্তু শক্ত হয়ে আছে মাটিতে। আর তার ভিতর থেকে গাড়ি উদ্ধার করা যাবে না। যতোদিন না সেই সাত-আট ইঞ্চি পুরু বরফের আচ্ছাদন গলে যায়।

চারদিকে তাকিয়ে এই মনমরা সন্ধ্যা আমার মনে বিষাদের ছায়া ফেললো। যা আমি কল্পনা করতে করতে এসেছিলাম তার সঙ্গে কিছুই মিললো না। তারই মধ্যে একটু আলোর রেখা এই যে আর কিছু না হোক, পৌঁছেই বাড়ির চিঠি-গুলো তো অন্ততঃ পাবো! সেটা মস্ত কথা।

ক্রমাগতই দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরছিলাম বলে সব ঠিকানাই ছিলো অস্থায়ী। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ঠিকানাতেই ওদের চিঠি লেখার কথা। চিঠির কথা ভাবামাত্রই নিরানন্দ বিমর্ষ শহর অনেকটা সহনীয় মনে হলো। এই সময়ে সামনে বসে থাকা স্মীথ সাহেব ঘাড় ফিরিয়ে সহাস্যে বললেন—

'আপনাদের অনেক টাকা আমি বাঁচিয়ে দিয়েছি।'

বুদ্ধদেব বললেন, 'কী উপায়ে?'

'আপনাদের অ্যাপার্টমেন্টটা এই এক মাসের জন্য অন্য এক দম্পতিকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছি।'

'আর আমরা!' আমাদের চোখ খাড়া।

'আর তো মাত্র তিন দিন আছে মাসের, এ তিনদিনের জন্য একটা হোটেল ঠিক করেছি। বাড়িওলাটি একেবারে গলাকাটা, ঐ তিন দিনের জন্য পুরো মাসের ভাড়া চায়।'

আমরা ধন্যবাদ দিয়ে চুপ। এতোগুলো টাকা বাঁচিয়ে দেবার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত ছিলো। কিন্তু মুখে এলো না।

ভদ্রলোক তারপরে আর একটি সুসংবাদ পরিবেশন করলেন, 'ভারি একটা ভুল হয়ে গেছে।'

'কী?'

'ইউনিভার্সিটির ডাকবাক্সে কাঁচের ফাঁকে দেখলাম অনেক চিঠি এসেছে আপনাদের। বাক্স খুলে আমার নিয়ে আসা উচিত ছিলো। একদম ভুলে গেলাম। আজ শনিবার, তার মানে কাল বন্ধ, সোমবারের আগে আর পাচ্ছেন না।'

এর পরে যে হোটেলটিতে এনে আমাদের তোলা হলো, ওয়াশিংটন স্কোয়ারের

এক অতি মধ্যবিত্ত হোটেল। ভ্রমণে বেরিয়ে এতোদিন যে সব হোটেলের নবাবী উপভোগ করে এসেছি, তারপরে এই বাসস্থান যে কী দীন মনে হলো বলা যায় না। ঢোকবার মুখটা বরফ জলে চ্যাপ চ্যাপ করছে, সস্তা কার্পেট ভেজা ভেজা, আলোর জৌলুষ নেই, আসবাবপত্র সাধারণ, স্থান অপরিসর, বিমর্ষ মন আরো বিমর্ষ হলো।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নিজেদের নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে অবিশ্যি একটু ভালো লাগলো। বেশ সাজানো গুছোনো পরিচ্ছন্ন ঘর, সামনে রাস্তার ধারে টানা জানালায় হালকা নেটের টানা পর্দা, আসবাবপত্রও মন্দ নয়।

যাকগে, মাত্রই তো তিনটে দিন, কেটে যাবে কোনোরকমে।

পরের দিন সকালে উঠে কিন্তু মনে হলো, কোনো রকমে কাটানোও বেশ কঠিন। হোটেলটিতে কোনো খাবার বন্দোবস্ত নেই, সংলগ্ন কোনো রেস্তোরাঁ নেই, এক কাপ চা খেতে হলেও বাইরে যাওয়া ছাড়া গতি নেই।

পৌঁছেছিলাম শনিবার সন্ধ্যায়, পরের দিন সকালে রবিবার। রোববারের মতো নিষ্ফলাবার যে এ রাজ্যে আর কিছু নেই, আমি তা জানতাম না। সকালে চোখ মেলেই বুদ্ধদেবের চায়ের অভ্যেস, আধো ঘুমে এই আমেজ তাঁর অতি প্রিয় ব্যসন।

না বেরুলে আর কোথায় তা পাওয়া যাবে? সুতরাং ঘুম ভেঙেই মন খারাপ। মন খারাপের আরো কারণ, আকাশ একেবারে ধোয়া মোছা শ্লেটের মতো বিবর্ণ। এক ছিটে রোদের আভাস নেই। সকাল না দুপুর না বিকেল কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

উঠে পড়তে হলো। একেবারে স্নানটান সেরে নিয়ে তারপর বেরুনো। আমি চায়ের উপাসিক নই, বুদ্ধদেবেরই কষ্ট হচ্ছিলো। কিন্তু বেরিয়ে আমাকেই হাসিমুখে আশ্বাস দিলেন, 'ভেবো না, কাল আসতে আসতে কাছেই একটা 'ডেলিকেটেসন' দেখে এসেছি, চলো, তোমাকে চমৎকার একটা ব্রেকফাস্ট খাওয়াবো।'

আমিও একটু হাসলাম। এদেশে এসে বুদ্ধদেব আমাকে তাঁর অতিথি করেছেন। স্বদেশে স্বস্থানে হলে এই ব্যতিক্রমে কতো যে হাঁক ডাক হতো প্রায় কানে শুনতে পাচ্ছিলাম। আমিও তো এ সুযোগ ছাড়ি কেন, সঙ্গে সঙ্গে আতিথ্যের দ্যুতিতে অতিথির গাম্ভীর্য ভাব এনে ফেললাম চেহারায়।

'ডেলিকেটেসন' কাকে বলে আমি জানি না, এ শব্দ আমার কাছে নতুন। পরে বুঝেছিলাম, যেখানে কাঁচা পাকা সব রকম খাবারের বন্দোবস্ত থাকে তাকেই এরা ডেলিকেটেসন বলে।

স্ট্রীট ছাড়িয়ে অ্যাভিনিউতে পৌঁছুলাম, কোথায় ডেলিকেটেসন! যেদিকে তাকাই কেবল উঁচু নিচু উঁইয়ের ঢিবির মতো বরফের স্তূপ। আর সব বন্ধ। ছ সাতটা ব্লক পার হয়েও কোনো দরজা খোলা পাওয়া গেল না। বরফের উপর দিয়ে চলতে আমার অনভ্যস্ত পা ক্রমাগতই ঠেকে যাচ্ছিলো, ঠান্ডায় অবশ হয়ে যাচ্ছিলো, একটি জনপ্রাণীর দেখাও মিলছিলো না, তার মধ্যে ঝুপ ঝুপ দু'বার একটু একটু ছোটো বৃষ্টিও হয়ে গেল।

'কী আশ্চর্য, একটা ড্রাগ স্টোরও কি খোলা নেই?' এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিলো, তার পরেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওঃ হো, আজ তো রোববা

আমি বললাম, 'রোববার তো কী!'

'রোববার যে এখানে সব বন্ধ। ঈশ্! আমার একদম মনে ছিলো না। চলো তো ও দিকটায় যাই।'

ওয়াল্টডিজনির ইঁদুরের ছবির মতো খাবার খুঁজতে আমরা ক্রমাগত বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ার মধ্যেই চক্কর দিচ্ছিলাম, এবার উল্টোপথ ধরলাম, অর্থাৎ শহরের দিকে চলতে শুরু করলাম। আস্তে আস্তে একজন দুজন পথচারীর সাক্ষাৎও মিললো, তাদের জিজ্ঞেস করে জানা গেল কাছেই, ব্লক তিনেক হেঁটে রাস্তা পার হলেই একটা হাওয়াই রেস্তোরাঁ আছে, সেটা রোববার খোলা থাকে।

ঘড়ির কাঁটা ততোক্ষণে বারোর ঘর ছুঁয়েছে, মাথা ধরেছে, বরফ ভেঙে টিপিটিপি পায়ে হাঁটতে সময় লাগছে অনেক, রাস্তা পার হতে গিয়ে সরের মতো পাৎলা আয়নার মতো চকচকে এক রকম পিছল বরফে সোজা পড়ে গেলাম। ঐ জন বরফ কাটিয়ে ওপর উঠতে পারি না। কী দশা।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত বহাল তবিয়তেই হাওয়াই রেস্তোরাঁটিতে এসে পৌঁছোনো গেল। ঘরে ঢুকে নরমে-গরমে কী আরাম। কী শান্তি। দেখা গেল উৎকৃষ্ট চীনে খাবার আছে সেখানে। কিন্তু তার আগে এক পট চা। যুঁইফুলের মতো গন্ধওলা চীনে চা নিয়ে এলো, তাই স্বর্গ!

পরের দিন অবশ্য তেমন ঝামেলা হলো না, বিকেলে বক্তৃতা ছিলো বুদ্ধদেবের, বক্তৃতার পরে কলেজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার মাধ্যমে আলাপ পরিচয়ের ব্যবস্থা হয়েছিলো, দুপুরেও একজন লাঞ্চে ডেকেছিলেন।

পরের দিন বিকেলে ওয়াশিংটন থেকে ডক্টর অশোক মিত্র (এখন পশ্চিম বাংলার অর্থমন্ত্রী) এলো দেখা করতে। অশোক তখন ওয়াশিংটনে কর্মরত। অশোক আসতেই বরফ-পড়া রৌদ্রহীন বিরস হোটেল মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ওর স্ত্রী গৌরীও সঙ্গে ছিলো। স্নেহমিশ্রিত হৃদয়ে সেই সন্ধ্যায় আর কোনো স্বজনের দুঃখ রইলো না।

বিজ্ঞান

পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র

ট্রম্বে থেকে ফিরে : ৩

অপারেশন ইজ সাকসেসফুল, বাট দ্য পেশেন্ট ইজ ডেড'। শল্য চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে এই প্রবাদটি এক কালে প্রায় সবার মুখে মুখেই ফিরত। নামী ডাক্তার। দক্ষ হাত। প্রচুর অভিজ্ঞতা। তবু অস্ত্রোপচারের পর দেখা গেল, রোগী মুমূর্ষু। চলল যমে মানুষে লড়াই। তারপর, সব শেষ।

খুব পুরনো দিনের কথা নয়। মাত্র বছর তিন চার আগে কলকাতার বড়সড় কোন এক হাসপাতালেই তো ঘটেছিল ঘটনাটা। সামান্য অস্ত্রোপচার। কিন্তু অস্ত্রোপচারের পর রোগী আক্রান্ত হল টিটেনাসে। মারা গেল। ওই ঘটনার পর চিকিৎসকদের মধ্যে বড় রকমের চাঞ্চল্যও সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁরা ঠিক ভেবে পাচ্ছিলেন না, অপারেশন থিয়েটারে টিটেনাসের জীবাণু কি করে আসে? এর সম্ভাব্য উত্তর হয়ত তিনটি। এক, যে সব ছুরি, কাঁচি এবং সাজসরঞ্জাম অস্ত্রোপচারের সময় ব্যবহার করা হয়, হয়ত তাদেরই কারো না কারোর গায়ে লেগেছিল প্রাণঘাতী সেই টিটেনাস রোগের জীবাণু। দুই, তুলো বা গজের মধ্যেও ওই রোগের জীবাণু পরিবাহিত হতে পারে। তিন, অস্ত্রোপচারের সময় ডাক্তাররা যে দস্তানা ব্যবহার করেছিলেন তাতেই রোগের জীবাণু লেগে ছিল না কে বলতে পারে?

স্টেরিলাইজেশন। অর্থাৎ নির্জীবাণুকরণ। যে কোন চিকিৎসকের কাছেই এখন এটা বড় রকমের এক সমস্যা। এই সমস্যারই একটি অব্যর্থ সমাধান এনে

ট্রম্বে পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে জনৈক কুশলী যান্ত্রিক হাতের সাহায্যে তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট-৬০কে আধারের মধ্যে সংরক্ষিত করছেন। কোবাল্ট-৬০ আছে বিকিরণরোধী কক্ষের ভেতর। সীসে-মেশানো কাচের জানলা পথে ভেতরের অংশটি দেখতে হচ্ছে কুশলীকে।

দিয়েছে 'আইসোমেড'। বা ইরেডিয়েশন প্ল্যান্ট ফর স্টেরিলাইজেশন অভ্ মেডিকেল প্রোডাক্টস। ট্রম্বের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের এই প্ল্যান্ট চিকিৎসাসংক্রান্ত সামগ্রীর নির্জীবাণুকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বাঁ পাশে সাইরাস পারমাণবিক চুল্লি। চুল্লির ডান দিকের আঁকাবাঁকা পথ ধরে মাইল খানেক দক্ষিণে এগিয়ে গেলেই চোখে পড়বে পুরু কংক্রিটের বাড়ি আইসোমেড। আইসোমেডের এক দিকে পাহাড়। আর এক দিকে আরব সাগরের খাঁড়ি। খাঁড়ির মাঝে অদূরে এলিফেন্টা। সাধারণ মানুষও যাতে অনায়াসে এখানে যাতায়াত করতে পারে তার জন্য এই প্লান্টটিকে সিকিউরিটির কড়া চৌহদ্দির বাইরে বসান হয়েছে।

ঘরের মধ্যে ঘর। তার মধ্যে ঘর। ভেতরের ঘরের দেয়াল [illegible] থেকে [illegible] ফুট পুরু কংক্রিটে তৈরি। যে কংক্রিটের মধ্যে রয়েছে সীসে। তেজস্ক্রিয় গামা রশ্মির বিকিরণ যাতে ভেতরে আবদ্ধ থাকতে পারে, বাইরে গিয়ে মানুষ, পশুপাখি বা গাছপালার ক্ষতি করতে পারে, তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল পিজবোর্ডের তৈরি কয়েক ডজন প্যাকিং বাক্স। লম্বায় ৫১ সেন্টিমিটার, চওড়া ৩৪ সেন্টিমিটার এবং ৪৩ সেন্টিমিটার উচ্চতা। কনভেয়ার বেল্টের ওপর বাক্সগুলি পর পর সাজান। সেই বেল্টের ওপর চড়ে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর পর কয়েকটি বাক্স গিয়ে ঢুকছে বিকিরণ কক্ষে। যার ওঁরা নাম দিয়েছেন গোলকধাঁধা। বাইরে থেকে এর ভেতরটা দেখা যায় না।

জনৈক অফিসার বললেন, এসব বাক্স আমাদের নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন মত প্যাক করা। পাঠিয়েছেন বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানি। এদের কোনটির মধ্যে আছে প্লাস্টিকের থলে। সেই সব থলের মধ্যে আছে নানা রকম সামগ্রী। অস্ত্রোপচারের ছুরি, কাঁচি থেকে শুরু করে ইনজেকশন দেবার সিরিঞ্জ, তুলোর প্যাকেট, গজ, প্রভৃতি। কোন কোন থলের মধ্যে আছে নানা রকম ওষুধের টিউব। যেমন চোখের মলম, এই সব।

ভদ্রলোক বললেন, ধরুন শরীরের কেটে যাওয়া কোন অংশ ড্রেস করতে হবে। এর জন্যে দরকার তুলো, গজ এবং ব্যান্ডেজের কাপড়। এসব একটি প্লাস্টিকের থলের মধ্যে পুরে থলেটির মুখ সিল করে দেয়া হয়। এ ধরনের অনেক থলেই ওই বাক্সগুলির মধ্যে পাবেন। আবার কোন কোন থলের মধ্যে সিল করে রাখা আছে ভ্যাসেকটমি বা টিউবেকটমির সাজসরঞ্জাম। এমন ভাবে সিল করা, যাতে বাইরের বাতাস না তাদের ভেতরে ঢুকতে পারে।

থলে ভর্তি বাক্সগুলি গোলকধাঁধার মধ্যে গিয়ে হাজির হবে তীব্র গামা রশ্মির সামনে। কারণ ওই গোলকধাঁধার মধ্যে রেখে দেয়া হয়েছে গামা রশ্মি বিকীর্ণ করে এমন ধরনের এক তেজস্ক্রিয় রেডিও আইসোটোপ। গামা রশ্মির মাত্রা ২.৫ মেগারাডস। এই মাত্রার গামা রশ্মির সংস্পর্শে থলের মধ্যে রাখা বস্তুগুলির মধ্যে সামান্যতম রোগ জীবাণুও যদি থাকে তারা মারা পড়ে। এই ভাবেই করা হয় তাদের নির্জীবাণুকরণ।

প্রঃ আপাতত কি কি জিনিস আপনারা এই প্ল্যান্টে নির্জীবাণুকরণ করছেন?

উত্তরঃ ক্ষতস্থান সেলাই করার তন্তু, অস্ত্রোপচারকালীন ব্যবহারযোগ্য দস্তানা, মুখোশ, টুইজার, ছুরি কাঁচি, দস্তানার পাউডার, প্লাস্টিকের ইনজেকশন সিরিঞ্জ, ঢাকা দেবার কাপড়, প্রোস্থেসিস, ক্যাথেটারস, প্রোবস, রক্ত দেবার এবং নেবার যন্ত্রপাতি, গজ, সূঁচ, কাঁচ বা প্লাস্টিকের নল, ভ্যাসেকটমি এবং টিউবেকটমি কিটস, মেটারনিটি প্যাড, ওষুধপত্রের টিউব, অ্যান্টিবাইওটিক চূর্ণ, প্রভৃতি।

*

সমস্যাটা এই। ব্যক্তিগত চিকিৎসক থেকে শুরু করে বড় বড় হাসপাতাল বা গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দেখুন। একটি মাত্র ইনজেকশন দেবার সিরিঞ্জ। সেই একই সিরিঞ্জের সাহায্যে চিকিৎসক একাধিক রোগীর দেহে ইনজেকশন দিয়ে চলেছেন। প্রতিবার ইনজেকশন দেবার আগে সিরিঞ্জ এবং সূঁচ অবশ্য অ্যালকোহল বা অনুরূপ কোন বস্তুর সাহায্যে শোধন করে নেওয়া হয়। কিন্তু তাতে রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। অনেক সময় অস্ত্রোপচারের সাজ সরঞ্জাম জলে সেদ্ধ করে নির্জীবাণুকরণ করা হয়। এতেও ঝুঁকি থাকে যথেষ্ট। প্রথমত গরম জলের ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই করে ওঠা সম্ভব হয় না। হলেও ওই জলে নির্ভরযোগ্য এ কাজটি করা যায় না। দ্বিতীয়ত, কোন কোন সাজসরঞ্জাম বা ওষুধপত্র এই পদ্ধতিতে অনেক সময় শোধন করাও সম্ভব হয় না। এর ফলে বহুক্ষেত্রে ইনজেকশন দিতে গিয়ে অথবা অস্ত্রোপচারের পর রোগীকে বিপদে পড়তে হয়।

'অথচ দেখুন', আইসোমেডের সেই ভদ্রলোক বললেন, বিকিরণ পদ্ধতিতে এ কাজটি সহজেই সারা যায়। পিজবোর্ডের বাক্স ভেদ করে গামা রশ্মি অনায়াসে প্লাস্টিকের থলের মধ্যে রাখা সামগ্রীর ওপর গিয়ে পড়ে। এবং সাধারণ তাপমাত্রাতেই তাদের ওপর জমে থাকা জীবাণুদের ধ্বংস করে।

Prestige

পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের কথাই ভাবুন। ...রের হাসপাতালে প্রচণ্ড ভিড়। ভিড় গ্রামাঞ্চলের ...স্থ্যকেন্দ্রেও। বিকিরণের সাহায্যে নির্জীবাণুকৃত ... একটি কিট এই সব কেন্দ্রে কাজে লাগান যেতে ...রে। এক এক জনকে ভ্যাসেকটমি বা টিউবেকটমি ...তে যা যা দরকার প্রতিটি কিটের মধ্যে সেসবই ...ওয়া যাবে। একজনকে অপারেশন করার পর ...টার ফেলে দিতে হবে।'

ভদ্রলোক একটি প্লাস্টিকের প্যাকেট ...ক ধরলেন আমার সামনে। বললেন, এই প্যাকেটের ...র দেখুন তুলো এবং গজ রয়েছে। প্যাকেটটি ...ল করা। ফলে বাইরে থেকে বাতাস ঢুকে যে ...বাণু দূষিত করবে তার উপায় নেই। গামা রশ্মির ...হায্যে এর ভেতরের সামগ্রী জীবাণুমুক্ত করা ...য়েছে। প্যাকেটটি যতদিন ইচ্ছে এই অবস্থায় রেখে ...ন। ওই তুলো আর গজ জীবাণুমুক্ত থাকবে। ...বার হয়ত শরীরের কোন অংশ কেটে গেল। ...বে প্যাকেট ছিঁড়ে গজ, তুলো এবং ব্যাণ্ডেজ ...বহার করুন। কোন ঝুঁকি নেই। অথচ, ভাবুন, ...সপাতালে খোলাভাবে যে তুলো বা ব্যাণ্ডেজ ...কে তাতে রোগসংক্রমণের আশঙ্কা থাকে কত ...বীণ।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় না, এতে খরচ ...নেক বেশি পড়বে ?

উত্তর : কিছুটা বেশি পড়বে। তবে একটা কথা ...বুন, ধরুন কারোর শরীরে গজ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ ...রতে হল। আইসোমেডে শোধন করা সামগ্রী ...বহার করলে সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে অনেক ...ম। অথচ হাসপাতালগুলিতে যে ধরনের তুলো ...

...আইসোমেডের ভেতরে বিকিরণের সাহায্যে নির্জীবাণনের জন্যে বিভিন্ন সামগ্রী বোঝাই বাক্সগুলি কনভেয়ারের ওপর সাজিয়ে রাখছেন জনৈক-কর্মী।

...গজ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করা হয়, যে কোন মুহূর্তে ...ই আশঙ্কাটা কি এড়িয়ে যেতে পারেন ? আর ...তাই যদি একবার ইনফেকশন ঘটে, ভাবুন, ...পনার খরচের বোঝা বেড়ে গেল। সেই সঙ্গে ...ল ঝক্কি।

কথাটা ঠিক। আর একথা ভেবেই বহু প্রতি-...ন এখন আইসোমেডের সাহায্য নিচ্ছে। বিকিরণের ...হায্যে শোধন করে নিচ্ছে নানা রকম সামগ্রী। ...কাতার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বাক্সও দেখলাম ...খানে।

প্রশ্ন করেছিলাম ডঃ রামন্নাকে : আইসোমেডের ...য়োজনীয়তা এখন অনস্বীকার্য। কিন্তু একটি ...ইসোমেড কি সারা দেশের চাহিদা মেটাতে ...রবে ?

ডঃ রামন্নার উত্তর : কলকাতায় এ ধরনের ...কটি প্ল্যাণ্ট বসানর পরিকল্পনা আমরা করছি। এটা ...ন হলে, পূর্ব ভারতই শুধু নয়, এশিয়ার ...অঞ্চলের অনেক দেশও তাতে লাভবান হবে।

সে প্ল্যাণ্ট কবে বসবে, জানি না। তবে এখানে ...য়ার কারোর সঙ্গে কথা বলে মনে হল, সেটা ...নেকটা নির্ভর করছে এ অঞ্চলের চিকিৎসা বিষয়ক ...জসরঞ্জাম এবং ওষুধপত্রের যাঁরা কারবারী তাঁদেরও ...পর। মনে হয়েছে, তাঁরা আগ্রহী হলে এ কাজ ...ড়ও বাস্তবায়িত হতে পারে।

*

মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবস্থাকে বলা ...পরমাণু। একই মৌলিক পদার্থের যে কোন পরমাণুর রাসায়নিক গুণাগুণ একই রকম হয়ে থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন, রাসায়নিক গুণাগুণের দিক থেকে গরমিল না থাকলেও বেশ কিছু সংখ্যক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর মধ্যে কিছুটা ভৌতিক স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। হলই বা তারা একই মৌলিক পদার্থের পরমাণু। উদাহরণ স্বরূপ লোহার কথাই ধরুন। বিশুদ্ধ লোহার মধ্যে একমাত্র লোহার পরমাণু থাকে ঠিকই। কিন্তু দেখা গেছে ওই সব পরমাণুর মধ্যে কারোর ওজন এক রকম, কারোর অন্যরকম। ওজনের ভিত্তিতে হিসেব করলে দেখা যায় লোহার মধ্যে থাকে চার রকম পরমাণু। তাদের পারমাণবিক ভর যথাক্রমে ৫৪, ৫৬, ৫৭ এবং ৫৮। এবং তাদের হার যথাক্রমে শতকরা ৫.৮৪, ৯১.৬৮, ২.১৭ এবং ০.৩১। এদের বলা হয় লোহার আইসোটোপ। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে নিউট্রন কণার সংখ্যা বেশি না কম, তার ওপরই নির্ভর করে কোন বস্তুর পরমাণুর আইসোটোপ। বলা বাহুল্য, নিউট্রনের সংখ্যার হের-ফেরের জন্যেই একই মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক ভার ভিন্নতর হয়ে থাকে।

কোন কোন আইসোটোপের নিউক্লিয়াস আবার স্থিতিশীল নয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের শক্তির ক্ষরণ হয়ে থাকে। এবং অবশেষে স্থিতিশীল অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। পরমাণুর এই উদ্বৃত্ত শক্তি বেরিয়ে আসে কখনও আলফা কণা হিসেবে, কখনও বিটা কণা হিসেবে, আবার কখনও বা গামা বিকিরণ হিসেবে। আলফা কণা আসলে হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস। এর মধ্যে থাকে দুটি প্রোটন এবং দুটি নিউট্রন। তার পারমাণবিক ভর ৪। এই সব কণা পজিটিভ আধান বহন করে। বিটা কণা আসলে ইলেকট্রন। বহন করে নেগেটিভ আধান। আর গামা এক ধরনের প্রচণ্ড তেজ সম্পন্ন বিকিরণ। এক্স-রশ্মির সঙ্গে তার তুলনা চলে এতে। কোন বৈদ্যুতিক আধান থাকে না।

আরও একটি কথা। 'হাফলাইফ' বা অর্ধ-জীবন। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের কথা উঠলেই অনেকেই হয়ত লক্ষ করেছেন এই শব্দটিও তার সঙ্গে উচ্চারণ করা হয়। শব্দটির অর্থ কি ?

ধরুন, এক তাল তেজস্ক্রিয় ফসফরাস নিলেন। যার পারমাণবিক ভর ৩২। এর মানে কিন্তু এই নয় যে, ওই এক তাল ফসফরাসের সমস্ত পরমাণুই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। কিছু সংখ্যক ফসফরাস পরমাণু তেজস্ক্রিয়, কিছু সংখ্যক তেজস্ক্রিয় নয়। দেখা গেছে, ১৪ দিনের মধ্যে ওই তেজস্ক্রিয় পরমাণুগুলির প্রায় অর্ধেক ক্ষরণের দরুন ভিন্নতর অবস্থায় রূপান্তরিত হয়, বাকি অর্ধেক অপরিবর্তিত আছে। এই ১৪ দিনকেই বলা হয় তেজস্ক্রিয় ফসফরাস-৩২ এর হাফ লাইফ। অর্থাৎ হাফ লাইফ এমন একটি সময় যে সময়ে মোট তেজস্ক্রিয় পরমাণুর অর্ধেক সংখ্যক পরমাণু শক্তি ক্ষরণের মাধ্যমে, তা সে আলফা কণার ভেতর দিয়েই হোক, অথবা বিটা কণার, কিংবা গামা বিকিরণ—পুরোপুরি রূপান্তরিত হয়ে যায়। পরমাণু বিজ্ঞানীরা এই রূপান্তরকেই বলে থাকেন 'রেডিও অ্যাকটিভ ডিকে'। উল্লেখ্য, 'হাফ লাইফের' সময়কাল এক-এক আইসোটোপের ক্ষেত্রে এক এক রকম। ...কোনটার ক্ষেত্রে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। যেমন ফ্লুওরিন-১৮র হাফ লাইফ মাত্র ১.৮ ঘণ্টা। আবার কার্বন-১৪র হাফ লাইফ কয়েক হাজার বছর।

প্রকৃতিতে মোটামুটি পঞ্চাশটি মৌলিক পদার্থের আইসোটোপের সন্ধান পাওয়া গেছে। যাদের বেশির ভাগই ভারি পদার্থ। যেমন বিসমাথ, থোরিয়াম, সীসে, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি। তবে পারমাণবিক চুল্লি এবং সাইক্লোট্রনের মত পারমাণবিক শক্তি যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম পদ্ধতি এ পর্যন্ত প্রচুর সংখ্যক তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসের ওপর যথেষ্ট তেজ সম্পন্ন প্রোটন, আলফা বা নিউট্রন কণার আঘাত হেনে, কিংবা গামা রশ্মির আঘাতে এই সব আইসোটোপ তৈরি করা হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের চাহিদা বাড়ছে। বাড়ছে কৃষি-বিজ্ঞানের গবেষণায়, চিকিৎসায়, ভূ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কাজে। শিল্পোদ্যোগের জন্যেও তো আইসোটোপ চাই। আইসোটোপের ব্যবহার এখন আরও কত কাজেই বেড়েছে। শুধু বিশেষ কয়েকটি আইসোটোপ ছাড়া নানারকম আইসোটোপ দেশে পারমাণবিক ... নেবার আগে অতি মূল্যবান এবং ... কোন ক্ষেত্রে অপরিহার্য এসব বস্তুর ... আমাদের পুরোপুরি নির্ভর করতে হত বিদেশের ওপর। তার জন্যে খরচা হত প্রচুর। লুটে কারবার করতে গিয়ে বিদেশী কোম্পানিরা ... যেমন ... , টালবাহানাও ছিল তাদের ... প্রচুর অর্থের বিনিময়ে যেন দাক্ষিণ্য ... ।

কিন্তু পটের পরিবর্তন হয়েছে। ভাবা পারমাণবিক গবেষণাকেন্দ্রের চেষ্টায় আইসোটোপ ... উৎপাদনের ব্যাপারে আমাদের দেশ এখন আত্ম-নির্ভর। বিশেষ ধরনের গুটিকয় আইসোটোপ ছাড়া। তাই এখন আইসোটোপ রপ্তানি করছে বিদেশে।

এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছিলাম ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের বিশিষ্ট আইসোটোপ ... ডঃ ডি কে আইয়ার সঙ্গে। অত্যন্ত আলা- ... ডঃ আইয়া। কথা বলছিলাম তাঁর গবেষণাগারে ...।

বললেন, বিশ্বাস করুন, মিঃ কর, মানব- ... কতটুকু কাজে লাগাতে পেরেছি ... এই রেডিও আইসোটোপ? আইসোটোপ উৎপাদনের ব্যাপারে আমরা আত্মনির্ভর। এর ... কোথায় নেই? বিশেষ করে চিকিৎসা এবং ... শিল্পে আইসোটোপের ভূমিকা এখন কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উচিত এগিয়ে আসা। তাতে করে ... যে মানুষেরই উপকার হবে তা নয়, অর্থ-নৈতিক দিক দিয়ে তাঁরাও লাভবান হবেন। তাঁরা আমাদের সঙ্গে দয়া করে যোগাযোগ করুন, কৌশলগত অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরাই সাহায্য করব ...।

বুঝলাম, আইসোটোপের জগতেই মনে প্রাণে ... রয়েছেন ডঃ আইয়া। তাঁর স্বপ্ন, দেশ ... বিজ্ঞানের এই বিশেষ ফলটি মানুষের কল্যাণে কাজে লাগুক। এ ব্যাপারে ডঃ আইয়ার সঙ্গে আমি দীর্ঘ আলোচনা করেছি। সে আলোচনা টেপ রেকর্ড করে ... এসেছি। পরবর্তী সংখ্যায় তার উল্লেখ ... আপাতত আইসোটোপ উৎপাদন সম্পর্কে তাঁর ... আমার যে কথাবার্তা হয়েছিল এখানে উল্লেখ করলাম।

প্রঃ ডঃ আইয়া, শুনেছি, দেশের চাহিদা মিটিয়ে ভারত এখন বিদেশের বেশ কয়েকটি দেশে আইসোটোপ রপ্তানি করছে। কোন কোন দেশে রপ্তানি করছে? তাতে কতটা আর্থিক সাশ্রয় ঘটেছে আমাদের?

ডঃ আইয়া: যে সব দেশে আইসোটোপ রপ্তানি করছি তাদের মধ্যে আছে অস্ট্রেলিয়া, ... আবু-ধাবি, আর্জেন্টিনা, আফগানিস্থান ... বার্মা, ব্রাজিল, বাংলাদেশ শ্রীলংকা ... ডেনমার্ক, ইথিওপিয়া, ফ্রান্স, ঘানা, গ্রীস, ... হাঙ্গেরি, হল্যান্ড, ইটালি, ইনদোনেশিয়া, ইরান, ... জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, কুয়াইত, কেনিয়া, ... মরোক্কো, মেকসিকো, মালেশিয়া, নেপাল, ... ফিলিপিনস, পোল্যান্ড, পেরু, রোমানিয়া, ... সিঙ্গাপুর, সেনেগাল, সিরিয়ান আরব রিপাবলিক, সুদান, স্পেন, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, ... তানজানিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউনাইটেড ... রিপাবলিক, উগান্ডা, উরুগুয়ে, ভিয়েতনাম এবং ... জার্মানি। আমাদের আয় হয়েছে ২১ লক্ষ হাজার টাকা।

প্র: ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে কি কি ... আইসোটোপ আপনারা তৈরি করছেন?

ডঃ আইয়া: ... রকম আইসোটোপ এখানে আমরা তৈরি করে থাকি। এক, চিকিৎসা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণার লাগে এমন শ্রেণীর আইসোটোপ। যেমন, আইওডিন-১১, ফসফরাস-৩২, ক্রোমিয়াম-৫১, ব্রোমিন-৮২, সোডিয়াম-২৪, সালফার-৩৫ পটাশিয়াম-৪২, ক্যালসিয়াম-৪৫, আইরন-৫৯, রুবিডিয়াম-৮৬, টেকনেসিয়াম-৯৯এম, গোল্ড-১৯৮, প্রভৃতি এ ধরনের মোট ৪৫ রকম আইসোটোপ এখানে আমরা তৈরি করছি। দুই, বিভিন্ন শিল্পে কাজে লাগে এমন ধরনের আইসোটোপ। যেমন ইরিডিয়াম-১৯২, কোবল্ট-৬০, থেলিয়াম-২০৪। তিন, বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে কার্বন-১৪। ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র থেকে এখন মোট ৩৫০ রকমের আইসোটোপ পাওয়া যেতে পারে।

প্র: এ সব আইসোটোপ। তৈরির কাঁচা মাল কি ভারতেই পাওয়া যায়? না বিদেশ থেকেও কিছু কিছু আমদানি করতে হয়?

ডঃ আইয়া: বেশির ভাগই ভারতে পাওয়া যায়। যৎসামান্য আনতে হয় বিদেশ থেকে।

প্র: এখানকার কোন কোন পারমাণবিক চুল্লি কি কি আইসোটোপ তৈরি করে সে সম্পর্কে কিছু বলবেন?

ডঃ আইয়া: 'অপসরা'তে তৈরি হয় ফসফরাস-৩২, গোল্ড-১৯৮, কোবল্ট-৫৮, প্রভৃতি। এদের বেশির ভাগই ক্ষণজীবী আইসোটোপ। তবে বেশির ভাগ আইসোটোপের জন্যে আমাদের নির্ভর করতে হয় 'সাইরাসে'র ওপর।

প্র: গবেষণা ক্ষেত্রে আইসোটোপের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলুন।

ডঃ আইয়া: যেমন ধরুন ফসফরাস-৩২। সুপার-ফসফেট সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে ভারতের সমস্ত গবেষণাগারে এই আইসোপটি আমরা সরবরাহ করে থাকি। কৃষি গবেষণাগারে আমরা পাঠাই পটাশিয়াম-৪২, সালফার-৩৫, প্রভৃতি। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ধাতব পাতের পুরুত্ব মাপার জন্যে এখান থেকে সংগ্রহ করে থেলিয়াম-২০৪। বাতাসে ধোঁয়ার অবস্থিতি জেনে কোথাও আগুন লাগল কি না, সেটা জানতে সাহায্য করে আমেরিসিয়াম-২৪১। ক্যানসার চিকিৎসার জন্যে দরকার কোবল্ট-৬০। ঢালাই-এর মধ্যে সূক্ষ্ম ত্রুটি রইল কি না, সেটা জানতে সাহায্য করে ইরিডিয়াম-১৯২।

প্র: ডঃ আইয়া, কলকাতার সাইক্লোট্রনও তো নানা রকম আইসোটোপ তৈরি করবে শুনেছি। এ সম্পর্কে আপনি কি কিছু বলবেন?

ডঃ আইয়া: ভাল প্রশ্ন। দেখুন, সাইক্লোট্রোনের সাহায্যে এমন কিছু কিছু আইসোটোপ তৈরি করা যায়, যাদের পারমাণবিক চুল্লিতে তৈরি করা সম্ভব নয়। এই সব আইসোটোপের অনেকের হাফ লাইফ এত কম যে, তাদের সাহায্যে যদি কোন মূল্যবান গবেষণা চালাতে হয়, তা হলে সে সব গবেষণার সুযোগ কলকাতাতেই করতে হবে। যেমন ধরুন, ওই সাইক্লোট্রন তৈরি করতে পারবে তেজস্ক্রিয় ফ্লুওরিন-১৮। যার হাফ লাইফ মাত্র ১·৮ ঘণ্টা। অগ্নাশয়, দাঁত, শরীরের হাড়, রক্ত প্রবাহ—এ সবের ওপর তথ্যাদি জানা যেতে পারে এই আইসোটোপটির সাহায্যে। এটিকে নিশ্চয় আপনি বোম্বাই-এ নিয়ে আসতে পারবেন না। ১·৮ ঘণ্টার মধ্যেই তারা 'ডিকে' হয়ে যাবে। অতএব ওই সব তথ্য এর সাহায্যে কলকাতায় বসেই করতে হবে। আইরন-৫২ আর এর একটি স্বল্পস্থায়ী আইসোটোপ। এর হাফ লাইফ মাত্র ৮·২ ঘণ্টা। সাইক্লোট্রনে তৈরি হয়, চুল্লিতে নয়। অস্থি-মজ্জার রোগ নির্ণয়ে এই বস্তুটি সাহায্য করে। যদি অদূর ভবিষ্যতে কলকাতায় চিকিৎসা এবং চিকিৎসা-শিল্পের ভাল ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, পূর্বাঞ্চলে অনেকেই লাভবান হবেন বলেই আমার বিশ্বাস। এ লাভ উভয় ধরনের চিকিৎসা এবং অর্থনৈতিক—দুই দিক দিয়েই হবে।

ডঃ আইয়ার সঙ্গে কথা বলে মনে হল, বিজ্ঞানের আধুনিকতম সুযোগ যেমন চাই, সেই সঙ্গে দরকার সর্বসাধারণের মনে যথাযথ প্রবণতার উপস্থিতি। যে প্রবণতা সেই বিজ্ঞানকে বুঝে নিতে সাহায্য করে, সাহায্য করে নিজেদের কল্যাণে প্রয়োগ করার ব্যাপারে।

সমরজিৎ কর

শংকর

■ ৬৭ ■

এরপর বিচিত্র কান্ড। পনেরো মিনিট চুপচাপ বসে আছি, মা-জননীর দেখা নেই।

আরও আধঘন্টা কাটলো। এখনও বিলাসিনী দেবী ফিরলেন না।

বিলাসিনী দেবী কি আমার কথা ভুলেই গেলেন? আমি গালে হাত দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম।

কে এমন টেলিফোন করলো যে আধঘন্টা ধরে দেখা নেই? এ বিষয়ে মনে-মনে গবেষণা করে আরও কিছুক্ষণ সময় কাটানো গেলো। ঘড়ির কাঁটা আরও কিছুটা ঘুরলো, কিন্তু ফল তেমন হলো না। এখনও বিলাসিনী দেবী জলসাঘরে ফিরলেন না।

একবার অন্যরকম মনে হলো। সংসারে নিরাসক্ত ধনবতী মহিলাদের জীবনযাত্রা ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আমার তেমন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই। হয়তো এইভাবেই তাঁরা একটা কাজের মধ্যেই অন্য কাজের দিকে এগিয়ে যান এবং অর্ধসমাপ্ত প্রথম কাজের কথাটা তাঁদের মোটেই মনে থাকে না।

কৈলাশবাবু একবার উঁকি মেরে গেলেন। আমাকে তীর্থকাকের মতো বসে থাকতে দেখেও তিনি কোনো কথা বললেন না।

আরও কিছুক্ষণ পরে, আমার ধৈর্যের বাঁধ যখন ভাঙতে বসেছে তখন কৈলাশবাবু ফিরলেন। বললেন, "মা-জননী হঠাৎ আবার পুজোর ঘরে ঢুকলেন। এ রকম সাধারণত করেন না—নিশ্চয় কোনো এমার্জেন্সী প্রয়োজন হয়েছে।"

ঠাকুর ঘরের সঙ্গে এই ধরনের অর্ডিনারি, আর্জেন্ট অথবা এমার্জেন্সি যোগাযোগের রহস্য আমার কাছে অজ্ঞাত। সুতরাং মুখ বন্ধ করে মহিলা মহলের সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ করে যাওয়াটাই বুদ্ধিযুক্ত।

কৈলাশবাবু আমার অবস্থাটা আন্দাজ করে নিজেও অস্বস্তি বোধ করছেন। কিন্তু তিনিও তো সামান্য কর্মচারি মাত্র। এমন অবস্থায় তিনি কীই বা করতে পারেন?

কৈলাশবাবু নিবেদন করলেন, "পুজোর ঘরে ঢুকে মা-জননীর বোধ হয় আপনার কথা খেয়াল হয়েছে। আমাকে ডেকে আপনাকে বলতে বললেন, ওয়াকার ম্যানসন যেমন চলছে চলুক। খালি ফ্ল্যাট-গুলো সম্বন্ধে ব্যস্ত হবার কিছু নেই। এ সম্বন্ধে পরে খবরাখবর দেবেন।"

গভীর নৈরাশ্য নিয়ে ক্লান্ত পদক্ষেপে সেদিন আবার ম্যানসনে ফিরে এসেছি। একবার মনে হলো এদেশের মহিলা মালিকরা এমনই হন। কোনো ব্যাপারে সোজাসুজি সিদ্ধান্ত তাঁরা জানাতে পারেন না। এই কারণেই তাঁদের স্বার্থ ব্যাহত হয়; প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁরা পিছিয়ে পড়েন। আর যাঁরা কাজ করেন? তাঁদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কার কী এসে যায়?

কলকালি এই সময় আমার ঘরে উঁকি মারলো। চন্দ্রোদয় ভবনে আমার যাবার সংবাদটি যে আর গোপন নেই তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

"কলকালি, তুমি কিছু বলবে?" আমি সৌজন্যবশত প্রশ্ন করি।

বিনয়ে বিগলিত কলকালি এবার মাথা চুলকোতে লাগলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "স্যর, ওয়াকার ম্যানসনের সমস্ত পুরনো পাইপ কী পাল্টে ফেলা হবে?"

আমি নিরুত্তর। কিন্তু খবরটা সম্বন্ধে কলকালি এতোই নিশ্চিত যে সে জানতে চাইলো এই পাইপ পাল্টানোর কাজ ঠিকাদার মারফত হবে, না ঠিকাটা সে-ই পাবে।

আমি এখনও কথা বলছি না দেখে কলকালি ভাবলো, ব্যাপারটা এই মুহূর্তে সরকারীভাবে তাকে জানাতে আমি আগ্রহী নই।

কলকালির এই অত্যধিক ব্যগ্রতার কারণও এবার বেরিয়ে পড়লো। সে করজোড়ে নিবেদন করলো, কাজটা যদি তার হাতে না দেওয়া হয়, তাহলে অন্তত একটি অনুগ্রহ আমাকে দেখাতেই হবে। পাইপ পাল্টানোর এই চাঞ্চল্যকর খবরটা অন্তত একটি সপ্তাহ আমাকে গোপন রাখতেই হবে; *নাহলে এই গরীব কলকালিকে শোচনীয় আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হতে হবে। কলকালি আজ আর নিজের ব্যাপারটা গোপন রাখলো না।*

ওয়াকার ম্যানসনের ভাড়াটিয়াদের এমার্জেন্সি সার্ভিসের জন্য গোপনে কলকালি ছাদের কোণে একটি নতুন পাইপের গোডাউন স্থাপন করেছে। কলকালির এই সাম্রাজ্যের সদ্ব্যবহার না করলে ভাড়াটেদের কলের পাইপ মেরামতে ডবল সময় লাগে। সুতরাং সকল ভাড়াটিয়াই হাসিমুখে বাজার থেকে কিছু বেশী দরেই কলকালির কাছে পাইপ কিনে থাকেন। অকস্মাৎ সমস্ত বাড়িতে নতুন পাইপ বসানোর প্রস্তাব বেচারা কলকালির কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। এবং অচীরে এই কাজ শুরু হলে কলকালির কর্মজীবন শুধু নয়, তার ব্যক্তিজীবনও সম্পূর্ণ বিপন্ন হবে।

ব্যক্তিজীবনের ব্যাপারে কলকালিকে আমি কোনো প্রশ্ন করিনি—এখন কোনো ব্যাপারে বিশেষ ঔৎসুক্য দেখাবার মতো মানসিক অবস্থাও আমার নেই। কিন্তু কলকালি আসন্ন বিপদের ইঙ্গিতে নার্ভাস হয়ে একের পর এক স্বীকারোক্তি দিয়ে চলেছে।

কলকালি জানালো, পাইপ সংক্রান্ত কারিগারি বিদ্যা তার নিজস্ব হলেও, ওই পাইপের গোডাউনের মালিকানা কোনোক্রমেই তার নয়। সমস্ত মালিকানা বলরাম বসু ঘাট স্ট্রীটের এক বঙ্গ-রমণীর। কলকালির বারংবার অনুরোধে এই রমণী নতুন গহনার পরিবর্তে কষ্টার্জিত অর্থ এই পাইপে বিনিয়োগ করেছেন; কিন্তু তাঁর সন্দেহের নিরসন হয়নি। কলকালিকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে লগ্নী অর্থের নিরাপত্তার কোনোরকমে বিঘ্ন ঘটলে ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হবে; এবং তাঁর অভিসারকক্ষে কলকালির প্রবেশ চিরতরে নিষিদ্ধ হবে এবং প্রয়োজনে পাড়ার মাস্তান টেরু গুন্ডাকে স্বাধীন রক্ষার ব্যাপারে নিযুক্ত করা হবে।

এই টেরু গুন্ডার রদ্দা আমাদের কলকালি অনেকদিন আগে একবার নিজদেহে গ্রহণ করেছে এবং এখনও সে-যন্ত্রণা ভুলতে পারেনি।

কলকালির মুখ দেখে মনে হচ্ছে, এমন ত্রিমুখী বিপদের সম্মুখীন সে কখনও হয়নি। এবং গোপন সূত্র থেকে খবর সংগ্রহ করা মাত্রই জরুরী কাজকর্ম ফেলে রেখে সে আমার অফিসে ছুটে এসেছে—এবং অনেকক্ষণ ধরে আমাকে না দেখে আরও চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এতোই চিন্তিত যে বলরাম বসু ঘাট স্ট্রীটের একটি পূর্ব নির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্টও সে ক্যানসেল করেছে।

অনেক দুঃখের মধ্যেও কলকালির আচরণে হাসি আসছে। এবং আমার এই হাসিকে দুঃ প্রত্যয়ের ইঙ্গিত মনে করে বেচারা কলকালি আরও ভেঙে পড়লো।

নতজানু হয়ে কলকালি করজোড়ে নিবেদন করলো, "আপনি স্যর, আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করুন। সাতটা দিন শুধু চুপচাপ থাকুন। এরই মধ্যে ইস্পেশাল কায়দায় আমি সমস্ত পাইপের একটা গতি করে ফেলবো— এই ওয়াকার ম্যানসনেই টেকনিক সমস্ত জিনিস ফিট হয়ে যাবে।"

পরিবর্তে কলকালি শুধু আমাকে আশীর্বাদ করবে না। যখন আমার বাড়ি হবে, তার প্লাম্বিং-এর সমস্ত কাজ নিজের হাতে করে দিয়ে আসবে—যেমন ভবানীপুর সিংহাসনের জামাইয়ের বাড়ির সমস্ত পাইপের কাজ সে বিনামূল্যে করে দিয়েছে।

অবাঞ্ছিত লোম তুলে ফেলুন—বাঞ্ছিত ক্রীম অ্যান ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার দিয়ে

কামাবেন ? নানা, সে তো পুরুষদেরই সাজে। একে তো মেয়েদের কোমল চামড়া ব্লেড দিয়ে কেটে-ছড়ে যাওয়ার ভয় বেশী, তার ওপর কামানোর পর গজিয়ে ওঠে শক্ত খোঁচা লোম !

তাহলে ? অবাঞ্ছিত লোম তুলে ফেলার জন্যে ব্যবহার করুন, বাঞ্ছিত ক্রীম—কোমল অ্যান ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার। অ্যান ফ্রেঞ্চ চামড়ার গভীরে গিয়ে কাজ করে, তাই আপনার চামড়া থাকে রেশমী কোমল—কয়েক সপ্তাহ ধরে !

অ্যান ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার লেবুর সুগন্ধে আর ফুলের সুগন্ধে পাওয়া যায়। আপনার পছন্দমত বেছে নিন।

অ্যান ফ্রেঞ্চ* হেয়ার রিমুভার, অবাঞ্ছিত লোম দূর করতে বাঞ্ছিত ক্রীম

176-HR-244 Ben

* Licensed User of TM ; Geoffrey Manners & Co. Ltd.

মদনার এই সরলতা আমার ভাল লাগে। নিজের দুঃখ কিছুই সে আমার কাছে চেপে রাখে না।

"আর কিছু না দিন, দুখানা ইনটারভিউ-কার্ড পেলেই হাতিয়ে নিন, আমার কথা শুনুন, স্যার", আমাকে পরামর্শ দেয় মদনা।

"তোমার কাজকর্ম কেমন হচ্ছে মদনা ?" আমি প্রশ্ন করি।

একগাল হেসে মদনা বললো, "চুরি জোচ্চুরি জোচ্চুরির কোনো মানে হয় না স্যার। রাজা লাইন কলকাতায় এই একটাই আছে স্যার—এই চাওলা মেমসায়েবের লাইন। টাকা-কে-টাকা, খানা-কে-খানা, প্রেসটিজ-কে-প্রেসটিজ।"

শেষের জিনিসটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। চোখ বড়ো বড়ো করে মদনা বললো, "কী বলছেন স্যার ? কলকাতার কত বড় বড় লোক মেমসায়েবের স্পেশাল রুমে পায়ের ধুলো দিচ্ছেন।"

মদনা এবার নিজের মনের কথাও বলে ফেললো। "ছেলের জন্যে স্যার লেখাপড়ায় ফাঁকি না দিয়ে মেমসায়েবের কথা শুনে, বড় বড় এগজামিন দিয়ে গভর্নমেন্ট অফিসার হবার চেষ্টা করবো। আপনি তো চেষ্টা করলে হতে পারতেন—কেন যে হলেন না ?" আমার মেধা ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে মদনার অগাধ বিশ্বাস।

"তাতে কী লাভ হবে মদনা ?" আমি প্রশ্ন করি।

চোখ বড়ো বড়ো করে মদনা বললো, "গট-গট করে ওপরে উঠে যাবেন ; যা খুশী খাবার অর্ডার দেবেন, আমি অর্ডার নেবার জন্যে দরজার বাইরে অ্যাটেনশন হয়ে থাকবো, যতক্ষণ খুশী দরজা বন্ধ করে রাখবেন, তারপর যখন খুশী গটগট করে চলে যাবেন। একটি আধলা বিল করবো না। বেয়ারারা পর্যন্ত একটি পয়সা বকশিস চাইবে না। এসব কী এমনি হয় স্যার—পেটে অনেক বিদ্যে আছে বলেই তো এইসব সুবিধে হয়েছে।"

মদনা এবার কাজের কথায় চলে এলো। "ঘরের খুব অসুবিধে হচ্ছে, স্যার। এতো সব বড় বড় লোক পায়ের ধুলো দিচ্ছেন যে মেমসায়েব খুব মুশকিলে পড়ে যাচ্ছেন। ট্রাফিক জ্যাম না হয়ে যায়।"

ট্রাফিক জ্যাম কথাটার ভারি সুন্দর প্রয়োগ করেছে মদনা। "ট্রাফিক জ্যাম হলে তোমার কী ?" আমি মদনাকে নিরুৎসাহ করবার জন্য বললাম।

ঠোঁট উল্টোল মদনা। আমার সঙ্গে সে একমত হতে পারলো না।

সে বললো, "আপনি তো নিজের চোখে দেখেন নি, সেই জন্যে ওরকম বলছেন। মেমসায়েবের স্পেশাল রুমগুলোতে ভিড় দেখলে বড় বড় সায়েবরা ভীষণ রেগে যান। মোটা-মোটা বই পড়ে এতোসব লেখাপড়া শিখেছেন ; কিন্তু দশ মিনিট ধৈর্য ধরতে পারেন না। একটু দেরি হলেই হম্বিতম্বি করে গটগট করে বেরিয়ে চলে যান। আর কেউ চলে গেলে চাওলা মেমসায়েব খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন।"

মদনা এবার মাথা চুলকে বললো, "কিছু খবর আছে নাকি, স্যার ? সকালবেলায় আপনাকে দেখে চাওলা মেমসায়েব বললেন, নিশ্চয় আপনি কোনো ব্যাপারেই বেরিয়েছেন। আপনি স্যার একখানা ঘর ছাড়লেই আমার উন্নতি হয়ে যাবে।"

"খবর থাকলেই জানতে পারবে।" সুযোগ পেয়ে মদনাকে পাঠানোর এই পন্থাটা আমি পছন্দ করতে পারছি না। কিন্তু, আমার পছন্দ অনুযায়ী কেন শক্তিমতী মহিলারা কেন চলবেন ?

সন্ধ্যার একটু আগেই আমার ঘরে যে বিশিষ্ট অতিথির আবির্ভাব হলো তাঁর জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

"কী ব্যাপার ? একমনভাবে মুখ ব্যাজার করে নিজের ঘরে বসে আছো কেন ?" গণপতিবাবুর গলা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

গণপতিবাবু হাসিমুখে বললেন, "ভড়বড় করে, দুশ্চিন্তা করে কখনও কাজ হয় না। বরং চুপ করে ঘাপটি মেরে থাকলে অনেক সময় টোপ গিলে সাঁটি থেকে মাছ ছিপের দিকে ছুটে আসে।"

আমার ঘরের সবেধন নীলমণি চেয়ারে বসে পড়ে গণপতিবাবু আমার বাবার প্রসঙ্গ তুললেন। বললেন, "তোমার বাবা বলতেন—জোয়ার পরে নাই ভুবনের ভার, হালের পরে মাঝি আছে করবে তরী পার।"

গণপতিবাবুকে আপ্যায়নের জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। তিনি বললেন, "আজ স্রেফ এক কাপ চা। অনেক কাজ আছে।"

খুব তাড়াতাড়ি স্পেশাল কাপে চা এসে গেল। গণপতিবাবুর মতো লোককেও একটু বিশেষ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে পারছি না বলে অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। কিন্তু গরম চাকে দ্রুত ঠাণ্ডা করার প্রচেষ্টা থেকেই বুঝতে পারছি, গণপতিবাবুর সত্যিই তাড়া রয়েছে।

গণপতি যেন অন্তর্যামী। জিজ্ঞেস করলেন, "চন্দ্রোদয় ভবনের মা-জননীকে কেমন দেখলে ?"

আমার চন্দ্রোদয় ভবনে যাবার সংবাদ গণপতিবাবু কী ভাবে পেলেন ?

একটু হাসলেন গণপতিবাবু। তারপর বললেন, "ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

ঘড়ির দিকে তাকালেন গণপতিবাবু। বললেন, "বড় খারাপ দিনে তুমি বিডন স্ট্রীটে গিয়েছিলে।"

গণপতিবাবু এবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, "হাতে কোনো কাজ নেই তো ? চলো আমার সঙ্গে একটু।"

রাস্তায় বেরিয়ে গণপতিবাবু ফিস ফিস করে বললেন, "বিলাসিনী দেবীর আজ বড় দুর্দিন।" তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "সকালবেলায় তুমি যখন গিয়েছিলে তখন পদ্মাকে দেখেছিলে ?"

পদ্মা। সেই মোমের পুতুলটি। তাকে তো একবারই মাত্র দেখেছিলাম অনেকদিন আগে। সেই ছবিটা তো এখনও ভুলতে পারিনি। সেই হাসিটি আমার এখনও মনে আছে।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে গণপতিবাবু বললেন, "বড়ই দুঃসংবাদ। কাউকে বোলো না। খবরটা এখনও খুবই কনফিডেনশিয়াল। পদ্মাকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"পদ্মাকে পাওয়া যাচ্ছে না !" নিজের অজান্তেই আমি গণপতিবাবুর কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করি।

গণপতিবাবু বললেন, "তুমি যখন মা-জননীর সঙ্গে কথা বলছিলে সেই সময়েই তো টেলিফোন এলো।"

গণপতিবাবু জানালেন, "ফোন করেছিল, বাড়ির ড্রাইভার নগেন মান্না। দিদিমণিকে কলেজ থেকে আনতে গিয়ে সে হাঁ-করে আধঘণ্টা বসেছিল। তখনও খবর না-পেয়ে নগেন মান্না পদ্মার ক্লাসের মেয়েদের কাছে খবর নিয়েছিল। তারপরেই সে সামনের স্টেশনারি দোকান থেকে মা-জননীকে ফোনে খবরটা দিয়েছিল।"

বিলাসিনী দেবীর বাড়িতে সেই মুহূর্তের নাটকটা এবার পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। অকারণে আমি হাজার রকম সন্দেহ করে বসে ছিলাম।

গণপতিবাবু বললেন, "যথাসময়ে আমার ডাক পড়েছে। আমার বাবুরাও অতশত জানেন না। তাঁরা শুধু বললেন, বিলাসিনী দেবী তোমাকে একবার জরুরি খবর পাঠিয়েছেন।"

সদর স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে আমরা ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে পড়েছি। রাস্তার কয়েকটা আলো জ্বলছে না। এ-পাড়ার কিছু লোক কয়েকটা পোস্টের ল্যাম্প সুপরিকল্পিতভাবে ভেঙে দেয়। সাময়িক অন্ধকারের এই গণ্ডী সৃষ্টি করে লোকগুলোর কী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

গণপতিবাবু আজ এসব দিকে নজরই দিলেন না। পশ্চিম দিকের সরু ফুটপাথ ধরে গম্ভীরভাবে তিনি দক্ষিণ দিকে হাঁটতে লাগলেন।

ভিড়ের চাপে আমি একটু পিছিয়ে পড়েছিলাম, একটু থেমে তিনি আমার পাশে চলে এলেন। তারপর গণপতিবাবু শান্তভাবে বললেন, "এ-ব্যাপারে তোমার একটু সাহায্য প্রয়োজন হবে, শংকর।"

(ক্রমশ)

খেলা

[ইস্]টবেঙ্গল এবং [ল]ীগ চ্যাম্পিয়নশিপ

[ই]স্ট বেঙ্গল ক্লাবের বদলে যদি মোহনবাগান ক্লাব [জ]িতলো সাতাত্তরের লীগ চ্যাম্পিয়ান হত নিশ্চয়ই [উত্]তম—যোগ্যের যোগ্য সম্মান। ওটা আমাদের, [আ]র সাংবাদিকদের বাঁধা বুলি। চ্যাম্পিয়ন [হয়]েছে ইস্ট বেঙ্গল। প্রায় নিষ্কলঙ্ক চ্যাম্পিয়নশিপ। [২]৪টি খেলার ২২টিতেই জয়। অবশ্য এরিয়ান ও [মহ]মেডানের বিরুদ্ধে "ওয়াক ওভার"সহ। পুরো ৪৪ [পয়]েন্ট। বিরুদ্ধে ৪টি গোল চাঁদের কলঙ্ক চিহ্নের [মত]। এবার কী লিখব?

ভেবে চিন্তেই লিখছি, মোহনবাগানের সঙ্গে [তু]লনামূলক বিচারে টিম যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না [কি]ন্তু টিম স্পিরিট ছিল যথেষ্ট ভাল। আত্মবিশ্বাস [ছি]ল আকাশ-ছোঁয়া। তার সঙ্গেই একটু ভাগ্যের [সহা]য়তা।

দলগত শক্তি এবং ভাগ্য সম্পর্কে হয়তো প্রশ্ন [উঠ]তে পারে। ইস্ট বেঙ্গলের কোনো সমর্থক হয়তো [প্রশ্]ন করতে পারেন "আমাদের কোন খেলোয়াড়টা [দু]র্বল?" খেলার ব্যাপারে ভাগ্যের দোহাই পাড়া নিয়েও [প্রশ্ন]ও উঠতে পারে। কেউ কেউ বলতে পারেন, যেখানে [মুখো]মুখি সংগ্রাম, শক্তি ও নৈপুণ্যের পরীক্ষা [সেখা]নে ভাগ্যের দোহাই কেন? কিন্তু খেলার [ব্যাপা]রেও কে ভাগ্যকে অস্বীকার করতে পারে? [চ্যাম্]পিয়নশিপ লাভের মুখে বিমুখ হওয়ার ঘটনা তো [ইস্ট]বেঙ্গলের ক্ষেত্রেই ঘটে গেছে বহুবার। সে [আ]লোচনায় পরে আসছি। তার আগে দলগত শক্তির [খুঁ]টি বলে নেওয়া যাক।

[ক্ল]াবের শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে ইস্টবেঙ্গল [চা]রজন খেলোয়াড়কে সাসপেন্ড করেছিল, শুধু [ঐ] নামী চারজনই নয়—এবার দলে ছিল না অন্তত [আ]ট-আটজন খেলোয়াড়, যাদের পরিপূরক পাওয়া [যায়]। যেমন, গোলকিপার তরুণ বসু ও বিশ্বজিৎ, [ব]্যাক সুধীর কর্মকার ও অশোকলাল ব্যানার্জি [ব]্যাক গৌতম সরকার, ফরোয়ার্ড শ্যাম থাপা [শু]ভঙ্কর সান্যাল, কৃষ্ণ মিত্র। এদের মধ্যেই বিশ্বজিৎ [সুধ]ীর, গৌতম, শ্যাম এবং শুভঙ্কর মোহনবাগানের [পাল্ল]া ভারী করে। উইঙ্গার উলাগানাথন ইস্ট বেঙ্গলে [ফিরে] আসায় পাল্লা যেটুকু হাল্কা হয় সেটুকু আবার [ফি]রে যায় উঠতি উইঙ্গার মানস ভট্টাচার্যের [অন্ত]র্ভুক্তিতে। গৌতম সরকার আর সমরেশ চৌধুরীর [দলত্যা]গ বিয়োগে মোহনবাগান তুলনামূলক বিচারে [নিঃস]ন্দেহে লাভবান হয়েছিল। কারণ গৌতম ফুটবল [মাঠে]র তাজা ঘোড়া। টানবলিয়ে চলে, তাল রেখে, [খে]লে। অসাধারণ লিঙ্কম্যানদের অন্যতম। অপরদিকে [সমর]েশকে মনে করা হত রেসের বাতিল ঘোড়া [যে] কারণে বিগত জাতীয় ফুটবলে বাংলা দলে তাকে [স্থা]ন দেওয়া হয়নি। তাছাড়া আধুনিক ফুটবলে [লিঙ্]কম্যানদের ভূমিকা অসাধারণ। মূলত তারাই দলকে [চাল]ায়। তারা বক্ষল বলের সামনের স্তম্ভ, আক্রমণ [ও] পেছনের উৎস। প্রসূন ব্যানার্জী এবং গৌতম [দুজনা]র সেদিক দিয়ে মোহনবাগানে মণিকাঞ্চন [যো]গ। অন্যান্য খেলোয়াড় সম্পর্কে আলোচনা [করলে] লেখা বেড়ে যাবে। সেই দল বদল শুরু হওয়া [থে]কে বিশেষজ্ঞরাও বিস্তর লেখালেখি করেছেন এ [সম্প]র্কে। মোটের উপর সবারই অভিমত, খেলোয়াড়-[সং]খ্যা এবং নাম অনুযায়ী মোহনবাগানের সঙ্গে [তুল]নামূলক বিচারে ইস্ট বেঙ্গল ছিল কমজোরী।

অবশ্যই প্লাস পয়েন্ট ছিল ইস্টবেঙ্গলের তারুণ্য এবং আত্মবিশ্বাস। "জিততে হবে—জিতবই"—একটা মানসিকতা ও জেদ।

এবার ভাগ্যের কথা। অতীতে ভাগ্যদেবী যদি ইস্ট বেঙ্গলের প্রতি প্রসন্ন থাকতেন তবে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের অনেক আগে, প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে ইস্ট বেঙ্গলই লীগ চ্যাম্পিয়ন হতে পারত। আমি চুয়াল্লিশ-পয়তাল্লিশ বছর আগের কথা বলছি। ১৯৩২ এবং ৩৩ দুবারই ডারহ্যামস লীগ চ্যাম্পিয়ন হয় ইস্ট বেঙ্গল থেকে এক পয়েন্ট এগিয়ে থেকে। দুবারই ইস্ট বেঙ্গলের লীগ জয় প্রায় নিশ্চিত ছিল। খেলা বাকি দুটি কি তিনটি, চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য প্রয়োজন একটি পয়েন্ট—এমন অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তখন ইস্ট বেঙ্গল টিমও ছিল দারুণ শক্তিশালী। দলে সব বাঘা বাঘা খেলোয়াড়। কিন্তু সেই একটি পয়েন্ট আর সংগৃহীত হয়নি। হার স্বীকার করতে হয়েছে শক্তিহীন দলের কাছে। ভাগ্যের পরিচয় এখানেই। দ্বিতীয়বার অর্থাৎ ৩৩এ লীগ কোঠার সর্বনিম্ন স্থানাধিকারী স্পোর্টিং ইউনিয়নের কাছেও হার স্বীকার করতে হয়েছিল, সম্ভবত শেষ খেলায়। তারও আগে চরম দুর্ভাগ্যের পরিচয় দিয়েছিল ১৯২৮এ যখন তারকাখচিত ইস্ট বেঙ্গল দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে গিয়েছিল। ভাগ্য

প্রসন্ন থাকলে লীগ জয়ের জন্য ইস্ট বেঙ্গলকে আরও দশ বছর অপেক্ষা করতে হত না। লীগ জয়ের তিলক চিহ্ন বাঙালেই ললাটে লেপন করতে পারত। সাদা-কালো এবং সবুজ-মেরুন পতাকা আকাশে ওড়ার আগেই লীগ জয়ের লাল-হলুদ পতাকা উড়ত আকাশে। সুতরাং খেলার ব্যাপারেও ভাগ্য আছে বইকি!

এখন তো কলকাতার ফুটবল লীগ এক রকম এক ম্যাচের লীগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুই প্রধানের পারস্পরিক খেলার ফলাফলেই হচ্ছে লীগের ভাগ্য নির্ণয়। আবার ওই খেলাতেই মিলছে দলের ভাগ্যের পরিচয়। ধরা যাক ৭৫ সালের কথা। শ্যাম থাপার একটি গোলে ইস্ট বেঙ্গল জিতে গেল। মোহনবাগান দাপটে খেলেও গোল শোধ করতে পারল না। ৭৬-এ ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে (নাকি ১৭ সেকেন্ড?) আকবর মোহনবাগানের গোল করে বাদশা বনে গেল। ইস্ট বেঙ্গল বাকি ৪১৮৫ সেকেন্ড সিংহ বিক্রমে খেলেও গোল শোধ করতে পারল না। এ বছরের খেলাতেও মোহনবাগানের আপেক্ষিক আধিপত্য কে অস্বীকার করতে পারে? খেলায় ২—০ গোলে জিতে গেল কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল। মিহির বসু কি অমন আর একটি ভলি শটে গোল করতে পেরেছে? নাকি অমন চোক ধাঁধানো ফ্রি কিকে সমরেশ পরে করেছে আর কোনো গোল? ৭৫-৭৬-৭৭—তিন বছরই দেখলাম লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের ব্যাপারে ভাগ্য বড় ভূমিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কেউ কেউ আবার দলের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন ব্যক্তির ভাগ্যকে, যেমন সমরেশ চৌধুরী। ৭০ থেকে ৭৫—টানা ছয় বছর ইস্টবেঙ্গলের লীগ জয়ের সৈনিক। ৭৬এ মোহনবাগানে গিয়েও লীগ জয়। আবার এ বছর ইস্ট বেঙ্গলে এসেও চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মান। তুলনাহীন রেকর্ড।

তবে আমার মনে হয় ইস্ট বেঙ্গলের এবারের সাফল্যের মূলে আছে সেই মানসিকতা, ৯ জুলাইয়ের মহারণের পর একটি খেলা-পাগল ছেলের মুখে যা ফুটে উঠেছিল। "আমরা তো আগেই জানতাম ইস্ট বেঙ্গল জিতবোই জিতবো। আরে লাল হলদে জামা গায়ে চড়ালে আশী বছরে বুড়াও জুয়ান হইয়া যায়, ছাপ্পান্ন বছরের জুয়ান হয় ষোলো বছরের ছ্যামড়া"।

সংবাদ বিচিত্রার জন্য আকাশবাণীর উপেন তরফদার ছেলেটিকে সেদিন রেডিও অফিসে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ওইদিন আর একটি ক্লাব-পাগল ছেলের সে কী বীর দর্পের ছন্দময় আবৃত্তি: "আগে বাঙাল জনতা/ এক মন এক প্রাণ একতা।" বলেছিলাম, তা ভাই তোমাদের অধিনায়ক শ্যামল ঘোষ, শ্যামল ব্যানার্জী কি বাঙাল? ছেলেটির তাৎক্ষণিক জবাব বাঙাল মানে জানলে তো আপনি সুনীতি চাটুয্যে হয়ে যেতেন। বাঙাল মানে কি জানেন? ওই দেখুন, বলে ছেলেটি মোহনবাগান মাঠের সুউচ্চ বাতি স্তম্ভের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করেছিল—যেখানে তখন আর কয়েকটি ছেলের হাতে উড়ছিল লাল-হলুদ পতাকা।

ইস্ট বেঙ্গল খেলোয়াড়দের ক্রীড়া দক্ষতার সঙ্গে এই ধরনের মানসিকতার মিলন এবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অন্যতম কারণ মোহনবাগানের ১০ বছর পরে প্রথম ডিভিসন লীগে এসে এবং এক বছর দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলে ইস্ট বেঙ্গল এবার লীগ জয়ে মোহনবাগানের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলল। দুই দলেরই এখন ১৫ বার করে চ্যাম্পিয়ন হবার সম্মান। কোনো পয়েন্ট না খুইয়ে ইস্টবেঙ্গল লীগ জিতল দুবার, ৭৫ সালে এবং এ বছর। আর কোন ভারতীয় দল একবারও এ কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। অতীতে দেখিয়েছে তিনটি গোরা দল। ১৯০১ সালে রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস, ১৯০৮ সালে গর্ডন লাইট ইনফ্যান্ট্রি এবং ১৯১২ সালে ব্ল্যাক ওয়াচ। তখন খেলার সংখ্যা ছিল অনেক কম। মাত্র ১৪টি। এখন ২২টি। সুতরাং ইস্ট বেঙ্গলের রেকর্ড যেকোনো রেকর্ডের মত ভঙ্গুর নাও হতে পারে। অন্তত দুবার কোনো পয়েন্ট না হারানোর রেকর্ড টিকে থাকতে পারে বহুদিন, যেমন রয়্যাল আইরিশ রাইফেলসের নিষ্কলঙ্ক রেকর্ডটি টিকে আছে দীর্ঘ ৭৬ বছর। ১৯০১ সালে আইরিশ রাইফেলসের বিরুদ্ধে একটি গোলও হয়নি ১৪টি খেলার মধ্যে। ছ-য় ঘরে শূন্য ৮০ বছরের লীগ চৈতন্যের সব চেয়ে দুর্লভ লক্ষণ দৃশ্য।

মুকুল

...ুন বই

...ন্যাস

...া নদী। সন্তোষকুমার ঘোষ। ...ং পাবলিশিং প্রাঃ লিঃ, ১৩ ...ম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩। ... টাকা

...ের উপন্যাস সমগ্র। কাজী ...রুল ইসলাম। মুক্তধারা ...শনী, ১০/১ বঙ্কিম ...র্জী স্ট্রীট, কলি-৭৩। দশ ...া

...ীর জঙ্গলে। বুদ্ধদেব গুহ। ...জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম ...র্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩। আট ...া

...জার রথের ঘোড়া। ... ...। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ..., বেনিয়াটোলা লেন, কলিঃ- ...। দশ টাকা

...। বিমল কর। আনন্দ ...লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ ...য়াটোলা লেন, কলি-৯। দশ ...া।

...বিতা

... চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ...জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম ...র্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩। বারো ...া।

...গ। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। ...ন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ ...য়াটোলা লেন, কলি-৯। পাঁচ ...া

...ীয় শিরাম। শিবরাম ...র্তী। পত্রলেখা, ১—১৯, ...ক স্ট্রীট মার্কেট, কলি-৭। ... টাকা

...কে বিসর্গ। ব্রজ কিশোর ... নাথ ব্রাদার্স, অমর লাইব্রেরী, ...জান বুক মার্ট। সাত টাকা

... আকো আৰ। বিষ্ণু দে। ...ন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ ...য়াটোলা লেন, কলিঃ-৯। পাঁচ ...া।

...া সংগ্রহ। অমিয় চক্রবর্তী। ...জ পাবলিশিং। ১৩ বঙ্কিম ...র্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩। ষোল

...ধ

... সাহিত্যের রূপ বিবর্তন ...খণ্ড)। বিমলভূষণ চট্টো-...। অনিমা প্রকাশনী, ১৪১ ...চন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলি-৯।

ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ। শঙ্খ ঘোষ। দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩। বারো টাকা

পথের শেষ কোথায়। আবু সয়ীদ আইয়ুব। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩। বারো টাকা।

সাহিত্য সাহিত্যিক ও পাঠক। বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায়। অনিমা প্রকাশনী। ১৪১, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলি-৯। ষোল টাকা

সিদ্ধার্থশংকর : সিদ্ধি ও নির্বাণ। সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিঃ-৯। ছয় টাকা

ইন্দিরা-একাদশী। বরুণ সেনগুপ্ত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯। দশ টাকা (শোভন) এবং পাঁচ টাকা (সুলভ)।

রাজ্য ও রাজনীতি। বরুণ সেনগুপ্ত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিঃ-৯। আট টাকা

অনুবাদ

ক্রীতদাস। এরিক করভার। ভাষান্তরঃ দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবেশক নাথ ব্রাদার্স, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩। দশ টাকা

বিবিধ

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫। টোডরমল। অনিমা প্রকাশনী, ১৪, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিঃ-৯। আট টাকা

শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মা কথামৃত। গণেশচন্দ্র চক্রবর্তী কথিত। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ-৭৩। দশ টাকা।

বাদার গল্প। শংকর বসু। বর্ণনা, ৬/৭ বিজয়গড়, কলকাতা-৭০০০৩২। প্রাপ্তিস্থান র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

ক্ল্যাসিক বীক্ষ্য (মহাভারত পর্ব)। সুবোধকুমার চক্রবর্তী। এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলিঃ-৭৩ আঠার টাকা

চিরঞ্জীব বনৌষধি (দ্বিতীয় খণ্ড) আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, ...

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **বই**

End Of An Era by C. S. Pandit. Allied Publishers Pvt. Ltd. Rs. 30.00.

একটি যুগ : ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৭। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গগনে ইন্দিরা তারকার উদয়, বিকিরণ ও অস্ত যাওয়া। ('অস্ত গেছে সে গৌরবশশী' কথাটা জোর দিয়ে বলার সময় কিন্তু এখনও আসেনি।)

একটি যুগ। কিঞ্চিদধিক এক দশক। স্বাধীন ভারতের তিরিশ বছরের জীবনে এই যুগটি সবচেয়ে ঘটনাবহুল ; সবচেয়ে বেশী চিহ্নিত। লালবাহাদুরের দু বছর তো বটেই, জওহরলালের সতেরো বছরকেও অনেক অতিক্রম করে গেছে ইন্দিরার এগারো বছর।

এই সাম্প্রতিক ইতিহাস আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এই ইতিহাসের অঙ্গীভূত আমরা। কিন্তু, এ ইতিহাস প্রকৃত অনুধাবন করতে আমাদের দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে। বর্তমান, বা নিকট অতীত প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টির অন্তরায়।

কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেকে এ ইতিহাস লেখার কাজে লেগে গিয়েছেন। যাঁরা লেগে গিয়েছেন তাঁরা কেউই ঐতিহাসিক নন। প্রায় সকলেই তাঁরা সাংবাদিক। এ পর্যন্ত যতোগুলি বই ইন্দিরা গান্ধীর উত্থান-পতন বা আপৎকালীন অবস্থার অন্ধ-অতি নিয়ে রচিত হয়েছে তার প্রায় সবগুলিই দ্রুত-রচিত সংবাদ-সাহিত্য। 'সংবাদ-সাহিত্য' কথাটি ইচ্ছে করেই ব্যবহার করলাম, যদিও সাহিত্য-মূল্য এসব রচনায় অনুপস্থিত। কল্পনা—যা সাহিত্যের প্রাণ—এসব রচনায় একটু বেশী মাত্রায় উপস্থিত। কাহিনীকে আকর্ষক করে তোলার আত্যন্তিক প্রয়াসও বহু স্থানে লক্ষণীয়।

সি এস পণ্ডিতের বইটি একটু স্বতন্ত্র ধাঁচের। এর লেখকও সাংবাদিক—প্রবীণ এবং প্রথিতযশা। কিন্তু এঁর বর্ণনা, দৃষ্টিভঙ্গী এবং ইতিহাসবোধ স্বতন্ত্র। রচনা অনেকখানি নির্মোহ।

"This book has been written more in sorrow than in anger" —ভূমিকায় বলেছেন লেখক। এ-জাতীয় অন্যান্য বইগুলিতে ক্রোধ এবং অসূয়া প্রকট।

এগারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই বইয়ে ইন্দিরা গান্ধীর এগারো বছরের প্রধানমন্ত্রিত্বের ইতিহাস বিধৃত। ইতিহাস-ই—গল্প-কাহিনী নয়। মার্চ মাসের সাধারণ নির্বাচনে হেরে যাবার পর থেকে যেসব খবর প্রকাশিত হয়ে চলেছে—দুর্নীতি ও অবিবেকী কার্যকলাপের খবর জরুরী অবস্থায় উনিশ মাস ধরে যা চলেছিল—যার সত্যতা এখনও যাচাই হয়নি—লেখক তা অগ্রাহ্য করেছেন, অবশ্য কিছু কিছু ছাড়া, যেগুলি তিনি প্রত্যক্ষত জানেন। কিন্তু তাই বলে তিনি অগ্রাহ্য করেননি সেই মূল বস্তুগুলি : গত দু বছরে ইন্দিরা

...নীর কার্যকর্মের স্টাইলের অবনতি
...তাদে লেখকদের জীবনতকে
...মিক হস্তাদান, এবং এমন সব
...প্রকাশকে প্রশ্রয় দান অথবা
...নুর না দেওয়া, যা তাঁর দলের
...র নীতি বা গণতন্ত্রের মৌল
...দের পরিপন্থী।

...ভাবতে অবাক লাগে, ইন্দিরা
...ন্ধী যখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে—সারা
...থিবীর মানুষ যখন অবাক বিস্ময়ে
...র দিকে তাকিয়ে—ঠিক সেই সময়
...থেই কেমন করে যেন তাঁর পতন
...রু হয়ে গেল।
...wer corrupts; absolute
...wer corrupts absolutely—
...বাক্যের জাজ্বল্য প্রমাণ প্রত্যক্ষ
...লাম আমরা। ইন্দিরা চরিত্রের
...কটি ট্রাজেডি তাঁর রাজনৈতিক
...কর্মীদের প্রতি গভীর অবিশ্বাস
...ও ক্লাসেরকে মনে পড়ায়)। এর
...ে অবিশ্যি তাঁর প্রধানমন্ত্রী
...র ইতিহাস এবং 'সিন্ডিকেট'
...দের অবদান রয়েছে। যা হোক,
...র সিদ্ধান্ত দেবার সময় এখনও
...সেনি। এবং বর্তমান লেখকও তা
...নি।

...শ্রীপণ্ডিতের বইয়ের একটি
...ধান পরিচ্ছেদ হলো
...ternational Ramifications
...71 to 1977)
...রর দশকে দুই বৃহৎ শক্তি রাশিয়া
...আমেরিকা কিভাবে ভারতের উপর
...র রেখেছে এবং কেমন ব্যবহার
...তে যা করতে চেয়েছে এবং তার
...শ ইন্দিরা গান্ধীর কর্মপদ্ধতির কি

যোগসূত্র—তার সামান্য আঁচ দেওয়া হয়েছে এখানে।

ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসে ইন্দিরা যুগের যে পরিচয় এই স্বল্প-পরিসর পুস্তকে তুলে ধরেছেন লেখক তা—দ্রুত রচনার ত্রুটিগুলি বাদ দিয়ে—প্রশংসনীয়। লেখককে ধন্যবাদ জন-প্রিয়তার খাতিরে (তথা অর্থপ্রাপ্তির

ক্ষণমোহে : জনৈক সাংবাদিক-লেখক নাকি তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত এই জাতীয় বই থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা রোজগার করছেন।) তিনি কল্পনাকে যথেচ্ছ ব্যবহার তো করেনই নি, বরং সযত্নে তা পরিহার করেছেন।

প্রকাশককে ধন্যবাদ একটি সুরুচিপূর্ণ প্রকাশনা উপহার দেওয়ায়, যদিও সামান্য কিছু ছাপার ভুল বোধ হয় সহজেই এড়ানো যেত।

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা। শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

জাল সন্ন্যাসী

পরিচালক সলিল সেনের আগের ছবি 'অসাধারণ'-এর সাধারণত্ব নিয়ে কয়েকমাস আগে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম। 'জাল সন্ন্যাসী'তে তিনি সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন—অর্থাৎ উত্তমকুমার ছাড়া টিঁকে থাকার কোনো পথ তিনি এখনো দেখতে পাননি। উত্তমকুমার নিয়ে তিনি হাজার বার ছবি করুন, কাহিনী যদি তাই দাবি করে তাহলে সেখানে আপত্তির কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না। কিন্তু উত্তমকুমার যে-ছবির একমাত্র ব্যবসায়িক টোপ, সবরকম ফাঁকির নিশ্চিন্ত পূরণ, সে-ছবির নাম জাল সন্ন্যাসী না হয়ে জাল-ছবি হলেই ভালো হত। এখন দেখা যাক এ-ছবির কাহিনীর দাবিতে উত্তমকুমারের উপস্থিতি কতটা অনিবার্য বলে মনে হয়। ছবির প্রারম্ভেই আমরা জানতে পারি কাহিনী যে-সময়ে শুরু হচ্ছে তার পাঁচ চার বছর আগে ছবির নায়ক চঞ্চল চ্যাটার্জি (রূপায়ণে অবশ্যই উত্তমকুমার) মেডিকেল স্টুডেন্ট ছিলেন। তাহলে ছবির শুরুতে চঞ্চলের বয়েস মেরেকেটে পঁচিশ। উত্তমকুমার, আপনি নিজে বিশ্বাস করেন যে আপনি এখনো পঁচিশ বছরের একটি ছোকরার চরিত্রে হেসে খেলে চলে যেতে পারেন, তাও আবার কখনো-কখনো বিনা ক্লোজআপে, এবং প্রায় আগাগোড়া বিজ শর্ট-এর ? মনে রাখবেন, আমি কিন্তু আপনার সৌন্দর্য কিংবা পারসোনাল ক্যারিজমা নিয়ে কোনো কটাক্ষ করছি না, কিন্তু পঁচিশ এমন এক দুরন্ত বয়েস যা বছর পঁচিশ অতিক্রান্ত হয়ে আর কোনো-ভাবেই পঁচিশকে ধরা যায় না। সুতরাং কাহিনীর দাবিতে উত্তমকুমার এ-ছবিতে আসেন নি, এসেছেন ব্যবসার দাবিতে, এসেছেন ধর্মতলা স্ট্রীট-এর সিকিউরিটি হিসেবে, এসেছেন ভঙ্গুর চিত্রশিল্পী আর দুর্বল চিত্রপরিচালনার ক্ষতিপূরণ হিসেবে।

এবং শুধু এসেছেন বললে ভুল বলা হয়, এসেছেন একেবারে সর্বগ্রাসীভাবে, সুচাগ্র মেদিনীও কারো জন্যে ছেড়ে না দিয়ে। তার ফলে, এই বহু-বিজ্ঞাপিত খুনের ছবিতে কোনো সত্যিকারের খুন নেই (যেহেতু খুন উত্তমকুমারের রোমান্টিক ইমেজের বিরোধী), প্রেমটেমও নেই (যেহেতু স্বামীজীর পোশাক পরে কোনো মহিলাডাক্তার-এর সঙ্গে প্রেম করাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যেত) এবং সত্যিকারের ভক্তি-রসও নেই (যেহেতু ছবির নাম জাল সন্ন্যাসী)। মোদ্দাকথাটা হল এই যে, জাল সন্ন্যাসী ছবিতে যে কি আছে সেটা গোয়েন্দাগিরি করে বার করতে হলে স্বয়ং ব্যোমকেশ কিংবা ফেলুদা-ও সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। যাইহোক, যে-কথা বলছিলাম—এ-

চটপট আরাম পেতে নিন জোরালো অথচ নির্ভরযোগ্য অ্যানাসিন

জোরালো : অ্যানাসিন চটপট ব্যথা-বেদনায় আরাম এনে দেয়, কারণ এতে সেই ওষুধই বেশী ক'রে দেওয়া আছে সারা বিশ্বের ডাক্তাররা যা সুপারিশ করেন।

নির্ভরযোগ্য : অ্যানাসিন ডাক্তারের দেওয়া ওষুধের মতই নানান ভেষজের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। এর জন্যই লক্ষ লক্ষ লোক অ্যানাসিন খান, অ্যানাসিন খাওয়ার সুপারিশ করেন।

সর্দি আর ফ্লু'র ব্যথা-বেদনায়, মাথাধরায়, পিঠের ব্যথায়, পেশীর ব্যথায় আর দাঁতের যন্ত্রণায় চটপট আরাম এনে দেয়।

ভারতে ব্যথা-বেদনার উপশমকারী ওষুধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়
জেফ্রি ম্যানার্স-এর অ্যানাসিন বিভাগ থেকে

*Regd. T M

A22-7/77

ছবিতে উত্তমকুমার সর্বাঙ্গীণভাবে উপস্থিত। ফলে, আরতির ভট্টাচার্য-র করার কিছু করারই নেই। একটি কি দুটি দৃশ্যও যদি তাঁর জন্যে ছেড়ে দেওয়া হত, তাহলেও এই সর্বোচ্চ অভিনেত্রী এতটাই অপচিত হতেন না। হয়তো তিনি স্ক্রিপ্ট না পড়েই ছবিতে সই করেছিলেন, আর তাই ছবির দ্বিতীয়ার্ধে তাঁকে প্রায় হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেয়া হয়। তাঁর প্রায় কিছুই করার নেই, তবু আমাদের এটুকু বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে তিনি কত সহজে, কত সাবলীলভাবে আনাগোনা করতে পারেন। এমনকি উত্তমকুমারের কাছ থেকেও একের পর এক দৃশ্য চুরি করে নেন ছায়া দেবী—তাঁর অভিনয়ের প্রাবল্য ক্ষমতা প্রায় অনিরুদ্ধ। এ-ছবিতে শুধু ছায়া দেবীর দৃশ্যগুলি আলাদা হয়ে তাঁর অনন্য প্রতিভার চিহ্ন নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে রইলো। এবং সেই সঙ্গে রেণুকা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত একটি দৃশ্য মনে রাখার মতো হলো। বিশেষ করে স্মৃতিভ্রংশের পর তিনি যখন একেবারে শূন্যমন 'অম্বল' হয়ে যান।

এবার ছবিটিকে আরো একটু অন্যভাবে বিচার করে দেখা যাক। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-এর একটি প্রাচীন কাহিনীকে অবলম্বন করে তৈরী হয়েছে 'আল ...'। এবং ছবির টেকনিক্যাল কোয়ালিটি থেকে এ ধারণা করা কঠিন নয় যে ছবিটি ১৯৭৭-এ তৈরি হয়েছে। সেদিক থেকে যে ছবিটি পিরিয়ড পিস সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ-কথাটা যে নেহাৎ ভিত্তিহীনভাবে বলছি না সেটা জায়গার অভাবে মাত্র দু-একটা উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছি। (১) উত্তমকুমার যে-দৃশ্যে বন্ধুর ওষুধের দোকানে এলেন সেখানে একটা জ্বলন্ত আলোর বাল্ব সরাসরি লেন্স-এর ওপর পড়ে দুটো হয়ে যাচ্ছে এবং সেটা শুধু চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক নয়, সেখানে আমরা সিনেম্যাটোগ্রাফির শোচনীয় পরাজয় দেখতে পাই, অথচ ক্যামেরাম্যান বিজয় ঘোষ সেদিকে খেয়ালই করেন নি; (২) স্টেশন-এ একটি ঝড়ের দৃশ্যে ঝড়ের আওয়াজ, মেঘের গর্জনে সাউন্ডট্র্যাক তোলপাড় হয়ে যায়, একটু উঁচু থেকে নেয়া একটা শট-এ স্টেশন-এর কাঁকরে স্বামীস্ত্রীকে আমরা ঝড়ের প্রাবল্যে বিপর্যস্ত দেখি, অথচ সুদূর ব্যাকগ্রাউন্ডে কালো-কালো গাছের মাথাগুলি নিথর হয়ে আকাশের গায়ে আঁকা থাকে, যেন তারা অন্য পৃথিবীর; (৩) স্টেশন-এর ওয়েটিং-রুম দৃশ্যে ক্যামেরাম্যান বিজয় ঘোষ দেখিয়ে দিয়েছেন যে যদি উত্তমকুমার একটি তেলের ল্যাম্প জ্বালান নিজে হাতে তাহলে সেই আলোতেই একটি বেশ বড় সাইজ-এর ঘরও রোশনাই হয়ে যেতে পারে। ব্যাপক লোড-শেডিং-এর দিনে এ-তথ্য মূল্যবান। (৪) নদীর জলে সুপারইমপোজড্ সাপ এত কাঁচা হাতের কাজ যে মনে হয় আমরা বোধহয় কোনো অলৌকিক প্রথায় সময়কে পিছিয়ে নিয়ে যেতে

মহাজাতি সদনে
(শীততাপ নিয়ন্ত্রিত)
প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৬॥টায়
নটী বিনোদিনী
প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৬॥টায়
বিদ্যাসাগর অথবা মা মাটি মানুষ
আসন্ন উপহার
পাপ পুণ্য ভগবান
সাঁই ফকির রূপচাঁদ
পরিবেশনায়
সর্বযুগের একটি নাম
নট্ট কোম্পানী
১৭ হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট, কলিঃ ৫ ফোন ৫৫-৭৭১২ ও ৫৪৩৬৬৮

ON EASY INSTALMENTS
TELEVISIONS
REFRIGERATORS
STEREO SYSTEMS
RECORD PLAYERS
TAPE RECORDERS

bambino

…ীর ; (৫) আদালতের সমগ্র …টিকে প্রদক্ষিণ করে যে প্যানিংটি …রে সেরকম দুর্বল ক্যামেরা চালনা …রেখিদম দেখিনি—ঠোক্কর খেতে- …তে প্যানিং হয় এবং একটি পাখার …লেটার-এর ওপর অযথা ক্যামেরাটা …কে থাকে। ব্যপারটা এডিটিং-এ …ক করা এবং সবচেয়ে মজার …পার ঐ মডেল-এর রেগুলেটার …০-এর দশকে (যে-সময়কার কাহিনী …র ছবি) এ-দেশে চালু ছিল না। …ন্তু শুধু রেগুলেটর কেন ? পরাধীন …রতবর্ষে অর্থাৎ ১৯৪৭-এর আগে … ডিজাইন-এর গ্লাস জানলায় …হত হত না, ঐ মডেল-এর …লিস্কোপ চলতি হয়নি, এবং …পেনসারি দৃশ্যে টেবিল-এর …রে সামনে যে টেলিফোনটি দেখা যায় সেটিকে রিসিভার এবং ক্রেডল-এর গঠন থেকেই আমরা চিনতে পারি আধুনিক বলে। এবং মিড ক্লোজ-এ উত্তমকুমার দু-তিনটি দৃশ্যে সিগারেট ধরান, এবং প্রতিটি সিগারেট ফিলটারড ! ৪০-এর দশকে পরাধীন ভারতবর্ষে কোনো দিশি ফিলটারড সিগারেট ছিল না। কিন্তু, বিদেশি সিগারেট-এর ফিলটারড সংস্করণ হয়তো পাওয়া যেত, কিন্তু উত্তমকুমার যে সিগারেটগুলি ক্যামেরার অত কাছাকাছি অমনি নির্ভয়ে ধরে থাকেন সেগুলি যে বিদেশি তার কোনো এসট্যাবলিশিং শট সমস্ত ছবিতে একবারও আছে কি ? ভালো কথা, উত্তমকুমার যে বিশেষ 'হুঁউ' ছাঁটের কেশবিন্যাস এদেশে চালু করলেন সেটা ৪০-এর দশকে স্বামীজী (জাল সন্ন্যাসী) জানলেন কি করে ? এ-কাহিনীর নায়ক চঞ্চল চ্যাটার্জি ওরফে স্বামীজী ওরফে জাল সন্ন্যাসী (যিনি ৪০-এর দশকের মানুষ) বড়ুয়া সাহেবের ছবি দেখে থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি সত্তরের 'গুরু' উত্তম-কুমারকে অ্যানটিসিপেট করলেন কি করে ? আমি তো ভেবে পাচ্ছি না, সলিলবাবু আপনি পারেন ? কোলরিজ, আপনি একদা বলে ছিলেন আপনার কবিতা বুঝতে হলে প্রয়োজন উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ-এর। বাংলা ছবি দেখলে আপনি যে টোটাল অ্যানিহিলেশন অফ ডিসবিলিফ-এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেন তাতে সন্দেহ নেই।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

কাটিঙেরী কৃষ্ণ হেব্বার (১৯১২—)

জন্ম দক্ষিণ কানাড়ায়। তারপর একসময় বোম্বাইতে এলেন। শেষ পর্যন্ত সেখানেই থেকে গেলেন। পড়াশুনো শেষ করে ১৯৩২ সালে তিনি বোম্বাইয়ের জে জে স্কুল অব আর্টে ভর্তি হলেন। ১৯৩৮-এ সসম্মানে বেরিয়ে এলেন।

বোম্বাই শহরে পার্শী প্রাধান্যের জন্যে পাশ্চাত্যকরণ ঘটেছে জীবনের নানা স্তরে। শিল্পকলার ক্ষেত্রে জে জে স্কুলের শিক্ষাধারার মধ্যে প্রতীচ্য শিল্পরীতিকে আয়ত্ত করার সবরকম আয়োজন ছিল। অবনীন্দ্রনাথের মতো কোনো শিল্পাচার্য এসে সেখানে তেমনভাবে কোনো প্রশ্ন তোলেননি। হেব্বার অবশ্য 'বোম্বে গ্রুপের' সদস্য ছিলেন না। দক্ষিণীদের ঐতিহ্যপ্রীতি তাঁর ছবির মধ্যে সুস্পষ্ট।

১৯৪৯-৫০—এই দুই বছর প্যারীর আকাদমী জুলিয়ানের ছাত্র ছিলেন। হেব্বার তৈলচিত্র আঁকেন। ইউরোপীয় আঙ্গিকের নবতম সংযোজন সম্বন্ধে জানেন, অবশ্য প্রতিচিত্রের মধ্যে দিয়ে নয়। সব মহাদেশ দেখা আছে তাঁর। ভারতীয় বিষয়কে আধুনিক কলাকৌশল এবং আঙ্গিকে কী করে উপস্থিত করা যায় হেব্বার সব সময় সেটা ভেবেছেন। সহজে স্বাভাবিকভাবে দর্শকের কাছে মনকে খুলে ধরতেই মগ্ন তিনি। এই উভয় দুদিককে বজায় রাখেন আশ্চর্য কৌশলে। তাঁর সব কাজের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভারতীয় মাটির মধ্যে প্রোথিত তাঁর মূল। কিন্তু আধুনিক আকাশের মধ্যেই শাখা-প্রশাখা পত্রপুষ্প মেলে দাঁড়িয়ে আছেন। যাঁরা ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ করেন তাঁদের চোখে সন্দেহভাজন তিনি। কিন্তু নানা পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। ইউরোপ এবং ভারতবর্ষের নানা শহরে প্রদর্শনী করেছেন। ১৯৭৬-এ দিল্লির ললিতকলার 'ফেলো' নির্বাচিত হয়েছেন।

১৯৭০ সালে আকাদমী অব ফাইন আর্টসে তাঁর পূর্বাপর ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল। হেব্বারের ছবিতে সুরের প্রাধান্য। সাতটা রঙ যেন সাতটা সুর। বস্তুজগতের প্রতিমাগুলির সঙ্গে পটভূমির শূন্য অবকাশের সম্পর্ক তাঁর কাছে খুবই জরুরী। একটা বিস্তারের আবহ তৈরি করতে চান। রূপময় জগৎ এক মহাজাগতিক শূন্যতার মধ্যে ঘূর্ণায়মান, ছবির মধ্যে এমন একটা ভাব তৈরি করতে চান। তাঁর 'সংগীত চিত্রমালায়' তিনটে ছবি ছিল। 'সংগীত' (প্রাচ্য) যেখানে তিনি একক ধ্যানে ভগবদ্-সাধনার রূপ ধরার চেষ্টা করেছেন। তেমনি 'সংগীত' (প্রতীচ্য) বহু বিরোধী সুরস্বরের দ্বন্দ্বসমন্বয়ের ভাবটা ছবির ভাষায় বলেছেন হেব্বার। 'তাল'-এ ছবিতে জলের গর্জন উচ্ছ্বাস উল্লাসের চলিষ্ণুতা ধরতে চেয়েছেন। 'শারদ পূর্ণিমা' তেমনি বিস্তৃত সুস্পষ্ট আলোর প্লাবনকে ধরেছেন। 'দ্যুতি' ছবিতে দেখিয়েছেন সূর্যাস্তের পর চারদিকে সব কিছুতে যেন রক্তের আগুন লেগে গেছে। তেমনি 'গ্রীষ্মে' গাছপালাতে আগুন ধরে যায়। আকাশে কখনো চাঁদ আর কখনো সূর্য সহাবস্থান করে। গরম পড়লে দিন-রাতের ভেদ থাকে না একথা

বলতে চেয়েছেন। 'ভোর' হলে সব-কিছু তার রঙ ফেরত পায়।

তেমনি 'অনুসন্ধা'-র মতো ছবি দেখলে বোঝা যায় বিশুদ্ধ বিমূর্ত কাজ কেমন পরিষ্কার করে আঁকতে পারেন। মাঝখানে একটা শূন্য অবকাশের মধ্যে ভুলে যাওয়া স্মৃতির মতো কিছু রঙ উঁকি দেয়। পটের ওপরে গাঢ় নীল খয়েরী এবং কালো চাপিয়েছেন। নীচে গাঢ় নীল গোলাকার বস্তু পড়ে আছে খয়েরী কালো পটভূমিতে। নীল ছোপ আছে ছড়ানো। মাঝখানের সাদা অংশটু একটা রেখা সর্পিলভাবে দ্বিখণ্ডিত করে চলে যায় বাঁ থেকে ডানে।

'পাপের শাস্তি' (Nemesis ১৯৫৮, তৈলচিত্র, ৬০"×৪৮" অস্ট্রেলিয়ার কমনওয়েলথ সংগ্রহশালা —অ্যাটম বোমার প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ভয়ঙ্কর রূপ তুলে ধরেছেন হেব্বার। মেটে সিঁদুর রঙের চওড়া অনুভূমিক রেখা মাঝখান থেকে গিয়ে আনতভাবে চারপাশের ফ্রেমকে ঘিরে রয়েছে। যেন জীবনের বেষ্টনী। অনুভূমিক রেখার নীচেকার কালো ঘন রঙে ধুলোটের মধ্যে মানুষ পালাচ্ছে। লা সবুজ দুই বিপরীত রঙের ছোপ এ অংশটাকে হিংস্র করে তুলেছে। আ অনুভূমিক রেখার ওপরে সেই ভয়ঙ্ক ছত্রক। হেব্বার রঙে রেখায় সাবধান উচ্চারণ করেছেন চিত্রভাষায়। খ্রীষ্ট পূর্ব ৮ম শতাব্দীর ইহুদি-নবীদে মতো রুদ্র তাঁর ভঙ্গী।

'প্রকাশন' (তৈলচিত্র—৪০"×৪৪ ১৯৭০)—হেব্বারের 'সঙ্গীত' চিত্র মালার অন্যতম ছবি। পটের অবকাশে মধ্যে সুর এবং বিস্মৃতির ভাবসৃ করেছে সহজ আভাসে। গায়িকাকে ঘিরে বসে আছে সঙ্গত করবে যারা তাদের কারো হাতে খোল। খেল করে তানপুরার গায়িকার চম্প আঙুল। রূপসী আঙুলের মুখ তানপুরা খাড়া উঠে গিয়ে নীচে গোলাকার [illegible] কল্পনা বৃদ্ধি করেছে। স্বল্প রঙ ছোপ ছোপ কর লাগিয়ে একটা গূঢ় গভীর আবহ রচনা করা হয়েছে।

"আমি যেমন আমার স্কোয়ার ড্রাইভের নিপুণতায় সচেষ্ট ছিলাম,
আমার দাড়ি কামাবার ষোলআনা তৃপ্তির জন্যে পামঅলিভও তেমনি"

-বলেন সুনীল গাভাসকর

এখন নতুন পামঅলিভ-এর এস জি এল-৪ যুক্ত আরো উন্নত ময়শ্চারাইজড লাদার দিয়ে আরো মিহি, আরো মোলায়েম করে দাড়ি কামানো যায়

পামঅলিভ-এর ময়শ্চারাইজড লাদার এখন আপনার দাড়ি কামানোকে অনেক বেশী উপভোগ্য করে তোলে। এর অসাধারণ উপাদান এস জি এল-৪, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই প্রচুর ঘন ফেনার সৃষ্টি করে। এই ফেনার রাশি অনেক বেশীক্ষণ ভিজে থাকে, ফলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার দাড়ি কামানো হয় আরামদায়ক। এমন কি সবচেয়ে শক্ত দাড়িও এ নরম করে রাখে। আর, আপনার রেজর সড়সড় করে কামিয়ে চলে।

সবচেয়ে মিহি আর মোলায়েম করে দাড়ি কামানোর সঙ্গে সঙ্গে পামঅলিভের কোমলতাদায়ক সমৃদ্ধ উপাদান আপনার ত্বককে কোমল করে রাখে।

দাড়ি কামানোর এক আধুনিকতম চাঞ্চল্যকর অনুভূতি—এস জি এল-৪ যুক্ত পামঅলিভ ব্যবহার করুন।

দাড়ি কামানোয় আপনার পছন্দমত সুখানুভূতির জন্যে বেছে নিন পামঅলিভ থেকে

পামঅলিভ ডি লাক্স লাদার...
নরম তুলতুলে ফেনা আর কামিয়ে সত্যিকারের আরাম পাবার জন্যে পুরুষোচিত সৌরভ।

পামঅলিভ লেমন-ফ্রেশ...
কামানোর পর তরতাজা অনুভূতির জন্যে লেবুর চনমনে স্নিগ্ধতা।

পামঅলিভ মেন্থল-কুল...
চমকলাগা শীতল সুরভি আর মেন্থলের শীতল পরশ।
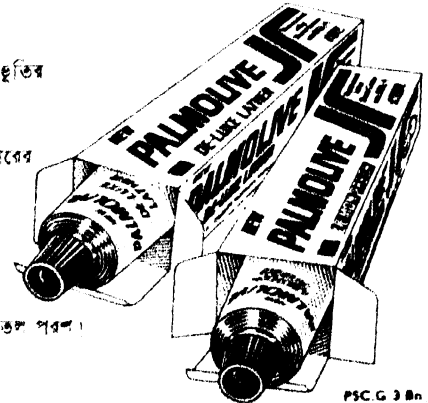
পামঅলিভ—বিশ্বের সর্বত্র কৃতী পুরুষদের জন্যে

PSC.G 3 Bn

নির্ভাবনায় কিনে ফেলুন,
বিমলের কাপড় সত্যিই উত্তম;
গুণবত্তার পেছনে আছে,
৪০০০ বিশেষজ্ঞের শ্রম.
VIMAL®
A RELIANCE PRODUCT
স্যুটিং

নতুন গোল্ড মিস্ট। এর অনন্ত কোলনের সতেজতায় আপনাকে ঘিরে রাখুন। আপনার ত্বকে শিহরন জাগাবে: কোলনের সুবাস আপনার সারা অঙ্গে মিশে থাকবে সারাদিন ধ'রে।

নতুন গোল্ড মিস্ট। দেখুন, কেমন সুরুচিপূর্ণ এর নতুন গঠন, কেমন অভিজাত এর সোনালী মোড়ক।

নতুন গোল্ড মিস্ট। ওজনে যেন ১০০ গ্রাঃ সোনা! আর ওজনটাও দেখবার মত বৈকি!

একই দামের অন্যান্য অধিকাংশ সাবান ওজনে অনেক কম।

টাটার তৈরী

OBM-7892 BN

চিঠিপত্র

নজরুলের বাংলা গান

শ্রীপ্রণবকুমার ঘটক চিঠিপত্র বিভাগ (দেশ, ৩০ জুলাই, ১৯৭৭)-এ লিখেছেন, আমি নজরুলের বাংলা গজলকে স্বাধীন বিস্তারের পথে নিয়ে যাবার উপদেশ' দিয়েছি। একথাও লিখেছেন যে, স্বাধীন বিস্তারের পন্থা আমার অনুমোদনসাপেক্ষে। মনে হয়, দেশ (৯ জুলাই, ১৯৭৭)-এ প্রকাশিত আমার চিঠি তিনি ভালো করে পড়েন নি।

প্রথমতঃ, উপদেশ আমার প্রবন্ধ নয়। প্রণববাবু 'কবির কিঞ্চিৎ সম্মতি' বলে নজরুলের যে উক্তির উল্লেখ করেন নি, উপদেশ তার মধ্যেই নিহিত। শুধু একখানি গানে পাঁচ প্রকার বিভিন্ন বিস্তারের নমুনা দিয়ে নজরুল বলছেন, বিস্তারের কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া হইতেছে'; তাছাড়া, স্বরলিপির মাধ্যমে গজলের সুরের কাজের ঢং-এর নিদর্শন দিয়ে 'আর্টিস্ট পৃথক পৃথক-ভাবে সুরের কাজের সৃষ্টি' করবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নজরুল বললে কি হবে, ঘটক মহাশয় বলছেন, 'কই, কোথাও তো কবি শুধু একটা স্বাধীন বিস্তারের প্রশ্রয় দেন নি।' এ ব্যাপারে কার মত গ্রাহ্য,—ঘটক মহাশয়ের, না নজরুলের?

দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীন বিস্তারের পন্থা আমার অনুমোদনসাপেক্ষ নয়। যেখানে স্বয়ং সুরকারের প্রত্যক্ষ নির্দেশ আছে, সেখানে অনুমোদনের কথা আসে না। তাছাড়া, সেকালের প্রতিষ্ঠিত নজরুল-সংগীতের শিল্পীদের কণ্ঠে আমি নজরুলের গজল শুনেছি। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্বে শ্রীঅনিল বাগচী মহাশয় হাসনাবাদ কয়েক দিনের জন্য এসেছিলেন। তিনি সমারোহ আসরে নজরুলের গজল গেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন সেই গান নজরুলের কাছেই শেখা। অতি চমৎকারী স্বাধীন বিস্তার দিয়ে তিনি 'দেশ'-এর অংশ গেয়েছিলেন সে কথা আজও আমার মনে আছে। পাটনার শ্রীপ্রফুল্ল সেনগুপ্ত মহাশয় (যিনি যৌবনে ঠুংরী প্রতিযোগিতায় শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সমগৌরব লাভ করে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন) নজরুলের সঙ্গীতগুরু ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে ঠুংরী ও নজরুলের কাছে তাঁর গান শেখেন। তাঁকে সুন্দর স্বাধীন বিস্তার দিয়ে নজরুলের গজল গাইতে শুনেছি। তিনি আজও বর্তমান এবং কাজী অনিরুদ্ধ তাঁর কাছে নজরুলের বিস্মৃত গান সংগ্রহ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন একথাও জানি। ত্রিরিশের দশকে শ্রীমতী কমলা ঝরিয়াকেও ইচ্ছামত বিস্তার দিয়ে নজরুলের গজল গাইতে শুনেছি। বাহুল্য ভয়ে উদাহরণ বৃদ্ধি করলাম না। এই সব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সংগে নজরুলের লিখিত উপদেশ যুক্ত করলে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, নজরুলের গজলে গায়কের স্বাধীন বিস্তারের অবকাশ আছে।

প্রণববাবু যে-সব রেকর্ডের কথা

লিখেছেন, সেই সব রেকর্ডের নম্বর ও কণ্ঠশিল্পীদের নাম দিতে পারেননি। পারলে তাঁর কথা যথোচিত-ভাবে তথ্যভিত্তিক হতো। অবশ্য, নজরুলের কাছেই সেই শিল্পীরা শিক্ষা পেয়েছিলেন এর অবিসম্বাদিত স্বীকৃতিও দরকার।

প্রণববাবু লিখেছেন, 'গোপালবাবুর পন্থা অনুসরণ করলে উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়া নজরুলের গানে আর কিছু ঘটবে না।' স্বাধীন বিস্তার ও উচ্ছৃঙ্খলতা যে এক জিনিস নয়, সেকথা কি লিখে বোঝাতে হবে? "আজকালকার অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক অথচ নামকরা গায়ক-গায়িকাদের বিরুদ্ধে প্রণববাবুর যে বিক্ষোভ, সেটা প্রকাশের জন্য তিনি অন্য ক্ষেত্র নির্বাচন করতে পারতেন। নজরুল স্পষ্ট ও লিখিতভাবে স্বাধীন বিস্তারের উপদেশ দিয়ে গেছেন তাঁর গজলে। সেই স্বাধীনতা যদি মাত্রা ছাড়ায়, তবে সেটা মাত্রাবোধহীন গায়ক-গায়িকার নান্দনিক জ্ঞানের অভাব বলেই সূচিত হবে। কিন্তু সে জন্য স্বাধীন বিস্তার বন্ধ করার উদ্যোগ কেন? এই যুক্তির অনুসরণ করলে তো খেয়াল-ঠুংরীতেও স্বাধীন বিস্তার বন্ধ করতে হয়; কেন না, বাড়াবাড়ি সর্বত্রই বাড়াবাড়ি।

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁর 'নজরুলের সঙ্গীতচিন্তা' প্রবন্ধেই লিখেছেন, 'প্রোফেশনাল গায়কেরা গানে যে অবকাশ প্রত্যাশা করেন নজরুল তার সুযোগ রেখেছিলেন প্রচুরভাবেই'। বাংলা দাদ্রায় এই সুযোগ রেখে গজলের ক্ষেত্রে (যেখানে এ সুযোগ না দিলে রসহানি হবেই) তিনি এ সুযোগ রাখেন নি একথা তথ্য-বিরোধী ও অনুমানভিত্তিক।

উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করার একমাত্র উপায় স্বাধীনতা-হরণ নয়।

গোপাল মিত্র মৌলা, ছাপরা

বাংলা থিয়েটার

গত ৩০শে জুলাই, 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীবিপ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের প্রবন্ধ 'বাংলা থিয়েটার ও সরকারী দায়িত্ব' প্রবন্ধটি পাঠ করলাম। উনি অনেক ভালো কথা লিখেছেন এবং আপনার সহযোগিতায় প্রবন্ধটির মাধ্যমে বিনা খরচে নান্দীকারের ভালো বিজ্ঞাপনও দিয়েছেন কিন্তু আমার সম্বন্ধে উনি লিখেছেন (পৃঃ ৫৪- "অসীম চক্রবর্তী ব্রাসিয়ারের বিজ্ঞাপন দেখিয়ে বারবধূকে এপার রেকর্ডের পথে নিয়ে যাচ্ছেন।") নাটকটি না দেখেও নাটকটির সাফল্যের জন্য ওঁর এই ক্রোধ কেন? রঙ্গনা থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে বলে? প্রতাপে আমি এখনও প্রতাপের সঙ্গে রয়েছি বলে? আমি তো গেঞ্জী, মোজা, জাঙিয়া বা ব্রাসিয়ারের ব্যবসায়ে নেই যে ও-ধরনের বিজ্ঞাপনে আমার প্রয়োজন। আর এরকম বিজ্ঞাপনই বা উনি দেখলেন কোথায়?

মুক্ত অঙ্গনে আমরা যখন 'জনৈকের মৃত্যু'র নিয়মিত অভিনয় করছি তখন নান্দীকার অভিনয় করছেন 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' যার মূল বক্তব্য ছিল সেক্স। সং বাবার সঙ্গে মেয়ের যৌন সম্পর্ক এবং মঞ্চের ওপর ব্লাউজ ছেঁড়া। চতুর্মুখের

প্রকাশিত হল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের

সরস গল্পের সংকলন

শ্বেত পাথরের টেবিল দাম ৮·০০

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় নতুন লেখক। মাত্র বছর তিন-চার হলো সাহিত্যের আসরে তিনি প্রবেশ করেছেন সরস গল্পের ডালি নিয়ে। প্রবেশ মাত্রই তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছে প্রশংসা আর অভিনন্দনের অজস্র কুসুম তাঁর অসীম কৌতুক বোধ এবং হাস্যরস সৃষ্টির আশ্চর্য নিপুণতার জন্যে। বাংলা হাসির গল্পের ছোট্ট আসরটুকু যখন ঘন আঁধারে প্রায় ডুবে যেতে বসেছিল, বার্ধক্যভারে পীড়িত এক প্রবীণ নায়ক শিবরাম চক্রবর্তী যখন একমাত্র 'একা কুম্ভে'র মতো বাংলা কৌতুক গল্পের 'বুঁদির গড়'টি একা হাতে কোনরকমে রক্ষা করে চলছিলেন, সেই অসময়ে তরুণ সূর্যের মতো উদিত হয়ে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় নতুন আশার আলোয় ভরিয়ে তুলেছেন সাহিত্যের এই ছোট্ট অঙ্গনটুকু। তাঁর এগারোটি সেরা গল্প নিয়ে গ্রন্থিত হয়েছে এই বই : শ্বেত পাথরের টেবিল

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের

বিভিন্ন গ্রন্থ

মাধুরীলতার চিঠি

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

প্রকাশিত হল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

নতুন উপন্যাস

শ্যাওলা দাম ৮·০০

একটা নতুন ভিয়েৎ-নাম গড়ার কিংবা লং মার্চ করার স্বপ্নে মেতে উঠেছিল এক দল যুবক। ভুল হোক, সাচ্চা হোক, একটা বিপ্লব হয়েছিল। সেই বিপ্লবের এক নায়ক হিরণ্ময়। পেটা-কোঁচড়ে বিভক্ততার, টনটনে স্নায়ু, সজাগ পেশী। আর ছিল রূপালি—হিরণ্ময়ের দিকে যে বাড়িয়ে দিয়েছিল ভালবাসার মোহময় হাত। হিরণ্ময়ের এক চোখে ভালবাসা, অন্য চোখে ঘৃণা। তারপর এল 'গঠন মূলক' দিন। দ্রুত এগিয়ে গেল দেশ। পুলিসের বুটের ওঠানামায় একবার 'গঠন' একবার 'মূলক' শব্দে ভরে গেল নতুন সমাজ। গড়ে উঠল নতুন যুব আন্দোলন। সেই নতুন সমাজে ফিরে এল ব্যর্থ বিপ্লবী হিরণ্ময়। নিঃস্ব, নিঃসহায়, নিঃসম্পর্ক। অচল টেলিফোনের মতো যোগাযোগহীন। নতুন সমাজে সকলেই কিছু বলতে চায় তাকে। কিন্তু রিং বেজে যায় বার্তা পৌঁছয় না।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর এই নতুন উপন্যাসে এক দিকে আশ্চর্য মমতায় ফুটিয়ে তুলেছেন অভিমানী আত্মঘাতী যুবসমাজের নিষ্ঠুর দেয়ালীলিপির মতো অমোঘ নিয়তি, অন্য দিকে মুন্সিয়ানা ক্ষমতায় চিহ্নিত করেছেন দুঃসময়ের এক জীবন্ত আলেখ্য।

সুশোভন উপায়ন সংস্করণ প্রকাশিত হল

বিমল করের

এক কিশোর নবদম্পতির নতুন প্রণয়ের কৌতুকোজ্জ্বল স্নিগ্ধমধুর চিরায়ত কাহিনী

বালিকা বধূ

জীবনের মধুরতম মুহূর্তগুলিকে চিরন্তনতার আভিসিঞ্চিত করে রাখবার অভিজ্ঞান হিসেবে পরিকল্পনা এই অনবদ্য সংস্করণটির। এটির বৈশিষ্ট্য :

- অসাধারণ বিশিষ্ট আয়তন
- সুমসৃণ দুগ্ধশুভ্র মূল্যবান কাগজ
- আগাগোড়া নয়নলোভন বর্ণোজ্জ্বল দুরঙা মুদ্রণ
- সোনালী অপরূপ নতুন ধরনের প্রচ্ছদ
- মজবুত হাফ-ক্লথ বাঁধাই
- শিল্পসুষমায় অপূর্ব অলংকরণ

এত সব মাত্র সাত টাকায়

এই লেখকের অন্যান্য বই :

প্রচ্ছন্ন ১০·০০ দ্বীপ ৬·০০ মোহ ৭·০০ দংশন ৬·০০ সান্নিধ্য ৫·০০ অসময় ১২·০০ একা একা ৫·০০ ভুবনেশ্বরী ৪·০০ মৃত ও জীবিত ৪·০০ একদা কুয়াশায় ৬·০০ কুশীলব ৩·৫০ আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন ৪·৫০ যদুবংশ ৮·০০ পূর্ণ অপূর্ণ ১৫·০০ পরিচয় ৪·০০ গ্রহণ ৪·০০ খড়কুটো ৭·০০ কাপালিকরা এখনও আছে (কিশোর-সাহিত্য) ৭·০০ ওআংতার মামা (কিশোর-সাহিত্য) ৬·০০

কয়েকটি উপন্যাস

সমরেশ বসুর
একটি অস্পষ্ট স্বর
দাম ৫·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
অর্জুন
দাম ৭·০০

বিমল মিত্রের
নিবেদন ইতি
দাম ৫·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
সেতুবন্ধন
দাম ৭·০০

মনোজ বসুর
স্বর্ণসজ্জা
দাম ৪·০০

প্রবোধকুমার সান্যালের
জনম জনম হম
দাম ৪·০০

আশাপূর্ণা দেবীর
দোলনা
দাম ৫·০০

গৌরকিশোর ঘোষের
আমরা যেখানে
দাম ৫·০০

প্রতিভা বসুর
বেলা-অবেলার গান
দাম ৬·০০

সুবোধ ঘোষের
বাসরদত্তা
দাম ৪·০০

রমাপদ চৌধুরীর
বনপলাশির পদাবলী
দাম ১৫·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
প্রতিধ্বনি ফেরে
দাম ৪·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কহেন কবি কালিদাস
দাম ৩·০০

শৈলেন ঘোষের

ছোটদের রূপকথার বই

হুপ্পোকে নি[illegible] গপ্পো দাম ৫·০০

ছোট্ট মেয়ে ঝুমকির ছি[illegible] একটা ছোট্ট বাঁদরছানা। নাম হুপ্পো। ঝুমকি ন[illegible] পায়ে নাচ শেখে। হুপ্পো[illegible] মনে মনে ভারী ইচ্ছে সে[illegible] নাচে। একদিন ভরদুপু[illegible] নুপুর পরে নাচতে গিয়ে[illegible] এমন কান্ড ঘটালো যে,[illegible] শিউরে উঠতে হয়! আ[illegible] দুরন্ত বাঁদর দুটি পাও[illegible] ভার। দুরন্ত বলে দু[illegible] চচ্চড়িভাজা বুড়ীর ছাগ[illegible] পিঠে চেপে কি কান্ডট[illegible] করলো সে! অত কি, গ[illegible] রাতে পুলিসের সঙ্গে [illegible] পুলিস খেলা, কিংবা সার্কাসের বাঘকে খোঁপ[illegible] দিয়ে ভেংচি কাটা, নিয়[illegible] রাতে কালো ছায়াটার স[illegible] [illegible] করা কি হুপ্পোর [illegible] বাহাদুরি। 'হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো' শৈলেন ঘো[illegible] এমনই এক ছোট্ট বাঁদরে[illegible] মজার অ্যাডভেঞ্চার ॥

এই লেখকের অন্যান্য বই : আমার নাম টায়রা ৫·০০ [illegible] বাজনা ৫·০০ ছোট্ট সো[illegible] গল্প শোনা ৬·০০ মিতুর [illegible] নামে পুতুলটি ৪·০০ [illegible] বরুণ কিরণমালা ৩·০০

সেলস কাউন্টার স্থানান্তরিত

আমাদের সেলস কাউন্টা[illegible] ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রো[illegible] থেকে ৪৫ বেনিয়াটোল[illegible] লেন-এর আমাদের অফি[illegible] বাড়ির দোতলায় স্থানান্তরিত হয়েছে।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা
ফোন ৩৪ ৩৩৩২

দেশ ৪৪ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা
৮ আশ্বিন ১৩৮৪

সম্পাদকীয়

সূচীপত্র

সমৃদ্ধ অরণ্য সমৃদ্ধ জীবন

'দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর'—রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় যে উপলব্ধির বাণী ধ্বনিত হয়েছে, সেই উপলব্ধি সাম্প্রতিক কালের ইকোলজির পণ্ডিতদের চিন্তাতে আরও বেশি প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে করা চলে। কবির এই উক্তির নিতান্ত বাচ্যার্থ বিচার করলে কোন-কোন সমালোচকের মনে এই সংশয় সঞ্চারিত হতে পারে যে, কবি যেন নগরের তুলনায় অরণ্যকে মানুষের জীবনের পক্ষে বেশি অনুকূল সৌন্দর্যের পরিবেশ বলে মনে করেছেন। কিন্তু উক্তিটির সরল মর্মার্থ অনুযায়ী ধারণা করতে হয় যে, নগর তথা সহর নামক পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত সভ্যতার মানুষকে অরণ্যের মূল্য মর্যাদা ও প্রয়োজনের মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে অনুরোধ করেছেন। ইকোলজির বিচারে জীবনের সহজ স্বাচ্ছন্দ্য স্বাস্থ্য ও স্বস্তির যে অমোঘ প্রয়োজনের স্বীকৃতি অধুনা খুবই সরব হয়ে উঠেছে, সেটা সহরের পরিবেশের মধ্যে সফল করে তুলতে হলে সহরের সঙ্গে অরণ্যের একটি সুসম্বন্ধ চাই। প্রাচীন মেসোপটেমিয়া ও মধ্য এশিয়ার স্থানে-স্থানে ধ্বংসীভূত প্রাচীন জনপদের যে বৃক্ষ বিরল নেড়া-নেড়া চেহারা পুরাতাত্ত্বিকের মনের একটি ধারণা সৃষ্টি করেছে, তার মধ্যে জনপদ ও অরণ্যের সম্পর্কগত এই সত্যেরই পরিচয় পাওয়া যায় যে, অরণ্যের সম্পর্ক থেকে আত্যন্তিক রকমে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার কারণে এইসব জনপদের প্রাণবত্তা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

সাতদিন ধরে নাইরোবিতে অরণ্যের সমৃদ্ধতির তত্ত্ব আলোচনা করবার জন্য আহূত বিশ্ব-সম্মেলনে যে চিন্তার কথা প্রতিনিধিদের প্রায় সবারই মুখে ভাষিত হয়েছে, সেটা যেন অরণ্যের প্রসন্নতা আহ্বান করবার জন্য বিশ্বজীবনের একটি ব্যাকুল আবেদনের কথা। মরুভূমির প্রসার নিরোধ এবং অরণ্যের প্রসার বৃদ্ধির উপায় নির্ধারিত করবার জন্য অনেক বিচার-বিবেচনা ও অনেক আলোচনা এই সম্মেলনে উপস্থিত বক্তা ও প্রবক্তাদের ভাষণে পরিস্ফুর্ত হয়েছে। মরুভূমির প্রসার ও বনভূমির সঙ্কোচ, একই করুণ সমস্যার দুই প্রকাশ। একটি অপরটির হেতু। এই সমস্যা আমাদের ভারতভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নিদারুণ এক পরিণামের সঙ্কেত নিয়ে দেখা দিয়েছে। যে-ক্ষেত্রে ভারতীয় বনভূমির আয়তন সমগ্র ভূ-ভাগের তেত্রিশ শতাংশ হওয়া চাই, সেক্ষেত্রে ভারতীয় বনভূমির আয়তন হলো ভূ-ভাগের মাত্র তের শতাংশ। বনভূমির আয়তনের ক্ষুদ্রতা ভারতের অনেক কষ্ট ও করুণ সমস্যার হেতু হয়েছে। বন্যপ্রাণীর সংখ্যা হ্রাস, কৃষি ও অন্যান্য আবাদের সঙ্কোচ, ভূমিক্ষয়ের প্রবলতা আবাহ বিপর্যয়ের তীব্রতা ও বন্যার আধিক্য এই সবই অরণ্যের অভাব ও সঙ্কোচের প্রত্যক্ষ পরিণামের সঞ্জাত ঘটনা। অরণ্যগুলি যে 'কাষ্ঠ' সম্পদের আশ্রয়, অর্থনীতিক প্রয়োজনের সম্ভার হিসাবেও তার মূল্য উপেক্ষণীয় নয়। অরণ্যের ক্ষুদ্রতা ভারতীয় অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্নটিকে কত করুণ করে তুলেছে তার হিসাব অর্থনীতিক বিশেষজ্ঞের পক্ষে অজানা থাকবার কথা নয়। কিন্তু সন্দেহ হয়, ভারতীয় অর্থনৈতিক ও আর্থিক তথ্যের সরকারী বিজ্ঞেরা এক্ষেত্রে বাস্তব তথ্যের কোন হিসাবই রাখেন না। নইলে অরণ্যের সংরক্ষা এবং নতুন অরণ্যের পত্তন ভারতের সরকারী আগ্রহ এবং উদ্যমের একটি প্রধান অভীষ্ট হিসাবে অনুপ্রাণিত হতো। কাজ যে একেবারে কিছুই হয় নি, তা নয়। ব্রিটিশের শাসনকালের সময় থেকেই নূতন বনভূমির পত্তনের জন্য কিছু চেষ্টা ও কিছু সার্থক কাজ হয়ে এসেছে [illegible] ভারতের ত্রিশ বছরের সরকারী কৃতিত্বের হিসাব লক্ষ্য করলেও বিষন্ন হতে হয়। [illegible] চেষ্টা ও কাজের দরকার ছিল, সেটুকুও হয়নি। তা না হলে, এতদিনের মধ্যে [illegible] মতো সুফলপ্রসূতার কিছু প্রমাণ পাওয়া যেত। খরা ও বন্যার সমূহ অন্ত[illegible] সম্ভাবিত হয়ে যেত না। কিন্তু তার বিনাশক প্রকোপ কিছু হ্রাস পেত। বিশ্বের কোন-কোন সমস্যাগ্রস্ত দেশে দেখা গিয়েছে যে, পঁচিশ বৎসরের আন্তরিক অধ্যবসায়ের ফলে বনভূমির প্রসার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, কৃষির যথেষ্ট উন্নতিও হয়েছে এবং খরা-বন্যার প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে।

অরণ্যের ভাল-মন্দ অবস্থার সঙ্গে দেশের অর্থনীতিক উন্নতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের ভাল-মন্দ অবস্থার সম্বন্ধ যদি প্রসঙ্গের বাইরে রেখে শুধু মানবতা ও সভ্যতার ভাল-মন্দ পরিণামের প্রশ্ন আলোচনা করা হয়, তবে বুঝতে হয় যে, প্রাকৃতিক সৃষ্টির সবকিছুর সঙ্গে অরণ্যেরও একটি আত্মিক সম্বন্ধ আছে, যেটা সবারই অস্তিত্বের একটি নিগূঢ় সামঞ্জস্য বলে মনে করা চলে। দার্শনিক তত্ত্বের কথা হলেও এটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কথা। কবি রজনীকান্তের একটি গানে এই তত্ত্বের যে সাঙ্কোচিত উপলব্ধির কথা আছে সেটা আধুনিক কালের প্রকৃতি-বিজ্ঞানী কোন-কোন বিজ্ঞানীরও উপলব্ধির কথা হয়ে প্রচারিত হতে দেখা যায়। অনলে অনিলে ও নভোনীলে ভূধর সলিলে ও গহনে একই পরম সত্য বিরাজিত। সে সত্য আছে বিটপী লতায়, জলদের গায় শশী তারকায় তপনে! দার্শনিক তত্ত্বের ও যুক্তির সূত্র ধরে বিচার করলে অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে, অরণ্যের অতিশয় সঙ্কোচ বস্তুত সমগ্র প্রাকৃতিক সৃষ্টির স্বস্তিবিধায়ক একটি প্রাণময় পরিবেশের অত্যন্ত প্রকারের ক্ষয় ও ক্ষতির পরিচয়।

পরবর্তী আকর্ষণ

শিবনারায়ণ রায়ের প্রবন্ধ
গান্ধী-জিজ্ঞাসা
মৃত্যুঞ্জয় সেনের রচনা
নীল আন্দামান সবুজ নিকোবর
বরুণ সেনগুপ্তর কারাকাহিনী
অন্ধকারের অন্তরালে
সুনীল দাশের গল্প
মুক্তপুরুষ

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাদাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
দাম এক টাকা
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

ব্যঙ্গচিত্র

অন্ধকারের বন্ধু

শুভ্রাংশু গুপ্ত

দমকা হাওয়ায় প্লেনটা দুলছিল। আকাশের বুকে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘ। কখনও রৌদ্র, কখনও বৃষ্টি। তারই মধ্যে পথ করে নিয়ে আমাদের প্লেন এগিয়ে চললো। দূরে সেই নীল-নীল আকাশ যেখানে একেবারে মাটিতে গিয়ে মিশেছে।

চারিদিকে বড় বড় উঁচু উঁচু পাহাড়। একেবারে আকাশে ছুঁই ছুঁই। নীচে মাঝখানে একটুকরো জমি। কাঁচ কাঁচ সবুজ ঘাসে ভরা। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে ঘন বনাঞ্চল একেবারে সেই সমতলে। পাহাড়ের বুকে জমে থাকা বরফ গলা জল সেখানে তরতরিয়ে নীচে নেমে এসেছে।

ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটা ডাকোটা। দেখলেই চোখে পড়ে এর ঝরঝরে সঙ্গীন অবস্থা। বাইরেটা যেমন ভেতরটাও তেমনি। কলকাতার রাজ্য পরিবহন সংস্থার বাসের মত আর কী! জোড়হাট এয়ারবেসে প্লেনটাতে ওঠবার মুখেই আমার বুকের ভেতরটা দুলে উঠেছিল। ঠিক আকাশে উড়বে তো? আকাশে আবার ভেঙে পড়বে না তো! তবু অন্যান্য সহযোগী বন্ধুদের মত আমিও একরকম লাফ দিয়েই এয়ারক্রাফটে গিয়ে উঠলাম। আমরা উঠলাম, আর উঠলো বস্তাবোঝাই চাল-গম এবং অন্যান্য আনাজপাতি। সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে। রসদ যাবে দুর্গম পাহাড়ের বুকে দুর্ভেদ্য সীমান্তবর্তী এলাকার ছোট্ট ছোট্ট দেশে। যেখানে জীবন পরিচিত গতানুগতিকতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যেখানে মানুষ চিরদিনই বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন করে এসেছে। যেখানকার মানুষ সবে বুঝতে শিখেছে তাদের বাইরেও অনেক বড় একটা দেশ আছে। একটা জগৎ আছে। সেই জগতের আলোর ছোঁয়াচ সবে তারা পেয়েছে। অন্য প্রান্ত থেকে লোক এখানে আসছে যাচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আসছে। এখানকার প্রয়োজনের খবর দেশের অন্য প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। প্রয়োজনমত আবার রসদ আসছে। যোগাযোগটা এই-ভাবেই বেড়ে চলেছে। আর এই যোগাযোগ রেখে চলেছে ভারতীয় বিমান-বাহিনীর বিমান।

সীমান্তবর্তী এরকম কতগুলি অঞ্চলের সাথে ভারতীয় বিমানবাহিনী যোগাযোগসূত্র রক্ষা করে চলেছে?

এয়ার মারশাল গাড়োয়াল বললেন: দুশো হতে পারে পাঁচশো হতে পারে। বছরে সব সময় তো আর সীমান্তবর্তী লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন না। সেটা নির্ভর করে কখন কী অবস্থায় সেই সব লোকেরা থাকেন তার উপর। তবে জুন থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বন্যার ফলে প্রায় সব সীমান্ত অঞ্চলই বিচ্ছিন্ন থাকে এবং সেই সময় তাদেরকে কাজে লাগানো হয়।

এয়ার মারশাল নিজে চালক। সহযোগী পাইলট জোড়হাটের এয়ারকমান্ড গ্রুপ ক্যাপটেন কে সি শরমা। প্লেনের ককপিটে বসে এয়ার মারশালের সঙ্গে কথা বলছিলাম।

তখনও উইলবুর রাইট এবং অরভাইল রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা কেউ শোনেই নি। শুনবে কী করে? ওঁরা তখন জন্মানই নি। ১৭৮৩-তে প্রথম এয়ারক্র্যাফট তৈরি হয়েছিল। গরম হাওয়া এবং হাইড্রোজেন গ্যাস বড় বেলুনের ভেতর পুরে দিব্যি আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হতো। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে উঠে চলে যেতো। বেলুনে ভরে দেওয়া হতো খাদ্যসামগ্রী রসদ কিংবা অন্যান্য হালকা জিনিস। দেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা। ১৭৯৩ সালে ফ্রান্সে Aerostiers নামে ছোটখাট একটা প্লেন-কম্পানি রীতিমত গড়ে উঠলো। ১৭৯৪-এর ২ এপ্রিল সেই বেলুনের জায়গায় এলো এয়ারোপ্লেন। এখনকার প্লেনের কাছে সেটা রীতিমত খেলনা। ১৭৯৯এ অন্যান্য দেশের চাপে পড়ে ফ্রান্সের প্লেন কম্পানি তুলে দিতে হলো। দেখা গেল সব দেশই তখন ওই প্লেন সম্পর্কে কৌতূহলী আগ্রহী। আমেরিকার সিভিল ওয়ারে সেই প্লেনই ব্যবহৃত হলো। ১৮৮৪ থেকে ১৯০১-এ ব্রিটিশরা আফ্রিকায় তাদের আধিপত্য বিস্তারে সেই প্লেনকে কাজে লাগালো এবং খুব সফলভাবেই। নেপোলিয়ান ইংলন্ড আক্রমণের সময় সৈন্য বহনের জন্য এই প্লেনকে কাজে লাগালেন। ১৮৪৯-এ অস্ট্রিয়া ভেনিস-এ সৈন্য পাঠালো সেই বেলুনবাহী প্লেন-এই। কিন্তু রাইট ভ্রাতৃদ্বয় ১৯০৩-এর ১৭ ডিসেম্বর এয়ারক্র্যাফট তৈরির ক্ষেত্রে আলোড়ন এনে দিলেন। ১৯০৮-এর ফেব্রুয়ারীতে তাঁদের তৈরি প্লেন ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে ছুটে ১২৫ মাইল পথ দিব্যি পাড়ি দিলো। ধীরে ধীরে সমস্ত দেশ থেকে প্লেন-এর জন্য তাগিদ আসতে লাগলো। ১৯১০-এর পর অবশ্য সেই প্লেনকে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। ১৯১১ সালে ফ্রান্সে একটি দুইযাত্রীবাহী প্লেন-এ মেশিনগান সংযুক্ত করা হলো। আর পরের বছরই ইংলন্ডে মেজর রবার্ট ব্রুক পোপহাম তাঁর ছোট্ট 'ব্লু-বার্ড'-এর সঙ্গে মেশিনগান জুড়ে দিলেন।

সে সব অবশ্য অনেক অনেক পুরনো ইতিহাসের কথা।

এরই মধ্যে প্লেনটা মেচুকার মাটি দিয়ে ছুঁয়েছে। মেটাল দেওয়া শক্ত রানওয়ে নয়। মাঠের মধ্যে ঘাস চুণ পাথর ছড়ানো রানওয়ে। এয়ার মারশাল তাঁর নিপুণ হাতে ওই কাঁচা রানওয়ের মধ্যেই দিব্যি হাওয়াই জাহাজটা নামিয়ে দিলেন। যেন ছোট্ট একটা খেলনা নিয়ে নামলেন।

পুবে কুড়ি মাইলের মধ্যে চীন দেশ। এখানকার লোকেরা বলে 'থ্রী ডেইস মার্চ' পথ। অন্যদিকে ভুটান, তিব্বত এবং বর্মার পার্বত্যমালা চারিদিক থেকে ঘিরে। পাহাড় আর পাহাড়। বাইরে থেকে সবকিছু ঢাকা। এখানে আবার মানুষ থাকে নাকি? বিশ্বাস হবারই কথা নয়। মেচুকা অরুণাচলের সিয়াং
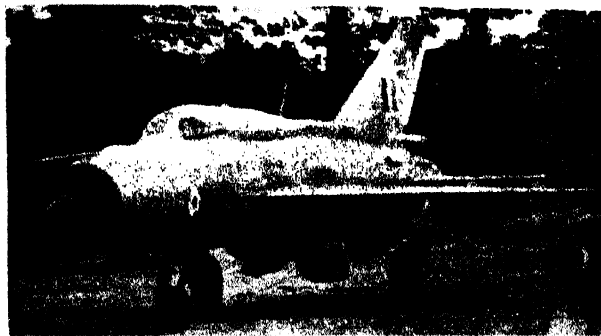
পূর্বাঞ্চলে প্রতিরক্ষার জন্য মিগ বিমান

জেলার একটা ছোট্ট খণ্ড। বসতি খুব বেশি হলে ছ হাজারের মত। বাসিন্দারা হলো প্রধানত মেমবাস। অবশ্য কিছু কিছু খোগুম, বোমিন, গ্যালন এবং খাসবাস উপজাতিও আছে। টিউটিং-এ এদের বসতি বেশি। টিউটিং চীন সীমান্তের আর একটা অঞ্চল। চীনের আরও কাছে। অরুণাচলের কামিং, সুবনসিরি সিয়াং, লোহিত এবং তিরাপ জেলায় এরকম অনেক অনেক স্বল্প-বসতি দুর্ভেদ্য অঞ্চল রয়েছে, যার সঙ্গে তথাকথিত সভ্য জগতের যোগাযোগের মাধ্যম শুধু এই বিমান বাহিনী। বছরের প্রায় সময়টাই অঞ্চলগুলি বরফে ঢেকে সাদা হয়ে থাকে। তখন অবশ্য বিমান বাহিনীকে এয়ার ড্রপিং-এর মাধ্যমে ওই সব জায়গায় খাদ্য এবং অন্য রসদ পাঠাতে হয়।

এ তো গেল একটা গতানুগতিক সমস্যার কথা। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সব কটি পার্বত্য রাজ্যই আসাম, অরুণাচল, নাগাল্যানড, মিজোরাম দোর্দণ্ড ব্রহ্ম-পুত্রের কবলে। বছরের প্রায় ন' মাসই এই রাজ্যগুলির হাজার হাজার বর্গমাইল এলাকা মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। তখনও কিন্তু ভরসা সেই বিমান বাহিনী। ওরাই লক্ষ লক্ষ নিরাশ্রয় বন্দী মানুষের রসদ জুগিয়ে যায়। ওদের সঙ্গে দেশের অন্য অংশের যোগাযোগ রেখে চলে।

শুধু ভারতের এই প্রান্তেই নয়। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্রই এই সমস্যার মোকাবিলা করে চলেছে ভারতীয় বিমান বাহিনী।

উইং কমান্ডার রণবীর সিং আমায় বলছিলেন, ১৯৫০ সালের এপ্রিলে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে যে বিধ্বস্ত ভূ-কম্পন হয় তাতে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স যেভাবে কাজ করেছে তা তাবৎ দুনিয়াকে চমক লাগিয়েছিল। ইউনাইটেড নেশনসও সে সময় রেসকু এবং রিলিফের কাজে প্লেন পাঠিয়েছিল।

সশব্দে প্লেনটা মাটির 'টারম্যাকে' গিয়ে দাঁড়ালে পাহাড়ী ঝরনার মতো তরঙ্গ তুলে কাঁচ কাঁচ ছেলেমেয়ের দল ছুটে নেমে এলো। পাহাড়ের বুক থেকে। বাঁশ, কাঠ এবং গাছগাছালির তৈরি ছোট ছোট বাড়ি থেকে ছেলেমেয়ে বেরো-বাও বেরিয়ে এলো। ওদের মুখের ভাষ বোঝা যায় না। কিন্তু বোঝা যায় ওদের চোখের বিস্ময়কে। কৃতজ্ঞতায় ভরা বিস্ময়।

প্লেন থেকে নেমে এলেন ছ ফুট আড়াই ইঞ্চি লম্বা প্রায় পঞ্চাশোর্ধ্ব সুদর্শন এয়ার মারশাল গাড়োয়াল। পেছন পেছন নামলেন গ্রুপ ক্যাপটেন শরমা। তারপর একে একে আমরা, কলকাতা থেকে যাওয়া সাংবাদিকদল।

নন-প্রেসারাইজডগরমী এয়ারক্রাফট থেকে নীচে নেমে পলকে প্রাণভরে নিশ্বাস নিলাম। ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া। প্রাণজুড়ানো একটা মিষ্টি আবেশ। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ফুটে রয়েছে নাম-না-জানা বাহারী ফুল। চোখ জুড়িয়ে যায়। ওরা আপনিই ফোটে আবার আপনিই ঝরে যায়। হাওয়ায় ভেসে আসছে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘ। গোটা জায়গাটা ক্ষণিকে ঢেকে সাদা হয়ে গেল। আবার মুহূর্তে বাতাসে মেঘ সরে গিয়ে সব পরিষ্কার। কাছে দূরে পাহাড়ের চূড়োগুলি নীরবে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে। যেন আস্তরণ মেলে নীচের মানুষগুলিকে নিরাপত্তা জুগিয়ে চলেছে। ওদিকে প্লেন থেকে চাল গমের বস্তা নামাচ্ছে একদল স্থানীয় লোকজন। কত রসদ হয়েছে?

এয়ার মারশাল বললেন, চার হাজার টনের মত আছে। প্রয়োজন অবশ্য

বিমান থেকে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় জিনিস প্যারাস্যুটে ফেলা হচ্ছে

অনেক অনেক বোঁশ। কিন্তু বোঁশ একসঙ্গে বহন করে নিয়ে যাওয়ার অসুবিধে। আরও বেশি অসুবিধে নীচে নামানো। এমন অনেক দিন হয়েছে প্লেন নীচেই নামানো যায়নি। উপরে আকাশ থেকে ফিরে যেতে হয়েছে।

আমি তখন পাহাড়ের নীচে বসে আছি। পাশে এয়ার মার্শাল গাড়োয়াল। সহযোগীরা অনেকেই এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে। খাতা পেন্সিল হাতে করে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে সহকর্মী প্রভাত মিত্র। সমাচারের দীপক বসাক দূরে ভিড়ের মাঝে এগিয়ে গেল। পটাপট কী সব নোটবুকে লিখে নিচ্ছে। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর শেখর গুপ্ত এরই মধ্যে স্থানীয় কয়েকজনের ইন্টারভিয়ু টেপ করে নিলো। কেউ কেউ বাংলা বোঝে ভালই। ভাঙা উচ্চারণে বলতেও পারে ভালই। বাঙালীও রয়েছে প্রায় শ দুয়েক। একটা সরকারী অফিসও আছে। ল্যাণ্ড রেকর্ড অফিস। স্টেট পুলিসের ছোট একটা দফতর। দিল্লির এস আই বিও অফিস খুলেছে। একটা রেশন অফিস। একটা আটচালা ঘরে কিছু ঔষধপত্র, অন্যান্য সামান্য সাজসরঞ্জাম। একজন কম্পাউণ্ডার। এটাই এখানকার হাসপাতাল।

মেচুকার চাইতে টুটিং কিন্তু কিছুটা উন্নত এবং স্বচ্ছন্দ। সীমান্তের আরও কাছে, তাই বোধ হয় জায়গাটার প্রতি সকলের দৃষ্টি আরও বেশি সজাগ। এবং সতর্ক। সরকারী প্রচেষ্টায় টুটিং-এ শহুরে জীবনযাপনের পরিবেশ কিছুটা রয়েছে। কামিং-এর বোমডিলায় তো একেবারে শহুরে আবহাওয়া। আর সুবনসিরির জিরো তো রীতিমত এক পাহাড়ী শহর।

ওদিকে হেলিকপটারে এয়ারড্রপিং-এ কলোরিয়াং গেছে অন্য আর একটি দল। সঙ্গে গেছে আমাদের ফটোগ্রাফার চণ্ডীপ্রসাদ সিংহ এবং স্টেটস-ম্যানের সুব্রত পত্রনবীশ। সঙ্গে কয়েকজন রিপোরটার। মূল ভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কলোরিয়াং-এর এখানে-সেখানে প্যারাসুটের সাহায্যে ফুড এয়ারড্রপিং হলো। একটি গ্রামে হেলিকপটার নামলোও। এরা—এই বিমান-বাহিনীর লোকেরা ওদের দুঃখের দিনের বন্ধু। ওদের অন্ধকারের দিনগুলিতে আলো জোগায় এই ভারতীয় বিমানবাহিনী। অনশনক্লিষ্ট বুভুক্ষু মানুষকে এরা শুধু অন্ন জোগায়ই না, এদের মধ্যে নতুন করে বাঁচার নেশাও জাগিয়ে তুলেছে।

হিমালয়ের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে যেমন সকাল সন্ধ্যা সদা জাগ্রত প্রহরী কাজ করে চলেছে, চলেছে বিচ্ছিন্ন সব অংশে রসদ এবং অন্যান্য সামগ্রী পৌঁছে দেবার কাজ। তেমনি ভারতের অন্যান্য অংশেও ভারতীয় বিমান বাহিনী অনুরূপ কাজ করে চলেছে। কাশ্মীরের দুর্গম অঞ্চলে, রাজস্থানের মরুভূমিতে এরা রসদ জুগিয়ে চলেছে।

১৯৩২-এর ৮ অক্টোবর ভারতীয় বিমানবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হলো—

পূর্বাঞ্চলে পার্বত্য এলাকায় হেলিকপটার সক্রিয়
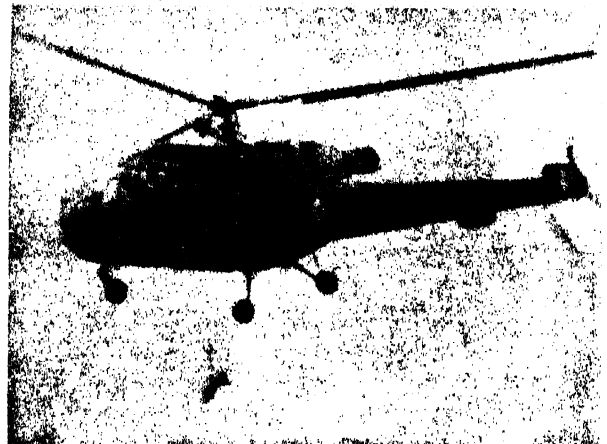
ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স অ্যাক্ট পাশ হলো। ইংলণ্ডে ট্রেনিংপ্রাপ্ত প্রথম বিমান-বাহিনীর অফিসারদল ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রথম সৈন্যদল। তারপর থেকে বিমানবাহিনীর ইতিহাসের রাস্তা ধরে একটার পর একটা ইতিহাস রচনা করে এসেছে ভারতীয় বিমানবাহিনী। শুরু হয়েছিল করাচির ড্রিগরোড-এ প্রথম প্রথম স্কোয়াড্রন প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। একটা থেকে তিনটে ফ্লাইট—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে প্রহরীর কাজ করেছে ১৯৩৮ সাল থেকে। দিনের বেলা তো প্লেন আকাশে উড়তো। রাত্রিবেলা এয়ারক্র্যাফ্টগুলিকে দুর্গে ঢুকিয়ে ফটক বন্ধ করে দেওয়া হতো। পাছে পার্বত্য দুর্ধর্ষ আদিবাসীরা সেগুলি হামলা দিয়ে কেড়ে না নিতে পারে। ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে মাদ্রাজ, বোম্বে, কলকাতা, করাচি এবং কোচিং-এ প্রায় ৩ হাজার মাইল জলপথ পাহারা দেবার জন্য পাঁচ পাঁচটা ভলানটিয়ার রিজার্ভ ফ্লাইট চালু করা হয়। পরেই হলো ভিজাগাপত্তনম্-এ।

১৯৪১-এ আরও দুটো স্কোয়াড্রন তৈরি হলো। পরের বছরের মধ্যেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো সাত স্কোয়াড্রনে। করাচি এবং কলকাতায় বিমান-

কণ্টকিত
অতুল্য ঘোষ

॥ ১৭ ॥

১৯৫০। কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন। জওহরলালের কাছ থেকে একটা চিরকুট এলো, কংগ্রেস সভাপতি পদে শ্রীশংকররাও দেওকে নির্বাচিত করলে ভাল হয়। শ্রীশংকররাও দেও সুপরিচিত। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। আমরা মেনে নিলুম। কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের পদ্ধতি বদলে গেছে। আগে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি নাম পাঠাতেন এবং তার সংখ্যাধিক্য অনুযায়ী সভাপতি নির্বাচিত হতেন। লাহোর কংগ্রেসে সভাপতি পদে গান্ধীজী সবচেয়ে বেশী ভোট পান, তারপর সর্দার প্যাটেল। গান্ধীজী অস্বীকার করেন এবং সর্দার প্যাটেল অক্ষমতা জানান। ফলে, ওয়ার্কিং কমিটির দ্বারা নির্বাচন হয় এবং গান্ধীজীর নির্দেশে জওহরলাল সভাপতি হন। পদ্ধতি বদলে গেছে, নিয়ম হয়েছে: ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস-এর ডেলিগেট অর্থাৎ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সব সদস্যই ভোটদানে অধিকারী। ব্যালট ভোট। এবং সংখ্যাধিক্য অনুযায়ী সভাপতি নির্বাচন। কিছুদিন বাদে জওহরলালের কাছ থেকে আবার খবর এলো যে, শংকররাও দেও নয়, আচার্য কৃপালনী। শংকররাও দেও তখন মহারাষ্ট্রে সফররত। তাঁর কাছে খবর নিয়ে জানা গেল, তিনি জওহরলালের মত পরিবর্তনের কথা জানেন না। আমরা একটু বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হলুম, এবং বেশ বিরক্তিও হলো। আচার্য কৃপালনী আমাদের পরমাত্মীয়, চৌদ্দ বছর কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তবু আমরা জওহরলালের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারলুম না এবং শ্রীশংকররাও দেও তাঁর নামও প্রত্যাহার করলেন না। ইতিমধ্যে শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনের নাম প্রার্থীপদের জন্য ঘোষিত হয়েছে। ট্যাণ্ডনজীকে ভোট দেওয়াই স্থির হলো। আমরা যে আচার্য কৃপালনীর বিরুদ্ধে ছিলুম তা নয়: আমাদের মনে হয়েছিল শ্রীশংকররাও দেওকে না জানিয়ে আর একজন প্রার্থীকে সমর্থন করতে বলা ঘোরতর অন্যায় হয়েছে। প্রতিবাদে ট্যাণ্ডনজীকে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত। অবশ্য অন্য কারণও ছিল। সর্দার তখন জীবিত।

সর্দার ট্যাণ্ডনজীকে সমর্থন করছেন, এ খবরও আমাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। অধিকাংশ কংগ্রেস কর্মীর কাছে সর্দার ছিলেন বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র। সংগঠক বলে তো নাম ছিলই, স্বয়ং গান্ধীজী সর্দার বলে অভিহিত করেছিলেন। কাশ্মীরের পাক আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন, আর দেশীয় রাজ্যের ভারতভুক্তির সিদ্ধান্ত ও সাফল্যে দক্ষ প্রশাসকরূপে পরিগণিত হন। দেশীয় রাজ্যের ভারতভুক্তি ভারত-ইতিহাসের এক উজ্জ্বলতম অধ্যায় এবং তার কর্ণধার ছিলেন সর্দার। বিসমার্ক জার্মানীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যকে সংগঠিত করে নতুন জার্মানীর প্রতিষ্ঠা করেন। জার্মানীতে ছোট রাজ্যগুলি যাঁরা একত্রিত হলেন তাঁদের ভাষা, ধর্ম এবং পোশাক এক। আর যে ৬৩৫টি দেশীয় রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলো তাদের ভাষা আলাদা, ধর্ম আলাদা পোশাক আলাদা, আচার বিচার আলাদা। বিসমার্কের পিছনে ছিল প্রাসিয়ার অস্ত্রবল, আর সর্দারের পিছনে ছিল দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাদের ইচ্ছাশক্তি এবং সর্দারের মনোবল। সর্দার প্রথম জীবনে গান্ধীজীর প্রভাব অনুভব করেননি। কৃষক পরিবারে জন্ম, চুটিয়ে আইন ব্যবসা করতেন, নামও হয়েছিল খুব। একবার আদালতে একটি মামলায় দাঁড়িয়েছিলেন। সওয়াল করছেন। একজন সহকারী এসে হাতে একটা চিরকুট দিয়ে গেল। চিরকুটটি পড়ে পকেটে রেখে দিয়ে আবার সওয়াল আরম্ভ করলেন। সওয়াল শেষ হবার পর যখন আদালত ছেড়ে গেলেন কেউ কোনও ভাবান্তর লক্ষ করতে পারলো না। চিরকুটটিতে ওঁর স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ লেখা ছিল। যখন গান্ধীজীকে গ্রহণ করলেন তখন সম্পর্ক গুরু-শিষ্যের। অখণ্ড বিশ্বাস। তা সত্ত্বেও প্রয়োজন হলে গান্ধীজীও সর্দারের কাছে রেহাই পেতেন না। কথিত আছে যে, গুজরাট বিদ্যাপীঠ আরম্ভ হবার আগে ঐ আশ্রমে যত বই ছিল গান্ধীজী একটি প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দেন। সর্দার জেল থেকে বেরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেন। ফলে, সব বইই ফেরত আসে এবং অনুরূপ অর্থের বই পরে সর্দার প্রতিষ্ঠানটিকে কিনে দেন। যেমন কঠোর, তেমনি কমনীয়। কর্মীদের বিপদ-আপদে তারা জানতো, সর্দার আছেন, ভয় কি? যখন ভারতবর্ষের সহকারী প্রধানমন্ত্রী তখন অফিসাররা যেমন ভয় করতো তেমনই নির্ভরও করতো। পারিবারিক ব্যাপারেও সামাজিক পদ্ধতি মেনে চলতেন।

ট্যাণ্ডনজী নাসিক কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হলেন। একদিন সকালে সর্দারের বাড়িতে ডাক পড়লো। দিল্লীতে ট্যাণ্ডনজী তখন সর্দারের বাড়িতে আছেন। গিয়ে দেখি, যাঁরা আমাদের ছেড়ে গেছেন এমন অনেক ব্যক্তি এবং আজকের দিনে রাজনীতিক্ষেত্রে সুপরিচিত এমন অনেকেই রয়েছেন। পাশের ঘরে ট্যাণ্ডনজী বসে। সর্দার কাছেপিঠে কোথাও ছিলেন না। আলোচনা হচ্ছে পার্লামেণ্টারী বোর্ডে কাঁরা সদস্য হবেন তাই নিয়ে। বিধান হচ্ছে—ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক পারলামেণ্টারী বোর্ডের সদস্য নির্বাচন। অবশ্য ওয়ার্কিং কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতির ওপর ভার দিতে পারেন। আলোচনা শুনে আমার হাত-পা অবশ হয়ে গেল। জওহরলাল চান শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থকে —আমার মতে তিনি যোগ্যতম ব্যক্তি। কিন্তু সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা চাইছেন ডি পি মিশ্রকে। দ্বারিকাপ্রসাদ আমার বহুদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। স্বাধীনতার আগে যখন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তখন মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে খুব নাম করেছেন। আর জেল, জরিমানা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক ভূষণ তো ছিলই। এই দ্বারিকাপ্রসাদ মিশ্রকে অনেকেই চাইছেন, কিন্তু জওহরলাল গোবিন্দবল্লভ পন্থের নাম প্রস্তাব করার পর এঁর নাম প্রস্তাব করতে সকলেই ইতস্তত করছেন। আমি ছিলুম সব-চেয়ে বয়োকনিষ্ঠ এবং অখ্যাত। অতএব স্থির হলো ডি পি মিশ্রের নাম আমাকেই করতে হবে। জওহরলালের বিরুদ্ধে বলতে হবে, এটাই খুব শক্ত। তার উপর শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থের বিরুদ্ধে। ভারতবর্ষের যে ক'জন অগ্রজ সব সময় স্নেহ প্রীতি ভালবাসা দিয়ে আমাকে রক্ষা করে এসেছেন তাঁদের মধ্যে পন্থজী অগ্রগণ্য। পন্থজী তখন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। দিল্লীতে এলে জওহরলালের বাড়িতে বাস করতেন। গেলুম ত্রিমূর্তি ভবনে। পন্থজী যেখানেই থাকুন, আমার জন্যে দ্বার অবারিত। কয়েক মিনিট বাদে ঘর থেকে সবাইকে সরিয়ে দিলেন। আমার দিকে ঔৎসুক্যভরা দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি অসুস্থ?' আমি তখনো কোনও কথা বলিনি, আমার চেহারা দেখেই বুঝেছেন গুরুতর কিছু একটা হয়েছে। আমি যা বললুম আর উনি জেরা করে যা বার করলেন তাতে ঘটনাটা বুঝতে ওঁর একটুও কষ্ট হলো না। তার পরই হাসি। পন্থজী যখন হাসতেন তখন কোনও শব্দ হতো না; যখন খুব খুশী হতেন, ওঁর সর্বাঙ্গ হেসে উঠতো। আমায় যা বললেন তার মর্মার্থ হলো, 'তুমি কি পাগল হয়েছো? আমার বিরুদ্ধে নাম করবে কেন?' আমি ফ্যালফ্যাল করে মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। পন্থজী বললেন, 'জওহরলাল একটি নাম করবেন, তুমি একটি নাম করবে। এতে বিরুদ্ধতা কোথায়? যে বেশী ভোট পাবে সেই নির্বাচিত হবে।' আবার হাসি। আমি ভাবলুম—কি ভাবলুম আজও তা মনে আছে, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না।

ওয়ার্কিং কমিটিতে ভোটাভুটি প্রায় কখনোই হয় না। দ্বারিকাপ্রসাদ নির্বাচিত হলেন। তারপর ১৯৫২র নির্বাচনে দ্বারিকাপ্রসাদ কংগ্রেস ছাড়লেন। কি একটা নাম দিয়ে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অনেক প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিলেন এবং নিজেও দাঁড়িয়েছিলেন। একটিও আসন পাননি এবং নিজেও হেরেছিলেন। বহুদিন কংগ্রেস থেকে নির্বাসিত থাকার পর আবার ফিরে আসেন। নবগঠিত মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন এবং উত্তরকালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার অন্যতম প্রধান পরামর্শদাতা।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এই ভোটাভুটির পরে প্রকাণ্ড ঝড় উঠেছিল। কিছুতেই জওহরলাল ট্যাণ্ডনজীকে সহ্য করতে পারেননি। আর আমি তো সেদিন থেকেই অপাংক্তেয়। ডাঃ রায়, গোবিন্দবল্লভ পন্থ অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। ব্যাঙ্গালোরে সাত-দিন ধরে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং হল। সেখানেই মোটামুটি ট্যাণ্ডনজীর মতই গ্রাহ্য হল যে, তিনি পদত্যাগ করবেন। ফলে, পরে দিল্লী অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে আমি প্রস্তাব করলুম, গোবিন্দবল্লভ পন্থ সমর্থন করলেন—ট্যাণ্ডনজীর পদত্যাগপত্র সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। আর একটি প্রস্তাবে জওহরলাল সভাপতি নির্বাচিত হলেন।
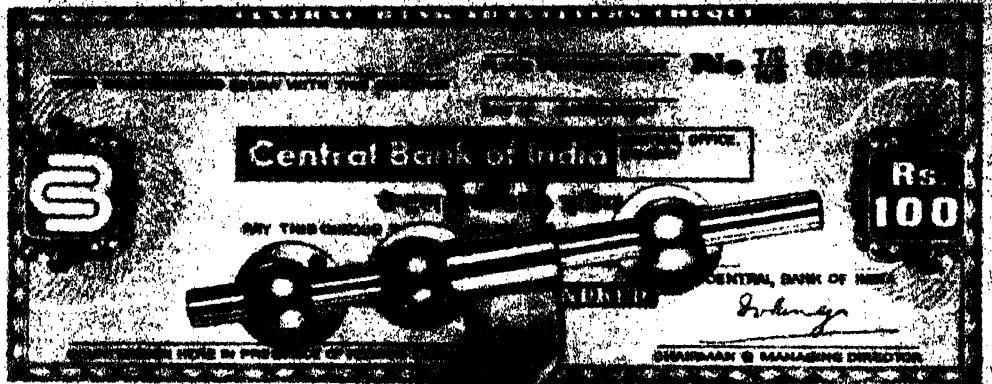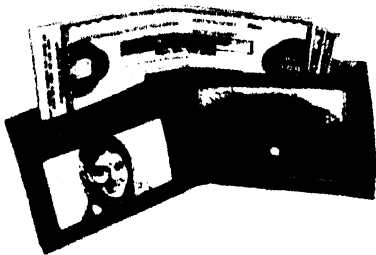
কারো পৌষ মাস

অশোক রুদ্র

গত আষাঢ়ে শ্রাবণের দেশ-এ প্রকাশিত 'চরমপন্থী কে' প্রবন্ধে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, আয়-বণ্টন বৈষম্যে কোন পরিবর্তন আজ সম্ভব হবে না, বণ্টন বৈষম্য চিরকালের মতোই চূড়ান্ত অবিচার দ্বারা চিহ্নিত থেকে যাবে, একথা ধরে নিয়েই গত পঁচিশ বছরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই বক্তব্য থেকে কারো মনে হতে পারে যে বণ্টন বৈষম্যের বিষয়টাকে আমাদের পরিকল্পনা ও আর্থিক নীতির বাইরে ফেলে রাখা হয়েছিল। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। আমি এই প্রবন্ধে আলোচনা করে দেখাবো যে বৈষম্যের ব্যাপারে কোনো নীতি যে অনুসৃত হয়নি তা নয়, পরিকল্পনা ও সর্বপ্রকার আর্থিক নীতির মধ্যেই বৈষম্য সংক্রান্ত একটি সুস্পষ্ট নীতি খুঁজলেই পাওয়া যায় এবং সেই নীতিটি হলো বৈষম্য কমানোর নয়, বাড়ানোর। পঁচিশ বছর যাবৎ বলা হচ্ছে বণ্টন বৈষম্য কমানো অন্যতম প্রধান জাতীয় লক্ষ্য। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য বাড়ানোর নীতিই অনুসৃত হয়েছে এই বক্তব্য অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকতে পারে। সচেতনভাবে না অন্য কোনো চেতনার আশ্রয়ে এই প্রকার নীতি অনুসরণ করা হয়েছে সেই প্রশ্ন আমাদের বর্তমান আলোচনার বহির্ভূত। নীতিগুলি ঘটনা হিসেবে বৈষম্য না বাড়িয়েই পারে না এই হবে আমার যুক্তি। এক-এক করে আর্থিক নীতির আলোচনা করে দেখাবো কিভাবে তাদের বেশীর ভাগই যাদের কিছু আছে তাদের আরো পাইয়ে দেওয়া, যাদের অনেক বেশী আছে তাদের অনেক বেশী পাইয়ে দেওয়া এবং যাদের নেই তাদের বঞ্চিত রেখে দেওয়া এই ফল না দিয়েই পারে না।

আলোচনার সূত্রপাতে একটু ভূমিকা করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। আমাদের সমস্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার ভিত্তিতে আছে কৃষির সমস্যা ও জমির সমস্যা। দেশটা যখন কৃষিপ্রধান, দেশের অধিকাংশ জনগণই যেহেতু জীবনযাত্রার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং কৃষিতে যেহেতু জমিই উপাদিকা শক্তিদের মধ্যে প্রধান, সেহেতু দারিদ্র্যের সমস্যাই হোক, বেকার সমস্যাই হোক, অথবা বণ্টন বৈষম্যের সমস্যাই হোক, কৃষির সমস্যার সমাধান ও ভূমি ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ব্যতীত তাদের কোনো সমাধানের কথা ভাবাই যায় না। ভূমির কথা আগের প্রবন্ধ দুটিতেও কিছু আলোচনা করিনি, এই প্রবন্ধেও করবো না। কারণ, ভূমির সমস্যা এতই বৃহৎ ও ব্যাপক যে তার জন্য সম্পূর্ণ পৃথক আলোচনা বাঞ্ছনীয়। এই প্রবন্ধে ভূমির বণ্টন বৈষম্য বাদ দিয়ে, অন্যান্য ক্ষেত্রে যে বৈষম্য তার আলোচনা করবো।

দ্বিতীয় কথা মনে রাখা ভাল যে, আমাদের আলোচনায় একদিকে রাজা-মহারাজা, জমিদার, শিল্পপতি ও সমাজের অপর প্রান্তে ভূমিহীন কৃষক, দরিদ্র চাষী, বেকার যুবক বা একেবারে যারা কাঙালী শ্রেণীর এই দুই অংশের মধ্যে যে বৈষম্য তার উপর বক্তব্য কম রাখব। আমাদের বাংলা থিয়েটারে ও হিন্দী সিনেমায় বৈষম্যের কথা যে বলা হয় না তা তো নয়, বরং বেশী করেই বলা হয়। এই থিয়েটার ও সিনেমার জগতে ভিলেন সর্বদাই ধনী, নায়ক সর্বদাই দরিদ্র অথবা ধনীর এমন পুত্র যার ধন সম্বন্ধে বৈরাগ্য জন্মেছে। ধনী রাজা বা জমিদার বা শিল্পপতি সব ব্যাপারেই অসৎ। সে অত্যাচারী, সে অসাধুভাবে কালো টাকা উপায় করে। তার বিলাসের আতিশয্য এতই যে তার নমুনা ওই আসর ও রাস্তার জগতের বাইরে বিরল। সে চরিত্রহীন, অর্থাৎ কিনা মদ খেয়ে মাতলামি করে এবং সুযোগ পেলেই নারীদের সতীত্বহানি ঘটানোর চেষ্টা করে। এই সব সিনেমা-থিয়েটারেও সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কথা বলা হয়ে থাকে। এবং এই পরিবর্তন বলতে বোঝানো হয়, এই জাতীয় অত্যাচারী চরিত্রহীন ধনীদের উৎখাত। বক্তব্যটি রাখা হয় এমনই ভাবে ও সুরে যে প্রেক্ষাঘরের কোনো দর্শকের কোনো অস্বস্তিবোধ না হয়। জমিদার বা শিল্পপতিদের চরিত্র সম্বন্ধে আমার যে কোনো উচ্চতর ধারণা আছে তা নয়। কিন্তু আমার ধারণা সমাজে দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা বা বৈষম্যের প্রকোপ কমাতে যে-জাতীয় সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজন তাতে শুধু ওই অত্যাচারী, চরিত্রহীন ধনীদের উৎখাত ঘটবে কিন্তু প্রেক্ষাগৃহের দর্শক সাধারণের গায়ে আঁচটুকু লাগবে না তা সম্ভব নয়। আমার ধারণা, ওই জাতীয় সামাজিক পরিবর্তনে প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের অনেকেরই আঁচে গা লাগবে। থিয়েটার সিনেমার দর্শকদের কথা বলছি এই কারণে যে তাঁরাই আমাদের দেশের অত্যাচারী ধনী ও দরিদ্রতম এই দুই প্রান্তের অন্তবর্তী এলাকার অধিবাসী এবং এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীই এই জাতীয় সিনেমা থিয়েটারে প্রতিফলিত। তা নয় তো এঁরা টিকিট কেটে এ ধরনের তথাকথিত সামাজিক সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যেতেন ? এবং ব্যবসায়ীরাও এ জাতীয় সাংস্কৃতিক উদ্যোগে পুঁজিনিয়োগ করে মুনাফা লুটতেন না। বৈষম্য সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই সিনেমা-থিয়েটারের দর্শকদের অনেকেরই অস্বস্তির কারণ হবে। দেশ-এর পাঠকদের সকলেরই আমার কথা পছন্দ হবে তাও মনে হয় না। কারণ বৈষম্য বাড়ানোর যে নীতির কথা আলোচনা করবো তার দ্বারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত আমরা অনেকেই লাভবান হয়েছি। সমাজের নিম্নতর অংশের সর্বনাশ হয়ে গেছে, এখনও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরো হবে। কিন্তু সরকারী আর্থিক নীতির অনুসরণে যে সব অংশের পৌষ মাস ঘটেছে, তাদের মধ্যে অত্যাচারী ধনী জমিদার ও কালোবাজারী ব্যবসায়ী ছাড়াও আরও যারা আছে, তাদের মধ্যে আমি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আমরাও অনেকে।

সর্ব প্রথমেই একটি নীতির অভাবের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। আয় বৈষম্য কমাতে হলে নিম্নতম আয় ও উচ্চতম আয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নীতি থাকা প্রয়োজন। এ রকম কোনো নীতি আমাদের দেশে নেই। কোনো কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশে উচ্চতম আয়কে নিম্নতম আয়ের পাঁচ গুণের বেশী হতে দেওয়া হয় না। আমাদের দেশে সরকারী প্রতিষ্ঠানে বেতনের বাঁধাধরা নিয়ম-কানুন আছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিম্নতম বেতনের হার বেঁধে দেওয়া আছে এবং যে সব ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ শ্রমিক সংগঠন আছে সে সব ক্ষেত্রে নিম্নতম হার অনুসারেই বেতন দেওয়া হয়। কিন্তু এ ব্যাপারটা প্রায় ব্যতিক্রম। এ দেশের ছোট-খাটো কারখানার অধিকাংশের জন্য হয় কোনো নিম্নতম বেতন বেঁধে দেওয়া হয়নি, নয়তো কাগজপত্রে কিছু বেঁধে দেওয়া আছে, কিন্তু তাদের প্রয়োগের কোনো কথাই ওঠে না। যেমন, ভূমিহীন কৃষকদের মজুরির হার অনেক রাজ্যে বেঁধে দেওয়া আছে, কিন্তু প্রায় সর্বত্রই সেই হারের সঙ্গে ক্ষেতমজুরে যা পায় তার কোনো সম্পর্কই নেই।

নিম্নতম বেতনের হার যেসব ক্ষেত্রে বেঁধে দেওয়া আছে এবং প্রযুক্তও হচ্ছে, সে সব ক্ষেত্রে বৈষম্যের ব্যাপারে দুইটি সমস্যা থেকে যায়। এক, নিম্নতম হার বেঁধে দেওয়া হলেও উচ্চতম আয়ের সীমা কখনই বেঁধে দেওয়া হয় না এবং এই উচ্চতম অথবা উচ্চ স্তরের কর্মচারীদের বেতন যেমন আছে তেমনি আছে সেই আয় বাদ ভিত্তি মুনাফা। ফলে নিম্নস্তরের শ্রমিক বা কর্মচারীদের বেতনের হার বেঁধে দেওয়াতেও বৈষম্য সব সময়ে কমে না। দুই, কোন কোন ক্ষেত্রে নিম্নতম হার বাঁধা হয়, প্রযুক্তও হয়, অন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা হয় না, এর দরুনও বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মীদের মধ্যে আয় বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই বৈষম্য শ্রমিক আন্দোলনের অসম প্রসারকে সূচিত করে। আবার অন্য অনেক ক্ষেত্রে এই বৈষম্যকে ঘটানো হয়েছে ইচ্ছাকৃত ভাবে, সমাজের কোন কোন অংশকে বিশেষ সরকারী দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের ফলে। এই দ্বিতীয় ঘটনাটি নিয়ে আরো খানিক আলোচনা একটু পরে করবো

আয়ের ব্যাপারে বৈষম্য খুব একটা সামাজিক ক্ষতি করতে পারতো না। যদি উৎপাদন ব্যবস্থাকে এমনভাবে নিয়মিত করা যেত যাতে আয়ের বৈষম্য ভোগ্যদ্রব্যের বণ্টনে বৈষম্য না ঘটাতে পারতো। সেরকম ব্যবস্থা করা যায়। সেরকম ব্যবস্থা অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশে আছে। এরকম দেশে কিছু ব্যক্তির অনেক আয়ের পথ খোলা রাখা হয়েছে, কিন্তু বেশী ব্যয়ের পথ রাখা হয়নি। সমাজতান্ত্রিক দেশে টাকাকে পুঁজি হিসেবে লাগানোর কোনো উপায়ই তো নেই। কিন্তু বিলাসব্যসনে যে টাকা ওড়াবে তারও উপায় রাখা হয়নি। কারণ, বিলাসের সামগ্রী উৎপাদনই করা হয় না। কোন সমাজে যদি দরিদ্রদের প্রয়োজনের পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহকে প্রসারিত করে দেওয়া হয় এবং একই কালে ধনীদের বিলাসের সামগ্রীর উৎপাদন ও সরবরাহকে সংকুচিত করে দেওয়া হয় তো ধনীদের আয় যতই বেশী হোক না কেন তাদের ভোগকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকতেই হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থাকে ঠিকমত নিয়মিত ও চালিত করলে তার দ্বারাই বৈষম্যের সমস্যাকে অনেকদূর পর্যন্ত হাতের মুঠোয় আনা যায়। আমাদের দেশে উৎপাদনকে নিয়মিত ও চালিত করার অনেক কলকাঠি সরকারের হাতে আছে। যেমন, লাইসেন্স না দিলে কোন নতুন শিল্পের পত্তন সম্ভব হয় না, লাইসেন্স না দিলে কলকব্জা ও কাঁচামালের জন্য বিদেশী মুদ্রার ব্যবহারও সম্ভব নয়। তাছাড়া, অনেক উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরাসরিভাবেই সরকারী পুঁজি নিয়োগ করা হয়ে থাকে, অন্য অনেক ক্ষেত্রে সরকারী পুঁজি দিয়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানদের সাহায্য করা হয়ে থাকে।

কিন্তু এইসব কলকাঠি নেড়ে বৈষম্য কমানোর জন্য যা করা যেত, করা হয়েছে ঠিক তার উলটো। সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন না বাড়িয়ে বাড়ানো হয়েছে সেই সব দ্রব্যের যা কিনা সচ্ছল ব্যক্তিদের শখ বা বিলাসের উপকরণ। সাধারণ মানুষের সব চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় যে ভাত-কাপড় তার কি অবস্থা জানেন ? মাথাপিছু খাদ্যশস্যের সরবরাহ ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৭১-৭২ এর মধ্যে ১২৩ কিলো থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ১৪০ কিলোয় পৌঁছেছিল বটে কিন্তু ১৯৩১-৩৩ সালে সেই সংখ্যাটি ছিল ১৬৫·৫ কিলো। তেমনি মোটা কাপড়ের উৎপাদন ও আমদানি-রপ্তানি ১৯৩১-৩২ সালে যা ছিল তার থেকে মাথাপিছু কাপড় জুটতো ১২·৪ গজ, ১৯৫০-৫১ সালে মাথাপিছু ভাগ কমে দাঁড়িয়েছিল ৯·৯ গজে এবং কুড়ি বৎসরের পরিকল্পনার ফল হিসেবে ১৯৭১-৭২ সালে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো ১২·৭ গজে। তাহলে দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে ভাত-কাপড়ের সংস্থান খানিকটা বেড়েছে বটে, কিন্তু তিরিশ দশকের গোড়ার দিকে গড়পড়তা যে ভাত-কাপড় জুটতো স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরেও তা জুটছে কি জুটছে না।

কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাত-কাপড়ের এই অবস্থা হলেও সব ভোগ্যপণ্যের কি এই অবস্থা ? নিশ্চয়ই না। সকলেই জানেন। মোটা মিলের কাপড় আজকাল বেশী চলে না। আজকাল যা বেশী চলে তা হলো নাইলন, টেরিলিন, ইত্যাদি, যাদের বলা হয় সিনথেটিক ফাইবার। এই সিনথেটিক ফাইবারের উৎপাদন ১৯৫৫-৫৬ থেকে ১৯৭০-৭১ এই পনেরো বৎসরের মধ্যে বেড়েছে সাতগুণ। তাহলে কি আমি হিসেবে ভুল করছিলাম ? মানুষের পরিধানের ব্যাপারে রুচি বদলেছে, সেই কথা ভুলে গিয়ে কাপড়ের সংস্থান বাড়েনি বলছিলাম ? না, হিসেবে আমার কোনো ভুলই হয়নি, বরং যা বলছি তাই আমার এই প্রবন্ধের বক্তব্যের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে যাচ্ছে। নাইলন, টেরিলিনের চাহিদা বেড়েছে কাদের মধ্যে ? আমার আপনার মধ্যে, 'দেশ'-এর পাঠক ও লেখকদের মধ্যে বেড়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বেড়েছে কি ? দেশবাসীর এক-শতাংশের মধ্যে যে সব দ্রব্যের চাহিদা তাদের উৎপাদন বিস্ফোরণের আকার নিয়ে বেড়ে গেছে আর বাদবাকি নিরানব্বুই জনের চাহিদা যে সব দ্রব্যের তাদের মাথাপিছু সরবরাহ বেড়েছে শম্বুক-গতিতে। এই শতাংশ যার মধ্যে আপনিও আছেন, আমিও আছি, তাদের চাহিদা মেটাতে বিশেষ এক ধরনের ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন কি হারে বাড়ানো

প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা যেতে পারতো।

রেশনের দোকানে যা যা পাবার কথা তার অনেকই যে অনেক সময় পাওয়া যায় না তা তো সকলেরই জানা। কিন্তু নিত্য ব্যবহার্য অধিকাংশ জিনিসেরই মূল্যের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তরিতরকারি, মাছ, দুধ, কাপড়, কয়লা এসব জিনিসের উপর মূল্যনিয়ন্ত্রণের কথা অনেক সময়ে বলা হয়েছে, কিন্তু কার্যত সে সব ব্যবস্থা ক্ষণিক বিদ্যুচ্ছটার মতো দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেছে। সাধারণ ক্রেতাদের কাছে মূল্যের আকাশ যে ডিগ্রিতে সেই ডিগ্রিতেই রয়ে গেছে। কিন্তু মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারটা কি একেবারেই কার্যকরী হয়নি? হয়েছে বইকি। যে সব সামগ্রী অনতিধনী মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে অত্যধিক ধনী পর্যন্ত শ্রেণীর লোকেদের ভোগে লাগে সেসব সামগ্রী প্রায়শই এমন মূল্যে বিক্রয় হয় যা কিনা সরকারী নিয়ন্ত্রণের দৌলতে অন্যথায় বাজারে যা হতো তার চেয়ে কম। সবচেয়ে ভাল উদাহরণ হলো মোটরগাড়ি, স্কুটার প্রভৃতি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মোটরগাড়ির দর বাঁধা ছিল, যার ফলে সাধারণ ক্রেতাদের বহুকাল, অনেক সময় বহু বৎসর, অপেক্ষা করতে হতো। বহু ক্রেতা অধিকতর মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিল এবং সরকার গাড়ির দাম বাড়িয়ে বর্ধিত মূল্যের অংশটুকু কর হিসেবে আদায় করে নিতে পারত। গাড়ি ভোগ্যপণ্য সরাসরি ভাবেই। অন্যান্য অনেক ধনীদের ব্যবহার্য ভোগ্যপণ্য আছে যাদের দাম সরাসরিভাবে কমানো হয় না, তাদের উৎপাদনে ব্যবহার্য কাঁচামালের দাম কমিয়ে একই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হচ্ছে বিদেশী মুদ্রার মূল্য নিয়ন্ত্রণ। সচ্ছল মধ্যবিত্ত বা ধনীরা যেসব সামগ্রী ব্যবহার করতে ভালবাসে তা হয় আমদানি করা, নয়তো তাদের উৎপাদনে লাগে প্রচুর পরিমাণে বিদেশী কাঁচামাল। এসব আমদানির জন্য বিদেশী মুদ্রা সরবরাহ করা হয় নিয়ন্ত্রিত মূল্যে। যেমন এখন এক ডলারের নিয়ন্ত্রিত মূল্য সাড়ে আট টাকার মতো। কিন্তু কালোবাজারে ডলার বিক্রী হয় কুড়ি টাকায়। অর্থাৎ কুড়ি টাকায় ডলারের কাঁচামাল ব্যবহার করেও লাভবান হওয়া যায়। এই অবস্থায় তার অর্ধেকেরও কম দামে ডলার বিক্রী করা হচ্ছে সেইসব সামগ্রী উৎপাদনের জন্য যা একমাত্র সচ্ছল মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে ধনীরাই ব্যবহার করে। দরিদ্র জনসাধারণ ব্যবহার করে এমন খুব কম সামগ্রীর কথাই ভাবা যায় যার উৎপাদনে বিদেশী কাঁচামাল লাগে।

সস্তায় বিদেশী মুদ্রাকে শুধু যে বিদেশী কাঁচামালের মাধ্যমে সচ্ছল ও ধনীদের স্বার্থে কাজে লাগানো হচ্ছে তাই না, সরাসরিভাবেও করা হয়। যেমন, কারো যদি শখ হয় বিদেশ ভ্রমণ করার বা কোনো পরিবার যদি পুত্র-কন্যাকে বিদেশে লেখা পড়া শেখানোর অভিলাষ করেন তো তাঁরাও এই একই সস্তাদরে বিদেশী মুদ্রা কিনতে পারেন, যদিও এদের কুড়ি টাকা দরে ডলার বিক্রী করে বর্ধিত মূল্যের অংশটুকু কর হিসেবে নেওয়া হলে সরকারেরও তহবিলে কিছু আসতো আর এইসব শৌখিন ব্যক্তিদের শখের পূর্ণ মর্যাদাও দেওয়া হতো।

সিমেন্ট, ইস্পাত জাতীয় পদার্থের উপরে যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ তাও যে দরিদ্রদের বিশেষ উপকারে এসেছে তা তো দেখা যায় না। দরিদ্ররা সিমেন্ট ও লোহা ব্যবহার করে বাড়ি বানায় না, সিমেন্ট ও লোহার ব্যবহার আছে এমন বাড়িতে ভাড়াও তারা থাকে না। সিমেন্ট লোহার মূল্য নিয়ন্ত্রণে উপকৃত হন একমাত্র তাঁরাই যারা শহর এলাকায় বড় বড় বাড়ি করছে, নিজেদের থাকার জন্য অথবা ভাড়া দেবার জন্য। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের প্রতি সরকারের যে অগাধ অনুগ্রহ তার সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া যায় বাড়ি করার জন্য সরকারী অর্থ সাহায্য-দানে।

মূল্যনিয়ন্ত্রণ দ্বারা ধনীদের সুবিধা করে দেওয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় বিদ্যুৎ ও পরিবহণের দামের ক্ষেত্রে। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত সাধারণ ক্রেতাদের জন্য বিদ্যুতের দুইটি দাম বহাল ছিল। একটি দাম যা কিনা বেশী তা ছিল আলো ও পাখা ব্যবহারের বিদ্যুতের উপর প্রযোজ্য। আর সস্তা দামটা ছিল হিটার থেকে শুরু করে এয়ার-কণ্ডিশনার পর্যন্ত যাবতীয় বিদ্যুৎ-চালিত গৃহে ব্যবহার্য যন্ত্রের জন্য। বলাই বাহুল্য শহরবাসী যে সব দরিদ্ররা বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারে তারা বাতি জ্বালাতেই তা ব্যবহার করে, বড়জোর পাখা চালাতে এবং তাদেরই দিতে হচ্ছিল বেশী দাম। পরিবহণের ক্ষেত্রে দেখানো যায় যে ফার্স্ট ক্লাস ও সেকেণ্ড ক্লাসের কামরায় যাত্রীদের জন্য ব্যবস্থায় যে আকাশ পাতাল প্রভেদ এই দুই ক্লাসের ভাড়ার ব্যবধানে তা প্রতিফলিত হয় না। অর্থাৎ, সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রীরা যে ভাড়া দেয় তারই এক অংশ ব্যবহার করে ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীদের সুখসুবিধা দেওয়া হয়।

উৎপাদননীতি এবং মূল্যনীতি এই উভয় নীতিই দেখলাম দরিদ্রদের সাহায্য করে না, করে সচ্ছল মধ্যবিত্ত ও ধনীদের উপকার। এখন দ্রব্য উৎপাদনের বাইরে যে সব খাতে সরকারী পুঁজি নিয়োগ করা হয় জনসাধারণের কল্যাণের উদ্দেশে যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাস ইত্যাদি তাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক। ভাত কাপড়ের পরেই মানুষের যা প্রয়োজন তা হলো মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই। গ্রামের দরিদ্ররা চুলোয় যাক, শহরের দরিদ্ররা যে নরককুণ্ডের মতো বস্তিতে বাস করে তাদের জন্য কি আমাদের সরকারের কোন চিন্তা-ভাবনা নেই? আছে বইকি। বস্তি উন্নয়ন বলে একটি খাতে বরাবরই বেশ কিছু টাকা রাখা হয়েছে। কম কিছু নয়। পঞ্চম পরিকল্পনায় এই খাতে দেওয়া আছে ১০৫ কোটি টাকা। আর আমাদের সরকার বাহাদুর কতটা সমদর্শী জানেন? ১০৫ কোটি টাকা যদি রাখা হয়েছে দেশের লক্ষ লক্ষ বস্তিবাসীদের জন্য তো রাজ্য সরকারের অফিসারদের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরেদের বাসস্থান নির্মাণের জন্য রাখা হয়েছে তার চেয়ে বেশী না, ১০০ কোটি টাকা মাত্র। রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা দেশের সেবায় খেটে খেটে মরে যাচ্ছেন, তাঁদের অফিসারদের তো একটু আরামের না হলেই নয়। আর তাঁদের কোয়ার্টার যে একটু খোলামেলা হবে, একটু উচ্চপদস্থ যাঁরা কোয়ার্টারে ছোট-বড় বিভিন্ন আটটা দশটা কামরা থাকবে, এক-আধ বিঘে জমিতে সরকারী বেতনে পুষ্ট মালীর যত্নে বাগান থাকবে এসব আর এমন কি বেশী?

বাসস্থানের পরে ভাবা যেতে পারে শিক্ষার কথা। শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও শিক্ষায় বঞ্চিত ব্যক্তির মধ্যে সুযোগের ব্যবধান যে বৈষম্যের সৃষ্টি করে তা কোনোদিনই হ্রাস পাবে না যতদিন শিক্ষা অনেকাংশে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান মারফত বিতরিত হবে, ধনীর পুত্রকন্যা পাবে এমন অর্থকরী শিক্ষার সুযোগ যা থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে দরিদ্রের পুত্র কন্যারা। তেমনি চিকিৎসা ব্যাপারটা ব্যবসায়ের উপর নির্ভরশীল যতদিন থাকবে ততদিন দরিদ্ররা মারা যাবে চিকিৎসার অভাবে আর ধনীরা মারা যাবে অনেক সময় হয়তো বা চিকিৎসার প্রাচুর্যের জন্যই। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে নূতন কথা একেবারেই বলছি না, নূতন কথা বলা সম্ভবও না, এসব কথা সকলেই সব সময়েই বলছেন। আরো প্রাইমারী স্কুল চাই, প্রাইমারী স্কুলের আরো উন্নতি চাই, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ এখনও সমাধা হল না, গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা এখনও হল না, পাস করা ডাক্তাররা শহরেই গাদাগাদি করে পড়ে রইল, গ্রামে গেল না—এসবই বস্তাপচা পুরোনো কথা, সকলেই আক্ষেপ করছেন, সকলেই যা হওয়া উচিত ছিল তার কথা চিন্তা করছেন। কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন বাস্তব কি, তার জবাব এই হবে: শহরে শহরে হাজারে হাজারে নার্সিংহোম গজিয়ে উঠছে। ডাক্তাররা ফি নিয়ে রোগী দেখে নিশ্বাস ফেলবার সময় পান না। কখন যাবেন তাঁরা ধুলো কাদাময় পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্যের আলো বিকিরণ করতে? যদি প্রশ্ন করা যায়, কিমাশ্চর্যম, তো উত্তর হবে আশ্চর্য এই যে, প্রাথমিক প্রয়োজন নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও প্রাইমারী স্কুলের আওতায় দেশের সমস্ত শিশুদের আনা এ কথা সর্বজনস্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও প্রাইমারী স্কুল অপর্যাপ্ত ও অবহেলিত থেকেই যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষার নামে একের পর এক বিশ্ব-বিদ্যালয় খুলেই যাওয়া হচ্ছে। যদিও এই উচ্চশিক্ষার মান যে উত্তরোত্তর নিম্নগতিতে যাচ্ছে সে বিষয়েও কোনো মতভেদ নেই। আর ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে তথাকথিত গবেষণাকেন্দ্র। পঞ্চম পরিকল্পনাতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার খাতে রাখা হয়েছিল এক হাজার কোটি টাকা ২৪০ লাখের মতো ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির কথা মনে করে। অর্থাৎ ছাত্রপিছু পুঁজি নিয়োগ করা হয়েছে ৪০০ টাকা হারে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে হিসেব করা হয়েছে ছাত্রপিছু ২২০০ টাকা হারে এবং এই খাতে রাখা হয়েছে [illegible] কোটি টাকা। আর গবেষণা খাতে কত টাকা দেওয়া হয়েছে [illegible] ১৬০০ কোটি টাকা। গবেষণার খাতে টাকা দেওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার প্রতিবাদই অতিশয় সংকীর্ণ মনের প্রকাশ বলে অনেকের কাছে মনে হতে পারে তা বইকি। জ্ঞানবৃদ্ধির কাজটা মহৎ তো বটেই, আর্থিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয়ও বটে। একদিন সুযোগ-সুবিধার অভাবে কত তরুণ গবেষক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সত্যেন বসু, জগদীশচন্দ্র বসু হয়ে উঠতে পারেনি। একজন কেরানী রামানুজন হয়ে উঠে গণিতে চিরকালীন স্বাক্ষর রেখে গেলেন, এমন কত কেরানীর মধ্যে প্রতিভা বিকাশের সুযোগই পেল না কে জানে। তাছাড়া অর্থনৈতিকভাবে দেশকে স্বয়ংনির্ভর হতে হলে প্রায়োগিক বিজ্ঞানে গবেষণা অত্যাবশ্যক নিঃসন্দেহে। তবে বর্তমান লেখক যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ে ও গবেষণাকেন্দ্রের মাধ্যমেই রুজিরোজগার করে থাকেন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করা যাচ্ছে না। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই যে, জগদীশ বসু, সত্যেন বসু বা রামানুজনের যে প্রতিভা তা তো নিশ্চই চাইলেই পাওয়ার ব্যাপার না। কিন্তু তাঁদের যে জ্ঞানার্জনে নিষ্ঠা ও অসীম অনুসন্ধিৎসা ছিল তার তুলনীয় মনোভাব আজকালকার দিনের গবেষকদের একশো জনের মধ্যে একজনেও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। আর অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পঁচিশ বৎসর পরেও যখন দেখি আমরা উৎপাদনশৈলীর জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল আগের চেয়েও অনেক বেশী পরিমাণে তখন মনে প্রশ্ন না জেগেই পারে না গবেষণার নামে দেশে যা চলছে তা না থাকলেই বা দেশের কি ইতর বিশেষ হতো। তাছাড়া গবেষণার খাতে যাঁরা টাকা দেন এবং জনসাধারণের মধ্যে যাঁরা এ বিষয়ে উৎসাহ বোধ করেন তাঁদের মধ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং উৎপাদন-শৈলীর উন্নতি ছাড়াও অন্য কিছু ব্যাপারে আগ্রহ আছে। ধরা যাক মহাকাশ সম্পর্কিত গবেষণার কথা। এর নামে পঞ্চম পরিকল্পনায় ১৭২ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। বলাই বাহুল্য এ জাতীয় গবেষণার কোনো অর্থকরী সম্ভাবনা নেই। আর জ্ঞানবৃদ্ধি? আমেরিকা ও রাশিয়া এ-ব্যাপারে যতটা এগিয়ে গেছে তার পাশে আমাদের দেশে যে কোনপ্রকার প্রচেষ্টাই বালখিল্য নয় শিশুসুলভ হতে বাধ্য। আসলে, গবেষকদের অধিকাংশই জ্ঞানসাধক নন তাঁদের কাছে গবেষণা একটি বৃত্তি মাত্র। তাঁদের জীবনধারা দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং সরকারী আনুকুল্যে যথেষ্ট আরামের। যে দেশের অর্ধেক অধিবাসীর ন্যূনতম ভাত-কাপড়টাও জোটে না, ন্যূনতম শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ থেকেও যারা বঞ্চিত সে দেশে এ-জাতীয় গবেষণার ব্যবস্থা রাখা গরীবের হাতি পোষার মতো। অথবা তুলনা খুঁজলে বলা যায় এসব হল প্রেস্টিজ সিম্বল বা সম্মান চিহ্ন, যেমন হীরা জহরতের গয়না ধনবতী রমণীর দেহে। কিন্তু যে রমণী অনাহারে, রোগে ক্লিষ্ট, লজ্জানিবারণের কাপড়ও যার যথেষ্ট নেই, তার অঙ্গে হীরা জহরত যেরকম শোভা পায় আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রগুলিও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সেরকমই শোভন।

অনাহার-ক্লিষ্ট অঙ্গে হীরা-জহরতের মতো প্রেস্টিজ সিম্বল আরও অনেক রয়েছে। যেমন প্রত্যেক দেশই আজকাল চেষ্টা করছে নিজের নামে একটি করে আন্তর্জাতিক বিমানের সংস্থা রাখার এবং ভারতবর্ষও আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে করেছে এয়ার ইণ্ডিয়া। যে ভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তাতে করে মনে হতে পারে যে বুঝি এই উপায়ে অনেক বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা যাচ্ছে। আসলে হিসেব করলে দেখা যাবে এই এয়ার-ইণ্ডিয়াকে চালু রাখার জন্য শত শত কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা

বেরিয়ে গেছে। এটা কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। এক একটি জাম্বো বিমান ক্রয় করতে যা খরচ হয় তা দিয়ে বেশ কয়েকটা বড়সড় কারখানা স্থাপন করা যায়। এয়ার ইণ্ডিয়া মাঝে মাঝে চলতি বছরের হিসাবে খানিকটা উদ্বৃত্ত দেখায় বটে, কিন্তু সেই উদ্বৃত্ত দিয়ে বিমানবহরের যে সম্প্রসারণ করা হয়েছে তা আদৌ সম্ভব হয়নি। আমাদের যদি নিজস্ব একটা আন্তর্জাতিক বিমানবহর নাই থাকতো তো দেশের ক্ষতিটা কি হতো? এদেশের লোক যাঁরা বিদেশে যান তাঁদের কতজনের বিদেশ যাওয়াটা সত্যিই অত্যাবশ্যক? চীন দেশের বা ভিয়েতনামের লোকেদের তো কই বিদেশী বিমানবন্দরে তেমন দেখা যায় না যেমন দেখা যায় ভারতীয়দের? শুধু আন্তর্জাতিক বিমানের কথা বলি কেন, অন্তর্দেশীয় বিমানের উপর যে পুঁজি নিয়োগ হচ্ছে তারই বা যুক্তি কোথায়? এই গরুরগাড়ির দেশে বিমান ভ্রমণ কজনের পক্ষে অত্যাবশ্যক? পঞ্চম পরিকল্পনায় অন্তর্দেশীয় বিমানের খাতে টাকা রাখা হয়েছে ১১০ কোটি। হিসেব করে দেখেছি, খরচটা দাঁড়ায় ভাগ্যবান যাত্রীদের মাথাপিছু ২০ হাজার করে টাকা। বিমানের সংখ্যা আরও অনেক কম হলে, ভাড়া আরও বেশী হলে ব্যবসায়ীদের হয়তো খানিক অসুবিধে হতো কিন্তু সরকারী পয়সায় যাঁরা হামেশা দার্জিলিং থেকে ত্রিবান্দ্রম পর্যন্ত ঘুরে বেড়ান তাঁদের ঘোরা খানিক কমলে, প্লেনে পেট্রোল পোড়া কিছু কম হোলে দেশের মঙ্গল বৈ কি অমঙ্গল কিছু হতো কি?

অন্তর্দেশীয় বিমানের কথা বলতে মনে পড়ে গেল, এর স্বপক্ষে একটা যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে যে এ নাহলে বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণ করা যাবে না। কিছু বুদ্ধিহীন বা দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি উঠে-পড়ে লেগেছেন দেশের আনাচে কানাচে সর্বত্র যেখানেই আছে কিছু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বা কোনো চিত্তাকর্ষক পুরাকীর্তি সেখানেই আমদানি করে আনা সেই যত সব অসভ্যতা ও বর্বরতা যা বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণ করার অমোঘ উপায় বলে পাশ্চাত্ত্য জগতে মনে করা হয়ে থাকে। চতুর্দিকে অর্ধনগ্ন, অনাহারী মানুষের ভিড়, তার মধ্যেই তোলা হচ্ছে অশোকা হোটেল, তাজমহল হোটেলের মত চাকচিক্যময় প্রাসাদোপম হোটেল যেখানে মদ্যপানের ব্যবস্থা থেকে রৌদ্র-স্নানের ব্যবস্থা পর্যন্ত সবই রাখা হচ্ছে একমাত্র বিদেশী পর্যটকদের কথা মনে করে। অর্ধনগ্ন, রোগাক্লিষ্ট শরীরে হীরা জহরতের উপমা কি এই বিশেষ ক্ষেত্রে পূর্ণভাবেই প্রযোজ্য নয়? এখনও কেউ বলতে পারেন যে এসবের মাধ্যমেই অর্থনীতি লাভবান হচ্ছে। হচ্ছে কিনা সেই হিসাব কেউ করে দেখায় নি। আমার ঘোরতর সন্দেহ যে কোন লাভই হচ্ছে না, ক্ষতিই হচ্ছে। পঞ্চম পরিকল্পনায় এই খাতে টাকা দেওয়া হয়েছে ১১০ কোটি টাকা। আগেই উল্লেখ করেছি বস্তি-উন্নয়নের জন্য টাকা দেওয়া আছে ১০৫ কোটি টাকা। ওই ১১০ কোটি টাকা দিয়ে বড় বড় পঞ্চ-তারকার হোটেল তৈরী না করে পুরো টাকাটা বস্তি উন্নয়নের কাজে লাগালে তাতে শুভবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেত।

গত কয়েক বছরের মধ্যে দেশে টেলিভিশন নামক যন্ত্রটি সচ্ছল পরিবারদের ড্রইংরুমের শোভাবর্ধন করতে শুরু করেছে। বিদেশে বহু লোক এই যন্ত্রটিকে আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার চূড়ান্ত অভিশাপ বলে মনে করেন, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো মাথায় ওঠে, পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়, একেবারে বাড়ির ভিতরেই সিনেমা হলের আবহাওয়া জাঁকিয়ে বসে। আর কেউ কেউ মনে করেন যন্ত্রটি পরম উপকারী, আধুনিক শিক্ষার এক প্রধান হাতিয়ার। এব্যাপারে আমার কোনো মত নেই। যে ব্যাপারে মত আছে তা এই যন্ত্রটি উৎপাতই হোক আর শিক্ষার হাতিয়ারই হোক, বড়লোক বই গরিবের তো এ জিনিস ঘরে ঢোকানোর সাধ্য নেই। তা বড়লোকরা তো অনেক ব্যাপারেই বড়লোকি করছেন, শুধু এই ব্যাপারে বিশেষ করে বলার কি আছে? বলার এই আছে যে হাতে গোনা যায় এমন কয়েকজন বড়লোকের শিক্ষা বা বিনোদনের শখ মেটাবার জন্য সরকার কিভাবে দরিদ্র জনসাধারণের টাকা ব্যবহার করে, এ তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সমস্ত দেশে খুব বেশী করে হয়তো বা দুই লাখ পরিবার এই যন্ত্রটি ব্যবহার করছেন কিন্তু অনুষ্ঠান প্রচার কেন্দ্রের উপর সরকার থেকে পুঁজি নিয়োগ করা হয়েছে দেড়শো কোটি টাকারও বেশী। অর্থাৎ, প্রত্যেক পরিবার যাঁরা একটি করে এই যন্ত্র কিনেছেন তাঁদের জন্য ৭৫০০ করে টাকা খরচ করা হয়েছে সরকার পক্ষ থেকে।

এ যাবৎ সরকারের পুঁজি নিয়োগ নীতি, উৎপাদন নীতি, মূল্য নীতি এসবের আলোচনা করে দেখিয়েছি এসব নীতিই কি ভাবে বৈষম্য না কমিয়ে বাড়াচ্ছে। এখন একটু আলোচনা করে দেখাবো কিভাবে কিছু কিছু বিশেষ শ্রেণীর লোকেদের আত্মজন করে নেওয়া হচ্ছে, তাদের সুখে-ভাতে রাখবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, অবশিষ্ট দেশবাসীকে বঞ্চিত রেখে যেন তারা যাদের জলে ভেসে এসেছে। এখানে আমি জমিদার বৃহৎ শিল্পপতি বা ধনী কৃষক এদের কথা বলবো না। এই শ্রেণীর লোকেরা অবশ্যই তাঁড়াদের ক্ষীর-ননী সবটুকুই চেটেপুটে খাচ্ছে। কিন্তু তা তো খাবেই। সমাজে যতদিন ব্যক্তিগত মালিকানা আছে ততদিন এরাই জমির মালিক ধনের মালিক সবকিছুরই মালিক এবং রাষ্ট্র এদেরই স্বার্থসাধনের একটি যন্ত্র বিশেষ। আপাতত এদের কথা বলছি না। বলছি, মধ্যবিত্ত দেশবাসীর কথা, যাঁরা রাজা নন প্রজা, যারা মালিক নয়, মালিকদের বেতনভোগী কর্মচারী। উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যাক সরকারী চাকুরেদের। পূর্ব জন্মে অনেক পুণ্য করলে তবে হয় এদেশে সরকারী চাকুরী পাওয়া যায়। সরকারী চাকুরের অনেক সুখ সুবিধা। চাকুরী যখন তখন খোয়া যায় না, চাকুরী জীবনের অন্তে পেনসন পাওয়া যায়, মাইনে ছাড়াও অনেক রকমের ভাতা পাওয়া যায়, অগ্রিম পাওয়া যায় অথবা নানা ভাড়ার জন্য ভাতা পাওয়া যায়, অসুখ-বিসুখে চিকিৎসার খরচ পাওয়া যায়, বাড়ি করার জন্য টাকা ধার পাওয়া যায়, বাড়ি বেড়াতে যাবার টিকিট খরচ পাওয়া যায়, সপরিবারে দেশভ্রমণে যাওয়া যায় ট্রেন ভাড়া না দিয়ে এমন কত কি। এ বিষয়ে লক্ষণীয় যে, বেশীর ভাগ সুখ-সুবিধাই এমন, যা অনেক সমাজতান্ত্রিক বা সমাজকল্যাণমূলক দেশে নির্বিশেষে সমস্ত দেশবাসীকেই দেওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং ব্যবস্থাগুলি যে মন্দ তা বলছি না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে আমাদের দেশে এগুলি রাখা হয়েছে শুধুমাত্র একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর জন্য। সরকার যদি একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হতো তো বলার কিছু থাকতো না। এক একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মচারীদের জন্য যা ইচ্ছে সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করবে তাতে বলার আছে কি বা কার। কিন্তু সরকারের তো নিজের কোনো আয় নেই। সরকার যা ব্যয় করে তা জনসাধারণের কাছ থেকে কর হিসেবে আদায় করা। জনসাধারণ টাকা দেবে আর সেই টাকায় সরকারী কর্মচারীদের বিশেষ বিশেষ সুখ-সুবিধে দেওয়া হবে বার থেকে জনসাধারণ বঞ্চিত এ কেমন যুক্তি? এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে যাদের দুধে-ভাতে রাখার এরূপ বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের শুধু সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেই গোষ্ঠীবদ্ধ রাখা হচ্ছে না। আরও কিছু কিছু সংখ্যায় অতি ক্ষুদ্র কিন্তু দাপটে প্রবল গোষ্ঠীর লোকেদের এই জামাই-আদর দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। সরাসরিভাবে যাঁরা সরকারী কর্মচারী নন, কিন্তু যাঁদের কর্মস্থান সরকারী অর্থে চালিত, যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গবেষণাকেন্দ্রগুলি, সাহিত্যকলা ইত্যাদির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য স্থাপিত হয়েছে যে সংস্থাগুলি তাদের কর্মচারীদের মধ্যেও এইসব সুখ-সুবিধার প্রসার ঘটানো হচ্ছে। যাঁরা মন্ত্রী, অথবা যাঁরা বিধানসভা, লোকসভা বা রাজ্যসভার সদস্য তাঁরা তো বটেনই। একদা মন্ত্রী ছিলেন অথবা কোন সভার সদস্য ছিলেন, এখন ভোটরণাঙ্গনে ভগ্নজানু হয়ে ধূলিলুণ্ঠিত, এ জাতীয় দেশসেবকরাও বিশেষ সুবিধা ভোগ করেই চলেন। সবই জনগণের পয়সায়।

আমি যে বৈষম্যের কথা আলোচনা করলাম তা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে সমাজের প্রতি অঙ্গকে, সমাজব্যবস্থার পরতে পরতে ঘটেছে তার অনুপ্রবেশ। এই বৈষম্যের দূরীকরণ না করে সমাজের সার্বিক মঙ্গল নেই। এবং শুধু মাতাল লম্পট জমিদার শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেই এই সমস্যার সমাধান হবে না। এর জন্য অবশ্যই চাই ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তার উৎপাটন। কিন্তু কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক আন্দোলনই পারবে না এই বৈষম্যের অবসান ঘটাতে যদি সেই সঙ্গে সঙ্গে না আন্দোলন করা যায় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্য। সাংস্কৃতিক বিপ্লব চাই এজন্য যে শুধু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পাল্টালেই হবে না, ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রতি স্তরের মানুষের মনে যে অর্থমনস্কতার বিকার ঢুকিয়েছে তার থেকেও চাই মুক্তি।

ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমানো মানে চড়া হারে সুদের সুযোগ
আর সেই সঙ্গে অপরকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা

তাই অমর প্যাটেলের জমা টাকায় নতুন একটি ট্র্যাক্টর কেনা সম্ভব হল।

তাঁর অবশ্য এক বিঘা জমিও নেই।

অবসর গ্রহণ করে অমর প্যাটেল প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের সব টাকা ইউকোব্যাঙ্কের একটি ফিক্সড ডিপজিট পরিকল্পনায় জমা রাখেন। তিনি মোটেই জানতেন না— মাসে মাসে তিনি যখন সুদের টাকা তুলছেন, তখন তাঁর জমা টাকার সাহায্যে একটি কৃষক সমবায়ের ট্রাক্টর কেনা হচ্ছে।

ইউকোব্যাঙ্কের অন্যান্য আমানতকারীদের টাকার মত অমর প্যাটেলেরও জমা টাকা সমাজে যাঁরা দুর্বল ও নিঃসম্বল তাঁদের স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে। এই যেমন—একটা ট্রাক্টর দিয়ে কিছু চাষীর প্রয়োজন মেটানো, কিংবা কোন যুবকের দরকারমত কাজের রসদ জোটানো, অথবা অসহায় দুঃস্থ মহিলাদের জীবিকার সংস্থান করা বা পশু ও অপারগের জন্যে জলের ব্যবস্থা করা। আমাদের নানা পরিকল্পনায় আপনার সঞ্চয়, তা যেমনই হোক না কেন, সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহু রকমের সহায়ক। তাই, ইউকোব্যাঙ্কের যে কোনো সঞ্চয় পরিকল্পনায় টাকা জমা রাখার মানেই অপরকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করা, এবং সেই সঙ্গে নির্বিঘ্নে ও লাভজনকভাবে নিজের সম্পত্তিও বাড়িয়ে তোলা। কারণ আপনার জমা টাকা দিন দিন সুদে আসলে মিলে বেড়েই চলবে।

পশ্চিমবঙ্গের একটি অ্যাগ্রো-সার্ভিস সমিতিকে এই ট্র্যাক্টর দেওয়া হয়েছে। সমিতি ট্র্যাক্টরটি গরীব চাষীদের প্রয়োজনে ধার দেন।

ইউকোব্যাঙ্কের লাভজনক পরিকল্পনা কী কী?

সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট
ফিক্সড ও টাইম ডিপজিট
রিকারিং ডিপজিট
রিকারিং ডিপজিটের সঙ্গে যুক্ত ফিক্সড ডিপজিট
ডিপজিট সার্টিফিকেট পরিকল্পনা
কুবের যোজনা
ফিক্সড ডিপজিটের সঙ্গে যুক্ত জনতা পার্সোনাল অ্যাকসিডেণ্ট ইনসিওরেন্স পলিসি পরিকল্পনা

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

জনগণকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে

তারপর "আমি আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি, তাঁহারই উপর নির্ভর করিতেছি। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত কেহ নিরাপত্তা লাভ করিতে পারে না। সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র তাঁহারই"—এই দোওয়াটাও পাঠ করে দাদীজানের নির্দেশে তাকে বাপ পাড়া আগে থাকিতে যাত্রা করতে হয়েছিল। গাড়ির মধ্যে গড়াগড়ি খেতে খেতে সেটা তার মনে পড়ল। তাই হয়ত কার্তিকের কথার সঙ্গে ঝিলকিসের মাথাটা ঠক করে ঠুকেই কাঁচাটা কেটে গেল। কার্তিককে ব্যাজার মুখে মাথায় হাত বুলোতে দেখে ঝিলকিস নিজের ব্যথা ভুলে গেল এবং খিলখিল করে হেসে উঠল। সেকারণেই ঘটিক।

মকবুল মোষ দুটোকে প্রাণান্ত পরিশ্রমে বাগে এনে যখন গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তায় উঠতে যাবে তখন শুনল, ছইএর ভিতরে মিঞা বিবি হাসতে শুরু করেছেন।

মকবুল কৈফিয়ৎ দিল। "মোষের দোষ নেই, ঐ শালা মটোরের আচমকা ভক ভক হরনে শুনে ভড়কে গেছে। একদম একেবারে মোষ আপনি ঠাণ্ডাতে পারেন না?"

মকবুলের কথা শুনে মিঞা বিবি আবার হেসে উঠলেন। তার মানে আমার কথা বিশ্বাস হলো না। মকবুল মনে মনে গরম হয়ে গেল। সে হঠাৎ তার স্বরে "হা মুড়ী, হুর্‌র্‌র্ হা হা" বলে দুটো মোষের পেটে পা দিয়ে ঠোক্কর মেরে তাদের লেজে দিল মোচড়। সঙ্গে সঙ্গে মোষ দুটো প্রচণ্ড তেজে দিল দৌড় এবং অতিদ্রুত খাড়া ঢাল বেয়ে মাঠ থেকে রাস্তায় গাড়ি তুলে ফেলল। ফলে গাড়ি হঠাৎ ওঞ্চা হয়ে যাওয়ায় কার্তিক আর হবি সামলাতে না পেরে আবার এ ওর ঘাড়ে পড়ে পিছনে গড়িয়ে গেল।

কোনও রকমে সামলে নিয়ে কার্তিক জিজ্ঞেস করল, "মকবুল মিঞার মোষ এরকম এলেম আরও দেখাবে নাকি?"

মকবুল নিতান্ত ভালোমানুষের মত বলল, "আজ্ঞে না। বড় রাস্তা তো একেবারে মাখন বাপের মত পেলেম, উঁচু নীচু আর নেই তো। পড়ে যাওয়ার ভয় আর নেই।"

দাদীজান ঝিলকিসের গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, মনিরে, আজ কটা কথা কই, খিয়াল রাখো। অ্যাকদিন এজিদ আনসারিয়ানদ বিবি আছমা মেয়েদের তরফের থে হজরত রছুল্লাহর খেদমতে আসে আরজ ক'রল, ইয়া রাছুলুল্লাহ! পুরুষরা যত কী করে ছওয়াব পায়। তাদের জন্য জুম্মো, জামাত, ঈদ, বিমারপোরছি, জানাজা, হজ্জ ওমরা আরও কত রকম নেক কাজ আছে এবং এই সব কাজ হাসিল করে তারা আমাদের চাইতে কত বেশী ছওয়ার আদায় করে আর আমগের ব্যালায় এই সব ছওয়াব পাওয়ার জো নেই ক্যান? কী আমরা করলি আমরা তা পাবো? হজরত সে-কথার জবাবে বলেন, হে আছমা! তুমি চলে যাও আর মেয়েদের ডাকে ডাকে এই কথা শুনোয়ে দাও যে তারা যদি তাদের সোয়ামীদেরে খুশী করবার জন্য সাজ সজ্জা করে ও সোয়ামির হক আদায় করতি থাকে, সোয়ামীর সন্তোষ তলব করে আর সোয়ামীর মর্জি অনুযায়ী তার পায়রবী করে তা হলিই তারা ঐ রকম সব কাজের মতই ছওয়াব পাবে।"

দাদীজানের বলিরেখা অঙ্কিত প্রশান্ত মুখখানা সেই গাড়ির ছই-এর মধ্যেই হবির চোখে ভেসে উঠল। এবং তার স্নেহজড়িত কণ্ঠস্বর।

শুন রে! তবে শোন: হাদিছ শরীফ আছে, কোনও এক সাহাবার প্রশ্নের উত্তরে হজরত রছুল ফরমাইয়াছেন, দাদীজান মাঝে মধ্যে একেবারে কেতাবের কথা আওড়ে যান, হাসি মুখের বা চক্ষের ভ্রুকুটির দ্বারা অথবা কোনও কঠোর আদেশ পালন হেতু কিম্বা স্বামীর জান ও মালের হেফাজত করিয়া যে স্ত্রী তাহার স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিয়াছে তাহাকেই হাদিয়া ও সেক্‌কায় আওয়ত বলা হইয়া থাকে।

আব্বার মলিন মুখটা ভেসে উঠল। মন খারাপ কখনও করবা না। বুঝিছ। এই তো এই গিরাম আর ঐ গিরাম। থাকি গেলি এ-পাড়া আর ও পাড়া। অ্যা মনে করবা ব্যাসে এবাড়ি আর ও বাড়ি। আব্বাজানের মুখটা ক্রমশ ওর কানের কাছে এগিয়ে এল তার গলার আওয়াজটাও ফিসফিস করতে শুরু করল, বিবি তুমার বাক্স খুলে অ্যাকটা জিনিস পাবা। উডা তুমার। তুমার যা মর্জি হবে উডা দিয়ে তাই করবা। তারপর একটু কেশে গলাটা সাফ করে নিয়ে আওয়াজটা চড়িয়ে বললেন, আর হ্যাঁ তুমার শ্বশুরবাড়ির শাউড়ি মন্দ করবা। আর হ্যাঁ মোটেই মন খারাপ করবা না। উডাউ তুমার বাপ ইডাউ তুমার বাড়ি। বুঝিছ।

ঝিলকিসের চোখ ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল। মুখগুলো আর তেমন সাফ দেখতে পা। আমিও ইবার তোর রাঙা ভাইর সঙ্গে মোকামে চলে যাবো। বুঝলি হবি। কাল রাত্তিরি আমার বুকি মুখ রাখে খুব কাঁদিছে। কোয়েছে আমার উপর অ্যাতদিন ধরে যা অবিচার করিছে তার জন্যই আল্লাহ নাকি তোর রাঙা ভাইরি কাছে হুশিয়ার করে দেছেন। কাল রাত্তির অ্যাবল কাঁদিছে আর আদর করিছে কোয়েছে, অ্যাকা থাকলিই নাকি ওর ঘাড়ে শয়তান আসে ভর করে। আর তখন যত খারাপ কাজ করে ফ্যালে। আমি আর ওরে অ্যাকা ছাড়তিছি নে। এ ভুল আর না। ইবার আমরা নতুন করে ঘর বাঁধব হবি। আর ওরে ছাড়ে থাকব না।

মোছফেক্কাডা ভারি শয়তান। ওর মুখ কিছু আর আটকায় না। বাইরি আব্বা ঘুরাঘুরি করিছেন। দাদীজানের ঘর ভর্তি। ছুটকি ফুটকি, ওগের দুই শাউড়ি। লোকে অ্যাকেবারে গিজগিজ করিছে। তার মধ্যি মোছফেক্কা চোখ মুছতিছে আর ধরা ধরা গলায় ক্ষেপে উঠল, বিবি! বাড়িখান তো খালি করে চলে যাতিছ। যাতিছ যাও। কিন্তু কোলে অ্যাকজনারে নিয়ে ফিরে আসা চাই। আর অমনি সবাই মিলে ঠিক কোয়েছে, ঠিক কোয়েছে মোছফেক্কা বলে অ্যাকেবারে কলকলিয়ে উঠল। ঝপ করে ঝিল-

আমাদের কাপড়ের প্রত্যেক সুতোয়
অরবিন্দের উৎকৃষ্টতা বোনা। উত্তম
পলিয়েস্টার - কটন মিশ্রিত অতুলনীয়
বস্ত্র-সম্ভার থেকে বাছাই করে নিন।
এ কাপড়ে ভাঁজ পড়ে না বললেই
চলে এবং ইহা বহুদিন টেকে। বহু
বছরের কারিগরী দক্ষতার সাহায্যে
এই কাপড়ের উন্নতিসাধন করা
হয়েছে। আপনি যে দাম দেন—
তা এরই জন্য।
Interpub/AM/11/77/IBN
অরবিন্দ
মেসার্স চুন্নুলাল দুর্গাপ্রসাদ, বাঁকীপুর, পাটনা ৪

হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেডের উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

HLLS. 1223

আলো কোটে নি

সুনীল বসু

ছন্দে নিখুঁত তোমার পঙ্‌ক্তি
অলংকারের চতুর কারুকার্যে ঠাসা তোমার কবিতা
উপমা রূপকের ব্যবহারে চোখ ধাঁধিয়ে যায়
তবু যাকে বলে স্বর্গীয় স্বাদ, যাকে বলে আনন্দ-নিষ্যন্দী ব্যাপার
যাতে আমি ক'রে কেঁপে উঠব
সবিনয়ে বলি তা হয় নি

একটু আচড় একটু ছোঁয়া তা হলেই হয়ে ওঠে
সেটা কি করে আসে, কখন আসে, কেমন করে আসে,
আমি তো কোন ছার
রবীন্দ্রনাথও সব সময় জানতেন না।
অবচেতনার কোন অতল থেকে অজান্তে শুধু ঝলক দিয়ে যায়
খাতার সাদা পাতায় সোনার চিহ্ন ফুটে ওঠে মহৎ কবিতার
কবিতা-পাগল লোকগুলো তখন আনন্দ-সাগরে ভাসে

একটি নিরাভরণ ভঙ্গিহীন পবিত্র সহজ সরল
কবিতা লেখ দেখি
রামপ্রসাদের মত একটি কালোত্তীর্ণ পঙ্‌ক্তি
যা আজ চলন্ত ট্রেনের মধ্যে গাইছিল অন্ধ ভিখিরিটা

ভেবে দেখ কত সাদামাটা কত সহজ সরল ওর আবেদন
অথচ কত গভীর তত্ত্বের কথা
এখনো কতদিন পরেও জিভে সুধার মতন ছুঁয়ে আছে

ছন্দ তোমার নিখুঁত, উপমা অলংকারের ছড়াছড়ি
অথচ সবিনয়ে বলি, যে কবিতায় কেঁপে উঠব
তা তোমার হয় নি।

যাওয়া

বীতশোক ভট্টাচার্য

এই কুয়াশার দেশ ছেড়ে কাল তুমি চলে যাবে।
যেভাবে বিহ্বল হাওয়া কালো পিচ পথের ওপরে
ভোরের নীলচে নীল ছায়া ফেলে, যেন জলে ছই
দুলে উঠলো একটিবার, তারপরই, চল, যাই: এখানে প্রবাসে
যাওয়ার অস্পষ্ট পথ; হঠাৎ অবাক হয়ে বেঁকে
যেমন দেখেছো তুমি দুদিকের সারিগাছ সাদা স্মৃতিটিকে
কী ভুলে ভিতার দিকে নিয়ে গেলো, আর সে ফটকে হাত রেখে
কুয়াশায় ভূমিকায় তুষারের মত মূর্তি, মুখের ধোঁয়ায়
হঠাৎ অনুশো ক'রে সব কিছু হেসে উঠলো : বলো তো, কোথায়
মাঁর্নিং স্কুলের ঘণ্টা বেজে উঠছে; যেন আজ কারো চুমো ছাড়া
কার আই দুধের শিশু ছুটে যায়......আজ কিছুতেই
বিশ্বাস না করে তুমি পারবে কী, বেড়ালটি ঘাস খেতে এসে
শিশিরে ভুবিয়ে মুখ শুয়ে আছে; ইচ্ছে হলে তুমিও ঘুমিয়ে
পড়েছো তো ভোরবেলা, কিন্তু কলম রেখে আজকে সকালে
বাইরে তাকালে দেই আমলকী তরুটির পাতা ঝরে ঝরে
তোমাকে শোনাতো তার ছন্দ নেই, আত্মমগ্নতা, শব্দ, তাও নেই :
শুধু যেতে হবে জেনে সেও জেগে বসে আছে আজকে, সকালে

তোমাকে ছুঁলে

ফিরোজ চৌধুরী

ভালবাসার কি কোন রঙ আছে
গোলাপী মেদুসে কিংবা হলুদে
কল্পনার গভীরে তলিয়ে যাবার নির্মমতা
ভালবাসার কি কোনো ভাষা আছে
জ্যামিতিক গন্ডী কিংবা খোলা বিস্তীর্ণ মাঠ
যেখানে সূর্য ডুবে গেলে ভূমিকম্প হয়

তুমি কি জানো
তুমি কথা বললে বিঠোফেন বেজে ওঠে
সমস্ত বৃক্ষ হয় পুষ্পিত
তুমি কি জানো
তুমি কথা বললে নাইটিঙ্গেল গান গেয়ে ওঠে
প্রতি রাত হয় গোল পূর্ণিমা

তাই তোমাকে ছুঁলে
আকাশে মেঘের খেলা
দূরের ঝাউবনে ঝড়
তোমাকে ছুঁলে সব কিছু পালটে যায়
তোমাকে ছুঁলে

কৃষ্ণলীলা পট। মধ্যে যমুনা বয়ে যাচ্ছে, দুপাশে শ্রীকৃষ্ণের নানা খেলার চিত্ররূপ। একেবারে উনিশশো শতকের মেদিনীপুরের পটুয়া। পটচিত্রকলার আধিকতা বর্তমান কালে সমকালীন চিত্রকলায় অনেকেই জানেন। সুনয়নী দেবী, যামিনী রায়ের নাম জেনেই গেছে, কিন্তু পটচিত্রের যে চেহারাটি ওঁরা খুঁজে দিয়ে গেছেন একালের শিক্ষিত শিল্পীদের তা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা আজও চলেছে, ভিন্নভাবেও চলবে। কি ছন্দেই না বেঁধে গেছেন তাঁদের আঁকা সেকালের পটুয়ারা।

আমাদের ফেলে দিতে চাইছে ...

অন্ধকারের অন্তরালে

বরুণ সেনগুপ্ত

বসন্ত

আমাদের সমাজের প্রায় সর্বত্রই যেমন শ্রেণীভেদ আছে জেলেও তেমনি আছে। সমাজে আছে ধনী, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত, অফিস-কাছারিতে আছে ফার্স্ট ক্লাস অফিসার থেকে আরম্ভ করে ফোর্থ ক্লাস স্টাফ পর্যন্ত, রেলে আছে এয়ারকন্ডিশন, ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড ক্লাস আর জেলে আছে ডিভিসন 'ওয়ান, টু' এবং 'থ্রী'। জেল পরিচালনার গাইডবুক 'জেল-কোডে' লেখা আছে: সামাজিক মর্যাদা, জীবনযাত্রার মান, শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রভৃতি বিষয়ের বিচারে বন্দীদের শ্রেণীবিন্যাস করা হবে। এই শ্রেণীবিন্যাসের অধিকার রয়েছে দুই কর্তৃপক্ষের—(এক) রাজ্য সরকারের এবং (দুই) সংশ্লিষ্ট মামলার বিচারকের। এঁরা যে-কেউ ঠিক করে দিতে পারেন কোন্ বন্দী কোন্ শ্রেণীভুক্ত হবে।

মিসা-বন্দীদের ক্ষেত্রেও শ্রেণীবিন্যাস আছে। তবে শ্রেণীপরিচিতির ঢং একটু আলাদা। উল্টো দিক থেকে হিসাব। মিসা 'সি', মিসা 'বি' এবং মিসা 'এ'। মিসা-বন্দীদের কিভাবে রাখা হবে সেই সম্পর্কে রাজ্য সরকার যে নিয়মাবলী তৈরি করেছেন তাতে লেখা আছে, মিসা 'বি' বন্দী একজন বিচারাধীন ডিভিসন ওয়ান বন্দীর সমান সুযোগ-সুবিধা পাবে, আর মিসা 'এ' হল শাস্তিপ্রাপ্ত ডিভিসন 'টু' বন্দীর সমপর্যায়ভুক্ত। মিসা 'সি'-র হল বিশেষ মর্যাদা। ডিভিসন ওয়ান বন্দীর চেয়েও অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা পাবে একজন মিসা 'সি' বন্দী।

আরও এক বিচারে সমাজের মতন জেলেও তেমনি ব্যবস্থা আছে। অফিসার হলে তার আর্দালী থাকে, বড়লোকের থাকে খানসামা এবং ডিভিসন বন্দী হলেও তার ফাইফরমাস খাটার জন্য দেওয়া হয় ফালতু।

বাইরে থেকে লোক এনে? না, মোটেই তা নয়। ওই ডিভিসন থ্রি বন্দীদের মধ্য থেকেই এই ফাইফরমাস খাটার লোক যোগাড় করা হয়। জেলে চিরকালই এদের বলা হয় ফালতু। একটা বিচ্ছিরি ডাকনাম। এখন অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে ফালতু-দের আর ফালতু বলা হয় না, বলা হয় অ্যাটেন্ডার। যদিও সেটা শুধু কাগজপত্রে। জেলের আই জি থেকে আরম্ভ করে সেপাইরা পর্যন্ত সবাই এখনও এই লোকগুলোকে ফালতু বলেই ডাকে।

এই ফালতু কথাটা আমি প্রথম শুনি প্রেসিডেন্সী জেলের সুপারিনটেন্ডেন্টের মুখে। সবে জেলে ঢুকেছি। কোথায় আমাকে রাখা হবে এই নিয়ে আলোচনা চলছে। আমি বললাম, মোটামুটি ভাল এমন কোনও ওয়ার্ডে আমাকে দিতে পারেন ভাল হয়। কিন্তু জেলার বললেন: না, ওখানে কোনও জেল নেই। আমি সরকারী নির্দেশমত মিসা 'বি' বন্দী। অনেক আলোচনার পর কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন যদিও আমি মিসা 'বি' তবু আমাকে গোরা ডিগ্রীতে মিসা 'সি'-দের সঙ্গেই রাখা হবে। ওখানে আরও দুজন আছেন যাঁরা মিসা 'সি' নন।

এই যখন সিদ্ধান্ত হল তখন ডাক পাঠিয়ে সুপার সাহেব আমাকে কিছু উপদেশ দিলেন। একান্তে। এক নং উপদেশ: জেলের ভেতরে বেশী ঘোরাঘুরি করবেন না। নানা ধরনের কয়েদী আছে। চোর, ডাকাত, রাজনৈতিক—নানা রকমের। এরা কে কখন কি বলবে, কি করে বসবে বলা যায় না। তাই, ঘোরাঘুরি বেশী করবেন না। দুই নং উপদেশ: মালপত্র, ঘড়ি, কলম—সব সাবধানে রাখবেন। এই ফালতু-টালতুগুলো সব বিশ্বাসযোগ্য নয়, চুরি ওদের হাড়ে আছে মশাই। তিন নং উপদেশ: যা কিছু অসুবিধা হবে আমাকে জানাবেন। সব ঠিক করে দেব।

গোরা ডিগ্রীতে যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন কিন্তু এর ঠিক উল্টো কথাগুলি শুনলাম। স্নান করতে যাচ্ছি—ঘড়িটা, পেনটা অশোক দাশগুপ্তের কাছে রাখতে দিলাম। বললাম: ঘরে রেখে এলাম না। সুপারিনটেনডেন্ট বললেন, এই ফালতু-টালতুরা নাকি চোর হয়।

অশোকবাবু হেসে ফেললেন। বললেন: চোর ওরা ঠিকই মশাই। তবে জেলের ভেতরে নয়। বাইরে। জেলের ভেতরে ওরা চুরি-চামারি করে না। এই ওয়ার্ডের কোনও ফালতু কিছুই চুরি করবে না। নিশ্চিন্তে ওদের বিশ্বাস করতে পারেন। বরং সাবধানে থাকবেন জেলের লোকদের সম্পর্কেই। জেলের সেপাই থেকে আরম্ভ করে উচ্চতর পদের কর্তা পর্যন্ত সব সুযোগ পেলেই চুরি করে। এই বলে তিনি ডাকলেন: বসন্ত, এই বসন্ত, নতুন বাবুর ঘড়িটা আর পেনটা ও'র ঘরে রেখে আয়।

সেই থেকেই গোরা ওয়ার্ডে আমার নাম হয়ে গিয়েছিল নতুনবাবু। অন্তত ফালতু অর্থাৎ অ্যাটেন্ডারদের কাছে। আমি সবচেয়ে পরে এসেছি, গোরা ডিগ্রীর নবতম বাসিন্দা—তাই নতুনবাবু হয়ে গেলাম।

গোরা ডিগ্রীতে তখন পাঁচজন ফালতু এবং একজন মেট। ফালতু বসন্ত, পালোয়ান, রাজুয়া, রাজেন এবং বাহাদুর। আর মেট হল জগদীশ। এদের মধ্যে রাতেও গোরা ডিগ্রীতে থাকত বসন্ত, পালোয়ান এবং রাজুয়া। আর সবাই ছ'টার সময়ই যে যার ওয়ার্ডে চলে যেত।

ওদের কাজও ভাগ করে দিয়েছিলেন সুশীলবাবু। রান্নাবান্না, বাসনমাজা, উনুন ধরানো প্রভৃতি বাহাদুর আর রাজেন। এদিকের কাজকর্ম অর্থাৎ ঘর ঝাড় দেওয়া ও মোছা, জল তোলা, খেতে দেওয়া ইত্যাদি বসন্ত এবং পালোয়ান। বাসনপত্র মাজা এবং ধোলাই করা ইত্যাদি রাজুয়া এবং রাজেন। প্রতিদিনের যেমন আমরা বসন্ত এবং পালোয়ান বা রাজুয়া। ওদের মধ্যে কেউ হেড ফালতু ছিল না। কেউ প্রধান নয়, সবাই সমান। তবু, বুদ্ধির বলেই হোক আর চটপটে বলেই হোক বসন্তই ছিল হেড ফালতু। প্রতি সন্ধ্যায় যখন জমাদার গোরা ডিগ্রীর গেটে দাঁড়িয়ে হাঁকত: ফালতু, ফালতু হো, আজ গুনতি কিতনা? তখন কাছাকাছি উপস্থিত থাকলেও আর কেউ উত্তর দিত না। দোতলায় থাকলেও জবাব আসত বসন্তের কাছ থেকেই: আট বাবু, পাঁচ ফালতু, এক মেট।

কার্যত আমরাও সবাই জানতাম, বসন্তই হেড ফালতু। জগদীশের অবর্তমানে অফিসে কোনও কাজে পাঠাতে হলে পাঠাতে হত বসন্তকেই। কোনও ফালতু কোনও দুষ্কার্য করলে সে সম্পর্কে অভিযোগও করা হত বসন্তের কাছেই। সুশীলবাবু যখন বাসনের বাটিটা, গামছা বা ঘরে তৈরী টি-টি অন্য কোনও ওয়ার্ডে পাঠাতেন তখনও ডাক পড়ত বসন্তেরই।

এর পুরো নামটা আমি কোনও দিন জিজ্ঞেস করিনি। সম্ভবত গোরা ডিগ্রীতে কেউ তা জানতেনও না। সুশীলবাবু, ক্ষিতীশবাবু এবং দীপেনদা ছাড়া আমরা আর সবাই ওকে ডাকতাম বসন্ত বলে। ওরা তিনজন কিন্তু ওর নামের বিশুদ্ধতম উচ্চারণ করতেন। বিকেলে হয়তো সুশীলবাবু গাছ খোঁচাচ্ছেন, হঠাৎ দেখলেন একটা গাছে একটু বাড়তি জল দিতে হবে। হাঁকলেন: বসন্ত, ও বসন্ত, বাবা, এক বালতি জল নিয়ে আয় দেখি। অথবা বয়স্ক ক্ষিতীশবাবুর 'আনন্দবাজার' কাগজখানা চাই। তখন হয়তো কাগজখানা পড়ছেন স্বরাজবাবু। ক্ষিতীশবাবু দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েই আস্তে আস্তে ডাকতেন: বসন্ত, বসন্ত, ভাই, স্বরাজবাবুর পড়া হলে 'আনন্দবাজার'খানা একটু ওপরে দিয়ে যাবে। ক্ষিতীশবাবু এমনিতেই ধীরস্থির প্রকৃতির লোক। কথাও বলতেন আস্তে আস্তে।

সুন্দর চেহারা ছিল বসন্তের। লম্বা। ভাল স্বাস্থ্য। সরু কোমর। চওড়া বুক। হাতে পায়ে পেশীর ছড়াছড়ি। ব্যাকব্রাশ করা চুল। চোখমুখের গড়নও বেশ সুন্দর। তবে, একটা খুঁত ছিল বসন্তের। অন্তত আমার তাই মনে হত। প্রচুর পান খেত। আর পান খেয়ে খেয়ে দাঁতগুলি হয়ে গিয়েছিল লাল এবং ফাঁকা ফাঁকা। ও সব সময়ই প্রায় হাসত। আর হাসলেই লাল লাল ফাঁকা ফাঁকা দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ত। আমি বলতাম: বসন্ত, দাঁত ভাল করে মাজ, আর পান ছাড়া নইলে তোমার দাঁতগুলি যাবে।

ও আরও হাসত। আরও বিকটভাবে দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ত। বলত: বাবু, আমি তো গাঁজা খাই না। শুধু পান খাই। জেলে অধিকাংশ থি ক্লাস বন্দীই গাঁজা খায়। বসন্ত গাঁজা খেত না এটা সত্যি। কিন্তু বিড়ি খেত।

আমি হেসে বলতাম: কেন, তুই বিড়ি খাস না।

ও হেসে লজ্জায় মুখটা ঘুরিয়ে নিত। অস্বীকার করত না যে খায়, আবার মুখ ফুটে স্বীকারও করত না।

কিন্তু ওদের মধ্যে সবচেয়ে আত্মাভিমানী গোমড়ামুখো গোছের ছিল পালোয়ান। একটু হাবাগোবাও। কোনও কোনও দিন দুপুরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকত আমার সেলের দুয়ারে। জিজ্ঞেস করতাম: কিরে পালোয়ান, কিছু বলবি?

পালোয়ান চোখটা নামিয়ে নিত: নাহি বাবু।

আমি উঠে বসতাম। তারপর গল্প করতাম কিছুক্ষণ ওর সঙ্গে। ওর বাড়ির কথা, গ্রামের কথা, আত্মীয়স্বজনের কথা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

পালোয়ানের সাজা হয়ে গিয়েছিল বাক্স চুরির চার্জে। পালোয়ান সেই হিসেবে ছিল কয়েদী। সাধারণত আমরা জেলের সব বন্দীকেই কয়েদী বলি। জেলে কিন্তু তা বলা হয় না। জেলে শুধু শাস্তি-প্রাপ্তদের কয়েদী বলা হয়। আর যাদের কেস চলছে তাদের বলা হয় হাজতি। পালোয়ানের ছয় মাস সাজা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পালোয়ানের নিবৃত্তি মত ও 'বি' ক্লাস কয়েদী ছিল না। 'বি' ক্লাস বলা হয় তাদেরই যাদের একাধিকবার সাজা হয়। বসন্ত, রাজুয়া—ওরা সব 'বি' ক্লাস। কতবার জেলে ঢুকেছে বেরিয়েছে তার হিসাব নেই। বসন্ত হাসতে হাসতে বলত: জানেন নতুনবাবু, রাজুয়ার অন্তত দশ-বারোটা নাম আছে। এক-এক নামে এক-একবার জেলে ঢোকে। নিজেরই মনে থাকে না কবে কোন্ নামে জেলে ঢুকেছে। ওকে জিজ্ঞেস করুন, বলতে পারবে না এবার ওর নাম কী।

এটা মোটেই অতিশয়োক্তিও নয়। বাঁকুড়া জেলে দেখা হয়েছিল প্রেসিডেন্সী জেলের এক প্রাক্তন ডেপুটি জেলারের সঙ্গে। আমি যখন বাঁকুড়া জেলে তখন তিনি ওখানে অ্যাক্টিং জেলার। ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করেছিলাম একবার এই ব্যাপারটা: হ্যাঁ মশাই, আপনি তো প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলেন, 'বি' ক্লাসেরা এক-এক নামে এক-একবার জেলে ঢোকে এটা সত্যি?

হে। বড়বাবু একদিন বলছিলেন, পালোয়ান বেলা এক-এক ওর ঘরে গিয়ে কাঁদছিল। মানের রান্নাঘর আছে, বাজারী আছে, একটা ও আছে। পালোয়ান বাকি ওদের কথা বলে ছিল।

আমরা সবাই মিলে সেদিনই ঠিক করলাম, আমাদের ঘর যাওয়ার খরচা এবং হাতখরচা কিছু দেব। রাতে ও হাওড়া পৌঁছলেই চলে যেতে পারে। রণের কাছে টাকা না থাকতেও পারে। সেইমত রবাবু এবং অশোকবাবু অফিসে গিয়ে সব বন্দোবস্ত করে এলেন বিকেলেই। প্রত্যেকের পি সি থেকে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট থেকে কিছু কিছু বাজার দরে টাকাটা একসঙ্গে দেওয়া হবে পালোয়ানের। গেটের ভেতরে দেওয়া চলবে না। গেটের বাইরে গেলে জেন্টুজিবাবুর কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে দীশ ওর হাতে দিয়ে দেবে।

সন্ধ্যের পর পালোয়ান এল একবার আমার ঘরে। শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলাম। চুপচাপ এসে দাঁড়াল। ওকে দেখেই বললাম: পালোয়ান, তুই তা হলে কাল চললি আমাদের ছেড়ে!

পালোয়ান খুব ধীরে ধীরে বলল: হাঁ বাবুজী।

: তোর তো এবার মজা। বাড়িতে চলে যাবি। খরচের টাকা জগদীশ তোকে দিয়ে দেবে। বাবার সঙ্গে দেখা করেই ঘর পালাবি। কাল সন্ধ্যার ট্রেনেই, নইলে পুলিস আবার ধরলে মরবি। অন্তত কয়েক বছর আর কলকাতা আসবি না। একেবারে বাজারী এলাকায় মদ বেচতে বসবি না।

পালোয়ান শুধু বলল: হুঁ।

কালো কুচকুচে এই পালোয়ান। বেঁটেখাটো। দেখলাম। দেখলাম ওর চোখে জল। আশ্চর্য হয়ে গেলাম!

: কাল তুই ঘর যাবি আর কাঁদছিস কেন? তুই বাড়ির ছেলে বোকা!

পালোয়ানের চোখ দিয়ে তখনও জল পড়ছে: বাবুজী, যখন ধরা পড়ি তখন দেশ থেকে চিঠি এসেছিল—লড়কীর বিমার। তারপর আর কোনও খবর পাইনি। কে জানি কেমন আছে!……

আমি ওকে আশ্বস্ত করে বললাম: না, না, তোর কোনও চিন্তা নেই। সব ভাল আছে। তোর লড়কীও ভাল আছে।

: বাবুজী, আপনার মনে হচ্ছে ভাল আছে? সত্যি ভাল আছে? ….বাবুজী, দু' বছর ওকে দেখিনি।

আমি জোর দিয়ে বললাম: নিশ্চয়ই ভাল আছে। পরশুদিন বাড়ি পৌঁছেই দেখবি তোর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। লড়কীর জন্য একটা খেলনা কিনে নিয়ে যাবি। জগদীশ যে টাকা দিয়েছে তা থেকেই হয়ে যাবে।

ও যেন একটু আশ্বস্ত হল। বললাম: এবার যা, আটটা বাজে, এখনই দীনেশদা তোকে ডাকবে।

ও আস্তে আস্তে নেমে গেল।

সেইদিন রাতে পালোয়ানের ভাগে এক-সপ্তাহ খাবার সুশীলবাবু নিজেই বরাদ্দ করে দিয়েছেন। কাল পালোয়ান কাল চলে যাবে।

পরদিন সকালে আটটার পর পালোয়ান খালাস পেল।

ও সকালেই স্নান-টান সেরে নিল। বড়বাবু ওর জন্য বাজারে কাচানো একখানা ধুতি দিয়েছিলেন। পালোয়ান পরিপাটি করে সেখানা পরল। নিজের জামাটা নিজেই কেচে নিয়ে ইস্ত্রি করিয়ে রেখেছিল। সেটা পরল। সবাই বসে পালোয়ানকে ব্রেকফাস্ট খাওয়ালাম। সবচেয়ে বেশী আগ্রহী বড়বাবু। ডিম-টোস্ট। মাখন পুরু করে লেপে দেওয়া। এক কাপ চা। কোনটিতো ছিনিয়ে নিলেন অশোকবাবু। পালোয়ান নিজেই বসে খেতে যেন লজ্জা পাচ্ছিল। খাওয়া হল। গামছা, একটি লুঙ্গি এবং একটি ছোট পুঁটলি করে নিল। তারপর একে একে সবাইকে প্রণাম করল। ওর চোখে আবার জল এসে গিয়েছিল। বড়বাবুর চোখেও জল।

তারপর জগদীশ আর বসন্ত ওকে নিয়ে গেল গেটে। বড়বাবু এবং অশোকবাবু বারবার বলে দিলেন জগদীশকে: দেখবি তুই, কেউ যেন ওর টাকা না নিয়ে নেয়। কোনও সেপাই যেন না নেয়। বলে দিবি তুই ভাল করে।

পালোয়ান আস্তে আস্তে চলে গেল। জগদীশ আর বসন্তের সঙ্গে। লোহা জিরাফি গেট পর্যন্ত ফিরে ফিরে তাকাল। আমরা সবাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওকে বিদায়-সংবর্ধনা জানালাম। স্তব্ধতা নেমে এল। সেই স্তব্ধতা ভাঙলেন বড়বাবু। বললেন: সত্যিই, পালোয়ান বড় ভাল ছেলে ছিল।

সেদিন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর বসন্ত এল। পালোয়ান ছিল ওর বন্ধু। পালোয়ান চলে যাওয়ায় স্বভাবতই ওর মনটা একটু খারাপ। বললাম: কী রে বসন্ত, তোর বন্ধু চলে গেল!

বসন্ত বলল: হ্ বাবু।

: ওকে তো দেখ আমরা সবাই বলেছি বাড়ি চলে যেতে। যাবে নিশ্চয়ই। না হলে ও আবার ধরা পড়বে। পুলিস আবার জেলে ঢোকাবে।

বসন্ত বলল: ও জরুর যাবে বাবু। রোজ রাতে শুয়ে শুয়ে দিন গুণত। কবে ঘর যাবে! কবে লড়কীকে দেখবে। সব সময় এই বলত।

জিজ্ঞেস করলাম: তুই তোর বাবার ওখানে গিয়েছিস কোনও দিন?

বলল: হাঁ বাবু, গিয়েছি। দু'বার।

: কে কে আছে তোর বাবার?

: বেটা আছে দুটা, বেটী আছে একটা। বহু আছে।

: কি করে তোর বাবা?

: চাষবাস করে বাবু। প্রায় পনেরো বিঘা জমিন আছে। ক্যানালের জল পায়, চলে যায় খেতির ফসলে বারো মাস।

: তুই বাবাকে টাকা দিস?

: নাহি বাবু।

: তোর বাবা জানে, তুই এই কাজ করিস?

: নাহি বাবু। জানে আমি কারখানায় কাজ করি। ভাল মাইনে পাই, তবে সব খরচা করে ফেলি!

এবার আমি আসল কথাটায় এলাম: আচ্ছা, ধর তোর সব কেস মিটে গেল। তুই জেল থেকে বের হলি। তখন আমি ডি-ডিতে বলে দেব, তোকে ধরবে না। তবে একটা শর্ত, তুই এই কাজ আর করবি না। আর তোর যা টাকা আছে সব নিয়ে দেশে চলে যাবি। রাজী?

ও চুপ করে রইল।

আমি আবার বললাম: দেখ ভেবে। তাতে যদি রাজী থাকিস তা হলে এখন আর বেল নিয়ে বের হস না। সব কেসে খালাস হলে একেবারে বের হস। আমার ঠিকানা দিয়ে যাব। সোজা সেখানে চলে আসবি। তোকে ডি-ডির অফিসে নিয়ে যাব। বলব সব। নিশ্চয়ই তোকে আর ধরবে না। টাকা সব নিয়ে বাড়ি চলে যাওয়ার জন্য দিন আট-দশ সময় দেবে। তোর তো বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা আছে। জমি কিনে, কি একটা দোকান বানিয়ে বসবি। তোর বাবা নিশ্চয়ই তোর শাদী কি করিয়ে দেবে। পুলিসের ঝামেলা আর থাকবে না। সুখে থাকবি। কি রে, রাজী?

ও তবু চুপ!

আশ্চর্য হয়ে বললাম: অসুবিধে আছে কোনও? গ্রামেও কোনও চুরি-টুরি করেছিলি?

ও তাড়াতাড়ি সলজ্জভাবে বলল: নাহি বাবু!

: তা হলে আমি যা বললাম তাতে তুই রাজী নস কেন?

ও তখনও চুপচাপ।

বললাম: বল, বল না কারণটা কি?

ও একটু লাজুক হাসি হাসল। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলল: নতুনবাবু, কলকাতা ছোড়কে গাঁওয়ে মন নাহি মানতা। গাঁওয়ে গিয়ে দেখেছি। ওখানে আমার সাত দিনও মন টেকে না। বাবুজী! আমার গ্রামে যেতে ইচ্ছাই করে না। (ক্রমশ)

শ্রমজীবী মহিলা বা স্নেহপরায়ণ পিতা

কানাড়া ব্যাঙ্কের নিরন্তর

নিয়মিত মাসিক আয়

যুগিয়ে আপনাকে দেবে
এক নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ...

বরাবর... বরাবর...

সেইসঙ্গে কোনো বাড়তি খরচ ছাড়াই জীবন বীমার সুবিধে

আপনি শ্রমজীবী মহিলা হোন আর স্নেহপরায়ণ পিতাই হোন—দেখবেন, কানাড়া ব্যাঙ্কের নিরন্তর ডিপজিট স্কীম আপনার নিজের ভবিষ্যৎ অথবা আপনার বাচ্চার শিক্ষার জন্যে এক আদর্শ সঞ্চয় যোজনা!

'নিরন্তর' ডিপজিট স্কীম কিভাবে কাজ করে

আপনি যদি ৭ বছর ধরে মাসে টা. ৫০/- করে জমা দেন, তাহলে তারপর থেকে আপনি প্রতি মাসে পাবেন টা. ৫০/- করে। বরাবর...বরাবর। সেই সঙ্গে, এই ৭ বছর ধরে জীবন বীমার সুবিধেও পাবেন—কোনো বাড়তি খরচ ছাড়াই। (কিস্তির পুরো টাকা জমা দেবার আগেই যদি মৃত্যু ঘটে, এবং প্রতি কিস্তি যদি টা. ১০০/- পর্যন্ত হয় তাহলে তা সুরক্ষিত রাখা হবে—কিছু বিশেষ শর্ত অনুসারে)। এবং আপনার টা ৬০০০/- মূলধনও সম্পূর্ণভাবে অব্যাহত থাকবে।

এই সঞ্চয় যোজনা আপনার সাধ্যের মধ্যে

আপনি নিরন্তর ডিপজিট অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন মাসে ন্যূনতম টা. ১০/- (অথবা তার গুণিতকে) জমা দিয়ে।

আরো জানতে হলে, আমাদের নিকটতম শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করুন, অথবা নীচে দেওয়া কুপনটি কেটে ডাকযোগে এই ঠিকানায় পাঠান:

দি পাবলিক রিলেশনস ম্যানেজার B-38
কানাড়া ব্যাঙ্ক, হে. অ., জে. সি. রোড, ব্যাঙ্গালোর ৫৬০ ০০২

প্রিয় মহাশয়,
অনুগ্রহ করে নিরন্তর ডিপজিট স্কীম সম্বন্ধে আপনাদের বিজ্ঞাপনের পুস্তিকাটি পাঠিয়ে দেবেন।

নাম ____________________

ঠিকানা ____________________

____

স্বাক্ষর ____________________

কানাড়া ব্যাঙ্ক

(ভারত সরকারের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন)

পুজোয় চাই নতুন জুতো
জীন্‌স্ ৩৭
লিলিপুট ১৪
টপার্স ৩৬
লিলিপুট ৪৪
অ্যাডমিরাল ৫৭
নোভা ১৪
জুনিয়ার ০৪
মোকাসিনো ১৩
নোভা ১৩
এক্সিকিউটিভ ১৭
সিনডারেলা ৭৮
Bata
Bata understands shoes

বি আই গারলিং ব্রেক স্পেয়ারের নাম সর্বদাই খেয়াল রাখবেন। যখনই আপনি আপনার ব্রেক সিস্টেম বদলাতে চাইবেন—তখন, এমন স্পেয়ার লাগাবেন যে স্পেয়ারের ওপর আপনি পুরোপুরি ভরসা রাখতে পারেন—শুধু একবার নয়-বারবার-প্রতিবার।

প্রয়োজনে ব্রেক স্পেয়ার নতুন করে বদলানো যায়—কিন্তু আপনার প্রাণ নয়। সুতরাং বাজে স্পেয়ার লাগিয়ে আপনার সেই অমূল্য প্রাণ বিপদে ফেলবেন না।

নকল করা বাজে ব্রেক স্পেয়ার—তা' এক জোট্ট রবার ওয়াশারও হতে পারে—আপনাকে ধোঁকা দিতে পারে ও সেই সঙ্গে আসল কাজের সময়ে আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে। ব্রেক সিস্টেমে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার জন্যে যখনই স্পেয়ার বদলাবেন, খুঁটিয়ে দেখে নেবেন যে সেটা আসল স্পেয়ারের মতো একরকম কি না।

আপনার ব্রেককে নিরাপদে রাখতে হলে অনুমোদিত বিক্রেতাদের কাছ থেকে কেবলমাত্র আসল. বি আই গারলিং ব্রেক স্পেয়ার পার্টস্ কিনুন।

বিনামূল্যে! ভালভাবে ব্রেক করার ও ব্রেকের যত্ন সম্পর্কে অমূল্য পরামর্শ সম্বলিত ইংরাজি পুস্তিকা। বড় অক্ষরে আপনার নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করে চিঠি দিন।

সেইখানে আছে সুরক্ষা তত—যেখানে সব স্পেয়ার একই পরিবারের অন্তর্গত

TVS

ব্রেকস্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
পাডি, মাদ্রাজ ৬০০ ০৫০

SAA/81/2665 BEN

বিজ্ঞান

পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র
ট্রম্বে থেকে ফিরে : ৪

… পাশে বাজারে চলতি সবজে বাজা। ডান পাশে … আয়তনে বড়। তেজের পরিমাণও এতে বেশি। ইন্সের গবেষণাগারে তৈরি হয়েছে। কলকাতিতে এই

…তৈরিল এই গবেষণাগার। আমরা দেখলাম, এ কাজটি …ড় তুলতে গিয়ে আরও নানা রকম সুযোগ এখানে …তৈরি হচ্ছে। তৈরি হয়েছে নানা রকম রেডিও-আই-…সোটোপ, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ব্যবস্থা। এই সব সুযোগের …সাহায্যে অনেক সমস্যায় যে সমাধান করা চলে, অনেক …সম্ভাবনাকে যে উজ্জ্বল করা যায়, এ তো সবাই জানেন। …মনে ধরুন, আমরা জানি, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ অনেক …সময় প্রাণী এবং উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। কিন্তু …দেখুন, আমাদের দেশে বেশ কিছু অঞ্চলের মাটিতে …প্রচুর মনোজাইট আছে। এই মনোজাইটে থাকে …তেজস্ক্রিয় পদার্থ। যেমন থোরিয়াম। অথচ আমরা …দেখি, ওই সব মাটিতে নানা রকম গাছপালা বহাল …তবিয়তে টিকে আছে। কি ভাবে, সেটা উদ্ভিদ …বিজ্ঞানীদের কাছে একটা বড়ো রকমের রহস্য। এ সব …নিয়ে গবেষণা করতে গেলে শুধু উদ্ভিদ …বিজ্ঞানী হলেই চলে না, দরকার পদার্থবিজ্ঞানী, …তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক প্রকৃতির সাহায্য। দরকার নানা …রকম ইলেকট্রনিক সাজসরঞ্জাম। এ সব সুযোগ …স্বাভাবিক ভাবেই এখানে গড়ে উঠেছে। তাদের …সাহায্যে আমরা কাজে লাগাচ্ছি। তবে হ্যাঁ, সব …আমরাই করছি বললে ভুল হবে। কৃষি গবেষণাগার-…গুলি থেকে শুরু করে অন্যান্য গবেষণাগারগুলির …সঙ্গেও আমাদের যোগ রয়েছে। পারস্পরিক …সহযোগিতায় দেশের বহু গবেষণাগারে গড়ে উঠেছে …বিকিরণের সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা।

*

আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গবেষণা …করছেন তাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের …বিজ্ঞানীরা। সেটা খাদ্যশস্য সংরক্ষণ। তেজস্ক্রিয় …বিকিরণের সাহায্যে।

…পর্বতটি খুবই সাধারণ বললেন এই গবেষণা …কেন্দ্রের বাইও-কেমিস্ট্রি এবং ফুড টেকনলজি বিভাগের …প্রধান ডঃ বি জি নাদকার্নি। 'ধরুন, আলু, পেঁয়াজ, …ডাল, প্রভৃতি। গত কয়েক বছরে এ সব ফসলের …উৎপাদন বেড়েছে অনেক। কিন্তু যথাযথ সংরক্ষণের …অভাবে তাদের অপচয়ও সেই সঙ্গে বেড়েছে। ট্রেনে …করা হচ্ছে বস্তাবন্দী করে পেঁয়াজ পাঠালেন। পথে …আসতে আসতে কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল …পেঁয়াজগুলির গাছ বেরিয়ে গেছে। উপযুক্ত হিমঘরের …অভাবে বছরে হাজার হাজার টন আলু নানা রকম …জীবাণুর আক্রমণে পচে যায়। এ ধরনের অপচয় রোধ …করার জন্যে আমরা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ কাজে লাগাচ্ছি। আমরা দেখেছি, নিয়ন্ত্রিত মাত্রার গামা …বিকিরণের সাহায্যে শোধন করে নিলে এ সব শস্য …অনেক দিন ধরে পচনের হাত থেকে বাঁচান যায়।'

…বিরাট গবেষণাগার। পুরোপুরি শীততাপ …নিয়ন্ত্রিত। কোন ঘরে চলছে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় …আইসোটোপ থেকে বিকীর্ণ রশ্মির সাহায্যে জীবাণু …নিয়ে গবেষণা। কোন ঘরে খাদ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত …পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ডঃ নাদকার্নির সঙ্গে …এসে সংরক্ষিত খাদ্যসামগ্রী দেখতে একটি ঘরে।

…পর পর এক জোড়া করে পাত্র সাজান। পাত্রে …পাশাপাশি রাখা হয়েছে বিকীর্ণ এবং অবিকীর্ণ …খাদ্যের নমুনা। আলু, পেঁয়াজ, ডাল, ধান, গম, কলা, …প্রভৃতি। যাদের ওপর গামা বিকিরণ ফেলা হয়নি …তাদের চেহারা যথেষ্ট টাটকা। আর অবিকীর্ণ নমুনাগুলি প্রায় নষ্ট হওয়ার মুখে। জীবাণুর আক্রমণে আলুর গায়ে পড়েছে রোগ। খোসা কুঁচকে গেছে। অঙ্কুরিত হয়েছে। পেঁয়াজেরও ওই একই অবস্থা। ডালগুলি বিবর্ণ।

ডঃ নাদকার্নি বললেন, শুধু শস্যই নয়। এদিকে আসুন। দেখুন, নিয়ন্ত্রিত গামা বিকিরণের সাহায্যে মাছ মাংসও কেমন টাটকা অবস্থায় রাখা সম্ভব হয়েছে।

না। বরফের ব্যবস্থা নেই। হিম ঘরের মতও কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। খোলা ঘরে কয়েকটি ট্রে। পাশা-পাশি। তাদের ওপর রেখে দেওয়া হয়েছে চিংড়ি এবং মাংস। গামা বিকিরণে শোধন করার পর। কয়েক দিন ওই ভাবেই আছে তারা। অথচ কোন বিকৃতির লক্ষণ নেই।

ডঃ নাদকার্নি বললেন, দেখুন, অনিবার্য কারণে সারা দেশের খাদ্যশস্য সংরক্ষণের পুরোপুরি ব্যবস্থা এখনও আমরা করে উঠতে পারিনি। হিমঘর আছে অনেক। তবে প্রয়োজনের তুলনায় কম। সমুদ্র, নদী, খাল বিলে প্রচুর মাছ ধরা হয়। বরফের অভাবে সে সব মাছ ঠিক মত সংরক্ষিত করা সম্ভব হয় না। তাদের পচিয়ে নষ্ট করা হয়। হিমঘরের জন্যে চাই বিদ্যুৎ শক্তি। ইদানীং তারও ঘাটতি দেখা দিয়েছে। কলার কথাই ধরুন, অথবা আম। গাছ থেকে পেড়ে এদের হয়ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চালান দিতে গেলেন। অথবা বিদেশে রপ্তানি। দেখা গেল গন্তব্যস্থলে পৌঁছানর আগেই মাঝপথে তারা পেকে গেল। চালানের একটা বড় রকমের অংশ নষ্ট হয়ে গেল এইভাবে। এতে যে শুধু আর্থিক ক্ষতি হয় তা নয়, মূল্যবান খাদ্যেরও তো অপচয় ঘটে? অথচ গামা বিকিরণের সাহায্য নিন। দেখবেন, সাধারণ তাপমাত্রায় রেখে দেওয়া সত্ত্বেও আলু, পেঁয়াজ, শাকসব্জি, ডাল নষ্ট হবে না, পচবে না। তাদের গাছও গজাবে না। ফলমূলের পাকার সময়টাও বিলম্বিত করা যায় এই বিকিরণের সাহায্যে।

প্রঃ গামা বিকিরণের ফলে ওই সব বস্তুর খাদ্য-গুণ নষ্ট হবে না তো?

উত্তর ঃ আলু, পেঁয়াজ, আম, কলা, চিংড়ি, মাছ প্রভৃতির ওপর যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে আমরা গবেষণা চালিয়েছি। পৃথিবীর আরও কয়েকটি দেশেও এ নিয়ে কাজ হয়েছে। বিকীর্ণ খাবার বিভিন্ন পশুকে খাইয়ে পরীক্ষাও করা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, এ ব্যাপারে চিন্তা করার কোন কারণ নেই। অনেকের ভয়, বাবা, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ! ও সব খাবার খেলেই হয়ত তেজস্ক্রিয়তায় ভুগতে হবে। রোগ হতে পারে। এ সব ধারণা ভুল এভাবে সংরক্ষণ করলে খাবারের কোন ক্ষতি হয় না।

ডঃ নাদকার্নি বললেন, একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। দিঘায় মাছ ধরা পড়ে প্রচুর। কিন্তু বরফের অভাবে সেই মাছের বেশ কিছু পরিমাণ কলকাতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। নিয়ে গেলেও সব মাছ তো আর সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হবে না। মার্কেটিং-এর জন্যে তাদের রেখে দিতে হয় আরও কয়েক দিন। আর এ সব করতে গিয়ে প্রচুর মাছ পচে নষ্ট হয়ে যায়। অথচ এ সমস্যাটি সহজেই মেটান যায়। যাঁরা মাছের কারবারী, তাঁরা একটি বিকিরণ-প্ল্যান্ট বসান। জেলে মাছ তুলে তাদের বিকীর্ণ করে নিন। তারপর চালান দিন। বরফের হাঙ্গামা নেই। খোলা জায়গায় রেখে দিন। দেখবেন, বেশ কয়েক দিন মাছগুলি টাটকাই রইল।

শংকর

॥ ৬৮ ॥

গণপতিবাবু বললেন, "এ-পাড়ার অন্য বাড়ির ...জনদের সঙ্গে নিশ্চয় তোমার আলাপ-সালাপ ... গিয়েছে।"

হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু থাকারে ম্যানসনের ...টিতেই তো সবসময় বাঁধা রয়েছি। বাইরে ঘোরা-...রি করবার অবকাশ কোথায়? কর্পোরেশনের বাবু, ...জরীক সামন্তের তারকাটা ইনসপেকটর, টেলি-...দের পেটমোটা জগদোল মিস্ত্রি এবং কয়েকজন ...কেওয়ালা ছাড়া এ-পাড়ার আর কাকে-কাকে চিনি ... মনে করতে সচেষ্ট হলাম।

গণপতিবাবু বোধ হয় আমার এরকম অবস্থা ...ন্দাজ করেন নি। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে তিনি ...লেন, "সেকালের লোকেরা বলতেন লোকবলই ...। এ-যুগে কলকাতা শহরে লোকবল আর কোথায় ...? কিন্তু এখন হচ্ছে পরিচয়বলের যুগ। পরিচয় ...কলেই প্রয়োজনের সময় লোকবলের অভাব হয় না। ...র পেলেই লোকজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে ...বে।"

গণপতিবাবুর অনেক অভিজ্ঞতা। তিনি ঠিকই ...লেন, প্রতিবেশীর সঙ্গে পরিচয়বল কখন ...জন হবে, তার ঠিক নেই।

গণপতিবাবু বললেন, "ভাবছিলাম, জাবনালি ...ন থেকেই শুরু করবো।"

আমি বললাম, "আশ্চর্য বাড়ি এই জাবনালি ...। ওর মধ্যে কী যে নেই তা ভেবে উঠতে ... না।"

হাসলেন গণপতিবাবু, এবং আমার দিকে ...লেন।

আমি বললাম, "আমার ফ্রেন্ড মদনার মুখে যা ...খবর পাই—তাতে মাথা ঘুরে যাবার কথা।"

"কলকাতা শহর বলে কথা! এতো সহজে মাথা ... চলবে কেন?" সহাস্য মন্তব্য করেন ...তিবাবু।

আমি বললাম "ছোটখাট একটি পৃথিবী বলতে ... এই জাবনালি ম্যানসনকে। ওখানে কী নেই? ... দোকান আছে, অফিস আছে কারখানা ... গেরস্থ ঘর আছে, দুর্নীতির জালো ...ছোট খুপরি আছে, আবার শ্রীশ্রীঅমৃতানন্দ ...র ভজনালয়ও আছে। বেআইনী অ্যাবরশনের ...ন চেম্বার আছে, আবার ছোটদের ইস্কুলও খোলা ...।"

গণপতিবাবু বললেন, "এই তো এ-যুগের ... জাল-মন্তর যাচ্ছে বাহিন ভায়া সাজিয়ে না ... বিজনেস জমবে না। যে দুধ খাবে সে তামাক ...না এ-নীতি বোধ হয় একালের বড়লোকদের ...নয়। যেসব বিজনেসমেন ভিতরের রহস্যটা ...নিয়েছে তারা হুড় হুড় করে এগিয়ে চলেছে। ...ই সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে ...দর বুদ্ধিমান লোকদের ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধেও ...একই মনোভাব। সুকর্ম কুকর্ম কোনোটা সম্বন্ধেই ... অত্যধিক টান নেই—যখন যা প্রয়োজন তাই ... প্রস্তুত না-হলে বড়লোকেরা আরও বড়লোক ...হবে না।"

জাবনালি ম্যানসন প্রসঙ্গে অন্য কথা মনে পড়ে ... গণপতিবাবুর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে বললাম ...ম কাউকে চিনি না বললে ভুল হবে। জাবনালি ...নের এক-মালিক ভরত সিং-কে দু-একবার ...। এখন বয়সে প্রপার্টির ডিরেক্টর না ...কেন, কিন্তু মাঝে-মাঝে আসেন। আমাদের ... পপি বিশোয়াসের সঙ্গে খুব আলাপ।

প্রয়োজন হলে ওঁর কাছে আমরা অনায়াসেই যেতে পারি। কোনো অসুবিধে হবে না। আমি বললে মিসেস পপি বিশোয়াস সঙ্গে-সঙ্গে ভরত সিংকে ডাইরেক্ট নম্বরে ফোন করে দেবেন।"

"ডাইরেক্ট নম্বরের ব্যাপারটা কী?" জানতে চাইলেন গণপতিবাবু। বহু ব্যাপারেই তাঁর আগ্রহ। আইনপাড়ায় এতোদিন ঘোরাঘুরি করেও গণপতিবাবু মনটা বেশ তাজা রেখেছেন।

আমি বললাম, "পপি বিশোয়াসের কাছে শুনেছি, বড় বড় লোকদের দুটো করে টেলিফোন থাকে। একটা অফিসের বারোয়ারি নম্বর—শুধু বিজনেস টক-এর জন্যে। আর একটা স্পেশাল ডাইরেক্ট নম্বর, যার হদিস খুব স্পেশাল লোক ছাড়া কাউকে দেওয়া হয় না। মিসেস পপি বিশোয়াসকে সবাই স্পেশাল ডাইরেক্ট নম্বরটাই দিয়ে রাখেন, না-হলে উনি ইনসালটেড ফিল করেন।"

মৃদু হাসলেন গণপতি হাজরা।

আমি বললাম, "অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি এই মিসেস পপি বিশোয়াসের। ওঁর স্পেশাল জানাশোনা লোকদের টেলিফোন নম্বর আঙুলের ডগায় সবসময় ঝুলছে। ইচ্ছে হলেই টকাটক ডায়াল করছেন। টেলিফোন ডিরেক্টারির ধার ধারেন না মিসেস বিশোয়াস। খুব দরকার হলে পার্স-এর মধ্য থেকে ছোট্ট এক টুকরো কাগজ বার করে ফেলেন। সেখানে শুধু পরের পর কয়েকটা নম্বর লেখা আছে, কোনো নাম নেই।

নাম না থাকলেও মিসেস পপি বিশোয়াসের কোনো অসুবিধে হয় না। নম্বর দেখলেই ওঁর নাম মনে পড়ে যায়। সবচেয়ে মজার হলো, যে-নম্বর লেখা আছে, সে নম্বর তিনি ডায়াল করেন না। প্রথম দুটো নম্বর থেকে দুই বিয়োগ করে শেষের দুটো নম্বরের সঙ্গে দুই যোগ করে কীভাবে অন্য একটা নম্বর তৈরি করেন।"

গণপতিবাবু আবার হাসলেন। বললেন "আত্মাহারি নাকি?"

আমি বললাম "আত্মাহারি কিনা ভগবান জানেন। তবে মিসেস পপি বিশোয়াস বলছিলেন, যাঁদের টেলিফোন নম্বর তাঁরাই নাকি কাঁচা নম্বরটা ওঁর খাতায় লিখিয়ে যেতে সঙ্কোচ বোধ করেন। যদি কখনও অন্য কারও হাতে কাগজটা পড়ে যায় তাই বাধ্য হয়েই ওঁকে ওই স্পেশাল পপি কোড চালু করতে হয়েছে, যার অর্থ পপি বিশোয়াস ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না।"

"খুব মাথা আছে বলতে হবে" যেতে-যেতে মন্তব্য করলেন গণপতি হাজরা।

আমি বললাম মিসেস বিশোয়াস নিজে এই কোড মাথা খাটিয়ে বার করেন নি। শিখেছেন ওই ভরত সিং-এর কাছ থেকে। পপি বিশোয়াস এবং আরও অনেকের নম্বর ও'র পকেট বুকে লেখা থাকে, কিন্তু এমনভাবে যে কেউ বুঝতে পারবে না।"

এই মুহূর্তে ভরত সিং-এর ডাইরেক্ট টেলিফোন নম্বর সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করলেন না গণপতিবাবু। ভরত সিং-এর যে-আত্মীয় এখন জাবনালি ম্যানসনের পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে, এবং বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন কারণে অভাবনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তার সম্বন্ধেও আগ্রহ নেই গণপতিবাবুর।

খুব সাবধানে পরিস্থিতি বিবেচনা করেই যেন গণপতিবাবু বললেন, "ওই লেভেলে আমি এখন যেতেই চাই না। নিচুমহলের কাউকে একবার পাকড়াও করতে হবে।"

মদনার বন্ধু কালুর কথা মনে পড়ে গেল। থাকারে ম্যানসনের বিজনেস থেকে তাড়িত হয়ে কালু জাবনালি ম্যানসনেই কী একটা চাকরি নিয়েছে শুনেছিলাম।

একটু খোঁজ করতেই কালুকে পাকড়াও করা গেল। কালু আমাকে দেখেই দুঃখ করতে লাগলো। "পেটের দায়ে এখানে সাব মুইপারি করছি। খাটুনি খেটে-খেটে হাতে ঘা হয়ে গেল স্যার—কোনোরকমে পেটটা চলে যায়, কিন্তু জামাকাপড়ের খরচও ওঠে না।

দাদ, একজিমার মত চুলকানি,
পাঁচড়ার ক্ষত এবং
ব্রণ সারানোর জন্যে

ব্যবহার করুন
নিক্সোডার্ম

এই মলম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈরী
যা ত্বকের গভীরে প্রবেশ ক'রে
সংক্রামক রোগজীবাণু বিনাশ করে—
আপনার ত্বকের স্বাভাবিক
স্বাস্থ্য ফিরিয়ে এনে
ত্বককে সজীব করে তোলে।

...ূন বই

...পন্যাস

...র নারী। সন্তোষকুমার ঘোষ। ...জ পাবলিশিং প্রাঃ লিঃ, ১৩ ...ম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩। ... টাকা

...রীর জঙ্গলে। বুদ্ধদেব গুহ। ...জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম ...র্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩। আট ...

...নেই জ্যোৎস্না। মোহন ঘোষ। ...র পুস্তকালয় ১৩/১ ...ম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি- ... ছয় টাকা

...মনের রথের ঘোড়া। অমরেন্দ্র ... আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ... বেনিয়াটোলা লেন, কলিঃ- ...দশ টাকা

...। বিমল কর। আনন্দ ...লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ ...য়াটোলা লেন, কলি-৯। দশ ...

...ধ

...পার রবীন্দ্রনাথ। শংখ ... দেজ পাবলিশিং ১৩, ... চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩। ...টাকা

...শেষ কোথায়। আবু সয়ীদ ...র। দেজ পাবলিশিং ১৩ ... চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩। ...টাকা।

...শিকের : নিশিথ ও নির্বাণ। ...ন দাশগুপ্ত। আনন্দ ...শার্স প্রাঃ লিঃ ৪৫ ...টোলা লেন, কলিঃ-৯। ...কা।

...একাদশী। বরুণ সেনগুপ্ত। ... পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ ...টোলা লেন, কলি-৯। ...কা (শোভন) এবং পাঁচ ...সংস্করণ)।

... রাজনীতি। বরুণ সেন-... আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ ...৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, ... আট টাকা

...

...াধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ... পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম ... স্ট্রীট, কলি-৭৩। বারো ...

... বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। ...পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ৪৫ ...টোলা লেন, কলি-৯। পাঁচ ...

উত্তরে থাকো মৌন। বিষ্ণু দে। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিঃ-৯। পাঁচ টাকা।

কবিতা সংগ্রহ। অমিয় চক্রবর্তী। দেজ পাবলিশিং। ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩। ষোল টাকা

অ থেকে বিসর্গ। ব্রজ কিশোর দত্ত। নাথ ব্রাদার্স, অমর লাইব্রেরী, ইণ্ডিয়ান বুক মার্ট। সাত টাকা

শিশু সাহিত্য

হর্ষবর্ধনের নানান কান্ড। শিব-রাম চক্রবর্তী। শরৎ পাবলিশিং হাউস, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩। পাঁচ টাকা।

অদ্বিতীয় শিব্রাম। শিবরাম চক্রবর্তী। পত্রলেখা ১—১৯, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-৭। ছয় টাকা

অনুবাদ

এক বসন্ত (কোরিয়ার কবিতা)। উত্থানপদ বিজলী অনূদিত। শৈব্যা পুস্তকালয় ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২।

ক্রীতদাস। এরিক কমার। ভাষান্তর: দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবেশক নাথ ব্রাদার্স ৯ শ্যামা-চরণ দে স্ট্রীট কলি-৭৩। দশ টাকা

বিবিধ

হিন্দুদের দেবদেবী (সচিত্র)। অধ্যাপক হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য। ফার্মা কে এল এম কলি-১২। ১৭·০০

(পশ্চিমবঙ্গে) জমি ও ফসল (সচিত্র)। মিহির মুখোপাধ্যায়। ফার্মা কে এল এম, কলি ১২। ছয় টাকা

শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মা কথামৃত। গঙ্গোপাধ্যায় চক্রবর্তী কথিত। দেজ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ-৭৩। দশ টাকা।

জ্যোতি বীক্ষা (মধ্য ভারত পর্ব)। সুবোধকুমার চক্রবর্তী। এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলিঃ-৭৩ আঠার টাকা

চিরঞ্জীব বনৌষধি (দ্বিতীয় খণ্ড) আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন কলি-৯। পঁচিশ টাকা।

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা: শিল্প সংস্কৃতি **বই**

DAVID HARE Bicentenary volume—1975-76. Publisher: David Hare Bicentenary of Birth Celebration Committee 13A Shibdas Bhaduri Street, Calcutta-4. Editor: Rakhal Bhattacharya Price Rs. 30.00.

মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের দ্বিশত-বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত দ্বিশতাব্দী এই স্মারকগ্রন্থটি পড়তে পড়তে মনে হল বাংলা ও বাঙালীর প্রকৃত ইতিহাস লেখার দিন আসন্ন। এই দুরূহ কাজটি করতে গেলে প্রয়োজন কলকাতার আদি-পর্বের নবাবজাগরণের স্বল্পালোকিত ও অনালোকিত অধ্যায়গুলির পুনরুদ্ধার ও বিশ্লেষণ। এবং তৎকালীন চিন্তানায়ক-কর্মনায়কদের প্রকাশ্য এবং নেপথ্য-জীবনের পুনরুদ্ধার ও বিশ্লেষণ। এবং জীবনের পুনর্মূল্যায়ন ও পূর্ণমূল্যায়ন। বাঙালী জাতির অবিস্মরণীয় উত্তরণের মধ্যে মহামতি ডেভিড হেয়ার অনন্য পুরুষ। অন্যান্য মিশনারী ও বিদেশী সংস্কর্তার মধ্যে তিনি ভিন্ন গোষ্ঠীর, ভিন্ন কোটির মানুষ। তিনি এদেশের মাটির মানুষের কাছে নেমে এসেছিলেন শুধুমাত্র ভালবাসার টানে। ইংরেজ সভ্যতার সম্রাজ্য বিস্তারের তিন হাতিয়ারের—বাইবেল, বেয়নেট ও ব্রান্ডীর—একটিও ছিল না তাঁর হাতে। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে তিনি কায়মনোবাক্যে অর্থ ও সময় উৎসর্গ করেছেন এই দেশের সেবায়, সমস্ত রকমের অশিক্ষা, অজ্ঞানতা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে। এই দেশেই যেন হয়েছিল তাঁর পুনর্জন্ম, এ-দেশেই মৃত্যু। ১৮০১ সালে ২৬ বছরের যে যুবকটি কলকাতা বন্দরে নেমেছিলেন ঘড়ির ব্যবসা জমাতে, সব ছেড়ে কর্মযোগী সন্ন্যাসীর মত তিনি হয়ে উঠলেন মানবনির্মাতাদের একজন। উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত না হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রই তাঁর সাধন সাফল্যের উজ্জ্বল কেন্দ্র হয়ে থাকল ভাবতে আশ্চর্য লাগে। রাধাকান্তদের ও রামমোহনের অভিভাবক হয়ে, ভাব-বিপ্লবী ডিরোজিওর সমচেতা ডেভিড হেয়ার বাঙালী সমাজের সঙ্গে সেতুবন্ধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন তাঁর নিশ্ছিদ্র কর্মবহুল জীবন দিয়ে। একদিকে স্কুল-সোসাইটি, স্কুলবুক সোসাইটি, অন্যদিকে হিন্দু কলেজ, মেডিকেল কলেজ—এই চতুরঙ্গ সংস্থার সঙ্গে আদি যুগ থেকে জড়িয়ে ছিলেন তিনি। তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে তখন তিনটি স্কুল চলতো। তিনি যেমন ইংরেজী শিক্ষার অন্যতম প্রেরণা, তেমনি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানেরও আদি সমর্থক। অবৈতনিক শিক্ষাদানের সফল রূপকার এই ভিনদেশী মানুষটিই প্রথম বাঙালী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। প্রচুর প্রশংসা এবং প্রচুর নিন্দা দুইই তাঁর ভাগ্যে জুটেছে। খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী সমাজের কবরখানায় তাঁর মরদেহ ঠাঁই না পেলেও নৈতিক-প্রেমিক, নিরীশ্বরবাদী এই মানুষটির মৃত্যুর পরে কলকাতা শহর শোকে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। তাঁর শবযাত্রায় মিছিলে অন্তত পাঁচ হাজার মানুষের সম্মিলন সেদিনের ইতিহাসে নজির-হীন হয়ে আছে। তাঁর অগণিত কৃতী ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে বাংলাদেশের উজ্জ্বলতম রত্নে পরিণত হয়েছিলেন, যেমন কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, শ্যামাচরণ মিত্র, রামনাথ শিকদার, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মহেন্দ্রলাল সরকার, রাজনারায়ণ বসু, মদনমোহন বসু, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, তারকনাথ ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ।

এই স্মারক গ্রন্থটিতে ইংরাজী বাংলা মিলিয়ে যথাক্রমে সতেরটি এবং পনেরটি প্রবন্ধ আছে, আছে কয়েকটি নির্বাচিত কবিতা এবং উনিশ পৃষ্ঠা আর্টপেপারে

ছাপা ছবি। দুই তারপর ডেভিড হেয়ারের একটি রঙীন পোর্ট্রেট চার্লস পোটের আঁকা, আকর্ষণ বাড়িয়েছে। কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন আচার্য সুনীতিকুমার, বিমলপ্রসাদ মজুমদার, অমলেন্দু দে, হীরালাল চক্রবর্তী, গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, অমর দত্ত, শ্রীপান্থ, অরুণকুমার সেন প্রমুখ। গ্রন্থটি মহামতি হেয়ারের জীবন ও পরিপার্শ্ব অনেকখানি আলোকিত করেছে। দুঃখের বিষয় ডেভিড হেয়ারের জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে আমাদের অবলম্বন এখনও প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা জীবনী গ্রন্থটিই। পরিষদের কাছে আমাদের নিবেদন আলোচ্য মনীষীর এক-খানা পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য জীবনী প্রকাশে তাঁরা এবার উদ্যোগী হন।

আনন্দ বাগচী

Social Ideas and Social Change in Bengal 1818-1835. by A. F. Salahuddin Ahmed. Raddhi. Price Rs 60.

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাস এ গ্রন্থের লক্ষ্য। আমরা জানি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন নিরঙ্কুশ ছিল। কিন্তু কোম্পানির নীতিনির্ধারণ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দ্বারা পরিচালিত হত। পার্লামেন্টের প্রভাব যে গুরুতর ছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কোনো কোনো গভর্নর জেনারেল তাঁদের সংস্কার প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের

অনুকূলেও পেয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত আমেদ সে কথা বলেছেন। বাংলার রেনেসাঁসের আন্দোলনে মুসলমান সমাজের ইংরেজ শাসনের প্রতি অসহ-যোগিতার কারণ বিজিত শক্তির বিজয়ী শক্তির প্রতি ঘৃণার মনোভাব। ওয়াহাবি আন্দোলনকেও প্রগতিশীল আন্দোলন বলা দুরূহ। এ বিষয়টিও এ গ্রন্থে গুরুত্ব পেয়েছে। অপর দিকে হিন্দুসমাজ পশ্চিমী সংস্কৃতি'কে দূরে সরিয়ে না রেখে তার সঙ্গে সহ-যোগিতাই করেছে। ফ্রি ট্রেডের সমর্থক ইংরেজ ও হিন্দুসমাজ একমত হয়ে বাণিজ্যপ্রসার চেয়েছিল। রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর ইত্যাদি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অবসান চেয়েছিলেন।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ-বর্জনের প্রশ্নে হিন্দুসমাজ ত্রিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এক দল রক্ষণশীল, দ্বিতীয় দল সংস্কারপন্থী, তৃতীয় দল বিপ্লবপন্থী। প্রথম দলের নেতৃত্ব করেন রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, দ্বিতীয় দলের রামমোহন, তৃতীয় দলের ডিরোজিও। ধর্মসভা, ব্রহ্মসভা এবং অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন যথাক্রমে তিন দলের মুখপাত্র। রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কর্মচিন্তার বিস্তৃত পরিচয় এ গ্রন্থে পাই। এক দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার আগ্রহ, অন্য দিকে হিন্দু রীতিনীতি রক্ষণে কঠোর মনোভাব রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের মধ্যে দেখা যায়। প্রসঙ্গত হিন্দু কলেজ সম্বন্ধে একটি অজ্ঞাতপূর্ব দলিল আবিষ্কার করে শ্রীযুক্ত আমেদ প্রমাণ করেছেন যে, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা একা ডেভিড হেয়ার নন। এডোয়ার্ড হাইড ইস্টের উদ্যোগে সেকালের শিক্ষিত বাঙালী এ কলেজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। যে হিন্দু কলেজের পরিচালকবর্গের মধ্যে রক্ষণশীল হিন্দুরাই ছিলেন প্রধান সে হিন্দু কলেজেরই শিক্ষক ছাত্র ডিরোজিওর বিপ্লব পন্থায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। এ বিষয়টি এ গ্রন্থে তথ্যযোগে বিবৃত। রামমোহনের কৃতিত্বের দিকটি এ গ্রন্থে তেমন গুরুত্ব পায়নি। লেখক তিন পন্থার আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, শেষ পর্যন্ত রক্ষণশীল মনোভাবই জয়ী হয়।

শ্রীযুক্ত আমেদ সংবাদপত্রের উদ্ভব ও সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশেষে যথেষ্ট গুরু স্বীকার করেছেন। তিনি ইংরেজী সংবাদপত্র এবং ইংরেজ সম্পাদকদের নির্ভয় সংগ্রামের কথা সবিস্তারে বলেছেন। সিল্ক বাকিংহাম প্রমুখ সম্পাদকদের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার যথেষ্ট নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রধানত তাঁদের উদ্যোগেই মেটকাফের সময়ে বাধাহীন প্রকাশের ব্যাপারে সংবাদপত্র স্বাধীন হল। বাংলা সংবাদপত্রও এ ব্যাপারে উপকৃত হয়েছিল। বেন্থামের যুক্তিচিন্তা যে বাংলার সমাজচিন্তায় বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল সে প্রসঙ্গও স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে। প্রকৃতপক্ষে, সংবাদপত্রই এ-দেশে জনমত গঠনে সহায়তা করেছিল এই সময়ে। নানা বিরুদ্ধ চিন্তার সঙ্গে সংবাদপত্রের মাধ্যমেই জনসাধারণ পরিচিত হয়েছিল। এ-দেশের শিক্ষা-বিস্তারে, অর্থনৈতিক পরিবর্তনে, ধর্মসংস্কারে সরকারী মনোভাবের আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার চিত্রটি শ্রীযুক্ত আমেদ সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট করেছেন। বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রচেষ্টা কিভাবে ব্যর্থ হল তার করুণ অথচ বাস্তব চিত্র আমরা এখানে পাই। শিক্ষাবিস্তারে ইংরেজ-দের মধ্যেই নানা মত দেখা যায়। মেকলে, বেন্টিঙ্ক ইত্যাদির উদ্যোগ সত্ত্বেও হিন্দুসমাজ রক্ষণশীল শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেছিল। বলা বাহুল্য, লেখকের সঙ্গে সকলে এ ব্যাপারে একমত হবেন না। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু-সমাজের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ধরনের। এরকম সরল সিদ্ধান্ত সমীচীন বলে মনে হয় না।

ভূমিকায় লেখক বলেছেন, এ গ্রন্থে তিনি নূতন তথ্য পরিবেশন করেননি। কেবল তাঁর আলোচ্য সময়ে বাংলার সমাজে যে তীব্র আলোড়ন দেখা দিয়েছিল তাকে অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছেন। বহু গবেষকের এই সম্বন্ধে নানা বিশ্লেষণ ও আলোচনা থাকলেও শ্রীযুক্ত আমেদের গ্রন্থটি সুলিখিত, সুবিন্যস্ত এবং ইতিহাসসম্মত।

বিজিতকুমার দত্ত

আলোচনা শিল্প সংস্কৃতি

চিত্রকলা

অ্যাকাডেমি-প্রদর্শনী (১)

অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এ সদ্য-প্রাপ্ত প্রদর্শনী দেখতে দেখতে আমার কয়েকটি কথা মনে হলো। একশো কয়েকটি প্রদর্শিত ছবি ও ভাস্কর্যের মধ্যে (তুলনামূলক ভাবে, ভাস্কর্যের সংখ্যা খুবই কম) অধিকাংশ কাজই খুব কাঁচা, এবং অপরিণত। শিল্পীরা যদি তাঁদের প্রাথমিক শিক্ষানবিশীর কিছু নমুনা এখানে টাঙিয়ে থাকেন, তাহলে আমার কিছু বলার নেই, বরং সেক্ষেত্রে তাঁদের উৎসাহ দেওয়াই শিল্পসমালোচকদের কর্তব্য। কিন্তু সমস্যা হলো এই যে প্রদর্শনীটি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-দের পক্ষ থেকে করা হয়েছে, এবং সেক্ষেত্রে সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী অন্য রকম হতে বাধ্য। প্রদর্শনীর উদ্বোধনের দিন অনেক বিদেশীরা আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। তাঁরা কি এই প্রদর্শনী দেখে পশ্চিমবঙ্গের চিত্র-কলা সম্পর্কে কোনো সঠিক ধারণা করতে পারবেন? যেভাবে চিত্রকলা ও ভাস্কর্য পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতবর্ষে বিবর্তিত হয়ে চলেছে, তার কোনো ইঙ্গিত বা প্রতিফলন এই প্রদর্শনীতে আছে কি? যে শহরে গণেশ পাইন, বিকাশ ভট্টাচার্য, সুনীল দাস, রবীন মণ্ডল, বিজন চৌধুরী প্রমুখ শিল্পীরা ছবি এঁকে চলেছেন সেই শহরেই এমন একটি অ্যাকাডেমি চিত্রপ্রদর্শনী সম্ভব হয় কি করে? আমি যে শিল্পীদের নাম করলাম (এবং এঁদের সঙ্গে আরো অনেকের নাম করা যেতে পারে), তাঁদের ছবি এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত নেই কেন? এটা কি শিল্পীদের অসহযোগিতা? না, অ্যাকাডেমির কর্তৃপক্ষের ত্রুটি? এর সঠিক উত্তর আমি জানি না।

প্রদর্শনীতে অ্যাকাডেমি ...

এবং রঙোত্তীর্ণ ছবি ...
এবং সেজন্য আকাদেমী ...
আর্টস আমাদের ধন্যবাদার্হ ...
আমার ভালো লেগেছে, ...
পরিচিত শিল্পী, এবং ...
থাকিয়াম। ইন্দু দুগারের ...
আঁকা "এ তিন সিস্টার্স" ...
হলেও আকর্ষণীয়, এবং ...
দেবের বিমূর্তায়ন, উজ্জ্বল ...
ত্রিমাত্রিক জগতে আঁকা ...
ছবি। রামানন্দ বন্দ্যো-...
পাধ্যায়ের, করোজা ছবি ...
বাংলা চিত্রকলায় বিশেষ ...
করেছে। এই প্রদর্শনীর ...
ছোটো "গল্প" ছবিটি (...
কাচের ওপরে রঙ ...
আমার ভালো লেগেছে। ...
লাহিড়ীর "হিপিজ" ছবিতে ...
জীবনযাত্রার একটি অন্তর্চিত্র ...
ধরা পড়েছে, কিন্তু ছবিটি ...
বিন্যাসের পর্যাপ্ত সীমিত ...
ছবির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ...
দাশগুপ্ত খুবই সম্ভাবনাময় ...
এবং তাঁর "দ লাস্ট আউট ...
"নাউ" ছি ইয়ু টায়ার্ড" ...
লেখার ছবিটি, যেখানে একটি ...
ক্রান্তভাবে আঁকা-আঁকাদের ...
... এই প্রদর্শনীর ...
... টি ছবি। কার্তিক ...
... "ইট-ফিনিট" এবং ...
... —সবল অনায়াস ...
... মুগ্ধ করে।

... দত্ত অনেকদিন ...
... কিন্তু এই প্রদর্শনীর ...
... মূর্তি দেখে মনে হলো ...
... চিত্রশৈলী বিশেষভাবে ...
... হয়তো ছবির ...
... পাল্টেছে, এই পর্যন্ত। ...
অর্ধ-বিমূর্ত "শিপ্স ইন ...
এ প্রসেস অব ট্রান্স...
রসোত্তীর্ণ হয়নি। এ ছাড়া ...
ছবিই গতানুগতিকভাবে ...
গতানুগতিকভাবে আঁকা হলো ...
বর্তায় না, যদি তাতে শিল্পীর ...
উপলব্ধি উপস্থিত থাকে ...
আঙ্গিকও সমান গতিশীলভাবে ...
হয়। চিরদিনে চৌধুরীর ...
অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টো...
ছবিটি দেখে ভালো লাগলো।

প্রদর্শনীতে যে কয়েকটি ...
নমুনা আছে, তার ...
অনুল্লেখযোগ্য। সূত্রত ...
ছোটো থাকের পরিশ্রমে ...
অনেও হতে পারে। ...
সম্পাদন করেছেন, কিন্তু ...
পট্টনায়কের নাম তালিকায় ...
পাওয়া না।

প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন ...
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ ...
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, এবং সভাপতি ...
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ...
ঘোষ।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

জার্মান গ্রাফিকস

বিদেশ থেকে একাধিক ছবির (Graphics) প্রদর্শনী এ বছরে। আয়োজন করে ... দেশের প্রচার দপ্তর। সাংস্কৃতিক ... দেশের শ্রেষ্ঠ ছবি বা মূর্তি ... হয়

...ঠে তার ফলে।
...ই জনারও আরো প্রকট হয়ে ওঠে
...পরবর্তী অংশে যেখানে দু'জনের
...জার খেলায় পাত্র-পাত্রী পরি-
... হয়েছে লেখক-চিত্রনাট্যকারের
...—প্রেম বা ব্যক্তির জাগিয়ে না।

... ধরে যে প্রেমিক নায়িকার
..., সে-ই নিজেদের দেখায়
... বোনকে বিয়ে করতে রাজি
... কবিতারই অনুমোদনে।
...াকর মনে হয় যখন কবিতার
...কৃষ্ট হয়ে তার অফিসের
...ডিরেকটর তাকে বিয়ে করতে
...বিচিত্র পরিস্থিতিতে তারই
...নক স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছে।
... কবিতারই অনুরোধে।
...—অর্থাৎ পাত্রপাত্রী অদল-
বদলের ব্যাপারে—কবিতা হ্যাট-ট্রিক করেছে এক আয়ুবে দু'জনের সঙ্গে জীবন সম্পর্কে উদ্‌ভ্রান্ত তার বাল্যবান্ধবীর বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে দিয়ে।

দুলেন্ড কার্সিকান এই ছবিতে কিছু কিছু সিরিয়াস মুহূর্ত তৈরি করবার চেষ্টা করা হয়েছে লালসা-তাড়িত নরনারীর আচরণকে কেন্দ্র করে, একই দল-নায়কের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে মা ও মেয়ের আত্মহত্যার চেষ্টার মধ্য দিয়ে। কিন্তু এগুলি মনে দাগ কাটে না যথাযথ পারিপার্শ্বিক রচনার অক্ষমতায়।

নাম ভূমিকায় মঞ্জা সিংহের অভিনয় বেশ স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ। তাঁর প্রণয়ী রূপে রঞ্জিত মল্লিক যথাযথ। দাপটের সঙ্গে অভিনয় করবার সুযোগ পেয়েছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় প্রতাপ দাদার ভূমিকায় এবং প্রেমা নারায়ণ নায়িকার বান্ধবীর চরিত্রে। দু'জনেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন।

ভূমিকালিপিতে বহু শিল্পীর সমাবেশ সত্ত্বেও অধিকাংশের অভিনয়ই মামুলি, বৈশিষ্ট্যবর্জিত। দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পী কামাল হাসান কৌতুকাভিনেতা হিসেবে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে তাঁর বাংলা উচ্চারণ বিদেশীর মতই।

কে এ রেজার ফটোগ্রাফি এবং সলিল চৌধুরীর লেখা গান ও সুর ছবিটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। বাংলাদের ধাঁচে হালকা সুরে ও দ্রুত তালে গাওয়া গানগুলি বিশেষভাবে উপভোগ্য।

মনুজেন্দু ভঞ্জ

প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

নীরদ মজুমদার (১৯১৬—)

নীরদ মজুমদার ভারতীয় চিন্তাভাবনা এবং তেলরঙের আশ্চর্য সমন্বয় সার্থকভাবে করেন। 'ক্যালকাটা গ্রুপের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি। অবনীন্দ্রনাথ থেকে যামিনী রায় পর্যন্ত আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার গতিপ্রকৃতি তাঁদের দলের কাউকেই প্রভাবিত করতে পারেনি। যুদ্ধ মন্বন্তরের তাণ্ডবের মধ্যে আন্তর্জাতিক এবং নাগরিক চেতনা তাঁদের সবাইকে আক্রমণ করেছিল। সেই সময় থেকে তাঁর ছবি পটের ওপর ভেসে উঠে যথার্থ শিল্পাতিক হলো। এক ধরনের অস্থিরতা বিক্ষোভ তাঁদের চঞ্চল করেছিল।

মাত্র বার-তেরো বছর বয়সে কুটিবলার রেখা: সুধীর চট্টোপাধ্যায়ের শিক্ষালয় থেকে নীরদ মজুমদারকে অবনীন্দ্রনাথের ইণ্ডিয়ান স্কুল অব ওরিয়েন্টাল আর্টে তাঁর পিতা ভর্তি করে দেন ১৯২৯ সালে। ১৯৩৫ সালে বেরিয়ে আসেন। সম্মান ফার্স্ট স্বর্ণপদক লাভ করেন। যুদ্ধের গোড়ার দিকে বন্ধুদের সঙ্গে 'ক্যালকাটা গ্রুপের' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৬-এ ফরাসী সরকারের বৃত্তি পেয়ে শিল্প শিক্ষার্থী হয়ে ফরাসী দেশে যান। কিছুকাল একোল দ্য লুভারে চিত্রশিক্ষা করেন। ১৯৫১-৫৫ লণ্ডনে ছিলেন। ১৯৫৪ আবার ফরাসী দেশে আসেন। ১৯৫৮ সালে দেশে ফেরেন। ললিতকলার অবসর শিল্পীদের একজন। এ বছরে দু মাসের জন্যে ফরাসী দেশ ভ্রমণ করে এসেছেন। রাথ ব্রাম্বুসীর স্নেহধন্য তিনি। ত্রাঁ কাসু থেকে মার্টার পর্যন্ত বিদেশী শিল্পকলা সমালোচকদের দেখেছেন কাছ থেকে। দেশে বিদেশে প্রদর্শনী করেছেন বহু।

তাঁর ছবিতে বিশ্বের সব দেশের শিল্পকলার প্রধান ধারাকে সংগ্রহ এবং সমন্বয়ের প্রচেষ্টা প্রাধান্য পেয়েছে। 'অন্যের গতিশীল ভাষা' পর্যায়ের ছবিতে ফরাসী চিত্ররীতিকে সজ্ঞানে উত্তীর্ণ হয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক জগতের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন তিনি। বেহুলা লখীন্দর পর্যায় থেকে ক্রমে তন্ত্রের নির্দিষ্ট রীতির আলোয় এক জগৎ আবিষ্কার করেছেন। হিমালয়, গঙ্গা, জন্ম জন্মান্তর থেকে বৈতরণী পর্যন্ত মানুষের জীবন, গ্রহ, তারা এবং বিশ্বভুবনের যাত্রার কল্পনা করেছেন। সমস্ত ভারতীয় ধ্যান-ধারণা ছবির ভাষায় অনুশীলনের বিরাট প্রচেষ্টা। স্রোতধারা, হাইকোর্টের জজ, উকীল থেকে দুর্গা বা চণ্ডী—এই নাটের কুশীলব কখনো জাগতিক কখনো মহাজাগতিক। বর্ণ ব্যবহার, রূপারোপ, কাঠামো, নির্মাণ বিরাট ব্যাপক পরিবর্তন আনলেন। তাঁর হাতেই পরবর্তী প্রজন্মের নূতন শ্রেষ্ঠ চিত্রকর প্রকাশ কর্মকার এবং বিজন চৌধুরী প্রশিক্ষিত হলেন নবতর চিত্রভাবনায়। রাতারাতি বদলাননি তিনি। বড় নদীর মতো তাঁর কাজে আছে ধারাবাহিকতার বৈভব। ঐতিহ্য এবং আধুনিকতায় সুষ্ঠু সমন্বয় হয়েছে। জনজীবনে প্রোথিত লৌকিক

সৌন্দর্যবোধ তাঁকে তান্ত্রিক ছবি আঁকিয়েছে। কিন্তু অন্য তান্ত্রিক আঁকিয়েদের বিকার তাঁকে স্পর্শ করেনি।

তিনটে প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন তিনি উক্ত ভালবাসার—তাঁর স্ত্রী, মেয়ে অর্পিতা এবং ছেলে চিত্রভানুর। ইউরোপীয় প্রথাগত বাস্তব কাজ নয়। সৃজনশীল প্রতিকৃতি। অলৌকিক উদ্ভাস। 'অর্পিতার' (২৪'×৩০' তেলচিত্র) প্রতিকৃতি হলুদ, সবুজ আর সাদায় আঁকা। ছবিতে আছে কুসুমের কালের কথা। চিরাচরিত নীরদীয় রীতিতে পট-সরোবরের মধ্যস্থলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করেছেন তিনি। আদিম বৃত্ত ক্রমশ বড় হয়ে পাড়ে আঘাত করে কেন্দ্রে ফিরো অর্পিতার মুখে এক নিবি মমতা। বর্ণ এখানে নিজে চেয়ে অধিক সক্রিয়—যাকে বলে 'অতিভায়'। প্রতিটি বস্তু অর্থাৎ even luminair আছে বলে ছবি সব সময় দি

তাঁর ছবিতে রয়েছে দেশের প্রত্যাবর্তন। ফরাসী কৃত্রিম চেতনায় পীড়িত ম দেশজ বোধের সমকালীন বিশ্বাসী তিনি। ভারতীয় সজ্ঞান কল্পনায় সমাহিত অপচেষ্টা নেই। ছবি এখা সাধনার ধারা সুতরাং আমি সম্মোহিত হই।

VIMAL
A RELIANCE PRODUCT
শাড়ী • ড্রেস মেটিরিয়াল
® is the Registered trademark of Reliance Textile Industries Ltd.

প্রকাশিত হলো
তারাপ্রণব ব্রহ্মচারীর
যক্ষিণী ১২৲
বুদ্ধদেব গুহ'র
লবঙ্গীর জঙ্গলে ৮৲
শচীন ভৌমিক-এর
হাউস ফুল ১২৲
পরিতোষ মজুমদার-এর
কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ১০৲
দে'জ পাবলিশিং C/o দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩,
ফোন : ৩৪ ৩০৩৫

চিঠিপত্র

স্বপ্নভঙ্গ

১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ এর দেশে শ্রীসুবোধরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয়ের আমার "কর্তকালিপত্র" রচনার "স্বপ্নভঙ্গ" সম্পর্কীয় লেখার সম্পর্কে লেখার সম্পর্কে মন্তব্য পড়লুম। হুগলি ও মেদিনীপুরের সদস্যদের কাছে কোথাও থেকে কোনও নির্দেশ আসেনি। হুগলি, মেদিনীপুর অঞ্চলের এম-এল-এ-দের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য ছিল। অবিভক্ত ও বিভক্ত কংগ্রেস পরিষদীয় দলকে প্রভাবিত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার বক্তৃতা সম্পর্কে যে উক্তি করা হয়েছে, তার কোন প্রতিবাদের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তৎকালীন রেকর্ডে সমস্তই জানা যাবে।

এ সম্বন্ধে আর কোন চিঠি বা প্রশ্নের আমার পক্ষ থেকে উত্তর দেবার প্রয়োজন আছে, আমি মনে করি না।

অতুল্য ঘোষ

অচেনা চীন

গত ১৩ আগস্ট, ১৯৭৭-এর সংখ্যায় দেখলাম তিনি চীনের অনেক কিছুকে গ্রহণ করেও সাহিত্যের আলোচনায় থমকে গেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন শুধু বিপ্লবোত্তর চীনই নয়, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও সাহিত্যের মান তো বাড়েই নি বরং কমে গেছে। তিনি লিখেছেন যে, ডাণ্ডা মেরে আর যাই হোক সাহিত্য হয় না। আর চিন্তার স্বাধীনতা প্রভৃতি বুর্জোয়া রাষ্ট্রে অনেক বেশী বলেই সেখানে কালোত্তীর্ণ সাহিত্যের প্রকাশ ঘটেছে। আর লিখেছেন, দেশের কাজ, চরিত্র গঠন আর রাজনীতিই যেখানকার সাহিত্যের প্রেরণা সেখানে classic সাহিত্য কিভাবে রচিত হবে? শ্রীমতী দেবী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের সনাতন অভিযোগের বাইরে শেষ পর্যন্ত যেতে পারলেন না।

প্রশ্নেরা লেখিকা আগের অংশের সংখ্যায় অবশ্য বারবারই লিখেছেন যে, যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও শৃঙ্খলার সাথে সমস্ত দেশের জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছেন দেশকে গড়ার কাজে, যেভাবে দেশের অর্থনীতি, সংস্কৃতি, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি ক্রমশ উন্নতির দিকে যাচ্ছে তা ডাণ্ডা মেরে হয় না। তার জন্য দরকার জনগণের দেশাত্মবোধের প্রেরণা পরের জন্য নিজের স্বার্থত্যাগ করার আদর্শের চালিকাশক্তি যা তাঁরা পেয়েছেন মাও-এর কাছে, তাদের পার্টির কাছে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কাছে। অর্থাৎ তাঁর কথায় সেখানেই রয়েছে প্রকৃত স্বাধীনতা, মানুষের প্রকৃত বিকাশের সুযোগ ও পরিবেশ। তিনি আরও লিখেছেন চীনের মানুষ সার্থশিল্পী। অথচ সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি লিখেছেন যে, সেখানে প্রকৃত সাহিত্যের খুবই অভাব। তিনি লিখেছেন অন্যান্য ক্ষেত্রে মাও সে-তুং

তৃতীয় প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে
২০টি সুনির্বাচিত বই প্রকাশিত হল

শরৎচন্দ্রের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য জীবনী। বিষ্ণু প্রভাকরের 'আওয়ারা মসীহা'র সার্থক অনুবাদ

ছন্নছাড়া মহাপ্রাণ ১৮·০০

অনুবাদ : দেবলীনা বন্দ্যোপাধ্যায় কেজরিওয়াল

কাদম্বরী দেবী ১০·০০

সুব্রত রুদ্র

রবীন্দ্রনাথের জীবনে কাদম্বরী দেবী কি ও কতোখানি তা সুবিদিত। কিন্তু এই কাদম্বরী দেবীকে নিয়ে তাঁর আত্মহত্যার পর থেকে আজো চলেছে অনেক জল্পনা-কল্পনা-রটনা। কাদম্বরী দেবীর জীবন ও মৃত্যুরহস্য নিয়ে একমাত্র এই গ্রন্থ।

ঋত্বিক ২০·০০

সুরমা ঘটক

ঋত্বিক ঘটকের অপ্রকাশিত রচনা, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র সম্বলিত এই গ্রন্থের লেখিকা ঋত্বিকের সুখ দুঃখের একুশ বছরের সঙ্গী তাঁর স্ত্রী সুরমা ঘটক।

যামিনী রায় ১৫·০০

বিষ্ণু দে

বাংলা বানান ১০·০০

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ

ঈশ্বর-কোটির রঙ্গকৌতুক ১০·০০

কমলকুমার মজুমদার

চৈতন্য মহাপ্রভু, রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শিবনাথ শাস্ত্রী থেকে অসংখ্য মহাপুরুষদের রঙ্গকৌতুকের গল্পের সংকলন।

নিঃশব্দের তর্জনী ৭·০০

শঙ্খ ঘোষ

যাত্রাগানের ইতিবৃত্ত

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১০·০০

বিমল করের শ্রেষ্ঠ গল্প

বিমল কর ১৮·০০

ধুলো মাটির স্বর্গ ১২·০০

রতন সান্যালের শক্তিশালী উপন্যাস

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের

করে দেখ ১ম ও ২য় খণ্ড, প্রতিখণ্ড ৫·০০

অরূপরতন ভট্টাচার্যের

আমরা কেন আমাদের মতো দেখতে ৬·০০

বাংলায় জেনেটিকসের উপর প্রথম বই।

আশা
এই উপলক্ষে জোড়া সুযোগঃ বিশেষ কমিশন এবং উপহার

এই মৈত্রী! এই মনান্তর! ১০·০০

অরুণ সেন

চিঠিপত্রে সুধীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দের বন্ধুত্ব ও মনান্তরের ইতিহাস।

ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অন্যান্য প্রবন্ধ ১২·০০

ডঃ নবনীতা দেবসেন

ডোডো-তাতাইয়ের জন্যে ৫·০০ তারাপদ রায়

এরিখ কেস্টনারের

উড়ো ক্লাসঘর ১০·০০

অনুবাদ : দেবলীনা ঘোষ

টোকোলোশ ৭·০০

রনাল্ড সেগাল

অনুবাদ : সুবীর রায়চৌধুরী

পেটার বিকসেলের গল্প সংগ্রহ ৭·০০

অনুবাদ : মাইকেল কাটনার/মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাঁজ করি আনন্দে ১০·০০

যাদুকর সমীরণ

বাংলায় প্রথম ও একমাত্র অরিগামির বই।

আগামী ১২ থেকে ১৫ অক্টোবর যে কোনও এবং যতখুশী বই কিনুন ২০% কমিশন দেওয়া হবে। এই কদিন সমস্ত ক্রেতাদের মধ্যে যে কোনও একজন ক্রেতাকে আমরা তাঁর পছন্দমত ২৫০ টাকা মূল্যের বই উপহার দেব।
অগ্রিম ছাড়া ডাকে বই পাঠান হয় না।
পুস্তক ব্যবসায়ীদের নির্দিষ্ট কমিশনের উপরেও আকর্ষণীয় অতিরিক্ত কমিশন দেওয়া হবে।

আশা প্রকাশনী

২৪ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা ৯

...পরিচালনায় ভার নিলেও শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি তা করেন নি, যদিও তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে মাও সে-তুং অত্যন্ত উঁচুদরের কবি। একজন বড় কবি কি সঠিক সাহিত্য গড়ে তোলার কাজকে অবহেলা করতে পারেন?

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর এই ধারণা হল কেন? (অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন যে, তিনি বর্তমান চীনা সাহিত্য খুব বেশী পড়েন নি) একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমস্ত সমাজ ব্যবস্থাই একটা নির্দিষ্ট আদর্শ ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পিত ও পরিচালিত। উপযোগিতামূলক সেখানে কোন কাজই হয় না। সমাজবহির্ভূত অলস কল্পনাপ্রবণতা কিম্বা লক্ষ্যের স্বপ্নজাল বোনা সেখানে [illegible]। তাই সেখানে যে সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে তাও সমাজের স্বার্থেই সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের মত দেশের লোকের পক্ষে ঐ সাহিত্যের তাৎপর্য বোঝা খুবই কঠিন। মাও সে-তুং-এর অন্যতম ক্লাসিক রচনা "Talks at the Yenan forum on Literature and Art"

চীনের শিল্প-সাহিত্যের প্রধান প্রেরণা ও গাইড লাইন।

তিনি আরও লিখেছেন

"...all our literature and art are for the masses of the people and in the first place for the workers, peasants and soldiers; they are created for the workers, peasants & soldiers and are for their use"

শিল্প সাহিত্যের মান ও লক্ষ্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

"Works of art which lack artistic quality have no force, however progressive they are politically. Therefore, we oppose both the tendency to produce works of art with a wrong political view point & the tendency towards the 'poster & slogan style' which is correct in political view point but lacking in artistic power"

সমর ঘোষ
কলকাতা-৭

প্রিয়নাথ সেন

'দেশ'-এর ৩ সেপ্টেম্বর সংখ্যার চিঠিপত্র বিভাগে প্রিয়নাথ সেন শিরোনামায় জনৈক শচীন সেন লিখিত একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। ওই চিঠিতে পত্রলেখক ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখছেন কেন আমি আমার ৬ আগস্ট প্রকাশিত "ভারতীর কালবই ও গ্রাহক তালিকা" প্রবন্ধে প্রিয়নাথ সেনের কুড়ি টাকা বেতনে কর্মচারী নিযুক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছি। তাঁর মতে ওই মন্তব্য অযৌক্তিক ও অসত্য।'

এর উত্তরে সবিনয়ে জানাচ্ছি, ওই তথ্য মোটেই আমার স্বকপোল-কল্পিত নয়, আমি তা সংগ্রহ করেছি

অবাঞ্ছিত লোম তুলে ফেলুন—বাঞ্ছিত ক্রীম অ্যান ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার দিয়ে

কামাবেন ? নানা, সে তো পুরুষদেরই সাজে ! একে তো মেয়েদের কোমল চামড়া ব্লেড দিয়ে কেটে-ছড়ে যাওয়ার ভয় বেশী, তার ওপর কামানোর পর গজিয়ে ওঠে শক্ত খোঁচা লোম !

তাহলে ? অবাঞ্ছিত লোম তুলে ফেলার জন্যে ব্যবহার করুন, বাঞ্ছিত ক্রীম—কোমল অ্যান ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার। অ্যান ফ্রেঞ্চ চামড়ার গভীরে গিয়ে কাজ করে, তাই আপনার চামড়া থাকে রেশমী কোমল—কয়েক সপ্তাহ ধরে !

অ্যান ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার লেবুর সুগন্ধে আর ফুলের সুগন্ধে পাওয়া যায়। আপনার পছন্দমত বেছে নিন।

অ্যান ফ্রেঞ্চ* হেয়ার রিমুভার, অবাঞ্ছিত লোম দূর করতে বাঞ্ছিত ক্রীম

176-HR-244 Ben

* Licensed User of TM ; Geoffrey Manners & Co. Ltd

…শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র ভবনে সযত্নে …রক্ষিত ভারতীর ১২৮৭ (১৮৮০) …সনের ক্যাশবই ও হিসাব খাতা থেকে। …ওই ক্যাশবই ও হিসাব খাতায় যে-সব …ব্যবহারের বিবরণ আছে তা নিশ্চয়ই …ভারতী-র সম্পাদকগোষ্ঠী বা পত্রি- …কামণ্ডলীর জ্ঞাতসারেই লেখা। …বৈশাখ থেকে কার্তিক—এই ছ মাস …কুড়ি টাকা হিসাবে প্রিয়নাথ সেনকে …বেতন দেওয়া হয়েছে—তার বিবরণ

…খাতায় পেয়েছি। যে-সব পাতায় …বেতনের হিসাব আছে তার নীচের …কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত …স্বাক্ষর পড়ে এন টি' দেখা যায়—মনে …হিসাব লেখক প্রত্যেকটি হিসাব …জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে দেখিয়ে অনুমোদন …করিয়েছেন। সুতরাং প্রিয়নাথ সেনকে …টাকা বেতন দেওয়ার ব্যাপারে …খাতায় যা লেখা হয়েছে তার …সম্পাদকমণ্ডলীর—যার মধ্যে …ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পাদক), …জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ। এ ক্ষেত্রে আমার কিছু করণীয় নেই। আমি শুধু আমার প্রবন্ধে বিবরণটি উল্লেখ করেছি মাত্র। ওই ক্যাশবইতে যে-ভাবে বেতনের বিবরণ লেখা আছে তার আলোকচিত্র এখানে তুলে দিলাম।

অবশ্য পাঠকরা নিশ্চয়ই ভাববেন না সামান্য বেতনের উল্লেখ (সেকালের হিসাবে কুড়ি টাকা কি খুব সামান্য?) করে আমি প্রিয়নাথ সেনের প্রতি বিন্দুমাত্র অসম্মান প্রদর্শন করতে চেয়েছি। কারণ আমি মনে করি না, কুড়ি টাকা বেতনের কর্মচারী ছিলেন—এ তথ্য প্রকাশ হওয়া মাত্র প্রিয়নাথ সেনের পূর্বখ্যাতি কিছু মাত্র ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটলো কিংবা রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সুহৃদরূপে তিনি যে অমরতা লাভ করেছেন—সেই অমরতা লাভ থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। আমি 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশের নেপথ্যের কথাই আমার প্রবন্ধে বলতে চেয়েছি, প্রসঙ্গক্রমে প্রিয়নাথ-বাবু ও তাঁর বেতনের কথা এসে পড়েছে—তাঁর প্রতি কোনো অশ্রদ্ধা প্রকাশ নিশ্চয়ই আমার উদ্দেশ্য ছিল না।

পত্রলেখক লিখেছেন, এই প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু প্রিয়নাথ সেন নন। তাহলে ইনি কে —এ বিষয়ে পত্রলেখক বা অন্য কেউ যদি আলোকপাত করতে পারেন তাহলে আমি কৃতজ্ঞ হব।

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন

প্রকাশিত হল

জনার্দন ঠাকুরের

সারা ভারতে সাড়া-জাগানো বই 'অল দি প্রাইম মিনিস্টারস মেন'-এর অনুবাদ

ইন্দিরা এণ্ড কোং

দাম ৮·০০

দেশ জুড়ে তখন ইমার্জেন্সির তাণ্ডব চলেছে। বিরোধী নেতারা কারারুদ্ধ, সংবাদপত্রের গলা টিপে ধরা হয়েছে, রাজপথে ছড়িয়ে পড়ে আছে মৌলিক অধিকারগুলির রক্তাক্ত শবদেহ। মঞ্চের উপরে নেমে এসেছে কালো পর্দা, আর সেই পর্দার অন্তরাল থেকে মুহুর্মুহু ভেসে আসছে মদমত্ত স্বৈরাচারী শক্তির জয়ধ্বনি।

সেই দুঃস্বপ্নের স্মৃতি আজও মিলিয়ে যায়নি। কিন্তু পর্দার আড়ালে কি নিদারুণ বীভৎসার খেলা যে সেদিন জমে উঠেছিল, আজও তা অনেকে জানেন না। জানেন না যে, অর্থলোভী মিথ্যাচারী ক্ষমতালোলুপ ও বিবেকবিহীন কিছু মানুষ ষাট কোটি মানুষের ভাগ্য ও এই মহান দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিভাবে ছিনিমিনি খেলেছে। কেউ ভাঁড়, কেউ চাটুকার, কেউ সুযোগসন্ধানী, কেউ ধান্দাবাজ। সকলেই তারা ছোট মাপের লোক, নিতান্ত বামন মাত্র। কিন্তু গণতন্ত্রকে পায়ে মাড়িয়ে, ইমার্জেন্সির হাতিয়ার সম্বল করে সেই বামনরাই সেদিন চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়েছিল। 'ইন্দিরা অ্যান্ড কোং'-এর মধ্যে তাদেরই মুখচ্ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই গ্রন্থ পড়ে জানতে পারছি ভারত-সম্রাজ্ঞী ইন্দিরা ও যুবরাজ সঞ্জয়ের সেই বয়কলজ্ঞ বাহিনীর গোপন চক্রান্তের কথা, গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে যারা সেদিন এক [illegible]

চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

বিমল করের

চিরায়ত প্রেমের উপন্যাস

খড়কুটো

দাম ৭·০০

কৈশোর পত্রপ্রায়, যৌবন সমাগত—এমনই এক মধুর সন্ধিক্ষণে পরিচয় হয়েছিল দুজনের। জীবন-পরিক্রমা-ক্লান্ত অসুস্থ একটি মেয়ে, আর স্বভাবখুশী প্রাণোজ্জ্বল একটি ছেলের। অসুস্থ, অনাদৃত এবং অসুখী মেয়েটিকে দেখে তার প্রতি মায়া, মমতা, সহানুভূতি এবং প্রীতিতে ভরে গিয়েছিল ছেলেটির মন। আর, নিঃসঙ্গ বন্ধুহীন মেয়েটির আত্মীয়ের মতন, বন্ধুর মতন সুন্দর ও নিবিড় লেগেছিল ছেলেটিকে। জন্ম হয়েছিল তৃপ্তি-লজ্জা-আনন্দ-বেদনায় ধরোথরো ফুলের মতন সুন্দর, ফুলের মতনই নিষ্কলুষ একটি প্রেমের। যে প্রেম ফুলের মতনই অকারণে হাসি বিলায়, অকারণেই ঝরে যায়; রেখে যায় শুধু এক বিরাট হৃদয়-ধর্ষী শূন্যতা॥

কয়েকটি গল্পগ্রন্থ

শিবরাম চক্রবর্তীর

ভালোবাসার অনেক নাম

দাম ৬·০০

ঘরণীর বিকল্প

দাম ৩·০০

সুবোধ ঘোষের

ভারত প্রেমকথা

দাম ১৩·০০

সমরেশ বসুর

মানুষ

দাম ৩·০০

প্রকাশিত হল

নীললোহিত-এর

নতুন এবং বিচিত্র উপন্যাস

স্বর্গের খুব কাছে

দাম ৬·০০

শুভ্রা চ্যাটার্জি নামের একটি সামান্য মানুষ একদিন তার ছোট্ট একটুকু সৃষ্টি তার একমাত্র ছোট্ট মেয়েটির হাতখানি ধরে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছিল তার স্বামীকে—হিমালয়ের বিশালতার কোলে যিনি অকস্মাৎই চোখের আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। তিনি কি মৃত? শুভ্রা তা বিশ্বাস করে না। তাই তার এই খোঁজাখুঁজির উন্মত্ততা। পথেই জুটে গিয়েছিল সঙ্গী—নীললোহিত। অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট এবং অনেক বিপদ-বিপর্যয় পার হয়ে, অনেক কান্নার মধ্য দিয়ে শেষে একদিন তার খোঁজাখুঁজির শেষ হয়েছিল—সে তার উত্তর পেয়ে গিয়েছিল। তার সেই চরম প্রশ্নের উত্তর—যা তাকে সব কিছু তুচ্ছ করে টেনে এনেছিল স্বর্গের খুব কাছে, হিমালয়ের কোলে—যেখানে মানুষের কোনও প্রশ্নই উত্তরহীন থাকে না, অবসান হয় সব খোঁজাখুঁজির ব্যস্ততা। কাশ্মীরের অসাধারণ নৈসর্গিক সৌন্দর্যের প্রেক্ষাপটে গুটি কয় মাত্র চরিত্র নিয়ে এক নতুন ধরনের বিচিত্র উপন্যাস নীললোহিতের এই 'স্বর্গের খুব কাছে'॥

এই লেখকের আর একটি উপন্যাস:

সমুদ্র তীরের জলে ৮·০০

চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

রমাপদ চৌধুরীর

দিনদুপুরের রাতদুপুরের উপন্যাস

পিকনিক

দাম ৬·০০

তিনটি তরুণ আর তিনটি তরুণী। সকালের ফুলের মতন তাজা, ঝকঝকে, প্রাণ-প্রাচুর্যে উজ্জ্বল। দূরে নিরালা এক সবুজ ভূমিখণ্ডে ওরা গিয়েছিল পিকনিক করতে।

এই যাওয়া

আসলে হয়তো প্রেমেই যেতে চাওয়া। কিন্তু সেখানেও কি শেষ অবধি পৌঁছতে পারা যায়? —যায় না। ক্ষণিক স্ফূর্তির আমলে সারা জীবনের মূর্তিটিকে গড়ে তোলা যায় না বলেই হয়তো॥

কয়েকটি নাটক

বুদ্ধদেব বসুর

সংক্রান্তি প্রায়শ্চিত্ত ইকাকু সেন্নিন

দাম ৪·০০

অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ

দাম ৫·০০

পুনর্মিলন

দাম ৪·০০

কালসন্ধ্যা

দাম ৩·০০

কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ

দাম ৬·০০

তপস্বী ও তরঙ্গিণী

দাম ৩·০০

সত্যজিৎ রায়ের

ছোটদের একটি আশ্চর্য ...

ফটিকচাঁদ

দাম ...

ছোট্ট একটি বছর বারোর ছেলে। জঙ্গলের মধ্যে ... ধারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ... সারা দেহে তার জখমের ... একসময়ে ছেলেটির জ্ঞান ফিরল। কিন্তু তখন ... কিছুই মনে করতে পারছে না। কি তার নাম, কে ... বাবা কোথায় তাদের ... এখানে এমনভাবে পড়েই ... কেন, কি করে এল ... কি হয়েছিল ... লোকে জিজ্ঞেস করে ... নাম বলতে পারে না ... সে নিজেই নিজের একটা নাম বানিয়ে নিল ফটিকচাঁদ পাল। 'ফটিকচাঁদ' সেই স্মৃতিভ্রষ্ট বালকটির স্মৃতি হারানো এবং স্মৃতি ফিরে পাওয়ার এক দারুণ রোমাঞ্চকর গল্প। যদিও এটি গোয়েন্দা ফেলুদার বোধবুদ্ধি-ধাঁধানো কোনও রহস্য অ্যাডভেঞ্চারের গল্প কিংবা প্রোফেসর শঙ্কুর চমকে-দেওয়া কল্পবিজ্ঞান কাহিনী নয়, তবু যে কোন সাধারণ বিষয় নিয়ে লেখা গল্পই যে সত্যজিৎ রায়ের হাতে কতখানি অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে, 'ফটিকচাঁদ' তা এক উজ্জ্বলতম উদাহরণ।

এই লেখকের অন্যান্য বই:

ফেলুদা এণ্ড কোং ৮·০০
জয় বাবা ফেলুনাথ ...
আরো এক ডজন ১০·০০
রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৩·০০
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৩·০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৩·০০
বাক্সরহস্য ৫·০০ সোনার কেল্লা ৬·০০ গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫·০০ প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৩·০০
এক ডজন গপ্পো ১০·০০

দেশ ৪৪ বর্ষ ৫১ সংখ্যা
২৯ আশ্বিন ১৩৮৪

সূচীপত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

সন্তোষকুমার ঘোষের প্রবন্ধ
সৌদিন চাঁদেও বটে
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর রচনা
দেবেশ
জ্যোতির্ময় দাশগুপ্তের রচনা
নীরঞ্জন স্মরণে
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প
বিজ্ঞ পুরুষ
সমর বসুর রচনা
সেকাল একালের দুর্গোৎসব

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে
[illegible] রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং
[illegible] প্রাইভেট লিমিটেড [illegible]
[illegible] রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
মুদ্রিত।
[illegible] এক টাকা।
[illegible] মাশুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা

নৃত্যকলার মহান সাধক

সম্পাদকীয়

ভারতের অনেক নটরাজমূর্তি অপসারিত হয়ে বিদেশে, বিশেষ করে ইওরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাদুঘরে, ব্যক্তিগত সংগ্রহশালাতে এবং আর্টের শৌখিন সমঝদারের ড্রইংরুমে স্থান পেয়েছে। কোন সন্দেহ নেই নটরাজমূর্তি ভারতীয় ভাস্কর্যের একটি বিস্ময়, এপস্টাইন যার প্রতি তাঁর বিস্ময়াপন্ন শ্রদ্ধা মুক্তকণ্ঠে উচ্চারিত করেছেন। কিন্তু ভারতীয় নটরাজমূর্তির সম্পর্কে বিদেশীয় আগ্রহের মধ্যে যে উপলব্ধির সঞ্চার ছিল, সেটা বিশেষভাবে নটরাজমূর্তির রূপকল্পের বিচিত্রতা, অর্থাৎ চমৎকার এক ভাস্কর্যের নিদর্শন হিসাবে নটরাজমূর্তি বিদেশের সমালোচক এবং গুণিজনের প্রশস্তি পেয়েছিল, কিন্তু বিদেশীয় গুণিজনের ধারণাতে এই উপলব্ধির সামান্য সাড়াও ছিল না যে, এই নটরাজমূর্তি ভারতীয় নৃত্যকলার একটি বিরাট ও মহান ঐতিহ্যের প্রতীক-মূর্তি, এবং সেই ঐতিহ্য আজিও ভারতীয় জীবনের ঘরে ও মন্দিরে জননীয় কান্তকলা হিসাবে অনুশীলিত হয়ে থাকে। ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্পদের একটি প্রধান সৌন্দর্য যে নৃত্যকলার মধ্যে আশ্রিত, সেই নৃত্যকলার নয়নাভিরাম সৌন্দর্য এবং লীলায়িত আবেদন বিদেশের সাংস্কৃতিক আগ্রহের কাছে সবার আগে সব চেয়ে সুন্দর করে যিনি পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি আজ আর নেই। সেই উদয়শংকর, যিনি ভারতীয় নৃত্যের সমাদর, সম্মান ও জনপ্রিয়তার নতুন এক ভাগ্যোদয় সম্ভব করেছিলেন।

শুধু বিদেশে সাংস্কৃতিক জনতার সমাবেশের সম্মুখে নয়, স্বদেশীয় মঞ্চে ও আসরে উদয়শংকরের নৃত্য নিতান্ত একটি নয়নাভিরাম প্রদর্শনী হিসাবে নয়, বস্তুত ভারতীয় ঐতিহ্যে আশ্রিত বহু বিভিন্ন নৃত্যকলার জাগরণী আহ্বান হিসাবে সার্থকতা লাভ করেছিল। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, উদয়শংকরের নৃত্যভঙ্গিমার মুদ্রা ও অঙ্গহারের সুললিত প্রকাশ যেন প্রত্যক্ষ প্রেরণা হয়ে ভারতীয় নৃত্যকলার নবোন্মেষ সম্ভব করেছিল। উদয়শংকরের সমকালীন ভারতীয় জীবনে ভারতনাট্যম, কথাকলি ও কথক ইত্যাদি নৃত্যকলার ক্ষেত্রে প্রতিভায় ও দক্ষতায় গুরু বলে বিবেচিত হবার মতো আরও অনেক কৃতী এবং গুণী ছিলেন। কিন্তু এঁরা কেউই বিদেশে ভারতীয় নৃত্যের প্রচারব্রতে প্রতিনিধি অথবা পথিকৃৎ বলে সম্মানিত ও স্বীকৃত হবার মতো কোন কর্তব্য প্রতিপালিত করেননি। উদয়শংকর ভারতীয় নৃত্যের বিভিন্ন কলাগত পদ্ধতি ও সৌকর্যের ক্ষেত্রে গুণী হিসাবে এবং কৃতী হিসাবে 'শ্রেষ্ঠ' বলে অভিহিত হতে পারেন কি পারেন না, এই প্রশ্নের বিচারে মতভেদের তর্ক অবশ্যই থাকতে পারে। কিন্তু ভারতীয় নৃত্যের সমাদর এবং অনুশীলনের যে বিপুল জাগৃতি ভারতের আধুনিক জনজীবনে নৃত্যকলার প্রতিষ্ঠা প্রশস্ততর করেছে, সেটা বিশেষ করে উদয়শংকরের প্রয়াস ও সাধনার সুফল।

কিন্তু একথাও কোন সমালোচক কখনও বলবেন না যে, ভারতের ঐতিহ্যগত নৃত্যকলার পদ্ধতি উদয়শংকরের দ্বারা শুধু অনুসৃত হয়েছে। তাঁর প্রতিভার স্বয়ংসিদ্ধ কৃতিত্বে ঐতিহ্যগত পদ্ধতিরই মধ্যে নতুন রূপের অনেক প্রকরণ লক্ষ্য করতে হয়েছে। নৃত্যকলার নিষ্ঠাশীল সেবকতার পরিচয় তাঁর জীবনের নানা প্রয়াসের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। উচ্চমানের নৃত্যকলার শিক্ষা প্রদান ও প্রচারিত করবার ইচ্ছায় তিনি একাধিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করেছিলেন। এবং এই কর্তব্যের আদর্শিক সৌষ্ঠব রক্ষা করতে গিয়ে তাঁকে আর্থিক অনটন এবং আরও বহু দুরূহ বাধা ও সমস্যার প্রকোপ সহ্য করতে হয়েছে। দেশবাসী লক্ষ্য করেছে যে, মানুষটি বাধা ও বিপত্তিকে যেন তাঁর জীবনের আরব্ধ ব্রতের পরীক্ষা হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর সাধনাকে সদাজাগ্রত করে রাখতেন, বিচলিত ও হতাশ হতেন না। পথিকৃৎ হবার এই দুই মহৎ গুণ তাঁর প্রকৃতির সহজ বৈশিষ্ট্য ছিল বলে ধারণা করতে হয়। দেখাই তো গেল যে, সাতাত্তর বৎসর বয়সের উদয়শংকরও কর্মক্লান্তি কামনা করেননি। বিরাম নয়, ক্লান্তিহীন অধ্যবসায়ের মধ্যেই তিনি পরিতৃপ্ত ছিলেন।

ভারতের ক্লাসিক নৃত্যকলায় তিনি অনুরাগী ছিলেন বটে, কিন্তু ভারতীয় লোকনৃত্য এবং উপজাতীয় জনজীবনের প্রিয় সামাজিক নৃত্যকলার বিপুল বিচিত্র রূপসম্ভার তাঁর গুণিত্বের অন্যতম অর্জিত বৈভব ছিল। তিনি যেন গবেষকের কৌতূহল ও প্রচেষ্টা নিয়ে ভারতের সকল রূপের নৃত্যকলার রম্যতা আহরণ করে ভারতের সাংস্কৃতিক প্রাণের একটি ছন্দোময় সামঞ্জস্যের সত্য অন্বেষণ করেছিলেন। চিন্তার ও চেষ্টার বহু সমস্যার বাধা অতিক্রম করে এবং অবস্থার রিক্ততা জয় করে তিনি কৃতিত্বের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। ভারতের জাতীয় জীবনের সাংস্কৃতিক রূপের মহত্ত্বকে মহত্তর করেছে যার সারাজীবনের প্রয়াস সেই উদয়শংকরকে নিতান্ত একজন কৃতী নৃত্যশিল্পী বলে দেশবাসী মনে করতে পারবে না। সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্তের লেখক অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, তিনি ছিলেন ভারতজীবনের একটি যুগের একজন প্রতিনিধি সাংস্কৃতিক।

দেশবাসীর কাছে তিনি আর একটি দুর্লভ গুণে স্মরণীয় ও শ্রদ্ধান্বিত হয়ে থাকবেন। নৃত্যকলায় অত্যুচ্চ মানের কৃতী হয়েও তিনি তাঁর কৃতিত্বকে নিতান্ত পেশাদারী সার্থকতার মধ্যে সীমিত করে রাখেননি ; সে কৃতিত্বকে তিনি কলালক্ষ্মীর নৈবেদ্যরূপে উৎসর্গ করেছিলেন, ক্লাসিক গ্রীসের গুণীরা যেমন মিউজ দেবীদের কাছে তাঁদের প্রতিভা উৎসর্গ করতেন। জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে নৃত্যকলার আনন্দ ছন্দায়িত হোক, এই কামনাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ও প্রথম কামনা। এক্ষেত্রে তিনি জাতির জীবনে বস্তুত বরণীয় এক [illegible]।

দেবী দুর্গতিনাশিনী !

উদয়শঙ্কর

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যনায়ক উদয়শঙ্কর ২৬ সেপ্টেম্বর বুধবার কলকাতার হাসপাতালে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বয়েস হয়েছিল সাতাত্তর বছর।

উদয়শঙ্কর ছিলেন মূল ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির ধারকের মত। তাই তাঁর জীবনের অবসান অগণিত রসিকজনের কাছে মর্মান্তিক বেদনার।

এই শতকের তিন দশকের শেষ ভাগে নৃত্যকলা যখন অবহেলিত এবং তার পরিবেশ কলুষিত—হয় ব্যাকরণের কঠিন শৃঙ্খলে গুরুগম্ভীর নয় বাঈজীবৃন্দের দ্রুত তাল সঙ্গীতময় ঊষর নৃত্য—এমন পরাধীন ভারতের আকাশ অন্ধকারময় ও সংস্কৃতি বিনিময়ের কল্পনাও দুঃসাধ্য—সেই চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে উদয়শঙ্কর অবলীলায় ভারতীয় নৃত্যকলালক্ষ্মীর সব বন্ধন মোচন করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন বিশ্বসভায় এবং দেশ-দেশান্তরে প্রচার করলেন ভারতের লৌকিক ও পৌরাণিক সংস্কৃতির চিরন্তন রূপ। এই রূপ উদয়শঙ্করের মনোলোকে আপনা-আপনি আঁকা হয়ে গিয়েছিল অনেক আগে—তাঁর শৈশবে ও কৈশোরে—হয়তো তাঁর প্রকৃতির আনুকূল্যেই।

আরাবল্লী পর্বতমালার কোলে উদয়পুরে ১৯০০ সালের ৮ ডিসেম্বর উদয়শঙ্করের জন্ম। পিতা শ্যামশঙ্কর তখন উদয়পুরের মহারাজার মন্ত্রী। কখনো পিতার সঙ্গে, কখনো মাতামহের সঙ্গে উদয়শঙ্করের শৈশব কৈশোর ও অস্ফুট যৌবন অতিবাহিত হয়েছে উত্তরপ্রদেশে—গাজীপুর ও নসরতপুরে এবং রাজস্থানের ঝালোয়ারে। এক বন্ধনহীন বেপরোয়া কিশোর মুগ্ধ নয়নে দেখেছে ভীল নাচ, দেখেছে নওটঙ্কী। ঝালোয়ারে রাজদরবারে সে গেছে বার বার, গেছে রাজপুত উৎসবে—দেখেছে ফাটাবাজি, দেখেছে অস্ত্রপূজা। উদয়শঙ্করের এই দেখা পরে—অনেক পরে প্রকাশ পেল ছন্দে সুষমায় ভঙ্গিতে অভিব্যক্তিতে। নর্তকজীবনের প্রথম পর্যায়ের নৃত্যাবলীতে তার ছাপ আছে। একদিকে ইন্দ্র গান্ধর্ব রাধাকৃষ্ণ পার্বতী রাসলীলা গজাসুরবধ—অন্য দিকে নৃত্য মাড়োয়ারী মদন গণ্পাপুজো অস্ত্রপুজো কাজ ভীলনৃত্য।

উদয়শঙ্করের শৈশব ও কৈশোর দুর্লভ উপকরণ ও উপাদানে ভরে উঠেছিল বলে তাঁর নৃত্যমঞ্চে পৌরাণিক ও লৌকিক ভারত ছন্দে এবং সুষমায় রূপময় ও গীতিময় হয়ে উঠেছিল। উদয়শঙ্করের নৃত্য দেখতে দেখতে সব মিলিয়ে দর্শক কখনো চলে যেত দেবলোকে, কখনো বৃন্দাবনে, কখনো যমুনা নদীর কূলে, কখনো রাজপুত উৎসব প্রাঙ্গণে।

দ্ম ও হরেন ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উদয়শঙ্কর ও সিমাকি

উদয়শঙ্করের নৃত্য শুধু একটি বিশেষ আবেগ কিম্বা বিশেষ ভঙ্গি প্রদর্শন নয়, তাঁর নৃত্যের প্রত্যেকটি ভঙ্গি জীবন্ত ভাবধারায় সঞ্জীবিত। তাঁর নৃত্যকলার মূল ভাবধারাই তাঁর প্রত্যেক নৃত্যভঙ্গিমার ভিত্তি। মানুষের সৌন্দর্যলিপ্সায় ক্ষণিক তৃপ্তিকে প্রাধান্য না দিয়ে উদয়শঙ্কর সব সময় তাঁর নৃত্যে শক্তি সফলতা ও সৌন্দর্যের পরিচয় দিয়েছেন—জীবনের গভীরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছেন।

বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী না হলে সম্ভবত উদয়শঙ্কর ভারতবিখ্যাত চিত্রশিল্পী হতে পারতেন। খুব ছোটবেলা থেকেই তাঁর স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল আঁকার দিকে। কয়লার টুকরো দিয়ে ঘরের পরিচ্ছন্ন দেয়ালে তিনি হাতাচোরা ছবি আঁকতেন। গাজীপুর স্কুলের ড্রয়িং মাস্টার তাঁর আঁকা দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে প্রচুর উৎসাহ দেন। এই শিক্ষকের নাম অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়।

উদয়শঙ্করের জীবনে অম্বিকাচরণের দান অসীম। তিনি শুধু উদ্‌ঘাটন করলেন তাঁর কাছে পৃথিবীর চিত্রজগৎ। কত গ্রন্থের কথা বললেন, পাঠ করে শোনালেন। বাঁশী, হারমোনিয়ম শোনালেন, গান গাইলেন। এবং তাঁকে শেখালেন ম্যাজিক। ম্যাজিকবিদ্যায় যে উদয়শঙ্কর পারদর্শী তার প্রমাণ পাওয়া গেছে তাঁর শেষ জীবনের শিল্পকর্মে—"শঙ্করস্কোপে"। ষোল-সতের বছর বয়সে লণ্ডনের জে জে স্কুল অব আর্টস-এ ভর্তি হয়েছিলেন উদয়শঙ্কর। পাঁচ বছরের দীর্ঘ শিক্ষাক্রম তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে শেষ করেন মাত্র দু বছরে। লণ্ডনেও ঠিক তাই। রয়াল কলেজ অব আর্টস-এর পাঁচ বছরের শিক্ষাক্রমও তিনি শেষ করেন সেই দু বছরে।

স্যার উইলিয়ম রদেনস্টাইন ও আনা পাভলোভা দুজনেই উদয়শঙ্করকে উপদেশ দেন মহিমময় ভারতের অফুরান সম্পদের দিকে চোখ মেলে তাকাতে এবং ইউরোপের প্রভাবে সামান্য প্রভাবান্বিত না হতে।

উদয়শঙ্কর বলতেন, "এঁদের উপদেশ আমি চিরকাল মেনে এসেছি। আর অম্বিকাচরণ আমার কাছে দেবতার মত এক মানুষ। তিনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। আমাকে শক্তি দিয়েছেন, সাহস দিয়েছেন।"

তিনি আরও বলতেন, "আমার একমাত্র নৃত্যগুরুর নাম শঙ্করণ নাম্বোদ্রি। তিনিই আমাকে শিখিয়েছেন কথাকলি।"

আটষট্টি বছর বয়েস অবধি নর্তক হিসেবে উদয়শঙ্কর যেমন ছিলেন ক্লান্তিহীন, কম্পোজার হিসেবেও তেমন তাঁর সৃষ্টির ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত। ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে উদয়শঙ্কর সৃষ্টি করেছেন, গ্রেট রিনানসিয়েশন, ইটার্নাল রেকর্ড, গৌতম বুদ্ধ (ছায়ানৃত্য), সামান্য ক্ষতি, প্রকৃতি ও আনন্দ এবং আরও অনেক ছোটবড় নৃত্যনাট্য।

মৃত্যুর কয়েক বছর আগে ক্লান্ত ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলেছিলেন উদয়শঙ্কর, "জীবনে একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। যদি নিজের একটা স্কুল গড়ে যেতে পারতাম! তাহলে হয়তো ছাত্রছাত্রীদের কাছে রেখে যেতে পারতাম আমার ভঙ্গি, আমার মুদ্রা—আমার নাচের গোটা ব্যাকরণ। যখন সময় ছিল, সামর্থ ছিল তখন এসব মনে হয়নি।"

কিন্তু সময় চুপ করে থেকে তিনি আবার বলেছিলেন, "তবে আমার নিজের কোন ইনস্টিটিউশন না থাকলেও আমার প্রভাব হয়তো আছে।"

শিব-পার্বতী তাণ্ডব নৃত্যে উদয়শঙ্কর ও সিমকি

আমি যা সৃষ্টি করেছি তা বোধ হয় থেকে গেছে। [illegible] ছিল, শচীনশঙ্কর আছে। শিল্পী আর আমেরিকাতেও আছে অনেক ট্রুপ। এদের মধ্যে আমি শিখলাম, আমি আছি। আর, হয়তো আমি থেকেও যাব।"

উদয়শঙ্কর যে-কথা বলেছিলেন হয়তো প্রসঙ্গতঃ আরও কিছু বলা যায়। তাঁর ভাব ভঙ্গি মুদ্রা যে শুধু থেকে যাবে আধুনিক নৃত্য জগতে তা নয়, নৃত্যে উৎসাহী যে-কোন মানুষে তাঁর বিস্ময়কর ও অফুরন্ত অবদানের জন্যে তাঁকে এক নতুন পরিমণ্ডলের স্রষ্টা হিসেবে স্মরণ করবে।

উদয়শঙ্করের নৃত্যদল গঠনে সহায়ক ছিলেন শিল্পী ইম্প্রেসারিও হরেন ঘোষ। মুখ্যত তাঁরই চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উদয়শঙ্করের যোগাযোগ ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ উদয়শঙ্করকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, "তুমি যা করে চলেছ, আমিও তা করতে চেয়েছিলাম। আমি পারিনি, কিন্তু তুমি পারবে—"

নৃত্যের ব্যাকরণে নিজের পরিধিকে সীমাবদ্ধ করতে পারেননি উদয়শঙ্কর। স্বাধীন শিল্পী-মনের দৃঢ়তা নিয়ে বার বার সৃষ্টি করেছেন অভিনব শিল্পলোক। তিনি এক-এক সময় নিজেই বলতেন, "আমার লোকনৃত্য বিশেষ কোন গ্রামবাসীদের লোকনৃত্য নয়, তা আমারই লোকনৃত্য। অস্ত্রপূজা শুধু রাজস্থানের ধর্মীয় উৎসব নয়, তা আমার তৈরী আর এক নতুন উৎসব। 'অসিনৃত্য' শুধু সৈন্যসামন্তের তলোয়ার চালানো নয়, আমি এটাকে একটা ছন্দের মধ্যে ফেলবার চেষ্টা করেছি আমার 'কার্তিকেয়' কথকলি নাচ হলেও, পরিকল্পনা আমিই করেছি।"

ইউরোপে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করলেও উদয়শঙ্করের কোন নৃত্যে সামান্য পাশ্চাত্য প্রভাব নেই। তিনি কাজ করেছেন ইউরোপের ব্যালে ট্রুপে, টিকবার জন্যে প্যারিসের ছোট-বড় সব ক্যাবারেতে প্রথম জীবনে বারো-চোদ্দ ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রম করে শরীরপাত করেছেন, তিনি বহুদিন বিদেশে সেই সময় যুক্ত ছিলেন অনেক থিয়েটার হলের সঙ্গে জীবনধারণের জন্যেই—কিন্তু ভারতীয় নৃত্য ছাড়া উদয়শঙ্কর কখনো কোথাও কোন বিদেশী নৃত্যের প্রদর্শনী করেননি। ইউরোপীয় ব্যালে দেখবার তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। বলরুম নাচ তিনি জানতেন না। কখনো শেখেননি। মনে-প্রাণে আদর্শ ভারতীয় বলেই উদয়শঙ্কর হয়তো নিজেরই অজ্ঞাতে তাঁর শিল্পের মাধ্যমে পরাধীন ভারতের দারুণ দুর্দিনে ইউরোপে যেভাবে এ দেশের মহিমা প্রচার করেছেন যা সেই সময় অন্য কারুর পক্ষে হয়তো সম্ভব ছিল না।

এ দেশের যা কিছু সব মন্দ। এদের মানুষ অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন—এই রকম অপপ্রচার চালানো হয়েছিল তখন ইউরোপে। বিশেষ করে মিস মেয়ো নাম্নী মহিলার বহুল পঠিত 'মাদার ইণ্ডিয়া' এই অপপ্রচারে প্রচুর ইন্ধন জুগিয়েছিল।

এক সন্ধ্যার ছোট একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলে বোঝা যাবে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও উদয়শঙ্করের শিল্পসৃষ্টির মূল্য কতখানি। এবং তা দেখে কীভাবে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে বিদেশের মানুষ।

তিরিশ দশকের প্রথম দিকে লণ্ডনের প্যালেস থিয়েটারে উদয়শঙ্করের হিন্দু ব্যালের প্রদর্শনী চলেছে। সেটাই ছিল শেষ রজনী—উনিশতম প্রদর্শনী। সেদিনও প্রেক্ষাগৃহ একেবারে পূর্ণ।

যবনিকা ওঠার কিছু আগে এক ইংরেজ মহিলা দেখা করতে এলেন উদয়শঙ্করের সঙ্গে। বললেন, "আজ তোমাদের শেষ প্রদর্শনী। তোমরা চলে যাচ্ছ, তাই দেখা করে গেলাম।"

উদয়শঙ্কর বিনীতভাবে বললেন, "কষ্ট করে যখন এসেছেন তখন দয়া করে নাচ দেখে যান। আমি নেমন্তন্ন করছি আপনাকে।"

ইংরেজ মহিলা হাসলেন। ব্যাগ খুলে উদয়শঙ্করকে একটা টিকিট দেখিয়ে বললেন, "এই যে টিকিট। আমি আগেই কেটে রেখেছি। আই হ্যাভ সীন দি নাইনটিনথ টাইম দিস ইভনিং। যতদিন আপনার নাচ চলেছে এখানে, আমি রোজ এসেছি। আপনার প্রত্যেকটি শো দেখেছি—" উদয়শঙ্করের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তিনি আরও বললেন, "আপনার নাচ দেখে বুঝতে পারলাম কী মহান আপনাদের দেশ ভারতবর্ষ! কী সব আজেবাজে কথা 'মাদার ইণ্ডিয়া'য় লিখেছেন মিস মেয়ো!"

ইউরোপীয় সাহিত্যের যুগান্তকারী প্রতিভা জেমস জয়েস উদয়শঙ্করের নাচ দেখে তাঁর মেয়ে লুসিয়াকে লিখেছিলেন,

"I send you the programme of the Indian dancer Udayshankar. If he ever performs at Geneva, don't miss going there. He leaves the best of the Russians far behind. I have never seen anything like it. He moves on the stage floor like a semi divine being. Altogether, believe me, there are still some beautiful things in this poor old world".

জেনেভা থেকে সেই সময় উদয়শঙ্করকে লিখেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র, "আমি বর্তমানে অসুস্থ। হাসপাতালে শুয়ে আছি। আপনাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হল না। কিন্তু যিনিই এখানে আসছেন তিনিই আপনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছেন। শুনে গর্বে আমার বুক ভরে যাচ্ছে। আপনি বিদেশে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।"

আধুনিক নৃত্যকলাক্ষেত্রে উদয়শঙ্করের অফুরন্ত অবদান যেমন বিস্ময়কর তেমন দেশের গৌরব বৃদ্ধির কাজে তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্ধকারময় পরাধীন ভারতে তিনি তাঁর প্রথম যৌবনেই এনেছিলেন আলোর উদ্ভাস, পরবর্তীকালেও এই ছিল তাঁর ব্রত, তাঁর ধর্ম। উদয়শঙ্করের নৃত্যকলা একদিকে যেমন শিল্পের সূক্ষ্ম কারুকাজ, অন্যদিকে তেমন এই ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অপূর্ব ব্যঞ্জনা পায়। শিল্পের মাধ্যমে দেশপ্রেমিকের এই কর্তব্য পালনে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী অগ্রদূত।

(প্রবন্ধে ব্যবহৃত ছবি অশোক ঘোষের সৌজন্যে)

চলতি যুগের নারী...
অতি আধুনিক রূপ তার-ই...
Lakmé
ATIN GLOW
LIQUID
MAKE UP
নারী মুক্ত বিহঙ্গের মত। চতুরা—মোহিনী।
চলতি হাওয়ার পন্থী।
নারী জানে তার কি চাই।
অতি স্বাভাবিক অথচ যৌবনোজ্জ্বল রূপ-লাবণ্য।
তার চাই ল্যাকমের সামান্য একটু সাহায্য।
ল্যাকমে সৌন্দর্য সম্ভার

বাংলার নবজাগরণ ও আজকের সংকট

অম্লান দত্ত

আচারশাসিত সমাজে রামমোহন যুক্তিধর্মিতার একটি প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন। সেই স্রোত সমাজের বেশী গভীরে প্রবেশ করেনি। সে কথা ভিন্ন। তার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। কিন্তু 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচারে' যে রামমোহনকে আমরা পাই, তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির পটভূমিকায় নির্ভীক যুক্তিধর্মিতাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর দেশবাসীর জন্য এমন একটি ঊর্দ্ধলোকে জাগরণ প্রার্থনা করেন, যেখানে চিত্ত ভয়শূন্য, জ্ঞান মুক্ত এবং যেখানে "বিচারের স্রোতঃপথ" অবলুপ্ত নয় "আচারের মরুবালুরাশিতে" তখন কবির সেই চিন্তার পিছনে আমরা যেন রামমোহনের একটি মূর্তি প্রত্যক্ষ করি। রামমোহন ধর্ম ত্যাগ করেননি। ধর্মের উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর জন্ম; সেই ধর্মকে যুক্তি দিয়ে বিচার ও পরিশুদ্ধ করে তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

আচারের শাসন থেকে বিচারের মুক্তিতে আরোহণই যেমন রামমোহনের বৈশিষ্ট্য, যুক্তিবাদ থেকে অধ্যাত্মবাদে উত্তরণ তেমনই দেবেন্দ্রনাথের চৈতন্যের বিবর্তনে প্রধান ঘটনা। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম পরিবেশে শৈশব অতিবাহিত করেননি। পশ্চিমী যুক্তিবাদকে তিনি সহজ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের মতনই লাভ করেছিলেন। সেই যুক্তিবাদ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানে বিশ্বাসী এবং জগতের সামগ্রীকে উপকরণ হিসেবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত। কিন্তু এই চিন্তা দেবেন্দ্রনাথকে শান্তি দিতে পারেনি।

আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "আমি য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র বিস্তর পড়িয়াছিলাম। কিন্তু এত করিয়াও মনের যে অভাব, সেই অভাব! তাহা কিছুতেই ঘুচাইতে পারিলাম না। ... ভাবিলাম, 'প্রকৃতির অধীনতাই কি মনুষ্যের সর্বস্ব? তবে তো গিয়াছি! ইহার নিকট নতশিরে থাকাই যদি চরম কথা হয় তবে তো গিয়াছি। আমাদের আশা কৈ, ভরসা কৈ?'" (শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৪১) যে অধ্যাত্মচিন্তায় দেবেন্দ্রনাথ অবশেষে শান্তি লাভ করেন তার বিশদ আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সেই চিন্তার একটি মূল কথা এই: মানুষ উপকরণ সংগ্রহ করে ও প্রয়োজন মতো তার পুনর্বিন্যাস করে, একে বলা যায় রচনা। রচনা এবং সৃষ্টি এক নয়। মানুষ রচনা করে, ভগবান সৃষ্টি করেন। সেই সৃষ্টির রহস্য মানুষের অজ্ঞাত। সৃষ্টির রহস্য কিন্তু অনন্ত বিস্ময়কর। দেবেন্দ্রনাথের ভাষায়: "আমরা, সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রচনা করি; তিনি, তাঁহার ইচ্ছায় সকল উপকরণ সৃষ্টি করিয়া রচনা করেন। তিনি জগতের কেবল রচনা কর্তা নহেন, তিনি ইহার সৃষ্টিকর্তা। আবার আমি একাগ্র মনে অগণ্য গ্রহনক্ষত্র খচিত এই অনন্ত আকাশের উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, এবং অনন্তদেবকে দেখিলাম।" এছাড়া ভগবানের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য দেবেন্দ্রনাথ আরও কিছু যুক্তি ব্যবহার করেন, যেসব বহু পরিমাণে পশ্চিমী দর্শনশাস্ত্র থেকে পাওয়া, যার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচিন্তার কিছুটা যে আভাস দেওয়া হল তার একটা কারণ আছে। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচিন্তার আস্বাদ ঠিক এক নয়। রামমোহন সাধারণের সমক্ষে শাস্ত্রের পর্যালোচনা ও যুক্তিতর্কের সাহায্যে সকল মানুষের গ্রাহ্য একটি সাধারণ ধর্মমতে পৌঁছাতে চেষ্টা করেছিলেন। রামমোহনের স্বরচিত ব্রহ্মসংগীতেও যেন তত্ত্বের আধিক্য। তুলনায় দেবেন্দ্রনাথের ভিতর রহস্যানুভূতি ও ব্যক্তিগত উপলব্ধির প্রাধান্য, যদিও উপনিষদের প্রতি তিনিও শ্রদ্ধাবান। এই পার্থক্য পরবর্তীকালে গুরুত্ব অর্জন করে।

বিপিনচন্দ্র পাল এই পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখেন: "রাজা (রামমোহন রায়) একান্তভাবে শাস্ত্রপ্রামাণ্য বর্জন করেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শুদ্ধ ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির উপরে ঐকান্তিকভাবে সত্যাসত্য ও ধর্মাধর্ম মীমাংসার ভার অর্পণ করেন। ... কিন্তু এই স্বানুভূতি প্রতিষ্ঠিত ধর্মকে তিনি উপনিষদের শ্রুতির আশ্রয়ে স্থাপন করিতে যাইয়া একপ্রকারের শাস্ত্রপ্রামাণ্যও প্রদান করেন।" মূল প্রশ্নটি এই, ধর্ম বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিলে সেই সংশয়ের নিরাকরণ করবেন কে কি ভাবে? ইউরোপে রেনেসাঁসের যুগে এই প্রশ্ন উঠেছিল; এ দেশেও অনিবার্যভাবে একই প্রশ্ন দেখা দিল। দুই বিপরীতমুখী উত্তরও পাওয়া গেল। একদল ধর্মকে "শাস্ত্রপ্রামাণ্যের" ওপর স্থাপন করতে চাইলেন, এ নয় তো সমাজে ঐক্যবন্ধন বলে কিছু থাকবে না; [illegible] পণ্ডিত শাস্ত্রাশ্রিত জ্ঞানই নির্ভরযোগ্য। আবার কেউ কেউ বললেন যে "স্বানুভূতিই বিশ্বাসের ভিত্তি, নয় তো ওটা যথার্থ বিশ্বাসই নয়, জনসাধারণের অন্ধ অনুকরণ মাত্র।" রবীন্দ্রনাথ এই দ্বিতীয় মতের মানুষ ছিলেন, অন্তত সেদিকেই ছিল তাঁর ঝোঁক। তাই তিনি লিখেছিলেন "আমার মত বিশ্বাস, শিল্পসাহিত্যে যেমন ধর্মমতেও তেমনি, যা গোষ্ঠীগত তার মূল্য সামান্যই। প্রকৃতপক্ষে ওটা পরম্পরা অনুকরণের সংক্রামকতা ছাড়া আর কিছু নয়।"

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, প্রথম মতটিই আমাদের সমাজে প্রাধান্য পেয়েছে। যারা মনে মনে দ্বিতীয় মতে বিশ্বাসী তাঁরাও বাইরের আচরণে রক্ষণশীল থেকে গেছেন প্রায়শঃ। দেবেন্দ্রনাথ নিজেই এ-ব্যাপারে উদাহরণস্বরূপ। পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ পিতা সম্বন্ধে লিখেছেন:

"My father, though an uncompromising enemy of idolatrous worship, was essentially conservative in his instincts."

ধর্মের তাত্ত্বিক প্রশ্নে দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন "স্বতন্ত্রপন্থী"। পৌত্তলিকতা বা মূর্তিপূজার ব্যাপারে তাঁর বিরোধিতা ছিল অখণ্ড এবং সংশয়হীন। কিন্তু হিন্দুসমাজের প্রচলিত বর্ণভেদপ্রথার সঙ্গে আপোস করতে তাঁর অসম্মতি ছিল না; বরং এ-ব্যাপারে কেশব সেনের অনমনীয় মনোভাবটাই তাঁর কাছে আপত্তিজনক মনে হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ জানতেন যে, জাতিভেদপ্রথার ওপর আঘাত হিন্দুসমাজ সহ্য করবে না। এ-ব্যাপারে হিন্দুসমাজের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করাই তিনি সমীচীন মনে করলেন।

আমাদের ইতিহাসে এই রকম বারবারই হয়েছে। দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছে। বুদ্ধ থেকে মার্ক্স অবধি অনেকের ডাকেই মানুষ সাড়া দিয়েছে। তারপর বিশাল সমাজের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে বিদ্রোহীরা ধীরে ধীরে নেমে এসেছেন নবলব্ধ সত্যের ঊর্দ্ধলোক থেকে প্রচলিত আচারের কঠিন মাটিতে। বিদ্রোহী মন্ত্র অথবা আওয়াজ ত্যাগ না করেও তাঁরা জীবনের আচরণে আপোষ করে নিয়েছেন রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে।

(২)

যে-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অবলম্বন করে গত শতকের নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল, সেই শ্রেণীটি সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। তবু দু'য়েকটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ঊনিশ শতকে যে-ইংরেজী শিক্ষাপদ্ধতি এদেশের কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হয়, বলা হয়েছে যে, কেরানী সৃষ্টি করাই ছিল ঐ শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য। অজস্রবার উচ্চারণের গুণে কথাটা এখন আমাদের কাছে একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ওটাকে শুধু অর্ধ সত্য বলেই স্বীকার করা সম্ভব, তাও 'কেরানী' শব্দটিকে অনেকটা ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে তবে। আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো পাঠক্রম ও পুস্তকের তালিকা খুঁজে দেখে নিলেও বোঝা যায় যে, শুধু কেরানী তৈরি করবার জন্য অত সব প্রয়োজন ছিল না। বরং বলা যেতে পারে যে, ইংরেজী উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল উকীল ও ডেপুটি তৈরী করা; অনিবার্যভাবেই অধ্যাপকও হয়েছে। সেই সঙ্গে সামান্য কিছু ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়র।

শাসনযন্ত্রের উচ্চতম পদে সেদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন ইংরেজরা। ভারতীয়েরা সেখানে কদাচিৎ প্রবেশ করতে পেরেছেন। বহুদিন অবধি এদেশীয় ইংরেজী শিক্ষিত উচ্চাভিলাষীরা জীবনের শেষে ডেপুটির পদটিই কামনা করেছেন।

ডেপুটির সঙ্গে যোগ হল উকীল। নতুন শিক্ষাব্যবস্থার এঁরা উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অঙ্গ হিসেবেও এঁরা সমান উল্লেখযোগ্য। উকীল অথবা আইনজীবী সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিকতা বোঝা যাবে না। একই সঙ্গে ইংরেজ শাসনযন্ত্র এবং নতুন জমিদারীপ্রথার অত্যাবশ্যক অঙ্গ হয়ে দাঁড়ালেন উকীল। ভূমিস্বত্ব আইনের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আইনজীবীর গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেল। রাজধানীর বাইরেও জেলায় জেলায় প্রধান শহরে আইনজীবীদের আবির্ভাব ঘটল।

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি জীবন্ত করে তোলা যাক। জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট নাগরিক চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয় ১৯০২ সালে তাঁদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন: "বলি দেখি তোমরা কে? কোথা থেকে এসেছ? ... প্রায় ৪০।৫০ বৎসর আগে এখানে ইংরেজ গভর্নমেন্ট এসে একটি আড্ডা করলেন একটা শহর তৈরি মহলে। এখানে বসলো আফিস, আদালত, পোস্টাফিস, থানা, আরো কত কি। সঙ্গে সঙ্গে এলো ডেপুটী, মুন্সেফ, উকিল, মোক্তার, কেরানী প্রভৃতি। এরা এদেশী লোকের কাছ থেকে কিছু জমি কিনে বা পত্তন নিয়ে বসলো। ধীরে ধীরে এদেশের লোক মামলা মোকদ্দমা করতে শিখলো আর তাদের টাকায় উকিল, মোক্তার মোটা হতে লাগলো।" নতুন মধ্যবিত্তের বিবর্তনের একটি দিক অল্প কথায় এখানে পরিষ্কার চিত্রিত হয়েছে।

আইনজীবীর ভূমিকার আরও একটি গভীরতর দিক আছে। আধুনিক অর্থে আমরা যাকে আইনের শাসন বলি, সেটা এদেশে গড়ে উঠেছে ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে। এই আইনের শাসন ছাড়া গণতন্ত্র অথবা নাগরিক স্বাধীনতা অসম্ভব। আইনের শাসনই যথেষ্ট নয়, কিন্তু নাগরিক স্বাধীনতার জন্য ওটা আবশ্যক। কাজীর বিচার আচারশাসিত সমাজের অঙ্গ। ইংরেজ আমলে আইনজীবী সম্প্রদায় এদেশে এক নতুন ঐতিহ্যের ভিত্তি স্থাপন করলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে আমাদের বরেণ্য নেতাদের অনেকেই এসেছেন এই আইনজীবীদের ভিতর থেকেই।

এদেশের নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিকতার এবং বাস্তব স্থিতিতে কোন অভাবের দিক, অন্তত বিচক্ষণ পর্যবেক্ষকদের চোখে সে-দিকটা গত শতক থেকেই মোটামুটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল।

মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল না জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা। কেরী এবং মার্শম্যান কিন্তু ঊনিশ শতকের গোড়াতেই জোর দিয়েছিলেন জনশিক্ষার ওপর। মাতৃভাষাকে ওঁরা জনশিক্ষার মাধ্যম করে তুলতে চেয়েছিলেন। ওঁরা দৃষ্টি ফেরাতে চেষ্টা করেছিলেন শ্রমমূলক শিক্ষার দিকে, অর্থাৎ জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে। সেই সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব ওঁদের চিন্তায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। নগর থেকে জ্ঞানবিজ্ঞানকে ওঁরা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন দেশের নানা প্রান্তে। কিন্তু শিক্ষার এই নতুন আদর্শ সরকারী নীতিতে স্বীকৃত হয়নি।

ফলে ঊনিশ শতকের নবজাগরণ নগরকেন্দ্রিক হয়ে গেল। নগর ও গ্রামের ভিতর ব্যবধান আরও দুস্তর হল। দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য

"ডাক্তারবাবু! আমার বাচ্চা পুতুলের অসুখ করেছে একটু দেখুন না।"
"জ্বর নেই পেটের সামান্য গোলমাল রয়েছে...... যখনই বাচ্চার অস্বস্তি হবে—উডওয়ার্ডস্ গ্রাইপ ওয়াটার। মাও আমাকে এইটেই খেতে দিয়েছিলেন।"
IMPORTANT TO MOTHERS
WOODWARD'S CELEBRATED
GRIPE WATER
উডওয়ার্ডস্
গ্রাইপ ওয়াটার
শতাধিক বছর ধরে বিচক্ষণ মায়েরা নির্ভর করে আসছেন।

সর্বনাশ! এতো বেদম ঠকে গেছি!

কাপড় কুঁচকে কমে গিয়ে

সাবধান!

প্রতি বছর কাপড় কেনার সময়েই কিছুটা কাপড় নষ্ট হয় কুঁচকে খাটো হয়ে গিয়ে। তার পরিণাম? যখনই আপনি সেলাই করাতে যান, দেখেন কাপড়ে কম পড়ে গেছে।

এই কাপড় কুঁচকে খাটো হবে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচার কি কোনও রাস্তা আছে? নিশ্চয়ই আছে…

কেনবার আগে দেখে নিন…স্যানফোরাইজড লেবেল লাগানো আছে কি না।

স্যানফোরাইজড লেবেল একমাত্র সেই কাপড়েই লাগানো হয় যা অনেক কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কাপড় কোঁচকানো সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে। সারা পৃথিবীতে ৫০০টিরও বেশী কাপড়ের মিল এই লেবেল ব্যবহার করছেন।

এরপর যখনই কাপড় কিনবেন, দেখে নেবেন 'স্যানফোরাইজড' লেবেল লাগানো আছে কিনা। এই লেবেল কাপড় কোঁচকানো থেকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতীক।

একমাত্র সেই কাপড়ই কিনুন যাতে লেবেল লাগানো আছে 'স্যানফোরাইজড'— কাপড় কোঁচকানো থেকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার রক্ষাকবচ

"স্যানফোরাইজড" রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্কের স্বত্বাধিকারী ক্লুয়েট, পীবডী অ্যাণ্ড কোম্পানী ইনক্ (আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সীমিত দায়) দ্বারা প্রচারিত। স্বত্বাধিকারী এই ট্রেডমার্ক …
কিংবা পরীক্ষার পর কুঁচকে খাটো হবে না এই দৃঢ় শর্ত পূরণ করে এমন একমাত্র পরীক্ষিত কাপড়ের জন্য …

অন্ধকারের অন্তরালে

বরুণ সেনগুপ্ত

প্রেসিডেন্সির পেটি প্রাপ্তি

প্রেসিডেন্সী জেলে আমি সপ্তাহ তিনেকের মত ছিলাম। তারপর হঠাৎ একদিন এক অফিসার চালাকি করে আমাকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। রাইটার্স বিল্ডিংসে খবর পৌঁছেছিল, আমি প্রেসিডেন্সী জেলে ভাল আছি, আমার মনোবল ভেঙে পড়েনি। তাই সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষ হুকুম দিলেন, ওকে আলিপুরে পাঠিয়ে দাও।

জেল সম্পর্কে, অর্থাৎ জেলের ভেতর সম্পর্কে এর আগে আমার কোনও অভিজ্ঞতাই ছিল না। বাংলায় জেল-টেল নিয়ে যেসব বইপত্র লেখা হয়েছে তাও আমি কোনও দিন পড়িনি। ফলে, কেমন বা প্রেসিডেন্সী জেল, আর কেমনই বা আলিপুর সেন্ট্রাল জেল সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই ছিল না। সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে প্রেসিডেন্সী জেলেরই অনেকটা দেখে উঠতে পারিনি। বহু বাসিন্দাকে তখনও চিনিনি। এলাকা বহু ওয়ার্ড তখনও অদেখা। জেলের চৌহদ্দির মাঝে-মধ্যে দেখতাম আলিপুরে অঞ্চল দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু কোনও জেলের ভেতর আমি আগে দেখিনি। প্রথম দর্শন প্রেসিডেন্সী এবং তারপর আলিপুর।

প্রেসিডেন্সীর পর আলিপুর জেল দর্শনে আমি বুঝলাম সব জেল জেল-কোড অনুসারে চললেও এবং সব জেলেরই এক কর্তৃপক্ষ হলেও সব জেল একরকম নয়! না চরিত্রে, না গঠনে, না দর্শনে! আলিপুর জেল আর প্রেসিডেন্সীতেও নানা বিষয়েই মৌলিক পার্থক্য।

এক কথায় বলতে গেলে, প্রেসিডেন্সী জেল আর আলিপুরের তফাতটা অনেকটা কলকাতা আর নয়াদিল্লির পার্থক্যের মত। যাঁরা দিল্লি শহর দেখেননি, তাঁদের বোঝাবার জন্য অন্যভাবেও তুলনাটা দেওয়া যায়। প্রেসিডেন্সী জেলকে যদি বলা হয় বৈঠকখানা-বাজার তো আলিপুর সেন্ট্রাল জেল হল নিউ মার্কেট!

প্রেসিডেন্সীতে দিনরাত হইচই, সবাই যেন সর্বক্ষণ আড্ডা দিচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে, জেলের ভেতরটা যেন একটা ছোটখাটো কলকাতা শহর। তার ভেতরে দর্শন হরেক জাতের হরেক লোক দেখবেন। দরিদ্রতম ব্যক্তি থেকে আরম্ভ করে কোটিপতি পর্যন্ত। জঘন্যতম ক্রিমিনাল থেকে আরম্ভ করে আদর্শতম ব্যক্তি পর্যন্ত। প্রেসিডেন্সী জেলে নিগ্রো দেখেছি, অস্ট্রেলিয়ান দেখেছি, আমেরিকান দেখেছি, জার্মান দেখেছি, পাঞ্জাবী দেখেছি, সিন্ধী দেখেছি, গুজরাটী দেখেছি, মাদ্রাজী দেখেছি, কাবুলী দেখেছি, বিহারী দেখেছি, ওড়িয়া দেখেছি—সব দেখেছি। প্রেসিডেন্সী জেলে হিন্দু দেখেছি, খ্রীস্টান দেখেছি, মুসলমান দেখেছি, পার্সী দেখেছি, আদিবাসী দেখেছি—সব দেখেছি। প্রেসিডেন্সী জেলে সব রাজনৈতিক দলের লোকদেরও দেখেছি—নব কংগ্রেসী থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন দলের নকশাল পর্যন্ত—সব। প্রেসিডেন্সীতে সব রকমের আসামীও দেখেছি—কাফেপোসার বন্দী, মিসার বন্দী, খুনের দায়ে বন্দী, অস্ত্রআইনের বন্দী, পকেটমারীর অভিযোগে বন্দী, ছিনতাইয়ের আসামী, ডাকাতির আসামী, গাঁজা বিক্রির আসামী, চোলাই মদ বিক্রির আসামী, হেরোইন বিক্রির আসামী ইত্যাদি, ইত্যাদি সব!

কিন্তু আলিপুরে তা নেই। আলিপুরে বিদেশী আসামী দেখেছি মাত্র একজন। এক আফগানী মালিক। আলিপুরে বিভিন্ন ধর্মের আসামী ছিল ঠিকই। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আসামী ছিল না। আলিপুরে কোনও নব বা আদি কংগ্রেসী বা জনসংঘী বা প্রজা-সমাজতন্ত্রী বা সমাজতন্ত্রী আসামী দেখিনি। আলিপুরে সব আইনের আসামীও দেখিনি। আলিপুরে কাফেপোসার বন্দী ছিল না। আলিপুরে মিসার বন্দী আমিই একা। আলিপুরে পকেটমার ছিনতাই, চোলাই মদ বিক্রির আসামীও সেই অনুপাতে চলে।

প্রেসিডেন্সী হল আসেওয়ালা-যাবেওয়ালা জেল। প্রতিদিন তিন-চার শ' করে নতুন বন্দী আমদানি এবং প্রতিদিন তিন-চার শ' করে খালাস। প্রেসিডেন্সীতে মহিলা বিভাগও আছে। আলিপুর মহিলা-বর্জিত। প্রেসিডেন্সীর আসামীরা শুধু কয়েদী নয়, হাজতীও। তিন-চার-ছয় মাস সাজাওয়ালাই বেশী। আমি যখন প্রেসিডেন্সীতে ছিলাম তখন ওখানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীর সংখ্যা পঞ্চাশও নয়। মোট বন্দীর সংখ্যা প্রায় আটাশ শ'। আর আমি যখন আলিপুরে ঢুকি তখন সেখানে বন্দীর সংখ্যা বাইশ শ' মত। তার মধ্যে প্রায় পাঁচ শ'ই হল লাইফার, অর্থাৎ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দী। তাদের অনেকেরই আট-দশ-বারো বছর জেল খাটা হয়ে গিয়েছে! আলিপুরের অধিকাংশ বাসিন্দাই দীর্ঘমেয়াদী। শুধু জেলের আসামীরা ছাড়া। কাজ করার লোক পাওয়া যেত না বলেই আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে তখন হাওড়ায় টিকিট-না-নিয়ে চড়া বা মহিলা কামরায় উঠে পড়া পুরুষ যাত্রীদের নিয়ে আসা হত। এদের সাজা হত বড় জোর এক মাস। এদের বাদ দিলে আলিপুরে দৈনিক কয়েদী আমদানি-রফতানির সংখ্যা ছিল নগণ্য। প্রেসিডেন্সীতে অধিকাংশই ছিল হাজতি', অর্থাৎ যাদের মামলা চলছে। আলিপুরে প্রায় সবাই হল মেয়াদী কয়েদী, অর্থাৎ যাদের দীর্ঘ সাজা হয়ে গিয়েছে। প্রেসিডেন্সী থেকে প্রত্যেক দিন বিভিন্ন আদালতে যেত চার-পাঁচ শ' বন্দী। আলিপুর থেকে দিনে পঞ্চাশজনও নয়। প্রেসিডেন্সী আসেওয়ালা-যাবেওয়ালা জেল। আলিপুর দীর্ঘস্থায়ী বাসিন্দাদের জেল। জেল-কোডই বলে, প্রেসিডেন্সী 'বি' ক্লাস জেল, আর আলিপুর 'এ' ক্লাস জেল। বি ক্লাস বন্দী হল সেই-ই, যে একাধিকবার সাজা পেয়েছে। এ ক্লাস বন্দী বলা হয় তাকেই, যে প্রথমবার সাজা পেয়েছে।

দুটো জেলের কাঠামোও দু'রকম। প্রেসিডেন্সী দেখেই বোঝা যায়, পরিকল্পনামত তৈরি করা জেল নয়। ছড়ানো-ছেটানো ব্যাপার। খোলা ডিগ্রীতে যদি প্রচণ্ড মারামারি হয়ে যায়, এমন কি বিস্ফোরণও হয়ে যায়, তা হলেও তার কোনও শব্দ শোনা যাবে না প্রেসিডেন্সী জেলের গেটে বা অফিসে। অথবা, যদি সাতখাতায় কিছু একটা ঘটে যায় তা হলে তা কিছু জানা যাবে না খোলা ডিগ্রী থেকে! প্রেসিডেন্সী জেল বিরাট এলাকা নিয়ে। প্রেসিডেন্সী যেন জেল-কলকাতা। শহরে যেমন কোটিপতিদের প্রাসাদের পাশেই আছে দরিদ্রের বস্তি, প্রেসিডেন্সীতেও তেমনি আছে খোলা ডিগ্রী এবং নিউ ওয়ার্ডের মত দুটি প্রেসটিজিয়াস ডিভিশন ওয়ার্ডের পাশেই টি বি পাগল—টি বি রোগে আক্রান্তদের থাকার ব্যবস্থা! প্রেসিডেন্সীতে নোংরা যত্রতত্র ছড়ানো। সবাই স্নান করছে, মলমূত্র ত্যাগ করছে, উনুনধরিয়ে রান্না করছেও যত্রতত্র। আলিপুরে এসব অভাবনীয়। আলিপুরে ডিভিশন ওয়ার্ড এক দিকে, সাধারণ ওয়ার্ড আর এক দিকে। আলিপুরের টাওয়ারে উঠলে গোটা জেলের সবটা দেখা যায়। প্রেসিডেন্সীর কোনও এলাকা থেকে জেলের সব এলাকা দেখার কোনও উপায় নেই। প্রেসিডেন্সীর হাসপাতালে ঢুকলে মনে হয় আর জি কর বা নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের কোনও ফ্রি ওয়ার্ডে ঢুকেছি, আলিপুরের হাসপাতালে ঢুকলে মনে হবে পি জি-র উডবার্নে গিয়েছি!

পুরনো যাঁরা সেপাই তাঁরা প্রেসিডেন্সীকে

কাজেন পুরোনো জেল, আর আলিপুরকে নয়া জেল। তবে, আলিপুরে জেলেরও বয়স কম হয়নি। বয়সটা গুনে পড়ে সত্তরের কম নয়। তবু আলিপুরে 'বাবু' জেল, নয়া জেল। পশ্চিমবঙ্গের যে-কোনও জেলের যে-কোনও কর্মীকে জিজ্ঞেস করুন, বাবু জেল কোনটা? বিনা দ্বিধায় বলবে, আলিপুরে সেন্ট্রাল। আলিপুরে সেন্ট্রাল জেলের একটা চলতি নামও হল বাবু জেল। প্রায় সব বন্দীই ফিটফাট ছিমছাম থাকে। আলিপুরে এমন কয়েদী খুব কম মিলবে যার গায়ে নোংরা জামা, কাপড় শতছিন্ন বা ময়লা। আলিপুরে জেলে জামাকাপড় দেখে বোঝার উপায়ও নেই কে ডিভিসন প্রিজনার, কে নন-ডিভিসন প্রিজনার। আলিপুরে যেন কয়েদীদের মধ্যে পরিষ্কার থাকার, ফিটফাট থাকার একটা প্রতিযোগিতা চলছে সর্বদা।

তবু বলব, আলিপুরে নয়াদিল্লি এবং প্রেসিডেন্সী কলকাতা। নয়াদিল্লি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সাজানো গোছানো, তকতকে ঝকঝকে; কিন্তু তবু যেন সেখানে প্রাণ নেই। কলকাতা নোংরা, ঘিঞ্জি, আবর্জনাভরা, ভিড়ে ভরতি, তবু সেখানে প্রাণ আছে।

এই আলিপুরে জেলে নিয়ে গিয়ে আমাকে এক নং মিসডেমিনার সেলে থাকতে দেওয়া হল। মিসডেমিনার কথার অর্থ হল স্বল্প দোষের অপরাধী। স্বল্প অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত ইংরেজদের রাখার জন্য দুটি মিসডেমিনার সেল তৈরি করা হয়েছিল আলিপুরে— এক নং এবং দুই নং। দুই নং মিসডেমিনার সেলে তখন ছিলেন অনন্ত সিং। মিসডেমিনারের পর হল চারটি ডিভিসন ওয়ার্ড। দোতলা করে বাড়ি। পর পর চারটি। এক, দুই, তিন, চার নম্বর তাদের এবং সেই নম্বর অনুযায়ী পরিচিত। এক নম্বর ডিভিসন ওয়ার্ডে থাকেন তখন একা অসীম চ্যাটার্জি। নকশালপন্থী নেতা কাকা।

আমার, অনন্ত সিং এবং কাকার একা থাকার ব্যবস্থা। প্রত্যেক মিসডেমিনার সেলে চারটি করে ঘর। এ ছাড়া আলাদা বাথরুম, রান্নাঘর ইত্যাদি। সামনে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ছোট উঠোন। এক পাশে একটা বড় চৌবাচ্চা। এক নং মিসডেমিনারের একটি ঘরে ১৯০৪ সনে চার মাসের জন্য জওহরলাল নেহরু আটক ছিলেন। সেই ঘরে তাঁর একখানা প্রতিকৃতি রাখা রয়েছে। জওহরলাল যে সত্যিকারের সুন্দর পুরুষ ছিলেন এ সম্পর্কে কারু কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। কিন্তু আলিপুরে জেলের মিসডেমিনার সেলে তাঁর যে প্রতিকৃতি রাখা আছে তা দেখলে মনে হবে জওহরলালের চেয়ে কদাকার পুরুষ পৃথিবীতে কম জন্মেছে।

আমি যাওয়ার আগে এক নম্বর মিসডেমিনারে ছিলেন তিনজন ডিভিসন বন্দী। হুকুম ছিল, আমাকে নির্জন অবস্থায় রাখতে হবে, তাই তাঁদের সবাইকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল আমি পৌঁছবার আগেই। এক এবং দুই নম্বর মিসডেমিনার সেল আলাদা আলাদা দরজা দিয়ে ঘেরা। কিন্তু দুটোরই বারান্দা এক। মাঝখানে শুধু একটা দরজার পার্টিশন। সেই দরজাটা বন্ধ করলে এক নং এবং দুই নং মিসডেমিনারে কোনও সম্পর্ক নেই। খুললেই দুটি সেল এক। বাইরের গেট দুটি বন্ধ থাকলেও। আমি যাওয়ার আগে সন্ধ্যার পর দুই সেলের মাঝখানের দরজাটা খুলে দেওয়া হত। রাতে এক সেপাই দুই সেলে পাহারা দিত। আমি যাওয়ার পর যেহেতু আমাকে জেলের অন্য কোনও বন্দীর সঙ্গে কথা বলতে না দেওয়ার কড়া হুকুম ছিল, অতএব রাতদিন ওই গেট দুটো বন্ধ করে রাখা হত। অনন্ত সিং, অসীম চ্যাটার্জি অর্থাৎ কাকা এবং আমি পর পর বন্দী তিনজনই তিনজনের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী। বার বার জেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছিলাম; আপনাদের কারু উপস্থিতিতেই না-হয় একটু কথা বলব একজন আর একজনের সঙ্গে। অসীমবাবুর কথাতে তো সব সময়ই একজন ডেপুটি জেলার থাকেন। কিন্তু এক জবাব পেয়েছি প্রতিবারই। হুকুম নেই। অন্য কোনও বন্দীর সঙ্গে আপনার কথা বলা বারণ। অনন্তবাবু এবং অসীমবাবুও আমার সঙ্গে কথা বলার অনুমতি চেয়েছিলেন এবং তাঁরাও একই জবাব পেয়ে গিয়েছিলেন। গোটা আলিপুরে জেলে এইরকম [illegible]

সুতরাং, আলিপুরে জেলে আমার প্রধান সঙ্গী ছিল বটেশ্বর দাস। [illegible] কীর্তনের দাস বাবাজিদের কনিষ্ঠ পুত্র বটেশ্বর দাস।

ওর নিজের নাম এবং বাবার নাম দুটো দেখেই মনে হবে বটেশ্বর বাঙালী। আসলে কিন্তু তা নয়। বটেশ্বরদের বাড়ি উত্তরপ্রদেশে। তবে, বটেশ্বর এবং ওর বাবা দুজনই পশ্চিমবঙ্গে। বটেশ্বরের মা বেঁচে আছেন। বাবা নেই। মা এখন থাকেন উত্তর প্রদেশে ওদের গ্রামের বাড়িতেই।

আমি আলিপুরে জেলে পৌঁছে যখন জিনিসপত্র গোছাবার চেষ্টা করছি তখন ও এসে হাজির হল। বেঁটে খাটো পাতলা মানুষটি। ত্রিশের একটু উপরেই বোধ হয় বয়স হবে। বলল : দিন, আমি সব গুছিয়ে দিচ্ছি। আমি এই ওয়ার্ডের পাহারা। আমাদের [illegible] পাহারা ছিল না। পাহারা কে এবং কি আমি তা ভাল করে জানতামও না। জিজ্ঞেস করলাম : পাহারা মানে?

বড় জমাদার পাশে ছিল। উত্তর দিল : ও-ই এই ওয়ার্ডে সব দেখাশোনা করে। ও-ই হল এখানের পাহারা।

তারপর সুপার সাহেব এলেন, জেলারবাবু এলেন এবং দুজনেই আমাকে আশ্বস্ত করলেন যে আমার কোনও অসুবিধা হবে না। যখন যা দরকার পাহারাকে বললে ও-ই সব ব্যবস্থা করে দেবে। আমার ওয়ার্ডের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজনই হবে না।

প্রকারান্তরে ওঁরা দুজনই বলে গেলেন, আমার বাইরে যাওয়া নিষেধ। ওঁরা দুজনে চলে যাওয়ার পর কথাটা আমাকে খোলাখুলি বলল সেপাই। বলল : বাহারমে যানা আপকা মানা হ্যায়। খুব সজ্জন এই সেপাই ভদ্রলোক। এত সৎ, নিষ্ঠাবান কম সেপাই আমি আর কোথাও দেখিনি। উত্তর প্রদেশের লোক। যাওয়ার আগে বড় জমাদার বটেশ্বরকে নির্দেশ দিয়ে গেল আরও দুজন কালতু নিয়ে আসতে। ঠিক হল, একটা ঘরে ওরা তিনজন থাকবে, একটাতে আমি থাকব এবং একটা সেল খালি থাকবে। আর একটাতে তো নেহরুর প্রতিমূর্তি রয়েছে।

বটেশ্বর দৌড়ে লাফিয়ে দুজন কালতু নিয়ে এল গুদাম থেকে একটা বালতি, একটা মগ, টিনের থালা বাটি সব নিয়ে এল। বিছানা-টিছানা আগেই এসে গিয়েছিল। কালতু হিসাবে যাদের দুজনকে নিয়ে এল বটেশ্বর তাদের একজনার নাম মনোহর, আর একজনের নাম সত্যনারায়ণ। দুজনই রিকশ চালায় দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনায়। সত্যনারায়ণ রাজপুরহাটের এখানে। মনোহর ডায়মন্ডহারবারের দিকে। দুজনেই দেশ থেকে ফিরছিল। বিহার থেকে। বিনা টিকিটের যাত্রী নয়। একটা খালি মহিলা কম্পার্টমেন্টে চড়ে আসছিল। আরও অনেক পুরুষ এসেছিল সেই কম্পার্টমেন্টে। তাই ওরাও চড়ে বসেছিল। পথে দুবার টি টি টিকিটও চেক করেছিল। কিছু বলেনি। কিন্তু যেই গাড়ি হাওড়া পৌঁছল অমনি ওরা গ্রেফতার। মহিলা কামরায় ওঠার দায়ে। স্টেশনেই বিচার হয়ে গেল। এক শ' টাকা করে জরিমানা। অনাদায়ে এক মাস কারাদণ্ড। ওরা এক শ' করে টাকা দেবে কোথা থেকে! দেশ থেকে কর্মস্থলে ফিরছে। হাতে পথ-খরচা ছাড়া আর কিছু নেই। সুতরাং জেলে আসতে হল। সাত আটদিন হল আলিপুরে এসেছে। পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে ছিল। সেখান থেকে চলে এল মিসডেমিনারে। বড় জমাদারই ওদের বেছে দিয়েছিল। বটেশ্বর নিয়ে এল।

বটেশ্বর আগেও এই এক নং মিসডেমিনারে পাহারা ছিল। কিন্তু আগে রাতে ও এখানে থাকত না। থাকত অন্য ওয়ার্ডে। এবার যে ও মিসডেমিনারে থাকার ব্যবস্থা হল তাতে যেন বটেশ্বর খুশীই।

সন্ধেবেলা আলিপুরের চিফ রাইটার ভোলানন্দ এসে দাঁড়াল। [illegible] আমি ভোলানন্দ। চিফ রাইটার। আপনার কি কি প্রয়োজন বলুন? কাল সকালে ওঁরা খাতায় সব লিখে নিয়ে যাবেন। কেস টেবিলের রাইটাররা আসবেন। আপনাকে যেতে হবে না।... আপনার কি নিউজ পেপার আসবে রোজ? বললাম : হাঁ, আসবে। তিনখানা। নাম বলে দিলাম। ভোলানন্দ বলল : ঠিক আছে। কাল সকাল থেকেই কাগজ পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, [illegible]

এবার! সংগীতপ্রেমিকদের জন্য অফুরন্ত আনন্দ!

এইচ এম ভি সফারী ডিল্যুক্স ট্রানস্‌মেইন্‌স্‌

৪ ব্যাণ্ড
৪ স্পীড
পোর্টেব্‌ল্‌
রেডিওগ্রাম

ঘরে বাইরে যেখানে খুশি বাজান : অফুরান আনন্দের উৎস।

এতে আছে একটি ভেরিয়েব্‌ল্‌ টোন কন্ট্রোল যার সাহায্যে আপনি যেমন পছন্দ তেমনি স্বর চড়া বা নরম করতে পারেন। এর বিল্ট-ইন অটো-স্টপ-কারিগরির ফলে রেকর্ড বাজানো শেষ হওয়া মাত্র টার্নটেব্‌ল্‌ নিজে থেকে বন্ধ হয়ে যায়।

এর ৪ ব্যাণ্ডের রেডিওয় সারা দুনিয়ার হরেক রকমের অনুষ্ঠান শোনার জন্য পাচ্ছেন পুশ-বাটন ব্যাণ্ড সিলেক্টর। ফাইন টিউনিং কন্ট্রোলের সূক্ষ্মতার গুণে গায়ে-গায়ে লাগা শর্টওয়েভ ব্যাণ্ডের মধ্যেও আপনার পছন্দের স্টেশনটি অনায়াসে বেছে নিতে পারবেন এবং স্পষ্ট ও পরিষ্কার অনুষ্ঠান শোনা যাবে।

এইচ এম ভি সফারী ডিল্যুক্স — এই পোর্টেব্‌ল্‌ রেডিওগ্রাম একইসঙ্গে রেডিও এবং গ্রামোফোন — ফলে আপনার শোনার আনন্দ দুদিক থেকেই বাড়িয়ে দিচ্ছে। চলে মেইন্‌স ও ব্যাটারিতে।

সর্বোচ্চ প্রস্তাবিত বিক্রয়মূল্য : **৯৯৯ টাকা**
উৎপাদন শুল্ক সমেত। স্থানীয় কর অতিরিক্ত।

এইচ এম ভি
সফারী ডিল্যুক্স
একটি সেরা উপহার
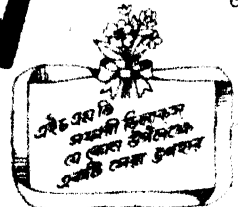
৫,৬০,০০০ এর বেশী এইচ-এম-ভি বৈদ্যুতিক 'সাউণ্ড সিস্টেম' শ্রোতাদের আনন্দ যোগাচ্ছে। তাঁদের সন্তুষ্টি আপনার সন্তুষ্টির প্রতিশ্রুতি।

ইউ ডোন্ট মাইন্ড। আপনার চুলটা দেখছি বড় হয়েছে। কাটিয়ে নেবেন নাকি? ভাল সেলুন আছে এখানে। আমি মাথাটায় হাত বুলালাম। দেখলাম চুলগুলি বেশ বড়ই হয়ে গিয়েছে। বললাম : তা কাটিয়ে নিলে মন্দ হয় না। ডোনাল্ড বলল : অল রাইট। কাল ক'টায় পাঠাব ওকে? বললাম, সাড়ে আটটা নাগাদ। ডোনাল্ড আবার বলল : ভেরি গুড। তারপর বলল : গুড নাইট! আপনার কিছু প্রয়োজন হলে জানাবেন। পাহারাকে বলবেন। ও আমাকে খবর দেবে। গুড নাইট!

ও চলে যেতে বটেশ্বরকে জিজ্ঞেস করলাম : এ কে রে?

বটেশ্বর জবাব দিল : ডোনাল্ড সাহেব। চিফ রাইটার। জেলের নানা কাজ দেখে।

প্রেসিডেন্সীতে থাকতেও এই রাইটার রাইটার শুনেছিলাম। কিন্তু এরা কারা তা জানতাম না। আলিপুরে এসে জানলাম।

রাইটার হয় সাধারণত শিক্ষিত কয়েদীরা। লেখা-পড়ার কাজে তারা জেল কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করে। জেলের বিভিন্ন দফতরেই আলাদা আলাদা রাইটার থাকে। যেমন, হাসপাতালের রাইটার, গুদামের রাইটার, টিকিট ব্রাঞ্চের রাইটার, অ্যাডমিশন ব্রাঞ্চের রাইটার, গেটের ব্রাঞ্চের রাইটার ইত্যাদি, ইত্যাদি। কাজ করতে করতে এরা এত অভ্যস্ত হয়ে যায় অনেকে যে এক-একজন ডেপুটি জেলারের চেয়ে কাজ ভাল জানে।

আলিপুরের প্রায় সব রাইটারই লাইফার অর্থাৎ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী। ডোনাল্ডও ছিল তাই। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। একদা নাকি গ্রান্ড হোটেলে কাজ করত। আসল চৌদ্দ বছর জেল খাটা হয়ে গিয়েছে ডোনাল্ডের। বিভিন্ন রেমিশন নিয়ে কুড়ি বছর। সাধারণত রেমিশন নিয়ে বিশ বছর জেল খাটা হয়ে গেলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগকারীদের ছেড়ে দেওয়া হত বছরের ছাব্বিশে জানুয়ারি। '৭৬ সনের ২৬ জানুয়ারি কিন্তু কাউকেই ছাড়া হল না। কোনও জেলেই না। তাই ডোনাল্ডও ছাড়া পেল না।

পরদিন বটেশ্বর আরও সব ব্যবস্থা করে ফেলল। ঘরের আর সত্যনারায়ণকে নিয়ে ঝাঁট দিয়ে উঠানকে ঝকঝকে তকতকে করে তুলল। চৌবাচ্চাটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে জল ভরে দিল। ডিভিশন চৌকা থেকে অর্থাৎ যেখানে ডিভিশন বন্দীদের খাবারদাবার হয়, সকাল সওয়া ছটা নাগাদ চা, টোস্ট, মাখন এবং ডিম সেদ্ধ এনে দিল। খালি সেলটাকেও পরিষ্কার করে ফেলল। ফিনাইল এনে ঘষে ঘষে বারান্দাটা ধুয়ে ফেলল। সমাচার দাশগুপ্ত একদা এই সেলে ছিলেন। তিনি সমাদ্দারমশায়ের, একটা আম গাছ, একটা ডালিম গাছ, একটা রক্তশিমুল গাছ, একটা শিউলি গাছ এবং একটা পাতি লেবুর গাছ লাগিয়ে গিয়েছিলেন। এখন সবগুলিতে ফুল ও ফল হয়। সেগুলির গোড়াগুলিও পরিষ্কার করে ফেলল বটেশ্বর। উঠানের এক পাশে একটা কামিনীফুল গাছ লাগিয়ে পাহারাদার তার নীচে একটা বেদীমত তৈরি করিয়েছিলেন। বটেশ্বর সেটাও পরিষ্কার করল ধুয়েমুছে। ডোনাল্ডের কথামত নাপিতও এসে সময়মত চুল ছেঁটে দিয়ে গেল। কেস টিকিটের রাইটাররা সব লিখেও নিয়ে গেল। স্নান সেরে ডিভিশন চৌকার ঠান্ডা ভাত ও মাছের ঝোল খেয়ে দুপুরবেলা বসলাম বটেশ্বরের গল্প শুনতে।

বটেশ্বরের সাজা পাঁচ বছর। তিন বছরের মত কাটান হয়ে গিয়েছে। ওর কেস ছিল আধুলি সিকি জাল করার। বটেশ্বর বলল : বটেশ্বর আমি সাজা পেয়ে গেলাম। এ কাজটা করত আমার দাদা। আমি একটা চায়ের দোকানে কাজ করতাম। আমি ওসব কিছু জানতাম না। দাদা থাকত বৌবাজারে। ঝগড়া করে একবার চলে এল আমার ওখানে বেলঘরিয়াতে। তখন আমার সময়। বলল, তোর কাছেই ক'টা দিন থাকব। পার্টির সঙ্গে ঝগড়া। বললাম, থাক। আমি কি জানতাম ও কি করে! রোজ সকালে চায়ের দোকানে কাজ করতে চলে যেতাম। ঘরে আর কেউ থাকত না। আমি যখন থাকতাম না তখন দাদা বসে টাকা, আধুলি,

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম : তুমি জানতে না দাদা ওসব বানায়?

ও মাথা দুলিয়ে বলল : জানতাম না। ঠিক, জানলে আটকাতাম! তারপর একদিন জোরে এসে পুলিশ ঘর ঘিরে ধরল। দাদাকে ধরল। আমাকেও ধরে নিয়ে গেল। সেই কেসে দাদার সাজা হল সাত বছর, আর আমার পাঁচ বছর। দাদা এখন আছে প্রেসিডেন্সী জেলে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : কে খবর দিল পুলিশকে যে তোমার দাদা এই কাজ করে? প্রতিবেশী কেউ?

বটেশ্বর তাড়াতাড়ি মাথা দিয়ে বলল : না, না, দাদার পার্টনারই, রাগে, হিংসাতে!

জানতে চাইলাম : এতে কত লাভ ছিল?

ও বলল : তা বাবু, এক শ' টাকায় খরচখরচা বাদ দিয়ে চল্লিশ টাকা।

তোমার দাদা দিনে কত তৈরি করত টাকা, আধুলি, সিকি?

তা সব সময় তো আর নকল চালানো সহজ নয়। পুজোটুজোর সময় বেশী চলত। অন্য সময় অল্প চলত। দাদা এক দিনে এক শ' টাকার মত আধুলি, সিকি, টাকা তৈরি করতে পারত। লোক ছিল ঠিক করা। তারা এসে নিয়ে যেত। এক শ' টাকায় নগদ টাকা দেবে। পুজো-পার্বণের সময় দিনে চার-পাঁচ শ' টাকার মাল অনায়াসে চলে যেত।

বটেশ্বর ধরা পড়ে দাদার সঙ্গেই প্রথম ছিল বারাকপুর সাব-জেলে। তারপর দুজনেই দমদমে। তারপর সেখান থেকে ও আলিপুরে এবং দাদা প্রেসিডেন্সিতে। আলিপুরে দেখতাম অনেকেই বটেশ্বরকে চেনে। বিশেষ করে অবাঙালীরা। কারণ, ও ভাল ঢোল বাজাতে পারত। ওরা যখন বিকেলবেলা মাঝে-মধ্যে ঢোল নিয়ে গান গাইতে বসত বটেশ্বরকে ছাড়া তখন ওদের চলতই না।

পরে একদিন ও এই ব্যাপারে আরও অনেক কথা বলেছিল। ওর দাদা এই কাজ শিখে এসেছিল আমেদাবাদ থেকে। তারপর বম্বেতে কিছুদিন এই কাজ করে। তারপর চলে আসে কলকাতায়। কলকাতায় কাজ করত প্রধানত মেটেবুরুজ এবং খিদিরপুর অঞ্চলে। এক বাড়িতে বসে বেশী দিন কাজ করত না। প্রায়ই ডেরা পাল্টাত। বিভিন্ন এলাকায় খুঁজে খুঁজে ঘর বের করত। কাজ করত প্রধানত রাতে। ডাইসগুলি অর্থাৎ ছাঁচগুলি অত্যন্ত সন্তর্পণে দাদা সদা-সর্বদা লুকিয়ে রাখত।

বটেশ্বর কিন্তু কোনও দিনই আমার কাছে স্বীকার করত না যে ও-ও এই নকল টাকা আধুলি সিকি বানানোর কাজে ছিল। অবশ্য সত্যনারায়ণের কাছে ও স্বীকার করেছিল যে ও-ও এই কাজ জানত।

ও প্রায়ই দুঃখ করে বলত : জানেন দাদাবাবু, মা আমাকে ভীষণ বকাবকি করেছে। বলেছে দাদার সঙ্গে মিশলি কেন? দাদাকে তোর বাড়িতে থাকতে দিলি কেন? চায়ের দোকানে আর কারখানায় কাজ করেই তো তোর বেশ ভাল চলে যাচ্ছিল! তোর বাপ কোনও দিন অসৎ পথে গিয়েছে? তোরা দু বেটাই খারাপ পথে গেলি! তুই দাদার সঙ্গে না মিশলে এমন হ'ত না।

বটেশ্বর বলত, ওর মা প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছে। শরীরও ভীষণ খারাপ। দেখবার কেউ নেই বাড়িতে। বটেশ্বর ওর মার কথা প্রায়ই বলত। ও সব সময়ই লোকে হাসিয়ে গুনগুনিয়ে গান গেয়ে সময় কাটাত। মাঝে-মধ্যে শুধু বিমর্ষ দেখতাম। বিশেষ করে দুপুর বেলায়। দেখতাম, চুপচাপ বসে আছে। সেলগুলি থেকে নিয়ে আসতাম। বারান্দায় বসতে বলতাম। বুঝতাম, ও বিমর্ষ মার কথা ভেবে। ওকে যখনই বিমর্ষ দেখতাম তখনই জিজ্ঞেস করলে একটাই জবাব পেতাম : দাদাবাবু, জানিনা বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত মা বাঁচবে কিনা, মাকে দেখতে পাব কিনা।

আমি ওকে আশ্বস্ত করতাম : নিশ্চয়ই পাবে, আবার দেখতে পাবে, তুমি তো আর লাইফার নও। আর ক'দিন পরেই তো ছাড়া পেয়ে যাবে। তারপর আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে নিতাম প্রসঙ্গ। দমদম বা বারাকপুরের জেলের কথায় চলে যেতাম। অথবা, শুনতাম জেল খাটিয়ের নানা ধরনের কয়েদের নানা কাহিনী। বটেশ্বর ওদের প্রায়ই সবাইকে চিনত। (ক্রমশ)

কণ্টকস্মৃত

অতুল্য ঘোষ

॥ ২০ ॥

১৯২৬-২৭ সাল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অফিস থেকে খবর এল কিরণবাবু (কিরণশঙ্কর রায়) ডেকে পাঠিয়েছেন। পরের দিন বাড়িতে গেলুম। ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনে। কিরণবাবু বললেন, 'একবার দুমকা যেতে হবে। দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়েছে। অনেক বাঙালীকে ধরেছে।' আমি বললুম, 'আজ্ঞে।' কিরণবাবু বুঝলেন। অতি বিচক্ষণ লোক। যেমন পণ্ডিত, তেমনি বুদ্ধিমান, তেমনি সুরসিক। বাংলা পড়াতেন এবং 'সবুজপত্রে'ও লিখতেন। ব্যারিস্টারি পাস করে এলেন, কিন্তু এক দিনও কোর্টে যাননি। আমার দ্বিধাটা উনি বুঝতে পেরেছিলেন। আমার বয়স তখন বাইশ। আমি উকিলও নই, পড়াশুনাও করিনি। আমি দুমকার মত অগম্য জায়গায় গিয়ে কি করব? তা ছাড়া মনে দ্বিধাও ছিল। যাবার পর আর কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ বিশেষ খোঁজখবর নেবেন বলে মনে হয় না। কিরণবাবু একটু হেসে বললেন, 'কোনও অবিশ্বাস করবার কারণ নেই। আমি তো আছি।'

বেরোলুম দুমকার জন্য। দুমকা হল সাঁওতাল পরগনা জেলার হেড কোয়ার্টার। এখানেই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট (ওখানে বলে ডেপুটি কমিসনার)। যেদিক দিয়েই যাওয়া যাক, চল্লিশ মাইলের মধ্যে রেল-স্টেশন নেই। দেওঘর, রামপুরহাট, সিউড়ি, মান্দার হিল সব জায়গা থেকেই চল্লিশ মাইল। তখন বাস চলন হয়েছে; পুরনো মোটরগাড়িও বলা যায়—যাতে বনেট, বাম্পার, সবের উপর বসিয়ে কুড়ি-পঁচিশজন নেওয়া যেত। আমি গেলুম রামপুরহাট হয়ে। শীতকাল। দুমকার যত কাছাকাছি পৌঁছনো গেল, তত পুলিসের চেক। বাঙালী প্যাসেঞ্জার থাকলে তো কথাই নেই। নাম, গোত্র, বংশপরিচয়—সবই পুলিসের দরকার। দুমকা এখনও তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খানিকটা বজায় রেখেছে। তখন তো মনে হত সবটাই বন, মাঝে মাঝে ক'টা সরকারী বাড়ি পুলিস কোয়ার্টার, পুলিসের ব্যারাক। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে শহর বলে মনে করবার কোনও কারণ হত না। জেলা শহর সেইজন্য কিছু দোকানপাট ছিল। আর জেলা কোর্ট বলে জেলার সর্বত্র থেকেই লোকজনের যাতায়াত। সেইজন্যই বসতি। দুটো চারটে হোটেল, চায়ের দোকান বাজারের মতনও খানিকটা ছিল। বিহারের প্রথম ষড়যন্ত্র মামলা, সেইজন্য অগম্য দুমকা প্রায় দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছিল। চারিদিকে শুধু পুলিস আর পুলিস।

আমি একটা ধর্মশালায় উঠেছিলুম। সকাল-বেলাই পুলিস এসে হাজির। যিনি অফিসার আবার রায়বাহাদুর। কতরকমের কথা। ... আত্মীয়স্বজন ধরা পড়েছেন কি না, তার খোঁজ নেওয়া। এই শীতে দুমকায় একটু কষ্ট হবে, তাও বললেন। কষ্ট শীতের জন্য না হলেও অন্যরকমে হল। প্রায় দোকানীই জিনিস বেচতে চায় না, হোটেল-ওয়ালারাও সেইরকম। কোর্টে গেলুম, সেখানে উকিলবাবুদের ব্যবহার দেখে মনে হল, আমি যেন কোনও অন্য গ্রহ থেকে এসেছি। চোখ-ভরা ঔৎসুক্য, কিন্তু ঠোঁট বন্ধ। একজন উকিলবাবু একটু এদিক-ওদিক চেয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'সাঁওতাল পরগনা তো নন্-রেগুলেটেড জেলা, এখানকার নিয়মকানুন সবই আলাদা। উকিলবাবুদের প্রতি বছর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে লাইসেন্স নতুন করে নিতে হয়।' আমি মর্মে মর্মে তা অনুভব করলুম। বার লাইব্রেরীতে বসবার তো জায়গা পেলুমই না, আর আসামী পক্ষে দাঁড়াবার কোনও উকিল পাওয়া সম্ভব হল না। একটু ক্ষুণ্ণ হলুম, জেদও একটু চাপল। রাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। খেয়ে এসে দেখি, যে ধর্ম-শালায় উঠেছিলুম তার দরজা বন্ধ। আমার দুটো কম্বলের বিছানা, আর দু-একটা কাপড়-জামার ব্যাগ গেটের বাইরে। অনেক ডাকাডাকি করায় দারোয়ান খুব কাতরভাবে জানাল যে, আমার ঢোকবার হুকুম নেই। বুঝলাম। শীত-কাল। তায় আবার দুমকা শহরেই তখন নেকড়ে বাঘ, ভাল্লুক—এসব বেরোত। উপায় নেই। সেই ধর্মশালার দরজায় ঠেস দিয়ে রাত কাটিয়ে দিলুম। একটু ভয় ভয় করছিল। বাঘ-ভাল্লুকের চেয়ে মানুষের ভয়ই বেশী। যদি পুলিস হঠাৎ ধরে নিয়ে কোনও অজানা জায়গায় পাঠিয়ে দেয়, তা হলে আর কাউকে কোনও খবর দেওয়া যাবে না। যাই হোক, সে রাতও কাটল। সারা রাত্রে কতরকম আওয়াজ। শাল, পিয়াশাল, মহুয়া, অর্জুন—আরও কতরকমের বড় বড় গাছ। সারা রাত্তির মনে হল, তারা যেন হাঁটা-চলা করছে। ভয়, অথচ একটা অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা। সকালে দেওঘর পৌঁছলুম।

দেওঘর জানা জায়গা। মাতামহের একটি বাড়ি ছিল, তাই প্রতি বছরই যাওয়া হত। শশীদাকে চিনতুম। শ্রীশশীভূষণ রায়। জেলা কংগ্রেস কমিটির কর্ণধার, আরও বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। সব কাজেই সাহায্য পাওয়া যেত। আর চিনতুম বিনোদাবাবুকে। শ্রীবিনোদানন্দ ঝা। জেল-খাটা লোক। পাণ্ডা বংশে জন্ম, কিন্তু কিছুই মানতেন না। পরে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। শশীদা এবং বিনোদাবাবু সব শুনে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। দেখলুম, খানিকটা অসহায়ের মত মনোভাব। যাই হোক, ও'রা নিয়ে গিয়ে তুললেন এক ধর্ম-শালার তেতলার ঘরে। তারপর খোঁজ করলুম, জানাশুনো কে তখন আছেন দেওঘরে। অমরদা আছেন। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বোস। যে বরদাচরণ বোসের নামে দেওঘরের স্কুল, সেই পরিবার-ভুক্ত। আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিত। আর আছেন জলপাইগুড়ির 'টি কিং' নামে খ্যাত শ্রীযোগেশ-চন্দ্র ঘোষ। যোগেশবাবুর ছেলে তেজেশ একজন আসামী। হুগলীর পণ্ডিত ধরানাথ ভট্টাচার্য, নদীয়ার শ্রীকিরণমোহন সান্যাল—এরকম কয়েক-

জন খ্যাতনামা লোকও আছেন আসামীদের মধ্যে। প্রথমে অমরদার কাছে গেলুম। তিনি সব শুনে উকিলের জন্য চেষ্টা করবেন বললেন। তারপর গেলুম শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষের কাছে। সেখানে আলাপ হল শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে। প্রকাশ পেল, তাঁর বড় ছেলে আমাদের অনাথদা। অনাথদার পরবর্তী কালে শিক্ষাবিদ হিসাবে খুব নাম হয়েছিল। দিল্লী ইউনিভারসিটিতে ছিলেন, বিশ্বভারতীতেও ছিলেন। যোগেশবাবু সবই শুনলেন। হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল। তিনি আমার মাথায় তাঁর দুটি হাত রেখে বললেন, 'বাবা, আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি ভবিষ্যতে অনেক কাজ করবে।' স্বাভাবিকভাবেই আমি একটু অভিভূত হলাম। যোগেশবাবুর পরিবারের সঙ্গে সেই থেকে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

ধর্মশালায় গিয়ে দেখি পুলিসের সার্চ হয়ে গেছে, অমরদার বাড়িও সার্চ হয়েছে। বিকেলে সকলে একত্রিত হলুম অমরদার বাড়িতে। স্থির হল, কেস দুমকা থেকে দেওঘরে স্থানান্তরিত করতেই হবে। শশীদার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে মধুপুরে মতি মিত্তির মশায়ের বাড়ি গেলাম—ওঁর তখন দোর্দণ্ড প্রতাপ, যদি গিরিডির কোনও উকিল পাওয়া যায়। মতিবাবুর বাড়ি সদাব্রত, উনি পাতরোলের দেওয়ান। যে পাতরোলে এখনও হাজার হাজার মানুষ দূর দূর জায়গা থেকে যায়, আর অসংখ্য ছাগবলি হয়। খুব যত্ন, খাওয়াদাওয়ার সুব্যবস্থা সবই হল। নামও খুব ওঁর। তিনি আশ্বাস দিলেন উকিল ঠিক করবার। সেখান থেকে গেলুম রামপুরহাট। তখন জে এল ব্যানার্জী মশাই রামপুরহাটের বাড়িতেই আছেন। সস্নেহে খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং অনুরাগমিশ্রিত ভর্ৎসনা করলেন যে, আগে তাঁর কাছে যাইনি কেন। ওইখানেই গিরিজার সঙ্গে দেখা হল। আগে ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল শ্রীগিরিজা মুখোপাধ্যায়। এই গিরিজা মুখার্জীই কর্পোরেশনের অধিকর্তা বেণীমাধব বড়ুয়ার কন্যাকে বিবাহ করে। পরে ফরাসী দেশে যায়, সেখানে লেখাপড়ার কাজে অনেক নাম হয়। ঐখান থেকেই 'ফরওয়ার্ড' কাগজে একখানি চিঠি পাঠাই। 'ফরওয়ার্ড' কাগজের তখন অসীম প্রভাব। তারা বড় বড় করে ছাপে যে, সাঁওতাল পরগনার উকিলরা মক্কেলের কথা বেশী ভাবে না, তার চেয়ে বেশী সম্পর্ক রাখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাবুর্চি-খানসামার সঙ্গে। তার পরদিন এক অঘটন ঘটল। পাকুড়ের শ্রীকালিদাস রায় কি এক কাজে রামপুরহাট এসেছিলেন। আমার মুখে সব শুনে সঙ্গে সঙ্গে আসামী পক্ষে দাঁড়াবার জন্য রাজী হলেন। ইতিমধ্যে আমি কলকাতাতেও অনেক খবর পাঠিয়েছি। টাকা পাইনি, কিন্তু খবর পেয়েছি ব্যারিস্টার এস কে সেন আসবেন। অবশ্য তাঁর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা সব আমাকেই করতে হল। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ কোনও লোক বা টাকা পাঠাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।

সেই পুরনো পথেই রামপুরহাট থেকে [illegible]। [illegible] ব্যবহার এবং যার লাইব্রেরীর ব্যবহারও অন্যরকম। কারণ 'ফরওয়ার্ড' কাগজে চিঠি বেরিয়ে গেছে। উপেক্ষা তো নেই-ই, বরং একটু আপ্যায়নের ভাব। দেওঘর দিয়ে শ্রী এস কে সেন ব্যারিস্টার মহোদয় এলেন, আর পাটনা থেকে এলেন শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায়। কৃষ্ণবল্লভবাবু তখন বিধান পরিষদের সদস্য। আর একজন এসেছিলেন আমাদের হেমেনদা। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, যাঁর গিরিশ ঘোষের উপর বই অতুলনীয়। হেমেনদা আর মনোরঞ্জনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) ঢাকা থেকে কলকাতা আসবার পথে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান।

দুমকায় একটা স্মরণীয় ঘটনা ঘটল। রাতে থাকবার জায়গা পাওয়া যায় না, কৃষ্ণবল্লভবাবুও পাননি। খুব বিপদ। অথচ থাকতেই হবে, পরের দিন মামলা। আমি তখন নিষিদ্ধ পল্লীতে গিয়ে বললুম, 'মায়েরা, দুটো-তিনটে ঘর আমাদের খালি করে দিন। আমরা এই কাজে এসেছি, কিছু টাকা দেব।' সমাজের অস্পৃশ্যা মহিলারা জিভ কেটে বললেন, 'বাবা, সে কি কথা! টাকা দিতে হবে না। যে ক'টা ঘরের দরকার, আমরা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এবং আমাদের ছোঁয়া যদি খাওয়া চলে, তা হলে এখানেই আহারাদি করতে হবে।' তখন মনের যা অবস্থা হয়েছিল, ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারব না। খালি মনে হয়েছে, এই মহীয়সী মহিলাদের সম্যক মর্যাদা দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই—আমরা এত অকৃতজ্ঞ। তার পরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। মামলা দেওঘরে স্থানান্তরিত হল। তখন আর প্রদেশ কংগ্রেস কোনও সম্পর্ক রাখা প্রয়োজন আছে মনে করলেন না। আমি গিয়ে বীরেন শাসমল মশাইকে ধরলুম। সম্পূর্ণ অপরিচিত। অত্যন্ত দরদ দিয়ে আমার সব কথা শুনলেন ও সঙ্গে সঙ্গে আমায় জানিয়ে দিলেন, দেওঘরে গিয়ে আসামী পক্ষ সমর্থন করবেন। এই শাসমল মশাই এক অদ্ভুত মানুষ ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় মেদিনীপুর জেলায় ওঁর নেতৃত্বে চৌকিদারি ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন হয়। আন্দোলন সর্বত সাফল্য অর্জন করে। সরকারী যন্ত্র অচল হয়ে গিয়েছিল।

পরের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। বিহার আইনসভার দলপতি নির্বাচন। প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষ্ণবল্লভবাবু আর বিনোদাবাবু। আমাকে ওয়ার্কিং কমিটি পাঠিয়েছেন নির্বাচন পরিচালনার জন্য। দুজনেই আমার পুরাতন বন্ধু এবং বয়োজ্যেষ্ঠ। সানুনয়ে দুজনকে বললুম, 'দুজন মুখ্যমন্ত্রী তো হবেন না, একজন মুখ্যমন্ত্রী হন এবং আর একজন সহকারী মুখ্যমন্ত্রী।' কোনও ফল হল না। নির্বাচনে কৃষ্ণবল্লভবাবু জয়ী হলেন। আমি সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বললুম, 'আজ যাঁকে নেতা নির্বাচিত করলেন, ইনি দুমকায় এক নিষিদ্ধ পল্লীতে রাত কাটিয়েছেন।' সভার সকলে হতচকিত। অস্ফুট গুঞ্জন। সে এক উপভোগ্য অবস্থা। কৃষ্ণবল্লভবাবু একটু দৌড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দু' হাত জোড় করে বললেন, 'আমি নিষিদ্ধ পল্লীতে রাত কাটিয়েছিলাম, কথাটা ঠিক। কিন্তু আমার সঙ্গে ছিলেন আজকের সভার সভাপতি।'

অতুলনীয় রূপ-লাবণ্য.
মনোহর. রেশম কোমল. স্নিগ্ধ সুন্দর.
তোলে রেশম কোমল, স্নিগ্ধ সুন্দর।
LUX
LUX
SUPREME
এর পর আপনার
আর কিছুই পছন্দ হবে না
হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেডের উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

এরা সব দুস্থ গ্রাম

[illegible] দে

[illegible] থেকে ছুট করে ঝলকে ঝলকে,
বর্ষার সম্পূর্ণ রূপ—নাকি মৃত্তিকার রস।
কখন বা উন্মাদ সরসতা, কখনও বা শিথিল পলকে
সূর্যের দৈবিক দ্যুতি।

কখনও বা ধানের আকৃতি : জল! চায় জল!
[illegible] শোষণ করে উল্‌পীর মৃত্তিকা গহ্বরে।
দুই চাষী ধান বোনে, ধান রোয়, কবে বা তুলবে ঘরে ঘরে!
[illegible] পরগণায় সকলে বিহ্বল।

অথচ তাদেরই মধ্যে মাঝে মাঝে মারামারি—
অনেকে স্বয়ম্‌-স্বার্থে, নিতান্তই মানবিক বটে!
[illegible] চলেও না, কে বা জিতি-হারি!
পাড়ায় পাড়ায় তাই নানা কেচ্ছা রটে।

এরা সব দুস্থ গ্রাম! তার তবুও কত না
চলে খিটিমিটি! আবার সম্ভাবও বটে!
মাঝে মাঝে শোনা যায় হরেক-ও রটনা—
শহরে যেমন, গ্রাম-গ্রামান্তরে তাই রটে।

অথচ ভালোও আছে বেশ কিছু কিছু সত্যই মানুষ,
কেউ কেউ শান্ত আর পরিশ্রমী তাতে,
আবার কেউ বা খালি জোচ্চুরিতে মাতে আর মাতে—
তা সে মেয়েই হোক্‌ বা হোক্‌ না পুরুষ॥

একেকদিন এই শহরে আমি

দেবাশিস বসু

চাপা অভিমানের মতো আলো বাতাস
ঘোর লাগা জ্বরের মতো উত্তাপ
শীতের রাতের মতো নির্জনতা আর
মিছিলের মতো কোলাহলে মাখামাখি
আমার ব্যক্তিগত কলকাতা,
এখানেই জন্ম-আবাসিক এই আমি আপাত উদ্দেশ্যহীন—
একমাত্র সিগারেটের আগুন আঙুল ছুঁলে মনে হয়
বেঁচে আছি।

ব্লেড দিয়ে হাতের রেখায় খাল করেছি
ভবিষ্যতের সুখের কুমীর এলো বলে,
প্রতিটি আগামীদিনকে গতদিন করে ছাড়ে এইরকম হতচ্ছাড়া
ক্যালেণ্ডারকে ঘর থেকে তাড়িয়েছি
যখন তখন মন খারাপ ভালো করতে পারে এমন বধিও
ভূ-ভারতে নেই, তাই

একেকদিন ময়দানে ঘুরে শরীর জুড়োই
চোখ ঠেরে মনুমেন্টকে দেখি—যেন একখানা বিশাল উরত,
আর একটা কোথায়? খুঁজতে খুঁজতে আমি ভিক্টোরিয়ার
কেয়ারি করা ফুলের বাগানে......
সেখান থেকে রেড রোড, তারপর হঠাৎ
গঙ্গার ধারে
জেটিতে দাঁড়িয়ে ঘোলাজলে টুকরো টুকরো মন খারাপ ছুঁড়ে দিই
নোঙর করা বিদেশী জাহাজের দিকে তাকিয়ে বলি—
'জলের ভেতরে আমার বিষণ্ণতাগুলো মৃতের শরীর নিলে
কেবল তখনই জেটি ছেড়ে যেয়ো।'

সহসা পশ্চিমের আকাশে সূর্য থেকে গাঢ় রক্তপাত হয়
নিহত সূর্যের সম্মানে নাবিকেরা মাস্তুলের পতাকা নামিয়ে ফেলে
চারপাশের আলো আর স্টিমারের ভোঁয়ের মধ্যে অভিষিক্ত আমি
যেন একটা নতুন মানুষ
সম্রাটের মতো ধীর পদক্ষেপে নেমে আসি।

দুই দিক

[illegible]েন্দ্রনাথ রক্ষিত

[illegible] উড়তে থেমে যাওয়া, স্তব্ধ হতে গিয়েও উঠি চমকে
[illegible] আসছি তরতরিয়ে, হঠাৎ—
[illegible] লাগলো ঘণ্টা বেজে-ওঠা সে-বিহ্বল।
[illegible] কিছুই হয়নি যেন জ্যোতির্মণ্ডলে ;
[illegible], হয়তো বা খয়েরী
[illegible] মতো, গাছ কাটার শব্দে থতমত
[illegible] যাচ্ছি বাড়ি...
[illegible] মধ্যে কে আসছে কে যাচ্ছে, দেখি করাত আছে থমকে!

[illegible] আমাকে দিয়ে দরজা
[illegible] হবে? যেমন ছিলো খোলা ছিলো বন্ধ
[illegible] অন্তরাত্মাটিকে পাখিতে খায় ঠুকরে,
[illegible] তারও ধ্বংসের আনন্দে—
টুকরো-টুকরো হয়ে যাওয়া ইট-কাঠ-পাথরই
দাঁড়িয়ে পড়লো জলে,
আমার দুটো দিকের একটি ভেঙে পড়লেও আমি
[illegible] কি [illegible]?

পদ্ম ফুল। ফুল বিকাশ চৌধুরীর প্রিয় বিষয়বস্তু। সরকারী আর্ট কলেজের এই সদ্য পাশ করা শিল্পীটি শুধু ছবি বা তৈলচিত্রে নয়, মস্ত মস্ত ম্যুরাল রচনায়ও সুন্দরভাবে নানা ফুলের মনোহর রূপ তুলে ধরেছেন। কিন্তু একালের শিল্পী বিকাশ, [illegible] শুধু না দিয়ে, সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী রঙ ও রেখার আঙ্গিকের দিকে নজর রাখেন বেশী। ফলে প্রকৃতির [illegible] রূপ কিছুটা বিকৃত হবেই। কিন্তু ছবির আকর্ষণ শক্তি অনেক বেড়ে গেছে!

টাইরেক্সাস!
পালা!
!

ওকে হয়রান করে ফেলতে হবে!

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে! এইবারে বাঁধব!
!
!

এইবার ওকে বন্দী করা যাক!

জোরে ধরে রাখো! আর একটা ফাঁস পরাচ্ছি!

বাপরে! কী জোর!
2:27

আর একটা ফাঁস পরাব!

...নাও, এবারে টানো!
কিন্তু ওকে নিয়ে কী করব এখন?

নিয়ে স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য বজায় রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হইছে বাপ, এট্টু ঠান্ডা মাথায় খোলসা করে কও দিন? দাউদ কী করিছে? কনে দাউদ? আমরাও তো তার পিত্তোশে বসে আছি।"

"দাউদ বাড়িতে আসেনি!" রাখহরি আর্তনাদ করে উঠল, "চাচা ভাগ্নি আমার সব্বোনাশ হয়ে গেছে। ওরে দাউদ, ওরে কালোজিরে! তোদের মনে এই ছিল! হায় হায় হায়!"

এবার হাজী ছাহেব একরাশ উদ্বেগ নিয়ে বলে উঠলেন, "রাখ বাপ! পরে কাঁদো। সিদাসির কও দিন, কী হইছে?"

"চাচা!" বুকফাটা আর্তনাদ করে রাখ বাইতি বলে উঠল, "দাউদ আমার কালোজিরে নিয়ে ভেগে পড়েছে। চাচা, যদি জানেন, দাউদ কুথায় গেছে, কয়ে দ্যান আমারে। এর শোধ আমি নেবো।"

"কী মুশকিল, কালোজিরেডা কী, সিডা কবা তো?"

"কালোজিরে," বাইতি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, "আমার বউ।"

মজলিসে "কও কী?" বলে সমস্বরে একটা বিস্ময়সূচক ধ্বনি উঠল। ফটিক বেশ স্পষ্টভাবেই এটা শুনতে পেয়েছিল। তারপরই সে মাথা ঘুরে বাপের পায়ের কাছে পড়ে গেল। তার চেতনা লুপ্ত হল।

কত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিতে পারে মেয়েরা! দাউদ অবাক হয়ে যায়। খুলনার হোটেলে এসে দাউদ নিজের ঠিক নামটাই লেখাল। শেখ দাউদ। পিতার নাম? ঠিক বলল। শেখ রহমান। বিবির নাম? জিরে বিবি। কোত্থেকে আসা হচ্ছে? দাউদ ঝিনেদার একটা ঠিকানা দিল। চাচার আড়তের। যাওয়া হবে কোথায়? ঢাকা। কোন্ কাজে? দাউদ জবাব দিল, মাছের কারবার খোলবো। বাস। প্রশ্ন শেষ। দাউদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। চাকর একটা চাবি নিয়ে সঙ্গে এল। দাউদ বাত ধোত সব বোঝে। চাকরের হাতে এক সিকি বকশিশ গুঁজে দিয়ে বলল, "নতুন বিছানা দাও। আর শোনো, বিবিদের হাত মুখ ধুবার জায়গাডা কনে? সাফসোফ করে পানিটানি ঠিক করে রাখে আসে আমাদের ডাকবা।"

"জি। আগে বিছানাডা আনে দিই।" লম্বা সেলাম দিয়ে চাকরটা চলে গেল।

কালোজিরে বলল, "ইবার ইডা, এই বস্তন্নাডা খুলি?" বোরখার ভিতরে সে সেদ্ধ হচ্ছিল।

দাউদ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না। আর একটু সবুর কর। বিছানাডা পাতে দিয়ে যাক।"

বলতে না বলতেই চাকরটা বিছানার বান্ডিল নিয়ে ঘরে ঢুকল। তারপর বলল, "মে, এট্টু মেহেরবাণী করে আপনারা চিয়ারে বসেন। আমি বিছানাডা পাতে দিই।"

চাকরটা দুটো ওয়াড়পোশ জোড়া দিয়ে যখন বিছানা পাতছিল, আর পাশে বোরখা ঢাকা কালোজিরে, [illegible], তখন এক লহমার জন্য দাউদের মনে হয়েছিল, তার পাশে কালোজিরে নয়, ফটিকই বুঝি বসে আছে। কী হতে কী হয়ে গেল? এখন যখন কালোজিরে তার বুকে, সুখে এলিয়ে আছে, [illegible] এবং দাউদের মন হালকা এবং রাত্রি গভীর তখন দাউদের মনে হল, ফটিক ওর পথ চেয়ে জেগে বসে আছে। দাউদের ফটিকের জন্য কেন কষ্ট হতে লাগল। ফটিকের সঙ্গে সে বেইমানি করেছে। কিন্তু দিতে লাগল, ব্যাপারটা এমন হঠাৎ হয়ে গেল যে আমার কোনও হাত ছিল না।

কালোজিরে দাউদের শিথিল শরীরটা ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে খাটের উপর উঠে বসল। বেশবাস ঠিক করে নিয়েই দাউদকে বলল, "ওঠো, আর দেরী করো না। দুকানে গিয়ে সিদাসির আরেকটা সুটকেস আর আরেকটা বোরখা কিনে আনো। দুটোর বাসের আর দেরী নেই। ঐ বাসেই বেরোয়ে পড়ব।" দাউদ ইতস্তত করছে দেখে কালোজিরে তার চোখের উপর চোখ রেখে বলল, টাকার চিন্তা? এই ন্যাও টাকা। বলেই ব্লাউজের তলা থেকে একমুঠো টাকা এনে বনাৎ করে ফেলে দিল। বিশ্বাস করো, হাতের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দাউদ প্রাণপণে ফটিককে বোঝাতে চাইল, আমি ইচ্ছা চাইনি, চাইনি। ফটিক শোনো, আমি এরে নিকে করব। তারপর ঢাকায় ঘর ঠিক করে তুমারেও নিয়ে আসব। ফটিক, তুমি বিশ্বাস করো।

রহমান নির্বিরোধ, স্বভাবত শান্ত মানুষ। সাত চড়ে কথা বলে না। হঠাৎ সে খপ করে জ্বলে উঠল, হাঁকড় মেরে বলল, "মিথ্যে কথা! আমার দাওয়ালের নামে ফের যদি অ্যাকটা কথা কইছ তো তুমার জিভ আমি টানে ছিঁড়ে ফালব।"

জ্ঞান ফিরে আসতেই ফটিক, ফটিকের কোলে তার মাথা, ফটিক চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে, তার শ্বশুরের কথা শুনতে পেল। হ্যাঁ, মিথ্যে কথা। সেও মনে মনে বলে উঠল। তার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। দ্যাও ঐ মিথ্যুকটার জিভটা ছিঁড়ে দ্যাও।

রহমানের প্রচণ্ড রাগ দেখে রাখহরি থমকে থেমে গেল।

হতভম্ব হয়ে রাখহরি বলল, "মিথ্যে কথা! তুমার দাওয়াল আমার বউরি নিয়ে পলায়ে গেছে, সিডা মিথ্যে কথা? এখেনে বসে বসে নাড়া মা নাড়ো তাঁর হাটখুলায় চলো। শুনবা চলো, তুমার গুণধর দাওয়ালের কীর্তি নিজির কানে শুনবা চলো। তুমি আমার জিভ ছিঁড়ে নিবা, অ্যাঁ? আমার জিভ ছিঁড়ে নিবা? হাজী চাচা, আপনি থাকতি এই হলো বিচের? যদি যার শিল যার নড়া, তারি ভাঙিস দাঁতের গড়া! এই হলো বিচের! অ্যাঁ, ? তুমার দাওয়াল আমার বউ চুরি করিছে, টাকা চুরি করিছে, গয়না নিয়ে ভাগিছে। আমার সব্বোনাশো নিয়ে গেছে। এই কলায়। ন্যাও, ছেঁড়ো আমার জিভ।"

রাখ একটু থেমেই বুকফাটা চিৎকার করে উঠল "আমো! ছেঁড়ো—ও।"

হাজী ছাহেব এবার নিচে নেমে এলেন। রাখহরিকে জড়িয়ে ধরলেন। ওর হাত থেকে থাড়াটা নিয়ে নিলেন, "বাপ রাখো, মাথা গরম করে না। বিপদ আপদ ঘটলি মাথা ঠান্ডা রাখলি, বুদ্ধি বেশী গজায়। চলো উপরে চলো। সবরা চলো। এট্টু ঠান্ডা হও। তারপর সব কথা আমারে কও, যাতে ব্যাপারটা বুঝি। তারপর দ্যাখা যাবে, তুমি কী পিরতিকের চাও। তবে অ্যাকটা কথা কই বাপ, বিশ্বেস কর, দাউদ এখেনে নেই। সকালে নাস্তা খায়ে বেরোয়ে গেছে, অ্যাখনও ফেরেনি। আমরা সবাই ওর চিন্তা ভাবতিছি। আর তাছাড়া দাউদ যদি অ্যামন কম্ম কোরেই থাকে, কোন্ মুখি এ মুখো হবে? আমরা তারে জায়গায় না দেখো জান?"

লোকটাকে পিটিয়ে ভাগিয়ে দেয় না কেন উরা? ফটিক বুঝতে পারছে না। ওর সঙ্গে আলাপ করে অত কথা কওয়ার দরকারই বা কী? ও মিথ্যেক, ও মিথ্যুক, ও মিথ্যুক।

রহমান বলল, "তুমি যে আমার দাওয়ালের নামে অ্যাত অ্যাত নালিশ করিছ, তার সাবুদ কিছু আছে? সাক্ষী আছে?"

ঠিক। সাক্ষী কনে? খালি গলাবাজি করেই জিতে যাবা, না? ফটিক বলতে চাইল।

"সাক্ষী?" এবার আর বাইতি চ্যাঁচালো না। আছে। আছে।"

না। না। না। ফটিক আর্তস্বরে প্রতিবাদ করতে চাইল। কিন্তু উৎসাহ পেল না।

লোকটা যেভাবে বলল প্রমাণ আছে সেই কথাতেই ফটিকের বুক কেঁপে গিয়েছিল। লোকটা চলে গেলে হাজী ছাহেব খালেককে বাইকে করে হাটখোলা ঘুরে এসে খবর জানাতে বললেন। মেয়ারাও যেতে চাইল। হাজী ছাহেব তাকে যেতে দিলেন না। খালেক গেল। খালেক আসা পর্যন্ত ফটিক ও-বাড়িতেই বসে থাকল। ফটিক আবার যেন নিজের স্বর্গে ফিরে এসেছে। আর অস্থিরতা নেই। কাজির হুকুম শোনার জন্য সে এখন প্রস্তুত। খালেক এসে জানাল, খবরটা সত্যি এবং সাক্ষী-সাবুদ যথেষ্ট আছে। শুধু তাই নয়, হাটখোলার আবহাওয়া গরম হয়ে উঠেছে। হিন্দু নারী অপহরণের জন্য হাটশুদ্ধ হিন্দুরা মুসলমানদের উপর খেপে উঠেছে। গ্রামে গ্রামে ওরা খবর পাঠিয়েছে।

ফটিক সেই যে ও-বাড়ি থেকে উঠে চলে এসেছে ঘরে, আর বের হয়নি। বাতিটাও জ্বেলে না ফটিক। ঘটকার অন্ধকারে চেয়ে আছে সেই থেকে।

এমন কি আছে সেই মেয়েটার যা তার নেই। যে জন্যে ফটিককে ফেলে সেই মেয়েটাকে নিয়ে ভেগে পড়ল দাউদ? ফটিকের সেই মেয়েটাকে দেখতে বড় ইচ্ছে হল। ফটিক এত হারে কেন? খালি হারছে সে।

হঠাৎ ও বাড়ির কুঁকড়োটা প্রথমে, তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বাড়ির কুঁকড়োটা জোরে ডেকে উঠল। একটু পরেই ফজরের নামাজের আজান শুরু হবে। আরী, ফজর নামাজের আজান? তার মানে তো বিহান হয়ে এল? এর পর আলো ফুটবে। দিন হবে। দলে দলে পড়শীরা এসে জড়ো হবে। কত রকম কথা বলবে লোকে। কত রকম চোখে চাইবে তার দিকে। তার ব্যর্থতা নিয়ে সহানুভূতি সমবেদনা ঠাট্টা বিদ্রূপ কিছু আর বাকী রাখবে না কেউ!

ফটিক বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। নিঃশব্দে দরজা খুলল। নিরুদ্বেগভাবে ঘরের কোণে রাখা ওজনের ভারী ঘড়াটাকে কাঁখে তুলে নিল। তারপর রোজ যেমন যায় তেমনি খিড়কি পুকুরে চলে গেল। তবে আজ আর হাজীদের বাঁধা ঘাটে না। ওদের ঘাটে গিয়ে দাঁত মাজতে বসল। ধীরে সুস্থে মুখ ধুলো। পরনের শাড়িটা আঁট করে পরল। আঁচলটা বড় করে পায়ে লম্বা করে দিল। মাঝখানটা দিয়ে নিজের গলায় একটা ফাঁস এমনভাবে বাঁধল যাতে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট না হয়। আঁচলের মুখটা দিয়ে ঘড়ার গলাটা বেশ শক্ত করে বেঁধে নিল। টেনে টেনে দেখল, খুলবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই।

"আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার!" ফটিক চমকে উঠল। মোয়াজ্জিন যেন ওর কানের কাছে মুখ এনে আজান দিয়েছে।

ফটিক নিঃশব্দে জলে নেমে গেল। আর ভোরের ঠান্ডা জলে তার শরীরের সব তাপ, সব সন্তাপ, সব জ্বালা যেন জুড়িয়ে গেল। খুব আরাম বোধ করল ফটিক। আঃ কী শান্তি! সে ঘড়া বুকে ধরে নিঃশব্দে সাঁতার কেটে একেবারে মাঝ পুকুরে চলে গেল।

"আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার!" আল্লাহু মহান আল্লাহ মহান। মোয়াজ্জিনের আহ্বান দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ফটিক একবার শুকতারাটা দেখে নিল। তারপর ঘড়াটা উল্টে ধরতে লাগল। একটুক্ষণ বকবক করল তারপর ঘড়াটাই ওকে টেনে নিল

বন্দী!

খাঁচা রাজলক্ষ্মী দেবী

'পাখী পাখী—পাখী—'। ইঃ। জানালায় এসে একটুক্ষণ বসতে না বসতেই ওদের ডাকাডাকি শুরু হলো। যেন, পাখা মেলে উড়তে না পারি, ডানা ঝাপ্টানোর অলীক স্বাধীনতাটুকুও নেই আমার।

'পাখী—পাখী—পাখী'। কে আমার এই অদ্ভুত নাম রেখেছিলো, আমি জানি। ওই দাই জ্ঞানদা বুড়ী। লাঠিতে ভর দিয়ে ঠুক ঠুক করে হাঁটে, দুটো চোখেই ছানি পড়েছে। কিন্তু আজ থেকে বিশ বছর আগে নিশ্চয় শক্ত সমর্থ ছিলো। বছর বছর মায়ের আঁতুড় সামলাতে আসতো জ্ঞানদা বুড়ী। আমার জন্মও হয়েছিলো তারই হাতে। পাখির মতো ক্ষুদ্র, ক্ষীণ, অপুষ্ট আমার এই আঠারো বছর বয়সের শরীর। কিন্তু অকর্মণ্য এই শরীরটাতে আমার, ছট্ফটে তাজা একটা উড়াল-দেওয়া মন।

'পাখী—পাখী—পাখী'। আমি কেন এমন হয়েছি। সে রহস্যও আমি জেনে গিয়েছি। জানিয়ে দিয়েছে ওই জ্ঞানদা বুড়ী। 'আঃ লো, তোর মায়ে তো ঔষধ খাইছিল। পেট খসানের ঔষধ। পেট তো খসল না, শেষে সাত মাসের মাথায় তুই জন্মাইলি। রা নাই শব্দ নাই। কতো সেঁক তাপ দিয়া তোরে আমি বাঁচাইলাম। আঙ্কুটুকুনি পাখীর ছানাডার মতন ছিলি।'

ভাগ্যিস্ বাঁচিয়েছিলো। আমি মানুষ প্রমাণ না হয়ে পাখীর ছানার মতো জন্মেছিলাম,-তা নিয়ে এই মুহূর্তে আমার এতটুকু ক্ষোভ নেই। যতোক্ষণ মনে মনে আমি পাখা মেলে উড়তে পারি,— যতোক্ষণ স্বপ্ন দেখতে পারি,—যতোক্ষণ এই জানালার পাল্লাটিতে বসে নিজের মনকে নিয়ে খেলতে পারি,—ততোক্ষণ জীবনকে এক মহার্ঘ বস্তু বলেই মনে হয় আমার। জন্মের পর পরই মরে যেতে পারতাম, এই সম্ভাবনাটা ভেবে দেখতেও বিশ্রী লাগে।

জানালাটা ও-বাড়ির জানালার মুখোমুখি। ওদের জানালাটা পুরোপুরি খোলা, কিন্তু আমাদেরটার শুধু ওপরের পাট আমি খুলে রাখি। আমাদের জানালা বন্ধই থাকে, কিন্তু ওদের জানালায় ফুলকাটা পর্দা ঝুলছে। পুরো খোলা থাকলেও তাই ঐ জানালাটা মাঝে মাঝে ঢেকে যায়। আর মাঝে মাঝে হাওয়া এসে পর্দাকে এক ঝাপ্টায় উড়িয়ে দেয়। ধৈর্য ধরে বসে থাকলে সেই সব মুহূর্তে আমি ওদের ঘরের ভেতরটাও দেখতে পাই। ঘরটা কেমন ছিমছাম পরিচ্ছন্ন। দেব-মূর্তির মতন ছেলেটি বেহালা বাজায়। আর মহিলাটি সাদা ধপধপে থান পরে একখানা চেয়ারে বসে উল বোনেন। উনি নিশ্চয় মা আর হয়তো নিশ্চয়ই ছেলের জন্য সোয়েটার। বুনতে বুনতে ছেলের দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে কথাও বলেন। কিন্তু মাঝে মাঝে,—মা যখন ঘরে নেই,—ছেলেটির চোখ এসে ছুঁয়েছে আমার আধ-খোলা আধ-ঢাকা জানালা। আমি মানে তো শুধু আমার মুখ-খানা। আমার শরীরটা আমি ওকে দেখাতে চাই না। এখন না, কখনো না। তাই ওরা যতোই 'পাখী—পাখী—পাখী' ডেকে যাক্, আমি এখন নড়বো না, উঠবো না, দরজার দিকে এগুবো না। আমি বই পড়বার ভান করে নিচু চোখের কোণা দিয়ে দেখবো, ও কোথায়। ও এদিকে তাকিয়ে থাকলে আমাকে তো বসেই থাকতে হবে।

'পাখী—পাখী—পাখী'! এখন উঠতে পারি। ওরা কেউ এখন ঘরটাতে নেই। ও তো আমাকে দেখে না, শুধু চোখ বুলিয়ে আবার নিজের অস্তিত্বে চলে যায়।

সিঁড়ি নামতে নামতে সরলা আর জেঠাইমা-র কথাবার্তা শুনতে পাই। উঠোনে বসে জেঠাইমা এক রাশ ডাল বাটা নিয়ে বড়ি দিচ্ছেন। শিলনোড়ার পাশে, ডালবাটা থামিয়ে, সরলা। সরলা, না, সরলা—মা? সরলা আমাকে মানুষ করেছে। আমার মুখে মা-ডাক শুনতে চেয়েছে। আমি কিন্তু চিট হয়ে থাকতাম। বলতাম, "সরলা। মা না হাতী!" সরলা আমাদের এই সেকেলে এলোমেলো বাড়ির কায়েমি গৃহকর্ত্রী। নামে চাকরানী হলেও, আসলে সে এখন সর্বেসর্বা। জেঠাইমাও ওকে সমীহ করে চলেন। কিন্তু সরলা বোকা নয়। সরলা জানে, তার যৌবনকাল যাই যাই করছে। এখন যদি চামের আদর, তো আখেরে কামের আদর। সরলা সংসারের চক্র নিপুণ হাতে ঘুরিয়ে তথা [illegible] খোশামোদ করে এ বাড়িতে নিজের ঠাঁই পাকা করে নিয়েছে। সরলা এখন আমাকে নিয়ে জল্পনা করছে। সরলা জেঠাইমা-কে বলছে, "ও মা গো, মাইয়ার এখন যেমন আইছে, মন উড়ু উড়ু। আপনারা বিয়াশাদী-র জোগাড় করেন।"

"তুই হাসাইলি সরলা। ওই তো লেপাপোছা, ঝিরা-লাগা চেহারা। ওরে বিয়া করবে কেডা?"

"তা হইলে কী হইবে গো,—[illegible] চায়।" বলে চোখ টিপে হাসতে গিয়ে মধ্যপথে আমাকে দেখেই সরলা থেমে গেলো। এবং খোশামুদীর সুরটি গলায় টেনে এনে বলল, "জেঠাইমায় কখন থাইকা তোমারে ডাকতেছে, শুনতে পাও না?"

জেঠাইমা সরলার এই ওকালতিতে গলে যান। হাসিমুখেই বলেন,—"তোর মায়ের স্নানের সময় হইছে পাখী। জল সাবান দিয়া আয়।"

মা শয্যাগতা। আমার জন্মের পর থেকেই। শরীরের একটা দিক ঠিক পঙ্গু না হলেও, অনেকটা অক্ষম। একে একে সাতটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলো মা,—একটিও বাঁচে নি। আঁতুড়ঘরেতে ভুগে দুধপোষা শৈশবেই বিদায় নিয়েছিলো। শেষে আমার বেলাতে মা বন্ধ করতে চেয়েছিলো এই ব্যর্থ, বেদনাদায়ক জনন-লালন প্রক্রিয়া। গর্ভপাতের ওষুধ খাবার ফলেই কি মায়ের শরীর ভেঙে গেলো? আমি কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেঁচে রইলাম। গর্ভপাতের কঠোর ঔষধের সঙ্গে লড়াই করে সর্বাঙ্গ আমার গলে গেলো, মিলিয়ে গেলো, হয়ে গেলো থেকেও নেই। কিন্তু—আ,—তবুও আমি বেঁচে রইলাম। গুড় গুড় করে হাঁটতে শিখলাম। আমার দিকে তাকিয়ে মা চোখের জলে ভাসতো, তবু হাসতো। আপন মনে হাসতো। সরলা নাওয়াতো খোয়াতো খাওয়াতো আমাকে। তবু সরলাকে দেখলেই মা রেগে যেতো। সরলার সেবাযত্ন মা চায় না। সরলার সান্নিধ্য মা চায় না। কেন, তা' ছোটবেলায় আমি বুঝতাম না। এখন বুঝি। মায়ের স্থান, মায়ের অধিকার সব একে একে সরলা দখল করেছে। বাবার সঙ্গে সরলার নিবিড় সম্পর্ক থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। আমার গম্ভীর ভয়ংকর বাবাকে নিয়ে ও-রকম কথা ভাবাই যায় না। কিন্তু সরলা বিকেলে হাস্যমুখী হয়ে প্রসাধন করে বাবার খাবারটি সামনে ধরে দেয়, পাখা করে এবং সংসারের এটা সেটা কথাবার্তা বলে। বাবাকে পরামর্শ দেয়। মা তাই সরলাকে দু চক্ষে দেখতে পারে না।

সরলাকে ভালোবাসতে গিয়ে আমি মায়ের দিকে দেখতাম। তারপরই বলতাম,

ক্ষণে ক্ষণে প্রতি ক্ষণে খাবার বিস্কুট

ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট

যেমন হাল্কা তেমনি সহজপাচ্য

দিন শুরু করুন বেশ ঝরঝরে আর তাজা ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট বিস্কুট দিয়ে। বাচ্চাদের এই বিস্কুট যেমন হাল্কা, তেমনি হজম করাও সহজ। বাচ্চা থেকে বুড়ো—বাড়ীর সবার জন্যে। সকালে, কাজের অবসরে চায়ের সঙ্গে—যে কোনো সময়েই ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট খেতে ভাল।

লিন্‌টাস-BBC.AR.3-140 BG

সরলা খোলামুখী চেয়ে বলত,—'মায়ের হাতে খাইবার ইচ্ছা বুঝি? এইখানেই ভাত আইন্যা দিতাছি।'

তবুও সরলা আমাদের মন পায় নি। মায়ের না, আমারও না। আমার-ও না? আমি নিশ্চয়ই সরলাকে একটু ভালোবাসি। ভালোবাসি, না, মায়া করি? কাকে জানাই? ভালোবাসা কি দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার, না কিছুটা উর্ধ্বস্তরের ব্যাপার!'

সরলার কোলে চড়ে বেড়িয়েছি। সরলা সাজিয়ে গুছিয়ে টিপ্‌ পরিয়ে দিয়ে বলেছে,—কও না পাখী, একবার কও। সরলা-মা।

'সরলা। সরলা। সরলা।'

'দেখছ নি মাইয়ার জিদ্দী।'

আনন্দা বুড়ী তখনও লাঠি ছাড়া হাঁটত। আসত যেত, কোলে নিত। বলত, 'পাখীর ছানাডার মতন জন্মাইছিলি—আমি তো ডরাইলাম বাঁচাইতে নি পারমু। তো পাখীডার মতোনই ছোট্টখাট্ট রইলি।'

কতোটা ছোট্টখাট্ট থাকবো, তা সেই বয়সে বোঝা যায় নি। সাত আট কিংবা দশ বছর বয়সেও না। তখনও আমার দিকে চেয়ে চেয়ে মায়ের চোখ দুটি হাসতো। এখন আর হাসে না। বড়ো ব্যথা, বড়ো অপরাধবোধ চোখে নিয়ে আমার দিকে তাকায় মা। আমার চৌদ্দ বছর বয়স হবার পর থেকেই। সরলাও যেন চোরের মতন হয়ে গেছে। আনন্দা-বুড়ীর চোখে ছানি, তবুও কাছে ডাকে, হাতায় পিতায়। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে,—'ভগবানের যে কী ইচ্ছা।'

একদিন মায়ের কাছে চুপি চুপি কিছু বলছিলো। মা তারপরে কেঁদে কেটে একাকার। সরলা আর জেঠাইমা নিষ্ঠুরের মতো বলাবলি করছিলো,—'পাপ করছে মায় ফল ভুগতাছে মাইয়াডা।' আনন্দা বুড়ীও আরেকদিন আমার মাথায় হাত রেখে কেঁদে ফেলেছিলো। 'ঔষধ খাওয়া বড় পাপ রে পাখী। পাপের সাজা পাইতাছে তোর মায়।'

তবুও মাকে আমি ভালোবাসি। ভালোবাসি, না মায়া করি? মায়ের চোখে জল দেখলে বুকের মধ্যে কষ্ট হয়। মাকে এখন জল দেবো, সাবান দেবো, ধরে ধরে স্নানের ঘরে নিয়ে যাব। আমি ছাড়া এই সব কাজ কেউ করতে পারে না। মা এমন অবুঝের মতো জিদ করে। সরলা বা জেঠাইমাকে দেখলে চোখ বুজে মুখ গুঁজে বিছানা আঁকড়ে থাকবে। ওদের ওপর এই রাগ দেখিয়ে কী লাভ হচ্ছে মায়ের? আর মায়ের রাগ—অভিমানে ওদেরই বা কী লোকসান হচ্ছে? মা রয়েছে সংসারের এক কোণায়,—বিছানা আশ্রয় করে। ওরাই তো মুঠোর মধ্যে রেখে নিয়েছে সংসার। নড়ছে চড়ছে কাজকর্ম করছে। পাড়াপ্রতিবেশি গল্প চালাচ্ছে তারই ফাঁকে ফাঁকে।

মায়ের নাওয়া শেষ করে ফিরে এসেও শুনি সরলার মুখ চলছে। সরলা বলছে,—'বয়সকালে হিজড়ারও মন চুলবুল করে গো। পাখী তো হিজড়া না।'

'থো ফালাইয়া। আমার আর অন্য কাজকর্ম নাই, ওই মাইয়ার বিয়ার চিন্তা করি।'

"করবার লাগে ঠাকুরাইন। মাইয়া মানুষের একটা খুঁটির দরকার।" খুঁটির জন্যেই আমাদের সংসারে হামলে পড়েছে সরলা। চর্কির মতন ঘুরছে। ভোর চারটে থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত এক মুহূর্ত অবকাশ নিতে দেখা যায় না তাকে। বর্ষীয়সী জেঠাইমার সে এখন হাতের নড়ি। আর বাবার জন্যে? বাবা কোর্ট-কাছারী করে কি আমাকে, আমার মা-কে সেই মর্যাদা দিতে পারতেন, যা সরলা দিয়েছে? সরলার প্রতি বাবার কৃতজ্ঞতা তো স্বাভাবিক। সেই কৃতজ্ঞতা যদি অন্য কোনো অনুভবে রূপ নেয়, তাও হয় তো স্বাভাবিক।

সরলা, সরলা-মা। সত্যিই কি মায়ের মতো স্নেহ নিয়ে আমার ভবিষ্যৎ ভাবতে বসেছে সরলা? আমি একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকি। শুনি, সরলা বলছে—'পাখীর অদৃষ্টে থাকলে ভগবানই পাত্র জুটাইয়া দিবেন। কিন্তু আমার তো চিন্তা আছে। এক চিন্তা নিজের অপদার্থটারে লইয়া—'

অপদার্থটি সরলার পুত্র। শিশু পুত্র সন্তানটিকে নিয়ে সরলা আমাদের সংসারে প্রবেশ করেছিলো আজ থেকে আঠারো বছর আগে। আজ সে এক দশাসই শরীর বাগিয়েছে, কিন্তু তদনুপাতে তার বুদ্ধিবৃত্তি নিতান্ত ক্ষীণ। তাকে ব্যাঙা বলেই সরলা ডাকতো। আমরাও ওই নামে সম্বোধন করি। বয়সে আমার চেয়ে ব্যাঙা সামান্য বড় হবে। মনে পড়ে, শৈশবকালে যখন আমাকে এ বি সি ডি ইত্যাদি শেখাতে এক মাস্টার আসতেন, তখন সরলা বাবাকে ধরে পড়েছিলো, যে ব্যাঙাকেও মাস্টারমশায়ের কাছে লেখাপড়া শেখাতে হবে।

সরলার প্রতি কৃতজ্ঞতা,—না স্নেহ? ততোদিনে বাবার হৃদয়ে বেশ ভালো জায়গা করে নিয়েছিলো। তাই বাবার অনুমতি পেয়ে ব্যাঙাও আমার সাথে সাথে লেখাপড়া শিখতে শুরু করলো। বেশিদূর এগুতে পারে নি অবশ্য। অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টায় মাস্টারমশাই তাকে বাংলায় ইংরেজীতে অক্ষর পরিচয় করাতে পেরেছিলেন। সেখান থেকেও ঠেলাঠেলি করে প্রথম ভাগ, ইংরেজী প্রাইমার—সামান্য যোগ-বিয়োগ। তারপরই ব্যাঙার এক আবদার হলো,—"আমি নাম সই করমু। আমারে নাম সই শিখাইয়া দেন মাস্টারমশয়।"

এখনও ব্যাঙা যখন তখন নাম সই করে। কোথাও এক টুকরো কাগজ পেলেই বাংলায় তথা ইংরেজীতে নিজের নাম আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে লিখবে। নাম তার খুব সুন্দর—শ্রীশুভাশিস রায় নামধারী একটা বিশ্রী বোকা উপদ্রব। এক মূর্তিমান উৎপাত। পড়তে বসি যখন, হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ায়।

"পাখী পড়তে বসছ বুঝি?

লিখিবে পড়িবে মরিবে দুখে

মৎস্য ধরিবে, খাইবে সুখে।

বুঝেছ? হাঁহী—হাঁহী—হাঁহী।"

"ব্যাঙা, বিরক্ত করিস না। যা এখান থেকে। গাণ্ডু মেরে বসে আছিস, লেখা-পড়ার মর্ম তুই কী বুঝবি?"

"ক্যান, আমিও তো লেখাপড়া করলাম কতদিন। কী হইল তাতে? তবে নাম সইটা করতে পারি। দাও না একখান কাগজ, নাম সই করে দেখাই তোমায়।"

"থাক্ থাক্। এখন না, পরে দেখাস্। লক্ষ্মী ব্যাঙা, পড়তে দে। যা এখান থেকে।"

"তাড়িয়ে দাও ক্যান? আমার বুঝি দুঃখ হয় না? আমারে বুঝি তুমি মানুষ বলে গণ্যই করো না?"

আসলে কিন্তু ব্যাঙার প্রতি সকলেই কিছুটা স্নেহশীল। জেঠাইমা তাই সরলার দুঃখের কথা থামিয়ে দিয়ে বলেন, "সব সময় গালমন্দ দিস্ না ওকে সরলা। ব্যাটাছেলে সোনার আংটি। লেখাপড়া না করলে কি আর হাত পা খাটাইয়া খাইতে পারব না? বিয়াশাদীও করবে সময়কালে।"

ব্যাঙার বিয়ের কথা ভেবে হাসতে গিয়ে থমকে যাই আমি। আমি তো নিজেও পুরোপুরি একটা মনুষ্য নই! ও যদি একদিকে খুঁতো হয়, অন্য দিকে আমিও তো তাই। বোধ হয় আসলে আমরা দুজন কিছুটা এক রকম। তাই ব্যাঙাকে অসহ্য লাগলেও দয়ামায়া না করে উপায় নেই। এ-বাড়িতে ছেলেবেলা থেকে এক সঙ্গে তো বেড়ে উঠেছি আমরা দুজনে। ওর সাথে লুডো খেলেছি, সাপসিঁড়ি খেলেছি। নির্বোধ ব্যাঙা প্রতিবারই হেরে যেতো, হেরেও রাগ করতো না। বরং হি হি করে হাসতো।

বয়সে এখন ব্যাঙা যুবক। কিন্তু তার হাবভাব একটা তেতালার শিশুর মতন।

পড়ার টেবিলে বসে আছি, হঠাৎ আমার মাথার ওপর দিয়ে উঁকি মেরে বলে ওঠে "এ তো কবিতা। কবিতা বুঝি পরীক্ষায় পড়া হয়?"

"তুই থাম। নিজের কাজ কর। পরীক্ষার পড়া তুই কী বুঝিস?"

"বুঝি যে, মন দিয়ে পড়লে সববারেই পাশ করতে। ফাস ডিবিশন।"

"ফার্স্ট ডিভিশন পাওয়া যেন খুবই সোজা।"

"ইস্কুলেই পড়লে না—" ব্যাঙা দুঃখমাখানো কণ্ঠে বলে, "তোকে ইস্কুল যাবার জন্যে পাগল!"

"তুই আর বলিস না। তোর তো ইস্কুলের নামেই জ্বর আসতো।"

"ওই যে যুক্ত অক্ষর আছে না পাখী? এমন কঠিন! ওই যুক্ত অক্ষরই খেলো আমার পড়াশোনা। মূর্খ হয়েই রইলাম। তবে নাম সই করতে পারি। দাও না একখানা কাগজ তোমার খাতার থেকে। দাও না।"

ব্যাঙা ঠিক পুরোপুরি নির্বোধ নয়। কতক ব্যাপারে তার একটা গভীর বোধশক্তিও আছে। মনে হয়, সে জানে, ওই জানালাটার সঙ্গে আমি আমার আমাকে যুক্ত করতে চাইছি। যখন তখন খপ খপে পায়ে এ-ঘরে এসে দাঁড়ানো তাই বেড়ে যাচ্ছে ব্যাঙার। চাতুরিগুলিও কখনো কখনো বিদ্যুতের মতো খেলে যায় ব্যাঙার মাথায়। যেমন সেদিন এদিক ওদিক কাড়াকাড়ি করতে করতে ব্যাঙা খট করে বন্ধ করে দিলো ওবাড়ির দিকের ওই আধ-খোলা জানালাটা।

"কী ধুলো আসে হাওয়ায়। ঝাড়তে ঝাড়তে মরি।"

জেঠাইমা বা সরলা যে এ ঘর পর্যন্ত উঠে আসে না, তার জন্যে আমি ব্যাঙার কাছে কৃতজ্ঞ থাকি। ব্যাঙাই আমার পড়ার ঘর, দোতলায় বাবার, আমার শোবার ঘর পরিষ্কার করে। মা ওপরে উঠতে পারে না বলে মায়ের বন্দোবস্ত নিচে। জেঠাইমা মুখের ঘরে শোয়। সরলা শোয় নীচে অন্য ঘরটাতে, ব্যাঙাকে নিয়ে। সত্যি বলতে কি, বাবার সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে সরলাকে কখনোই একান্তিত হতে দেখিনি আমি। তবে রাতে অনেক দিন ঘুম ভেঙে দেখেছি বাবা বিছানায় নেই। বারান্দায় সিগারেটের আলোও খুঁজে পাইনি। আমি ভেবে নিয়েছি বাবা ছাদে গিয়েছেন অথবা বাথরুমে। এই ভেবে নেওয়া সত্য কি না, তার মীমাংসা আমি করতে চাইনি। সত্যকে নিয়ে বাড়াবাড়ি আমার ভালো লাগে না। সত্যে স্বপ্নে মিশিয়ে মিশিয়ে একটা ক্ষুদ্র আশ্রয় তৈরী করে তার মধ্যেই তো আমি থাকতে চাই। ডানা মুড়তে চাই। যেমন ডানা মেলতেও চাই।

জেঠাইমা বা সরলা সামনে না থাকলে আমার দুঃসাহস সীমাহীন। আমি ব্যাঙাকে এক ধমক লাগাই। "জানালা খুলে দে। মিছা কাড়াবি, তাই তো তোর কাজ। খোল জানালা, আমার গরম লাগছে।"

ব্যাঙার মুখে তার মনোভাব স্পষ্ট ফুটে ওঠে। সে-মুখে দেখতে পাই জবরদস্ত অনিচ্ছা। গোঁয়ার অধিকারবোধ, ইতর আপত্তি। কিন্তু মুখফোঁড় প্রতিবাদ নিয়েও একটা কথা বলতে পারে না ব্যাঙা। জানালা খুলে দিয়ে খুব নীচু গলায় কী সব গজর গজর করে। আমি শুনতে না পাবার ভান করি।

এ-ঘরে এলে আজকাল ব্যাঙা যেতে চায় না। ঘুর ঘুর করতে থাকে আমার চারদিকে। অস্বস্তিবোধ করলেও, ব্যাঙাকে একটু প্রশ্রয় না দিয়ে আমার উপায় নেই। জন্মাবধি একই পরিবেশে একই প্রক্রিয়ায় বেড়ে উঠেছি আমরা দুজনে। জেনেছি, জীবন এক কড়িখেলা। যা দান পড়ে। তার বেশি এক পা-ও এগুতে পারা যায় না। যা মূলধন নিয়ে খেলা শুরু করা হয়, তার অতিরিক্ত এক কড়িও কোথাও মেলে না।

তাই ব্যাঙাকে সহ্য করতে হয়। ব্যাঙা এসে আমাকে চা দেয়।

লকালি দাঁত বার করে হাসে, "খুব গুজগুজ ফুসফুস চলছে। তোমার বিয়ে লাগালো বইল্যা।"

আমি উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করি না। কিন্তু ব্যাঙা দমবার পাত্র নয়। "বুঝলে পাখী, বিয়ে লাগলো বইল্যা। অত লেখাপড়া আর কোরো না।"

"তার মানে?" হঠাৎ ভুরু কুঁচকে ওঠে আমার।

"মানে আবার কী হবে"—আমার মুখিয়ে-ওঠা দেখে কেঁচোর মতো কুঁকড়ে যায় ব্যাঙা। "বিয়ে হলে তো আর পেটের চিন্তা করতে হবে না আমার মতন।"

"থাম্ থাম্। সরলা-মা থাকতে তোর তো কোনও চিন্তার লক্ষণই নেই।"

"মা তো কল খোঁটার পাখী। তোমরা যখন শোনো না, তখন এমন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বলে, ইচ্ছা করে গলায় দড়ি দিই। কেবল এক কথা, কাজকর্ম দেখ, কাজকর্ম দেখ। লেখাপড়া জানি না, কে আমাকে কাজ দিবে? বাসায় যে এতখানি কাজ করি, তা বুঝি কিছুই না? পেটে খাই বলে এমন ধারার কথাবার্তা কয়, যামু একদিন পলাইয়া।"

"যা না। আপদ্ যাবে।"

"তুমিও আমায় দেখতে পার না, আমি জানি—" বলেই দাঁত বের করে হাসে ব্যাঙা। নির্লজ্জ আর কাকে বলে।

সরলা কি সত্যিই আমাকে ভালবাসে, আমার জন্য ভাবে? সরলা কেন মা-ডাক শুনতে চাইতো? অবোধ ব্যাঙার মা-ডাকে তার বুক তেমন করে ভরতো না? পাশাপাশি বসিয়ে আমাকে আর ব্যাঙাকে খাওয়াতো সরলা। ভাত মেখে দিলে ব্যাঙা নিয়ে খেতো, আমার মুখে গরাস তুলতো সরলা। ছাল-ছাড়ানো ছোটো ছোটো ল্যাংড়া আমের টুকরো সরলা চামচ দিয়ে আমার মুখে পুরে দিতো। আঁটিগুলি একটা থালায় নিয়ে গপ্ গপ্ করে চুষতে থাকতো ব্যাঙা। পাখির খোরাক আমার, কতো ভুলানি ভালানি দিয়ে আমাকে খাওয়াতে চেষ্টা করতো সরলা। আমার ফেলে-দেওয়া, ছুঁড়ে দেওয়া খাবার বাটিতে তুলে রাখতো দ্বিতীয়-বারের অপেক্ষায়। সেদিকে নজর দিলে চোখ গেলে দিতে চাইতো ব্যাঙা।

সাপসিঁড়ি খেলার সময়ে কখনো কখনো ব্যাঙার ঘুঁটি চালাতে বসতো সরলা। তখন ইচ্ছে করেই জেতাতো আমায়। লুকোচুরি, ছুটোছুটি খেলায় সরলাই নিয়ম করে দিয়েছিলো ধাক্কাধাক্কি চলবে না, পাখির কোমল শরীরে লেগে যাবে। আমার হালকা করে আলতো ছোঁয়ানো পর্যন্তই। তবুও অনেকবার আমি "লেগেছে" বলে নালিশ করে ব্যাঙাকে বকুনি খাইয়েছি।

সরলা, সরলা-মা এখন আমার বিয়ে দিতে চায়। বাবা কোর্ট থেকে ফিরে চাপকানের বোতাম খুলছেন, যথারীতি চা-জলখাবার নিয়ে এসে সরলা কথা পাড়ে। "বাবু, পাখি উনিশ বছরে পড়লো এই বৈশাখ মাসে। মাইয়ার বিয়া দেওন লাগে।"

"তা তো ঠিকই।" অন্যমনস্ক ভাবে বাবা বলেন এবং লুচি ছিঁড়ে মুখে দিতে থাকেন।

"বাবা, আমি বিয়ে টিয়ে করবো না।"

আমার এই মন্তব্য সরলা, আর বাবাও, অনায়াসে এক দিকে সরিয়ে দেয়। সরলা বলে, "আমার বেটীর আবার বিয়ার ভাবনা। কতো পাত্র মাথায় কইরা লইয়া যাইবে।"

বিয়ের কথা শুনলে যে আমার দিগন্ত আচমকা আঁধারে ভরে যায়, তার কারণ আমি সরলা আর জেঠাইমার অনেক কথাবার্তা আড়ি পেতে শুনেছি। শুনেছি, সরলা বলেছে, "পুরুষ মাইনষের ভালোবাসা মুসলমানের মুরগী পোষা। টুকটাইন, ফিতফুলী বউ থাকলে পুরুষের নজর অন্য দিকে যাইবেই।"

আমি জেনে নিয়েছি যে প্রত্যেক পুরুষ মেয়েদের দেহ থেকে একটা কিছু চায়, দিকে তাকিয়ে আমি সংকুচিত, কুণ্ঠিত হই। হ্যাঁ, তার মূল্যেই কাজ আছে। বাবার টাকা আছে, তাই কেউ হয়তো আমাকে বিয়ে করতে রাজি হতে পারে। হয়তো চন্দনে সিঁদুরে লাল চেলিতে সমৃদ্ধ সেই শুভলগ্নও আমার জীবনেও আসবে। কিন্তু মালাবদলের পরে যদি পরিতৃপ্ত ভ্রমরের মতো আমাকে ফেলে দিয়ে সেই অতৃপ্ত পুরুষটি চলে যায় অন্য কোনো সুন্দরতর পুষ্টতর শরীরের সন্ধানে! না না, বিয়ে আমি করতে চাই না। এ-রকম একটা ভয়ানক ঝুঁকির ব্যাপারে যাওয়া আমার পোষাবে না।

অথচ আমি ভালোবাসতে চাই। ভালোবাসা একটা মূল্যবোধের ব্যাপার। যৌবন ঝরে যায়, জীবন বয়ে যায়। ভালোবাসা, অনুভবের সঞ্চিত মূল্য, হৃদয়ে স্থির থাকে। হয়তো অন্তর মূল্যের সন্ধানে দেহটিকেও পরিণত হয় ভালোবাসা। আর সোপানে সোপানে আবেগের মূল্যগুলোকে ফেলে দিতে হয় বাক্সের ভিতরে খোসার মতন। কিন্তু সে তো পার্শ্বপ্রক্রিয়া। মুখ্য কথা, ভালোবাসা মূল্যবোধের ব্যাপার। সৌন্দর্য, সুরুচি, সৌজন্যকে যে শ্রদ্ধা যথাযথমূলকভাবে দিতে হয়, তাই তো, তা-ই তো ভালোবাসা।

ভালোবাসা, যেন এ-বাড়ির রেলিঙের বেহালা বাজানো। যখন খুশি, তখনকার ভালো লাগা স্বকল্পবিলাসী। সোনা কুড়িয়ে যাবার পর যে মন ভরে থাকবার আস্বাদন, তাই তো দীর্ঘমেয়াদী। নিরাপদ যে-অংকারে দিনরাতগুলি ফুলের মতো ফুটে ওঠে, তাতেই তো দীর্ঘাকৃতি পরিতৃপ্তির আশ্বাস। কোন্ শরীরী সুখে এই সঞ্জীবনী সুধা আছে? শরীর নেই বলে ভালোবাসতে পারি না, তা তো নয়। শরীরের টান থেকে ছাড়া পেয়েছি বলেই তো ভালোবাসায় আমি প্রচুর সুতো আলগা দিতে পারি।

সে-ভালোবাসা বাড়িতে কারও জন্যে নয়। শুধু ওদের জন্যে, ওদের অন্য রকম জীবনবোধের জন্যে। বাড়ির লোকেদের আমি অশ্রদ্ধা করি না, বিচার করি না, মায়া করি, কিন্তু ভালোবাসি না। ভালোবাসা নিতান্তই একটা মূল্যবোধের ব্যাপার।

অথচ এক সময়ে বাড়ির জীবনযাত্রাকেই আমি চেয়েছিলাম। তখন আড়ে আড়ে সোনা দেহবয়সের পৃথিবী আমাকে হাতছানি দিতো। তখনও আমার আশা ছিলো একদিন আমি শরীরে বেড়ে উঠবো। ডাক্তাররাও তাই বলেছিলো। চড়া দামী ওষুধ, ইনজেকশনে ওরা আমাকে স্বাভাবিক করতে চেয়েছিলো। তার ফলে শরীরে পুষ্টি না এলেও, মনের দিক থেকে আমি বোধ হয় যৌবনবতী হয়েছি। এ-কথা আমি প্রথম বুঝতে পেরেছি ব্যাঙার চোখের চাউনি দেখে। একটা লোভী বেড়ালের মতো আমার চারদিকে ঘুর ঘুর করে সে আজকাল। ডাক্তাররা শেষ পর্যন্ত, জবাব দিয়েছে। প্রকৃতির মহাশক্তির সামনে অসহায় বোধ করেছে, অক্ষমতা জানিয়েছে। আমি তবুও হাল ছাড়িনি। মহিলা মাসিকের পরামর্শ অনুসারে ব্যায়াম করেছি সকালে বিকেলে। ফিতে দিয়ে মাথার সপ্তপদে মেপে দেখতে চেয়েছি, আমার অঙ্গে, বক্ষে কটিতে নিতম্বে, কোথাও বাড়তি থাকলো কি-না। কিন্তু না, কিছু না, কোথাও না। শুধু ব্যাঙার লোভী চোখের চাউনিতে ছাড়া আমার যৌবন কোথাও ধরা পড়ে না।

তাই শেষ পর্যন্ত যৌবনকে, দেহকে বিদায় দিয়ে সরে এসেছি আমি। আমার জন্যে শুধু স্বপ্ন, শুধু চিন্তাবিলাস। আমি সমস্ত হৃদয় একত্রিত করে এক দেহবিহীন ভালোবাসায় ডুবে আছি। আহা, জানালায় এই বসে থাকাই যদি জীবন হতো। যদি তার আর কোনও তরঙ্গ দাবি না থাকতো।

আমি শুনতে পাই, সরলা জেঠাইমাকে বলছে—"বাবুর সব কামেই বাড়াবাড়ি। ছলচাতুরী কইরা মাইয়া পার করবেন না। আমি তো কইতে আছিলাম, চৌধুরী বাড়ির বড়বউরে দেখাইয়া দেন। বেয়াক ঠিক হইয়া গেলে সাত পাক ঘোরা হইয়া গেলে, তখন বুঝা যাইবে। হিন্দুর বিয়া একবার সাত পাক ঘুরলে কি আর রদ হয়?"

জেঠাইমা সহানুভূতির 'চুক চুক' শব্দ করে বলেন, "ওই মাইয়ারে দেখাইলে কি আর বিয়া লাগবে? সব সম্বন্ধই ভাঙ্গিয়া যাইবে।"

আমার অন্ত নেই। সরলা আমাকে বলে গেলো, "আইজ একখান পাইক্যা তোমারে দেখতে আসবে পাখি। কাপড়চোপড় বদলাইয়া লও।"

আমিও বোধ হয় মনের মাঝখান দিয়ে দ্বিধাবিভক্ত। তাই একলা জাগিয়া মনের মধ্যে গোপন করা সত্ত্বেও সাজলাম, গুজলাম, পরিপাটি হয়ে জানালার পাশে বসে রইলাম। জানালার ওপাশ থেকে দু-একবার রেলিঙের চকিত চাউনি আমাকে ছুঁয়ে গেলো। আমার কল্পনা যেন সে চাউনিতে মুগ্ধতার আভাসও লক্ষ করলো।

বসে থাকা আমার এমনিতে ফুরোয় না। কিন্তু আজ যেন ডাক শুনবার জন্য কান পেতে আছি। বুকের ভেতরটা অল্প দুরুদুরু করছে। ব্যাঙা একবার ঘুরে গেলো ঘর থেকে। কথাবার্তা বলতে সাহস করলো না। শুধু অনেকক্ষণ ধরে ঝাড়ন ঝাপটাঝাপটি করে নিঃশব্দে বোঝাতে চাইলো, ব্যাপার গুরুতর। ব্যাঙার এ সব ভালো লাগছে না। ব্যাঙা তার অবোধ অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারছে, আমার এবং ওর মধ্যে দূরত্ব এসেছে, আরও আসছে, তারই বন্দোবস্ত হচ্ছে।

ব্যাঙার সাহস কম নয়। "দেখি তোমার হাতের পাতা" বলে আরও যখন তখন সে আমার হাত নিজের থাবায় ভরে নেয়। আমার মাথা ধরলে সরলা যদি মাথা টিপতে আসে, তো ব্যাঙা বেশি দূরে থাকে না। একদিন বলতে এসেছিলো, "সরলা তো নিচে কী কাজে ব্যস্ত। আমি তোমার মাথা টিপে দিই? আমার হাতের মালিশে সব সেরে যাবে।"

"তোর হাতের মালিশ? ইঁটের মতন শক্ত তোর হাত!"

তবুও ব্যাঙা শোনেনি। খপ করে হাত দিয়েছিলো আমার কপালে। উল্টো ঠেলে দিয়েছিলাম আমি। এক ঝটকায় ওর হাত ফেলে দিয়ে বলেছিলাম, "আরেকবার যদি গায়ে হাত দিস। তোর মুখ দেখতে চাই না। দূর হয়ে যা এখান থেকে।"

থাকবে, বাচ্চা সে-পাত্রই নয়। অবিবাহিত থাকে আসতে চেয়েছে, পছন্দ কেঁদেছে, জেঠামণিরও বয়সটাও কম ছিলনি। তাতে আমার ভয়েই ভোলো। আমি জানি এক বয়েসে থাকায় ওকে মাত্র হাত ধরে ফেলে দেওয়া যায়। ওর মোটা চেহারা আমি একটুও ভয় পাই না।

কিন্তু সরলা ওকে বিশ্বাস করে না। প্রথম যেদিন বাচ্চা লুকোচুরি খেলার সময়ে আমাকে জাপটে ধরেছিলো, আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, সেদিন ওকে চড়-চাপড় মারতে মারতে সরলা বলেছিলো, "আর গুন নাই হস গুণ আছে তোমার। অনেক দিন যদি এই সব কর, দুঃখি দেখি তো খুন করিয়া ফালামু।"

ওর মার দেখতে দেখতে জেঠাইমা বলেছিলো, "কান্ড যে সরলা। পোলাডারে মাইরা ফালাবি নাকি!"

বাচ্চা কাঁদেনি। দোষী হয়ে দাঁড়িয়ে মার খেয়েছিলো। আর ঘন্টা খানেক পরেই ফ্যাক ফ্যাক করে হেসে আমাকে বলেছিলো, "নালিশ করলে বালিশ পায়। একদিন তোমারে দিমু বালিশের বাড়ি।"

সেদিন অবশ্য তা সে সরলার ভয়েই হোক, বা যে কারণেই হোক।

শেষ পর্যন্ত পাত্রপক্ষ এলোই না, আমার সেজেগুজে বসে থাকাই সার। নিচে গিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনতে ইচ্ছে হচ্ছিলো না, কিন্তু বাচ্চাই খবর এনে দিলো, "বা কানে নিশ্চয় ভাংচি দিয়েছে কেউ।"

ভালোই তো। আমি তো বেঁচে গেলাম। কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখি, আমার মুখে কেমন এক অপ্রতিভ বিষণ্ণতা। তবে কি আমিও নিজের অসম্পূর্ণ অস্তিত্ব থেকে বেরুতে চাইছি? চাইছি, এই বদ্ধ নিস্তরঙ্গ জীবনে আমার যেমন তেমন কয়েকটা ঢেউ উঠুক?

এইভাবে কয়েকবারই আমার বিয়ের ফুল ফুটি-ফুটি করেও ফুটল না। সরলা, আর বাচ্চাও, যেন কান পেতে থাকে দরজায় কড়া-নাড়ার আওয়াজটা শুনবার জন্যে। পাঁচ-দশখানা খবরের কাগজে 'পাত্র চাই' বিজ্ঞাপন লাগানো হয়েছে, ঘটক মহাশয় আনাগোনা করছেন। মাঝে মাঝে এক আধ ভদ্রলোক এসে এটা-ওটা কথা-বার্তা জিজ্ঞাসা করে যান। কিন্তু মেয়ে-দেখা পর্ব পর্যন্ত এগুবার আগে নিশ্চয় আমার দৈহিক খুঁতের খবর ওঁদের কাছে পৌঁছে যায়।

এর-ই মধ্যে কিনা, সহসা একদিন, ওরা এলো। অবশ্য দরজা খুলতে আমি কক্ষনো কোনওদিন যাই না। বাইরের ঘরে লোকজনের সাড়াশব্দ পেলেই পেছনে সরে এসে মায়ের ঘরটিতে লুকিয়ে থাকা আমার অভ্যেস। যখন থেকে টের পেয়েছি, সবাই, এমন কি যুবকরাও, আমার দিকে একটা বীতস্পৃহ করুণা নিয়ে তাকায়—তখন থেকেই লোকসমক্ষে যেতে আমি একদম নারাজ। সেই জন্যেই তো ক্লাস ফাইভ পেরুবার পরে আর স্কুলে গেলাম না আমি। বাড়িতে পড়ে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক গত বছর দিয়েছিলাম। পাশ করতে পারিনি, তাই এ বছর আবারও তৈরী হচ্ছি।

ভেবে দেখতে গেলে আফসোস হয়, আমি কেন ওপরে নিজের ঘরেই থাকলাম না সে সময়ে? সে-সময়টা আমার নিচে থাকার সময়, তখন আমি মায়ের কাছে বসি, দুটো কথাবার্তা বলি। আর সে-সময়টা ওদের বাড়িতে জানলা বন্ধ থাকে, ছেলেটি তখনও কাজ থেকে ফেরে না, আর মা বোধ হয় অন্য দিকে রান্নাবান্নায় ব্যস্ত। তাই না আমি, মায়ের ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে ওদের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনতে পেলাম।

শুনতে পেলাম মহিলাটি জেঠাইমাকে বলছেন, [illegible] পাশের বাড়িতে থাকি, আলাপ নেই। তাই আলাপ করতে এলাম।" আরও [illegible] পেলাম, "এটি আমার ছেলে। এই একটিই ছেলে আমার।"

জেঠিমা অপটুভাবে কী সব আলাপের চেষ্টা করছেন, তা আর আমার কানে গেলো না, কেন না দরজা ছেড়ে ততোক্ষণে আমি ভেতরে সরে এসেছি। আমি কিন্তু কল্পনায় পরিষ্কার দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, ওরা আমাদের সেকেলে পুরোনো প্যাটার্নের চেয়ারগুলিতে বসেছে। মা-মহিলাটি আলাপ জমাতে চাইছেন, আর ছেলেটির চোখ ঘরের চার দেয়ালে, দেয়াল থেকে পেছন দিকের দরজায়, যে দরজায় পর্দা নেই, তা পেরিয়ে পেছনের লম্বা বারান্দায় এসে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ট্রে-র ওপর চা আর কুচো নিমকি সাজিয়ে সরলা যে লম্বা বারান্দা পেরিয়ে ও-ঘরে যাচ্ছে, তাও আমি এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি। মনে মনে বলছি 'সরলা সরলা মা,—কোনও একটা ছলে অছিলা করে আমাকে একবার ও-ঘরে নিয়ে যাবি না?' এতো ইচ্ছে, কিন্তু আমার পা এগুবে না। আমার খোঁজ যদি ওরা করে জেঠাইমা বা সরলা একবারও ওদের পাত্রপক্ষ ভেবে দুটো মাথা ঢাকা কথার আড়াল বানাবে না। হয়তো জেঠাইমা সোজাসুজি বলে দেবে, "লজ্জায় কি আর বাইর হইবো আপনাদের সামনে? ওরে তো ভগবান মাইরা রাখছে। আঠারো বছর বয়স হইল আইজও বাড় নাই শরীরের।"

অথবা হয়তো সরলার চোখ টিপুনি খেয়ে জেঠিমা থমকে যাবে। তখন সরলা সুন্দর বানিয়ে বানিয়ে বলবে, "বাবু পছন্দ করেন না যুবতী মাইয়ার সকলের সামনে বাইর হওয়া।"

কেন আমি ওদের সামনে যাই না? কেন যেতে পারি না?

"পাখি, কাইন্দো না।" "পাখি তোমার চোখে জল দেখলে আমার মনডা এ[illegible] অস্থির হয়।"

এই মুহূর্তে বাচ্চাকে ধমক দিতে ইচ্ছা করছে না আমার। ওদের চায়ের জ[illegible] কুচো নিমকি ভেজে নিয়ে সরলার হাতে দিয়ে এসেছে বাচ্চা। ও-ঘরে ঢোকার স্বাধীনতা তারও নেই, আমারও না। অতএব বাচ্চা যদি এর পরে আমার চো[illegible] মুছিয়ে দেবার নাম করে গালের ওপরে সস্নেহ সান্ত্বনার মতো হাত বুলোলো, [illegible]

বিজ্ঞান

লক্ষ্য বৃহস্পতি
অতঃপর শনি এবং ইউরেনাস

আবার আন্তর্গ্রহ যাত্রা।

পাইওনিয়ার নয়। এবার ভয়েজার-১ এবং ভয়েজার-২।

২০ অগাস্ট, ১৯৭৭ মার্কিন বিজ্ঞানীরা উৎক্ষেপ করলেন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি মহাকাশযান। ভয়েজার-১। মানব-আরোহীহীন এই মহাকাশযানের মধ্যে এবার রাখা হয়েছে অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি পথ নির্দেশক যন্ত্র। রাখা হয়েছে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি যন্ত্রগণক বা কমপিউটার।

মার্কিন মহাকাশ সংস্থা 'নাসা'র প্রতিবেদন : কোন অসুবিধে হয়নি। যাত্রার প্রথম পর্যায়ে ভয়েজার-১কে আমরা পৃথিবীর ঊর্ধ্বাকাশে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করলাম। তারপর বেতার সংকেতের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠান হল : এবার ক্যানোপাসকে খুঁজে নাও। নির্দেশমত যন্ত্রগণক রেট্রো-রকেট চালু করল। রকেটের ধাক্কায় মৃদু গতিতে পাশ ফিরল ভয়েজার-১। তার যান্ত্রিক চোখের ওপর ভেসে উঠল ক্যানোপাস। যার আর এক নাম আলফা কারিনি। পৃথিবীর আকাশের দ্বিতীয় ও উজ্জ্বলতম এই নক্ষত্র। এই নক্ষত্রটিকে পথনির্দেশক বিন্দু হিসেবে সামনে রেখে ভয়েজার-১ এবার শুরু করল তার আন্তর্গ্রহ যাত্রা। দক্ষ নাবিক যেমন রাতের আকাশের বিভিন্ন নক্ষত্রকে চিনে নিয়ে গতিপথ ঠিক করে নেয়, পৃথিবী থেকে পাঠান বেতার সংকেত মারফত ভয়েজার-১ও সেই মত পথ চিনে বৃহস্পতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে শুরু হবে তার শনি এবং ইউরেনাসের উদ্দেশে যাত্রা।

৩ সেপ্টেম্বর মার্কিন বিজ্ঞানীরা উৎক্ষেপ করেছেন আরও একটি মানব-আরোহীহীন মহাকাশযান। ভয়েজার-২। ভয়েজার-১কে অনুসরণ করে এই যানটিও এখন বৃহস্পতির দিকে ছুটে চলেছে।

নাসার বিজ্ঞানীরা এই অভিযানটির নাম দিয়েছেন 'মালটি-ওয়ার্লড ট্যুর'। মালটি ওয়ার্লড বলতে মুখ্যত ওঁরা বৃহস্পতি এবং শনির কথাই বুঝিয়েছেন। আমাদের সৌরজগতে এ দুটিই বৃহত্তম গ্রহ। বৃহস্পতির ভর পৃথিবীর ৩১৮ গুণ। আর শনির ৯৫ গুণ। শনির একাধিক উপগ্রহের মধ্যে একটি উপগ্রহ পৃথিবীর মত। এই গ্রহটি সম্পর্কে এর আগে কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এই সব তথ্য পরীক্ষা করে গ্রহ-বিশেষজ্ঞরা বলেছেন : আজ থেকে ৩৭০ কোটি বছর আগে পিছিয়ে যান। তখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ঠিক এখনকার মত হাল্কা ছিল না; ছিল ভারী। সেই বাতাসের মূল উপাদান ছিল কার্বন মনোক্সাইড, মিথেন, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি গ্যাস। পৃথিবী-সদৃশ শনির ওই উপগ্রহের বায়ুমণ্ডলও এখন ঠিক তেমনি। শনির আর একটি উপগ্রহের উপরে লবণের আস্তরণে ঢাকা, কোন কোন বিশেষজ্ঞ এমন মন্তব্যও করেছেন। বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখা গেছে, এই উপগ্রহটির রঙ মাঝে মাঝে গোলাপী হয়। বৃহস্পতির সঙ্গে তখন তার বৈদ্যুতিক সংযোগ ঘটে। এছাড়া অবশিষ্ট উপগ্রহগুলির কোন কোনটির ভূপৃষ্ঠে দেখা গেছে বড় বড় পাথরের চাঁই এবং বরফের স্তূপ। অদ্ভুত এক রকম কালো বস্তুর মধ্যে নিমজ্জিত। তেলের মত দেখতে। ভূপদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে এটি এখনও বড় রকমের এক রহস্য।

মূল পরিকল্পনাটি এবার এই রকম :

মহাকাশযান ভয়েজার-১ প্রথমে বৃহস্পতির পরিমণ্ডলে গিয়ে পৌঁছবে। সম্ভবতঃ মার্চ ৫, ১৯৭৯। এটি কিছুটা সোজা পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে।
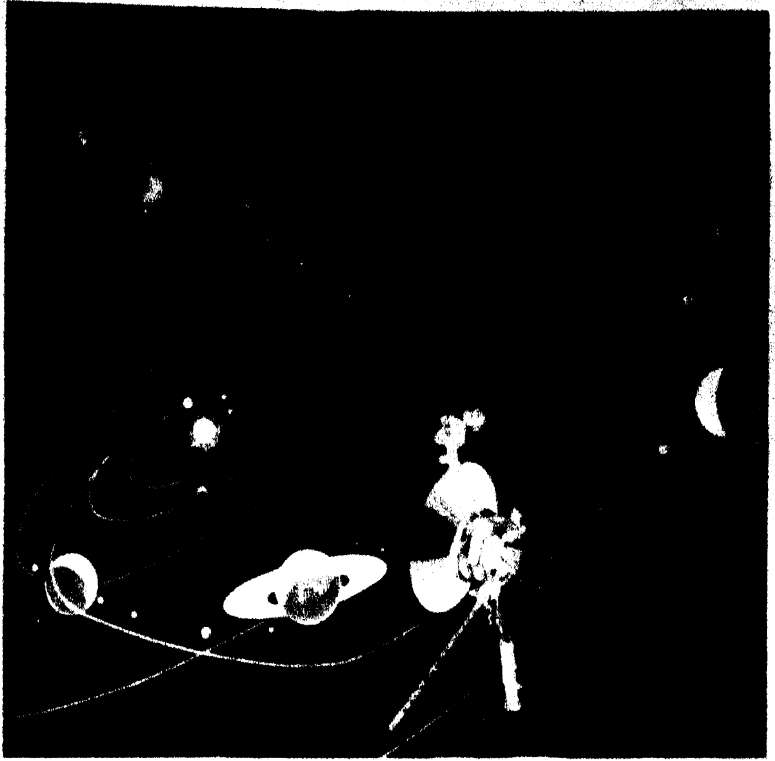
পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরু করে প্রথমে বৃহস্পতি, পরে শনি। ভয়েজার তারপর কোন পথে ইউরেনাসের দিকে এগিয়ে যাবে, দেখানো হল। সৌরজগতের প্রান্তিক গ্রহ (সূর্য থেকে দূরত্ব ২৭৯ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল) ইউরেনাস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা এই প্রথম

শনির বলয় বাঁচিয়ে ভয়েজার কিভাবে শনির দূরে সৌরবিকিরণের মধ্য দিয়ে এগোবে শিল্পীর তুলিতে তা দেখানো হল

তাই বৃহস্পতির পরিমণ্ডলে পৌঁছতে এটির সময় লাগবে কিছুটা বেশী। তবে আশা করা যাচ্ছে, জানুয়ারী ১০, ১৯৭৯ এটি সেখানে পৌঁছতে পারবে। বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি। পরবর্তী পর্যায়ে মহাকাশযান দুটি চালনার ব্যাপারে বৃহস্পতির প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সুযোগ নেবেন বিজ্ঞানীরা। এই শক্তির সাহায্যে যান দুটিকে ঠেলে দেওয়া হবে শনির উদ্দেশ্যে। তখন মহাকাশযান দুটির গতি গিয়ে দাঁড়াবে ঘণ্টায় ৩২,০০০ মাইলের মত। এ পর্যন্ত কোন মহাকাশ-যানের গতি এত বেশি তোলা সম্ভব হয়নি। ভয়েজার প্রকল্পের ডাইরেক্টর [illegible] মনে করেন, অঘটন না ঘটলে ভয়েজার-১ শনি গ্রহে গিয়ে পৌঁছবে নভেম্বর ১২, ১৯৮০। আর ভয়েজার-২ সেখানে গিয়ে হাজির হবে ২৭ অগাস্ট, ১৯৮১।

তারপর কিছুটা অনিশ্চয়তার পালা। ভয় মহাকাশযান দুটি শেষ পর্যন্ত শনির বলয় অথবা শনির দৈত্যাকার উপগ্রহ টাইটানের শিকার হবে না তো? টাইটানের আবহাওয়া পৃথিবীর মত, একথা আগেই বলেছি। কে জানে, সেই অজানা আবহাওয়ার মধ্যে প্রচণ্ড গতিতে চলার সময় তারা পুড়ে ছাই হয়ে যেতেও পারে। জানা গেছে, শনির বলয়ের মধ্যে রয়েছে বড় বড় পাথর। অতএব শনির বলয়ের কাছে এসে সেই পাথরের আঘাতে মহাকাশযান দুটি যে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে না, এ কথাই বা কে বলতে পারে?

না। আশাবাদী হওয়া যাক। সেক্ষেত্রে ভয়েজারের কর্তাদের বক্তব্য: দুটি মহাকাশযানের একটি অন্ততঃ শনির পরিমণ্ডল ছাড়িয়ে ইউরেনাসের পথে পাড়ি দেবে। এবং সেখানে গিয়ে হাজির হবে ৩১ জানুয়ারি, ১৯৮৬। তারপর—হয়ত এখানেই শেষ নয়। অতঃপর নেপচুন। আমরা ধরে নিচ্ছি হয়ত কোন
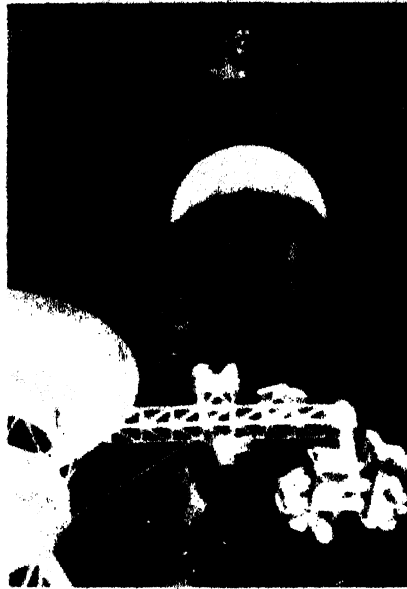
ঠিক এইভাবে বৃহস্পতির বড় ডিস্কের ওপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে আন্তর্গ্রহযান ভয়েজার

দুর্ঘটনা ঘটবে না। আর সত্যিই যদি তাই হয়, অন্ততঃ একটি ভয়েজার নেপচুনে গিয়ে পৌঁছবেই। সূর্য থেকে ২৭৯ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল দূরবর্তী ওই গ্রহে তার পৌঁছানর কথা ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে।

নিছক কল্পনাবিলাস নয়। অনেক ভেবেচিন্তেই পরিকল্পনাটি নিয়েছেন নাসা-র বিজ্ঞানীরা। সূর্যের চারপাশে পরিভ্রমণ করতে গিয়ে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস এবং নেপচুন—এই চারটি গ্রহ এখন এক সরলরেখা বরাবর অবস্থান করছে। অর্থাৎ এক সরলরেখা টানলে চারটে গ্রহই এখন সেই সরলরেখার ওপর এসে পড়বে। ফলে ওই গ্রহগুলির পারস্পরিক দূরত্ব এখন এসে দাঁড়িয়েছে সবচেয়ে কম। এ [illegible] ঘটনা প্রতি ১৮০ বছর অন্তর একবারই ঘটে।

দুটি ভয়েজারেই বসানো রয়েছে নানারকম যন্ত্রপাতি। স্পেকট্রোমিটার, ম্যাগনেটোমিটার, টেলিভিশন ক্যামেরা ইত্যাদি। এসব যন্ত্রপাতির সংবেদনশীলতা আগের সমস্ত উদ্যমকেই যেন হারিয়ে দেয়।

নেপচুনে পৌঁছানোর পর যদি দেখা যায় মহাকাশযান দুটির রেট্রো রকেটের জ্বালানি তখনও শেষ হয়নি, তাহলে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার কথা ভেবে দেখছেন নাসা-র কর্তৃপক্ষ। লক্ষ্য, সৌরমণ্ডলের বাইরে ভিন্ন কোন নক্ষত্র জগতের দিকে। সৌরজগৎ তার নক্ষত্রজগৎ যা গ্যালাক্সির মধ্যে যে দিক বরাবর ছুটে চলেছে, ভয়েজারও সেই বরাবর ছুটতে শুরু করবে। সেই সঙ্গে পাঠিয়ে যাবে নানা নতুন তথ্য।

'এ কাজ শুরু হবে আজ থেকে তেরো বছর পর', বলেছেন নাসা-র মহাকাশ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ নোয়েল হাইনারস। 'ভয়েজার যদি আমাদের এই পৃথিবী থেকে ৯৩০ কোটি মাইল দূরেও চলে যায়, তবু তাদের সঙ্গে আমরা বেতার সংযোগ রাখতে সমর্থ হব। আর এ কাজ আমরা চালিয়ে যেতে পারব আরও তিরিশ বছর।'

নানা রকম প্রশ্ন। বৃহস্পতির একটি উপগ্রহের নাম 'আইও'। কয়েক বছর আগে মার্কিন জ্যোতি

গ্রহ পাইওনিয়ার-১০ এবং পাইওনিয়ার-১১ এই উপগ্রহটি সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত সব তথ্য সরবরাহ করেছিল। যেমন, গ্রহটি প্রস্তরময়। তার বেশির ভাগ অংশ লবণের পুরু আস্তরণ। কিভাবে এই আস্তরণটি জমল? কেউ বলছেন, পৃথিবীর মত আইওতে এক সময়ে হয়ত সমুদ্র ছিল। সমুদ্রের জল শুকিয়ে যাওয়ায় তার মধ্যে গুলে থাকা লবণই অবশেষ হয়ে ওই আস্তরণ তৈরি করেছে। আর একদল বলছেন, বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে প্রচণ্ড শক্তিশালী বিদ্যুৎ প্রবাহ। যার বিভব প্রায় চার লক্ষ ভোল্ট। এই বিদ্যুৎ প্রবাহ বৃহস্পতি এবং তার উপগ্রহ আইও-র মধ্যে চলাচল করে। এর ফলে 'ইলেকট্রোলাইটিক' বা তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ওই উপগ্রহটির জলাভূমির লবণ জল থেকে পৃথক হয়ে উপগ্রহটির বুকে অধঃক্ষিপ্ত হয়েছে।

জানা গেছে বৃহস্পতির আর একটি গ্রহ ইউরোপার ভূ-স্তর ঢেকে রেখেছে পুরু বরফের আস্তরণ। যার গভীরতা ৪৫ মাইলের মত। অপর দুটি গ্রহ গানিমেদ এবং কালিসতোয় পাওয়া গেছে জলের সন্ধান। এ জল কিসের জল? পৃথিবীর মত জল, না অন্য কিছু? এ সম্পর্কে বিশদ তথ্য দেবে ভয়েজার। এছাড়া শনির উপগ্রহগুলির ছবিও পাঠিয়ে দেবে এই মহাকাশযান। উল্লেখ্য, শনির মোট উপগ্রহ দশটি। ভয়েজার এদের আটটির ছবি তুলবে। এই আটটি উপগ্রহ হল হাইপেরিওন, রিয়া, ডাইওন, টেথিস, এনসেলেডাস, মাইমাস, আইয়াপেটাস এবং টাইটান।

*

বৃহস্পতি এবং শনি গ্রহ সম্পর্কে বিস্তারিত খবর জোগাড় করার জন্যে ভয়েজারের আগে মার্কিন বিজ্ঞানীরা আরও দুটি মহাকাশযানকে কাজে লাগান। পাইওনিয়ার-১০ এবং পাইওনিয়ার-১১। প্রথমটি উৎক্ষেপ করা হয় ২ মার্চ, ১৯৭২। অপরটি তার কয়েকদিন পর।

৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ বৃহস্পতির প্রায় [illegible] মাইল দূর থেকে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে পাইওনিয়ার-১০ যেসব তথ্য পাঠিয়েছিল সেগুলি বিশ্লেষণ করার পর অনেকেই অবাক হয়েছেন। পাইওনিয়ার-১০-এর তথ্যাদি থেকে জানা গেছে, ওই গ্রহটির উর্ধাকাশের বাতাসে শতকরা ৮২ ভাগই হাইড্রোজেন, ১৭ ভাগ হিলিয়াম এবং অন্যান্য গ্যাস ১ ভাগ। এর অভ্যন্তরে ভূস্তরের গভীরে আছে হাইড্রোজেনের বরফ। জানা গেছে, সূর্য থেকে যে পরিমাণ উত্তাপ বৃহস্পতির বুকে এসে পড়ে, তার চেয়ে বেশি উত্তাপ এই গ্রহটি নিজেই বিকীর্ণ করে। বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও পর্যন্ত এটা বড় রকমের একটি ধাঁধা।

পাইওনিয়ার-১০ই প্রথম জানিয়েছিল, পৃথিবীর মত বৃহস্পতিরও নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্র আছে। তবে পৃথিবীর তুলনায় তার শক্তি সাত গুণ বেশি। এই চৌম্বক ক্ষেত্র গ্রহটির পৃষ্ঠ থেকে শুরু করে উর্ধাকাশে প্রায় ৫৫ লক্ষ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। এত শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টির সঠিক ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

বৃহস্পতির আর একটি রহস্য তার অতিকায় রক্ত তিলক বা রেড স্পট। এর অস্তিত্ব প্রথম ধরা পড়েছিল ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে, রবার্ট হুকের চোখে। ওই বছর গিওভানি কাসিনি এর একটি ছক তৈরি করেন। প্রথমে মনে হয়েছিল, বৃহস্পতির ভূস্তরের একটি অংশেরই হয়ত বা এই রঙ। পরে মনে হয়েছে, ভাসমান মেঘ। সূর্যের আলোয় অমনটি দেখাচ্ছে। কিন্তু মেঘই যদি হবে, তাহলে তো সে চিরস্থায়ী হবে না? কোন না কোন সময়ে অদৃশ্য হবেই? অদৃশ্য না হলেও কয়েকবার অবশ্য ফিকে হতে দেখা গেছে। পরে আবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১৮৯০ সাল থেকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে এই রক্ত তিলক ডিম্বাকার উপবৃত্তীয়। লম্বায় চব্বিশ হাজার কিলোমিটার, চওড়ায় তের হাজার। অবস্থান, গ্রহটির বিষুবরেখা থেকে ২২ ডিগ্রি দক্ষিণে। কেবলমাত্র পৃথিবীর [illegible]। এর দক্ষিণ প্রান্তে ঘড়ের মত একটি জায়গা দেখা যায়, যেটা কোনদিনই অদৃশ্য হয়নি। বছর পাঁচ আগে ডঃ [illegible] এবং ডঃ সিরিল পোনামপেরুমা ক্যালিফোর্নিয়ার মোফেটফিল্ড গবেষণা কেন্দ্রে অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করে পরীক্ষা চালিয়ে একটি সিদ্ধান্তে আসেন। এই সিদ্ধান্তে বলা হয়, বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকা সম্ভব। আর ওই রক্ত তিলকের মধ্যে আছে হাইড্রোজেন সায়ানাইড। এর জন্যেই সম্ভবতঃ ওই লাল রঙ।

তা না হয় হলো। কিন্তু বৃহস্পতির নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলেই বা অমন ধরনের রক্ত তিলক থাকার কারণ কি? বৃহস্পতিকে কেন্দ্র করে এমন অনেক প্রশ্নই বিজ্ঞানীদের মনে উঁকি মারছে। আশা করা যায়, ভয়েজার এসব প্রশ্নের উত্তর যোগাতে সাহায্য করবে।

তবে শনিগ্রহ সম্পর্কে আমাদের তথ্য পাঠাবে পাইওনিয়ার-১১। সেই যে শুরু হয়েছিল যাত্রা, ১৯৭২-এ, তারপর কোটি মাইল অতিক্রম করে ভয়েজারের অগ্রগামী পরিব্রাজকের মত পাইওনিয়ার-১১ ইতিমধ্যে শনির অনেক কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে। ১৯৭৯ নাগাদ এটি তার পরিমণ্ডলে প্রবেশ করবে। এই গ্রহটি সম্পর্কে অনেক চমকপ্রদ খবর হয়ত তখন আমরা জানতে পারব।

সমরজিৎ কর

এখন! আপনার গাল তাজা গোলাপের মতো কোমল ক'রে তুলুন...রুক্ষতা দূর করুন

গালে গোলাপী গোলাপী আভা—
ত্বক সব মরশুমেই অম্লান।
নতুন জনসন্স* বেবী কমপ্লেক্শান
ক্রীম আপনার ত্বকে রেশমী কোমলতা
জাগিয়ে তোলে—জাগিয়ে তোলে
গোলাপের সুষমা।
একমাত্র জনসন্স* বেবী কমপ্লেক্শান
ক্রীম সারাক্ষণ আপনার ত্বক কোমল
রাখে। এক সুগন্ধি বেষ্টনী দিয়ে তাকে
ঘিরে রাখে।
অল্প বেশী দাম যা দেন তা আবার
অপরূপ রূপে ফিরে পান।
এই গোলাপী ক্রীম আপনার রঙে
রূপে এক অনিন্দ্যসুন্দর গোলাপী
আভা জাগায়। এর সুগন্ধ আপনার
ত্বক ঘিরে থাকে।

নতুন জনসন্স*

বেবী কমপ্লেক্শান ক্রীম
আপনার ত্বক কুসুম-কোমল রাখে

* Trademark © J&J 77

Johnson & Johnson®

OBM-7128-BEN

তুমি সুমনাকে মাপ করে যাও। ওকে তুমি নতুন লাইফ প্রেজেন্ট দিচ্ছো।"

"বেশ, বেশ! আমি মিস্টার সুন্দরেশনকে মিষ্টি মিষ্টি করে খুব শুনিয়ে দিলাম। আমাদের লাইনে এরকম পাপ নেই না, মিস্টার সুন্দরেশন। এর জন্যে আমি সুমনাকে সাবধান করে দিয়েছি—সেটা ভালো মেয়েদের লাইন এটা নয়। অপর লোকের কথা যারা চেপে রাখতে পারে না তারা আমাদের এ-লাইনের অযোগ্য। তাদের উচিত সিঁথিতে সিঁদুর চড়িয়ে সংসার লাইনে চলে যাওয়া। কিন্তু গরীবের কথায় সুমনার শিক্ষা হয় নি।"

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিসেস পাপি বিশ্বাস বললেন, "ওই ম্যাড্রাসি মিস্টার সুন্দরেশনের এখনও চোখ খোলে নি। এখনও যাটারফাই সুমনার জন্যে ফেকচার দিয়ে যাচ্ছেন। বলছেন, ওই ধরনের স্মার্ট লেডিটি মেয়ে আমার বুটিকের অ্যাসেট। তখন বলতে হলো আমি মিস্টার সুন্দরেশনের মুখের ওপর —মিস্টার সুন্দরেশন, বড় বড় লোকেরা, নির্ভয়ে আমার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে আমার এই বুটিকে পায়ের ধুলো দেন। তাঁদের আমি কিছুতেই বিপদে ফেলতে পারি না। এই যে আপনি আমাদের প্যাট্রনাইজ করেন, সময় পেলেই এখানে আসেন এবং সুমনার টেলিফোন পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে অফিসের কাজ ফেলে ম্যাড্রাস থেকে কলকাতায় হাজির হয়েছেন, এ সব কথা আপনি কি চান আমি আমার অন্য কাস্টমারদের কাছে রসিয়ে রসিয়ে গল্প করি?"

হি হি করে হেসে ফেললেন মিসেস পাপি বিশ্বাস। আমাকে বললেন, "সেই না শুনে মিস্টার সুন্দরেশন তিড়িং-বিড়িং করে লাফাতে লাগলেন। ও না, নো। নেভার কখনই না। সেটা হবে ব্রিচ অব ট্রাস্ট।"

আসেন। তা হলে পথে আসুন!" মন্তব্য করেছিলেন পাপি বিশ্বাস। এবং তারপর সুন্দরেশন সাহেব বলেছিলেন, "তুমি মিস্ বিশ্বাসকে খাতির করতে পারো। সেটা তোমার আফেয়ার—এ ব্যাপারে আমাদের কিছুই বলবার থাকতে পারে না।"

মিসেস পাপি বিশ্বাস হঠাৎ দুঃখে ভেঙে পড়লেন। বললেন, "কিন্তু কত কথা আর পেটে পেটে জমিয়ে রাখবো! এক এক সময় শরীর হাঁসফাঁস করে ওঠে। তখনই তো আপনার কাছে চলে আসি। আপনি তো আর আমার লাইনের লোক নন—তাই মুখ খুলতে দ্বিধা হয় না। তা ছাড়া, আমি জানি, আমার ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ আপনি করবেন না।"

শেষ কথাটা বোধ হয় তেমন মিথ্যা নয়। মিসেস পাপি বিশ্বাসকে আমি আগে ঘৃণা করতাম। তারপর ওঁকে কোনো রকমে সহ্য করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ক্রমশ এখন ওঁকে আমি মানুষ বলে ভাবতে শিখেছি। আজকাল ওঁর জন্যে আমার মাঝে মাঝে চিন্তা হয়—কেমন যেন অবাক দুঃখ বোধ করি এই দাম্ভিক বিলাসিনী পাপি বিশ্বাসের জন্য।

পাপি বিশ্বাস এবার শাড়ির প্রসঙ্গে ফিরে এলেন। "ও মা! আমার এই শাড়ির ঘটনাটাই আপনাকে বলা হলো না!"

মিসেস পাপি বিশ্বাস ঘোষণা করলেন, "আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না, মিস্টার শংকর, কিন্তু এই বাংলা তাঁতের শাড়ির কদর ক্রমশই বেড়ে চলেছে।"

"কোথায়?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"ইন্ডিয়ার হাই সোসাইটিতে। বিশেষ করে দিল্লি-বোম্বাইয়ের টপ ভিজিটররা ক্রমশ এর ভক্ত হয়ে পড়ছেন। কিছুদিন আগেও সিল্ক শাড়ি ছাড়া অন্য কোনো শাড়ির কোনো কদর ছিল না—আমার বুটিকের মেয়েদের পই-পই করে বলে দিতে হতো, ভুলেও এই দিশী তাঁতের কাপড়গুলো পরে ডিউটিতে এসো না। কিন্তু এখন উলটো প্রব্লেম হচ্ছে।"

আবার হাসলেন মিসেস পাপি বিশ্বাস। "আমার এই শাড়িটার কথা যদি শোনেন আপনি! ওই যে মিস্টার জয়রতনের কথা বলছিলাম—ঠিক জানো আপনি চেনেন না।"

"হাই সোসাইটির লোকদের সঙ্গে দেখা না করে লাফাবেন হোটেলে দেখতাম। এখানে তার সুযোগ কোথায়, মিসেস বিশ্বাস?" আমি নিবেদন করি।

"হাই সোসাইটির লোকদের সঙ্গে দেখা না করে আপনার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, মিস্টার শংকর, আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারি। হাই-সোসাইটি চরিয়েই তো আমি বেঁচে রয়েছি—একেবারে অরুচি ধরে গিয়েছে! এক এক সময় ইচ্ছে হয় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কোনো গ্রামে পালাই—যেখানে বড় বড় পোস্টের বড় বড় লোকদের সঙ্গে দেখাই হবে না।"

আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার ওই মিস্টার জয়রতন সম্বন্ধে কী যেন বলছিলেন?"

ডান হাতের একটি আঙুল আলতো দাঁতে কামড়ে মিসেস পাপি বিশ্বাস বললেন, "অদ্ভুত লোক এই মিস্টার জয়রতন। দিল্লিতে বিরাট চাকরি করেন। বড় বড় লোকের টিকি ওঁর কাছে বাঁধা। মিস্টার জেঠমালানি আমাকে আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিলেন—বলেছিলেন খুব স্পেশালি হ্যান্ডেল করতে হবে।

"এই কথা শুনে কার না রাগ হয় বলুন? আমি মিস্টার জেঠমালানিকে শুনিয়ে দিয়েছিলুম, 'আমাদের সব গেস্টই স্পেশাল গেস্ট।'

"তখন মিস্টার জেঠমালানি বললেন, মিস্টার

ড্যানড্রাফ (খুস্‌কি) ধুয়ে সাফ করে চুল করে তোলে ঝলমলে, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল

এখন পাচ্ছেন ক্লিনিক ল্যানোলিন: শুষ্ক চুলের গোড়ার জন্যে

ক্লিনিক: স্বাভাবিক চুলের গোড়ার জন্যে

ক্লিনিক কি ভাবে কাজ করে—

বৈজ্ঞানিক ফর্মুলায় তৈরী করা ক্লিনিক ও ক্লিনিক ল্যানোলিন, চুলের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত ড্যানড্রাফ (খুস্‌কি) ধুয়ে একদম সাফ করে দেয়।

রাশি রাশি ঘন ফেনা চুলের গোড়া অবধি ঢুকে সমস্ত খুস্‌কি ধুয়ে নির্মূল করে দেয় কিন্তু চুলের নিজস্ব স্বাভাবিক তেলভাবের কোন ক্ষতি করে না। চুল করে তোলে ঝলমলে, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল।

সবচেয়ে ভাল ফল পেতে হলে: চুলে ভাল করে ফেনা লাগিয়ে আলতো করে ধুয়ে ফেলুন। দ্বিতীয়বার ফেনা লাগিয়ে মিনিট খানেক ঘষতে থাকুন। এতে ক্লিনিক কার্যকরভাবে কাজ করে ও চুলের গোড়ায় নতুন জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনে।

নিয়মিতভাবে ক্লিনিক বা ক্লিনিক ল্যানোলিন ব্যবহার করুন: অন্ততপক্ষে সপ্তাহে একবার। ক্লিনিক আপনার চুল থেকে ড্যানড্রাফ (খুস্‌কি) একদম নির্মূল করে দেবে।

ক্লিনিক ল্যানোলিন একমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

ক্লিনিক শ্যাম্পু

এখন আপনি পছন্দ করে নিন।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড-এর এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

HL.CL-1509

জয়রতন অনেকদিন কী সব কাজে বাইরে ছিলেন, সুতরাং বুঝতেই পারছেন, টেস্ট অন্যরকম হয়ে গিয়েছে।"

"কয়েক দিনেই আমার একটু চিন্তা হলো," বললেন মিসেস বিশোয়াস। "কিছুদিন বাইরে থাকলেই কিছু কিছু ইন্ডিয়ানের মাথা বিগড়ে যায়—রুচি পাল্টে যায়। আমি অনেক ভেবে-চিন্তে এই শিল্পী তাঁতের টাঙ্গাইল শাড়ি সিলেকশন করলাম। নামেই টাঙ্গাইল—এখন নবদ্বীপে রিফিউজিরা তৈরি করে।"

"তারপর?" এবার আমি জিজ্ঞেস করি।

মিসেস বিশোয়াস এবার নাটকীয় কায়দায় বললেন, "টাঙ্গাইল শাড়ি পরলাম তো বটে। কিন্তু ভয় হলো মিস্টার জয়রতন না আবার বিরক্ত হন। আফটার অল দিল্লির অত বড় অফিসার। তাঁর ডিউটিতে সামান্য দামের শাড়ি।"

"তার পরের ব্যাপারটা আপনি ভাবতেও পারবেন না মিস্টার শংকর। অপছন্দ হওয়া তো দূরের কথা, মিস্টার জয়রতন এই টাঙ্গাইল শাড়ি দেখে মোহিত। ভদ্রলোকের ভাবগতিক কাণ্ডকারখানা দেখে কে বলবে চৌদ্দ বছর হ্যাপিলি ম্যারেড, বড় ছেলে আমেরিকায় পড়ছে। যাই হোক, ভদ্রলোক সুপার প্লিজড হয়ে আমার ওখান থেকে গেস্ট হাউসে ফিরে গেলেন। কিন্তু যাবার আগে দুম করে বলে বসলেন, 'মিসেস বিশোয়াস, ওয়ান রিকোয়েস্ট, মিসেস জয়রতনের জন্যে।' আমার শাড়ির আঁচলখানা হাত দিয়ে পরীক্ষা করলেন, তারপর বললেন এই রকম একখানা শাড়ি আমাকে জোগাড় করে দিতেই হবে।" শাড়ির টাকাটাও আমার হাতে গুঁজে দিলেন ভদ্রলোক।

মিসেস পাপ বিশোয়াস বললেন, "এরকম পরিস্থিতিতে জীবনে কখনও পড়ি নি। বাধ্য হয়ে ছুটলাম দোকানে। পরের দিন সকালে এয়ারপোর্টে যাবার পথে মিস্টার জয়রতন আমার কাছে এলেন। এবং শাড়ির প্যাকেটটা তুলে নিলেন। বললেন, আমার ওয়াইফ এই শাড়ি পেয়ে খুব খুশী হবে, ওকে মানাবেও চমৎকার। আনফরচুনেটলি, ওকে বলতে পারবো না, কে এই শাড়ি কিনে দিয়েছে।"

এই ক'সপ্তাহ আগেকার ব্যাপার এ সব। মিসেস পাপ বিশোয়াস বললেন, "কী বলবো আপনাকে, সেই থেকে এই শাড়িটা দেখলেই আমার বেচারা মিসেস জয়রতনের কথা মনে পড়ে যায়। পুরুষমানুষেরা যে কতটা নির্লজ্জ হয় তা যদি বেচারা গৃহবধূরা জানতো।" মিসেস পাপ বিশোয়াস এবার খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

এইখানেই আজকের পর্ব শেষ হবে ভেবে-ছিলাম। কিন্তু হাসির বেগ কাটবার আগেই পাপ বিশোয়াস বললেন, "এই আপনাদের রাজকুমারী পদ্মার কথাই ধরুন না কেন। এই বিপুলভূষণবাবুর মাথায় কী আছে, কেন উনি রাজকন্যা হরণের মতলব এঁটে-ছিলেন, এ সব কেউ কী বলতে পারে?"

পদ্মা ও বিপুলভূষণ বারিকের সমস্ত ব্যাপারটা আমার নিজেরও জানা নেই। হয়তো এটি একটি প্রকৃত বয়স্ক রোমান্স। সুতরাং অন্য কিছু সন্দেহ করে, বিষয়টা তিক্ত করে তোলা আমাদের কাজ নয়।

কিন্তু মিসেস পাপ বিশোয়াস আমাকে শান্তিতে থাকতে দিলেন না। বললেন, "রাজকন্যের মা নিশ্চয় আপনার মতো এই বিপদে পড়ে কিছুটা বুঝতে পেরেছেন। খবরগুলো যদি কানে গিয়ে থাকে, তা হলে উনি নিশ্চয় আপনাকে আবার ডেকে পাঠাবেন। আর যদি ডেকে পাঠান, তা হলে, মিস্টার শংকর, আপনি বলে দেবেন স্রোতে পা ভাসিয়ে না দিতে। এই মিস্টার বারিকের ব্যাপারটা আরও খোঁজখবর করা খুব দরকার।"

কেন এমন সব সন্দেহ প্রকাশ করছেন মিসেস পাপ বিশোয়াস? এ সম্বন্ধে ওঁর কাছে কি নতুন কোনো খবর আছে?

পাপ বিশোয়াস বললেন, "আমার সন্দেহ করবার কিছুই ছিল না। রাজবাড়ির মাস্টার যদি রাজকুমারীর সঙ্গে রোমান্স করে, কার কী বলবার আছে? কিন্তু তাদের সঙ্গে তো ওই শকুন্তলা চাওলার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। আপনাকে বলে রাখলাম, মিস্টার শংকর, ওই শকুন্তলা চাওলা মহিলাটি মোটেই সুবিধের নয়। কিন্তু এতোশত না করে দুনিয়ার কাউকে কিছু আসল দেবার মহিলা তো উনি নন।"

পাপ বিশোয়াস বললেন, "আমার নিজের অঙ্কও কিছু গোলমাল হয়ে গিয়েছে। আমি ভাবলুম কোনো দুষ্টুবুদ্ধি নিয়ে মিসেস চাওলা এই মিস্টার বারিককে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে রাখছেন। আমিও সেই মতো উল্টো অঙ্ক কষে খবরাখবর নিলাম যে, এই ব্যাপারে মাসখানেই আপনার সহায়তায় মিসেস বিলাসিনী গুপ্ত নিজের মেয়েকে উদ্ধার করবেন এবং এই শকুন্তলার স্বরূপটি বুঝে নিতে পারবেন। কিন্তু..."

"এর পর কী?" আমি মিসেস পাপ বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "কিন্তু লাস্ট মোমেন্টে সব গোলমাল হয়ে গেল। আমি এইমাত্র শুনলাম, আপনারা নাকি এই সিনেমার গলি থেকে পদ্মাকে উদ্ধার করেন নি? ওদের পেয়েছেন আবদানি ম্যানসনের গেস্ট ফ্ল্যাট থেকে? এটা কি মিসেস শকুন্তলা চাওলার শেষ মুহূর্তের চাল? না অন্য কোনো লোকও একই সঙ্গে দাবা খেলে যাচ্ছে? অঙ্কটা আমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। একটু সাবধানে থাকবেন, মিস্টার শংকর। আপনাকে এইটুকু বলবার জন্যেই আমি এখানে চলে আসতে বাধ্য হলাম।"

[ক্রমশ]

এখন আপনি ওর দাঁত যন্ত্রণাদায়ক
ছিদ্রের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন

কিনুন সিগন্যাল 2

**এতে আছে সবচেয়ে কার্য্যকরী ফ্লোরাইড ফর্মুলা
যা দাঁত মজবুত ক'রে দন্তক্ষয় রোধ করে**

দাঁতের ব্যথা শুধু যন্ত্রণাদায়কই নয়—এ দন্তক্ষয়েরও লক্ষণ। অবহেলা করলে ক্ষয় আরও গভীর হবে, পরিণামে দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক গর্তের সৃষ্টি হবে।

সাধারণ টুথপেস্ট ততো এসিড রোধ করতে পারেনা, যে এসিড দাঁতের ভেতরে ঢুকে ক্ষয় সৃষ্টি করে।

সিগন্যাল 2-তে আছে সবচেয়ে কার্য্যকরী ফ্লোরাইড ফর্মুলা যা মুখের এসিডকে দাঁতের ভেতরে ঢুকে ক্ষয় সৃষ্টি করতে বাধা দেয়।

দন্তছিদ্র রোধ করে

বেশী দেরী হয়ে যাবার আগে এখনই পরিবারের সবাই এমন এক টুথপেস্ট ব্যবহার শুরু করুন যা দন্তক্ষয় রোধ করে ব'লে প্রমাণিত হয়েছে, আর তা হোল —সিগন্যাল-2। এর বিশেষ ফ্লোরাইড ফর্মুলা দাঁতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে দাঁত আরও মজবুত করে, ক্ষতিকারক মুখের এসিডকে আরও ভালভাবে প্রতিরোধ করে—আর দাঁতে গর্ত সৃষ্টি রোধ করতে সাহায্য করে। দন্তক্ষয় রোধ করার ব্যাপারে আর কোন টুথপেস্টই এর চেয়ে ভাল ফল দেয়না।

শুধু আমাদের কথাই মেনে নেবেন না। আপনার দাঁতের ডাক্তারকেও জিজ্ঞেস করুন।

পরিবারের সবার দাঁতে
ছিদ্র রোধ করে।

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-SG2.1-2416 BG

পেলেকে পেলাম না

চুনী গোস্বামী

নাটকের পরিভাষায় হয়তো একেই বলে "অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স"। পেলেকে ঘিরে কলকাতাবাসীর অদম্য আগ্রহ যেন এক বিকেলেই নিভে গেল। জনপ্রিয়তার সাঁওই এক অদ্ভুত উপাদান আছে—যা এক বিকেলেই ফুটবলের রাজার ভাবমূর্তিকে অর্ধেক ম্লান করে দিল। আমি ফুটবলের এক সাধারণ সৈনিক। স্বভাবতই, ফুটবলসম্রাটের প্রতি দর্শকদের তীব্র কটূক্তি আমার বুকে বার বার বিঁধেছে।

কিন্তু কেন এমন হোল ? তিনবার যুলে রিমে কাপ যিনি ব্রাজিলের ঘরে তুলে দিয়েছেন, পৃথিবীর ফুটবল পণ্ডিতেরা যাঁকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার বলেছেন এবং স্বয়ং ইউসেবিও যাঁর গোলাম হতে

চেয়েছেন—তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে তো কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তাহলে কলকাতায় পেলে এমন ফুটবল খেললেন কেন ?

কলকাতা পেলেকে যে সম্মান জানিয়েছে, তাতে পৃথিবীর যে-কোনো রাষ্ট্রনায়কেরই ঈর্ষা জাগতে পারে। এত ভালবাসা জানাল এই ফুটবলের শহর, বিনিময়ে পেলে কি দিলেন ?

খেলা শেষ হবার পর এই প্রশ্নগুলিই আমাকে কিছুক্ষণের জন্য বিব্রত করে দিয়েছিল। রাতে গ্র্যান্ড হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে মোহনবাগান ক্লাবের দেওয়া পার্টিতে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, এ ব্যাপারে পেলের কাছে প্রশ্ন রাখলে কেমন হয়। কিন্তু দ্বিধাও ছিল : এত বড় একজন ফুটবলারকে সরাসরি এই ধরনের কথাবার্তায় টেনে আনা কি ঠিক হবে ?

শেষ পর্যন্ত এই ভেবে নিজেকে শক্ত করলাম : পেলে আমার চেয়ে অনেক অনেক বড় ফুটবলার এবং আমাদের দুজনের মধ্যে পার্থক্য আকাশ-পাতাল—তবু, আমরা দুজনেই একই খেলা খেলেছি দীর্ঘকাল। সুতরাং খুব নীচু গলায় প্রশ্ন রাখলাম, "আপনি আজ মাঠে খেলার কোনো চেষ্টাই করলেন না কেন ? ফুটবল জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আপনি কি বিব্রত ছিলেন ?"

পেলে হাসলেন। তারপর খুব ধীরে ভাঙা ইংরেজীতে বললেন, "গত তিন বছর আমি অ্যাস্ট্রো টার্ফ খেলেছি যেখানে বল নির্দিষ্ট নিয়মে লাফায়।

অ্যাস্ট্রো-টার্ফে বুটের স্টাড ছোট হলেই চলে। মাঠের এই রকম অবস্থার কথা আমি চিন্তা করিনি। এই ধরনের মাঠে অভ্যাস না থাকলে দাঁড়িয়ে থাকাই কঠিন। এবং এই মাঠে বল নিয়ে দুরন্তগতিতে এগোনোর চেষ্টা করে লাভ নেই।"

পেলের কথা শুনতে শুনতেই খেলার শুরু হবার আগের মুহূর্তের একটি ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। পেলে এবং কসমসের অন্য খেলোয়াড়দের ক্লাব হাউস থেকে মাঠে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় লক্ষ্য করলাম পেলে যেন খেলার জন্য উৎসাহে টগবগ করছেন। কিন্তু সিঁড়ি থেকে মাঠে পা দিতেই পেলে আমার দিকে ঘুরে যেন আর্তনাদ করে উঠলেন : "ঈশ। মাঠ তো জঘন্য রকম।" সম্ভবত ভাল খেলার ইচ্ছা পেলের তখনই চলে গেল।

পেলে অবশ্য খুব মৃদু অভিযোগের ভঙ্গীতে একবারও বললেন যে, বল দিয়ে অন্যদের কাছ থেকে আর তিনি ফেরত পাননি। এবং স্মিতহাস্যে পেলে জানিয়েছেন, কলকাতার ফুটবলারদের ছোট ছোট পাস এবং দ্রুত জায়গা নেওয়া তাঁর ভাল লেগেছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে যোগ করেছেন : মাত্র একটি খেলা

থেকে কলকাতার ফুটবল সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নয়।

বাইশ তারিখ প্রায় মধ্যরাত্রে তুমুল সম্বর্ধনার মধ্য দিয়ে পেলে কলকাতায় এসেছিলেন। পঁচিশ তারিখ রাতেও ফিরে গেলেন রাজকীয় মর্যাদায়। আমরা ধন্য, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ফুটবলারকে আমরা দেখলাম। আমার মতো হাজার হাজার ফুটবলারের কাছে পেলে ফুটবলের রাজা হিসেবেই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

পেলে কি কিছুই দেখাননি ? কী করে ভুললো "ব্যানানা কার্ভ"-মেলানো ঐ অনবদ্য ফ্রি-কিকটির কথা ? অসংখ্য ডিফেন্ডারের ফাঁক দিয়ে ছোট ছোট দুটি ধরালো পাস যখন নিখুঁত নিশানায় পাঠিয়েছেন, অল্প জায়গার মধ্যে যখন বল ধরেই ছেড়ে দিয়েছেন এবং মাঝে মাঝেই যখন সকার অনেকের চমৎকার জায়গা নিয়েছেন, পেলের ঐশ্বর্য তখন উপলব্ধি করেছি। আর ক্যাপ্টেন আলবার্টোকে দিয়ে যখন প্রথম গোলটি করালেন আধুনিক ফুটবলের একটি পৃষ্ঠা যেন আমাদের সামনে মেলে ধরা হোল।

তবু, পেলে যেহেতু পেলে, দীর্ঘ নব্বই মিনিট আমরা চোখ মেলে দেখেছি আরো বেশী কিছু দেখার আশায়। শুনেছি মাত্র কয়েক দিন আগে চীনে এবং জাপানেও নাকি তিনি দারুণ ভাল খেলে এসেছেন। তাই অভিযোগ নয়, আমাদের অভিমান : ফুটবলের রাজা বিদায়বেলায় দেখা দিয়ে গেলেনই, তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্যের সামান্য অংশও আমাদের দেখাতে চাইলেন না কেন ?

বাইশে সেপ্টেম্বর রাতে দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছে পেলে সহাস্যে "বিজয়" চিহ্ন দেখিয়েছিলেন। এই জয়ের চিহ্ন তিনি পঁচিশ তারিখ রাতে বিদায়লগ্নে দেখিয়েছেন। কিন্তু আবির্ভাব এবং বিদায়ের মধ্যে দুঃখজনক নব্বই মিনিট। পেলে খেলতে পারেনি—একথা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে কঠিন। দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ ডিফেন্ডারদের যিনি খেলায় অতিক্রম করেছেন, লোমচক্ষু ক্যামেরাও যাঁর চাতুর্যকে ধরতে পারেনি, ফুটবল নামক বিরাট খেলাটির যিনি শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়—শুধুমাত্র কর্দমাক্ত মাঠই তাঁকে ভাল খেলতে দিল না—একথা মেনে নিতে আমার মন চাইছে না। আমার দুঃখ আজ অবশ্যই অন্যরকম, কারণ বলের রাজার ঐশ্বর্য আমি দেখতে পেলাম না। কিন্তু সমস্ত বেদনার মধ্যেও একটি কথা ভেবে আমি আনন্দিত : পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ফুটবলারকে খেলার মাঠে চোখের দেখা অন্তত দেখলাম।

নতুন গোল্ড মিস্ট। এর অনন্ত কোলনের সতেজতায় আপনাকে ঘিরে রাখুন। আপনার ত্বকে শিহরণ জাগাবে: কোলনের সুবাস আপনার সারা অঙ্গে মিশে থাকবে সারাদিন ধ'রে।

নতুন গোল্ড মিস্ট। দেখুন, কেমন সুরুচিপূর্ণ এর নতুন গঠন, কেমন অভিজাত এর সোনালী মোড়ক।

নতুন গোল্ড মিস্ট। ওজনে যেন ১০০ গ্রাঃ সোনা! আর ওজনটাও দেখবার মত বৈকি!

একই দামের অন্যান্য অধিকাংশ সাবান ওজনে অনেক কম।

টাটার তৈরী

কলি ফিল্ডের আগেকার মতই একটি উঁচু সেণ্টার পিকরে মাথায় লাগাতে পারলেন না।

বিরতির কয়েক মিনিট আগেই কিনালিয়া একটা সুন্দর ডান পায়ের ড্রাইভ নিয়েছিলেন কুড়ি গজ দূরে থেকে, কিন্তু এবার শিবাজী ঠিক জায়গায় ছিল ও সময়মত পাঞ্চ করে বল বাঁচাও করে দেয়। প্রথমার্ধে ৩০ মিনিটের মাথায় পেলে একটা ফ্রি কিক শট মারতে এলেন। আমরা সকলেই উৎসুক তাঁর প্রসিদ্ধ 'সুপার্ভিং' শট দেখব বলে। তিনি বিপক্ষের ছয়জন খেলোয়াড়ের ভেতর দিয়ে সুন্দর একটা ইনসুইং মেরেছিলেন এবং সে শট গোলপোস্টের দ্বিতীয় কোণা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ঢুকছিলও বটে, কিন্তু শিবাজী বলকে কোনও রকমভাবে ধরতে না পেরে ফাউল বাঁচায়।

মোহনবাগান প্রথমার্ধে সমান সমান আক্রমণই করেছিল। চার-পাঁচ মিনিটের মাথায় বিদেশ গোল এরিয়ায় একা অসহায় গোলকীপারকে পেয়েও গোল করতে পারেনি।

কুড়ি মিনিটের মাথায় শ্যাম থাপা একটা সুন্দর [illegible] শটে গোল করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে [illegible]

৩১ মিনিটের মাথায় আকবরের বাঁ পায়ের একটা জোর শট গোলকীপার ইয়াসীন দোনামনা করে, শেষ মুহূর্তে পাঞ্চ করে বল ফেলে দেয় সামনে। হাবিব পিছন থেকে ছুটে এসে দ্বিতীয় গোলটি করে দেয়। প্রথমার্ধে মোহনবাগান ২—১ গোলে এগিয়ে।

দ্বিতীয়ার্ধে আমরা পেলের কাছ থেকে আশা করেছিলাম অন্তত কিছুটা গোল শোধ করবার প্রচেষ্টা, বিশেষ করে তাঁর দল যখন পেছিয়ে। কিন্তু তাঁকে দ্বিতীয়ার্ধে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর দুটি প্রচেষ্টা আমাদের বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। প্রথমটি তাঁর ছোট্ট ইনসুইং যা কিনালিয়া গোল করতে পারেনি। অপরটিও তিনি [illegible] করে কিনালিয়াকে গোল এরিয়ার ভিতরই দিয়েছিলেন। এবারও কিনালিয়া তার যথার্থ ব্যবহারে অক্ষম।

আশী মিনিটের মাথায় কসমস পেনাল্টি পায়। পেনাল্টি থেকে গোল করে কিনালিয়া।

দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দশ মিনিট মনে হচ্ছিল উভয় দলই খানিকটা পা ছেড়ে দিয়েছেন।

॥ ৪ ॥

আন্তর্জাতিক ফুটবলের নিরিখে যদি এই কসমসকে বিচার করতে হয়, তাহলে এই খেলা দেখে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে—আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছাতে গেলে যে বিশেষ গুণগুলো যেমন গতি, শক্তি, স্টাইল ও ক্রীড়া-শৈলীতে বৈচিত্র্য দলের বিশেষভাবে থাকা দরকার তার কোনটাই আমি কসমসের খেলায় খুঁজে পাইনি।

বেকেনবাওয়ার ছিলেন না কিন্তু পেলে, কিনালিয়া ও আলবার্তোর মত পৃথিবীর প্রথম সারির তিন জন ফুটবলার ও দলে ছিলেন। তাঁদের তিন জনের ক্রীড়াশৈলী নিঃসন্দেহে এ খেলাকে আরও গরিমাময় ও প্রাণবন্ত করে তুলতে পারত কিন্তু তাও হয়নি।

যে ৪-২-৪ পদ্ধতিতে কসমস খেলেছে, বিভিন্ন দুর্বলতার কারণে আজ উন্নতমানের ফুটবলের দেশে এ পদ্ধতি পরিত্যক্ত।

এই পরিত্যক্ত পদ্ধতির ভিতর থেকেই যে সমস্ত 'টাকটিক্যাল ভ্যারিয়েশন' খাঁটি সম্ভব বিশেষ করে আক্রমণে তার কোনও দৃষ্টান্তও এই কসমস দলের আক্রমণ থেকে আমরা খুঁজে পেলাম না।

প্রতিরক্ষায় 'ফ্ল্যাট-ডিফেন্সের' সফল প্রয়োগও আমরা দেখতে পাইনি। মধ্যমাঠে বল না ছেড়ে বিপক্ষের খেলোয়াড়দের নিজেদের বক্স এরিয়ায় ওপর দিয়ে বল কেড়ে নেওয়ার প্রচেষ্টাই 'ফ্ল্যাট ডিফেন্সের' কাজ। সেখানেও আমরা ভুল দেখেছি বারবার। একমাত্র সামবাদো' ছাড়া কেউই ট্যাকল করতে দেখতে পাইনি। তার জন্য মোহনবাগানের ফরোয়ার্ডরা অনেকবার গোল করবার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু অকারণ ব্যস্ততা ও তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে তাঁরা যে সুযোগ হাতছাড়া করেছেন—না হলে এ খেলায় তাঁরা অনেক বেশী গোলের ব্যবধানে জিততে পারতেন।

উঁচুতে মানের ফুটবলের পক্ষে মাঠ একটা অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু ইডেনের মাঠ সেদিন একটু পিছিল থাকলেও, আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল। ঘাসের পরিচর্যা তখনও মাঠের জন্য শেষ হয়নি। বল গড়ানোর ক্ষেত্রেও মাঠ ছিল যথাযথ।

এ খেলার শেষ বাঁশিটা যখন বাজল তখন দেখলাম সারা মাঠ জুড়ে কেমন যেন বিষাদের ছায়া। অনেক দিনের বিশ্বাস কে যেন হাতুড়ির ঘায়ে ভেঙে চুর চুর করে দিয়ে গেছে।

কিছু কিছু মোহনবাগানের উগ্র সমর্থক মোহনবাগানের সুন্দর প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ খেলার জন্য করতালি দিয়েছিল বটে, কিন্তু অধিকাংশ দর্শকই ক্লান্ত পায়ে ইডেনের পাশ দিয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে কাছ কাছে তাঁদের ক্ষোভ জানালেন সেটাই বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

তাদের মুখে, একটাই প্রশ্ন—আমাদের ঠকানো হলো কেন?

সমেত। এবং তারপরেই ওই জাতীয়তাবোধের সূত্র ধরে এলো নব্য হিন্দুচেতনা। এই চেতনাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে পরিণতি লাভ করেছে। মনোমোহন বসুর গীতাভিনয়ের ধারায় এই হিন্দু রীতিবোধেরই শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হয়ে এলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ ইত্যাদি। লেখক এই পর্বের নাট্যধারাকে চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এর পরের পর্বেই স্বদেশী ভাবনাকে রূপদেবার চেষ্টা—লেখকের ভাষায় 'কর্মযোগ'। লেখক এই শেষ বা পঞ্চম পর্বে বাঙলা নাটকে স্বদেশী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবের বিশ্লেষণ করেছেন নিপুণভাবে। ইতিহাসে জাতীয়তাবাদের উদ্দীপন হিসেবে কোন্ কোন্ নাটকে কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তারও বিস্তৃত পরিচয় লেখক দিয়েছেন এবং উদ্ধৃতিগুলির তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছেন। স্বদেশী জাগরণের সম্পর্কে লেখকদের নিজস্ব মতামত এবং দ্বিধাগ্রস্ত চিন্তা-ও এই আলোচনার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। বিশেষ করে দ্বিজেন্দ্রলালের রাজনৈতিক মতামত ও নাটকে তার প্রতিফলন কৌতূহলী পাঠককে উদ্দীপ্ত করবে।

পরিশিষ্টে হিন্দু বিধবা-বিবাহের ড্রাফ্ট্ বিল, বল্লাল সেনের আমলে কৌলীন্য প্রাপ্তদের নামের তালিকা 'কুলীন-কীর্তন' নামে একটি বই থেকে অনূঢ়া কন্যার উক্তি বহু বিবাহের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এই ব্যাপারে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের কমিটি রিপোর্ট, বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ বিষয়ক বইতে উদ্ধৃত কুলীনদের নাম বয়স বাসস্থান ও বিবাহ সংখ্যার পরিচয়মূলক তালিকা, বহুবিবাহ সম্পর্কিত একটি সম্পূর্ণ পুস্তিকা, কৌলীন্যের অত্যাচার সম্পর্কে সমাচার দর্পণের রিপোর্ট, বাল্যবিবাহ-নিরোধ আইন, রূপচাঁদ পক্ষীর লেখা ঠুংরী তালে উনিশ শতকের একটি বিবাহ বর্ণনা, সম্মতির বয়স বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চার বছরের এল-এম, বি-এল, এন্ট্রান্স, এবং বি-এ পরীক্ষার ফল এবং ক্যালকাটা 'রিভিউ' থেকে উদ্ধৃত নীলচাষের খরচ ও বিদেশে (লন্ডনে) তার রপ্তানি মূল্য ইত্যাদির হিসেবের টেব্‌ল্-টি দেওয়া হয়েছে। সমাজ, শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক রাজনীতির ইতিহাসে এই তথ্যগুলি অবশ্যই মূল্যবান।

সমাজভিত্তিক সাহিত্য-আলোচনার ক্ষেত্রে প্রদ্যোতবাবুর এই বই অন্তর্দৃষ্টি, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের প্রমাণ হিসেবে আদর্শ হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি **চলচ্চিত্র**

আদি মানব

আমার দুরন্ততম স্বপ্নেও আমি ছুঁতে পারতাম না তাদের, এ-ছবির প্রথম কয়েকটি দৃশ্য, কয়েকটি রুদ্ধ-শ্বাস, বর্ণিল মুহূর্ত এমনি চূড়ান্ত মাপের। আমি প্রায় দেখতে পেলাম কোটি কোটি তারকার জন্ম, বিশ্বের সেই অনিশ্চিত-প্রবল চেহারাটা একটির পর একটি বিস্ফোরণে আমাদের ভিতর পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়ে গেল, আর আমি প্রায় ভেবে ফেলেছিলাম আর একটু হলেই যে, আমার চোখের সামনে যা ঘটছে তা ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি নতুন যুগের সূচনা, অন্তত চাপা উত্তেজনাটাকে যে কোনো রকমে দুমড়ে নিয়ে বসে ছিলাম সে-কথা ঠিক। কিন্তু এই উত্তেজনা মুহূর্তে নিবে গেল আর মাথা নীচু হয়ে এল লজ্জায় আর অপমানে যখন একটু পরেই বুঝলাম প্রারম্ভিক সিকোয়েন্স-এর সবটাই, কিউব্রিক-এর অনুমতি না-নিয়েই (কেননা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের ভদ্রতাটুকু পর্যন্ত কেউ দেখাননি) একেবারে ছাঁকা 'স্পেস-অডিসি' থেকে কেটে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। পরীক্ষা থেকে চলচ্চিত্র—সর্বক্ষেত্রে এদেশে টোকাটুকির জয়-জয়কার—বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেনসর বোর্ড কারো কোনো আপত্তি নেই।

কিউব্রিক পর্ব শেষ হতেই আদি মানব ছবিটি শুরু হয়ে যায়—আর সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যায় ছবির রঙের টেকসচার, ডেনসিটি, ক্যামেরার ধরন-ধারন, বলতে গেলে ফটোগ্রাফির পুরো স্টাইলটাই বদলে যায়। আমরা ভারতীয় ছবির অভ্যস্থ চেহারাটায় ফিরে আসি। এবং তারপর চোদ্দ রীল ধরে এই 'শিক্ষামূলক' ছবিটিতে (এ-দেশের নৃতত্ত্ববিদদের কিছু শিখিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই সেনসর বোর্ড এই রু-ফিল্মটিকে মুক্তি দিয়েছেন সন্দেহ নেই) যে-সব ঘটনা ঘটাতে থাকে ... যে শুধু ডারউইন সাহেব কবরে ... নড়ে ওঠেন তা-ই না, আমাদের ... ইতর জন একদা স্কুল-কলে... প্রাগৈতিহাসিক মানুষ সম্বন্ধে যৎ... জেনেছিলাম সে-জ্ঞান যে কত ভ্রান্ত ... নগণ্য আমরা বুঝতে পারি।

যাই হোক, 'আদি মানব' ... পর আমার মাস্টারমশাইরা আম... হাজার হাজার বছরের পুরো... পৃথিবী সম্বন্ধে যে-সব ভুল তথ্য ... ছিলেন সেগুলো আমি শুধরে ... পেরেছি। আদি মানব ছবিটি ... যে-সব নতুন খবরাখবর আমি পে... সেগুলির একটি তালিকা করে দি... যাতে আপনারাও যে শুধু নিজে... ভুলটুল শুধরে নেবেন তাই না, ... ছেলেদের কাছে ভুল তথ্য ... অপ্রস্তুতে পড়বেন না। ভালো ... আদি মানব ছবিটি কেবল মাত্র প্রা... বয়স্কদের জন্যে বললেই কিশো... কিশোরীর, এমন কি বালক-বালি... ভিড়ও দেখলাম।

১। মানুষ যখন আগুন জ্বাল... এবং কথা বলতেও শেখেনি ... আদি মানব-মানবীদের চেহারা... আমাদেরই মতো ছিল—সরু ... তীক্ষ্ণ নাক, কোমল দেহ; আমি ... আপনারা শিখেছিলেন প্রাগৈতিহা... মানুষ ছিল ডাইনোসেফালিক— আদি মানব দেখে বুঝলাম ওসব ... বড় কথা আজকাল আর চলছে না ... দেখতে ... আমাদেরই মতো ...

২। ... মানব-মানবীরা প্রত্যে... স্মল-প... টিকে নিতো—পরে...

তাদের
VIMAL
A RELIANCE PRODUCT
SIMOES/RTI/F/77

আপনার জন্ম যদি ১৯৫৩ সালের আগে হ'য়ে থাকে আপনার চুল উঠতে থাকবে...চিরকালের মত!

পিওর সিলভিক্রিন চুল ওঠা বন্ধ করে সত্যিসত্যিই চুলের একেবারে গোড়া থেকেই চুলকে শক্ত ক'রে তোলে।

পিওর সিলভিক্রিন একটি অনন্য, বিজ্ঞান-সম্মতভাবে গবেষণাকৃত ফরমুলা

যাঁদের বয়স ২৫ বা তা'র বেশী তাঁদের ১০ জনের মধ্যে ৯ জনেরই চুলের গোড়ায় একান্ত প্রয়োজনীয় অ্যামিনো এসিডের ঘাটতির দরুন চুলের বৃদ্ধি অস্বাস্থ্যকর হয়। এর প্রতিকার না করলে, চুলের গোড়া দুর্বল হ'য়ে চুল উঠতে শুরু করে। পিওর সিলভিক্রিন হ'ল একটি বিজ্ঞানসম্মতভাবে গবেষণাকৃত ফরমুলা যা'তে রয়েছে ১৭টি অ্যামিনো-এসিডের সবগুলি, স্বাভাবিক প্রোটিন,—যা চুল সুস্থ হয়ে বেড়ে ওঠার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

চুল ওঠা বন্ধ করে, চুলের গোড়া থেকেই চুলকে শক্ত ক'রে তোলে

পিওর সিলভিক্রিন তাড়াতাড়ি চুলের গোড়ার গভীরে প্রবেশ করে, চুলে স্বাভাবিক প্রোটিনের যে ঘাটতি ছিল—সেই চাহিদা মেটায়। অল্প সময়ের মধ্যেই, পিওর সিলভিক্রিন চুলকে শক্ত ক'রে তোলে, চুলকে ফিরিয়ে দেয় তা'র আগের স্বাস্থ্য আর ঘন বৃদ্ধি। যতদিন না আপনার চুল আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসছে, ততদিন প্রত্যহ দু বার ক'রে কয়েক ফোঁটা পিওর সিলভিক্রিন ব্যবহার করুন।

চুলের স্বাভাবিক আহার

প্রমাণিত ফল:

"পিওর সিলভিক্রিন ব্যবহার ক'রে আমি খুব ভাল ফল পাচ্ছি... আমার চুল ওঠা বন্ধ হ'য়েছে।"
ডি. নাবিন, ভালাবালপাক, ৭০ দামা মহল, কাফ প্যারেড, বোম্বাই।

"পিওর সিলভিক্রিন-এর ওপর আমার পুরো আস্থা আছে ... কারণ এটি আমার চুলের স্বাস্থ্য অটুট রাখে।" এম, বেণুগোপাল, সুপেরভাইজার, দোবারা, পালঘাট (জিল্লা), কেরালা।

পিওর সিলভিক্রিন

OBM-8153-BEN

সিলভিক্রিন হেয়ার ড্রেসিং
সুস্থ চুলের জন্য দৈনিক আহার

চুল পড়তে থাকা যখন একটা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ায়, ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না। সুস্থ চুলের দৈনিক যত্ন নেওয়া দরকার। একজন আপনি যে হেয়ার ড্রেসিং প্রত্যেক দিন (এবং দিনের পর দিন) ব্যবহার করেন সেটিকে দুরকমভাবে কাজ করতে হবে: এটি যেমন আপনার চুল ঘটার পর ঘণ্টা সুবিন্যস্ত রাখবে তেমনি চুলের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও উন্নতি সাধন করবে। একমাত্র সিলভিক্রিন হেয়ার-ড্রেসিং-এ রয়েছে তেলের গুণ ও পিওর সিলভিক্রিনের সমন্বয়—যা আপনার চুল চমৎকারভাবে সুবিন্যস্ত রাখে এবং চুলে স্বাভাবিক পুষ্টি যোগায়। অন্য কোনো হেয়ার ড্রেসিং আপনার চুলের এত যত্ন নেয়না।

চিঠিপত্র

কারো পৌষ মাস

অশোক রুদ্রের লেখা 'কারো পৌষ মাস' পড়লাম। পাণ্ডিত্যের ধোঁয়ায় লোককে কি রকম বিভ্রান্ত করা যায়, এই লেখাটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রথমেই বলে রাখি, আমি সরকারের বা আর কারোর হয়ে ওকালতি করছি না, বরং আমাদের সরকার যে অনেক কিছুই করতে পারেন নি, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। তা বলে নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সংখ্যাতত্ত্বকে মোচড় দিয়ে কাজে লাগিয়ে লোককে ধাঁধা দেওয়াও ঠিক নয়। শ্রী রুদ্র কি ভাবে এই কাজটি করেছেন তাঁর লেখা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিলেই স্পষ্ট হবে।

১। তিনি বলেছেন, সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিস, যেমন তাঁত কাপড়ের উৎপাদন বাড়ে নি। ১৯৫০—৫১ সালে প্রধান প্রধান শস্যের উৎপাদন ছিল ৫ কোটি ২৮ লক্ষ টনের মতন আর এখন হয়েছে ১১ কোটির উপর। দু গুণের ও বেশী বাড়াকে কি বাড়া বলে না? ১৯৫০—৫১ সালে কাপড়ের উৎপাদন ছিল ৪২১ কোটি মিটারের কিছু বেশী আর (আমার হাতের কাছে সাম্প্রতিক উৎপাদনের সংখ্যা সম্বন্ধে কোন প্রামাণ্য তথ্য নেই) ১৯৭০-৭১ সালে এটা বেড়ে হয়েছিল ৮৩১ কোটি মিটারের কিছু বেশী। শ্রী রুদ্র এটাকে বৃদ্ধি বলে স্বীকার করবেন না? আসলে ওঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য উনি মাথা পিছু উৎপাদনের হিসাব দিয়েছেন। ১৯৫১ সালে লোকসংখ্যা ছিল ৩৬ কোটির কিছু বেশী, আর এখন হয়েছে ৬০ কোটির কাছাকাছি। সুতরাং উৎপাদন বাড়লেও মাথাপিছু উৎপাদন যে বাড়তে না পারে, এটা তো অতি সোজা কথা। তিনি যদি বলতেন, যে উৎপাদন বাড়লেও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে বাড়েনি, তা হলেই সত্যের মর্যাদা দেওয়া হত। কিন্তু তাঁত কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধির (absolute increase) কথা তিনি উল্লেখই করতে চান না কারণ তাতে তাঁর সরকারকে নিন্দা করার ভাষা ফিকে হয়ে যাবে না?

২। তাঁত-কাপড়ের পর তিনি চলে গেছেন সিন্থেটিক ফাইবারে। এখানে আর মাথা পিছু হিসাব দেন নি, কারণ তাহলে তার যুক্তিটা জোরাল হবে না। তিনি বলেছেন যে ১৯৫৫—৫৬ সাল থেকে ১৯৭০—৭১ এই পনেরো বছরে উৎপাদন সাত গুণ বেড়েছে। কিন্তু যদি ১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৭০-৭১ সালের হিসাব নেওয়া যায়, তবে দেখা যাবে কৃত্রিম তন্তুর উৎপাদন বেড়েছে তিন শতাংশের সামান্য বেশী। অর্থাৎ গোড়ার দিকে বৃদ্ধির হার বেশী হলেও, সেই বৃদ্ধির হার পরে অনেক কমে গিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, সিন্থেটিক ফাইবারের তৈরী পোষাক দরিদ্র বা নিম্নবিত্ত লোকেরাও বেশ বেছে পছন্দ করেন, এটা উপলব্ধি হবে উৎসবের সময় কৃত্রিম তন্তুজাত পোষাকের (বিশেষত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের) চাহিদা থেকে।

৩। তারপর তিনি রেফ্রিজারেটর মোটর সাইকেল, স্কুটার, গুঁড়ো সাবান নিয়ে পড়েছেন। এখানে তিনি মাথা পিছু উৎপাদনের দিকে যাননি, তুলনা করে, কত গুণ চার গুণ [illegible] ইত্যাদির কথা বলেছেন। একটা দেশের অগ্রগতি সূচিত হয়, সে আধুনিক সভ্যতার উপযোগী [illegible] উৎপাদন কত গুণ বাড়াতে পেরেছে তাই দিয়ে। শুধু তাই নয় এই সব জিনিস কেনবার লোকও [illegible] সংখ্যা সংখ্যা স্বীকার [illegible] আর এইসব লোকেরা [illegible] মধ্যবিত্ত [illegible] সম্প্রদায় [illegible] রুদ্র [illegible] করেছেন। এখানে একটা কথা [illegible] তিনি গুঁড়ো সাবান [illegible] Detergent-এর কথা কেন উল্লেখ করেছেন? এটা কি [illegible]? তিনি কি জানেন যে Detergent-এর একটা বড় অংশ ক্ষুদ্রায়তন [illegible] প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন হয় আর সাধারণ সাবানের তুলনায় Detergent-এর জন্যে গৃহস্থকে খুব বেশী একটা খরচ করতে হয় না?

৪। রেশনের কথা তিনি যা বলেছেন, তাতে বিশেষ আপত্তি [illegible] কথা নয়, কারণ রেশন ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত না করলে, এই ব্যবস্থার সুফল শহরাঞ্চলের লোকেরাই পাবেন। [illegible] রেশন ব্যবস্থা ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ শহরাঞ্চলেই নেই। আর রেশন ব্যবস্থা তুলে দিলে, গ্রামবাসীরা কি উপকৃত হবে? বরং শহরাঞ্চলের লোকেদের ক্রয়ক্ষমতা বেশী থাকার দরুন গ্রাম থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোজ্যদ্রব্য শহরের দিকে চলে যাবে এবং মুনাফাখোররা এই সুযোগে বল্গাহীন ভাবে দাম বাড়িয়ে চলবেন। এই জন্যেই পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বামপন্থী সরকার বর্তমান রেশন ব্যবস্থাকে [illegible] সমর্থন করে এর সম্প্রসারণ চাইছেন।

৫। তিনি ধনীদের [illegible] বিলাস দ্রব্য তৈরী করতে [illegible] বিদেশী মুদ্রায় কাঁচামাল ব্যবহারের [illegible] লিখেছেন। স্কুটার বা মোটর [illegible] তৈরী করতে কতখানি বিদেশী [illegible] লাগে তা কি তিনি জানেন? আমি যত দূর জানি সমগ্র উৎপাদনের তুলনায় বিদেশী কাঁচা মালের অংশ খুবই কম। প্রসঙ্গক্রমে বলি যে সম্প্রতি খবরে দেখা যাচ্ছে :

Statesman 25.9.77 — Brigedier B. J. Shahany, Chairman, Board of Import Substitution Director General of technical Department-এর অধীনে যে সব বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে তাতে মাত্র শতকরা ৮ ভাগ বিদেশী মুদ্রায় আনীত কাঁচামাল লাগে। তা ছাড়া, এমন অনেক জিনিস আছে যেখানে বিদেশী মুদ্রা বেশ প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করা হয়, সাধারণ লোকের কল্যাণে, যেমন সার আমদানিতে বা সারের কারখানায় প্রয়োজনীয় মালপত্র আমদানিতে, আর কে না জানে এই সার ব্যবহার হয় খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়াবার জন্যে।

৬। পরিকল্পনা সম্বন্ধে শ্রী রুদ্র যা বলেছেন, সেটা কেমন করে যে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়কে সমর্থন

করে, তা আমার বোধ গম্য হল না। তারপর তিনি বলেছেন যে "পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে দেখান যায় যে ফার্স্ট ক্লাস ও সেকেন্ড ক্লাসের কামরায় যাত্রীদের জন্য ব্যবস্থায় যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, এই দুই ক্লাসের ভাড়ার ব্যবধানে প্রতিফলিত হয় না।" সত্যই কি তাই? আমার হাতের কাছে যে টাইম টেবল আছে, তাতে দেখতে পাচ্ছি ১০০০ কিঃ মিঃ দূরত্বের জন্য ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া ১৩৩.৫০ পয়সা, আর ওই দূরত্বের জন্য সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া ২৯ টাকা, মেল হলে ৪০.৪৫ অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে মোটামুটিভাবে ভাড়ার পার্থক্য চার গুণ বা পাঁচ গুণ। আর তার তুলনায় প্রথম শ্রেণীতে গদি আঁটা বসার বা শোয়ার জায়গা ও সামান্য বাথরুম ছাড়া, আর কি এমন ব্যবস্থা থাকে যার "আকাশ পাতাল" প্রভেদ ৫ গুণেরও বেশী ভাড়ার ব্যবধানে প্রতিফলিত হয় না?

৭। তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার খাতে মাথাপিছু ব্যয়ের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা দানের ব্যয়ের মাথা পিছু তুলনা করেছেন। এটা স্রেফ পাঠকদের বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছু না কারণ কে না জানে যে সবদেশেই উচ্চ শিক্ষার ব্যয় তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশী এখানে মাথাপিছু ব্যয়ের তুলনার কোন অর্থই হয় না। আর গবেষণার বিরুদ্ধে তিনি যে জেহাদ ঘোষণা করেছেন, তা পড়লে আশ্চর্য হতে হয়। তিনি পঞ্চম পরিকল্পনায় ১৬০০ কোটি টাকা গবেষণার খাতে রাখা স্পষ্টতই অপব্যয় মনে করেছেন। জিজ্ঞাসা করি, পঞ্চম পরিকল্পনার মোট বিনিয়োগ কত? পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকারও বেশী, তাহলে শতকরা কত দাঁড়ায়? তিনি জগদীশ বসু, সত্যেন বসু, রামানুজ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের কথা বলেছেন—তাঁরা তো তাঁদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার শীর্ষ ভাগে ছিলেন স্বাধীনতার আগে, যখন দেশের বৈষয়িক অবস্থা আরও অনুন্নত ছিল। তখন তো কেউ বলেনি যে আগে বিদেশী শাসনের অবসান হোক, মানুষের ভাত-কাপড়ের সমস্যা মিটুক, তার পরে বৈজ্ঞানিক গবেষণা? চীনের উদাহরণ হামেশাই দেওয়া হয়ে থাকে। ওদেশে কি জনগণের মূল প্রয়োজন মেটানোর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক গবেষণা যথাসাধ্য গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি? আর যে ভাবে রুদ্র মহাশয় আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষকদের প্রতি কটাক্ষ করেছেন, বিনা তথ্যে তিনি এই শিক্ষিত ভদ্রলোকদের প্রতি কেন অপমানজনক ইঙ্গিত দিতে গেলেন? আর কিছু উল্লেখ না করে, আমি শুধু দেশ পত্রিকায় মাঝে মাঝে শ্রীসমরজিৎ করের এদেশে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্বন্ধে যে নিবন্ধ বার হয়, তা পাঠ করতে অনুরোধ করব।

৭। আর বেশী কিছু না বলে আমি শ্রী রুদ্রের প্রবন্ধের শেষ ভাগে চলে যাব যেখানে তিনি সরকারী চাকুরেদের এক হাত নিয়েছেন। যে সরকার সব সম্পত্তির মূল তার চাকুরেরা যে তাঁর বিষ নজরে পড়বেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তবে আশ্চর্য এই যে, পাশাপাশি তিনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের যে সুখ-সুবিধা দেওয়া হয় তার সমর্থনে বলেছেন যে, সেটা সেইসব প্রতিষ্ঠানের দেবার অধিকার আছে। সরকারের সেই অনুরূপ অধিকার নেই, কারণ সরকারের আয় কই? জিজ্ঞাসা করি, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান যে তাঁদের কর্মচারীদের সুখ-সুবিধা দেন, তা কি তাঁরা জনসাধারণের পয়সাতেই দেন না? যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস তাঁরা যে ভোগ্য পণ্য উৎপাদন করেন বা যা service দেন, তার জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে যা আদায় করেন তাই। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক কখনই মুনাফা কমিয়ে তাঁদের কর্মচারীদের সুখ-সুবিধা দেন না। যদি কাপড়ের কলে শ্রমিকদের বোনাস দেওয়া হয় বা মজুরি বৃদ্ধি করা হয়, তবে উৎপাদনের যে ব্যয় বৃদ্ধি হবে সেটা উশুল করা হবে জনসাধারণের কাছ থেকে যাঁরা বর্ধিত মূল্যে কাপড় কিনতে বাধ্য হবেন। সরকারী কর্মচারীরা বেতন পান সরকারী তহবিল থেকে যেটা পূরণ হয় জনসাধারণের অর্থে, আর বেসরকারী কর্মচারীরা বেতন পান ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের আয় থেকে যে আয় আসে ওই জনসাধারণেরই প্রদত্ত অর্থে। আসল কথা এই সরকারী কর্মচারী মনে করেন তিনি একজন কর্মচারী এবং কর্মচারীর যে সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার তাকে যেন তা দেওয়া হয়। এখানে জনগণের সেবার কথা তোলা অবান্তর। একজন ইঞ্জিনিয়ার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যে বেতন বা সুখ-সুবিধা পান, সেই রকম বেতন এবং সুখ সুবিধা সরকারী বিভাগে কর্মরত সমগুণ সম্পন্ন একজন ইঞ্জিনিয়ার আশা করবেন, তাতে আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে? আসলে এটা কর্মচারী-মালিক সমস্যা, সে মালিক সরকারই হোক বা অন্য যে কেউ হোক। এই দৃষ্টি ভঙ্গিতেই এই সমস্যাকে দেখা হয় সব রাজনৈতিক দলের পক্ষেই।

প্রবন্ধের উপসংহারে ব্যক্তিগত মালিকানা (এবং সেই সঙ্গে অন্যের সর্বনাশ) যাতে না হয় তার জন্য এক সর্বরোগহর দাওয়াই বাতলেছেন লেখক। এর জন্য অবশ্যই চাই ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তার উৎপাটন। এই যদি মূল কথা তবে এত কথা লেখার কি দরকার ছিল? সাম্যবাদে বিশ্বাসী আমাদের রাজনৈতিক বন্ধুরা তো অনেক আগেই বলে আসছেন, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় জনগণের সত্যকারের উন্নতি করা সম্ভব নয়। যেখানে রুদ্র মশাই গোটা ইমারতটাই ফেলে দিতে চাচ্ছেন, সেখানে সেই ইমারতের কোন জানলাটা ভাঙা, কোন দিকটা চকচকে আর কোন দিকটা জীর্ণ মলিন, এত কথা বলার দরকার কি? কাজেই তাঁর লেখাটি মূলতঃ এক রাজনৈতিক দলিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। খালি আমাদের মত সাধারণ লোক, যারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নই, তাদের মনে কিছু সন্দেহ থেকে যায়। তা হল এই, যদি ব্যক্তিগত মালিকানা সব অনর্থের মূল তবে আমেরিকা, কানাডা, পশ্চিম জার্মানী, সুইডেন, জাপান ইত্যাদি উন্নত দেশগুলি এই ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতেই এত উন্নতি করল কি ভাবে? এবং এ কথাও জানা যে, যদি ভোগ্য পণ্যের প্রাচুর্য এবং আধুনিক

সুখ-সুবিধার কথা ভাবা যায়, তবে এই সব দেশের জীবন-যাত্রার মান আজও রাশিয়া সমেত সব সমাজতান্ত্রিক দেশের চেয়ে বেশী, এখানে সামাজিক ন্যায় বিচারের কথা তুলছি না, অর্থনৈতিক অবস্থার কথাটাই বলছি, কারণ শ্রী দত্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথাই বলেছেন। বলা হতে পারে আমাদের দেশে ধন-তান্ত্রিক ব্যবস্থা উপযোগী নয়, কারণ দেশ জনবহুল এবং কৃষি প্রধান। কিন্তু যে সব দেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা তো এক লাফে বর্তমান উন্নত অবস্থায় পৌঁছায়নি। যেমন ধরুন জাপানের কথা। আর কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানার বিরোধ কোথায়? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি উৎপাদন অন্য যে কোন দেশের চেয়ে বেশী এমন কি রাশিয়া এবং চীনকেও সে দেশ থেকে মাঝে মধ্যে কৃষি দ্রব্য আমদানি করতে হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তো শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে ব্যক্তিগত মালিকানা কোন বাধার সৃষ্টি করেনি। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই সব প্রশ্নের যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পাণ্ডিত্যের মোড়কে মোড়া কোন থিওরীই তাদের মনে দাগ কাটবে না যারা যুক্তির কষ্টিপাথরে জিনিসের সত্যাসত্য বিচার করতে চান।

সলিলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
মাহেশ, হুগলী

কণ্টকিলিপত

'দেশ' পত্রিকায় ১০ই সেপ্টেম্বর ৬৬ সংখ্যায় শ্রীঅতুলা ঘোষ মহাশয়ের কণ্টকিলিপত উক্তি—বিক্রমাদিত্যের সেনাপতি মানসিংহ যখন লড়াই করতে এলেন তখন প্রতাপাদিত্যের পরাজয় এবং বন্দীত্ব কথাটি ইতিহাস সম্মত নয়।

বহারিস্তান-ই-ঘায়েবি নামক ফার্সীতে লেখা পুঁথি থেকে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার প্রমাণ করেছেন—মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করেন নি। মানসিংহ বাংলাদেশের সুবাদারী ছেড়ে চলে যাবার ৫।৬ বছর পরে ১৬১০ খৃঃ নাগাদ জাহাঙ্গীরের নিযুক্ত ... বঙ্গদেশে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ও বন্দীত্ব ঘটে বাংলার তৎকালীন সুবাদার ইসলাম খাঁর হাতে। বাহাদুর ... ও ধ্বংসকারী মির্জা নাথন নামে জনৈক মুঘল সৈনিক এই বহারিস্তানের লেখক। ঐতিহাসিক যদুনাথ ১৩২৭ সালের কার্তিক মাসের 'প্রবাসী'তে বহারিস্তান অবলম্বনে প্রতাপাদিত্যের পতন নামে এক প্রবন্ধ লেখেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে লিখিত রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত' বহারিস্তানকে সমর্থন করে।

অতুলাবাবুর উক্তি—রবীন্দ্রনাথ, 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' প্রতাপাদিত্য চরিত্র একটু চিত্র দিয়েছেন।' কিন্তু ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্রর উক্তি—প্রতাপ-কন্যা প্রত্যাখ্যাতা হইয়া কাশী চলিয়া যান নাই, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস উপন্যাসই, উহাতে ঐতিহাসিক বিশেষ কিছু নাই।' যশোহর-খুলনার ইতিহাস (২য় খণ্ড, ৩০০ পৃঃ) কারণ মাত্র ২০ বছর বয়সের তরুণ রবীন্দ্রনাথ, প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' নামে উপন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'বউঠাকুরাণীর হাট' লেখেন।

অতুলাবাবুর আর একটি উক্তি—'আঠারো বছর বয়সে নবাব হবার পর তিনি (সিরাজদ্দৌল্লা) সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যান।' এটিও ভুল তথ্য। সিরাজদ্দৌল্লা নবাব হন ২৩ বছর ১০ মাস বয়সে। প্রতাপ আর সিরাজ এক শ্রেণীতে পড়ে না। প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনীষী ও স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের উক্তি—

'প্রতাপাদিত্য বাংলার স্বাধীনতা প্রচেষ্টার সৈনিক ছিলেন না বলা একেবারেই চলে না। শুধু ইচ্ছা করলেই তো তিনি মুঘলের 'খয়ের খাঁ' হতে পারতেন।'

প্রসিত রায়চৌধুরী
নরেন্দ্রপুর

সিরাজউদ্দৌল্লা

'দেশ' পত্রিকার ১০ই সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় শ্রীঅতুল্য ঘোষের 'কণ্টকিলিপত' রচনাটিতে একটি তথ্যভ্রান্তি চোখে পড়ল। লেখক বলেছেন, 'আঠারো বছর বয়সে নবাব হবার পর তিনি (সিরাজউদ্দৌল্লা) সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যান'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে বিহারের ডেপুটি গভর্নরের পদে আলিবর্দী খাঁ এর নিযুক্তির কয়েক দিন আগে সিরাজউদ্দৌল্লা জন্ম গ্রহণ করেন। সিরাজউদ্দৌল্লার জন্মগ্রহণ এবং আলিবর্দীর এই উচ্চপদ লাভ একই সময় সংঘটিত হওয়ায় সিরাজ আলিবর্দীর বিশেষ স্নেহ অনুগ্রহের পাত্র হয়ে দাঁড়ান। আর এরপর ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ১০ই এপ্রিল সিরাজউদ্দৌল্লা শাসনভার গ্রহণ করলে তখন তাঁর বয়স ছিল তেইশ বছর, আঠারো বছর নয়। অবশ্য ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের মে মাসের প্রথম দিকে যখন সিরাজের বয়স ছিল আঠারো বছর তখন আলিবর্দী সিরাজকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে ঘোষণা করেন। ... সেটাকে নিশ্চয়ই নবাব হওয়া বলে না।

এছাড়া 'নবাব হবার পর সিরাজউদ্দৌল্লা সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যান'—এ-কথার পেছনেও কোন ঐতিহাসিক সত্য নেই। নবাব হবার আগে তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতার সীমা ছিল না—এ-কথা ঠিক। কিন্তু মসনদে বসার পর তাঁর চরিত্রের অনেক পরিবর্তন হয়। Luke Scrafton যিনি সেই সময় কাশিমবাজারে ইংরেজ কুঠির প্রধান William Watts-এর সহকারী ছিলেন, তাঁর 'Reflections on the Government of Indostan'-এ লিখেছেন, "I have before mentioned Surajah Dowla (Siraj-ud-daulah), as given to hard drinking; but Allyverde (Alivardi) in his last illness, foreseeing the ill consequences of the his excesses obliged him to swear on the Koran, never more to touch any intoxicating liquor which he ever after strictly observed."

এর পর আর নিশ্চয়ই একথা বলা যায় না যে, নবাব হবার পর

সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কে উদ্ভ্রান্ত হয়ে যান।

সুশান্তন চক্রবর্তী
নিউ ব্যারাকপুর।

আনন্দ কে কুমারস্বামী

'দেশ' ২৫ ভাদ্র ১৩৮৪ সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'আনন্দ কে কুমারস্বামী' পড়ে খুব ভাল লাগল। এতে প্রসঙ্গক্রমে কুমারস্বামী পরিবারের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করা হয়েছে। সে-সম্পর্কে আমার সামান্য বক্তব্য সংক্ষেপে নিবেদন করি।

ধর্মবিশ্বাস প্রসঙ্গটি আমি নিজে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না। কুমারস্বামী যদি 'খৃস্টান তামিল পরিবার'এ জন্মগ্রহণ করেও থাকেন তাহলেও তাঁর ভারত সাধনার সঙ্গে পারিবারিক পরিবেশের কোনো অসঙ্গতি অন্তত আমার চোখে পড়ে না। মাইকেল মধুসূদন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা ওড়িশার মধুসূদন দাস খৃস্টধর্মাবলম্বীই ছিলেন। এঁদের সাহিত্য সাধনা বা দেশ সেবামূলক কর্মকাণ্ড এই কারণে কোথাও ব্যাহত হয়েছে বা সংকীর্ণতাগ্রস্ত হয়েছে এমন কথা জানা নেই। কিন্তু আনন্দ কে কুমারস্বামীর ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে একটি তথ্য তাঁর সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে কোথাও উল্লেখযোগ্য ভাবে আলোচিত হয়নি।

তথ্যটি আমার যতদূর জানা আছে—সর্বপ্রথম পরিবেশন করেন সুবিখ্যাত শিল্পতত্ত্বজ্ঞ স্বর্গত অর্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়। কুমারস্বামীর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ছে বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলী পত্রিকার এক সংখ্যায় কোন সংখ্যা মনে নেই এখন হাতের কাছেও নেই—তবে খুঁজে বার করা কঠিন হবে না আশা করি। 'কুমারস্বামী' সম্পর্কে এক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন বাঙলায় অবস্থানকালে কুমারস্বামী এক বৈষ্ণব গোস্বামীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই দীক্ষার পর থেকে তিনি তাঁর নামের মধ্যপদ 'কেন্টিশ' আর ব্যবহার করেন নি, নিজেকে সাধারণত আনন্দ কুমারস্বামী বলেই উল্লেখ করতেন। জানি না স্বর্গত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের এই উক্তির সূত্র কি। তবে এটি প্রকাশিত হবার পর এর কোনো প্রতিবাদ আমার চোখে পড়েনি। যিনি ভারতীয় শিল্পকলা, রসতত্ত্ব ও সৌন্দর্যতত্ত্বের গভীর সার্থক অনুশীলনে জীবন অতিবাহিত করেছেন তাঁর মনে বৈষ্ণব রস-সাধনার প্রতি আকর্ষণ জন্মানো বিচিত্র নয়। আমি স্মৃতির উপর নির্ভর করে উপরের কথাগুলি বললাম, খুঁটিনাটিতে ভুল অবশ্যই থাকতে পারে। কুমারস্বামী শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই মনীষীর ব্যক্তিত্বের সমগ্র পরিচয়টুকু উদ্ঘাটিত করবার জন্য যদি কেউ বিষয়টি সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন তাহলে খুবই ভাল হয়।

দিলীপকুমার বিশ্বাস কলকাতা-৩৭

সিকিম

'সিকিম' প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত জগদীশ চৌধুরী তাঁর পত্রের একাংশে জানান—আমাদের জলঢাকা নদীও তার উৎস মুখে ভুটানে দি চু নামে পরিচিত। কিন্তু আমরা জানি জলঢাকা নদীর উৎস-মুখ ভুটানে নয় সিকিমে।

আরও উনি বলছেন চি চু এবং নি চু উপনদীর যুক্তধারা ঐ দি চু জলঢাকা ...। এ ক্ষেত্রে জানাই দি চু নদী ভুটানে প্রবেশ করে নি চু ও বিন্দু খোলা উপনদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে জলঢাকা নাম নিয়েই প্রবাহিত হয়ে শেষে বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্র নদীতে মিলিত হয়েছে।

অতএব এর মধ্যে চি চু উপধারা কোথা থেকে এলো শ্রীযুক্ত চৌধুরী তথ্য দিয়ে জানালে বাধিত হবো।

প্রসঙ্গত উনি আরও বলেছেন—জলঢাকা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আকস্মিক প্রাকৃতিক বিভ্রাটের জন্য আলো অন্ধকারের ভেল্কিবাজীতে মাঝে মাঝে ভূত দেখানোর মতোই অবস্থা করে তোলে।

বিনয়ের সঙ্গে বলছি দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ মাস ঐ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অতিবাহিত করেছি। সেই সময় "আকস্মিক প্রাকৃতিক বিভ্রাট" বলতে দেখেছি মৃদু ভূকম্পন, অতিবর্ষণ, নদীর তীব্র জলোচ্ছ্বাস, প্রচুর ফগ এবং পাহাড়ী ধস। এতে করে কোথাও ভূত দেখানোর মতো অবস্থা অনুভব না করতে পারার অক্ষমতা ক্ষমার্হ।

তবে বিদ্যুৎ বিভ্রাট জনিত সমগ্র অঞ্চল অন্ধকার হয়ে গেলে মেঘ মুক্ত অমাবস্যার রাত্রিতে জলঢাকার আকাশে তারাগুলো বড় বেশী জ্বল জ্বল করে আর পূর্ণিমায় জলঢাকা-সংলগ্ন ভুটান পাহাড়ে চন্দ্রোদয়ের দৃশ্য ও দি চু নদী দি চু'র পরিবেশের মতোই অপূর্ব!

দুলাল কর্মকার
আগরপাড়া

ট্রম্বের গবেষণা

গত ২৫ সেপ্টেম্বরের দেশ পত্রিকায় সমরজিৎ কর লিখিত আমাদের গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কিত বিবরণ আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম। উক্ত রচনার কোন কোন বিষয়ে অবশ্য কিঞ্চিৎ সংশোধন প্রয়োজন। উক্ত প্রবন্ধে লেখা হয়েছে, সংকর জাতীয় আখে চিনির পরিমাণ সাধারণ আখের চেয়ে শতকরা ৩০ ভাগ বেশি। প্রকাশিত ছবিটির তলায় লেখা হয়েছে ৩১ শতাংশ বেশি। এই দুটি তথ্যই ভুল। সাধারণ আখের তুলনায় রূপান্তরিত আখে চিনির পরিমাণ মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ বেশি। পরিবর্তিত চীনেবাদামের ফলন অবশ্যই বেশি হয়, কিন্তু স্বাভাবিকের দ্বিগুণ নয়, লেখক যেমন বলেছেন। তবে চীনেবাদাম বীজের আকৃতি সাধারণ চীনেবাদামের দ্বিগুণ, ছবিতে যেমন দেখা গেছে।

বর্তমানে আমরা কয়েকটি জৈব-নিয়ন্ত্রকের ওপরে কাজ করছি। একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ—মাছের সাহায্যে মশক নিবারণ প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু উক্ত বিবরণ থেকে এই ধারণাই জন্মায় যে কাজটি মৌলিক এবং এখানেই সূত্রপাত হয়েছে। এটাও ঠিক নয়।

এন এস রাও
জীববিদ্যা ও কৃষি বিভাগীয় প্রধান
ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র ট্রম্বে।

প্রকাশিত হল
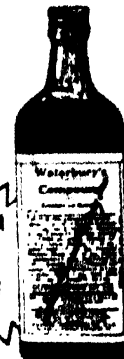
জয়প্রকাশ নারায়ণের

জরুরী অবস্থায় জেলে আটক থাকাকালীন রচনা 'প্রিজন ডায়েরি'র অনুবাদ

কারাবাসের কাহিনী

দাম ৫.০০

জয়প্রকাশ নারায়ণের জরুরী অবস্থায় জেলে আটক থাকার সময়ের একটা অংশের—১৯৭৫ সালের ২১ জুলাই থেকে ৫ নভেম্বর—মোট সাড়ে তিন মাসের দিনলিপি এই 'কারাবাসের কাহিনী'। এতে সমকালীন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষীর চিন্তাধারা, মেজাজ এবং নৈতিক চেতনাবোধ যেমন প্রতিফলিত, তেমনি সুস্পষ্ট-রূপে বিধৃত জন-আন্দোলন, সামগ্রিক বিপ্লব প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণাটিও। শুধু তাই নয়, সমসাময়িক বিশিষ্ট ঘটনাবলি—কি দেশের, কি বিদেশের—তাঁর মতো মানুষের সংবেদনশীল মনে কি ধরনের অনুরণন তোলে, তারও একটি স্বচ্ছ আলেখ্য এ বই। জয়প্রকাশ ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে এক প্রচণ্ড স্বাধীনতোত্তর বিস্ময় বলে প্রতিভাত। 'কারাবাসের কাহিনী' পাঠককে সেই দুর্বোধ্য বিস্ময়ের মানস-সান্নিধ্যে এনে দেবে—যা তাঁকে এবং তাঁর আন্দোলনকে বুঝতে অনেকখানি সহায়ক হবে॥

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৫৩

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

সাড়া-জাগানো প্রথম উপন্যাস

পিতৃপুরুষ

দাম ৫.০০

এ উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে একটি শিশু। চতুর্দিকে স্নেহ, মায়া, প্রেম, লালসা—তারই ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে একটু একটু করে সে বড় হয়ে উঠছে। আঁকড়ে ধরতে চাইছে স্থির, নিশ্চিত একটি অবলম্বন। যার অন্য নাম পিতৃ-ভাবমূর্তি। শৈশবেই সেই ভাবমূর্তি কোনও-না-কোনও ব্যক্তিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে, বিভিন্ন সময়ে হয়তো তা সঞ্চারিত হয় ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে, শেষ পর্যন্ত হয়তো বা ঈশ্বরে। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর প্রথম উপন্যাসেই এই চিরন্তন ব্যাপারটিকে একটি অনবদ্য সাহিত্যরূপ দিয়েছেন। সব কালের, সব সমাজের একটি শাশ্বত মানবিক বৃত্তি—যা প্রেমের মতো সর্বজনীন হয়েও সাহিত্যে প্রেমের মতো বহু-ব্যবহারে অবক্ষয়িত বিষয় নয়—নিয়ে লেখা এই উপন্যাস একই সঙ্গে রম্য, চিন্তাকর্ষক ও চিন্ময়॥

এই লেখকের আর একটি বই :

উলঙ্গ রাজা (কবিতা-সংকলন) ৫.০০

ষোড়শ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

সত্যজিৎ রায়ের

বারোটি বিচিত্র স্বাদের গল্পের সংকলন

এক ডজন গপ্পো

দাম ১০.০০

ফেলুদার দুটি বড় গোয়েন্দা-কাহিনী, তিনটি বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প, দুটি চারেক অলৌকিক কাহিনী, দুটি স্রেফ মজার গল্প, এবং একটি সিরিয়াস গল্প—মোট এই বারোটি গল্প এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। যদিও গল্পগুলি বিচিত্র স্বাদের, তবুও মূলত সর্বদা কি-হয় কি-হয় সংশয়, রক্ত-হিম-করা ত্রাস, এবং অনাবিল কৌতুকের হাসিই গল্পগুলির প্রধান সুর॥

ছোটদের বই

সত্যজিৎ রায়ের

প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা

দাম ৫.০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

যাঁর নাম ঘনাদা

দাম ৫.০০

লীলা মজুমদারের

বাতাসবাড়ি

দাম ৪.০০

অমরনাথ রায়ের

দেশবিদেশের বিজ্ঞানী

দাম ১০.০০

শৈলেন ঘোষের

হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো

দাম ৫.০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

মহত্তর বক্তব্য ও ভাবনায় সমৃদ্ধ নতুন উপন্যাস

কাগজের বউ

দাম ৮.০০

এই উপন্যাসের নায়ক উপল বেঁচে থাকবার জন্যে কি না করতে চেয়েছে! বাস কনডাকটরি থেকে ট্রেন ডাকাতি সব কিছুই, কিন্তু কোনটাই সেভাবে পারেনি। উপলের ছিল দুরারোগ্য এক খিদে—কুষ্ঠের মতো, ক্যানসারের মতো। সে চেয়েছিল খিদে মেটাবার জন্যে কিছু টাকা। জলপ্রপাতের মতো, হ্যান্ডবিলের মতো, কিংবা জ্যোৎস্নার মতো অনায়াস টাকা। যা-ই করতে গেছে উপল, তাইতেই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার বুড়ো বিবেক আর কানা মামী। শেষ পর্যন্ত টাকা এল এক বিচিত্র পথে। উপলের বন্ধু সুবিনয় যখন তার শ্যালী প্রীতির প্রেমে পড়ল তখন উপলকে লাগাল তার নিজের বউ ক্ষণার সঙ্গে অবৈধ প্রেম করার কাজে। কোনও কাজই শেষ পর্যন্ত পারে না উপল, তবে এ কাজটা পেরেছিল। কিন্তু রাখতে পারল কি?

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর এই উপন্যাসে বহু বিচিত্র, জটিল এবং সূক্ষ্ম ঘটনার মধ্য দিয়ে এই মেকী, অসার, ঠুনকো সভ্যতার অন্তর্লোকটি সম্পূর্ণ উন্মোচিত করেছেন॥

এই লেখকের অন্যান্য উপন্যাস :

ঘুণপোকা ৮.০০ যাও পাখি ২৫.০০ আশ্চর্য ভ্রমণ ৬.০০ দিন যায় ৮.০০ পারাপার ১২.০০ ঘুণপোকা ৬.০০

সপ্তম মুদ্রণ প্রকাশিত হল

সত্যজিৎ রায়ের

বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী-সংকলন

সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু

দাম ৬.০০

শুধু বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনীর দৌলতেই পাঠক-কুলের কাছে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত বাংলা সাহিত্যে এমন চরিত্র মাত্র একটিই—তিনি প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু। তাঁর পাঁচটি দারুণ অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী সংগ্রথিত হয়েছে এ বইয়ে—যেগুলির প্রত্যেকটিই সাস্পেন্সে বা রোমহর্ষকতায় সেরা বিদেশী সায়েন্স ফিকশনের চেয়ে কোনও অংশে কম তো নয়ই, বরং উৎকৃষ্টতর॥

ছোটদের বই

সত্যজিৎ রায়ের

আরো এক ডজন

দাম ১০.০০

শৈলেন ঘোষের

বাজনা

দাম ৫.০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

পাঁচ মুণ্ডীর আসর

দাম ৬.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

তিন নম্বর চোখ

দাম ৫.০০

পার্থসারথি চক্রবর্তীর

চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা

দাম ৪.০০

দেশ ৪৪ বর্ষ ৫০ সংখ্যা
১২ কার্তিক ১৩৮৪

সূচীপত্র

পরবর্তী আকর্ষণ

[illegible] দত্তের প্রবন্ধ
[illegible] ও প্রতিষ্ঠান
[illegible]কুমার ঘোষের গল্প
[illegible] স্টেশনে
[illegible] রায়ের রচনা
[illegible] ও ছো-নাচ
[illegible]রঞ্জন ঘোষের প্রবন্ধ
[illegible] থিয়েটার শিকড় ও ডানা
[illegible] চট্টোপাধ্যায়ের রসরচনা
[illegible] আছে সেই কলকাতাতেই

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
[illegible] পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে
[illegible] রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং
[illegible] অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮
[illegible] রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
মুদ্রিত।
[illegible] এক টাকা
[illegible] : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
[illegible] অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা

সম্পাদকীয়

এগিয়ে যাবার পথই পথ

যুধিষ্ঠিরের কাছে ধর্মের প্রশ্ন ছিল—পথ বলি কারে? যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন—মহাজনরা যে-পথে চলেছেন সেটাই পথ। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে প্রশ্ন ও উত্তর উভয়ই নৈতিক জীবনের বিষয়ীভূত একটি উপলব্ধির কথা। প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে যদি পথের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে উত্তরও ভিন্নতর হবে। গ্রামছাড়া রাঙামাটির পথ হোক, কিংবা টার-ম্যাকাডাম ও কংক্রীটের তৈরী পথ হোক, স্থানিক জীবনের সঙ্গে বৃহত্তর বহির্জীবনের সংযোগ রক্ষা করে যে পথ, সেটাই স্থানিক জীবনের পক্ষে সার্থক পথ। সভ্যতার ইতিবৃত্তে পথের কথা অনেক আছে। সে-সব ঐতিহাসিক পথের কিছু স্মৃতিচিহ্ন এখনও পৃথিবীর ধূলিলিপ্ত বক্ষের এখানে-ওখানে পড়ে থাকতে দেখা যায়। শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাষাণের কথা বস্তুত একটি পথের পরিচিত ও সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনার কথা। দেশের পথ যাকে সামান্য অর্থে সড়ক অথবা রাস্তা বলে অভিহিত করা হয়, তার কিন্তু বৃহত্তর একটি সার্থকতা আছে, যার মধ্যে দেশের জাতীয় স্বার্থ এবং সাংস্কৃতিক স্বার্থেরও পরিণাম নিহিত আছে।

দেশের সরকার হরিজন এবং আদিবাসী জনসমাজের জীবনে নতুন স্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থ-নৈতিক প্রসন্নতা সঞ্চারিত করবার ইচ্ছায় নানা উন্নয়নী পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন। তাই পথের কথা প্রসঙ্গত এসে পড়ছে। আজ অতীতের একটি তথ্য স্বাধীনভারতের নাগরিকের কানে ও মনে একটি কঠোর বিস্ময়ের মতো বেজে উঠবে। ভারতের ব্রিটিশ শাসক ভারতীয় জাতির সংহতি অসম্ভব করে তোলবার উদ্দেশে যে-সব রীতি-নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যে একটি হলো এই যে, সাধারণ গ্রামাঞ্চল ও আদিবাসীর বসতির অঞ্চলে পথ তথা সড়কের নির্মাণ কিংবা প্রসার ন্যূনতম প্রকারে কুণ্ঠিত করে রাখতে হবে। আদিবাসীর বসতি অঞ্চলকে 'বহির্ভূত এলাকা' (এক্সক্লুডেড এরিয়া) নামে চিহ্নিত করে যে-অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেটা সেই সব অঞ্চলকে নিদারুণ এক ভৌগোলিক দুর্ভাগ্যে অভিভূত করে রাখা। অঞ্চলগুলিকে পথশূন্য করে, বাইরের কোন সড়কের সংযোগ হতে বিচ্ছিন্ন একটা অবস্থায় নিয়ে পড়ে থাকবার পরিণাম ব্রিটিশরাজের পক্ষে রাজনীতিক প্রয়োজনের একটি কর্তব্য হয়ে উঠেছিল। আজকের স্বাধীন ভারতের মানচিত্রে কোন 'বহির্ভূত এলাকা' নেই। আদিবাসী অঞ্চলে, এবং হরিজন সমাজের বসতিযুক্ত গ্রামাঞ্চলে নূতন পথের নির্মাণ সাধিত হয়েছে। কিন্তু উপলব্ধি করতে হয়, যেটুকু নির্মাণ হয়েছে, সেটুকুই প্রয়োজনের সবটুকু নয়। জাতীয় সংহতির প্রক্রিয়া স্বচ্ছন্দ ও ত্বরান্বিত করতে হলে, হরিজন সমাজ এবং আদিবাসীকে সাধারণ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান আসরে আহ্বান করতে হবে। সড়কের প্রসার চাই, নতুন নির্মাণ চাই।

নতুন সড়কের নির্মাণ ও সড়কের বিস্তার বৃদ্ধি করবার সরকারী উদ্যোগের মধ্যে অবশ্যই একটি নীতি নিহিত আছে। অঞ্চলের অর্থনীতিক স্বার্থরক্ষার নীতি। হরিজন আদিবাসী এবং উপজাতীয় অঞ্চলের প্রতি ঐতিহাসিক দায়িত্ব হিসাবে শুধু অঞ্চলের অর্থনীতিক জীবনকে নয়, সামাজিক জীবনকেও বৃহত্তর ভারতীয় জীবনের সঙ্গে আন্তরিকভাবে সমন্বিত করবার প্রক্রিয়া স্বচ্ছন্দ করবার নীতি।

ভারতের শিক্ষিতজনের অনেকে ভেরিয়ের এলুইন নামে একজন নৃতাত্ত্বিকের নাম শুনেছেন। তিনি ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের উপজাতীয় জনসমাজের স্বার্থ সম্পর্কে ভারত সরকারকে পরামর্শ দেবার জন্য একজন পদাধিকারী অফিসার হিসাবে বহু বৎসর কাজ করে গিয়েছেন। আজ তিনি নেই, তাঁর কৃতিত্ব ও গুণের অনেক কথা স্মরণ করেও একটি পরিতাপের কথা স্মরণ করতে হয়। তিনি ভারত সরকারকে যে-সব পরামর্শ দিতেন, তাতে উপজাতীয় জনজীবনের হিতে-বিপরীত হবার সম্ভাবনাই বেশি থাকতো। ভাগ্য ভাল যে তাঁর প্রিয় নৃতাত্ত্বিক ধারণার প্রকোপ থেকে শেষ পর্যন্ত ভারতের সরকারী নীতি অনেকটা মুক্ত হতে পেরেছিল। ভেরিয়ের এলুইনের সিদ্ধান্ত ছিল : উপজাতীয় অঞ্চলে সড়ক নির্মাণ করলে উপজাতীয়ের মনোবল প্রাণবল ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য একেবারে বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাঁর যুক্তির কথা এই ছিল যে, সড়ক নির্মিত হলে বিশুদ্ধ উপজাতীয় জীবনের ভিতরে বাইরের (অর্থাৎ সমতল ভারতের) জনজীবনের যত অস্বাস্থ্য ও বিকার সংক্রামিত হবার অবাধ সুযোগ পেয়ে যাবে। নেফার উপজাতীয় মেয়ের পক্ষে ভারতীয় নারীর অত্যন্ত পরিধানের শাড়িও স্বাস্থ্যের ও মনের হানিকারক বলে তিনি 'সুপারিশ' করেছিলেন। যা-ই হোক, শুধু পথেরই প্রসঙ্গে বিচার-বিবেচনা করলে আবার এই প্রয়োজনের সত্যটিকেই উপলব্ধি করতে হয়, হরিজন অঞ্চলে ও আদিবাসী এবং উপজাতীয় অঞ্চলে যেমন পথের নতুন নির্মাণ আরও অনেক চাই, তেমনই সমতলক্ষেত্রের বৃহৎ-বৃহৎ সড়কের সঙ্গে সংযোগও চাই। স্মরণ করতে হয়, প্রাচীন ভারতের দু-তিন হাজার বছরের জীবনে আদিবাসী উপজাতীয় এবং হরিজন সমাজের অঞ্চলকে যেন জাতীয়তার প্রধান বৃত্ত থেকে দূরেই ব্যবহিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে থাকতে হয়েছে। শিক্ষা ও অর্থনীতিক অন্যান্য স্বাচ্ছন্দ্য বিহিত করবার সরকারী নীতির মধ্যে এই উপলব্ধির সঞ্চার চাই যে, হরিজন ও আদিবাসী অঞ্চলে পথের স্বাচ্ছন্দ্য বিস্তারিত করতে হবে, পরিণামে সেটা হবে জাতীয় সংহতিরই স্বচ্ছন্দ প্রতিষ্ঠা। যুধিষ্ঠিরের বক্তব্যের একটু হেরফের করে বলা চলে—এগিয়ে যাবার পথই হলো পথ।

আগামী গ্রীষ্মে কী যে হবে
জানি না!
কলকাতা বন্দর

সত্যেন বসুর ব্যক্তিত্ব ও মননের ধারা

পূর্ণিমা সিংহ

সত্যেন বোস সম্বন্ধে আমাদের দেশে নানারকম পরস্পরবিরোধী অভিমতের অন্ত নেই।

"এই তবে ১৯২৪ সালে আইনস্টাইনের সঙ্গে কি একটা করেছিলেন তারপর তো শুধু আড্ডা দিয়েই কাটালেন। হোয়াট হ্যাজ হি প্রডিউসড ?"

"আহা, অমন জ্ঞানী পণ্ডিত হয় না। বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, সঙ্গীত সব বিষয়ে অগাধ জ্ঞান।"

"অত্যন্ত দয়ালু, পরম ধার্মিক, ভগবৎ বিশ্বাসী।"

"উঁহু, নাস্তিক।"

"অতি অলস।"

"নিরলস কর্মী।"

বাসে ট্রামে, চায়ের দোকানে, ঘরোয়া চায়ের আসরে, স্কুল কলেজের আড্ডায়, নানা পত্রপত্রিকায় এমন কি দৈনিক পত্রিকাতেও মন্তব্যের ছড়াছড়ি।

এমন পরস্পরবিরোধী মতামতের কেন্দ্র হয়ে উঠলেন কেন এই মানুষটি? এর একটাই উত্তর সম্ভব। তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষের চালচলনের একটি ব্যতিক্রম। একটা সর্বজনগ্রাহ্য নিয়মের মাপে তাঁকে মাপা সম্ভব ছিল না। অথচ সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তথ্যের ভিত্তিহীন গদগদ মন্তব্য বা উদাসীন তাচ্ছিল্য কিছুই তাঁর মত বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের প্রতি প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। সত্যেন বসু কি করতে পেরেছেন তার চেয়ে বড় প্রশ্ন হল তাঁর যা দেবার সম্ভাবনা ছিল তার কতটুকু আমাদের গ্রহণ করার প্রস্তুতি ছিল? তাঁকে কতটুকু বোঝা গেছে? কোন্ ধারার মানুষ ছিলেন তিনি? কোন ধরনের ব্যতিক্রম ছিলেন?

সব প্রতিভাবান মানুষই তো সাধারণের মাপে বেখাপ্পা। কিন্তু মহাপুরুষদের মাঝেও দুটি ধারা আছে। এক শ্রেণী গুছিয়ে খুঁটিনাটির নজির রাখেন এবং নিজের সম্বন্ধে সকলকে জানাতে আগ্রহী। সত্যেন বসু ছিলেন অপর শ্রেণীর—তিনি নিজের সম্বন্ধে জানাতে উৎসুক ছিলেন না। এমন হওয়া ভাল কি মন্দ সে বিচার নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এটা বোঝা দরকার যে এমন মানুষ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা সহজ নয় এবং সেই তথ্য থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ ছবি পাওয়া আরও কঠিন।

আমাদের দৃষ্টির অনধিগম্য রহস্যাবৃত মৌলকণা জগতের চরিত্রের খবর পাবার জন্য যেমন বিভিন্ন স্তরের যন্ত্রপাতি ও তত্ত্বের সাহায্যে আংশিকভাবে আলোকপাত করে একটা সম্পূর্ণ ছবি পাবার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা—তেমনি সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব থেকে বিকীর্ণ রশ্মি নানা মানুষের মন থেকে কিভাবে বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করে আর তাঁর নিজের বলা টুকরো টুকরো কথা জড়ো করে ক্রমশ তাঁর বিজ্ঞানী চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের একটা সমগ্র রূপ পাবার পথে অগ্রসর হওয়া হয়তো সম্ভব।

প্রথমত জনসাধারণের জানা প্রয়োজন যে, ১৯২৪ সালের বিখ্যাত কাজটি তিনি আইনস্টাইনের সঙ্গে করেন নি—ঢাকায় বসে একাই করেছিলেন। আইনস্টাইন বসুর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের ভিত্তি অবলম্বন করে আর একটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন।

আধুনিক আণবিক পদার্থবিদ্যার পথিকৃৎ নীলস বর বলেছেন, যদিও তিনি আইনস্টাইনকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বলে মনে করেন এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনা সব সময় ফলপ্রসূ কিন্তু ১৯২৫-এ বোস সংখ্যায়ন প্রয়োগ করার গুরুত্বপূর্ণ সার্থক কাজটির পর সুদীর্ঘ ৩০ বছরে তাঁর বিভিন্ন লেখা বিজ্ঞান জগতের সমর্থন পায় নি।

Max Born : "The last of Einstein's investigation which I want to discuss....the original idea was not his but came from an Indian physicist S N Bose..... The Bose-Einstein statistics was to my knowledge, Einstein's last decisive contribution to physical statistics.

Wolfgang Pauli : "... in a paper of S N Bose, a derivation of Planck's formula was given, in which only the corpuscular picture .... was given. This inspired Einstein to give an analogous appplication to the theory of degeneration of ideal gases...."

আলোককণার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বোসের নতুন সংখ্যায়ন তত্ত্ব থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আইনস্টাইন গ্যাসের বস্তুকণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন যা দ্য ব্রগলির নব আবিষ্কৃত বস্তু-তরঙ্গের ধারণা মিলিয়ে। সেই কাজ থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রডিঙ্গার তরঙ্গ বলবিদ্যার বিখ্যাত সমীকরণে উপনীত হলেন—যে সমীকরণ আধুনিক আণবিক পদার্থবিদ্যার মূল ভিত্তি। যে সব মৌলকণা বোসের নিয়ম মেনে চলে ডিরাক বোসের নামানুসারে তাদের নাম দিলেন "BOSON"। প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের পথে পথপ্রদর্শক বিজ্ঞানীরা এমনিভাবে একজনের হাত থেকে আর একজন মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলেন।

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ৩০ বছর বয়সে ঢাকায় বসে সত্যেন বসু যে তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন তা আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জগতে এমনিভাবে সাড়া জাগিয়েছিল আর বিজ্ঞানের অগ্রগতির একটা বড় সোপান রচনা করেছিল। এর পর তাঁর ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত BOSONS নামক সংকলনে দেখতে পাওয়া যায় যে, ১৯২৪-এর পর থেকে সেই সময় পর্যন্ত Einstein, Dirac, Fermi, Pauli, London, Landau, Feynman, Lee, Huang, Yang, Yukawa প্রমুখ পশ্চিম ইউরোপ, রাশিয়া, আমেরিকা, চীন ও জাপানের পঞ্চাশজনের বেশী নোবেল সম্মান ভূষিত বিজ্ঞানী কুড়িটিরও বেশী গবেষণা পত্র লিখেছেন বোসের কাজের ভিত্তিতে। আজও পর্যন্ত সেই তত্ত্বের প্রয়োগে বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। বসুর আবিষ্কার একটা হারিয়ে যাওয়া তুবড়ীর স্ফুলিঙ্গ নয়, একটা কালোত্তীর্ণ হাতিয়ার।

১৯২৪ সালের এই আবিষ্কার কি আকস্মিক? তার আগে বা পরে তাঁর জীবন কিভাবে চলছিল? তিনি কি সত্যিই আর বিজ্ঞান চর্চা করেন নি বা কিছুই প্রকাশ করেন নি? বিজ্ঞানে এমন কেউ আকস্মিক আবিষ্কার করেন না যিনি আগে বা পরে বিজ্ঞান চিন্তায় মগ্ন থাকেন না। প্রকৃতির অজানা রহস্যের ঘরের দরজা তার কাছেই হঠাৎ খুলে যায়, যে বারে বারে সুচিন্তিত পন্থায় ঘা দেয়।

১৯১৮ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত সত্যেন বসুর ২৪টি গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়েছে। তাদের বৈশিষ্ট্য কি তার বিশদ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কেউ কেউ এ কাজ করছেন। কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকী। তা ছাড়া, অপ্রকাশিত গবেষণা প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মত খোঁজা প্রয়োজন। গবেষণার বিষয়বস্তু বিশুদ্ধ গণিত থেকে শুরু করে সংখ্যায়ন, তাত্ত্বিক এবং পরীক্ষামূলক গবেষণায় বিভিন্ন

১৯৭৪ : আশী বছর বয়সে

শাখা পার হয়ে জৈব রসায়ন পর্যন্ত বিস্তৃত। একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে এ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের একটি গোষ্ঠী এ কাজ করতে পারে।

তথ্য বিশ্লেষণ হবার আগে যে কোন অনধিকারী কেন তাঁর সমালোচনা করবেন? কারণ, আমাদের দেশে বিকশিত প্রতিভা, উদ্দেশ্যহীন জনসংখ্যার তুলনায় নগণ্য। তাই একজন কেউ বড় হলে আমরা সবাই প্রতিফলিত গৌরবে গৌরবান্বিত হবার জন্য অসহিষ্ণু হয়ে উঠি।

"বাঙালী বড় চতুর তাই
আপনি বড় হইতে নাই
অথচ কোন চেষ্টা নাই কষ্ট নাই তায়।"

কেউ বলে, "আমাদের দেশের অমুক এত বড়।" আর কেউ বলে, "তিনি এতটুকু হলেন কেন, আরও বড় নয় কেন?"

• • • •

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়া আর নানা বিষয়ে তিনি কি ভাবতেন? কি রকম পরিবেশে তিনি জীবনের নানা সময় কাটিয়েছেন?

১৯৫০ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে আমরা দশ বারোজন আমাদের মাস্টার মশাই সত্যেন বোসের তত্ত্বাবধানে কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিদ্যার ছোট্ট গবেষণাগারে পরীক্ষামূলক গবেষণায় নিযুক্ত ছিলাম। তা ছাড়া, অন্যান্য বিভাগ থেকে এবং প্রধানত ফলিত গণিতের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে আসতেন। পরেও বহুবার তাঁর কাছে নানা বিষয়ে গল্পসল্প করতে তাঁর বাড়ি গিয়েছি—যেমন গিয়েছেন আরও অগণিত ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন বয়সের বন্ধু—বিজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, ঐতিহাসিক, নৃতত্ত্ববিদ আর চেনা অচেনা নানা মানুষ নানা কারণে। কিন্তু এই বিরল প্রকৃতির মানুষটির কথাগুলি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রয়োজনের কথা খেয়াল হয়নি। খেয়াল হল অনেক দেরিতে।

১৯৭৩ এর ২২ জুলাই সকালে একটা টেপ রেকর্ডার হাতে ২২নং ঈশ্বর লেনের বাড়িতে মাস্টারমশাইর কাছে গিয়ে বললাম, "আপনার একটা জীবনী লিখতে চাই।" হেসে উঠে বললেন, "আমার জীবনী লিখবি কিরে? আমার কি আর কিছু মনে আছে? আমি তো রোজনামচা লিখিনি।......ছোটবেলার সব নাম ভুলে যাচ্ছি।"

"আপনি কোথায় জন্মেছিলেন?"

"গঙ্গার ধারেই এই বাড়িতেই।......শোন, আমাদের দেশ ছিল এখন যেটা কল্যাণী ইউনিভার্সিটি—তার কাছে বড় জাগুলিয়া। ওটা বোধ হয় আগে ত্রিবেণী মত ত্রিবেণী-সরস্বতী, যমুনা, গঙ্গা যেখানে মিশেছে। যমুনা ম্রিয়মাণ আর

...ধীনখেড়ে থেকে হাসিনগরে আমাদের গ্রামের ভেতর দিয়ে ইছামতীতে পড়েছে। গ্রামের কাছে মধুবোল বিল......এইখানেই পূর্বপুরুষেরা দক্ষিণ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল ১৬-১৭ শতাব্দীতে—একটা জেনেরাল এক্সোডাস হয়েছিল। তেলেঙ্কোলা অনেকগুলো গোষ্ঠি। বাবাও ছিলেন তেলেঙ্কোলায়।...ঠাকুরদাদা আমার জন্মের আগে মারা গেছেন। ঠাকুরদাদার প্রপিতামহ তেলেঙ্কোলায় ইংরেজদের আগমনের আগে চিটাগঙে নুনের গোলায়—বাঁটা পথে তখন পদ্মা পর্যন্ত যাওয়া যেত—চাকরি করে কিছু নিয়ে এলেন। তান্ত্রিক হয়ে এলেন মুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে। আমার হলো ২৭ পর্যায়। ১৪ পর্যায় থেকে ওই জায়গায় settle করেছে ৩০০ বছর আগে। প্রতাপাদিত্য বারুদ, পর্তুগীজ, আরাকানি, মগ...আমাদের ক্রমশ একসঙ্গে যোগ-সূত্র একটা হয়েছিল। সাতপুরুষ দশপুরুষ ক্রমাগ পাশাপাশি বাড়ি। মাইনগরের বোস। Old Ganges straintা বলে গেছে। কিরকির করে খালের মত আছে।...আমার মার বাবা মতিলাল রায়চৌধুরী—পাসটাস করে উকিল হয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন দক্ষিণী—নদনে—দক্ষিণ দিকে তখন বিদেশী এই সব নদীগুলি ছিল ইন ফুল স্ট্রীম। আমার মামাবাড়ি ছিল বোনগ্রাম—বোনগ্রাম রায়চৌধুরী পরিবার অনেক দিনের...।"

মাস্টারমশাই গল্প বলতে বলতে দুটিন ঘন্টা কেটে গেল। মাঝে মাঝে খন্দ দিতে গেল। খাতায় কিছু নোট নিলাম। "তুই লিখছিস? দূর!" বলে উঠলেন। দেখলাম মনে অনেক কিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি হয়ে আছে। অনু-পরমাণুর গঠন ও চালচলন যেমন ওঁর মনে ছবির মতন ভাসে, যেমন আগ্রহ ও দরদ দিয়ে খুব স্বচ্ছ সহজভাবে তা প্রকাশ করেন তেমনিভাবেই স্মৃতিচারণ করে চললেন। শুধু অনুতাপ হয় আমাদের বড় দেরি হয়ে গেল ওঁর মনের ছবি ওঁর নিজের ভাষায় বাইরে তুলে ধরার কাজে। তাঁর মৃত্যুর আগে আর মাত্র দুদিন কয়েক ঘন্টার আলোচনা রেকর্ড করা হল।

• • •

১৯৭৪-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সত্যেন বসুর তিরোধানের পর পত্রপত্রিকায় নানা আলোচনা প্রকাশিত হতে থাকল। দেখা গেল, এমন কি আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল কিনা তাই নিয়েই দেশে-বিদেশের নানা কাগজে নানা অভিমত।

"১৯২৪ বা ২৫ সালে বার্লিনে একটা বিখ্যাত সেমিনার হয়—বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্স-এ। এতে Planck, Laue, Nernst, Otto Hahn, Lise Meitner, Haber ইত্যাদি বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা যোগ দেন। Laue সেমিনার পরিচালনা করতেন।...সাধারণত তরুণ পদার্থবিদদের গবেষণাপত্র পড়তে দিতেন এবং অভিজ্ঞ নামী অধ্যাপকদের মন্তব্য করতে বলতেন। বোস তার মধ্যে একদিন সেমিনার দেন—সেদিনই আমি তাকে প্রথম দেখি।......সেখানে নার্নস্ট বসেছিলেন, আইনস্টাইন বসেছিলেন, প্লাঙ্ক বসেছিলেন। সাধারণত বক্তৃতার শেষে Laue বলতেন, "বেশ, ভাল, কোন প্রশ্ন আছে কি?" সেদিন বললেন, "এই বিষয় সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট পরিচিত নই। অধ্যাপক আইনস্টাইনকে আমি মন্তব্য করতে অনুরোধ করছি।" আইনস্টাইন বললেন, "এই কাজটি গত কয়েক বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজের অন্যতম বলে আমি মনে করি।" নার্নস্ট প্রশ্ন করলেন, "সে দিনটা ছিল একটা বিশেষ সাড়া জাগানো দিন। কারণ, ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা হয়েছিল।"

আরও অনেক বিষয় অনেক রকম খবরের ভেতর থেকে সত্য নিরূপণের জন্য প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করা ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না।

মাস্টারমশাইয়ের সমকালীন জার্মান বিজ্ঞানী হেরমান মার্ক এখনও জীবিত। তিনি বর্তমানে নিউইয়র্কের একটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। মার্ক বসু পরিবারকে লিখেছেন "...ওঁর বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি এমন ছিল যা Einstein-এর মত প্রতিভাবানের মনকেও উদ্দীপিত করেছিল।...আমার স্ত্রী ও আমার এই দুই মহান মনের মিলন দেখবার প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছিল।"

মার্ক-এর কাছ থেকে আরও খবর সংগ্রহের জন্য আমাদের খরা গবেষণাগারের সহকর্মী বন্ধু ও মাস্টারমশাইয়ের ছাত্র, বর্তমানে নিউ জার্সিতে একটি গবেষণাগারে Solid State বিভাগের প্রধান বিজ্ঞানী জগদীশ শর্মাকে কয়েকটি প্রশ্ন লিখে পাঠালাম। কিছুদিন বাদে জগদীশবাবু মার্ক-এর প্রশ্নোত্তরের আলোচনার টেপ পাঠিয়ে দিলেন। তার কিছু অংশের অনুবাদ তুলে দিচ্ছি:

"অধ্যাপক বোসকে প্রথম কখন দেখেন? কেমন দেখেছিলেন?"

মাস্টার মশাই নিজে এমনভাবে এ গল্প কারো কাছে করেছেন বলে শুনিনি। মার্ক বলে চলেছেন, "আমরা ডালেম-এ আমাদের কাইজার উইলহেম ইনস্টিটিউটে ওকে নেমন্তন্ন করলাম এই বিষয়ে আবার সেমিনার দিতে। কয়েক সপ্তাহ পরে সে এল। আমাদের ইনস্টিটিউটে প্রায় রোজই আসত—আমাদের কাজ সম্বন্ধে খুব আগ্রহ প্রকাশ করত। আমি তখন Weissenberg ও Polanyi-র সঙ্গে কাজ করছি।...বোস সম্বন্ধে আমাদের সকলের ঠিক যা ধারণা ছিল তা এই রকম: বোস যখন বিজ্ঞানের কোন নতুন কাজের ধারায় সন্দিহান হত তখন একটুক্ষণ বসে শুনত—সেই বিষয়ে সমস্যার মূলগত ভিত্তির ওপর ওর আশ্চর্য দখল দেখা যেত। তারপর ও প্রশ্ন করত—সে প্রশ্ন শুধু বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন নয়—সে প্রশ্ন তাঁৎক্ষণিকভাবে সেই কাজের ধারায় ভবিষ্যতের অগ্রগতির দিকনির্দেশ করত। Szilard, Wiegner এদের সঙ্গে যখন বোস ঘন্টার পর ঘন্টা তর্কবিতর্ক করত আমরা অত্যন্ত মজা পেতাম। আমার স্ত্রী আমাদের বাড়িতে ওদের চা বা কফি পান করতে ডেকে আনত...ঘন্টার পর ঘন্টা একটা ঘরোয়া পরিবেশে আনন্দে কেটে যেত। ওর দোকানে কিছু কেনাকাটা করার থাকলে আমার স্ত্রী ওর সঙ্গে যেত। অনেক ছবি আছে তোমায় দেখাব।"

"আচ্ছা, আইনস্টাইন-এর সঙ্গে বোসের যোগাযোগ সম্বন্ধে একটু মতদ্বৈধ দেখা যাচ্ছে। উনি তো আইনস্টাইন-এর সঙ্গে কোন কাজ প্রকাশ করেন নি?"

"দেখ ওঁরা ছিলেন সক্রেটিসের মত—গ্রীক দার্শনিকদের মত—আইনস্টাইন তেমনি ছিলেন। ওঁরা দুজন হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতেন। জান, ইনস্টিটিউটের কাছেই একটা সুন্দর পার্ক ছিল। ওঁরা দুজনে সেখানে চলতে চলতে আলাপ করতেন।" সস্নেহে হেসে বললেন, "আর ওঁরা সে সব প্রকাশ করেন নি..."

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক বসুর স্ত্রী বললেন, "জার্মানী থেকে ফিরে বলেছিলেন আইনস্টাইন-এর বাড়ি যেতেন। উনি বেড়িয়ে বেড়িয়ে কথা বলতেন।"

"আচ্ছা Blanpied নামে একজন আমেরিকান বছর দুয়েক আগে ... বোস সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, বোস হয়তো ইউরোপীয়দের ... লাজুক, ভীতু, জড়োসড়োভাবের জন্য বিশেষ সমাদর পান নি বা বিদগ্ধ সমাজের সঙ্গে তাল রাখতে পারেন নি।"

"না! না! না!" খোলা হাসির পর মার্ক বললেন, "full of humour ... always with good jokes! He would give his jokes ... everybody!

"ও জার্মান গান করত আর আমাদের পার্টি হলেও গান পরিচালনা করত..."

"সকলের কেমন ধারণা ছিল ওঁর সম্বন্ধে?"

"জানলাম তো, Ewald, Wigner, Szilard, Karman এঁরা সবাই ... মুগ্ধ ছিল ওঁর সম্বন্ধে। আর তাঁরা ওঁর সঙ্গে আজীবনের বন্ধুত্ব ... করেছিল। ওঁদের প্রত্যেকে!"

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জগতের এতজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের কাছে ... সমাদরের একটি ভগ্নাংশ পেলেও অভিভূত হয়ে অনেক গল্প শোনানই স্বাভাবিক ... কিন্তু মাস্টার মশাইকে বিদেশের অভিজ্ঞতার গল্প বলতে বললে কেবল ... কি কাজ করছিল সেই গল্পই শোনাতেন।

"১৯২৬-এ দেশে ফেরার আগে বোস আমার বাবা মা ও ছেলের সঙ্গে ...

১৯২৫ : প্যারিসে

দিন ছিল ভিয়েনাতে। সেখানে ইউনিভার্সিটিতে সে একটা সেমিনার ... বিখ্যাত পদার্থবিদ শ্রয়েডিংগার ও প্লাঙ্ক সেখানে ছিলেন। শ্রয়েডিংগার ... চিন্তা করছে—তার বিখ্যাত প্রবন্ধ ১৯২৭-এ বেরিয়েছিল জানই তো! ... খুব সুন্দর আলোচনা করেছিল।"

"পরে কবে দেখা হলো?"

"নাৎসীরা যখন আমায় তাড়িয়ে দিল খবর পেয়েই ঢাকায় একটা পদ ... আহ্বান দিয়ে চিঠি পাঠাল। তখন আমি কানাডায় একটা কাজে যোগ দেব ... জানিয়ে দিয়েছি তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যেতে পারিনি। পরে কলকাতায় এ... দেখা হয়েছিল। তখন মহলানবীশের সঙ্গেও আলোচনা হয়।"

২৫শে জুলাই, ১৯৭৩ :

মাস্টার মশাই বলছেন : "১৯২৫-এর সেপ্টেম্বরে আইনস্টাইন-এর সঙ্গে ... হলো। উনি তো ক্লাস ট্যাস নিতেন না। মাঝে মাঝে বাড়িতে লোকজন ... কথাবার্তা বলতেন। সেই সময় হেইসেনবের্গ-এর পেপার বেরিয়েছে...সে ... খুব stir হল। এ কি কথা বলছে রে বাবা! কিছুদিন বাদে শ্রয়েডিংগার এ... অস্ট্রিয়া থেকে। বক্তৃতা দিলেন। সবাই উল্লসিত—এতদিনে বোধ হয় একটা সলিউশন পাওয়া গেল। হেইসেনবের্গ ইকুয়েশনগুলো আবার শ্রয়েডিংগার ইকুয়েশন ... বের করা যায়। আমরা সকলে মিলে রেস্তোরাঁতে ডিসকাশন করতাম ... কাগজে বেরোবার তিন-চার মাস আগে। এই সমস্তকেই আলোচনায় খুব উৎ... ছিলেন...।"

"আচ্ছা প্রফেসর মার্ক, দেশে ফিরে এসে বহুদিন অধ্যাপক বোস কোন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেন নি......"

"দেখ আমরা খুঁটিনাটি গঠন বৈশিষ্ট্য খোঁজায় পেছনে ঘুরতাম। পরমাণুটা এখানে আছে না ওখানে আছে—তার ফলাই বা কি হবে—এইসব। তার ওসবে আগ্রহ ছিল না। তার দৃষ্টি ছিল পদার্থ বিজ্ঞানের বিস্তৃত পটভূমিতে মূলগত ধারার বিবর্তনের পথে।"

"প্রফেসর মার্ক, ব্লানপিড অনুমান করছেন বোস ওঁর কাজের তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি, আর কি ফলপ্রসূ দিকে সে কাজের প্রসার হতে পারে বুঝতে পারেন নি বলেই আর সে বিষয়ে কাজ করেন নি।"

কেউ যদি এমন কথা বলে তবে তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে এই অভিমত দেবার কারণ কি? সে বলতে পারে দুটি মূলগত গবেষণাপত্রের পর বোস অনেক দিন কিছু প্রকাশ করেন নি। তবে তাকে বলা চলতে পারে "ও, দ্য ব্রগলী কি বোকাই না ছিলেন যে, তিনি শ্রোডিঙ্গার-এর সমীকরণে উপনীত হতে পারেন নি। দ্য ব্রগলী তার (সমীকরণ) আবিষ্কার করার পর সে বিষয়ে তার আগ্রহ চলে যায়। তার মানে এই নয় যে, সে নিজের আবিষ্কারের গুরুত্ব বুঝতে পারে নি।"

"টি আই এফ আর-এর অধ্যক্ষ এম জি কে মেনন ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ রেডিও ভাষণে বলছেন (বাংলা সারাংশ):

"আমি বা আমার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বন্ধুরা কখনই বুঝতে পারি নি সত্যেন বোসকে কেন নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল না। ওঁর কাজ তো শুধু একটা তত্ত্ব ছিল না, পরবর্তী পরীক্ষামূলক গবেষণায় নিয়ামক ছিল। পরবর্তী তিন দশকের আধুনিক পদার্থবিদ্যার পরীক্ষার ফলাফল ক্রমাগত তাঁর তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যাঁরা এইভাবে আধুনিক পদার্থবিদ্যার সোপান গড়ে তুলেছেন তাঁরা সবাই নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এই সারির একজন দিকপাল নিশ্চয়ই সত্যেন বোস। কিন্তু নোবেল পুরস্কারের চেয়ে বড় কথা বিজ্ঞানের পাতায় পাতায় তাঁর তত্ত্ব সবাই পড়ছে, আলোচনা করছে—ব্যবহার করছে।"

নোবেল পুরস্কার যথার্থ গুণীরাই পেয়ে থাকেন। তবু নোবেল কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করার যোগাযোগকারী মানুষও অন্যান্য ক্ষেত্রে থাকে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাসে খুব মূলগত কাজ সাধারণত একজনের জীবনে একটার বেশী হয় না। প্লাঙ্ক, বসু এই সব দিকপালদের নামের সঙ্গে এক একটি কাজেই বিশেষভাবে যুক্ত। এমনকি এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী আইনস্টাইনেরও বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ ও প্রধান চমক-লাগানো কাজ দুটি ১৯০৫।৬এ প্রকাশিত হয়েছে। তারপর নার্নস্ট চেষ্টা করে তাঁকে বার্লিনে এমন একটি পদের ব্যবস্থা করে দিলেন যাতে তাঁর কোনো বাঁধাধরা পড়ানোর দায়িত্ব ছিল না। বিখ্যাত পদার্থবিদ সমারফেল্ড বলেছেন, "এই অখণ্ড যুক্ত অবসরের ফলেই আমরা (১৯১৬ সালে) সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে অবগত হলাম।"

এই দশ বছরের অবসরে যদি Einstein সম্পূর্ণ সমাধান না খুঁজে পেতেন তবে কি বলা হত তিনি চিন্তা না করে আলসে দিন কাটিয়েছেন। যেমন ১৯৩০ থেকে আমরণ ১৯৫৫ পর্যন্ত তাঁর চিন্তার সফল রূপ তিনি যে দিতে পারেন নি তার হিসাব কি কারখানার উৎপাদনের মাপে করা যাবে? মানব সমাজ কি সেই হিসাব করে তাঁকে চিন্তা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার দায়িত্ব নিতে পারে?

সরকারী হিসাব রক্ষকের দপ্তর অধ্যাপক বসুর বৈজ্ঞানিক উৎপাদনের পরিমাণের হিসাবে ব্যস্ত থেকে শেষ কয়েক মাস জাতীয় অধ্যাপকের বৃত্তি না পাঠিয়ে তাঁর জীবন বিপন্ন করে তুলেছিল এ খবর মৃত্যুর পর জানা গেল।

• • •

Blanpied-এর যে প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—"Satyen Bose: Co-founder of Quantum Physics" নামে American Journal of Physics-এর সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ সংখ্যায় সেটি প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটিতে কিছু কিছু অযথা তথ্যানুসন্ধান ও তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর নিদর্শন ছিল। একদিন মাস্টার মশাইকে প্রবন্ধটি পড়ে শোনাতে চাইলাম, আর বললাম ভুল কথা কিছু থাকলে শোধরানো দরকার। মাস্টার মশাই হেসে বললেন, "তার যা খুশী লিখেছে, সে যা বুঝেছে লিখেছে তাতে তোরই বা কি আমারই বা কি এসে যায়?" তবু প্রবন্ধটি আমি তাঁকে পড়ে শোনালাম। পাঠশেষে সহাস্যে বললেন, "আমি তো ছাত্র হিসাবে বিদেশে যাইনি, গিয়েছিলাম মাস্টার হিসাবে। ওখানে নতুন যন্ত্রপাতি কি হচ্ছে তা দিয়ে কি পরীক্ষা হচ্ছে সে সব দেখে এসে দেশের ছেলেদের শেখাবো বলে গিয়েছিলাম। তারপর এক্সরে অ্যানালিসিস শিখে ঢাকায় যন্ত্র তৈরি করিয়েছি—তাতেও কাজ হয়েছে।" আর কোন মন্তব্যের প্রতিবাদ শোনা গেল না।

মাস্টার মশাইর এই "ঔদাসীন্য" সম্বন্ধে জনসাধারণ ও বিজ্ঞানী সমাজের অনেকেই জানেন না বলে বহুজনেই এই সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন যে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধের পর সমসাময়িক পেশাদার বিজ্ঞানী ফের্মি, ডিরাক ইত্যাদির মত ক্রমাগত আরও কাজ প্রকাশিত হতে থাকল না কেন?

আমাদের দেশের তৎকালীন ঔপনিবেশিক অবস্থায় দেশের সাধারণ মানুষের বিজ্ঞান চর্চার ভিত্তি গড়ার কাজটাই মাস্টার মশাই প্রধান বলে মনে করেছিলেন। উচ্চতর বিজ্ঞান যেমন চলার চলবে। এক সময় তিনি বলেছিলেন, সমস্ত দেশ যদি বিজ্ঞান চিন্তা না করতে পারে তবে শুধু মুষ্টিমেয় উচ্চস্তরের বিজ্ঞানীর কাজ দিয়ে দেশে বিজ্ঞান বাসা বাঁধবে না। সমবর্তী বর্ন, হেইসেনবার্গ, ফের্মি, ডিরাক যখন আধুনিক পদার্থবিদ্যার বিকাশের জন্য বহুবিধ প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন তখন তিনি ঢাকায় দেশী অশিক্ষিত কারিগরদের দিয়ে যত্ন করে যন্ত্র তৈরি করিয়েছেন—যারা কাছে ছিল তাদের যতটুকু দেবার অবস্থা থাক, তাদের আধুনিক বিজ্ঞান শিখিয়েছেন। এ কথা শুনতে যতই আশ্চর্য লাগুক, এটাই সত্যি। অধ্যাপক বোসের তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতে প্রথম উইসেনবের্গ ক্যামেরা তৈরি হয়েছিল, এক্সরে যন্ত্র তৈরি হয়েছিল এবং তাপদীপ্তিমাপকের পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যায় নতুন শাখা এক্সরে ক্রিস্টালোগ্রাফির গবেষণার ঐতিহ্য শুরু হয়েছিল।

১৯৭১ সাল থেকে অধ্যাপক বোসের তত্ত্বাবধানে শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় বক্রেশ্বরের তাপকুণ্ড থেকে হিলিয়াম গ্যাস সংগ্রহ ও বিশুদ্ধিকরণ প্রকল্প শুরু করেন। অতি সূক্ষ্মভাবে বিশুদ্ধতা নিরূপণের যন্ত্র গড়ে তুলে এই অতি প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য গ্যাসটি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

সত্যেন বোস, যাঁর স্বধর্ম ছিল বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক চিন্তা, ওঁর পরীক্ষামূলক গবেষণায় কেমন প্রবণতা বা দক্ষতা ছিল?

আমাদের গবেষণাগারের অলিখিত নিয়ম ছিল যার কাজের জন্য যে যন্ত্রপাতি দরকার হবে তা নিজে বানিয়ে নিতে হবে। আসল কাজ শুরু করতে দেরী হবার জন্য হয়ত আমরা মাঝে মাঝে অসহিষ্ণু হয়ে উঠতাম কিন্তু যন্ত্র সকলকে তৈরী করে নিতে হয়েছিল। কখনও ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগের সাহায্যে, কখনও যুদ্ধের পরিত্যক্ত যন্ত্রপাতির জঞ্জাল ঘেঁটে সস্তায় কিছু যন্ত্রাংশ কিনে প্রধানত আমাদের গবেষণাগারের কারখানার সাহায্যে পরীক্ষার উপযুক্ত এক্স-রে যন্ত্র ও ক্যামেরা তৈরী করিয়ে নিয়েছিলাম মাস্টারমশাইর নির্দেশে। প্রতি ধাপেই খোঁজ খবর নিতেন এবং নির্দেশ দিতেন। বহু বাধা বিপত্তির পরে সত্যি সত্যি যখন প্রাথমিক যন্ত্রের ছবি উঠল ততদিনে যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে পাঠ্যাবস্থা থেকে সঞ্চিত অহেতুক ভয় ও আত্ম-বিশ্বাসের অভাব দূরীভূত হয়ে গেছে।

জগদীশ শর্মা অধ্যাপক বসুর কাছে ১৯৪৭ থেকে অনুপ্রভ বস্তুর তাপদীপ্তির বর্ণালী বিশ্লেষণের কাজ করে ডক্টরেট করে ১৯৫৪ থেকে বেশীর ভাগ সময় বিদেশে কাজ করেন। এখন আমেরিকায় সাময়িক। জগদীশ শর্মা তাঁর অভিজ্ঞতা বলেছেন: "মাস্টারমশাইর সার্বোত্তিক ইনটারেস্ট ছিল এক্সপেরিমেন্ট-এ। ভাবতেন থিওরি যে কেউ করতে পারে—নিজে পারতেন বলে হয়ত। টেবিলে বসে ঠিক কল্পনা করে বুঝতে পারতেন কি কি অসুবিধা হচ্ছে—কোথায় ভুল হতে পারে, কিসের জন্য কি করা দরকার অ্যানালাইজ করতেন। রোজ অনেকগুলো সাজেশন দিতেন। প্রাকটিক্যাল মাইন্ড: সব কটা কাজে করতে পারলে ভাল কিন্তু ল্যাবরেটরীর লিমিটেশন-এর মধ্যে সম্ভব ছিল না। তার জন্য একটা ইনস্টিটিউট দরকার ছিল। আমি তার মধ্যে যেটা আমার পক্ষে করা সম্ভব তাই বেছে নিতাম। পরে বলতেন "না পারিস ওটা যে বলেছিলাম করিস নি কেন?" বেছে নিতাম বলেই কাজ শেষ করতে পেরেছি। অনেকে হয়ত গুছিয়ে শেষ করতে না পেরে বিভ্রান্ত হয়েছে। সেখানে তা নয়। একটা সময়সীমার মধ্যে থীসিস করাতে ওঁর ইনটারেস্ট ছিল না। আমি থীসিস বাঁধিয়ে ফেলার পর বললেন, "হাঁরে তুই যে থীসিস বাঁধিয়ে ফেললি, আর বদল করবি কি করে?" তার কিছুদিন আগেই আরও কয়েকটা ডিটেইলড কাজ করতে বলেছিলেন। আমি বলেছিলাম বর্ষাকালে যন্ত্র চলছে না পরে করব। আমি বললাম, "আজকে লাস্ট ডেট"। উনি মজা করে তাকিয়ে বললেন, "লাস্ট ডেট মানে কি? লাস্ট ডেট কাকে বলে?" আমার এক সহকর্মী পায়ে ঠোকর দিয়ে বললে, "তুমি কেটে পড়।" মাস্টার মশাই অবশ্য থিসীস সই করে দিয়েছিলেন। Thermo-luminescence মাপার যন্ত্রের আইডিয়া, প্ল্যান, ডিজাইন থেকে প্রত্যেক স্টেপ মাস্টারমশাই দেখিয়ে দিয়েছেন। অত তুইক। কমপ্লিট স্ক্যানিং ডিভাইস আগে কেউ করেনি। এই র‍্যাপিড কন্টিনুয়াস স্ক্যানিং বিষয়ে রিসার্চ-এর রাস্তা খুলে দিয়েছে। ১৯৫৪-এ Paris-এ crystallographic conference-এ মাস্টার মশাই এ কাজ report করেন। এই যন্ত্র ব্যবহার করে আমাদের গবেষণাগারের শীতেন দত্ত ও অমল ঘোষ চন্দসেনীর কাজ করে ডক্টরেট করে পরবর্তীকালে যথাক্রমে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গবেষক রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হন।

"ওঁর পাশের আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য কি ছিল?"

"গঙ্গার মত। গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে যে যা পার করে নাও। সেটার আমেজ সার্বোত্তিক ছিল। আমার পার্সোনাল লাইফ-এ অনেক জায়গায় কাজ করলাম, অনেক বসু হল অনেক প্রফেসর দেখলাম—ওঁর তুলনা পাওয়া যায় না। Those years were the best years of my life. উনি সামান্য ব্যাপার নিয়ে শেষও এনকারেজ করতেন। পরে ভেবেছি কত তুচ্ছ প্রশ্ন নিয়ে গিয়েছিলাম। ওঁর পক্ষে কোন জিনিসই তুচ্ছ ছিল না। ভাবতেন ছোট খাটো ছোটখাট জিনিস, থেকেই হয়ত এক আধটা দরকারী কথা বেরিয়ে আসতে পারে।

"শেখানোর বৈশিষ্ট্য কি ছিল?"

সব কিছু নিজে করতে পারতে হবে। বলতো, "বর হার্মোনিয়াম আবিষ্কার হয়নি—তুমি নিজে বের কর। বহু সাহেব বর করে গেছেন ওঁর কাগজপত্র হারিয়ে পড়ে গেছে—যদি বুঝে থাক তবে বই ফেলে দিয়ে প্রথম থেকে নিজের মত করে শুরু কর।"

অধ্যাপক বসুর স্ত্রী বলছেন:

"সারা কাছে শুনেছি জীবন দুষ্টুমি করতেন ছোটবেলায়। বইয়ের একটা পাতা পড়া হয়ে গেলে সে পাতাটা ছিঁড়ে ফেলতেন।"

অশোক দেব হাসান এম এস সি পাশ করে কিছুকাল গণিত পড়ে ১৯৪৯ থেকে খয়রা গবেষণাগারে অধ্যাপক বোসের তত্ত্বাবধানে তাপের প্রভাবে মৃত্তিকার প্রকৃতির পরিবর্তনের বিষয় পরীক্ষামূলক গবেষণা করেন। এই কাজের জন্য আমাদের গবেষণাগারের কারিগরদের সাহায্যে একটি differential thermal analyser প্রস্তুত করেন। মাঝে মাঝে গণিত ও তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায়ও মাস্টারমশাইর সঙ্গে আলোচনা করতেন। পরে ১৯৫৪ সালে জার্মানী গিয়ে বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী

প্রফেসর, লেকচারার সকলের সঙ্গে সমান। "আমি সত্যেন বোস, নাম করা লোক" কাউকে feel করতে দিত না। আমার মনে হয় সে ভাবটাও ওর মনের মধ্যে ছিল না। হাফ প্যান্ট পরে বসে তবলা বাজাচ্ছে—বাবার সঙ্গে বসে সিগারেট খাচ্ছে। বয়সের তফাতের জ্ঞান ওরও ছিল না—ওর বাবারও ছিল না। ওর বাবা আমাকে communism-এর বই পড়তে দিয়েছিলেন—হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধেও গভীর পড়াশুনো ছিল ওঁর।" বাবার সঙ্গে গভীর ভালবাসা ও আত্মিক যোগ ছিল তাঁর। আধুনিক পশ্চিমী ধারা, সনাতন বা আধুনিক ভারতীয় ধারা কোন ছাঁচেই সত্যেন্দ্রনাথকে ফেলা যায় না।

১৫ই আগস্ট ১৯৭৩ঃ

"আপনার বাবা ভগবান বিশ্বাস করতেন কি?"

"বাবা খুব র‍্যাডিক্যাল ছিলেন আর কি।"

"কিন্তু আপনি যখন স্কুলে বা কলেজে পড়েন তখন ভগবানের বিষয় কি ভাবতেন?"

"তখন কি আর কেউ ভগবানের কথা ভাবে? মানুষ খায়দায় ঘুরে বেড়ায় ভগবানের বিষয় কি কেউ ভাবে?" (হেসে বললেন)। "না, বিপদে না পড়লে কেউ ভগবানের কথা ভাবে না।"

"আমাদের ঋষিরা তো ভাবতেন..."

"সে অন্য কাজ থেকে সরে গিয়ে...টলস্টয় ভাবতেন, কিন্তু পার্সোনাল গড-এ না।"

"নিউটন তো বিশ্বাস করতেন।"

"নিউটন বিশ্বাস করতেন, হয়তো। নিউটন কি বিশ্বাস করতেন তা কি আর লিখে গেছেন? আই কনফেস ঃ ...কনফেস করে লিখেছেন?"

"ওঁর অনেক চিঠিপত্র আছে..."

"সে চিঠিপত্রের মধ্যে আমিও লিখব, 'হ্যাঁ, ভগবান'", হেসে উঠলেন।

"ভগবান সম্বন্ধে আপনার কি মত?"

"আমার কিছু মত নেই। বললাম তো খাচ্ছিদাচ্ছি—ভগবানের বিষয় কিছু দরকার হয়নি বলার!"

"যদি আপনার সম্বন্ধে কেউ বলেন, আপনি ভগবান বিশ্বাস করেন—যেমন দিলীপ রায় বলেন, আমার শ্বশুরমশাই বলেন—এই যে আপনার মত সম্বন্ধে ইনটারপ্রিটেশন—"

"না, আমি ভগবান বিশ্বাস করি—মানে ওঁদের মত বিশ্বাস করি কিনা সেটা বলা শক্ত। সেটা যাচাই করা হয়নি।"

"এ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি?"

"আমি জানি না, আর আমার জানবার কোন ইচ্ছেও নেই। আমি ধর্মপ্রচারক নই—আর ভগবানের বিষয়ে এমনভাবে কিছু বুঝিনি যে, তোমায় বলব যে তুমি এইটে কর—এইটে ঠিক—অন্য কিছু করো না। কিছু বলতে পারি না।"

"আপনার জীবনযাত্রায় ধর্মের সাহায্য নেবার কোন প্রয়োজন হয় না?"

"মানে? তুমি কি বলছ আমি অধার্মিক? তা নয়, বাইরের যা কিছু সবই মেনে রেখেছি। যে সমাজে আছি তার নিয়ম তা তো মানছি।"

"মানছেন, কিন্তু আমি ভগবানের কথা বলছি।"

"তা যদি বল, হিন্দুর সমাজ কি নিরীশ্বর? বিশ্বাসের কথা নেই। কতকগুলো হচ্ছে আচরণে এবং কতকগুলো মেনে নিতে হয়। যেমন আমার স্ত্রী এক রকম ভাবে, আমি এক রকম ভাবছি। ধর কি—এতকাল পর্যন্ত আমার মতেই আনতে পারলাম না। তা আমি মেনে নিলাম। উনি ওই রকম ভাবেন—আমি এরকম ভাবব—তা সত্ত্বেও থাকা যায় তো! থাকা যায়।"

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪ঃ

শান্ত মৃদুভাষিণী সহধর্মিণী বলছেন:

"উনি পড়াশুনো নিয়েই থাকতেন কিন্তু ছেলেমেয়ে সংসারের ভার, তার চাপ শেষ জীবন পর্যন্ত নিয়েছেন। ঢাকায় শান্তিতে পড়াশুনো করতেন। এখানে অনেক আজেবাজে লোক বিরক্ত করত। বাইরের যে কোন লোক ঢুকে পড়ত—বাধা দিতেন না। টাকা চাইতে আসত—এ ইস্কুলের মাইনে দিতে পারছে না ওর মার অসুখ—বিরক্ত হতেন না, বলতেন এসেই যা। টাকাপয়সা যে যা চাইত দিয়ে দিতেন।"

"সংসার চালাতে অসুবিধা হতো না?"

সস্নেহে হেসে বললেন, "আমি বারণ করিনি, উনি যা চাইতেন করতেন।"

ইউরোপের পরিবেশে কেমন ঘটে?

আইনস্টাইনের প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ সম্বন্ধে তাঁর ছেলেকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন ঃ "আমার মনে হয় বিচ্ছেদের কারণ এই ছিল যে, পারিবারিক জীবন তাঁর কাজের সময় বড় বেশী নিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু পরে নিজেকে নিজে দেখতে গিয়ে হয়তো আরও অসুবিধা হয়েছে।...বাবা মার হয়তো মতামত ও চলার ধরনে তফাত ছিল। কিন্তু মার প্রতি বাবার নরম অধ্যায়ও ছিল।"

মাস্টারমশাই বলে চলেছেন ঃ

"আচ্ছা মনে কর তিনি হয়তো মনে করলেন যে, ভগবান বিশ্বাসের নমুনা আমাকে কালী পুজো দিতে হবে উপোস করতে হবে, তা আমি কি বাধা দেব? আমি নিজে করছি না, নিজে বিশ্বাস করি না এতে কিছু হয়, কিন্তু অন্যে বিশ্বাস করে যদি শান্তি পায়, তাতে আমার কি আছে?

"কিন্তু আপনার বন্ধুদের মধ্যে সব রকম মানুষ আছে। কারো সঙ্গে ক্ল্যাশ হয় না?"

"বন্ধু যদি এমন ভাবে যে আজকে একটা লোককে আমি বলি দিই তো স্বর্গে যাব—আমি প্রোটেস্ট করব। মানব সমাজে আমারই মত এনটিটি, তার কতগুলো ট্র্যাডিশনস ও রাইটস-এ আমি বিশ্বাস করি। আমি যে সব এনজয় করছি, সমাজের নিয়ম অনুসারে তার থেকে আর কতকগুলো ... দিয়ে আমার প্রোটেস্ট—এই হচ্ছে আমার মত আর কি।"

"সেটা আপনার মতামত?"

"হুঁ, ধর্ম বলতে আমার কিছু নেই যে, আমি একটা বই লিখব প্রজ্ঞানানন্দর মত। আমি বই লিখতে যাব না। না।"

"যদি কেউ বই লিখে আপনাকে তার মধ্যে টানে?"

"এখনও সেরকম লোকের সাক্ষাৎ হয়নি যাতে আমি এই বিষয়েতে কনভার্টেড হয়ে যাই।"

"প্রজ্ঞানানন্দর সঙ্গে কোন কথাবার্তা হয়েছে?"

"ধর্মের বিষয়ে কথা হয়নি। এমনি আলাপ আছে—এখন তাদের কনসেপশনটা কি তা বলা শক্ত। আর সত্যি মানুষে কি তাকে বুঝতে পারবে? এই সামান্য ম্যাটার নিয়েই তো কত রকম আইডিয়া হচ্ছে—রোজ নতুন করে প্রপার্টি বেরোচ্ছে। হাইড্রোজেন অ্যাটম আগে যেভাবে ভেবেছি তা তো চলছে না। আমরা যতই দেখি রহস্য গভীরতর হচ্ছে। একদিক থেকে দেখতে গেলে অনেক কিছু বুঝেছি। গ্যালিলিও যেমন পৃথিবী ঘুরছে বলে তাঁকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল এখন লোকে চাক্ষুষ দেখছে ওপর থেকে। পৃথিবীর ওপরের বস্তুর ব্যবহার দেখে আমরা যে নিয়ম ঠাউরেছি তা দিয়ে তারার গঠনের স্পেকুলেশন করছি—এমনকি সারা ব্রহ্মাণ্ড কি করে ইভলভ করছে স্পেকুলেশন করছি—কিন্তু মিওলজির মিলিয়নস অব ইয়ারস ধরে ঘটনা সম্বন্ধে যে স্পেকুলেশন হয়—পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতো তা তোকিফাই করা যাবে না। —শেষ পর্যন্ত সেই বুদ্ধিতর্ক, নিজের রিজনিং, ইনটুইশন-এর ওপর নির্ভর। রিজনিং-এর পেছনে কি আছে সে তো আরও মুশকিল।"

"কনসেপশন অব ক্রিয়েটর দিয়ে আপনার দিক থেকে লাভ আছে মনে হয়?"

"অন্ততঃ বিজ্ঞানের দিক থেকে তো কিছুই নেই। মানে আমরা কখনো বিশ্বাস করি না যে, হঠাৎ অ্যাকসিডেন্টালি কোন ইনটারফিয়ারেন্স হবে টু দি ইউজুয়াল অবজারভেশনস। তবে মিউটেশন-এর ক্ষেত্রে যদি যাও, হঠাৎ চেঞ্জ করে।...আপাত দৃষ্টিতে অনেক কিছু ঘটে যা মেলে না। কিন্তু বিজ্ঞানী বিশ্বাস করে যে, একটা অন্তর্নিহিত রীজন আছে, পরে জানতে পারবে।"

আমার স্বামী, নৃতাত্ত্বিক সুরজিৎ সিংহ প্রশ্ন করলেন ঃ

"এডিংটন, জীনস এঁদের ভগবান বিষয়ে ধারণা সম্বন্ধে কি মনে হয়?"

"ওঁদের অঙ্ক আমি বুঝি। ভগবান বিষয়ে ওঁদের কি কনসেপশন বোঝা যায় না। ও জায়গাটা গোলমেলে মনে হয়।"

"আচ্ছা, বুদ্ধদেব বা যীশুখৃষ্ট এঁদের সময় মেটিরিয়াল সায়েন্স কম ডেভেলপড ছিল। তখনও তাঁরা একটা মোটামুটি র‍্যাশনাল পিকচার অব দি ইউনিভার্স দিয়েছিলেন। সেটা হয়তো মানুষের কাজে লেগেছে।"

"ওয়ার্লড-এর পিকচার নয়, মানুষের পিকচার! মানুষের সঙ্গে মানুষের রিলেশন-এর পিকচার। সে তো সব সময় প্রকট ছিল। তবে তখন মানুষকে বোঝান আর একটু সোজা ছিল—এত লোকসংখ্যা ছিল না—ওপরের রাজশক্তির সঙ্গে বা অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কে না এসে গ্রামের লোক লোকে দিনের পর দিন জীবন যাপন করতে পারত। কলকাতা শহরে যে রকম সত্তর আশি কোটি লোক, সে অবস্থায় যীশুখৃষ্ট বা বুদ্ধদেবকে শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে ছেড়ে দিলে কি অবস্থা হতো বলা যায় না। না ভাই, এ সবের কোন উত্তর নেই। প্রত্যেকেই ইন হিজ ইনারমোস্ট সেলফ একটা ওয়ার্কিং হাইপথেসিস করে চলেছে।"

মাস্টারমশাই অনেকক্ষণ কথা বলে গেলেন। কোন সমস্যার সহজ শেষ সমাধান উনি দিলেন না। একটা ইটারনাল এনকোয়ারিং মাইন্ড।

পরদিন ফোন করে বললেন ঃ "তোমরা সেদিন আমায় বড় বকিয়েছ!"

আমার একটু অভিমান হল, কিছুদিন গেলাম না। কয়েকদিন বাদে ফোন এল, "কি খবর? শোন, আমার এক সন্ন্যাসী বন্ধু খুব পুরোনোকালের—মুসলমান যুগের আগের প্যারিশিয়ান মিউজিক-এর স্কেল একটা বইতে খুঁজে পেয়েছে। সেটা পিয়ানোতে রেকর্ড করিয়ে আমাদের সামগানের সুরের সঙ্গে মিল আছে কিনা দেখতে হবে। তুই এটা করে দিয়ে আসবি!" ঘন ঘন ফোন আসতে লাগল। বুঝলাম এটা না দিয়ে যাওয়া যাবে না। অক্টোবরের শেষ দিকে পাশাপাশি দু রকম সঙ্গীতের রেকর্ড নিয়ে মাস্টার মশাইর কাছে গেলাম। মাস্টার মশাই সন্ন্যাসী বন্ধুকে বুঝিয়ে দিলেন যে, মূল সুরের গঠনে দুটি সঙ্গীতে মিল আছে। সেই দিন আমার সঙ্গে শেষ দেখা। বলেছিলাম ৮০ বছরের জন্মোৎসবের হাঙ্গামা মিটে গেলে আবার যাব।

১৯৭৪, ১লা জানুয়ারী ঃ

আশি বছরের জন্মদিনে রেডিও সাক্ষাৎকারে বললেন, "বোস স্ট্যাটিসটিক্স আমি ভুলে গেছি।"

সত্যিই কি ভুলে গিয়েছিলেন? বা আধুনিক পদার্থবিদ্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন?

২৩শে জানুয়ারী, ১৯৭৪ঃ

মৃত্যুর দশ দিন আগে বিশ্বভারতীর পদার্থবিজ্ঞান শাখার দুজন অধ্যাপক—পার্থ ঘোষ (তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক বসুর কাছে ডক্টরেট করেছে যখন জাতীয় অধ্যাপক ছিলেন) ও অসীম রায় গিয়েছিলেন। বসু সংখ্যায়নের সম্বন্ধে বললেন এক জায়গায় তিনি photon spin-এর কল্পনা করেছিলেন Einstein সেটা বাদ দিতে বলেছিলেন। পার্থ জিজ্ঞেস করল, "পরবর্তীকালে photon spin-এর ধারণা চালু হলে বলেন নি কেন?"

উত্তরে বললেন, "কাজটা হলেই হল, কে করেছে তাতে কি এসে যায়।"

তাপ বিকীরণ সম্বন্ধে ১৯২৪এ প্রকাশিত তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধ সেটি Einstein অনুবাদ করে প্রকাশ করলেও আপত্তিদের সম্বন্ধে মতানৈক্য প্রকাশ

করেছিলেন বলে বিজ্ঞানী সমাজ মনে রাখে কি, সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করে বললেন, অধুনা আবিষ্কৃত মৌল কণায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে হয়তো তার তাৎপর্য বোঝা যাবে। আগের দিন রাত্রে অত্যন্ত অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও উৎসাহভরে গবেষণাপত্রটির বিভিন্ন জায়গা জার্মান থেকে অনুবাদ করে ওদের বুঝিয়ে দিলেন। বললেন: "এই paperটার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে Einstein আমাকে বলেছিলেন, যদি জগতে আর কিছু না থেকে শুধু একটা hydrogen atom থাকত তবে তোমার এই তত্ত্ব কিভাবে খাটত? তখন মনে পড়েনি, এখন ভাবছি যে সাহেব, তাহলে তুমিও থাকতে না আমিও থাকতাম না। সে আলোচনা করে কিছু লাভ নেই।"

আধুনিক কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা অনুযায়ী, যে অবস্থা নেই সে সম্বন্ধে কি হতে পারত সে বিষয়ে কল্পনা কার্যকরী নয় বলে ভাবা হয়।

• • •

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাংলায় বিজ্ঞান প্রচারের চেষ্টায় যে অবিচল দৃঢ়তা দেখা গিয়েছিল সেটা কি একটা পাগলামি? এই ধ্রুব লক্ষ্যের নির্দেশ কোথা থেকে এসেছিল?

বিশ্বপরিচয়ের মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন:

"এই বইখানি তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত করছি। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে এমন বিজ্ঞান সম্পদ নেই যা বিনা সংকোচে তোমার হাতে দেবার যোগ্য।......যে বয়সে শরীরের অপটুতা ও মনোযোগ শক্তির স্বাভাবিক শৈথিল্যবশত সাধারণ সুপরিচিত বিষয়ের আলোচনাতেও স্খলন ঘটে সেই বয়সেই অল্প পরিচিত বিষয়ের রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেম। তার একমাত্র কারণ সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের ছাঁচ গড়ে দেবার ইচ্ছা আমার মনে ছিল।"

• • •

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪:

নীরব শবযাত্রা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স-এর প্রাঙ্গণে এসে কিছুক্ষণ থামল।

আমার পাশে ছিলেন বিজ্ঞান ঐতিহাসিক সমর সেন। আমাকে ধীরে ধীরে বললেন, "দেখ, আমাদের বাংলা ভাষায় মহাপুরুষ, মহামানব এই সব অনেক কথা আছে যা প্রয়োগ করার উপযুক্ত ক্ষেত্র পাওয়া যায় না। এই একজন সম্বন্ধে এ সব কিছুই প্রয়োগ করা যেত।"

প্রশ্নোত্তরে হেরমান মার্ক বলছেন:

"He was a dear! Ah, wonderful; He was very benevolent—He could only do good things! We used to call him our Buddha!

• • •

মাস্টার মশাইর এত দেশপ্রেম সত্ত্বেও বিজ্ঞান কলেজে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ তেমনভাবে গড়ে তুলতে পারলেন না কেন?

অশোকদা: "স্বদেশী প্রীতি প্রেম থাকলেও দিয়ে উঠতে হয়। —ডিপার্টমেন্ট স্ট্র্যাটেজির ব্যাপার।"

"আপনার ওপর তাঁর প্রভাব কি ভাবে লক্ষ করেছেন?"

"২০ বছর দেশ ছেড়েছি। বাঙালীপনা নিশ্চয়ই কমে গেছে। কিন্তু এত ক্যানাডিয়ান হইনি যে, ছাত্রকে বলব it has to be finished within three days। মাস্টার মশাইর ছিল ৫ বছর লাগে ৫ বছর লাগাও, ১০ বছর লাগে ১০ বছর লাগাবে—চুলিয়ে দেখ: ইউরোপীয়ান কাজ।"

তাঁর "প্রতিষ্ঠান" ছাড়াও রয়েছে যাদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে—কে এস কৃষ্ণান, সতীশ গাঙ্গুলী, বেদান্তবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়—আরও অনেকে যাঁদের নাম বিজ্ঞান জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

মাস্টার মশাই ভাল ভাল ছাত্র ডেকে এনে নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করে নিজের চারপাশে জড়ো করেন নি। কাজের দিকে নজর ছিল।

১৯৭২ সালে আমার ওয়ার্কিং গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এ একদিন অনুপস্থিত থাকার পর গিয়ে শুনলাম মাস্টার মশাই এসে আমার খোঁজ করেছিলেন। নিচে লোকজন চিনতে পেরে অধ্যক্ষকে ডেকে এনেছিল। পরদিন ফোন করলাম, "কেন গিয়েছিলেন?"

উত্তর এল, "আমার নাতিদের ছেলে অল্পস্বল্প পড়াশুনো করেছে। তোদের অফিসে তার একটা অ্যাপ্রেন্টিসের চাকরির খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম।"

আমরা অধ্যাপক থাকাকালে একটি ১৪-১৫ বছরের ছেলে রেডিও টেকনিক সম্বন্ধে একটা ছোট বই লিখেছিল। ছেলেটির বাবা একটি ভূমিকা লিখে দিতে বললে মাস্টার মশাই লিখে দেন। একজন এসে বলল, "ও কি লিখেছে ভুলভাল কথা, আপনি ভূমিকা লিখে দিলেন?" মাস্টার মশাই বললেন, "ও তো একটা ছোট ছেলে লিখেছে তুমি একটা ঠিকঠাক করে দেখ তোমাকেও লিখে দেব।" ঠিক করে লেখা অবশ্য হয় নি।

যাদের উন্নতির পথ খোলা আছে তারা তো পথ পাবেই। যাদের বাধা আছে তাদের কে দেখবে? দেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী তাদের দেখতে এগিয়ে গেলেন। আমাদের দেশের অপরিজ্ঞাত অবস্থা শ্রেষ্ঠ কবিকে দারিদ্র্য নিবন্ধ গ্রাম সংগঠনের কাজে নিয়ে গেছে। এইভাবে চলতে গিয়ে তাঁদের ব্যক্তিত্বের যে সর্বস্তরে বিকাশ ঘটেছে তা পরিষ্কারভাবে পাওয়া দুষ্কর। মানব ইতিহাসে এক ধরনের চলার আপাত সফলতাই শেষ কথা নয়। কোন ধরন করে কারুর কাজকে বলা হয় না। এক একজন মানুষ বহু যুগ পর পর আসেন পথের ধ্রুব লক্ষ্যকে স্মরণ করিয়ে দিতে। তবু যদি আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় ধারাটি মধ্যপথে হারিয়ে গেছে তবে নদীই মরল, না মরুভূমি?

রামমোহন রায় ও গার্স্যাঁ দ্য তাসী

দিলীপকুমার বিশ্বাস

রামমোহন রায়ের জীবনী অনুশীলন করলে জানা যায় জীবনের মধ্যাহ্নকাল থেকেই ফরাসী দেশের সঙ্গে তাঁর চিত্তের একটি নিবিড় যোগ স্থাপিত হয়েছিল। রংপুরে অবস্থানকালে (১৮০৯-১৮১৪) ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান পাকা হবার পর থেকেই তিনি তাঁর স্থানীয় মনিব মিঃ ডিগবীর দপ্তরে আগত বিভিন্ন ইংরেজি সংবাদপত্র থেকে সমকালীন পাশ্চাত্য রাজনীতি সংক্রান্ত সংবাদ নিয়মিত আহরণ করতেন। প্রথম দিকে নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্ব, সামরিক প্রতিভা ও শাসনৈপুণ্য তাঁকে আকৃষ্ট করলেও এই স্বৈরাচারী শাসক সম্পর্কে মোহমুক্ত হতে তাঁর বেশীদিন লাগেনি। ক্রমশ সমকালীন ইয়োরোপীয় ইতিহাসের যুগান্তকারী ঘটনা ফরাসী বিপ্লবের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন ও এর আদর্শ ও ভাবধারা তাঁর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীকে নানা দিক দিয়ে প্রভাবিত করে। বিপ্লবের জন্মভূমি হিসাবে ফ্রান্সের প্রতি তিনি আজীবন গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে এসেছেন ও বিভিন্ন সময়ে তাঁর উক্তিতে ও আচরণে এই শ্রদ্ধার বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে। এজন্য ইয়োরোপ যাত্রার সময়ে প্রথম থেকেই ফ্রান্স পরিদর্শনের একান্ত আগ্রহ নিয়ে রামমোহন ভারত ত্যাগ করেছিলেন। অপর পক্ষে যে দেশ সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা ও কৌতূহল এত গভীর সেই ফ্রান্সেও সশরীরে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে তিনি মোটেই অপরিচিত ছিলেন না। ভারতবর্ষে ফরাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ সম্ভবত তিনি পাননি। কিন্তু তাঁর ইয়োরোপ গমনের বহু পূর্বে বেদান্তদর্শনের সুপণ্ডিত ব্যাখ্যাতা ও প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কারকরূপে তাঁর খ্যাতি ইংলন্ডের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সেও পৌঁছেছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার তদানীন্তন 'দি টাইমস' পত্রিকার সম্পাদক মঃ দা আকোস্তা রামমোহন রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ ও সেই সঙ্গে রামমোহনের এক সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী ফ্রান্সে ব্লোয়ার বিশপ আবে গ্রেগোয়ারকে পাঠিয়ে দেন। এই গ্রন্থাবলী ও তথ্যাদির ভিত্তিতে উক্ত ধর্মযাজক রামমোহনের উপর ফরাসী ভাষায় এক পুস্তিকা লিখে প্রচার করেন। এই পুস্তকাখানি পরে 'লা ক্রনিক রেলিজিউজ' নামক ফরাসী সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়েছিল। এর অংশবিশেষের ইংরেজি অনুবাদ ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইংলন্ডের 'মন্থলি রেপোজিটরি' পত্রিকার পঞ্চদশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এর পরে রামমোহনের মনীষা ও কীর্তি সম্পর্কে ফরাসী প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতসমাজের কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে ও 'রেভ্যু আঁসিক্লোপেদিক', 'জুর্নাল আজিয়াতিক' প্রভৃতি বিদগ্ধ সমাজে প্রচলিত পত্রিকাগুলিতে রামমোহনের গ্রন্থতালিকা ও তাঁর সম্পর্কে আলোচনাদি প্রকাশিত হয়। ফরাসী বিদ্বজ্জনমণ্ডলী রামমোহন সম্পর্কে তাঁদের গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে রামমোহনকে ফ্রান্সের 'সোসিয়েতে আজিয়াতিক' (প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনের জন্য প্রতিষ্ঠিত ফরাসী 'এসিয়াটিক সোসাইটি')এর সম্মানিত বৈদেশিক সদস্য মনোনীত করেন। যে কাহিনী সবিস্তারে বলবার জন্য এই অনিবার্য পশ্চাৎপটের প্রয়োজন, তা হল সমকালীন ফরাসী প্রাচ্যবিদমণ্ডলীর সঙ্গে রামমোহনের এই ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা উপলক্ষে মঃ গার্সাঁ দা তাসীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এই যোগাযোগের সাক্ষ্যপ্রমাণগুলি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।

জোসেফ এলিওদোর সাজেস ভার্তু গার্সাঁ দা তাসী (১৭৯৪-১৮৭৮) জন্মসূত্রে দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্সের উপকূলবর্তী মার্সাই নগরীর অধিবাসী। তাঁর পিতা জোসেফ গ্রাঁ গার্সাঁ সেখানে ব্যবসায়ী ছিলেন। 'তাসী' পদবীটি তাঁর মাতৃকুল থেকে লব্ধ। মার্সাই বন্দরটি বাণিজ্য সূত্রে প্রাচ্য জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকায় বাল্যকাল থেকেই দা তাসী প্রাচ্য ভাষা ও প্রাচ্য সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন ও তরুণ বয়সে নূতন খ্রীস্টদেশীয় শিক্ষকের কাছে চলতি আরবী ভাষা শেখেন। প্রাচ্য মুসলিম সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানপিপাসা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে ও তেইশ বৎসর বয়সে তিনি প্যারিসে এসে ফ্রান্সে আধুনিক ইসলাম চর্চার প্রতিষ্ঠাতা সিলভেস্ত্র দা সাসি পরিচালিত 'একোল দে লাঙ্গ ওরিয়েন্তাল ভিভাঁত' নামক প্রতিষ্ঠানে প্রাচ্য ভাষা ও মুসলমান সংস্কৃতি সম্পর্কে উচ্চ পাঠ গ্রহণ করেন। ইসলামীয় বিদ্যায় দা সাসিই ছিলেন তাঁর গুরু। নিষ্ঠা ও যত্নের ফলে আরবী ফার্সী ও তুর্কী—মুসলিম সংস্কৃতির বাহন এই তিন ভাষাই তিনি উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন ও ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। কিন্তু দ তাসীর বিশেষ আগ্রহ ছিল ভারতবর্ষের মুসলমান ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে—এবং ভারতীয় ইসলামের বিশিষ্ট রূপটিকে বুঝবার জন্যই সমগ্র জীবনের সাধনায় তিনি আয়ত্ত করেছিলেন হিন্দুস্থানী বা উর্দু ভাষা। তাঁর সময়ে ফ্রান্সে উর্দুতে তাঁর সমকক্ষ পণ্ডিত আর কেউ ছিলেন না। উর্দু ছাড়া তিনি হিন্দী ও সম্ভবত মোটামুটি সংস্কৃতও জানতেন। জীবদ্দশায় তাঁর পাণ্ডিত্য ও মনীষার যথেষ্ট স্বীকৃতি দা তাসী লাভ করেছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি প্যারিসে 'কোলাজ দা ফ্রাঁস'-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। ঐ বৎসরই 'সোসিয়েতে আজিয়াতিক' এর প্রতিষ্ঠার পশ্চাতেও তাঁর উদ্যম ছিল এবং প্রথম থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক মনোনীত হয়েছিলেন। অবশ্য সম্পূর্ণ নিজের মনোমত ক্ষেত্রে কাজ করবার সুযোগ তিনি পান ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে যখন তদানীন্তন ফরাসী সরকার 'একোল' শীর্ষক পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানে 'হিন্দুস্থানী' বা উর্দু ভাষার এক অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করে তাঁকে সেই পদে নিযুক্ত করলেন। তাঁর দীর্ঘজীবনের প্রাচ্য গবেষণার শ্রেষ্ঠ কাজ এই পদে অধিষ্ঠিত থেকেই দা তাসী সম্পন্ন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পাণ্ডিত্য ও মনীষার জন্য তিনি দেশে ও বিদেশে বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৮৭৬ সালে 'সোসিয়েতে আজিয়াতিক' তাঁকে সভাপতি নির্বাচিত করেন, সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্মান 'লেজিয় দনার'ও তিনি লাভ করেছিলেন।

দা তাসীর দুখানি জীবনচরিত আছে। একটি উর্দুতে মোহিউদ্দিন কাদির জোর রচিত; অপরখানি Garcin de Tassy: Biographie et Etude Critique de Ses Oeuvres —ফরাসীতে সাইদা সুরিয়া হুসেন প্রণীত ও পণ্ডিচেরীর ইনস্টিটিউট ফ্রাঁসেজ দ্য ইন্দোলজি কর্তৃক ১৯৬২ সালে প্রকাশিত। দ্বিতীয় বইখানির দ্বিতীয় অধ্যায়ে হিন্দুস্থানী (উর্দু), হিন্দী, আরবী, ফার্সী ও তুর্কী ভাষা ও সাহিত্যে ও ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত দা তাসীর গবেষণামূলক অসংখ্য গ্রন্থপ্রবন্ধের এক বিস্তারিত বিবরণ ও সমগ্রভাবে এই গবেষণার মূল্যায়ন পাওয়া যায়। এই রচনাটির মধ্যে বর্তমান আলোচনার পক্ষে যা সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক তা হল ১৮৩৯-৪৭ সালে প্রকাশিত তাঁর হিন্দী ও হিন্দুস্থানী (উর্দু) সাহিত্যের দুই খণ্ডে প্রকাশিত বিরাট ইতিহাস (Histoire de la Litterature Hindouie et Hindoustanie) ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে এর একটি পরিবর্ধিত ও মার্জিত সংস্করণ গ্রন্থকার তিনটি বিপুল খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন। সম্ভবত এই বিরাট গ্রন্থের উপক্রমণিকাস্বরূপ ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে দা তাসী লেখেন একখানি ক্ষুদ্রকায় পুস্তিকা যাতে উৎকৃষ্ট হিন্দুস্থানী রচনার কিছু কিছু নিদর্শন ও হিন্দুস্থানী ব্যাকরণের কিছু সূত্র সংকলিত হয়েছে। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত তাঁর দুখানি গ্রন্থ—Doctrine et devoirs de la religion musulmane tires du Coran suivis de l'eucologe musulman traduit de l'arabe (Second Edition 1840) L'islamisme d'apries le Coran, l'enseinement doctrinal et la pratique (১৮৭৪)। দ্বিতীয় গ্রন্থখানিকে আলাদা না ধরে কেউ কেউ অনুমান করেছেন এটি প্রথমটিরই খোল-নলচে বদলানো পরিবর্ধিত সংস্করণ। সে যাই হোক, স্বয়ং নিষ্ঠাবান ক্যাথলিক হওয়া সত্ত্বেও সত্যিকার নিষ্ঠা ও সহানুভূতি সহকারে হজরত মহম্মদের জীবন ও ইসলামতত্ত্বের আলোচনা করেছেন দ তাসী পাশ্চাত্য লেখকগণের ইসলাম সংক্রান্ত রচনায় যা প্রায়শ অপ্রত্যাশিত।

ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এমন প্রগাঢ় কৌতূহলী হলেও এবং তার অনুশীলনে জীবন উৎসর্গ করলেও দা তাসী স্বয়ং কখনো ভারতবর্ষ পরিদর্শনের সুযোগ পাননি। তবু তাঁর গবেষণাকর্মের খ্যাতি ভারতে পৌঁছেছিল। তিনি লাহোরের আনজুমান ও আলিগড় ইনস্টিটিউটের সম্মানিত বিদেশী সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রামাণিক হিন্দী ও হিন্দুস্থানী সাহিত্যের ইতিহাসের এক উর্দু অনুবাদ দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়। তদানীন্তন ভারতবর্ষে যাঁরা হিন্দী উর্দু ভাষাসাহিত্যের চর্চা করতেন তাঁদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর পত্র-ব্যবহার ছিল। এঁদের মধ্যে কেউ ইয়োরোপ ভ্রমণ উপলক্ষে ফ্রান্সে এলে তিনি সাগ্রহে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে রামমোহন সম্ভবত সর্বপ্রথম ভারতীয় মনীষী যাঁর সঙ্গে দা তাসীর কেবল পরিচয় নয়—অন্তরঙ্গতা ও সাক্ষাৎ হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় সাইদা সুরিয়া হুসেন তাঁর গবেষণামূলক দা তাসী জীবনীতে সমকালীন ভারতীয়গণের সঙ্গে দা তাসীর যোগাযোগ প্রসঙ্গ আলোচনায় রামমোহনের নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করেননি; যদিও দা তাসী স্বয়ং তাঁর একাধিক রচনায় এ বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য রেখে গিয়েছেন।

রামমোহনের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে সম্ভবত দীর্ঘকাল দা তাসীর যোগ ছিল। এর কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। হিন্দী ও উর্দু ভাষাদ্বয়ে রামমোহনের অধিকার ছিল নিজ মাতৃভাষার তুল্য। হিন্দীতে তাঁর গদ্যরীতি আধুনিক সমালোচকগণের প্রশংসা অর্জন করেছে ও বিশেষজ্ঞ মহলে তিনি আধুনিক হিন্দী গদ্যের অন্যতম পথিকৃৎ গণ্য হয়ে থাকেন। সুতরাং এই দুই ভাষায় সাহিত্য সম্পর্কেও তাঁর মনোভাব সজাগ ও অনুসন্ধিৎসু হবে তা কিছু আশ্চর্য নয়। এক্ষেত্রে বিদগ্ধ ও মার্জিত মনের কৌতূহলবশত তিনি দা তাসী ও তাঁর হিন্দী উর্দু সাহিত্য গবেষণার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ধরে নেওয়া যেতে পারে। দুই মনীষীর মধ্যে আর একটি সম্ভাব্য যোগসূত্র ছিল ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি। দুজনেই ইসলামশাস্ত্রজ্ঞ—দুজনেই মুসলমান না হয়েও ইসলামধর্মের প্রতি সশ্রদ্ধ। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহন ফ্রান্সের 'এসিয়াটিক সোসাইটি' (সোসিয়েতে আজিয়াতিক)র সম্মানিত বিদেশী সদস্য মনোনীত হয়েছেন। দা তাসী এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই নূতন প্রতিভাশালী বিদেশী সদস্যটির সঙ্গে পত্রালাপে দ তাসী আগ্রহী হবেন তা খুবই স্বাভাবিক। এর আগে যদি তিনি রামমোহনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নাও থাকেন এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এঁরা পরস্পরের কীর্তির পরিচয় লাভ করেছিলেন তা স্বচ্ছন্দে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রে মঃ লাঁজুয়ানে রচিত রামমোহন ও তাঁর কীর্তিবিষয়ক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। রামমোহন-দা তাসীর পত্রালাপের নিদর্শনও আছে। ইংলন্ডে পৌঁছবার প্রায় চার মাস পরেই রামমোহন দা তাসীকে এক পত্র লিখে শীঘ্র ফ্রান্সে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁর এই ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হয়নি। প্রায় দেড় বছর পরে ১৮৩২ এর সেপটেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি ফ্রান্সে পৌঁছান ও সম্ভবত ডিসেম্বরের শেষে কি পর বৎসর জানুয়ারীর প্রথমে ইংলন্ডে ফিরে যান। এই অল্প সময়ের মধ্যেই দা তাসীর সঙ্গে তাঁর একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছিল।
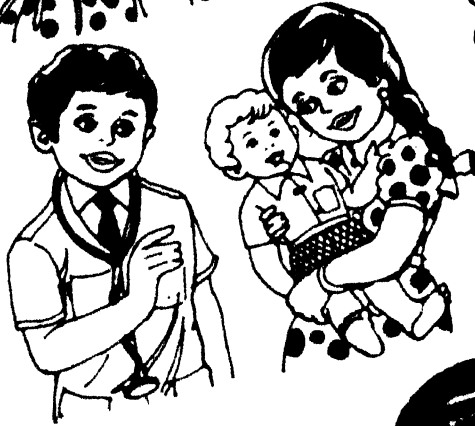
পেট ব্যথা, পেট ফাঁপা, বদহজম, উদরাময় এবং দাঁত ওঠবার সময়ে অস্বস্তি হলে উডওয়ার্ডস্ খাওয়ালে বাচ্চারা এ সব থেকে আরাম পায়।

CAS OPPL.1.77 BN

দ্য তাসী স্বয়ং তাঁর হিন্দী ও হিন্দুস্থানী সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসে এই সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করেছেন ও রামমোহনের বিস্তারিত পরিচয়ও লিপিবদ্ধ করেছেন। বিবরণটির ঐতিহাসিক অংশে অবশ্য বিশেষ মৌলিকতা নেই আর এটি সম্পূর্ণ ত্রুটিহীনও নয়। রামমোহনের মৃত্যুর পর এসিয়াটিক জার্নাল (নিউ সিরিজ ভলুম ১২,১৮৩৩), আথেনিয়ামে (অক্টোবর ১৮৩৩) প্রভৃতি ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত সাময়িক পত্রে তাঁর যে জীবনকাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলিও ডঃ লান্ট্ কার্পেন্টার ও শ্রীমতী মেরী কার্পেন্টারের গ্রন্থদ্বয়ই তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল। তবে দ্য তাসী দীর্ঘকাল চিঠিপত্রের মাধ্যমে রামমোহনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং প্যারিসে বহুবার দুজনের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থে রামমোহন প্রসঙ্গের ভূমিকাস্বরূপে তিনি এই সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করেছেন ও প্রসঙ্গত বলেছেন, রামমোহন তাঁকে ইংরেজিতে ও হিন্দুস্থানীতে অনেক পত্র লিখেছেন। রামমোহনের সঙ্গে দ্য তাসীর এই দীর্ঘকালব্যাপী অন্তরঙ্গতার পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহন প্রসঙ্গে তাঁর কয়েকটি উক্তি কৌতূহলোদ্দীপক মনে হতে পারে। রামমোহনের তিব্বতগমন সম্পর্কে তিনি বলেন 'বৌদ্ধদের মধ্যে সত্যধর্মের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কিনা পরীক্ষা করবার জন্য তিনি তিব্বত গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দুই-তিন বৎসর বাস করেন। কিন্তু তাদের অস্পষ্ট ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতবাদগুলি তাঁর পক্ষে কোনও আকর্ষণের বস্তু হয়নি'। রামমোহনের সার্বভৌম ধর্ম সম্পর্কে দ্য তাসীর যে ধারণা হয়েছিল তা এই : 'এই সংস্কার হল এক রকম সমন্বয়মূলকধর্মবিশ্বাস; এর দুটি মূলতত্ত্ব—ঈশ্বরে বিশ্বাস ও পরলোকে বিশ্বাস। এই তত্ত্বদ্বয়ের ভিত্তিতে যাঁরাই ধর্মোপদেশ দিয়েছেন—যেমন মুশা খ্রীস্টু খ্রীষ্ট, ব্যাস ও মহম্মদ—তাঁদের সকলকেই এই ধর্ম সমান শ্রদ্ধার পাত্র বিবেচনা করে থাকে; এবং যে শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে এই সকল তত্ত্ব উপদিষ্ট হয়েছে—যেমন পেন্টাটিউক (বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট অংশে প্রথম পাঁচটি গ্রন্থে বিবৃত মুশার উপদেশ), বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট অংশে প্রদত্ত খ্রীষ্টের উপদেশ, বেদ ও কোরাণ, সেগুলিকেও তুল্যরূপে উৎকৃষ্ট গণ্য করে। একে কোনোক্রমেই নূতন ধর্মমত বলা যায় না। এই ধর্ম প্রাচ্য জগতের সুফী নামে পরিচিত অধ্যাত্মতত্ত্ববিদগণের মতবাদের সঙ্গে জড়িত। লক্ষ করার বিষয় দ্য তাসী রামমোহনের সমকালীন অনেক ইংরেজ বন্ধু ও অনুরাগীর মত তাঁকে খ্রীষ্টান প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেননি। তাঁর দৃষ্টিতে রামমোহনের ধর্মমতের অসাম্প্রদায়িকতা ও সার্বভৌমত্ব নির্ভুলভাবেই ধরা পড়েছিল। তিনি যে রামমোহনকে সুফী মরমীদের গোত্রভুক্ত করেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য। মুসলমান সুফীসাধক সম্প্রদায়ের প্রতি রামমোহনের অকৃত্রিম অনুরাগ ও ফার্সী সুফী সাহিত্যে তাঁর অধিকারের কথা সুবিদিত। দ্য তাসী স্বয়ং ছিলেন মুসলিম সংস্কৃতিতে বিশেষজ্ঞ। স্বভাবত রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও মতবাদের এই দিকটি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও পরলোকে বিশ্বাস—এ দুটিকে রামমোহনের ধর্মমতের দুই মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করার মধ্যে এটা বোঝা যায় যে তিনি রামমোহনের 'তুহ্ফাৎ-উল-মুওয়াহ্হিদিন' ভাল করেই পড়েছিলেন। রামমোহনের ফ্রান্সে আগমন ও ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ১৮৩২ এর শরৎকালে রামমোহন ফ্রান্সে আসেন ও ১৮৩৩ এর জানুয়ারীতে ইংলণ্ডে ফিরে যান। এক্ষেত্রে তাঁর উক্তিটি যাচাই করে নেবার উপায় আছে। ১৮৩২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর রামমোহন ফ্রান্সের পথে ডোভার থেকে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদকে লেখেন : "আমি ফ্রান্স ও ইটালিতে প্রস্থান করিতেছি।............ফ্রান্স হইতে পুনরায় পত্র লিখিব।" ধরে নেওয়া যায় তিনি পৌঁছান ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে। সুতরাং ফ্রান্সে তাঁর পৌঁছানোর সময়টি দ্য তাসী ঠিকই হিসাব করেছেন। তবে তিনি ১৮৩৩ এর জানুয়ারিতে ইংলণ্ডে ফিরেছিলেন কিনা সে-বিষয়ে একটু সন্দেহ থেকে যায় ; কেননা ফরাসী সাময়িকপত্র 'রেভ্যু আঁসিক্লোপেদিক' ডিসেম্বর ১৮৩২ সংখ্যায় মঃ দ্য শাঁথিয়ে লিখছেন, রামমোহন ইংলণ্ডে ফিরে গেছেন ; তাঁর উদ্দেশ্য ফরাসী ভাষা ভাল করে শিখে নিয়ে আবার ফ্রান্সে ফিরে আসবেন। এর থেকে মনে হয় হয়তো বা ১৮৩২ এর নভেম্বরের শেষে বা ডিসেম্বরের প্রথমেই রামমোহন ফ্রান্স ত্যাগ করেন। এই দুই সমসাময়িক সাক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য করা কঠিন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের মৃত্যুর উল্লেখ করে দ্য তাসী সংবাদ দিয়েছেন পর বৎসর তুর্কী, রাশিয়া ও পারস্যের মধ্য দিয়ে তাঁর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা ছিল। ইসলামের সঙ্গে গভীর পরিচয়সম্পন্ন রামমোহন যে দেশে ফিরবার পথে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার অভিলাষী হবেন তা স্বাভাবিক।

রামমোহনের দৈহিক সৌষ্ঠবও দ্য তাসীকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর ভাষায়—চরিত্রের নৈতিক উৎকর্ষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে রামমোহনের দেহাকৃতি; মুখভাবে মহত্ত্ব ও মাধুর্য পরিস্ফুট; তিনি ঘোর শ্যামবর্ণ, প্রায় কালই বলা চলে; কিন্তু তীক্ষ্ণ নাসা, সতেজ, উজ্জ্বল দুই চোখ, প্রশস্ত কপাল, মুখাবয়বের সৌন্দর্য—তাঁর মুখমণ্ডলকে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত করেছে। তাঁর দেহ যথোচিত সৌষ্ঠবসম্পন্ন, উচ্চতায় তিনি ছয় ফুট। সাধারণত তিনি নীলবর্ণের পোশাক পরিধান করেন ; একটি সাদা শাল তাঁর দুই স্কন্ধ বেষ্টন করে সামনের দিকে কটিদেশ পর্যন্ত বিলম্বিত ; ভারতীয় মুসলমানী রীতি অনুযায়ী তাঁর মাথায় একটি পাগড়ী জড়ানো।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইংলণ্ডে পৌঁছাবার অল্পদিন পরেই রামমোহন দ্য তাসীকে এক পত্র লিখেছিলেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে দ্য তাসী এই পত্রখানি তাঁর এক গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। এখানি চোস্ত উর্দুতে লেখা। তৎকালীন উত্তর ভারতের বিদগ্ধ সমাজে প্রচলিত আদব-কায়দা দোরস্ত মার্জিত উর্দুতে রামমোহন কতখানি স্বচ্ছন্দবিহারী ছিলেন চিঠিখানি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দ্য তাসী পত্রখানির সঙ্গে একটি ফরাসী অনুবাদও গ্রন্থভুক্ত করেছেন। বাঙলা মর্মানুবাদ সমেত মূল পত্রটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

মূল

জনাব ফাজিলাৎ মাআব মেহেরবান মকরমুদ্দম ওয়া মখদুমম—

রোকায়ে মুবারক পহুচা; বান্দাকো মসরুর ওয়া মওজ্জায় কিয়া। কাদের আলালইৎলাক আপকো ইস ইত্তাদ আওয়ারিকে সাথ সলামৎ রকখে। তিন মাহিনেসে জেয়াদা বান্দা ইংলণ্ডমে মকীম হায়। ইনশাআল্লাহতালা আন করিব প্যারিসমে মুলাকাৎ এ খেদমত হোগা। ঔর আপকি তবজ্জোহসে জনাব শেজি সাহাব কি সাথ মুলাকাৎ হাসিল করেঙ্গা। আপকে ওয়াদায় মুরাআৎসে বান্দাযে কমতর মমনুন হুয়া। ওর আদাযে শুকর তহে দিলসে করতা হায়।

জেয়াদা হদদে আদাব।

খাদেমেকুম, ওয়া মমনুনেকুম

তহরীর কি তারিখ রামমোহন

ইয়াকুম আগস্ট ১৮৩১

আইন, ইমাম

জনাব লফ্জৎ হুজুরি শেজি সাহব-এ ফকরম সাহারিক হাওয়ালা কিয়া গিয়া।

অনুবাদ

সুবিজ্ঞ মহাশয় (যেন তাঁর সুনাম ও যশোরাশি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।)

আপনার সুকৃপত্র পঁহুছিয়াছে; এবং উহা আপনার ভৃত্যকে আনন্দে ও সম্মানে পূর্ণ করিয়াছে। প্রার্থনা করিতেছি যেন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর এই অনুগ্রহপূর্ণ অভিজ্ঞানের নিমিত্ত আপনাকে সুস্বাস্থ্যে রক্ষা করেন। তিন মাসের অধিক হইল আপনার ভৃত্য ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছেন। যদি পরমেশ্বর ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি শীঘ্রই প্যারিসে উপস্থিত হইয়া আপনাকে অভিবাদন করিবার সম্মান লাভ করিবেন ও আপনার মাধ্যমে শ্রীযুক্ত শেজি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎকার সম্পন্ন করিবেন। আপনি তাঁহার জন্য লইবার যে প্রতিশ্রুতি তাঁহাকে দিয়াছেন তজ্জন্য আপনার দীন ভৃত্য গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছেন ও অন্তর হইতে আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

পত্র দীর্ঘতর করিলে শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘিত হইবে। আপনার কৃতজ্ঞ ভৃত্য

লিখিত ১ আগস্ট রামমোহন।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ।

পুঃ এই পত্র সুমহান মাননীয় শ্রীযুক্ত ফকরম সাহেবের হস্তে সমর্পিত হইল।

১ আগস্ট ১৮৩১ লিখিত এই পত্রে একটি অতিরিক্ত সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। রামমোহন যথাশীঘ্র ফ্রান্সে পৌঁছে প্যারিসে দ্য তাসীর মধ্যস্থতায় সমকালীন সুবিখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যবিদ আঁতোয়ান লেওনার দ্য শেজি (১৭৭৩-১৮৩২)-র সঙ্গে পরিচিত হতে উৎসুক ছিলেন। এই ফরাসী মনীষী ইয়োরোপে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ। কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের সংস্করণ ও প্রামাণিক অনুবাদ এঁর অক্ষয় কীর্তি। তাছাড়া ইনি 'অমরুশতক' এবং রামায়ণ থেকে 'যজ্ঞদত্ত বধ' উপাখ্যানেরও ফরাসী অনুবাদ করেন। ইনি ফার্সীও জানতেন এবং 'লায়লা মজনু'র প্রণয়কাহিনীও ফরাসীতে অনুবাদ করেছিলেন। ১৮১৪ থেকে ১৮৩২ তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত দ্য শেজি ছিলেন ফ্রান্সের রাজকীয় বিদ্যালয়ে (কলেজ দ্য ফ্রান্স) সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সর্বপ্রথম অধ্যাপক। দ্য শেজির পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে রামমোহন স্বভাবত তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের জন্য উৎসুক হয়েছিলেন। তবে এ বিষয়ে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছিল কি না জানা যায় না। কেন না ফ্রান্সে যাবার সুযোগ তাঁর ঘটেছিল ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে অল্পদিনের জন্য। ১৮৩২এই শেজির মৃত্যু হয়।

পত্রের 'পুনশ্চ' অংশটুকু থেকে আমরা জানতে পারি এটি দ্য তাসীর কাছে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন ডানকান ফোর্বস (১৭৯৮-১৮৬৮)। ইনি স্বয়ং একজন প্রাচ্যবিদ্যাবিদ ও জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে রামমোহনের সমানধর্মা বন্ধু ছিলেন। ফোর্বস আরবী, ফার্সী, হিন্দুস্থানী ও বাঙলা ভাষা জানতেন। ১৮২৮ সালে তিনি একখানি ফার্সী ব্যাকরণ রচনা করেন ও ১৮৩০তে 'হাতিম তাই'এর কাহিনী ফার্সী থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। উত্তরকালে ইনি লণ্ডনের কিংস কলেজে হিন্দুস্থানী ভাষার অধ্যাপক হয়েছিলেন। এঁর 'হিন্দুস্থানী ইংরেজি অভিধান' প্রভৃতি আরও অনেক গ্রন্থ আছে।

দ্য তাসীর রচনা রামমোহনের সঙ্গে তাঁর যে স্বল্পমূল্য পরিচয়টুকু উদ্ঘাটিত করে তার থেকে আমরা সম্ভবত একটি বিষয় নির্ভুলভাবে অনুমান করতে পারি। সরকারীভাবে রামমোহনের ইংলণ্ড গমনের উদ্দেশ্য ছিল তিনটি : (১) দিল্লীর বাদশাহের ভাতাবৃদ্ধির জন্য তদবির করা; (২) সতীদাহ উচ্ছেদ আইনের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ প্রিভি-কাউন্সিলে যে আবেদন পাঠিয়েছিলেন তা স্বয়ং উপস্থিত থেকে নাকচ করাবার চেষ্টা করা; (৩) ১৮৩৩এর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনদে যথাসম্ভব ভারতবাসীর স্বার্থের অনুকূল শর্ত বসাবার চেষ্টা করা। এই উদ্যমগুলির ক্ষেত্রে আমরা কর্মী ও সংস্কারক রামমোহনকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে দেখি। কিন্তু তার অন্তরালে আর এক রামমোহন ছিলেন যিনি জ্ঞানতপস্বী, ভারতপথিক। ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগের সংস্কৃতির মর্মোদ্ধারের কাজে পাশ্চাত্য দেশে যাঁরা রত ছিলেন তাঁদের অনেকেই ছিলেন তাঁর পরিচিত, আরো অনেকের সঙ্গে পরিচয়লাভের জন্য তিনি ছিলেন উৎসুক। এঁদের তিনি আত্মার আত্মীয় গণ্য করতেন। এই জ্ঞানীমণ্ডলের সঙ্গসুখ উপভোগ করাও তাঁর ইয়োরোপযাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য যে ছিল এতে বিশেষ কোনো সন্দেহ নেই। এর টুকরো টুকরো বহু প্রমাণ আছে। বর্তমান নিবন্ধে তারই একটির কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনা করা গেল।

বেলেঘাটা পার্টি

কল্যাণ চক্রবর্তী

বাস থেকে নেমে তরুণ মনে মনে কয়েকবার 'সাউথ' কথাটা আওড়াল। বিত্তনের কথা মত ডাইনে পাক খেয়ে গুণে গুণে চতুর্থ বাড়ির সামনে দরজার উপর ঠিকানা দেখল। বেশ সহজ ঠিকানা। বললেই হল 'সাউথ'। এ যদি বেলেঘাটা হত। বিশটা লোককে জিজ্ঞেস করতে হত, তারপর যে বাড়িতে যাবে তাদের সুন্দরী মেয়ে থাকলে হয়তো পাড়ার ছেলেরা সহজে একটা হদিস দিতে পারবে। আর যদি সে সব না বলতে পার, তাহলে যাও বাংলা বাজারে। বেলেঘাটার ঠিকানার কোন মা-বাপ নেই, হয়তো তিন তারপর একুশ, বিয়াল্লিশ কিংবা তের।

হাতের সামনে কড়া, বার দুই নাড়াল। তরুণের কড়া নাড়ানোর বড় ভয়। একবার কড়া নাড়িয়ে বিপদে পড়েছিল। বেলেঘাটায় দরজার কড়া অনেকক্ষণ খুব জোরে নাড়াতে হয়। বেপাড়াই বলতে হবে, তরুণ কয়েকবার কড়া নাড়ার পর দেখল হাতে কড়া চলে এসেছে। সে আর এক বিপদ, এখন কড়া নিয়ে তরুণ কি করে! আশেপাশে ছুঁড়েও ফেলতে পারে না, যদি কেউ দেখে ফেলে। উপরে কলিংবেল দেখে তরুণ আলতোভাবে হাত ছোঁয়াল।

ওপারে দরজা খোলার জন্য যেন 'রেডি'ই হয়েছিল।

তরুণকে দেখে বলল, 'আয়! তোর জন্য অপেক্ষা করছিলাম, আসতে কোন অসুবিধা হয়নি তো?'

তরুণ বলল, 'না।'

'আর বলিস না, বস্তির বাচ্চা ছেলেগুলো খালি দরজার কড়া নাড়ে। খুললেই ছুটে পালায়' বিত্তন বলল।

তরুণ একটু আগে কড়া নেড়েছে। আর বেলেঘাটায় যেখানে থাকে, ওর চাইতে বস্তিও অনেক ভাল। একটা বাড়ি কোনকালে ইট-চুন দিয়ে তৈরি হয়েছিল—বাড়িতে তেরটা ভাড়াটে। জোরে কথা বললে দেওয়াল খসে পড়ে। বাড়িওয়ালা ভাড়াটের ভয়ে ফেরার। শুনেছি অনেককাল আগে নাসির মিয়া মক্কায় গিয়েছে। এতকাল একটা লোক মক্কায়ই বা কি করবে, কে জানে এর মধ্যে হয়তো অক্কাই পেয়ে গেছে। তরুণ বাসাটা ছাড়ার চেষ্টা অনেকদিন ধরেই চালিয়ে যাচ্ছে। শেষ চেষ্টা করেছিল জার্মানী থেকে আসার সময়। দু বছর জার্মানীতে থেকে যখন তল্পি-তল্পা গুটিয়ে চলে আসছে, তখন বাড়ির কথা মনে হওয়াতে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল। বাবাকে লিখেছিল একটা বাসা কোথাও দেখতে, অন্তত তিন রুমের ফ্ল্যাট যদি জোগাড় করা যায়, তাহলে একেবারে নতুন বাসায় গিয়ে উঠবে তরুণ। তাতে বাবা বুঝল ভুল। ভাবল ছেলে দু বছর জার্মানীতে থেকে জার্মান হয়ে গিয়েছে, ভাঙা বাড়িতে উঠতে পারবে না। কিংবা ছেলে বোধ হয় জার্মান মেমসাহেব নিয়ে ফিরছে। বউ নিয়ে বস্তিবাড়িতে উঠতে তরুণের প্রেস্টিজ যাবে। গরীবের ছেলে বিদেশে গিয়েছে একটু ভালভাবে থাকতে খেতে কটা দিন, সেখানেও একটা সাদা চামড়াকে ফাঁসিয়েছে। নিশ্চয়ই রাজা জমিদারের ছেলে বলে পরিচয় দিয়েছে। যা হোক বাবা শেষ পর্যন্ত এ সব আশংকা করে পাড়ায় তরুণের এক বন্ধু অলককে দিয়ে একটা চিঠি লিখিয়েছিল। অলকের ওসব বাছবিচার নেই। কয়েক লাইন লিখেছিল। এখনও মনে হলে হাসি পায়। শুধু, ভাবনার কোন কারণ নেই। মেমসাহেবের কোন অসম্মান হবে না। কি জিনিস ফাঁসিয়েছ, কবে নিয়ে আসবে দেখার আশায় রইলাম। আপাতত তোমাদের বাড়ি একটু সারিয়ে নিলেই চলবে। কলকাতায় লোকসংখ্যা বড় বেড়ে গেছে। নতুন বাড়ি ভাড়া পাওয়া মুশকিল। আসার সময় একটা ভাল জামা আর সেন্ট আনবে।'

জার্মানী থেকে ফিরে তরুণ চাকরি খুঁজে ক্লান্ত হয়েছিল কমাস। চাকরি পাওয়ার পর বাড়ি খুঁজে বার করা আর এক চাকরি। ছোট দু ভাই অবশ্য আছে, তারা খুব ব্যস্ত। পড়াশোনা ছাড়া খেলা ও আড্ডা দেওয়ার পর যে অবশিষ্ট সময়টুকু থাকে, তা আর বাড়ি খুঁজে নষ্ট করতে চায় না। অবিবাহিত বয়স্ক এক বেকার মামা ছোটবেলা থেকেই বাড়িতে আছে। সে পরের কাজ করে সময় পায় না। কেবল খাওয়ার সময় দুবেলা বাড়িতে আসে। তা ছাড়া কাকে ক্রিকেটের টিকিট দিতে হবে—কার পাসপোর্টে গ্যারান্টার-এর জায়গায় একটা সই না করিয়ে দিতে পারলে একটা ছেলে বিদেশে যেতে পারবে না—জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। একবার রেশন আনতে সবগুলো কার্ড হারিয়ে এসেছিল, তা আজ অবধি হয়নি। অতগুলো লোকের ব্ল্যাকে চাল কিনে চলছে। অথচ পাড়ার কে বিয়ে করে এসেছে, বউ-এর নামে একটা রেশন কার্ড করে দিতে হবে, মামাকে দরকার। রেশন ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করেছিল, বউ-এর বিয়ের আগের কার্ড কোথায়। ব্যস, মামা গেল ক্ষেপে। এক ইনফ্লুয়েন্সিয়াল এম এল এ-কে দিয়ে রেশন অফিসে ফোন করে দিল। বাবা মাঝে মাঝে খুব রেগে গেলে মাকে খোঁচা দেবার জন্য বলেন মামা দেশের কাজ করে সময় পায় না। যা হোক, তরুণ যদি বাড়ি ভাড়া করে দামড়া ভাই আর বেকার মামাকে কোলে করে নিয়ে যেতে পারত, তা হলেই বাড়ি পাল্টাতে পারত। বাড়ি একটু ভদ্রলোকের বসার জন্য তরুণের যা খরচ, তা দিয়ে প্রায় নিজের বাড়ি হয়ে যেত।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে মাঝামাঝি জায়গায় জানলায় প্রায় পুরোটা জড়িয়ে উঠেছে মানি প্ল্যান্ট। সিঁড়িটা ঝকঝকে কোথাও একটা ট্রামবাসের টিকিট বা একটু ধুলো নজরে পড়ল না। তরুণের আবার মনে পড়ল 'সাউথ'। আপন মনে কখন একটু হেসে ফেলল ও।

বিত্তন লক্ষ করেছিল, বলল, 'কিরে হাসছিস কেন, পাগল হয়ে গেলি নাকি?'

'না একটা কথা মনে পড়ল।' তরুণ বলল।

উপরে উঠে ঘরটা খুব ছোট। ঘরটা জুড়ে একটা ডিভান আর একটা চেয়ার, তার মাঝখানে হাতখানেক জায়গা, এঘর ওঘর করার জন্য। ঘরে ঢুকে বিত্তন বলল 'বাপি, মাই ফ্রেন্ড তরুণ।'

'প্লেজার নাইস। ভেরি নাইস।'

তরুণের মনে হল বিত্তনের বাবা ওর দিকে হাত বাড়াচ্ছে হ্যান্ডশেক করার জন্য। বিত্তনের বাবা লোকটা খুব ছোটখাটো চেহারা। শরীরের তুলনায় মাথাটা মনে হল আরও বেশী ছোট। গায়ের রংটাও ময়লা। বিত্তনের সঙ্গে ওর বাবার কোন মিলই নেই। বিত্তন বেশ লম্বা দোহারা চেহারা। আর গায়ের রংও যেমনি টকটক করছে।

'সিট ডাউন। সিট ডাউন।'

একেবারে সাহেবী কায়দায় বিত্তনের বাবা বসতে বলল তরুণকে।

বিত্তনের বাবার হাতে স্টেটসম্যান-এর এডিটোরিয়াল পৃষ্ঠাটা ভাঁজ করা, লাল টি পেন দিয়ে মাঝে মাঝে দাগ দেওয়া। তরুণকে ওদিকে লক্ষ করতে দেখে বিত্তনের বাবা একটু হেসে বললেন, 'আগে এ কাগজটা পড়ে আনন্দ পেতাম।

ইংরেজ চলে যাওয়ার পর সব কিছুই নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি ইংল্যান্ডে ছিলে?'
'না ইংল্যান্ডে নয়, জার্মানীতে ছিলাম বছর দুই।'
'ওই হল! ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি তো।' বিভিনের বাবা বললেন।

ভদ্রলোকের কথা তরুণের বেশ লাগল। এতদিন দেশে এসেছে কেউ কখনও ভুলেও বলেনি বিলেত আর জার্মানী এক। যার সঙ্গেই কথা বলেছে সেই প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিয়েছে বিলেত আর জার্মানী অনেক ফারাক। ইচ্ছে করলেই জার্মানী যাওয়া যায়। ওখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সারা পৃথিবী থেকে লেবার নিয়ে কাজ করায়। আর বিলেত যাওয়া বড় কষ্ট, ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায় না, [illegible] কথা অনেক লেখাপড়া চাই, মূর্খ লোকের জন্য বিলেত নয়।

বিভিনের বাবা চুরুটে দু'চারটে টান দেওয়ার পর কাশতে শুরু করল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা দু'একটা কথা বলে আবার কাশি। 'আমারও একবার বিলেত যাওয়ার সব ঠিক হয়ে গেল, জাহাজে চাপবো এমন সময় আরম্ভ হল যুদ্ধ। ব্যাস, আর যাওয়া হল না।' বিভিনের বাবার বলতে কাশতে চোখ মুখ বেশ লাল হয়ে উঠল। তরুণের মনে হলো, চোখগুলো যেমন লাল আর বড় দেখাচ্ছে যে কোন সময় বেরিয়ে আসতে পারে। শরীরটা যেমন রোগা হার্টের অবস্থাও নিশ্চয়ই দুর্বল। কাশির সঙ্গে নিঃশ্বাসটাও বেরিয়ে আসা কোন বিচিত্র ব্যাপার নয়। তরুণ কি করবে বা কি বলবে ভাবছিল। এমন সময় বিভিন তরুণের ঘাড়ে মৃদু চাপ দিল।

'চল ভিতরে।'

তরুণের উঠতে কেমন লজ্জা করছিল। কিন্তু বিভিন প্রায় টেনে তরুণকে তুলে ভেতরের দিকে পা বাড়াল।

ভেতরের ঘরটা একেবারে আলাদা। কোন কমার্শিয়াল আর্টিস্টকে দিয়ে বেশ একটু আগে সাজান হয়েছে। প্রথমেই লক্ষ পড়ল দরজা জানলার পর্দা, বিছানার বেড কভার, সোফার কভার এক রকম রং মিলিয়ে লাগান। দেওয়ালে দুটো বড় সাইজের অ্যাবস্ট্রাক্ট অয়েল পেন্টিং।

এ যদি তরুণের বাড়ির পর্দা হতো। দরজার পর্দা বেকার দাদা শীতে সকাল বেলা গায়ে দিয়ে পাড়ার চায়ের দোকানে গিয়ে বসত। তারপর কখন কি খেয়ালে কাকে দিয়ে চলে আসত। দু'চার দিনের মধ্যে বাড়িতে যদি কারো চোখে পড়ে দরজার পর্দা নেই, তখন কে নিয়েছে, আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন ধরে নিতে হবে, রাত্রিতে বাড়িতে চোর এসেছিল, দরজার পর্দাটা নিতে। আর সোফার কভার। কে চা ফেলে বিশ্রী দাগ করে রাখবে। ছোট ছোট ভাগনেভাগনীরা মামাবাড়ি এসে আবদার করে দেওয়াল থেকে অয়েল পেন্টিং নামিয়ে তার উপর পুতুলের বিয়ে দেবে। জার্মানী থেকে ফিরে দেখল, দেওয়ালের অয়েল পেন্টিং হাওয়া হয়ে। বেটা মধু ওটা ছিঁড়ে টুকরো করে উনুনে হাওয়ার কাজে লাগিয়েছে। তরুণ ভেবেছিল, মধুকে পাছায় এক লাথি মেরে গঙ্গার ওপার করে দেবে।

কি কারণে তরুণ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, বিভিনের গলা শুনে দরজার দিকে তাকাল।

'আমার মা মণি।' বিভিন বলল।

তরুণ কিছু বলার আগেই বিভিনের মামণি মুখে হালকা হাসি এনে বলল, 'তোমার কথা সব শুনেছি বিভিনের কাছে। এত দেরি করলে কেন? আমরা এখনও চা খাইনি, তুমি এলে একসঙ্গে চা খাবো বলে।'

বিভিন অবশ্য বারবার বলে দিয়েছিল তরুণকে খুব সকাল করে আসতে। ছুটির দিনে যা হয়, ঘুম থেকে প্রথমেই উঠতে দেরি, তারপর সব কাজই একটু বিলম্বে হয়। তবু এখনো নটা বাজেনি। ছুটির দিনে সকালই বলা চলে। তবে অন্যদিন এর মধ্যে তিনচারবার চা হয়ে যেত এটা ঠিক।

'বেরুতে দেরি হয়ে গেছে।' তরুণ একবার দায়সারা গোছের করে বলল।

'এসো আমরা আগে একটু চা খেয়ে নি।' বিভিনের মা তরুণকে সোফা দেখিয়ে ভেতরের ঘরের দিকে পা বাড়াল। বিভিনের ছোট বোন সোফার সামনে একটা টী-টেবিল রেখে গেল। বিভিন তরুণের দিকে সিগারেট-এর প্যাকেট এগিয়ে দিল। তরুণ ইশারায় না করল। বিভিন বলল, 'আমার পারমিশান নেওয়া আছে।'

বিভিন সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিল। তরুণ ভাবতেই পারে না, ওর বাড়িতে মা-বাবার সামনে সিগারেট ধরিয়েছে। তরুণের বড়দা কম করে বারো বছরের বড় হবে ওর চাইতে, সে এখনও বাবার সামনে সিগারেট ধরাতে সাহস পায় না। বড়দা একবার বন্ধুর খপ্পরে পড়ে বারে গিয়ে মদ গিলে এসেছিল। রাত্তিরে বাড়িতে বমি করার সময় সকলেই টের পেল। সকালবেলা বাবার জেরা শুরু হল। বড়দা সত্যি কথা বলল, 'অফিস থেকে বেরিয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে অনেক দিন পর দেখা, সে মদ খাইয়েছে।' এ কথা বলেও রেহাই নেই। বাবা প্রায়ই বলত, 'কেমন বন্ধু! কলকাতা শহরে দু'হাত অন্তর মিষ্টির দোকান, সে সন্দেশ রসগোল্লা দেখতে পায় না, মদ দেখতে পায়।' এর পর কখনও বড়দা অফিস থেকে একটু দেরি করে ফিরলে বাবা বলতেন, 'বউমা, দেখ আবার কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে কি না।'

বিভিনের বোন এক প্লেট পাঁপড় রেখে গেল। নানা রং-এর পাঁপড় দুশোর কাঁচা টাকার সাইজের। হঠাৎ দেখলে মনে হয় ছেলেপুলেদের কোন খেলার জিনিস।

তরুণের প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। সকাল থেকে এখনও পেটে কিছু পড়েনি। অন্তত খিদে মারার জন্য এক কাপ চা-ও না।

বিভিন অনেকদিন ধরে তরুণকে ওদের বাড়িতে আসার নেমন্তন্ন করেছে। এখন আর নিজের কথা বলছে না। হয়তো ক'দিন ধরে বলে যাচ্ছে, মামণি তাকে ডেকে বলেছে, কোনদিন বাবার কথা, আবার এর ফাঁকে ফাঁকে বোনেদের কথাও বলেছে। একদিন অবশ্য তরুণ জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোর মা, বাবা, বোনেরা আমাকে চিনল কি করে?' বিভিন বলেছিল 'একদিন আর দেখতে পাবি।'

সেদিন বিভিন একটা সুন্দর সোয়েটার পরে অফিসে গিয়েছিল। তরুণের এত পছন্দ হয়েছিল যে, না জিজ্ঞেস করে পারে নি। যদিও তরুণ এক মাসের মধ্যে কুড়ি দিন বিভিনকে কুড়িটা সোয়েটার পরতে দেখেছে। এত সুন্দর সুন্দর সোয়েটার কে করে দেয়। অন্তত একগোটা বোন থাকলে এক মাসে কুড়িটা সোয়েটার পরা যায়।

'তোর এ সোয়েটারটা কে করে দিয়েছে?' তরুণ বলল।

'আমার বোন।'

'বাঃ বেশ সুন্দর হয়েছে তো। রোজ একটা করে সোয়েটার পর।'

বিভিন হেসে বলল, 'সবগুলো আমার বোনেরা করে দিয়েছে।'

তরুণ ভাবছিল, যদি আমার একটা সোয়েটার কেউ করে দিত, তাহলে চির গোলাম হয়ে থাকতাম।

ছোট বোন একবার ধরল উল এনে দেওয়ার জন্য। পাশের বাড়িতে নতুন বউ এসেছে। ভাল উলের কাজ জানে। তার কাছ থেকে একটা নতুন ডিজাইন শিখে আসবে।

দু'তিন দিন উল নিয়ে বসল, বেশ খানিকটা করে ফেলল। হঠাৎ উল বোনা বন্ধ। কি ব্যাপার! নতুন বউ-এর সঙ্গে বাড়ির লোকের কি হল, বাসনের ব্যাপার, বউকে ধরে বেদম ঠেঙ্গানি দিল—বউ পালিয়ে গেল। তা পালালি পালালি, আর দু'চারটে দিন পর পালাতে পারতিস তো। কি এক সৃষ্টিছাড়া ডিজাইন নাকি; ছোট বোন অনেক জায়গায় চেষ্টা করল শেষ করার জন্য। চেষ্টা করেছে না কি করেছে ভগবান জানেন। ছোট বোনের কাজ থেকেই সোয়েটার বোনার ব্যাপারে একবার বাইরে বেরুনো। এ নিয়ে বাড়িতে আর এক অশান্তি। বাবা বলত বোনের উচ্ছন্নে যাওয়ার কারণ তরুণ।

এর মধ্যে বাড়িতে এল বউদি। বউদির সঙ্গে দাদার বিয়েটা ফিফটি ফিফটি ছিল। মানে ফিফটি প্রেম আর ফিফটি বড় সাইজের রসগোল্লা বাবাকে খাইয়েছিল আর অনেক সেলাইয়ের কাজ মাকে দেখিয়েছিল। মা বলেছেন, 'বউমাকে দিয়ে সোয়েটার বানিয়ে নে।' বউদিও বলল, 'আমাকে উল এনে দেবে, আমি সোয়েটার করে দেব।'

তরুণ আর মার খেতে রাজি নয়। ফিফটি পারসেন্টের ব্যাপার।

বউদি ক'দিন টেকে তরুণ দেখল, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে আরও দামী উল কিনে আনল। দু'তিন দিনের মধ্যেই সোয়েটারটা বেশ ডেভেলপ করে গেল, আর দু'চারটা দিন কোন রকমে কাটাতে পারলেই হাতটা চাপানো যাবে। কিন্তু বিসমিল্লায় গলদ। একদিন অফিস থেকে ফিরে দেখে বউদির সঙ্গে মার কিচকিচ। তরুণ মাকে সাপোর্ট করে বউদিকে দু'চার কথা শোনালো। ব্যাস, তারপর থেকেই উল বোনা বউদির বন্ধ। জিজ্ঞেস করলে বলে, সংসারের কাজ করে সময় করে উঠতে পারছে না। দুপুরে খেতেই নাকি বেলা গড়িয়ে যায়। এমনি করে দুটো শীত কেটে গেল। অত দামী উল, তরুণ অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আর শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারল না। বউদিকে বলতে একেবারে তেলেবেগুনে হয়ে উঠে বলল, 'দেখছ তো আমি কি ব্যস্ত, আমাকে দেওয়ার কি দরকার ছিল।'

তরুণের কপালে কুটনি লেখা আছে, নয়তো সেদিন এমন মাতব্বরিতে উঠতে উঠল কেন। ওটা তো আরও দু'চার দিন পর দেখাতে পারতো। জীবনে বড় হতে যে কত ধৈর্য দরকার, তরুণ কিছুই বুঝতে পারে না।

বেশ বড় সাইজের কাপে আর কাপ করে চা এলো। তরুণের প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। চা হাতে নিয়ে দু'একবার মুখে দিল। দামী চা। করেছেও ভাল, তা হলে কি হবে। খিদের পেটে শুধু চা।

বিভিনের মা বলল, 'এ কি বাবা পাঁপড় নিচ্ছ না।'

বড় প্লেটের পাঁপড় থেকে সকলেই দু'একটা করে চায়ের সঙ্গে মুখে দিচ্ছে। এই টাকা সাইজের একশটা খেলেও, কিছু হবে না তরুণের। খেলোয়াটা পার্টি, সকালবেলা চায়ের সঙ্গে মুড়ি কিংবা রুটি চাই। ছুটির দিন নয়তো একপেট কিছু সিদ্ধ দিয়ে ভাত। বিভিনের মা বলল, 'আমরা রবিবার সকালে পাঁপড় খাই। পাঁপড় একটা দারুণ জিনিস। আজকাল ফরেন একসপোর্ট হচ্ছে পাঁপড়। তুমি তো বিদেশে ছিলে ওখানে পাঁপড়ের কেমন আদর।'

তরুণ হেসে হালকা করে বলল, 'তেমন কিছু নয়।'

'সে কি, আমার এক বোন স্টেটস্‌-এ থাকে, ওকে মাঝে মাঝে পাঁপড় পাঠাতে হয়। ওখানে আমেরিকানরা পাঁপড় পেলে আর কিছু চায় না।'

পাঁপড়ের যে একশো আট রকম গুণ, তরুণের জানা ছিল না। তরুণ ভাবে পৃথিবীর আর সকলেই বোধ হয় রবিবার সকালে চায়ের সঙ্গে পাঁপড় খায়। আর আমেরিকানরা যখন পাঁপড় ছাড়া খেতে পারে না, আমাদেরও তাই হওয়া উচিত।

এই যদি তরুণের বাড়ি হতো, কেউ এলে চায়ের সঙ্গে কিছু মিষ্টি কিংবা মুড়ি দিত। তরুণ সিওর ওর মা-বোনেরা একসপোর্ট কাকে বলে জানে না। আমেরিকার পাঁপড় খায় শুনলে হেসেই অস্থির হবে। মা তো বলেই দেবে, পোড়ারমুখোরা পাঁপড় ছাড়া আর কিছু খাওয়ার পেল না। কেমন সাহেব যে পাঁপড় খায়। কবে শুনেছো যে, সাহেব ভাত খায়। আগেকার দিনের সাহেবরা কি সব ছিল, এখনকার সাহেবরা সব ভিখারী হয়ে গেছে।'

বিভিন বলল, 'চল একটু বাইরে ঘুরে আসি।'

তরুণ বেরুনোর জন্য উঠতে যাচ্ছিল।

বিভিনের মা বলল, 'কোথায় যাচ্ছ? আমার মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করলে না। ওরা ক'দিন ধরে তরুণদা তরুণদা করছে।'

তিন মেয়ে চায়ের কাপ হাতে সোফায় বসেছে। তরুণ চায়ে চুমুক দেওয়ার ফাঁকে ওদের লক্ষ করেছে। সুন্দর নিটোল স্বাস্থ্য, ফরসা দীর্ঘদেহী। তিনজনেরই শর্ট টাইটস্‌এর স্কার্ট পরনে। মাঝে মাঝে টেনে হাঁটুর কাছে আনছে।

বিতিনের মা বলল, 'আমার বড় মেয়ে সীতা কম্পারেটিভ লিটারেচার নিয়ে পড়েছে।'

তরুণ কৌতূহল বোধ করল। সীতা নাম। আজকালকার সীতার সঙ্গে রামায়ণের সীতার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় কি না। অনেক মিল আছে, দুঃখী করুণ, চোখের পাতা দুটো ভেজা ভেজা। হঠাৎ দেখলে মনে হবে একটু আগে বোধ হয় কাঁদছিল। রামের বিরহে কাতর ধরে নেওয়া যেতে পারে এবং আধুনিক সীতার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তরুণের মধ্যে সেকালের একটা ভাব যেন কোথায় লুকিয়ে আছে। এতো বড় মেয়ে ঠ্যাং ঠ্যাং করে পায়ের কতটা বার করে রেখেছে এ কেমন! আপার পোষাকটার সীতার সঙ্গে যথেষ্ট মিল থাকলেও লোয়ার পোষাকে একদম মার খেয়ে গেছে। ঠিক আছে কাম অন সেকেন্ড।

'আমার দ্বিতীয় মেয়ে রীতা আর ছোট মেয়ে মিতা। দুজনেই লেডী ব্রেবোর্নে পড়ে। আর দুষ্টুমি করে।' এই বলে বিতিনের মা থামল।

'তাই নাকি! কলেজে পড়? আমি তো ভাবছিলাম...।' তরুণ বলল।

'আপনি ভাবছিলেন আমি এখনও স্কুলে পড়ি? আমি রীতিমত গ্রোন আপ।' তারপর মার দিকে তাকিয়ে, 'আমি দুষ্টুমি করি?' মিতা বলল।

'না না মোটেই না। আমার তিন মেয়েই লক্ষ্মী। আজকালকার যা সব মেয়ে! তাদের তুলনায় হীরের টুকরো।' বিতিনের মা বলল।

বিতিনের মা মেয়েদের সামনাসামনি এমন প্রশংসা শুরু করল যেন বিয়ের কনে দেখতে পাত্র পক্ষের লোক এসেছে। হঠাৎ দুচার মিনিটের মধ্যে তাঁদের বুঝিয়ে দিতে হবে আজকালকার মেয়েদের যেমন দেখছেন, সেই চোখে আমার মেয়েদের বিচার করলে চলবে না।

'তরুণদা আপনি বিদেশ থেকে চলে এলেন কেন?' রীতা বলল।

'ওটা দেশ নয় বলে।' তরুণ বলল।

'উঁহু, এক কথায় বললে হবে না। কেন আপনার কি ওদেশ ভাল লাগেনি?'

'ভাল লাগবে না কেন। ভিসার মেয়াদ বাড়াল না।'

'শুনেছি ওদেশে বিয়ে করলে নাকি পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হওয়া যায়। আপনি সেভাবে চেষ্টা করলেন না কেন?'

'বিয়ে? ওদেশে বিয়ে করতে হলে প্রেম করতে হয়। আর চেষ্টাচরিত্র করে প্রেম করা পোষাল না।' এ সব কথা বিতিনের মার সামনে বলতে কেমন সঙ্কোচ বোধ করল তরুণ।

'দিদির পরীক্ষা হলে বিদেশে চলে যাবে।'

'কোথায়?'

'আমেরিকা।'

'যাঃ, কি বাজে বকছিস। আমার কিছুই ঠিক হয়নি।' সীতা বলল।

'আমার বোন আছে আমেরিকায়। ও গত বছর এসেছিল, দেশের অবস্থা দেখে গেছে। ওখানে ছেলে দেখছে। আর সীতাকে ও ভীষণ ভালবাসে, ওকে নিয়ে যাবেই।' বিতিনের মা বলল।

'ওঃ, বড় মেয়ে গেলেই হবে, আমরা যাব না বুঝি!' মিতা অভিমানের সুরে বলল।

'অস্থির হবার কি আছে। মাসীমা তো বলেছে একজন একজন করে তোদের তিনজনকেই নিয়ে যাবে। তারপর আমিও বেড়িয়ে আসবো।' বিতিনের মা বলল।

তরুণ মনে মনে বলল, বেশ ভাল লাইন ধরেছে। তরুণের তিন বোন। দু বোন বড়। দেখতে বাংলার ছয়, পাঁচ, সাত। বড় বোনকে বিয়ে দিতে বাবার দশ হাজার খসেছিল তখনকার দিনে। আর মেজ বিশ হাজারেও নামতে চায় না, যাওয়ার সময় ঘরের চালা অবধি খুলে নিয়ে যেতে চায়। অথচ তখন যদি এরকম প্রেমের চালাও বন্দোবস্ত থাকত, তাহলে বাবাকে বিয়ের দেনা শোধ করার চিন্তায় অকালে জবুথবু হতে হতো না। ছোট বোনের বিয়ের ব্যাপারে কিছুটা কিচাঙ হয়েছে। ছোট বোন কি করে একটা চাকরি জোগাড় করে ফেলেছিল। চাকরির জোরে ভালো ভালো পাত্র আসতে শুরু করল এবং তাদের চাহিদাও তেমন ছিল না। কিন্তু যত গোলমাল বাধাল বোন নিজেই। ওর বিয়েতে কোন কিছু শর্টকাট করার উপায় ছিল না। প্রথম থেকেই বলতে শুরু করল দিদি মেজদিদিকে বিয়েতে যা দিয়েছ, আমাকেও তাই দিতে হবে। এ নিয়ে অশান্তি চরমে উঠেছিল। এদের ক্ষেত্রে কি হতে পারে। দেশে ছেলে বিয়ে করতে আসবে, দাবি-দাওয়া কিছু থাকবে না। বিয়ে করে চলে যাবে। বড় জোর যাওয়ার সময় পাত্র যদি চালু হয় প্যাসেজ ভাড়াটা চাইতে পারে, বিয়েতে একটু বেশী খরচ হয়ে গেছে এই অজুহাতে। নয়তো মাল রেখে যেতে চাইবে, গিয়ে টিকিট পাঠিয়ে দেবে। বাবা তখন ধার দেনা করে রাতারাতি মেয়েকে পাঠিয়ে দিতে পারে তো ভাল, নয়তো ছেলে ওদেশে ল্যান্ড করেই পুরোন বান্ধবীদের দেখে বিয়ের কথা ভুলে যেতে কতক্ষণ। এই একটা রিসক্ আছে। আরও সামান্য কিছু রিসক্ আছে। ছেলে হয়তো নিজেকে ইঞ্জিনিয়ার বলে পরিচয় দিয়েছে মেয়ে ওদেশে গিয়ে দেখল স্ট্যাটাস নেই; ইঞ্জিনিয়ার-টিঞ্জিনিয়ার কিছু না, কারখানায় মেশিন মোছে। মেয়ে প্রথমটা খুব খচে যায়। তারপর দেশ থেকে বাবা মার চিঠি পেলে ভেবে দেখে, আমেরিকার মত স্বর্গরাজ্যে আসতে পেয়েছে বলে ফিফটি পারসেন্ট ক্ষমা করে আর বাকিটা ক্ষমা করে দশজনের বড় ছেলের মাথা দিলে বারে গিয়ে স্বামীর পাঁচটা বন্ধুর সঙ্গে নাচানাচি করতে পারে বলে।

বিতিন আবার ওঠার জন্য তাড়া দিল।

'ঠিক আছে মাসীমা আমরা একটু ঘুরে আসি।' তরুণ বলল। শীতের সকাল। সোনালী রোদ পুরো রাস্তা ফুটপাথটার ছড়িয়ে পড়েছে। ফুটে দুচার হাত অন্তর পাঁচ সাতজনের এক একটা গুচ্ছ দাঁড়িয়ে গাঁজাচ্ছে। কেউ একেবারে রাস্তার উপর চলে এসেছে, কেউ দোকানকে পেছনে রেখে কিলবী কায়দায় পা ফেলে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে কি বোঝাচ্ছে। রাস্তা, ফুটপাথ বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন এখানকার লোকেরা করপোরেশনের টাক্স দেয়।

বেশ কয়েক পা হেঁটে বিতিনের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলো। ফুটের অনেকটা জায়গা জুড়ে প্রায় দশ বারোজন ছেলে টেস্ট ম্যাচের আলোচনা করছে। প্রত্যেকেরই সুন্দর চেহারা। মানানসই সব জামাপ্যান্ট পরনে। যেন বিয়ের বরযাত্রী যাওয়ার জন্য কনেবোধে সবাই অপেক্ষা করছে।

একটা জিনিস দেখে তরুণ খুব অবাক হয়ে গেল। বিতিনের বন্ধুদের মধ্যে যে লোকেটার এপাড়ো যেন বিতিনও বিভিন্ন দিন পায়ে দিয়ে অফিসে গিয়েছে। ওর বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় আরও বিচিত্র লাগল। ওরা সবাই বড় বড় কোম্পানির কেউ ডিরেক্টর, ম্যানেজার সিনিয়র এক্সিকিউটিভ; এর নীচে কারো পজিশন নয়। বিতিন অবশেষে তরুণের পরিচয় দিল ওদের কোম্পানির ম্যানেজার। হায় আল্লা! ম্যানেজার! দশ বিশ বছর কাজ করলেও হবে কিনা বলা শক্ত। ভাল কাজ করতে পারলেই হবে না, ভাল তেল দিতে জানতে হবে। তরুণ যা বিতিনের কাজ হলো বাংলা কথায় মাল বেচার প্রতিনিধি। ভাল মাল বেচতে পারলে চাকরি থাকবে, নয় তো রাস্তা দেখ। এই চাকরিই পেতে হলো ভাল কাঠ খড় পোড়াতে। বারাত জার্মান ঘুরে এসেছিল, তার উপর টুপকি-চাপকি দিয়ে হয়ে গেছে। যে ম্যানেজার ইন্টারভিউ নিয়েছিল, সে একবার তিন বছরের জন্য জার্মান গিয়েছিল। তখন জায়গাটা তার খুব ভাল লেগেছিল, অনেক পরিকল্পনা করেও আর যেতে পারেনি। খুব মজা পেয়ে গেছে তরুণ। ভাগ্যিস বিদেশে যাওয়ার জন্য ভিসা আটকায়নি তা হলে তার দোষ নিয়ে নিত তরুণের উপর। নইলে এর আগে যে কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিয়েছিল তরুণ, সেখানে আশা করেছিল হয়ে যাবে। মাইনে প্রায় একই, কোম্পানির দিক দিয়ে সেটা আরও ভাল ছিল। কিন্তু গোলমাল তরুণের তিন ইঞ্চি জায়গায়; ইন্টারভিউর সময় ম্যানেজার খুব ইন্টারেস্ট দেখাল, কিন্তু সেই শুনল জার্মান ফেরত বাস, মাল কিচাঙ হয়ে গেল। তারপর এখানে। এখানকার ম্যানেজার ভালই বলতে হবে। বিদেশ থেকে যারা ঘুরে এসে এখানে চাকরি পায় না, তাদের জন্য তার একটা সফট কর্নার আছে। তা ছাড়া, ছেলেগুলো ভাবছে কি? যদি কখনও অফিসে আসে কেউ। না অফিসের কোন লোক এদের জানা শোনা বেরোয়। ছিঃ ছিঃ। যখন তরুণ আর বিতিন এসে দাঁড়াল, তখন এখানে গল্প চলছিল ক্রিকেটের উপর, এখন নিজে সুন্দরীতে চলে এলো, তাও বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না; গাড়ির মডেল, তারপর টাই, জামা, কাপড়, সিগারেট, কসমেটিকস, কোন দিশী জিনিসই ওদের আলোচনায় স্থান পেল না। সব কিছু গ্রাস করে আছে বিলেত আর আমেরিকা। মাঝে মাঝে বেশ কৌতুক বোধ করছিল তরুণ। ওর পাড়ার ছেলেরা এতো ওসব খবর রাখে না। যদি কেউ বিলেত বা আমেরিকা নিয়ে অত মাথা ঘামায় তার নাম হয়ে যাবে সাহেব। তরুণ আঠাশ বছরের জীবনে দু' বছর কাটিয়ে এসেছে জার্মানীতে, তাতেই ওর নাম হয়ে গেছে জার্মান। বাজারে গেলে মাছওয়ালা হাঁকে, 'এই যে জার্মানদা'।

বাড়িতে ফিরতে বিতিনের তিন বোন তরুণকে ছেঁকে ধরল।

'বেশ মজা, এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? চলুন মা ডেকে গেল।'

সীতা বলল। ওর সঙ্গে আর দুই বোন গলা মেলাল।

সীতা ভিতরে পা বাড়াতে বিতিনের মা অনুযোগের সুরে বলল, 'সেই কখন একটু চা খেয়েছ, আমি সকাল থেকে খাবার নিয়ে বসে আছি, তোমাদের দেখা নেই। বিতিনের বন্ধুদের সঙ্গে নিশ্চয়ই জমে ছিলে। নাও এখন খাবার খেয়ে নাও।'

তরুণ ঘড়ি দেখল। বারটা বাজে। কি বলবে ইতস্তত করছিল। ছুটির দিনে অবশ্য বেলা বারটা কিছুই না। বিতিনের বাবা পাশের ঘর থেকে হাঁকল।

'এতো বেলায় জলখাবার না দিয়ে একবারে খেতে বসে যাও।'

'আমাদের অবশ্য ছুটির দিনে এটাই খাওয়ার টাইম।' বিতিনের মা বলল।

'তা হলে আসুন আমরা সকলেই খেতে বসে যাই।'

'হ্যাঁ, আমিও ভাবছিলাম তাই বলি।' বিতিনের মা বলল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মাঝখান থেকে দেয়ালগুলো দেয়ালের দিকে করে মেঝের মাঝখানটায় ভাতের হাঁড়ি। ডাল তরকারি এক এক করে এল। ভাতের হাঁড়ির সাইজটা দেখে তরুণ ভাবল এগুলো বোধ হয় কেবলমাত্র ওর জন্যই এসেছে। এতো ছোট হাঁড়ি, একজনের ভাত কোনক্রমে হতে পারে। ছোটবেলায় বোনের পুতুলের বিয়েতে এমন হাঁড়িতে ভাত রান্না করে বরযাত্রীদের খাওয়াত। একটা প্লেটে চার আনা সাইজের খান কয়েক বেগুন ভাজা। বেশ আর্ট করে কাটা হয়েছে এবং বাজার থেকেও খুব হিসেব করে নিশ্চয়ই এনেছে। ছোট হাঁড়িটা দিয়ে ঝক-ঝক করছে স্টেনলেস স্টীলের কয়েকটা মানানসই বাটি। আইটেম অনেকগুলো হবে। সকলেই খাবারগুলোকে চারদিক দিয়ে গোল হয়ে বসল। সীতা, মিতা, রীতার স্কার্টগুলো এবার পাল্টে গেছে। একটু ঢলঢলে আকাশী রঙ, আরও শর্ট সাইজের, ওরা পা ছেড়ে বেশ সুন্দর করে বসল। সুন্দর শরীর থাকলে যা খুশি তাই করা যায়।

'আমি বাবা মেয়েদের বলেছি যে কদিন স্কার্ট পরা যায় পরবে। এর পর সারা জীবন রইল শাড়ি পরার জন্য।' বিতিনের মা বলল।

এই ডাগর ডাগর মেয়েরা স্কার্ট পরে বেশ দিব্যি চালাচ্ছে। এ যদি তরুণের বাড়ি হতো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যেত। মনে আছে, ছোট বোন ফ্রক থেকে শাড়িতে পা দিয়েছে, বাড়িতে ঠাকুমার চ্যাঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে। বাবাকে পাগল করে তুলেছে, 'এতো বড় মেয়ে লজ্জা শরম নেই। বংশের মান ইজ্জত সব গেল নাকি! ওর তাড়াতাড়ি বিয়ে দে।'

প্রত্যেকের সামনে একটা করে প্লেট রাখল। দুটো চামচ রাখা আছে যে যার মত নিয়ে নাও।

বিতিনের মা তরুণের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পেল্ট আগে নেবে।'

রীতা উঠে রেডিওগ্রামে কয়েকটা রেকর্ড চাপাতে লাগল।

'ইংরেজী গান দিস কিন্তু, তোদের ওই ন্যাকা বাংলা গান ভাল লাগে না।'

বিতিনের মা তরুণের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার বাবা খাওয়ার সময় একটু ইংরেজী গান হলে ভাল লাগে। তুমি খাওয়ার সময় গান বাজাও না?'

তরুণ এর কি জবাব দেবে! ওদের আবার খাওয়া! কোনক্রমে দুটো খেলা। যখন বেকার ছিল তখন দুবেলা রুটি চলত আর ভাতের থালায় এক মুঠো করে ছাই দিত। আর গান—সে তো বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টাই চলছে। দাদা আর বোনদের ছেলেমেয়ের হাট তো লেগেই আছে। ওদের নানা সুরের কান্নার কাছে ইংরেজী গান হার খেয়ে যাবে। রেডিওর বিবিধ ভারতীও মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায়। তরুণকে নেওয়ার জন্য আবার তাড়া দিল।

চায়ের চামচ দিয়ে কতবার ভাত নিতে হবে বুঝতে পারছিল না। যা খাবার এখানে সাজান আছে, পেট ভরে খেতে গেলে তরুণেরই হবে না। এটা বেলেঘাটা পার্টির সকালের জলখাবার। যদিও তরুণের জার্মান ঘুরে এসে খাওয়া কিছুটা কমে গেছে। এতোগুলো মানুষ এত সামান্য খাবার খেয়ে এত সুন্দর স্বাস্থ্য রাখে কি করে। এর মধ্যে তরুণের মধ্য প্রদেশে খিদের জ্বালা শুরু হয়েছে। এখনি কিছু ফেলতে হবে, নয়তো পুরোন রোগ দেখা দিতে পারে। তরুণ লজ্জার মাথা খেয়ে যা খাবার ছিল, তার অর্ধেকটা নিজের প্লেটে নিল, তারপর কোন দিকে না তাকিয়ে খেতে শুরু করল। ওদিকে বেশ আস্তে গান বেজে চলেছে। মাঝে মাঝে বাইরের ঘর থেকে বিতিনের বাবার কথা ভেসে আসছে। ভদ্রলোক সুর করে ইংরেজী কাগজ পড়ছেন। কি ভাবছে ওরা। তরুণ চলে গেলে বলবে রাক্ষস! তা ছাড়া আর কি-ই বা বলতে পারে। কিংবা সফিস্টিকেটেড লোকেরা যা বলে, 'আন-সোস্যাল।'

কয়েক মুহূর্ত এমন নিঃশব্দে গেল।

'মা, এ রোববারে আমার টার্ম ছিল, দেখিয়ে দিলাম, তোমার কিন্তু সামনের রোববারে।' মিতা বলল।

'আমাকে কয়েকটা রোববার রেহাই দাও, আমার বিস্তর খসে গেছে।' বিতিনের মা বলল।

কি ওদের কথা হচ্ছে তরুণ বুঝতে পারল না।

'কি ব্যাপার বলো তো!' তরুণ মিতাকে উদ্দেশ্য করে বলল।

'মানে প্রত্যেক রোববারে আমাদের এক এক করে টার্ম থাকে, সিনেমার টিকিট কাটার। এ রোববারে আমি টিকিট কেটেছি। গত রোববারে রীতার টার্ম ছিল।'

'তুমি কজনের টিকিট কেটেছো!'

'সকলের।'

'কোথাকার টিকিট?'

'গ্লোব।'

'সে তো অনেক টাকার ব্যাপার। তুমি টিউশনি কর?'

'না। আমার হাতখরচের টাকা থেকে।'

বাবা, কলেজে পড়ে এদের আবার হাত খরচের ব্যাপারও আছে। আমাদের বাড়িতে মেয়েদের হাত খরচের কোন বালাই নেই। মেয়েছেলের আবার হাত খরচ কি? গ্লোব সিনেমার টিকিট কেটে এনেছে আমাদের বাড়ির মেয়েরা ভাবতেই পারে না। ভূগোল পড়ে বড়জোর জেনেছে গ্লোব মানে পৃথিবী। এর পর যদি গ্লোব সিনেমা শোনে জট বেঁধে যাবে, ভাববে দুটো পৃথিবী কোত্থেকে এল।

'দাদাভাই বাদ। এয়ার কণ্ডিশন সিনেমা দাদাভাইর সহ্য হয় না। ওতে গেলেই জ্বর এসে যাবে।'

'আমারও এয়ার কণ্ডিশন সহ্য হয় না।' তরুণ বলল।

'উঃ, ও বললে চলবে না, টিকিট কেটেছি।' মিতা বলল।

'বইটা ভাল। ঠিক আছে আমি যেতে পারি, আজকের টার্ম আমার।' তরুণ বলল। ওরা তিন বোন আর মা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

'বলো রাজি কিনা?' তরুণ আবার জোর দিয়ে বলল।

বিতিনের মা ব্যাপারটা সহজ করে দিল।

'তরুণ ভাল চাকরি করে ও তোদের সিনেমা দেখাবে সে তো খুব আনন্দের।

'ঠিক আছে তা-ই হবে।' মিতা অভিমানের সুরে বলল।

বাইরের ঘর থেকে 'বিতিন' বলে ডাক ভেসে এল। বেশ সুরেলা কণ্ঠস্বর। একসঙ্গে দুই তিনজনের গলা।

বিতিনের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, উঠবো উঠবো করছিল, বলল, 'এই রে, সর্বনাশ ওরা এসেছে।' বিতিন তরুণের দিকে তাকিয়ে ইশারায় বলল, 'আমার বন্ধুরা।' আবার ওরা সুন্দর করে বিতিনকে ডাকল। ডাকার মধ্যে একটা মেয়েলি ভাব লক্ষ করলো তরুণ। আর বিতিন নামটা বেশ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করলো।

বলতে বলতে বিতিনের বন্ধুরা ঘরে ঢুকল। ওরা তিনজন। বেশ চকচক করছে মুখ চোখ। কি ব্যাপার, তরুণ ভালোভাবে লক্ষ করল স্নো পাউডার ভাল-ভাবে মুখে ঘষেছে। ঠোঁটগুলো অত লাল কেন? লিপস্টিকও লাগিয়েছে নাকি! শুনেছি এখানে ওসব চলে। তা ভালই, বেটাছেলের মেয়ে সাজতে সাধ হয়েছে।

এরা বন্ধুবান্ধবকে কত [illegible] ডাকে। ডাকার মধ্যে একটা মেয়েলী নেকাপনা আছে। আর তরুণ [illegible] বাইরে থেকে ডাকবে তরা তরা, ডাবে তরো। তাও আবার সব [illegible] না, তাড়ি হয়ে যায়। ছোটবেলায় একবার বন্ধুরা রেগে তাড়ি তাড়ি বলে চিৎকার করেছিল। ঠাকুমা চোখে দেখতে পেত না। কি করে তাড়ি কথাটা তাঁর কানে গিয়েছিল। সন্ধ্যাবেলায় অশান্তি করে তুলল, শেষকালে বাবার কাছে জোড়াসো বেতের লাঠির বাড়ি খেতে হল। তখন বেলেঘাটার তাল গাছের ছড়াছড়ি ছিল। কাজেই তাড়ি খাওয়াটা খুব অস্বাভাবিক ছিল না।

ঠাকুমা যদ্দিন বেঁচে ছিলেন বলতেন, 'তোর বাবা যে অকম্মা [illegible] নেশাভাঙ দিয়ে কেউ নাম রাখে?'

বড় অনাসৃষ্টি। তরুণ মজা করে ঠাকুমাকে বলত, 'আমার নাম তাড়ি নয় তরুণ।'

'ওই হল, তাড়ি আর তরুণ একই।'

এখনও পাড়ায় বন্ধুরা তাড়ি বলেই ডাকে। তরুণ তিন ছেলের বাবা হয়ে গেলেও ও নাম ঘুচবে না। ওদের বন্ধু জগা, আসল নাম জগদু। এখন জগদু নাম কেউ জানে না, সবাই জগা বলেই ডাকে।

ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছে বুদ্ধকন্যা সেও এসে জগার খোঁজ করে, পাড়ার নতুন জামাই এসেছে, সেও বলে জগাদার মত লোক হয় না।

বিতিন প্যান্ট শার্ট পাল্টাতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল, কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় পাঁচ সাত মিনিট কাটিয়ে দিল চুল আর মুখের বিন্যাস করতে। কি সব মাখল-টাখল মুখে। এদের সব ব্যাপারে খুব যত্ন আছে। বাড়ির লোকও কিছু বলে না। আর তরুণদের বাড়িতে আয়নার সামনে একবারের বেশী দুবার দাঁড়ালে বা একটু সময় নিলে আওয়াজ শুরু হয়ে যাবে। এরা হাত দিয়ে চুলটা কত রকম কি করছে। তরুণ যদি চুলটা একটু হাত দিয়ে ফুলিয়ে দেয়, তা হলে বলবে মাথায় সিঙ্গাড়া বানিয়েছে। রাস্তায় বেরুলে কেউ হয়তো সিঙ্গাড়া বলে ডাকবে, এর পর থেকে সিঙ্গাড়া নাম চালু হয়ে যাবে। পাড়ায় তরুণদের পরের ব্যাচের ছেলেরা পুজোর চাঁদা নিতে এসে হয়তো বাইরে থেকে ডাকবে 'সিঙ্গাড়াদা'। কোন মেয়ের সঙ্গে একটু আলাপ থাকে বা কেউ কথা বলতে দেখে বা একটু হেসে হেসে ভাব লক্ষ করে, তা হলে তার হয়ে গেল। মেয়ের বাড়ির সামনে দেয়ালে দুটো নাম বড় করে পাশাপাশি লিখে মাঝখানে প্লাস চিহ্ন দিয়ে দেবে, তাতেও শান্তি হবে না, টেলিফোনে বলবে, 'তাড়ি কথা বলছি' বা বেনামী প্রেমপত্র দেবে যা-তা লিখে মেয়ের অভিভাবক বাবার নামে। এর পর কোন মেয়ে প্রেম করার জন্য আর থাকে না। অটোমেটিক কেটে যায়।

তরুণের ওরকম একটা ব্যাপার সামান্য ছিল। ভেবেছিল জার্মান ঘুরে এলে রিজাইন্ড করবে। কে জানে বেনামী চিঠিতে হয়তো লিখে দিয়েছে তাড়ি জার্মান গিয়ে মেশিন মোছার কাজ করে। বেলেঘাটার মেয়েরা আর যাই করুক জার্মানীতে যে মেশিন মুছেছে, তার সঙ্গে প্রেম করবে না। তার সঙ্গে তরুণের একদিন দেখা হয়েছিল, ওরে বাবা তরুণ যদি উত্তর মেরুতে যায়, সে যায় দক্ষিণ মেরুতে বাস করে। এখানে ওসবের বালাই নেই যে যার খাপ্পায় আছে।

বিতিনের খুব তাড়াতাড়ি ছিল, তরুণের সঙ্গে আর কোন কথা হল না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল, 'আমি গড়িয়াহাটের মোড়ে বাটার দোকানের সামনে থাকবো, সিনেমা দেখে চলে আসবে।'

বিতিনের বোনরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে তৈরী হয়ে নিল। এই যদি তরুণের বাড়ি হতো হই চই পড়ে যেত। আয়না পাওয়া যাচ্ছে না, পাউডারের কৌটোয় ছেলেপেলেরা কখন জল ঢেলে রেখে দিয়েছে। আর স্নো! বড় পিসীমা তো একবার কলগেট টুথপেস্টই মুখে মেখে সিনেমায় গিয়েছিল। আর বেলেঘাটার সিনেমা! বৃষ্টি হলে উপর থেকে জল পড়ে। ছাতা মাথায় চটি হাতে বসতে হয়। একটু বৃষ্টিতেই মেঝেতে হাঁটু জল দাঁড়িয়ে যায়। তখন লম্বা লম্বা বাঁশ ফেলে সাঁকোর মত করে নিজের সীটে যেতে হয়।

রীতা আর মিতা স্ট্রাপ দেওয়া এক রঙের স্কার্ট পরেছে। আর বিতিনের দুটো শার্ট পরেছে দুজনে। বিতিনের মা আর সীতা পরেছে শাড়ি কেমন বাঁধ রং-এর ফিনফিনে পাতলা। তরুণ শুনেছে, ঢাকাই মসলিন একটা আংটির ভিতর দিয়ে চলে যায় বা একটা দেশলাই-এর মধ্যে শাড়িটা পুরে রাখা যায়। এই শাড়িটা বোধ হয় আলপ্রাণনের আংটি দিয়ে পাস করে যাবে কিংবা একটা হোমিওপ্যাথির শিশিতে ভরে রাখা যাবে। ঢাকাই মসলিন যারা তৈরী করতো, তাঁদেরই ইভলিউশনে যে বংশধর বর্তমান বোধ হয় তারা এ শাড়ি দুটো করেছে। দুজনেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধনের শেষ টানটুকু দিয়ে নিচ্ছে।

বিতিনের মা আয়নায় চোখ টিপে তরুণকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'দেখ কি, কি, আমাদের দু জনকে দু বোন বলে ভুল হয় না?' তরুণ তাকাল।

নাক, চোখ, মুখ, গায়ের রঙ, লম্বা সবই এক। খুব লক্ষ করলে বোঝা যায় বিতিনের মা একটু ভারি সীতার তুলনায়। তরুণের চোখ কিছু করুক ও চায় না। তরুণ আর কোন কিছু পেল না বলল, 'হাঁ।'

'জানো, এবার পুজোয় ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলাম। সীতার বন্ধুরা আমাকে সকলেই ওর ছোটবোন বলে ভুল করেছে। আমি কত যত্ন করে শরীরটা রেখে দিয়েছি। মেয়েদের ওসবের বালাই নেই। ওরা ভাবে এমনি সব হয়।' তরুণ বাড়ি দেখছিল। সময় বড় কম। ঘরের জানলা সব কটাই বন্ধ, হাওয়া আসার কোন রাস্তা নেই। তবুও হাওয়া সব সময় অদৃশ্য। ঠিক এক স্কোয়ার মিটার পরিমাণ হাওয়া কোন দিক দিয়ে যেন আসে এবং মা ও মেয়ের আঁচলটা বার বার ফেলে দেয়।

তরুণ তাড়া দিল, 'এর পরে গেলে বই শুরু হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা বাবা আচ্ছা। তুমি বড় তাগাদা দিচ্ছ, আমার হয়ে গেছে। তোমরা নিচে গিয়ে ট্যাক্সি ধর আমি আসছি।'

ফুটপাথ ঘেঁষে এক ঝাঁক ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। সাউথ। এখানে ট্যাক্সির প্রাচুর্য বড় বেশী। বেলেঘাটা থেকে আসার সময় ট্যাক্সি পাওয়া যায়। ট্যাক্সি-ওয়ালার ভাবখানা এই রকম যেন নরক থেকে মুক্তি চাচ্ছে আর যদি বেলেঘাটার যেতে চাও তো হয়ে গেল। বেলেঘাটা শুনলেই ট্যাক্সিওয়ালার দু পায়ে বল আসে। তখন কারো গাড়ি খারাপ হয়ে যাবে। কারো চায়ের এমন নেশা চেপেছে যে পথ

ক্ষণে ক্ষণে প্রতি ক্ষণে খাবার বিস্কুট

ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট

যেমন হাল্কা তেমনি সহজপাচ্য

দেখতে পারছে না। আবার কেউ স্পষ্টই বলে দেবে, সাউথের গাড়ি মানে ওদিকে তুলে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

ট্যাক্সিতে ওঠার সময় বিতিনের মা বলল, 'মিতা তুমি সামনে বস। তরুণা আমাদের সঙ্গে বসবে।'

তরুণা ট্যাক্সিতে ওঠার সময় লক্ষ করল ফুটপাতের এদিক ওদিক অনেকগুলো চোখ ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। তরুণা কাকে হাফসোল দিয়ে যাচ্ছে কে জানে। বেলেঘাটার যদি বেপাড়া থেকে এসে এমনভাবে কেউ মাল এক্সপোর্ট করে, তা হলে চব্বিশ ঘণ্টা পেরোতে পারবে না, বাড়ির সামনে পেটো পড়বেই। পাড়ার ছেলেরা এই অপমান কিছুতেই সহ্য করবে না।

ট্যাক্সি ছেড়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় রীতা আর মিতা তরুণার দুই দিক দিয়ে দুটো হাত জড়িয়ে এমন করে পার হল, যেন পাঁচ সাত বছরের বড়লোক আদুরে মেয়ের মত।

বই দেখতে বসে আর এক বিপদ। ওরা তিন বোন আর মা ইংরেজী বই-এর আলোচনা শুরু করল। কোন নায়ক কাকে বিয়ে করেছে, কোন নায়িকা কাকে ছেড়ে দিয়েছে। কার বক্স অফিস এখন টপ-এ। তরুণা যে এসব আলোচনায় একেবারে যোগ দিতে পারে না তা নয়। কিন্তু আশেপাশের লোক তো টিকিট কেটে ঢুকেছে, তারা কি অপরাধ করেছে! বইটাও খুব ভাল লাগছিল না। তার উপর এরা ইংরেজী বই-এর এক একজন এনসাইক্লোপিডিয়া। বেলেঘাটার মেয়েদের দৌড় বাংলা বড় জোর হিন্দী বই অবধি। বই ভাঙতে বিতিনের মা বলল, 'আমার বড্ড মাথা ধরেছে, একটু চা না হলে চলবে না।'

বিতিন হাতের সামনে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকতে যাচ্ছিল, রীতা আর মিতা বাধা দিয়ে বলল, 'উঃ তরুণদা একটা চাইনিজ-এ চলুন।'

'তোমাদের চাইনিজ খুব ফেবারিট বুঝি?'

'দারুণ।' মিতা বলল।

বেশ কতকটা রাস্তা হেঁটে গিয়ে চাইনিজ রেস্তোরাঁ পাওয়া গেল। তরুণ স্বস্তি বোধ করছিল, হলে এতক্ষণ একটা গুমোট আবহাওয়া থেকে বাইরে বেশ ঠাণ্ডায়।

সন্ধ্যাবেলা। রেস্তোরাঁয় বেশ ভিড়। কোথাও জায়গা নেই। ওরা বেয়ারা ডেকে কি যেন বলল, তারপর তরুণার দিকে চোখ টিপল, বোঝা গেল কোন কৌশল করেছে। সত্যি বেয়ারা দুতিনজনকে কি উপায়ে তুলে কোণার দিকটায় পাঁচজনের জায়গা করে দিল।

বিতিনের মা বলল, 'তোমরা খাও, আগে আমাকে একটু গলাটা ভেজাতে দাও।'

মেনু দেখে রীতা আর মিতা বেশ চটপট অর্ডার দিয়ে ফেলল। ওদের মধ্যে সীতা একটু কম কথা বলে, ও কোন অর্ডার দিল না। ততক্ষণে বিতিনের মার জন্য এক কাপ চা টেবিলে এসে গেছে। তরুণার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, এখানে এক কাপ চা খেয়ে বাইরে গিয়ে কিছু খাওয়া যেতে পারে। এখানে যা গলাকাটা দাম। তা ছাড়া, চাইনিজ প্রিপারেশনে তরুণার চলে না। বেয়ারাকে এক কাপ চা দিতে দেখে তরুণা আর এক কাপ চা ওর জন্য আনতে বলল।

'এ কি, তুমি শুধু চা খাবে নাকি?' বিতিনের মা বলল।

'আমার জন্য ভাবতে হবে না, আমি ঠিক খেয়ে নেব। কিন্তু সীতা কিছু অর্ডার দিল না।' তরুণা বলল।

'ওর কথা আর বলো না। ও একদম খেতে চায় না। আমি বলছিলাম না, মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষ্মীমন্ত ও।' বিতিনের মা বলল।

'কিন্তু এক যাত্রায় পৃথক ফল।' তরুণা বলল।

'তা তুমি বলো। তুমি বললে যদি খায়।' বিতিনের মা বলল।

'মা বড্ড......।' সীতা বলল।

তরুণার বেলেঘাটা পার্টি অনেক চ্যামনামি জানে।

'কেন তোমার কি আমাদের ভাল লাগছে না?'

তরুণার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল, আমার দুর্ভাগ্য আমি প্রায় পুরোপুরি ভারতীয়। ভগবানকে রিকোয়েস্ট করবো সামনের জন্মে যেন আমেরিকায় ল্যাণ্ড করান।

'না না ওসব কিছু নয়।' সীতা বলল।

'তা হলে কি? হাতি না ঘোড়া। সেই কখন চায়ের চামচ করে তুলে ক' চামচ ভাত খেয়েছো। এত বড় বডি ওটুকু খাওয়াতে চলে। এখনও খিদে পায়নি! ন্যাকামির জায়গা পাও না! মেয়েছেলেরা এক একটা ন্যাকামির পাহাড়।'

'ঠিক আছে "অন ইওর রিকোয়েস্ট" একটা ছোট্ট আইসক্রীম দিতে বলুন।' সীতা বলল।

'বাব্বা, দিদি অর্ডার দিচ্ছে। সকালে সূর্য উঠেছিল তো।' মিতা বলল।

'আইসক্রীম খাবি কেন? তুই চিংড়ি মাছ ভালবাসিস তাই নে। আমি শেয়ার করবো। জানো চিংড়ি মাছ আমার আর সীতার খুব ফেবারিট।' বিতিনের মা বলল।

সীতা মৃদু আপত্তি তুলল।

তরুণ সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারাকে ডেকে মেনুটা নিল। চিংড়ির পাশে দামটা দেখে ট্যাক্সিওয়ালার মত অবস্থা হল; বেলেঘাটা যাওয়ার কথা শুনলে ওদের যেমন দুই হাঁটুতে কম্প বাজে সেরকম তরুণার দু হাঁটুতে কম্প বাজতে শুরু করল।

'বাজারে চিংড়ি মাছ পঞ্চাশ টাকা কিলো।' বিতিনের মা বলল।

ওরা কত সুন্দর অর্ডার দেয়। বাজারে কোনটার কি দাম সব খবর রাখে। বেলেঘাটার কোন পার্টি যদি হত, রেস্তোরাঁতে ঢুকে বলবে হয় ভেজিটেবিল চপ নয় মাটন কাটলেট। এই দুটো জিনিস খুব চলে। কেঁচোর মত একগাদা চাউমিন খাওয়াতেই পারবে না, যদি ইনফ্লুয়েন্সে অতখানি বাড়ি এসে বমি করবে, পাড়ার লোকে জানবে কি সব যা তা খেয়ে এসেছে। তাতেও শান্তি হবে না, ছেলে অগ দি ফ্যামিলির কাছে বকুনি খেতে হবে।

খাবার সাজিয়ে টেবিলটা প্রায় ভরে ফেলল। জলের গ্লাস রাখার জায়গা হয় না। বিতিনের মা প্রায় সকলের প্লেট থেকেই চাখতে শুরু করল। বেশী খেল চিংড়ি। আশ্চর্য এর যে কোন একটা প্লেট শেষ করতে তরুণার বেশ খেতে
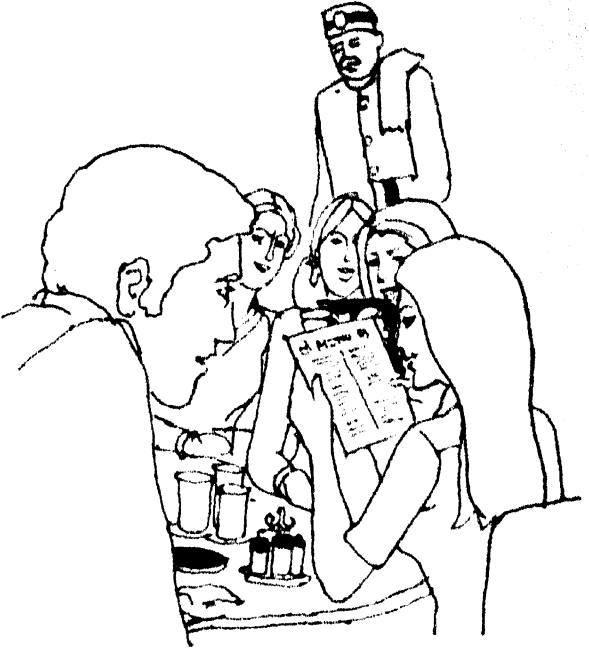
হবে। অথচ এরাই বাড়িতে যখন খাচ্ছিল, তখন মনে হচ্ছিল না কেউ খেতে পারে।

দুএকবার রীতা মিতা অবশ্য বলল, 'উঃ তরুণদা, আপনি কিছু না খেলে আমাদের খেতে বড় খারাপ লাগছে।' অবশ্য ওদের খারাপ লাগার কোন লক্ষণ বোঝা গেল না। নির্বিঘ্নে প্লেট শেষ করে ফেলল।

তরুণ বিল মিটিয়ে উঠে দাঁড়াল। তিন মেয়ে আর মা কথায় ব্যস্ত। কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরুতে পারলে তরুণ বাঁচে। দুটো বেয়ারা পাহারা করে এমনভাবে মা আর মেয়েদের দেখছে। আর বেয়ারাকে দোষ দিয়েই লাভ কি। তরুণার উলঙ্গ রাজার গল্প মনে পড়ল। রাজার অবশিষ্ট কিছু বোধ ছিল, বাচ্চা ছেলে কোন পাপ করেনি, ও যখন বলছে তা হলে ঠিক বলছে।' এদের সে বোধটুকু ভগবান অবশিষ্ট রাখেনি। এই সাজ যদি কেউ তার উদারতায় উলঙ্গ না বলে ভাল। বিতিনের মা জায়গা ছেড়ে উঠে আসার সময় রীতা আর মিতাকে কাঁধাল চাপা সুরে কি যেন বলল। ওরা দুজনেই কিছু কামড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাধ্য হয়ে তরুণ জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার?'

কেউ কোন কথা বললো না।

কি হল রে বাবা। পাশের টেবিল থেকে কিছু রিমার্ক পাস করেছে নাকি? শত হলেও তরুণ বেলেঘাটার পার্টি। মেয়েছেলেকে আওয়াজ দিতে দেখলে শরীরের রক্ত টগবগ করে ওঠে। তরুণ যুদ্ধের আশঙ্কা করে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে পড়ল। কিভাবে মিচুং চালাবে।

বিতিনের মা বলল, 'মেয়েদের কাণ্ডজ্ঞান দেখলে তো! আর ক'দিন পরে স্বামীর ঘর করতে যাবে!'

বিতিন কিছুই বুঝতে পারল না, কি ব্যাপার। একটু আগে তো হীরের চেয়েও দামী ছিল সব মেয়েরা। এখন আবার কি হল। বিতিনের মা মেয়েদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'নিজেরা তো কত কিছু গিললে, বাড়িতে বুড়োটা আছে তার জন্য কিছু নেওয়ার কথা মনে হল না একবার।'

'বাপির জন্য কিছু নিয়ে নি।' মিতা কাঁচুমাচু করে বলল।

'তোমাদের মত এসব কেঁচো-কেঁচো উনি খাবেন না।' বিতিনের মা বলল।

তরুণার মনে হল ওর কিছু বলা দরকার।

'হ্যাঁ, মেসোমশাইয়ের জন্য কিছু নিয়ে নিন।' তরুণা বলল।

'বাপির জন্য মোগলাই ডিস নিয়ে নি।' মিতা বলল।

বিতিনের মা তরুণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'দেখ না লোকটা একা বাড়িতে পড়ে আছে। নিজেরা সব সিনেমা দেখতে বেরিয়েছে...'

তরুণ এক প্লেট মোগলাই ডিস সুন্দর করে প্যাকেট করে দিতে বলল।

গাঁজা, এদের মাঝে কর্তাব্যক্তি। বেলোবাগা যাব হয়, বাড়িতে জানতেই পারে না সিনেমায় যাচ্ছে। আর যদি ধর্মের ষাঁড়টাই হয় তবে প্রকাশ্যে বলে করে যেতে পারো, তবে রেস্তোরাঁর চপ কাটলেট নিয়ে বাড়িতে ঢুকলে রক্ষে নেই, বৌদিরা বিদায় করে দেবে। আর সিনেমার গল্প: বড় জোর ঠিকে ঝি-এর সঙ্গে ব কর্তারা অফিসে বেরিয়ে গেলে দুপুরবেলা পাশের বাড়ির বউ-এর সঙ্গে আলোচনা দিয়ে করতে পারে।

তরুণ নাম মিটিয়ে রাস্তায় নামল।

এখন সন্ধ্যাবেলা ট্যাক্সি পাওয়া খুব কষ্টকর। হঠাৎ সামনে একটা ট্যাক্সি খালি হচ্ছে, রীতা আর মিতা দৌড়ে গিয়ে ওতে উঠে বসল। সত্যি স্মার্ট মেয়ে এ যদি ওর বাড়ির মেয়েরা হত? ট্যাক্সি কোথায় খালি হচ্ছে, এত নজর কোথায়! সামনে দিয়ে হাতী হেঁটে গেলেও দেখতে পায় না। শো-কেসের শাড়ি আর লোকজন দেখতে গিয়ে কতবার গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে।

এবার আর বলতে হল না, মিতা আগে থেকেই সামনের সীটে বসেছে।

'আমি আর যাবো না, আপনারা যান।' তরুণ বলল।

বিতিনের মা বোনেরা সকলেই যেন আকাশ থেকে পড়ল। একযোগে বলে উঠল, 'সে কি?'

'তা কি হয়। বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম করে চা খেয়ে তারপর যাবে।' বিতিনের মা বলল।

তরুণের কোন আপত্তিই ধোপে টিকল না। গাড়িতে উঠল তরুণ। গাড়ি চৌরঙ্গী রোড থেকে পার্ক স্ট্রীটে পড়ল। এমন সময় মিতা বলে উঠল, 'মা, সানি কাকা।'

'তুই ক্ষেপেছিস, সানিকাকা এখন জাপানে।' বিতিনের মা বলল।

তরুণের বুকের ভেতর বেলুন ফাটার শব্দ হল। ওদের জি এম-এর নাম সানি সেন। লম্বা প্রায় ৬ ফুট, টান টান হয়ে হাঁটে। শরীরে একটুও বাড়তি মাংস নেই, গায়ের রংও তেমনি ধবধব করছে ফরসা। সে এখন জাপানে। সে তো ভীষণ বাজে লোক। কলকাতার কাছে তার দুটো [illegible]গান-বাড়ি আছে ফুর্তি করার জন্য। কিছুদিন আগে তার বউ আগুনে পুড়ে [illegible]হত্যা করেছে। ছেলে-মেয়েরা সব বড় বড়। বাবার মুখদর্শন করে না। [illegible]সে তার ভীষণ বদনাম। সে নয়তো আবার!

'গাড়ির নম্বরটা আমি ভুল দেখেছি তুমি বল[illegible]ও?' মিতা গাড়ির নম্বর বলল। গাড়ির নম্বরও মিলে যাচ্ছে।

'সানি সেনের কথা বলছেন?' তরুণ বলল।

'হ্যাঁ, তোমাদের জি এম।'

'আপনারা ও'কে চেনেন?'

'আমি আমার ভীষণ বন্ধু। ও আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসে। আমি ওর [illegible] বাগানবাড়িতে অনেকবার গেছি। বিতিনের চাকরিটা তো ও-ই করে দিয়েছে।'

বিতিনকে নিয়ে অফিসে অনেকে হাসাহাসি করে। তরুণ কোন গুরুত্ব দেয়নি। লোকের ও অভ্যাস আছে। পরের নিন্দে করে বেড়ানো। অফিসের লোকেরা বলে সানি সেন সাংঘাতিক লম্পট। শালা গায়েরও খায় তলারও কুড়োয়। নানারকম বদমায়েশি করে কোম্পানির অবস্থাও খারাপ করে দিয়েছে।

'ক'দিন আগে সানির বউটা মারা গেল। সী ওয়াজ ক্রেজি।' বিতিনের মা বলল। তরুণ কেমন যেন পাথরের মত হয়ে গেল। কেমন একটা অপরাধবোধ ওকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলল। কোনদিকে তাকাতে পারল না। হুট করে 'আঃ' বলে একটা শব্দ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল তরুণের।

'তুমি দুঃখবে, বাইরে থেকে ঘুরে এসেছ, পৃথিবী কত এগিয়ে গেছে। এসব আজকাল সিম্পল ব্যাপার। এত সব বস্তাপচা ভাবনা নিয়ে চলে না। সানির স্ত্রীকে বরাবরই দেখেছি একটু হিস্টেরিক ইয়ে...।'

ট্যাক্সির মিটার দেখে তরুণ ভাড়া দিয়েছিল। নেমেই সুযোগ খুঁজছিল কি টেকনিকে বলে কেটে পড়বে। মনে মনে দু'একবার রিহার্সালও দিয়ে নিল। তারপর কপালটা যথাসম্ভব কুঁচকে বললো, 'মাসিমা, আমার একদম মনেই ছিল না। সাড়ে সাতটার সময় এক ভদ্রলোক আমার কাছে আসবেন। খুবই দরকার আছে।'

'বাড়ির লোকেরা ঠিকই বসিয়ে রাখবে।'

'তাড়াতাড়িতে বেরুনোর সময় বাড়িতে বলে আসা হয়নি।'

'তা হলে চা?'

'তা আর একদিন খাওয়া যাবে।'

'তাই হবে। আবার কবে আসছো? এবার তো চিনে গেলে, যখন খুশি চলে আসবে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

মাসিমা মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তরুণকে বলো আবার আসতে।' রীতা আর মিতা এগিয়ে এলো।

'সত্যি তরুণদা আপনি যাবেন-ই।'

তরুণ মাথা নাড়ল।

'ওর দরকার আছে ওকে ছেড়ে দে।' বিতিনের মা বলল।

'ঠিক আছে, আজ ছেড়ে দিচ্ছি। শীগ্‌গীরই একদিন আসা চাই কিন্তু', মিতা বলল।

তরুণ রাস্তা পার হয়ে এদিকে এলো। ট্যাক্সি এখন অনেক দূরে। বাস ও মিনিবাস [illegible] ক্লাসে বন্ধুর বাড়ি। তারপর তো রাইটাই একারো নম্বর। মনে মনে নিজেকে বলল, শালা, এবার হাতে হ্যারিকেন নিয়ে ফেরো।

সাহিত্য

সাহিত্য '৭৭

বৃহত্তর পাঠকসমাজের স্বীকৃতির মধ্যেই লেখক বা কবি পান তাঁর পরম পুরস্কার। প্রাতিষ্ঠানিক পুরস্কার এই জনস্বীকৃতিতেই নতুন রঙ্গীন দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় গুণী লেখক বা শিল্পীর কপালে কোন বরমালা বা শিরোপাই জুটল না। অনাদৃত অবহেলিত হয়ে তিনি দিনযাপন করলেন এবং নানা দুঃখকষ্টের মধ্যেও সৃষ্টি করলেন এমন অমোঘ কিছু রচনা যার মূল্য কালের দরবারে স্বীকৃত হল। ইহজীবনে তিনি পেলেন না কোন লোভনীয় পুরস্কার তিনিই আবার পুরস্কৃতদের সব কৃতিত্বকে ম্লান করে অমর হয়ে রইলেন কালের খাতায়। সৃষ্টির ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্ত অনেক। প্রসঙ্গত প্রবাদপ্রতিম

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (ইন্দ্রজিৎ)

একটি ইংরেজী উক্তির কথা মনে পড়ে, বাংলা তর্জমায় যার অর্থ—কবি ও শিল্পীদের সমাদর মৃত্যুর পরে। বাঙ্গ ও বিদ্রুপের ভিতরে এই উক্তির মধ্যে লুকিয়ে আছে এক করুণ রসের আভাস। অর্থাৎ কবি বা লেখককে জীবদ্দশায় কেউ তাঁকে বুঝতে পারেন না। তিনি মারা যাবার পর তাঁর কাজ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ আগ্রহী হন।

কিন্তু অনাগ্রহ বা অনাদরই শেষ কথা নয়, নয় সত্যের একমাত্র প্রতিভাস। আজকাল লেখক, কবি বা শিল্পীদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আগ্রহ ও সশ্রদ্ধ কৌতূহল অনেক বেড়েছে। তাই কবি ও লেখকদের পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি। শিল্পীর দর্শকও সেই অনুপাতে বেড়েছে। বেড়েছে কণ্ঠ ও যন্ত্রশিল্পীর উৎসুক শ্রোতা। তাঁরা যে সবসময় শিল্পসৃষ্টিকে সঠিকভাবে বুঝতে পারছেন তা নয়। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে শিল্পরসিকদের পরিবারে বহু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে। বেশ কিছু লেখক, কবি ও শিল্পী পেয়েছেন সমাজে প্রতিষ্ঠা। খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাতেই স্বীকৃতি এক একটি পুরস্কার।

এবার আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকা প্রদত্ত প্রফুল্ল সরকার পুরস্কার ও সুরেশ স্মৃতি পুরস্কার পেলেন যথাক্রমে কৃতী প্রাবন্ধিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও তরুণ ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব গুহ। কবিতার জন্য উল্টোরথ পুরস্কার পেয়েছেন এই সময়ের অন্যতম প্রধান কবি শঙ্খ ঘোষ। পার্ক হোটেলের এক উজ্জ্বল সাহিত্য সমাবেশে পুরস্কার-অর্জিত প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। স্বভাব-লাজুক, মিতভাষী কবি শঙ্খ ঘোষ ব্যক্তিগতভাবে সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন না বলে পুরস্কার সেদিন তাঁর হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

বাংলায় এখন নামনিষ্ঠ প্রাবন্ধিক ও সমালোচকের সংখ্যা অঙ্গুলিমেয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাহিত্যের সুষ্ঠু বিচারবিশ্লেষণে সমালোচকের দায়িত্ব অনেক। বিশেষ সময় ও সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সাহিত্য ও শিল্পকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করেন। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে তিনি পথনির্দেশেরও ক্ষমতা রাখেন। এর জন্য সমালোচক ও প্রাবন্ধিককে বিশেষভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়। অতীতের উল্লেখযোগ্য প্রধান প্রধান সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টি থেকে তিনি সংগ্রহ করেন তাঁর রসদ। নিজেকে সুশিক্ষিত করেন তার আলোকে। সাহিত্যের ইতিহাস তাঁকে জানতে হয় বলেই তিনি সমকালীন সাহিত্যকে সংস্কারমুক্ত চিত্তে বিচারবিশ্লেষণ করে দেখাতে পারেন। সমালোচকহীন সাহিত্যসৃষ্টি হালহীন নৌকা চালনার মতো বিপজ্জনক ও অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়। সমালোচক ও প্রাবন্ধিকের সঙ্গে মৌলিক স্রষ্টার সম্পর্কও প্রায় অবিচ্ছেদ্য। উপযুক্ত সমালোচকের অভাবে মৌলিক লেখক-কবিরা পঙ্গু হয়ে পড়েন। কিন্তু এই প্রয়োজন যত অনিবার্যই হোক না কেন দেখা গেছে বাংলায় লেখক, কবি ও সমালোচকের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু সমালোচক আবার স্কুল-কলেজের পরীক্ষার দিকে লক্ষ করে যে দায়সারা গোছের কেতাবী সমালোচনা গ্রন্থ লিখতেই অভ্যস্ত। বিচার বিশ্লেষণের দিক থেকে সেসব গ্রন্থ হয় নিছক নিরস ও ক্লান্তিকর। সমালোচনাও যে এক ধরনের সৃষ্টিকর্ম এবং হয়ত মৌলিক রচনার চেয়েও জটিলতর সৃষ্টিকর্ম তা এইসব নম্বরবিলাসে তুষ্ট কেতাবী সমালোচকের দল ভুলে যান।

আবার নিস্তেজ অন্ধকারে নিমজ্জিত এই পরিবেশেই থাকেন হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতো কিছু গুণী প্রাবন্ধিক ও সমালোচক, সাহিত্য সামগ্রিক ভাবে যাঁদের দ্বারা বারবার উপকৃত হয়। কিন্তু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত শুধু সাহিত্যের নিরস বিচার বিশ্লেষকই নন, তিনি নিজে ঔপন্যাসিক এবং একজন বিরল জাতের রম্যসাহিত্য রচয়িতা। অন্তর্লীন রসবোধ না থাকলে কেউ রম্যরচনা লিখতে পারেন না। আবার এই রম্যরচনাকে এক বিশেষ স্তরে উত্তীর্ণ করতে হলে চাই চিন্তার খোরাক, অন্তর্দৃষ্টি ও রচনার সাবলীল প্রসাদগুণ। বলাবাহুল্য, এসব কিছুই হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যে সুষ্ঠু, সমন্বয়ে বিকশিত হয়েছে। পুরস্কারদাতাদের পক্ষ থেকে তাঁকে যে মানপত্র দেওয়া হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে—'বুদ্ধিতে দীপ্ত, রসে স্নিগ্ধ প্রবন্ধের রচয়িতা হিসেবে বাংলা সাহিত্যে আপনি একটি উজ্জ্বল নাম। সহজ সুরে গভীর কথা বলতে আপনি অদ্বিতীয় প্রমথ চৌধুরীর সার্থক উত্তরাধিকারী

বুদ্ধদেব গুহ

শঙ্খ ঘোষ

আপনি। স্বনামে এবং ইন্দ্রজিৎ ছদ্মনামে আপনি বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্যকে করেছেন পরম রমণীয়। আপনি রবীন্দ্র সাহিত্যের দক্ষ সমঝদার, রবীন্দ্রজীবনের সমঝদার। রবীন্দ্রনাথ আরো নিকট, আরো অন্তরঙ্গ হয়েছেন আমাদের কাছে, আপনার রচনার ঐশ্বর্যে ও মাধুর্যে।'

হীরেন্দ্রনাথের প্রতিভা বহু বিচিত্র। তাঁর বধূ অমিতা, বন্ধনহীন গ্রন্থি প্রভৃতি উপন্যাসে আমরা পাই একজন মননশীল লেখককে। ইংরেজি সাহিত্যের তিনি কৃতী অধ্যাপক। বিশ্বভারতীর ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হয়েছিলেন। আবার অনুবাদের মাধ্যমে তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন লরেন্সের বহু বিখ্যাত ও বহু সমালোচিত 'লেডি চ্যাটার্লির প্রেম' উপন্যাসখানি। শুধু লরেন্স নয়, রোমাঁ রোলাঁর রচনাও তিনি বাঙালী পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এক সময় ইংরেজী 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি' পত্রিকার তিনি ছিলেন সম্পাদক।

তরুণ ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব গুহের উপন্যাসের বিষয় এক কথায় রোমান্টিক। 'কোয়েলের কাছে' তাঁর একটি জনপ্রিয় উপন্যাস। তাঁর উপন্যাসে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। অরণ্যের আলোছায়াময় পরিবেশ, অচেনা মানুষ, তাদের প্রেম ভালবাসা, দুঃখ, দুঃখবেদনা, সর্বোপরি সহজ সরল ভাষা তাঁর উপন্যাসকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। তুলনা না করে বলা যায়, সতীনাথের 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' প্রভৃতি উপন্যাসের মতোই বুদ্ধদেবের 'কোয়েলের কাছে'ও পাঠকদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এক একজন লেখকের এক একটি বিশিষ্ট উপন্যাস থাকে। বুদ্ধদেবের 'কোয়েলের কাছে' উপন্যাসটি তাঁর একরকম একটি রচনা। শিশু সাহিত্যেও তাঁর অমূল্য ইতিমধ্যেই শিশু ও কিশোরদের মন জয় করেছে।

শঙ্খ ঘোষের কবিতার বিষয় বহু ক্ষেত্রে অন্তর্মুখী হলেও ঝড়ের সময় উটপাখির মত তিনি বালিতে মুখ গুঁজে থাকেন না। তাঁর পরিণতিজাত ভাবী ও চিত্রকল্পময়ী কবিতার ভিতরে থাকে সেই উত্তাপ যা সমকালীন সমাজ ও মানুষের থেকে আহরিত। শঙ্খ ঘোষ একজন প্রথম শ্রেণীর সমালোচক ও বিদেশী কবিতার অনুবাদক। কবিতার জন্য তো তিনি পুরস্কার পেলেন, কিন্তু প্রবন্ধ-সাহিত্যের জন্যও তিনি যে-কোন পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। এদেশে কোন কোন কবি শুধু কবিতা লিখেই যান। সেই সব সমালোচনার দশ মাইল রেডিয়াসের মধ্যেও তাঁদের খুঁজে পাওয়া যায় না যা পড়ে আমরা তাঁদের রচনার ও সমকালীন সাহিত্যের মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হতে পারি। শঙ্খ ঘোষ এদিক থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। নিজেকে নিয়ে হই-চই তিনি পছন্দ করেন না। নিরহংকার আত্মপ্রচারবিমুখ এই কবি-অধ্যাপক বহু আগেই পাঠকদের স্বীকৃতি পেয়েছেন। এবার পেলেন পুরস্কার। এই বিজ্ঞাপনশাসিত সমাজে, চক্কানিনাদমুখরিত বিজ্ঞাপিতর যুগে তাঁকে সম্মানিত করে আমরা নিজেরাই গৌরব বোধ করছি।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

কষ্টকল্পিত

অতুল্য ঘোষ

॥ ২২ ॥

হুগলী জেলায় ঠিক হল যে, আমাদের কিছু সত্যাগ্রহী যাবেন মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে লবণ আইন অমান্য করার জন্য। আর গ্রামবাসীরা চৌকীদারি ট্যাক্স বর্জন করবে এবং অন্যান্যভাবে আইন অমান্য আন্দোলন করা হবে। প্রথম দলে দশজন সত্যাগ্রহী থাকবেন, যাঁরা হেঁটে হাওড়া অবধি যাবেন এবং তারপর ট্রেনে গন্তব্যস্থান। এই দশজনকে নিয়ে যাবার ভার আমার উপর পড়ল। আমরা অতি ভোরে বড়ডোঙ্গল থেকে হেঁটে বেরোলুম। রাস্তায় রাস্তায় গেট, মালা, চন্দন, আবার অনেকে টাকা পয়সাও দিলেন, কোথাও কোথাও বা থেমে সভা করতে হল। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা। আর মাঝে মাঝে বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু সত্যাগ্রহী এসে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইল। আমরা অবশ্য তাদের বড়ডোঙ্গলে গিয়ে নাম লেখাতে পরামর্শ দিলাম। মাঝে একটি গ্রামে রাত কাটিয়ে তার পরদিন রাত কাটানো হল তারকেশ্বরে। চাঁপাডাঙ্গা থেকে তারকেশ্বর চার মাইল। কি ভিড় আর কি সাদর অভ্যর্থনা! লোকে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, 'ওরে নুন মারতে যাচ্ছে।' আবার কেউ বলছে, 'লড়াইয়ে যাচ্ছে। গান্ধী ডেকে পাঠিয়েছে।' কারোর মুখে কোনও অশোভন বা অসঙ্গত টিপ্পনী নেই। যে সক্ষম, সে তো সহযোগিতা করছেই; যারা অক্ষম, তারাও নানাভাবে সাহায্য করছে। এত মালাচন্দন পেয়ে মনটা একটু বেশ খুশীই হয়েছিল। তা ছাড়া হুগলী জেলার প্রথম সত্যাগ্রহী দল। আর আমাদের জেলার নামজাদা নেতার অভাব নেই, তাঁদের সকলের সঙ্গেই আমার বয়সের অনেক তফাৎ। তারকেশ্বর থেকে হরিপালে গিয়ে রাত কাটানো—সব ব্যবস্থা কল্যাণ কেন্দ্রের। আশুদার (ডাঃ আশুতোষ দাস) কল্যাণ কেন্দ্র। আর পরিচালক বিজয়দা (বিজয়কুমার ভট্টাচার্য)। সারা দিন জনসভা, আলোচনা, সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। সন্ধ্যার সময় প্রফুল্লদা (প্রফুল্লচন্দ্র সেন) এসে হাজির হলেন। এই ত্রি-মূর্তির আশুদা ছিলেন আমার অভিভাবক। আমার যা কিছু প্রয়োজন, অলক্ষে থেকে উনি তার ব্যবস্থা করতেন। বিজয়দা ছিলেন—ঠিক বলতে পারব না কি ছিলেন। উনি হেডমাস্টারি ছেড়ে অসহযোগ করেন। এখন বর্ধমানের নবকলাগ্রামে ওঁর বুনিয়াদী বিদ্যালয় পঃ বঙ্গে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই বিজয়দা প্রতি সপ্তাহে শ্রীরামপুরে এসে আমরা যে কংগ্রেস অফিসে থাকতুম, সেটি ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করতেন। ক'দিনের পড়ে থাকা বাসনও বাদ যেত না। আর কম্বল ও মাদুরের বিছানা, তাও ঝাড়মোছার হাত থেকে অব্যাহতি পেত না। অন্তত চার বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে এ কাজ করেছেন। আর প্রফুল্লদা আমার অভিজ্ঞতার অভাবের দরুন যেসব অপকর্ম করতাম তার [illegible] দিয়েছেন। এই তিনজনকে একসঙ্গে দেখে আমি ভাবলুম, আমাদের আশীর্বাদ করতে এসেছেন। আমরা সোৎসাহে বর্ণনা দিলুম—পথে কত টাকা পাওয়া গেছে, কত সংবর্ধনা, কতজন সত্যাগ্রহী হয়েছে। অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত। প্রফুল্লদা বললেন, 'তোমার এখন কাঁথি যাওয়া হবে না। বাকী সকলকে নিয়ে গৌরবাবু যাবেন।' গৌরবাবু মানে গৌরহরি সোম। আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। বড় সরকারী চাকরি ছেড়ে অসহযোগী হয়েছেন। আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না। একটু জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করলুম, 'তবে আমি কি হরিপালেই আইন অমান্য করে জেলে যাব?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, 'না। তুমি এখান থেকে বড়ডোঙ্গলে ফিরে যাবে।' আমার অবস্থা শোচনীয়। চোখ প্রায় জলে ভরে এসেছে। যে রাস্তা দিয়ে মালা পরে, চন্দন নিয়ে, সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে হেঁটে এসেছি, লোকে বলেছে নুন মারতে যাচ্ছে, গান্ধীর ডাকে আইন অমান্য করতে যাচ্ছে—সেই পথ দিয়ে ফেরত যেতে হবে। নিজেকেই বোঝাতে পারছি না, লোককে কি বলব? আমি একটু ক্ষোভ-ভরা কণ্ঠে বললুম, 'আমি তা হলে শ্রীরামপুরে আমার কর্মকেন্দ্রে ফেরত যাই। সেখান থেকে আইন অমান্য করব।' তখন মনে একটু সন্দেহ হল যে, আমি কি কিছু গর্হিত কাজ করেছি? মাথা নীচু করে বসে রইলুম। মুখে কথা নেই। মনের মধ্যে লজ্জা, যন্ত্রণা, আর একটা ব্যর্থতার ভাব।

প্রফুল্লদা আমার হাতে একখানি চিঠি দিলেন। চিঠি খুলে পড়বার ক্ষমতাও নেই। তখন দুটো চোখই আছে যদিও, কিন্তু বরাবরই তো খুব খারাপ। তাবার ভাবাবেগে চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে গেছে। বিজয়দা চিঠিটি পড়লেন। জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব—আমাকে হুগলী জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার সব ভার দেওয়া হয়েছে। এটাও বুঝতে কষ্ট হল। আমি সবচেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ, স্বল্পশিক্ষিত, তা ছাড়া অভিজ্ঞতাও কম। যাঁরা ভার দিচ্ছেন, তাঁরা সকলেই অভিজ্ঞ এবং আমার চেয়ে বয়সে বড়। আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন। একটু ভয়ও হল যে, এই বিশ্বাসের উপযুক্ত মর্যাদা যদি না দিতে পারি। ফিরে গেলুম। বিজয়কে (মোদক—বর্তমানে লোকসভার সদস্য) সঙ্গে নিয়ে গেলুম।

অনেক শিবির খোলা হল। আরামবাগের বাইরে শ্রীরামপুর শহরে ছাত্রদের মধ্যে অদ্ভুত সাড়া। কতগুলো পাড়ার প্রতি ঘর থেকে জেলে গেল। এমন বাড়িও ছিল, যেখান থেকে চার-পাঁচজনও আইন অমান্য করেছে। সদর মহকুমাতেও উৎসাহ কম ছিল না। তবে শ্রীরামপুর মহকুমা আর সদর মহকুমায় মোটামুটিভাবে স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলনই হয়েছিল। বড়ডোঙ্গলের হরিনারায়ণ, বলাইকেষ্ট এবং তাদের মা বারবার জেলে গেছে। বাড়ি ক্রোকশির নামে জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে। কিন্তু কোনও আন্দোলনেই তারা পেছিয়ে থাকেনি। হরিনারায়ণ জেল থেকে বেরিয়ে আর এক জেল-ফেরতের কলেরায় সেবা করতে গিয়ে প্রাণ দিল। হাজরা মশাইরা তিন ভাই। তিন ভাই জেলে। জয়া, বিজয়, তীর্থ, পেয়ারী—তার মামাতো-পিসতুতো ভাই। এক পরিবারভুক্ত। চারজনই জেলে। আর কত নাম করব। গোষ্ঠ বেরা, সামান্য নিঃস্ব কৃষক। সে যে-কোনও স্বাধীন দেশে জন্মালে নিঃসন্দেহে বড় সেনাপতি হত। ১৯৩২এ একটা গ্রামে পুলিস অত্যাচার করেছিল। খানাকুল থানার খাড়োক নামে গ্রাম। গ্রামের সব লোক এস-ডি-ও-কে চিঠি দিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল। 'আমাদের গ্রামে পুলিস অন্যায়ভাবে অত্যাচার করেছে। আমরা গ্রামের সমস্ত অধিবাসী জিনিসপত্র রেখে, দরজা খুলে গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছি।' গ্রামের এক অদ্ভুত অবস্থা। কয়েকটা কুকুর উচ্ছিষ্ট খেতে না পেয়ে ঘেউ-ঘেউ করে কাঁদছে। সব দরজা হাট করে খোলা। যত দূর মনে হচ্ছে, গ্রামবাসীর দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিতেও কোনও জিনিস খোয়া যায়নি। পরস্পরের প্রতি একটা দায়িত্ববোধের জ্ঞান খুব দেখা গিয়েছিল। এক মানুষ যারা জেলে গিয়েছিল, গ্রামের যারা জেলের বাইরে ছিল, তারা সেই লোকটির চাষ তুলে দিত। নকুণ্ডা গ্রামের জাগরণও অদ্ভুত। বিশ্বনাথ, সুধীর, অতুল, গগন, যতীন—সকলেরই চাষ উপজীবিকা। সকলেই তো জেলে গেল। অতুল আবার মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। আমি চুনট গ্রামের চন্দ্রবাড়িতে দশ মাস ছিলুম। চন্দ্র ছিল যারা সমাজে জল আচরণীয় নয়, সেই গোষ্ঠীর। একখানি ঘরে তারা স্বামী, স্ত্রী, আমি ও ছাগল, আর বাইরে ঢেঁকি ও রান্নার জায়গা। ভাণ্ডারহাটির রায়দের বাড়িতেও অনেক দিন ছিলুম। আর কতরকমের গান। বালির সুধীর—তারা তিন ভাইই জেলে গিয়েছিল। সে যখন গান ধরত 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা'—চারদিকের লোক [illegible] কাজ ফেলে দাঁড়িয়ে শুনত। পারশাসপুরের নারাণ চক্রবর্তী। কি গলা!—

'চাষী ধর কষে লাঙ্গল'
আমরা মাটির খাঁটি ছেলে দূর্বাদলশ্যাম,
মোদের মাঝেই লুকিয়ে আছে
রাবণ, হরি, রাম।
আবার—'জগন্নাথের জাত যদি নাই,
তবে কেন জাতের বড়াই।'

গ্রামে গ্রামে সভা, বৈঠক, যেখানেই পাঁচজন লোক—সেখানেই এইসব গান। আমরা চৌকিদারি ট্যাক্স বন্ধের সঙ্গে জমিদারি খাজনা বন্ধ, সেটেলমেন্ট বয়কট করেছিলুম। জীবিকার একমাত্র সম্বল জমি চলে যাচ্ছে—তবু কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। চুনট গ্রামের একজন গ্রামবাসীর বাড়ি থেকে পুলিস একজন সত্যাগ্রহীকে ধরে নিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের চার-পাঁচখানা গ্রামের সমস্ত অধিবাসীরা এস-ডি-ও-কে চিঠি লিখে জানাল, 'আমাদের বাড়িতে বেআইনী ঘোষিত কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাস করে। আমাদেরও গ্রেপ্তার করা হোক।'

(ক্রমশ)

বম্বে ডাইং-এর
ভাবী বিজেতা
কাপিতান
ওয়াড্রান
বম্বে ডাইং

যে কোনও ফ্যাশন মডেলকে জিজ্ঞাসা করুন
তিনি আপনাকে এই কথাই বলবেন
"৬ রকম সুন্দর রঙে ভরা শিঙ্গার কুমকুম প্যাকের তো তুলনাই হয় না। এর ভেতরের নানান্ সুন্দর রঙ আমার যে কোনও সাজের সঙ্গে দারুণ মানিয়ে যায়। আর এই বিশেষ সুবিধের জন্যে আমি যখন নানান্ কাজে সারাদিন ঘোরাঘুরি করি তখন এটা সবসময়ে আমার কাছেই থাকে!"
শিঙ্গার কুমকুমের এই ৬ রকম রঙে ভরা প্যাকে পাচ্ছেন শিঙ্গারের নামকরা সেরা কোয়ালিটির উপাদান।
শিঙ্গার
ভারতে সবচেয়ে বেশী বিক্রীর মনলোভা টিপ
প্যারামাউন্ট প্রোডাক্টস্, বম্বে ৪০০০০৪.
everest/1054/SH-bn
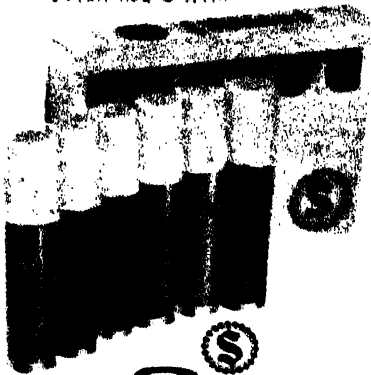
কিনারে যদিও আলো জ্বলছে তবুও একসারি ইটখোলার ঝিলিকজুন, শুধু আকাশে যেন তরল আগুন ছড়িয়ে গেছে, বাতাসে আগুনকণা। ইস্পাতের মত উজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকিয়ে একটি মুগ্ধ কবিতাও ছটফট করে ওঠে অস্থিরতায়। কি অপূর্ব রূপ এই দৃশ্যের, কি ভয়াবহ তাঁর দাহ, কি আশ্চর্য বস্তু উজ্জ্বল্য। মাঝে-মাঝে নিতান্ত 'নীলোৎপলপত্র কান্তিভিঃ কদাচিৎ প্রতিভাসমানমরাশিকায়িতৈঃ' মেঘমালা দূর দিগন্ত জুড়ে ভেসে চোখের চাতককে দুদণ্ড তৃপ্তি দিয়ে যায়। তারপরেই আবার ডাকপাখির চিৎকার, গাঙচিল ও শালিকের পাখায় ঝটপট, মৌমাছির গুঞ্জরণ; উদার নিরালা দুপুরে। সবুজ বনশ্রী, মাথার উপর সফেদা মেঘের সারি, বাজপাখির চক্কর আর কান্না।" সুচরিতা

বরিশালের এই প্রকৃতি, এই বন, বন-জ্যোৎস্না, বর্ণ-গন্ধ-ঘ্রাণ, আর এই পাখিদের অবিরল অজস্র রকমের সাড়া-শব্দে, হাঁক-ডাক, হই-হুল্লোড়, মোগল সম্রাটের সীলমোহরের মতো এক নক্শাময় ছাপ ফেলেছিল তাঁর গহন-চেতনায়। নিজের কবিতায় বর্ণে মত ধরিয়ে দিয়েছেন সেই সব। ফেরার পরও ফুরোয়নি। কিছু ছিল উদ্বৃত্ত। অবশিষ্ট। সেগুলো ছড়িয়ে দিয়েছেন ইতস্তত তাঁর গদ্যের ভিতরে, গল্প-উপন্যাসে। গল্প-উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ভিতরে উঁকি দিয়েছেন তিনি নিজেই, স্মৃতি-গন্ধে ভারাতুর তাঁর ভিতরে চোখ তুলে। আর সেই সূত্রেই অজস্র পাখির আনাগোনা ঘটে গেছে তাঁর গদ্যে।

১। "শান্তিশেখরের মনে হলো, মাস্টারমশাই মালায়ের দু-তিনখানা বই আলগোছে টু-শব্দ না-করে কোথায় যেন রেখে দিলেন। মনে হলো, অমলকীপল্লবের থেকে শিশির ঝরে পড়ল যেন হেমন্ত রাতের পাখির পালকে...।" বিলাস

২। "রাজহাঁসের মতো ঘাড় কাত করে বই-গুলোর দিকে তাকিয়েছিল শান্তিশেখর।" বিলাস

৩। "শান্তিশেখরের মনে হল, কোন এক অন্ধকার থেকে তাদের কবেকার ইস্কুলের মত হেডমাস্টারমশাই অপরেশবাবু, তাকে বলছেন, 'বিলাসী তোমার মন, শান্তিশেখর। কী যে রাজহংসী খুঁজে মরছ তুমি—কী যে বালিহাঁস কাদা-খোঁচা খুঁচে মারছে তোমাকে! কিন্তু তারাও পাখির মতো চোখ তুলে তাকাতে-না-তাকাতেও পালকের সোঁদা গন্ধ হাওয়ায় হারিয়ে যায় বুঝি? শূন্যে মিলিয়ে যায় তারা? তারাও?' 'তা যায়: তা যাক; তাদের জন্যে কোনো খেদ নেই।" বিলাস

৪। "রেবা বললে, 'কেন ডাকছিলে?'

খাঁচার পাখি যেন ছাড়া পেয়েছে—গলার স্বর এমনি। আমিও আকাশটাকে ফিরে পেয়েছি। পেয়েছি ফিরে আকাশের যা-কিছু আলো—সবটুকু।" ছায়ানট

এরপর ছোট গল্প থেকে চলে আসি উপন্যাসে। তাঁর মাল্যবানে, পাখিদের ভূমিকাটাও যে কতখানি মূল্যবান, সেটা এখুনি শরতের রোদের মতো ঝলমলিয়ে উঠবে আমাদের সামনে।

১। "এখন নিচের ঘরে যেতে হয়। কিন্তু তবুও মাল্যবান গেল না সহসা। মশারীর খুঁট তুলে এদের খাটের পাশে পাড়াগাঁর শব্দহীন রাতে নিশ্চুপ ডানার পাখির মতো এসে স্নিগ্ধ নৈঃশব্দ্যে—এদের জাগিয়ে বসে থাকতে চায়।"

২। "একটি স্ত্রীলোক মিষ্টি হোক, বিষ হোক, ঠাণ্ডা হোক, আমার জীবনের বাধা-ঢাকা সবুজ বনে আতার ক্ষীরের মতো কথাগুলো শুনতে আসবে—সে পাখি ও নয়। ওর চেহারা যদি কালো, খারাপ হতো—তাহলে তো চাষার মেয়েরও অযোগ্য হত। একটা মেজদাকাকাকে নিয়ে ঘর করাই আত্মপনের পাখির মতো—সেই-সেই-পাখিনীকে চেয়ে আমি—"

৩। "একটা পাখি সৃষ্টি করে তাকে যদি ইঁদারার অন্ধকারে ফেলে দেওয়া হয়—কেমন ছটফট করে উঠতে লাগল মাল্যবানের ভিতরটা।"

৪। "মাল্যবান মাঝে-মাঝে অবাক হয়ে ভাবে—কথা ভাবে। কথা ভাবা কালো পুরনো পাখিদের নীড় ভরা মাথাটা, আচমকা একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বা সভায় বসে ঘ্রাণ কথাটা বলে ফেলে পাখি-গুলোকে উড়িয়ে দেয় সে।"

অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত আভিসারিকা

৫। "শেষ রাতের একটা বসন্তবৌরির পাখির মতো একরাশ নক্ষত্র ও অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়বার আগে একটু চমকে মিঠে হেসে জেগে উঠবার বেঁচে থাকবার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা অতিক্রম করে (মাল্যবানের মনে হল) কে যেন উৎক্রান্ত হয়ে গেল।"

৬। "হুড়কা বানের ঠাণ্ডা স্রোতে যেন মুর্গি আমি হাঁসের মতো মতো সাঁতার কাটতে চাচ্ছি, বাজ-পাখির মতো উড়ে যেতে চাচ্ছি। আমার জীবনের মানচারের ব্যাপারটা এই রকম।"

৭। "পাড়াগাঁর বাড়িতে প্রকাণ্ড বড় উঠান ছিল তাদের, ঘাসে ঢাকা, কোথাও বা শক্ত সাদা মাটি বেরিয়ে পড়েছে, তারই ওপর সারাদিন খেলা করত রোদ, ছায়া, মেঘের ছায়া, আকাশের চিলের ডানার ছায়া রোদে দুপুরের চলিষ্ণু হীরেকষের মতো তার চটকানো শালিখ উড়ে আসত উঠানে; খড়ের চালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত বক—এই সরোবর থেকে সেই সরোবরে যাবার পথে। ডানায় তাদের জলের গন্ধ, ঠোঁটে মাছের আভা চকিত চোখ দূরের দিকে—নীলিমার দিকে। কত উঁচু উঁচু গাছ ছিল উঠোন ঘিরে সারাটা শীতকাল দুপুরে তাকে আমরুল খাওয়াতো আমের বন নিম হিজলির জঙ্গল যেমন করে ফুকরে ফুকরে উঠত—রোদের দিকে পিঠ রেখে নিজের শরীরটাকে একটু এলিয়ে দিলে সমস্ত শরীর জুড়ে জুড়ে উঠত সেই পাখির ডাকে। মাঝে মাঝে উঠোনে এসে পড়ত ঘুঘু, যেমন কলের মতো, পাখিদের দেশে কচুপ ঢেঁকির পাড়ের মতো ঘুঘুদের লেজগুলো উঠত-পড়ত, উঠত-পড়ত—ঘুরে ঘুরে ঘুরে করে ঘুরে ফেরত তারা মাঠে-কাকে-কী খুঁজত, কী চাইত? সেই পঁচিশ-তিরিশ বছর আগের শীতের রোদের কুয়াশার ভেতর সেই সব পাখি যেমন পৃথিবীর সঙ্গে কোনো দিন ছিল না; আজকের পৃথিবীটা কল-কাতার বণিকশক্তির গোলকধাঁধা দিয়ে এমনি অদ্ভুত অপূর্বী। ফিকে কাঁকর কোকোর মতো মাথা গলা ফুলিয়ে কত পাতিকাক উড়ে আসত খড়ের চালে, উঠোনে; শন শন করে উড়ে যেতো ঠাণ্ডা জলের ওপর

জলার দানোকে তো অনেক কষ্টে ধরা হয়েছে...
টানো! টানো!

এখন সে দিব্যি ঘাসপাতা খায়।
দেখতে কুচ্ছিত!
না না, খুব সুন্দর!

ওটাকে মেরে খেয়ে ফেললেই তো হয়!
না না, আগে আমি শহর থেকে ঘুরে আসি!

অরণ্যদেব জঙ্গল ছেড়ে শহরের দিকে চললেন.....
3-13

ছুটলেন সিধে বিশ্ববিদ্যালয়ে...
UNIVERSITY of BANGALA
প্রাণীটির পরিচয় তিনি জানতে চান।

জলার মধ্যে মস্ত একটা প্রাণী ছিল। সেটাকে ধরেছি। অদ্ভুত প্রাণী। এঁকে দেখাতে পারি।
বেশ তো, আঁকুন না!

অনেকটা এইরকম। ঘাসপাতা খায়। হিস্‌স্ হিস্‌স্ করে শব্দ করে।
ঠাট্টা করছেন?

আপনি একটা স্টেগোসরাস এঁকেছেন। পৃথিবী থেকে এই প্রাণী লুপ্ত হয়েছে প্রায় দশ কোটি বছর আগে!
?!

খারাপ লাগত। এমন কি অপরাধ করেছে ওরা! কাকা মহিলা ভিখারি উঠেছে, সেই জন্য এক শ' টাকা জরিমানা! অনাদায়ে এক মাস জেল! এরা গরীব লোক—এক মাস বসে থাকলে খাওয়াবে কে এদের।

প্রায় রোজই সন্ধ্যার বেড়াতে বেরিয়ে দেখতাম, জ্মান মেট জেল গেট থেকে খিদিরপুর হাটে তাড়িয়ে তাড়িয়ে গরু নিয়ে যাওয়ার মত ষাট-সত্তর জন মিয়- বেল, মুখমুখ ও মুশ্শ শরীরের ছেলে-বুড়োকে নিয়ে আসছে গুমটির দিকে। এরা সব রেলওয়ে আইনভঙ্গ- কারী। বিনা টিকিটের যাত্রী বা খালি মহিলা ভিখারি ওঠা পুরুষ বা রেল-স্টেশনের ভিখারী। লম্বা লাইন করে এগোতো এরা গেট থেকে গুমটি পর্যন্ত। পেছনে পেছনে জুম্মান মেট চেঁচাত এই...এই...লাইন ভাঙ্গছে কে রে...সোজা...সোজা লাইন কর।

জুম্মান ছিল বড় জমাদারের প্রিয়তম মেট।

এদিকে, ঘটেশ্বরের আবার ভালই চলছিল। ফিটফাট হয়ে থাকত। ঘরদোর যথাসময়ে পরিষ্কার করাত। চৌকা আর হাসপাতাল থেকে নিয়মিত খাবার আনত। এবং সব সময় জামার হাতার উপর কালো ফিতার নিম্নমুখী 'ভি' সাইনটা লাগিয়ে রাখত।

এইটাই হল পাহারার চিহ্ন। জেলের ভাষায় 'বিল্লা'। পাহারারা এই চিহ্ন পরে জেলের বিভিন্ন এলাকায় অবাধে যেতে-আসতে পারে। অনেক পাহারা সব সময় এটা পরে না। তাছাড়া, চেনা বামুনের আবার পৈতের দরকার কি! ঘটেশ্বর কিন্তু এ বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ ছিল। বিল্লা ওর জামার হাতায় সব সময় লাগানো থাকত। সাদা ধপধপে জামার হাতায় কালো কুচকুচে বিল্লা।

আর, যেদিন সাহেবের ফাইল থাকত সেদিন তো কথাই ছিল না। ঘটেশ্বর সকাল থেকেই তাড়া দিত সবাইকে : এই...এই...আজ সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা চাই! আজ সাহেবের ফাইল আছে! আজ সাহেব আসবেন!

আগেই বলেছি, প্রত্যেক জেলেই সুপারিনটেন- ডেন্টকে সাহেব বলা হয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সুপারিনটেনডেন্টকে সাহেব কেন বলা হয়? আমার মনে হয়, এর প্রধান কারণ, ইংরেজ আমলে জেল সুপারিনটেনডেন্ট হতেন ইংরেজরা অর্থাৎ সাহেবরা। জেলার প্রভৃতি অন্যান্য পদে থাকতেন ভারতীয়রা। ইংরেজ আমলে জেলা জেলগুলিতে আলাদা সুপারিনটেনডেন্ট থাকতেন না। জেলের প্রধান সরকারী ডাক্তার অর্থাৎ সিভিল সার্জনই হতেন পার্ট-টাইম সুপারিনটেনডেন্ট। হোল-টাইম সুপারিনটেনডেন্ট থাকতেন শুধু সেনট্রাল জেলে। এই সেনট্রাল জেলের সাহেব সুপারিনটেনডেন্টদের সাহেব বলা থেকেই সাহেব কথাটা চালু হয়ে গিয়েছে। এখন সব জেলের সুপারিনটেনডেন্টকে সাহেব বলা হয়। এখন জেলা জেলগুলিতেও হোল-টাইম সুপার থাকেন। দু-একজন সুপারকে ঘণ্টা বাজিয়ে অবতারদিকে হুকুম দিতেও শুনেছি : কেরানীবাবুকে বল, সাহেব ডাকছেন! অনেক জেলে নিয়ম আছে, সাহেবকে জেলের দিকে আসতে দেখা গেলেই গেটে ঢং ঢং করে দুবার ঘণ্টা বাজানো হবে! সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া আর কি যে, সাহেব জেলে ঢুকছেন!

জেলকোডের অর্থাৎ জেল পরিচালনার বিধির চুলচেরা বিচার করতে গেলে হয়তো জেলের ভেতরের ব্যাপারে সুপারের চেয়ে জেলারের দায়িত্ব ও ক্ষমতা বেশি, কিন্তু এতদসত্ত্বেও সুপারই হলেন জেলের প্রধান অফিসার। তাঁর নামেই জেল চলে। জেলার কাউকে সাজা দিতে পারেন না। না কয়েদীকে, না অধ্যস্তন কর্মীদের। সুপারিশ করতে পারেন মাত্র। জেলে সাজা দেওয়ার একমাত্র মালিক সুপার। তা ছাড়া, সেনট্রাল জেলের সুপারদের একটা বিশেষ ক্ষমতা হল সেপাই- জমাদার টানসফার করা।

পশ্চিমবঙ্গে পাঁচটি সেনট্রাল জেল, অর্থাৎ পাঁচটি জেল সার্কেল। প্রত্যেকটি সেনট্রাল জেলের অধীনে অর্থাৎ সার্কেলে একাধিক জেলা, স্পেশাল ও সাব জেল আছে। জমাদার-সেপাইরা বদলি হবে বরাবর একই সার্কেলের ভেতরে। বহু ক্ষেত্রে এই জমাদার-সেপাই ট্রান্সফার একটা চালাও ঘুষের ব্যাপার! জেল ছেড়ে ঘুষের কারবার! যেমন শিল্পাঞ্চলের বা সীমান্তের সাব জেল বা স্পেশাল জেল হল সবচেয়ে লাভজনক পোস্টিং। আমি সেপাই-জমাদারদের মুখেই শুনেছি, তাদের মধ্যে যারা সেনেওয়ালা তাদের পক্ষে পশ্চিম- বঙ্গের সবচেয়ে লাভজনক জেল হল আসানসোল, ব্যারাকপুর, আলিপুরদুয়ার, বসিরহাট, ডায়মন্ড- হারবার ইত্যাদি। আসানসোল বা ব্যারাকপুর জেলে বড় জমাদার হয়ে যেতে হলে অন্তত তিন হাজার টাকা খরচা করতে হয়।

সব সুপারই যে ঘুষ নেন তা নয়। তবে, কেউ কেউ নেন। অনেক খ্যাতনামা পুরুষ যাঁরা সুপার ছিলেন তাঁরাও নাকি প্রচণ্ড ঘুষখোর ছিলেন! কোথাও কোথাও আবার বদলিতে সুপার ঘুষ নেন না, নেন জেলারবাবু, ডেপুটিবাবু এবং কেরানীবাবুরা!

বদলি জমাদার-সেপাইদের যতটা বিরাট ব্যাপার, ঠিক ততটা বিরাট ব্যাপার অবশ্য কয়েদীদের কাছে সাহেবের ফাইল নয়। তবে, তাদের অনেকের কাছে সাহেবের ফাইলের গুরুত্ব অসীম। নিয়ম হল, সাহেব সপ্তাহে অন্তত এক দিন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গিয়ে কয়েদীদের অভাব-অভিযোগ শুনবেন। এই সাহেবের ওয়ার্ড পরিদর্শনকেই বলা হয় সাহেবের ফাইল। ছোট জেলা জেলে এক দিনেই সাহেবরা সব ওয়ার্ডে ফাইল সারেন। সেনট্রাল জেলে তা সম্ভব নয়। তাই পালা করে ফাইল হয়। সাহেব যখন যে ওয়ার্ডে যাবেন সেই ওয়ার্ডের কয়েদীরা সবাই ফাইল হয়ে অর্থাৎ লাইন দিয়ে দাঁড়াবে। তাই একে বলা হয় সাহেবের ফাইল। সেখানে সাহেব কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলে সে তার জবাব দেবে, অথবা কারু কিছু বলার থাকলে সাহেবের অনুমতি নিয়ে তা বলবে। এটা সব জেলেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ সাধারণত এ ছাড়া সাধারণ কয়েদীরা আর সাহেবের কাছে যেতে পারে না।

আমাদের ওখানে সাহেব আসতেন বৃহস্পতিবার, ঘটেশ্বর সেদিন সকাল থেকেই ত্রটস্থ থাকত। নালা, উঠান, বারান্দা, ঘর—সব ঝকঝকে! নিজেও সকাল সাড়ে নটা থেকেই ইস্ত্রি-করা জামা-প্যান্টটি পরে রেডি থাকত! কালতু অর্থাৎ ভলান্টিয়ারদেরও বার- বার সতর্ক করে রাখত! আজ জামাকাপড় পরিষ্কার থাকা চাই! আজ সাহেবের ফাইল!

সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে সাহেব আসতেন। আলিপুরের তখনকার সাহেব মোল্লান ছিলেন অত্যন্ত ভালমানুষ। অত্যন্ত সৎ, ভদ্র ও বিনয়ী। সাহেব যখন ফাইলে আসতেন তখন সঙ্গে আর আসতেন ওয়েলফেয়ার অফিসার, একজন ডেপুটি জেলার ও বড় জমাদার এবং অন্তত আর একজন জমাদার ও দুজন সেপাই। মোল্লান সাহেব এসে দাঁড়াতেন। আমিও নমস্কার করে বলতাম : আসুন, আসুন, বসুন।

মোল্লান সাহেব কিন্তু বসতেন না। বলতেন : না, না, বসব না, আপনার কোনও অসুবিধা নেই তো?

আমি হেসে জবাব দিতাম : না, না, কোনও অসুবিধা নেই।

মোল্লান সাহেব বলতেন : আচ্ছা, আচ্ছা, আমি চলি। ফাইলে বেরিয়েছি কিনা। ঘুরতে হবে এখনও কিছুটা।

তারপর তিনি দলবলে চলে যেতেন। ঘটেশ্বরও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচত! সাহেব চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ওর যেন উৎকণ্ঠার অন্ত থাকত না! যে ক' মিনিট মোল্লান সাহেব আমাদের ওখানে থাকতেন সেই ক' মিনিটই ঘটেশ্বর ভলান্টিয়ারদের নিয়ে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত!

মাঝে মাঝে জেলারবাবুও আসতেন। তবে, ফাইল করতে নয়। এমনি। ঘটেশ্বর ছুটে এসে চেয়ার এগিয়ে দিত। সঙ্গে সঙ্গে ওদের স্পেশাল স্টোভ জ্বালিয়ে চা বানাতে বসত। সাবান দিয়ে কাপ-প্লেট ধুয়ে জেলার- বাবুদের চা এগিয়ে দিত।

এমনিভাবে ঘটেশ্বরের ভালই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখি এগারোটা নাগাদ ও চোখমুখ ভারো করে এসে আমার সামনে দাঁড়াল।

জিজ্ঞেস করলাম : কি হল ঘটেশ্বর?

ও প্রায় কাঁদো-কাঁদো স্বরে জবাব দিল : দাদা- বাবু, বড় জমাদার আজ আমাকে গুমটিতে ডেকেছিল। বলেছে, দাঁড়াও, তোমাকে দেখাব। বহুৎবাবু তো আর বেশিদিন জেলে থাকবে না। তখন তুমি যাবে কোথায়!

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম : হঠাৎ বড় জমাদারের সঙ্গে তোমার কি হল? কি নিয়ে আবার ঝগড়া হল?

ঘটেশ্বর বলল : আমি কোনও ঝগড়া করিনি দাদাবাবু। ওই যে অজিতদা জেলারবাবুকে বলে আমাকে আবার এখানে নিয়ে এসেছেন তারপর থেকেই বড় জমাদার ভীষণ চটে আছে। আমাকে আজ বলছিল, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া তোমায় দেখাব আমি!

শুনে বেশ রাগ হল। বললাম : তুমি ঝগড়া করতে যেও না। তারপর দেখি। অজিতবাবুকেও বলব।

অজিতবাবুকে পরদিনই ব্যাপারটা বললাম। অজিতবাবুও শুনে রাগ করলেন। তবে বললেন : কি আর করবে ও! ঘটেশ্বরকে বলবেন, ওর বাড়ে-কাছে যেন না যায়। ব্যস! তারপর কিছু করলে দেখা যাবে!

প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম ব্যাপারটা। তিন-চার দিন পরে আবার ঘটেশ্বরই তুলল। ঠিক তুলল বলা ভুল হবে, তোলালো। সুবোধকে দিয়ে।

সুবোধ ছিল দু নং দিন ডেকের মেট। অর্থাৎ, অনন্তবাবুর ওখানের মেট। উত্তর চব্বিশ পরগনার বাগদা অঞ্চলের ছেলে। ডাকাতির মামলায় পাঁচ বছর সাজা হয়েছিল। অজিতবাবু ওকে বলত 'লিটল ডাকাত'। খুব অল্প বয়স। কুড়ি-একুশ হবে। তা হলে ভাবুন যখন ডাকাতি করেছিল তখন বয়স কত ছিল! আলিপুর সেনট্রাল জেলে অনন্তবাবুই একমাত্র বন্দী যাঁর নিজস্ব রান্নার ব্যবস্থা ছিল। সুবোধ রাঁধত না। রাঁধত আর একটি ছেলে। সুবোধ ইনচার্জ হিসাবে সব যোগাড়যন্ত্র করে দিত। এই ছেলেটির রান্নার হাত খুব ভাল ছিল। সুবোধ প্রায়ই অনন্তবাবুর রান্না থেকে আমাকে কিছুটা দিয়ে যেত। সুবোধের সাজা শেষ হতে আর মাত্র কয়েক দিন বাকি ছিল।

পাশাপাশি দুই ওয়ার্ডে দুজন ইনচার্জ। সেই হিসাবে সুবোধের সঙ্গে ঘটেশ্বরের খুব ভাব ছিল। দুজন বিকালে একসঙ্গে এক নং দিন ডেকের বড় চৌবাচ্চার সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করতে করতে ঝপাঝপ করে স্নান করত প্রায়ই। ঘটেশ্বর ছিল পাহারা, আর সুবোধ ছিল মেট। মেট মর্যাদায় পাহারার চেয়ে উপরে। মেটকে জেল কোডের ভাষায় বলা হয় কনভিক্ট ওভার- সিয়ার, সংক্ষেপে সি ও। সুবোধ তবু ঘটেশ্বরকে ঘটেশ্বরদা বলত, কারণ বয়সে ঘটেশ্বর ছিল বড়।

এই সুবোধ এসে একদিন দুপুরে বলল আমাকে : দাদাবাবু, বড় জমাদার যে ঘটেশ্বরদার পেছনে ভীষণ লেগেছে!

আমি ভাবলাম, আবার বোধ হয় নতুন কিছু হয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম : কি হল আবার?

ও বলল : না, নতুন কিছু হয়নি। ওই সেদিন বলছিল, বাবু গেলে তোকে দেখে নেব!...লোকটা ভাল নয়। আপনি গেলে ঘটেশ্বরদার উপর অত্যাচার করবে।

বললাম : না, তা কেন করবে! তবু অজিতবাবুকে বলে রেখেছি, বলেছেন কিছু করলে দেখবেন।

সুবোধ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল : বলছিলাম কি দাদাবাবু, আপনি যদি একটু আলকোবাবুকে বলে ঘটেশ্বরদাকে মেট করে দিয়ে যেতে পারেন তা হলে আর কোনী ভয় থাকে না। বড় জমাদার বা অন্য কোনও সেপাই-জমাদার মেটকে ঘাঁটাতে সাহস পাবে না!

জিজ্ঞেস করলাম : কিন্তু ঘটেশ্বরের কি মেট হওয়ার সময় হয়েছে?

সুবোধ বলল : হ্যাঁ, হয়েছে। ওর সাজার অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। বিল্লা পেয়েছে সাত-আট মাস হয়ে গেল। এখন আপনি একটু চেষ্টা করলেই ও মেট হয়ে যেতে পারে। তাতে বড় জমাদারের ভয়ও কম থাকবে, আর

পাহারা হলে যেমন 'পাহারা' পায়, মেট হলে তেমন পাবে 'পেটি' অর্থাৎ বেল্ট। বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয় তারা সবাই খাটলে দৈনিক ছয় আনা মজুরি এবং বছরে পাঁচ দিন রেমিশন পায়। মেট ও পাহারা দৈনিক মজুরি পাবে আট আনা। পাহারা হলে অন্য কোনও খাটুনি নেই, শুধু 'পাহারা' দেওয়া ছাড়া, আর রেমিশন এক দিন বেশী অর্থাৎ বছরে ছয় দিন। মেট রেমিশন পাবে আরও এক দিন বেশী, অর্থাৎ বছরে সাত দিন।

বটেশ্বরের মেট হওয়ার প্রস্তাব সম্পর্কে সুবোধকে বললাম : তা তো হল, কিন্তু বটেশ্বর কি লিখতে-পড়তে জানে? তা না জানলে মেট হবে কি করে?

ও জবাব দিল : হ্যাঁ, হিন্দী লিখতে-পড়তে জানে। বাংলাও পড়তে পারে।

ওকে আশ্বাস দিলাম : আচ্ছা, দেখি আলংকাকে বলে।

পরদিন সকালেই আলংকাকে ব্যাপারটা বললাম। বটেশ্বরও পাশেই ছিল। আলংকা একটু হাসল। তারপর বটেশ্বরকে জিজ্ঞেস করল : হ্যাঁ রে, বিল্লা টানা কতদিন হল?

জেলের ভাষায়, বিল্লা টানা মানে 'পাহারা' থাকা। কাউকে যদি জিজ্ঞেস করতে হয় কতদিন পাহারা হয়েছে তা হলে পুরনো কয়েদীরা বলবেই ওই আলংকার মত : হ্যাঁ রে, কতদিন বিল্লা টানছিস?

বটেশ্বর বলল : প্রায় আট মাস হল।

আলংকা জিজ্ঞেস করল : বড় জমাদারকে বলেছিলি?

এই পাহারা থেকে মেট হওয়ার ব্যাপারেও বড় জমাদারের অনেকটা হাত। সেই উপযুক্ত কেস নিয়ে হাজির করবে জেলারবাবু এবং সুপার সাহেবের কাছে। তারপর কাজ হবে।

বটেশ্বর বলল : বলেছিলাম কিছুদিন আগে। তা বলল, এখন আর মেট করা হবে না।

আলংকা বলল : বলেছে! তারপর আমাকে বলল : আচ্ছা দাদা, দেখি।

আসলে সব জেলেই মেট বা পাহারা হতে হলে বড় জমাদারদের কিছু দক্ষিণা দিতে হয়। বটেশ্বর তা দিতে খুব ইচ্ছুক ছিল না। আর যদি কিছু না দিয়েই মেট হওয়া যায় তা হলে সে চান্স ছাড়ে কে!

দিন আট-দশ পরেই আলংকা এসে বটেশ্বরকে বলল : যা বেটা, তুই মেট হয়ে যাবি। কাল জেলার-বাবুর কেস টৌবিলের সময় ডোনাল্ড বা রবি শেলেকে নিয়ে টিকিটটা দিস।

বটেশ্বরের চোখ আনন্দে একেবারে জ্বলজ্বল করে উঠল : হবে আলংকাদা!

আলংকা গম্ভীরভাবে বলল : বলছি তো কাল তুই টিকিট নিয়ে কেস টৌবিলে যাস।

তারপর গোটা দিন বটেশ্বরের আনন্দ আর দেখে কে! সারা দিন গুনগুন করে গান গাইল এবং লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কাজ করল। তখন আমাদের ওখানে ভলান্টিয়ার জলিল এবং হামিদ। বাংলাদেশের দুটি ছেলে। পাস-পোর্ট-ভিসা ছাড়া চোরাই চালানের জন্য এপারে আসার অভিযোগে ছ' মাস করে শাস্তিপ্রাপ্ত। জলিল শিক্ষিত ছেলে। চট্টগ্রামের। হামিদ নোয়াখালির গ্রাম্য। জলিল শহুরে এবং ওদের ওখানের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষাও পাস করেছে। ফরিদপুরে ওর খাবার দোকান আছে। হামিদ চাষীর ঘরের ছেলে। বটেশ্বরের আনন্দ দেখে জলিল এবং হামিদও ওকে দুনিয়ে দুনিয়ে বলল : আজ আর দাদার আনন্দ দেখে কে! ওরা দু' জনেই বটেশ্বরকে দাদা বলত।

পরদিন খুব ভোরে উঠল বটেশ্বর। রোজ সাড়ে পাঁচটা নাগাদ উঠত। এদিন বোধ হয় চারটাতেই উঠে পড়েছিল। আমি বেড়াতে বেরোবার সময় দেখি বটেশ্বর বসে আছে। খুব খুশী-খুশী ভাব।

আমি বললাম : কি বটেশ্বর, আজ এত ভোরে উঠেছ যে!

বটেশ্বর হেসে বলল : আজ যে জেলারবাবুর কেস টৌবিলে যেতে হবে।

আমি বললাম : সে তো নটায় পর!

বটেশ্বর কিন্তু আটটা থেকেই রেডি! ফিটফাট হয়ে বিল্লা লাগিয়ে চটি পরে প্রস্তুত!

আমি হেসে বললাম : বটেশ্বর, এত আগে গিয়ে ওখানে বসে থেকে লাভ নেই। তার চেয়ে এখানেই একটু বসো। জেলারবাবু কেস টৌবিল করতে যখন যাবেন তখন তো এখান থেকেই দেখা যাবে।

বটেশ্বরকে তবু সামলানো গেল না। সাড়ে আটটার সময়ই ও চলে গেল। ফিরে এল বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ। একেবারে আহ্লাদে আটখানা! গেট থেকেই বলতে বলতে ঢুকল : দাদাবাবু, হয়ে গিয়েছে ...হয়ে গিয়েছে! ...এবার বাকি রইল সাহেবের কেস টৌবিল। সেটা পরশু।

জিজ্ঞেস করলাম : জেলারবাবু তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না?

বটেশ্বর হেসে লুটোপাট : কিছু না বাবু!... আলংকাদা পাশে ছিলেন!

মাঝখানে একটা দিন তো কোনও মতে কাটল। বটেশ্বরের আনন্দ দেখে কে! তারপর সেই পরশু এল। এদিনও দেখি বটেশ্বর খুব ভোরে উঠে বসে আছে। কেন আজ আর তা বুঝতে অসুবিধা হল না। এদিনও ও আটটা নাগাদই রেডি। আরও ফিটফাট। এদিনও সাড়ে আটটা বাজতেই ছুটল। এবং, ফিরে এল এগারোটা নাগাদ। আবার সেই আহ্লাদে গদ-গদ ভাব। আবার সেই গেট থেকেই ঘোষণা : দাদাবাবু, হয়ে গেল। দাদাবাবু আমি মেট হয়ে গেলাম!

আমি বললাম : কিন্তু পেটি কোথায়?

ও হেসে বলল : সাহেব পাস করে দিয়েছেন। পেটি পাব সন্ধেবেলা! আর কে আটকাবে দাদাবাবু!

সন্ধেবেলা যখন বটেশ্বর বেল্ট নিয়ে ফিরল তখন কিন্তু ওকে একটু বিমর্ষ দেখলাম। খুশী, তবে ততটা খুশী নয়! জিজ্ঞেস করলাম : কি হল বটেশ্বর?

ও একটু কুণ্ঠিত স্বরে বলল : পেটি পেয়েছি, কিন্তু পেটিটা ভাল না। পুরনো, অনেক দিনের, একটু ছেঁড়াও!

বললাম : তাতে কি, পেটি তো!

ও সখেদে বলল : কিন্তু দাদাবাবু, অত ঝকঝক করবে না!

রাতেই আবার দেখি ও বেজায় খুশী। বললাম : এখন তা হলে মনটা ভাল হয়েছে! পুরনো বেল্টের দুঃখ আর নেই!

ও আবার হেসে লুটোপাট। খুব খুশী হলে বটেশ্বর এমনিই হাসত। বলল : দাদাবাবু, সুবোধের বেল্টটা নিয়ে এসেছি পাল্টে। ও তো সাত-আট দিন পরেই খালাস পাবে। ওর বেল্টটা নতুন।

হেসে বললাম : এবার তা হলে বেল্টটা পরে ফেল।

ও একটু লজ্জা-লজ্জাভাবে বলল : আজ না দাদাবাবু। কাল পরব। কাল পরব। রাতে বেল্টটা আরও চকচকে করব!

পরদিনও দেখি বটেশ্বর খুব ভোরে উঠেছে। তখনও ওদের সেলের গেট খোলা হয়নি। বেড়িয়ে ফিরে এসে ইজি-চেয়ারটায় বসলাম বারান্দায়। রোজ সকালে বটেশ্বরই বিছিয়ে রাখত এনে।

বটেশ্বর তখনও ওদেরই ঘরে। চা বানাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ও এল। হাতে চায়ের গ্লাস। ধপ-ধপে সাদা শার্ট আর প্যান্ট। তার ওপর ঝকঝকে পেটি। পেতলের অংশটা একেবারে চকচক করছে।

কিন্তু এ কি, বটেশ্বরের চোখ দিয়ে জল পড়ছে কেন, ওর মুখে হাসি নেই কেন?...ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম : কি হল বটেশ্বর?

চায়ের গ্লাসটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বটেশ্বর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল : দাদাবাবু, বুড়ীকে যদি দেখাতে পারতাম, আমার মাকে যদি দেখাতে পারতাম এই পেটিটা! ও কাঁদছিল, আর বার বার একই কথা বলছিল।

আমি চুপ করে রইলাম। কোনও কথা বলতে পারলাম না। (ক্রমশ)
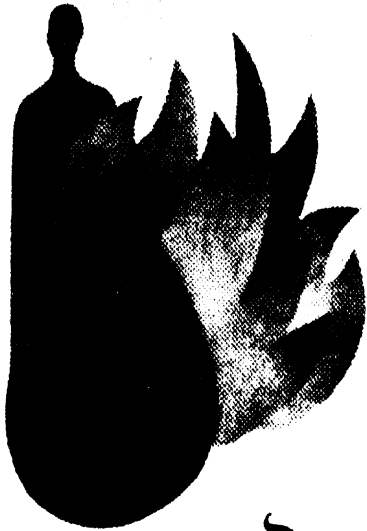
প্রেম নেই

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ ২ ॥

ফটিক নিজের উপরেই বিরক্ত হয়ে উঠছিল। আজকাল প্রায়ই তার এমন হচ্ছে। কেবলই নিরাশার মধ্যে ডুবছে সে। কীই বা করতে পারল জীবনে? সে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখল। সে সমাজের একে নিচুতলার লোক যে কুয়ো বেয়ে মুখে উঠতেই তার দম ফুরিয়ে যায়। তার আর পুঁজি কোথায় যে আরও উপরে উঠবে? খোনকার জাতীয় লোকেরা ওর তুলনায় বলতে গেলে তো সুযোগ সুবিধের একেবারে চূড়োয় বসে আছে। ঐ সব ঘরের ছেলেরাই তো উন্নতি করবে। গড়গড় করে উপরে উঠে যাবে। নিজের সম্পর্কে সে একটা বেশ উঁচু ধারণা তৈরি করে রেখেছিল। বাস্তব অবস্থা বিচার না করেই এমন একটা উঁচু ধারণা করে বাস্তবিক উচিত কাজ হয়নি। ইস্কুল কলেজে লেখাপড়া করা এক জিনিস আর পেশার জগতে ঢুকে করে খাওয়া অন্য জিনিস।

মিস্ পালিত ওর বাবার চেম্বারে আর্টিকেলড হওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন বলে ওকে জানিয়েছিলেন। মিস পালিতের প্রস্তাব সফীকুল বিনীতভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছিল। কেন না, তখনও নিজের সম্পর্কে তার একটা ভাল ধারণা ছিল। এখন কি সেজন্য অনুশোচনা হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তরে হাঁ কি না বলা ফটিক দেখল অসুবিধা হচ্ছে। সে কি মিস্ পালিতের পরামর্শ না মেনে ভুল করেছে?

"আমি কি দোষ করেছি?" বিলকিস অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেই ফেলল।

সফীকুল বাধা পেয়ে বিরক্ত হল। বিরক্তি দমন করে বলল, "তোমার অসুখ হয়েছে। এটা তো কারও দোষ হতে পারে না। দোষ করবে কেন?"

"তাহলে আমার সঙ্গে কথা কচ্ছেন না ক্যান?" বিলকিস কাঁদো কাঁদো গলায় জিজ্ঞেস করল, "আমার সঙ্গে আপনার কথা কইতে কি ভালো লাগে না?"

"না না, একথা বলছ কেন ছবি? তোমার অসুখ, স[illegible] এখন অনেক। তোমার তো ঘুমোনো উচিত[illegible], তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে [illegible] ঘুম পাড়াও।"

"ঘুমোতি আমার ডর করতেছে।"

"ঘুমোতে ডর করছে! সে আবার কী?"

"যদি ঘুমোলিই আবার দেখি? আমি ঘুমোলিই ক্যাবল দেখতিছি। আর ডুবে জলে দাঁড়ায়ে কেবল আমারে ডাকতিছে। যদি আমি চলে যাই? যদি আমি মরে যাই।"

ফটিক বিলকিসের কথা শুনে তাজ্জব হয়ে গেল। ভয়ও পেল সে।

"কী যা তা বকছ। ও তোমার মনের ভুল ছবি। তুমি মরার কথা ভাবছ কেন?"

"একটু আগেই আইছিল ফটিক। আর মা ছবি, আর মা কেবলই আমারে কেবলই ডাকতিছিল।"

বিলকিস তারপর হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ফটিককে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। "আমি অ্যাখন মরব না। যাব না, আমি যাব না, যাব না। আপনি আমারে ধরে রাখেন। কিছুতেই যাতি দেবেন না।"

ফটিক দেখল বিলকিসের আবার জ্বর বাড়ছে। তার খুব অনুশোচনা হলো।

ছি, এমন অবস্থায় ছবির উপর নজর না দিয়ে আত্মচিন্তায় মগ্ন হওয়াটা উচিত হয়নি। ছবির উপরেই সব নজরটা দেওয়া উচিত ছিল।

ফটিক ছবিকে কোলের মধ্যে টেনে নিল। তার শরীরটা কী গরম। ফটিক চমকে উঠল।

সফীকুলের নাওয়া খাওয়া প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। বিলকিসের অসুখটা হঠাৎ কেমন বাঁকা পথ ধরল। বিলকিসকে ফেলে ওর কোর্টে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। যদিও সই ফুল, সই ফুলের আম্মা এঁরা কেউ না কেউ সারাক্ষণ থেকেছেন, সাঁঝ ওদের ঋণ শোধ দেবার সাধ্য সফীকুলের নেই, তথাপি বিলকিস ওকে নড়তে দেয়নি। জেগে থাকলে সর্বদাই চোখের সামনে থাকতে হয়েছে। চোখ বুজে থাকলে ওর হাতখানা ধরে পাশে বসে থাকতে হয়েছে। নিতাই সাহানাকে ডেকেছিল সফীকুল। তিনি এসে আদ্যোপান্ত ইতিহাস শুনে বললেন, ফটিকের অস্বাভাবিক মৃত্যুটা বিলকিসের মনের অবচেতনে ঘা দিয়েছিল। তারপর পরিবার-পরিজনহীন এই বাড়িতে যখন একা কাটায় তখন তাই নিয়ে অজ্ঞাতসারে ওর মনের মধ্যে তোলপাড় করে। এতদিন শরীর সুস্থ ছিল, তাই কিছু বোঝা যায়নি। একটা বড় রকম জ্বর হতেই শরীর ও মন দুই জায়গাতেই একসঙ্গে আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে। শরীরটা আমি সারিয়ে দিচ্ছি। মনটাকে সুস্থ করে তোলার দায়িত্ব কিন্তু আপনাকে নিতে হবে। ইউ ক্যান ডু মোর দ্যান এনি ডক্টর ক্যান ডু। ওর বাবা-মাকে আসতে বলুন।

সফীকুল কালবিলম্ব না করে মৌলভী জয়নুদ্দীনকে পাঠিয়ে হাজী সাহেব আর নয়ডোনকে আনিয়ে নিল। সে নিজেও কিছু কিছু হতে আছে সেই রাত্রির ঘটনার জন্য। বিলকিস যে ভয় পাচ্ছে এবং ভয়টা কাটাবার জন্যই তার সঙ্গে কথা বলতে অত ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল, এটা সে সত্যিই বুঝতে পারেনি। আর একটু, যত্ন যদি সে সেদিন নিত, তাহলে আর ব্যাপারটা এতদূর গড়াতো না।

ভাগ্যিস নকুল আর শাশুড়ী এসে গিয়েছিলেন। না হলে খুব আতান্তরে পড়ে যেত। কারণ এই ডামাডোলের মধ্যেই ওর পার্ট টাইম মুহুরি হরিনারায়ণ নাথ এক মামলা এনে হাজির করল। নকুল শাশুড়ী সবে এসে পৌঁছেছেন।

হরি মুহুরি বলল, "উকিল সাহেব, আক্কটা বড় কেস হাতে নেবেন? পয়সা নেই কিছু। এই যে বদরুদ্দী, আর এ হল সদরুদ্দী।"

ওরা দুজন সালাম করে দাঁড়াল। দু-জনেই দুঃস্থ। চাষা। ঠিক যেন ওর বাপ।

হরি মুহুরি বলল, "ইরা দুই ভাই। বদরুদ্দীর দুই আর সদরুদ্দীর এক, এই তিন জুয়ান ছাওয়ালরি একেবারে ৩৭৬ ধারায় চালান করে দেছে।"

সফীকুল বলল, "বলেন কি? এ তো বেশ কেস।"

বদরুদ্দী আর সদরুদ্দী দু-জনেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, "হুজুর, উরা নির্দুষী। মিথ্যে মামলায় ওদেরে ফাঁসায়ে দেছে আমাগের গিরামের মোড়লরা। ফুল কায়েত। যে মেয়ে-ছেলেডার মাথে মামলা সাজের করিছে, সেই চিন্তামণি, ঐ ফুলকায়েতের চাষী পরাণ বেরেগীর বউ। আসলে ফুলকায়েতের রাঁড়তা। এমনিতেই ওর স্বভাব ভালো না। গিরামের জুয়ান ছেলেদের বড় খারাপ করে। এ কথা সবাই জানে। হুজুরে আমাগের ছাওয়াল তিনডেরে বাঁচায়ে দ্যান। হুজুরই আপনার।"

সফীকুল একটু ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু মুহুরি মশাই আমার বিবির যে বড় বাড়াবাড়ি অসুখ।"

"রবে যাও," হরি মুহুরি বলল, "হাপ্‌ যাও গে। ছাওয়ালদের শ্বশুরপক্ষের যদি দাও হয় আ-হলিউ অন্তত দশ বছর। ঘানি টানতে হবেই। টাকা নেই, পয়সা নেই, ও-পক্ষে আবার খান বাহাদুরের দাঁড় করাচ্ছে, কোন উকিল আর এ-কেস নেবে? আবার আই উইটনেস জুটাও করিছে। এ অ্যারেঞ্জমেন্টে রাজাথকা।"

"সব সাজানো হুজুর। সব সাজানো সাক্ষী। সবাই ঐ ফুল কায়েতের নিজের লোক।"

"ও-দিক ঢুকি খোনকার দাঁড়িয়েছেন?" সফীকুলের স্বরে একটু আগ্রহের ভাব দেখা গেল, "সে তো অনেক পয়সার ব্যাপার।"

হরি মুহুরি বলল, "উর তো আখন হাজির হলিই আক মোহর।"

"ও বাবা, আবার মোহর?"

"খান বাহাদুর চালু কইরেছেন," হরি বলল, "আগাগোড়া রায় বাহাদুরও ফলো কইরেছেন। এলাইমিশ বড় বালাই। বোঝেলেন না? গরজে পড়লি তুমি চালা যায়, তা উকিলির হাতে মোহর আগে দেবে, এ আর বড় কথা কী?"

"আমাগের আকদম পয়সা নেই হুজুর।" সদরুদ্দী বলল, "মুসলমানের ছাওয়াল, ইমান মাফিক রাখে কাছু হুজুর, সামান্য জমি কয়েক জমি আছে। তাতে বছর চলে না।"

হরি ধমকাল, "আরে মিঞা, জমি বড় না ছাওয়াল বড়? অ্যাঁ। আখনও জমি জমি করিতেছে। ইরা কি মানুষ না ভূত? অ্যাঁ।"

"হুজুর আপনি দয়া না করলি ভাসে যাব।" বদরুদ্দী কাতর স্বরে হাত জোড় করে বলল,

"আল্লা ছাড়া আমাগের আর কেউ নেই। হুজুর, আল্লা আপনারে দৌলত ইজ্জত সব দেবেন। হুজুর।"

সফীকুল একটু ভাবল। তারপর বলল, "মুহুরি মশাই, ওদের দিয়ে ওকালতনামায় দস্তখত করিয়ে নিন গে। কোর্টে দেখা হবে।"

ওরা চলে যেতেই সফীকুল দেখল, হাজী সাহেব বাইরের ঘরের এককোণে বসে ওর দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে আছেন।

সফীকুল কিছু বলবার আগেই হাজী সাহেব বলে উঠলেন, "বিবির জন্য একটুও ভাবনা না। সব চাইতি বড় উকিলির সঙ্গে লড়তি যাচ্ছ, তুমি তুমার জনমাডাই ভাবো বাপ। এদিক আমরা দেখতিছি। আল্লাহ তুমার সহায় হোন।"

সফীকুল মামলা নিয়ে মেতে উঠল। ৩৭৬ ধারার মামলা। বলাৎকারের অভিযোগ। মহামান্য সম্রাট বাহাদুর বনাম মোহাম্মদ বাকিরুদ্দিন ওরফে লালা মিঞা এবং অন্যান্য। সরকার পক্ষের প্রধান প্রথম সাক্ষী অর্থাৎ ফরিয়াদী শ্রীমতী চিন্তামণি দাসী, দ্বিতীয় সাক্ষী তার স্বামী শ্রীপরাণচন্দ্র বৈরাগী, তৃতীয় সাক্ষী শ্রীকুঞ্জবিহারী সরকার, চতুর্থ সাক্ষী চৌকিদার শ্রীমনতোষ পাইক ইত্যাদি। প্রথম আসামী মোহাম্মদ বাকিরুদ্দী, পিতা মোহাম্মদ বদরুদ্দী, সাকিন বেতাইতলা থানা কোতোয়ালী, দ্বিতীয় আসামী মোহাম্মদ মইনুদ্দী, ওরফে সরাদ মিঞা, পিতা ও সাং ঐ, তৃতীয় আসামী মোহাম্মদ মণিরুদ্দী ওরফে গাজু মিঞা, পিতা মোহাম্মদ সদরুদ্দী, সাং ঐ।

অভিযোগ : সরকার পক্ষের ১নং সাক্ষী, পাশ্ববর্তী পাড় চাকলা গ্রামের শ্রীমতী চিন্তামণি দাসীকে দিনদুপুরে তার শোবার ঘরে ঢুকে উক্ত তিনজন আসামী কর্তৃক উপর্যুপরি বলাৎকার এবং

অমানুষিক অত্যাচারের ফলে গর্ভপাত ঘটানো, ৯নং সরকারী সাক্ষী তার স্বামী শ্রীপরাণচন্দ্র বৈরাগী-কে বলপূর্বক আটক রাখা এবং ৪নং সরকারী সাক্ষী, গ্রামের চৌকিদার শ্রীধনরায় পাইককে মারধোর। ঘটনার তারিখ ১০ এপ্রিল ১৯৩৬। থানায় এজাহারের তারিখ ১১ এপ্রিল ১৯৩৬। চৌকিদারকে মারপিটের অভিযোগ সম্পর্কে এজাহারের তারিখ ১৩ এপ্রিল ১৯৩৬।

সরকার পক্ষের উকিল খানবাহাদুর খোনকার মজলুর রহমান এবং আসামী পক্ষের উকিল সফীকুল মোল্লা। সফীকুল মোল্লা? সেসন জজ রায় পীতাম্বর চক্রবর্তী বাহাদুর বিস্মিতভাবে আদালতের দিকে চাইলেন। "কাউনসেল সফীকুল মোল্লা কে?"

খোনকার জজ সাহেবের মনোভাব আন্দাজ করে সঙ্গে সঙ্গে টিপ্পনী কাটলেন, "এ গ্রিন হরন ইওর অনার।"

জজ সাহেব পাত্তা দিলেন, "নেভার ইগনোর এনিথিং গ্রিন স্যার, এ গ্রিন বাম্বু, অফ টু ডে মে টার্ন টু বি এ ইয়েলো ওয়ান অফ টুমরো।"

জজ সাহেব ওর নামটা বলা মাত্র সফীকুল উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছিল। ও ভেবেছিল একটা ছিমছাম জবাব দিয়ে জজ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। যেমনভাবে কলেজের মুট কোরটে সহপাঠীদের প্রশংসা অর্জন করেছিল। কিন্তু সেশন জজের এজলাসে এতগুলো লোকের চোখের সামনে সফীকুল এমনই ঘাবড়ে গেল যে একটা কথাও ওর মুখ দিয়ে বের হল না। ওর কান ঝাঁ ঝাঁ করছে, গলা শুকিয়ে গিয়েছে, বুক ঢিপ ঢিপ করছে। কী করে যে পা দুটোর থরথরানিকে বেশী প্রশ্রয় দেয়নি সে নিজেও তা জানে না।

জজ সাহেব ওর দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। বললেন, "ওয়েল ইয়ং ফ্রেনড, জাসটিস ইজ ব্লাইনড, ডু ইউ নো হোয়াট ডাজ ইট মিন?"

সফীকুল হঠাৎ জড়তা কাটিয়ে উঠল। বলল, "ইওর অনার এখানে ব্লাইনড মানে অন্ধ হবে না, হবে ইমপারশিয়াল। নিরপেক্ষ।"

"হোয়াই?" জজ সাহেব বললেন, "মে আই নো?"

সফীকুল ক্রমশই উৎসাহিত হয়ে উঠছে। বলল, "ইওর অনার, জাসটিসের দুটো দিক আছে। একটা হচ্ছে প্রসেস। এটা সত্যে পৌঁছুবার পন্থা। এখানে আমরা কিছুতেই অন্ধভাবে পথ চলতে পারি নে। ইওর অনার, ব্লাইনডনেস মানে অন্ধত্ব, এখানে জাসটিসের পক্ষে বাধাই সৃষ্টি করে। এখানে চোখ কান এবং বুদ্ধি বিচার খোলা রাখাই অভিপ্রেত। জাসটিসের দ্বিতীয় দিকটা হচ্ছে জাজমেনট অর্থাৎ রায়। এখানে, ইওর অনার নিরপেক্ষতার মেটাফর হিসাবে ব্লাইনড কথাটা ব্যবহার করা যায়।"

"থ্যাংক ইউ, ইউ হ্যাভ মেড এ পয়েনট।" জজ সাহেব বললেন। "ওয়েল টেক ইওর সিট প্লিজ। রিমেমবার ইটস এ লং জার্নি অ্যানড ইটস এ ম্যান হিজ জার্নি, অ্যান্ড হি হু ল্যাক বি দি মোসট সিনসিয়ার, দি মোসট পেইনসটেকিং, ওনলি হি শ্যাল মেক ইট। গুড লাক। গড ব্লেস ইউ।"

বিরতির সময়েই সফীকুল তার মক্কেলদের সঙ্গে দেখা করে নিয়েছিল। এবং তাদের বলে দিয়েছিল, তারা নির্দোষ, এছাড়া যেন একটা কথাও না বলে। মামলাটা যত গড়াচ্ছে, ততই সফীকুল দেখল সেটা জটিল হয়ে উঠছে। রেপ কেস-এ আসামী পক্ষের হয়ে মামলা লড়ার প্রধান অসুবিধা হচ্ছে এই যে এটা এমনি একটা অপরাধ যার কথা শোনামাত্র সকলের সহানুভূতি ফরিয়াদীর উপর পড়ে। বিশেষত ফরিয়াদী যদি যুবতী হয় এবং তার মুখখানা যদি এমন ঢলঢলে হয় যে দেখলেই তার উপর মায়া পড়ে, তাহলে আসামীকে সমর্থন করা দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে চিন্তামণি দাসী যুবতী এবং দেখতে ভাল হওয়ায় তার কাজটা শক্ত হয়ে উঠেছে। তারপর এমনিতে বেশীর ভাগ রেপ কেসেই প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী থাকে না। অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ, অনুমান ইত্যাদি প্রধান সম্বল হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু এই কেস-এ প্রত্যক্ষদর্শী, একজন নয়, দু-দুজন। একজন সাক্ষী তো চিন্তামণির স্বামী নিজেই। আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শী কুঞ্জবিহারী। সে-ই দৌড়ে গ্রামের চৌকিদারকে ডেকে আনে। এবং চৌকিদারকে তারই চোখের সামনে আসামীরা মারধোর করে। সাক্ষী হিসাবে কুঞ্জবিহারী যে একজন ঘানু, সে-কথা অনভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও সফীকুলের বুঝতে বিলম্ব হয়নি। কুঞ্জবিহারী ঘাঘু মামলাবাজ। ওকে জেরা করে কাত করা যাবে না। আরেক প্রত্যক্ষদর্শী পরাণ। পরাণকে কাবু করতে পারবে কিনা, তা সে চেষ্টা করে দেখবে।

থানায় যে এজাহার দেওয়া হয়েছিল ফরিয়াদীর পক্ষ থেকে তার নকল আনাল সফীকুল। ঘাঁটতে দেখতে গিয়ে একটা আশ্চর্য ব্যাপার তার নজরে পড়ল। চিন্তামণি দাসীর উপর অত্যাচার সম্পর্কে এজাহার দেওয়াতে ১১ এপ্রিল চৌকিদার ধনরায় পাইকই চিন্তামণি, পরাণ এবং কুঞ্জবিহারীকে কোতোয়ালীতে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সেদিন তাকে যে মারধোর করা হয়েছে, এই মর্মে কোনও এজাহার সে দেয়নি। সে ১৩ এপ্রিল কোতোয়ালীতে গিয়ে আলাদাভাবে আর একটা এজাহার এই মর্মে লিখিয়ে আসে। একই ঘটনার জন্য দুটো আলাদা এজাহার, এ বড় আশ্চর্য ঠেকল তার কাছে। এর কী রহস্য? চট করে কোনও ব্যাখ্যা পেল না সফীকুল।

তাছাড়া এজাহারগুলো বিশ্লেষণ করে সফীকুল দেখল : ১। চিন্তামণির উপর বলাৎকার, ৩৭৬ ধারা, ২। পরাণকে বে-আইনিভাবে এবং বলপ্রয়োগের দ্বারা আটকে রাখা, ৩৪২ ধারা এবং সরকারী প্রতিনিধি চৌকিদারকে মারধোর করে কর্তব্যকর্মে বাধা দান, ৩৫৩ ধারা—পরিষ্কার এই তিনটি ধারাতেই যদিও আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা আনা যেত, কিন্তু ফরিয়াদী পক্ষের উকিল অন্য দুটো ধারাকে আমল না দিয়ে শুধুমাত্র ৩৭৬ ধারাতেই আসামীদের অভিযুক্ত করতে চাইছেন। কেন? ৩৭৬ ধারার কেস অন্য দুটো ধারার কেস থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে? এটাও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না সফীকুল। খোনকার মামলাটার গতিকে ধীরে ধীরে একমুখী করে তুললেন। রেপ। প্রকাশ্য দিবালোকে অসহায় স্বামী এবং প্রতিবেশীদের চোখের সামনে কুলবধূর উপর অনুষ্ঠিত সমাজের জঘন্যতম অপরাধ। এইদিকেই মামলাটাকে নিয়ে চলেছেন শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফৌজদারি উকিল খানবাহাদুর খোনকার সাহেব। সফীকুলকে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মানেই করেন না। তাঁর চোখে সফীকুল শুধু শিশু একজন।

বাড়িতে বসে মামলার নথি এবং তার নোটস মিলিয়ে দেখছিল সফীকুল আর ভাবছিল খোনকারের মতলব কী? মেডিক্যাল রিপোর্ট ৩৭৬-এর একটা বড় হাতিয়ার। খোনকার তাকেও আমল দিতে চাইছেন না। লেডি ডাক্তার মিস ডরোথী নলিনী দাস এবং সিভিল সার্জেন ডি পি মোকারজি এম আর সি এস, সরকার পক্ষের সাক্ষী নং ৭ এবং ৯, পারতপক্ষে এদের জেরাই করলেন না। আর এক কাণ্ডই করলেন বটে খোনকার। আদালত শেষ হবার মুখে ৭নং এবং ৯নং এই দুজন গুরুত্বপূর্ণ দু-জন সাক্ষীকে তুললেন সাক্ষীর কাঠগড়ায়। নোট মিলিয়ে দেখতে গিয়ে বেশ অবাকই হচ্ছিল সফীকুল। সে ভেবে পাচ্ছিল না, এ কী রকম জেরার ধরন।

খোনকার : আপনার নাম?

৭নং সাক্ষী : ডরোথি নলিনী দাস।

খোনকার : আপনার পিতার নাম?

৭নং সাক্ষী : স্যামুয়েল অম্বুজাক্ষ দাস।

খোনকার : আপনি কিসের ডাক্তার।

৭নং সাক্ষী : আমি মানুষের চিকিৎসা করি।

খোনকার : সরি, ডঃ দাস, আপনি কোন বিষয়ের স্পেশালিস্ট, আই মিন আপনি সার্জেন না ফিজিশিয়ান না এই ইয়ে—

৭নং সাক্ষী : আমি প্রসূতিবিদ্যা এবং স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ। গাইনোকোলজিস্ট।

খোনকার : কোনও নারী ধর্ষিতা হলে তার কি গর্ভপাত ঘটা সম্ভব?

৭নং সাক্ষী : ধর্ষণ গর্ভপাতের একটা কারণ বটে। তবে—

খোনকার : থ্যাংক ইউ ডক্টর।

সফীকুল আদালতের কাছে প্রার্থনা জানাল একনাগাড়ে দু-জনকে এক সঙ্গেই সে জেরা করতে চায়। আদালত অনুমতি দিলেন। খোনকারের অনুরোধে এর পর সিভিল সার্জেন সাক্ষ্য দিতে উঠলেন।

খোনকার : ডাঃ ডি পি মোকারজি এ শহরে আবাল-বৃদ্ধবনিতার কাছে আপনি পরিচিত। তা সময় সংক্ষেপের জন্য ভণিতা বাদ দিচ্ছি। আই সে ডকটর হাউ ডাল্লুয়েবল ইজ ইওর টাইম।

৯নং সাক্ষী : থ্যাংক ইউ স্যার।

খোনকার : ডঃ এই রিপোরট আপনি তৈরি করেছেন?

৯নং সাক্ষী : ইয়েস স্যার।

খোনকার : আচ্ছা ডা মোকারজি আমি যদি বলি, কোনও গর্ভবতী নারীকে যদি তিন জন দুর্বৃত্ত উপর্যুপরি পৈশাচিকভাবে ধর্ষণ করে তবে তা গর্ভপাত হতে পারে, আপনি কি একজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মেডিক্যাল একসপার্ট হিসেবে এই বিবৃতি প্রতিবাদ করবেন?

৯নং সাক্ষী : ইউ সি কাউনসেলার—

খোনকার : প্লিজ ডকটর প্লিজ, সে ইয়েস অর নো। আই নো দি ভ্যালু অফ ইওর টাইম।

৯নং সাক্ষী : ওয়েল, নো।

খোনকার : থ্যাংক ইউ। দ্যাটস অল।

নোটস দেখতে দেখতে সফীকুল উত্তেজিত হয়ে উঠল। এ তো স্পষ্ট মুখ বন্ধ করা। খোনকারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সাবকানসটানশিয়াল এভিডেনস, বিশেষজ্ঞের মতামত, এসব তিনি নিঃশব্দে একেবারে ছেঁটে দিতে চাইছেন খোনকার। তাই নাড়াচাড়া করে এগুলোকে সেরে ফেললেন তিনি। হঠাৎ একটা ব্যাপার তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল সে বুঝে গেল, খোনকার যে বিষয়গুলো ঠেলো করে দেখাচ্ছেন, গুরুত্ব না দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইছেন সেইগুলোই ওঁর দুর্বল স্থান। সফীকুলকে যদি সফল হতে হয় তবে তার এই সব জায়গাতেই জোরে ঘা মারতে হবে। প্রথম দিকে সফীকুল ভেবেছিল এত প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী সাথে খোনকারের হাতে যে খোনকার বোধ হয় ওয়াক ওভার পেয়ে যাবেন জোর জার করে বেরিয়ে যাবেন মহরমের বাজনা বাজিয়ে। কিন্তু এখন তো সে দেখছে অনেকগুলো ব্যাপারের মুখোমুখি হতে চাইছেন না তিনি। সফীকুল তার নোট বই খুলে প্রতিপক্ষের দুর্বলতার জায়গাগুলো খুঁজে বের করতে লাগল।

১। একই অভিযোগের জন্য দুদিন দুটো এজাহার দেওয়া হল। কেন? চৌকিদারকে মারা হল, তার কর্তব্য কর্মে বাধা দেওয়া হল। এজাহারে হল। মামলায় তার উল্লেখ নেই। কেন?

২। ফরিয়াদীর স্বামীকে জবরদস্তি আটকে রাখার অভিযোগ থানায় এজাহার দেওয়া হল, কিন্তু মামলায় তাকে আদৌ প্রাধান্য দেওয়া হল না। কেন?

৩। গর্ভপাতের ব্যাপারটায় বিশেষজ্ঞদের অভিমত জানতেই দেওয়া হল না বরং তাঁদের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার ঝোঁকই দেখা গেল। কেন?

রেপ কেসের দুটো প্রধান শর্ত : কোনও রমণীর সঙ্গে (১) তার আপত্তি সত্ত্বেও এবং (২) তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক সহবাস করলে তবে তাকে ভারতীয় পেনাল কোড মোতাবেক ধর্ষণ বলা যাবে। নচেৎ তা রেপ হবে না। সফীকুলের কানে কেবল 'উইদাউট হার কনসেনট' অর্থাৎ আপত্তি সত্ত্বেও এবং 'এগেনসট হার উইল' অর্থাৎ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ইংরাজী বাংলা এই কয়টা শব্দ মর্মান্তিক অনবরত ধ্বনিত হতে লাগল। খোনকারের গতিবিধি দেখে সফীকুলের মনে একটা অসম্ভব ইচ্ছা অঙ্কুরিত হতে থাকল। সে যদি সতর্কভাবে অগ্রসর হয় তবে হয়ত খোনকারের সফলতা না-ও আসতে পারে। কিন্তু সেই সম্ভাবনা সফীকুলের কাছে এখনও দূরের স্বপ্ন।

মামলার তৃতীয় দিন সফীকুল ক্রস একজামিন করতে উঠে সরকার পক্ষের ৭নং সাক্ষী ডঃ ডরোথী নলিনী দাসকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কাল বলেছেন ডাক্তার, যে ধর্ষণ গর্ভপাতের একটা কারণ, তার মানে কি এই বুঝব যে গর্ভপাতের আরও কারণ আছে?"

৭নং সাক্ষী : নিশ্চয়ই আছে। আমি সেই কথাই কাল বলতে গিয়েছিলাম। কিন্তু—

সফীকুল সবিনয়ে বলল, আমার অভিজ্ঞ এবং বিজ্ঞ সহযোগির কাছে সময়ের দাম গিনি সোনা। আমি গ্রিন হরন, আমি শিক্ষার্থী, ব্যাপারটা একটু ভাল করে বুঝে নিতে চাই।

খোনকার : অবজেকশন, ইওর অনার, এটা আদালত, মেডিকেল ইশকুল নয়। অবান্তর এবং অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপারে সময় নষ্ট হোক, এটা আমরা চাই না।

সফীকুল : ইওর অনার, রেপ এবং গর্ভপাত উভয়ই আমার অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞ সহযোগীর কাছে খুবই প্রাসঙ্গিক। অন্তত আমার ধারণা তাই। আমার ধারণা, ব্যাপারটা আদালতও জানতে চাইবেন।

জজ সাহেব : বলুন।

সফীকুল : ডঃ মিস দাস, আপনি অনুগ্রহ করে জানাবেন কি যে ধর্ষণজনিত গর্ভপাতের কি কোনও বৈশিষ্ট্য আছে?

৭নং সাক্ষী : আছে। ধর্ষণকালে নারী দেহে এবং মনে প্রচণ্ড আঘাত পায় তার ফলে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টার মধ্যেই তার গর্ভপাত ঘটে যায়।

সফীকুল : ডঃ মিস দাস, ধরুন, কোনও গর্ভবতী রমণীকে তিন জন দুর্বৃত্ত পৈশাচিকভাবে ধর্ষণ করল, এ ক্ষেত্রেও কি ১০ থেকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে গর্ভপাত ঘটবে,

খোনকার : ইওর অনার, অবজেকশন এটা লিডিং কোশ্চেন হচ্ছে!

জজ সাহেব : প্রাসঙ্গিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আপত্তি খারিজ। ডঃ জবাব দিন।

৭নং সাক্ষী : অবশ্যই ঘটবে।

সফীকুল : এমন কি হতে পারে না যে, এই ধরনের পৈশাচিক ধর্ষণের তিন-চার দিন, ঘণ্টা নয় ডাক্তার, দিন বলছি, তিন-চার দিন পরে কি উক্ত রমণীর ঐ কারণে গর্ভপাত হতে পারে?

৭নং সাক্ষী : গর্ভপাত হতে পারে, তবে যে গর্ভপাত তিন-চার দিন পরে ঘটে তার কারণ তিন-চার দিন আগেকার ধর্ষণ নয়, অন্য কোনও কারণেই তা ঘটবে।

সফীকুল : আপনি তো এই মামলার ফরিয়াদী শ্রীমতী চিন্তামণিকে পরীক্ষা করেছেন?

৭নং সাক্ষী : আজ্ঞে হাঁ করেছি।

সফীকুল : কত তারিখ ছিল সেটা মনে আছে?

৭নং সাক্ষী : ১৫ এপ্রিল ১৯৩৬।

সফীকুল : আপনি চিন্তামণির শরীরে গর্ভপাতের কোনও লক্ষণ দেখেছিলেন?

৭নং সাক্ষী : না। ওর শরীরে গর্ভপাতের কোন লক্ষণ ছিল না।

সফীকুল : ধন্যবাদ ডাক্তার মিস দাস। আপনি যেতে পারেন।

পরের সাক্ষী সিভিল সার্জেন সাহেব।

সফীকুল : আপনার কাছ থেকে জাস্ট একটা মেডিকেল ওপিনিয়ন নিতে চাই ডঃ মোকারজী। আপনার আগে ডাঃ মিস দাস বলে গেলেন, গর্ভবতী নারী ধর্ষিতা হলে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে তার গর্ভপাত হবে, তা না হয়ে যদি ধর্ষণের তিন চার দিন পর হয়, তবে তাকে আর ধর্ষণজনিত গর্ভপাত বলা যাবে না। ডঃ মোকারজি একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে আপনি আদালতকে জানাবেন কি যে এটা ডঃ মিস দাসের ব্যক্তিগত মত না মেডিকেল সায়েন্সের মত?

খোনকার : ইওর অনার, দিস ইজ নট প্রপার ক্রস একজামিনেশন। আই স্ট্রংলি অবজেক্ট!

সফীকুল : ইওর অনার, একটা ভাইটাল ব্যাপারে আমার বিজ্ঞ সহযোগী কি আদালতকে বিভ্রান্ত করার জন্য সজ্ঞানে আপত্তি করছেন? আপত্তি নেই। বাট দিস ইজ নট প্রপার প্রসিডিওর।

জজ সাহেব : আপনি সাক্ষীকে এই প্রশ্ন করছেন কেন? আর ইউ সিওর ইউ আরনট ডিভিয়েটিং, ইউরসেলফ?

সফীকুল : আই অ্যাম অ্যাবসলিউটলি সিওর ইওর অনার। আদালতের জানা উচিত এত বড় একটা ভাইটাল ম্যাটারে আগের সাক্ষী যা বলে গেলেন সেটা তার ব্যক্তিগত অভিমত না মেডিক্যাল সায়েন্সের স্বীকৃত মত, সেটা জানা এই মামলার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। ইউর অনার, দি প্রপার প্রসিডিওর ইজ, হোয়াট আই আন্ডারস্ট্যান্ড, টু হেল্প দি কোর্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি কেস প্রপারলি অ্যান্ড নট টু কনফিউজ ইট।

আই অ্যাম সিওর ইওর অনার দ্যাট আই অ্যাম হেল্পিং দি কোর্ট।

জজ সাহেব : আনসার দ্য কোয়েশচেন।

৯নং সাক্ষী : ওটা মেডিকেল সায়েন্সেরই মত। ধর্ষণের ভায়োলেন্স এবং শক এমন প্রচণ্ডভাবেই শরীর এবং মনের উপর ধাক্কা মারে যে গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

সফীকুল : এবং ১০ থেকে ১২ ঘণ্টার মধ্যেই তা হয়ে যায়?

৯নং সাক্ষী : নরম্যাল এবং হেলদি নারীর ক্ষেত্রে তা হয়।

সফীকুল : চার-পাঁচ দিন পরে হতে পারে না?

৯নং সাক্ষী : না। তাহলে বুঝতে হবে এ ক্ষেত্রে অন্য কারণ আছে।

সফীকুল : আপনি ফরিয়াদী চিন্তামণিকে পরীক্ষা করেছেন?

৯নং সাক্ষী : হাঁ।

সফীকুল : ১৫ এপ্রিল ১৯৩৬?

৯নং সাক্ষী : হাঁ।

সফীকুল : আপনি আবরশনের কোনও চিহ্ন ওর শরীরে দেখেছেন?

৯নং সাক্ষী : না।

সফীকুল : এমন কোনও লক্ষণ আপনি কি ফরিয়াদী চিন্তামণির শরীরে দেখেছেন, যাতে করে আপনি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যে, ১০ এপ্রিল থেকে ১৫ এপ্রিলের মধ্যে চিন্তামণির গর্ভপাত ঘটেছে?

৯নং সাক্ষী : বলতে পারি যে ঐ সময়ের মধ্যে ওর গর্ভপাত ঘটেনি।

সফীকুল : চিন্তামণি যে গর্ভবতী ছিল, আপনি যখন ওকে পরীক্ষা করেন, অন্তত তখন পর্যন্ত, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত?

৯নং সাক্ষী : আমার রিপোর্টেই উল্লেখ আছে গর্ভবতী ছিল।

সফীকুল : আপনার কি মনে হয়, সে নরম্যাল?

৯নং সাক্ষী : হাঁ।

সফীকুল : হেলদি?

৯নং সাক্ষী : হাঁ।

সফীকুল : তাহলে ডঃ মোকারজি, চিন্তামণি সুস্থ ও স্বাভাবিক নারী। সে গর্ভবতী। তাকে তিন তিন জন দুর্বৃত্ত পর পর ধর্ষণ করল। আমার পরম বিজ্ঞ প্রসিকিউশন কাউন্সেলের ভাষায় পৈশাচিকভাবে। অল্প সময়ের মধ্যে প্রচণ্ড ভায়োলেন্স ও শক হল। এ ক্ষেত্রে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টার মধ্যেই, আপনাদেরই মেডিকেল সায়েন্সের তত্ত্ব অনুযায়ী, গর্ভবতী চিন্তামণি দেহে ও মনে যে পরিমাণ শক পেয়েছে, তাতে তার তো আবরশন হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। নয় কি?

৯নং সাক্ষী : নিশ্চয়ই।

সফীকুল : কিন্তু আপনারা দুজনেই রিপোর্ট দিলেন যে পনের এপ্রিলের মধ্যে তার আবরশন হয়নি। আপনি এর কী ব্যাখ্যা দেবেন?

খোনকার : অবজেকশন, অবজেকশন। ইওর অনার, হি ইজ গোয়িং টু ফার। ইটস নো ক্রস একজামিনেশন। দিস ইজ এ লিডিং কোশ্চেন। দিস ইজ, দিস ইজ মিসলিডিং পুটিং ওয়ানস আইডিয়া ইন টু আদারস মাইন্ড। ইওর অনার,

জজ সাহেব : ডেফিনিট! এ লিডিং কো-শ্চেন অফ দি [illegible]। [illegible]?

সফীকুল : [illegible], আই উইথড্র।

জজ সাহেব : অল রাইট। আপনি প্রসিড।

সফীকুল : থ্যাংক ইউ স্যার। আপনাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা নেই।

একটা বড় রকমের জয় হয়েছে। খোনকারকে সে বিচলিত করে তুলতে পেরেছে। [illegible] দেখছিল সফীকুল। রাত অনেক হয়েছে। এক বড় কাগজে পয়েন্ট লিখছিল সফীকুল।

১। চিন্তামণির আবরশন হল না কেন?

২। চিন্তামণি কি সত্যিই দুর্বৃত্তদের দ্বারা বলাৎকারিতা হয়েছিল, যেমন বলেছে?

৩। চিন্তামণির বা দুর্বৃত্তদের কারো শরীরেই কোনও আঁচড় কামড়ের দাগ নেই কেন (দ্রষ্টব্য মেডিকেল রিপোর্ট)

৪। দুর্বৃত্তরা বলিষ্ঠ সংখ্যায় তিনজন, এবং জোয়ান, তবুও কারও হাতেই কোনও অস্ত্র ছিল না ফরিয়াদী পক্ষের ১নং, ২নং ৩নং এবং ৪নং সাক্ষী সে কথা স্বীকার করেছে। এবং চিন্তামণি এও বলেছে যে আসামীরা একজন একজন করে তার ঘরে ঢুকেছে একসঙ্গে দুজন কখনোই ঘরে ঢোকেনি বা ছিল না দুজন করে পরাণকে চেপে ধরে রেখেছিল এবং অন্য জন চিন্তামণির উপর অত্যাচার করছিল। কেন তিনজন প্রত্যক্ষদর্শী এই সাক্ষ্য দিয়েছে। এর দুঃখের বিষয় সফীকুল একটা সাক্ষীকেও ভাঙাতে পারেনি। এখানেই তার ব্যর্থতা। আরে বাঃ! হাঁ তাই তো? চিন্তামণি ঘরে খিল তুলে দেয়নি কেন? প্রথমবার না হয় আচমকা অত্যাচারটা হয়ে গেল। কিছু করার ছিল না। কিন্তু প্রথম আসামী বেরিয়ে যাবার পর? এবং দ্বিতীয় আসামী ঘরে ঢোকার আগে? তখন খিল দেয়নি কেন ঘরে কেন? কিছুক্ষণের জন্য হলেও সে তো একাই ছিল তার ঘরে? তাহলে? এবার কী দাঁড়াল?

চিন্তামণির ঘরে তিনজন আসামীরা একধারে একজন করে ঢুকল। তার আপত্তি সত্ত্বেও এবং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা তিনজন একে একে তার উপর অত্যাচার করে বেরিয়ে এল। এবং প্রত্যেকবারই সে প্রচণ্ড বাধা দিয়েছে। অথচ দেখা যাচ্ছে :

ক। চিন্তামণি বা আসামী, কারও শরীরেই আঁচড় কামড়ের দাগ নেই।

খ। চিন্তামণি সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ঘরজোড়া খিল এঁটে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেনি।

গ। প্রচণ্ড "ভায়োলেন্স" তার উপর হওয়া সত্ত্বেও এবং প্রচণ্ড "শক" পাওয়া সত্ত্বেও গর্ভবতী চিন্তামণির গর্ভপাত ঘটেনি।

এই তিনটি ঘটনাই যে কোনও যুক্তিশীল লোকের সিদ্ধান্তকে একটি জায়গাই অভ্রান্তভাবে পৌঁছে দেবে। এবং তা হল আসামীরা চিন্তামণির সঙ্গে যাই করে থাক, "উইদাউট হার কনসেন্ট" এবং "এগেনস্ট হার উইল" কিছু করেনি। অর্থাৎ চিন্তামণি বাধা দেয়নি। যা ঘটেছে তা তার সম্মতি এবং ইচ্ছা অনুসারেই ঘটেছে। অতএব আসামীদের কিছুতেই ধর্ষণের দায়ে ৩৭৬ ধারায় অভিযুক্ত করা যায় না।

সফীকুল বলল, "এই হচ্ছে আমার সওয়াল।"

তারপর খোনকারকে উদ্দেশ্য করে বলল, "পারো তো ঠেকিয়ে দাও।"

তারপর অন্ধকারের দিকে চেয়ে বলল, "ইওর অনার। আসামীদের ৩৭৬ ধারায় অভিযুক্ত করা চলে না। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য বর্ণিতমত বিভ্রান্তিকর। আপাতদৃষ্টিতে তাদের সাক্ষ্য যে ধারণাই সৃষ্টি করুক না কেন, এখানে সারকামস্টেনশিয়াল এভিডেন্স অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এবং নিশ্চয়ই আসামীরা নিরপরাধ। ওদের খালাস দেওয়া হোক এই আমার নিবেদন।"

খুশী সফীকুল এই রাত দুপুরে জোর করে এক

দৃষ্টিকোণ

স্মৃতি, বিস্মৃতি ইত্যাদি

পশুর সঙ্গে মানুষের বোধ করি মৌলিক ফারাক একটিই, মানুষের স্মৃতি আছে পশুর নেই। স্মৃতি অর্থে এখানে স্থূল ইন্দ্রিয়বোধ অভিজ্ঞতার কথা বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে না প্রত্যক্ষ ধারণার কথা। এই স্মৃতি কেবল দুঃখকাল, দুরবস্থা এবং দুঃখ-ঘটনাকে মনে রাখাই নয়, এই স্মৃতি এক প্রকারের আবিষ্ক্রিয়া বেদনা-বোধ, কল্পনার জারকরসে মজানো। এই স্মৃতি ছোট রাগের সুখদুঃখ বন্দনার কারবারী নয়, এই স্মৃতি এক ধ্যানের উপলব্ধি, মানুষের উজ্জ্বল উত্থান। মানুষের এক বিচিত্র ধারণ-ক্ষমতা।

স্মৃতিভ্রষ্ট মানুষ কোনোদিন বড় হতে পারে না, কোনোখানেই না। কি বিদ্যায়, কি জীবনে-জীবিকায়, কি সৃজন-প্রজননে। আমি নিজে ছোটবেলা থেকেই স্মৃতিশক্তি থেকে বঞ্চিত। মাত্র চব্বিশ-পঁচিশ সপ্তাহের ব্যবধানে পর পর দুটি কঠিন অসুখ আমার চোখ-কান-মাথা—এই তিনকেই চিবিয়ে খেয়ে গিয়েছিল। ফলে আমার না হয়েছে লেখাপড়া, না কার্যসিদ্ধি, না বিত্তবান হওয়া। বয়সে যত বড় হতে থাকলাম আমার রথের চাকা ততই কর্ণের মত বসে যেতে থাকল।

কিছুই আমি মনে রাখতে পারি না, বার তারিখ বারে বারে ভুল হয়ে যায়, নিজের চোখে দেখা কত দৃশ্য, কত ঘটনা, কত পরিচিত মুখ ভুল হয়ে যায়। নাম মনে পড়ে না। গত সপ্তাহে পড়া বইয়েরও বিষয়বস্তু, ভাল লাগা বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো ভুল হয়ে যায়। ভুল হয়ে যায় বুকে-চমক-দেওয়া কবিতার লাইন, ভুল হয়ে যায় গানের সুর। কথা দিয়ে কথা রাখতে ভুলে যাই, পরে করব বলে জমিয়ে রাখা কাজ ভুলে যাই করতে। কাজের কাগজপত্র কোথায় রেখেছি কিছুতেই মনে পড়ে না, এমনি অসংখ্য বিস্মরণ।

ফলে এক এক সময় নিজেকে দুর্বল লাগে, নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হয়, মনে হয় ফাঁপা অন্তঃসার-শূন্য দিন থেকে দিনে গড়িয়ে-যাওয়া মানুষ। আমি কতবার ট্রামে-বাসে ভুল করে দুবার টিকিট কেটেছি, কখনও না-কেটেই নিশ্চিত বিশ্বাসে ভাড়া নেড়ে দিয়েছি। এমনও হয়েছে, সিনেমার টিকিট কেটে ফেলে শো-আরম্ভ হওয়ার অনেক দেরী আছে দেখে ঘুরে বেড়াতে কিংবা অন্য ছোটখাটো কাজ সারতে গেছি, কিন্তু আর ফিরে আসিনি। রাতে বাড়ি ফিরে জামা খুলতে গিয়ে তারপর টিকিট দেখে চমকে উঠেছি। একবার তো ব্যাপার চরমে গড়িয়েছিল। এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে ইভনিংশো-এ সিনেমা দেখে ধর্মতলা থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরেছি, উদ্দেশ্য, ওকে একখানা মারাত্মক বই হাতে হাতে দিয়ে দেব। ওকে গলিতে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি ভেতরে ঢুকলাম। সারাদিন পরে ভেতরে তখন অন্য মানুষ, অন্য পরিবেশ, অন্য কথাবার্তা। ব্যস একেবারে কাঁচা ঘুম ভাঙল ছোট বোনের ধাক্কা খেয়ে। এত রাতে আমাকে বাইরে নাকি কে ডাকছে। বিরক্ত হলাম, বিস্মিতও হলাম। চোখ কচলাতে কচলাতে সদর খুলেই ভূত দেখলাম। আমার লাজুক বন্ধুটি সামনের বাড়ির রোয়াকের ওপরে ট্রেন-ফেল-করা প্যাসেঞ্জারের মত বসে আছে।

ঘটনাটা একচুল বানানো নয়, তবে আমার জীবনে এরকম ঘটনা একবারই ঘটেছিল। অবশ্য অন্য রকমের ভুলচুক অনেক হয়েছে। চিঠি লিখে চাপা দিয়ে রেখে তাড়াহুড়োয় অন্যের নাম ঠিকানা লেখা খামের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি। একবার কি হয়েছে, রাস্তার ডাক-বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে একটা আধা লেখা চিঠি সম্পূর্ণ করে পোস্ট করে দিয়েছি। খুব তাড়া, এক্ষুনি দৌড়ে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে। কয়েককদম দৌড়েও ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ বুক পকেটে কলমটা রাখতে গিয়ে যেন ইলেকট্রিক 'শক' খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। কলম কোথায়, তার বদলে আমার হাতে রয়ে গেছে না-ফেলা চিঠিটাই। ফলে সেদিন আমার আর ট্রেন ধরা হল না, লেটারবক্স ক্লিয়ারেন্সের সময় অবধি ঠায় সেখানে পাহারার মত প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলাম।

টেলিফোন আজকাল কলকাতাবাসীদের কত ভোগাচ্ছে, বছর আঠারো আগে আমিও একবার খুব ভুগেছিলাম। একটা কনেকশন জরুরী দরকার, পরিচিত এক বাড়ি থেকে পাঁচ বার ডায়াল করলাম, কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। অথচ যন্ত্রটি মৃত নয় তা তার বুকের ধুকধুকে আওয়াজ থেকে মালুম পাচ্ছি। গৃহস্বামী অবশেষে আমাকে উদ্ধার করতে বিনীতভাবে হস্তক্ষেপ করলেন, বললেন, 'বলুন নম্বরটা, আমি দেখছি।'

কিন্তু নম্বরটি বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেই যে অট্টহাসি শুরু হল, আর থামতেই চায় না। হাসি থামতে হতভম্ব আমি প্রশ্ন করলাম, 'কি হয়েছে?'

ভদ্রলোক ফের হাসতে শুরু করে বললেন, 'সেম-সাইডে গোল দেবার তালে ছিলেন মশাই, আবার বলছেন কি হয়েছে! আমারই টেলিফোন নম্বর সেই থেকে ঘুরিয়ে চলেছেন, তা যন্ত্রের আর দোষ কি!'

একবার এক বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটতে ঘটতে বেঁচে গিয়েছিলাম সেই কথা বলি। এক প্রবাসী বন্ধুকে বিজয়ার চিঠিতে তার মায়ের কুশল সংবাদ জানতে চেয়েছিলাম। জবাবে বন্ধুটি আট দশ মাস আগে লেখা আমারই একখানা চিঠি খামে ভরে ফেরত পাঠিয়েছিল। চিঠিটা পড়ে গায়ে কাঁটা দিল। সেই চিঠিতে ওর মায়ের আকস্মিক পরলোকগমনের সংবাদে বিস্তর সমবেদনা ও সান্ত্বনা জানিয়েছিলাম।

লোকের নাম ভুলে যাওয়া ইদানীং একটা রোগের মতই আমাকে পেয়ে বসেছে। কতজনের সঙ্গে ইতস্তত নতুন আলাপ হয়। সে আলাপ কথায় কথায় অনেক সময়ই খুব জমে ওঠে কিন্তু আলাপিত মানুষটি বিদায় নেবার আগেই সভয়ে লক্ষ করি, তাঁর নামটা বিলকুল ভুলে মেরে দিয়েছি। এই রকম ঘনিষ্ঠতার পর দ্বিতীয়বার আর নাম জিজ্ঞাসা করা চলে না। পথে আপনজনের মত কেউ কেউ আচমকা সামনে এসে দাঁড়ায়, কাঁধে থাবড়ের ওজনদার থাপ্পড় মেরে কি হাতের মধ্যে হাত নিয়ে মুখ চোখে হাসে, আমার কিছুই মনে পড়ে না, পালাবার জন্যে ছটফট করতে থাকি, ব্যস্ততার ভান করি। হায়, কে আমাকে এখন বলে দেবে আধচেনা মুখের এই মানুষটি কে? কোথায় আলাপ, শেষ আলাপের সময় কোথায় একে ছেড়েছিলাম, আপনি তুই না তুমি-তে?

এই কারণে অনেকে আমাকে ভুল বোঝে, অনেকে আমাকে ধূর্ত আর অহংকারী মনে করে। কিন্তু আমি যে কত অক্ষম, কত অসহায় সে শুধু আমি নিজেই জানি। ছুটন্ত ট্রামবাসের মত অনেক প্রিয় মানুষকে ধরবার চেষ্টাও এইভাবে আমার হাত থেকে ফসকে যাচ্ছে, আমি শূন্যে ঝুলছি, কি করে যেন ঝুলেই আছি, পায়ের তলায় কোথাও মাটি দেখতে পাচ্ছি না।

এই স্বীকারোক্তিমূলক লেখাটি আমার চাকরি যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট তবু সত্যি কথা আমাকে বলতেই হবে। দীর্ঘ ষোল বছর কি করে কলেজে মাস্টারি করলাম, কি করে ছেলেমেয়েদের জ্ঞান দান করলাম নিজেই জানি না। পড়ানো কাজটা হয়ত খুব খারাপ করিনি কিন্তু শিক্ষকের দায়-দায়িত্ব কতটুকু পালন করতে পেরেছি খুবই সন্দেহ আছে। এক একদিন ক্লাসে রোলকল করতে গিয়ে যখন প্রথম দশ পনেরোটি ক্রমিক সংখ্যা ডেকেও কোন সাড়া পেতাম না বিরাট হলঘরভর্তি ছাত্রছাত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুকটা ধড়াস করে উঠত। আবিষ্কার! একটা মুখও যে চেনা লাগছে না, তবে কি ভুল করে সায়েন্সের ক্লাসে চলে এসেছি। এমন ঘটনা অবশ্য বাস্তবে ঘটেনি, কিন্তু এমন ভয় আমি বাস্তবিকই একাধিকবার পেয়েছি। টেস্ট পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর দলবেঁধে ছেলেমেয়েরা আবদার করে সাজেশান চাইতে আসে, প্রায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মত এটা একটা রেওয়াজ এবং চাঁদা দেওয়ার মতই মাস্টারমশাইদেরও না করবার রীতি নেই। রাজী হই কিন্তু কাঁপতে থাকি সঙ্গে সঙ্গেই, এরা পার্ট ওয়ানের ছাত্র না পার্ট টু-র? ইলেকটিভ বাংলার না অনার্সের? এত প্রিয় সম্বন্ধ ছাত্রের মুখোমুখি নিয়ে ওরা আসে যে সে কথা আমি জিজ্ঞেস করি কোন মুখে!

অথচ আমার কোন কোন সহকর্মী এক একটি জিনিয়াস, ওঁদের মেমরি-ইনডেক্স প্রায় কম্পিউটারের মেশিনের মত নিখুঁত এবং ত্রুটিহীন। ক্লাসের ছাত্র-দের বিবরণ যেন মানসপটে সব হুবহু, যেন ছবির নখদর্পণে। কেবল বর্তমানের নয়, প্রাক্তনদেরও সব-জীবনের অনুপুঙ্খ তাঁরা বিন্দু বিন্দু রাখেন।

বিস্মৃতির অভিশাপের কথা ভাবতে ভাবতে মনে হয় স্মৃতি নিজেও কি বিশ্বাসঘাতক নয়? জীবনে কত কিছু মানুষ ভুলবে না ভাবে কিন্তু স্মৃতি তার কতটুকুই বা ইচ্ছা পূরণ করে? জরুরী ঘটনা, সাংসারিক দিক থেকে অনেক মূল্যবান ব্যাপার কি সে দূর-দূর করে থাকে না? অদ্ভুত স্মৃতির ঝুলিতে অপদার্থ জঞ্জাল যা পড়ে থাকে তা কি অনেক তুচ্ছ, অনেক অর্থহীন সস্তাই যা ইচ্ছা পূরণ করে? জরুরী ঘটনা, সাংসারিক দিক থেকে অনেক মূল্যবান ব্যাপার কি সে দূর-দূর করে থাকে না? অদ্ভুত স্মৃতির ঝুলিতে অপদার্থ জঞ্জাল যা পড়ে থাকে তা কি অনেক তুচ্ছ, অনেক অর্থহীন সস্তায় নয়? আমাদের জীবনস্মৃতির দিকে তাকালে এরকম অনেক বাসীখলা আকর্ষণ, বিজয়দৃপ্তিহীন নাস্তিকতা চোখে পড়ে। শিশুর মত সে তার নিজস্ব ভাঁড়ারে সযত্নে তুলে রাখে ভাঙা পেন্সিলের টুকরো, রাংতার কুচি কি সস্তা পুঁতির মালা। সেগুলো কুড়োনোর সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দিলেই ভাল হত; জমিয়ে রেখে মধ্য-দিনে কি সোহাগ আর নাড়ানো!

তাই বড় হয়ে শেষ দিকে পিছনদিকে যখন ঘাড় ফিরিয়ে তাকানো যায় তখন চেয়ে দেখি রাস্তার পাকা মাইলস্টোনগুলো আর চোখেই পড়ে না, দুপাশের ইতিহাস-ভূগোল অনেকখানিই মুছে ঝাপসা—বড় বড় পরীক্ষা পাস, আশানিরাশা, বিপর্যয়, অনেক জমা-খরচের অঙ্ক সেকেলে ফিকে ন্যাতার জলে, অনেক জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের পুঙ্খানুপুঙ্খতা স্মৃতির দেয়াল থেকে ইরেজ করা হয়ে গেছে। শুধু তাদের মধ্যে অকারণে জ্বলজ্বল করছে দুচোখে মামুলী তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, কিছু উপেক্ষণীয় অপমান, এক-আধটা শিশু-সুলভ উচ্চারণের আস্বাদ। শত চেষ্টা করেও তা ভুলতে পারিনি। হয়ত একটা বাঁশি বাজে গানের লাইন, এক-আধটা হাতে খড়ি বিদিত, প্রথম অবৈজ্ঞানিক বিবিধক্রম, অভিজ্ঞ নারী-চেতনা, কি কাঁপা আঙুলে প্রথম সিগারেট। অনুপ্রবেশকারী স্মৃতির চেহারা ঠিক এই রকমই।

দুটি একটি পথিক চলে
গল্প করে হেসে,
লজ্জাবতী বধূটি চলে
ঘোমটি দিয়ে পাশে।

প্রশ্ন এই, তাহলে স্মৃতিজীবী মানুষ মাত্রেই কি সুখী? স্মৃতির অনুগ্রহে যিনি ধন্য, যিনি কিছুই ভোলেন না, অক্ষরে অক্ষরে সব মনে রাখেন, যাঁর মগজ বিবর থেকে একটা কমা-সেমিকোলনও পালিয়ে যায় না, ছায়াছবির মতই জীবনের পূর্ব অধ্যায়গুলি যিনি চোখ বুজলেই দেখতে পান তাঁর মানসিক অবস্থাটা প্রকৃতপক্ষে কি রকমের? স্মৃতি যে পর্যায়ক্রমে পুঙ্খানুপুঙ্খ, প্রায় যান্ত্রিক, দৃষ্টি এবং যুক্তিহীন তা টের পেতে আমার বিলম্ব হয়নি। কলেজ জীবনে আমাদের এক শিক্ষাগুরুকে দেখেছিলাম যিনি দুরারোগ্য স্মৃতির দ্বারা আক্রান্ত, প্রত্যহ এবং প্রতিমুহূর্তে যিনি স্মৃতি-পীড়িত। যুক্তি এবং দর্শন যাঁকে প্রায় পাগল করে রেখেছে, ইনসমনিয়ার রোগীর মত যিনি ক্রমাগত স্মৃতিতে কাতরে বেড়ান। বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাস যিনি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা মুখস্থ বলে যেতে পারেন, সেক্সপীয়ার থেকে রবীন্দ্রনাথ, ভারতচন্দ্র থেকে মাইকেল [illegible], চল্লিশ বছরের অধ্যাপনা-জীবনে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর প্রবেশ প্রস্থান যাঁর স্মরণে আছে। তাঁর কাছেই শুনেছি, যৌবনে এম এ পরীক্ষার আগে তিনি পথে বেড়াতে বেরোতেন কানে তুলো গুঁজে। পাছে অবাঞ্ছিত, অনাবশ্যক কিছু কথা কানে ঢুকে যায়। কারণ, তাঁর কানে ঢোকার অর্থই মনের ভিতর দিয়ে মরমে পশে যাওয়া।

আমাদের ছাত্রদশায় একবার এক ধরাচূড়া-পরা মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, সম্ভবত কোন সরকারী অফিসের বড় অফিসার, এসেছিলেন কলেজে তাঁর মেয়ের পড়া-

একমাত্র ব্রিটিশ পেইন্টস্ ভাইনল থেকেই পাই ডিস্‌টেম্‌পারের খরচে ইমালসনের গুণ

"আমার সিদ্ধান্ত ফাইনাল পেইক্ট মানে, চাই ভাইনল"

ব্রিটিশ পেইন্টস্ ভাইনল হ'ল একমাত্র এক্রিলিক ইমালসন পেইন্ট যা পলিমেরাইজারে সমৃদ্ধ। পেইন্টের জগতে এ এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। যার ফলে আপনি অয়েল বাউণ্ড ডিস্টেম্পারের খরচেই ভাইনল পাচ্ছেন।

ব্রিটিশ পেইন্টস্ ভাইনল ১০০% ধোয়া-মোছা যায়। এর ফিনিশ খুবই ভাল। অনেক দিন টেঁকে আর রং-এর ঔজ্জ্বল্য কমে না। ৫০ রকম বিভিন্ন রঙে ভাইনল পাওয়া যায়। আর দুই বা ততোধিক রং মিশিয়ে আপনার পছন্দ মত আরও অনেক ধরণের রঙ পেতে পারেন।

ব্রিটিশ পেইন্টসের [illegible] টেকনলজিই এনে দিয়েছে আগামী দিনের ইমালসন —ব্রিটিশ পেইন্টস ভাইনল।

VINYL
WALL PAINT

ব্রিটিশ পেইন্টস্ ভাইনল - দাম থেকে কাজ পর্যন্ত পারফেক্ট পেইন্ট

LINTAS/BP/23-203 Bg

গোলমাল বিষয়ে খোঁজখবর নিতে। দেখা হয়ে গেল আমাদের সেই মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে। প্রায় কাকতালীয় যোগাযোগ। ভদ্রলোক সবিনয়ে বললেন, 'আপনি তো এ স্কুলে বাংলা পড়ান শুনেছি। আমার মেয়েটিও বাংলায় অনার্স পড়ছে। বলতে পারেন মেয়ে আমার পড়াশোনা কেমন করছে, অনার্স-টনার্স পাবে?'

মাস্টারমশাই টিপটপ্‌টাই ইস্তক এই হাকসাহেব বাবুকে কঠিন নজরে একপলক দেখে নিলেন, ঠোঁটের কোণে একটা সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠল। বললেন, 'মেয়ের কি নাম?'

ভদ্রলোক নাম বলতেই মাস্টারমশাই বলে উঠলেন, 'ও, রোল থার্টি-নাইন! ভাল মেয়ে, ভাল ফল করবে। তা বাপু কৃষ্ণচন্দ্র, তোমার মেয়ে কিন্তু তোমার চেয়ে ইংরেজীটা নির্ভুল লেখে!'

এতক্ষণ চেনা-না-দেওয়া প্রাক্তন ছাত্রটি এবার লজ্জায় তৎক্ষণাৎ অধোবদন হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন।

এই ঘটনা দেখার পর থেকে আমার প্রায়ই মনে হয়, স্মৃতিভারে এক জায়গায় পড়ে থাকার চেয়ে বড় শাস্তি বোধ হয় আর নেই। 'ট্র্যাভেল লাইট, ট্র্যাভেল ফেস্ট' কথাটা কেবল রেলওয়েতে নয়, জীবনের হাইওয়েতেও সমানভাবে খাটে। ঝাড়া হাত পায়ে চলে যাবার মত স্বস্তির আর কি আছে। রবীন্দ্রনাথ তো সেই কথাই বলেছেন, আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি সকলই হয়েছে বোঝা।

বিস্মৃতির সাহায্যে তাই নিয়মিত মগজ ধোলাই প্রয়োজন। সংসারে যখন রেক জার্নি করতে নেমেছি তখন শুধু শুধু কুলীর মত মোটঘাট শিরোধার্য করে লাভ কি!

ইদানীং তাই আমার কোন আক্ষেপ নেই বয়সে ছাড়া আর কোন প্রকারে বড় হতে পারলাম না বলে। কেউকেটা সবাই হয় না, তার জন্যে দুঃখ কি। আমি তা কোন দিন হতেও চাই নি। কিন্তু একটা বাসনা একদা মনের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল, সেটা লেখক হবার বাসনা। কারণ, প্রথম জীবনে গল্প উপন্যাস যেভাবে আমাকে নাড়া দিয়েছে, রাতটুকুর ঘুম কেড়ে নিয়েছে, চোখে হঠাৎ-হঠাৎ জল এনে দিয়েছে—এমন আর কেউ না, কিছু না। মানুষের সবচেয়ে নিকটজন যে লেখক তাতে আর সন্দেহ থাকে নি। তাই নিজেরও লেখক হবার বাসনা জন্মেছিল কিন্তু হাতে কলমে চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝেছি ওই কর্মটি অন্তত আমাকে দিয়ে হবার নয়। ওই স্বপ্ন কোনদিনই সফল হবে না, আমার মত জন্মকুঁড়ে আর স্মৃতি দেউলে মানুষের পক্ষে। অত কঠিন পরিশ্রম এবং অত সর্বক্ষণিক মগজ মন্থন আমার দ্বারা নৈব নৈব চ। ঈশ্বরের রাজ্যে সবটাই খোলাবাজার, কিন্তু সেখান থেকে চুরিচামারি হাত-সাফাই করে নাম কিনতে হলে চাই রীতিমত মালপাচারী মগজ, লুঠেরা বুদ্ধি আর অলৌকিক হোল্ডঅলের মত সর্বস্বধরনেবালী স্মৃতি। নইলে হিমাক্য সংসারের মাল গুদাম করার মত এলেমদার হওয়া যায় না। তামাম গপ্পের কারবারটাই পাকা সম্পত্তি-গুছোনো বিষয়বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল। এক হাটে কিনে অন্য হাটে বেচে দেওয়ার ব্যাপার। গল্প-উপন্যাস মানেই মনুষ্যচরিত্র টুকলিফাই করা। রাইনে-বাঁয়ের মানুষকে মনে রাখা, তাদের চেহারা, তাদের কর্ম-অপকর্ম, কথাবার্তা-ভাব-ভাবান্তর যথা-সময়ে যথাস্থানে ওগরানো খুব সহজ কাজ নয়। চেষ্টা করতে গিয়ে দেখেছি, ব্রাহ্মমুহূর্তে সব ফর্সা হয়ে যায়। স্বপ্নের পিছন কামড়ে কিছুই আর তেমন মনে পড়ে না। একটি সুন্দরী মেয়ের চোখ মুখ নাক কপালের গড়ন কেমন হবে, কোন শাড়ি-জামা আর অলংকারে সে খোলতাই হবে, একটি ক্রুদ্ধ কি শোকার্ত লোক কেমন কেমন সময়ে কিভাবে, কোন ভাষায় তাদের রাগ-শোক-হতাশা প্রকাশ করবে তা কিছুতেই ভেবে-চিন্তে পাইনি। অথচ সবই আমার চারপাশের দেখা দৃশ্য। আমার যে বস্তুটাই ভুলভুলিনতং অবস্থা, দেখা মাত্রই ভুলে মেরে দিই, সুতরাং পাবব কোথা থেকে। কত দীর্ঘরাত্রি, কত কর্মক্ষেত্র দেখা হয়েছে জীবনে, কত দিন লোকাল ট্রেনের কোণে, কি অফিসগামী বাসের ভয়-পেট গুলোতানুপির মধ্যে কত দুর্লভ প্রোফাইল দেখে ফেলেছি যার কোনখানটুকুতেই অসাধারণ গল্প কাঁদা হয়েছে। এমন অনেক টুকরো কথা, টুকরো ঘটনা চক্ষুকর্ণগোচর হয়েছে যা মনকে চাকের মতই ক্ষণেই ছোঁপ, বড়শি আর দুইলের সুতোয় দিকে টেনে নিয়ে গেছে; মাথায় প্লট এসেছে, এসেছে নতুন আইডিয়া শাণিত মারপ্যাঁচ। সব কিছুই মনের মধ্যে থেকে থেকে চলাফেরা করে, লিখে ফেলার জন্যে খোঁচাতে থাকে। কিন্তু কলম ধরার সঙ্গে সঙ্গেই তারা গায়েব, নিখোঁজ, বেপাত্তা। তখন গল্পের ছক, চরিত্রের রাশিচক্র সব তালগোল পাকিয়ে শিশুপাঠ্য প্রহসনে পরিণত হয়। সুতরাং যে সব লেখা কোন দিনই আর লেখা হবে না তার জন্যে দুঃখ করি না।

বরং ভেবে দেখলে স্মৃতিই আমাদের জীবনের মোহ এবং মায়া, স্মৃতিই আমাদের বিনিসুতোয় দড় বাঁধন, স্মৃতিই আমাদের অভ্যন্তরীণ পরাধীনতা। আমাদের লোভ ক্রোধ প্রেম অহংকার কিছুই স্মৃতি-নিরপেক্ষ নয়। কলুর বলদের মত স্মৃতিই আমাদের ঘুরিয়ে মারে, স্থির থাকতে দেয় না। তাই নিরঙ্কুশ কুঁড়েমি উপভোগ করতে হলে আমার মনে হয় স্মৃতি-ছুট হওয়া চাই, এই দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া চাই। তা হলে অনেক বাড়তি দায় দায়িত্ব থেকে রেহাই পাওয়া যায়, মনটা অনেক হাল্কা থাকে।

স্মৃতি-স্খলন এবং অনামনস্কতা নিশ্চয়ই এক জিনিস নয়, কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে একটা নিকট কার্যকারণ সূত্র আছে। আমরা অনামনস্ক হতে থাকি বলেই স্মৃতিচ্যুত হই, না স্মৃতিচ্যুত হতে থাকি বলেই

অনামনস্কতা আমাদের মনকে সহজে দখল করে নেয় সে মীমাংসা তর্কসাপেক্ষ। আমার অনেক সময় এমন ব্যাপার হয়, এঘর-ওঘর ছোটাছুটি করে কোন একটা জিনিস খুঁজে বেড়াচ্ছি কিন্তু কিছুতেই সেটাকে দেখতে পাচ্ছি না, শুধু শুধু হয়রান হচ্ছি। তারপর যখন হাল ছেড়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে বসেছি তখন আবিষ্কার করেছি জিনিসটা আমার চোখের সামনেই রয়েছে, আমি অন্ততঃ পাঁচবার সেটা নাড়াচাড়া করে গেছি। জিনিসটা তাহলে হাতে তুলে নিয়েও দেখতে পাইনি কেন? আমার দৃষ্টিশক্তি কিছু অতটা ক্ষীণ নয়। আসলে এই খুঁজে বেড়ানর সময় আমি অনা-মনস্ক ছিলাম তাই ভুলে গিয়েছিলাম সঠিক কোন জিনিসটা খুঁজছি। তাই চুরাটা দেখেও দেখিনি। অথবা শেষ পর্যন্ত শুধু মনে ছিল আমি খুঁজছি কিন্তু কি খুঁজছি সেটা বিলকুল ভুলে গিয়েছিলাম। আর সেই ফাঁকে অন্য কোন একটা কথা বা চিন্তা আমার ভাবুক মনকে দখল করে নিয়ে মুচকি-মুচকি হাসছিল, আমার বেকুব অবস্থাটাকে উপভোগ করছিল। একেই বলি অনামনস্কতা।

বয়সের সঙ্গে স্মৃতির একটা সম্পর্ক আছে, সেই সম্পর্কটা ভাল নয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির গ্রন্থি শিথিল হতে থাকে, মনের ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। তাই স্মরণ পুঁজিকে বারবার ঝাঁটাতে ইচ্ছে হয়, একই কথা বারবার বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এই সঙ্গে স্মরণের ঝড় বয়সের একটা ভাল দিক। বয়সের একটা দুর্বলতা আছে, সেটা কেবল শারীরিক নয়। বয়স ক্রমশ মানুষের অবিশ্বাস করার শক্তি নষ্ট করে দেয়। চল্লিশ পেরিয়ে কোন মানুষ না পথ চলতে দ্বিধায় বাধা মেলেনা। প্রকাশ্যে যদি না, মনে মনে নিশ্চয়। দুধের ইংরেজী টিচার, ব্যবসায়ীর টাই, পরম পোর্টফোলিও সব কিছু করেও শরণাপন্ন জন্য তুষ্ট থেকে যাবে।

এবং স্বভাবতই মৃত্যুর ভাবনা থেকে থেকে দেখা দেয়। যৌবন পর্যন্ত যা ছিল দূরের বস্তু, এখন তাই যেন হঠাৎ কাছে এসে গেছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটাও নরম হয়ে এসেছে, তৈরি পাই তাকে মধ্য থাপ করছে। কেবলই মনে হয় আমাদের দেখা-শোনা জানার বাইরে আরও অনেক কিছু আছে, অনেক কিছু ঘটছে। এই জগতের গায়ে গায়ে একটা মায়ার জগৎ আছে, যাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। আমার পর পর কয়েকটা মৃত্যু আমার চোখের সামনে তার সূচনা ও উপসংহার নিয়ে এমনভাবে ঘটল যে আমার এতদিনকার চালিত বিশ্বাস অনেক-খানিই আলগা হয়ে গেল। অবিশ্বাস আর সন্দেহের বর্ডার কিভাবে যেন পার হয়ে যেতে থাকলাম। এমন ছোট ছোট রহস্যময় ঘটনা ঘটতে থাকল, যেগুলোকে কোন কিছুর প্রমাণ হিসেবে হাজির করা না গেলেও বুদ্ধির ব্যাখ্যা দিয়েও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জগতে চলতে এরকম অলৌকিকের ছিটেফোঁটা ছোঁয়া অনেকেই হয়ত পেয়েছেন নিজের জীবনে। মৃত্যুভাবনা যা থেকে আসে, মৃত্যু-ভয় নয়। স্মৃতিই আমাদের জীবন, পরিপূর্ণ স্মৃতিহীনতাই মৃত্যু। এই মৃত্যু, এই বিস্মরণ তো খণ্ডখণ্ডভাবে আমরা সবাই বেড়াচ্ছি। একদিক থেকে দেখলে জীবন ক্রমে আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে, এবং যতটুকু করে সে ছাড়ছে মৃত্যু তা দখল করে নিচ্ছে। কিন্তু এই মৃত্যু ব্যাপারটা পরিষ্কার করে সে কি বিজ্ঞান, দর্শন কেউই আজ পর্যন্ত বলতে তো পারল না। প্ল্যানচেটে যাঁরা আসেন তাঁরাও খোলে বলেন না, যাঁরা জাতিস্মর তাঁরা অন্য জন্মের, অন্য জীবনের কথাই বলতে পারেন যে সময়টুকু মৃত্যু-নিদ্রা দিয়েছেন তার কথা বলতে পারেন না। অথচ মৃত্যুর ভেতর দিয়ে চোলাই হয়ে যে আত্মা আবার নতুন দেহে ফিরে আসেন তিনি কি অজ্ঞাত উপায়ে পূর্বজন্মের কিছু অভ্যাস, কিছু উত্তরাধিকার সংস্কার সঙ্গে করে নিয়ে আসেন! এই অভাবনীয় স্মাগলিং-এর কারবারটি চিরকাল ধরে সমানে চলেছে। আর মাথা ঘামাতে পারি না, শুধু একটা কথাই সার সত্য, বিস্মরণ ছাড়া গতি নেই শেষ পর্যন্ত। আমাদের শেষ স্লোগান সেই— ভোলে বাবা পার করেগা।

আনন্দ বাগচী

বিজ্ঞান

মানুষ গড়ার কারিগরি

ল্যাবরেটরীর দরজায় যদি তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, বিজ্ঞানীদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ যদি কেড়ে নেওয়া হয়, তাহলে হয়ত তাঁরা গ্রীক পণ্ডিতের মতো বালির উপর দাগ টেনে অঙ্ক কষতে বসে যাবেন, এবং সেখানেই সারা হবে যাবতীয় গাণিতিক সমস্যার জটিল সমাধান। মরচে ধরবে কম্প্যুটার যন্ত্রে। নাগালের বাইরে থাকবে পরমাণু, ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া, ডি-এন-এ এবং সিন্থেটিক জীন। সেই সময় যদি বিভিন্ন দেশে জমা করে রাখা পরমাণু অস্ত্রগুলি ড্যাম্প লেগে অকেজো হয়ে যায় দুনিয়ার লোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়বে। ভাববে যাইবা হল পরমাণু শক্তির প্রয়োগে উন্নত ধরনের কৃষি কিম্বা সৌরশক্তি ধরে নিয়ে তাপ অথবা বিদ্যুৎ উৎপাদন, ধ্বংসের চিন্তা থেকে তো মুক্ত হলাম। আর কোন নাগাসাকি-হিরোসিমার সম্ভাবনা তো দূর হল।

জানিনা এমন দিন কখনও আসবে কি না। তবে এমন কথা চিন্তা করার প্রয়োজন হচ্ছে কেন? প্রয়োজন এই কারণেই হচ্ছে যে বিজ্ঞানীরা যা কিছু নতুন তথ্য মানবসমাজকে উপহার দিচ্ছেন তার নিয়ন্ত্রণ কবলিত হচ্ছে এক শ্রেণীর ধুরন্ধর রাজনীতিবিদদের হাতে এবং মানবকল্যাণে যার ব্যবহার হওয়া সম্ভব ছিল সেই জ্ঞান অপচয় হচ্ছে মানবজাতির ধ্বংসের জন্যেই। এই সেদিনও ভিয়েতনামের যুদ্ধে আমরা দেখেছি রসায়ন শাস্ত্রের চরম অপপ্রয়োগ। সম্প্রতি বুদ্ধিজীবীমহলে আলোড়ন তুলেছে জীব-বিজ্ঞান—সিন্থেটিক জীন এবং জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং। জীন তৈরী করা যাবে, ডি এন এ থেকে একটা অংশ কেটে বার করে এনে নতুন অংশ তৈরী করে জুড়ে দেওয়া যাবে, এমন সব আশ্চর্য ক্ষমতা মানুষের করায়ত্ত এখন। অনেকে কল্পনা করতে বসে গেলেন ক্যানসার দূর করা যাবে, উদ্ধার পাওয়া যাবে বংশগত রোগের হাত থেকে, তৈরী করা যাবে ইচ্ছাকৃত প্রয়োজন মত উন্নত ধরনের খাদ্য-উৎপাদনকারী শস্য—শুধু কতগুলি জীন বদল করে দিলেই হল। কল্পনা কেন, এর অনেকটাই বাস্তব হয়ে দাঁড়াবে একদিন। তবে এমন যদি হয় যে এসব করতে গিয়ে কোন কিছু তৈরী হয়ে বিজ্ঞানীদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল যা থেকে ছড়িয়ে পড়ল জটিল কোন রোগ—তাহলে?

এরকম সম্ভাবনার কথা আর আমরা ভাবছি কেন, সত্যিই কি সে রকম কিছু সম্ভব? জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং ব্যাপারটা তাহলে কি? জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং বলতে বোঝায় বংশধারা বহনকারী জীন যে রসায়ন দিয়ে তৈরী সেই ডি-এন-এ থেকে কিছু অংশ কেটে বাদ দিয়ে নতুন অংশ জুড়ে দেওয়ার কাজ। এ কাজ সম্ভব এবং বিজ্ঞানীরা হাতে সাফল্য লাভ করেছেন। এই প্রচেষ্টা এবং সাফল্য যে যুগান্তকারী তাতে সন্দেহ নেই। তবে এই আবিষ্কারের সাহায্যে আমরা যে বংশগত রোগ সারিয়ে ফেলতে পারব, ক্যানসার সারিয়ে ফেলতে পারব সে সব এখনই ভাবা ঠিক নয়। যদি কোন ভাইরাসের কোন জীন ক্যানসার রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী হয় তাহলে আমরা জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং পদ্ধতিতে যে এখনই তার ক্রমোজোম থেকে ঐ জীনটি কেটে বার করে এনে নতুন সুস্থ জীন জুড়ে দিতে পারব তা নয়; এবং কোনদিন তা পুনর্গঠিত দেহে হয়ত সম্ভব হবে না, কারণ আমাদের দেহ অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রত্যেক কোষেই তেইশজোড়া করে ক্রোমোজোম আছে আর প্রত্যেক ক্রোমোজোমে আছে বেশ কিছুসংখ্যক জীন। সম্ভব হতে পারে ভ্রূণের আদিতম অবস্থায়। যখন একটি কি দুটি কোষ সবে সৃষ্টি হয়েছে তখন এবং তার জন্য প্রয়োজন 'পেটেন্টেড বেবিজ'। যদি এমন হয় কোন দম্পতি জানেন যে তাঁদের ক্রোমোজোমে কোন বিশেষ রোগ সৃষ্টিকারী জীন আছে যা তাঁদের ছেলে-মেয়েরা সকলেই পাবে অথচ তাঁরা চান সুস্থ নিরোগ সন্তান, তখন তাঁরা বিজ্ঞানীর শরণাপন্ন হবেন টেস্টটিউব বেবির জন্য। বিজ্ঞানী হয়ত শুক্র ও ডিম্বকোষ দেহের বাইরে মিলিত করে ভ্রূণের শৈশব অবস্থায় জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং পদ্ধতিতে জীন বদল করে আবার সেই ভ্রূণকে যথাসময়ে মায়ের দেহের জরায়ুর ভিতরে বসিয়ে দিলেন এবং সুস্থ নিরোগ সন্তান প্রসব হলো। এই পদ্ধতিতে বংশগত রোগ থেকে আগামী দিনের শিশুরা মুক্তি পেতে পারে জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সাহায্যে।

জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এর কথায় এবার আসি। প্রথমত—ক্রোমোজোম তৈরী হয়েছে ডি অক্সিরাইবো নিউক্লীক অ্যাসিড বা সংক্ষেপে ডি-এন-এ দিয়ে। ক্রোমোজোমের অংশ যে জীনগুলি সেগুলি এই ডি-এন-এ দিয়েই তৈরী। ডি-এন-এতে আছে সুগার, এবং ফসফেটের চেইন। সুগার মলিকিউলের সংগে যুক্ত থাকে চার রকম জৈব ক্ষারক জাতীয় রসায়ন,—এডেনাইন, থায়ামাইন, সাইটোসাইন এবং গোয়ানাইন। সুগার ফসফেটের দুইটি চেইন পরস্পর যুক্ত থাকে হাইড্রোজেন দিয়ে। জৈব ক্ষারকগুলিই হাইড্রোজেনের মাধ্যমে এই সংযোগ সাধন করে। শুধু তাই নয় এডেনাইন যুক্ত হবে থায়ামাইনের সঙ্গেই শুধু। এবং গোয়ানাইন যুক্ত হবে সাইটোসাইনের সঙ্গেই। এই অবস্থায় সুগার ফসফেট-এর চেইন দুটি পাক খাওয়া দড়ির মতো জড়ানো থাকে। দেখা যায়, আলট্রাভায়োলেট রশ্মির প্রয়োগে ডি-এন-এতে যদি কোথাও পাশা-পাশি দুটি থায়ামাইন থাকে তারা একত্রে জুড়ে যায়। যাকে বলা হয় 'থায়ামাইন ডাইমার'। এর ফলে ক্রোমোজোমের স্বাভাবিক কাজকর্মই যে শুধু ব্যাহত হয় তা নয়, এক ধরনের রোগ সৃষ্টি হয় যাতে সূর্যের আলোয় কষ্ট হয়, চর্মকের রোগ হয়। শৈশব অবস্থায় এই বিরল রোগটির (জিরোডারমা পিগমেনটোসাম) আক্রমণ হয়। রোগটা জানা ছিল অনেকদিন, আসল কারণ জানা গেল পরে যে থায়ামাইন ডাইমার থেকে এর সৃষ্টি। দেহকোষে যদি ঐরকম এনজাইম থাকে তাহলে ঐ ডাইমার নষ্ট করে দিয়ে ডি-এন-এর সেই অংশটা আবার ডি-এন-এ পলিমারেজ এনজাইমের সাহায্যে তৈরী করা সম্ভব হয়।

প্রথমে ঐরকম এনজাইম এন্ডোনিউক্লীয়েজ এ ডাইমার-এর দুপাশে সুগার ফসফেট চেইন কেটে ডাইমারটিকে আলাদা করে দেয়। এরপর আর একটি এনজাইম এক্সোনিউক্লীয়েজ ডি-এন-এর ঐ অংশের কিছুটা নষ্ট করে ফাঁকটি বড় করে দেয়। পরবর্তী পর্যায়ে ডি-এন-এ পলিমারেজ এনজাইম ডি-এন-এর ঐ অংশ স্বাভাবিকভাবে গড়ে দেয় এবং ডি-এন-এ'র অপরদিকের অংশটির প্রতি-পূরক হিসাবে তা তৈরী হয়। অবশেষে আর একটি এনজাইম লাইগেজ এসে নতুন তৈরী ডি-এন-এর দুই প্রান্ত পুরনো চেইনের দুই প্রান্তের সংগে জুড়ে দেয়।

এখন ঠিক এই পদ্ধতিতে ডি-এন-এ'র কোন অংশ বাদ দিয়ে নতুন করে গড়ে দেওয়া যখন সম্ভব, তার উপর আবার ডি-এন-এ'র অংশ ইচ্ছামত গড়ে তোলাও যখন সম্ভব হয়েছে খোরানার প্রচেষ্টায়, তখন ভবিষ্যতে কোন জীন বদল করা অসম্ভব হবে না।

কোন জীন অনেক সংখ্যায় তৈরী করাও সম্ভব বিশেষ ধরনের ডি-এন-এ ব্যবহার করে (রিকম্বিন্যান্ট ডি-এন-এ)। এই বিশেষ ধরনের ডি-এন-এ তৈরী করা যায় খুব সহজে। ১৯৭২ সালে লেডারবার্গ এবং হায়েস আবিষ্কার করলেন ব্যাক-টিরিয়াতে যে একটিমাত্র চক্রাকার ক্রোমোজোম থাকে, তাছাড়াও আরো কিছু এই ধরনের গোলাকৃতির পদার্থ থাকে যা ডি-এন-এ দিয়েই তৈরী। এদের বলা হয় প্লাসমিড। রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে ডি-এন-এর কিছু টুকরো কেটে আলাদা করে দেওয়া যায়। ডি-এন-এর ভাঙা অংশগুলির প্রান্ত এমনই যে কাছাকাছি এলেই আবার জোড়া লেগে যায়। এখন একটি প্লাসমিড ডি-এন-এর একটা অংশ রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কেটে বাদ দিয়ে অন্য কোন ডি-এন-এ'র অংশ সেখানে জুড়ে দিলেই এই বিশেষ ধরনের ডি-এন-এ বা রিকম্বিন্যান্ট ডি-এন-এ তৈরী হল। এখন এইটিকে যদি আবার ব্যাকটিরিয়ার দেহে প্রবেশ করানো হয় সেখানে তারা সংখ্যায় বৃদ্ধি করবে। ব্যাকটিরিয়া ব্যবহার করে রিকম্বিন্যান্ট ডি-এন-এ সংখ্যায় অনেক তৈরী করা যায়। এই আবিষ্কার জীনের গঠন ও কার্য-পদ্ধতির উপর গবেষণার কাজে যুগান্তর এনেছে।

জীন নিয়ে এইসব গবেষণা কিন্তু কোন অসতর্ক মুহূর্তে মারাত্মক বিপদ ডেকে এনে মানবজাতির সর্বনাশ করতে পারে। যদি এমন হয় যে গবেষণার জন্যে ক্যানসার ভাইরাস-এর ডি-এন-এ প্লাসমিডের সংগে জুড়ে কোন ব্যাকটিরিয়ার দেহে প্রবেশ করানো হয়েছে। কর্মীদের অসাবধানতায় হয়ত কিছু ব্যাকটিরিয়া জলের সংগে মিশে নর্দমার পথে বাইরে বেরিয়ে গেল। ঐ ব্যাকটিরিয়া ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র, আর তাদের ধরা সম্ভব নয়। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ব্যাকটিরিয়া তৈরী হয়ে ক্রমশ ছড়াতে লাগল এবং জলের মাধ্যমেই আবার মিলল মানবদেহে। রিকম্বিন্যান্ট ডি-এন-এ ঐ জীন মানবদেহের কোষে সঞ্চারিত করে দিতে পারে ফলে ক্যানসার যা সাধারণত ছোঁয়াচে রোগ নয় তা হয়ত ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত। আবার ঠিক ঐ একই পদ্ধতি হয়ত ইচ্ছাকৃতভাবে প্রয়োগ করা হল রাজনৈতিক কারণে, যুদ্ধের প্রয়োজনে।

বিজ্ঞানীদের মনে একটা ধারণা আছে যে সমস্ত স্বাভাবিক কোষের ক্রোমোজোমে ক্যানসার সৃষ্টির জীন আছে। এই জীন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, এবং তামাক জাতীয় পদার্থের প্রভাবে অথবা দূষিত বাতাসের প্রভাবে এই জীন সক্রিয় হয়ে ওঠে। এমন হতে পারে যে ই কোলাই ব্যাকটিরিয়া থেকে সংক্রামিত রিকম্বিন্যান্ট ডি-এন-এ'র প্রভাবে ক্যানসার জীন সক্রিয় হয়ে উঠল।

এসচেরিসিয়া কোলাই বা ই কোলাই ব্যাক-টিরিয়া মানবদেহের অন্ত্রে থাকে। শুধু মানবদেহেই নয় অন্য যেসব প্রাণীর দেহে উষ্ণ শোণিত আছে তাদের দেহেও থাকে। ই-কোলাই সর্বত্র জলেও পাওয়া যায়। মানবদেহে নাক-মুখের ভিতর দিয়ে সংক্রামিত হতে পারে সহজেই। ই কোলাই ব্যাক-টিরিয়া ল্যাবরেটরীর কাজে গবেষকদের খুব প্রিয়। কারণ, ই কোলাই ব্যাকটিরিয়া এক কোষ থেকে অন্য কোষে খুব সহজে ডি-এন-এ পাঠিয়ে দিতে পারে। এমন কি যেসব ই-কোলাই মৃত অবস্থায় তারাও এই ডি-এন-এ অন্য কোষে সংক্রামিত করতে পারে।

এই আশংকা বিজ্ঞানীদের মনেও জেগেছে এবং নানারকম চিন্তাভাবনা তাঁরা করছেন। চিন্তাভাবনা প্রধানত দু রকম—এক, আইন করে এই জাতীয় গবেষণা বন্ধ করা; দুই—বিশেষ কোন সতর্কতার পদ্ধতি আবিষ্কার যা এই ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে। ১৯৭৬-এর জুলাই মাসে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশেষ গবেষণাগার তৈরী সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে মেয়রের নির্দেশে। সিটি কাউন্সিলের সদস্যরা এই ব্যবস্থা নিয়েছেন কোন কোন বিজ্ঞানীর অনুরোধেই। বিজ্ঞানীদেরই একটা অংশ মনে করেন এই ধরনের গবেষণা বিপজ্জনক এবং এতে মানবজাতির কল্যাণের সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকলেও, বিপদের আশংকাও যথেষ্ট। গবেষণার কাজ আইন করে বন্ধ রাখা যায় না কোনদিন তাই বিশেষভাবে চিন্তা করা হচ্ছে প্রতিরোধ পদ্ধতি অথবা বিশেষ কোন সতর্কতার পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য।

বিবেকজ্যোতি মৈত্র

এখন! আপনার গাল তাজা গোলাপের মতো কোমল ক'রে তুলুন...রুক্ষতা দূর করুন

গালে গোলাপী [illegible] আভা—
ত্বক সব মরশুমেই অম্লান।
নতুন **জনসন্স*** বেবী কমপ্লেকশান ক্রীম আপনার ত্বকে রেশমী কোমলতা জাগিয়ে তোলে—জাগিয়ে তোলে গোলাপের সুষমা।
একমাত্র **জনসন্স*** বেবী কমপ্লেকশান ক্রীম সারাক্ষণ আপনার ত্বক কোমল রাখে। এক সুগন্ধি বেষ্টনী দিয়ে তাকে ঘিরে রাখে।
অল্প বেশী দাম যা দেন তা আবার অপরূপ রূপে ফিরে পান।
এই গোলাপী ক্রীম আপনার রঙে রূপে এক অনিন্দ্যসুন্দর গোলাপী আভা জাগায়। এর সুগন্ধ আপনার ত্বক ঘিরে থাকে।

নতুন জনসন্স*
বেবী কমপ্লেকশান ক্রীম আপনার ত্বক কুসুম-কোমল রাখে

* Trademark © J&J 77

Johnson & Johnson*

OBM-7129-BEN

শংকর

॥ ৭৩ ॥

শ্রীমতী শকুন্তলা চাওলা ও মিসেস পপি বিশোয়াস—এঁদের সব কথা এখনও আপনাদের জানানো হয়নি। আমার ব্যর্থ জীবনের এই ইতিবৃত্ত শেষ করবার আগে অবশ্যই এই দুই মহিলার বিচিত্র জীবনের শেষ কথাগুলি পুরোপুরি লিখে যেতে হবে। আপনারা নিজেরাই তখন এঁদের দুজনকে বিচার করতে পারবেন, আমার পক্ষে কোনো সওয়াল-জবাবের প্রয়োজন হবে না। সদর স্ট্রীটের পাঁকের মধ্যে প্রবেশ করে কেন এমন ভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ অন্ধকারে করে চলেছি তাও হয়তো আমার বিজ্ঞ, বিরক্ত ও অধৈর্য পাঠকের কাছে তখন স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কিন্তু তার আগে আমার একটা জরুরি কাজ আছে, সেই কাজটা আমি আর দেরি করতে চাই না।

সেদিন অভিমানিনী মিসেস পপি বিশোয়াস অনেকক্ষণ আমার কাছে বসে থেকে নিজের মনের বোঝা হালকা করতে চেয়েছিলেন। মিসেস পপি বিশোয়াস চা-ওয়ালাকে ডেকে নিজেই আরও দুকাপ চায়ের অর্ডার দিয়েছিলেন।

চা আসার পর ব্যাগ খুলে মিসেস বিশোয়াস নিজেই দাম দেবার চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন, "দিই না, মিস্টার শংকর? এর আগের কাপটা তো আপনিই খাইয়েছেন। মিসেস বিলাসিনী গুপ্ত তো হাড়কৃপণ আপ্যায়নের জন্যে আপনাকে কোনো খরচ দেন না। শুধু শুধু আমাদের মতো বাজেবাজে লোকের কথা শোনবার জন্যে আপনি কেন পয়সা অপচয় করবেন?"

সহজভাবে এবং আমাকে ভালবেসেই মিসেস পপি বিশোয়াস কথাগুলো বলেছেন নিশ্চয়। কিন্তু আমার মনটা হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। আমার অফিস ঘরে আমারই সঙ্গে দেখা করতে এসে কেউ চায়ের খরচ বহন করতে চাইবেন এর থেকে দুঃখের কী থাকতে পারে? আমার বর্তমান অবস্থার এর থেকে অপমানকর ব্যাখ্যা আর কী হতে পারে? মিসেস বিশোয়াসকে আমি দোষ দিচ্ছি না, কিন্তু আমারই ঘরে বসে চা-ওয়ালার সামনে ওঁর এই আর্থিক বদান্যতা আমাকে আর একবার আমার ব্যক্তিগত শোচনীয় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

মিসেস পপি বিশোয়াসকে পয়সা বার করতে নিষেধ করলাম। আমার আর্থিক অবস্থা অবশ্যই খারাপ, আমার অতীত অনুজ্জ্বল ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, কিন্তু অতিথির কাছে চায়ের অর্থ আদায় আজও আমার কাছে অকল্পনীয়।

মিসেস পপি বিশোয়াস এই মুহূর্তে যেন কোনো বিখ্যাত চিত্র-পরিচালকের ক্যামেরার সামনে পার্ট বিদিনী হয়েছেন। ক্রেমে আধটা ছবির মতো তাঁর নরম ডান হাতটি ভ্যানিটিব্যাগের কাছে স্থির হয়ে রয়েছে। মিসেস বিশোয়াসের চোখ দুটো এবার একটু নড়ে উঠলো। চোখের ইশারাতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার?"

"কিছু মনে করবেন না। যতই গরীব হই—এ-জিনিসটা কখনো হয়নি।" আমি কাতরভাবে পপি বিশোয়াসকে অনুরোধ করলাম।

মিসেস বিশোয়াস ব্যাপারটা বুঝেই বোধ হয় নিজেই একটু সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে উঠলেন আমাকে হয়, সস্নেহ বকুনি লাগালেন। "ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে কখনও এতো মাথা ঘামাতে নেই। আপনি বয়সে আমার থেকে অনেক ছোট, মিস্টার শংকর, আপনি মনে রাখুন, পৃথিবী সম্বন্ধে আপনার কোনো অভিজ্ঞতাই হয়নি! এই পৃথিবীতে যদি সুখে বেঁচে থাকতে চান, তাহলে সব সময় ছিক ছিক হয়ে হয়ে—অর্থাৎ যার যার তার তার পলিসি ফলো করবেন। অপরের বোঝা এই দুনিয়ায় কখনও নিজের মাথায় তুলতে আছে?"

আমি চুপ করে রইলাম। মিসেস পপি বিশোয়াস ব্যাগ থেকে হাত সরিয়ে এনে বললেন, "আপনি বোধ হয় এতোদিন শুধু ইংরেজদেরই দেখেছেন। যদি আপনি ডাচ বা আমেরিকানদের সঙ্গে ঘর করতেন, তা হলে, খরচ ভাগাভাগি নিয়ে মাথাই ঘামাতেন না। দুজন আমেরিকান সেবার আমার ওখানে এসে হুইস্কির অর্ডার দিলো। আপনি বিশ্বাস করবেন না, ওইখানে আমার সামনে দুই বন্ধু পকেট থেকে পয়সা বার করে হুইস্কির খরচ এবং বেয়ারার বকশিশ দুভাগ করতে বসলো। এসব ব্যাপারে কোনো লাজলজ্জা নেই—যাদের অনেক আছে। যত লজ্জা আমাদের, এই অভাগা বাঙালীদের।"

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "রাগ করবেন না, মিস্টার শংকর। নানান জাতের মানুষের সঙ্গে মিশে-মিশে কেমন জগাখিচুড়ি বনে গিয়েছি—কোথায় কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সব সময় মনে রাখতে পারি না।"

আমি মোটেই রাগ করিনি মিসেস বিশোয়াসের ওপর—দুঃখ হয়েছে নিজেরই অবস্থার কথা ভেবে।

মিসেস পপি বিশোয়াস সস্নেহে বললেন, "পয়সার অনেক দাম এই দুনিয়ায়। আমার কথা যদি শোনেন, কখনও ভস্মে ঘি ঢালবেন না। এই যে পাড়ায় এসেছেন, এটা তো আপনার হাওড়া-কাসুন্দে নয়—এটা তো সুন্দরবনের জঙ্গল। এখানে কোনো রকম চক্ষুলজ্জা রাখবেন না। এই যে চায়ের দাম আমি দিতে চাইছি, ভাবছেন আমি নিজের গাঁট থেকে দিতুম? মোটেই না! পপি বিশোয়াস আর অতো বোকা নেই।"

তা হলে? আমি মিসেস বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকালাম।

মিসেস বিশোয়াস এবার স্বভাবসিদ্ধ হাসির ঝিলিকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন। হাসির ধাক্কা একটু কমবার পর তিনি বললেন, "সব আমি আজকের পার্টির কাছ থেকে আদায় করে নেবো। আউট-অব-পকেট খরচ বলে যা চাইব তাই সুড়সুড় করে পার্টি দিয়ে দেবে। কোনো কথা বলবে না, কোনো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে না।"

একটু থামলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। তারপর বললেন, "আপনি রাগ করছেন তাই। না হলে জোর করে আমি খরচ দিয়ে দিতাম। যে টাকা দেবার জন্যে গৌরী সেন রাজী রয়েছেন সে-টাকার জন্যে আপনি আমি কেন ক্ষতি স্বীকার করি?"

পপি বিশোয়াস এরপর আমাকে আরও অবাক-করা খবর দিয়েছিলেন। হেসে বলেছিলেন "সায়েবরা অনেক সময় আমাদের কাছ থেকেও রসিদ চায়! কী হাঙ্গামা ভাবুন তো! তারপর শুনলাম এঁদের অনেকেই নিজের পকেট থেকে একটি আধলা খরচ করে না—পার্সোনাল ফুর্তির খরচও কোম্পানির ঘাড়ে ট্রাভেলিং এক্সপেন্স বলে চাপিয়ে দেয়। কিন্তু সেই জন্যেই পপি বিশোয়াসের কাছে এসেও রসিদ প্রয়োজন!"

ব্যাপারটা আমার কাছেও অভিনব বটে। এ ধরনের খবর কখনও আমার কাছে আসেনি।

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "কী বলছেন আপনি! বম্বে দিল্লীতে এর জন্যে ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট কার্ড চালাবার ব্যবস্থাও আছে। একটি ক্রেডিট কার্ড পয়সা নগদ দিতে হয় না। ক্রেডিট কার্ড দেখিয়ে পছন্দ মতো সুন্দরীর সার্ভিস নাও, পরে যথাসময়ে বিল চলে যাবে। বড় বড় সায়েবেরা কিন্তু খুব বেড়াচ্ছেন আমেরিকান এক্সপ্রেস, ডাইনারস ক্লাব ইত্যাদি কার্ড নিয়ে—ওঁরা কাঁচা পয়সা সঙ্গে রাখার হাঙ্গামা পছন্দ করেন না, আজকাল নগদ দিনারের দরকারও হয় না।"

মিসেস পপি বিশোয়াস এই রহস্যের ওপর আরও আলোকপাত করলেন। বললেন, "রসিদের এবং কাজের সুবিধের জন্যে কেউ কেউ বিউটি

সি ই এস সি'র নতুন "ভিজিলেন্স সেল"

নতুন সার্ভিস কনেক্শন বা ইলেকট্রিক বিল থেকে উদ্ভূত অভিযোগ সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করিয়ে দেবার অছিলায় কিছু অসৎ লোক আমাদের গ্রাহকদের কাছে টাকা চাইছে, এই ধরনের খবর পেয়ে আমরা বিশেষ চিন্তিত। আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গ্রাহকদের কাছে তাই আমাদের একান্ত অনুরোধ তাঁরা যেন কখনই কাউকে এই সব ব্যাপারে কোনো রকম টাকাকড়ি না দেন, এমন কি, সে ব্যক্তি আমাদের কোম্পানীর লোক বলে নিজেকে জাহির করলেও।

যদি কেউ আপনাদের কাছে এই ধরনের অর্থ দাবী করে তবে আমাদের বিশেষ অনুরোধ আপনারা যেন পাশের ঠিকানায় আপনাদের অভিযোগ-সহ সব খবরটি জানিয়ে দেন যাতে এই সব অসৎ লোকের সম্ভাব্য সব কুপ্রচেষ্টাকে আমরা প্রতিরোধ করতে সমর্থ হই।

"ভিজিলেন্স সেল"
সি ই এস সি লিমিটেড
পোস্ট বক্স নং ৬৬৫৪, এসপ্লানেড,
কলকাতা-৭০০০৬৯

এই পোস্ট বক্সটি বিশেষ করে এই কাজের জন্যই নেওয়া হয়েছে এবং এই ঠিকানায় লিখিত সব চিঠির বক্তব্য গোপন থাকবে এবং লেখকের অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ করা হবে না।

CESC

দি ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন লিমিটেড

CES/CAS-11/77 BEN

আপনি যা রাগী লোক।"

এসব অবস্থায় আমি কী করতে পারি? মিস্টার ভেঠমালানি ছাড়া আর বিরুদ্ধেই যা আমি ব্যবস্থা নিয়েছি?

মিসেস পীপ বিশোয়াস বললেন, "না, মিস্টার শংকর, আপনার কাছে আমি কাঁচা মিথ্যে কথা বলবো না—তাতে আমার ক্ষতি হয় হোক।"

এবার কী খবর দেন তা শোনবার জন্যে মিসেস পীপ বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকালাম।

মিসেস পীপ বিশোয়াস ফিস ফিস করে বললেন, "আপনি বাইশ নম্বর ফ্ল্যাটের খবর জানেন? ওই ফ্ল্যাটের মিসেস কিরণ খোসলা বেচারা স্বামীর হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ে কোনোক্রমে প্রাণধারণ করছিল, কিন্তু এখনও স্বামীর ভাগ্য ফিরলো না। মিস্টার খোসলা এখনও পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। মান-সম্মান রাখবার জন্যে মিসেস খোসলা শেষ পর্যন্ত কয়েক দিনের জন্যে কাকার কাছে পালাতে বাধ্য হয়েছে। হাতে একদম পয়সা ছিল না বেচারার। শেষ পর্যন্ত আপনাদের ওই ময়না, ওই ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আমাকে ফ্ল্যাটের চাবিটা দিয়েছে কিন্তু টাকার বিনিময়ে। কিন্তু মাকালীর পা ছুঁইয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়েছে যেদিন ও চাইবে সে দিনই ঘর ছেড়ে দিতে হবে। তা আমি তো আর আপনার শকুন্তলা ভাওলা নই যে ঠোঁটে এক এবং বুকে আর এক হবে। আমি আপনার ওই ময়না এবং মিসেস খোসলাকে কথা দিয়েছি, আমি সে-কটা দিন ঘর আগলে থাকতে পারি ততদিনই আমার সুবিধে। মিসেস খোসলা যেদিন চাইবেন আমি সেদিনই এই থ্যাকারে ম্যানসনের ফ্ল্যাট থেকে বিদেয় হয়ে যাবো। তবে, ততদিনে ভগবান যদি মুখ তুলে চান। আপনি যদি আমার জন্যে একটা কিছু ব্যবস্থা করে ফেলতে পারেন তা হলে অন্য কথা।"

এই বলে, আমাকে রীতিমত অবাক করে দিয়ে মিসেস পীপ বিশোয়াস তখনকার মতো থ্যাকারে ম্যানসনের অফিস ঘর থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন।

পীপ বিশোয়াস সম্বন্ধে আকাশ-পাতাল ভাববার সময় এখন হাতে নেই। সময় মতো চিন্তা করা যাবে এই বিচিত্ররূপিণী সম্বন্ধে। একে আমি যতো দেখছি ততই বিস্মিত হচ্ছি—এঁর চরিত্রটি আমার কাছে এখনও দুর্জ্ঞেয় রহস্য হয়ে রয়েছে, এতো কাছে এসেও মিসেস পীপ বিশোয়াসের কিছুই যেন আমার এখনও জানা হয়নি। পাকে-চক্রে দীর্ঘপথ ঘুরে এই মহিলা যখন অবশেষে আমাদের এই থ্যাকারে ম্যানসনেই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আশ্রয় গ্রহণ করলেন তখন নিশ্চয় কোনো নতুন নাটকের শুরু হতে দেরি নেই।

পীপ বিশোয়াসকে আমি যে আর ঘৃণা করি না তা যেমন সত্য, তেমনি তাঁর কোনো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছাও আমার নেই। কিন্তু আজকের এই অপ্রত্যাশিত সংবাদ আমাকে যেন সাবধান করিয়ে দিচ্ছে, বলছে সামনেই হয়তো এমন কোনো নাটক ঘটতে চলেছে যার সঙ্গে তোমার জড়িয়ে পড়া যুক্তিযুক্ত হবে কিনা ভেবে দেখো।

বেয়ারা এসে এবার আমাকে মিস্টার ভড়ের কথা মনে করিয়ে দিল। মিস্টার ভড়ের ফ্ল্যাটে আমাকে অবিলম্বেই যেতে হলো।

সেখানে সেই পুরাতন সমস্যা। ঘরে ঢুকতেই ভদ্রলোক আমাকে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে একটা কিছু বিহিত করবার জন্যে জরুরী আবেদন জানালেন। মিস্টার ভড়ের ঘরের সিলিং-এর এককোণে জলে ভিজে ফুলে রয়েছে এবং সেখান থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে।

মিস্টার ভড় সত্যিই বিপদে পড়েছেন। ওপরের ফ্ল্যাটটির বাথরুমের পাইপ চোক হয়ে গেলেও খেয়াল করেন না। ওই অবস্থার পূর্ণ উদ্যমে তিনি বাথরুম ব্যবহার করে যান। নি... ষয় সামলাতে, মিস্টার ভড় ইতিমধ্যেই গত ... দু-বার নিজের খরচে ওপরের ফ্ল্যাটটির ... পাইপ পরিষ্কার করিয়েছেন। কিন্তু আবার কোন অজ্ঞাত কারণে জল জমতে শুরু করেছে।

বিরক্ত মিস্টার ভড় আমার কাছ থেকে জানতে চান, এই ব্যাপারে ম্যানসন থেকে আইন-কানুন স... উঠে গিয়েছে কিনা। তিনি কতদিন এইভাবে আত্মরক্ষার জন্য অপরের স্যানিটারি পাইপ পরিষ্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন?

প্রশ্নটি অবশ্যই ওপরের মিসেস হীরানন্দানিকে জিজ্ঞেস করলে ভাল হতো। এ-বিষয়ে আমার কী বলবার থাকতে পারে? কিন্তু এই মুহূর্তে এই ধরনের কোনো উত্তর দিয়ে মিস্টার ভড়ের মেজাজ আরও গরম করে তুলবার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

এ বিষয়ে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখালাম মিস্টার ভড়কে। এই ঘরে বসে বসেই তিনি দুনিয়ার লোকের ভাগ্য সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন। ভদ্রলোক আগে মিলিটারি না কোথায় কাজ করতেন, কিন্তু অকালে অবসর গ্রহণ করবার পর, এই হাত-গণনার প্রফেশনে প্রবেশ করেছেন। অকৃতদার মিস্টার ভড়ের একটি বাচ্চা চাকর আছে—সেই সংসারের সব কাজকর্ম করে। অন্য সময়ে ছাপানো হ্যান্ডবিল নিয়ে চাকরটি পার্ক স্ট্রীট অথবা কিড স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এবং ট্যাক্সি, প্রাইভেট গাড়ি, ট্রাম ও বাসের মধ্যে মিস্টার ভড়ের হ্যান্ডবিল ছুঁড়ে দেয়।

এই হ্যান্ডবিল মন্ত্রের মতো কাজ দেয়। প্রতিদিনই কয়েকজন অচেনা ভাগ্যান্বেষী থ্যাকারে ম্যানসনে মিস্টার ভড়ের ফ্ল্যাটে হাজির হন। বিদেশীদের ক্ষেত্রে মিস্টার ভড় শুধু মৌখিক উত্তর দেন না, টাইপরাইটারে ইংরিজীতে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ করেন।

এ হেন মিস্টার ভড়ের পক্ষে ওপর থেকে মাথায় টপ টপ করে জল পড়া অবশ্যই এক মর্মান্তিক অবস্থার সৃষ্টি করে। (ক্রমশ)

হাওয়ায় উড়েছিল। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া এবং দুলিয়ে যাওয়া শরীরটাকে নিয়ে রহিম সাহেব আমার পাশের চেয়ারটাতেই বসলেন। প্রশ্নের উত্তরে বললেন—তাকিয়ে আছি সেই বেটা।

সেদিন অন্ধ্র পুলিস বনাম বি এন আর-এর খেলায় প্রথমার্ধের ফলাফল ১—১। এগিয়ে না থাকতে পারাতে এবং সব চেনাশুনোই বি এন আরের খেলোয়াড়দের আটকে যাওয়াতে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে দল-খেলোয়াড়দের উদ্দেশে কত কম চীৎকার করে উঠেছিলেন রহিম সাহেব। ঐ অল্প সময়ের ভেতরে গোটা দশ-বারো চারমিনার সিগারেটের শেষ অংশগুলো তাঁরই পায়ের আশেপাশে সবুজ ঘাসের ওপর ছড়ালো। আমি অবাক হয়ে রহিম সাহেবের টেনশন দেখছিলাম।

খেলার পর শোচনীয় পরাজয়ের বেদনায় আমি যখন মুহ্যমান, রহিম সাহেব আমার ডান হাতটা ধরে বললেন—বুঝলো টিম তো ফার্স্ট হাফ-এ ভালো খেলছিল না, লেকিন ৪-২-৪ ছেড়ে তিন কিউ উইংহাফকে চলা দিয়া?

সেই মুহূর্তে কোচের সঙ্গে সহজ কথাটা বলতে ইচ্ছা হয়েছিল—ক্লাব কর্মকর্তাদের কত যে অন্যায় আবদার আমাদের মত ছোটখাট কোচেদের সহ্য করতে হয়, তা আপনার মত ভারত তথা এশিয়া-খ্যাত কোচ বুঝবেন কেমন করে?

কিন্তু রহিম সাহেবকেও যে উপেক্ষা অনাদর আর তাঁর লড়াইয়ের ভিতর দিয়ে সাফল্যের দরজায় পৌঁছতে হয়েছে, সেই আবেগ মুহূর্তে সেই সত্যটাই আমার একদম মনে আসেনি।

আজ পর্যন্ত বিশ্ব ফুটবলে যে দেশই বড় বড় ঢেউ তুলে পৃথিবীতে সাড়া জাগিয়েছে, তাদের সকলেরই সাফল্যের মূলে রয়েছে একটি করে নির্ভীকমান, অর্থাৎ একটি করে অসাধারণ ব্যক্তির দূরদৃষ্টি কল্পনা, অনলস শ্রম, ধৈর্য ও নেতৃত্ব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্রিটিশ ফুটবলে ছিলেন হার্বার্ট চ্যাপম্যান। '৪২ থেকে '৫৪ হাঙ্গেরিয়ান ফুটবলের সোনার দিনে গুস্তাভ সিবেস। '৫৪র বিশ্ব কাপ বিজয়ী ও জার্মান ফুটবলের জনক সেপ হারবার্গার। '৫৮ ও '৬২ সালে পরপর বিশ্ব কাপ জয়ী ব্রাজিল দলের ম্যানেজার ভিসেন্টে ফিওলা। '৬৬র বিশ্ব কাপ জয়ে ইংল্যাণ্ডের স্যার আলফ্ রামসে। এবং বর্তমান বিশ্ব ফুটবলে জার্মানীর আধিপত্য বিস্তারের জন্য অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী হারবার্গারের মন্ত্রশিষ্য হেলমুট শন।

ভারতীয় ফুটবলেও আজ যদি উপর্যুক্ত ধরনের কোনও ব্যক্তিত্বের খোঁজ করতে হয়, তা হলে যাঁর নাম নিঃসন্দেহে প্রথমে আসবে, যিনি আন্তর্জাতিক ফুটবলের জগতে ভারতীয় ফুটবলের প্রদীপটি ধীরে

আজকের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার হল্যাণ্ডের জাতীয় দলের অধিনায়ক জোহান ক্রুইফ বিজয়ানন্দিত গর্বিত ভঙ্গিতে ছবি তুলছেন।

ধীরে তুলে ধরেছিলেন, তিনি হলেন রহিম সাহেব। '৫২র হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে যুগোস্লাভিয়ার কাছে ১০—১ গোলে ভারতীয় ফুটবল দলের শোচনীয় পরাজয় কোচ রহিম সাহেবকে শুরুতেই দু পা পেছিয়ে দিয়েছিল। '৫৩ সালের কোয়াড্রাঙ্গুলার ও '৫৪ সালের এশিয়ান গেমসে ভারতীয় ফুটবল দলে রহিম সাহেবের নাম পাওয়া গেল না।

'৫৫ সালে কলকাতার অনুষ্ঠিত কোয়াড্রাঙ্গুলার টুর্নামেন্টে ভারতীয় ফুটবল সংস্থার কর্মকর্তাদের আবার ডাকতে হল রহিম সাহেবকে। নিয়মানুবর্তিতার যে অভাব এতদিন ভারতীয় ফুটবলকে কুরে কুরে খাচ্ছিল তা প্রথমেই তিনি তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বে দূর করিয়ে আনলেন। অসীম সাহসে বয়সের ভারে ন্যুব্জ অধিকাংশ ফুটবলারদের বাদ দিয়ে তরুণ প্রতিভাবান ফুটবলারদের নিয়ে ভারতীয় দল তৈরি করলেন।

আন্তর্জাতিক ফুটবল অভিজ্ঞতা লাভ করে সেই দলই রোম অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দল চতুর্থ স্থানে এবং '৬২ সালে যুবভারতীর পুনর্জন্ম করে ভারত ফুটবলে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করল।

ভারতীয় ফুটবলকে ঘিরে ভারতীয় ফুটবল অনুরাগীদের মনে যখন রঙীন আশা একটু একটু করে দানা বাঁধছিল, ১৯৬৩ সালে রহিম সাহেবের অকালমৃত্যু সেই স্বপ্নকে ভেঙেচুরে ছারখার করে দিয়ে গেল। ভারতীয় ফুটবলের কর্মকর্তারা আবার তাঁদের পুরানো বিষয়ে ফিরে গেলেন। মেতে উঠলেন জাতীয় দলকে নিয়ে দলীয় রাজনীতিতে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ—উঃ ও দঃ কোরিয়া, বার্মা, জাপান, মালয়েশিয়া, ইরান, ইরাক, কোয়ায়েত ও ইস্রায়েল যখন উপযুক্ত দেশী-বিদেশী কোচের হাতে দশ বারেক বছরের জন্য জাতীয় দলকে ছেড়ে দিয়ে উন্নতির শিখরে উঠে গেল তখন আমরা এ-খেলা ও-খেলা কোচ পাল্টেছি। নিজেদের গোষ্ঠীর অনুগত কোচের হাতে জাতীয় দলকে সঁপে দিয়েছি। আমাদের ফুটবল কর্মকর্তাদের কোচেদের প্রতি কি নিবিড় শ্রদ্ধা!

গত এশিয়ান গেমসে একজন কোচ তো খেলা উঠতে গিয়ে এয়ার হোস্টেসের কাছে জানতে পারলেন তাঁর টিকিট কাটা হয়নি। অর্থাৎ দলে তিনি অন্তর্ভুক্ত হননি। চোখের জল ফেলতে ফেলতে তিনি বাড়ি ফিরলেন। এবং তারই পরিণতি—আজকের ভারতীয় ফুটবল সারা অঙ্গে দগদগে ঘা নিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসরে লজ্জায়, ঘৃণায় নিজেকে এক কোণে লুকিয়ে রেখেছে।

আর আমরা—ভারতীয় ফুটবল রসিকরা বিভ্রান্ত উদাস। আমরা কখন আমাদের পরিচয় হারিয়ে ফেলেছি তাই আমরা জানি না।

বিশ্বকাপ বিজয়ী উপেক্ষিত অধিনায়ক

শতবর্ষের ফুটবলে স্মরণীয় লগ্নের ঘটনা। বেশ কিছুটা বিরক্ত হয়েই পেলের প্রেস কনফারেন্স থেকে বেরিয়ে আসছিলাম। গ্র্যান্ড হোটেলের মেন গেটেই দেখা হয়ে গেল কুঞ্চিত কেশ দীর্ঘদেহী এক বিরাট পুরুষের সঙ্গে। তিনি তখন হোটেলে ঢুকছেন। বোধ হয় একটু আগে কোনো কারণে বাইরে গিয়েছিলেন।

আমার এবং আমার সঙ্গের সাংবাদিক বন্ধুর ওঁকে চিনতে একটুও সময় লাগল না। কতবারই তো ওঁর ছবি দেখেছি সংবাদপত্রে, ছায়াচিত্রে। "তুমি নিশ্চয়ই কার্লোস অ্যালবার্টো" বলতেই হেসে উঠলেন। দুজনে অটোগ্রাফের বই বের করতেই হাসি মুখে সই করে তারিখ বসিয়ে দিলেন। সামান্য কিছু কথা হল। ইংরেজী ভাল বলতে পারেন না। বিশেষ বুঝতেও পারলেন না আমাদের কথা। পর্তুগীজ ওঁর মাতৃভাষা। যুক্তরাষ্ট্রের কসমস ক্লাবে যোগ দিয়েছেন এই বছর। তাই পেলের মত ইংরেজীতে সড়গড় হয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু গ্র্যান্ড হোটেলের মেন গেটের সামনে মাত্র কয়েকটি কথার মধ্যেই যেন আমাদের আপন করে নিলেন। বিদায়ের সময় জানালেন উষ্ণ আলিঙ্গন। আমরা কিছুটা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বলাবলি করছিলাম এত বড় একজন বিশ্বখ্যাত ফুটবলার, যাঁর অধিনায়কত্বে চিরতরে ব্রাজিলের বিশ্ব কাপ জয়, তাঁর কত অসমাদর। পেলেকে নিয়েই সবাই মেতে আছে—হোটেলের সুইমিং পুলের পাশে শ আড়াই ফটোগ্রাফার আর শ' খানেক সাংবাদিক মিলে হই হল্লা করছে। কিন্তু ভুলেও কেউ খোঁজ নিচ্ছে না কার্লোস অ্যালবার্টোর কী নিদারুণ উপেক্ষা। অথচ ১৯৭০এ মেক্সিকোতে বিশ্ব কাপের খেলার পর মহানায়ক এই অ্যালবার্টোই হয়ে উঠেছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত ফুটবলার। তখন পেলের চেয়ে অ্যালবার্টোকে নিয়েই মেক্সিকোর মানুষ বেশী মেতে উঠেছিল। ব্রাজিলে ফিরেও পেয়েছিলেন রাজার সম্মান। আমরা কিন্তু বিশ্বকাপ জয়ী এক অধিনায়ককে কাছে পেয়েও তাঁর মুখ থেকে দু' একটি কথা শুনতে আগ্রহ দেখাইনি। ফুটবলের শহর বলে যে কলকাতার এত নাম সেই শহরের মানুষও তাঁকে কোনো অভিনন্দন জানায়নি।

ব্রাজিলের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং এখনো ক্রীড়া জগতে দীপ্যমান এই খেলোয়াড়কে যথাযোগ্য সম্মান না দেখানোয় আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবে একটি ক্লাব-অনুষ্ঠানে সভাপতি হয়ে এসে এক বিশালবপু অবাঙালী ব্যবসায়ী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বললেন—"তিনি বহুৎ খাপসুরৎ ছিলেন। নাচ গান করতেন। কবিতা ভি লিখতেন।"

শুনেছিলাম ওই বেওসায়ীর বপুর তুলনায় সিন্দুক ছিল বেশী ভারী। ওঁকে সভাপতি করে মোটা টাকা ডোনেশন পাওয়া গিয়েছিল।

উপমাটা হয়তো ঠিক ঠিক মিলবে না। তবু বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ওই বেওসায়ীর জ্ঞান এবং অ্যালবার্টো সম্পর্কে ফুটবল শহরের মানুষজনের মধ্যে পার্থক্য সামান্যই। অ্যালবার্টোর চেহারা বহুৎ খাপসুরৎ এবং তিনি ফুটবল ভি খেলেন—এর বেশী নয়। অথচ পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার পেলেই এক সময় ছিলেন অ্যালবার্টোর পাশের নক্ষত্র। আমরা তাঁকে ধরে নিয়েছিলাম পেলের পাশের ম্লান নক্ষত্র বলে। মাঠে কিন্তু ঔজ্জ্বল্য বেশী ছড়িয়েছেন অ্যালবার্টোই। বুঝতে কষ্ট হয়নি কোন্ গুণে তিনি দুঃসময়ে ব্রাজিল দলের হাল ধরেছিলেন।

দুঃসময় ছাড়া কী? ১৯৬৬-র বিশ্ব কাপে লজ্জাজনক ফলের পর আন্তর্জাতিক ফুটবলে ব্রাজিল বেশ [illegible] উঠেছিল। কর্মকর্তাদের মধ্যে মাঝারি শক্তির দলের কাছেও কয়েকটি খেলায় হার স্বীকার করতে হয়েছিল। কোচ ফিওলার চাকরী আগেই খতম হয়েছিল। জোয়াও সালদানা নতুন কোচ হয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে দলটিকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন। তিনি পেলেকে দল থেকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন পেলের ক্রীড়া বিন্যাসের সঙ্গে দলটিকে মানানসই না করে দলের বিন্যাসের সঙ্গে পেলেকে মানানসই করতে। জোয়াও চাকরী গেল নতুন কোচ হলেন মেরিও জাগেলো। ওই অবস্থার মধ্যে দল নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল কার্লোস অ্যালবার্টোর উপরে। কেন? না, তাঁর মত ধীর স্থির সংগঠনক্ষম নেতা তখন আর কেউ ছিলেন না। ক্রীড়া দক্ষতাও ছিল অসাধারণ। পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাইট ব্যাক হিসাবে যাঁর স্বীকৃতি সেই জালমা স্যান্টোসের স্থলাভিষিক্ত হবার যোগ্যতাও ছিল অ্যালবার্টোর। বস্তুত যাদের কৃতিত্বে ব্রাজিলের চিরতরে 'সোনার পরীটি' জয় তাদের মধ্যে ফুটবল রাজা পেলে ব্যতিরেকে তিনজনের ভূমিকা বড় হয়ে উঠেছিল। ফরোয়ার্ডে জেয়ারজিনো, মিডফিল্ডে গারসন এবং ডিপ ডিফেন্সে অ্যালবার্টো।

ফুটবল খেলার ছক ও পদ্ধতি বদল হতে হতে আজ এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যেখানে গোলকিপারই শুধু নিজের জায়গায় থাকবে, বাকি ১০ জন প্রয়োজন অনুযায়ী জায়গা বদলাবে এবং ডিফেন্সের খেলোয়াড়রা নেবে আক্রমণ শক্তির অংশ। ১৯৭৪এ পশ্চিম জার্মানীতে বিশ্বকাপের খেলায় নেদারল্যান্ডসের এই ক্রীড়াপদ্ধতি বিশ্বকে নতুন চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। বলা হয়েছে, আগামী শতাব্দীর খেলার ছক তৈরী করে দিয়েছে নেদারল্যান্ডস। কিন্তু তার ৪ বছর আগে এই কার্লোস অ্যালবার্টোই কি ওই ছকের হদিস দেননি। তার ফলে কোনো কোনো ফুটবল সমালোচক তার বিরুদ্ধে সমালোচনাও করেছেন। বলেছেন, মাঝে মাঝেই তিনি উপরে উঠে এসে ডিফেন্সকে অসহায় অবস্থায় ফেলেন। অতীতের নামী ফুটবলার এবং ব্রাজিলের কোচ মেরিও জাগেলো কিন্তু বলেছিলেন—'অ্যাটাকই বেস্ট ডিফেন্স যদি অ্যাটাক পরিকল্পনা মত হয়।'

না, অ্যালবার্টো তাঁর খেলার ধারা একটুও বদলাননি। মেক্সিকোর বিশ্বকাপের ফাইনালে যেভাবে ইতালির বিরুদ্ধে তিনি গোল করেছিলেন ঠিক সেই-ভাবে ইডেনে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে কসমসের প্রথম গোলটি করেন ৬৫ হাজার মানুষকে বেশ কিছুটা অবাক করে। কখন যে তিনি আক্রমণে অংশ নিলেন, কখন নিজের পজিশন ছেড়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করলেন আমরা ঠাহরই করতে পারিনি। দেখলাম অনেকখানি এগিয়ে যেতে পেলেকে বল পাস করেই পাস ফিরে পাবার জন্য পরিকল্পনা মত এগিয়ে যাচ্ছেন, অফসাইড না হন সেটা লক্ষ রেখে। পেলের পাস পায়ে পেলেন একেবারে ফাঁকা অবস্থায়। তারপরই একটি মাপা শটে সহজ ও সাবলীল গোল। মোহনবাগানের গোলরক্ষক বুঝতেই পারলেন না অ্যালবার্টো কীভাবে গোল করলেন। সেদিনের খেলার চারটি গোলের মধ্যে এটিই ছিল সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গোল।

মাত্র বছর আগে মেক্সিকোর বিশ্বকাপের ফাইনালে ইতালির বিরুদ্ধেও অমন একটি গোল করেছিলেন। ওই পেলের পাস থেকেই। ব্রাজিল তখন আগেই ৩—১ গোলে এগিয়ে ছিল। খেলা শেষ হতে বাকি ছিল আর ৩ মিনিট। কিন্তু অধিনায়ক অ্যালবার্টোর তীব্র প্রয়োজন ছিল আর একটি গোলের। কেননা ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট এমিলিও গারাস্তাজু মেডিসি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ফাইনালে ব্রাজিল ৪—১ গোলে জিতবে। প্রেসিডেন্টের ভবিষ্যৎ বাণী সফল করার অধিনায়ক বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। ১—৩ গোলে পিছিয়ে থেকেও দারুণ শক্তিশালী ইতালি তখন মরিয়া লড়াই চালাচ্ছে। অ্যালবার্টো নিজে একটি বল ধরে অনেক উপরে উঠে দিয়ে নিখুঁতভাবে পাস করলেন জেয়ারজিনোকে। জেয়ারজিনো বল দিলেন পেলেকে। পেলে যখন ফরোয়ার্ড পাস করলেন তখন পরিকল্পনামত অ্যালবার্টো গোলের মুখে পজিশন করে নিয়েছেন। বল পেয়েই তিনি পরাজিত করলেন ইতালি গোলরক্ষককে। অধিনায়কের গোল হলেও ওই গোলটি প্রেসিডেন্টের গোল নামে অভিহিত হল এবং সোনার-পরীসহ ব্রাজিলে পৌঁছবার পর প্রেসিডেন্ট এমিলিও উষ্ণ আলিঙ্গনে অ্যালবার্টোকে জড়িয়ে ধরে বললেন—"আমি চিরদিনের জন্য ঋণী হয়ে রইলাম তোমার কাছে।" এই অ্যালবার্টোই উপেক্ষিত হয়ে কলকাতা থেকে ফিরে গেলেন।

অ্যালবার্টোর পুরো নাম কার্লোস অ্যালবার্টো টোরেস। জন্ম ১৯৪৭ সালে। খেলা শুরু রিও ডি জেনিরিওর ফ্লুমিনেন্স ক্লাবের ছোট দলে। ফুটবল খেলায় অসম্ভব ভালবাসত। ছোট বেলাতেই বড়দের দৃষ্টি পড়ে ছেলেটির উপরে। ফ্লুমিনেন্সের বড় দলে স্থান করে নিতে বেগ পেতে হয়নি। রিও লীগে বোটাফোগো তখন দারুণ দল, ৬১ থেকে ৬৩—পর পর তিনবার চ্যাম্পিয়ন। ৬৪তে ফ্লুমিনেন্স লীগ চ্যাম্পিয়ন হয় মুখ্যত অ্যালবার্টোর ক্রীড়ানৈপুণ্যে। অসাধারণ অ্যাটাকিং ফুল ব্যাক হিসাবে নামটা ছড়িয়ে পড়তেই ডাক আসে পেলের স্যান্টোস ক্লাব থেকে। তার আগেই অবশ্য ব্রাজিলের কোচ ফিওলা ওকে খেলিয়েছিলেন জুনিয়র ওয়ার্ল্ড কাপে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে। ওর অ্যাটাকিং মুভমেন্ট ইংলন্ডের উপর এমন প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল যে ১০ মিনিট ইংলন্ড প্রায় আত্মরক্ষায় নিরত ছিল। খেলায় ব্রাজিল জিতেছিল ৫—১ গোলে। অ্যালবার্টোর বয়স তখন মাত্র ১৬ বছর। পরে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে একটি খেলায় অ্যালবার্টো ফিওলাকে হতাশ করলেন। কী যে হয়েছিল কিছুই বোঝা গেল না। না পারলেন আক্রমণ প্রতিরোধ করতে, না পারলেন আক্রমণ তৈরী করতে। আর্জেন্টিনা ওই খেলায় ব্রাজিলকে হারাল ৩—০ গোলে এবং নির্বাচকরা সাময়িকভাবে অ্যালবার্টোর কথা ভুলে থাকলেন। ৬৫ থেকে আবার স্বমহিমায় খেলা শুরু করেন এবং জাতীয় দলে জালমা স্যান্টোসের শূন্য স্থান পূর্ণ করার জন্য নির্বাচকরা ওকেই বেছে নেন। তারপর আর কোনদিন পেছনে ফেরেননি। বল প্রতিরোধ এবং ট্যাকল-এর পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি এবং বল নিয়ন্ত্রণের চমৎকারিত্বে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাইট ব্যাকের শিরোপা পান মেক্সিকোতে। আক্রমণের মোকাবিলা করেই প্রতি আক্রমণের জন্য ঝড়ের মত ছেড়ে যাওয়া ওঁর খেলার বড় বৈশিষ্ট্য। তার চেয়ে বড় কথা অধিনায়কোচিত দৃঢ়তা এবং প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী খেলা।

১৯৭১এ সাময়িকভাবে বোটাফোগোর খেলতে গিয়ে হাঁটুতে ভীষণ চোট লাগে। অনেকদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। অস্ত্রোপচার করে শেষ পর্যন্ত কার্টিলেজ সরিয়ে ফেলতে হয়। কিন্তু ওই অস্ত্রোপচার তাঁর ক্রীড়া দক্ষতায় টান ধরাতে পারেনি। স্যান্টোস ক্লাবে খেলেছেন সমান দাপটে। পেলের উদ্যোগেই এসেছেন কসমস ক্লাবে। ৩৩ বছর বয়সী বিশ্ব তারকা এখনো স্বদীপ্তিতে দীপ্যমান, যদিও আগের তুলনায় কিছুটা ম্লান।

মুকুল

নামরহস্য

পারাবত (পায়রা)

পায়রা নামটি পারাবত থেকে এসেছে। পার মানে জলের তীর। সেই তীরে সে বেগে যায়। বেগে গিয়েই যেন পড়ে যায়। যেমন আ-পতাটি। পার—আ-পত্ অত্। পতোনের পিত্ত শব্দ থেকে পত স্থানে বত। এটি লোক-সংস্কৃত শব্দ হলেও প্রাচীন।

কলরব : এটি পারাবতের একটি নাম। কল মানে অব্যক্ত ও মধুর ধ্বনি। সে মধুর অথচ অব্যক্ত ধ্বনি করে তার নাম কলরব। পারাবত যখন রমণপ্রয়াসী হয়, তখন বকম্ এই অব্যক্ত মধুর শব্দ করে।
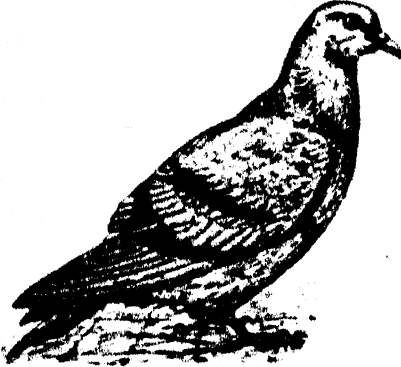
কপোত : পায়রার আর একটি নাম। এই নামটি আজও সর্বাধিক প্রাচীন। ঋক্‌বেদের ১০।[illegible] সূক্তে আছে। ক মানে বায়ু; সেই বায়ুতে যে পক্ষী জাহাজের মত চলে। তাই তার নাম দেওয়া হয়েছে 'কপোত'। ক—বায়ুতে পোত ইব।

কোকিল

কোক শব্দ থেকে কোকিল শব্দ। কোক শব্দের তিনটি অর্থ। (১) নেকড়ে বাঘ; (২) চক্রবাক পাখি, ও (৩) কোকিলের ধ্বনি। সকলে অবশ্য কিন্তু একটি অর্থকে লক্ষ করে। সেটি হলো—শুধু গ্রহণ করে, ত্যাগ করে না। চক্রবাক পাখিও কাউকে দিয়ে খায় না। এই কোকিল ও তার পত্নী পুত্র কন্যা বা আত্মীয়স্বজনকেও দিয়ে খায় না। তাই বলা হয় কোক-স্বভাব। সেই কোক্ শব্দটি এই পাখিতে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করেও আর একটি অর্থ প্রকাশ করে।" সেটি হলো—কুক্ ইতি ধ্বনিং কৃত্বা লাতি। অর্থাৎ কু এই ধ্বনি করার পরই সে চূতমঞ্জরীর রস গ্রহণ করে, অর্থাৎ আমের মুকুলের রস পান করে। কুক্ অর্থে গ্রহণ; এর উত্তরে ইলচ্ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন, কোকিলের পুরুষজাতিই কুহু ধ্বনি করে, স্ত্রীজাতি করে না।

বনপ্রিয় : কোকিল গ্রামের বা ময়দানের গাছ অপেক্ষা বনের গাছকেই বেশী পছন্দ করে। তাই তার এক নাম বনপ্রিয়।

পরভৃত : কোকিলের কুখ্যাত নাম এটি। পরের দ্বারা এরা পুষ্ট হয়। সেই পর হলো কাক। কোকিল অত্যন্ত ধূর্ত। রাতে কাক বাসায় থাকে; তাই দিনের আলোর কিছু আগেই কাক বাসা ছেড়ে গেলেই কোকিল তার বাসায় গিয়ে কাকের ডিমগুলি ফেলে দিয়ে নিজে ডিম পেড়ে চলে আসে। তারপর কাক সে ডিম নিজের মনে করে তা দেয়। বাচ্চা অবস্থায় কাক কি কোকিল চেনা যায় না। যখন ডাকতে শুরু করে তখনই কাক তাকে তাড়ায়। এর ফলে এরা দুই দিক থেকেই নিষ্ঠুর হয়। প্রথমত, মাতাপিতার স্নেহহীন হয়ে জন্ম নেয়; দ্বিতীয়ত, কাকের তাড়াতেই তার শৈশব অতিবাহিত হয়। যাকে বলে 'বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো' ছেলে। এইজন্য তারা কোক্—নিষ্ঠুরভাবে কেবল গ্রহণই করে। আর পরভৃত অর্থ—পরৈঃ ভৃতঃ—পুষ্টঃ।

পিক : কোকিলের প্রখ্যাত নাম পিক। এই নাম বৈদিক আর্যদের দেওয়া। শুক্ল যজুর্বেদের ২৪।[illegible] সূক্তে আছে। এই সূক্তটির অর্থের ভাষ্য করে[illegible]

শব্দের (বৈদিক অভিধান) উক্তি দিয়ে পি+কৈ (শব্দ) অক্+অ। অর্থাৎ, এই পাখিটি কিবা পুরুষ, কিবা নারী একটি ধ্বনি করে—পিক্ পিক্। শুধু কুহু করে না নারী কোকিল। কিন্তু পিক্ পিক্ উভয়েই করে।

বলাকা (বাল-হাঁস)

এই পাখিটি আর্যদের খুব পরিচিত ছিল, শুক্ল যজুর্বেদের ২৪।২২ সূক্তে উল্লেখিত। এও এক রকমের হাঁস, দেখতে আকারে ছোট কিন্তু অবিকল হাঁসের মত। কালো ও সাদা দু[illegible] দেখতে পাওয়া যায়। এরা খুব দূর দেশে [illegible] যেতে পারে। যখন ওড়ে তখন দল বেঁধে ওড়ে[illegible] এর আর এক নাম বিস-কণ্ঠিকা। এদের চলতি কথায় বাল-হাঁস বলে। এখানে বাল শব্দের অর্থ ছোট।

সংস্কৃত ভাষায় বলাকা নামটি যত সুন্দর কিন্তু তার প্রকৃতিটি ততটা সুন্দর নয়—খুব হিংসুটে। বল ধাতুর উত্তরে আকন্ প্রত্যয় যোগে বলাকা। বল শব্দটি হিংসা এবং সামর্থ্যকে বোঝায়।

বাচস্পতি

নতুন বই

উপন্যাস

ফাল্গুনী। **শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।** আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯। আট টাকা

গুহায়। **বিমল কর।** আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯। দশ টাকা

প্রবন্ধ

নিবার্সংকর ঃ নিশি ও নিরাশি। মুখরঞ্জন দাশগুপ্ত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিঃ-৯। ছয় টাকা

বিবেকানন্দের সাহিত্য। **জয়ন্ত** গোস্বামী ও মায়াঞ্জনা গোস্বামী। পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯। সাত টাকা

রাজা ও রাজনীতি। **বরুণ সেন-গুপ্ত।** আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিঃ-৯। আট টাকা

শিশু সাহিত্য

মাধুরীলতার চিঠি। **পূর্ণানন্দ** চট্টোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯। পাঁচ টাকা

কবিতা

হিময়ুগ। **বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত।** আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯। পাঁচ টাকা

শাশ্বতী। **অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ** দাস। আল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশনস লিঃ, ৫৫-১ কলেজ স্ট্রীট, (দোতলা), কলি-৭৩। পাঁচ টাকা

প্রজ্বলিত অগ্নি। **অঞ্জনকুমার** দাস। আল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশনস লিঃ, ৫৫-১ কলেজ স্ট্রীট, (দোতলা) কলি-৭৩ পাঁচ টাকা

উত্তরে থাকো মৌন। **বিষ্ণু দে।** আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিঃ-৯। পাঁচ টাকা

গল্পগ্রন্থ

শ্বেত পাথরের টেবিল। **সঞ্জীব** চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। ছয় টাকা

বিবিধ

চিরঞ্জীব বনৌষধি (**দ্বিতীয়** খণ্ড) আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯। পঁচিশ টাকা

আলোচনা : শিল্প সংস্কৃতি

আলোচনা শিল্প সংস্কৃতি **বই**

রাধাকৃষ্ণ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা-৯। মূল্য দশ টাকা।

রাধাকৃষ্ণ উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে পরিচিত গণ্ডীর বাইরে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। কৃষ্ণ ও রাধা ভারতবর্ষের আবহমানকালের মানুষের স্বপ্ন ও কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে। বিশেষত রাধা।

বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা সেই বিতর্কের মধ্যে না-গিয়ে শুধু এটুকু বলতে পারি, বৃন্দাবন-লীলার অংশ বিশেষকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় গদ্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এবং গল্পের 'মিসিং লিঙ্ক'-গুলিকে কল্পনায় ও অনুমানে ভরাট করে দিয়েছেন। সেই ভরাট করাটা কতখানি সুসংগত হয়েছে সে বিচারই সাহিত্যের বিচার।

কংসের ভয়ে গোকুলে যশোমতী আশঙ্কায় অস্থির—এই দৃশ্য দিয়ে কাহিনী শুরু এবং শেষ মথুরারাজ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিরহিণী রাধার মিলনে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'রাধাকৃষ্ণ'-এ অতি যোগ্য হাতে ঘটনাগুলো সাজিয়েছেন। সে আবেগ-তীব্রতা রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম-

কাহিনীর মূল সম্পদ তা আগাগোড়া অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাঁর নিজের ভাষা সহজ ও সাবলীল, কিন্তু আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে যেখানে তিনি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও মাধবেন্দ্রের পদ বিশেষ প্রায় হুবহু ব্যবহার করেছেন। সুনীলের ভাষা ও বৈষ্ণবপদকর্তাদের ভাষা মেশামেশি হয়ে একটি প্রকাশের যাদু সৃষ্টি হয়েছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আপন ক্ষমতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ঔপন্যাসিক। সেই জন্যই সম্ভবত তিনি দুটি কাজ করার চেষ্টা করেননি। (১) পৌরাণিক পরিবেশ সৃষ্টি ; (২) পৌরাণিক চরিত্রগুলির এক নূতনতর ব্যাখ্যা—যেটা মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথ যথাক্রমে রাবণ প্রমীলা প্রভৃতি ও কর্ণ, কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও দুর্যোধন প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে করেছেন। তিনি যেটা করেছেন, খুব সুন্দর করে সাধারণ পাঠকের জন্য রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার কাহিনীটি বলতে প্রয়াস করেছেন। এবং সেই প্রয়োজনে কোথাও কোথাও প্রচলিত কাহিনীর শূন্যস্থান পূরণ করার চেষ্টা করেছেন কবি কল্পনায়। যেমন কৃষ্ণ কেন মথুরায় রাজা হয়ে আর কোনোদিনই বৃন্দাবনে এলেন না—তার একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য সম্ভাব্য ব্যাখ্যা তিনি রেখেছেন শেষ অধ্যায়ে।

তবে অসংগতিও আছে অনেক জায়গায়। কালীয়দহের বিবরণ সাদাটিকে করেছেন বিস্ময়হীন। বিখ্যাত কালীয়-নাগকে করেছেন অজগর। আবার অজগরের কথা দেখিয়েছেন। বাসকে বানিয়েছেন বনপ্রাণী ও প্রকৃতিকে হিংস্র। কানুকে বাঁশি শিখিয়েছেন শ্মশানের ধারে এক সাধুর কাছ থেকে, আত্মপরিচয়ও জেনেছে সে এক সাধুর কাছ থেকে। বালক বলরামকে 'ধ্বংস মেলায় ভৌতিক' দেখাতে বলেছেন। দেবতার জন্মের আগে দেবতার পুজো প্রবর্তন করে দিয়েছেন। উপন্যাসের অলংকরণটি তাঁর সুন্দর হয়েছে। রাধা-কৃষ্ণের একক ও যুগল মূর্তির আর্ট-প্লেট আছে গোটা বারো। এগুলি উপন্যাসটির মনোহারিত্ব বাড়িয়েছে সন্দেহ নেই। তবে কিছু ছাপার ভুল গ্রন্থের মর্যাদাকে নষ্ট করেছে।

এতৎসত্ত্বেও কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন, এর বাহ্য আগে কত অন্য—তাহলে বলতেই হবে বইটা অনেকেরই প্রাণ মাতাবে।

অমল মুখোপাধ্যায়

রচনাবলী ১ম খণ্ড ; শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ; দুশমন্তু ; ৬৩ কলেজ স্ট্রীট কলকাতা-১২ ; পঁচিশ টাকা।

বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের অভাব নেই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের প্রয়োজনের বাইরে এসব রচনার পাঠক মুষ্টিমেয়। রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মননসমৃদ্ধ প্রবন্ধের আর কী অবস্থা! কিম্বান সর্বত্র পড়া হলেও তাঁদের রচনা বোধ করি সর্বত্র পঠিত নয়।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত গুপ্তের রচনাবলীর প্রথম খণ্ড বার হয়েছে। এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে তাঁর সাহিত্যিক রূপ ও রস, আধুনিকী শিক্ষা ও দীক্ষার প্রবন্ধগুলি। রবীন্দ্র সমালোচনামূলক প্রবন্ধও এই গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। বলা বাহুল্য প্রতিটি প্রবন্ধের বিস্তৃত পরিচয়ের অবকাশ নেই। নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রথম প্রবন্ধটিতে (কবিতার দিশারী) কানাইয়ের সঙ্গে মধুসূদনের তুলনা করেছেন এবং লক্ষ করেছেন মধুসূদনের কাব্যে রোমক শক্তিমত্তার দ্যুতি এবং অস্পষ্টপ্রবর্তী সংহতি। অবশ্য দেখেছেন মধুসূদনের রচনায় প্রাণশক্তির বেগ 'বাইরের দিকে'। আর অন্তরতম যে রহস্যকথা তার পরিচয় রবীন্দ্রসাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিকের সেই অনন্তের দ্যোতনা' পরিব্যাপ্ত। মধুসূদনে গ্রীকের অর্ধ-গৌরবের গভীরতা মুক্ত সুস্পষ্ট চাক্ষুষতা এবং রবীন্দ্রকাব্যে রোমক ভাবার্থের অভাব। কেলটিক ধর্মের (মিস্টিক ধর্মের) স্বরূপ প্রকাশিত রবীন্দ্রকাব্যে। অন্যত্র লেখক কেলটিক ধর্ম উদ্ভূত রচনাকে আত্মিক কবিতা বলেছেন। শ্রীযুক্ত গুপ্তের সাহিত্য বিচারে উদার দৃষ্টির পরিচয় পাই যেখানে তিনি ইউরোপীয় ও ভারতীয় দৃষ্টির তৌলিক আলোচনা করে দেখিয়েছেন কবি নিজস্ব পুত্রের, তাই তিনি বিশ্বজ্ঞান (জোড়ভঙ্গি) বা বীজমুক্তিরূপ (হিউ-রোপীয়) উভয়ের মধ্যেই আপনাকে পূর্ণভাবে প্রকাশিত করিতে পারেন।' সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনায় সেই ক্ষেত্রে অনেকেই কৌতূহলী হয়েছিলেন। বিশেষত ভারতীয় রসতত্ত্ব আলোচনায় পাণ্ডিত্যকর্ম ব্যাখ্যা বোধ করেছেন। পাশ্চাত্য পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও প্রাচ্য সাহিত্য-জিজ্ঞাসায় প্রীতি প্রীতি-পক্ষপাত নলিনীকান্তের রচনায় অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কাব্যের উৎস নির্ণয়ে রুচি ও স্ফূর্তির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অথবা কাব্যের শ্রেণী-ভেদ নির্ণয়ে শুধু, বিদ্যা, কবীর ও চিত্তবৃত্তির কবিতা চিন্তা নলিনীকান্তের মৌলিক না হোক তাঁর বিশ্লেষণ আমাদের চমৎকৃত করে। ভাব এবং ছন্দ ও কথার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে ভাবকে প্রত্যাখ্যান, সমাধিস্থ শিবিরদের সঙ্গে তুলনা করেছেন শ্রীযুক্ত গুপ্ত। আর ছন্দস্রোতে সে ভাবকে বিগলিত করে দিচ্ছে ; কথা যেন সেই স্রোতে আলোকসম্পাত। ঋষি, কবি ও দার্শনিক দৃষ্টির তুলনামূলক আলোচনা পাই কয়েকটি প্রবন্ধে। সেখানেও লেখকের চিন্তার মৌলিক দিকটি উদ্ভাসিত। কাব্য-জিজ্ঞাসা আলোচনায় নলিনীকান্ত সর্বদা কাব্য-মীমাংসায় পৌঁছেছেন এমন নয়, সে প্রয়াসও তাঁর নেই। মনন ও অনুভূতির সাহায্যে তিনি নিজের বক্তব্যকেই তুলে ধরেছেন। সৃষ্টির বেদনাকে তিনি নতুন দিক উপলব্ধি করেছেন এবং তা পাঠকের গোচরে এনেছেন। সাহিত্য রচনায় নলিনীবাবু, দিব্যশক্তির আবির্ভাবের কথা বলেন। তাঁর ভাষায় মানুষের সাধারণ বুদ্ধি—তাহার প্রতীতি, প্রেরণা, দৃষ্টকোণ খেলাইতেছে প্রকৃতির এপারের উপরিটি লইয়া।... প্রতিভার প্রতিভা কিন্তু এইখানে যে তিনি এপারের এ গণ্ডী কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছেন ওপারে—অর্থাৎ শরীর প্রাণ ও মনের উপরে যে চতুর্থ বা তুরীয়লোক সেইখানে, যাহা সত্যের ও সৎ-এর, অবাধ জ্ঞান ও জ্যোতি, সুসমর্ণের প্রতিষ্ঠান, উপনিষদ যাহার নাম দিয়াছেন 'বিজ্ঞান'—বৃহৎ জ্ঞান—যেখানে রহিয়াছে 'দিব্যদৃষ্টি' আর দিব্যবৃত্তি। জগৎ ও জীবনের লক্ষ্য সেই দিব্যজীবন লাভ। সাহিত্যে সেই জিজ্ঞাসা। সাহিত্যে নরকেও সুন্দরকে পায় (বোদলেয়ার আলোচনা প্রসঙ্গে নলিনীবাবু তা বিশদ করেছেন), কুৎসিতের মধ্যেও অনন্তের আভাস দেখে। পারিভাষিক আলোচনা শ্রীযুক্ত গুপ্তের অভিপ্রেত নয়। এখানে তাঁর দার্শনিক জিজ্ঞাসাই প্রধান। নলিনীকান্ত কিছু প্রবন্ধে সমকালীন সাহিত্য ভাবনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তাঁর সময়ে আধুনিক সাহিত্যের স্বরূপ নিয়ে যে আলোচনা-সমালোচনা হয়েছিল সে-সবের উল্লেখ না থাকলেও এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, সমকালীন সাহিত্য বিষয়ক তর্ক-বিতর্কে তিনিও বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন। আধুনিক সাহিত্যের অতিপ্রবণতা (সমকালীন রবীন্দ্রনাথের 'বাস্তব' প্রবন্ধ) বা প্রগতিবাদিতার তিনি বিরোধিতা করেছেন কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের যেখানে গভীরতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখা দিয়েছে তাকে তিনি

পাকাচুল আর
হেয়ার ডাই (কলপ)
সম্বন্ধে, আপনার যে
এক তরফা ধারনা,
গোদরেজ তা
সহজেই নাকচ
করে দিচ্ছে—
পাকাচুল হওয়াই তো স্বাভাবিক
তা তো বটেই! তবে গোদরেজ যখন চুল ডাই করার ব্যাপারটাকে চুল শ্যাম্পু করার মতই সহজ আর স্বাভাবিক করে দিয়েছে, তখন পাকাচুল পাকা রাখাটাই অস্বাভাবিক!
পাকাচুল চেহারায় বৈশিষ্ট্য আনে
পাকাচুল হয়তো চেহারায় বৈশিষ্ট্য আনে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপনার চেহারায় খানিকটা বয়েসও জুড়ে দেয়। বন্ধুদের জিজ্ঞেস করে দেখুন।
চুল ডাই করার ঝামেলায় কে যেতে চায়?
কেউই চায় না। সেই জন্যেই গোদরেজ এমন হেয়ার ডাই এনেছে যা আপনা থেকে ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ, আপনাকে আর কষ্ট করে সিঁথি কেটে চুল ভাগ করে ডাই দিয়ে চুল পেন্ট করতে হয় না, তার বদলে চুলে খানিকটা ডাই ঢেলে, ঘষে ফেনা করে নিয়ে, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর চুল ধুয়ে ফেললেই বাস্! ব্যাপারটা সত্যিই এত সহজ!
হেয়ার ডাই চুলের ক্ষতি করে না?
কিন্তু সেকেলে হেয়ার ডাই নিশ্চয়ই করতে পারে। সেই জন্যে গোদরেজ অন্য ফর্মুলায় তৈরী। এতে এক রকমের হেয়ার কণ্ডিশনার মেশানো আছে যার ফলে চুল সুন্দর দেখায় আর ঝলমলে তারুণ্যে ভরে ওঠে!
ভারতের প্রথম
আপনা থেকে
ছড়িয়ে পড়া
হেয়ার ডাই!
Godrej
Permanent
hair dye
১/- টাকা
ডিস্কাউন্টের বিশেষ
সুযোগ* নিন!
গোদরেজ
পার্মানেন্ট হেয়ার ডাই
—চুল ডাই করা থেকে
"ঝামেলা" বাদ দিয়েছে,
আপনি যাতে চেহারা
থেকে খানিকটা বয়েস
ছেঁটে বাদ দিতে পারেন!
পুরুষদের জন্যে,
মহিলাদের জন্যেও।
২টি রঙে: স্বাভাবিক কালো,
গাঢ় খয়েরী
* শিগগির! যতদিন স্টক থাকবে এ সুযোগ পাবেন!
CASGS-109-244 BEN

অনুষ্ঠানে এঁরা সাফল্যের নজির রাখেন। মাঝখানে কিছুদিন নীরব থাকার পর আবার এঁরা সক্রিয় হয়েছেন দেখে ভালো লাগল।

অ্যালিয়াঁস ফ্রাঁসেজের অনুষ্ঠানে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ ভার্বিক হরিনাথ দে-র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। গৌরী ঘোষ এ সময়ের একজন বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী। তিনি পাঠ করেন করুণানিধানের কবিতা। হরিনাথ দে-কৃত মধুসূদনের 'আত্ম-বিলাপ' কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ ও মূল কবিতাটি পড়ে শোনান অমিতাভ চক্রবর্তী। তরু দত্তের মৃত্যু শতবার্ষিকী উপলক্ষে ফরাসী থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা কবিতা পরিবেশন করেন পার্থমিত্র চৌধুরী ও অপর্ণা মুখোপাধ্যায়। মূল ফরাসী কবিতা আবৃত্তির দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল সুদেষ্ণা চক্রবর্তী ও নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের ওপর। অ্যালিয়াঁস ফ্রাঁসেজের অনুষ্ঠান বলেই সম্ভবত আগাগোড়া পুরো অনুষ্ঠানটি বাংলা ও ফরাসীতে উপস্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু আবৃত্তির মান যে সবসময় উচ্চ পর্যায়ের হয়ে উঠেছিল তা বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি-ভাবনা প্রসঙ্গে আবৃত্তি ব্যাপারটা আসলে কী তা মৈত্রেয়ী দেবী ব্যাখ্যা করে জানান। পাঠ কোথায় আবৃত্তির স্তরে গিয়ে পৌঁছায় তিনি তা রবীন্দ্রনাথের কবিতা উদ্ধার করে দেখান। অর্থ বোঝার সুবিধার জন্য আধুনিক ফরাসী কবিতার অনুষ্ঠানটিকে প্রথমে বাঙলা, পরে মূল ফরাসী—এই দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। বাঙালী তরুণ-তরুণীদের পাশে সেদিন ফ্রাঁসোয়া গার এবং জঁ পিয়ের আন্দ্রেও কবিতা পড়েন। সমবেত আবৃত্তির প্রযোজনা ছিল তিনটি—নারী, নিগ্রো এবং বিদ্রোহ ও প্রেম। 'নারী' অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, চিঠি ইত্যাদি থেকে রচনা সংকলন করে নারীর স্বাধীন সত্তা ও তার বিদ্রোহী রূপটিকে তুলে ধরা হয়। 'নিগ্রো' অনুষ্ঠানে কবি ও অনুবাদকবৃন্দের নাম ঘোষণার প্রয়োজন ছিল। 'বিদ্রোহ ও প্রেম' ছিল আন্তর্জাতিক কবিতা পাঠের আসর। যে মানুষ প্রেমিক সে আসলে বিদ্রোহী এবং যে বিদ্রোহী সে মনে মনে প্রেমিক—বক্তব্যের দিক থেকে এটি আহামরি নতুন কিছু না হলেও, পরিবেশনার গুণে অনুষ্ঠানটি প্রীতিপ্রদ হয়ে উঠেছিল। অনুষ্ঠান গুলিতে বিশেষ ভূমিকা নেন, রত্না মিত্র, সান্ত্বনা চৌধুরী ও বিনয় চক্রবর্তী। সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতার অনুষ্ঠানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তার আবার নতুন পরিচয় পেলাম। ফরাসী কবিতার অনুপ্রেরণায় লেখা তাঁর কবিতা নিয়ে সেদিন হই-হই পড়ে যায়। কিন্তু মন ভালো নেই কবিতাটির প্রতি শ্রোতাদের কিছুটা অনুকম্পা মনে হল। নবনীতা দেবসেন পড়েন তিনটি স্বরচিত ও একটি ফরাসী কবিতা।

পঙ্কজ সাহা পরিকল্পিত ও পরিচালিত অনুষ্ঠানটিকে বিশেষভাবে অলংকৃত করেছিল রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি ছবি।

প্রতিভাবানদের সঙ্গে জড়িত হয়েছিল দর্শকদের বাসনা।

অ্যাকাডেমী মঞ্চে কবিতা

নান্দীকার-এর সহযোগিতায় আবৃত্তিলোকের প্রযোজনায় দুদিনব্যাপী গান ও কবিতা পাঠের আসর বসেছিল অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিল্পের চেনাজানা পরিসরটাকে বাড়ানো এবং সেই সঙ্গে নতুন কিছু বৈচিত্র্যের সন্ধানই তাঁদের লক্ষ্য। আর একটি মহৎ উদ্দেশ্যের কথাও আমাদের জানানো হয়েছে। তা হল, অনুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত অর্থে কেয়া চক্রবর্তীর স্মৃতিতে প্রতি বছর তিনটি বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। অনুষ্ঠানের তাৎপর্য সার্থকতা অনেকটাই নির্ভর করে তার লক্ষ্যের ওপর। লেখা বাহুল্য, লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য উদ্যোক্তা ও সহযোগী সংস্থার তরফে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তবুও খুব যে তাঁরা সফল হয়েছেন তা বলতে পারি না।

ইদানীং আবৃত্তি যে বেশ জনপ্রিয় হয়েছে তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার আরেকটা প্রমাণ, বিভিন্ন নাম করা নাট্য সংস্থা এবং প্রেক্ষাগৃহের মালিক ও কর্তৃপক্ষরা নাচ বা আধুনিক বাঙলা গানের আসর মুলতুবি রেখে শুধুমাত্র আবৃত্তি নিয়েই এক একটি অনুষ্ঠানের প্রযোজনা করতে শুরু করেছেন। এর নীট রেজাল্টটি যাই হোক না কেন, এতে আবৃত্তিকারদের দায়িত্ব আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। আবৃত্তিকারদের 'মার্কেট ভ্যালু' বেড়েছে। এতে আমাদের উদ্বেলিত হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু দেখতে হবে জনপ্রিয়তার খেসারত দিতে গিয়ে তাঁরা যেন আবৃত্তির শিল্পমূল্যকে রাতারাতি জলাঞ্জলি দিয়ে না বসেন! ভুল ত্রুটি, ছন্দ পতন ইত্যাদি যা কিছুই ঘটুক না কেন দেখা যায় বিশেষ কিছু কিছু কবিতার আবৃত্তি শ্রোতাদের মধ্যে সাড়া তোলে। হাততালি পাওয়ার লোভে এবং দুর্নিবার ইমেজ সৃষ্টির তাড়নায় আবৃত্তিকাররা ভুলত্রুটি সমেত তখন একই ভঙ্গিতে ওই একই কবিতার আবৃত্তি নিয়ে আসর জমান। বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি ছাড়া আমরা আর তখন কোন কিছুই পাই না। আবৃত্তিকাররা, বুঝুন বা না বুঝুন, ম্যানারিজমের শিকার হন। তাঁদের ব্যক্তিগত ইমেজ এবং সে সম্পর্কে তাঁদের মাত্রাতিরিক্ত সচেতনতা অনেকক্ষেত্রে পঠিত কবিতাটির ক্ষতি করতে পারে। অর্থাৎ যে ভাবে ছন্দ বিচার করে, ভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে এক একটি কবিতা পাঠ করা উচিত শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠে না। জনপ্রিয়তার লোভী পোকা এভাবে অনেকক্ষেত্রেই শিল্পের বিশুদ্ধতাকে গ্রাস করে। অ্যাকাডেমী মঞ্চে গান, আবৃত্তি ও কবিতাপাঠের আসরে সেদিন প্রচ্ছন্নভাবে এই ব্যাপারটিই ঘটতে দেখলাম।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত মঞ্চের একজন শক্তিমান অভিনেতা। কিন্তু অভিনেতা হলেই যেন তিনি ভালো আবৃত্তিকারও হবেন এ রকম বাসনার ফল যে বিজ্ঞ শ্রোতাদের মনে কী রকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তা বোধ হয় উদ্যোক্তারা জানতেন না। নইলে তাঁরা অভিনেতাদের আবৃত্তিকারের ভূমিকায় করতে মঞ্চে পাঠাতেন না। শুধু রুদ্রপ্রসাদ নন, কুমার রায়ও ব্যর্থ হয়েছেন আগাগোড়া। কুমার রায় অবশ্য প্রত্যাশা জাগিয়েছিলেন আমাদের মনে। সুধীন্দ্রকুমার চৌধুরীর 'অসি দাও' কিংবা অরুণ মিত্রের 'এ জ্বালা কখন জুড়োবে' কবিতার নির্বাচনে যতই বিশিষ্টতা থাকুক না কেন, তাঁর পাঠ আমাদের হৃদয়ে কোন দাগ কাটতে পারল না। গান ও কবিতার মিশ্র অনুষ্ঠান কিন্তু বেশ 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' আবৃত্তির জন্য এখানেও পার্থ ঘোষ বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। পাঠের মধ্যখানে অকারণে হঠাৎই কণ্ঠে কীর্তন নিয়ে তিনি কবিতাকে ক্লাইম্যাক্সে নিয়ে যেতে চান। ইদানীং এটা তাঁর একটা ম্যানারিজম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে হয়তো হাততালি পাওয়ার বিশেষ অসুবিধা হয় না।

গান ও আবৃত্তির মাধ্যমে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' কবিতার দিক থেকে আমরা সম্পূর্ণ এক নতুন আস্বাদন পেলাম। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সুরে খুব সুন্দর গেয়েছেন কুমকুম চট্টোপাধ্যায় ও স্বর্ণ [illegible]। খুব ভালো আবৃত্তি করেছেন অমিয় চট্টোপাধ্যায় ও গৌরী ঘোষ। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ভাষ্যপাঠে। আবৃত্তিলোকের এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। দুদিনের অনুষ্ঠানে সবচেয়ে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন তিন বিশিষ্ট কবি—বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও অমিতাভ দাশগুপ্ত। গদ্য কবিতার আসরে অনেকে পড়েছেন চড়া সুরের কবিতা, চড়া গলায়। রবার স্ট্যাম্প দিয়ে কিছু কবিতাকে গদ্য কবিতা হিসেবে ছাপ মেরে দেওয়ার একটা প্রবণতা কিছু লোকের মধ্যে দেখা যায়। এর মাথামুণ্ডু খুঁজে পাওয়া যায় না। এখনও পর্যন্ত 'কেউটে আঁধার' কিংবা 'কন্যাকুমারী কপাল' ইত্যাদি ধরনের শব্দবন্ধ যেসব কবিতায় প্রায়শই ব্যবহার করা হয় সেই সব রচনার প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহই থেকে যায়। মহিম ঘোষ একজন ভালো আবৃত্তিশিল্পী। কিন্তু জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য কি চীৎকার করতে হবে আবৃত্তিকারকে?—তাঁর নেরুদা ও নিগ্রো কবিতার আবৃত্তি শুনে এ রকমই অনেকের ধারণা হবে। কবির রাগ ও প্রতিবাদের ভাষা প্রকাশের একটি নিজস্ব স্বরগ্রাম আছে। আবৃত্তিকারকে তার সন্ধান পেতে হবে।

শাওলী মিত্র, কাজল চৌধুরী, রূপসী কাহালী, সৌমিত্র মিত্র, শান্তনু রায়ের আবৃত্তি নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই। দোষ গুণ মিলিয়ে এঁরা সবাই প্রতিটি অনুষ্ঠানে ভালো কিছু করার চেষ্টা করেন। মঞ্চে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের উপস্থিতি ও গান গাওয়া ব্যাপারটি ছিল উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'নবজীবনের গানে' আমরা অবশ্য কিছু [illegible] ক্যালকাটা হুইল অফ মিউজিক [illegible] পরিবেশন করেছেন তিনটি [illegible] সাম্প্রতিক নাট্যসংগীতের আসরে [illegible] যেমন নান্দীকার, থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রভৃতি সংস্থা ও বিশিষ্ট গায়কেরা। দু দিনের আসরে পাঁচমিশেলী অনুষ্ঠান কিছু খুব আমরা দেখতে পেলাম। [illegible]

...। কিন্তু অর্কেস্ট্রায় সুরে বাজল না।
রুদ্রাদিন বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা শিল্প সংস্কৃতি **সংগীত**

সাগর-পারের লোকসংগীত

সন্ড্রা জনসন প্রিয়দর্শিনী,

শুনেছিলাম তোমার গলা মিষ্টি। কোথায় যেন পড়েও ছিলাম, তোমার কণ্ঠে মিশে আছে রাশিয়ার আকাশ (যেহেতু ঠাকুমার কাছে শিখেছিলে রাশিয়ার গান), স্পেনের সবুজ প্রান্তর, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের সাগরদোলা, আর আমেরিকার বার্তা বিক্ষুব্ধ, আনন্দ। শুধু যা আমি পড়িনি বা শুনিনি কোথাও, কিন্তু যে-ভাবনাটি ওরা অক্টোবর সন্ধেবেলা ইউসিস আয়োজিত সন্ধ্যার আসরে (বিদ্যামন্দিরে) আমাকে ছুঁয়ে গেল তা হল এই যে, তুমি যখন তোমার অ্যাপালেচিয়ান ডালসিমার যন্ত্রটি বাজিয়ে গান গাও, কোথায় যেন বাংলাদেশের বাউল তার গেরুয়া বসনটি উড়িয়ে দেয়। আর মনে পড়লো, কিংবা বলা উচিত তোমার গানের সুর আর কথা ভাসিয়ে নিয়ে এল আমার কাছে স্মৃতিতে ম্লান হয়ে

আসা কয়েকটি ছবি—টমাস হার্ট বেন্টন-এর লোনসাম রোড, পামার আক্কেন-এর আঁকা কয়েকটি তৈলচিত্র এবং টমাস ইকিনস-এর সেই ছবিটি যার নাম কাউবয় সিংগিং। লক্ষ করলাম শ্রোতার ওপর সবচেয়ে পরিব্যাপ্ত প্রভাবের নাম কোন বেঞ্জ। কিন্তু তোমার নিজস্ব ধরনটিকে পাওয়া যায় সবচেয়ে স্বচ্ছন্দে তোমার উচ্চারণে, তোমার কণ্ঠস্বরের ওঠানামায়, আমাদের কাছে নিজেকে পৌঁছে দেবার ব্যাকুলতায়। পরের দিন সকালে কফি-উষ্ণ প্রাতঃ কল্লোলের আড্ডাটা কাটিয়ে তুমি যখন নিজের বিষয়ে অনেক কথা বললে আমাকে বুঝতে পারলাম কোথায় তুমি অন্যদের চেয়ে অন্য রকম। তোমার ভাষায়: "আমি গানকে অভিনয়ের চেয়ে এই অর্থে আলাদা করে দেখিনা যে গান ও অভিনয়ের মূল উদ্দেশ্য কমিউনিকেশন এবং এর মাধ্যম অনেকটাই কণ্ঠস্বর, উচ্চারণের ভঙ্গি, কথা বলার ধরন। আমার উদ্দেশ্য শুধু গান গাওয়া নয়, গান পৌঁছে দেয়া। সুরে দিয়ে অন্যের হৃদয়ে সুরের সৃষ্টি করা, কথা দিয়ে অন্যের মনকে ছুঁয়ে দেয়া।" সেদিন সন্ধ্যায় কুড়িখানারও বেশি গান শুনিয়েছিলে তুমি—কোনোটি ব্যালাড, কোনোটি শ্যান্টি, কোনোটি স্পিরিচুয়াল, কোনোটি ব্লুজ। পৃথিবীর কতো সমুদ্র উদ্যানে এ-সব ফুলের প্রারম্ভিক বীজ—কোনোটি স্কটল্যান্ডের, কোনোটি স্পেনের, কোনোটি রাশিয়ার জনদের কাছ থেকে আহৃত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ তোকাটি আমেরিকার, কেননা গায়িকা তুমি, কেননা তোমার কণ্ঠেই এদের পূর্ণ রূপটিকে আমরা দেখতে পেলাম। শুনলাম বারবারা আলেন-এর প্রাচীন কাহিনী, জানলাম প্রেমের যন্ত্রণা কেমন করে গোলাপের কাঁটা হয়ে ওঠে, কেমন করে প্রেমিকার চুম্বন সুইট উইলিয়াম-এর সমাধিতে ফুটিয়ে তোলে একটি লাল গোলাপ, আর কেমন করে অন্ধকার রাতে গাড়ি চালাতে-চালাতে একটি মেয়ে বারবার আর্ত-চিৎকার করতে-করতে কোথায় যেন আধুনিক জীবনের প্রতীক হয়ে যায়। সান্ড্রা, তুমি তো আমেরিকার কন্যা—তোমার হৃদয়েও অমন তীব্র বেদনা?

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা শিল্প সংস্কৃতি **নাটক**

মন্থন

"যখন লড়াই করা দরকার, তখন লড়াই এড়ানোর চেয়ে বড় অপরাধ আর নেই"—ফ্রীড রিল ভোলকে

রাজনীতি ছাড়া বাংলা নাটক হয় না। অনেক সময় আরোপিত রাজনীতি নাটককে পঙ্গু করে দেয়। রূপান্তরী প্রযোজিত 'মন্থন' কোন আরোপিত রাজনীতি নিয়ে নাটক নয়, সম্পূর্ণভাবেই রাজনৈতিক নাটক। যাঁরা রাজনীতি থেকে 'হাত-হাতেন' দূরে থাকার প্রবচনে বিশ্বাসী, তাঁরা এ নাটক দেখার পর কি সিদ্ধান্ত নেবেন জানি না, তবে সময় বিশেষে 'আগেও নেই পাছেও নেই' কথাটা শুধু নির্বিরোধের সার্টিফিকেট নয়, পলায়নী বৃত্তির দিকে কঠোর অঙ্গুলী নির্দেশে চিনিয়েও দিতে পারে। মাইম একাডেমিতে 'মন্থন' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনাদি চেয়েছিল একটি নিরুপদ্রব শান্তির নীড় রচনা করতে। যেখানে শান্ত—পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, পাখির ডাকে জেগে ওঠার মত শান্তি! কিন্তু যখন ঝড় আসে তখন হরিসাধনের সঙ্গে বাক্সবন্দার্থের রেখারেখিকে তালা-চাবি দিয়ে ঘরে বন্ধ রেখে মদত জোগাতে হয় ব্যারিকেড রচনায়, নিজের অজান্তেই শান্তিপ্রিয় নাগরিক আকস্মিক প্রেরণায় চ্যালেঞ্জ জানায় রাজশক্তিকে এবং ঝাঁপ দিতে পারে মৃত্যুতীর্থে। সেই তীর্থের যাত্রী যাঁরা, দেশজোড়া মন্থনে তাঁরা নীলকণ্ঠ। হয়ত পথটা ভুল ছিল, কিন্তু আমাদের স্তিমিত চৈতন্যে নিদারুণ কষাঘাতে ঐসব আত্মাহুতি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিল, সময়কে অস্বীকার করে গৃহপালিত জীবন, মূর মানসকে সময় মত চিনতে না পারা আমাদেরই পাপ।

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও নির্দেশিত 'মন্থন' রাজনৈতিক আত্মসমালোচনার নাটক, যদিও এই আত্মসমীক্ষা বহু ক্ষেত্রেই নাটকীয় শর্ত পালন করে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। প্রথম পর্বে ললিতের মুখে (রথীন সরকার) চমকপ্রদ সংলাপ, হরিসাধনের বিচিত্র চরিত্র (হাত তুলে

CAPEXIL
K P W LTD
CAPEXIL
CAPEXIL
খোডিয়ার
হ্যাট্রিক
করলো
কেমিক্যালস্ অ্যাণ্ড অ্যালায়েড প্রোডাক্টস এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল কর্তৃক ১৯৭৫-৭৬ সালের এক্সপোর্ট ব্যাজ পুরস্কার লাভ করে খোডিয়ার স্যানিটারী ওয়্যার আন্তর্জাতিক খ্যাতিতে এক নতুন দিগন্তে পৌঁছলো। পর পর তিন বছর CAPEXIL-এর এই দুর্লভ সম্মান লাভ করে খোডিয়ার এখন সব দেশের বাথরুমগুলির সৌন্দর্য বৃদ্ধির দাবী করতে পারে।
খোডিয়ার স্যানিটারী ওয়্যারের রপ্তানী সাফল্যের গোপন কথা হল এর অনুপম সৌন্দর্য। এর প্রত্যেকটি অংশ অতি আধুনিক উপাদানে তৈরী। ফ্রান্সের বিখ্যাত স্যানিটারী ওয়্যার নির্মাতা পোচার-এর সহযোগিতায় ও পরিদর্শনে তৈরী খোডিয়ার স্যানিটারী ওয়্যার চেহারায়, মাপে, ডিজাইনের বৈশিষ্ট্যে ও রঙের বৈচিত্র্যে, সৌন্দর্যক্ষেত্রে এক চমক্ এনে দিয়েছে।
national-214-BEN-R-1
খোডিয়ার

প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

গোপাল ঘোষ (১৯১৩—)

জন্ম কলকাতায়। পিতৃদেব ছিলেন মিলিটারী ক্যাপ্টেন। শৈশবের অনেকটাই কেটেছিল সিন্ধুদেশে। উত্তর প্রদেশের পাহাড়, সমতলভূমি, উপত্যকা তাঁর মধ্যে সর্বেশ্বরবাদের (Pantheism) উপলব্ধি জাগিয়েছিল। ছোটবেলা থেকে ছবি আঁকতেন। তাঁর পিতা কাগজ আর রঙ কিনে দিতেন অজস্র। অবসরগ্রহণ করার পর বারাণসীতে সপরিবারে বসবাস শুরু করলেন ক্যাপ্টেন ঘোষ। এ আর এক জগৎ। কাশীর গলিঘুঁজি, দরজা, মন্দির, তীর্থযাত্রী, পান্ডা, মণিকর্ণিকা আর দশাশ্বমেধ ঘাট—অন্য আরেক জগৎ। লোকজনের ভীড়, হট্টগোল এসব ভাল লাগতো না গোপাল ঘোষের।

এলাহাবাদের অ্যাংলো বেঙ্গলী কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়েছিলেন। জাতীয় আন্দোলনের উত্তেজনায় কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁর বাবা তাঁকে জয়পুরের মহারাজা চারু এবং কারুকলা বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেন তখন। ১৯৩১-৩৫ সেখানে পড়াশুনো করলেন। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে চলে এলেন মাদ্রাজের সরকারী চারু কারুকলা বিদ্যালয়ে। ১৯৩৮ সালে সেখানেও গোপাল ঘোষ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলেন। মাদ্রাজে সমুদ্রতীরে বসে একদিন তন্ময় হয়ে ছবি আঁকছেন গোপাল ঘোষ। কখন থেকে পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন একজন খেয়াল নেই তাঁর। রাজাগোপালাচারী নিজের পরিচয় দিলেন। গোপাল ঘোষের বিদেশযাত্রার সমস্ত বন্দোবস্ত হয়েছিল। আর্ট স্কুলের কর্তৃপক্ষ এতে সায় দিলেন না। তাই যাওয়া হল না।

১৯৩৮ সাল থেকে গোপাল ঘোষ কলকাতায়। চাকরি পেলেন অবনীন্দ্রনাথের ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টে। ছুটিতে সাইকেলে করে সারা ভারত ঘুরে এলেন। 'বঙ্গশ্রী'তে সচিত্র ভ্রমণকাহিনী লিখলেন। সপ্তাহে দু'দিন শিবপুর বি ই কলেজে স্থাপত্যকলার নকশা আঁকা শেখাতেন। আর স্কটিশ চার্চ কলেজের শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগে অংকন। এইভাবে পার্ট টাইম নানা কাজ করার পর শেষে রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁকে সাদরে ডেকে নিলেন সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ে। ১৯৫১-৭১ পর্যন্ত কুড়ি বছর অধ্যাপনা করে বর্তমানে অবসর জীবন কাটাচ্ছেন। এর মধ্যে ইউরোপ এবং আমেরিকা ভ্রমণ করে এসেছেন। ইদানীং শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না। মনেও ক্ষোভের চাপা নিরাশা। গোপাল ঘোষ আর বড় একটা ছবি আঁকেন না।

লণ্ডনে গোপাল ঘোষের প্রথম প্রদর্শনী করেন তাঁর পিতৃবন্ধু ব্রান ডি লা ভেলেতা ১৯৫১ সালে। দু হাজার টাকায় সব ছবি বিক্রী হয়ে যায়। তারপর কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লিতে একক এবং যৌথ প্রদর্শনী করেছেন অনেক। অজস্র ছবি এঁকেছেন। প্রচুর বিক্রী করেছেন। শিল্পী তিনি। তাই টাকা রাখতে পারেননি।

মোটামুটি '৩৮-৬৫ এই হলো তাঁর ছবি আঁকা স্বর্ণযুগ। এর মধ্যে যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের বছরগুলিতে তৈরি করলেন 'ক্যালকাটা গ্রুপ'। বাংগালী মধ্যবিত্তর নন্দনকাননে ভাঙনের দিনে কলকাতার তরুণতর, অগ্রণী শিল্পীরা যামিনী রায় উত্তর ছবির স্বরূপ অনুসন্ধান করলেন—প্রদোষ দাশগুপ্ত, রথীন মৈত্র, নীরদ মজুমদার, অবনী সেন, প্রাণকৃষ্ণ পাল, পরিতোষ সেন এবং অবশ্যই গোপাল ঘোষ।

গোপাল ঘোষ জলরঙ এবং প্যাস্টেলেই প্রধানত ছবি এঁকেছেন। সাদা ব্যবহার করে জলরঙকে স্বচ্ছ করেছেন কখনোবা। কখনো প্যাস্টেল কালিকলম জলরঙের মিশ্রমাধ্যমে ছবি এঁকেছেন। প্রথম দিকে ইম্প্রেসনিস্টদের [illegible] পেন্সিলের কাজ খুব সুন্দর। তারপর অবনীন্দ্রনাথের ধারায় মনুষ্য-জন জলরঙে এঁকেছেন। আসলে শিল্প সমালোচক উইলিয়াম আর্চারের কাছে দুমকায় যাবার পর লণ্ডনে হয় তাঁর 'দুমকা চিত্রমালা'। এ ছবিগুলোর সর্বত্র উজ্জ্বল সমারোহের সংগে সর্বদিকে হাল্কা কাব্যময় মনন। ভারতীয় ছবির নিসর্গ পশ্চাদপটে থেকেছে। মহিমময় সেই উপস্থিতি।

গোপাল ঘোষের ছবিতে নিসর্গ তার আঞ্চলিক পরিমণ্ডল উত্তীর্ণ হয়ে গেল। স্থানকালের সীমানার বাইরে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মূল চরিত্র তাই ধরলেন তিনি। আলো হাওয়া পাহাড় পর্বত গাছপালা, ঝর্ণা, নির্জনতম শিল্পী গোপাল ঘোষ রূপবোধে বর্ণগন্ধস্পর্শে নিবিড় আসক্ত। প্রকৃতির মধ্যে ঘোরাফেরা চলে সারাদিন। তিনি তারই রূপকার। বস্তু সত্য খোঁজেন কখন পেতে। ভারতীয় চিত্র ঐতিহ্যের ভেতরে থেকেই পালাবদলের ঘণ্টা বাজালেন গোপাল ঘোষ। এমন কি আমেরিকায় গিয়ে তাঁর চোখে পড়ল রকি পর্বতমালার ভুগিল ছবি, সোপান প্রপাত। প্রেয়ারীর বিস্তার আর রুক্ষ ফাঁকা জায়গা অতিক্রমনসাহ করুণ সৌন্দর্য, ঐতিহ্যের সূত্র ধরে সমকালীন নিসর্গচিত্র আঁকায় অনন্য তিনি।

সিন্থল
দূর করে, সুরভিত
CINTHOL
Godrej
CINTHOL
DEODORANT AND COMPLEXION SOAP
ভারতের একমাত্র সুরভিত সাবান, যা, আপনার গায়ের ঘামেভেজা দুর্গন্ধ একেবারে দূর করে।
আপনাকে এতো সজীব ও স্নিগ্ধ রাখতে অন্য কোন সাবান পারেনা।
ত্বক-বিশেষজ্ঞেরা রূপলাবণ্য অটুট রাখার জন্যে এই সাবান সুপারিশ করে থাকেন।